শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
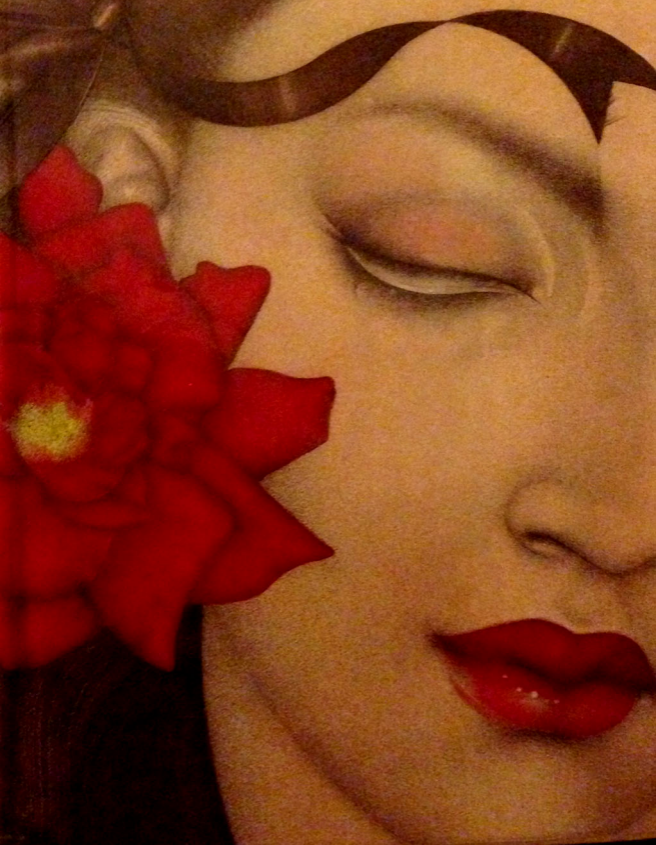
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ

প্রেমের উপন্যাস

উৎসর্গ

পান্না কায়সারকে
প্রীতি উপহার

সূচী

আত্মপ্রকাশ / ১
যুবক যুবতীরা / ১৩৮
সরল সত্য / ২৪৬
গভীর গোপন / ৩২৫
দর্পণে কার মুখ / ৪০৭
সুদূর ঝর্নার জলে / ৪৬৮
স্বপ্ন লজ্জাহীন / ৫৬২
অরণ্যের দিনরাত্রি / ৬৪১

আত্মপ্রকাশ

সকালবেলা পরিতোষ এসে বললো, এসব আপনারা কি আরম্ভ করেছেন? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত !

তখনও দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয় নি। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে বারবার ভুলে যাচ্ছি। চোখ দুটো আঠার মতন। এই রকমই হয়, দিনের প্রথম চোখ মেলেই দুটো ইচ্ছে জাগে, খাটের নিচ থেকে জলের গ্লাশটা টেনে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করা, যতবারই জল খাই মনে হয়, আঃ, জলই তো জীবন, কত রকম পানীয়ই তো চেখে দেখলুম, কিন্তু সকালবেলার জলের মতন এমন চমৎকার স্বাদ আর কিছুতে পাই নি। — তারপরই খবরের কাগজের জন্য মন ছটফট করে। কিন্তু তখনও ঘুমে মুখ জড়ানো, চোখ আঠা, মাথা ঝিমঝিমে, প্রথম পাতা শেষ করে সাতের পাতায় গিয়ে আবার প্রথম পাতাটা ভুলে যাই। মনে হয়, আজকের প্রধান খবরটা কী ? প্রধান খবর জানতে গোড়ার দিকে ফিরে এসে ততক্ষণে ফের ঝিমুনি এসে যায়।

বারান্দা থেকেই পরিতোষকে আসতে দেখেছিলাম। অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা মাথায় পরিতোষ বকের মতো পা ফেলে ফেলে আসছিল।

আমি জোর করে চোখ খুলে রেখে বললুম, ব্যাপারটা কি ?

— কাল রাত্তিরে আপনারা কোথায় ছিলেন ?

আমি পরিতোষকে তেমন পছন্দ করি না। বন্ধুর ছোট ভাইরা যে-রকম সাধারণত হয়ে থাকে, ভদ্র ও বিনীত, কচি—পরিতোষ তার থেকে আলাদা নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ ইকনমিক্স-এ এম.এ. পড়ে এবং যদি ভালো ছাত্র হয়, তবে সে তার দাদার বন্ধুদের কাছে এসে হঠাৎ চাপা অহঙ্কারী হয়ে যায়। এইটাই নিয়ম। পরিতোষের ধারণা, ওর অস্তিত্ব পৃথিবীর পক্ষে খুব উপকারী। আর আমরা, থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সকালবেলা সবাইকেই ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়। আমার ইচ্ছে হয়, পরিতোষকে খুব আন্তরিকভাবে যত্ন করি।

আমি বললুম, কাল রাত্তিরে ? কাল রাত দেড়টা পর্যন্ত নানা জায়গায় ছিলাম। তুমি কোন সময়টার কথা বলছো ?

পরিতোষ স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা সুরে বললো, দাদা কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি !

শুনে আমার খুব অস্বস্তি হলো। সকালবেলাতেই কেন অপরের সমস্যা আসবে আমার কাছে ! এই তো এইটুকু সময়, সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা, এর মধ্যে খুব একা গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে চেয়ার, খাট, বইয়ের আলমারি ও ঘুরন্ত পাখা সমেত নিজেকে ভালবাসতে। বুঝতে পারি জলের অপর নাম জীবন, মানুষ পৃথিবীতে বড় সুখে আছে। খুবই ইচ্ছে করে, পরিতোষ যা খুশি বলে যাক্, আমি গোপনে অন্যমনস্ক থাকি, আমি কিছুই শুনবো না। কিন্তু পরিতোষের গলার ক্ষুব্ধ অভিমান বাঁশির সুরের মতন নিরেট, উপেক্ষা করা যায় না। আমি বললুম, শেখর কাল ফেরে নি ? কেন ?

— আপনি জানেন না ?

— না, শেখরের সঙ্গে তো দু'তিন দিন আমার দেখাই হয় নি।

— তা হলেও আপনি আন্দাজ করতে পারবেন হয়তো, দাদা কোথায় গেছে।

— তুমি এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে কেন ? এতক্ষণে হয়তো ফিরে এসেছে। কোথাও আটকে গিয়েছিল বোধ হয়।

— মা কাল সারা রাত ঘুমোন নি। ভোর থেকে আমায় তাড়া দিয়েছেন খোঁজ করার জন্য।

— শেখর তো আগেও দু'একবার রাত্রে বাড়ি ফেরে নি। তাসপাশা খেলায় মত্ত হয়ে ...। চিন্তা করার কিছু নেই।

— আপনি ভুল করছেন। বাড়ি না ফেরা দাদার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু সহ্য করা মায়ের পক্ষে স্বাভাবিক হবে কি করে ? মা প্রত্যেকবারই দুশ্চিন্তা করবেন !

আমার সামান্য হাসি পেল। যেন আমিই রাত্রে বাড়ি ফিরি নি, পরিতোষ এমনভাবে বলছে যেন আমিই মাকে কষ্ট দিচ্ছি। অথবা আমিই শেখরের বাড়ি না ফেরার জন্য দায়ী। সকালবেলাতেই এরা এমন যুক্তি সাজিয়ে কথা বলে কী করে ? ইকনমিক্স পড়লে বোধ হয় সবই পারে, ওর গলায় অবিকল ইকনমিক্সের ছাত্রসুলভ গাম্ভীর্য, পৃথিবীর উপকার করার জন্য জন্মেছে তো ! আমরা তো, থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি নেই ! শেখরের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেবো কিনা বুঝতে পারি না। শেখরের রাত্রে বাড়ি না-ফেরা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ? শেখর একটা দশাসই জোয়ান, পকেটে টাকাও থাকে প্রায়ই, মাথাখানা এমন যে ময়দানের যে-কোনো টুকরো যে-কোনোদিন নিলামে বিক্রি করে দিতে পারে, খাল দেখে কোনোদিন নদী বলে ভুল করবে না, সে এক রাত্তির বাড়ি ফেরে নি, তাই নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা! তা হলে তো তিব্বতে কেন চিনি তৈরি হয় না, তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হয়। কিন্তু বন্ধুরা মানুষকে যে-রকমভাবে চিনতে পারে বাড়ির লোক তো তা পারবে না। একথা ঠিক। সকালবেলা আমিও তো যুক্তি বুঝতে পারি দেখছি ! সুতরাং আমি চিন্তিত ভঙ্গি করে বললুম, শেখর কাল কখন বেরিয়েছিল বলো তো ?

— রোজ যেমন হয় দশটার সময় খেয়েদেয়ে অফিসে গিয়েছে। বিকেলে তো কোনোদিনই বাড়ি ফেরে না, ফিরতে দশটা-এগারোটা। কাল ফেরে নি, কোনোরকম খবরও দেয় নি।

— তুমি প্রথমেই আমার কাছে এলে কি করে ? বরং —

— তাপসদার কাছে আগে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, আপনার কাছে খোঁজ নিতে।

এটা শুনেও আমার হাসি পাবার কথা। এই তা হলে নিয়ম, একজন আরেকজনের কাছে চালান করে দেবে। তাপস আমার কাছে পাঠিয়েছে, আমি ওকে অবিনাশের কাছে, অবিনাশ আবার পরীক্ষিতের। কিন্তু পরিতোষের জন্য আমার মায়া হলো। ছাতাটা পাশে মুড়ে রেখে চেয়ারে ঋজু

হয়ে বসে আছে। মুখে উদ্বেগের বদলে অভিমানই বেশি। যেন পরিতোষও জানে, শেখরের কিছুই বিপদ হয় নি, কিন্তু তার সেই বেপরোয়া নিয়ম-না-মানা ব্যবহার সে পছন্দ করছে না। আমি সাবধানে বললুম, নিশ্চয়ই হঠাৎ কোথাও আটকে গেছে। এতক্ষণে ফিরেও এসেছে বোধ হয়। যাই হোক, এর মধ্যে যদি না-এসে থাকে, তবে দুপুরে তুমি আমাকে অফিসে টেলিফোন করো। আমি বিকেলে খোঁজখবর করবো। তোমাকে এখন আর কোথাও যেতে হবে না, চা খাও।

— না, চা খাবো না, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

— সত্যি, কয়েকদিন শেখরের সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। শেখরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আলগা হয়ে গেছে ! তবে, বিকেলবেলা আমি খোঁজখবর নেবো।

— আপনাদের আড্ডাগুলোরই কোনো একটায় —

— সে সব জায়গায় আমি অবশ্য আজকাল প্রায় যাই-ই না।

— বিশ্বাস হয় না।

আমি একটু দুর্বলভাবে হেসে বললুম, তুমি জানো না পরিতোষ, এখন আমি অনেক বদলে গেছি।

পরিতোষের মুখ নিচের দিকে, ও বললো, কতটুকু সময়ে মানুষ কতটা বদলায় আমি জানি। সুনীলদা, জীবন নিয়ে আপনারা যে-রকম খেলা করছেন, তার সত্যিই কতটা মূল্য আছে, আমার সন্দেহ হয়।

— তুমি ছেলেমানুষ —

— খুব ছেলেমানুষ নই। আপনার চেয়ে মাত্র পাঁচ-ছ' বছরের ছোট হবো হয়তো।

— জীবনের এই সময়টায় পাঁচ-ছ' বছর কম সময় নয়। এক একটা বছর বড় লম্বা।

— আচ্ছা চলি। দুপুরে টেলিফোন করবো অফিসে।

— হয়তো তার দরকার হবে না। বাড়ি গিয়েই দেখবে শেখর ফিরে এসেছে। ফিরে এলেও আমাকে একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দিও খবরটা।

পরিতোষ চলে যেতেই বৃষ্টিটা জোরে এলো এবং রকম দেখে মনে হয় সহজে থামবে না। অর্থাৎ, আজ আর কাচা ইস্ত্রি করা জামা পরা চলবে না। জুতোটা পালিশ করারও মানে হয় না, কারণ কাদা তো লাগবেই। সুতরাং কালকের ঘামের গন্ধঅলা জামা আর কাদামাখা জুতো পরে বেরুতে গেলে দাড়ি কামানোটা অনর্থক। অনেকগুলো কাজ বেঁচে গিয়ে হাতে বেশ সময় পাওয়া গেল। এইসব বৃষ্টির দিনে সাধারণত অনেক লোকের অফিসে না-যাবার শখ হয়। কিন্তু আমার অফিসে যেতে বড় ভালো লাগে আজকাল, চৌকো টেবিলের সামনে পা তুলে দিয়ে চা খাবার যে আনন্দ, তার তুলনায় বাড়িতে খাটে শুয়ে থাকা কিছুই না। কিছুদিন আগে অফিসে আমার একটা উন্নতি হয়েছে, হলঘরে সকলের সঙ্গে বসার বদলে এখন একটা ছোট ঘরে আর দু'জনের সঙ্গে বসি। টং টং করে বেল বাজালে বেয়ারা ঝরি সিং তখুনি হাজির, তাকে যা ইচ্ছে হুকুম করা যায়। লে আউট সেকসনের তিনটে লোক সরাসরি আমার অধস্তন, ওর মধ্যে বনমালীবাবু আমার ঠাকুরদার ছোট ভাইয়ের বয়েসী—সে লোকটাকে কথায় কথায় দাবড়াতে বেশ লাগে, একটু সুযোগ পেলেই বলি, চোখের মাথা খেয়েছেন, আর কতদিন কলম-তুলি চালাবেন ? এবার রামায়ণ-মহাভারত পড়ুন গে যান! — মানুষকে হুকুম করা কিংবা ধমকাবার মধ্যে যে মজা আছে তা আমি সদ্য পেতে শুরু করেছি।

তিনটে আন্দাজ সুবিমল এসে হাজির হলো। আর, তার একটু পরেই পরিতোষের টেলিফোন। ওঃ, শেখরের কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। পরিতোষের গলায় আশঙ্কা বা ভয়ের

লেশমাত্র নেই, বরং অভিমান আরও গাঢ়। বললো, দাদা এখনো ফেরে নি। আপনি কোনো খবর পেয়েছেন ?

আমি বললুম, দাঁড়াও, এক মিনিট। তারপর টেলিফোনের মুখটা চেপে সুবিমলকে জিজ্ঞেস করলুম, শেখরের কিছু খবর জানিস ?

— কি খবর ?

— তোর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল ?

— না।

শেখর কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি। আচ্ছা দাঁড়া —

আমি পরিতোষকে আবার বললুম, না। আমি তো কোনো খবর জানি না। ও কোনো খবরও পাঠায় নি বাড়িতে ?

— না। আমি দাদার অফিসে ফোন করেছিলুম, কাল দুটো আন্দাজ বেরিয়েছে অফিস থেকে। আজও কোনো খবর নেই। সমস্ত হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি – সেখানে কিছু জানে না।

— থানায় খোঁজ নিয়েছিলে ?

— থানায় ? থানায় কেন ?

— নানা কারণে। যাক্‌গে, থানায় ও নিশ্চয়ই নেই। আমি দেখছি।

— মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বারবার আপনার কথা বলছেন। দাদার বন্ধুদের মধ্যে মা তো আপনাকেই বেশি চেনেন !

— মাকে ভাবতে বারণ করো। আমরা তো আছিই। আমি এখুনি বেরুচ্ছি, দেখি, আমার মনে হয় ও বহরমপুরে অনিমেষের কাছেও যেতে পারে। মাঝে মাঝে তো যায় ওর কাছে— অফিসে ছুটি নেয় নি ?

— না।

— আচ্ছা, আমি দেখছি। যদি পারি সন্ধের পর তোমাদের বাড়িতে যাবো একবার, ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যাঁ ?

ফোন নামিয়ে আমি সুবিমলকে বললুম, শেখরের কী হলো বল তো ?

সুবিমল পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খুঁটছিল, বললো, কী আবার হবে, মাথায় আমবাত হয়েছে নিশ্চয়ই।

— তুই কাল চণ্ডীর দোকানে গিয়েছিলি ?

— হুঁ।

— শেখর ছিল না সেখানে?

— না।

— চল্ বেরোই, শেখরের একটু খোঁজ করা দরকার। অবিনাশ কিংবা পরীক্ষিৎ বোধ হয় জানে।

— অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ কাল আমার সঙ্গে চণ্ডীর দোকানে ছিল। ওদের সঙ্গে শেখরের দেখা হয় নি।

— চল্ বেরুনো তো যাক্। আবার এক ঝঞ্ঝাট !

— বেরিয়ে কোথায় যাবি ?

— কে জানে ! চল, খড়ের গাদায় আলপিন খুঁজি গিয়ে।

সুবিমল চকিতে আমার ঘরের অন্য দুটো টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, শেখরকে খোঁজার আগে চল একটু বিয়ার খেয়ে নি। ঠাণ্ডা মাথায় ওসব খোঁজা–ফোঁজা চলে না।

কত জায়গায় যেতে হবে খেয়াল আছে ?

আমি ততক্ষণে ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। বললুম, এই বৃষ্টির দিনে বিয়ার ? তোর মাথা খারাপ !

সুবিমল সারা মুখ ভর্তি হেসে বললো, যা বলেছিস্ ! এই কথাটাই শুনতে চাইছিলুম, বৃষ্টির দিনে বিয়ার ভদ্দরলোকে খায় ! আজ একেবারে টিপিক্যাল হুইস্কি ওয়েদার।

— কে খাওয়াবে ?

— গৌরী সেন।

— আজ গৌরী সেন কে ?

— তুই হবি না বুঝতে পারছি। তা হলে চল অবিনাশের কাছে যাই।

দরজা দিয়ে বেরুবার মুখে বনমালীবাবু এলেন। হাতে ট্রেসিং পেপারে কয়েকটা ড্রয়িং, ভদ্রলোক কোনো বুড়ো মানুষ আঁকবার সময় সব সময় নিজের মুখটা আঁকেন। বললেন, মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি চলে যাচ্ছেন ? সাইমন্‌স কোম্পানির কপিটা —

মুহূর্তে গলার রুক্ষ ভাবটা টেনে এনে বললুম, কাল প্রেস বন্ধ, আজ কপি নিয়ে হবেটা কি ? এতে আপনার কিছু করারও নেই, প্রেস টাইপ কম্পোজ করে বসিয়ে দিতে হবে। আপনি ড্রয়িংগুলো আমার টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে যান ! মিঃ মৈত্র ফিরে এসে আমাকে ডাকলে বলবেন, আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ গেছি। বুঝলেন ? জরুরি কাজে যাচ্ছি, বলতে ভুলবেন না।

মিঃ মৈত্র, অর্থাৎ আমার বড় জামাইবাবু, যাঁর দৌলতে আমি এই বিনা কাজের, মাঝারি মাইনের এবং মানুষকে হুকুম করার ও ধমকাবার অধিকার সমেত এই চাকরিটা পেয়েছি, মাঝে মাঝে তাঁর নামটা উচ্চারণ করে বেশ মনের জোর পাই। অফিসে আত্মীয়স্বজন থাকলেও একটা দূরত্ব রাখা উচিত, আমি সে সব গ্রাহ্য করি না, মাঝে মাঝে মিঃ মৈত্র না বলে ইচ্ছে করেই বলি, বড় জামাইবাবু। অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গিয়ে হয়তো কখনো বলি, বড় জামাইবাবুর ঘরের পাখাটায় ওরকম কিচকিচ করে শব্দ হয় কেন ? উনি কাজের লোক — এসব খেয়াল করেন না, আপনি তো একটা ব্যবস্থা করতে পারেন ! — এ আপিসের খোদ বড় সাহেবের আমি আপন শালা — আমার ওপর এখানে কথা বলে কোন্ শালা ? এই যে আমি মিঃ মৈত্রর নাম বললুম, এর ফলে বনমালীবাবুকে অফিসে বসে থাকতে হবে ছ'টা পর্যন্ত।

বৃষ্টিটা বিশ্রী ধরনের, দস্তা রঙের আকাশ, দেখলেই বোঝা যায় সারা বিকেল-সন্ধে এই রকমই টিপ্‌টিপ্ চলবে, জোর বর্ষণও হবে না, থামবেও না। সুবিমল জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি দেখলো। রিসেপসান কাউণ্টারের ইহুদি মেয়েটার দিকে আমি হালকা চোখ তুলে বললুম, মিস নাওমি, টেলিফোন এলে বলো, আমি আজ ফিরবো না। তুমি বিকেলের মেলগুলো সর্ট করে রেখো। তুমি তো কাল পরশু দু'দিনের ছুটি নিয়েছো, না?

— হ্যাঁ, একটু —

— ইস্, এ দু'দিন অফিসটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা লাগবে !

মেয়েটা চিড়িক করে হেসে তৎক্ষণাৎ বললো, আপনি চলে যাচ্ছেন, আজ বিকেলটা আমারও ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।

আমি কাউন্টারের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললুম, তাই নাকি ? তুমি ফ্রি আছো আজ? একটা ডেট হতে পারে ?

মেয়েটা তখনও ঠোঁটে হাসি চালিয়ে যাচ্ছে, বললো, না, মাত্র বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ফ্রি !

একটু বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ—কিন্তু ফর্সা রঙে মানিয়ে গেছে, হলদে রঙের চুল ও

মেয়েটার দু' চোখের রং দু'রকম। একটা চোখের মণি নীল, আর একটা কালো। আমার পিসিমার বাড়িতে একটা বেড়ালের এই রকম দু'রঙের চোখ দেখেছিলাম।

সুবিমল বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় পা দিয়ে বললো, মেয়েটাকে পাওয়া যায় ?

— চেষ্টা করে দেখছি।

— অরুণদের অফিসে একটা টেলিফোন অপারেটর ছিল, বাঙালি মেয়ে, সে অন্য রকম গলা করে অরুণকে প্রায়ই প্রেমের কথা শোনাতো।

— যাঃ, অরুণের বাজে গুল যত সব।

— না রে, আমি পুরো ব্যাপারটা জানি। অরুণ যখন একা থাকে, তখন মেয়েটা প্রথমে নীরস গলায়— অপারেটরদের গলা যেমন হয়,— বলে, মিঃ দাসগুপ্ত, হিয়ার ইজ এ কল্ ফর য়ু। তারপরই, একটু থেমে, অন্য রকম গলায়, হ্যালো, অরুণ, বলেই মিষ্টি হাসি। অরুণ বলে, কে ? তখন সেই রহস্যময় কণ্ঠ প্রশ্ন করে, আমায় চিনতে পারছো না ? অরুণটা তখন তো তো করে বলে, না, ঠিক, কে তুমি ? মেয়েটি তখন বলে, যদি চিনতে না পারো, তবে থাক্। এই বলেই লাইন কেটে দেয়। পরের দিনও আবার সেই রকম, আমায় চিনতে পারছো না ? অরুণটা পড়েছিল ফ্যাসাদে, টেলিফোনে গলার আওয়াজ একটু বদলে যায়, এখন কোন্ মেয়েকে অন্য কোন্ মেয়ের নাম বলে দেবে — সে এক কেলেঙ্কারী ! — দু'তিনদিন এ রকম চলার পর ও চোখ কান বুজে একদিন বলে ফেললো, তুমি কে, মালতী?

ওপাশ থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস, তারপর, এতদিনে যা হোক চিনতে পারলে !

অরুণ বললো, মালতী, তুমি কানপুর থেকে কবে ফিরলে ? মেয়েটা বললো, তিন দিন ফোন করছি, তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না, মাত্র এই ক'দিনে —। অরুণ বললো, মাত্র এই ক'দিন নয়, তিন বছর পর —। মেয়েটা বললো, তিন বছরেই বুঝি মানুষ সব ভুলে যায়— তারপর এই রকম চললো কয়েকদিন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এখন কি অবস্থা ?

— শোন্ না মজা। অরুণ তখনও কিছুই বুঝতে পারে নি। অপারেটরের কথা ও চিন্তাও করে নি। টেলিফোনের রহস্য নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদিন এই রকম টেলিফোনের সময় আমি গিয়ে উপস্থিত। অরুণ আমাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলে কাঁচুমাচুভাবে জিজ্ঞেস করলো, এখন কি করি বলতো ? আমি বললুম, মালতী তোর পুরানো বান্ধবী বুঝি ? তার সঙ্গে দেখা কর না ! অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ভাগ্ শালা, আমি মালতী বলে কস্মিনকালেও কারুকে চিনি না। আমি বানিয়ে নাম দিলুম, আর ওপাশের মেয়েটাও মালতী সেজে গেল। এখন, কোন্ মেয়ের দায় পড়েছে, আমার সঙ্গে রোজ রোজ ইয়ার্কি করার বল তো ?

আমি বললুম, অরুণের নিজের বউ নাতো ?

— না, সেদিকটা চেক্ করা হয়েছে। অরুণের বউ একদিন দুপুরের শো-তে আত্মীয়দের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল, সেদিনও টেলিফোন এসেছে। আর এদিকে ব্যাপারটাকে পুরো ঠাট্টাও বলা যায় না, এতদিন ধরে নিছক ঠাট্টা চালিয়ে যাওয়া, তা ছাড়া মেয়েটা যে-সব কথা বলে, তার মধ্যে কিছু বেশ নরম নরম ব্যাপার আছে। অরুণ কোনো চেনা অল্প-চেনা মেয়েকেই সন্দেহ করতে পারছিল না, তখন টেলিফোন অপারেটরের কথা আমারই মাথায় আসে। অরুণদের অফিসে দু'জন অপারেটর আছে, শিফট ডিউটি। এদের মধ্যে কোন্‌জন ? একজন কালো ধুমসী, আরেকটি বেশ ফর্সা ছিপছিপে। কালো ধুমসীটারই হবার চান্স বেশি, এরকম মেঘের আড়াল থেকে খেলছে যখন ! একদিন হাতে হাতে ধরে ফেললুম ! চল্, এত কাছাকাছি এসে গেছি, অবিনাশের কাছে যাবার আগে এক রাউন্ড খেয়ে যাই।

কথা বলতে বলতে আমরা ওয়েলিংটন থেকে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত এসে গিয়েছি। বৃষ্টিতে এখন সর্বাঙ্গ ভেজা। অবিনাশের অফিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে, আরও অতটা হাঁটতে হবে। সুবিমলকে বললুম, আমার কাছে বেশি টাকা নেই রে।

— চল্ না। আমার কাছে দশ টাকা আছে। তোর কাছে কিছু হবে না ? আর, একটা কাজ করলেই তো হয় ! এতক্ষণ এ কথা ভাবি নি কেন ? তোর মাথায় একদম বুদ্ধি খেলে না ! অবিনাশের অফিস পর্যন্ত যাবার দরকারটা কী, ওকে টেলিফোন করে এখানে ডাকলেই তো মিটে যায় !

টেলিফোনে অবিনাশকে পাওয়া গেল। আমরা দু'জনে একটা ছোট মতন বারে গিয়ে ঢুকলুম। বেয়ারাকে যাতে টিপ্‌স না দিতে হয়, সেইজন্য সুবিমল নিজেই কাউন্টার থেকে দু'গ্লাস হুইস্কি আর সোডা নিয়ে এলো টেবিলে। তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আহা, রাগ করছিস কেন ? ইচ্ছে করেই বেশি সোডা মিশিয়ে এনেছি। এসব এখন শিখে নে একটু একটু। দিনের প্রথম পেগটা খেতে হয় অনেক সোডা মিশিয়ে, খুব আস্তে আস্তে। তারপর, রাত্রের দিকে যা ইচ্ছে কর না !

প্রথম চুমুক দিয়েই আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। সুবিমলকে মিথ্যে কথা বলেছিলুম, আসলে আমার পকেটে অনেক টাকা আছে। কালকের জামাটাই গায়ে দিয়ে এসেছি আজ, কাল বিকেলে পাওয়া অনেক টাকাই পকেটে রয়ে গেছে। সুবিমলের সঙ্গে এই যে শুরু হলো, আজ কোথায় থামবো জানি না। অথচ, আজ পালিয়ে যাবো ভেবেছিলাম। ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ সন্ধেবেলা স্বাভাবিক মানুষের মতন তিনটে সরল কাজ করবো। একা স্বাধীনভাবে কলকাতার সন্ধেবেলার হাওয়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমি তিনটে জায়গা ছুঁয়ে আসবো। প্রথমেই হাসপাতালে, মাঝে মাঝে হাসপাতালে গেলে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা খুব জোরালো হয়ে ওঠে, কিন্তু শুধু সেজন্য নয়, আমার দাদামশাই হাসপাতালে আছেন, আট বছর তাঁকে দেখি নি, তাঁকে শেষবার একবার আমি খুবই দেখতে চাই। কিন্তু আজ আর আমার মুক্তি নেই, আমি প্রথম চুমুক দিয়েই বুঝতে পেরেছি।

সুবিমল বললো, কিরে, হঠাৎ অমন গুম মেরে গেলি কেন ?

আমি মুখ তুলে বললুম, শেখরের কথা ভাবছি। কোথায় যে গেল !

— কোথাও আছে ঘাপটি মেরে ! আমার কি মনে হয় জানিস্, শেখর ঐ মৃচ্ছকটিক নাটকের সেই লোকটার মতো, কি যেন ক্যারেকটারটার নাম, বসন্তসেনার প্রেমিক ছিল ?

— চারুদত্ত ?

— হ্যাঁ, সেই চারুদত্ত'র মতন জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে কোথাও নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে!

— খুব জুয়া খেলছে বুঝি আজকাল ?

— ও যখন যে নেশা ধরে, জানিস তো ব্যাপার ? এখন তো আর মদ খায় না, এখন শুধু জুয়ার নেশা, জুয়ায় হারার নেশা ! জিতলে ওর আনন্দ হয় না, হারতেই ওর উত্তেজনা। ছেড়ে দে শেখরকে। সেই অরুণের ব্যাপারটা শোন্।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন্ অপারেটরটা ? কালো ধুমসী না ফর্সা দোহারা ?

— শোন্ না ব্যাপারটা ! একদিন আমি ওর টেবিলের উল্টোদিকে চুপ করে বসে আছি, সেই সময় টেলিফোন আর সেই নকল মালতী। কিছুক্ষণ কথা চলার পর আমি অরুণের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে হুঁ-হাঁ দিয়ে চালাতে লাগলুম, আর অরুণ চট্ করে চলে গেল পিবিএক্স যে ঘরে থাকে। তখুনি হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। সেই দোহারা ফর্সা মেয়েটা! তারপর কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হলো। মেয়েটা মোটেই ঠাট্টা করে নি, খিলখিল করে হেসে ওঠার বদলে লজ্জায় মাথা নুইয়ে

ফেললো। অরুণের সঙ্গে আর কথাই বলতে চায় না। মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটা; অরুণকে বললো, আমায় ক্ষমা করুন, এ ঘরে থাকবেন না, প্লিজ ! আমার অন্যায় হয়ে গেছে ! অরুণ তো অবাক হয়ে ফিরে এলো। এদিকে আমি যেটুকু সময় ফোন ধরেছিলুম, তখন মেয়েটা বলছিল, আমি আর পারছি না অরুণ, এই আমার শেষবার, তুমি যদি দূরে ঠেলে দাও, তা হলে আমি কোথায় নেমে যাবো জানি না ! মাইরি, সে গলার আওয়াজে ঠাট্টার ঠ–ও নেই। শুনে আমার শরীর শিউরে উঠেছিল।

— মেয়েটির নাম কি ?

— সাবিত্রী। সাবিত্রী হালদার। রিফিউজি মেয়ে, চাকরি করে একটা বড় সংসার চালায়। কিন্তু মেয়েটা ঠিক টেলিফোন অপারেটরের টাইপ নয়, মুখে একটা অন্য ধরনের লাবণ্য আছে। যখন তাকায় মনে হয় যেন খুব দূর থেকে তাকিয়ে আছে, কিংবা কাছে বসেও খুব দূরের জিনিস দেখছে।

— আর একটা রাউন্ডের অর্ডার দে। গেলাস খালি। উঠতে হবে না, বেয়ারাকে বলে দে না।

— তোর আর সোডা লাগবে ?

— না।

— মেয়েটাকে অফিসের সবাই জ্বালাতন করে, একটু সুযোগ পেলেই মাঝবয়সী অফিসারদের ইশারা–ইঙ্গিত। ছোকরা কেরানিরা তো আছেই। তুই আজ তোর অপারেটরের সঙ্গে যেমন করছিলি —

— আমি কিছু করি নি ! আমি ইয়ার্কি করছিলুম।

— ঐ তো। টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে সবাই শুধু ইয়ার্কি করে, আর সে ইয়ার্কি শুধু একটু গোপনে ফুর্তি করার ইঙ্গিত। আর কিছু না। মেয়েটার ডিউটি শেষ হয় সাড়ে ছ'টায়, আমি আর অরুণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আমি একটু দূরে। অরুণ কথা বলতে গেল। একটু বাদেই ফিরে এলো। মেয়েটা লজ্জায় অস্বস্তিতে কোনো কথাই বলতে পারে নি, খালি বলেছে, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন। আমার এমন মায়া হলো, আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো। আমার ইচ্ছে হলো মেয়েটাকে আমি বিয়ে করি —

— তুই? তুই আবার এর মধ্যে এলি কি করে ?

— বাঃ! মেয়েটা তো জানে না যে অরুণের বিয়ে হয়ে গেছে ! অরুণের ঐ রকম লালটুমার্কা চেহারা আর ঠাণ্ডা স্বভাব দেখে মেয়েটা অরুণের প্রেমে পড়েছিল। তাই বলেই তো আর মেয়েটার সর্বনাশ হতে দেওয়া যায় না ! বরং আমি বিয়ে করলে —

— মেয়েটা ভালবাসে অরুণকে, হঠাৎ তোকে বিয়ে করতে যাবে কেন ? তা ছাড়া, মেয়েটা অরুণকে ভালবাসে জেনেও তুই তাকে বিয়ে করবি কি করে ?

— অরুণকে ভালবেসেছিল বলে সে আর পরে আমাকে ভালবাসতে পারে না ? আমিও তো এর আগে সতেরোটা মেয়েকে ভালবেসেছি, তা বলে আর কারুকে পারবো না ? আমি তো সেইদিনই মেয়েটাকে অসম্ভব ভালবেসে ফেললুম। সাবিত্রী—এই নামটা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে এখন একটু একটু ব্যথা করে। এর নামই তো ভালবাসা, তাই না ?

— কে জানে ! যাই হোক, তুই মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলি ?

— না — সাবিত্রী তো আমাকে চেনেই না। অরুণ যদি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতো, আমি সাবিত্রীর কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতুম। আঃ, টেলিফোনে ওর সেই করুণ গলা এখনও আমার কানে ভাসছে, তুমি যদি দূরে ঠেলে দাও, তা হলে আমি কোথায় নেমে যাবো

জানি না। আমার মনে হলো, নদীর স্রোতের মধ্যে ভেসে যাওয়া সেই মেয়েটির নরম হাত দুটো আমাকে ধরতেই হবে। আমি অরুণকে সব বললুম। ও কি করলে জানিস ? অরুণটা একটা তিলে খচ্চর ! ডগ ইন দি ম্যানজার, যাকে বলে ! আমার কথা শুনে, অরুণ রেগে বলে উঠলো, আমি যেন কোনোদিন ওর অফিসে না যাই ! আমি আর কোনোদিন গেলে, ও দারোয়ান দিয়ে আমাকে বার করে দেবে—

— অরুণকে খুব দোষ দেওয়া যায় না ! কি করে তোকে বিশ্বাস করবে ?

— কেন করবে না ? এক মুহূর্তে মানুষের জীবন বদলায় না ? আমি সেদিন ওই এক মুহূর্তে—

— হ্যাঁ, এক মুহূর্তেও বদলায়। কিন্তু কোন্ মুহূর্তটা সেই বিশেষ মুহূর্ত তা চেনা বড় মুশকিল। তোর এর আগের সতেরো বার —

— আঃ ! আমি তো জানি ! এই মুহূর্তটাই রিয়েল ! তা বলে অরুণ আমাকে ওর অফিসে যেতে বারণ করবে ! এটা একটা ছোট লোকের মতন ব্যবহার নয় ?

সুবিমল এক চুমুকে পুরো গেলাসটা শেষ করে ঠক্ করে টেবিলে রাখলো। ঠোঁট দুটো সামান্য বেঁকানো, যেন ও গেলাসটা উপভোগ করে নি। মাথার চুলের মধ্যে চিরুনির মতো আঙুল চালিয়ে তেতো গলায় সুবিমল বললো, এর পরের রাউন্ডটা তুই খাওয়া।

সুবিমলকে দেখে মনে হয়, ও সত্যি আহত হয়েছে। ঠিক কি জন্য ? অরুণ ওকে অপমান করেছে তাই, না সাবিত্রীর সঙ্গে ওর পরিচয় হয় নি বলে ? আমি গলার আওয়াজ নিচু করে বললুম, সুবিমল, তুই আর কতদিন দুপুরে বন্ধুদের অফিসে অফিসে ঘুরবি ? তোর ভালো লাগে ?

ক্লান্ত ভঙ্গিতে সুবিমল বললো, কী করবো, দুপুরে বাড়িতে বসে থাকতে একদম ভালো লাগে না ! একা থাকলে মাথায় যত রাজ্যের কু-চিন্তা আসে। শরীর খারাপ হয়ে যায়!

— কিন্তু, রোজ রোজ বন্ধুদের অফিসে এসে আড্ডা দিতে একঘেয়ে লাগে না তোর ? একটা চাকরি-টাকরি খুঁজে নে না—

— দিচ্ছে কে ?

— অবিনাশকে বল্ না ? ওর তো অনেক —

— যা যাঃ ! অবিনাশ দেবে চাকরি, আর তাই নিয়ে আমায় বাঁচতে হবে ? জানিস, দেশে থাকতে অবিনাশরা আমাদের প্রজা ছিল ? অবিনাশের বাবা আমার ঠাকুরদার কাছে রোজ সকালে এসে হেঁ হেঁ করতো —

— ওসব চালিয়াতি ছাড়ু। পুব বাংলা থেকে যারা এসেছে, সবাই আগে এক একজন জমিদার ছিল— এসব ঢের শুনেছি ! এখন ওসব ভুলে —

— তুই বিশ্বাস করলি না ? তোরা কোথাকার ?

— আমিও ইস্টবেঙ্গলের, কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন টুলো পণ্ডিত, আমরা খড়ের ঘরে থাকতুম ভাই, এখন কলকাতার দোতলা বাড়িতে থাকি। আমি খারাপ নেই। যাকগে, অবিনাশকে না বলবি তো অন্য কোথাও চাকরি দেখ না —

— একশো তেইশ জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করেছি এ পর্যন্ত, সতেরো জায়গায় ইন্টারভিউতে ডেকেছিল, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলাম একশো সতেরো টাকা মাইনের ! তারপর থেকে ও পাট চুকিয়ে দিয়েছি—। এর চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-ফিঞ্জিনিয়ারিং পড়লে কাজ হতো ! সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস— এসবের তো আর দরকার নেই দেশের—

— কোথাও মাস্টারির চেষ্টা করলে তো পারিস ?

— এঁদো গাঁয়ে গিয়ে ? পারবো না। তাছাড়া, ছোট ছেলেদের সঙ্গে জোচ্চুরি আমার পোষাবে

না। অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাস্টারি, তার মানে ক্লাসে গিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে, ড্যাফোডিলের সাবসটান্স লেখো তো বাপু, এই বলে ঘুমোনো, আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি মন দিয়ে পড়াতেও পারবো না, ফাঁকি মারতেও পারবো না। তা হলে ?

— মন দিয়ে পড়াতে পারবি না কেন ?

— তুই আমায় জেরা করছিস্ কেন রে শালা ? দে, আরেক রাউন্ডের অর্ডার দে। তুই তো শালা জামাইবাবুর জোরে চাকরি পেয়েছিস্ ! অফিসে গিয়ে ফুটানি করিস্ খালি। সবাই সব জিনিস পারে না, আমার দ্বারা মাস্টারি–ফাস্টারি হবে না ! মানুষকে আমার কিছুই শেখাবার নেই ! তুই তো ভালো চাকরি পেয়েছিস্, তুই কাজ করিস না কেন ?

— আমি কাজ করি না, তার কারণ কাজ নেই বলে। অফিসে অন্য লোকেরা সারাদিন টেবিলে বসে, ফাইল নাড়াচাড়া করে যে–কাজ করে, তা আসলে এক ঘণ্টার কাজ। এর আগে আমি গভর্নমেন্ট অফিসে কেরানিগিরি করতুম। সেখানেও কোনো কাজ নেই। সাত দুগুনে চোদ্দর চার নামিয়ে হাতে পেন্সিল নিয়ে বসে থাকা। তাকিয়ে দেখ না, সারা দেশটা থেমে আছে। আসলে এখন প্রত্যেকদিন ভারত–বন্ধ্। ওসব কাজ–টাজের কথা ভাবিস্ না। কোনোরকমে একটা চাকরি খুঁজে নে। টাকাটা তো দরকার। সবাই কাজ না করে টাকা নিচ্ছে, তুই–ই বা নিবি না কেন ?

সুবিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, চাকরি–ফাকরি আর পারবো না। ভাবছি, কবিতা লেখা ছেড়ে এবার নভেল–টভেল লিখতে শুরু করবো।

আমি হেসে উঠে বললুম, তাতেই তোর সব সুরাহা হয়ে যাবে ? কত লোকই তো নভেল লিখছে ! তুই নভেল লিখে দু'দিনেই বুঝি তুম্প মারবি ? পারবি বিমল মিত্তিরের মতো লিখতে ?

এই সময় দরজার কাছে অবিনাশের লম্বা চেহারাটা দেখা গেল। একটা দামি সুট হাঁকিয়েছে, এদিক–ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে খুঁজছে আমাদের। দেখতে পেয়ে, বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে এসে টেবিলে বসলো। সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কি রে এত দেরি ? আমি বললুম, অবিনাশ, তুই শেখরের খবর জানিস্ ?

— কেন, শেখরের কি হয়েছে ?

— কাল রাত থেকে বাড়ি ফেরে নি !

— চুলোয় যাক্। বাড়ি ফেরে নি, ওর কি বাড়ির অভাব আছে ? চল্, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, একবার বারীনদার আখড়ায় যাবো।

সুবিমল বললো, আমি বারীনদার ওখানে যাবো না। আমার ভালো লাগে না।

— চল্ না। আজ একটা মারামারি হতে পারে।

— আমি মারামারির মধ্যে নেই !

— তুই আমার সঙ্গে থাকবি। সুনীল থাকবে, পরীক্ষিৎ আসবে, তোর ভয় কি ! আজ বারীনকে টিট্ করতে হবে !

আমি বললুম, কিন্তু শেখরের একটা খোঁজ নেওয়া দরকার। ওর ভাই এসেছিল সকালে, কোথায় যে যেতে পারে—

অবিনাশ ধমকে বললো, তুই শেখরকে কোথায় খুঁজবি ? ওর কোনো জায়গা ঠিক আছে ! চল্, বারীনদার ওখানে যদি খোঁজ পাওয়া যায়—।

যখন ঢুকেছিলাম, তখন দোকানটা নিরিবিলি ছিল। অন্ধকার হয়ে আসার পর এখন গম্‌গম্ করছে। কোণের টেবিলে একটা বিশাল জোয়ান মাতাল হয়ে গিয়ে শিশুর মতন গলায় গান

ধরেছে। মাঝে মাঝে লোকটা চিৎকার করে বলে, শের-ই-পাঞ্জাব ! ইউ নো, হু ওয়াজ মাই ফাদার ? শের-ই-পাঞ্জাব ! হিন্দুস্থান কা বুলবুল ! মাই ফাদার ওয়াজ কে এল সাইগল ! শের কা বাচ্চা শের !—এরপর সে গুমগুম করে বুকে শব্দ করে। লোকটাকে অনেকদিন ধরে চিনি, একটু পরেই ঐ শেরের বাচ্চাকে এক পাল শেয়ালের মতন এই বেয়ারার দল ঠেলতে ঠেলতে দরজা দিয়ে বার করে দেবে। একটা গেলাস ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দিক থেকে ভরাট গলায় হো-হো করে হাসি।

২

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু বাতাসে এখনো মিহি জলকণা। কিসের একটা বিরাট প্রসেশন বেরিয়েছে, ট্রাম-বাস সমস্ত জমাট। এখন ট্যাক্সি পাওয়াও অসম্ভব। ভিজে রাস্তা দিয়ে সপ্‌সপ্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে প্রসেশনের লোকরা কী নিয়ে যেন খুব রাগারাগির শ্লোগান দিচ্ছে। কান পেতে শুনলুম, ভিয়েৎনাম। ছেলেবেলার মতো এখনো আমার শোভাযাত্রা দেখতে খুব ভালো লাগে। লক্ষ করে দেখেছি, প্রত্যেক শোভাযাত্রার লোকদের ঠিক একরকম দেখতে হয়। ঠিক, তিনটে প্যাণ্ট-পরা লোকের পর দু'জন ধুতি, একটি বেঁটে লোক লাইন মেক-আপ করার জন্য আধা-দৌড়োয়, এরপর কয়েকটি বুক-প্লেন মেয়ে, দু'টি পায়জামা-গেরুয়া পাঞ্জাবী চুলে তেল নেই, পিছনে আবার তিনজন প্যাণ্ট পরা। এই একই মানুষ দেখি প্রত্যেক শোভাযাত্রায়, অবিকল এই সব মুখ। ভিয়েৎনামের বদলে খাদ্য চাই, ঠিক এই প্রসেশন, ঠিক তিনজন প্যাণ্টের পর দু'জন ধুতি, একটা বেঁটে লোক আধা-দৌড়ানো। আবার এরাই আসবে পুজো বোনাস কিংবা ডি-এ বাড়াও আন্দোলনে, ছাঁটাই চলবে না—তাও একই লোক, তিনটে প্যাণ্ট, দুটো ধুতি একজন বেঁটে, কাশ্মীর দেবো না, এরাই, ডি-আই-আর প্রত্যাহার করো, তাও এরা, আমি খুব ভালো করে লক্ষ করে দেখেছি। শোভাযাত্রার লোকেরা খুব সুখী, আমার মনে হয়, কারণ এদের দাবি আছে। ওদের নিশ্চিত আশা আছে, অন্তত দশটা দাবির মধ্যে জীবনে একটা না একটা পেয়ে যাবেই। আমার কোনো দাবি নেই, তাই আমাকে পাশে দাঁড়িয়ে প্রসেশন দেখতে হয়।

সুবিমল বললো, দাঁড়া, আমি আমার দিনের গুড টার্ন-টা সেরে আসি।

অবিনাশ বললো, সে আবার কিরে ?

— আমি ঠিক করেছি, সারা দিনে একটা না একটা ভালো কাজ করবো। তাতে মনটা বেশ পরিষ্কার থাকে।

সুবিমল একটি মধ্য-বয়স্ক লোকের কাছে গিয়ে বললো, চলুন ! লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলুম সে অন্ধ, হাতে একটা সাদা লাঠি। লোকটি অস্বস্তির সঙ্গে লাঠিটা মাটিতে ঠুকছিল। সুবিমল বললো, আপনি রাস্তা পার হবেন তো ? চলুন, এ প্রসেশন এত বড় যে শেষ হতে ঢের সময় লাগবে, আপনাকে আমি পার করে দিচ্ছি।

লোকটি বললে, হ্যাঁ, আর দেরি হলে আমি ট্রেন ধরতে পারবো না !

অন্ধ লোকরাও একা ট্রেনে ওঠে, আগে জানতুম না। সুবিমল লোকটির হাত ধরে রাস্তায় নামলো, বিশাল মিছিল, অসংখ্য গলায় ক্রুদ্ধ চিৎকার, তার মধ্য দিয়ে একটি অন্ধ লোক পার হয়ে গেল।

আমরা চৌরঙ্গি ধরে হাঁটতে শুরু করলুম তিনজনে। কিছুক্ষণ চুপচাপের পর সুবিমল

অবিনাশকে জিজ্ঞেস করলো, বারীনদার সঙ্গে তোর ঝগড়া হলো কী নিয়ে ?

অবিনাশ তীব্র গলায় উত্তর দিল, ওটা একটা মহা শয়তান ! শ্মশানের পাশে ব্যবসা করে, বুঝলি না ? কাল খেলার সময়—

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম, ওদের কথায় আর কান রইলো না। শরীরটা চনচনে লাগছে, ঠিক নেশা হয় নি, কিন্তু মাথায় কিছুটা রক্ত উঠেছে। পায়ের শব্দ বেশ ভারি, জিবটা শুক্‌নো। এখন আর থামা যাবে না। অথচ, সন্ধেবেলাটা অন্যরকম কাটাবার ইচ্ছে ছিল আজ। ভেবেছিলাম, প্রথমেই একবার হাসপাতালে যাবো। দাদামশাই আর বাঁচবেন না, আট বছর তাঁকে দেখি নি, দাদামশাইর কথা মনে পড়লেই চোখে ভাসে একাত্তর বছরের একটি দীর্ঘ ঋজু শরীর, বুক ভরতি সাদা লোম। দাদামশাইয়ের গায়ের রং কালো, মাথার চুল এখনো অনেক কালো আছে, কিন্তু বুকের রোম সব সাদা। দাদামশাই মানেই আমার কৈশোরকাল। ওঁর কাছে যখন বহরমপুরে থাকতুম, উনি বলতেন, সংস্কৃত আর অঙ্ক— এই দুটো মন দিয়ে শেখো, বুঝলে! এই দুটো শিখলে বেঁচে থাকা সম্পর্কে কোনো দ্বিধা আসবে না, পৃথিবীকে মনে হবে না ভয়ের স্থান, যা–কিছু অজ্ঞাত তাকেই মনে হবে না জ্ঞানের অতীত, বরং ইচ্ছে হবে তার মধ্যে প্রবেশ করতে। বুঝলে ?— আমার ও–দুটোই শেখা হয় নি, সংস্কৃত আর অঙ্ক আমার শেখা হয় নি, তাই কি আমার এত দ্বিধা ?

দাদামশাই আর বাঁচবেন না। আট বছর তাঁকে দেখি নি, ইচ্ছে ছিল এই যৌবনে এসে আমার কৈশোরের সেই আদর্শ পুরুষটিকে একবার দেখে রাখি। স্মৃতিরও কিছু যুক্তি আছে। দাদামশাইকে এখন একবার না দেখে রাখলে, ওঁর সম্পর্কে আমার স্মৃতিটা সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আজ যাওয়া হলো না, আর দেখা হবে কি ? কাল বড়দির মুখে যা শুনলুম, তাতে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, আর আয়ু নেই ওঁর। দাদামশাই এতদিন ছিলেন ওষুধ খাবার পোকা, নিজেই নানান্ মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে নিজের চিকিৎসা করতেন, সামান্য সর্দি–কাশিতেই টপাটপ ওষুধ খেতেন, অন্যদেরও খাওয়াতেন। হার্ট অ্যাটাক হবার পর কয়েকদিন কোমার মধ্যে কাটিয়ে এখন তিন–চারদিন আবার জ্ঞান ফিরেছে হাসপাতালে। সেখানেও ওষুধ দিতে দেরি হলেই আর সহ্য করতে পারতেন না। নার্সকে টেবিলের ওপর রাখা পকেট–ঘড়ি দেখিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলতেন, সাতটা বেজে তিন, তোমার তিন মিনিট দেরি হয়েছে মা। এসব সেবার কাজ, এ বড় কঠিন দায়িত্ব। মানুষের জীবন বাঁচাবার জন্য সময়টা বড় দামি !

কিন্তু বড়দির মুখে শুনলুম, কাল বিকেলবেলা ওঁরা যখন দেখতে গিয়েছিলেন, তখন দাদামশাই ঘুমোচ্ছেন। অনেকটা সুস্থ, এবার ভালো হয়ে ফিরে আসবেন, এই সকলের আশা। নার্স ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি দেখে ওষুধ এনে ওঁকে জাগিয়ে তুলেছে। ঘুম ভেঙে দাদামশাই খানিকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে নার্সের দিকে হাতজোড় করে অন্যরকম গলায় বললেন, মা, আমাকে আর ওষুধ দেবেন না। আমার আর ওষুধের কোনো দরকার নেই। এবার আমি বাড়ি যাবো। আমাকে ক্ষমা করুন !

সকলে বিষম অবাক। অনেক পীড়াপীড়ি করা হলো, কিন্তু উনি আর ওষুধ খেলেন না, ওঁর গলায় যেন অন্য লোক কথা বলছে, উনি বারবার শিশুর মতন বলতে লাগলেন, আমি বাড়ি যাবো !

এই বাড়ি মানে মৃত্যু ? দাদামশাইকে দেখে ব্যাপারটা জেনে নেওয়া দরকার। হাঁটতে হাঁটতে আমরা যেখানে এসেছি, কাছেই পি জি হাসপাতাল, কিন্তু এখন আমার পক্ষে যাওয়া চলে না। এখন আমার জিব শুকনো, মাথা চনচনে, পায়ের শব্দ ভারি। দাদামশাই, তুমি আর একদিন অন্তত বেঁচে থেকো। তোমাকে আমার দেখা খুবই দরকার। আমি কাল যাবো।

আমি অবিনাশকে বললুম, চল্ এবার ট্যাক্সি ধরি, আর হাঁটতে পারি না ! ওরা দু'জন গল্পে মশগুল ছিল। সুবিমল বললো, বেশি তো রাত হয় নি, চল্ কালীঘাট পর্যন্ত হেঁটেই যাই।

আকাশের দিকে তাকালেই মনে হয় সাড়ে সাতটার বেশি বাজে নি। ভিজে জামা-প্যাণ্ট গায়েই শুকিয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলুম। আমার চোখ একটুতেই লাল হয়ে যায়।

ভবানীপুরের কাছে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছি, রাস্তার ওপারে চার-পাঁচটি অল্পবয়েসী মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, সেই দিকে চোখ পড়লো। প্রথমে রুটিন চোখে তাকিয়েছিলাম, মেয়েদের দিকে যে-রকম একবার তাকাতেই হয়, এক পলক দেখেই এ-পাশের অন্য দু'টি বেণী-ঝুলোনো মেয়ের দিকে দেখলুম, আবার চোখ ফেরালুম ওদের দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে কী রকম যেন অন্য রকম লাগছে, কিছু যেন একটা আমার মনে পড়ার কথা। আবার চোখ সরিয়ে চলন্ত বাসের জানলার কাছে হলদে শাড়ি পরা এক বিশাল মহিলাকে দেখে নিতে না-নিতেই আবার পাশ দিয়ে দু'জন শালোর পরা পাঞ্জাবী কুমারী, তাদের আঁট শরীর দু'টিও ভালো করে দেখে নিতে হয়, তারপর আবার ঐ দলটার দিকে তাকালাম। পাঁচটি বাচ্চা মেয়ে, পনেরো-ষোলোর মতো বয়েস, হাত-পা নেড়ে কল্‌কল্ করে কথা বলছে। আমি ওদের মুখগুলোর ওপর দিয়ে চোখ ঘোরাতে লাগলাম, কী যেন একটা আমার মনে পড়ার কথা, ঘড়ির অ্যালার্মের মতো একটা রিনরিন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওদের মধ্যে একটি লাল শাড়ি পরা মেয়ের দিকে দু'তিনবার তাকিয়ে আমার চোখ আটকে গেল। মুহূর্তে মনে পড়লো সেই দৃশ্য, ওকে আমি দেখেছিলুম দু'বছর আগে। একটা বিয়েবাড়িতে বহু আলো ও লোকজন, তার মধ্যে আমি ঐ মেয়েটিকে, ওর নাম যমুনা, ওকে দেখেছিলাম। সেই দেখা আমার বুকে লেগে আছে। বিয়ের দিনে লোকজনের সট্‌সট্ ছোটাছুটি, সানাইয়ের চিৎকার আর গণ্ডগোলের সুর, বেমানান ঝলমলে পোশাকে অসংখ্য কুৎসিত নারী, তার মধ্যে আমি যমুনাকে দেখেছিলাম, এখনও সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, বিশাল সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে ঐ বালিকাটি দাঁড়িয়েছিল, একটি সাদা ফ্রক পরা, হালকা শরীরে ঝক্‌ঝকে স্বাস্থ্য, আমি নিচ থেকে দেখছিলাম, মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তলার মানুষদের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখে কী রকম যেন একটা অবাক হবার ভাব ছিল, ঐ বয়েস, ঐ হাঁসের মতন শরীর, দেবীর মতন মুখের ডৌল, সাদা ধপধপে ফ্রক, ওর চোখের বিস্ময়—সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন একটি সরলতা স্থির মূর্তি, যার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর, যে নিজের শরীরের জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে সুন্দরের জেগে ওঠাকে দেখছে। সুন্দরী স্ত্রীলোক তো কম দেখি নি, কাছ থেকে, দূর থেকে, কখনো সাজানো, কখনো অনাড়ম্বর, এমন কি সেই বিয়েবাড়িতেও, যাদের ঠিক স্ত্রীলোক বলে—সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে শুধু যাদের শরীরই প্রকট, তাদেরও দেখছিলাম, কথা ও ফষ্টিনষ্টি করা হয়েছিল কম নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সরলতার জন্য হঠাৎ কাঙাল হয়ে পড়েছিলুম। আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওকে দু'হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি, দেখি, ছুঁয়ে দিলে ওর গা থেকে রং উঠে আসে কিনা, সরল বিস্ময়ভরা জীবনের পবিত্র রং।

ও যে খুব সুন্দরী, তা নয়। অথবা, ঐ বয়েসে সব মেয়েই আশ্চর্য সুন্দরী, তাছাড়া আর কিছু খুব আলাদা নয়, ওর রং খুব ফর্সা নয়, একটু চাপা, টেবিল ল্যাম্পে নীল রঙের ঢাকনা থাকলে ওপর থেকে তার আলো যেরকম দেখায়—অনেকটা সেই রকম। আমি বহুক্ষণ সেদিন ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, ওকে আগেও দেখেছি, কিন্তু সেদিনের সেই অবাক পবিত্রমুখ, তা মূর্তি গড়িয়ে পুজো করার মতন। আমি ওকে বলেছিলাম, খুকু, তুমি একটা ফুল নেবে ? ও বলেছিল, আমার নাম খুকু নয়, আমার নাম যমুনা। আমায় চিনতে পারলেন না ? আমি বরুণের বোন।

স্থির চোখে তাকিয়ে দেখলুম, লাল শাড়ি পরেছে, তবু যমুনার মুখ এখনো পবিত্র সরল। ঝরনার জলের মত ঝকঝকে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সুবিমল আর অবিনাশকে বললুম, তোরা একটু এগিয়ে যা, আমি পরে আসছি।

অবিনাশ বললো, কেন ?

— আমাকে একটা ওষুধ কিনতে হবে বড়দির জন্য। ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন না কিনলে আর পরে হবে না।

— কিনে আন না, আমরা দাঁড়াচ্ছি।

— না, একটা মিকশ্চার আছে, বানাতে একটু দেরি হবে। তোরা এগো না, আমি যাচ্ছি।

সুবিমল বললো, চল্, ও পরে আসবে। অবিনাশ আমার খুব কাছে সরে এসে বললো, ঠিক আসবি তো ? না, কেটে পড়ার তালে আছিস্ ?

আমি বললুম, কাটবো কেন ? তোরা যা না। আমি মিনিট পনেরো–কুড়ির মধ্যেই বারীনদার ওখানে আসছি। এই বলে আমি সামনের ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়লুম। ঢুকে সোজা কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালুম ভিড়ের পাশে। একটু পরে একজন চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই ? আমি বললুম, একটা টেলিফোন করতে দেবেন দয়া করে?

টেলিফোন তোলার পর লক্ষ করলুম আমার হাত কাঁপছে। কেন ? কে জানে ! ইচ্ছে করেই সাবধানে আমি মাত্র পাঁচবার ডায়াল ঘোরালুম। সুতরাং অনেকক্ষণ এনগেজ্‌ড টোন। হতাশার ভঙ্গি করে রিসিভারটা নামিয়ে বেরিয়ে এলুম ডাক্তারখানা থেকে। সতর্কভাবে উঁকি দিয়ে দেখলুম, অবিনাশ আর সুবিমল সত্যি চলে গেছে।

কিন্তু রাস্তার এপারেও ফাঁকা। সেই পাঁচটি মেয়ের কেউ নেই। কোথায় গেল ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ? এই তো দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, দু'মিনিটের মধ্যে সবাই চলে গেল ? ভোজবাজি ! নাকি ওরা কেউ এখানে ছিলই না, আমিই কল্পনা করেছিলুম। যমুনাকে আমি দেখি নি ?

মুহূর্তে দপ করে রাগ জ্বলে উঠলো আমার শরীরে। মাথায় ছলাৎ করে রক্ত চলে এলো। আমি কঠিন মুখে ভস্ম করার চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে মনে মনে বললুম, যমুনাকে ফিরিয়ে এনে দাও ! যমুনাকে আমি দেখতে চাই একবার, এখুনি, যমুনাকে দাও ! নইলে আমি সর্বনাশ কাণ্ড বাধাবো, আমি ট্রামের লাইন উপড়ে ফেলবো, ছিঁড়ে ফেলবো টেলিগ্রাফের তার, মাঝ রাস্তায় আগুন জ্বালাবো। কোথায় যমুনা ? দাও ! ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়লো। যেন কেউ তাকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল, আবার সত্যিই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। অল্পদূরে বাস স্টপে যমুনা একা দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে আমার টান্‌টান্ শরীরটা শিথিল হয়ে এলো, কোমল হলো মুখের ভঙ্গি, যেন আমি অনেকক্ষণ পর নিঃশ্বাস ছাড়লুম।

নিঃশব্দে যমুনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, কেমন আছো ? চমকে ফিরে তাকিয়ে যমুনা বললো, একি ! সুনীলদা ! আপনি এখানে ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখানে কী করছো ? তোমরা এখন এখানেই থাকো নাকি ?

— না, আমাদের বাড়ি তো লেক প্লেসে। এখানে গান শিখতে আসি। ঐ তো ঐটা আমার গানের ইস্কুল।

— তুমি শাড়ি পরেছো তো, তাই তোমাকে প্রথমে চিনতে পারি নি।

— বাঃ, শাড়ি তো আমি অনেকদিনই পরি। আপনি আগে দেখেন নি বুঝি ?

— কি জানি ! আমার মনে পড়ে, সেই বুলুদির বিয়ের দিন তোমাকে দেখেছিলুম ধপধপে সাদা একটা ফ্রক পরা।

— ওমা কি মিথ্যে ! বুলুমাসীর বিয়ের সময় আমি মোটেই ফ্রক পরতুম না। তখন আমি শাড়ি পরি রীতিমতো। বুলুমাসীর বিয়ে এই তো সেদিন হলো —

— সেদিন নয়, দু'বছর আগে। তখন তুমি—

— মোটেই না, বুলুমাসীর বিয়েতে আমি গোলাপী রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক পরেছিলুম।

— সে হয়তো বউভাতের দিন। কিন্তু বিয়ের দিন তুমি সাদা ফ্রক পরেছিলে আমার স্পষ্ট মনে আছে।

— আপনার কিচ্ছু মনে থাকে না ! সে তো নরেশদার বিয়েতে, তিন বছর আগে। বুলুমাসীর বিয়ে তো হলো মোটে গত বছর জুনে। বুলুমাসীর বিয়েতে তো আপনি আসেনই নি ! মেয়েদের শাড়ি পরার কথা ঠিকই মনে থাকে।

— ও বাবা ! 'মেয়েদের' ! শাড়ি পরেই বেশ বড়ো হয়ে উঠেছো দেখছি! তুমি তো একটা খুকী !

— মোটেই খুকী নই।

— আচ্ছা বেশ, খুকী নও। তুমি আমায় চিনতে পারলে কী করে ?

— বাঃ, পারবো না ? তবে, আপনার চেহারা অনেক বদলে গেছে ! আগে আপনি অনেক ভালো দেখতে ছিলেন, সত্যি !

— এই তো তুমি এখনো খুকী আছো ! 'মেয়েদের' মধ্যে একজন হয়ে উঠলে কি কোনো ছেলের সামনা–সামনি তার চেহারা ভালো বলতে হয় ? একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে।

পরিষ্কার ছন্দে যমুনা হেসে উঠলো। সে হাসির মধ্যে কোথাও একটুকরো কঠিন পদার্থ নেই। এই হাসি যেন ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে আসে। হাসতে হাসতেই বললো, এখন তো ভালো দেখতে বলি নি ! এখন কি বিচ্ছিরি —

— কী রকম বিচ্ছিরি ?

— রং কালো হয়ে গেছে। দাড়ি কামানো নেই। জামা প্যাণ্ট কী রকম যেন !

— বৃষ্টিতে ভিজেছিলুম তো ! কালকেই দেখবে আবার অন্যরকম। কালকেই।

— আপনি জোরে জোরে কথা বলছেন কেন ?

আমি চমকে উঠে বললুম, জোরে কথা বলছি ? তোমার অসুবিধা হচ্ছে ?

যমুনা ওর বিশাল কালো চোখ আমার দিকে মেলে বললো, না, আপনি আগে এ রকম জোরে কথা বলতেন না। আপনার চোখ লাল দেখাচ্ছে কেন ? আপনার শরীর খারাপ ?

— না, না। চোখে এমনি বালি পড়েছিল। তুমি বাসে উঠবে ? চলো না, একটু হেঁটে যাই, আমি কালীঘাটে যাবো, তুমি ওখান থেকে বাসে উঠবে।

— চলুন ! আপনি আমাদের বাড়িতে আসেন না কেন ? আজ যাবেন ? চলুন না —

— উঁহু। আর একদিন। তোমার দাদা বরুণ তো আমেরিকা থেকে এখনো ফেরে নি ?

— দাদা এই নভেম্বরে ফিরবে। আমার জন্য একটা টেপ রেকর্ডার আনতে বলেছি।

লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, লাল রঙের চটি, তার মধ্যে যমুনার কচি নিটোল শরীর, এতগুলো লাল রঙের মধ্যেও কোনো আগুনের আভা নেই, এই হচ্ছে সুন্দর, যা দেখলে মন অবনত হয়। এক পলক আমার মনে হলো, যমুনা, তুমি সত্যি সুন্দর— এই কথা বলে আমি ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। ওর ভিতরে যে সুন্দর আছে, তা প্রণাম পাবারই যোগ্য। কিন্তু তা করা যায় না, না ? লোকে পাগল বা মাতাল বলবে ! আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললুম, যমুনা, তোমাকে হঠাৎ দেখে আমার মনটা খুব ভালো লাগছে।

— বাড়ি চলুন না, বাবা ! কী এমন কাজ ?

— না, আজ নয়। তার আগে আরেক দিন আমি তোমার এই গানের ইস্কুলের সামনে দেখা করবো।

— গানের ইস্কুলের সামনে ? কেন ?

— এমনি। আজ এখানে তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগলো তো ! আরেক দিনও বোধ হয় ভালো লাগবে। তুমি এখন কী গান শিখছো, পাতার ভেলা ভাসাই ?

— ও মা, আপনি জানলেন কী করে ? ওটা তো বিগিনারদের গান। আমি এখানে সেকেন্ড ইয়ার।

— ও, তাহলে তো এখন, শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে, তাই না ? যমুনা আবার সর্বাঙ্গ দিয়ে হেসে উঠলো। বললো, আপনি এসব জানলেন কী করে ? গান শিখতেন বুঝি ?

— না। কোনোদিন না। আমাদের পাশের বাড়ির একটা মেয়ে গানের ইস্কুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে আর রোজ সকালে হারমোনিয়ামে সেই সব গান গায়, গায় না ঠিক, চেঁচায় ! সেইজন্যে, কোন্ গানের পর কোন্ গান শেখানো হয় সব আমার মুখস্থ।

— ভালোই তো, আপনারও গান শেখা হয়ে যাচ্ছে !

কী মুখ, পরিষ্কার, কোথাও একটু সামান্য দাগ নেই, পবিত্র চোখ দু'টিতে নেই সামান্য দ্বিধা, গাঢ় কালো রঙের ভুরু। গাছ থেকে পেড়ে আনা সদ্য টাটকা নিটোল আপেল বা পেয়ারা হাতে নিলে যেরকম ভালো লাগে, যমুনার মুখ দেখে আমার সেই রকম মনে হতে লাগলো। ধরিত্রীর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ—তা যেন আমি ওর মুখে দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত শরীরটাই নিখুঁত, কোথাও একটুও অতিরিক্ত বা কম নেই, একটা বাচ্চা ঘোড়া কিংবা একটা বাজপাখির শরীরের প্রতিটি অংশ যেমন সুষম আর ছন্দোময়, ঠিক সেই রকম, এমন কি আকাশে একটি এরোপ্লেন উড়ে যাবার মধ্যে যে স্মার্টনেস আছে, যমুনাকে দেখে একবার আমার সে-কথাও মনে হলো। মসৃণ গলার নিচে সদ্য জেগে ওঠা বুক, একটা হাত ধরে আছে বুকের কাছে গানের খাতা। স্তন কথাটার মানে—যা শব্দ করে যৌবনকে আগমন ঘোষণা করে— এই রকমই যেন কোথায় শুনেছিলাম। আমি যমুনার মুখ ও বুকের দিকে তাকিয়ে যৌবনের জেগে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। খুবই ইচ্ছে করছে, এই পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি যমুনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। কিন্তু, তা করা যায় না, না ? লোকে পাগল কিংবা মাতাল বলবে।

জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের গানের ইস্কুল কবে-কবে ?

— মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার। ছ'টা থেকে আটটা। আপনি গান শিখবেন ? শিখুন না, আপনাদের মতোও অনেকে শেখে।

— যাঃ ! তা নয়, আমি তো এই দিকে মাঝে মাঝে আসি। হঠাৎ হয়তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। আজ তোমাকে দেখে এমন ভালো লাগলো।

— মাকে বলবো আপনার কথা। কবে আসবেন বাড়িতে ?

— যাবো, যাবো। ঐ যে তোমার বাস এসে গেছে। উঠে পড়ো, নইলে বাড়িতে তোমার জন্য ভাববে। হয়তো ভাববে, তুমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছো।

— ইস্, কী যে বলেন ! আমি একা একা কত জায়গায় যাই।

— বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি খুব বড়ো হয়ে গেছো। এবার উঠে পড়ো বাসে।

যমুনা এগিয়ে বাসে উঠলো। তারপর ফিরে হাসলো আমার দিকে। ওর সর্বাঙ্গের লাল পোশাকের জন্য ওর হাসিতেও একটা লাল আভা এসেছিল। বাস ছাড়ার মুহূর্তে ও রিনরিনে গলায় শুদ্ধ ধৈবত সুরে চেঁচিয়ে বললো, আসবেন কিন্তু ! যমুনা এখনো 'মেয়েদের' মধ্যে একজন হয়ে ওঠে নি, সে রকম কোনো মেয়ে বাসে ওঠার পর রাস্তায় দাঁড়ানো পুরুষের প্রতি চেঁচিয়ে কথা

বলে না। নিয়ম নেই।

কালীঘাট বাজারের ওপরে একখানা ঘর নিয়ে বারীনদা থাকে। বারীনদার সঙ্গে কী করে বা কোন্ সূত্রে যে আমাদের চেনা হলো তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু দেখেছি ওর ঘরে অনেক ফিল্মস্টার কিংবা ফুটবল খেলোয়াড়ও আসে। বারীনদার ঘরে তাসের জুয়া খেলতে খেলতে অনেক রাত ভোর করেছি। কোনো কোনো রাতে সর্বস্বান্ত হয়ে হেরে গেছি হয়তো, কিন্তু বারীনদা সকালে ডিমসেদ্ধ আর চা খাইয়ে— বাড়ি ফেরার গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত দিয়েছে। বারীনদা লোকটা দুর্দান্ত ধরনের, কিন্তু নিছক অর্থলোলুপ নয়। জুয়া খেলার সময় একটা পয়সা ছাড়ে না, কিন্তু অন্য কোনো সময় ধার চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর ফেরত চায় না। বেঁটে, কিন্তু সবল চেহারা, হাত দু'খানা বিষম ভারী, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখখানা নেপালি ধরনের। মুখের ভাবে রাগ কিংবা দুঃখ সহজে বোঝা যায় না। কেওড়াতলা শ্মশানের পাশে বারীনদার একটা ফুলের দোকান আছে, দিনের বেলায় সেখানে বসে। এটাও অদ্ভুত, ঐ ফুলের দোকানে ওর কতই বা লাভ হয়, বারীনদার যা কিছু লাভ সবই তো রাত্রে, জুয়া। তা ছাড়া ওর ঘরে সব সময়ই তিন চার রকমের মদ থাকে —পয়সা দিয়ে খেতে হয়। কিন্তু দোকানটার ওপর ওর খুবই যত্ন, কারুর প্রতি যথার্থ স্নেহ দেখাতে গেলে বারীনদা বলে, যাঃ, তুই মরলে, আমার দোকান থেকে বিনা পয়সায় ফুল দেবো এখন ! যত লাগে।

আমি ঢুকে দেখলুম, ঘরে অনেক লোক। প্রথমেই চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম, শেখর আছে কিনা। নেই। খাটের ওপর জুয়া বসে গেছে, বারীনদা, অবিনাশ, তাপস আর একটি অচেনা লোক। জানলার কাছে বসে নূরুল আর সুবিমল। এক কোণে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে পরীক্ষিৎ, হাঁটু মোড়া ও হাত ছড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারা যায়— ও আর সারা রাত্রে উঠবে না। আমি জিজ্ঞেস করলুম, বারীনদা শেখরের কোনো খবর জানো ?

— না ভাই। সে তো দিন পনেরো হলো এখানে আসে না ! আর আসবেও না কোনোদিন বলে গেছে।

— আর আসবে না ? কেন ?

— আরে, ওসব লোক কি খেলতে জানে ? ও মাসে শেখর পরপর চারদিন জিতলো, অনেক, প্রায় পাঁচশো টাকা। তারপর একদিন হারলো ছ'শো টাকার মতন। সেদিনই বললো, ও নাকি টাকাটা ইচ্ছে করে হেরেছে। ওর আর খেলায় মন নেই। দূর, দূর, ওসব লোককে নিয়ে খেলা হবে না। খেলে বটে অবিনাশ মিত্তির।

— অবিনাশ ? কিন্তু কাল নাকি ওর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে ?

— অবিনাশ কোনো কথা না বলে নিবিষ্টভাবে তাশের দিকে তাকিয়েছিল। বারীনদা হো-হো করে হেসে বললো, কাল অবিনাশ একটু বেশি জিতছিল কিনা, তাই মেজাজটা একটু গরম হয়ে গিয়েছিল। আরে ভাই, কুড়ি বছর ধরে তাসের খেলা খেলছি— একটা জিনিস দেখলুম, হেরে গেলে যত না মাথা গরম হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি হয় জেতার সময়। নতুন ডিল করছি, তুমি বসবে নাকি ?

— না, আমি না।

তাপস বললো, আয় সুনীল, বোস না। ঘণ্টাখানেক খেলবো।

আমি বললুম, না-রে। তোরা খেল।

— কেন ? টাকা নেই ?

— সেজন্য না। আমার ইচ্ছে নেই আজ। তোরা খেল না। আমি এলুম শেখরের জন্য। তোরা কেউ শেখরের খবর জানিস না ? তা হলে তো একটু চিন্তারই কথা দেখছি !

— শেখরটা একটা স্বার্থপর। ও কারুর খবর নেয় না, আমরা ওর খবর কেন নিতে যাবো?

— কিন্তু বাড়ি ফেরে নি কাল রাত্তিরে, কোনো পাত্তা নেই, হারিয়ে গেল না কি? কিছুটা খোঁজ খবর তো করা দরকারই—

অবিনাশ মুখ তুলে সামান্য জড়িত গলায় বললো, মনে কর না আমরাই হারিয়ে গেছি। শেখরকে বল্ আমাদের খুঁজতে।

— তাকে পাচ্ছি কোথায় যে বলবো ?

— বীণার ওখানে খোঁজ করেছিলি ? আমার নিশ্চিত ধারণা ও— (ছাপার অযোগ্য) বীণার ওখানেই পড়ে আছে।

— বীণার ওখানে ? শেখর তো ওখানে আর যায় না শুনেছি। তা ছাড়া ওখানে গেলেও পরের দিন বাড়ি ফিরবে না কেন ?

— মারামারি করেছে না বাঁধা পড়ে আছে, তার কিচ্ছু ঠিক আছে ! তুই ওখানে গিয়ে দেখ, ঠিক পাবি !

আমি খানিকটা চটে উঠে বললুম, আমার দায় পড়েছে। আমাকেই একা খোঁজ করতে হবে— তার কি মানে আছে ?

অবিনাশ দাঁতে দাঁত ঘষে তেতো গলায় বললো, তা হলে তোমায় এখানে এ প্রস্তাবটা কে আদুরে আদুরে গলায় উত্থাপন করতে বলেছে মানিক ? খেলতে হয় খেলো, না হয় এখান থেকে কাটো।

বারীনদা বললো, তাস দিচ্ছি, বসবে নাকি দু'এক রাউন্ড ?

আমি বললুম, না। আপনারা খেলুন, আমি দেখি। কত করে বোর্ড ?

— ছোট বোর্ড। দশ–পয়সা, কুড়ি পয়সা।

— লিমিট ?

— বারো টাকা। দু'জন হয়ে গেলে আনলিমিটেড।

বারীনদা তাস দিতে দিতে বললেন, দাও দাও বোর্ড মানি দাও। নাও, মুভ !

তাপস প্রথমেই তাস তুলে দেখে নিয়ে ঠোঁট উল্টে বললো, প্যাক ! অচেনা লোকটি একটি টাকা রেখে বললো, দশ। অবিনাশ বললো, দশ। বারীনদা বললো, দশ। তারপর তিনজনেই আবার, দশ, দশ, দশ। দশ, দশ, দশ।

এই সময় হীরালাল এক গ্লাস সোডা মেশানো রাম এনে বললো, এই লিন সুনীলবাবু, তিন টাকা পনেরো দিন।

আমি বললুম, এ কি ! কে দিতে বললো ? আমি চাই নি তো ?

— খাবেন না ?

— না। তা ছাড়া আমি হুইস্কি খেয়ে এসেছি, এমনিতেই খেতুম না।

— হুইস্কি শেষ। রাম আর জিন আছে। বাংলাও আছে, খাবেন ?

— না, আমার আজ কিচ্ছু চাই না। তুমি এটা নিয়ে যাও !

— ঢেলে ফেলেছি যে। আপনি না খান, অন্য কেউ খাবে—আপনি দামটা দিয়ে দিন না।

বারীনদার এই পেয়ারের চাকরটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। কথাবার্তা বিষম কাঠখোট্টা। এক একদিন ইচ্ছে করে ধরে দু'ঘা কষিয়ে দি। কিন্তু যা ষণ্ডামার্কা চেহারা, সাহসও হয় না। আর বিনা বাক্যব্যয়ে আমি পয়সা বার করে দিয়ে, গেলাসটা নিলাম। একটা চুমুক দিয়েই

মুখটা বিশ্রী হয়ে গেল। আমি বললুম, কী হীরালাল, এ যে একেবারে স্পিরিট ! দাম বেশি নিচ্ছো, আবার ভেজালও মেশাচ্ছো ?

— কী বলছেন ? খাঁটি ফাইভ ইয়ার্স দিয়েছি। আপনি পুরোনো লোক —

বারীনদা সোহাগ করা গলায় বললেন, সত্যি হীরালালটা কি যে করে ! মাঝে মাঝে আমাকেও এমন মাল দেয় যে মনে হয় ভেজাল মেশানো ! কি রে হীরু ? দে, আমাকে দে এক গ্লাস।

আরেকটা চুমুক দিয়ে আমার সত্যিই খারাপ লাগলো। আমি বললুম, এ আমি খাবো না, ফেলে দিচ্ছি !

অবিনাশ হাত বাড়িয়ে বললো, ফেলিস না, আমাকে দে। গেলাসটা নিয়ে অবিনাশ এক চুমুকে সবটা শেষ করে বাঁ হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঠোঁট মুছলো। অবিনাশের কপাল ভর্তি ঘাম, চুলগুলো খাড়া-খাড়া, নাকের ডগাটা চকচকে। মেরুদণ্ড সোজা করে অবিনাশ উঁচু হয়ে বসে বললো, ব্লাইন্ড এক টাকা হিট্, রাজি ? বারীনদা মুচকি হেসে বললো, রাজি ! অচেনা লোকটি অন্য বিষয়ে একটিও কথা বলছে না, গম্ভীর গলায় বললো, রাজি।

সুবিমল আর নূরুল জানলার কাছে প্রায় নিঃশব্দে বসে আছে। নূরুল একটা সিগারেট নিয়ে দু' আঙুলে ডলছে। দেশলাই কাঠি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সিগারেটের ভেতর থেকে তামাক বার করে ফেলেছিল। তারপর বাঁ হাতের তালু থেকে অন্য একটা মশলা সিগারেটের মধ্যে ঢোকালো। নূরুল বললো, কী সুনীলবাবু, বড় তামাক চলবে নাকি একটান ?

আমি বললুম, না, আমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

নূরুল ছোট করে হাসলো। ভারি মধুর ওর হাসি। মুখ নিচু করে বললো, সবার কাছেই এক কথা শুনি। ছেড়ে দিয়েছি ! ছাড়ার জন্য নিজেকে কোয়ালিফাই করলেন কবে ? ভালো করে ধরেছেন কখনো, যে ছাড়বেন ? উপনিষদের কর্মকাণ্ডে আছে না, পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ! তার মানে, পর্যাপ্ত কাম্য বিষয় ভোগ করে তবেই তো ভোগ্যবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়। বুঝলেন, ভোগ্যবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হলে তখনই সংসারের সমস্ত কামনা দূর হয়ে যায়। তা নয়, আগে থেকেই এটা খাবো না, ওটা ছোঁবো না, ওটা করবো না, এতে কি আত্মা পরিষ্কার হয় ? সংসারে সাধনা করতে এসেছি, পুরো সাধনা করে যেতে হবে। আগে সব জিনিসগুলো যাচিয়ে দেখে নিতে হবে তো ! গাঁজা যে ছেড়েছেন বললেন, তার আগে গাঁজা কী তা বুঝতে পেরেছেন ?

নূরুল প্রত্যেকটি শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করে। আমি ওর ব্যাখ্যা শুনে অল্প হাসছিলুম, সুবিমল বললো, না, সুনীলটা এক সময় নেশা ভাং কম করে নি কিন্তু ! ঐ যে দেখছিস না, ওর রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা আর আমসির মতো মুখখানা, তোবড়ানো গাল— এক সময় ওর চেহারা কিন্তু পাঞ্জাবী মুলোর মতন লালটু ছিল। গাঁজা টেনে টেনে ঐ হাল হয়েছে ! আর ঐ যে চোখের কোণে কালো চাকতি— এক সময় মরফিয়া নিতো কিনা — মাথার চুল উঠে যে মাথাখানা খোলার খাপরা হয়ে গেছে, তার কারণ —

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ভাগ ! মোটেই আমি অত নেশা করি নি কোনো দিন। আর মোটেই আমার চেহারা অত খারাপ নয় ! আজই একটা মেয়ে আমার চেহারার প্রশংসা করছিল।

সুবিমল তড়াক করে সোজা হয়ে বসে বললো, আজ তোর সঙ্গে কোনো মেয়ের দেখা হলো কোথায় ? আমি সারাদিন তোর সঙ্গে আছি —

আমি বললুম, সকালবেলা —

সুবিমল চোখ ঘোলা করে চেঁচিয়ে উঠলো, সকালবেলা ? তুই আজকাল সকালবেলা মেয়ে পেয়ে যাচ্ছিস ? ব্যাপারটা কি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অ্যাঁ ? সকালবেলাই তোর সঙ্গে

কোনো মেয়ের দেখা হয় কী করে ? অ্যাঁ ?

আমি নূরুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সুবিমলটা অনেকখানি গাঁজা খেয়েছে বুঝি?

নূরুল সেই রকম মধুর হেসে বললো, খুব বেশি না, তবে হিট করে গেছে। আপনি একটা টাকা দেবেন না ?

— না, আপনি খান। আমার ইচ্ছে নেই আজ। অ্যালকহলের পর গাঁজা আমার সহ্য হয় না। আমি সবই একটু একটু চেখে দেখেছি, ঠিক স্বরূপ বুঝেছি কিনা জানি না, তবে আসক্তি হয় নি, কোনোটাই মনে হলো না আমার জীবনকে আরও একটু এগিয়ে দেবে —

সুবিমল ধরা গলায় বললো, টেনে দেখ না একবার আজ। জীবনটা বদলে যাবে —

আমি উত্তর দিলাম, গাঁজা খেয়ে আমার আজ আর স্বপ্ন দেখার দরকার নেই। আমি একটা অন্য স্বপ্ন পেয়ে গেছি।

নূরুলের মুখখানা আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল। খুবই দুঃখিত স্বরে বললো, এই তো আর একটা ভুল কথা বললেন ! স্বপ্ন দেখার জন্য গাঁজা খাবেন কেন ? গাঁজা খাবেন শুধু গাঁজারই জন্য ! যেমন নারীর কাছে যাবেন— তার মধ্যে কোনো ঈশ্বরী বা প্রকৃতিকে খোঁজার জন্য নয়, নারীরই জন্য ! রূপকে রূপান্তরিত করার কোনো দরকার নেই। প্রত্যেকটি অস্তিত্বেরই একটা নিজস্ব শুদ্ধ সৌন্দর্য আছে, তাকে অন্য জিনিসের সঙ্গে তুলনা না করে, বুঝলেন, কিছু আরোপ না করে, তাকেই মূল পর্যন্ত আস্বাদ করা উচিত। সেই যে মহর্ষি আরুণি শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, ত্বং হোবাচ —

সুবিমল যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, আঃ, জ্বালালে ! এই শালা, লেড়ের লেড়ে পাতি লেড়েটা আজকাল কথায় কথায় সংস্কৃত ঝাড়ছে। এই নূরুল, তুই শালা মোছলমানের বাচ্চা, তোর অত সংস্কৃত আওড়াবার দরকারটা কি রে ? এক দিন দাঁত ভেঙে যাবে বলছি, এখনও ছাড়।

নূরুল বললো, তুই চুপ কর্ শুকর্বি বামুন ! চাল–কলা খেয়ে খেয়ে তো রক্তটাও টিকটিকির মতন সাদা করেছিস, আবার হিঁদুগিরি ফলানো ! সুনীলবাবুতে আমাতে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, তুই এর মধ্যে মাথা গলাতে আসিস কেন রে, মুখ্যু ?

সুবিমল চোখ পাকিয়ে বললো, দাঁড়া, একদিন ছুরি দিয়ে তোর পেট ফাঁসাবো। দে, সিগারেটটা দে, আর একটা টান দি !

নূরুল সিগারেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললো, একদিন এর মধ্যে গাঁজার বদলে বিষ ভরে দেবো তোকে, বুঝলি ?

সুবিমল হাত মুঠো করে আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ভরে চোখ বুজে একটা লম্বা দম টানলো। তারপর ধোঁয়াটা বার না করে দম বন্ধ গলায় ফিসফিস করে বললো, দে ভাই, তাই দে, বেঁচে যাই। নিজের হাতে বিষ খাবো, সে সাহস নেই, তুই যদি হাতে তুলে দিস— টপ করে খেয়ে ফেলবো। খেয়ে নিজেও মরবো, তোকেও ফাঁসিতে ঝোলাবো — যাঃ, ল্যাঠা চুকে যাবে !

আমি নূরুলকে বললুম, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু রূপকে রূপান্তর না করে বাঁচা বড় শক্ত। তার জন্য, কি জানি, বোধ হয় অনেক সাধনা করা দরকার। সেই আদিকালে মানুষ যেমন টোটেমের পুজো করতো, সূর্যকে মনে করতো ঈশ্বর, গাছকে মনে করতো দেবতা— এখনও তার রেশ রয়ে গেছে।— এখনও নদী দেখলে মনে হয় নৃত্যচঞ্চলা নারী, নারীকে মনে হয় নদী। রোদ্দুর দেখলে মনে হয় বর্শার ফলার মতো, আবার বর্শার ফলাকে মনে হয় রোদ্দুর দিয়ে তৈরি। এই রকম সব সময় তুলনা দিয়ে–দিয়ে আমরা কিছুই সত্যিকারের দেখতে পারি না, কিছুই বুঝতে পারি না। কোনো একটা বস্তুর মূল দেখবো কী করে, সব সময়ই তো চোখ সরে যাচ্ছে,

সব সময়ই তো অন্য একটা কিছু এসে তার ওপর ছায়া ফেলছে।

— এই জন্যই দরকার আগে নিজের সম্পর্কে ঠিকঠাক হয়ে নেওয়া। নিজের সম্পর্কে যদি ভুল ধারণা না থাকে, নিজের সম্পর্কেও যদি উপমা না মনে আসে, ইতিহাস থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া যায়, তবে বুঝলেন, অন্য জিনিসের মূল পর্যন্ত যাবার একটা পথ পাওয়া যায়। ফলকে ভাঙুন, তার মধ্যে বীজ, বীজকে ভাঙুন, তার মধ্যে কিছু না। পেঁয়াজ কিংবা বাঁধা কপি পরতের পর পরত খুলে যান, ভেতরে কিছু না। এই বিশ্ব-সংসারের সবগুলো কিছু না জানার জন্য সব কিছুকে আলাদা করে দেখতে হয়।

— সব কিছুকে দেখতে গেলে কোথাও একটা স্থির কেন্দ্র রাখাও দরকার। এলোমেলোভাবে দেখা যায় না। কিন্তু সেই কেন্দ্রটা কী বলুন তো ? ভালবাসা ?

— ভালবাসা তো বটেই ! কিন্তু কাকে ? নিজেকে, না আপনি মেয়েছেলের কথা বলছেন?

— নিজেকে ভালবাসা কথাটার কোনো মানেই হয় না। নিজেকে ভালবাসা হচ্ছে কি জানেন, হাওয়ার অস্তিত্ব বা জলের রং বা তুলোবীজের গতিপথের মতন— ঠিক টের পাওয়া যায় না। অন্য একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগানো দরকার। সেই অন্য একটা কিছু স্ত্রীলোক হওয়াই ভালো। নারী হচ্ছে পাথরের দেবতার মতো, যে সাড়া দেবে না, বিচলিত হবে না— তার কাছেই বারবার নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে। কখনো এক বিছানায় শুয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা, কখনো মন্দিরে গিয়ে গোপন প্রার্থনার মতো। এই কথাটা আমার এইমাত্র মনে পড়লো জানেন, আগে কখনো ভাবি নি।

নূরুল হেসে উঠে বললো, সে কি, গাঁজা না খেয়েও এসব কথা মনে পড়ে নাকি ? এমনি এমনিই মনে পড়ে ?

আমিও হেসে উত্তর দিলুম, এগুলো গাঁজাখুরি কথা বলছেন ? হতেও পারে। কিন্তু যখন গাঁজা খেতুম পুরো দমে, তখন কিন্তু আমার কোনো কথাই মনে পড়তো না। শুধু গা ব্যথা, গলা শুকনো, আর চোখে কিছু রঙিন ডিজাইন দেখতুম। দিন, আপনার সাজা এক ছিলিম টেনে দেখি।

নূরুল হাত বাড়িয়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা দিল। আমি তারপর দুটো লম্বা টান দিয়ে খক্‌খক্‌ করে কেশে উঠলুম। বিশেষ মশলা ছিল না, শেষটা শুধু সিগারেটের তামাক। আমি বললুম, নেই কিছু এতে। শুধু সোডা !

— আর একটা বানাবো ?

তাসের টেবিল থেকে তুমুল হৈ-হৈ শব্দ উঠলো। তাপসের গলাই সবচেয়ে উঁচুতে, অ্যাঁ, টায়ো ? জোচ্চুরি ! কোনো মানে হয়, জোচ্চুরি !

বারীনদার কঠিন গলা, জোচ্চুরি ?

তাপস থতোমতো খেয়ে বললো, না, না, তুমি জোচ্চুরি করছো, তা বলছি না ! ভগবানের জোচ্চুরি। আমার হাতেও তো উঠতে পারতো, আমি টপ্ রান নিয়ে বসে আছি, যাঃ মাইরি, আমি আর খেলবো না। আমার সব টাকা খতম্ ! বাড়ি চললুম।

— বাড়ি চললুম।

অবিনাশ বললো, বোস্ না ! কোথায় যাবি ? জমে উঠেছে খেলা, হীরালাল, আমাকে আর এক গ্লাস দাও তো !

তাপস দাঁড়িয়ে উঠলো, না, তোরা খ্যাল্, আমি যাই।

— এক্ষুনি কি যাবি ?

— এরপর গেলে ছায়া বিষম কান্নাকাটি করবে। বেচারা একা একা থাকে— সাড়ে এগারোটা বাজলো !

অচেনা লোকটি জুতোর ফিতে বাঁধছিল, সেও দাঁড়িয়ে বললো, আমিও যাই। আবার কাল আসবো ! তারপর আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তাপস আর সে বেরিয়ে গেল। অচেনা লোকটি ভারি রহস্যময়, এতক্ষণ আর একটিও কথা বলে নি, জুয়ার দান দেওয়া ছাড়া, শুধুমাত্র খেলতে এসেছিল, খেলা শেষ করে চলে গেল, ঘরের অন্য লোকদের সম্পর্কে সামান্য কৌতূহলও দেখালো না। আমি চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলুম, কে রে লোকটা ! অবিনাশ বিরক্ত ভঙ্গি করে বললো, কে জানে ! তাপস কোথা থেকে মক্কেল ধরে এনেছে।

বারীনদা পয়সা গুনছিল। বললো, আর খেলা হবে না তো ?

অবিনাশ এক চুমুকে আবার গেলাস শেষ করে বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে, তোমাতে আমাতে কিছুক্ষণ হোক।

আমি বললুম, অবিনাশ, আমিও তা হলে এবার বাড়ি যাই। ভালো লাগছে না।

অবিনাশ ব্যাকুল হয়ে বললো, না, তুই যাস নি। প্লিজ, একটু বোস্, কয়েক দান খেলেই—

— না, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে। এখন বাড়ি না গেলে—

অবিনাশের গলা নেশায় জড়ানো এবং করুণ। ও বললো, কি যে তোরা বাড়ি বাড়ি করিস ! ভাল্লাগে না ! যাঃ ! সেই রোজ এক রকম বাড়ি ফেরা, ফিরে গিয়ে পঞ্চাশ বছরের পুরনো কাঁসার থালায় ভাত, ঠাকুমার বিয়েতে পাওয়া খাটে গিয়ে শুয়ে পড়া, ওহ্ ! আর পারি না। সকালে দাড়ি কামানো, অফিস, বাড়ি ফেরা, মা–ফা, মাসি–পিসী হ্যালো ত্যালো গুষ্ঠির পিণ্ডি যতো সব, আ হক্ থুঃ ! দাও বারীনদা, তাস দাও। তোমার জন্যই বেঁচে আছি। তবু এখানে এলে একটু মাথায় রক্ত খেলে—

— অবিনাশ, তুই খেল না ! সুবিমল তো রইলো, আমি এবার যাই—

অবিনাশ কোমর সমান উঁচু হয়ে খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললো। তারপর করুণ কান্নাকান্না গলায় বললো, তোর পায় ধরছি, যাস নি মাইরি। আর একটু, তিন চার দান, তারপর বেরুবো, বাড়ি যাবো নাকি ভেবেছিস্, এরপর অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাবো তোকে, দেখবি কি জিনিস —

সুবিমল আবার নূরুলের সঙ্গে ওদিকে বসে গুজ গুজ করছে, যথেষ্ট নেশা হয়েছে ওর। বারীনদা তিনখানা করে তাস দিল, আমি চৌকির কোণটায় সরে দাঁড়ালুম, যাতে দু'জনের কারুরই হাত না দেখা যায়। অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠলো, উঁহু, ও কী, ও কী ! আগের বার তুমি ট্রায়ো পেয়েছো, এবার চার তাস।

বারীনদা হেসে বললো, তোমার মনে আছে দেখছি !

অবিনাশ বললো, এসো বারীনদা, এখন দু'জন হয়ে গেছি, পুল বাড়ানো যাক। এক টাকা-দু' টাকা। রাজি ?

— ঠিক আছে। নাও, তোমার মুভ।

অবিনাশ তাস তুললো না। বললো, ব্লাইন্ড এক। বারীনদাও তাস না তুলে বললো, এক ! দুই ! তিন !

বারীনদা তাস না তুলেই বললো শো !

অবিনাশ একটু অবাক হয়ে লাল চোখে তাকালো। চার তাশে এর মধ্যেই শো ? অবিনাশ নিজের তাস ওল্টালো। টেক্কার পেয়ার। বারীনদার কিছুই না, বিবি টপ।

অবিনাশ টাকাগুলো টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে বললো, তুমি নমস্য লোক বারীনদা, যেবার নিজের হাত খারাপ থাকে কী করে না দেখেই বুঝতে পারো, বলো তো !

বারীনদা সামান্য হেসে উত্তর দিলো, বেশিরভাগ সময়ই আমার মনের মধ্যে কেউ যেন

ফিসফিস করে বলে দেয়। তাস বাঁটবার পরই খানিকক্ষণ আমি চুপ করে বসে থাকি, সেই কথা শুনতে পাই কিনা। যেবার পাই না, সেবার হারা–জেতার ঠিক থাকে না। পেছন দিক থেকে মানুষকে চেনা যায় না কিন্তু তাশের আমি পেছন দিক থেকেও চিনতে পারি।

— অ্যাঁ, ফোঁটা কাটা আছে নাকি? অবিনাশ প্যাকের অন্য একটা তাস তুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো —

— ওসব এখানে পাবে না। আমি তো জুয়া খেলি না। আমি তাস খেলি। বাহান্নখানা তাস নিয়ে আমার সংসার। সংসারের মানুষ যেমন কেউ একজন অন্যজনের চোখে খারাপ, কিন্তু আরেকজনের কাছে সে ভালো, কোনো লোক যেমন বউয়ের কাছে মহাপাজী, কিন্তু পাড়ায় সে মহাপুরুষ, অপিসে যে–লোকটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ সেই হয়তো ক্লাবের জন্য জান দিয়ে খাটে, সেই রকমই বুঝলে, সবারই একটা নিজের জায়গা আছে, কাকে কোথায় মানায় দেখতে হবে! অধিকাংশ লোকই হচ্ছে দুরি–তিরির মতো, ভুষিমাল, কিন্তু তাদের তুমি চৌকো কিংবা টেক্কার পাশে বসাও না, কেমন রূপ খুলে যায়।

— থাক্ তোমাকে আর বুকনি ঝাড়তে হবে না। তাশ দিয়েছি, মুভ দাও। ধ্যান করে জেনে নাও, এবার তুমি জিতবে নাকি!

সেবারও অবিনাশ জিতলো, বারো টাকা। আবার তাস দেওয়া হলো, এবার বারীনদা উপুড় করা তাস আলতোভাবে ছুঁয়ে দিয়ে বললো, এবার আমি জিতবো।

অবিনাশ বিদ্রুপের হাঃ-আওয়াজ তুলে বললো, তাই নাকি? দেখা যাক্। এবার আমি সর্বস্ব বাজি ধরবো। নাও, প্রথমেই পাঁচ টাকা হিট।

বারীনদা মৃদুস্বরে বললো, আমারও পাঁচ।

— দশ।

— দশ।

— কুড়ি।

— কুড়ি।

— তিরিশ।

— তিরিশ।

— পঞ্চাশ।

— পঞ্চাশ।

— পঁচাত্তর।

— পঁচাত্তর।

— একশো।

— উঁহু। টাকা কোথায়? মুখে বললে হবে না, বোর্ডে টাকা ফেলো।

— দিচ্ছি টাকা, তুমি দাও না —

— না, বোর্ডে টাকা না রেখে খেলা হবে না।

অবিনাশ পকেটে হাত দিয়ে সারা শরীর খুঁজলো। আর টাকা নেই। অবিনাশ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই সুনীল, তোর কাছে টাকা আছে?

আমি বললুম, আছে, গোটা ষাটেক।

— দে, আমাকে দে।

বারীনদা বললো, না, তা হয় না। তোমার টাকা শেষ হয়ে গেলে, তোমার খেলা শেষ, তুমি প্যাক করে দিয়ে উঠে যাও। খেলার সময় ধার হয় না।

— বাঃ ! ধার না দিয়ে আমি যদি ঘড়ি কিংবা কলম বন্ধক দিয়ে টাকা নিই, তোমার তাতে আপত্তি কি আছে ?

— আমার ঘরে ও সব কারবার চলে না। যতক্ষণ বুকের পাটা আর পকেটে টাকা আছে ততক্ষণ খেলা হবে। ফুরিয়ে গেলে উঠে যাবে। নিয়ম অনুযায়ী তোমার প্যাক করে উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু ঠিক আছে, তোমাকে আমি শো দেবার চান্স দিচ্ছি। পকেটে যা খুচরো আছে, তাই দিয়ে শো দাও। জিতবো তো এবার আমিই —

— তুমি জিতবে ? হাঃ — অবিনাশ ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো — তুমি জিতবে, মাইরি আর কি ? তুমি তাসের সংসার চেনো, আর আমি চিনি না ? অবিনাশ আলতোভাবে তাস তিনটের গায়ে হাত বুলালো। আঃ — হালকা, হালকা, যেন হাওয়ায় উড়ছে, বুঝলি সুনীল, সরস্বতী পুজোর দিন যেমন এক বাড়ির পিঠোপিঠি তিন বোন তিনজনেই বাসন্তী রঙের কাপড় ছুপিয়ে মাথা ঘষে চুল এলো করে রাস্তা দিয়ে উড়তে উড়তে যায়, তিনজনকেই দেখতে এক রকম লাগে— এরাও তাই, না ট্রায়ো বলছি না তিন বোন কী করে ট্রায়ো হবে, বয়সের তফাত নেই ? রানিং ফ্ল্যাশ — দে, টাকা দে, লড়ে যাই।

বারীনদা বললো, না, সুনীল, তুমি টাকা দিও না।

আমি একটু অবাক হয়ে বললুম, তুমি কেন দিতে বারণ করছো, কিছু বুঝতে পারছি না। খেলতে ইচ্ছে হয়, খেলুক না। ইচ্ছেটা চেপে দেবার কি দরকার ?

— নিজের টাকায় খেলুক !

— নিজের এক পকেটের টাকা ফুরিয়ে গেলে যদি অন্য পকেটের টাকা নিয়ে খেলা যায়, তবে বন্ধুর পকেটের টাকা নিতেই বা আপত্তি কি ?

— না, এসব জুয়াড়ির স্বভাব। আমি জুয়া খেলি না, তাস খেলি। টাকার লোভেও খেলি না। আমি তো ওকে শো দেবার চান্স দিচ্ছিই। জিততে হয়, এই বোর্ডের পঁচাত্তর দুগুনে দেড়শো টাকা জিতে নিক না।

অবিনাশ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, চান্স দিচ্ছি মানে ? দয়া করছো ? অ্যাঁ ? খালি বড়ো বড়ো কথা, জুয়া নয়, তাস খেলা ! এই ক'মাসে ক'হাজার টাকা খিঁচে নিয়েছো ? অ্যাঁ ? এখন আমি তাস চিনতে পেরেছি, ওমনি ভয় ?

বারীনদা আহত মুখে বললো, আমি ভয় পাই নি মোটেই। আমি তোমাদের কাছ থেকে টাকা মোটেই খিঁচে নিই নি, তোমরাই হেরেছো। আমার ঘরে বসলে আমার নিয়মেই খেলতে হবে— না ইচ্ছে হয়, এসো না। আমার অন্য অনেক পার্টি আছে, তোমাদের মতো ফালতু লোকদের আমার দরকার নেই —

— এক এক দিন তোমার এক এক রকম নিয়ম ? শ্মশানের পাশে ব্যবসা করো তুমি, এক নম্বরের শকুনি। আজ তোমার চালাকি ভাঙছি, আজ শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে।

একটা খালি সিগারেটের টিনে বারীনদার টাকা আর খুচরো রাখা ছিল, চোয়াল শক্ত করে বারীনদা সেটা বাঁ হাতে চেপে ধরলো। তারপর বললো, তোমাকে দু'বার চান্স দিলুম, তুমি নিলে না। আজ খেলা শেষ। —বারীনদা ডান হাত বাড়িয়ে বোর্ডের টাকাগুলো নিতে গেল।

— খবরদার ! অবিনাশ আর বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে শক্ত ঘুষি মারলো বারীনদার চোয়ালে। বারীনদা একপাশে হেলে পড়তেই খুচরোগুলো ঝনঝন করে ছিটকে গেল মাটিতে। আর সময় না দিয়ে অবিনাশ আর একটা ঘুষিতে ওকে খাট থেকে ফেলে দিল। বারীনদা পড়ে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

সুবিমল আর নূরুলও উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার হয়তো তখন উচিত ছিল, ওদের বাধা দেওয়া,

তাহলে পরে আমাকে অতটা সহ্য করতে হতো না। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন আমার মনে হলো, শুধু আজকের ঘটনার জন্যই নয়, বারীনদা আর অবিনাশের যেন একটা পুরোনো ঝগড়া আছে। সেটা ওদেরই মিটিয়ে ফেলা ভালো। দু'জন সমর্থ পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে— সেখানে আমার কোনোই কথা বলার মানে হয় না; নূরুল নেশাচ্ছন্ন গলায় দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে বললো, আমি কোনো দলে নেই। আমি—। সুবিমল চুপ করে দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে। খাটের ওপাশে অবিনাশের লম্বা ভয়ঙ্কর চেহারা। খাটের এপাশে বারীনদা, ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত পড়ছে, লোহার মতো দু'হাত ছড়িয়ে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললো, আয় কুত্তা ...

অবিনাশও হিংস্রভাবে বললো, আয়—

পর্দার ওপাশ থেকে হীরালাল বেরিয়ে এলো, বোধহয় ভাত খাচ্ছিল, এক হাত তখনো এঁটো। অবিনাশের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, এই ওবনাশবাবু কী করছেন কি ! বড্ড নেশা হয়ে গেছে আপনার, যান বাড়ি যান—

অবিনাশ তাকে বাঁ হাতের এক ঝটকা মেরে বললো, সর—

বারীনদাও বললো, তুই সর হীরালাল।

হীরালাল তবু অবিনাশের একটা হাত চেপে ধরলো। এই সময় হঠাৎ কী হয়ে গেল, সুবিমল ছিটকে ওপাশে গিয়ে হীরালালকে বললো, এই, তুই গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন, ছাড় না —

হীরালাল সুবিমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাঁ হাত দিয়ে এক ধাক্কা দিল, নেশায় হালকা শরীর সুবিমলের, টলে পড়ে গেল দরজার কাছে, হীরালাল ঘরের দরজা খুলে হুকুমের সুরে অবিনাশকে বললো, যান, চলে যান। অবিনাশ বললো, চোপ ! এবং সেই সঙ্গেই সুবিমল মাটি থেকেই হীরালালকে একটা লাথি মারলো। হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে এমন জোরে সুবিমলকে লাথি মারলো যে, ধপ্ করে প্রচণ্ড শব্দ হলো তার, সুবিমল দরজা দিয়ে গড়িয়ে গেল বাইরে। সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পর্দার ওপাশ থেকে হীরালাল একটা বারো ইঞ্চি ছোরা নিয়ে আসতেই অবিনাশও সট্ করে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

তখুনি আমি আঘাতটা পেলাম। আমাকে কিছু ভাববার সুযোগ না দিয়ে বারীনদা চকিতে ঘুরে গিয়ে আমার কানের ওপর একটা এক মণ ওজনের ঘুষি মেরেছে। আমার যন্ত্রণা আর বিস্ময়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশি ছিল, বলা যায় না। আমি এ রকম আক্রমণের কথা কল্পনাই করি নি, আমার মাথার মধ্যে ঝন্ করে উঠলো, এমন ব্যথা পেয়েছিলাম যে, প্রথমে ভেবেছি যে, আমার পিঠে বোধহয় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। আমি টলে গিয়ে পড়তে পড়তে জানলাটা ধরে সামলে নিলাম। চোখ ঝাপসা, আস্তে আস্তে মুখ তুলে দেখি, দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে নূরুল— মুখ ফ্যাকাশে, মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পরীক্ষিৎ সুবিমল আর অবিনাশ নেই, হীরালালও নেই, খোলা দরজা অনেক দূরে, ইস্ মাটিতে কত খুচরো পয়সা ! একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে বারীনদা, এমনিতে বারীনদা শান্ত ধরনের মানুষ— এখন অকল্পনীয় নিষ্ঠুর মুখে চুপ, চোখ জ্বলছে, ঠোঁটের পাশে রক্ত। এরই মধ্যে বোধহয় একবার রক্তটা মুছবার চেষ্টা করেছিল, তাই বাঁ গালে একটা রক্তের পোঁচ।

আমি তো কখনো কারুকেই মারতে পারি নি। জীবনে অনেককে মারতে চেয়েছি, ভেবেছি কঠিন শাস্তি দেবো, কিন্তু তাদের সকলেরই হয় আমার চেয়ে গায়ের জোর বেশি, অথবা অনেক কম। সমান সমান কারুকেই তো পাই নি। কারুরই গায় হাত তোলা হয় নি তো এ পর্যন্ত। আর—

কোনো দরকার ছিল না, তবু বোধহয় মারার ঝোঁকেই বারীনদা আমাকে আবার মারলো চোয়ালে। খুব জোর নয়, তবু বুঝতে পারলুম, থুতনির কাছে কেটে গেছে, মাটিতে এক ফোঁটা

রক্ত দেখে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা না করলে হয়তো এরা আমাকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু প্রথমেই আঘাত করে বারীনদা আমাকে বিষম দুর্বল করে দিয়েছে। আমি মাথাটা না তুলেই বারীনদার দিকে একটা হাত চালালুম অনির্দিষ্টভাবে। বারীনদার কাঁধের পাশ ঘেঁষে একটু আলগাভাবে লাগলো, বারীনদা খপ করে আমার সেই হাতটা চেপে ধরলো। ধরেই মুচড়ে দিলো অসম্ভব জোরে।

আমি কুকুরের মতন আ–আ করে প্রবলভাবে চেঁচিয়ে উঠলুম। বারীনদা আমার মুখ চাপা দিয়ে বললো, চোপ ! তারপর দু'হাত দিয়ে বারীনদা আমার বাঁ হাতটা পিছন দিকে নিয়ে এসে এমনভাবে মুচড়ে ধরলো যে, আমি যেন মৃত্যুযন্ত্রণা পেলাম। আমি ফিসফিসিয়ে বললুম, বারীনদা, আমাকে আর মেরো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি —

তখনই আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম যে, বারীনদা আমার বাঁ হাতটা মুচড়ে ধরেছিল, কিন্তু আমার ডান হাতটা তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত, সেটাও অবশ হয়ে আছে। ডান হাতটা দিয়ে আমি বারীনদাকে একটা মারতে পারতুম, কিন্তু ডান হাতটা তোলারই কোনো সামর্থ্য নেই, সেটা এমনি ঝুলছে, কোনো কাজেই লাগলো না, যেন আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ডান হাতটা নূরুলের মতো নিস্পৃহ বা পরীক্ষিতের মতন অজ্ঞান, সে মারামারির মধ্যে যেতে চায় না।

বারীনদা বললো, খুব বন্ধুত্ব দেখাচ্ছিলি, অ্যাঁ ?

— বারীনদা ছেড়ে দাও, তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। আঃ, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে ধরছি।

— ধর্, পায়ে ধর্ ...

— নিচু হতে পারছি না।

বারীনদা হাত সামান্য আলগা করলো। আমি মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে অসহায়ভাবে মুখ তুলে বললুম, বারীনদা, আমাকে অপমান করে তোমার কি লাভ ?

— ধর, পায়ে ধর আগে। এবার নাক খৎ দে।

বিষম দুঃখে আমার বুকটা খুব হালকা হয়ে গেল হঠাৎ। আমি শান্ত ছেলের মতন নাক খৎ দিয়ে খাটের পায়া পর্যন্ত এসে, সেইরকমভাবেই মুখ রেখে বললুম, কতখানি ? আমি সারা ঘরে নাক খৎ দিতে পারি, তুমি তাই চাও ? আমি তোমার পা ধরে তোমার পায়ের তলা থেকে ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকাতে পারি। তুমি তাই চাও ? বলো, তুমি কি চাও ? বেঁচে থাকার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। বলো—

— যা, এবার বেরিয়ে যা, আর কখনো আসিস না।

আমি সেইরকমই শান্তভাবে বললুম, না, যখন আবার আসবো, একা আসবো।

— একা কেন, গুণ্ডার দল নিয়ে, পুলিশ নিয়ে— যেমন ইচ্ছে আসতে পারিস, বারীন সামন্ত কারুকে গ্রাহ্য করে না—

আমি সেইরকম শান্তভাবে বললুম, না, যখন আবার আসবো, একা আসবো।

সিঁড়িটা অন্ধকার। কোনো শব্দ নেই। দিনের বেলা এখানে বাজার বসে— সেই তুমুল গোলমালের কথা মনে পড়লেই এখানকার নিস্তব্ধতা এত গাঢ় মনে হয়। তা ছাড়া, এখন আমার মাথায় কোনো শব্দও ঢুকবে না। নিচের ধাপে হীরালাল ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতের ছুরিটা দেখা যাচ্ছে না, আমায় দেখে হীরালাল ফটফটে সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসলো। আমি একটু দাঁড়ালুম। সরু গলিতে হঠাৎ ষাঁড়ের মুখোমুখি এলে যেমন মনে হয়, ষাঁড়ের শান্ত অন্যমনস্ক মুখ—পাশ দিয়ে গেলে গুঁতোতেও পারে, না গুঁতোতেও পারে, দু'একজন লোক পাশ দিয়ে সরু হয়ে চলে যায়, ষাঁড় কিছুই বলে না, আবার কোনো একটা লোককে দেখে হঠাৎ শিং নাড়া দেয়—

আমি ঠিক সেইরকম দ্বিধায় পড়লুম। আমিও হীরালালের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। তারপর এক পা এক পা করে নেমে আসার সময় আমার সমস্ত শরীর শিরশির করতে লাগলো। আমি বুঝতে পারছি যে, আমি একটা বোকামি ভরা দুঃসাহসের কাজ করছি। হীরালাল তার শিং নাড়া দিয়ে উঠবে কিনা, কিছুই ঠিক নেই, কিন্তু এখন আর থামা চলে না, এখন আমার নেমে যেতেই হবে। আমি দুর্বল ভাঙা হাসি দিয়ে বললুম, কী হীরালাল ? হীরালাল আফশোস করার সুরে উত্তর দিল, কী যে ঝঞ্ঝাট করেন !

ওকে পেরিয়ে আসার পর হীরালাল সাধারণ গলায় বললো, যান্, ঐ দু'বাবু রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু ! একটু আগে সুবিমলের পেছনে অত জোরে লাথি কষাবার পর, এখনও সুবিমলকে বাবু বলছে হীরালাল। হাজার হোক, চাকর তো ! ওকে দু'চার আনা বকশিস দিয়ে আসা উচিত ছিল বোধ হয়।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে। সারা রাস্তা জুড়ে বৃষ্টির চট্‌চট্ শব্দ। আমি দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গাড়ি–বারান্দায় এলাম। সুবিমল একটা দোকানের রকে এলিয়ে বসে ছিল, অবিনাশ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমারই অপেক্ষায়। উত্তেজিতভাবে বললো, তোর কিছু হয় নি তো ? আমি তোর জন্যে আবার যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সিঁড়ির মুখে হীরালালটা এমন ছুরি নিয়ে—

আমি বললুম, না ঠিক আছে !

— এক নম্বরের গুণ্ডা। আমি পুলিশ এনে ওদের ধরাবো ...

— সুবিমলের কি হোল ?

— কিছু না, ওর নেশা হয়েছে বেশি। তুই বারীনকে কয়েকখানা ঝেড়েছিস তো ? ইস্, তোর থুতনিতে রক্ত কেন ? চল্ পানের দোকান থেকে চুন লাগিয়ে দি।

— না, না, চুন লাগালে ঘা সারতে দেরি হয়। এবার বাড়ি চল। তখনই বললুম বাড়ি যাই, তোর জন্য থেকে গিয়ে—

অবিনাশ বেশ খুশি গলায় বললো, বারীনকে আমি যা দু'খানা কষিয়েছি ওর সারাজীবন মনে থাকবে— তুই দু'একখানাও দিতে পারলি না ?

আমি খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিলুম, মাথার মধ্যে ঝিমঝিমুনি তখনো কমে নি, আমি বললুম, নাঃ ! আমাকে বেকায়দায় পেয়ে, উঃ কানে এত জোরে মেরেছে, এখনো, ওঃ, তোর জন্যে এরকম মার খেলুম।

অবিনাশ আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো, তুই দেখিস্, বারীন তোকে মেরেছে, আমি যদি তার শোধ না নিই—

— তুই তো উল্টোদিকে যাবি। তুই সুবিমলকে নিয়ে যা, আমি একটা আলাদা ট্যাক্সি ধরছি।

— দাঁড়া না। একটা সিগারেট দে। আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছে বুঝলি, ব্যাপারটা বেশ জমে গিয়েছিল। হীরালালটা যদি ছুরি না বার করতো, আমি ওদের শুয়োর পেটা পেটাতুম। আমি ভেবেছিলুম তুই বারীনকে একা অনায়াসে ... আচ্ছা দ্যাখ না, ওর দোকানে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো ! তোর গায় হাত তুলেছে, আমি তার এমন শোধ নেবো—

— ছেড়ে দে না, তুই বারীনদাকে মারলি, বারীনদা তার শোধ নিলো আমার ওপরে, আবার আমাকে মারার শোধ নিবি, ও হয়তো তার শোধ নেবে পরীক্ষিতের ওপর—

— তাই তো, পরীক্ষিৎটা ওখানে রয়ে গেল, ওকে যদি ...

— থাক্, পরীক্ষিতের কিছু হবে না, ট্যাক্সি—

আমাকে ট্যাক্সি পর্যন্ত তুলে দিতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবিনাশ বললো, পাঁচটা টাকা দিয়ে যা, আমি ফতুর।— তারপর একমুখ হেসে বললো, আজকের ব্যাপারটায় সবচেয়ে কী ভালো হলো বল্ তো ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ক্লিষ্টভাবে হাসলুম। অবিনাশ কী বলতে চায় আমি বুঝতে পেরেছি। বললুম, বারীনদার কাছে আর কখনো আসতে হবে না —

— উঃ, বাঁচলুম। চুম্বকের মতো এ জায়গাটা টানতো, এমন নেশা হয়ে গিয়েছিল। তাসের জুয়া খেলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় ! অথচ, অনারেব্‌লি ছাড়তেও পারছিলুম না, এখানে আসা বন্ধ করার কোনো যুক্তিও তো পাচ্ছিলুম না মনে মনে। যুক্তির চেয়ে মারামারি কত ভালো। একটা মারামারিতে ব্যাপারটা চুকে গেল — আর এখানে আসতে হবে না কোনোদিন। রিলিভ্‌ড্ ! কি রকম কায়দা করে ঝগড়াটা বাধালুম, দেখেছিস ?

— আর সেজন্য মার খেতে হলো আমাকে। চললুম—।

শেখরের মা সকাল সাড়ে ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ঠাকুর ঘরে থাকেন, আমি জানতুম, সেই হিসেব করেই গিয়েছিলাম, এগারোটা আন্দাজ। কিন্তু তিনি তখনও ঠাকুর ঘর থেকে বেরোন নি। শেখরের ছোট বোন তপতী আমাকে বললো, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

আমি শেখরের ঘরেই গিয়ে বসলুম। পরিতোষ ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছে, তপতীর এখনো বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয় নি বলে বাড়িতে বসে মোটা হচ্ছে। আর বেশি মোটা হয়ে গেলে, ওর বিয়েটিয়ে হওয়াই মুশকিল হবে। একেই তো তপতী কানে খুব কম শোনে, প্রত্যেকটা কথা চোখের দিকে না তাকিয়ে বললে বুঝতেই পারে না। কিন্তু সব সময় কে একটা মেয়ের দিকে চোখাচোখি করে কথা বলতে পারে ? অনেক কথাই তো চোখ নামিয়ে বলার, সেইজন্য আমি পারতপক্ষে তপতীর সঙ্গে খুবই কম কথা বলি। যেমন, এইমাত্র তপতী জিজ্ঞেস করলো, আমি চা খাবো কি না ! চা খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার, আমার বলা উচিত ছিল, আমি অফিস যাবার জন্য ভাত খেয়েই বেরিয়েছি, এখন আর চা খাবো না, কিন্তু এতবড় সেন্টেন্সে যদি তপতী শুনতে না পেয়ে বুঝতে না পারে, যদি এরপরও ও অনুরোধ করলে আমাকে আরও বড় সেন্টেন্স বলতে হয়, এই ভয়ে আমি কোনো কথাই না বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। তপতী চা আনতে গেল।

শেখরের ঘরের টেবিল ক্লকটা বন্ধ হয়ে আছে, কেউ দম দেয় নি। তিনটে চিঠি টেবিলে রাখা, কেউ খোলে নি। একটা বই আদ্দেক পড়া অবস্থায় উল্টে রাখা— এসব দেখলে গা ছম্‌ছম্ করে, মনে পড়ে মৃত্যুর কথা। কিন্তু শেখর মরবে কেন, না, ওর মরার কোনোই সম্ভাবনা নেই, আমি নিশ্চিত জানি, শেখরের যত কিছু পরীক্ষা— সবই ওর জীবন নিয়ে, জীবন শেষ করার জন্য না। শেখর দীর্ঘদিন বাঁচবে, অন্তত আমার চেয়ে বেশি দিন, অবিনাশের চেয়ে বেশি তো নিশ্চয়ই, অবিনাশের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ও দুর্ঘটনায় মরার জন্যেই জন্মেছে।

একটা রেকাবিতে কিছু কাটা ফল আর নারকোলছাপা সন্দেশ নিয়ে শেখরের মা ঢুকলেন। সাদা থান পরা ভারী চেহারা, তপতী ওর মায়েরই ধাত পেয়েছে। প্রথমটায় অস্বস্তিতে বসেছিলাম, মুখ নিচু, তারপর সবচেয়ে সহজ কাজটা মনে পড়তেই আমি খুশি হয়ে চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে, ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। জিজ্ঞেস করলুম, মাসীমা, আপনার শরীর কেমন আছে ?

— ভালো আছি। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। তুমি কেমন আছো ?

— ভালো। আমি —

— তোমার মা-বাবা এখন কোথায় ?

— ওঁরা তো বহরমপুর থেকে কয়েকদিন আগে এসে সেজকাকার বাড়িতে উঠেছেন। আমার দাদামশাইয়ের খুব অসুখ তো —

— কী হয়েছে ?

— স্ট্রোকের মতন, পি-জি'তে আছেন, সবাই খুব ব্যস্ত, আমিও কয়েকদিন হাসপাতালে ছোটাছুটি করে আর সময়ই পাচ্ছি না —

— তোমার থুতনিতে কাটলো কি করে ?

— ও কিছু না, কাল তাড়াতাড়িতে ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ ... আমি ...

— তোমার দাদামশাইয়ের বয়েস কত হোল ? প্রায় পঁচাত্তর, না ? রিন্টুর বিয়েতে ওঁকে একবার দেখেছিলাম, ওরকম ভালো স্বাস্থ্য,— উনিই তো তোমাদের মানুষ করেছেন ! তোমার বাবার বাবা তো —

— হ্যাঁ, আমার ঠাকুরদা খুব অল্পবয়েসে মারা যান। আমরা চোখেই দেখি নি ! আমরা দাদামশাইর কাছেই মানুষ।

— যাক্ উনি যদি এখন যান, সব দিক ভালো দেখেই তো গেলেন। শুধু, তুমি ছোট নাতি, তোমার বিয়েটা দেখে যেতে পারলেন না—তুমি এখনও বিয়ে করছো না কেন ?

কথাবার্তা সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। এজন্য তো আসি নি। শেখরের মা'র মুখে তেমন ভয় বা উৎকণ্ঠাও দেখতে পাচ্ছি না, পরিতোষেরই মতো কিছুটা অভিমান। তপতীর মতো উনি কানে কম শোনেন না, কিন্তু প্রত্যেকটি কথা বলছেন আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বৃষ্টিভেজা বেড়ালের মতোন মনটাকে জোরে একবার ঝাড়া দিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললুম, মাসীমা, শেখরের কোনো খবর পেয়েছেন ?

উনি একটু চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমার মনে হয় ও কোথাও বাইরেই গেছে। খবর পেলুম, পরশুদিন দুপুরে আপিস থেকে বেরুবার আগে ও কো-অপারেটিভ থেকে পাঁচশো টাকা তুলেছে। কিন্তু একটা খবর যে কেন দিল না! অন্তত টেলিফোনও করতে পারতো। সঙ্গে কিছু জামা-কাপড়ও নিয়ে যায় নি। এমনভাবে তো লোকে সাধু-সন্ন্যাসী হবার জন্য যায়।

আমি সামান্য হেসে বললুম, না, আর যাই হোক, শেখর সাধু-সন্ন্যাসী হবার মতো ছেলে নয়। — কথাটা বলেই মনে হলো, ভুল করলুম। মায়েরা বোধহয় এসব কথা শুনতে চায় না। প্রত্যেক মা-ই বোধহয় চায়, তার ছেলে সাধু-সন্ন্যাসী হোক, কিন্তু সংসারটি যেন না ছাড়ে। সংসারে থেকে, বিয়ে করে, বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চাকরিতে উন্নতি চালিয়ে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী সেজে থাকুক। কিন্তু কথাটা এখন আর ফেরানো যায় না।

মাসীমা বললেন, কিছুদিন ধরেই ও বলছিল, ও আলাদা থাকতে চায়। আমি তো তাতে কখনো আপত্তি করি নি, শুধু জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন ? ছেলেরা বিয়ে করে বনিবনা না হলে, বাপ-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, সে একটা বুঝি। কিন্তু এমনিই, বাড়িতে ওকে কেউ কোনো কিছুতে বাধা দেয় না, তবু চলে যেতে চায় কেন, বুঝতেই পারি না। তুমি কিছু জানো ?

— না, মাসীমা, আমি তো কিছু শুনি নি।

— ওর কোনো বিপদ হয় নি, তা জানি। বিপদ হলে এতক্ষণে টের পেতাম, আজ ঠাকুরঘরে ঐটে জানার জন্যই বসেছিলুম। আমার মন বলছে, ও যেখানেই যাক্, ভালো আছে। কিন্তু বাড়ি

ছেড়ে যাবার জন্য যদি যায়, তা হলে বন্ধুরা তো অন্তত জানবে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছো না তো ?

আমি মোজেইক করা মেঝের দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা কথা মনে হচ্ছিল, শেখর যদি বাড়ি ছেড়ে যেতেই চায়—তার মধ্যে ওর নিছক স্বার্থপরতা মোটেই নেই। শেখরদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, এ বাড়ির নিচের একগাদা দোকানঘর থেকে ভাড়া আসে, এছাড়া ওদের ডায়মন্ডহারবারের বিরাট বাগানবাড়িটা এক আমেরিকান কোম্পানি লিজ নিয়েছে। শেখর চলে গেলেও ওদের আর্থিক অসুবিধেয় একটুও পড়তে হবে না, শেখর যদি নাগপুরে বা কানপুরে চাকরি নিয়ে আলাদা থাকতো, তাও ঠিক ছিল, কিন্তু কলকাতা শহরে তার আলাদা থাকা কি সম্ভব ? বিয়ে না করে, বৌকে দিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়ে ? নিতান্ত নিরুপায় না হলে, কোনো সমর্থ পুরুষের তো একা থাকতে নেই! আমি উত্তর দিলুম, না, মাসীমা, আমি সত্যিই কিছু জানি না।

শেখরের মা এবার সম্পূর্ণ একটা অপ্রত্যাশিত কথা বললেন, গলার স্বর খানিকটা গাঢ় করে বললেন, সুনীল, তুমি অন্তত কথা দাও, এরকম বাউন্ডুলেপনা করে আর নিজের শরীরটা নষ্ট করবে না ?

চমকে উঠে বললুম, আমি ?—তারপর আলগাভাবে হেসে বললুম, মাসীমা, আমি তো কিছু করি নি। শেখর আমাদের মধ্যে একটু একগুঁয়ে ধরনের, ও—ও আস্তে—আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এত ভাবছেন কেন ?

— শেখরের কথা থাক্। তুমি আমাকে কোনো দুঃখ দেবে না বলো ?

— মাসীমা, আমি আপনাকে কখনো দুঃখ দিয়েছি ? আমি শেখরকে —

— আমি তোমার জন্যই আজ তোমাকে ডেকেছি। তোমার মা থাকেন অন্য জায়গায়, আমিও তোমার মায়েরই মতন।

— সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি তো কখনো —

— তুমি আজ আমার একটা কথা রাখবে ? একবার বাইরে এসো—। তপতী এই সময় চা নিয়ে ঢুকলো। মাসীমা বললেন, থাক্, ঘুরে এসে চা আর মিষ্টি খেও, একবার আমার সঙ্গে এসো, জুতোটা খুলে এসো ওখানেই।

মাসীমা আমাকে ঠাকুরঘরে নিয়ে এলেন। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছোট্ট ঘর, আতপ আবহাওয়া, পচা ফুল ও চন্দনের গন্ধ, পুজোর ঘরে ঢুকতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। বেশ ঠাণ্ডা লাগে শরীরটা, চোখ দুটো সম্পূর্ণ খুলে তাকানো যায়। মাসীমার মুখখানা থমথমে, শেখর সম্পর্কে যখন কথা বলছিলেন, তখন যেন ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরুত্তাপ, কিন্তু এখন আমার কথায় এসে মুখখানা কান্নাময়, যেন এখুনি চোখ দিয়ে জল পড়বে। না কাঁদাই ভালো, অন্য কারুর কান্না দেখলে, আমারও আবার চোখ দিয়ে জল আসতে চায়। সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে।

মাসীমা বললেন, তুমি আমার কথা রাখবে তো ? তুমি লক্ষ্মী–জনার্দনের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, আর ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরবে না, বাবা–মায়ের মনে কষ্ট দেবে না। বলো, আর কখনো ওসব অত্যাচার–অনাচার করে নষ্ট করবে না জীবনটা ? বলো!

আমি হাঁটু মুড়ে বসলুম সোনা বাঁধানো সিংহাসনে স্থাপিত লক্ষ্মী–জনার্দনের সামনে। প্যান্ট পরে কি আর ঠাকুরঘরে এসে বসা যায় ? উরুর কাছটায় বিষম টান লাগে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মাসীমাকে দেখলুম। আমার বলতে ইচ্ছে করলো, মাসীমা আমি প্রতিজ্ঞা করতে চাই না, কারণ প্রতিজ্ঞা করলে তা ভাঙা আমার স্বভাব নয়। আরও প্রতিজ্ঞা করতে চাই না এ কারণে যে, আমার বয়েস তিরিশ, আমি আমার জীবনের ভালো মন্দ যথেষ্ট ভালো বুঝি, আর যদি না বুঝি, তবে

অন্য কেউই আমাকে এখন আর বোঝাতে পারবে না। তাছাড়া আমি মোটেই আমার জীবনটা নষ্ট করতে চাই না, আমি প্রতি মুহূর্তে আমার জীবনকে শুদ্ধ এবং সৎ করে তুলতে চাইছি, যা আমার মন চায় না, সেরকম কাজ করে কখনো আমি আমার মনকে অপবিত্র করবো না। এজন্য আমার একটা নিজস্ব রাস্তা খুঁজে নিতেই হবে, এজন্য আমি মা-বাবা, ভগবান, অফিসের বড় সাহেব, ভারতের সংবিধান— কারুর অপছন্দ কথাই শুনবো না, আমাকে অনেক পথ ঘুরতে হবে।

কিন্তু মাসীমার উদ্‌গ্রীব মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, এসব কথা বলা যায় না। মা-মাসী-পিসী যাঁদের আমরা পায় হাত দিয়ে প্রণাম করি, হঠাৎ দেখলে পুরো আস্ত সিগারেটও ফেলে দিতে হয়, তাঁদের কাছে উচ্চারণ করা যায় না এরকম কথা, ওঁদের কাছে এসব হচ্ছে শুধু 'বড়ো বড়ো কথা', এর কোনোই মানে নেই। আহা, আমার সবসময়েই ইচ্ছে হয়, ওঁদের খুশি করে রাখি। মাসীমার ব্যাকুল মুখকে যদি এক মুহূর্তের জন্য খুশি করতে পারি, সেই তো অনেক, এক মুহূর্তের খুশিও জীবনে কম নয়। কী আসে যায়! কাল বারীনদার পায় ধরেছি, আজ লক্ষ্মী-জনার্দনের পা ধরতে পারবো না?

আমি ঝুঁকে হাত বাড়ালুম। সেই সময় চকিতে আমার যমুনার মুখটা মনে পড়লো। তিন বছর আগে বিয়েবাড়ির উৎসবের মধ্যে সিঁড়িতে দাঁড়ানো ওর পবিত্র কুমারী মুখ, ওর সেই টিয়া পাখির মতন তীক্ষ্ণ সরল চোখ, যে চোখ একটা নীলকান্ত মণির দিকে তাকিয়ে থাকার মতন এই পৃথিবীকে দেখে। যমুনার কথা মনে পড়তেই আমার মনটা হঠাৎ খুব ভালো হয়ে গেল, আমি ঠাকুরের পা ছুঁয়ে অভিভূত গলায় বললুম, মাসীমা, আমি কথা দিচ্ছি, আমি কারুকে কোনো দুঃখ দেবো না, আর কোনো অত্যাচার অনাচার করবো না। আমি শেখরকে ফিরিয়ে এনে দেবো।

৩

বিকেল চারটে আন্দাজ অফিসে আবার ঠিক সুবিমল এসে হাজির। মন দিয়ে কাজ করছিলুম, অর্থাৎ সারা টেবিলের ওপর বই কাগজপত্র ছড়িয়ে ঘনঘন সিগারেট টানতে টানতে খুব পেন্সিল দিয়ে লেখালেখি করছিলুম, এমন সময় সুবিমল। ওকে দেখে আজ খানিকটা বিরক্ত বোধ করলুম, সুবিমলের একটা স্বভাব হচ্ছে আগের দিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলা। তাছাড়া, আজ আমি সুবিমলের সঙ্গে কোথাও যাবো না, আজ আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। তারপর, মা খবর পাঠিয়েছেন, সেজ কাকার বাড়িতে খেতে হবে রাত্তিরে।

সুবিমল চেয়ারে বসেই বললো, সত্যি রে, ঢোকার মুখে তোদের রিসেপসনিস্টকে দেখতে পেলুম না বলে অফিসটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

আমি ওকে ইশারায় চুপ করতে বললুম। কোণের টেবিলে গোবিন্দবাবু বাইরের ডিউটি সেরে এখন কাজ করছেন। গোবিন্দবাবু খানিকটা সিরিয়াস প্রকৃতির লোক, এসব কথা পছন্দ করবে না নিশ্চিত। ও লোকটা আবার প্রায়ই বড় জামাইবাবুর সঙ্গে কি-সব গুজগুজ করে অনেকক্ষণ। হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললুম, উঃ, এতো কাজ জমে গিয়েছিল। আজ সব পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

—খালি তো বিজ্ঞাপনের কপি লেখা। এ আবার একটা কাজ নাকি?

আমি দুঃখের হাসি হেসে বললুম, কাজের তুই কি বুঝবি? সারাদিন বাড়িতে আরাম করে বিকেলে বেরোস আড্ডা মারতে। দাঁড়া, চা-খাওয়া যাক।

টেবিলের ওপর বেলটায় দু'বার টং টং করে আওয়াজ করলুম! বেশ লাগে বেল বাজিয়ে কারুকে ডাকতে। ঐ তো দরজার পাশে ঝরি সিং বসে, টুলে বসা ওর হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, গলার আওয়াজ একটুও জোর না করে ডাকলেও ও শুনতে পাবে, তবু বেল বাজানোই নিয়ম। ডাক শুনে ঝরি সিং যখন টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখুনি কিন্তু কথা বললে চলবে না। যেন ওকে দেখতেই পাই নি— এই ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে কাজের ভান করে যেতে হবে। খানিকটা বাদে মুখ তুলে— যেন স্বপ্নের মধ্য থেকে বলছি সেই সুরে—বলতে হবে, ও হ্যাঁ, শোনো—। এতে পার্সোনালিটি আসে। চাকরিতে যত উন্নতি হবে, যত উঁচু পোস্টে যাবো, ততোই মানুষকে অবহেলা করতে হবে, শিখে গেছি। তাছাড়া, বেলটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে বনমালীবাবুরাও খানিকটা উৎকর্ণ হয়ে থাকবে— কার এবার ডাক পড়ে। যতই দরকার থাক, আমি তো আর উঠে ওদের কাছে যাবো না, ওদেরই ডেকে আনবো—কারণ আমি ওদের চেয়ে মাইনে বেশি পাই। মাঝে মাঝে অবশ্য ওদের ঘরে গিয়ে ওদের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়তে হয় মুখে মাইডিয়ার হাসি ফুটিয়ে। সেটাও ট্যাকটিক্যাল। যখন গভর্নমেণ্ট অফিসে কাজ করতুম, আমার টেবিলের কাছেই ছিল অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি মিঃ চক্রবর্তীর ঘর। যখনি ঘণ্টা বাজতো, আমরা দশ-বারোজন সচকিত হয়ে উঠতুম। ওর বুড়ো আর্দালিটা ঘরে ঢোকার সময় কুকুরের মতন দ্রুত ছুটে যাবে গম্ভীর মুখে, বেরিয়ে আসবে হাসিমুখে হাতির মতন হেলতে দুলতে, টেবিলের সামনে এসে বলতো, সুনীলবাবু, আপনাকে সাহেব ডাকছেন— ড্রাগ কণ্ট্রোলের ফাইলটা নিয়ে যাবেন।—সাহেব! চক্কোবত্তির যা গায়ের রং—রাত্তিরের দিকে ওর নিজের ছেলেমেয়েরাও হঠাৎ অন্ধকারে দেখে ভিরমি খাবে। ওঃ, বেঁচেছি, ঐ চাকরি ছেড়ে!

ঝরি সিংকে বললুম, যাও টোস্ট আর চা নিয়ে এসো, গোবিন্দবাবু, আপনি চা খাবেন তো ? তিন কাপ নিয়ে এসো।

গোবিন্দবাবু একটু উঠে যেতেই সুবিমল বললো, ওফ্ কাল অবিনাশটার জন্য শুধু শুধু কি রকম প্যাঁদানি খেলুম বল তো ? কোমরটা এখনও বিষিয়ে আছে।

— আমারও বাঁ হাতটা টনটন করছে। কিন্তু তুই-ই তো মারামারিটা বাড়াতে গেলি।

— আমি ? মোটেই না— ওর সঙ্গে ঝগড়া, আমার তাতে কি —

— তুই হীরালালকে মারতে গেলি কেন ? না হলে, ওরা দু'জনে যা করতো—

— আমি ?

— তোর নেশা ছিল খুব, এখন মনে নেই। যাক্‌গে, ও কথায় দরকার নেই। শেখরের আর কোনো খোঁজ পেলি না ?

— আমি কোথায় পাবো। এই তো বাড়ি থেকে সবে বেরোলুম।

— সত্যি, শেখরটা একদম হাওয়া হয়ে গেল ?

— বীণার ওখানে খোঁজ করেছিস ? চল্ যাই।

— আমি যাবো না। তুই যা না।

— একলা গিয়ে আমি বীণার খপ্পরে পড়বো! পাগল হয়েছিস ? দু'জনে মিলে তবু যেতে পারি।

— আমার আজ সময় নেই। আমাকে আজ হাসপাতালে যেতেই হবে—দাদামশাইকে দেখতে। কালকেই যাওয়া উচিত ছিল। যদি শেষ দেখা না হয়, অবশ্য শুনলুম আজ অনেক ভালো আছেন।

— তোর কোন্ দাদামশাই ? যিনি চাণক্য সম্পর্কে বই লিখেছেন ?

— হুঁ।

— তোদের ফ্যামিলিতে বেশ লেখাপড়ার চর্চা আছে, না ?

— হ্যাঁ, তোদের মতো মুখ্যু জমিদারের বংশ নয়। এখন আবার তোদের জমিদারিও নেই!

— আহা, ওরকম পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়ে তুই নিজে লেখাপড়া কিছুই শিখলি না। তোর গোল গোল চোখ দুটো দেখলেই না আমার গোরুর কথা মনে পড়ে, মাইরি বলছি, রাগ করিস না—

অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার পর সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, তোকে হাসপাতালে যেতেই হবে ?

আমি বললুম, হ্যাঁ। তুইও চল না।

সুবিমল বিরক্তির ভঙ্গি করে উত্তর দিল, ধ্যুৎ! হাসপাতালে যেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। তাছাড়া, নার্সদের সৌন্দর্যচর্চা করাও আমার তেমন আসে না। আজ বাদ দে না, না গেলি। চল্, বীণার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

— কেন বারবার বলছিস ? বলছি তো, আমাকে যেতেই হবে। আমি একদিনও যাই নি। শুধু দায়িত্বের জন্য নয়, দাদামশাইকে আমার এমনিতেই একবার দেখা বিশেষ দরকার। আট বছর দেখি নি, কয়েক বছর কাশীতে ছিলেন, তারপর ছ'মাস ধরে বহরমপুরে আসার পরও দেখা হয় নি।

— এক্ষুনি যাবি কী করে ? ট্রামে–বাসে এরকম ভিড় !

— কালও তোর জন্যই যাওয়া হয় নি।

— আমার জন্য?

সুবিমল লাইট পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর অসহায়ের মতন বললো, আমি তা হলে এখন কোথায় যাই ? আমি সুবিমলের দিকে চেয়ে রইলুম। সুন্দর চেহারা সুবিমলের, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়েছে— ফর্সা গালে নীলচে আভা, তেল–চকচকে কালো চুল, ধপধপে সাদা পাট ভাঙা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরেছে, অথচ ওর কোনো কাজ নেই, ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই। সুবিমলের মুখখানা এখন করুণ। খানিকটা হতাশার সুরে বললো, তুই চলে গেলে একা আমি কী করবো ? সন্ধেবেলাটা, আচ্ছা, সন্ধেবেলায় মানুষ কোথায় যায় বলতে পারিস ? এই যে এতো লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে— এরা কোথায় যায় ? এরা যাচ্ছে না আসছে ? সন্ধেবেলাটা একা কী করে সময় কাটে ? একা কেউ সিনেমায় যায় ? একা ময়দানে বসে থাকতে পারে ? বাড়ি ফিরে যায় না কি সবাই ? সারাদিন অফিসে কাজ করে লোক বিকেলে বাড়ি ফেরে। আমি সারাদিন বাড়িতে থেকে বিকেলে বেরোই। আড্ডা মারতে না পারলে আর কোথায় যাবো ?

— তুই একটা কাজ–টাজ নে এবার।

— কাজ করি না নাকি ? এই তো রাশিয়ার যৌথ খামার বিষয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে বই অনুবাদ করলুম গত মাসে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে—তবু যা হোক চারশো টাকা পেয়েছিলুম।

— কম্যুনিস্টরা তোকে এখনো কাজ দেয় ? তোর মতন একটা—

— যে টাকা দেবে আমি তারই কাজ করতে রাজি। রাশিয়ার যৌথ খামার আর আমেরিকার গোয়েন্দা গল্প আমার কাছে একই, অনুবাদ করার কাজ হিসেবে বলছি আর কি! শোন না, আজ দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে, বুঝলি, নিজের একটা লেখা লিখছিলাম। হঠাৎ ভেতরটা ছটফট করে উঠলো। মনে হলো, তখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—কোনো একটা জায়গায় আড্ডায় জমে গিয়ে লেখাটার কথা কিছুক্ষণ ভুলে থাকতেই হবে। কিছুক্ষণ ভুলে না থাকলে আমি লেখাটা

সম্পর্কে আন্তরিক হতে পারবো না। একা থাকলেই ও আমাকে পেয়ে বসবে। এখন আমার দরকার প্রচুর মদ খেয়ে হুল্লোড় করা, অথবা বেশ্যা বাড়িতে গিয়ে ফূর্তি অথবা জুয়ায় মন বসানো। এরকম চড়া জাতের কিছু না হলে ওটাকে আমি ভুলতে পারবো না। বেশ্যার বদলে যদি কোনো ভদ্র মেয়ের সঙ্গে— আর কিছু না— ইচ্ছেমতো কথাবার্তা বলার সুযোগ থাকতো আমি তাতেও রাজি ছিলুম, মদ খাওয়ার বদলে জঙ্গলে গিয়ে শিকার করা— তাও রাজি। লেখাটা ভালো করার জন্যই লেখাটাকে কিছুক্ষণ আমার ভুলে থাকা দরকার, আর ভুলতে গেলে একটা কিছু চড়া ধরনের উত্তেজনা চাই, নইলে ভোলা যাবে না, লেখা এমন ত্যাঁদড় জিনিস! শিল্পীদের মডেল দরকার, গায়কদের চাই তবলচী— এসব লোকে মেনে নিয়েছে। আর লেখকদের বুঝি দরকার নেই ? চালাকি পেয়েছিস ?

—তুই আমাকে শাসাচ্ছিস কেন ? আমি এজন্য দায়ী নাকি ?

— নিশ্চয়ই। আমাকে একা ফেলে তোর হাসপাতালে গিয়ে কি গুষ্ঠির পিণ্ডি হবে ?

—আঃ, আমি ছাড়া আর কেউ নেই নাকি ? অবিনাশ কিংবা পরীক্ষিতের খোঁজ কর না—

—অফিস ছুটি হয়ে গেছে—ওদের এখন আমি কোথায় পাবো ? বার ক্রলার হয়ে দোকানে দোকানে ওদের খুঁজবো— আমাকে তুই এমন ছোট লোক পেয়েছিস ? নিজের টাকা থাকলে যে-কোনো মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকতুম। কিচ্ছু নেই, এই দ্যাখ পকেট।

—আমার কাছেও আজ টাকা নেই। বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য কারুর কাছেও তো যাওয়া যায়! তোর আর অন্য কোনো চেনাশুনো মানুষ নেই ?

—মানুষ থাকবে না কেন ? মানুষ তো কতোই আছে—কিন্তু সে-সব কি জিনিস— ভেজিটেবিল কাটলেট। দেখতে অবিকল একরকম, ভেতরে ভুষিমাল। যদি প্রদীপবাবুর বাড়ি যাই— উনি আর ওঁর বউ কতো গল্প করবেন, চা-টা খাওয়াবেন। কিন্তু সেই ভেজিটেবল কাটলেট খাওয়ার স্বাদ। প্রদীপবাবুর বদলে রতনবাবুর বাড়িতে গেলেও সেই —

আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিলুম। বললুম, তুই প্রেম-ট্রেম করার চেষ্টা কর না, তাতে সময় কাটবে। সেই টেলিফোন অপারেটারটরা কী হলো ?

—দেখি, কাল একবার যাব অরুণের অফিসে ...

—তুই আজ কফি হাউস-টফি হাউসে গিয়ে দ্যাখ কারুকে পাস কি না। আমাকে আজ ছেড়ে দে। অ্যাঁ ? প্লিজ —

ভিড়ের ট্রাম-বাসে ওঠার চেষ্টা না করে আমি হেঁটেই পিজি হাসপাতালে চলে যাবো ঠিক করলুম। বড় রাস্তা ছেড়ে সর্টকাটের জন্য ঢুকে পড়লুম ময়দানে। সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে ভেবে নিলুম—তিনটে সিগারেট শেষ হবার মধ্যেই পৌঁছে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে এইরকম ওয়াকিং রেস দিয়ে বেশ হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করি। ঠাণ্ডা জল-মেশানো হাওয়া দিচ্ছে, মন্দ লাগছে না।

হাসপাতালের মেন গেটের সামনেই বড় জামাই বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। উনি দ্রুত বেরিয়ে আসছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, তুমি এসে গেছো ? চলো, তোমার মাকে খবর দিতে হবে। তোমার দাদামশাই কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন। বেশি কষ্ট পান নি, স্বজ্ঞানেই মরেছেন। মরার আগে তোমার কথা বলছিলেন।

আমি থমকে দাঁড়ালুম। ইস্‌, বড় জামাইবাবুকে দেখেও হাতের সিগারেটটা ফেলতে ভুলে গিয়েছি। গোপনে পিছনে ফেলে দিলাম।

আজ কী বার ? আজ বুধবার। আজ গানের ইস্কুল বন্ধ! আজ আমায় শ্মশানে যেতে হবে।

৪

খুব ছেলেবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। আমার বন্ধু তপনকে দেখতুম বাবাকে বলতো বাবুজী, এইরকমভাবে কথা বলতো, বাবুজী তুমি যে আমাকে একটা এয়ারগান কিনে দেবে বলেছিলে, দিলে না, বাঃ! আচ্ছা!— যেন, বন্ধুর মতো। আমরা বাবাকে চিরকাল আপনি বলি। বাড়ির ছোট ছেলে হিসেবে বাবার আদর পাবার বদলে আমি ওঁকে এড়িয়েই চলতুম। বাবা এমনিতেই বেশ গম্ভীর, তা ছাড়া কোনো ব্যাপারেই নিজস্ব মত বদলাতে চাইতেন না বলে, আমারও কথা বলার তেমন উৎসাহ পাই নি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রথের মেলা দেখতে যাবো কিনা—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে উনি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলতেন, না, তারপরই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন—যেন এ সম্পর্কে আর কোনো কথাই চলে না। ইস্কুলের থিয়েটারে আমি ইশা খাঁর পার্ট পেয়েছিলাম, জোর রিহার্সাল চলছে—পরিচালনা করছেন আমাদের ইতিহাসের মাষ্টারমশাই, এমন সময় বাবা বললেন, না, না, ও আবার পার্ট করবে কি। সেই কথাই চূড়ান্ত হয়ে রইলো। থিয়েটারের দিন আমি ছিলাম চোখের জলের সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে বসে। ছেলেবেলায় বাবার এইরকম গাম্ভীর্য ও কঠিন স্বভাবের জন্য বাবাকে বেশ ভয় ও ভক্তি করতুম, অন্যদের চেয়ে আমার বাবার ধরন-ধারণ আলাদা, কঠোর সংযমের নিস্পৃহ—সুতরাং নিজেরা নির্যাতিত হলেও বাবাকে মনে করতুম মহাপুরুষ। ক্রমে বাবার নির্বুদ্ধিতা ও গোয়ার্তুমিগুলো একটু একটু করে চোখে পড়ে। বাবার গাম্ভীর্য আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হওয়া শুরু হয়। সেজ কাকার পকেট থেকে আমি একবার একটা সিকি চুরি করেছিলুম, সেটা জানতে পেরে বাবা আমাকে এমন মেরেছিলেন যে, আমি তিন-চারদিন জ্বরে ভুগেছিলুম তারপর। কিন্তু, সে বছরই শীতকালে আমাদের বাড়ির সবাই একটা করে রঙিন আলোয়ান পেলাম এবং খুব সামান্য চেষ্টাতেই জানা গেল যে, কাপড়ের ব্যবসায়ী হরিদাস শাহুর অসম্ভব ছেলেটিকে বাবা তদ্বির করে টেস্টে অ্যালাউ করিয়ে দিয়েছেন, সেইজন্যই আমরা ওগুলো উপহার পেয়েছি। এরপর থেকে বাবার প্রতি আমার ঠিক ঘৃণা জাগে না, কিন্তু ওঁকে একটা নগণ্য সাধারণ মানুষ হিসেবে জানতে পেরে আমার অনেক বোঝা হালকা হয়ে যায়। দাদা চিরকালই ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ, দাদামশাইয়ের কাছে থেকে দাদা অঙ্ক আর সংস্কৃত ভালো করে শিখেছে, দাদা কোনোদিন বাবার কোনো কথার প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু আমি ক্রমশ তেরিয়া হয়ে উঠলুম।

পাকিস্তান হবার পর, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় না এসে বহরমপুরে এসেছিলুম বলে আমাদের গায়ে ঠিক রিফিউজির গন্ধ লাগে নি। দাদামশাই বহরমপুরে আগেই শিক্ষকতা করতেন, বাবাকেও ওখানকার স্কুলে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সকলের সঙ্গে মিশে গেলুম। আমার তিন দিদিই বেশ সুন্দরী বলে স্থানীয় লোকের কৌতূহল ও সহানুভূতি পেতে দেরি হয় নি। দিদিরা তিনজন যখন বেণী দুলিয়ে ইস্কুল থেকে ফিরতো—তখন রাস্তার মোড়ের ছেলেরা বলতো, আর যাই বলিস, বাঙালদের মেয়েরা বেশ সুন্দর হয়!—আমি পেছনে থাকতুম, আমায় কেউ গ্রাহ্যই করতো না। মনে মনে অবশ্য রোজই ভাবতুম—কেউ যদি দিদিদের অপমান করতে আসে— আমি একটা থান ইট ছুঁড়ে মারবো।

ওখানকার বনেদি পরিবার মৈত্রদের বড় ছেলে যেদিন এসে বড়দিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানায়— সেদিন আমাদের বাড়িতে সৌভাগ্যের আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। বাবা যদিও রাঢ়ী-বারেন্দ্র এসব খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু মা বিনা পণে দিদির জন্য ওরকম ভালো ঘর-বর পেয়ে বাবার আপত্তি কিছুতেই গ্রাহ্য করেন নি। পরে আমার ছোড়দি

অবশ্য নিজেই জোর করে কায়স্থ বিয়ে করেছে—আর আমিই সেটার ব্যবস্থা করে দিয়েছি বলা যায়। কল্যাণদার চিঠি আমিই তো ছোড়দিকে পৌঁছে দিতুম।

বহরমপুরেই শেখরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বহরমপুরে ওর মামার বাড়ি, প্রায়ই ছুটিতে শেখররা আসতো। আমি একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিলুম, তখন শেখর এসে আমাকে মুরুব্বি চালে বললো, তোমার গলার আওয়াজ বেশ ভালোই, কিন্তু র আর ড়-এর উচ্চারণে দোষ আছে। আর যে কবিতাটা তুমি আবৃত্তি করলে সেটার মানে বুঝতে পেরেছো তো ? শুনে আমার বিষম রাগ হয়েছিল, আমি এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ভেবে নিয়েছিলাম যে, যদি মারামারি হয়—তবে আমি এই বড়লোকের রোগা পটকা ছেলেটাকে অনায়াসে কাৎ করে দিতে পারবো। তখনও পদ্মার গর্জন, আড়িয়াল খাঁ নদীর ভয়ঙ্কর বান, বাণীচকের বিলের হিংস্রতা, বাস্তুভূমি ছেড়ে আসার অভিমান আমার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। মানুষ দেখলে প্রথমেই আত্মরক্ষার জন্য শরীরকে সতর্ক করে নিতুম।

কিন্তু শেখরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বহরমপুরের শীর্ণ গঙ্গার পাড়ে শেখরের সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। শেখর আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো। আর্মেনিয়ান গির্জার ভাঙা দেয়ালের পাশে বসে শেখর আমাকে বলতো, আমার ইচ্ছে করে জলদস্যু হয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে। তোর করে না ?

শেখরই আমাকে প্রথম অনিয়ম শেখায়। ভোর চারটের সময় শেখর আমার ঘরের খড়খড়ি তুলে চাপা গলায় ডাকতো, সুনীল, উঠে আয়। আমার গাঢ় ঘুম, সহজে ভাঙে না, শেখর একটা কঞ্চি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় জাগাতো। আমি ধড়মড় করে উঠে বলতুম, কী ? শেখর ফিসফিস করে বলতো, চল, লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে মুর্শিদাবাদ চলে যাই। আমি বলতুম, এখন ? বাবা বকবে যে! শেখর বলতো ধুৎ, বেরিয়ে আয় না।

কোনোদিন হয়তো সারা সন্ধে নদীর ধারে বসে থাকবার পর শেখর বলতো, চল, আজ আর রাত্তিরে বাড়ি ফিরবো না। আজ সারারাত্তির স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকবো—কত লোক তো শোয় ওখানে !

আমি সভয়ে বলতুম, বাড়িতে খুঁজবে না ?

—খুঁজুক না। মরে তো যাচ্ছি না। কাল সকালেই তো বাড়ির লোক আমাদের পেয়ে যাচ্ছে। না হয় একটু বকুনি দেবে।

তারপর শেখর এক ধরনের নিঃশব্দ হাসি দিয়ে বলতো, মাঝে মাঝে একটু-আধটু নিয়ম ভাঙতে হয়, বুঝলি! রোজ রোজ একরকমের জীবন কাটাতে নেই। রোজই ঠিক সময় ওঠা, ঠিক সময় খাওয়া, ঠিক সময় ঘুমোনো—এর কোনো মানে হয় ? ধুৎ! ভাল্লাগে না!

তখন বাড়িতে মা অসুখে বিছানায় থাকে, বাবা কথা বলেন না, দিদিদের নিয়ে সবসময় হৈ-চৈ, বাড়িতে আমার নিজেকে মনে হতো পরিত্যক্ত, অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়। বাড়ির কথা ভাবলেই আমার মধ্যে আহত অভিমান জেগে উঠতো। যেদিন মেজদি বলেছিল, মাঝে মাঝে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারিস না! কী জামা-কাপড়ের ছিরি! আর দিন দিন যা চোয়াড়ে চেহারা হচ্ছে—তোর জন্য লজ্জা করে আমাদের। সেদিন আমি মেজদির গায়ে গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

রেললাইনের পাশে তিন-চারজন লোককে একটা মাটির কলসি নিয়ে গোল হয়ে বসে থাকতে দেখে আমরা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তাড়ি খেয়ে শেখর আর আমি নেশা করলুম,

সেই প্রথম, তখন আমাদের বয়েস ১৪/১৫ হবে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমার ইচ্ছে ছিল কলকাতায় এসে পড়াশুনো করি, বহরমপুরে আর ভালো লাগছিল না। তাছাড়া, সায়েন্স পড়ার আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবা কোনো কথাই না শুনে আমাকে জোর করে বহরমপুরে আই.এস-সিতে ভর্তি করে দিলেন। আমি মার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম। কিন্তু মা কিছুতেই আমার পক্ষ নিয়ে বাবাকে কিছু বললো না। মার ওপর তখন আমার বিষম অভিমান জাগে! কলেজে ক্লাশ করার কিছুদিন পর, কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে হঠাৎ আমার হাতের ধাক্কা লেগে একটা পোর্সেলিনের বিকার আর একটা সালফিউরিক অ্যাসিডের জার উল্টে পড়ে ভেঙে যায়। কলেজ থেকে সেইজন্য আমাকে পঞ্চাশ টাকা ফাইন করে। অথচ আমার কোনোই দোষ ছিল না, আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, সালফিউরিক অ্যাসিড সবটা গায় পড়লে আমি মরেও যেতে পারতুম, বাঁ পায়ে এক ছলক লাগার ফলে এখনও আমার পায়ের পাতা সাদা হয়ে আছে। কিন্তু বাবা এ-খবর শোনার পর, রাগে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিলেন! ওঁর ধারণা হয়েছিল আমি সায়েন্স পড়তে চাই নি, সেইজন্য ইচ্ছে করেই এসব ভেঙেছি বাবাকে জব্দ করার জন্য। বাবা মাকে বললেন, ঐ কুলাঙ্গার ছেলের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি নিজে তিন দিন ভাত খাবেন না। বাড়িতে সবাই আমার দিকে ছি-ছি চোখে তাকিয়ে রইলো। জ্ঞান হবার পর সেই প্রথম আমি মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদেছিলুম, মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, আমি ওগুলো মোটেই ইচ্ছে করে ভাঙি নি, ক্লাশ আরম্ভ করার পর আমার সায়েন্স পড়তে তেমন খারাপও লাগছিল না। মা, তুমি বিশ্বাস করো, আমার কোনো দোষ নেই, আমি ইচ্ছে করে ভাঙি নি।

জানি না, মা বিশ্বাস করেছিল কিনা, বাবা করেন নি। সেদিন বাবা কিছুই খেলেন না। দিদিরা সবাই গিয়ে বাবাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করতে লাগলো, সেদিন আমি কিছু খেয়েছি কি না—তা অবশ্য কেউ লক্ষ করে নি! সেইদিনই শেষ রাত্রে আমি কলকাতায় পালিয়ে আসি খোঁড়া পা নিয়ে। আমি জীবনে প্রথম কলকাতায় আসি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কিন্তু তীব্র ক্রোধ ও অভিমান বুকে ছিল, সেইজন্য কলকাতা আমাকে ভয় দেখাতে পারে নি। শিয়ালদা থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক পথ ঘুরে আমি বাগবাজারে সেজ কাকার বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপরের সাতদিন জ্বরের ঘোরে আমার চেতনা ছিল না।

সেজ কাকার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি বলে আমাকে ওঁরা খুব ভালোবাসতেন এক সময়ে। সেজ কাকার বাড়িতে থেকেই আমি কলকাতার কলেজে ভর্তি হই, বহরমপুরের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক প্রায় থাকেই না। প্রথম দু'বছর আমি বিজয়ার পরেও বাবা-মাকে প্রণাম করতে যাই নি। কাকীমা আমার মায়ের অভাব পূরণ করে দিয়েছিলেন, কাকীমা আমাকে প্রচুর হাতখরচ ও অবাধ স্বাধীনতা দিতেন বলেই কাকীমার কাছে আমি কোনোদিন একটাও মিথ্যে কথা বলি নি। ছেলেমেয়ে হয় না বলে কাকা প্রায়ই নানা ডাক্তারকে দিয়ে কাকীমার শরীর খোঁচাখুঁচি করাতেন। তৃতীয়বার অপারেশন করাতে গিয়ে কাকীমার মৃত্যু হবার পর— কাকার বাড়িতে আমার সুখের নীড় ভেঙে যায়।

বাবা আরেকবার এমন একটা অন্যায় করেছিলেন যে মনে হয়েছিল চিরজীবনে বাবাকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। ছোড়দির বিয়ের সময় কাকা আর কাকীমা আমাকে জোর করে বহরমপুর ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমি আবার মাঝে মাঝে বহরমপুরে যাওয়া শুরু করি। বি.এ. পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বহরমপুরে গিয়ে দেড় মাস ছিলাম, সেই সময় গায়ত্রীর সঙ্গে আমার নতুন করে বন্ধুত্ব হয়। 'ভ্রাতৃসঙ্ঘের' সেক্রেটারি নরেনদা আমায় খুব পছন্দ করতেন, ওঁর বোন গায়ত্রীকে আমি ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই চিনতাম। কিন্তু সে সময়টা

হাফপ্যান্ট ও ফ্রকের রহস্য জানার জন্য খুব মাথাব্যথা থাকে, গায়ত্রীর রোগাটে লম্বা চেহারার দিকে আমার কোনো আকর্ষণই জন্মায় নি। টাউন ক্লাবের দারোয়ান রামশরণ আর তার বউকে একদিন আলগা অবস্থায় দেখে ফেলার পর, অকারণেই আমার রক্ত চনমন করে ওঠে ও আমি ছোড়দির বন্ধু মোটাসোটা পারুলদিকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সহসা। পারুলদি খুব একটা আপত্তি করেন নি, আমার গালে একটা টোকা মেরে বলেছিলেন, দুষ্টু! খুব বখাটে হয়েছিস, না ?

সেবার কিন্তু আমি গায়ত্রীকে গিয়ে অন্যরকম দেখলাম। গায়ত্রীর মধ্যে আমি আবিষ্কার করলুম এক রহস্যময়ীকে। লম্বা-টান চেহারা, মাথায় প্রায় আমার সমান, সুন্দর স্বাস্থ্য। আগে যেখানে একটা মজা পুকুর দেখতাম, হঠাৎ যদি সেটা ভরাট হয়ে গিয়ে সেখানে একটা ঝকঝকে হলদে রঙের দোতলা বাড়ি তৈরি হতে দেখি— তাহলে মনটা যে-ধরনের খুশি হয়ে যায়, গায়ত্রীকে দেখে আমার সেইরকম লাগলো। আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটে, কথা বলার সময় প্রত্যেকটা শব্দ যেন আলাদাভাবে আদর করে নেয়। গায়ত্রীও সেবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে, বিকেলবেলা লাইব্রেরি থেকে বই বদলে ফেরার পথে গায়ত্রীর সঙ্গে আমার জেলখানার পাশের রাস্তায় দেখা হতো। গায়ত্রীর হাতে দু'খানা বই, প্রত্যেকদিন এক রঙের শাড়ি, অত গরমের মধ্যেও ওর মুখে একটু ঘাম নেই, যেন রাস্তার সবটুকু হাওয়া ও একরাশ শুষে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি প্রথমদিন সত্যি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম, এগিয়ে গিয়ে কথা বলবো কিনা ইতস্তত করছি। আমাকে দেখতে পেয়ে চোখ তুলে চেনা হাসি দিয়ে চলে যায়। তারপর রোজ গায়ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে শুরু করলুম।

গায়ত্রীর সঙ্গে আমি কথা বলতুম কম, বুকের মধ্যে কীরকম যেন শিরশির করতো, এরকম ধারণাও হয়েছিল যে, এই যে গায়ত্রীর সঙ্গে আমি বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছি, এটা যেন আমার এক বিশাল সৌভাগ্য। আমি যেন এর উপযোগী নই, এই একটা পুরোপুরি আস্ত, গোটা, সম্পূর্ণ যুবতী আমারই কথায় বিকেলেই বাড়ি না ফিরে আমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে সূর্যাস্ত দেখতে যেতে রাজি হয়—এতটা যেন আমার প্রাপ্য ছিল না। ঐ বয়েসটায় মেয়েদের কাছ থেকে অবহেলা, অপমান পাবার জন্যই মন উন্মুখ হয়ে থাকে। গায়ত্রী আমায় বলেছিল, তোমায় আমি সতীনাথ ভাদুড়ির জাগরী বইটা পড়তে দেবো—আমায় বলো তো, বইটা পড়তে-পড়তে তোমার কান্না পায় কিনা ? তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো। আমি তো কতবার কেঁদেছি! অথচ, দাদাকে বইটা পড়ালুম, দাদাটা এমন যে, কী রকম শুকনো চোখে আগাগোড়া বইটা পড়ে গেল। পড়ার পর হাই তুলে বললো, মন্দ না, বেশ লিখেছে। আচ্ছা, বলো, এরকমভাবে বই পড়ার কোনো মানে হয় ?

জাগরী তার আগেই আমিও পড়েছি এবং পড়তে পড়তে এমন কেঁদে ফেলেছিলাম যে কাকীমা পাশের ঘর থেকে দেখতে এসেছিলেন ছুটে। কিন্তু গায়ত্রীকে সে-কথা বলতে আমার লজ্জা হয়েছিল তখন। ও কথা তখুনি বলা মানেই তো আমার নিজের মুখে স্বীকার করা যে গায়ত্রীর মনের সঙ্গে আমার মন মিলে যায়। গায়ত্রীকে আরও অনেক কথা বলতে পারি নি, যেমন, তুমি কি চোখে সবসময় কাজল মেখে থাকো, নইলে যে-কোনো কথার সময়েই তোমার চোখ দুটো অমন হাসে কী করে ? হাঁটতে হাঁটতে দু'একবার যখন তোমার গায়ের সঙ্গে আমার গা লেগে যায়, আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে কেন ? মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী দেখো, আমার কপালে একটা কাটা দাগ আছে, সেইটা ? এসব কিছুই বলি নি।

একদিন গায়ত্রীর সঙ্গে বেড়াবার সময় বাবার সঙ্গে পথে দেখা হয়, উনি তখন হোসেন সাহেবের ছেলেকে পড়াতে যাচ্ছিলেন। বাবাকে দেখেই আমি সিগারেট ফেলে দিয়েছি, গায়ত্রীর সঙ্গে যেন এইমাত্র দেখা হলো ভঙ্গিতে অকস্মাৎ বি.এ. পরীক্ষা বিষয়ক আলোচনা শুরু করি।

বাবা কিন্তু ভূত দেখার মতন থমকে দাঁড়ালেন, অবাক চোখে দেখলেন আমাদের—যেন এরকম একটা দৃশ্য তিনি স্বপ্নেও দেখার কথা ভাবেন নি। একটা ট্রাক আসছে বলে উনি সরে দাঁড়িয়েছেন মনে হতে পারে, কিন্তু আমি জানি উনি আমাকে গায়ত্রীর সঙ্গে দেখেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। বাবা শুধু তাকিয়েছিলেন, কোনো কথা বলেন নি, আমিও কোনো কথা বলি নি। এখন মুশকিল এই, নিজের বাবার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলে মানুষ কী করে? অন্যদের মতন বাবাকে 'কেমন আছেন' বলা যায় না, চিনতে পারার ভঙ্গিতে মুচকি হাসিও দেয়া যায় না, অচেনা মানুষের মতন চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। আমিও চোখ নিচু করে রাস্তার অন্য মানুষদের মতন বাবাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। গায়ত্রী ওঁকে দেখতে পায় নি।

পরদিন বিকেলে গায়ত্রীর মুখ থমথমে। মনে হয় সারা দুপুর কেঁদেছে। আমাকে বললো, তুমি আর বিকেলে এরকমভাবে এসো না।

আমি আহত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

— তোমার লজ্জা করে না? ছিঃ! তোমরা সবাই এরকম।

— কী, কী হয়েছে?

— গায়ত্রী ম্লানমুখে বললো, আমার সত্যিই এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। আমাকে জোর কোরো না।

আমি তখনও ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারি নি, তবু শিউরে উঠেছিলাম ও-কথায়। নিরীহ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, গায়ত্রী, ব্যাপারটা কি?

— তোমার বাবা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। তোমার সঙ্গে আমার... হ্যাঁ, আমার বাবাকে সেই কথা বলেছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি। ছি ছি, এ-কথা তুমি আমাকে নিজে বলতে পারতে না? আগেই বাবাকে পাঠাতে হলো?

অপমানে আমার কান ও নাকের ডগা জ্বলতে লাগলো। সেই বয়সটায় খুব বেশি অপমানিত বোধ করলে আমার তখুনি চোখে জল এসে যেতো। এরকম ব্যাপার আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি। বাবা কাল রাত্রে বাড়িতে আমায় কিছুই বলেন নি, বাড়িতে এ নিয়ে কোনো গোলমালও করেন নি। আমি অতিকষ্টে কান্না চেপে বললুম, গায়ত্রী, বিশ্বাস করো, আমি এসব কিছুই জানি না।

— তোমার বাবা বললেন, আমাদের যখন জাতের মিল আছে, তখন এরকম দৃষ্টিকটুভাবে ঘোরাঘুরি না করে—আচ্ছা, আমি অন্যায় কি করেছি? কারুর সঙ্গে একটু বেড়াতে যাওয়াই দোষের? তোমার যদি এরকমই মনের ইচ্ছে, তুমি একথা তোমার বাবাকে বলার আগে তো আমাকে বলতে পারতে!

— আমি কোনো কথাই কারুকে বলি নি।

— আমার দাদা আর বাবা হয়তো রাজি হবেন। কিন্তু, সত্যিই এরই মধ্যে আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। আমার ইচ্ছে আরও লেখাপড়া শিখবো, বিলেতে যাবো। তা নয়, এখনই—

— গায়ত্রী, আমাকে মাপ করো। তোমার কোনো ভয় নেই। পুরো ব্যাপারটাই ভুল।

আমি সেদিন ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরেছিলাম। সদর দরজায় দড়াম করে শব্দ করে ঢুকে সোজা এসেছিলাম বাবার ঘরে। মা তখন বাবার হাঁটুতে তেল মালিশ করে দিচ্ছে। আমি বাবার দিকে চেয়ে তীব্র কণ্ঠস্বর তুলে বলেছিলাম, আপনি কি ভেবেছেন, আপনি যা খুশি তাই করবেন? আমার নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই?

মা তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমাকে ধরে বললেন, তুই এ কি করছিস? পাগলের মতন চেঁচাচ্ছিস কেন?

আমি বাবার ঘরের দরজায় হাত রেখে একটু ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলাম, উত্তেজনায় আমার চোখ-মুখ জ্বলন্ত। আমি তখনও চেঁচিয়ে বললাম, মা তুমি সরে যাও। তুমি জানো, নরেনদাদের বাড়িতে গিয়ে বাবা কী বলেছেন ?

বাবা বললেন, কেন, তুমি কি বিবাহ করতে চাও না ?

— চাই কিনা চাই, সেটা আমি বুঝবো। আপনি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করতে পারতেন!

— বিবাহ না করে কোনো কুমারী মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করা আমি পছন্দ করি না। অন্তত এ বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না।

— দরকার নেই চলার। এ বাড়িতে আর আমি কোনোদিন থাকতে আসবো না। মনে করবেন, আপনার ছোট ছেলে মরে গেছে। আমার সম্বন্ধে আর কোনোদিন কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।

মা বললেন, ছি ছি, তুই এ কী রকমভাবে কথা বলছিস—

সেই দ্বিতীয়বার আমার বহরমপুর ছেড়ে আসা। তারপর থেকে আর বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই নি। কাকীমা বেঁচে থাকা পর্যন্ত দেড় বছর সেজ কাকার ওখানেই ছিলাম, কিন্তু বহরমপুর থেকে বাবা-মা কিংবা দাদা কখনো এলে দেখা করতুম না, সেই ক'দিন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে থাকতুম। আমার প্রতি কাকীমার প্রশ্রয় ছিল অফুরন্ত, কখনো হয়তো রাত তিনটের সময় বাড়ি ফিরে দেখতুম, কাকীমা আলো জ্বেলে তখনও বসে আছেন। আমাকে বলতেন, এই বয়সের ছেলেদের একটু-আধটু অনিয়ম করা ভালো। তবে দেখিস, স্বাস্থ্যটা যেন নষ্ট না হয়।

কাকীমার নিজের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না, রোগা কিন্তু সতেজ শরীর, প্রত্যেকটি হাসির কথায় ঠিক সময় এমন নিখুঁতভাবে হাসতে আর কোনো নারীকে দেখি নি আমি, হাসির সময় কাকীমার চশমা ও চোখ ঝলসে উঠতো। তবু শুধুমাত্র ছেলেমেয়ে না হবার অপরাধে কাকীমাকে হাসপাতালে গিয়ে বেঘোরে মরতে হলো।

তারপর কাকার সঙ্গে আমার খিটমিট বাঁধতে শুরু করে ও একদিন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় আমি কাকার বাড়ি ছেড়ে মৌলালির কাছে একটা মেসে উঠে আসি। তারপর থেকেই কলকাতার সঙ্গে আমার সত্যিকারের আলাপ-পরিচয় শুরু হয়।

আমি কলকাতার প্রতিটি রাস্তাকে আলাদাভাবে উচ্চারণ করে করে দেখতে চেয়েছি। এই ছন্নছাড়া আত্মবিস্মৃত শহর, এর পার্ক স্ট্রিট আর কলাবাগানের বস্তি, ক্যানিং স্ট্রিট আর নিউ আলিপুর, মাটির নিচের দোকানে হিজড়েদের নাচ, ওয়েলেসলি স্কোয়ারের সখী-সখী বালক, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট-চিৎপুর-বৌবাজার-গ্রে স্ট্রিট-টালিগঞ্জে ধাপে ধাপে দর নেমে আসা বেশ্যার দল, রাত্তিরবেলা ভাঙা টিউবওয়েলের মধ্য থেকে বার করে আনা চোলাই মদের বোতল, চীনে পাড়ায় ঝিনুকের সঙ্কেতে চণ্ডুর আড্ডা খুঁজে পাওয়া, হাওড়া ব্রিজের নিচে কড়ি খেলার জুয়া— এসবের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ আমি নিজেকে শক্ত ও খাঁটি করে তুলতে লাগলুম। এসবের সন্ধান পেতে একটুও অসুবিধে হয় নি। একটা পেলেই অন্যগুলো পরপর আসে, যেমন রাত বারোটায় পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বাংলা মদ খেতে গেলে, আশপাশে আরও যে তিন-চারজন লোককে খেতে দেখা যাবে—তাদেরই কেউ গল্পে গল্পে বলে দেবে হিজড়ে নাচের আড্ডার ঠিকানা। প্রথমদিকে দু'বার থানায় ধরা পড়ে পেটি কেসে দশ টাকা করে ফাইন দিয়ে এসেছি। পরে সব জায়গা এমন চেনা হয়ে যায় যে, পুলিশ দেখলে ঘুষ দেবার আগে টাকা ভাঙিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকেই।

এসব জায়গায় সাধারণত শেখর আর আমি একসঙ্গে যেতাম। তবে আমাদের দু'জনের

মতলব ছিল দু'রকম। শেখরের চরিত্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা আছে, কোনো কিছুতেই ও বেশিদিন মন বসাতে পারে না, যেজন্য আজ পর্যন্ত কোনো একটা মেয়েকে ভালোবাসতে পারলো না। মেয়েদের প্রতি শেখরের ব্যবহার যেন খানিকটা স্নেহ মাখানো। সমবয়স্কা কোনো মেয়ে বা বেশ্যাকে শেখর যখন চুমু খেয়েছে, তাও যেন স্নেহচুম্বন। অনেক সময়েই শেখর মেয়েদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, আহা, তুমি বড় দুঃখী! চোখের দিকে তাকিয়ে শেখর কী দুঃখ দেখতে পায়, কে জানে! শেখর এসব জায়গায় যেতো নতুনত্বের খোঁজে, যে-কোনো জায়গাতেই প্রথমবার গিয়ে ও অসম্ভব খুশি হয়েছে, আবার ক'দিন বাদেই খুঁজেছে অন্য কিছু। যে উৎসাহ নিয়ে শেখর ওয়াই.এম.সি.এ-তে টেবিল টেনিস খেলতে বা ফ্লাড রিলিফের ভলান্টিয়ার হয়ে আসামে গেছে—ঠিক সেই একই উৎসাহে ও হৈ-হৈ করেছে বৌবাজারের নিচু পাড়ায়, নিমতলা শ্মশানে গিয়ে ভিখিরিদের সঙ্গে শুয়ে থেকেছে।

আমি নিজের জন্য একটা যুক্তি তৈরি করে নিয়েছিলুম। বাড়িঘর ছেড়ে এসে নিজেকে একলা বোধ হতো, তখন আরও মনে পড়তো, আমি শুধু বাড়িঘর বা বাবা-মাকেই ছেড়ে আসি নি, আমি আরও অনেক কিছু ছেড়েছি। যে জায়গায় আমি জন্মেছিলাম, তাও আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। আমাদের গ্রামের পাশে ছিল দুর্দান্ত আড়িয়াল খাঁ নদী—চিরকালের মতো সেই নদীটা আমি হারিয়েছি, বাড়ির ঠিক পাশেই ছিল বুড়ো বাতাবি লেবুর গাছ—সেটাকেও হারিয়েছি এ-জন্মের মতো, টিয়া-ঠুঁটি আমগাছটার নিচে আর কখনো ছুটে যাবো না কালবৈশাখীর ঝড়ে, শ্মশানখোলার বটগাছে আর শুনবো না সেই তক্ষকের ডাক, বাঁশের সাঁকোর ওপর বসে নিচের ঘূর্ণি জলে খলসে আর বাঁশপাতা মাছের খেলা দেখা, আদিগন্ত এক বুক সমান সেই পাটক্ষেতের মধ্যে আমার কৈশোরের একা ঘুরে বেড়ানো—সেখানে আর কোনোদিন ফিরে যাবার উপায় নেই। শুধু বাবা-মাকে ছেড়ে আসাই নয়, চিরজীবনের জন্য একটা নদী বা একটা প্রান্তরকে হারাবার দুঃখও কম নয়। বহরমপুরে থাকতে তেমন মনে পড়ে নি, কিন্তু কলকাতায় এসেই আমার প্রবলভাবে মনে পড়েছিল জন্মভূমির গ্রামের কথা, খেজুর রসের গন্ধ আর জলের স্রোতের শব্দ। সেসব হারাবার দুঃখেই আমি যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কিছু হারাতে হারাতে মানুষ এমন একটা জায়গায় আসে, যখন তাকে হারাবার নেশায় পেয়ে বসে। আমিও ঠিক করেছিলাম, আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলবো—ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। নতুন জায়গায় যখন একা নিজেকে বাঁচতে হবে—তখন আমি বাঁচবো আমার নিজের তৈরি করা নিয়মে, নিজের পছন্দমতো ভালো-মন্দ নিয়ে। গোড়া থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে নিজেকে একটা গোটা মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এইসব ভাবতুম আর কি।

আরও একটা ভালো যুক্তি ছিল। আমি এই শহরে আগন্তুক, কিন্তু আমাকে যেন কেউ গাঁয়ের ছেলে বলে চিনতে না পারে—সেটাও দেখতে হবে। আমাকে নিরীহ বোকা ভেবে এই শহর যাতে আমাকে পিষে না মেরে ফেলে তাও লক্ষ রাখা দরকার। আক্রমণটা কোন্‌দিক থেকে আসবে তা জানি না, তাই তন্নতন্ন করে এ শহরকে আমি চিনতে চেয়েছিলাম। সেই সময় আমি নিউ আলিপুরে এক বাড়িতে টিউশানি করতাম, সেটা ছিল এক অসম্ভব বড়লোকের বাড়ি, ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টসের বিরাট ব্যবসাদার। বাচ্চা দুটো ছেলেকে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতুম ঐ বাড়ির প্রতিটি আসবাব, লোকেদের ব্যবহার, ছাত্রদের তরুণী দিদির হাঁটার দুলকি চাল, অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে আদিখ্যেতা, বাড়ির কর্তা আমার সঙ্গে বা চাকরদের সঙ্গে যে-গলায় কথা বলেন, বউয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় আবার গলার আওয়াজ কি রকম বদলে যায়, টেলিফোন বেজে উঠলে মানুষ কি রকম বেড়াল বা কুকুর হয়ে ছোটে, তাও দেখেছি। নিউ আলিপুর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসতুম খালাসীটোলায় দিশি মদের

দোকানে— সেখানে মেথরের পাশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব, ঠেলাওয়ালার পাশে মধ্যবয়েসী শিল্পী ও পকেটমার, এদের সঙ্গে সমান হয়ে বসে থেকেছি। অবশ্য, বড়লোকগুলো সবাই বাজে মার্কা আর গরীব কুলিমজুররা খুব চমৎকার লোক—এরকম ভুল ধারণা আমার ছেলেবেলাতেও হয় নি। প্রত্যেকটা লোকই আলাদা, এইজন্য বহু রকমের আলাদা মানুষকে দেখার জন্য নেশা আমায় পেয়ে বসেছিল। মানুষ সম্পর্কে ব্রজেশ্বরদা একটা ভালো কথা বলেছিলেন। ব্রজেশ্বরদা মেসে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন, লম্বা মধ্যবয়সী পুরুষটি, মেসের অন্য লোকেরা ওকে একটি পাকা বদমাশ বলে জানতো। কিন্তু ব্রজেশ্বরদা আসলে একটি দার্শনিক, আমি দৈবাৎ ওঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। মার্টিন বার্ন অফিসে কেরানিগিরি করেন যদিও, কিন্তু ব্রজেশ্বরদার মেজাজটা পুরো জমিদারী। ওঁর শখ ছিল দু'টি, যতো রাজ্যের পুরোনো বই পড়া আর সন্ধেবেলা নিষিদ্ধ পাড়ায় গিয়ে মদ খাওয়া। ফর্সা চেহারা, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, ব্রজেশ্বরদা আদ্দির পাঞ্জাবি গায় দিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে বেরুতেন সন্ধেবেলা। আমাকে বলেছিলেন, মানুষ কী রকম জানিস ? ন্যায়শাস্ত্রে একটা কথা আছে, তৃণারণিমণি ন্যায়। তৃণ, অরণি আর মণি এরা তিনটেই মাত্র এক বিষয়ে এক—এই তিনটেই আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু ওরা কি এক ? ওরা সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষও তেমনি, সবারই গায় মানুষ মানুষ গন্ধ—এইটুকুই মিল, আসলে সবাই আলাদা, কেউ শুয়োরের বাচ্চা, কেউ ইঁদুরের বাচ্চা, কেউ দেবতার বাচ্চা। দেবতার বাচ্চা অবশ্য এ পর্যন্ত একটাও দেখি নি। মরার আগে অন্তত একজনকেও দেখে যাবো, আশা করে আছি।

ব্রজেশ্বরদা মাঝে মাঝে আমায় সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে নিয়ে গেছে নানান অদ্ভুত জায়গায়। একদিন ওঁর সঙ্গে তেলেঙ্গাবাগানে গিয়ে এমন সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে পড়েছিলুম যে আর একটু হলেই প্রাণটা যেত। ব্রজেশ্বরদা কিন্তু হাসতে হাসতে বলেছিল, এসব কী জানিস, এসব হচ্ছে তন্ত্র সাধনা। আমাকে শুদ্ধ করতে গেলে বীরাচার পশ্বাচার সবরকমই করে দেখতে হয়। সুরা দেখলেই সূর্য দর্শন করতে হয়—এও যেমন সাধনা, তেমনি রাত্রি দর্শনের জন্য শরীরের মধ্যে সুরা ঢুকিয়ে ফেলতে হয়। বুকের মধ্যে যেদিন মত্ত ভ্রমরীর নিঃশ্বাস শুনতে পাবি, সেইদিন বুঝবি জীবনটা সার্থক হলো। জানিস এসব ? না, তোরা তো শুধু ইংরেজি পড়িস। অ্যালকেমি জানিস— কী রকম পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা তৈরি করতে হয় ?

আমি বলেছিলাম, ব্রজেশ্বরদা, তুমি তো নিজে এসব অনেক করলে, তোমার কি সিদ্ধি হয়েছে ? তুমি কি শুদ্ধ মানুষ হয়েছো ?

বড় নিঃশ্বাস ফেলে ব্রজেশ্বরদা উত্তর দিলেন, না! আমার মধ্যে জিনিস ছিল না। সেটা তো আগে বুঝি নি। আয়নার ওপর ফুঁ দিলে আয়নার গায়ে একটা সূক্ষ্ম পর্দা পড়ে, আর জলের ওপর ফুঁ দিলে পর্দাটা সরে যায়। আগে থেকে আয়না কি জল—তা তো চেনা যায় না, জীবনের অনেকখানি কাটিয়ে এসে চিনতে হয়। ভুল হলেও তখন দুঃখ নেই, তবু তো চেষ্টা করেছিলুম।

কিন্তু এসব যুক্তির ভুল আমি ক্রমশ বুঝতে পারি। এসবই মনকে চোখ-ঠারা যুক্তি। নিজেকে তৈরি করছি এই ভেবে নিচু অসামাজিক জগতে ঘোরাফেরা করতে করতে একদিন বুঝতে পারলুম, আমার যুক্তিগুলো আসলে ছলছুতো, যে-কোনো অবৈধ বেআইনী কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার মধ্যেই যে একটা নেশা আছে, সেই নেশার ঘোরেই ওখানে ঘুরছি। যার যেখানে অহঙ্কারের তৃপ্তি। খুব একটা ধনীর বাড়িতে সফিসটিকেটেড পরিবারের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলে কী রকম একটা অস্বস্তি হয়; মনে হয় জুতোর কোণে একটু কাদা লেগে আছে— ওরা না দেখে ফেলে, হাতের কাপ থেকে যদি একটু চা ছলকে দামি কার্পেটে পড়ে তাহলে কী যেন একটা কেলেঙ্কারি হবে, প্যান্টের নিরীহ জায়গারও একটা বোতাম ছিঁড়ে গেলে মরমে মরে যেতে ইচ্ছে

হয়। কিন্তু মদের দোকানে, জুয়ার আড্ডায়, তুতি কিংবা বীণার ঘরে, মল্লিকবাজারে, হাওড়া ব্রিজের নিচে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা বা আড়ষ্টতা নেই, অনায়াসে টেবিলের ওপর পা তুলে বসা যায়, গরম লাগলে জামা খুলে ফেলা যায় যে-কোনো সময়ে, জোরে কথা বলছি না আস্তে, কখন হাসবো---- তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক থাকতে পারায় একটা আরাম পাই ওসব জায়গায়। শুধু কি এই জন্য ? এর মধ্যে একটা ছোট ফাঁকি আছে। নিজের ঘরের মধ্যেও তো স্বাভাবিক থাকা যায়।

আসলে অহঙ্কারটা পরিত্যাগ করাই মুশকিল। নিমতলায় গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলা, পাঁচজন ঝাঁকামুটে বসে বসে ছিলিমে গাঁজা খাচ্ছিল। গোল হয়ে বসে মাঝখানে খানিকটা তুলোয়-মোড়া কর্পূরে আগুন জ্বালিয়েছে, পাশে কয়েকখানা বাতাসা, লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো কল্কেটা হাত ঘুরে যাচ্ছে, পিছনে গঙ্গার কালো বাতাস। আমি, অবিনাশ আর শেখর ঘুরতে ঘুরতে ওদের পাশে ধপ করে বসে পড়লুম মাটিতে। একজনের কাঁধে হাত রেখে বললুম, ভাই একটা টান দিতে দেবে নাকি ? লোকটা ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, কল্কেটা এগিয়ে দিল। আমি জোরে একটা দম দিয়ে নিয়ে ওটা এগিয়ে দিই অবিনাশকে। অবিনাশ যত্ন করে লাল কাপড়টা জড়িয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলো—লোকগুলো অবাক হয়ে দেখতে লাগলো আমাদের। একজন বললো, হিঃ, বাবুলোক বড়ি মজেসে—হিঃ হিঃ! অবিনাশ বললো, খতম হো গিয়া। আউর নেই হ্যায়? একজন বললো, আউর পিজিয়ে গা ? বৈঠিয়ে তব, লাতে হেঁ হুজুর। অবিনাশ বললো, পয়সা নিয়ে যাও। একটা আধুলি বার করে দিতেই লোকটা শশব্যস্তে ছুটে গেল, আগের লোকটা ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে মাটিতে থুতু ফেলে আবার বললো, হিঃ, বাবুলোক বড়ি সউখ সে, হিঃ হিঃ! আমাদের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে গেল ওরা, নিজেরা না খেয়ে যত্ন করে আমাদের সেজে দিতে লাগলো, আমরা মাটিতে লেটিয়ে বসে ওদেরই বৃত্তের মধ্যে মিশে ওদের একজন হয়ে গেলুম। কিন্তু এ তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যাওয়া নয়, এর মধ্যে জোচ্চুরি আছে। বাবা-মায়ের কল্যাণে আমাদের তিনজনেরই মুখ ভদ্রলোকের মতো, গায়ের রঙ মাজা মাজা, তেল চকচকে মাথার চুল, তিনজনেরই পরনে ধোপদুরস্ত প্যাণ্ট-শার্ট, অবিনাশেরটা আবার টেরিলিনের। আমরা তিনজনই খাঁটি ভদ্দরলোক যাকে বলে, অর্থাৎ যারা ঐ মুটেগুলোর সঙ্গে সারাদিন তুই-তোকারি করে, দু'পয়সা-চার পয়সার জন্য দাঁত খিঁচোয়—আমরা তাদেরই প্রতিনিধি হয়েও ওদের সঙ্গে কাঁধে হাত দিয়ে মাটিতে বসেছি, একই কল্কে থেকে গাঁজা টানছি— এতে ওরা একেবারে কৃতজ্ঞ অভিভূত। আমরাও ওদের এই ভাবটা বেশ ভোগ করে আরাম পাচ্ছিলুম। শুধু তাই নয়, গঙ্গার পাড়ে এসে আমাদের খানিকটা গাঁজা টানতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু কে আর দোকান থেকে কিনতে যায় কিংবা কল্কে সাজার ঝঞ্ঝাট করে, ওদের দিয়ে ও কাজগুলো কত সহজে করিয়ে নেওয়া গেল।

এই রকম তো আরও কতবার করেছি, রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় এসে দাঁড়িয়েছি সেন্ট্রাল এভিনিউতে, নির্জন রাস্তা, একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত নেই। একটা রিক্সাওয়ালা শুধু একলা দাঁড়িয়ে আছে, ও আমার বাড়ি পর্যন্ত অতদূর নিশ্চয়ই যেতে চাইবে না। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, বিড়ি আছে ? একটা বিড়ি দাও তো ভাইয়া। সিগ্রেট খেতে আর ভালো লাগছে না। তুমি চাও তো, নাও আমার একটা সিগ্রেট। লোকটা অবাক হয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে টিনের কৌটো বার করে একটা বিড়ি দিল। আমি দেশলাই জ্বেলে প্রথম ওকে ধরিয়ে দিলুম, তারপর নিজে। ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে বললুম, কী, খুব শীত লাগছে বুঝি ? লোকটা তারপর নিজেই জিজ্ঞেস করলো, বাবু আপ কিধার যাইয়ে গা ? খুশি মনে বাড়ি পৌঁছে দিল তারপর, মাত্র আট আনায়। আমার পরনে একটা দামি সোয়েটার ও উলের প্যান্ট, তা সত্ত্বেও ওর বিড়ি চেয়েছি এবং ভাইয়া বলে

সম্বোধন, এরপর আর আমাকে বাড়ি না পৌঁছে দিয়ে ওর উপায় কি? ঠিক বুঝতে পারি না, আমার এই ব্যবহারকেই আন্তরিকতা বলে কিনা, অথবা ব্ল্যাকমারকেটিয়ারদের মতন এও ওদের অন্যভাবে ঠকানো। কেননা, সবসময়ই ওদের সঙ্গে আপনভাবে মিশতে গেলে— একটা না একটা উপকার পাই, এবং সেটা যে পাবো—তাও যে আগে থেকে জানি! শেখর আবার ওদের সঙ্গে আরও বেশি আপন কথা বলে, মুল্লুক কাঁহা? আরা জিলা? কে কে আছে বাড়িতে? ইস, তিন বছর বালবাচ্চাকে দেখো নি? অ্যাঁ, মেয়েটা বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়েছে? আমারও নিজের বোন, বুঝলে …। হ্যাঁ, আরা তো খুব ভালো জায়গা। ম্যায় তো আরা টৌন মে গিয়া থা আর সাল মে। উহো পোস্টোপিসকে নজদিগমে একঠো লাল কোঠি হ্যায় না, উহো তো হামারা ভাতিজা কো কোঠি হ্যায়। ব্যাস, এরপর সেই লোকটা বশম্বদ হুকুমের চাকর হয়ে পড়ে। চুল ওল্টানো, পালিশ করা জুতো পরা বাবু—সে যে গণ্ড-শহরে থাকে— সেখানে একবার বেড়াতে গিয়েছিল মাত্র, এটাই তার ধন্য হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি টের পাচ্ছিলুম, এর মধ্যে একটা গভীর লুকোচুরি থেকে যাচ্ছে।

ক্রমশ একথাও বুঝতে পারছিলুম, এবার ফিরতে হবে। এইসব চোর-গুণ্ডা-জুয়াড়ি-মাতাল-মজুর-বেশ্যা-দালাল— এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে লাগতে লাগলো আস্তে আস্তে। বেশ বুঝতে পারলুম— ওসব আত্মশুদ্ধি-টুদ্ধির কথার মধ্যে অনেক ফাঁকি, এখন জুয়া খেলতে ইচ্ছে করে পয়সা জেতার লোভে, মদ খেতে ইচ্ছে করে মাথায় রক্ত চনচনে হয়ে উঠে নিজেকে তখন অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় বলে, মেয়েমানুষদের ভালো লাগে কারণ কিছুক্ষণ দায়িত্বহীনভাবে মেয়েমানুষের সঙ্গ পাওয়া যায় তাই। বুঝতে পারার পর আমি এগুলো একে একে ছাড়ার চেষ্টা করলুম। ছাড়া অবশ্য সহজ নয়, খুব ছেলেবেলায় আমি একবার একটা বাদুড় ধরেছিলাম, সেটার কথা মনে পড়ে আমাদের রান্নাঘরের পিছনে একটা গাবগাছে বাদুড় থাকতো, একদিন চুপি চুপি গাছে উঠে একটা বাদুড়ের ডানা চেপে ধরেছিলাম। আশ্চর্য, বাদুড়টা কয়েকবার ঝটপট করেই মরে গেল, বাদুড়ের চেহারা দেখেও এমন ঘেন্না লাগছিল যে, আমি ওটাকে বাঁশবনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাদুড়টার ডানা থেকে কাজলের মতো তেলতেলে কালো রং লেগে গিয়েছিল আমার হাতে, বারবার সাবান আর গেঁরিমাটি দিয়ে ধুয়েও হাত থেকে সেই তেলতেলে ভাব ওঠে নি। সাতদিন পর্যন্ত সেই হাত দিয়ে কিছু খেতে গেলেই দুর্গন্ধ পেয়ে বমি আসতো। এখনো, সেই দিনটার কথা মনে পড়লেই হাতের সেই তেলতেলে ভাবটা যেন টের পাই, বমি ঠেলে আসে। এও সেই বাদুড় ধরার মতন, একবার ছুঁলে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। অবশ্য, এখনো আমার কোনো ঘৃণা বা অনুশোচনা জাগে নি, পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হবার ভয়েই আমি নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা শুরু করলুম। কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তারপর কোথায় যাবো? কলকাতা শহর আমার চেনা হয়ে গেছে— এবার কাকে চেনার চেষ্টা করে আমার সময় কাটবে? কোনো একজনের কাছে গিয়ে যেন এই প্রশ্ন করা দরকার।

ব্রজেশ্বরদা বলেছিলেন, যদি এসব থেকে মন ফেরাতে চাও, তবে কারুকে ভালবাসো। ভালবাসাই পৃথিবীর সব শূন্যতা পূরণ করে দিতে পারে—অবশ্য এসব আমার শোনা কথা, আমার নিজের যদিও ভালবাসা খোঁজার দরকার হয় নি এখনো!

তখন মনীষার কথা ভেবে আমি ব্রজেশ্বরদাকে উত্তর দিয়েছিলাম, আমিও চেষ্টা করেছিলাম ভালবাসার দিকে মুখ ফেরাতে, পারি নি।

মেসের ঘরটা অবশ্য ছেড়ে দিতে হয় বছরখানেক আগেই। আমার কীর্তি-কাহিনীর কিছু সৌরভ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই, সেজদি ছোড়দিও নাকি কানপুর থেকে আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর চেয়েছে। তিন-চার বছর বাড়ির কারুর সঙ্গেই আমি

কোনোরকম সম্পর্ক রাখি নি প্রায়, বড়দি শুধু অফিসের ঠিকানা জানতো, সেখানে টেলিফোন করতো মাঝে মাঝে। অনেক সাধাসাধি করলে কৃচিৎ কোনো রবিবার দুপুরে আমি বড়দির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতুম।

একদিন বড়দি সোজা গাড়ি নিয়ে মৌলালিতে আমার মেসে এসে হাজির। আমার জিনিসপত্র টান মেরে ফেলে লণ্ডভণ্ড করে বড়দি বললো, তোর এখানে আর থাকা হবে না, তুই আমার বাড়ি গিয়ে থাকবি। চল, আজই চল।

আমি হেসে বলেছিলাম, তুমি পাগল হয়েছো, বড়দি! আমি এখানে বেশ আছি। তোমাদেরও কোনো অসুবিধে নেই।

— তাহলে আমি এই খাটে বসলুম। তুই যা ইচ্ছে কর! যদি আমাকে তাড়াতে পারিস, তাড়া!

— কিন্তু তুমি এরকম করছো কেন বড়দি ? আমাকে তুমি এমন ছেলেমানুষ ভাবছো— এত ভাববার দরকারটা কি ?

— তুই আমাদের জন্য না ভাবতে পারিস, আমাদের চিরকালই তোর জন্য ভাবতে হবে। তোর কথা ভেবে ভেবেই মার শরীরটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাবাঃ, মাঝে মাঝে যা এক একটা কথা শুনি তোর নামে, উফ্ তুই এরকম হলি কেন রে ?

আমি বড়দির কথা শুনে না হেসে পারলুম না। বিয়ের পর থেকেই মোটা হতে শুরু করেছে, এখন রীতিমতো ভারিক্কি, বড়লোকের বাড়ির গিন্নী হবার পক্ষে মানিয়েছে ভালো। ছেলেবেলা থেকেই বড়দির কথাবার্তা এই রকম, যেন সবসময়ই পৃথিবীতে একটা না একটা ভয়ের ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। আমি বললুম, কী রকম হয়েছি ? বেশ ভালোই তো আছি।

— বিয়ে-থা করতে হবে না ? না কি এইরকম বাউণ্ডুলে হয়েই চিরটা কাল কাটবে ?

— সে যখন ইচ্ছে হয় করবো। তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই সব লোক ওসব পাট চুকিয়ে ফেলে নাকি ?

— সে তোর যা ইচ্ছে করিস্। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে থেকে কর। এই মেসের খাওয়া খেয়ে মানুষ বাঁচে ? ভাবলেই তো বমি আসে। কী চেহারাই হয়েছে !

—এই মেসে আরও ছত্রিশজন বোর্ডার আছে, তারা বুঝি মানুষ নয় ?

— সে তাদের ভাবনা আমি ভাবতে পারবো না, তাদের যদি মা কিংবা দিদি থাকে, তারা ভাবুক। আমার ভাবনা এখন তোকে নিয়ে! চল, আমাদের বাড়িতে বাইরের দিকে একটা ঘরে থাকবি, কেউ তোকে বিরক্ত করবে না, তবু তো কাছাকাছি থাকবি। নইলে যে তোর কথা ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না—

— হ্যাঁ, প্রথমে তো এই বলে নিয়ে যাবে, তারপরই একদিন বলবে, আজ বাজারটা করে নিয়ে আয় তো ছুট, আজ আমার ননদের বাড়ি অমুকটা পৌঁছে দিয়ে আয়, আজ আমার পিশশাশুড়িকে নিয়ে আয় হাওড়া স্টেশন থেকে! ওসব আমি পারবো না। এরপর নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে বলবে, সকালের দিকে ছেলেমেয়ে দুটোকে তো খানিকটা পড়াশুনো দেখিয়ে দিলেই পারিস ! বিনে পয়সায় বেশ একটা বাড়িতে মাস্টার পাওয়া—

বড়দি এবার নিঃশব্দে চওড়াভাবে হেসে বললো, না, সে ভয় করতে হবে না ! তোর হাতে আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ভার দিয়ে কি আমি নিশ্চিত হতে পারি ? তা হলে যে ওদের শিক্ষা কেমন হবে, তা তো আমি জানিই।

কিন্তু সব কথা এভাবে মেলে না। বড়দির বাড়িতে যাবার পর, বড়দির ছেলে বুবুল আমার ভক্ত হয়ে পড়ে, আমিও ওকে খুবই ভালবাসতে শুরু করি। এমনকি বুবুলের পরীক্ষার আগে, ও ভূগোলে খুব কাঁচা দেখে আমি নিজেই এমন চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম যে, দু'দিন সারা সকাল

সারা সন্ধে আমি বুবুলকে পাখি–পড়ার মতো ভূগোল পড়ালুম।

বড় জামাইবাবু তাঁর অফিসে আমার চাকরিটার ব্যবস্থা করতেই আমি গভর্নমেন্ট অফিসটা ছেড়ে দিলাম। সরকারি চাকরির সুবিধে ছিল এই যে, যখন তখন ডুব মারলে কিংবা কাজে হাজার ভুল করলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অন্য প্রাইভেট ফার্মে ঢুকলে এ নিয়ে অসুবিধে হলেও নিজের জামাইবাবুর অফিসে এ সবক'টা সুযোগই পাওয়া যাবে ভেবে, এটাই নিলাম। কিন্তু চাকরি নেবার পর দেখি অন্য বিপদ। মাইনের অঙ্কটা খারাপ নয়, কিন্তু পুরো টাকা কোনো মাসেই পাই না। আমার মাইনে থেকে একশো টাকা কেটে পাঠিয়ে দেয়া হয় আমার বাবার নামে, আর একশো টাকা বড় জামাইবাবু নিজে নেন, ওঁর বাড়িতে আমি বিনা পয়সায় থাকলে–খেলে যদি আমার গ্লানিবোধ বা অপমান হয় সেই জন্য। কিছুই অপমান হতো না, দিদি নিজে ডেকে এনেছে, তার ওখানে আমি খাবো, তার জন্য আবার টাকা কিসের? মাঝখান থেকে একশোটা টাকা—যতো সব বাজে ব্যাপার!

দিদি অবশ্য ঘোষণা করে রেখেছে, আমি যেদিন বিয়ে করবো, সেদিন থেকেই আর আমার দুশো টাকা কাটা যাবে না। লোকে বিয়ে করলে অনেক সময় অর্ধেক রাজত্ব পায়, আমার অন্তত দুশো টাকা মাইনে বাড়বে বিয়ে করলেই।

বিয়ে তো আমি অনেক আগেই মনীষাকে করতে চেয়েছিলাম। ততদিনে বেশ কয়েকটা মেয়েকে চিনেছি, মেয়েদের শরীরে শাড়ির ঠিক ক'টা পাক থাকে জেনে গেছি, জেনে গেছি পিকনিকে গিয়ে কেন মেয়েরা বারবার জলাশয় দেখতে চায়। কোনো মেয়েকে প্রথমবার চুমু খাবার আগে হাতের আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়াতে হয়, 'ভালবাসি' বলতে হয় তার অনেক অনেক পরে। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ, একথা বলার চেয়ে তোমাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়লো, একথায় মেয়েরা খুশি হয় ঢের বেশি। মেয়েদের রূপের প্রশংসা না করে, তাদের দোষের প্রশংসা করতে হয়, কোনো মেয়ের যদি থুতনিতে কাটা দাগ থাকে কিংবা হাতের একটা আঙ্গুলের নখ হয় কালচে, কান দুটো যদি বেশি বড় হয়—তবে সেগুলোই প্রশংসনীয়। কোনো মেয়ে যদি প্রসাধন করার সময় কোনো পুরুষকে পাশে বসতে দেয়, তবে সে তাকে তখন আদর করারও সুযোগ দেবে। একথা বুঝিয়ে দেয়, তাকে আদর না করলে তার প্রসাধন সম্পূর্ণ হবে না। আর, একবার না একবার মেয়েদের চোখের জল দেখে নিতেই হবে, আঙ্গুল দিয়ে মেয়েটির গাল থেকে চোখের জল না মুছে দিয়ে বাংলাদেশের কোনো মেয়েকে কেউ কখনো ভালবেসেছে, তা কখনো শুনিই নি। গাঁয়ের ছেলে হয়েও আমি এসব বৃত্তান্ত খুব চট করে শিখে নিয়েছিলুম। কিন্তু মনীষা এ সমস্ত নিয়ম ভেঙে দিতে পারে।

একটা পুরো দিন যদি মরুভূমিতে কাটানো যায়, তখন যে–কোনো মানুষই নাকি একবার না একবার মরীচিকা দেখবেই। তেমন, এক জীবনে কোনো না কোনো একটা সময়ে মানুষ নিজেকে জয়ী মনে করেই। সেই রকমই মনে হয়েছিল আমার, ছ'মাস, গত ফেব্রুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত, নিজেকে মনে হয়েছিল আমার অপরাজিত। কি যেন একটা অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল, প্রত্যেকটা ব্যাপারে জিতে যাচ্ছিলুম, তাস খেলায় তখন আমিই জিতে যেতুম রোজ, খেলার শেষে একমুঠো টাকা আমার হাতে। এমন হলো, তখন আমার সঙ্গে কেউ আর তাস খেলতে চাইতো না, আমি অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকাতুম সবার দিকে। মদ খেয়ে শেষ পর্যন্ত টং হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতুম তখন, অবিনাশের মতো ছেলেও তখন ঢলে পড়ে গেলে ওর ঘাড় ধরে ঠেলে তুলে দিতাম ট্যাক্সিতে। লাইটহাউসে সিনেমার সামনে কয়েকটা মাড়োয়ারী ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বাধে একবার, ইংরেজি স্কুলে পড়া চোঙা প্যান্টপরা ছেলেগুলো ওরাই দলে ভারি, কিন্তু অরুণের স্ত্রীকে উদ্দেশ করে ওরা কুৎসিত কথা বলেছিল, আমরা তিনজন—ওরা আটজন,

কিন্তু নিজেকে সে সময় আমার দৈত্যের মতন শক্তিশালী মনে হয়েছিল, আমি এগিয়ে গিয়ে ঝট করে একজনের কলার চেপে ধরতেই কিন্তু ওরা ক্ষমা চাইলো। আমি অহংকারদীপ্ত মুখে ফিরে এলুম বন্ধুদের মধ্যে। আঃ, ঐ ক'টা মাস কী অসম্ভব জয়ীর মতন বেঁচে ছিলাম ! মনে হতো পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কিছুই নেই। হাতের মুঠোয় আমলকীর মতন গোটা পৃথিবীর দিকেই আমি অভয় চোখে তাকাতে পারি, এমন অহঙ্কারও হয়েছিল আমার। সেই অহঙ্কারেরই তাপে ভেবেছিলাম মনীষাকে জয় করতে পারবো। কিন্তু মনীষা আমাকে কোনো সুযোগই দেয় নি।

তখন কোনো কোনো সন্ধেবেলা অরুণদের বাড়িতে আড্ডা হতো। অরুণ তাপসের বোনকে বিয়ে করেছে বলে স্বামী–স্ত্রী দু'জনই আমাদের চেনা, ওর বাড়িতে আর ছিল ওর বাবা আর বোন মনীষা। অরুণের বাবা তিনতলার ঘরে দূরে থাকতেন বলে আমরা ওখানে বেশ একটা উপযোগী আবহাওয়া পেয়েছিলাম। অরুণের দিদি বিধবা হয়ে বাচ্চা–কাচ্চা নিয়ে ও বাড়িতে ফিরে আসার পর আমাদের আড্ডা ভেঙে যায়।

মনীষা খুব সিল্কের শাড়ি পরতে ভালবাসে, যখনই ওকে দেখেছি সিল্কের শাড়ি পরা, সন্ধেবেলা ও হয়তো তখন কোথাও বেরুতে যাচ্ছে বা বাইরে থেকে ফিরে আসছে। এখনও মনীষার কথা ভাবলেই আমার চোখে ভাসে ওর মেরুন–রঙা সিল্কের শাড়ি পরা মূর্তি। সিল্ক পরলে মেয়েদের শরীরটা আরও নরম মনে হয়, নরম মুখ, নরম বুকের ডৌল, নরম ঊরুদেশ। ঐ নরম শরীরে খুব মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে করে। ঐ রকম শরীর হাতের কাছে এলে—একবার অন্তত বুকে জড়িয়ে ধরতে না পারলে, বুকের মধ্যে কঠিন অসুখ হয়ে যেতে পারে।

খুব কম বয়সে মা মারা গিয়েছে বলে মনীষার স্বভাব অনেকটা স্বাধীন। যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, যখন খুশি আসে। এজন্য তাকে কেউ শাসন করে না, অবশ্য শাসন করার দরকারও নেই, কারণ মনীষা এমনই বিদ্যুৎ চরিত্রের মেয়ে যে, ও কখনো কোনো বিপদে পড়বে না, বা ওকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না। অথবা মনীষা যদি ইচ্ছে করে বিপদে জড়াতে চায় তবে কারুর সাধ্য নেই ওকে আটকায়। এমন সুন্দর, এমন বুদ্ধিমতী, এমন নিষ্ঠুর মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। সন্ধেবেলা তাস খেলা হচ্ছে, তাস দেওয়া হয়েছে, কেউ তখনো তোলে নি, মনীষা শাড়ির শপশপ শব্দ করে কী যেন নিতে সে ঘরে ঢুকলো। আমি বললাম, মনীষা, আমার তাসটা একটু ছুঁয়ে দিয়ে যাও তো। যদি ভালো ওঠে, তা হলে—। দেবো ? আচ্ছা—বিনা দ্বিধায় মনীষা আমার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে আমার তাস তিনটে তুলে নিয়ে নিজে দেখলো—ও নিজেও বেশ খেলা জানতো, ঠোঁট টিপে হেসে বললো, দেখুন, এবার যদি না জেতেন তো কি বলেছি ! আমি তাস দেখে চমকে উঠলুম। এ যে অসম্ভব রকমের সাজানো ভালো তাস। আমার কাছ ঘেঁষে মনীষা বসেছিল, ওর শরীর থেকে সুন্দর ঘ্রাণ ভেসে আসছে, মেরুন–রঙা সিল্কে ওর শরীরের রেখাগুলো আরও মসৃণ, আমার খুব ইচ্ছে হলো বিশ্ববিজয়ী হবো। কি জানি ও মনের কথা শুনতে পায় কিনা—সেই মুহূর্তে ও উঠে পড়লো।

— বসো, আর একটু বসো, প্লিজ !

— ইস্, আমি এখন বসে তাস খেলি আর কি !

খানিকটা বাদে মনীষা আবার ঢুকলো, সেবার আমার তাস তোলা হয়ে গেছে। ও বললো, তুলে ফেলেছেন ? আমি একটা হাত বাড়িয়ে বললাম, তুমি শুধু আমার হাতটা ছুঁয়ে দাও, তাহলেই আমি জিতবো ! মনীষা আমার হাতটা ছুঁতেই আমি ওকে টান মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম।— ইস্, অত সহজ নয় ! মনীষা হাসতে হাসতে হাত ছাড়িয়ে নিল। সেবারও আমি খেলায় জিতলুম, কিন্তু মনীষা তখন ঘর থেকে চলে গেছে।

মনীষার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হতো, তা হলে অনেক আগেই হয়তো আমি জীবনের

মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতুম, ফিরে আসতে পারতুম সুস্থতার দিকে। অমন পাপহীন উজ্জ্বল মেয়ে মনীষা, কিন্তু ওই আমাকে ঠেলে দিল আরও গম্ভীর অন্ধকারের দিকে। মনীষার কাছে অসহায়ভাবে হেরে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, আমি আর কারুকে ভালবাসতে পারবো না এ জন্মে, কারুর ভালবাসা পাবো না, আমি ভালবাসারই অযোগ্য। মনীষা ওরকম অবহেলা না দেখালে আমি গত বছর পুজোয় গালুডিতে সাঁওতাল মেয়েটাকে নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনায় জড়িয়ে পড়তাম না।

কিন্তু ব্যর্থ প্রেমও তো নয়, মনীষার সঙ্গে আমার প্রেমে পড়াই যে হলো না। মনীষার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, তখন ও কত আপন, একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে এসে কথা বলেছে। একি, জামার বোতাম ছেঁড়া কেন, দেখি, দেখি, তা হলে সবগুলো ছিঁড়ে দি—এই বলে মনীষা আমার সবক'টা বোতাম ছিঁড়ে দিয়েছে পটপট করে। আমি ওকে শাস্তি দেবার জন্য হাত বাড়িয়েছি, ও তখন কোথায় ! যখন দেখা হতো, তখন এইরকম। আবার এক মাস কি দু'মাস দেখা না হলে, সে সম্বন্ধে মনীষা একটাও কথা বলতো না। কোনোদিন জিজ্ঞেস করে নি, এতদিন কোথায় ছিলেন। আর দলবলের সঙ্গে ছাড়া, মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হবার সুযোগও ছিল না। আমার বন্ধু অরুণের বোন মনীষা, সুতরাং ওদের বাড়িতে গিয়ে অরুণের ছাড়া শুধু মনীষার সঙ্গে কি দেখা করা যায় ! যায় হয়তো, কিন্তু আমি গ্রাম্য ছেলের এই সংস্কার কিছুতে ছাড়তে পারি নি। দু'একদিন একা গেছি অরুণদের বাড়িতে, অরুণ আর ওর বউয়ের সঙ্গে গল্প করেছি। কিন্তু কি একটা লজ্জা আমাকে পেয়ে বসতো, মুখ ফুটে একবারও সরলভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি নি, মনীষা কোথায় ? উদ্‌গ্রীবভাবে চেয়ে থেকেছি দরজার দিকে, কিন্তু সে-সব দিন মনীষাকে একবারও দেখি নি। কখনো টেলিফোন করেছি ওদের বাড়িতে, যেদিন দৈবাৎ মনীষা ফোন ধরেছে, আমার গলার আওয়াজ চিনতে পেরেই কিছুক্ষণ কলরব মুখরিত ইয়ার্কির পর বলেছে, দাদাকে চাইছেন তো ? আমি বলেছি, না, শুধু তোমাকে !—মনীষা হাসতে হাসতে বলেছে, আহা কি সৌভাগ্য আমার ! বুঝেছি, অসম্ভব দেরি হয়ে যাচ্ছে ! দাঁড়ান, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজে ছেড়ে দিয়েছে।

মরীয়া হয়ে একলা দেখা করার জন্য ইউনিভার্সিটির সামনেও দাঁড়িয়ে থেকেছি ওর জন্য। মনীষা তখন সিক্সথ ইয়ারে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ছে। ছুটির পর ছেলেমেয়ের দঙ্গল বেরিয়ে এলো, বাস স্টপে মনীষাই আমায় প্রথম দেখতে পায়। কোনো দ্বিধা কিংবা ব্রীড়া নেই, দেখেই স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত মুখে হাসলো। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললো, কোন্ মেয়েটা ? কোন্ মেয়েটা আমাকে দেখিয়ে দিন।

আমি বললুম, কী ?

— কোন্ মেয়েটার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বলুন। আমি দেখে রাখি, যদি চিনতে পারি...

— মনীষা, আমি তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি—

— সে আসে নি বুঝি ? আচ্ছা, তার নামটা বলুন না।

— সত্যি, তোমার জন্যই শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

— তাই নাকি ? কী ভালো লাগলো শুনতে। চলুন, তবে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন!

— বাড়ি যাবার আগে একটু চা খাবে ? কোনো চায়ের দোকানে—

— আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে। চলুন, বাড়ি চলুন।

— একটুখানি কোথাও বসে—

— বাড়িতে চলুন না ! সেখানে বুঝি চা খাওয়া যায় না ? ঐ যে বাস আসছে—। বাড়িতে পৌঁছিয়ে মনীষা চেঁচিয়ে উঠলো, বৌদি তোমার সখের দেওর এসেছে। চা খাওয়ার জন্য পাগল।

নাও, চা খাওয়াও, গল্প করো। আমি এখন পারমিতাদের বাড়ি যাবো একটু।

আমাকে দোতলার ঘরে বসিয়ে মনীষা রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো, বৌদির সঙ্গে বসে গল্প করুন। ইস্, রোদ্দুরে মুখটা কি হয়ে গেছে, পাখার তলায় এসে বসুন না। আমি চললুম।

সেদিন এমন বোকা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। অরুণের বউ খুকু তখন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, গা-ধোওয়া আরও কি কি সব মেয়েলি কাজ তখনও বাকি। কৃত্রিমভাবে আন্তরিক হয়ে আমাকে বললো, একটু বসুন, যাবেন না কিন্তু, আমি বাথরুম থেকে এক্ষুনি আসছি। চা দিয়ে যাচ্ছে! সেই ঘরের মধ্যে একা বসে চা খেতে আমি অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছিলাম। তখুনি উঠে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু তা-ও আসা যায় না। মনীষা আর একবারও ঘরে এলো না।

মনীষার জন্য আমি নিজেকে যোগ্য করে নেবারও চেষ্টা করেছিলাম। তখন আমি শখ করে তৈরি করলুম গোটা-তিনেক ডবল-কাফ শার্ট। সাধারণত আমি শার্টের হাতা গুটিয়ে রাখি অথবা হাফ-শার্ট। কিন্তু ডবল-কাফ শার্টের পুরো হাত দুটো খুলে পাথর বসানো স্টিলের বোতাম লাগিয়ে গায় দিয়ে হঠাৎ নিজেকে খুব শান্ত মনে হয়। দুটো হাত সম্পূর্ণ ঢেকে রাখার মধ্যে একটা মানসিক শান্তি আছে নিশ্চিত। এই ব্যাপারটাও আমি জানতে পেরেছিলাম কয়েকদিন আগে মাত্র। তার আগে, জামার হাতা খুলে বা গুটিয়ে রাখার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে, আমার এরকম কোনো জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু, অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে মারামারি করে পুলিসে ধরা পড়ার পর আদালতে যখন ওদের কেস্ ওঠে, আমরাও গিয়েছিলাম। আসামীর ঘেরা জালের মধ্যে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে। আমি, তাপস আর শেখর দর্শকদের বেঞ্চে বসে উকিলের ইয়ার্কি শুনছি। এমন সময় উর্দিপরা আদালতের বেলিফ আমার সামনে এসে রুক্ষ গলায় বললো, আপ উঠ্ যাইয়ে, বাহার যাইয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—যাইয়ে বাহার! নিকালিয়ে!

প্রথমটায় আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ট্যাক্সিতে মারামারির সময় আমিও দলে ছিলাম, কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সটকেছি। ট্যাক্সিওয়ালা বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করলে আমিই প্রথম নেমে গিয়ে ওর মিটারটা দু'বার নামিয়ে আবার তুলে দিয়েছিলাম। এখন জানতে পেরে, আমাকে অভিযুক্ত করবে নাকি! কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমার শার্টের হাতা গোটানো ছিল এবং গলার কাছে বোতাম খোলা, হাকিমের সামনে এরকমভাবে বসা নাকি বেআইনী। শুনে আমার মনে হয়েছিল, আমার আরও কত কি শেখার আছে। শিক্ষার তো শেষ নেই! হাকিমের পেছনেই দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর ছবি, তাঁকে মনে মনে প্রণাম করে আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তখন।

যাই হোক্, পোশাক বিষয়ে সহবৎ ওই আদালতেই টুক্ করে শিখে নেয়া গেল। মনীষার কাছে যাবার জন্য আমি নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়েছি, পুরো হাত ঢাকা, প্রত্যেকটি বোতাম লাগানো ধপধপে শাদা শার্ট, পরপর কয়েকদিন ঠিক সময় ঘুমিয়ে চোখের কোণের কালো দাগ মুছে গেছে, সারা শরীরময় চন্দন সাবানের গন্ধ। কেননা, মনীষা সবসময় সিল্কের শাড়ি পরে, কথায় কথায় প্রায়ই বলছে, ও ময়লা পোশাক একেবারে সহ্য করতে পারে না। প্রতিদিন পরিষ্কার পোশাক পরে আমারও মন ক্রমশ গ্লানিহীন হয়ে উঠেছিল সেই সময়, আর মনীষাকে পাবার ইচ্ছে তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মনীষাকে আমার খুবই দরকার প্রেমে, অপ্রেমে বা শরীরে। মনীষার প্রত্যেকটি ব্যবহার স্পষ্ট, কোনো কথারই দু'রকম মানে হয় না, তবু মনীষা আমাকে বিষম ধাঁধার মধ্যে ফেলেছিল। মনীষাকে যে আমি চাই— একথাটাই বলার সুযোগ ও আমাকে দিল না কিছুতেই। একথা বলার পর ও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতো, তারও একটা মানে ছিল। ব্যর্থ-

প্রেমিক হতেও আমার আপত্তি ছিল না। মেয়েরা তাদের প্রেমিককেও ভুলতে পারে, কিন্তু যাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে জীবনে ভোলে না। মনীষার মনে বা জীবনে আমি নিজের একটা ছাপ ফেলার জন্য আকুল হয়েছিলাম। কি জানি কেন। ভিড়ের মধ্যে যখনই দেখা হয়েছে, মনীষার ব্যবহার এমন, যেন ও আমারই প্রতীক্ষায় ছিল। একদিন সন্ধেবেলা আমরা অনেকে বসে আছি অরুণের ঘরে, মনীষা ঢুকলো, হাতে চিরুনি, ও তখন চুল আঁচড়াচ্ছিল, আমার পাশে এসে চিরুনিটা সোজা আমার চুলের মধ্যে চালিয়ে বললো, ইস্, রুক্ষ চুল আমি একদম দেখতে পারি না।

আমার এত কাছে তখন মনীষার শরীর যে, যে-কোনো সপ্রাণ মানুষেরই ইচ্ছে হয় ওকে তখন বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে, দাও, আমাকে তুমি পরিপাটি এবং সুশোভন করে দাও ! কিন্তু আমি বলতে পারি না, মনীষার শরীরের গন্ধ আমার বুক জুড়ে তবু ও আমার চোখে চোখ রাখে না, চিরুনিটা আমার মাথায় এমন আমূল বসিয়ে দেয় যে, আমি বলে উঠি, উঃ লাগছে, লাগছে—। মনীষা হাসতে হাসতে দূরে সরে যায়।

একা কোথাও মনীষার সঙ্গে দেখা হয় না। আমি যখন একা থাকি, মনীষা তখন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কতদিন আমি বন্ধু-বান্ধবদের এড়িয়ে একা একা রাস্তা দিয়ে ঘুরেছি, কত মানুষের সঙ্গেই তো হঠাৎ পথে দেখা হয়, কিন্তু মনীষার সঙ্গে কোনোদিন না। মনীষা তো প্রায়ই বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে যায়, কিন্তু তখন বুঝি শুধু বেছে-বেছে অন্য পথগুলো দিয়েই যায়! অথচ হঠাৎ দেখা হয়েছে অনেকবার ওর সঙ্গে, তখন হয় আমার সঙ্গে অন্য কেউ আছে, অথবা মনীষার সঙ্গে অন্য কেউ। থিয়েটার দেখতে গিয়ে দেখা হলো মনীষার সঙ্গে, ওর সঙ্গে দু'জন বান্ধবী আর এক মাসতুতো বোন। আমাকে দেখতে পেয়েই হৈ-হৈ করে এগিয়ে এলো মনীষা, বললো, সুনীলদা, আজ আমাদের খাওয়াতে হবে কিন্তু। উঃ এমন খিদে পেয়েছে না ! ভাগ্যিস আপনাকে পেলাম।

আমি নিচু গলায় বললুম, তুমি একা আসবে আমার সঙ্গে ? তোমাকে একা খাওয়াতে পারি। তোমার সঙ্গে আমার—

সুরেলা গলায় হেসে মনীষা বললো বান্ধবীদের দিকে ফিরে, দেখছিস, কি কৃপণ ! আমাকে একা খাওয়াতে চায় ! ইস্, পয়সা বাঁচাবার কি চেষ্টা—

ব্যান্ডেলে পিকনিক করতে গিয়েও মনীষা কিছুতেই আমার সঙ্গে একা জলের ধারে এলো না। জন পনেরো মেয়ে-পুরুষ, তার মধ্যে মনীষা ডিমের শুধু খোলাটা হাতে দিয়ে ইয়ার্কি করলো আমার সঙ্গে, আমি ওর আঁচলে হাত মুছতে গেলাম, ও কমলালেবুর খোসার রস দিয়ে দিল আমার চোখে... কিন্তু কিছুতেই ও আমার সঙ্গে একা জলের ধারে এলো না। অথচ ফেরার পথে গাড়িতে মনীষা আমারই পাশে, ভিড়ের মধ্যে আমার সম্পূর্ণ শরীরে ওর সম্পূর্ণ শরীরের ছোঁয়া, তবু চোখে চোখ রাখে না।... দোলের দিন রং দেবার আবেগে আমি মনীষার বুক ছুঁয়ে দিলাম, মুখ ও গলা ছাড়িয়ে আমার হাত মুহূর্তে ঢুকে গেল ওর ব্লাউজের মধ্যে, গরম, পরিপূর্ণ দুই বুক—তবু মনীষা থমকে তাকালো না আমার মুখের দিকে, অথবা ভর্ৎসনা ও ধিক্কার দিল না, নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরমুহূর্তে ফিরে এসে এক গাদা কয়লার গুঁড়ো আমার মুখে মাখিয়ে ভূত সাজিয়ে দিল। বললো, এবার কেমন লাগে ?

কী আমার ক্রটি, কী আমার ত্রুটি—একথা বোঝার জন্য আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। মনীষা পাগলও না, শিশুও না, অথচ দু'বছরের মধ্যে আমাকে একবারও একা কথা বলার সুযোগ দিল না। আমার সমস্ত ইশারা, ইঙ্গিত, কৌশল, অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গি—সব ব্যর্থ করে মনীষা শুধু আমার ভিড়ের মধ্যে আপন হয়ে রইলো। আমার কি ব্যর্থ প্রেমিক হবারও যোগ্যতা

নেই ? কিন্তু না চাইতে পারলে ব্যর্থই বা হবো কি করে ? ভেবেছিলাম চিঠি লিখবো— অত কাছে ওদের বাড়ি— যে কোনো সময়ে গিয়ে দেখা করা যায়। চিঠি লেখাটা কেমন যেন বোকার মতন, তা ছাড়া আমার মনে মনে গভীর ধারণা ছিল, চিঠি লিখলে মনীষা হয়তো বাড়ির সকলকে সে চিঠি পড়িয়ে হাসাহাসি করবে। এম.এ. পাস করবার পর, মনীষা যখন সোস্যাল এডুকেশনের ট্রেনিং নিতে দু'মাসের জন্য হায়দ্রাবাদ গেল, তখন অনেক কায়দা করে ওর ঠিকানা যোগাড় করে মনীষাকে আমি চিঠি লিখেওছিলাম। পরিষ্কার, স্পষ্ট চিঠি। সে চিঠির উত্তর আসে নি, ফিরে আসার পরও মনীষার কোনো ভাবান্তর নেই। আমি অরুণের সামনেই মনীষাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মনীষা, তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, তুমি উত্তর দিলে না কেন ?

মনীষা তখন হায়দ্রাবাদ থেকে কিনে আনা পাথরের মালা দেখাচ্ছিল, অম্লান চোখ তুলে বললো, ওমা, আপনি চিঠি লিখেছিলেন নাকি ? কই পাই নি তো ? ইস্, পেলে খুব ভালো হতো। বাইরে গেলে চিঠি পেতে এতো ভালো লাগে !

নিজেকে তখন একটা তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর আবর্জনার মতো মনে হয়। এই একটি সামান্য মেয়ের মন স্পর্শ করার আমার ক্ষমতা নেই। এর আগে আমি পুতুলখেলার মেয়ে দু'চারটি পেয়েছিলাম, মেয়েদের নিয়ে পুতুল খেলতে শিখে গিয়েছিলাম বেশ, কিন্তু পুতুলের মধ্যে প্রাণ খুঁজতে গিয়ে দেখি যে, আমার মন্ত্র জানা নেই। মনীষা অন্য কারুর কাছে ওর প্রাণ জমা রেখেছে কিনা, কিংবা কোন্ কৌটোয় বন্দী আছে ওর ভ্রমর— তা নিয়ে আমি গোপনে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কিছুই টের পেলুম না। তা ছাড়া মনীষা যেমন ধরনের মেয়ে, ও যদি কারুকে ভালবাসে, সে কথা ওর গোপন রাখার কোনোই কারণ নেই। ওর কলেজের পুরুষ–বন্ধুরাতো প্রায়ই ওকে বাড়িতে ডাকতে আসে। বিনা দ্বিধায় মনীষা ওদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গল্প করে, বা বেরিয়ে যায়। ওদের বাড়িতে স্বাধীন আবহাওয়া, ওর বাবা ওদের কোনো কাজে বাধা দেন না, তা ছাড়া তিনি করপোরেশনের কাউন্সিলার বলে বাড়ির ব্যাপারে তেমন দৃষ্টি নেই, সমাজ–জীবন নিয়েই ব্যস্ত। অরুণের সঙ্গে ওর বয়সের তফাত বেশি নয়, ভাইবোনের সম্পর্কও বন্ধুর মতন। মনীষা ভ্রূক্ষেপহীনভাবে আমাকে বিষম কষ্ট দিতে লাগলো। আমার এ কষ্টের কথা কোনো বন্ধু–বান্ধবকেও বলা যায় না। এই একটা ব্যাপারে আমি যত বেশি নিঃসঙ্গ হতে লাগলুম, ততই মনীষার জন্য আমার ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো। তখন আমি অরুণ–মনীষাদের বাড়ি যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলাম।

আর, তারপর থেকেই আমি বুঝতে পারলুম, মনীষাকে না দেখে ক্রমশ আমি আমার শক্তি ও মহিমা হারিয়ে ফেলছি আবার। আমি আবার তাস খেলায় হারতে লাগলুম, অল্প মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলুম, রাস্তা পার হতে গিয়ে প্রায়ই চাপা পড়ার উপক্রম, যেসব সামান্য লোকেরা আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস করে নি, তারা অনায়াসে এসে আমাকে অপমান করে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলুম, মনীষার ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

তারপর, এর সাড়ে চার মাস বাদে, মনীষার সঙ্গে আমার হঠাৎ একা দেখা হয়ে গেল। সন্ধেবেলা একা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরোচ্ছি, পেছন থেকে মনীষা আমায় ডাকলো। মনীষাও লাইব্রেরিতে ছিল। আমি শান্তভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কখন এসেছো ? ও বললো, সেই কখন এসেছি। দুপুর তিনটে থেকে ! আমার ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। এতক্ষণ একই সঙ্গে আমরা দু'জনেই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিলাম, অথচ আমি ওকে দেখি নি ! এখন বেরুবার মুখে নিশ্চয়ই অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, হয় ওর চেনা অথবা আমার, তারা আর সঙ্গ ছাড়বে না। আমার দারুণ ইচ্ছে হলো, কোনো একটা অলৌকিক উপায়ে আমরা দু'জনে

এখান থেকে একসঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাই।

অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হলো না। আমি মনীষাকে বললুম, তুমি এখন বাড়ি যাবে তো ?

— হুঁ। আপনি বুঝি এখন আড্ডা মারতে যাবেন আবার। চলুন, আমাকে বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিন অন্তত !

— আমার কোথাও যাবার কথা নেই। চলো, ময়দান দিয়ে এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটে যাই। তারপর তোমায় ওখান থেকে বাসে তুলে দেবো। তাই যাবো ? আজ তো গরম নেই ?

— ভারি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আজ, না ? লাইব্রেরির ভেতরটা এমন গুমোট !

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে চললুম দু'জনে। সাড়ে চার মাস ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তা নিয়ে মনীষা একটি কথাও বললো না। অথচ, আমি প্রতিদিন ওর কথা ভেবেছি। মনীষার প্রতিটি ভঙ্গি ও কথা স্বাভাবিক, দেখলে মনে হয় যেন ও আমার দেখা পেয়ে খুশিই হয়েছে। হাসুক বা না হাসুক, মনীষার নিচের ঠোঁট সবসময় হাসিতে টুসটুসে, পরিচ্ছন্ন মুখে চাঁদের আলো পড়ে কিছুটা রং বদলে দিয়েছে, হালকা মেরুন রঙা সিল্কের শাড়ি পরা, যেন মনে হয় শাড়িটা ওর শরীরে সম্পূর্ণ আলাদা, শরীর জড়িয়ে আছে অথচ শরীর ছুঁয়ে নেই। দুই ভুরুর মাঝখানে লাল টিপ, ঠিক মাঝখানে নয়, একটু বেঁকে আছে। হাঁটছে খানিকটা উচ্ছলভাবে, মাঝে মাঝে হাতের ছোট্ট ব্যাগটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে। আমি বললুম, মনীষা, তোমার হাতটা দেখি।

বিনা দ্বিধায় একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মনীষা বললো, দেখুন, কী রকম হাতটা ঘেমেছে। আমার ভীষণ হাত ঘামে।

আমি হাতটা নিয়ে নাকে গন্ধ শুকলাম। তোমার হাতে চুলের তেলের গন্ধ। চুলে কী তেল মেখেছো ?

মনীষা সাধারণত খোঁপা বাঁধে না, হাত দিয়ে চুলের গুচ্ছটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, গন্ধ শুঁকে দেখুন না। স্রেফ নারকোল তেল।

আমি দু'মুঠিতে ওর চুলের গুচ্ছ নিয়ে তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলাম। রাস্তার যে যা ইচ্ছে দেখুক। বললুম, তোমার চুলেও একটা সুন্দর গন্ধ। চুলের নিজস্ব গন্ধ।

কুলকুল করে হাসতে হাসতে ও বললো, তাই নাকি ? সবার নাকে অবশ্য এসব গন্ধ পাওয়া যায় না। আমি তো এখন একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ পাচ্ছি।

— মোটেই কোনো পচা গন্ধ নেই।

— নিশ্চয়ই আছে। রাস্তার পাশে কোনো বেড়াল বা কুকুর মরে পচে আছে কোথাও। ওই যে, ওই দেখুন।

সত্যিই, রেসকোর্সের পাশে একটা মরা বেড়াল বা কুকুর পড়ে আছে। বোধহয় দিন-দুয়েক আগে গাড়ি চাপা পড়েছিল, পেটের কাছটা ছিন্নভিন্ন, চোখ দুটো নেই—দিনের বেলায় কাকেরা যতখানি সম্ভব ঠুকরে খেয়ে রেখে গেছে আগামীকালের জন্য। সেই বীভৎস দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এখন ঐ জিনিসটা না দেখলে কি চলতো না ? কেন যে এসব চোখে পড়ে। আর কোনো কথা নেই কিছুক্ষণ। হাত ধরে দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে গেলাম খানিকটা। তারপর বললাম, মনীষা, তুমি এত অহঙ্কারী কেন ?

—বাঃ আপনার কাছে আবার কী অহঙ্কার দেখালুম !

—তুমি আমার সঙ্গে কথাই বলতে চাও না। আমার সঙ্গে দেখাই করতে চাও না। আমি তোমাকে—

—এই তো দেখা হলো। আপনারাই সব কোথায় কোথায় থাকেন।

—'আপনারাই' কেন ? শুধু আমার কথা জিজ্ঞেস করতে পারো না ?

—ওঃ, আপনারই তো অহঙ্কার দেখছি বেশি। শুনলুম, তাপসদার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যে ?

—হ্যাঁ।

—দেখলেন, আমাদের নেমন্তন্নও করলো না। আপনার বিয়েতে করবেন কিন্তু, তখন আবার বাদ দেবেন না !

— তোমার বিয়ে কবে হচ্ছে ?

— তাই তো ভাবছি ! আমার আর সে সুদিন কি আসবে ? —বলেই মনীষা আবার হাসলো।

আমিও খানিকটা হেসে বললুম, মনীষা, আমার দিকে তোমার চেয়ে দেখতেই ইচ্ছে করে না, না ?

মনীষা সম্পূর্ণ মুখ ঘুরিয়ে বললো, এই তো দেখছি। আহা, এমন সুন্দর চেহারা আপনার, না তাকিয়ে পারি ? চলুন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গিয়ে কুলপীমালাই খাই।

—মনীষা, অনেকদিন থেকেই তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

—এতগুলো কথা বলছেন, আবার আর একটা কথা ? চলুন না, কুলপীমালাই খাই।

—খাবো। তার আগে—

—তার আগে কেন ? পরে হয় না ! কী এমন কথা ? মাঝে-মাঝে এমন ছেলেমানুষি করেন আপনারা ?

—আবার 'আপনারা' ? আজ শুধু আমার নিজের কথা।

—কী স্বার্থপর আপনি ! চলুন, ঐ যে ঐ বুড়োর কাছে।

কুলপীপর্ব শেষ হলো সংক্ষেপে। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, এই সুযোগে আমি সিগারেট কিনে নিলাম। ডানদিক দিয়ে না গিয়ে, বললুম, চলো, রেড রোড ধরে যাই। সুন্দর রাস্তাটা।

আবছা অন্ধকারের রেড রোড। সট সট গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া মুখ থেকে বার না করতেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো হাওয়া। আমরা হাওয়ার বিপরীত দিকে যাচ্ছি বলে মনীষার শরীরের সবক'টি নিখুঁত রেখা ও আয়তন আমার চোখে পড়ে। আমি পাশাপাশি চোখে মনীষার গ্রীবা ও স্তন এবং উরুর দু'ভাঁজ দেখে নিয়ে ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে এসে ওর পশ্চাৎ শরীরটাতেও চোখ বুলিয়ে নিই। আর যাই হোক, মনীষাকে ত্রুটিহীন রূপসী বলা যাবে না, কোমরটা আরও আরও সরু হওয়া উচিত ছিল। তম্বুরা দু'টি তেমন গুরু নয়। চুলের গুচ্ছও কম চওড়া। কিন্তু দু'একটা ত্রুটি না থাকলে রূপ কখনো মোহিনী হয় না। মনীষার বাঁ চোখের পাশে একটা কাটা দাগ আছে, আমার বারবার ঐ কাটা দাগটায় চুমু খেতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ওর মুখের ঐ কাটা দাগের ছাপ আমার মুখে তুলে নিতে। মনীষার মুখখানাই দেখার জন্য আমি আবার পাশাপাশি এগিয়ে এলাম।

হাত তুলে উড়ন্ত চুল সামলাবার চেষ্টা করে মনীষা বলেছিল, আঃ, আজ এত ভালো লাগছে হাঁটতে। কী সুন্দর রাস্তাটা, এ রাস্তা দিয়ে সবসময় আমরা গাড়িতেই যাই, কিন্তু হেঁটে যেতেই তো বেশি ভালো লাগে। আপনার লাগে না ?

— হুঁ। কিন্তু আজ একটু বেশি হাওয়া। কথা বলতে গেলে জোরে জোরে বলতে হয়।

— কথা না বললেই হয়। চুপচাপ হাঁটতেই বেশি ভালো লাগে।

— কিন্তু তোমাকে যে একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতেই হবে। দেখি তোমার হাতটা দাও।

— জানেন, হাজারীবাগে একটা রাস্তা আছে, অদ্ভুত ভালো। দু'পাশে গভীর জঙ্গল, মাঝখান

দিয়ে টানা ঢেউ খেলানো রাস্তা। সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কারুর কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ঐ জায়গাটাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নির্জন। আমরা চার–পাঁচজন ছিলুম, আমার বন্ধু রত্নার বর, আর তার দু'জন বন্ধুও ছিল, কিন্তু কেউ আমরা সেই রাস্তায় একটাও কথা বলি নি। জানেনই তো আমি একটু বেশি কথা বলি, আমি পর্যন্ত চুপ। আধঘণ্টা ধরে শুধু আমাদের জুতোর শব্দ।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, মনীষা, মাঠের মধ্যে গিয়ে একটু বসবে ?

—না। দেরি করতে পারবো না আর। এবার ফিরতে হবে, চলুন বাসে উঠি।

—এসো, তা হলে এখানে একটু দাঁড়াই।

—রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমার দাঁড়াতেও ভালো লাগে না। হেঁটে যেতেই ভালো লাগে।

কিন্তু মনীষার হাত আমার হাতে ধরা ছিল, তাই দাঁড়িয়ে রইলুম। একটা বিশাল রেনট্রি গাছের নিচে। আমার ঠোঁটের কাছটা তেতো লাগছে, সমস্ত শরীরভরা অপমান। কোনো ভাষা নেই, মানুষ যা চায় তা দুম করে বলে ফেলতে পারে না কেন ? এরকম অসুবিধের মধ্যে আর কখনো পড়ি নি। একবার ইচ্ছে হলো ওকে জিজ্ঞেস করি, আমি তোমাকে ভালবেসে শান্তি পেতে চাই, তুমি আমাকে শান্তি দিতে চাও কি চাও না, এক কথায় সাফ উত্তর দিয়ে দাও !

কিন্তু জানি, যা মেয়ে, এ কথায় খিলখিল করে হেসে উঠবে। পাজী, মেয়েগুলো সব ক'টাই এক একটা পেজোমির ডিপো। আমার দ্বারা এদের ট্যাকল করা বোধহয় সম্ভবই নয়। আমি একটু অধীরভাবে বললুম, মনীষা, আমার সঙ্গে এখানে একটু দাঁড়াতে তোমার ভালো লাগছে না ?

— কেন লাগবে না ! খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এবার বাড়ি ফিরতে হবে যে।

— একটু দেরিতে কি ক্ষতি হবে ? মনীষা, তুমি আমাকে ভয় পাও ? সত্যি সশব্দে হেসে উঠে মনীষা বললো, কেন, ভয় পাবো কেন ? আপনি আজ এত বোকা–বোকা কথা বলছেন কেন ? কী হয়েছে আপনার ?

— কিচ্ছু হয় নি। আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই—

— এই তো কাছে আছি, আরও কাছে আসবো ? এই তো এলাম, এবার বাড়ি চলুন লক্ষ্মীটি।

— তুমি কি কিচ্ছু বুঝতে পারো না ?

— না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না। এই রাতদুপুরে আপনাকে বোঝাতেও হবে না।

আমার ধৈর্যের সেখানেই শেষ। আমার ভালো হওয়ার চেষ্টার সেখানেই শেষ। আমার পথ বদলাবার চেষ্টারও সেখানেই শেষ। প্রায় একটা হ্যাঁচকা টানে আমি মনীষাকে টেনে এনেছিলাম আমার বুকের ওপরে। এত জোরে যে, ওর মাথায় আমার থুতনি ঠুকে যায়। দানবের শক্তিতে আমি ওকে আঁকড়ে ধরলুম, একটা হাত ওর পিঠে, এমন দৃঢ় যে ওর নরম পিঠে যেন আমার পাঁচটি আঙুল বসে যাচ্ছে, মটমট করে এখুনি ভেঙে যাবে ওর পাঁজরা, অন্য হাতে আমি জোর করে মনীষার মুখটা তুলে, মনীষা প্রথমে ঠোঁট খুলতে চায় নি, কিন্তু আমি বুলডোজার চালানোর মতো দুই ঠোঁটে, যতক্ষণ না আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল—ততক্ষণ চুমু খেয়েছিলাম। দেখা যাক, এই ভাষা ও বোঝে কিনা।

আমি ছেড়ে দিতে, শাড়ির আঁচল দিয়ে মনীষা প্রথমে ঠোঁট ও পরে সমস্ত মুখ মুছলো। তারপর খুব শান্তভাবে বললো, ছিঃ, কেন এরকম পাগলামি করলেন ? আমার তখন উত্তর দেবার ইচ্ছে নেই। আমি তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছি, চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে, মনীষা যে দাঁড়িয়ে আছে, ওর যেন কোনো পটভূমিকা নেই, কেননা, আমি দূরের গাছপালা অন্ধকার বা আকাশ কিছুই দেখতে পাই নি, আমি শুধু মনীষাকে দেখেছিলাম। ওর সেই ক্ষীণ মূর্তি যেন মাটি স্পর্শ করেও আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়েছে। আমি আবার চুমু খাবার জন্য ওকে টানতে যেতেই মনীষা দ্রুত হাত তুলে,

ওর নিজের নয়, আমার ঠোঁট চাপা দিল। ওর নরম হাতের চাপে আমার ঠোঁট বন্ধ। কাতর গলায় বললো, আপনাকে আমি আর পাগলামি করতে দেবো না। দেখবেন, পরে এজন্য আপনার নিজেরই কষ্ট হবে।

— আমার এখনই যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন ?

— আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি ? তা হলে না জেনে দিয়েছি। সত্যি, আমি কী কষ্ট দিলাম আপনাকে ?

তখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমার সবকিছু উল্টোপাল্টা, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। চরমভাবে হেরে যাবার সময় সব মানুষই কাপুরুষ হয়ে যায়। আমি কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললাম, তুমি কিছু বুঝতে পারো না, না, ন্যাকা ? বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনীষার ফর্সা গালে আমি থাপ্পড় কষিয়েছি। এত জোরে মারার হয়তো আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু থাপ্পড় মারার ইচ্ছে হবার মত ইচ্ছেই তো কখনো হয় নি আগে। আমি খর চোখে মনীষার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মনীষাও আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। একটুও রাগ নেই মুখে, চোখ দুটি এমন স্নিগ্ধ যে মনে হয় চোখ থেকে আলো বেরুচ্ছে। না, আলো–টালো নয়, এখুনি হয়তো ওর চোখে জল আসবে। আস্তে আস্তে বললো, আপনি সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? আপনি এত ছেলেমানুষ তা তো জানতুম না। এতো জোরে কেউ কারুকে মারে ? সত্যি খুব লেগেছে।

—মনীষা, আমার দোষটা কি ? আমার কিসে অযোগ্যতা ?

—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লুম দেখছি। আপনার দোষের কথা আমি বলেছি ? আমি শুধু বললুম, আপনি ছেলেমানুষি করছেন।

—তুমি সব কথা এড়িয়ে যাচ্ছো। আমাকে জানতেই হবে আমার অযোগ্যতার কারণ। তুমি আমার উত্তর দাও।

—আমি আর কোনো কথা শুনবোও না, উত্তরও দেবো না। আমি এবার বাড়ি যাবো। তা বলে, আপনি যে রাগ করে আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে একা ফেলে যাবেন, তা হবে না কিন্তু। আমাকে বাস–রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হবে।

মনীষা আলতো করে আমার হাত ধরে অনুনয়ের স্বরে বললো, চলুন, চলুন না লক্ষ্মীটি ! মিছিমিছি আপনি আমার ওপর রাগ করছেন।

কী ধাতুতে গড়া এ জিনিস ? মেয়ে না ডাকিনী ? এই চব্বিশ বছরের শরীরবাহী জীবন নিয়ে ও কি চায় ? মনীষার শরীর তো ঠাণ্ডা নয়, আমি ওর বুক ছুঁয়ে দেখেছি, শীতকালের বিড়ালের মতন ওর বুক নরম ও গরম। দোলের দিন আচমকা আমি ওর বুক ছুঁয়ে দেবার পর, ওর মুখের রেখায় কোনো লজ্জা ছিল না, কিন্তু ওর উদ্যত বুক লজ্জা ও আবেগ অনুভব করেছিল, আমি সেই মুহূর্তেই টের পেয়েছি। আজ চুমু খাবার সময়ও আমি ওর তপ্ত জিভ ছুঁতে পেরেছিলাম। তবু কেন এমন স্পৃহাহীন ভঙ্গিতে আমাকে আজ নিরুত্তর করলো ! আমাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত করে ওর কিসের আনন্দ ? এইটুকু একটা পুঁচকে মেয়ে মুঠোর মধ্যে টিপে ধরলে কোথায় যায় তার ঠিক নেই, অথচ আমাকে এমন অসহায় ও নির্বোধ করে দিতে পারে ! আসলে সব মেয়েই কি তবে কালীপ্রতিমা হতে চায় ! গলায় নরমুণ্ডের মালা না পরতে পারলে সুখ নেই। কয়েকটি পুরুষের ছিন্নমুণ্ডের মালা। দেখি, দেখি, ঐ তো মনীষা ওর গলায় হায়দ্রাবাদ থেকে কেনা পাথরের মালা পরেছে, ওর বদলে বুঝি মুণ্ডমালা চাই !

নীরবে মনীষার সঙ্গে আমি ময়দানের বাকি পথটুকু হেঁটে এলাম। হঠাৎ আমার কি রকম অনুতাপ হলো, আহা, ওর মতন একটা হাসিখুশি মেয়েকে কেন আমার চুপ করিয়ে দিতে হলো। কিন্তু আমার কোথায় দোষ, কোথায় ভুল—কিছুতেই যে বুঝতে পারি না। আমি চেয়েছিলাম

একটি মেয়ের ভেতর থেকে একটি মেয়েকে বার করে আনতে। পারলুম না, কি করে আনতে হয় জানি না, কিন্তু একথা স্পষ্ট জানি, হৃদয়–ফিদয় নয়, একটি মেয়ের ভিতরের মেয়েটিকে না দেখতে পেরে আমার চলবে না। এবং সে না দেখালে ঐ রূপ আমি কোনোদিন দেখতে পাবো না ! মধুপুরে একটা ফুলবন্ত শিরীষ গাছ দেখে আমার ভালো লেগেছিল, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই গাছটির মধ্যে একটি নারীর সৌন্দর্য আছে। দুটো ফুটফুটে কুকুরের বাচ্চাকে খেলা করতে দেখেছিলাম একবার, সেই চমৎকার দৃশ্যটির মধ্যেও ছিল একটি নারীর রূপ। এমন কি একটা বিছানার চাদরের অভিনব ডিজাইন দেখেও একটি রমণী রূপের আভা পাই, যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখেছি তার মধ্য থেকেই একটা সর্বজনীন নারী বেরিয়ে আসে। আর, একটা নারীর মধ্যে আমি সেই নারীকে পাবো না ? এখনো পাই নি, মনীষাকে পাওয়া হলো না।

মনীষার সঙ্গে তার পরেও দেখা হয়েছে, কোনো অভিযোগ করে নি, ব্যবহার আড়ষ্ট করে নি, কিন্তু সামান্য দূরত্ব রেখেছে। মনীষার রহস্য জানতে আমার আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। কিন্তু মনীষার সঙ্গে একা দেখা করার ইচ্ছে আমার আর হয় নি। তবে মনীষার সেই সন্ধেবেলার ব্যবহারের পর, আমার অভিমানপ্রসূত ক্রোধ দীর্ঘদিন ছিল, পরবর্তী তিন চার মাস আমি মেয়েদের প্রতি প্রতারক ও নৃশংস হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, শরীর ছেনে কিংবা শরীর ছিঁড়ে বোধহয় শরীরের রহস্য জানা যাবে। কিন্তু কোথায় রহস্য, শরীর মানে শুধুই শরীর, শুধু শরীরটাকেও মাঝে মাঝে ভোগ করতে মন্দ লাগে না, হাতের কাছে অন্য একটা শরীর পেতে ইচ্ছে করে, হাত তখন সেই শরীরের নানা সংস্থান দেখে নিতে চায়, বেশ লাগে, তখন নিজের প্রতিটি অঙ্গ অন্য প্রতি অঙ্গের সঙ্গে জুড়ে যায়, কিন্তু কখনো তো লোভ জাগে না। মন তো বলে না, আমি তাকে সম্পূর্ণ দেখেছি, তার রূপ আমাকে তিরস্কার না করে, পবিত্র হতে বলেছে ? মানুষ কেন অমন শীতের মধ্যেও অত ভোরবেলা উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যায় ? বেশি কথা কি আমি অকপটে বলতে পারি, আমি টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট নারী–সৌন্দর্য দেখেছিলাম, কিন্তু কোনো নারীর মধ্যে সেই সূর্যোদয়ের শোভা দেখে যাবার জন্য আমার এখনও লোভ।

দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরোই নি। অনেকদিন পর, কিছুটা পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটলো। বড়দি মা আর বাবাকে সেজ কাকার বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। শোকের বাড়ি, কিন্তু একটা ছোট উৎসবেরও ভাব আছে। দিদির ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর দাদু–দিদিমাকে পেয়ে খুব ছুটোছুটি দৌরাত্ম্য শুরু করে দিল, ওদের আর কে বারণ করবে। মা প্রথম দিকটায় খুব কান্নাকাটি করছিল, কিন্তু এরই মধ্যে এক সময় কান্না থামিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোর থুতনিতে কাটলো কী করে ?

আমি বললুম, দিদির বাথরুমটা যা হড়হড়ে হয়ে আছে। পা–পিছলে—

মা বললো, শোন, এদিকে আয়, আমার কাছে এসে বোস একটু।

মায়ের চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, শুধু রোগা নয়, চামড়াগুলো যেন শরীরের থেকে আলগা। বললুম, বৌদি তোমার যত্ন করে না বুঝি ? তোমার শরীর এত খারাপ হলো কী করে?

—যত্ন করবে না কেন ? সরমা একেবারে লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কবে ওসব করবি ? লোকে আমাদের নিন্দে করে। আমরা তোর জন্য কোনো ব্যবস্থা করলুম না। বাবা যদি তোর বউয়ের মুখ দেখে যেতে পারতেন।

—তোমার বাবার সঙ্গে আমারই আর দেখা হলো না, আর আমার বউয়ের মুখ।

—একবারও গেলি না হাসপাতালে ? তোকে এত ভালবাসতেন।

—আমিও ওঁকে খুব ভালবাসতুম। এখনও বাসি। কিন্তু মা, আমার হাসপাতালে যেতে একেবারে ভালো লাগে না। কতদিন যাবো ভেবেছি, কিন্তু হাসপাতালের মুখ পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এসেছি। অসুখ দেখতে আমার ইচ্ছে করে না।

—আমার অসুখ হলেও তুই দেখতে যাবি না, না ? কবে একদিন মরে যাবো, জানতেও পারবি না।

— ও কি কথা ! আমি তা বলছি নাকি ? হাসপাতালে গেলে শুধু তো নিজের লোকই নয়, আরও অনেক অসুস্থ লোকও যে চোখে পড়ে।

—তোর শরীর ভালো আছে ?

বড়দি সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিল, বলে উঠলো, ওর কথা আর বলো না, মা। যা কাণ্ড করে বেড়ায়, শরীরের কথা ভাবে নাকি ? তবু তো চোখের সামনে রেখেছি।

আমি বললুম, একেবারে বিশ্বাস করো না, মা ! আমি খুব ভালো আছি ! আমার জন্য একদম ভেবো না। আমিই বরং তোমাদের জন্য ভাবি।

—আমাদের জন্য তোকে আর ভাবতে হবে না। তা যদি সত্যিই ভাবতিস, তাহলে তো আজ কথা ছিল না।

—মা, তুমি কিছুদিন এখানে থেকে শরীরটা সারিয়ে যাও। আমার এক বন্ধু আছে চোখের ডাক্তার, খুব ভালো ডাক্তার, তাকে দিয়ে তোমার চোখটা দেখিয়ে দেবো এবার।

—আমি সোমবারই বহরমপুর যাবো। সরমার বাচ্চা হবে, ওকে একা ফেলে রেখে এসেছি।

—এই এক বছরের মধ্যে আবার বাচ্চা ?

মা হঠাৎ শিউরে উঠে বললো, জানিস খুকী, গায়ত্রীর কথা শুনেছিস্ ? ঐ যে মুখুজ্যেদের বাড়ির গায়ত্রী ? ছ' মাসের পোয়াতি মেয়েটা, এই সেদিন পাড়াসুদ্ধ সবাইকে সাধের নেমন্তন্ন খাওয়ালো, তার ক'দিন পরেই কি সর্বনাশ হয়ে গেল ! ওর বর অপরেশ মারা গেছে গত মাসে!

দিদি বিষম চমকে বললো, ওমা, সে কী কথা ! ইস্—মাত্র দেড় বছর বিয়ে হয়েছিল ! কিসে মরলো ?

— পেটে কি যেন হয়েছিল, অপারেশন করাতে গিয়ে—। এদিকে গায়ত্রীর এখন সাত মাস চলছে। আহা, কি ভাগ্য মেয়েটার—দিদি আর মা গায়ত্রীর ব্যাপার নিয়ে খুব শোক করতে লাগলো। আমি গায়ত্রীকে কখনো সিঁদুর পরা অবস্থাতেই দেখি নি, সুতরাং ওর কপাল থেকে সিঁদুর মোছার দৃশ্যটা কল্পনা করা শক্ত হলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, অপরেশ কোন্ বাড়ির ছেলে ? গায়ত্রী নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছিল ?

—না, ওর বাড়ির লোকেরাই বিয়ে দিয়েছিল। নতুন স্টেশন মাস্টারের ছেলে। বেশ ভালো ছেলে, স্বাস্থ্য ছিল কী—আমাদের শম্ভুর মতন—এ-ই রকম ! পেচ্ছাপের কষ্ট ছিল শুনেছি—তাই পেটে অপারেশান করাতে গিয়েছিল। আহা, মেয়েটার কপাল ! এই বয়েস, তাও পেটে সন্তান।

বড়দি বললো, তোমরা ছটকু'র সঙ্গে গায়ত্রীর বিয়ে দিতে চেয়েছিলে না ?

মা শিউরে উঠে বললো, কি ভাগ্য যে হয় নি। ও মেয়ের যা অলক্ষুণে কপাল—

বড়দি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আহা, ওর দোষ দিচ্ছো কেন শুধু শুধু ? অপরেশের নিজের কপালেই মৃত্যু থাকতে পারে না ? ছটকু'র সঙ্গে বিয়ে হলে ওর ভাগ্যটা হয়তো বদলে যেত।

আমি ছোট হেসে বললাম, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে গায়ত্রী নিজেই মরে যেতো তাড়াতাড়ি!

—দূর ! অমন নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস কেন ?

—সত্যি বলছি। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছে আমার বিয়ের এক বছরের মধ্যে বউ মরে যাবে—যদি আমি তিরিশ বছরের আগে বিয়ে করি !

দিদি অর্ধেক অবিশ্বাসময় চোখ তুলে বললো, বাজে জ্যোতিষী ! মা বললো, তোর কোষ্ঠী আছে আমার কাছে, আমি জানি না ? তুই আমাকে বাজে কথা শোনাবি ?

জেলখানার পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বিকেলবেলায় গায়ত্রী অপরেশকে বলতে পারে নি যে, ও বিয়ে করতে চায় না ? অপরেশের দিকে করুণ চোখ তুলে ও বলতে পারে নি, বিয়ে না করেও ও অনেক কিছু জানতে চায় ? গায়ত্রীর শখ ছিল পড়াশুনো করতে বিলেত যাবে। বাংলাদেশের মফস্বল শহরের উকিলের মেয়ে হয়ে কী উদ্ভট শখ ! এখন সাদা শাড়ি পরে সকালের ইস্কুলে মাস্টারি করুক। পেটের সন্তানটি যদি না বাঁচে, আর নিরামিষ খেয়ে যদি চেহারাটা নষ্ট না হয়, তবে ভবিষ্যতে কোনো আদর্শবাদী পাঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে ওর আবার বিয়ে হলেও হতে পারে। গায়ত্রীর জন্য আমার দুঃখিত হওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝতে পারলুম না। ওর এখনকার মুখ তো আমি দেখি নি, ওর বিষণ্ন মুখ দেখলে হয়তো আমিও প্রবল অসুস্থতা বোধ করতুম। কিন্তু গায়ত্রীর বিষণ্ন মুখ দেখতে আমি আর বহরমপুরে যাবো না।

বাবাকে নিয়ে আর একটা মুশকিল হলো। দিদি এমন কাণ্ড করে ! বাড়িতে আর জায়গা নেই বলে বড়দি আমার ঘরেই আর একটা খাট পেতে সেখানে বাবার শোবার ব্যবস্থা করেছে। বয়স্ক ছেলে আর বাবা কখনো একঘরে শোয় নাকি ? সিগারেট-টিগারেট খাবার অসুবিধে, নানান ঝামেলা। আমি বড়দির কাছে সামান্য আপত্তি করেছিলুম, শোনে নি; আমি যদি এই নিয়ে চেঁচামেচি করতুম তা হলে তার মানে এই হতো, আমি বাবাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি না ! ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যাপারই নয়, বাবার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই কম কথা বলি। চার পাঁচ বছর একেবারে কথাই বলা হয় নি, এখন তাঁর সঙ্গে এক ঘরে শোবার মধ্যে কী যে অস্বস্তি তা বলা যায় না। অথচ এই সময়টা বাড়ির বাইরে রাত কাটানোও খারাপ দেখাবে নিশ্চিত। আমি এখন নিজের ঘরে পারতপক্ষে ঢুকি না, বাড়ির মধ্যে মেয়েদের কাছে, কিংবা বড়দির ছেলেমেয়ের সঙ্গে ক্যারাম খেলে সময় কাটাই। রাত্তিরবেলা কোনোক্রমে ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ি।

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে না, অন্ধকারের মধ্যে আমি বাবার খাটের দিকে তাকিয়ে দেখি। এত গরম সারা রাত পাখা চালাতে হয়, এর মধ্যেও বাবা গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শুতে ভালবাসেন। ওঁরও ঘুম আসে না, ঘুম খুব কমে গেছে মনে হয়, কোনো এক সময় রাত্তিরে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরান। অন্ধকারে সিগারেটের মাঝে মাঝে টানের লালচে আভায় আমি ওঁর অস্পষ্ট মুখ দেখতে পাই।

এর মধ্যে দু'একটা কথা হয়েছে বাবার সঙ্গে। প্রথমদিন রাত্তিরে আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সারারাত পাখা চললে আপনার অসুবিধে হবে ? তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি যে আগের চাকরি ছেড়ে রমেশের এখানে চাকরি নিলে—আত্মীয়স্বজনের অফিসে চাকরি করা ভালো ?

আমি তখন টেবিলে বইগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে না ফিরেই বললাম, এই, বড়দি খুব জোর করতে লাগলো ... মাইনে বেশি—

—তবু সরকারি চাকরিতে একটা স্থায়িত্ব ছিল। লোকে সহজে গভর্নমেন্ট সার্ভিস পায় না।

একথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি মুখে একটা অস্পষ্ট শব্দ করেছিলাম শুধু।

বাবার মাথার চুল প্রায় সবই পেকে গেছে, রিটায়ার করেছেন প্রায় পাঁচ-ছ' বছর, শীর্ণ চেহারা, দু-তিনদিন দাড়ি কামান নি বলে আরও রোগা লাগছে মুখটা। অনেক রাত্তিরে বিছানায় উঠে বসে যখন চাদরমুড়ি দিয়ে সিগারেট খেতে থাকেন—তখন সেই ভঙ্গির মধ্যে কী রকম

যেন একটা অসহায়তার ছবি দেখতে পাই। এ পাশের খাটে অন্ধকারের মধ্যে আমি চোখ খুলে শুয়ে আছি। হঠাৎ বাবাকে খুব নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত মনে হয়। হঠাৎ আমার আন্তরিক ইচ্ছে হয়, উঠে বসে আমি বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ মন খুলে কথা বলি। ঐ আমার জনক, অন্ধকারের মধ্যে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনে হয়, ওঁরও আমাকে কিছু বলার আছে। নিজের শরীরে এর মধ্যে কি দু'একবার মৃত্যুকে টের পান নি ? পেয়েছেন নিশ্চিন্ত, এখন শেষবারের মতন নিজের বংশধরকে কোনো গূঢ় কথা বলার থাকে না ! বাবার সম্পর্কে আমার সমস্ত রাগ অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে যে ভাবটা আসে, তাকে করুণা বললে কি ভুল বলা হবে ? ওঁকে মনে হয় খুবই অসহায়, আমার হাতখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ওঁর অসুখ করলে আমি কপালে জলপট্টি লাগিয়ে বহুক্ষণ চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে চাই। মাঝে মাঝে বাবা কাশতে থাকেন, ঘঙ ঘঙ করে কাশির শব্দ হয়, বুকের মধ্যে যেন অসংখ্য জাল, তারপর থুক থুক করে অনেকক্ষণ থুতু ফেলেন পাশের ডাবরে। আমার ইচ্ছে করে, উঠে হাত দিয়ে ওঁর মুখের থুতু মুছে দিই। হাত দিয়ে ওঁর থুতু ছোঁয়ার কথা ভেবেও এখন আমার একটুও ঘৃণা জাগে না। ওঁকে দু'একটা ভরসার কথা শোনাতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু কি করে কথা শুরু করবো বুঝতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই তো বাবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতে শিখিই নি। অন্ধকারে দু'জন মানুষ রক্তের সম্পর্কে সবচেয়ে আপন, অথচ কথা বলার ভাষাই জানি না। কিছুই বলা হয় না। আমি চুপ করে জেগে সিগারেটের লাল আলোয় বাবার অস্পষ্ট মুখ দেখি।

৫

কয়েকদিন পর অফিসে গিয়ে দেখলুম, আমার টেবিলে একটা কাগজ চাপা দেওয়া আছে। গতকাল শেখর আমাকে টেলিফোন করেছিল, আমি এলেই যেন ওর সঙ্গে পাঁচ নম্বর বাড়িতে দেখা করি।

শেখর নিরুদ্দেশ থেকে ফিরেছে তা হলে ? পাঁচ নম্বর বাড়িতে এখন কে যাবে। ওসব জায়গায় যেতে আমার এখন একটুও ভালো লাগে না। দেখা যাক কি ব্যাপারটা, ভেবে আমি ওর অফিসে টেলিফোন করলুম। শেখর অফিসে নেই, গত পাঁচদিন ধরেই আসে নি, আরও তিন সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছে নাকি। কলকাতায় আছে, অথচ অফিসে যাচ্ছে না কেন ছেলেটা ? আমি শেখরের বাড়িতে ফোন করলুম।

টেলিফোন ধরলো তপতী, তপতীর গলার আওয়াজ পেয়েই শিউরে উঠলুম আমি, তপতী কানে খুব কম শোনে—ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা এক মহাঝঞ্ঝাট। অফিসের টেলিফোনে এখন আমি চেঁচামিচি করবো নাকি ? ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলে বোধহয় মন্দ হয় না, কারণ আমি দেখেছি কালা লোকেরা ইংরেজিটা বেশ ভালো বুঝতে পারে। যাই হোক, আমি গলার আওয়াজ যথাসম্ভব ছুঁচোলো করে জিজ্ঞেস করলুম, শেখর আছে ? ওপাশ থেকে তপতীর গলা ভেসে এলো, হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন ?

—শেখর আছে নাকি ?

—আপনি কে কথা বলছেন ?

—বললেও তো শুনতে পাবে না। নাম বলে আমার লাভটা কি ? অন্য কারুক টেলিফোনটা দাও চটপট।

— সুনীলদা ? গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি। দাদা বাড়ি নেই।

— বাড়ি নেই মানে, এ ক'দিনে একবারও বাড়ি ফেরে নি, না, আজ এখন বাড়ি নেই ? এত বড় সেন্টেন্স আমার পক্ষে, বোঝা ... ঝামেলা।

— দাদা কলকাতার বাইরে গেছে। বলে গেছে সাতদিনের আগে ফিরবে না।

— তুমি কি আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছো নাকি ? দেখা যাক। তপতী, তুমি কেমন আছো?

— আর কিছু বলবেন ? মা'র সঙ্গে কথা বলবেন নাকি ?

— তপতী, তুমি কেমন আছো ?

— মা'র সঙ্গে কথা বলবেন না ? আচ্ছা, আপনি ভালো আছেন তো ?

এরপর আমি মুখে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জরণ তুলে টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। তপতী কি আমার সব কথা শুনতে পেয়েছে নাকি ? সর্বনাশ ! কিন্তু তা কি করে হয়, কালারা তো মুখের দিকে তাকিয়েই অধিকাংশ কথা বোঝে, তা হলে টেলিফোনে কি করে শুনবে ? কে জানে কি ! নাকি আন্দাজে চালিয়ে গেল ?

একটা কথা মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলুম যে সুবিমল আসার আগেই আজ পালাতে হবে। সুবিমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আবার অবিনাশ বা পরীক্ষিৎ বা তাপসের সঙ্গে গিয়ে জড়ো হওয়া, সেখান থেকে হৈ-হল্লা শুরু করা, ওর মধ্যে আজ আমি নেই। শেখরকে খুঁজতে পাঁচ নম্বর বাড়িতেও আমি যাবো না, তা ছাড়া বাড়ির লোক তো শেখরের সন্ধানে নেমেই গেছে, এখন আমার দায়িত্বটা কি ?

অফিসের কতগুলো কাজ নিয়ে চলে গেলাম প্রেসে। ঢোকবার মুখে রিসেপশানিস্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, মিস নাওমি, ছুটি নিয়ে দু'দিন কি করলে ?

মেয়েটা মুচকি হেসে ডান হাত তুলে মধ্যমায় একটা মুক্তো বসানো আংটি দেখালো। আমি বললুম, ও, এনগেজমেন্ট হয়ে গেল বুঝি ? ইস্, বড় দুঃখ পেলাম। ভেবেছিলাম, আমারও একটা চান্স আছে। কংগ্রাটস, এনি ওয়ে।

মেয়েটা হাসি বজায় রেখে বললো, ইউ আর এ ডিয়ার।

খুব মনোযোগ দিয়ে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করলাম প্রেসে। এক একটা লাইন কম্পোজ করিয়ে আনার পর, ঠোঁট উল্টে বললাম, উঁহু এ ফেসটা বাজে ! এটা বদলে এখানে ডবল গ্রেট কম্প্রেসড দিন। আপনাদের আটচল্লিশ পয়েন্টের টাইপ নেই কেন ? নতুন টাইপ আনান, খালি সেই একঘেয়ে পুরোনো দিয়ে—। আহ্ চাইলাম একটা হেয়ার রুল, দিলেন একটা ধ্যাবড়া লাইন ! এ রকম করলে কাজ হয় ! ছবিটা কাট আউট করে ম্যাপের ওপর বসান। এইটুকু কাজে আবার দু'ঘণ্টা লাগাবেন না যেন ?

মাঝে মাঝে এই রকম রুক্ষ গলায় কথা বলা দরকার, যাতে ওরা মনে করে, আমি খুব একটা কাজ জানি। নইলে ওরা বাধ্য থাকবে না, ভাববে আমি শুধু কোম্পানির মালিকের শালা বলেই চাকরি বজায় রেখেছি। তা হলে শুনিয়ে শুনিয়ে আড়াল থেকে টিটকিরি দেবে। আমি ওদের মধ্যে এসে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে বসে থাকি, ভাবখানা এই, যে-কোনো মুহূর্তে ওদের কাজের ভুল ধরে চাকরি খেয়ে দিতে পারি। যদি একবার বুঝে ফেলে, আমি ওদেরই মতন সাধারণ, তাহলে আর নিষ্কৃতি নেই। আর টিকতে দেবে না। হুকুম কিংবা ধমক এই হচ্ছে সব চাকরির মূলমন্ত্র, বেশ জেনে গেছি এখন।

প্রেস থেকে হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা রুমাল কিনে ফেললাম। বেশ বড় সাদা চওড়া রুমাল। রুমালটা দিয়ে একবার ভালো করে মুখ মুছতেই রুমালটা ময়লা হয়ে গেল। মুখে এত ময়লা আসে কোত্থেকে ? আয়নায় যখন দেখি, তখন তো বেশ পরিষ্কার মুখ। রুমালটায়

এমন ছাবড়া ছাবড়া ময়লা ভরে গেল যে ইচ্ছে হলো ফেলে দিই ওটাকে। ময়লা রুমাল পকেটে রাখতে গা ঘিনঘিন করে। অনেকে তো রুমালে সিক্নি মুড়ে সেটাও পকেটে রেখে দেয়। ভাবলে বমি এসে যায়। যাক গে, এ রুমালটার উল্টো পিঠটা আজ অন্তত আর একবার ব্যবহার করা যাবে। আর একবার তো মুখ মুছতে হবেই!

আরও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে আমার হাতে। এর মধ্যে কোনো সিনেমাও দেখা যায় না। আমি একটা ভালো রেস্টুরেন্টে ঢুকে বেশ আরাম করে চা খেতে লাগলুম। চায়ের পর কিছুক্ষণ সিগারেট ধরিয়ে একা বসে থাকতে চমৎকার লাগলো। অনেকদিন এমন ভালো লাগে নি। সন্ধেবেলা একা থাকার মতন দুঃখের সত্যিই আর কিছু নেই। আমি সুবিমলের কথা বুঝি। যারা বিকেলে টিউশানি করে না কিংবা পার্টটাইম প্রেম করে না, যাদের বাড়ির সামনে এমন জমি নেই যে বিকেলে গিয়ে বাগান করবে—বাড়িতে পুরো একটা ঘরই নেই নিজস্ব—সেই সমস্ত লোক বিকেলটা কি করে কাটায় ? খেলাধুলো ? কলকাতায় খেলাধুলো তো একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস! কলকাতায় খেলাধুলো করতে গেলেই খেলোয়াড় হতে হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন যারা খেলে—তারা সবাই স্পোর্টসম্যান হতে চায়, নিছক সময় কাটাবার জন্য এখানে কেউ খেলাধুলো করে না, খেলাধুলো ঐ জন্যই বিচ্ছিরি। সময় কাটাবার একমাত্র খেলা হচ্ছে তাস, তাস খেলতে খেলতেও অনেকে আবার খেলোয়াড় হয়ে গিয়ে কমপিটিশনে নাম দিতে চায়। কমপিটিশনে নাম না দিলে এমনি তাস খেলা একঘেয়ে হয়ে আসে, তখন হয় পয়সা দিয়ে খেলা! পয়সা দিয়ে ফিস কিংবা তিন তাস। বুড়ো না হলে ব্রিজ জমে না, বড্ড মারামারি হয়। অর্থাৎ জুয়া। জুয়ার সঙ্গে মদ। মদের পর আবার ... ওরেব্বাবা! চললো এরপর—

কিন্তু ইচ্ছে করে একা থাকার একটা আরাম আছে। আমি তো অনায়াসেই সুবিমল-অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে হৈ-হল্লা শুরু করে দিতে পারতুম। না গিয়ে, পার্ক স্ট্রিটের দোকানে চায়ের পর একা বসে সিগারেট টানতে বেশ ভালো লাগছে। আজকের সন্ধেটা কিছুটা ভারি ও অবসন্ন। পূর্ণ বিকেলের আগে থেকেই আবছা অন্ধকার হয়ে আছে। এখন আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারি, এমন কি আর্ট একজিবিশান দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

সত্যি সত্যি একটা একজিবিশানেই আমি ঢুকে পড়লুম। দাড়িঅলা লম্বা যে ছেলেটির মুখে তেলতেলে হাসি, ও-ই নিশ্চয়ই আর্টিস্ট। গোটা পঁচিশেক ফ্রেম, কিন্তু ছবি নেই, ফ্রেমের মধ্যে রেখা আর রং। এর মধ্যে সেই সর্বজনীন নারী-সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছি না। যার যার মধ্যে নারী-সৌন্দর্য পাই না, তা আমার সত্যিকারের সুন্দর মনে হয় না। এইজন্যই এত অসংখ্য সুন্দরী নারীকেই সুন্দরী মনে হলো না! একজন একটা স্যুভেনির বিক্রি করতে এলো, এক টাকা দাম। সময় কাটাতে এসেছি, তার জন্য আবার একটা টাকা খরচ কিসের ? না, না, ছবির নাম দেখার আমার দরকার নেই!

যারা দেখতে এসেছে, তাদেরও তো অনেকেরই চেহারা আর্টিস্টের মতন। অর্থাৎ হুড়োকুড়ো মাথা, রুখু দাড়ি, কাঁধে ঝোলা। এদের সঙ্গে অনেক যুবতী মেয়েও আছে। আর্টিস্টদের কাছে অনেক ধনী ঘরের যুবতী দুলালীরাও আসে দেখছি, এই বাংলাদেশেও। কিসের লোভে আসে ? বোধহয় মেয়েদের একটা ক্ষীণ ধারণা আছে যে, আর্টিস্টরাই একমাত্র মেয়েদের রূপের সত্যিকারের মর্ম বুঝতে পারে। মেয়েদের ক্ষণিক রূপকে শাশ্বত করতে পারে একমাত্র আর্টিস্টরাই। যে রূপ চামড়াকে ভর করে আছে, তা দেয়ালে বা পাথরে বা ক্যানভাসে কালজয়ী হয়ে থাকবে। সে গুড়ে বালি ! আর্টিস্টদের কি আর সেদিন আছে ? এখন নগ্ন মেয়েকে মডেল করে সামনে বসিয়ে রেখেও রং আর রেখা নিয়ে হিজিবিজি কাটাকুটি খেলবে। কম্পোজিশান না কি মাথামুণ্ড!

— সুনীল, তুই একা এসেছিস ?

আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলুম। এখানেও চেনা লোকের হাতে ধরা পড়তে হবে ? ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলুম পরীক্ষিৎ, নূরুল আর একটা অ্যামিরিকান ছোকরা। এরও মুখে দাড়ি, ময়লা পোশাক, কাঁধে ঝোলা। নূরুল বললো, আপনার সঙ্গে শেখরবাবুর দেখা হয়েছে ? উনি তো আপনাকে খুব খুঁজছেন।

আমি মুহূর্তে দ্বিধা না করে বললুম, হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ বললো, কখন দেখা হলো ?

— এই তো, আজকেই বিকেল চারটের সময়।

পরীক্ষিৎ গাল কুঁচকে হেসে বললো, শেখরটা কি কাণ্ড করেছে দেখেছিস তো ? ক্ষেপে গেছে একেবারে।

আমি বললুম, সত্যিই! শেখর একেবারে বেপরোয়া! এখানে বাথরুমটা কোথায় রে!

— জানি না। সেদিন তোরা বারীনদার সঙ্গে মারামারি করেছিস কেন ? তোকে নাকি বেধড়ক পেঁদিয়েছে!

— ভাগ! আমি অবিনাশ আর বারীনদার মারামারি ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলুম ...

— যাকগে। তোর ওপর বারীনদার কোনো রাগ নেই। আজ তুই হঠাৎ এখানে একা এসেছিস যে ?

— যে এই ছবিগুলো এঁকেছে, সে হচ্ছে আমার ছোড়দির দেওর। আসতে বলেছিল অনেক করে। চল, তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

— না, থাক, আলাপ করার দরকার নেই। আমরা এখানে এলুম এই সাহেবটার জন্য। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, মিট আওয়ার ফ্রেন্ড স্যান্ডি গ্রোভার। এ ছেলেটা নিজেও একজন আর্টিস্ট, বুঝলি ? শেখরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রথমে।

আমি হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়েছিলুম, ছেলেটা নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করলো। আমি বললুম, গ্ল্যাড টু মিট ইউ। ছেলেটা গম্ভীর গলায় বললো, নমস্কার।

ও, এর মধ্যেই দু'একটা বাংলা শিখে নেওয়া হয়েছে! এরপর প্যান্টালুন ছেড়ে পাজামা ধরবে, বাঁ হাত দিয়ে ভাত খাবে, জানি জানি, ওসব ঢের জানি!

পরীক্ষিৎ বললো, চল, শেখরের কাছে যাবি তো ? স্যান্ডিও যাবে আমাদের সঙ্গে।

আমি প্রফুল্ল মুখে বললুম, কোথায় ? পাঁচ নম্বর বাড়িতে ? আমি যাবো চল, আমার কিছু করার নেই এখন। একটু দাঁড়া, আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। তোরা ততক্ষণ ছবিগুলো দ্যাখ—

হলঘর থেকে বেরিয়ে আমি একটুও দেরি না করে বিদ্যুৎগতিতে সোজা চলে এলাম পার্ক স্ট্রিটে। একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি থামিয়ে চড়ে বসলাম।

এখনও সময় হয় নি। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে আমি গাছটার নিচে একটু দাঁড়ালাম। মেয়েরা কেউ এখনো আসে নি। এখন রাস্তায় লোকজন কম নেই, তবু রাস্তাটা কেমন নীরস। যেই গানের ইস্কুল ছুটি হবে, অমনি রাস্তাটা আলো হয়ে উঠবে। মনে হয় যেন, এই বিশাল গাছটা, দু'পাশের বাড়িগুলো আমারই মতন সেই সময়ের প্রতীক্ষায় আছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে এলো কলবল করে। অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমার চোখ পড়লো না, আজ আমি প্রথমেই যমুনাকে দেখতে পেলাম। আজ একটু বেশি সাজ করে এসেছে, মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, হাতকাটা ব্লাউজ, কচি কলাপাতা রঙের শাড়িটা নিশ্চিত খুব দামি। বেশি সাজে ওর সৌন্দর্য কিছু বৃদ্ধি পায় নি। সৌন্দর্য যার থাকে, তার আর বাড়ে-কমে না, সুন্দরী নারীর মুখে ব্রনো হলেও তা সুন্দর।

আমি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলুম, কখন আমার দিকে যমুনার চোখ পড়ে। মেয়েরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কথা বলে, তবু কে কি কথা অন্যকে শোনাতে চায় কে জানে। ঐ মেয়ে দঙ্গলের মিষ্টি গলার রিনরিনে কোলাহলে রাস্তার সব লোক ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে। যমুনা দল ছেড়ে তাড়াতাড়িই এগিয়ে এলো বাস স্টপের দিকে, এবং ও নিজেই আমাকে প্রথম দেখতে পেলো।— আপনি ? আপনি কখন এসেছেন ?

— এইমাত্র। বাসে চড়ে যাচ্ছিলুম, তোমাকে দেখে নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে আছি।

— আপনি সেদিন এলেন না ?

— কোন্‌দিন ?

— যেদিন দেখা হলো, তারপরের গানের ক্লাশের দিন ?

— আমি তো সেদিনই আসবো বলি নি।

— আপনি বললেন, আপনি পরের দিন আসবেন, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম আপনার জন্য!

— পরের দিনই তো বলি নি। বলেছিলুম, পরে আর একদিন আসবো। তুমি সত্যিই আমার জন্য দাঁড়িয়েছিলে ?

— হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। আমার কি রকম যেন মনে হয়েছিল, আপনি সেদিন আসবেন!

যমুনা আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল— একথা শুনে শরীরটা হঠাৎ জলের মতন নরম হয়ে গেল। ঐটুকু একটা কচি বাচ্চা মেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল, শুনেই বুকের মধ্যে একটা ঝাঁকি লাগলো। কি সুন্দর জড়তাহীন পরিষ্কার কণ্ঠ, বললো, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম! এরকম পরিষ্কার সত্য তো আমি নিজে বলতে পারি না। কেউ পারে না; আর কারুর মুখে শুনি নি। যমুনা ছাড়া পৃথিবীর আর সকলেরই বয়েস বেড়ে গেছে।

আমি বললুম, যমুনা, সত্যিই সেদিন আমার আসার ইচ্ছে ছিল। তোমাকে সেদিন হঠাৎ দেখার পর আমার মনটা এত ভালো লাগছে যে রোজই আমার ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমরা দু'জনে এখন থেকে বন্ধুত্ব পাতালুম, অ্যাঁ ? কেমন ? সেদিন আসতে পারি নি, তার আগের দিন আমার দাদামশাই মারা গেলেন তো, সেইজন্যই।

— ও, তাই বুঝি ? আপনি তবে চামড়ার জুতো পরেছেন কেন ? আপনার অশৌচ না ?

— দাদামশাই মারা গেলে মাত্র তিনদিন অশৌচ হয়। পার হয়ে গেছে! চলো, তোমাতে আমাতে আজ খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি পর্যন্ত যাই। যেতে যেতে অনেক গল্প করবো।

— কিন্তু আজ তো হবে না, আজ দেরি হয়ে যাবে যে!

— কত আর দেরি হবে ?

— না, আজ যে বাড়িসুদ্ধু সবাই নাইট শো'তে সিনেমায় যাচ্ছি। গিয়েই খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। মা বলেছিল, আজ গানের ইস্কুলে আসতে হবে না। কিন্তু আমার যে সামনের মাসে গানের পরীক্ষা।

— ভাগ্যিস এসেছিলে তাই দেখা হলো তোমার সঙ্গে।

— বাঃ, আপনি বুঝি বাড়িতে আসতে পারেন না ? মাকে সেদিন বলেছিলুম আপনার কথা। মা বললো, আবার দেখা হলে আপনাকে একদিন জোর করে বাড়িতে ধরে আনতে। দিদিও বললো আপনাকে নিয়ে যেতে। দিদি জিজ্ঞেস করছিল, দিদিকে আপনার মনে আছে ?

আমি বললুম, তোমার দিদির নাম সরস্বতী তো ? মনে থাকবে না কেন ?

সরস্বতীর মুখটা মনে পড়ে আমার একটু অস্বস্তি লাগলো। এ হচ্ছে সেই ধরনের মুখ যারা নিজেদের সুখ চেয়ে অপরকে কখনো সুখী হতে দেয় না। সরস্বতীকে আমার কখনো তেমন

ভালো লাগে নি। যমুনার দিদি হিসেবে ওকে মানায় না।

যমুনা বললো, আজ চলুন না!

— আজ গিয়ে কি করবো ? আজ তো তোমরা সবাই সিনেমায় যাচ্ছো।

— ও, হ্যাঁ! তাহলে বাড়িতে কবে আসবেন ?

— তোমার গানের ইস্কুল তো আবার পরশু দিন, না ?

— হ্যাঁ। সাড়ে ছ'টা থেকে আটটা। ঐ যে বাস আসছে—

— চলো, আমিও তোমার সঙ্গে বাসে উঠে পড়ি। আমি ঐ দিকেই যাবো।

— আসুন, শিগগির আসুন। যা ভিড়!

সত্যি বাসে বিষম ভিড়। সবসময় যে কেন একদল লোক বাসে উঠে জায়গা দখল করে বসে থাকে বুঝি না। এত ঘোরাঘুরির কি দরকার মানুষের ? অনবরত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় না গেলে বুঝি চলে না ? বাসের ভিড়ের লোকদের দেখে আমার গা জ্বলে গেল। যমুনা কিন্তু ভিড় ঠেলে বেশ তরতর করে উঠে পড়লো। আমি ওকে বললুম, চলো, দোতলায় চলো। সিঁড়ির লোকেরা যমুনাকে পাশ দিতেই, আমিও সেই ফাঁক দিয়ে উঠে গেলুম। সতর্ক ছিলুম, একটা লোকও যদি অসভ্যতা করে যমুনার শরীর ছুঁয়ে দেয়, তবে আমার পেরেক বসানো জুতো দিয়ে তার পা মাড়িয়ে দেবো। দোতলাতেও বসার জায়গা নেই, লেডিজ সিটে একটি মেয়ের পাশে একটি যুবক বসেছিল। যমুনাকে দেখে সে সিট ছেড়ে উঠে আমারই পাশে দাঁড়ালো। আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে বিরক্তভাবে তাকালাম। যমুনার পিঠের কাছে সিটের মাথায় আমার হাত।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে যমুনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি নামবেন না ?

আমি বললুম, না। তুমি নেমে পড়ো। আবার দেখা হবে।

— আসবেন কিন্তু, ঠিক!

তৎক্ষণাৎ একটা পুরো সিট খালি হতেই আমি বসে পড়ে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। যমুনা ছোট লাফ দিয়ে নেমে খানিকটা দৌড়ে গেল। তারপর তাকালো ওপর দিকে। আমাকে দেখতে পেয়ে ফুল ফোটার মতো হাসলো। আমি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাসি ও হাতছানি পাঠিয়ে দিলাম ওর দিকে।

তারপর মনে হলো, এ বাসে আমি অনেকক্ষণ বসে থাকবো। সত্যিই তাই রইলুম। বাস ডিপোতে এসে থামার পরও আমি চুপ করে বসে রইলুম দোতলার জানালায়। সিগারেট ধরিয়ে টানলেও এখন কেউ আপত্তি করবে না। তারপর যখন আবার বাস ছাড়লো, তখন আমার খানিকটা ঘুমের মতন এসে গেছে। খানিকটা তন্দ্রার মধ্যেই বসে থাকা, দীর্ঘযাত্রার পর, বাস থেকে নেমে আমি সোজা বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি ঢোকার মুখে কি সুন্দর একটা নিঃশ্বাস পড়লো আমার।

টেলিফোনটা বড় জামাইবাবুর ঘরে, সেইজন্য বন্ধু-বান্ধবদের বলে দিয়েছিলাম, সন্ধের পর কেউ যেন বাড়িতে আমাকে টেলিফোন না করে। ওখানে টেলিফোনে কথা বলার খুব অসুবিধে। যেসব দিন পার্টি বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, সেসব দিনে বড় জামাইবাবু সন্ধেবেলাতেই বাড়ি চলে আসেন, নিজের ঘরে বসেই কাজকর্ম করেন অফিসের। পাবলিসিটি লাইনের মানুষ, সারা বছর ধরেই বহু পার্টিতে যেতে হয়, সুতরাং মদ খাওয়াটা ওঁর অভ্যেস হয়ে গেছে। নিজের ঘরেই বোতল রাখা থাকে, কাজ করার সময় সন্ধেবেলা অল্প অল্প রোজই খান। বড়দির কড়া হুকুম আছে, বাড়ির কারুর এই সময়ে ওঁকে বিরক্ত করতে যাওয়া বারণ।

রাত্তির সাড়ে এগারোটা আন্দাজ বড়দি আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো, ঘুমিয়েছিস

না কি ? তোকে কে যেন টেলিফোনে ডাকছে!

আমি সারা খাটময় ছড়ানো কাগজপত্র ফেলেই উঠে এলাম। এখন কে আবার টেলিফোন করছে ? বড় জামাইবাবুকে এ সময় বিরক্ত করতে সত্যি আমার লজ্জা করে। বড় জামাইবাবু অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিছানার ওপর এক হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন, কাজ করার সময় কোনো কিছু চিন্তা করতে করতেই যেন গাঢ় ঘুম এসে গেছে। টেবিল থেকে বোতল-গ্লাস সবই বড়দি সরিয়ে ফেলেছে অবশ্য, কিন্তু ঘরে হালকা রামের গন্ধ। আমি টেলিফোন তুলে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যালো ? কে ?

ঠিক বহরমপুরের ছেলেবেলায় জানালা দিয়ে খুব ভোরে এসে শেখর যেমন ফিসফিসিয়ে ডাকতো, সেই রকম গলায় বললো, এই সুনীল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কি করছিস ? তুই এখানে এলি না ?

বেশ কয়েকদিন পর শেখরের গলার আওয়াজ শুনলুম। নতুন কিছু একটা রহস্য পেয়ে খুব মেতে উঠেছে মনে হয়। একটু বিরক্তই বোধ করলুম আমি। চকিতে তাকিয়ে দেখে নিলাম, বড়দি ঘরে নেই, জামাইবাবু সত্যিই ঘুমন্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ? কোথায় আছিস তুই ?

— পাঁচ নম্বর বাড়িতে। বীণার কাছে। খুব জমে উঠেছে, চলে আয় এক্ষুনি!

— এখন ? না—

— ধুৎ! চলে আয় না। এমন জিনিস দেখবি, ভাবতেই পারবি না। তোর অফিসে খবর দিয়ে রেখেছিলুম, পাস নি ?

— পেয়েছিলাম। কিন্তু একটু বিশেষ কাজ ছিল।

— এখানে অনেকে আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে টুক করে চলে আয় না—

— আমার বিষম মাথার যন্ত্রণা করছে। জ্বর উঠেছে প্রায় একশো তিন ডিগ্রি।

— তুই সন্ধেবেলা পরীক্ষিৎকে ধাপ্পা দিয়ে কেটে পড়লি কেন ?

— ঐ তো বললাম, শরীর খারাপ লাগছিল। জ্বর আসছিল তখন।

— তুই চলে আয়, দেখবি এমন জিনিস দেবো, এক মিনিটে জ্বর সেরে যাবে। কথা দিচ্ছি, বিশ্বাস কর, একবার এসেই দ্যাখ।

— শেখর, কেন বিরক্ত করছিস ? বলছি তো যাবো না।

— দাঁড়া, দাঁড়া, লাইন ছাড়িস নি। কাল অফিসের পরই সোজা চলে আয় তবে—

— আচ্ছা যাবো।

— ঠিক আসিস। এখানে নূরজাহান এসেছে। অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার—

— কে নূরজাহান ?

— তোর মনে নেই ? বীণার দিদি নূরজাহান ? ক'দিন ধরে আমি শুধু তার কান্না দেখছি। সুন্দরী মেয়ের কান্না দেখতে কি ভালো যে লাগে...

— আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি, আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি লাইন!

— আজ তুই এলি না, ইস! কাল ঠিক আসবি তো ? তোকে খুব দরকার। কাল বিকেলে তোর অফিসে টেলিফোন করবো—

— বাড়ি থেকে লুকিয়ে, অন্য জায়গায় রাত কাটিয়ে কি ছেলেমানুষি করছিস তুই ?

শেখরের হাসির আওয়াজ শুনতে পেলাম; কি রকম যেন লুকানো হাসি। বললো, ছেলেমানুষি নয়, তুই এলে বুঝতে পারবি।

— আচ্ছা, এখন ছেড়ে দিচ্ছি!

— কাল কিন্তু ঠিক—

সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি নানান দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। আবছা আবছা অস্পষ্ট ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্নে, আমি বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুচ্ছি, তখন আবার আর একটা স্বপ্ন, পূর্ব বাংলার গ্রামের যে বিশাল বটগাছটায় তক্ষক ডাকতো—সেটাতে দড়ি বেঁধে কে যেন আত্মহত্যা করেছে...মনীষা হাসতে হাসতে শেখরের তাস ছুঁয়ে দিল, আমি অরুণকে বললুম, সত্যি কোনো পাগলা গারদেই সিট পাওয়া যাচ্ছে না, মনীষাকে নিয়ে তো খুব মুশকিল হলো; অরুণ চিন্তিতভাবে বললো, ভাবছি, ওকে আন্দামানে পাঠাবো...বারীনদা একটা লোহার ডাণ্ডা ঘুরিয়ে মারলো আমার মাথায়, আমার মাথার ঘিলু ফেটে ছলাৎ করে অবিনাশের গায় পড়তেই অবিনাশ বললো, তুই কিছু ভাবিস না, আমি বারীনকে এমন শিক্ষা দেবো...যতবার দরজার ছিটকিনি দিতে যাচ্ছি, ছিটকিনিটা আলগা হয়ে টং টং করে পড়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে কারা যেন বিষম জোরে দরজা ঠেলছে, আমি প্রাণপণে দরজাটা চেপে ধরে আছি আর পারবো না—এক্ষুনি ওরা ঢুকে পড়বে...তাপস বললো, জানিস, ছায়ার বড্ড মন খারাপ। ওর গায়ের শ্বেতির দাগ ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে, ওর ধারণা ওর ছোঁয়া লেগে আমারও শ্বেতি হবে...আমি দেখলুম একটা পিওন চিঠি দিতে আসছে, তার গায়ে দাগড়া দাগড়া শ্বেতি, চিঠি দিতে যখন হাত বাড়ালো, হাতখানা কুষ্ঠে গলে গেছে, সেই হাতে চিঠিখানা ধরা, আমি বললুম, ও চিঠি চাই না, গম্ভীর গমগমে গলায় সে বললো, চিঠি না পড়ে ফেরত দেবার নিয়ম নেই। চিঠিখানা ছুঁড়ে দিতেই সেটা উড়তে লাগলো...

দূর ছাই, যতসব বাজে বাজে স্বপ্ন! বিছানা থেকে উঠে আমি ঢকঢক করে খানিকটা জল খেলাম। জলের স্বাদ এখন তেমন ভালো না। রাত্তিরে প্রচুর মদ খেলে সকালবেলা জলের স্বাদ যে–রকম মিষ্টি হয়, সে রকম আর কখনো না। যারা জীবনে কখনো মদ খায় নি, তারা জলের সত্যিকারের স্বাদ জানতেই পারলো না। আহা! রাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে একবার আলো জ্বাললে, শুনেছি স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়। যাকগে, স্বপ্ন বন্ধ করার দরকার নেই। বাবা আর মা দুপুরে চলে গেছেন বহরমপুর। বাবার খাটটা এখনো আমার ঘরে পাতা রয়েছে। আমি অন্ধকারেই নিজের খাট ছেড়ে বাবার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শয্যা বদলে দেখা যাক। ঐ সব ভূতুড়ে স্বপ্নের বদলে যমুনাকে নিয়ে একটা ছোট্ট মিষ্টি স্বপ্ন দেখা যায় না ? আমি চোখ বুজে, যমুনার হালকা মুখখানা অন্ধকারে ভাসিয়ে রেখে সেই রকম একটা স্বপ্নকে আহ্বান জানাতে লাগলুম! কোনো স্বপ্নই নেই আর, বাকি রাতটা গভীর ঘুম।

ঘুম থেকে উঠেই আমার প্রধান চিন্তা হলো, শেখরকে কি করে এড়ানো যায়। শেখর আর আমি এক সঙ্গে জীবন শুরু করেছিলুম, কিন্তু সারাজীবন এক সঙ্গে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, কিংবা আমার বিতৃষ্ণা এসেছে, শেখরের মতন নতুন নতুন রোমাঞ্চ খোঁজার ইচ্ছে আর আমার নেই। আসলে কোথাও রোমাঞ্চ নেই, সত্যিকারের অবাক হতে তো ভুলেই গেছি, ইলেকট্রিকের আলো জ্বললেই পেত্নী যেমন হঠাৎ বেলগাছ হয়ে যায়, তেমনি মানুষের দিকে একটু খরচোখে তাকালেই তার ভানগুলো খুলে পড়ে, প্রত্যেকটি মানুষ লজ্জিতভাবে বলে ফেলে, হ্যাঁ, আমিও তোমারই মতন। অন্য মানুষরাও যে আমারই মতন এটা জেনে আমার তেমন লাভ নেই, আমিও যে অন্য মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছি, এটাতে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। তাহলে আর আত্মরক্ষার তেমন প্রয়োজন নেই, এবার মাটির ওপর

স্থির হয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে। বেড়ালকে মাটি থেকে উঁচু করে তুললেই আপনি তার সব ক'টা লুকোনো নখ বেরিয়ে পড়ে, আমিও, একেই অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, তার ওপর বাঙাল ও রিফিউজি, বাস্তুভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই নখ খুলে তৈরি হয়েছিলাম। এই শহর বিশাল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, নিজের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী কুকুরের সামনে এসেও কি বেড়াল ফোঁস করে রুখে দাঁড়ায় না ? তারপর দেখলুম, এ শহরটা একেবারে ন্যালাখেপা, এর কোনো মাথার ঠিক নেই। নজরুল ইসলামের মতন এই কলকাতা শহর—নিজের বিপদ বা গৌরব সম্পর্কে উদাসীন। এখানে আমার কোনো বিপদ নেই, এখানে সমস্যা হলো নিজের ঠিকমতো জায়গা খুঁজে নেওয়া। শেখরের সে সমস্যা নয়, শেখরের দরকার নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা, বেরিয়ে কোথায় যাবে, সেইটা খুঁজছে। আর, আমি এসেছিই বাইরে থেকে, আমি এখন নিজেকে ঠিক কোন জায়গায় বসাবো, তাই দেখছি। এইজন্য সরেজমিন তদন্ত করা আমার এত প্রয়োজন ছিল।

এখন, শেখরের কাছ থেকে পালানো তেমন সহজ নয়। সন্ধেবেলা যেখানেই যাই, ঠিক খুঁজে বার করবে। শেখর না হোক, সুবিমল কিংবা তাপস বা পরীক্ষিৎ। আমি ধরা পড়তে রাজি নই। কিন্তু যাবোই বা কোথায় ? আর যাই হোক, আমি তো আর লুকিয়ে একা গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে থাকতে পারি না। চিনে বাদামওয়ালারা পর্যন্ত আমাকে দেখে হাসবে। সুবিমল আসবার আগেই আড়াইটে আন্দাজ প্রেসে যাবার নাম করে অফিস থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম একটা সিনেমায়। মনে মনে এই রকম একটা যুক্তি তৈরি করে নিলাম যে, ইনগ্রিড বার্গমানের ছবি আমি একটাও বাদ দিই নি, সুতরাং আজ এ ছবিটার শেষদিন, না দেখার কোনো মানে হয় না, একাই দেখা যাক। একা এসে সিনেমা দেখা এমন কি অপরাধ ? সুবিমল সিনেমা দেখতে ভালবাসে না, ওকে বললেও আসতো না, শুধু শুধু আমাকে আটকে দিতো। অবশ্য সুবিমল আজ অফিসে না–ও আসতে পারতো, শুনলাম কালও আসে নি।

সিনেমা হলে বসেই মনস্থির করলুম, সন্ধেবেলা যমুনাদের বাড়িতে যাবো। আজ গানের ইস্কুল বন্ধ, আজ বাড়ি না গিয়ে যমুনার সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। অন্য যতগুলো জায়গায় যাবার কথা ভেবেছি, সব ছাপিয়ে শুধু যমুনার কথাই মনে পড়েছে। আগে ভেবেছিলাম, খবরের কাগজের অফিস গিয়ে শশাঙ্কর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়, কিন্তু তাও তো বেশিক্ষণ নয়, একটু পরেই শশাঙ্ক বলবে, তুই আধঘণ্টা বোস, আমি হাতের কপিটা শেষ করে আসি। রঞ্জনদের ক্লাবে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হয় সেখানে নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে, অথবা তাস খেলা নিশ্চিত। তাসের নাম শুনলে আজকাল গা জ্বলে যায়। বিমলেন্দুর বাড়িতেও একটা ছোটখাটো আড্ডা বসে। বিমলেন্দু মদ খায় না, যারা মদ খায়, তাদের ও ঘৃণা করে। বিমলেন্দু ফ্রেঞ্চ শেখে—একই কথা! তুমি ফ্রেঞ্চ শেখো বলে আমি তো তোমাকে ঘেন্না করি না, আমি মদ খাই বলে তুমি আমায় ঘেন্না করার কে হে ? আমি যেদিন কিছুই খাই নি, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সেদিনও বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখা হলে আমাকে মদ খাওয়ার অপকারিতা বিষয়ে লেকচার দেবে! আমি ফরাসি ভাষার রস বুঝি না—তাই তার নিন্দে করতেও যাই না, তুমিও মদের মর্ম না বুঝে তার নিন্দে করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বোকারাম একটি! মদকে ঘেন্না করে ফরাসি ভাষা শিখছে, জীবনেও শিখতে পারবে না! ফরাসিরা শুনলে বলবে কি ?

মহীতোষ, বিমান—ওদের ওখানে তো যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে এখন গরম রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমাকে ওরা পছন্দ করে না, আমি নাকি এসকেপিস্ট, আমি নাকি দেশের নানান সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না। সত্যিই তো তাই, আমি মাথা ঘামাই না। কত লোক খেতে পাচ্ছে না জেনেও আমি দু'বেলা খাবার খাই, দেশের কত লোকের জামা–কাপড় নেই, কিন্তু

আমার জামায় ইস্ত্রি না থাকলে চলে না, ফুটপাথে হাজার লোক শুয়ে আছে দেখেও আমার দোতলার শোবার ঘরের বিছানার চাদর একটু ময়লা হলে পছন্দ হয় না। হ্যাঁ, আমি এগুলো চাই, আমি স্বার্থপর, আমি অপরাধী। আমি একটা নৃশংস, অমানুষ! কত লোককে যে বঞ্চিত করে আমি একা এত আরামে আছি, তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি এর একটাও ছাড়তে পারবো না। মহীতোষ, বিমান ওরা বেশ সুখী, কারণ ওরা দেশের সমস্যাগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পায়, আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো সমাধানেরও যুক্তি খোঁজে। আমি খুব ভালোভাবে জেনে গেছি, যুক্তি দিয়ে কেউ কখনো কোনো স্থাবর জিনিসকে বদলাতে পারে নি। যদি কখনো যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব বাধে—আমি সব টান মেরে ফেলে দিয়ে রাস্তায় ছুটে গিয়ে বন্দুক হাতে নেবো। আমার একথা শুনলে ওরা হাসে। আমার এসব রোমান্টিক ধারণা? কিন্তু রোমান্টিকরা ছাড়া কে কবে ইতিহাস বদলেছে? আস্তে আস্তে দেশের অবস্থা বদলানো—আমি বাবা ওর মধ্যে নেই! আমি মরে গেলে তারপর কবে দেশের উন্নতি হবে—সে উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যৎযুগকে খুশি করার জন্য, আমি নিজে এখন কোনোরকম স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নই। সাফ কথা! আমাকে তোমরা যা ইচ্ছে ভাবো না! এই গোটা জেনারেশান না খেয়ে, হাড় ডিগডিগে হয়ে, ক্ষইয়ে, গলিয়ে, পচে গিয়ে বেঁচে থেকে, এই রকমই আর একদল পচা-গলা বংশধর রেখে যাবে—তারপর দেশের উন্নতি? আমি নেই, আমি নেই, আমি স্বার্থপর, আমি যতদিন বাঁচবো, সুস্থভাবে পুরোপুরি বাঁচতে চাই। আমি একমাত্র প্রাণ দিতে রাজি আছি যুদ্ধে। যুদ্ধে মরলে কোনো কষ্ট হয় না, খুব নরম, হালকাভাবে মরা যায়, কারণ সেটা রোমান্টিক মৃত্যু। ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থমাকে বলেছিল, আমাকে গলা টিপে দম বন্ধ করে মেরো না আমাকে তলোয়ার দিয়ে মারো, তাহলে আমি স্বর্গে যাবো।

সুতরাং বিকেলে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। আশ্চর্য, অরুণের বাড়িতে গিয়ে মনীষার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার একবারও হলো না। মনীষার নামটা ভাবতেই এক ঝলক মনীষার মুখখানা ভেসে উঠলো। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠা মনীষার সেই মুখ বেশ ফুরফুরে হাসি-হাসি, আমিও হাসিমুখে, কল্পনায় মনীষার দিকে তাকালুম। না, মনীষা সম্পর্কে আমার কোনো দুঃখবোধও নেই। শুধু যমুনার কথাই মনে পড়ছে বারবার, যমুনার কথা ভেবেই একটু একটু দুঃখ পাচ্ছি। যমুনার কথা ভাবতে ভাবতে ওকে দেখার এমন অসম্ভব ইচ্ছে জেগে উঠলো যে, ভাবলুম সিনেমা শেষ না হতেই বেরিয়ে যাই। কিন্তু পুরো অফিসের সময় পার না করেই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছি— এটা যেন কি রকম। সেইজন্য, সিনেমা শেষ হবার পরও কিছুক্ষণ আমি চা খেয়ে কাটালুম।

যমুনারা আমাদের কি রকম যেন আত্মীয় হয়। কারণ সেজ কাকার বাড়িতে যমুনার মা আর বরুণকে দেখেছি আমি। যমুনাকেও দেখেছি দু'একবার, কিন্তু তখন ও এতো বাচ্চা ছিল যে আমি লক্ষই করি নি। যমুনার দিদি সরস্বতীর সঙ্গেও একবার খানিকটা পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু সরস্বতীকে আমার তেমন ভালো লাগে নি, কি রকম যেন ওর স্বভাব, মনে হতো, ওর গায় হাত দিলেই আমার হাত কেটে যাবে। কাকীমার শ্রাদ্ধের দিন সরস্বতী আমার ঘরে ঢুকে বলেছিল, এই, আমার দু'হাত এঁটো, পিঠের বোতামটা ছিঁড়ে গেল এইমাত্র, চট করে একটা সেফটিপিন আটকে দিন তো! আমি তখন একটা বই পড়ছিলুম, চোখ তুলে দেখি, যে-আমায় পিঠের বোতাম ছেঁড়ায় সেফটিপিন লাগাতে বলছে, সে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে বুক ফিরিয়ে। মুখোমুখি দাঁড়ালে পিঠে সেফটিফিন লাগাবো কি করে? না কি ও চায় আমি ওকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেবো? আমি বলেছিলুম, সেফটিপিন আমি কোথায় পাবো? ও বলেছিলো, কি যে করেন, কিছুই থাকে না আপনার কাছে। আমার চুড়িতে আটকানো আছে, খুলে নিন না! তারপর মুচকি হেসে

বলেছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন কি আমার সময় নেই এখন! দিন দিন, চট করে, আমাকে রান্নাঘরে যেতে হবে।—যে মেয়ের বুকে আমি কখনো মাথা রাখি নি, সে কেন আমাকে ব্লাউজের পিঠের বোতাম আটকে দিতে বলবে ? না, ওকথা আমার ভালো লাগে নি।

সরস্বতী আমার কাকাকে মেশোমশাই বলতো, তাহলে ওর মা হচ্ছেন কাকীমার বোন, অর্থাৎ ওরা আমার কোনো আত্মীয় নয়। যমুনার মাকে আমি কখনো কিছু বলে ডাকি নি, আজ কাকীমা বলেই ডাকবো।

— কাকীমা, অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো।

— আরেঃ, এসো এসো, চেনাই যায় না এত বদলে গেছো তুমি।

— আপনারা কেমন আছেন ? যমুনার সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হলো হঠাৎ।

— হ্যাঁ, মুন্নি বলছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি বললুম, ধরে আনলি না কেন ? একেবারে ভুলেই গেছো আমাদের, না, না, জুতো খুলতে হবে না, আমাদের ঘরের মধ্যে সবাই জুতো পরে আসে, চলে এসো, তোমার মা কেমন আছেন ?

— মা ভালো আছেন! আপনাদের কথা মা প্রায়ই বলেন।

— মাকে নিয়ে এলে না কেন ? জামাইবাবুর সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয় নি।

— হ্যাঁ, সেজ কাকা আজকাল ধর্ম নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন।

— তুমি এদিকটায় সরে এসে পাখার নিচে বোসো না। যা গরম আজ! দাঁড়াও আমি সতীকে ডাকি।

আগেকার ভারতবর্ষ, প্রবাসীতে 'আধুনিকা' বলে যে-সব ছবি ছাপা হতো, সেইসব ছবির মেয়েদের কিছুটা বয়েস বাড়লে যে-রকম দেখতে হওয়া উচিত, যমুনার মাকে সেইরকম দেখায়। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, কোঁকড়ানো মাথার চুলে এলো খোঁপা, চওড়া কল্কা পাড় সাদা শাড়ি, শাড়ি পরার ধরনটাও একটু অন্যরকম, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। ঠিক বাড়ির মা-মাসীমাদের মতন চেহারা নয়, অথবা উগ্রতাও নেই। দেখতে ভালো লাগে। এ বাড়ির আসবাবের মধ্যেও একটা স্নিগ্ধতা আছে। যমুনা কোথায় ? দেওয়ালের একটা বড় ছবিতে যমুনা, এক গা ফুলের গয়না পরা নৃত্য ভঙ্গিমায়, শুধু গান নয়, যমুনা নাচতেও জানে দেখছি। যমুনার ফটোগ্রাফের পাশে যামিনী রায়ের বেড়াল, তার পাশে কাচের জারে মানি-প্ল্যান্ট বাকি দেয়াল জুড়ে। যমুনার বাবা পুলিশে কাজ করেন জানি, অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, আশা করি উনি ঘুষ নেন না। এরকম শান্তিময় সুখী আবহাওয়া থাকতো কি তাহলে বাড়িতে ? যমুনা কি তাহলে অমন নিষ্পাপ সরল হতে পারতো ? যমুনা কোথায় ? বুককেসের ওপর একগাদা পিকচার পোস্টকার্ড, ওগুলো বোধহয় বরুণ আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছে। যমুনা কোথায় ?

সরস্বতী ও যমুনার মা এসে ঢুকলেন! হাতে খাবারের প্লেট ও লেমন স্কোয়াশের সরবৎ। এদের বাড়িতে নিশ্চয়ই রেফ্রিজারেটর আছে। সরস্বতীর মাথায় সিঁদুর নেই, এখনো বিয়ে হয় নি কেন ? যমুনা কোথায় ? আশেপাশের কোনো বাড়িতে খেলতে গেছে ? আমি চেয়ার ছেড়ে সামান্য উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে বললুম, কী, চিনতে পারেন ? সরস্বতী অল্প হেসে বললো, পারবো না কেন ? আপনি চিনতে পারবেন কি না—সেইটাই সন্দেহ ছিল। মুন্নি জোর করে আসতে বলেছে বলেই বুঝি এলেন ?

— না, আমি তো নিজেই এলাম। এদিকে বিশেষ আসা হয় না। আপনি কিন্তু একটু রোগা হয়ে গেছেন।

— ইচ্ছে করেই রোগা হচ্ছি। দেখতে খারাপ লাগছে ?

— না, না। অনেকদিন আপনাকে দেখি নি তো। (যমুনা কোথায় ?)

যমুনার মা হেসে বললেন, তুমি সতীকে আপনি বলতে নাকি ? ও তো তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

সরস্বতী বললো, আগে অবশ্য উনি আমাকে তুমিই বলতেন, এখন ভুলে গেছেন সে কথা!

সত্যিই আমি ওকে তুমি বলতাম নাকি ? মনে পড়ে না। কিন্তু যমুনা কোথায় ? পরিষ্কার চারখানা দেয়ালের মধ্যে এই ঘরে বসে, লেমন স্কোয়াশ চুমুক দিতে দিতে এইসব আমড়াগাছি কথাবার্তা বলতে আমি এসেছি নাকি এখানে ? আমি যেন হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, যমুনাকে দেখছি না ? যমুনা কোথায় ?

যমুনার মা বললেন, যমুনা তো নাটকের রিহার্সাল দিতে গেল। আমার মামাতো-ভাই রণেন একটা নতুন নাটক লিখেছে, তুমি নাম শোনো নি রণেন মৈত্রের ? আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ; নিশ্চয়ই!—কে জানে লোকটা কে!—যমুনার মা বললেন, ওদের ক্লাব থেকে তার অভিনয় হচ্ছে। যমুনাকে দিয়ে ছোট্ট নাচের পার্ট করাবে। তুমি আসবার একটু আগেই তো বেরোলো।

আমার মুখ দৃশ্যত বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি অস্ফুটভাবে বললুম, রিহার্সালে গেছে ?

— কেন, তোমাকে আজ আসতে বলেছিল নাকি ? বলেছিল আজ থাকবে ? কিন্তু ও তো আজ রিহার্সালের কথা জানতো।

আমি সামলে নিয়ে উত্তর দিলুম, না না, আমাকে সে-কথা বলে নি। যমুনা নাচ-গান দুটোই বেশ ভালোই শিখেছে বুঝি ? কি পড়ছে এখন ?

—প্রি-ইউনির্ভাসিটি পাশ করে, এ বছর ফার্স্ট ইয়ার আর্টসে ভর্তি হয়েছে ব্রেবোর্ন কলেজে। নাচ তো বেশ ভালোই শিখেছে। ঐ যে ছবিটা দেখছো, ওটা তো অল বেঙ্গল কনফারেন্সের। আরও অনেক ছবি আছে, সতী, অ্যালবামটা দেখা না—

আর কিছু আমার ভালো লাগলো না। একটা জিনিস নতুন করে শিক্ষা হলো, মনের ইচ্ছাকে চেপে রাখলে তার ফল কিছুতে ভালো হয় না, সিনেমা হলে বসে থেকে যমুনাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, বইটা আদ্দেক দেখে উঠে যদি আমি বেরিয়ে আসতুম, তাহলে অনায়াসে যমুনার সঙ্গে দেখা হতো। যমুনার সঙ্গে দেখা হবে না জেনে সম্পূর্ণ সন্ধেটা বিস্বাদ হয়ে গেল। মনের মধ্যে এক মুহূর্তে ঢুকে পড়লো মন-খারাপ রং। আর মন-খারাপ হলেই আমার মধ্যে সামান্য রাগ জাগতে থাকে। সরস্বতী যে অ্যালবামের পাতাটা উল্টাচ্ছিল, আমার ইচ্ছে হলো, ওর হাত থেকে অ্যালবামটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

যমুনার জন্য অপেক্ষা করবো ? কিন্তু এসব বাজে থিয়েটারের রিহার্সাল সহজে শেষ হয় না। আর এই নাটক-লেখা মামাতো-ভাইগুলোও বিষম ন্যাকা হয়। ওর মায়েরও দোষ, যার-তার সঙ্গে রিহার্সাল-ফিয়ার্সালে পাঠানো উচিতই নয়। ঐটুকু মেয়ের পক্ষে ওসব আবহাওয়া ভালো নয় মোটেই। আমি এসব একেবারে পছন্দ করি না। তাছাড়া কতক্ষণই বা বসে থাকবো ? আমার তো আর কিছুই কথা বলার নেই, প্রথমদিন বেড়াতে এসে কেউ বেশিক্ষণ থাকেও না। তাছাড়া, ইংরেজি মতে, অ্যালবাম দেখানো মানে উঠে যেতে বলা নয় ? এসব ঠিক বুঝতে পারি না। একবার যোধপুর পার্কের কাছে একটা অল্প চেনা বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, রাত্তির ন'টা আন্দাজ বন্ধুর মা বললো, তুমি আমাদের সঙ্গে আজ রাত্তিরে খেয়ে যাও। তেমন কিছু খাবার নেই অবশ্য, সামান্য ডালভাত, কিন্তু খেয়ে যাও আজ, কেমন ? আমরা খুব খুশি হবো, খেতে খেতে গল্প করবো, আমরা সবাই এক সঙ্গে টেবিলে বসে খাই রাত্তিরবেলা। এসো লজ্জা কি, এ তো তোমার নিজের বাড়ির মতন, খাবার দিতে বলি ? সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমি প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে বসে, প্রথমদিন সেই বাড়িতে গিয়েই রাত্রের খাবার খেয়েছিলাম। পরে শেখর একথা শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল, তুই করেছিস কি ? তুই তো একটা মহা উজবুক দেখছি!

সত্যি সত্যি কেউ খায় নাকি ? ও রকম খাবার কথা বলা মানে হচ্ছে, এবার তুমি চলে যাও, আমাদের এখন খাবার সময়। যত জোর করে খাবার কথা বলবে, তত বুঝবি তখুনি চলে যাবার নির্দেশ। যাকে-তাকে যখন-তখন খেতে বলার মতন যুগ আর আছে নাকি বাংলাদেশে ? হুঁ, তখন আমি অবশ্য বেশি বাঙাল ছিলাম, এখন ওসব বুঝে গেছি। যারা বেশি আদব-কায়দা দেখাবে, তাদের ওপর বেশি অত্যাচার করতে হবে। আজ যদি যমুনার মা আমাকে খেয়ে যেতে বলে, আমি মোটেই সেটাকে চলে যাবার নোটিস বলে গ্রাহ্য করবো না। তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানে খেয়ে যাবো। পরের বাড়িতে খাবারের স্বাদ সবসময় ভালো লাগে।

আমার পাশে এসে ঝুঁকে সরস্বতী অ্যালবাম দেখাচ্ছে, বারবার ওর বুক থেকে আঁচল খসে যাচ্ছে। এ কথা কে না জানে, মেয়েদের বুক থেকে কখনো এমনি এমনি আঁচল খসে পড়ে না। যদি মেয়েরা ইচ্ছে না করে, তবে কালবৈশাখীতেও বুকের আঁচল ওড়াতে পারবে না। কিন্তু সরস্বতীর দিকে আমার তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। হাজার হাজার লোক সরস্বতীকে বলবে সুন্দরী, কিন্তু ও যমুনার নখেরও যোগ্য নয়। সরস্বতীর মুখে কোনো স্পষ্টতা নেই, ও যেটা প্রাণপণে ফোটাবার চেষ্টা করছে তাকে ও বলতে চায় রহস্য, কিন্তু সব মেয়ের রহস্য ফোটে না, মনে হয় ভান। সরস্বতীর মুখের মধ্যে একটা চাপা কষ্টও আছে, কি যেন একটা গোপন আঘাত ও ইতিমধ্যে পেয়েছে। হয় প্রেমের ব্যর্থতা অথবা পাপ ওর শরীর ছুঁয়ে গেছে, একথা নিশ্চিত বোঝা যায়। এতদিন বিয়ে না হবার এই তাহলে কারণ! আর একটা ব্যাপার আমার এইমাত্র মনে পড়লো, কাল সন্ধেবেলা যমুনা যখন বলেছিল, আমি আপনার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম—তারপর থেকে আর আমি কোনো মেয়ের দিকে তাকাই নি! পথেঘাটে কত অসংখ্য মেয়ের দিকে রোজ দেখতেই হয়, রাস্তার এপাশে-ওপাশে যাবতীয় মেয়ের মুখ দেখে নেওয়া যেন একটা পরম দায়িত্ব, কোনো অপসৃয়মাণ মেয়ের মুখটা দেখতে না পেলে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—যদি সে একবারও মুখ ফেরায়। কিন্তু কাল থেকে যেন আমি আর একটি মেয়েকেও দেখি নি। না, মনে তো পড়ে না। এত কাছ থেকেও সরস্বতীকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না।

যমুনার মা বললেন, সুনীল, তোমার কোনো বন্ধুটন্ধু কি আমেরিকায় আছে ?

আমি বললুম, কেন বলুন তো ?

— আমাকে একটা খবর এনে দিতে পারো ?

সরস্বতী বললো, মা, কি দরকার!

আমি বললুম, বরুণ তো এই সেপ্টেম্বরেই ফিরবে ?

— তাই তো ফেরার কথা। আবার যে অন্যরকম শুনছি।

সরস্বতী বললো, মা—। তুমি শুধু শুধু।

— কেন, ওকে বললে কি হয়েছে ? জানো, শুনলুম, খোকা ওখানে বিয়ে করেছে।

— কোনো বাঙালি মেয়ে, না বিদেশিনী ?

— শুনছি মেয়েটি স্প্যানিশ। আমাদের অবশ্য ও কিছু জানায় নি। ওর এক বন্ধু খবরটা দিয়েছে আমাদের। শুনে আমার এমন ভয় করছে, যদি সত্যিই তাই হয়।

সরস্বতী বললো, মা এতে ভয়ের কি আছে ? দাদামণি কি ছেলেমানুষ নাকি যে, না বুঝেসুজে একটা কিছু করবে ? নিশ্চয়ই মেয়েটি ভালো।

যমুনার মা খানিকটা ভর্ৎসনার সুরে মেয়েকে বললেন, ছেলেমানুষ না হলেও সবাই সবসময় নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। অনেক দেখলুম তো।

সরস্বতী মুখটা মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার স্বাভাবিক চোখ ফেরালো। মায়ের সঙ্গে সরস্বতীর চোখাচোখি হলো। কি যেন একটা পুরোনো ঝগড়া ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

ওর মায়ের চোখে অপমান ও বেদনা। সরস্বতী বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললো, ছেলেমেয়েদের কথা এত ভাবতে ভাবতেই তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এতটা না ভাবলেও চলে।

আমি ঠিকই বুঝেছিলুম, যমুনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ সরল নেই। এ বাড়ির হাওয়া তো যথেষ্ট জটিল দেখছি। আমি বললুম, কাকীমা, আমি তাহলে এবার যাই। আর একটা জায়গায় যেতে হবে।

— তুমি পারবে খবরটা এনে দিতে ?

— সে রকম কোনো বন্ধুর কথা তো আমার মনে পড়ছে না। যে-সব ছেলে বিলেত-আমেরিকায় যায়, তারা কি আমাদের পাত্তা দেয়! আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো, চেনাশুনো কেউ—

— একটু দেখো, বরুণ আছে সানফ্রানসিস্কোতে।

সরস্বতী অনায়াসে হেসে বললো, ভালো লোককেই তুমি খোঁজ নিতে বলছো। ওর আর পাত্তা পাওয়া যাবে নাকি! আপনার বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

এমন সময় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ করে যমুনার বাবা জগদীশ রায় এলেন! সবল চেহারার সুদর্শন প্রৌঢ়, একমাত্র মোটা গোঁফে যেটুকু পুলিশী চিহ্ন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে শান্তভাবে টাইয়ের গিঁট খুলতে লাগলেন। যমুনার মা বললেন, একে চিনতে পাচ্ছো ? এ হচ্ছে সুনীল, মেজদির ভাসুরপো।

জগদীশ রায় আমার দিকে আর দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে তো চিনি (অসম্ভব, উনি আমাকে আগে কখনো দেখেছেন কিনা সন্দেহ), অনেক ছোট দেখেছি।

আমি একটুক্ষণ বিগলিত মুখে দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর বিনীতভাবে বললুম, অনেকক্ষণ এসেছি। আজ যাই।—জগদীশ রায় ঘরের মাঝখানে অধিপতির মতন দাঁড়িয়ে আছেন। দুই হাত ছড়িয়ে এবার তিনি কোট খুললেন। আমার উপস্থিতিকে আর বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে বললেন, সাতটার সময় আমার কোনো টেলিফোন এসেছিল ?

ওঁর স্ত্রী বললেন, না তো। উনি বললেন, শোনো, আমি দু'দিনের জন্য জামশেদপুর যাবো, আমার সুটকেস গুছিয়ে দাও। কাল খুব ভোরে আমার প্লেন।

আমি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার গলার স্বর উঁচুতে তুলে বললাম,— কাকীমা, আমি আজ চললুম। তারপর তিনজনের মুখের দিকেই পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বললুম, যাই।—জগদীশ রায় এবার সোফায় বসে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন, আমার কথায় কোনো সাড়া দিলেন না। ওঁর স্ত্রী অন্য ধরনের ব্যস্ততার মধ্য থেকে বললেন, আচ্ছা, আর একদিন এসো কিন্তু ঠিক।

সরস্বতী আমাকে এগিয়ে দিতে আসছিল, কিন্তু আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম, একবারও আর পিছনে না ফিরে। বেরুবার সময় ইচ্ছে হলো, দড়াম করে দরজায় শব্দ করি। লেটার বাক্সটা ভেঙে দিয়ে গেলে কেমন হয় ? রাস্তায় বেরিয়েই একটা বেড়ালকে দেখে সেটাকে সুট কষাবার জন্য তাড়া করে খানিকটা ছুটে গেলাম। একটা পুরো খালি মোটরগাড়ি ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ানো, দুপ করে আচমকা ঘুষি মারলুম সেটার জানালার কাচে। কাচ নয় বলেই ভাঙলো না, বরং আমার হাতে লাগলো। কাছেই একটা দমকলের বাক্স। ওটার কাচ ভেঙে হাতল ঘুরিয়ে একটা দমকলকে ডাকার খুবই ইচ্ছে হলো। কিন্তু ওটার পাশে দুটো ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনার দেখা না পেয়ে মন–খারাপ ক্রমশ রাগে বদলে যাচ্ছিল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় রাস্তায় একা বেরিয়ে আমার বিষম বিরক্ত লাগলো, মনে হলো, কেউ যেন আমাকে ঠকিয়েছে। আজ সন্ধেবেলা দুর্লভ কিছু একটা আমার পাবার কথা ছিল, তার বদলে একটা শুকনো পাতার মতন আমি পথের হাওয়ায় ভাসছি এখন। অথচ অন্যরকম হবার কথা ছিল। কেউ যেন আমার বিশ্বাসের

সুযোগ নিয়ে আমায় ঠকিয়েছে—এই ধরনের রাগী মন–খারাপ আচ্ছন্ন করলো আমায়। দূর ছাই! এসব হবে না আমার দ্বারা। শেখররা ওদিকে তুমুল আড্ডা জমিয়েছে, আর আমি একা পথে পথে বেড়াবো ? নাকি বাড়ি ফিরে গিয়ে ভেরেণ্ডা ভাজবো ? বীণার ওখানেই যাবার জন্য আমি চকিতে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, যা টাকা আছে, তাতে ট্যাক্সি ভাড়াটা কুলিয়ে যাবে।

গেঞ্জি গায়, ধুতিটা লুঙ্গির মতন পরা, পালঙ্কের ওপর শেখর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। যেন ও কতকাল ধরে এখানে আছে, যেন শেখরই এখানে গৃহস্বামী। আয়নার সামনে বীণা। অবিনাশ একটা চেয়ারে বসা, তার পাশে দু'জন বয়স্ক অচেনা লোক, পালঙ্কের এক কোণে আর একটি নারী। চিন্তামণিবাবুকে দেখতে পেলাম না। আমি পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম, সেই মুহূর্তে কি একটা কথায় ওরা সবাই হো–হো করে চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিল, তখুনি আমি ঘরে পা দিয়েছি।

বীণা প্রথমে আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, ঐ তো এসেছে! বাবাঃ! কি খোঁজাখুঁজি!

শেখর ঘাড় ফিরিয়ে বললো, এসেছিস, তোকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলুম।

আমি বললুম, সে কি রে! তোকেই তো ক'দিন ধরে আমরা সবাই খুঁজছি। কম জায়গায় ঘুরতে হয়েছে তোর জন্য ?

— যা যাঃ! এখানে এসেছিলি একবারও!

— এখানে তো তুই আসা ছেড়ে দিয়েছিলি ?

— কিন্তু আর কখনো আসবো না, তা তো বলি নি। তুই কালও এলি না, একটা জিনিস দারুণ মিস করলি! তোর জন্য কাল পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলুম!

এখানে তুই কি পাগলামি করছিস ? তোর মা বিষম চিন্তা করছেন! ইস্, তোর চেহারাও তো খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখছি!

অবিনাশ বললো, ঐ এলেন গুরুঠাকুর! এখন লেকচার ঝাড়বেন। তুই নিজে কি করছিস, ভাবছিস বুঝি আমরা টের পাই নি ?

শেখর পা দোলাতে দোলাতে বললো, তোকে সেজন্য ভাবতে হবে না। আমি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে এসেছি। বলে এসেছি, কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। সপ্তাহ কয়েক ফিরবো না!

— সপ্তাহ কয়েক ? কী করবি এখানে ?

— কিছু না ! এমনিই থাকবো। বাড়ি থেকে ছুটি নিলাম কিছুদিন। লোকে চেঞ্জে যায় না ? আমিও একটু চেঞ্জে এলাম, হাওয়া বদলাতে!

অবিনাশ বললো, ওসব কথা বাদ দে। যেজন্য এসেছি, এখন কাজের কথা হোক। অজয়বাবুর বাড়িটা কোথায় ?

বীণা বললো, জামাইবাবু থাকেন তিনতলায়। চার নম্বর গেটের কাছে, ইলেকট্রিক অফিসের পাশ দিয়ে রাস্তা। অন্তত ঐখানেই তো থাকতো আগে—

অবিনাশ বললো, এখন না থাকলেও নতুন ঠিকানা খুঁজে বার করা যাবে।

আমি শেখরের পাশে এসে পালঙ্কে বসলুম। শেখরের ডান বাহুতে একটা বড়ো রুপোর তাবিজ। এটা তো কখনো দেখি নি! আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ব্যাপার ? শেখরও হাসতে হাসতে বললো, মা বেঁধে দিয়েছে—যাতে আমার কোনো বিপদ না হয়। থাকুক না।

মা যদি খুশি হয়, তাহলে পরতে আপত্তি কি ?

অন্য মেয়েটি বললো, আপনার তাগার ওপরের ডিজাইনটা বেশ সুন্দর!

শেখর বললো, এটাকে তাগা বলে বুঝি ? বাঙালদের কথা! হুঁঃ! তাগা—বিচ্ছিরি শুনতে লাগে! আমরা বলি, মাদুলি।

— মাদুলি তো গলায় পরে।

— ভাগ্! ও সুনীল, তুই একে চিনিস! ইনি হচ্ছেন বীণার দিদি সাধনা, বিখ্যাত নূরজাহান বেগম!

আমি হাত তুলে বললাম, নমস্কার। আপনার নাম শুনেছি।

মেয়েটি প্রতিনমস্কার করে বললো, আপনার বন্ধু তো ক'দিন ধরে আপনাকে পাগলের মতন খোঁজাখুঁজি করছেন!

আমি বললাম, এইটাই মজা। আমি ওকে খুঁজছি, ও আমাকে খুঁজছে। আমি অবশ্য বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হই নি, ও-ই নিরুদ্দেশ হয়েছে।

— সত্যি, আপনার বন্ধু বেশ অদ্ভুত! কাল যা কাণ্ড করলেন।

আমি প্রশ্ন-চোখে শেখরের দিকে তাকালুম। শেখর বললো, তুই কালও এলি না ? একটা জিনিস তোর জন্য কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম, পরীক্ষিৎ এসে তোরটা শেষ করে দিল। এমন সুযোগ তুই আর জীবনে পাবি কি না সন্দেহ!

— কি ?

— এল.এস.ডি.।

— এল.এস.ডি. ? কোথায় পেলি ? সেটা এমন কিছু মহামূল্যবান জিনিস নয়। আমার লোভ নেই।

সাধনা বললো, আপনি খান নি, ভালোই করেছেন। বিচ্ছিরি জিনিস!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনিও খেয়েছিলেন না কি ?

সাধনার মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল যেন একটু। চোখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বললো, একটা খেয়েছিলুম। উঃ! মানুষের এমনিতেই এত দুঃখ, আবার সাধ করে ট্যাবলেট খেয়ে দুঃখের ছবি দেখার দরকার কি!

শেখর বললো, তুমি বুঝি শুধু দুঃখই পেয়েছো ? আনন্দ পাও নি একটুও ?

— না।

— আমি কিন্তু পেয়েছিলাম। ওঃ, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, শরীরটা যেন হালকা হয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় মিলিয়ে গেল—

আমি শেখরকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এল.এস.ডি. ট্যাবলেটের নাম শুনেছি আগে, ঠিক ব্যাপারটা কি বল তো ? কী হয় খেলে ?

— এটা আসলে একটা ডাক্তারি ওষুধ, এখনো পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে বুঝলি,—পাগলদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করে দেখা হচ্ছে—এতে স্মৃতি ফিরিয়ে আনে—ঐ স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটার জন্যই সারা পৃথিবীতে এখন গোপনে নেশার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে!

— পাগলের ওষুধ ? ভাগ্যিস খাই নি।

— একটা ট্যাবলেট খেলে তবে বুঝতে পারতিস। সামান্য এইটুকু একটা ট্যাবলেট, খাবার পর কি অবস্থা, শরীরটা একেবারে বদলে গেল, চোখের সামনে অসংখ্য স্বপ্ন, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন অনবরত, একটার পর একটা।

আমি জোরে হেসে উঠে বললাম, স্বপ্ন দেখার জন্য ট্যাবলেট খেতে হবে ? তোরা কাল

খেয়েছিলি বুঝি ? আমি কিন্তু কিছু না খেয়েই, কাল রাত্রে নিজের ঘরে শুয়ে অনেক উদ্ভট উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছি। প্রায়ই দেখি!

শেখর বিচলিত না হয়ে গাঢ়স্বরে বললো, না রে, এ সত্যিই অন্যরকম। তুই খাস নি তো, তোর বিশ্বাস হবে না। তুই আর আমি এক সঙ্গে অনেক কিছু খেয়ে দেখেছি তো, কিন্তু এর অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম। সত্যি, জীবনটা বদলে গেল।

— জীবন বদলাবার জন্য তোর এত লোভ কেন ?

— চালাকি করিস নি! তোর লোভ নেই ? তুই বদলাতে চাস না ? এখন যেটা আছে— এটা কি ? এই কি জীবন নাকি ?

— ট্যাবলেট খেয়ে কী রকমভাবে তোর জীবন বদলালো ?

— যদিও অল্প সময়ের জন্য, তবু বদলে গিয়েছিলাম ঠিকই। খুব ভয় করছিল। দূর থেকে আমিই যেন আমাকে দেখছি। এতে ঘুম পায় নি, জ্ঞান হারায় নি, হাত-পা নাড়া যায়, কিন্তু শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে ছবির পর ছবি, ছবিগুলো দেখলে অস্পষ্ট চিনতেও পারা যায়। যে সমস্ত স্মৃতি আমাদের হারিয়ে গেছে, সেগুলো কোথা থেকে যে ফিরে এলো! হারানো স্মৃতিকে দেখতে সত্যি কি রকম গা-ছম্‌ছম্ করে। তোকে বলতে গিয়ে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, দ্যাখ! সবচেয়ে অদ্ভুত কি, এতে অনেক সময় নিজের দুটো মূর্তি দেখা যায়।

— একই রকম দুটো চেহারা পাশাপাশি ?

— না, না, আলাদা আলাদা বয়সের চেহারা। আমি একবার দেখলুম, একটা চার বছরের ছেলে—পায়ে কাচ ফুটে গেছে, মাটিতে বসে কাঁদছে। ছেলেটার মুখ দেখেই চিনতে পারলুম, সেটা আমিই, আমারই চার বছরের চেহারা—ঠিক চেনা যায়। আর তার পাশে দাঁড়ানো একটা লোক—সেটা কে জানিস ? আমিই, এই বত্রিশ বছরের আমি। ভেবে দ্যাখ, চার বছরের আমি'র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই বত্রিশ বছরের আমি—দুটো আলাদা শরীর, আমারই, স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, চোখের সামনে স্পষ্ট সেই দুটো মুখ, আটাশ বছরের তফাৎ কিন্তু আমার ছেলেবেলার মুখ দেখলে মনে হয় যেন আমি তিনশো বছর পেরিয়ে এসেছি!—তুই বিশ্বাস করতে পারবি না—এরকম দেখলে কি অসম্ভব সুখ আর কষ্ট হয়! লাইসারজিক এমন জিনিস—শুনলুম, যারা একসঙ্গে চারটে ট্যাবলেট খায়—তারা মায়ের পেটে সেই অন্ধকারে শুয়ে থাকার দৃশ্যও দেখতে পায়।

— আমি সে দৃশ্য দেখতে চাই না—

— তুই বুঝতে পারছিস না ব্যাপারটা। বললুম তো, তুই কি জিনিস মিস করেছিস—তুই জানিস না। তোর জন্য কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম— অবশ্য, কাল আমার একটু অন্যরকম হয়ে গেল—

বীণার দিদি একমনে শেখরের কথা শুনছিল। মুখখানা একটু শুকনো। বললো, আমি আর কোনোদিন ও জিনিস খাবো না। আমার এত কষ্ট হয়েছিল, এমন মন খারাপ লাগছিল। যা ভুলে যাওয়াই ভালো— তাকে আর জোর করে মনে পড়িয়ে কি লাভ! কাল আপনিও যা দাপাদাপি করছিলেন, আমরা সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আমি শেখরকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই এল.এস.ডি. পেলি কোথায় ? এদেশে পাওয়া যায় নাকি ?

— স্যান্ডি বলে একটা অ্যামেরিকান ছেলের কাছ থেকে কিনলাম। অ্যামেরিকান ঠিক নয়, ক্যানেডিয়ান, যাই হোক, ছ'টা ট্যাবলেট, তিনশো টাকা দাম।

— তিনশো টাকা ? স্বপ্ন দেখার জন্য ? তুই সত্যিই পাগল হয়ে গেছিস। পাগলের ওষুধ খাওয়াই তোর দরকার!

— চাঁদে যখন যাত্রিবাহী রকেট যাবে, তখন এক একটা টিকিটের দাম কত হবে জানিস ? পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, ঘোষণা হয়ে গেছে। কেউ যাবে না বলতে চাস ?

— যাক গে। ছেলেটাকে জোটালি কোথা থেকে ?

— বলছি, বোস, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। চা খাবি ? বীণা একটু চা বানাও না। চা খাবি, না মদ খাবি ?

— চা খাবো।

অবিনাশ ওপাশ থেকে আঁতকে উঠে বললো, রাত্তির সাড়ে আটটার সময় চা ? লিভারের বারোটা বাজাতে চাস্ বুঝি ?

আমি বললাম, আমি চা-ই খাবো। বীণার হাতের চা খেলেই আমার নেশা হয়ে যায়।

বীণা বললো, আমার ঘরে চিনি নেই। দেখি রেণুর ঘরে আছে নাকি!

আমি অবাক হয়ে বললুম, সে কি ? চিনির কলের মালিকের ঘরেই চিনি নেই!

ঘরের সবাই চাপাভাবে হাসতে লাগলো। ভ্রূভঙ্গি করে বীণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চিন্তামণিবাবুই বীণার আসল বাবু। লোকটি ভারি মজার। ওঁর সব কিছুর মধ্যেই একটা রসিকতা আছে। রাকিট এন্ড রাকিট কোম্পানির উনি পঞ্চাশ শতাংশের মালিক, ওঁদের তিনটে চিনির কল। উনি নিজেই বলেন, আমার বাবা শুধু চিনির কল খুলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, চিনি জোগাবে চিন্তামণি—এইজন্য ছেলের নামও চিন্তামণি রেখে গেছেন। আমিও রক্ষিত বংশে জন্মে বংশের ধারা রক্ষার জন্য একটি রক্ষিতা রেখেছি। আমার বাবারও রক্ষিতা ছিল। আমার স্ত্রীও সময় বুঝে গত হয়েছেন।

রক্ষিতা রাখার ব্যাপারে চিন্তামণিবাবুর বেশ একটা বনেদিআনা আছে। বীণার কাছে তিনি শুধু শনিবার এসে সারারাত থাকেন। এইজন্য যে-মাসে পাঁচটি শনিবার সে মাসে তিনি দেন এক হাজার টাকা, যে-মাসে চারটি শনিবার সে মাসে আটশো। এই শনিবারগুলোতে বীণার ঘরের ত্রিসীমানায় কোনো পুরুষের আসা চলবে না। অন্যদিন যে-ইচ্ছে আসতে পারে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতেও তিনি হঠাৎ হয়তো এসে হাজির হন, কিন্তু তখন বীণার ঘরে অন্য পুরুষ থাকার ব্যাপারে তাঁর কোনো বিরাগ নেই। সামান্য ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে, তিনি সবার সঙ্গে সহাস্যে গল্প করে ঠিক দশটার সময় বাড়ি ফিরবেন। সেদিন তিনি বীণাকে স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না।

চিন্তামণিবাবুকে আমার ভালো লাগে, কারণ, তাঁর মধ্যেই প্রথম আমি পুরোনো কলকাতার বণিক সমাজের একজন প্রতিনিধিকে দেখতে পাই। এখন ব্যবসায়ী কথাটা শুনলেই মাড়োয়ারি বা ঐ ধরনের চালকুমড়ো মার্কা চেহারা মনে পড়ে, কিন্তু রক্ষিতবাবুরা কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতার ব্যবসায়ী। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মানুষটি, কোনো রকম গ্লানি বা উচ্ছ্বাস নেই চরিত্রে, বেশ শান্তভাবে পৃথিবীর যোগ বিয়োগ বুঝে নিয়েছেন। একেবারে অশিক্ষিতও নন, মাঝে মাঝে বৈষ্ণব কবিতা থেকে ভালো ভালো উদ্ধৃতি দিতে জানেন। মাথার সামনেটা টাক পড়ে গেছে, পেছনদিকের চুলগুলো সামনে পর্যন্ত টেনে এনে পাতা কাটা। প্রায় দাড়ি-গোঁফহীন সহাস্য মুখ। বয়েস পঞ্চাশ বাহান্নর বেশি নয়, কিন্তু কথা বলার সময় এমনভাবে বলেন, 'সে সব আমাদের কালে ছিল—', যেন তিনি সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের কাল থেকেই এ শহরে আছেন।

অনেকক্ষণ পরিশ্রম করার পর আরাম করে এক গ্লাশ জল খাবার মতনই সহজভাবে, সারা সপ্তাহ নিপুণভাবে ব্যবসার কাজ দেখাশুনো করে চিন্তামণিবাবু শনিবার আসেন বীণার কাছে। সেদিন তাঁর পূর্ণ বিশ্রাম চাই। অন্য দিনগুলোতে যে মাঝে মাঝে আসেন, তা যেন অনেকটা

বেড়াতে বা খোশগল্প করতে আসার মতন। ঐসব দিনেই আমার আর শেখরের সঙ্গে ওঁর কখনো কখনো দেখা হয়েছে। কোঁচানো ধুতি ও গিলে-করা পাঞ্জাবি পরে অনুত্তেজিতভাবে আসেন, এসে পকেট থেকে রুপোর পানের ডিবেটা বার করে সামনে রেখে আরাম করে বসেন। তারপর বলেন, কয়েকটা ধূপ জ্বেলে দাও তো বীণা, ছেলেবেলা থেকেই আমার ধূপের গন্ধ শোঁকা অভ্যেস, আপিসে আমার ঘরে সবসময় ধূপ জ্বলে, বাড়িতে জ্বলে, ধূপের গন্ধ ছাড়া সন্ধেবেলা আমি থাকতেই পারি না। ... চোখে কাজল দিয়েছো দেখছি, বাঃ, বেশ মানিয়েছে। — সেসব দিন বীণার প্রতি ওঁর ব্যবহার অনেকটা পিতার মতন। ভারি মধুর, স্নেহমাখানো।

চিন্তামণি রক্ষিতকে আমার ভালো লেগেছিল, কারণ উনি কলকাতার নাগরিক সমাজের একটি দিক আমাকে দেখিয়েছেন। সমাজে উনি সুদক্ষ ব্যবসায়ী, বাড়িতে নিশ্চিন্ত দায়িত্বশীল পিতা— এক ছেলেকে টেকনোলজি পড়াতে জার্মানি পাঠিয়েছেন; নিজের মেয়েকে কখনো কোনো উড়ো-সম্পর্কের দাদার সঙ্গে সিনেমা দেখতে পাঠাবেন না, পাড়ার দুর্গাপূজা কমিটিতে ওঁকে প্রতিবছর সহ-সভাপতি করা হয়, স্থানীয় ব্যায়াম সঙ্ঘের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে নিখুঁত বক্তৃতা দেবেন প্রধান অতিথি হিসেবে, নেতাজী ফিরে এলে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে রাতারাতি— এ সম্পর্কেও ওঁর দৃঢ় ধারণা আছে, এমনকি প্রতিবেশীর বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পড়তে ভুল করেছিল—তাও তিনি ধরে দিয়েছিলেন, এবং তিনি প্রতি শনিবার এসে বীণার ঘরে রাত কাটিয়ে যান। এর মধ্যে যেন কোনো বৈপরীত্য বা গরমিল নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক। চিন্তামণি রক্ষিতের আশ্রয় পেয়ে বীণা ভালোই আছে।

বীণার দিদি সাধনা খাটের ওপর এলিয়ে আধ-শোয়া হয়ে আছে, ওর পা'টা আমার গায়ে লাগছে, কিছুক্ষণ ধরেই আমি এজন্য বিরক্ত বোধ করছিলুম। সুন্দরী মেয়ে হোক আর যাই হোক, গায় পা লাগা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমি একটু সরে বসে আড়চোখে ওকে একবার দেখলুম। দেখলেই মনে হয়, বহু পুরুষের কাছ থেকে পদসেবা পেতে এ মেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বীণাকে দেখতে তেমন কিছু আহামরি নয়, কিন্তু বীণার দিদিকে সুন্দরী বলতেই হবে। কিংবা ঠিক সুন্দরীও হয়তো নয়, সৌন্দর্য ওর শরীরে ছড়িয়ে আছে, ঠিক যেন মিশ খায় নি। কোথাও কোথাও বড় বেশি ! একটা গাঢ় নীল রঙের পাতলা সিল্কের জরি বসানো শাড়ি পরেছে। এরকম জরি বসানো শাড়ি আজকাল কলকাতার মেয়েরা পরে না। মাথায় একরাশ চুল, মুখখানা নরম, ভারি নরম, তুলতুলে ফর্সা রং, মনে হচ্ছে ঠোঁট দু'টি, নাক, চোখের পাতা, আয়ত ভুরু— এগুলো সবই ছবির মতন আঁকা। কি জানি দু'একটা এর মধ্যে সত্যিই আঁকা কিনা, আমি তো আর হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছি না ! ওর সাজপোশাকে আর কী আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু চেহারার মধ্যে সত্যি একটা মুসলমান মেয়েদের ভাব এনে ফেলেছে। চোখে চোখ পড়তেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কবে এলেন ?

—সাত আট দিন হলো। গত সোমবার এসেছি।

—কি করে এলেন ?

—প্লেনে, কলোম্বো ঘুরে।

— থাকবেন এখানে কয়েকদিন ?

— দেখি ! একটা খুব দরকারে এসেছি, না এসে উপায় ছিল না।

— আপনার পক্ষে তো এখানে থাকা বিপজ্জনক। আপনার স্বামী জানতে পারলে মুশকিল হবে না ?

— না, কি আর হবে ! আমার মনটা আজ বড় খারাপ লাগছে, খাটের তলা থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা একটু তুলে দেবেন ?

অপরিচিত দু'জনের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, আমি দিচ্ছি ! সাধনা হাত বাড়িয়ে বললো, এই হচ্ছে এখন আমার স্বামী, এর নাম আবদুল হালিম। আর ঐ জন হচ্ছেন শহীদ চৌধুরী, আমার বন্ধু।

দামী সুট পরা লোক দু'টির মুখে কিছুটা আড়ষ্ট ভাব। তবু জোর করে হাসি ফোটাবার চেষ্টা আছে।

আমি দু'হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিলুম, তারপর কি ভেবে একটা হাত শুধু তুললুম। ওরাও দু'জনে এক হাত কপালের কাছে তুললো।

আমার একটা কথা ভেবে মজা লাগলো যে একটু আগে বীণা অজয়বাবুকে জামাইবাবু বলেছে। সে বেচারা তো খারিজ হয়ে গেছে, তবু বোধহয় পুরোনো অভ্যেস থেকেই বীণা এখনো তাকে জামাইবাবু বলে।

শহীদ চৌধুরী নামের লোকটি বললো, এবার বোধহয় আমাদের উঠতে হবে। সাধনা প্রায় ধমকের সুরে তাকে বললো, বসো না ! অত ব্যস্ত কিসের ! লোকটি বললো, না, ব্যস্ত নই, কিন্তু আমরা ঘর আটকে বসে আছি, ওদের হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, ওদের নিজস্ব কিছু ব্যাপার থাকতে পারে ! অবিনাশ হা–হা করে হেসে উত্তর দিলো, না, আমাদের নিজস্ব কোনো গোপন ব্যাপার নেই। আমাদের সবই এক সঙ্গে। বসুন !

বীণা চা নিয়ে ঢুকে বললো, একি সবাই মদ খাওয়া শুরু করেছো, তা হলে আমি চা বানালুম কেন ? আমি বললুম, আমাকে চা দাও। আমি চা–ই খাবো। শেখরও বাথরুম থেকে ফিরে বললো, আমাকেও চা দাও, আমার মাথা ঘুরছে এখনো।

সত্যি, পুরোনো রোগীর মতন শেখর দেয়াল ধরে ধরে হাটছে। চোখের মধ্যে কেমন ঘোর ঘোর ! আমি বললুম, তোর কী হয়েছে ? শেখর বললো, কালকে মাথার মধ্যে কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিল সেই থেকে শরীরটা খারাপ লাগছে। এখন প্রায় ঠিক হয়ে গেছে অবশ্য।

বীণা কোপের সঙ্গে বললো, অত করে বারণ করলুম ঐ ছাইভস্মগুলো না খেতে, তবু খাওয়া হলো !

খাট পর্যন্ত পৌছে, খাটের বাজু ধরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শেখর এক হাতে বীণাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, দূর পাগলি ! অত ভয় কিসের।

বীণা খানিকটা ছটফট করে বলে উঠলো, এই, কি হচ্ছে ! এত লোকের সামনে—!

শেখর আবেগময় গলায় বললো, কোনো লোক নেই। চোখ বন্ধ করো, তাহলেই আর কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। এসো, একটা চুমু খেতে দাও ... ওকি, জোরে ধাক্কা দিও না, পড়ে যাবো, এমনিতেই দাঁড়াতে পারছি না।

বীণা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, এখন নয়, পরে, পরে।

— পরে নয়, এখন, এখন ! এখন ইচ্ছে হয়েছে, এখনই।

— না না না।

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কি রকম যেন অন্যমনস্ক লাগলো, আজকে এই ঘরের হাওয়াটা কি রকম যেন অস্বস্তিকর, কথাবার্তা বারবার কেটে কেটে যাচ্ছে। শেখরের সঙ্গে আগে যখন এখানে এসেছি, একটা প্রবল হুল্লোড় দেখেছি তখন, বীণা অত্যন্ত বেশি মদ খেয়ে নাচের ভঙ্গি করতে করতে (নাচ জানে না) হুড়মুড় করে পড়ছে একদিন আলমারির গায়—ঝনঝন শব্দে ভেঙেছে কাচ, আর, স্ত্রীলোকের কাছাকাছি কাচ ভাঙার শব্দ এমন মানায়, আমার মনে হয়েছিল মেয়েদের আশেপাশে অনবরত কাচ ভাঙতে থাকুক, সেই শব্দে আমি এত মজা পেয়েছিলাম যে ঠং করে অ্যাশট্রে ছুঁড়ে মেরেছিলাম আলমারির বাকি পাল্লার কাচে। আজ এখানে

নানা ধরনের লোকের ভিড়ে কি রকম যেন একটা মিটিং মিটিং ভাব। যমুনাদের বাড়িতে গিয়ে যমুনাকে না পেয়ে আমার মন খারাপ লেগেছিল। মন-খারাপ থেকে রাগ। যখন রাগ আসে খানিকটা অকারণে, তখন কিছু একটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে, আর পৃথিবীতে যতগুলো ভাঙার জিনিস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে নিয়ম ভাঙা। আমি সেইরকমই কিছু একটার আশায় এখানে এসেছিলাম, যমুনাদের বাড়িতে গিয়ে অপমানিত বোধ করেছিলুম আজ। কে ঠিক অপমান করেছে তা বলা যায় না, তবু সব মিলিয়ে কি রকম যেন—যমুনাকে না পাওয়াই তো বড় অপমান। যমুনা, তোমাকে আমার চাই। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি এখানে এসে ভুল করেছি। আর কোনোদিন আসবো না। এখানে কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, অন্য কিছু একটা ব্যাপার চলেছে, যার সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

শেখর প্রগাঢ়ভাবে চুমু খেলো বীণাকে। শেখরের হাত দুটো বীণার চুলের মধ্যে মুঠো করা, একটু আগে আয়নার সামনে অত যত্ন করে চুল বেঁধেছে বীণা সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বীণা বললো, উঃ রাক্ষস একটি ! অবিনাশ বললো, এদিকে এসো তো বীণা, আমিও একটা চুমু খাই !

বীণা বললো, ইস্, অত আর শখ করে না।—অবিনাশ নেকড়ের মতন লাফিয়ে এসে বীণাকে জড়িয়ে ধরলো। খানিকটা ঝটাপটির পর অবিনাশের সশব্দ চুম্বনের দৃশ্য দেখা গেল। রাগে ফুলে ওঠা বিড়ালীর মতন বীণা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, নিন, আপনি আর বাকি থাকেন কেন ?

আমি হেসে বললুম, আগে মুখ ধুয়ে এসো।

-- কেন, মুখ ধুতে হবে কেন ?

— অবিনাশের এঁটো কে খায় ?

অবিনাশ বললো, এই শালা—

খাটের ওপর থেকে সাধনা খিলখিল করে পাগলাটে ধরনের হেসে বললো, আমারটা এঁটো নেই, আসুন !—আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, কই আসুন,—তারপর আবদুল হালিমের দিকে বক্র চোখে তাকিয়ে সেইরকম পাগলাটে হাসি। আমি তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে বললুম, ওরে বাব্বা, তারপর খুন হয়ে যাই আর কি !

সাধনা আদুরে গলায় বললো, এই, এই, ধরো তো লোকটাকে। আবদুল, ওকে আমার কাছে এনে দাও না। ওকে আমার একটা চুমু খেতেই হবে !

আমি পালাবার ভঙ্গি করে বললুম, খবরদার আজ কেউ আমাকে ছোঁবে না বলে দিচ্ছি ! আবদুল হালিম আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, হেসে বললো, আপনি ভয় পাচ্ছেন ?

আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, ভয় না, ঘেন্না !

আবদুল হালিমের মুখখানা শুকিয়ে গেল, যেন আমার কথা ও বুঝতেই পারলো না। অবিনাশ বললো, নূরজাহান বেগম, আমাকে একটা চান্স দেবে ?

সাধনা তখন গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। শেষ করে বললো, যাঃ, মনটা আবার খুব খারাপ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ব্যথা করছে।

আবদুল হালিম বললো, সাধনা এবার হোটেলে ফিরবে নাকি ?

সাধনা বললো, না, শরীরটা খারাপ লাগছে। এখানে আর একটু শুয়ে থাকি। তুমি বসো না।

বীণা বললো, দিদি, তুই আর অত খাস না ! একেই তোর শরীর খারাপ—

মুহূর্তে গলার আওয়াজ বদলে গেল সাধনার, যেন ফুঁপিয়ে উঠলো, আমার শরীর খারাপ না রে, শরীর ভালো আছে, কিন্তু আমার মনটা যে কিছুতেই ভালো হচ্ছে না।

শেখর আমার হাত ধরে বললো, চল্ সুনীল, ছাদে যাবি ? যা গরম, ছাদে গেলে হাওয়া পাওয়া যাবে ! ওখানে একটা সুন্দর ছোট্ট ঘর আছে। শনিবার দিন তো চিন্তামণিবাবু এসেছিলেন— আমি সেদিন ছাদের ঘরে ছিলাম। বেশ লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন বিদেশে বেড়াতে এসেছি।

অবিনাশ বললো, চল্, ব্র্যান্ডির বোতলটা নিয়ে ছাদে গিয়েই বসি। বিলিতি জিনিস, সুনীল একটু চেখে দ্যাখ্।

ছাদে উঠে আমি শেখরকে বললুম, ওরা এসে জুটলো কোত্থেকে ?

— কেন, তোর ভালো লাগছে না ?

— না, একটুও না।

— অত বড় একটা ফিল্‌ম স্টার তোকে চুমু খেতে চাইলো, তুই রাজি হলি না ? কত লোক এই সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যেতো।

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, কি ছেলেমানুষের মতন কথা বল্‌ছিস্ ! ভারি আমার ফিল্‌ম স্টার ! এখানে কে চেনে ওকে ? তা ছাড়া হিন্দুর মেয়ে এই রকমভাবে কোনো মুসলমানকে বিয়ে করলে আমার ভালো লাগে না !

— তুই দেখছি কমুনাল হয়ে উঠলি !

— কমুনাল ফমুনাল জানি না ! ভালো লাগে না, ভালো লাগে না ! জাতটাতের জন্য নয়, মেয়েটার শরীরের মধ্যে লোভ ছাড়া যেন আর কিছুই নেই ! ওরকম আদুরে আদুরে ন্যাকা ন্যাকা ঢঙের মেয়ে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না ! সিনেমায় নামের লোভে নিজের স্বামীকে ছেড়ে একটা মুসলমানকে বিয়ে করা—

অবিনাশ বললো, একটা নয় তিনটে। ঐ আব্দুল হাকিম ওর তিন নম্বরের নিকে করা স্বামী।

শেখর বললো, যার যা ইচ্ছে, সে তার নিজের পছন্দ মতো কাজ করবে, মানুষের এই স্বাধীনতায় তুই বিশ্বাস করিস না ?

—করবো না কেন ? যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে, কিন্তু তার সবগুলোই যে আমার পছন্দ হবে তার কোনো মানে নেই। শুধু লোভ দিয়ে তৈরি করা একটা শরীর, দেখলে আমার ঘেন্না হয়। দয়া-মায়া-স্নেহ এগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই।

শেখর আস্তে আস্তে বললো, শুধু একটা লোভী মেয়েকে দেখলে আমারও সহ্য হতো না। কিন্তু ঐ মেয়েটার আর একটা অসম্ভব দুর্বলতা আছে, যা ওর মতো মেয়ের পক্ষে অবিশ্বাস্য—

—যাক গে, চুলোয় যাক্। ওর কথা বাদ দে। তুই এখানে হঠাৎ লুকোবার কথা ভাবলি কেন ? গোড়া থেকে বল্। এল এস ডি খাবার জন্য এখানে এসে দিনের পর দিন পড়ে রইলি?

একটাই মাত্র গ্লাশ এনেছিল অবিনাশ, তাতে প্রায় ভর্তি করে ব্র্যান্ডি ঢাললো। নূরজাহান বেগমের আনা দামী ফরাসি ব্র্যান্ডি। অবিনাশ একটা চুমুক দিয়ে বললো, একটু চেখে দেখবি নাকি ? আমি ওর হাত থেকে গেলাশটা নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সবটা গলায় ঢেলে দিলাম। জিভ না ছুঁয়ে জিনিসটা জ্বলতে জ্বলতে গলা দিয়ে নামতে লাগলো। আঃ, শুকিয়ে ছিল গলাটা, জ্বালিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তুললো, আঃ, আর একটু জ্বলুক, এবার জ্বালাটা এসে পৌঁছালো বুকে, সাপের মত মোচড়াতে লাগলো, আরও নিচে নামবে, পেট পর্যন্ত, পেটের কাছে জ্বলছে, জ্বলুক, গলা-বুক-পেট, এতক্ষণ এদের কথা মনেও পড়ে নি, এখন বুঝতে পারলুম ওরা আছে, জ্বালা করছে বলেই টের পাচ্ছি, আর একটু জ্বলুক। আমি অবিনাশকে বললুম, দে, আর একটু দে আমায় ! শেখর বললো, আমি খাবো না। আমার মাথার মধ্যে এখনো বোঁ-বোঁ করছে। অবিনাশ জোর দিয়ে বললো, নে না একটু। অসুখ হলেই তো লোকে ব্র্যান্ডি খায় ! তুই কাল দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে খেতে গেলি কেন ?

— একটা দারুণ ইচ্ছে হলো, দেখি না কি হয়। ভেবেছিলুম অলৌকিক একটা কিছু দেখতে পাবো। উঃ, কাল হরিবল্ নাইট গেছে !

আমি বললুম, কি করে জোগাড় করলি বল না ! এখানে কেউ কখনো এল এস ডি খেয়েছে বলে তো শুনি নি।

শেখর বললো, ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি প্রথমে কিনতে চাই নি। প্রথমে রিফিউজ্ করেছিলুম। তারপর হঠাৎ মত বদলে ফেললুম। ব্যাপারটা কি হলো জানিস্, গত সপ্তাহে সেদিন ছিল সোমবার, বাড়ি থেকে অফিসে বেরুচ্ছি সেজেগুজে, পালিশ করা জুতো, টাই-ফাই সব ঠিক ছিল, মনের মধ্যেও কোনো খিঁচ ছিল না, আস্তে আস্তে শিস দিচ্ছিলাম পর্যন্ত, দরজা দিয়ে বেরুতে যাচ্ছি—হঠাৎ চৌকাঠে একটা হোঁচট খেলাম। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম। মা বললেন, অমঙ্গল, এক্ষুনি বেরোস না, আবার ঘরের মধ্যে একটু বসে যা ! জানিস তো মায়ের ব্যাপার, আমি এসব অগ্রাহ্য করে মাকে কষ্ট দিতেও চাই না। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে চেয়ারে আবার বসলাম। ঠিক করলুম, মনে মনে একশো গুনে আবার বেরুবো। সেই একশো পর্যন্ত গোনা কি যে অসহ্য মনে হতে লাগলো তোকে কি বলবো। বিরক্ত হয়ে তেতো মুখে এক একটা সংখ্যা গুনছি—আর মাথার মধ্যে যেন দম্‌দম্ করে হাতুড়ি পড়ছে। যাই হোক, তারপরে বেরুলাম, তখন থেকে মনটা খিঁচড়ে রইলো। বেরিয়ে এসে ট্রামে-বাসে উঠতে পারি না—এত ভিড় ! অন্যদিনও তো এরকম হয়, কিন্তু সেদিন যেন রাগে গা জ্বলে যেতে লাগলো। ইচ্ছে হলো গলার টাইয়ের দুটো ফেট্টি দু'দিকে জোরে টেনে ধরে দমবন্ধ করে নিজেকে মেরে ফেলি। বুঝতে পারছিস্ আমার কী রকম লাগছিল ?

অবিনাশ বললো, খুব স্বাভাবিক। মাইরি, ভেতরে ভেতরে যেন রাগ জ্বলছে সবসময়। কখন কিসে ফস্ করে বেরিয়ে পড়বে ঠিক নেই। এক এক সময় আমাদের অনেকেরই কিসের ওপর যে রাগ তাও বোঝা যায় না।

আমি বললুম, তা ঠিক। কাচের গ্লাশে জল খাবার পর ইচ্ছে করে, এক এক সময় গ্লাশটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে—তার কারণ হয়তো সকালবেলা কাগজে ভিয়েৎনামে বিশ্রী যুদ্ধের খবর পড়েছি। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষে চারদিকে লোকের না-খেয়ে মরার খবর শুনলে হয়তো বিকেলবেলা একটা মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। তুই যে সেদিন বারীনদাকে মারতে গেলি, তোর আসল রাগ হয়তো বারীনদার ওপর ছিল না, তোর রাগ ছিল কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর।

অবিনাশ খুক করে হেসে বললো, ব্যাপারটা বোধহয় এত সরলও না— অন্য লোকের দুঃখ-টুঃখ নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। ভেবে দ্যাখ অনেকের তুলনায়, আমাদের বেশ ভালো থাকার কথা। আমাদের সবারই চাকরি আছে, স্বাস্থ্যও খারাপ নয় হেসে খেলে বেশ তো সুখে জীবনটা কাটিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিসের যে এত ছটফটানি কিচ্ছু বুঝি না।

শেখর বললো তারপর শোন না। অফিসে তো পৌঁছোলুম। আমাদের সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গো-ডাউন ইনস্পেক্টারটা, ল্যারি, ওর পাশে দেখলুম একটা ছোকরা সাহেব বসে আছে। ল্যারিকে মনে আছে তো ? সেই যে আমাদের হাওড়ায় একটা হাউজি খেলার আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিল !

অবিনাশ বললো, ওটা তো একটা মহা চিটিংবাজ। আমাদের অনেক টাকা ঠকাবার চেষ্টা করেছিল সেবার। নেহাৎ তোর অফিসের লোক বলেই দাঁত ক'খানা ভেঙে দিই নি !

—ল্যারি আমার সঙ্গে সাহেবটার আলাপ করিয়ে দিল। ছেলেটার নাম স্যান্ডি গ্রোভার, জাতে ক্যানেডিয়ান, আমেরিকায় থাকে, আর্টিস্ট, সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে। ঐ বীটগুলো যেমন

বাওরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরই একটা আর কি ! ল্যারি আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, আর য়ু ইন্টারেস্টেড ইন এল এস ডি ? ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ফ্রম হিম্ !— স্যান্ডি বলে সেই ছোঁড়াটা আমাকে বললো, ও কতগুলো এল এস ডি ট্যাবলেট স্মাগ্‌ল করে নিয়ে এসেছে। ওর নিজের ব্যবহারের জন্য, ও নাকি অ্যাডিক্ট। যাই হোক, ওর হংকং যাবার প্লেন ভাড়া নেই, ও আমাকে ছ'টা ট্যাবলেট বিক্রি করতে পারে তিনশো টাকায়। আমি বললুম, স্যরি, আমার দরকার নেই। এই বলে ওদের কাটিয়ে দিলুম। তখন আমি ভেবেছিলুম কিছু একটা বাজে জিনিস আমাকে গছাবার চেষ্টা করছে। জিনিসটা যাই হোক, তখনো আমি পুরোপুরি পালাবার কথাটা ভাবি নি।

শেখর আমার দিকে চোখ তুলে বললো, কিন্তু না কিনে আমার উপায় ছিল না। কে আমাকে কিনতে বাধ্য করলো, কে জানে ! একটা জিনিস লক্ষ করেছিস্, আমাদের ইচ্ছেশক্তি কি রকম দুর্বল হয়ে গেছে এখন ! মুহূর্তে মুহূর্তে ইচ্ছেগুলো কি রকম বদলে যায় !

অবিনাশ বললো, তা নয়, ভেতরে ভেতরে সবসময় একটা তীব্র ইচ্ছে থাকে, বাইরের নানা যুক্তি দিয়ে সেটাকে কাটাবার চেষ্টা করি, কিন্তু হঠাৎ সেটা ঠিক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

— লাঞ্চ পর্যন্ত আমি ঠিক ছিলুম, সকাল দশটার চাপা রাগটা অনেকটা কমে আসছিল, মন দিয়ে কাজ করে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলুম। এমন সময় দুটো ঘটনা ঘটলো। আরাদের অফিসে একটি রেকর্ড সাপ্লায়ার আছে, বিষ্টুপদ—রোগা সিড়িঙ্গে চেহারার লোকটা। আমি লাঞ্চ খেতে বেরুচ্ছি, এমন সময় বিষ্টুপদ এসে আমার সামনে হাত কচলাতে লাগলো। বললে, স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি বললুম, কী ব্যাপার, তাড়াতাড়ি বলুন, আমি বেরুবো। লোকটা বললো, স্যার, আমাকে কুড়িটা টাকা দিন। আপনার কাছে না চেয়ে উপায় ছিল না, তাই এলাম। তিনদিন বাড়িতে রান্না হয় নি, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, কাল থেকে কিছু জোটে নি—। আমি বিব্রত হয়ে বললুম, এরকমভাবে ধার দেওয়া আমি পছন্দ করি না—। বিষ্টুপদ বললো, ধার নয় স্যার। আপনি আমাকে দান করুন। অফিসে কোথাও আমার কিছু পাওনা নেই, বাড়িতে একটা জিনিস নেই যা বিক্রি করে দিতে পারি, অনেকের কাছে ধার করেছি—শোধ দিই নি, ধার চাইলে কেউ আমাকে আর দেবে না। সারা অফিসে আপনিই একমাত্র ভালো লোক, আপনার কাছেই প্রথম দান চাইতে এলাম। অন্তত কুড়িটা টাকা না হলে এ-মাসটা কিছুতেই চালাতে পারবো না। ভেবে দ্যাখ, সারা অফিসের মধ্যে আমাকেই দাতা হিসেবে বেছে নিয়েছে ! শুনলে রাগ হয় কিনা ! লোকটার প্রার্থনার মধ্যে এমন একটা নির্লজ্জতা ছিল যে, শুনলে গা ঘিনঘিন করে। তিন দিন ধরে খাক্ বা না খাক্ তিনচারদিন দাড়ি কামায় নি, মুখের চেহারাটা কেমন রুক্ষ আর হিংস্র। এই রকম মুখওলা লোকেরাই আত্মহত্যা করে। তা ছাড়া আমি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি, এই সময় একটা ক্ষুধার্ত লোক এসে আমার কাছে টাকা চাইছে ব্যাপারটা কি রকম ভাল্‌গার। আমার ব্যাগে গোটা কুড়িক টাকাই ছিল, আমি ওকে সব টাকা দিলে আমার খাওয়া হয় না, কিন্তু একথা ওকে বলা যায় ? লোকটা ঘ্যান ঘ্যান করে যাতে আমার নামে প্রশংসা বেশিক্ষণ চালিয়ে না যেতে পারে—এই জন্য আমি ওকে বিদায় করতে চাইলাম। খুব অস্পৃশ্য জিনিস বাধ্য হয়ে ছুঁতে গেলে যেমন হয়, আমি দু'আঙুলে নোটগুলো তুলে ওকে দিয়ে, কড়া গলায় বললুম, লাল ফ্লাগ লাগানো ফাইলগুলো সব বড় সাহেবের ঘরে দিয়ে আসুন এক্ষুনি ! কারুকে কিছু দান করলে মনের মধ্যে একটা অহঙ্কার আসার কথা, কিন্তু আমার বিরক্ত লাগতে লাগলো।

—আর এই জন্যই তুই আবার তিনশো টাকা খরচ করে ফেললি ? অবিনাশ বললো। আমি বললুম, উঁহু, শেখর তো বললো, আর একটা ঘটনা আছে। সেটা কি ?

—সেটা ঠিক ঘটনা নয়। বিষ্টুপদকে টাকাটা দিয়ে আমি হাত মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে এলুম। অস্পৃশ্য জিনিস ছোঁয়ার মতই গা'টা ঘিনঘিনে লাগছিল। তখন সত্যি সত্যি ঐ রকম একটা

জিনিস ছুঁয়ে ফেললুম ! বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতে গেছি, দরজার হাতলের গায় একটা টিকটিকি ছিল—আমি সেটা দেখতে পাই নি। ওফ্, টিকটিকির গায় হাত লাগলে কি বিচ্ছিরি লাগে জানিস্ তো, জানি না তোদের লাগে কিনা, আমার হাতখানা যেন পচে গেল, সেই ঠাণ্ডা জিনিসটার গা ছুঁয়ে ফেলে আমার যেন শরীর শিউরে উঠলো। টিকটিকিটা চটাস্ করে পড়লো মাটিতে—আমি রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে, ড্যাম ইট, ড্যাম ইট বলে, সেটাকে জুতো দিয়ে মারার চেষ্টা করলাম। মারা সহজ নয়, সেটা সাড়াৎ করে দেয়াল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে গেল, একেবারে পালিয়ে গেল না, সেই শুয়োরের বাচ্চা টিকটিকিটা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। বাথরুমে এমন একটা কোনো জিনিস নেই—যেটা দিয়ে আমি ওটাকে খুঁচিয়ে মারতে পারি। কি অসহ্য রাগ, অসহায় ভাব আর ঘেন্না জেগেছিল তখন কী বলবো ! আমি বেসিন থেকে জল নিয়ে সেটার দিকে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম। সেটা আর একটুও নড়লো না। শুয়োরের বাচ্চাটাকে না মারতে পারলে আমার কিছুতেই গায়ের ঝাল যাচ্ছিল না। কিন্তু সেটাকে মারার কোনো উপায় নেই। আমার তখন কান্না পেয়ে যাবার মতন অবস্থা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি আবার বিষ্টুপদ। বিষ্টুপদ বললো, স্যার, বড় সাহেব বললেন—। আমি তার দিকে রক্তচক্ষু তুলে বললাম, ড্যাম ইট ! তারপর সোজা ক্যাশে এসে কো-অপারেটিভ ফান্ড থেকে পাঁচশো টাকা ঝট করে তুলে নিয়ে ল্যারিকে গিয়ে বললাম, কোথায় তোমার সেই বন্ধু ? আমি ওগুলো কিনবো। তোরা হয়তো বলবি, আমার ও ব্যবহারের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। সত্যিই নেই হয়তো, আমি দেখাতে পারবো না, কিন্তু সেই তখন শুধু একটা কথাই আমার মনে হচ্ছিল, আমার ছুটি চাই, আমার ছুটি চাই—তোরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারছিস না আমার তখনকার—

অবিনাশ বললো, ঠিকই বুঝতে পারছি। তারপর বলে যা—

—ল্যারিদের পাড়ায়, ইলিয়ট রোডের একটা হোটেলে স্যান্ডি গ্রোভার ছেলেটা থাকে। ঠিকানা নিয়ে আমি ওকে খুঁজে বার করলাম। আমাকে বলে দিল যে, যেখানে সেখানে বসে ওই ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। একটা নিরাপদ জায়গা দরকার, যেখানে বিছানায় শুয়ে থাকা যায় এবং মাথার কাছে সবসময় একজন দেখাশুনো করবার লোক থাকবে। যে দরকার হলে যদি তেষ্টা পায় জল এগিয়ে দেবে, মাঝে মাঝে কথা বলে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করবে, পায়ের তলাটা হাত দিয়ে ঘষে দেবে। এ ট্যাবলেট খেলে তো সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় না, অনেকটা পেথিড্রিন নেবার মতন নেশা। একা একা খেলে নাকি দারুণ মৃত্যুভয় আসে। তখন আমি ভেবে দেখলুম, বীণার এখানে আসাই বেস্ট। তোদের কারুর কথা তখন মনে পড়ে নি, আসলে আমি ভেবেছিলুম, এমন দামী জিনিস—নিজেই একা এর সুখটুকু ভোগ করবো। কিন্তু খাবার পর দেখলুম, এতে শুধু সুখই নেই, দুঃখও হয় প্রচণ্ড। ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে আবার দেখার মধ্যে একটা বিষম দুঃখ আছে। দুঃখ পাবার পরই বুঝলুম, এটা তোদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার। তোর জন্য আমি কাল পর্যন্ত একটা রেখেছিলুম—

— কাল রাত্রে তোর কি হলো বল্ !

—প্রথম দিন সন্ধেবেলা যখন এলুম, তখন বীণার ঘরে লোক ছিল। তাকে কাটাতে কাটাতে ন'টা বাজলো। একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে রইলাম, বীণা যত্ন করেছিল খুব, যখন নেশা কাটলো, তখন রাত দেড়টা প্রায়, শরীর অসম্ভব দুর্বল, বাড়ি ফেরার কোনো উপায় নেই। পরের দিন সকালবেলাই তো নূরজাহানরা এসে হাজির। তখন এমন একটা নতুন ধরনের ফূর্তি আর আমোদের ব্যাপার আরম্ভ হলো যে, মনে হলো দূর ছাই, আর বাড়ি ফিরে কি হবে? এই তো বেশ আছি ! অফিস থেকে বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে একটা কোথাও চেঞ্জে এসেছি। মেয়েছেলের বাড়িতে রাত্তিরে আসা এক জিনিস—আর সকাল থেকে সারাদিন সারারাত থাকা সত্যিই অন্য

জিনিস। সবই স্বাভাবিক, দয়া–মায়া–মান–অভিমান সবই আছে শুধু কোনো বন্ধন নেই। অদ্ভুত না? আমি এরকম স্বাদ আগে পাই নি। যাই হোক, পরদিন রাত্তিরে, আমি আর নূরজাহান দু'জনে দুটো ট্যাবলেট খেলাম, বীণা রাজি হয় নি। এল এস ডি খেয়ে নূরজাহানের কি কান্না! তুই বললি, ওর শরীরে শুধু লোভ? সেই কান্না যদি তুই দেখতিস! কি সব স্মৃতি ওর মনে পড়েছিল কে জানে! কিছুই বলে নি, কিন্তু পরের দিনও সারাদিন কেঁদেছে। এরপর তোদের খোঁজ করতে লাগলুম। তোকে পাওয়া গেল না, তোর বাড়িতে কে যেন মারা গেছে শুনলুম। কে মারা গেছে রে?

—দাদামশাই।

—তোর সেই বহরমপুরের দাদামশাই? আহা, বেশ ভালো লোক ছিলেন।

নিচতলা থেকে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শোনা গেল। কে যেন শেখরের নাম ধরে ডাকছে। শেখর বললো, দাঁড়া দেখে আসি!

বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, দূরে হাওড়া ব্রিজের মাথায় লাল আলোটা দেখা যায় এখান থেকে। অবিনাশ ব্র্যান্ডির বোতলটা প্রায় শেষ করে এনেছিল, বললো, আর একটুখানি আছে, খাবি নাকি? আমি শেষটুকু চুমুক দেবার সময় অবিনাশ বললো, তুই ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কি করছিস রে?

আমি চমকে উঠে বললুম, কোন্ বাচ্চা মেয়ে?

—ভাবছিস টের পাই না? সব খবর পাই। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, বাচ্চা মেয়েরা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক জিনিস। আমি শান্তাকে ছুঁতে গিয়েছিলাম, আমার দু'হাত এখনো ঝলসে আছে, দ্যাখ!

—তুই কার কথা বলছিস?

—ন্যাকামি করছিস কেন? কাল তোকে দেখলুম, একটা বাচ্চা খুকীর সঙ্গে বাসে উঠছিস ভবানীপুর থেকে। তোর চোখ মুখ দেখেই বুঝেছিলুম, তুই একটা মতলব ভাঁজছিস ওকে নিয়ে। তোকে সত্যি সাবধান করে দিচ্ছি, ওরা ডেঞ্জারাস! ওরা প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে, যে তোর সব কথা বিশ্বাস করবে, তার কাছে তুই একটা মিথ্যে কথা বলেও পার পাবি না।

—অবিনাশ, প্লিজ, তুই ঐ মেয়েটি সম্পর্কে কিচ্ছু বলিস না!

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে বললো, কেন, কি ব্যাপার?

আমি বললুম, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করিস না। আমি এই একটা ব্যাপার সবার কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই।

—গোপন! —অবিনাশ বিশ্রীভাবে নেশা ধরা গলায় হাসতে লাগলো। আবার বললো, পারবি গোপন রাখতে?

—তুই অন্তত আমার পেছনে স্পাইগিরি করিস না। আমাকে কয়েকটা টাকা দে তো, আমি এখন এখান থেকে সরে পড়বো। আমার এ জায়গাটা ভালো লাগছে না।

শেখর ফিরে এসে বললো, নূরজাহান বেগম অজ্ঞান হয়ে গেছে!

কথাটা কি রকম নাটুকে ভগ্নদূতের ঘোষণার মতন, আমার হাসিই পেয়েছিল, কিন্তু অবিনাশ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, কি ব্যাপার?

শেখর ওর হাত ধরে টান দিয়ে বললো, বিশেষ কিছু না, তুই বোস না! বুকের মধ্যে ব্যথা করছে, শরীর খারাপ লাগছে—এই রকম বলছিল, হঠাৎ ছটফট করে বিছানার ওপর গড়াতে গড়াতে জামাকাপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করে পাগলের মতো। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। বীণা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তবে ওর সঙ্গে লোক দু'জন বললো, এরকম নাকি ওর বছর দুয়েক ধরে মাঝে মাঝেই হচ্ছে, খানিকক্ষণ ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যায়। এইজন্যই এত ঝঞ্ঝাট করে

ওকে কলকাতায় নিয়ে আসা !

আমি বললুম, কেন, ঢাকায় বুঝি চিকিৎসা হয় না এর ! সত্যি সত্যি রোগ না ন্যাকামি ?

শেখর বললো, সুনীল, তুই পুরো ব্যাপারটা না জেনেই আগে থেকে একটা ভুল ধারণা করে আছিস। সাধনা কলকাতায় এসেছে ওর ছেলেকে নিয়ে যেতে।

—ওর আবার ছেলে আছে নাকি এখানে ?

—তুই না জেনেই ওকে কেন খারাপ ভাবছিস ! অজয়বাবুর কাছে ওর ছেলেটা রয়ে গেছে। সেই ছেলের জন্যই ওর এই অসুখ। ছেলেকে না পেলে ও আর কলকাতা থেকে ফিরবে না।

—অজয়বাবু ছেলেটাকে দিতে চান না ?

—না ! সেই তো মুশকিল।

বীণা আর সাধনার পূর্ব ইতিহাস আমি অস্পষ্টভাবে জানতুম। শেখরের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিলুম এখন সম্পূর্ণটুকু। বীণাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব মিল আছে। ওরাও তিন বোন, এক ভাই বুড়ো বাবা-মা'র সঙ্গে পাকিস্তান থেকে চলে আসে। এখানে ওদের কোনো আত্মীয় ছিল না, বীণার বাবা লেখাপড়াও জানতো না, বেলঘড়িয়ার একটা মুদির দোকানে কাজ নিয়েছিল বীণার বাবা, বীণার ছোট ভাই ট্রেনে ট্রেনে চানাচুর ফিরি করতে গিয়ে কাটা পড়ে। তারপর যা হয় আর কি, বাড়িতে তিনটে সমর্থ যুবতী মেয়ে, ওদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার লোক জুটতে এবং ওরাও ছিনিমিনি খেলার সামগ্রী হতে রাজি হতে বিশেষ দেরি হয় না। বাঙাল দেশের মেয়ে কলকাতা শহর দেখলে তো হকচকিয়ে যাবেই,—আমিই গিয়েছিলাম—ওদের আর দোষ কি। বাড়িতে অভাবের সংসারে দিনরাত বকুনি আর মুখঝামটা, অথচ রাস্তায় বেরুলেই ভালো ভালো পোশাক পরা লোকেরা পুজোকরা চোখে তাকায়, তৈলাক্ত নাক নিয়ে কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে কথা বলতে এগিয়ে আসে, সুতরাং মাথা ঘুরতে দেরি হলো না। সবচেয়ে বড় বোন জ্যোৎস্না প্রথম ঝরে গেল, একদিন রাত্রে সে বাড়ি ফিরলো না, আর কোনোদিনই ফেরে নি। জ্যোৎস্নার আর কোনো সন্ধানই পায় নি ওরা। সাধনাই বরং সৌভাগ্যের মুখ দেখেছিল কিছুদিন, একটা সাবান কোম্পানির সেলসগার্লের চাকরি পেয়েছিল, সেখানেই আলাপ অজয় সেনগুপ্তের সঙ্গে। অজয় সাধনাকে ধর্মমতে বিয়ে করেছিল। বেশ সুখেই ছিল কিছুদিন, বাপ-মাকে কিছু সাহায্যও করতো তখন, বীণাকেও কাছে রেখে লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সাধনার রূপের ছটা ছিল, একটু ঘষামাজা রূপ ও ব্রেসিয়ার-ব্লাউজ পরার ফলে সেই রূপকে অনেকে ভেবেছিল দুর্লভ। এ রকম রূপ তিলজলার এঁদো গলির একতলা বাড়িতে আটকে রাখা যায় না। রূপ হচ্ছে সকলের ভোগের জন্য। সুতরাং অজয় তার রূপবতী বউকে সিনেমায় নামাবার চেষ্টা করলো। অজয়ের একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু ছিল, সে লোভ দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করালো কিছুদিন—দু' একটা অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট, দু' একটা সিনেমায় সখী কিংবা ঝিয়ের রোলে দু'এক সিন। অজয় পেলো টাকার স্বাদ, সাধনার লাগলো নেশা। এসব একেবারে ছক বাঁধা, শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, কলকাতায় এখনই এই মুহূর্তেই অন্তত তিরিশটা বাড়িতে ফটোগ্রাফার কিংবা সিনেমার দালালরা চা খেতে খেতে তিরিশজন রূপসী, নম্র, নতমুখী মেয়েকে বলছে, আঃ সিনেমায় নামলে আপনাকে যা মানাতো!—সেই তিরিশজনই অবশ্য শেষ পর্যন্ত সিনেমায় নামার যা যা আনুষঙ্গিক ও অনুপান সেগুলো শরীরে মেখে, শেষ পর্যন্ত দেয়ালের লেখায় কোনোদিন নিজের নাম খুঁজে পাবে না। সাধনাও ঐভাবেই শেষ হয়ে যেতো, হঠাৎ একটা নাটকীয় ব্যাপারে তার ভাগ্য বদলে গেল।

পাকিস্তানে বাংলা ফিল্ম তোলার জন্য নায়িকার অভাব, ওখানে তখন সদ্য ফিল্ম তোলা শুরু হচ্ছে, ঢাকা থেকে কয়েকজন ফিল্মের লোক এসেছিল কলকাতায়, সেই ফটোগ্রাফার বন্ধু

তাদের কাছে সাধনাকে চালান করে দিল। কিছুদিন হোটেলে হোটেলে খুব ফুর্তি হলো, অজয় রোজ পকেটভর্তি টাকা ও গলাভর্তি মদ নিয়ে বাড়ি ফেরে। তখনও নেহরু–লিয়াকত চুক্তি বানচাল হয়ে যায় নি, দু' দেশে অবাধ বাণিজ্য ছিল, ঠিক হয়েছিল পাকিস্তানের ফিল্ম কলকাতাতেই তৈরি হবে। কিন্তু একদিন পাখি উড়ে গেল, সাধনাকে সঙ্গে নিয়ে লোকগুলো পালিয়ে গেল ঢাকায়।

ইতিমধ্যে বীণারও সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছিল। বাড়িতে ফিল্মের নষ্ট লোকজনের অবাধ যাতায়াত, সেখানে একটি স্বাস্থ্যবতী ডবকা মেয়ে আর কতদিন অনাদরে থাকবে ! আর একটি ফটোগ্রাফার বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে বীণাকে ঘরের বার করলো, কালীঘাটে নাকি মালা-সিঁদুরও পরিয়েছিল, সে বীণাকে নিয়ে চলে যায় দিল্লীতে। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য জানা গেল, বর্ধমানে লোকটার নিজের বাড়িতে তিনটি বাচ্চা সমেত বেশ একটি জবরদস্ত বউ আছে। সেই লোকটা নানা পার্টিতে নিয়ে গিয়ে বীণাকে বুড়ো দাঁত–নখ উঠে যাওয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিত। সেখানে নানান হাত ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছোয় চিন্তামণি রক্ষিতের কাছে। এখন চিন্তামণি রক্ষিতের বাঁধা হয়ে ও বেশ ভালোই আছে বলতে হবে। ওর বুড়ো বাপ–মা এখনো বেলঘড়িয়ায় বীণার রোজগার খেয়েই বেঁচে আছে।

ওদিকে ঢাকায় গিয়ে সাধনার নাম বদলে হয় নূরুজাহান বেগম। 'কুড়োনো মেয়ে' ছবিতে নায়িকার পার্ট পেয়ে প্রচুর হাততালির শব্দ শোনে বুকের ভিতর পর্যন্ত। দু'এক বছরের মধ্যেই ঢাকার ছোট আকাশে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে নকল তারা হয়ে দেখা দেয়। পুরানা পল্টনে এখন যেখানে বিশাল হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, তার কাছেই সাধনার চোখ–ধাঁধানো বাড়ি, বাড়ির নাম দিয়েছে 'নূরমহল'। নারায়ণগঞ্জ জন্ম সাধনার, ছেলেবেলায় যে ঢাকা শহরে এসে একদিনও শখ করে ঘোড়ার গাড়ি চাপতে পারে নি, এখন সেই রাস্তা দিয়ে ওর হলুদ–রঙা মোটর গাড়ি ধুলো উড়িয়ে যায়। সাধনা টাকা পেয়েছে, স্বামী হবার জন্য ব্যগ্র পুরুষ পেয়েছে, কিন্তু আর সন্তান পায় নি। ওসব জীবনের পক্ষে ছেলেমেয়ে থাকাই তো ঝঞ্ঝাট, না হয়ে তো ভালোই হয়েছে। কিন্তু ও সন্তান চায়। এখন ও নাকি ছেলের জন্য পাগল। আট বছর পর কলকাতায় এসেছে ওর প্রথম জীবনের একমাত্র ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

সব ঘটনা শুনে আমার একটুখানি বুক ছমছম করতে লাগলো। আমার তিন দিদিরই ভালো বিয়ে হয়েছে, আমাকে ট্রেনে ট্রেনে চানাচুর ফিরি করতে গিয়ে কাটা পড়তে হয় নি। আমি তো ভালো আছি, আমি কলকাতার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছি, আমাকে আর কেউ চিনতে পারবে না।

শেখর বললো, বীণা আমাদের এত উপকার করে, আমাদের উচিত ওর দিদিকে একটু সাহায্য করা !

আমি বললুম, এতে আমাদের কি করার আছে ?

—সাধনার টাকার অভাব নেই। প্রচুর ডলার নিয়ে এসেছে গোপনে। অজয়কে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর তাতে যদি রাজি না হয় তো তা হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি নীরস গলায় বললুম, শেখর, তুই এর মধ্যে খামোকা নিজেকে জড়াস নি। ব্যাপারটা বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

শেখর সচকিত হয়ে উঠে বললো, বিপদ ! এর মধ্যে কিসের বিপদ? একজন মা তার ছেলেকে ফেরত পেতে চাইছে, এর মধ্যে অন্যায়টা আবার কী ?

অবিনাশ সব কথা শুনছিল কিনা ঠিক নেই, তবু এ সময়টা হঠাৎ মুখ তুলে বললো, কাওয়ার্ড ! আমাদের মধ্যে সুনীলটা চিরদিনই কাপুরুষ থেকে গেল ! তোর ভয় থাকে তো তুই পালা !

আমি চটে উঠে বললুম, পালাবোই তো ? আমি এর মধ্যে একটুও থাকতে চাই না। একজন ছেলে তার নিজের মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসে এখন অন্য একজন মাকে তার ছেলে খুঁজে দেবার জন্য ব্যাকুল ! আমি এর মাথামুণ্ডু বুঝি না।

শেখর প্রথম যেন আমার কথা বুঝতেই পারলো না। খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু হেসে বললো, ও, তুই আমার কথা বলছিস ? আমি তো মার কাছ থেকে পালাই নি। আমি তো পরশু গিয়ে মাকে বলে এসেছি, ক'দিন কলকাতার বাইরে যাচ্ছি !

—মিথ্যে কথা তো বলে এসেছিস।

—এ ঠিক মিথ্যে কথাও নয়। আসলে ক'দিন ছুটি নিয়েছি। ক'দিন আমি মায়ের ছেলে, ছোট ভাই-বোনের দাদা, অফিসের ছোট সাহেব—এইসব পোস্ট থেকে ছুটি নিয়েছি। অনেক মিলিটারি অফিসারকে দেখবি ছুটি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। চোখের নিমেষে যারা মানুষ মারতে পারে, তারা সামান্য একটা মাছ মারার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, অনেক সময় বড়শিতে ছোট মাছ উঠলে সেটাকে আবার জলে ছেড়ে দেয়, এত দয়া। সেই রকমই আর কি। ইমপারসোনেশান, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধরে অন্য মানুষ হওয়া— এছাড়া জীবনে আর কোনো স্বাদ পাবার আশা নেই এখন। আমার এখানে বেশ লাগছে রে !

—যাই বলিস, সাধনাকে আমার ভালো লাগছে না। ওর ছেলেকে ফেরত নিতে আসার মধ্যে আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যাতে আমার কৌতূহল জাগতে পারে। তা ছাড়া, ছেলের বয়েস এগারো বছর, তারও তো একটা মতামত আছে এখন। সেও তো তার বাবাকে ছেড়ে এই গোলমেলে স্বভাবের মায়ের কাছে আসতে না চাইতেও পারে।

—ঠিক তাই। সেইটা দেখার জন্যই আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। এগারো বছরের ছেলে আট বছর পরে তার মাকে দেখে কী করে—সেইটে দেখার জন্যই আমি ছটফট করছি। ছেলেটা নিশ্চয়ই অনাদরে মানুষ, ময়লা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ায়, সেই ছেলেকে আট বছর পর দেখে তার রুপোলি পর্দা থেকে নেমে আসা জরির কাপড় পরা মার মুখ কি রকম হয়ে যায়, সেটা দেখতেও তোর কৌতূহল হয় না !

—না। আমার এসব দিকে মন নেই এখন। তোরা এর মধ্যে থাকতে পারিস, আমি উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে এখন বেঁচে যেতে চাইছি।

—পারবি বাঁচতে ?

—দেখা যাক। আমি এবার যাই। অবিনাশ, আমাকে দুটো টাকা দে।

—আজ রাত্তিরটা এখানে থেকে যা না।

—অসম্ভব !

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বীণার ঘরে একবার উঁকি দিলাম। পুরুষ দু'জন রুটি আর মাংস খাচ্ছে নিঃশব্দে। বীণা ঘরে নেই। খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে একটু মুচড়ে পড়ে আছে সাধনা। এখন অজ্ঞান কিংবা গভীরভাবে ঘুমন্ত, তা ঠিক বোঝা যায় না। ব্লাউজের বোতামগুলো খোলা, কালো রঙের ব্রেসিয়ার দেখা যাচ্ছে, একটা হাত নিচে, আর একটা হাত নিজের বাম বুক ছুঁয়ে আছে। শোওয়ার ভঙ্গিটা কেমন যেন অসহায়, কারুর উচিত ছিল ওকে একটু সোজা করে শুইয়ে দেওয়া। এক চোখের কোণ দিয়ে নেমে আসা মোটা জলের ধারা এখনো শুকোয় নি। শরীরের যন্ত্রণা বা যে-কোনো যন্ত্রণাতেই হোক অজ্ঞান হবার আগে মেয়েটা কেঁদেছিল ঠিকই। কাঁদুক। কান্না খারাপ নয়। কাঁদলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যে-শিশুকে ফেলে পালিয়েছিল, তাকে ফিরে পেতে হলে তো কাঁদতে হবেই।

—যমুনা আজ তোমায় গানের ইস্কুলে যেতে হবে না।

—সে কি, আজ যে আমাদের নতুন গান শেখাবে।

—শেখাক, আমি তোমাকে রেকর্ড কিনে দেবো।

—ধ্যাৎ ! 'আজি বহিছে বসন্ত পবন'— এ গানটার বুঝি রেকর্ড আছে ?

—না থাক। ওটা এমন কিছু শক্ত গান নয়, তুমি পরের দিন শিখে নিও।

—আপনি ও গানটা জানেন ?

—না, জানি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার এখন কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে ! তুমি বুঝি এখনো ক্লাশ পালাতে শেখো নি ?

—শিখবো না কেন ? এই তো ক'দিন আগে কলেজে আমরা তিন–চারজন ক্লাশ থেকে কেটে পড়ে সিনেমা দেখে এলুম।

—একা একা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে ? তোমার সাহস তো কম নয়।

—আহা, সিনেমা দেখতে আবার সাহস লাগে নাকি ? তাছাড়া আমরা তো চারজন ছিলুম।

—আচ্ছা, এসো তা হলে ঐ বাসটায় উঠে পড়ি। এখানে দাঁড়ালে তোমার গানের ক্লাশের মেয়েরা দেখে ফেলবে। তা হলে আমার লজ্জা করবে।

—কেন, আপনার লজ্জা করবে কেন ?

—তা হলে ওরা ভাববে, এই বুড়ো লোকটা তোমাকে ক্লাশে যেতে দিচ্ছে না।

—আপনি বুঝি বুড়ো ! ইস—

—তোমার সঙ্গে তুলনা করলে তো বুড়োই। চলো, বাস এসে গেছে।

—কোথায় যাবো ?

—চলো না—

যমুনাকে প্রথমে খানিকটা অস্পষ্ট মনে হয়, কেননা ও বেশ হনহন্ করে গানের ইস্কুলে প্রায় ছুটে যাচ্ছিল, এমন সময় আমি ওকে থামিয়েছি—আমার রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না, আমার কথায় ও ঠিক খুশি হয়েছে কিনা এখনো বুঝতে পারছি না। বাসের ভিড়ের মধ্যে পা–দানিতে আমি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে, আমি খুব ভালো করে লক্ষ করে দেখলুম ওর ঘাড়ের কাছে একটুও ময়লা নেই। মেয়েদের যত বয়েস বাড়ে ততই ঘাড়ের কাছে ময়লা জমে। এমন কি ওর কানের ফুটোটাও কি চমৎকার, কচি শশার মতন তরতাজা, ওখানেও একটুও ময়লা নেই নিশ্চিত। খানিকটা দূর যেতে না যেতেই আমি আলতোভাবে ওর গা ছুঁয়ে বললাম, চলো নেমে পড়ি। জলের ওপরের ময়লা সরাবার মতন দু'হাত দিয়ে ভিড় সরাতে লাগলুম ওর জন্য।

নেমেই যমুনা প্রশ্ন করলো, টিকিট কাটলেন না ? আমি বললুম, না, একদিন বাসে আমি পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলাম, কণ্ডাকটার বলেছিল, খুচরো নেই, একটু পরে দিচ্ছি। দু' আঙুলের ফাঁকে নোটটা গুঁজে রেখেছিল তারপর আমি আর চাইতে ভুলে গেলুম, লোকটাও আর আমাকে দিল না। এমন পাজি ! সেইজন্য আমি ঠিক করেছি, আর কুড়িদিন বাসে টিকিট কাটবো না!

যমুনা ফুরফুর করে হাসতে লাগলো। হালকা শরীরেই হাসি মানায়। যাদের ভারি চেহারা, তাদের হাসির মধ্যে কি রকম হাতুড়ি পেটার শব্দ। আমি জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, ক্লাশ পালিয়ে আসার জন্য তোমার মন খারাপ লাগছে না তো ? তোমার ভালো লাগছে আমার সঙ্গে যেতে ? ভুরু কুঁচকে যমুনা একটু চিন্তিত ভঙ্গি করলো, তারপর ফট করে আলো জ্বালার মতন উদ্ভাসিত

মুখে বললো, খুব ভালো লাগছে। একটা ক্লাশে আর কি হবে ?

আজ একটা সূর্যমুখী রঙা শাড়ি পরেছে। নতুন শাড়ি পরতে শিখেই আধুনিক কায়দা জানা হয়ে গেছে দেখছি, ব্লাউজ ও চটির রংও হলদে। বলতে যাচ্ছিলুম যে, হলুদ শাড়িতে তোমায় খুব মানায়, কিন্তু তখনই মনে পড়লো, আগের দিন লাল রঙা শাড়িতেও তো ওকে অসম্ভব মানিয়েছিল। এক রকমের চাবি আছে নাকি যাতে সব রকমের তালা খোলা যায়, সেই রকমই এক একজনের শরীরও সব রংকে জয় করতে পারে, যমুনার সেই শরীর। অবশ্য শুধু শরীর নয়। মনের মধ্যেও একটা সব তালা খোলার মতন চাবি থাকা দরকার, মনের মধ্যে গ্লানি থাকলে সব রঙের সম্মুখীন হওয়া যায় না। সুতরাং আমি বললুম, রোজ রোজ এক একটা নতুন শাড়ি পরে আসো, তোমার অনেক জামা-কাপড় বুঝি ?

যমুনা বললো, এইটা ? এটা তো দিদির কাপড় ! আমি দিদির সব শাড়ি পরি। মেয়েদের খুব মজা, না, শাড়ি তো আর ছোটবড় হয় না। একজনেরটা আর একজন পরতে পারে, ছেলেদের জামা-প্যান্ট তো তা হয় না !

—দিদি তোমাকে সব কাপড় পরতে দেয় ? দিদি তোমাকে খুব ভালবাসে বুঝি ?

—দেবে না কেন ? দিদির তো বেশি দরকারই লাগে না। দিদিকে তো মা আজকাল বেরুতে দেন না বেশি।

বেরুতে দেন না ? কেন !

যমুনা একটু গম্ভীর হয়ে বললো, কি জানি ! বাবা রাগ করেন।

—তোমার দিদির বিয়ে হচ্ছে না কেন এখনো ?

—দিদির যে কারুকে পছন্দ হয় না। দিদি নিজেই কতবার ঠিক করলো, আবার নিজেই ভেঙে দিল।

—তোমাকে একা একা বেরুতে দেয় ?

—হুঁ-উ। আমায় মা কিচ্ছু বলেন না। কিন্তু আমায় কেউ বেড়াতেই নিয়ে যায় না। আমাদের ক্লাশের শেফালী ওর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কত ঘুরে বেড়ায় ! এবার আমিও গিয়ে ওকে বলবো—

আমি ধমকের সুরে বললুম, আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড বুঝি ? খুব বাজে বাজে কথা শিখেছো—

যমুনা হাসতে হাসতে বললো, বয়ফ্রেন্ড থাকা খারাপ ? আপনি কিচ্ছু জানেন না। আমারও বয়ফ্রেন্ড আছে, তপনদা—

—তপনদা কে ?

—ডিভিশনাল কমিশনার সেনগুপ্তর ছেলে, খুব ভালো, কিন্তু খালি খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত।

—যাকগে, তুমি আমার সামনে আর তপনদার নাম বলো না।

—নাম বলবো না ? কেন ?

—কি দরকার ? যখন তপনদার সঙ্গে থাকবে— তপনদার কথা, এখন আমার সঙ্গে রয়েছো তো—

—কেন, নাম বলবো না কেন, বলুন না !

—তোমার মুখে অন্য কোনো ছেলের নাম শুনতে আমার ভালো লাগবে না। কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি কিনা।

ক্যাথিড্রালের পাশে নির্জন রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে যমুনা আমার মুখের দিকে তাকালো। চোখের মধ্যে একটা অসহায়তা ফুটে উঠলো, মেয়ে তো, ভালবাসার ব্যাপার বুঝুক আর না বুঝুক, ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসা কথাটা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। শুনলে চিনতে পারে। একবার যেন শরীরটা দুলে উঠলো ওর। চোখের পাতা দুটো যেন ভারি হয়ে উঠে পলক ফেললো,

স্বাভাবিকভাবে পলক উঠতে যেটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে একটু বেশি সময় পরে চোখ খুলে ম্লান কণ্ঠে যমুনা বলল, আপনি আমায় ভালবাসেন ? সত্যি ? কী করে ভালবাসলেন ?

আমি সর্বক্ষণ যমুনার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, বললাম, এমনিই। আসলে সেই বিয়েবাড়িতে সিঁড়ির ওপর তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমি তোমাকে ভালবেসেছি। এতদিন একথা আমার মনে ছিল না—তাই জীবনের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেল, এখন মনে পড়েছে।

—আপনি আমার সঙ্গে কথাই বললেন না, কিছু না, এমনি এমনিই ভালবাসা হয় বুঝি ?

—বেশি কথা বলা হলে, তারপর আর ভালবাসার কথা বলা যায় না, আমি জানি। তাই আগেই বলে নিলাম। এরপর অনেক কথা বলবো।

—সুনীলদা, আপনি আমাকে খুব ছেলেমানুষ ভাবছেন, না ? আমি মোটেই ততো ছেলেমানুষ নই, আমার বোঝার মতন বয়েস হয়েছে। আমার বয়েস...

—তোমার বয়েস সাড়ে পনেরো বছর।

—যাঃ ! আমার সতেরো বছর বয়েস, এখন সতেরো বছর তিন মাস চলছে আসলে—

—তা হতেই পারে না। তোমার সতেরো হলে আমার চৌতিরিশ হতে হয়। কিন্তু আমার যে একতিরিশ।

—এ আবার কি কথা ? এর কোনো মানে হয় না। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন !

—মোটেই ঠাট্টা করছি না। তোমার হাতটা দাও তো,—তোমার হাত খুব গরম, পাখির বাসার মতন গরম। আমি জানতুম।

—কী জানতেন ?

—জানতুম, তোমার হাত ঘাম-ভেজা হবে না। এই রকম গরম হবে, আর থরথর করে কাঁপবে।

যমুনার মুখখানা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। মুখের মধ্যে অসংখ্য পলাতক ছবি। লাল রঙের গানের খাতাটা এমন আলতো করে ধরে আছে—যেন এখনি পড়ে যাবে। আমি ওকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে একটা পাথরের বেদিতে বসালাম। আমার ইচ্ছে ছিল, ওকে ওপরে বসিয়ে আমি ওর পায়ের কাছে মাটিতে বসি। এসব বাড়াবাড়ি ? এইটুকু একটা কচি মেয়েকে নিয়ে বেশি বেশি আদিখ্যেতা ? কিন্তু আমি যমুনার সঙ্গে তো অসম্ভব রকমের বাড়াবাড়িই করতে চাই। যেদিন ওকে প্রথম চুমু খাবো, সেদিন, প্রকাশ্যে, চৌরঙ্গিতে, রাস্তার মাঝখানে সমস্ত ট্রাফিক থামিয়ে আকাশের তলায় যমুনাকে চুমু খাবো। কিন্তু আপাতত আমার তেমন মনের জোর নেই, কেননা চকিতে চোখ ঘুরিয়ে আমাকে আশেপাশের ভ্রাম্যমাণ মানুষদের একবার দেখে নিতেই হলো। আমি ওর পাশে একটু দূরত্ব রেখে বসলুম, যাতে ওর সঙ্গে আমার গায়ের ছোঁয়া না লাগে। এই বালিকাটি এখন চুপ করে আছে, হয়তো ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুত। আমি আমার গোটানো জামার হাতা সম্পূর্ণ খুলে বোতাম আটকালাম। গলার কাছের বোতামটাও লাগিয়ে নিলাম, এইভাবেই তো বিচারকের সামনে বসতে হয়। এবার থেকে কোনো মন্দিরে ঢুকলেও আমি এই রকমভাবে যাবো। বললাম, যমুনা, তোমার অবাক লাগছে ? যমুনা পুরো দু'চোখে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে বললো, আমায় সত্যিই ভালবাসবেন ? আপনি সত্যি কথা বলছেন তো?

—এবার থেকে সব সত্যি কথা বলবো। জানো, সেদিন তোমায় বলেছিলাম, তোমাকে দেখে আমি বাস থেকে নেমে পড়েছি, ও কথা মিথ্যে বলেছিলাম। আসলে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

—সত্যি ? সেদিন বলেন নি কেন ?

—মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। সবাই তো মিথ্যে কথাই বলতে শিখিয়েছে আমাকে। তুমি মিথ্যে কথা বলতে শিখো না—

—দু' একটা মিথ্যে কথা বললে কিচ্ছু হয় না। সবসময় সত্যি কথা বলা কী রকম যেন বিচ্ছিরি!

যমুনাকে হাসতে দেখে আপনিই আমার ঠোঁটে হাসি এলো। আমি বললুম, এই তো হাসি ফুটছে, তোমাকে একটু গম্ভীর হতে দেখে আমার খারাপ লাগছিল। তুমি একটুও গম্ভীর থেকো না। হাসাহাসি করার জন্যই তো ভালবাসা।

—আপনি সত্যিই আমাকে ভালবাসবেন ?

—হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসবো। কিন্তু তোমার এখন আমাকে ভালবাসার দরকার নেই। তুমি তো ছেলেমানুষ, তুমি আস্তে আস্তে ভালবাসা শিখে নিও।

— আপনি আবার আমাকে ছেলেমানুষ বলছেন ?

— আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ছেলেমানুষ নও। কিন্তু তোমার এখন ভালবাসার দরকার নেই। তোমার মুখে ভালবাসা কথাটা এখন পাকা-পাকা শোনাবে।

—কেন আমি বুঝি পারি না। আপনি একাই পারেন ?

—ও কথা এখন থাক, এর উত্তর তোমায় পরে বলবো। তুমি একটা গুনগুন করে গান করো তো।

আমি একটা সিগারেট ধরাতেই যমুনা চোখ বুজে ধোঁয়ার গন্ধ নিল। শিশুর মতন পা দোলাতে দোলাতে বললো, আমাকে একটা সিগারেট দিন তো ! আমি বললুম, না, তোমাকে সিগারেট খেতে হবে না। আমার সিগারেট খুব কড়া। ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ও বললে, ও সিগারেট আমি অনেক খেয়েছি। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে সিগারেট খাচ্ছি আমি !

চোখ গরম করে আমি বললুম, খুব ডেঁপো মেয়ে হয়েছো দেখছি। কার সঙ্গে সিগারেট খাও?

—কলেজের মেয়েদের সঙ্গে। বাড়িতেও তো বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে দিদি আর আমি খাই। বাবার কিছু মনে থাকে না। দিন না একটা।

—লোকে দেখলে কি ভাববে ?

—দেখুক গে, বয়ে গেল।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে আমি ওকে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। বেশ পাকা ভঙ্গিতে জোরে টানতে গিয়ে দু'বার খক্‌খক্‌ করে কাশলো। তারপর চোখের জল সমেত হাসিমুখে বললো; আমি কিন্তু কক্ষনো কাশি না, বিশ্বাস করুন, আজ হঠাৎ—।

আমি বললুম, বুঝেছি, এই দ্যাখো এইভাবে ছাই ঝাড়তে হয়, বুড়ো আঙুলটা দিয়ে এইভাবে তলায় টুস্‌কি মারো !

ও বললো, বাবার এক বন্ধু আছেন, তাঁর ছাই ঝাড়ার সময় প্রত্যেকবার চটাস চটাস করে টুস্‌কির শব্দ হয়।

যমুনার একটা হাত প্রায় আমার উরুর ওপর, আমি খুব সূক্ষ্মভাবে একটু দূরে সরে গেলাম। না, ওর শরীরের সঙ্গে আমার শরীরের ছোঁয়া লাগা উচিত নয়। শরীর বড় সহজে শরীরকে কাছে টানে, আমি অনেক দেখেছি, আর না। কয়েকবার সিগারেটে টান দিতেই আমার একটা কথা মনে পড়লো। আমি বললাম, জানো, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম গানের ইস্কুলের সামনে দেখা হয়, সেদিন তুমি বলেছিলে, আমি জোরে জোরে কথা বলছি, তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে আমার চোখ লাল কেন ? মনে আছে ? সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে সেদিন আমি মদ খেয়েছিলাম।

একটুও বিচলিত না হয়ে ও বললো, আপনি মদ খান বুঝি ? কেন খান ?

আমি বললুম, কী জানি, ঠিক জানি না।—সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবেই আবার বললুম, তোমার বাবা মদ খান না ?

গম্ভীর হয়ে গিয়ে যমুনা বললো, একটুও না। বাবা ভীষণ মদ খাওয়া অপছন্দ করেন। দিদির এক বন্ধু অলকেন্দুদা, তিনি মদ খান শুনে বাবা ওঁর সঙ্গে দিদিকে মিশতে বারণ করেছিলেন।

—তুমিও তা হলে আমার সঙ্গে মিশবে না ?

অকারণেই যমুনা হেসে উঠলো সশব্দে। তারপর বললো, সেদিন আমি একটুও বুঝতে পারি নি তো ? সেদিন কিন্তু আপনার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছিল। আপনি প্রত্যেকটা কথা মন থেকে বলছিলেন। রাস্তায় অনেকের সঙ্গে দেখা হলে যে বলে, কি, কেমন আছো—কি রকম ভাসা ভাসাভাবে যেন বলে। আপনারটা সে রকম না, একটুও বুঝতে পারি নি তো যে আপনি মদ খেয়েছেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, খুকুমণি, তুমি কি করে বুঝবে ?

— আবার খুকুমণি বলছেন ?

— আচ্ছা খুকুমণি নয়, তোমাকে আমি বুলবুলি বলবো।

মুখ বন্ধ রেখেও নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে এক ধরনের হাসি হয়, সেই রকম হাসি শুনিয়ে যমুনা বললো, বুলবুলি ? যাঃ—। যমুনা ওর কাঁধ আমার শরীরে লাগিয়েছে, এবার ইচ্ছে করে একটু চাপ দিল। ঐ উষ্ণ কচি শরীর আমার এতো কাছাকাছি আসা সাঙ্ঘাতিক। আমার পক্ষে, ওর পক্ষেও। আমার লোভ যদি চড়াৎ করে একবার জেগে ওঠে, আমি তাহলে হয়তো একটু নুন মাখিয়ে এক গ্লাশ জল দিয়ে ওর সমস্ত শরীরটা এক গ্রাসে গিলে খেয়ে ফেলবো। ওর পক্ষেও বিপদ, ও জানে না ওর শরীরের কথা, তাপ বিকিরণ করতে করতে সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই ওর ঐ বারুদ শরীর নিজেকে ধ্বংস করার জন্য হঠাৎ মেতে উঠবে। না, শরীরের খেলা বড় সহজ, আমি অনেক দেখেছি, এই মেয়েটিকে আমার স্পেয়ার করা দরকার। জুতোয় ফিতে বাঁধার ছলে নিচু হতে গিয়ে আমি একটু দূরে সরে গেলাম। সেই রকম মুখ নিচু অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, যমুনা, আমার সঙ্গে বসে থাকতে তোমার ভালো লাগছে ?

— হুঁ-উ। খুব। এখানে রোজ আসবো—

— না, তা হয় না। তোমার বাড়িতে জানতে পারলে বকুনি দেবে। শোনো যমুনা, আমি মদ খাই শুনে তোমার খারাপ লাগলো না আমাকে ? জানো আমি আরও অনেক খারাপ কাজ করেছি, কিংবা অনেক খারাপ ব্যাপারের মধ্যে ইচ্ছে করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয়, আমি মানুষ হিসেবে ভালো আছি বা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠছি। ঠিক বুঝতে পারি না। তোমাকে সব বলছি, তুমি শুনে দ্যাখো তো, এরপরও আমাকে তোমার খারাপ মনে হয় কিনা ?

— কী খারাপ কাজ করেছেন, কারুকে মেরেছেন ?

আমি ভাবতে লাগলুম কখনো কারুকে মেরেছি কিনা। মনে পড়ে না। অনেককেই মারতে চেয়েছি, অনেককেই মারতে পারতুম বা খুন করা উচিত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি, যুক্তির কথা ভেবে আটকে গেছে। যুক্তির কথা উঠলে আর মারা যায় না। মানুষকে মারার সত্যিই তো কোনো যুক্তি নেই। কারুকে মারতে গেলে সেও উল্টে মারতে আসে যে,—এও এক মুশকিল। আমি আত্মরক্ষার জন্যই সতর্ক ছিলুম। হঠাৎ আমার রবির কথা মনে পড়লো। রবির মুখটা ভেসে উঠতেই মনটা ভারি হয়ে গেল। আমি বললুম, জানো, রবি বলে আমার এক বন্ধু ছিল, মরে গেছে, বোধহয় তার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

যমুনা ব্যাকুল হয়ে উঠে বললো, না, না—

আমি বললাম, শোনো ঘটনাটা—

সেদিনকার সন্ধেবেলার প্রতিটি টুকরো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, দু'বছর আগের সেই সন্ধে আমার বিরক্ত মুখ, রবির একঘেয়ে অনুনয়, বারবার আমার হাত জড়িয়ে ধরা। রবি আমায় বলেছিল, আমায় ফেলে যাচ্ছিস ? আচ্ছা, একদিন এর শোধ নেবো!—আমি ধাক্কা মেরে রবিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। রবি আমার কলেজের বন্ধু ছিল, কলেজের পড়া অবশ্য রবি শেষ করে নি, তার মধ্যেই রবি অধঃপাতে যেতে শুরু করে। হ্যাঁ, রবিই অধঃপাতে গিয়েছিল, আমি যাই নি ! রবির সঙ্গে আমার মদের দোকানে ও নানান পাড়ায় দেখা হয়ে যেতো, তবু নিজেকে আমি কখনো রবির সমান ভাবি নি। রবির চোখেমুখে একটা চোরের ছাপ পড়েছিল। রবির হাতে কোথা থেকে অসৎ টাকা আসতে শুরু করে, পড়াশুনো ছেড়ে রবির চোখে কালো চশমা ওঠে। চেহারা সুন্দর ছিল রবির, কিন্তু কয়েক মাস বাদে বাদে যখনই ওকে দেখতুম, দেখতে পেতাম ওর চোখের কোণে ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে, অসৎ টাকা সহ্য করার শক্তি সবার থাকে না, একটা গ্লানির ভারে নিচের দিকে নামতে থাকেই, রবির সেই অবস্থা হয়েছিল। দু'একজন লোক থাকে যাদের সঙ্গে কোনো দরকার নেই, বন্ধুত্ব নেই, দেখা হলে খুশি হই না, তবু মাঝে মাঝেই তাদের সঙ্গে দেখা হয়, রবির সঙ্গেও সেই রকম দেখা হতো, রবি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতো, ও একটা গোপন সিঁড়ি আবিষ্কার করে ফেলেছে। ধাপে ধাপে ক্রমশ চূড়ায় উঠে যাবে। কিসের চূড়ায় তা কে জানে ? একদিন মৌলালির মোড়ে সেইরকম দেখা, আমি তখন মেসে থাকি। রবির মুখখানা শুকনো ও অপ্রস্তুত, আমাকে বললো, তুই কোথায় থাকিস রে ? আমি হাত দিয়ে মেসটা দেখিয়ে দিলুম। রবি হঠাৎ কোটের পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললো, এইটা তোর কাছে রাখ তো, এতে দু'হাজার টাকা আছে, আমি পরে নিয়ে যাবো, রেখে দে, প্লিজ!—আমি বিরক্তভাবে সরে গিয়ে বললুম, না ওসব টাকা–ফাকা আমি রাখতে পারবো না !—রবি কাঁচুমাচু মুখে বললো, একটু উপকার কর, প্লিজ ! আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে হয় টাকাটা খরচ হয়ে যাবে, না হয় কেড়ে নেবে। প্লিজ—আমি বললুম, সেখানে না গেলেই নয় ! কিংবা বাড়িতে টাকা রেখে যা। রবি ব্যস্ত হয়ে বললো, তার সময় নেই। তুই আমার পুরোনো বন্ধু, আমার এইটুকু উপকার কর্ ভাই।

আমি রুক্ষভাবে বললুম, না, আমি মোটেই তোর বন্ধু নই। তুই তোর নিজের কাজে পার্টির লোকদের কাছে যা ! রবি আমার হাতে খামটা গুঁজে দিয়ে ঝট করে রাস্তা পার হয়ে গেল।

আমি মেসে ফিরে ব্রজেশ্বরদাকে বললুম, ব্রজেশ্বরদা, দেখুন তো কি কাণ্ড ! এমন রাগ হচ্ছে আমার রবির ওপর ! ব্রজেশ্বরদা বললেন, খামটা খুলে প্রথমে গুণে দেখো, সত্যিই দু'হাজার টাকা আছে কিনা। তারপর ভালো করে দেখে নাও, ওগুলো জাল নোট কি না। যদি না হয়, তাহলে এসো দু'জনে মিলে টাকাটা খরচ করে ফেলা যাক !

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম, খরচ করে ফেলবো কি ? এতো টাকা—

ব্রজেশ্বরদা বললেন, তা ছাড়া কী করবে ? ওসব উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ করাই ভালো ! এ টাকা কি ওর উপার্জন করা টাকা ভেবেছো ? উপার্জনের টাকা লোকে নিজের কাছে রাখতে ভয় পায় না।

আমি বললুম, এটা তো আমারও উপার্জন করা টাকা নয়। এটা ছুঁতেই বিচ্ছিরি লাগছে। ঠিক আছে, যদি খরচ করতে চান, আপনি নিন্। খামটা আমি ব্রজেশ্বরদার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। ব্রজেশ্বরদা শিউরে উঠে বলেছিলেন, না, না না, আমাকে দিও না। আমি ওর মধ্যে নেই। তুমি খরচ করলে আমি তার ভাগ নিতে পারি। যাই হোক সে টাকা খরচ করা হয় নি। দু'দিন পর

রবি এলো। আমার সামনেই খাম থেকে টাকাগুলো গুণে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। ওর ধারণা ছিল, অন্তত পঞ্চাশ কি একশো টাকা ওর থেকে আমি খরচ করে ফেলবোই, সেজন্য ও প্রস্তুতই ছিল, করি নি যখন, তখন আমি নাকি একটা মহাপুরুষ। শুনে আমার গা জ্বলে গেল। আমি কড়া গলায় বললুম, দ্যাখ রবি, এরপর আবার কোনোদিন আমার সঙ্গে এরকম কাণ্ড করতে এলে মুশকিল হবে বলে দিচ্ছি। তুই খবরদার আমার কাছে আর কখনো আসবি না।—রবি বিচলিত হলো না, বললো, তুই এই পেনটা রাখ, তোকে এমনিই দিলাম, আসল জার্মানির জিনিস। আমি বললাম, না, চাই না, আমার পেন আছে। ও বললো, রাখ না, একটা উপহার। আমি পেনটা নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, ফেলে দেবো রাস্তায় ? এই নে তোর জিনিস, যা ভাগ এখান থেকে !

কিন্তু রবির সঙ্গে এরপরেও হঠাৎ দেখা হলেই ও সাগ্রহে এগিয়ে আসে, সঙ্গে বন্ধু থাকলে আলাপ করিয়ে দেয়, কোথাও বসে পানাহার করার জন্য টানাটানি করে। রবিকে দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে—এই রকম অবস্থা।

একদিন রবির সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে আমার দেখা হলো। রবি তখন টং মাতাল। সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, সেদিন সন্ধেবেলা অনেকক্ষণ মনীষাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও মনীষার দেখা পাই নি। মনীষার দুর্বোধ্যতা আমাকে ক্রমশ বিমর্ষ করে তুলেছিল। আমি আমার বন্ধু–বান্ধবদের খুঁজতে গিয়েছিলাম, তারা কেউ ছিল না, কিন্তু রবিকে দেখতে পেলাম। রবিকে দেখেই আমি সরে পড়ার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু ও আমাকে দেখতে পেয়ে টলতে টলতে ছুটে এলো, জড়িয়ে ধরে বললো, আয়, আজ তোকে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। চল্ আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, এই তিনজন আমার বন্ধু, জাহাজের ক্লিয়ারিং এজেন্ট, মস্তো লোক—। আমি বললুম, না, আমি একজনকে খুঁজতে এসেছিলুম, চলে যাবো।—রবি আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো, আয় না, ওরা ভালো লোক, তোর যদি কখনো বিলিতি ঘড়ি কিংবা ট্রানজিস্টার দরকার হয় বলিস, ওদের কাছ থেকে—আয় না।—আমি গলার স্বরটা একটু নরম করে বললুম, তোকে আর খেতে হবে না। তোর যা অবস্থা, এবার বাড়ি যা।—

রবি চোখ পাকিয়ে বললো, চোপ্, আজ তোকে পেয়েছি, আজ বিরাট পার্টি হবে। কতখানি বল্? তোর যা ইচ্ছে, তোর যা মন চায়, বুঝলি, তোর যা মন চায় খুলে বল্, সব দেখে, বুঝলি, আজ মাইরি... ধৈর্য রেখে আমি তবু বললুম, বাড়ি যা না, ভালো কথা বলছি।—রবি আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, তুই আমায় বাড়ি পৌঁছে দিবি ? আমি একা আজ যেতে পারবো না, আমার পকেটে অনেক টাকা... ও শালাদের আমি বিশ্বাস করি না, অনেক টাকা... মাইরি, তুই আমায় আজ দেখিস, তোর পায়ে ধরছি।—কিছুতেই এড়াতে না পেরে আমি ওদের টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম, ওর বন্ধু তিনজনই সব মধ্যবয়স্ক, পরনে দামী পোশাক, কিন্তু কি রকম যেন নিষ্ঠুর মুখ। যখন নীরব থাকে—তখন চোয়ালগুলো শক্ত দেখায়—এরকম শক্ত মানুষ আমি অনেক দেখেছি, এদের আমার পছন্দ হয় না। আমি এক গ্লাস খেয়েই উঠে পড়ার চেষ্টা করলুম, কেন না, ওদের কথাবার্তা সম্পূর্ণ অন্যজাতের, যখন 'জাহাজ' কথাটা উচ্চারণ করে তখন যেন সম্পূর্ণ জাহাজের ছবি ওদের মনে পড়ে ভাসে না, জাহাজের একটা অংশের কথা ওদের চোখে ভাসে শুধু। রবি আমার হাত ধরে বললো, বোস্ না, মাইরি, আজ ফোয়ারা ছোটাবো... যাবি না। আমাকে তুই বাড়ি পৌঁছে দিবি ! রবি পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে আবার অর্ডার দিল—কিন্তু সেদিন আমার নিজস্ব মন খারাপ ছিল, মনীষার কথা ভেবে বারবার বুকের ভেতরটা অপমানিত দুঃখে মুচড়ে উঠছিল, ওখানে আমার একটুও মন বসছিল না, আমি বাথরুমে যাবার নাম করে পালাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমার প্রতিই রবির সেদিন সম্পূর্ণ নজর, দরজার কাছে

গিয়ে আমাকে আবার ধরলো, এমন টলছিল যে দোকানের সবাই হাসছে, রবির চোখ মুখ টকটকে লাল, কপালের পাশে শিরা ফুলে উঠছে, পাগলের মতন বিড়বিড় করছে। ওর এখানে থাকতেও ভয় করছে, অথচ যেতেও চায় না, বললো, তুই পৌঁছে দিবি—ওদের হাতে ফেলে যাচ্ছিস, ওরা ডেঞ্জারাস... এক সঙ্গে যাবো। মাইরি, আজ তোতে আমাতে এক সঙ্গে, আয় না, কিছুই তো খাস নি, আয় না, আজ প্রচুর খাবো, তোর সঙ্গে, বাড়ি পৌঁছে দিবি তো ? আমি রুক্ষভাবে বললুম, যাবি তো এখন চলু, আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি !—রবি যেতে চায় না, আমাকে ও ধরে রাখতে চায়, ঐ লোকগুলোকে বিপজ্জনক মনে করেও কেন ও ওদের সঙ্গে বসে থাকতে চায় কে জানে। আমি বললুম, তোর যা ইচ্ছে কর্, আমি আর বসবো না ! রবি তবু আমাকে শক্ত আঙুলে ধরে রইলো। ধৈর্য শেষ হওয়ায় আমি রবিকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলাম। টলে গিয়ে পড়তে পড়তে দেয়াল ধরে ঘোলাটে চোখে বললো, তুই আমাকে ঠেলে দিলি, আচ্ছা শালা, দেখে নেবো একদিন... আমায় ফেলে যাচ্ছিস্ যা, একদিন এর শোধ নেবো—

— জানো, যমুনা, তার দু'তিনদিন পর আমি আবার সেই দোকানটায় গেছি, রবির সেই তিনজন বন্ধু বসেছিল, একজন আমায় বললো, আপনার বন্ধু রবির খবর শুনেছেন ? আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি খবর ? একজন চোখ বুজে হাতের তালু উল্টে দেখালো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি ? একজন বললো, রবি মারা গেছে। শুনে প্রথমটা আমার কিছুই মনে হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলুম, কী করে ? সেই লোকটা বললো, সেদিন একেবারে পেঁচি মাতাল হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম, বিশ্বাস করলো না, দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা—একেবারে ঘিলুফিলু বেরিয়ে ফর্দাফাঁই ! পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে সগ্যে চলেছে।—শুনে, সত্যি কথা বলছি তোমায় প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, যাক্ বাঁচা গেছে, একটা পাপ চুকেছে। তাকিয়ে দেখি লোক তিনটের চিবুক সেদিন কঠিন নয়, খুব মসৃণ, তিনজনেই মাথা নিচু করে আছে, ওদের টেবিলে একটা খালি চেয়ার। মনে হল যেন, রবির ছায়ামূর্তি সেখানে বসে আছে। আমি ওখান থেকে চলে এলুম, তখনও আমার কিছু মনে হয় নি। অন্য টেবিলে বসে অন্য গল্প করছিলুম। একটু বাদে বাথরুমে গিয়ে দেখি, ইয়ে, মানে পেচ্ছাপখানার দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'রবি আর নাই।' ওর বন্ধুদেরই কেউ পেন্সিল দিয়ে লিখেছে। আমার হঠাৎ যখন চোখে পড়লো, 'রবি আর নাই' আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। আর একটু হলে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যেতুম। হঠাৎ মনে হলো আমিই দায়ী। আমি যদি সেদিন রবিকে বাড়ি পৌঁছে দিতুম, তাহলে বোধহয় ও মরতো না। কিংবা ও এই রকমভাবেই মরতো একদিন না একদিন, কিন্তু সেইদিনটা তো অন্তত বাঁচতে পারতো। আমি ইচ্ছে করলেই ওকে একটা দিন বেশি বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম ঠিকই। কিন্তু সেদিন যে আমার ইচ্ছে হয় নি। এজন্য আমি দায়ী ? জানো, রবির কথা ভাবলেই আমার বিষম কষ্ট হয় একথা আমি কারুকে বলি নি, কিন্তু মনে হয় এজন্য আমাকে একদিন শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু, দোষ করলেও আমি না জেনে করেছি, ও সেদিন বোধহয় বুঝতে পেরেছিল মৃত্যুর কথা, সেইজন্য আমাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে আশ্রয় দিই নি, আমি ওকে সাহায্য করি নি, আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম, এত কষ্ট হয় ভাবলে !

যমুনা দু'হাত দিয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, ও কি, আপনি ওরকম করছেন কেন ? থাক, আর বলতে হবে না—

আমি ওর দিকে ফিরে বললাম, বলো, আমার দোষ ? না, আসল দোষ মনীষার ? মনীষা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল বলেই তো সেদিন আমি অন্য মানুষের কথা ভাবতে পারি নি।— যমুনা চুপ করে রইলো। আমি আবার বললাম, বলো, কার দোষ ? যমুনা কাঁপা গলায় বললো,

জানি না ! আমি কি করে জানবো ?

ওর গলার আওয়াজ শুনে আমার কিরকম যেন মনে হল, অন্ধকারে আমি এক আঙুলে ওর চিবুকটা তুলে ধরলাম। কলাগাছের একেবারে ডগায় যে পাতাটা থাকে, সেই পাতার মতন নরম পবিত্র মুখ যমুনার, সেই মুখে দু'ফোঁটা শিশিরের মতন চোখের জল। আমি সচকিত হয়ে উঠে বললুম, তুমি কাঁদছো !

— না তো। আপনি এমনভাবে বলছিলেন, আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল লোকটার জন্য।

— আরে ধ্যাৎ ! এসো, আমি তোমার মুখটা মুছে দিই—না, থাক্, তুমিই তোমার মুখটা মুছে নাও ভালো করে।

রবির জন্য আমি কখনো কাঁদি নি। কাঁদতে তো ভুলেই গেছি বলা যায়। রবির জন্য যমুনাকে কাঁদতে দেখে আমার বুকটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল। রবির মৃত্যু একেবারে অবহেলিত রইলো না, রবি আর একদিনের জন্য বেঁচে গেল। রবির জন্য আমার কষ্টটা মিলিয়ে গিয়ে যমুনার জন্যই কষ্ট হলো। কেন আমি এই শিশুটিকে কাঁদালুম ! কিংবা, কান্নায় বোধহয় কোনো কষ্ট নেই, সুখই আসলে।

মুখ মুছে যমুনা বললো, সুনীলদা, আপনি আর ওখানে কখনো যাবেন না।

— কোথায় ?

— ঐ দোকানটায়।

— না, আর কখনো যাই নি, যাবোও না। চলো, এবার উঠে পড়ি, এবার তোমার বাড়ি ফেরা উচিত।

উঠে, নিঃশব্দে কয়েক পা এগুবার পর, যমুনা জিজ্ঞেস করলো, মনীষা কে ?—আমি বললুম, ও একটা মেয়ে। ভারি পাজি। ওর কথা তোমায় পরে বলবো।—বলতে বলতেই দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এসে গেল বড় বড় ফোঁটায়। তখন আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বললুম, ছুটতে পারবে ? এসো !—যমুনা হরিণীর মতন তর তর করে ছুটতে লাগলো, গানের খাতাটা ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে, আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে, দু'জনে হাত ধরাধরি করে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালাম। বেশি ভিজি নি, রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললাম, তোমাকে বাড়িতে বকুনি দেবে আজ ! যমুনা কিন্তু বেশ মজা পেয়েছে, একটু আগেই কান্নার মুখ সরিয়ে ফেলে, হাসিতে শরীর ছটফট করছে, আমার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়। অজান্তেই নিশ্চিত। ওকে বুঝতে না দিয়ে আমি সরে যেতে লাগলুম। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই বৃষ্টি চলে গেল।

গাছতলা থেকে একটু এগিয়ে যেতেই কয়েকটা চোঙা প্যান্ট পরা ছেলে আমাদের দিকে একটা কুৎসিত মন্তব্য করলো। আমি আড়চোখে দেখে নিলুম, ওরা কদাকার পাঁচ-ছ'জন। না শোনার ভান করেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যমুনা বললো, কি অসভ্য কথা বলে ! আমি থমকে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ওর সব ক'টা কথার মানে বুঝেছো ? যমুনা উত্তর দিল না। মুখ দেখেই জানলুম, ও বুঝেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে আমার শরীর শক্ত হয়ে গেল, ছেলেগুলোর প্রত্যেকটার মুণ্ডু ছিঁড়ে গেণ্ডুয়া খেলার ইচ্ছে হলো আমার। ফিরেও দাঁড়িয়েছিলাম, ছেলেগুলো তখন অন্য কথা বলতে বলতে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, হয়তো আমাদের কি বলেছে—এর মধ্যেই ভুলে গেছে। এই রকমই তো আত্মবিস্মৃত ওরা, কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে কিছুই জানে না, পাগলের মতন যা খুশি বলে যায়। কিন্তু ওরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। খানিকটা সাহসের অভাবে, খানিকটা নাটক করার প্রতি বিতৃষ্ণায় আমি আর ওদের ঘাঁটালুম না। শরীর আবার সহজ করে নিয়ে যমুনার পাশে আবার হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা জানার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হলো। আমি ওকে

ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, তোমায় কেউ কখনো চুমু খেয়েছে ?

যমুনা মুখ তুলে বললো, যাঃ—

— বলো না, লজ্জা কি ?

— যাঃ ! আপনি এমন।

আমি ওর খুব কাছে সরে এসে বললুম, এমনি জিজ্ঞেস করছি, বললে কিছু হবে না !

মুখ সামান্য লাল হয়ে গেল ওর। আদরের ভঙ্গি করে বললো, না—আ—

আমি আবার বললুম,—বলো না। এতে লজ্জার কী আছে ?

— না—হ্যাঁ।

— কে ?

— তপনদা।

— আর কিছু ?

— আর কি ?

— না কিছু না। ঠিক আছে, ওতে কোনো দোষ নেই। তুমি খুব ভালো মেয়ে।

যমুনা হাসতে হাসতে বললো, আপনি যা ভাবছেন, আমি কিন্তু মোটেই তেমন ভালো মেয়ে নই !

আমিও ওর কাঁধে আলতোভাবে ছুঁয়ে দিয়ে বললুম, বুলবুলি, আমি তো আর তোমাকে সে রকম ভালো ভাবছি না। তুমি একটা অন্য রকমের ভালো মেয়ে !

সঙ্গীতের প্রতি আমার এমন কিছু মমতা নেই যে, আমি ভাববো যমুনা কয়েকখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত না শিখলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। সুতরাং আমি যমুনাকে গানের ক্লাশে যাবার পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে লাগলুম। এমনকি একদিন ওর দুপুরের কলেজ থেকেও ওকে কাটিয়ে নিয়ে ঘুরে এলুম ব্যারাকপুর। যমুনার কোনো ভয়-ডর নেই, এইভাবে লুকিয়ে বেড়াতে যাবার মধ্যে ও একটা নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদ পেয়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে। ওর চঞ্চল হাসিখুশি ও ছড়ার ছন্দের মতন কথাবার্তা আমাকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে তুলতে লাগলো। পৃথিবীর কোনো কথা শুনতেই ও ভয় পায় না, কোনো বস্তু সম্পর্কেই ও আগে থেকে খারাপ বা ভালো ধারণা করে রাখে নি, বরং মাঝে মাঝে পূর্ণ বিস্ময়ময় চোখ তুলে বলে, তাই নাকি ? সত্যি ? আমি ওকে একদিন নূরজাহান বেগমের ঘটনাটাও শুনিয়ে দিলুম। কিন্তু নূরজাহানের ব্যাপারটা ও ভালো বুঝতে পারলো না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছেলেকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল কেন ? আমি বললুম, সেইটাই তো মুশকিল। যমুনা বললো, একবার বিয়ে করলে আবার বিয়ে করা যায় ? ও হ্যাঁ, ক্রিশ্চানদের হয় শুনেছি।

— আজকাল সবারই হয়।

— আচ্ছা, বিয়ে করলেই তো ছেলেমেয়ে হয়। আবার বিয়ে করেছে যখন, তবে আবার ছেলেমেয়ে হলো না কেন ?

এখুনি একথার উত্তর যমুনার জেনে যাওয়া ভালো কি না আমি এক মুহূর্ত ভাবলুম। তারপর মনে হলো এখন থাক্‌। বললুম, তা হয় বটে, কিন্তু ওর তো আর হয় নি।

যমুনা বললো, আচ্ছা, ওর যদি আবার ছেলেমেয়ে হতো, তাহলেও কি এই আগের ছেলেটার জন্য ফিরে আসতো ?

এ প্রশ্নটা খুবই দুর্বোধ্য, সুতরাং বেশি ভাবার চেষ্টা না করে আমি বললুম, কি জানি !

যমুনার সংস্পর্শে এসে আমার মন প্রত্যেকদিন হাল্‌কাতর হয়ে আসতে লাগলো, বহুদিন পর সরলভাবে খুশি হতে লাগলুম আমি, যমুনার কথায় অবাক হওয়া দেখে, আমারও মনে হতে লাগলো, পৃথিবীতে আমারও অবাক হবার মতো এখনো অনেক কিছু আছে। এখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এক সঙ্গে দু'তিন ধাপ পেরিয়ে যাই, ট্রামে বাসে মানুষের ভিড় দেখলে আর রাগ হয় না, এমনকি দেশের খাদ্যসমস্যা অচিরে মিটে যাবে এ রকম মনে হয়। বৃষ্টি পড়লে মনে হয়, আজকের দিনটা খুব সুন্দর, কোনোদিন চচ্চড়ে রোদ উঠলেও হয়, আঃ আজকের দিনটা কি সুন্দর।

এর মধ্যে আমি যমুনার হাত ধরেছি শুধু, শরীর ধরি নি। ব্যারাকপুরে রেলের নির্জন ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠেও চুম্বন করি নি। ম্যাজিশিয়ানের মতন আমি ওর বুকের সামনে হাত ঘুরিয়েছি, কিন্তু ছুঁই নি। ওর তপনদা ওকে চুমু খাক, ওর তপনদা সাঁতার শেখাবার নাম করে লেকের সুইমিং ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ওর নবীন শালগমের মতন বুক দেখুক একদিন না একদিন। আমার ওসব দরকার নেই এখন। যমুনা কখনো না জেনে, অচেতনভাবে, নেহাৎ প্রাকৃতিক কারসাজিতে আমার খুব কাছে আসতে চেয়েছে, আমি তেল আর জলের মতন ওর সঙ্গে মিশ খাই নি। পুরুষের শরীরে আদিমতা আছে, কিন্তু আত্মঘাতের বীজ নেই। মেয়েদের শরীর সাঙ্ঘাতিক ! হয়তো অবান্তর, তবু রামকৃষ্ণের একটা কথা আমার মনে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ও কে, তা ও নিজে জানে না। যেদিন জানতে পারবে, সেদিন আর ও মানুষের মধ্যে থাকবে না। তেমনি আমার মনে হয়, মেয়েরা নিজের শরীর সম্পর্কে প্রথমে কিছুই জানে না, যেদিন জানতে পারে সেদিনই দেবীত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু মেয়ে হয়ে যায়। মেয়ে তো অনেক দেখা হলো, এবার কিছুদিন দৈব সংসর্গে আত্মাকে শুদ্ধ করে নেওয়া যাক। যে ক'দিন পারা যায়।

কিন্তু জীবনটা বড় শক্ত। আমি ঠিক যে–রকম বা যে–টুকু চাইবো, তাই যে আমি পাবো, তার কোনো মানে নেই। অন্য কোথায় কতজন্মের প্রাপ্য হয়তো আমি মেটাই নি। যা–যা করেছি, তার ভালোমন্দের বিচার হতে পারে হয়তো, কিন্তু যা–যা করি নি কখনো ?

একদিন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে যমুনা আমাকে বললো, সুনীলদা, আপনি আমাকে ভালবাসেন বলেছিলেন, মোটেই সে কথা সত্যি নয় ! আমি হঠাৎ ও কথা শুনে অবাক হয়ে বললুম, কেন ?

— আপনি আমাকে একটাও চিঠি লেখেন নি।

— চিঠি লিখবো কেন ? তোমার সঙ্গে একদিন অন্তর দেখা হয়, তবে চিঠি কিসের ?

— কিন্তু, তপনদা তো আমাকে চিঠি লিখেছে ! এই দেখুন ! দুটো বানান ভুল, তিনটে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছে বটে, কিন্তু তপন চিঠিটা বেশ ভালোই লিখেছে। বেশ আবেগময় এবং ভুল আবেগ কম। চিঠিটা পড়ে আমি হাসিমুখে যমুনার দিকে তাকালুম।

বিষম চিন্তিতের মতন যমুনার ভুরু কুঁচকোনো, বললো, আমি এখন কি করি বলুন তো ? ওর ঐ কচি মুখে অমন দুশ্চিন্তা দেখে আমার সত্যিই হাসি পায়। আমি আঙুল তুলে আলতোভাবে ওর ভুরুতে বুলিয়ে দিয়ে বলি বুলবুলি, তোমার এখন কিছু ভাবতে হবে না। তোমার অনেক ভালবাসা দরকার। আমি একা আর কতটা পারবো ? আরো অনেকে তোমাকে ভালবাসুক। কিন্তু আমার শুধু তোমাকেই দরকার। আমার অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে তো !

যমুনা দুর্বোধ্যভাবে তাকিয়ে থেকে আবার সেই রকমই দুর্বোধ্যভাবে হাসলো। মুখ নিচু করে বললো, আপনিও তো আগে অনেককে ভালবেসেছেন ?

আমি বললুম, উঁহু ! আমি কারুকে ভালবাসতে পারি নি আগে। কারুর কাছে নিজের কথা বলতেই পারলুম না। কিন্তু তোমায় বলেছি না, তুমি ভালবাসার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না!

এইটুকু মেয়ের মুখে ভালবাসার কথা খুব পাকা–পাকা শোনায় !

— বারবার আমাকে এইটুকু মেয়ে, এইটুকু মেয়ে বলবেন না, বলছি।

— ওঃ, কি বড় হবার শখ ! যখন সত্যি বড় হয়ে উঠবে, তখন দেখবো নিজেকে এইটুকু মেয়ে সাজাবার কী চেষ্টা। তোমার দিদি যেমন ! যমুনা এবার অকপটে হাসতে হাসতে বললো, সত্যি দিদিটা যেন কি ! বাড়ি থেকে তো বেরুতে পারে না, সারাদিন তাই শুধু টেলিফোন করে! আর কি সব বিচ্ছিরি কথা !

— কাকে টেলিফোন করে ?

— ওর সব বন্ধুদের। আমার ভালো লাগে না ! আমার নামে আবার বাবার কাছে খুব লাগায়।

— কী লাগায় ?

— কে জানে ? সুনীলদা, আমি দিদির মতন মোটেই হবো না !

আমি চোখ দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ আদর করে বলি, তুমি যে–রকম আছো, ঠিক সেই রকম থাকো।

৭

বন্ধু–বান্ধবদের আমি এ ক'দিন খুব কায়দা করে এড়িয়ে যাচ্ছিলুম। সুবিমল ও অবিনাশকে কাটাবার জন্য প্রত্যেকদিন সকালবেলা উঠে আমাকে নতুন নতুন পরিকল্পনা ভাবতে হয়। শেখর এখন বীণা আর নূরজাহানের সঙ্গে কী কাণ্ড নিয়ে জড়িয়ে আছে, তা জানতে আমার একটুও কৌতূহল হয় না। একদিন পরিতোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শুধু। রাস্তা দিয়ে ছাত্রদের একটা মিছিল, ভিড়ের মধ্যেও আমাকে দেখতে পেয়ে পরিতোষ মিছিল থেকে বেরিয়ে আসে। মুখে সেই ইকনমিকসের ছাত্রসুলভ প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। যেন ওর অস্তিত্ব পৃথিবী বা ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, আর আমাদের তো থাকলেও হয়, কিংবা না থাকলেও ক্ষতি নেই। আঙুল দিয়ে টিপে চশমাটা সোজা করে পরিতোষ আগের মতই তীব্র অভিমানভরা স্বরে বলে, সুনীলদা, দাদাকে বলবেন একটা মুখোশ কিনে পরতে ! আমি কাষ্ঠহাস্যে বলেছিলুম, কেন, শেখরের আবার কী হয়েছে ?

পরিতোষ বললো, দাদা বাড়িতে বলে গেছে তিন সপ্তাহের জন্য আসামে বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু পরশুদিন গণেশ এভিনিউয়ের কাছাকাছি দাদাকে একটা ট্যাক্সিতে দেখা গেছে, সঙ্গে একটা বাঈজি চেহারার মেয়ে ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি এবার বেশ ধমকে বললাম, পরিতোষ, তোমার দাদা কি করে না করে সেটা তুমি আমাকে বলতে আসো কেন ? আমি তার জন্য দায়ী ?

— না, আপনি মাকে কি সব কথা দিয়ে এসেছেন, শুনলাম !

— আমি যা কথা দিয়েছি, তা আমি বুঝবো। তুমি এর মধ্যে মাথা গলাতে এসো না—

পরিতোষ আর বাক্যব্যয় না করে ফিরে যায়। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে গিয়ে আবার মিছিলের মধ্যে নিজের জায়গায় ঢুকে পড়ে ও চিৎকার করে দাবি জানাতে থাকে।

পরিতোষজনিত অস্বস্তি মন থেকে মুছে ফেলে আমি যমুনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে যাই। অস্বস্তি, বিরক্তি, ঝঞ্ঝাট, যন্ত্রণা—ধ্যাৎতেরি ! আমাকে বাঁচতে হবে তো ! গানের ইস্কুলের সামনে থেকে যমুনাকে তুলে নিয়ে ঝট করে একটা ট্যাক্সি ধরে সাঁ করে চলে আসি গঙ্গার ধারে। ওর হাত ধরে প্রায় ছুটে যাওয়ার মতন ভাবে জেটির দিকে নামতে নামতে বলি, এসো, যমুনা, আমরা লুকোচুরি খেলি। অনেকে আমাদের খুঁজছে, আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি !—যমুনা

জিজ্ঞেস করলো, কারা খুঁজছে?—আমি বললুম, ভিড়ের প্রত্যেকটা লোক, শহরসুদ্ধ সবাই!—এরকম ছুটোছুটি করতে যমুনার ভালো লাগে। ও জিজ্ঞেস করে, মনীষা কে? আপনি পরে বলবেন বলেছিলেন? আমি ওর বেণী ধরে একটা হ্যাঁচটা টান মেরে বলি, এত জানার ইচ্ছে কেন খুকী! বড় হয়ে উঠছো বুঝি? যমুনা রাগ করে বলে, এই লাগছে, লাগছে। চুলে হাত দেবেন না বলছি! বলুন না, কে? আমি বললুম, মনীষা হচ্ছে কলকাতা শহরের একটা মেয়ে, যে আমাকে ভিড়ের মধ্যে খুব আপন করে নিতে চায়, কিন্তু কিছুতেই একা একা ওর সঙ্গে মনের কথা বলার সুযোগ দেবে না। কলকাতা শহরটাই এরকম। ভাগ্যিস, আমি তোমার দেখা পেয়েছিলাম!—যমুনা তখন আমার হাতের পাঞ্জা ছেড়ে দিয়ে বাহু ধরতে চায়। ওর শরীর ক্রমশ বেশি তপ্ত। আমি সেই মুহূর্তে সিগারেট কেনার অছিলায় ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাই। দূর থেকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখে একটা দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই একটা সমস্যা, এ নিয়ে কি করবো এখন বুঝতে পারি না। যমুনাকে আদর করার জন্য আমারও তো শরীর ভর্তি আদর অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখুনি কি তার ব্যবহার করবো? আগে অন্যদের সঙ্গে শরীরের ভাষা ব্যবহার করে দেখেছি, পরে আর অন্য ভাষা খুঁজে পাই নি। খুব আত্মগোপন করতে ইচ্ছে হয়েছে। এখন অন্য কথাগুলো বলার আগেই কি শরীরের ভাষায় কথা বলা ঠিক হবে?

যমুনাকে নিয়ে এখন আমি কী করবো? এখন আমার কোনো পেশা নেই, সমস্যা নেই, বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা কিংবা পাপবোধ নেই, যমুনা আমাকে প্রভূত উল্লাস এনে দিয়েছে। যমুনা বুঝুক বা না বুঝুক ওর আয়ত চোখের সামনে বসে আমি অনেক কথা বলতে পারি। কখনো কান্নায় ওর চোখ টলটল করে উঠেছে, কখনো হাসিতে ভেঙে পড়ে ও বলছে, যাঃ, আপনি বানিয়ে বানিয়ে সব কথা বলছেন!—হ্যাঁ, একথা ঠিক, আমি এখনো কিছু কিছু বানিয়ে বলছি ওর কাছে। অথবা বলার সুরের মধ্যে নিজেকে কিছুটা বড় করার চেষ্টা আছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমি ক্রমশ সৎ হয়ে উঠবো নিশ্চিত। কিন্তু এরকম তো বেশিদিন চলা সম্ভব নয়, আমি মনে মনে টের পাচ্ছি, জীবন তো এই জায়গায় থেমে থাকবে না। আহা, যদি থাকতো কোনোরকমে!

একদিন গানের ইস্কুলের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, যমুনার সঙ্গে সরস্বতীও এসে নামলো বাস থেকে। যমুনার মুখ একটু ভয় মাখানো ও শুকনো। তখন আমার পালাবারও সময় নেই, সরস্বতী আমাকে দেখে ফেলেছে। সরস্বতী বললো, কী ব্যাপার আপনি এখানে? আমি উদাসভাবে বললাম, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় যাবো ভাবছিলাম।

সরস্বতী বললো, তুই যা মুন্নি, আমি আবার আটটার সময় এসে তোকে নিয়ে যাবো।

যমুনা বললো, মা তোমাকে ছোট মামার বাড়িতে যেতে বলেছে, তুমি খবরটা দিয়ে এসো ঠিক!

সরস্বতী ধমকে উঠলো, তুই যা না! সে আমি বুঝবো।

যমুনা চলে যেতেই সরস্বতী আমার দিকে ফিরে বললো, চলুন!

আমি আড়ষ্টভাবে বললুম, কোথায়?

—চলুন না, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। পার্ক স্ট্রিটে যাবেন? অনেকদিন এসপ্রেসো কফি খাই নি। খাওয়াবেন?

নিজের গালে আমার চড় কষাতে ইচ্ছে হলো। কেন প্রথমেই বললুম, কোথায় যাবো ভাবছি! নইলে তো অনায়াসেই বলা যেতো, আমার বিশেষ কাজ আছে, ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলাম! এই সব ছোটখাটো ভুলগুলো কিছুতেই আমি সামলাতে পারি না। সরস্বতী খুব উগ্র পরিচ্ছদ ও হাই হিল পরে এসেছে। এই মেয়েকে কি কেউ সুন্দরী বলবে? রাস্তার বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে অবশ্য, তাতে কিছু আসে যায় না। আমিও তো রানী থেকে মেথরানী কারুকেই না দেখে ছাড়ি না, প্রথমে মুখ ও সঙ্গে সঙ্গে দুই বুক, তারপর সর্বাঙ্গ ও আবার মুখে চোখ রাখি যদি পছন্দ হয়, রিপিট, যেরকমভাবে মেয়ে দেখা নিয়ম। সরস্বতীর বুক ও নাক উদ্ধত, অনাবশ্যক গর্ব ওর বাহুর ভঙ্গিতে ও চিবুকের নিচে। ব্লাউজটা স্বচ্ছ, ভিতরে ব্রেসিয়ার দেখা যায়। আমি ওর বুকের দিকে চোখ ফেলেছি লক্ষ করে ও ঈষৎ শরীর ফিরিয়ে আমাকে অপর বুকটা দেখালো। এই রকমই একটা মেয়েকে মেট্রো সিনেমার সামনে সুবিমল উচিত কথা বলেছিল। আমি আর সুবিমল আসছিলাম, সুবিমলের প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যেকদিনই একটা না একটা ভালো কাজ করবে, মেট্রো সিনেমার সামনে সুবিমল থমকে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়া, আমার গুড টার্নটা সেরে আসি ! আমি অবাক হয়ে বললুম, এখানে তুই আবার পরোপকারের কী সুযোগ পেলি ? সুবিমল বললো, তুই একটু সরে গিয়ে দাঁড়া না ! —বাজপাখির মতন চোখ সুবিমলের, সিনেমা হলের থেকে একটু পাশে একটি রূপসী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, নিশ্চয়ই কারুর প্রতীক্ষায়, মুখে সেই অধীরতা। মেয়েটির পোশাক এমন যেন সারা শরীরে রঙের দাগ বেঁধে গেছে, এবং মেয়েটিকে রূপাশ্রিতা বলতেই হবে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। কাঁধ ছুঁয়ে ফেলে আর কি—এত কাছাকাছি গিয়ে সুবিমল বললো, মেয়েটিকে, কী খবর ? এখানে ? —স্পষ্টতই মেয়েটি সুবিমলকে চেনে না, চমকে তাকালা, কিন্তু ভ্রূ কোঁচকালো না। সদ্য পাট ভাঙা ধুতি ও পাঞ্জাবি সুবিমলের, মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কার্তিক মাসের কার্তিকের মতন মুখ—তাতে আবার একটা শান্ত ভদ্রতার বার্নিশ মাখানো। ওকে দেখে কে বলবে, ওর পকেটে একটিও পয়সা থাকে না, আসলে নরদেহধারী খোক্কশ একটি ! মেয়েটি বললো, আমি তো ঠিক—। সুবিমল আহত হয়ে বললো, চিনতে পারছেন না ? আপনি বালিগঞ্জে থাকেন না ? মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললো, হ্যাঁ, বালিগঞ্জে, কিন্তু—। সুবিমল প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন করুণভাবে বললো, আমাকে চিনতে পারলেন না ? আপনাদের বাড়িতে আমি কতবার—আপনার দাদা অমল আমার বিশেষ বন্ধু !— মেয়েটি এবার উজ্জ্বল মুখে বললো, আপনার ভুল হয়েছে, আমার দাদার নাম তো অমল নয়। সুবিমল ফ্যাকাশে মুখে বললো, নয় ? তাহলে আমার সত্যি ভুল হয়েছে। মাপ করবেন, কিছু মনে করবেন না, একেবারে অবিকল ইন্দ্রাণীর মতন দেখতে আপনাকে !— তারপর সুবিমল মেয়েটির দিকে ভালো করে আবার তাকিয়ে দেখলো অপাঙ্গে, সুবিমলের দু' পকেটে হাত, সামান্য জড়তাও নেই। একটু নিচু গলায় মেয়েটিকে বললো, একটু অমিল আছে। আপনার মুখের মধ্যে অহঙ্কার মাখানো। ঐ অহঙ্কারটা মুছে ফেলুন। আপনাকে সত্যি ইন্দ্রাণীর মতন সুন্দর দেখাবে। বিশ্বাস করুন আমার কথা ! চলি !

আমি সুবিমল চোখে এখন একবার সরস্বতীকে দেখলুম। মনে হচ্ছে আজ আর যমুনার সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই, তবু ক্ষীণ আশায় বললুম, আপনাকে মামার বাড়ি যেতে হবে না ?

সরস্বতী ঠোঁট উল্টে বললো, সে দেখা যাবে। চলুন না ! কতদিন বাড়ি থেকে বেরোই নি!

— আপনি বাড়ি থেকে বেশি বের হন না বুঝি ?

— মা বেরোতে দেন না। আমাদের বাড়িতে খুব পুলিশী শাসন ! আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন ? আগে তো তুমি বলতেন।

— ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।

কফির দোকানে বসে আমাকে বেশি কথা বলতে হলো না ! সরস্বতীরই বহু কথা। আমি কোথায় চাকরি করি, আমি বিকেলে কোথায় থাকি, আমার কোনো প্রেমিকা আছে কিনা। কথা বলার সময় আমি যখন মুখখানা একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে রাখি—তাতে নাকি আমাকে খুব দুষ্টু মনে হয়। আমার মতন লাজুক লোক নাকি মেয়েদের সঙ্গে একেবারে সুবিধে করতে পারে না।

আমি কেন গোঁফ রেখেছি—মেয়েরা আজকাল গোঁফ পছন্দ করে না। রাত জেগে পড়াশুনো করা আমার উচিত নয়, তাতেই নাকি চোখের কোণে কালি পড়ে। সপ্তাহে একদিন আমি চুলে শ্যাম্পু করি তো নিয়মিত ? আমি কি কখনো ফুটবল খেলতুম ? আমার চেহারা দেখে নাকি তাই মনে হয়, অন্তত সরস্বতীর মনে হয়।

বাড়ি থেকে বেশি বেরুতে পারে না, তাই কি সরস্বতীর এত প্রগল্‌ভতা ? খাঁচার পাখিকে ছেড়ে দিলে সে প্রথমেই সোজা উড়ে যায় না, খানিকটা উড়েই ডানদিকে বেঁকে যায়, আবার উল্টো দিকে ফিরে কিছুদূর এসে হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে বহুদূর যায়, আমি লক্ষ করে দেখেছি। সরস্বতীও একটু ওড়াওড়ি করে নিচ্ছে। হঠাৎ ও আমাকে দুম করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বাঙাল, না ?

আমি বললুম, হ্যাঁ। কেন হঠাৎ—

সরস্বতী খুকখুক করে হেসে বললো, তাই বলুন ! বাঙালরা বিষম একগুঁয়ে হয়, আর—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আর কি ?

সেই রকম হাসতে হাসতেই বললো, শুনবেন ? আর খুব প্যাশনেট হয়।

আমি বললুম, বাঙালরা নিগ্রো নাকি ? তা ছাড়া তুমি জানলে কি করে ?

রহস্য ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও বললো, জানি !

আমার হাসি পেল। এ যে ছেলেধরা হয়ে গেছে দেখছি। সর্বনাশ ! নাকের ডগায় একটু ঘাম, বগলের কাছটাও নিশ্চয়ই ঘামে ভেজা। এসব ঢের জানি। ওর বাপ–মায়ের উচিত এক্ষুনি ধরে–বেঁধে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। ওর বোধ হয় ইচ্ছে, এমন রূপ নিয়ে এখুনি ধরা পড়ে কি হবে? একটু খেলাধুলো করে নেওয়া যাক ! পাগলি মেয়ে, খেলাধুলো করতে গেলে হাত মুখ ছড়ে যায়, পাও ভাঙতে পারে— সে খেয়াল আছে ? আমি বললুম, চলো এবার ওঠা যাক। আমার কাজ আছে একটা—

আদুরে ভঙ্গি করে সরস্বতী বললো, ওসব কাজ থাক, আমাকে মামাবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মামাবাড়ি কোথায় ? — কালীঘাট।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি ট্যাক্সির দিকে একেবারে লক্ষই করলুম না। এ যা মেয়ে দেখছি, ট্যাক্সি–ফ্যাক্সি যথেষ্ট বিপজ্জনক। আজ থেকে তেইশ দিন আগে যদি যমুনাকে আমি পথের ওপর দাঁড়ানো না দেখতে পেতুম, তবে আমার এমনভাবে জীবন বদলাবার কথা মনেও পড়তো না, তাহলে, সরস্বতী, তোমাকে নিয়ে আমি কি কাণ্ড করতুম, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

পার্ক স্ট্রিট ধরে এগোলাম চৌরঙ্গির দিকে, বাস ধরার জন্য। কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, তোমার দাদা বরুণ কি সত্যিই বিয়ে করেছে নাকি বিদেশে ?

ঠোঁট উল্টে সরস্বতী বললো, কে জানে ! কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়েছিল বোধহয়, বিয়ে না করে আর উপায় ছিল না ! ও নিয়ে এত ভাববার কি আছে ? ইচ্ছে হয়েছে, করেছে ! মা'র যত বাড়াবাড়ি !

আমি বরুণের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলুম। পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হতো, পালিশ করা পুতুলের মতন চেহারা, ওর পক্ষেও কি কোনো কাণ্ড বাধানো সম্ভব নাকি ? কি জানি, চেহারা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।

একটু দূরে গিয়েই সরস্বতী চেঁচিয়ে উঠলো, সান্যালদা !—একটা খাকি রঙা জিপ ঝট করে থামলো। তারপর ব্যাক করে আমাদের পাশে এলো, পুলিশের গাড়ি, ডগলাস–গোঁফওলা একজন ইন্সপেক্টর মুখ বাড়িয়ে বললো, কি ব্যাপার ? তুমি এখানে ? মা কেমন আছেন ?

—একটু ভালো আছেন। আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করুন তো !

লোকটি হাসতে হাসতে বললো, কোথায় যাবে ? সরস্বতী একই রকম তুলতুলে গলায় বললো, আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করে কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

আমি বললাম, সরস্বতী, আমার আর তাহলে যাবার দরকার নেই। ও বললো, আসুন না। পুলিশের গাড়ি বলে বুঝি আপনার লজ্জা করছে ? আসামী আসামী মনে হবে নিজেকে ?

উত্তর না দিয়ে ওর সঙ্গে আমিও জিপটায় উঠলাম। সরস্বতী বললো, সান্যালদা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার বন্ধু—

৮

কলেজগুলোতে স্ট্রাইক চলছে, সুতরাং দুপুরবেলা যমুনাকে এখন কিছুতেই পাওয়া যাবে না। পরপর দুটো গানের ক্লাশেও যমুনা এলো না। আমার তো আর কিছু কাজ নেই, আমি ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়েছিলুম গানের ইস্কুলের সামনে। কত মেয়েরা গেল ও বেরিয়ে এলো, অনেককেই দেখতে প্রায় যমুনার মতন, কিন্তু যমুনা কেউ না। নদীগুলোও প্রায় সবকটাই একরকম দেখতে, কিন্তু সব নদীতে স্নান করলেই তো আর পুণ্য হয় না। দু'ঘণ্টা ধরে একা রাস্তার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে কি অশেষ যন্ত্রণা—কখনো বুঝি নি আগে। এই দু'ঘণ্টা এত দীর্ঘ, যে মনে হয়, পৃথিবীতে এক জায়গায় সবচেয়ে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে আমি রেকর্ড স্থাপন করে ফেলেছি। যেসব দণ্ডী সন্ন্যাসীরা সূর্যের দিকে এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে থেকে তপস্যা করে, ধৈর্যে আমি তাদেরও পরাস্ত করেছি মনে হয়। সেইসব সন্ন্যাসীরা কি শেষ পর্যন্ত কিছু পায় ? আমি তো পেলাম না। বাস স্টপের পাশে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম। রাস্তার সব লোকই যাচ্ছে, আমিই একা দাঁড়িয়ে আছি। অনেকে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, যেন জেনে ফেলেছে, আমি একজন ব্যর্থ মানুষ।

যমুনাকে না পেয়ে আমি তখন যে কি করবো বুঝতেই পারলুম না। আগে আমার দিনগুলো কেমনভাবে কাটতো আর মনেই পড়ে না। যমুনাকে না পেয়ে এখন শুধু মনে পড়ে, সামনে দীর্ঘ সন্ধ্যা ও বিশাল রাত্রি পড়ে আছে—এ নিয়ে আমি কি করবো ? কোথায় যাবো ? কোথায় যাবো? কোথায় যাবো বলো তো হে ? আমি পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলুম। বাতাসে মাথা ঝাঁকিয়ে গাছটা বললো, আমি কি জানি ! আমি তো কোথাও যাই না, আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। একদিন তোমাতে আমাতে দু'জনেই শ্মশানে গিয়ে পুড়বো !

আমি বললাম, ভাগ ! তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা গাছের গায়ে চেপে ধরলাম। বললাম, এবার দেখো না চাঁদ, পুড়তে কেমন লাগে !

যমুনাকে না পেলে তো আমার চলবেই না দেখছি। এতখানি ওতপ্রোতভাবে যমুনার মধ্যে আমি ডুবে গেছি, আমি নিজেও আগে বুঝি নি। সেদিন ধুতির সঙ্গে চটি পরে বেরিয়েছিলুম, একটা লোক আচমকা আমার পা মাড়িয়ে দিল। আমি যন্ত্রণায় আঃ শব্দ করে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে লোকটিকে বললুম, ইডিয়েট ! চোখ নেই ? লোকটি বললো, মাপ করবেন, দেখতে পাই নি। তখনো আমার পা জ্বলছে, আমি সেইরকম কর্কশভাবেই বললুম, ননসেন্স ! দেখতে পাও না কেন ? লোকটি অবাক ভাবে আমার দিকে তাকালো, নিরীহ চেহারার প্রৌঢ়, হাতে ভারি ব্যাগ, বোধহয় অধ্যাপক-টধ্যাপক হবে, লোকটি মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, সত্যি দেখতে পাই নি, বিশ্বাস করুন ! এত ভিড়ের মধ্যে, বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে করে কেউ কারুর—। আমি সহ্য করতে

পারছিলুম না, বললুম, থাক্ হয়েছে হয়েছে, আর বক্বক করতে হবে না। লোকটির মুখ ক্রমশ করুণ হয়ে যায়, আমাকে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে, আমি ক্রমশ রেগে উঠতে থাকি। এমন সময় আমার চড়া গলা শুনে, অন্য অনেকের সঙ্গে একটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক ভাবে তাকালো। মেয়েটির মুখের সঙ্গে যমুনার কোনো মিল নেই, এ মেয়েটির রং কালো ও মুখখানা ভারি, তবু মুহূর্তে আমার যমুনার কথাই মনে পড়লো। যেন এই মেয়েটির অবাক চোখের মধ্য দিয়ে যমুনা আমাকে বলছে, ছিঃ, কেন এই লোকটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন ? উনি তো সত্যিই ইচ্ছে করে আপনার পা মাড়িয়ে দেন নি—আপনিও তা জানেন !—ভিড়ের বহু লোক তখন আমার বিরুদ্ধে, তবু আমি বেপরোয়ার মতন উদ্ধত হয়ে রইলুম, আমার চোখ তখন জ্বালা করছে, আমি যমুনাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বললুম, বেশ করবো, খারাপ ব্যবহার করবো। যমুনা, তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করছো না ? তাহলে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো। আমি আগে কখনো ট্রামে বাসে ঝগড়া করেছি ? আমি আগে কখনো কোনো প্রৌঢ় লোককে তুমি বলেছি ? এখন বেশ করবো, বলবো, কেন তুমি দেখা করছো না ?

অফিসে বড় জামাইবাবু একদিন ঘরে ডেকে নিয়ে আমায় বললেন, তুমি নাকি বনমালীবাবুকে বুড়ো শকুন বলেছো ? ছি ছি, ভদ্রলোক আমার কাছে নালিশ করতে এসে একেবারে কেঁদে ফেলেছেন ! বুড়ো মানুষ, দু'একটা কাজে ভুল করতে পারেন, তা বলে এরকম বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করা তোমার অন্যায়। ছি ছি—

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নত চোখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সর্বাঙ্গে অভিমান। আমি মনে মনে বিড়বিড় করেছি, বেশ করবো, বলবো, আবার বুড়ো শকুন বলবো, শুয়ারের বাচ্চা, ছাগলের গু, এঁটো শালপাতা, হেঁপো রুগীর সিক্নি—এই বলে যাকে-তাকে গালাগাল দেবো, বেশ করবো, যতদিন না যমুনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। যমুনার সঙ্গে কেন আমার দেখা হবে না !

যমুনাদের বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিলুম, ইচ্ছে করেই ভেতরে যাই নি, দেয়ালের সবক'টা পোস্টার মুখস্থ হয়ে যাবার পর দেখলুম, যমুনা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, সঙ্গে আরও দু'টি মেয়ে। বাঃ, চমৎকার, আজকের সন্ধেবেলাটা ভারি চমৎকার তো ! ঐ একরত্তি মেয়েটাকে দেখেই আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। অথচ আমি তো লোভ করি নি, ঐ যে সুন্দর শরীর, এখনো ও শরীরের সবক'টা ভাঁজ খোলা হয় নি, এমন টাটকা, আমি তো ঐ শরীরের লোভ করি নি, আমি শুধু ওর মাধুর্যটুকু চেয়েছি। কিন্তু যমুনাকে আমার একা চাই, পাশের ঐ আজেবাজে মেয়ে দুটো কারা ?

আমাকে দেখতে পায় নি, বেশ ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা বাসস্টপের দিকে, এক্ষুনি যদি বাসে উঠে পড়ে, তাহলে আবার যমুনা হারিয়ে যাবে। আমি দ্রুত হেঁটে প্রায় কাছাকাছি এসে ফের গতি মন্থর করে এগিয়ে গিয়ে বললুম, কোথায় যাচ্ছো ? কি জানি আমার গলার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল কিনা, যমুনা অত্যন্ত বেশি রকম চমকে পিছন ফিরে তাকালো। তারপর, আমায় দেখে, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের বাড়ি যাচ্ছিলেন বুঝি ?

— গেলেও তো তোমায় পেতুম না। আগে একদিন গিয়েও তোমাকে পাই নি। আজ কোথায় যাচ্ছো ? রিহার্সাল ?

—না, সিনেমায়। টিকিট কাটা আছে যে।

আমার বলার ইচ্ছে হলো, আজ সিনেমায় যেও না। কিন্তু, একথা মুখে বলা যায় না। সুতরাং, আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, কোন্ পাড়ায়, চৌরঙ্গিতে ? দেরি হয়ে গেছে তো তাহলে, তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ো।

—হুঁ, আমাদের জন্য ওখানে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকবে !

যমুনা ওর বান্ধবীদের ছেড়ে আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললো, সুনীলদা, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে ! চলুন !

—না, না। তোমার বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে আমি গিয়ে কি করবো ! ওদের অস্বস্তি লাগবে।

—মোটেই তা না। আপনার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেবো, ঐ যে ওরা অর্চনা আর নবনীতা, আমার ক্লাসের মেয়ে—এই নবনীতা, তোদের সেই সুনীলদার কথা বলেছিলুম না—চলুন, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার সঙ্গে কোনোদিন সিনেমা দেখি নি—

— না খুকী, আজ না, আর একদিন।

— আবার খুকী ?

নবনীতা নামের মেয়েটি বললে, ঐ যে বাস আসছে, এটাতে উঠবি ?

যমুনা আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি আর একটু হলে বলতে যাচ্ছিলুম, আমিও ঐ দিকেই যাবো, চলো, তোমাদের সঙ্গে বাসে এক সঙ্গে যাই—কিন্তু, শেষ মুহূর্তে একথা না বলে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, তোমাদের সঙ্গে বাসের রাস্তাটুকু এক সঙ্গে যাবো ?

— আপনি কি ঐ দিকেই যাবেন ?

— আমার যে কোনোদিকে গেলেই হলো।

দোতলার দুটি সিটের লোকেরা উঠে দাঁড়ালো। আমি যমুনার সঙ্গে একসঙ্গে বসলুম, গায়ে গা না ছুঁয়ে উপায় নেই, যমুনার শরীরের আঁচ আমার গায়ে লাগতে ভারি ভালো লাগলো। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর বুক দুলে দুলে উঠছে, সারা দেহময় সুগন্ধ। আমি জিজ্ঞেস করলুম, খুব সেন্ট মেখেছো, বুঝি ? ও অবাক হয়ে বললো, বাঃ, সিনেমায় যাবার সময় সেন্ট মাখবো না ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ও সিনেমায় যাবার সময় সেন্ট বুঝি মাখতেই হবে ? নিয়ম?

— সবাই মাখে।

— তুমি গানের ইস্কুলে আর আসছো না কেন ?

মা বলেছেন, একমাস আর গানের ইস্কুলে যেতে হবে না। সামনেই কলেজের পরীক্ষা !

— সিনেমায় যেতে পারো, আর গানের ইস্কুলে গেলে কি ক্ষতি হয় ?

যমুনা ক্ষুণ্ন হয়ে বললো, আপনি আমায় বকছেন ? কিন্তু আমার কী দোষ ?

না বকি নি, আমি তো ওকে বকতে চাই নি, আমার ইচ্ছে হলো ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, না, বুলবুলি, তোমাকে আমি বকি নি। আমার মেজাজটা তোমার জন্যই রুক্ষ হয়ে আছে। আঃ, ট্রামে-বাসে কি কথা বলার কোনো উপায় আছে ? আশেপাশের গাদা-গাদা লোক হাঁ করে তাকিয়ে ! যেন আশেপাশে আর কিছু দেখার নেই, সবার চোখ আর কান এদিকেই ফেরানো। ঐ পাশের সিটেও তো বেশ দুটো ফুরফুরে মেয়ে বসে আছে, সেদিকে তাকা না হতভাগারা ! না, শুধু দু'টি মেয়ের চেয়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং, তাদের কিছুতেই নির্জনতার সুযোগ দেওয়া হবে না, এদিকেই ব্যাকুলভাবে ট্যারা চোখে তাকিয়ে থাকতে হবে। আমি একটা ক্রোধের দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

বাসটা এত জোরে ছুটছে, পৌঁছোতে আর কতক্ষণই বা দেরি লাগবে ! সময় নেই, আর সময় নেই। গলার আওয়াজ যথাসম্ভব মৃদু করে আমি বললুম, যমুনা, তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমার খুব ইচ্ছে হয়।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে যমুনাও মৃদুস্বরে বললো, আমারও।

— তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হওয়ার খুবই দরকার।

— দিদিটা যে ভীষণ সর্দারি করছে আমার ওপর ! ভালো লাগে না !

— কিন্তু, আমার যে খুবই দরকার।

— আমাকে এখন আর একা বেরোতে দেয় না !

ওপাশের সিট থেকে অর্চনা নাম্নী মেয়েটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, এই যমুনা, দ্যাখ দ্যাখ, ঐ যে টি কে পি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলেছিলুম না, ওঁর বিয়ে হয়ে গেছে। সঙ্গে ওঁর বউ।

যমুনা ব্যগ্র হয়ে বললো, কই, কই ?

বাসটা তখন থেমেছিল, আমাকে হাঁটু সরিয়ে পাশ দিতে হলো, যমুনা উঠে ওপাশের জানলার দিকে ছুটে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, টি কে পি কে ?

— আমাদের ইংরেজির প্রফেসার !

— যাই বলিস, ওঁর বউকে মানায় নি। টি কে পি এমন হ্যান্ডসাম।

— যাঃ, ওঁর বউকেও খুব স্মার্ট দেখতে।

— ওঁর বউও প্রফেসার, বেথুনের।

—এই অত মাথাটা ঝোকাস্ নি, আমাদের দেখতে পাবে।

— দেখুক না !

তিনটি বালিকা মিলে কলকল করতে লাগলো। কোথাকার কে এক ইংরেজির ছোকরা প্রফেসার, তার জন্যও সময় নষ্ট, সেও আমার শত্রুতা করবে ! যমুনা তো ব্রেবোর্নে পড়ে, সেখানেও পুরুষ লেকচারার আছে নাকি ? কিংবা হয়তো কোনো কোচিং ক্লাশের বা প্রাইভেট টিউটর, অর্থাৎ একটা এলেবেলে লোক, তার জন্যও আমার দুর্মূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ! আমি সেই সময়টা বিরস মুখে বসে রইলুম। এক একটা মুহূর্তও যেন মাইল পোস্টের মতন দূরে। তারপর মনের ভেতরটায় একটা নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিক হয়ে নিলুম। আমারই দোষ। কয়েকটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, তারা নিজেদের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে, ছোকরা প্রফেসারের বিয়ে হয়েছে কিনা এই নিয়ে কৌতূহল দেখাবে, শায়রাবানু আর দিলীপকুমারকে নিয়ে আলোচনা করবে— এইগুলোই তো স্বাভাবিক, মাঝখান থেকে আমি এসে গলাভারি করে কাতরভাবে কথা বলবো— এইটাই অস্বাভাবিক। আমার স্বার্থপরতা। একা দেখা না হলে আমার চলবে না। ঠিক সময় একথাটা বুঝতে পেরে আমি মনের গ্লানি দূর করে হালকা হয়ে গেলুম। হাসি মুখে তাকালুম ওদের দিকে।

জায়গা আসতে, ওদের নেমে যাবার সময় আমি আর সঙ্গে নামলুম না। আমি বসেই রইলুম। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে যমুনা হঠাৎ আবার ফিরে এলো, হাসিমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, যাই ? কি সুন্দরভাবে চুলগুলো ওর দুলে উঠলো কথা বলার সময়। শাড়ির আঁচলটা বাঁ হাতে পাকিয়ে নিয়েছে। আমিও গ্লানিহীন হাসিমুখে বললুম, শিগ্‌গির যাও, বাস ছেড়ে দেবে ! যমুনা তবু দু'এক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো, তারপর আকস্মিকভাবে গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে অভিমানের সঙ্গে বললো, সুনীলদা, আপনি আমাকে একটাও চিঠি লিখলেন না ! বলেই নেমে গেল।

চিঠি লিখলেন না ? একথার মানে কি ? চিঠি লিখে কি হবে ? এত কাণ্ডের পর এই বয়েসে আমি আবার চিঠি লিখে প্রেম করা শুরু করবো নাকি ? ধ্যাৎ ! যমুনার ঐ চিঠি কথাটার মানে বুঝতে পারি নি, কিন্তু ঐ শেষ মুহূর্তের তাকানো এমন অসম্ভব ভালো লেগেছিল যে বুঝতে পারছি আমার পালস্ রেট বেড়ে গেছে। আঃ, বাতাস এখন খুব হাল্কা, অনায়াসেই বারবার বুক ভরে ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।

বাস কিছুটা দূর যাবার পর ট্রাফিক জ্যামে থেমে রইলো। ভাগ্যিস আগে আটকায় নি, তা হলে যমুনাদের সিনেমার দেরি হয়ে যেতো। আহা, ওরা এখন হাসিখুশি নিয়ে রঙিন ফিলম্

দেখুক ! জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি একজন চেনা লোককে দেখতে পেলুম। অফিসের বনমালীবাবু। দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাত ধরে ফুটপাত থেকে ছিটের জামা কিনছে। ওঁকে আমি বুড়ো শকুন বলেছিলুম, ভেবে আমার একটু হাসি পেল। বনমালীবাবুকে দেখলে মনে হয়, আগে ওঁর বেশ ভালো স্বাস্থ্য ছিল, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগা হয়েছেন। দু'পাশের কাঁধ দুটো যেন ডানার মতন উঁচু হয়ে উঠেছে, অত বেশি পাওয়ারের চশমাটাও বড় বিশ্রী দেখতে——একটু শকুন শকুন ভাব আছে ঠিকই। চোখে ভালো দেখতে পান না বলে অফিসে ওঁর কাজে ভুল হয়, অফিসে সবসময় ওঁর মুখে কিরকম যেন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটে থাকে, কিন্তু এখন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তাঁর মুখের চেহারা অন্যরকম, আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকারীর মতন আস্থাবান, কি প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে দোকানদারকে ধমকাচ্ছেন। এখন উনি যেন অন্য মানুষ। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো, নেমে গিয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই এখন। একটু উঠে দাঁড়িয়েও ছিলুম, কী ভেবে আবার বসে পড়লুম। ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হয়ে যাবে, উনি হকচকিয়ে যাবেন, মুখে আবার সেই বিগলিত ভাবটা ফিরে আসবে, আমার ক্ষমা চাওয়ায় উনি খুশি হওয়ার বদলে বিকৃত ও ভীত হয়ে উঠবেন বেশি। আমায় যে বড় জামাইবাবু ডেকে ধমকেছেন, সে কথা নিশ্চয়ই ওঁর কানে গেছে, তাতেই খুশি হয়েছেন নিশ্চয়ই ! আমি তো মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিতেও পারি, একই কথা। জানলা দিয়ে আমি একদৃষ্টে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বনমালীবাবু, আসলে আমি সত্যিই তেমন খারাপ লোক নই। রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলুম। আমায় আপনি ক্ষমা করবেন তো ? রাগের মাথায় মানুষ দু'একটা ভুল তো করেই। যমুনার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছিল না বলেই তো আমার মেজাজ খারাপ। যমুনার সঙ্গে আর কয়েকদিন একা দেখা হলেই আমার মেজাজ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। আমি সম্পূর্ণ বদলে যাবো।

একা কোথায় দেখা হবে ? কিছুতেই যমুনাকে পাচ্ছি না। গানের ইস্কুলেও যায় না, কলেজ বন্ধ। যমুনাকে কোথায় পাবো ?

কয়েকদিন যমুনার দেখা না পেয়েই আমার পায়ের তলা আবার খসখস করতে লাগলো। যমুনার সঙ্গে থাকার সময় মনে হতো, আমি যেন সবসময় খালি পায়ে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছি, চারপাশে সবুজ গাছের নিঃশ্বাসের সুবাতাস। এখন আবার ভিড়ের মানুষের গরম নিঃশ্বাস আমার গায় লাগতে লাগলো। নাইলনের মোজার ছোঁয়ার পায়ের তলায় বিশ্রী স্বাদ। কিন্তু যমুনাকে পাবার জন্য আমি কি করতে পারি——কিছুই বুদ্ধি আসে না মাথায়। একটা ষোলো বছরের মেয়েকে আমি চাই, আমার একার জন্য——একথা পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করবে না। কিছু না ভেবেই আমি যমুনাদের বাড়িতে একটা টেলিফোন করলাম। তারপরই একটা ছোট ভুল করে ফেললুম আবার। কি করবো, যমুনার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে যে সত্যি কথা বলতে পারি না। আর সকলেই সত্যি কথা শুনলে ভুল বোঝে। টেলিফোনে একবার মাত্র রিং করার পরই একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো, ইয়েস——জগদীশ রায়ের গলা, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আমি ভাবলুম, জগদীশ রায়কে কী বলা যায়, যমুনাকে ডেকে দিন ! আমি শুধু ওরই সঙ্গে কথা বলতে চাই ? নাঃ——যায় না। তখন আমি অন্য একটা নম্বর বানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি এই নম্বর ? সেই গম্ভীর কণ্ঠ বললো, না——।

৯

পরদিন শনিবার, আমি দুপুরের দিকে যাদবপুরে সুবিমলের বাড়িতে চলে এলাম। এ–ক'দিন একা একা থেকে একাকীত্বটা বুকের মধ্যে বিষম ভারি হয়ে উঠেছে। সুবিমল চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সিগ্যারেট টানছিল, মাথার কাছে কাগজপত্র ছড়ানো, কিছু লেখার চেষ্টা করছিল বোধ হয়। রাস্তার পাশের কাঁচা ড্রেন পেরিয়ে আমি এসে ওর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললুম, কি রে ? ভেতরে ডেকে নেবার পর সুবিমল বললো, তোদের কি ব্যাপার ? তুই আর শেখর দু'জনেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলি ?

আমি বললুম, কোথায় আবার নিরুদ্দেশ হয়েছি ! শেখরও হয় নি।

সুবিমল ড্রয়ার ঘেঁটে সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বললো, জানি জানি, তোদের দু'জনের ব্যাপার জানি। তুই একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কিছু একটা কারবার করছিস—আর শেখর একটা বাঈজিকে নিয়ে মেতে আছে।

—তুই এসব কথা কোথা থেকে শুনলি ?

—অবিনাশের কাছে।

—সে গুণ্ডাটার নিজের কি খবর ?

—সে এখন শেখরের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। শেখরের অবস্থা জানিস তো, খুব শোচনীয়। এল এস ডি ফেলেসডি কি নাকি সব ট্যাবলেট খেয়েছিল, এখন ওর প্রত্যেকদিন মাথা ঘোরে, চলতে গিয়ে পড়ে যায়—তবু বাড়ি ফিরবে না, ঐ বেজাতের মেয়েমানুষটাকে নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। আর সে মেয়েমানুষটাও ছেলে ছেলে বলে একেবারে পাগল। এদিকে পরিতোষের সঙ্গে আমার কাল দেখা হলো, ওর মা না–কি ঠাকুরঘরে বসে জানতে পেরে গেছেন যে শেখর ওঁকে মিথ্যে কথা বলে গেছে। খুব কান্নাকাটি করছেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত না, শেখরের মা কাঁদছেন তাঁর ছেলের জন্য, আর শেখর এদিকে আরেকটি মায়ের ছেলে খুঁজে দিতে ব্যগ্র। ভাবছি এই নিয়ে একটা নাটক লিখবো। আর সেই মেয়েটার চরিত্রও অদ্ভুত। আমি—

—থাক, ওর কথা শুনতে চাই না এখন।

—তুই ওর পুরো ব্যাপারটা জানিস ?

—জানি।

—আমি কয়েকদিন আগে গিয়েছিলুম বীণার ওখানে। বীণার দিদি সেই নূরজাহান বেগম—অমন সুন্দরী, কিন্তু পোশাকটোশাক সব এলোমেলো, ঘনঘন ফিট হচ্ছে। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে।

—অভিনয় নয় তো এসব ? সিনেমার মেয়ে !

সুবিমল একটু হেসে বললো, না–রে, কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা অভিনয় নয়—এখন বড় বেশি বুঝতে পারি। এত বেশি বুঝতে না পারলেই ভালো হতো।

—ওর স্বামী কি বলছে ? ছেলে ফেরত দেবে না ?

নাঃ ! সে–লোকটা মহাপাজি। সে আরেকটা বিয়ে করেছে, সে বউকেও সিনেমায় নামাবার চেষ্টা করছে। ছেলেকে ফেরত দেবে না তার কারণ হিসেবে অবশ্য বলছে, নূরজাহান যদি ছেলেকে ঢাকায় নিয়ে যায়—তাতে তো ছেলেটাও প্র্যাকটিকালি মুসলমান হয়ে যাবে—সে তাতে রাজি নয়। তারও তো ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে করে। আসলে লোকটার ইচ্ছে, নূরজাহানকে এখানে ধরে রাখে; ঠিক স্ত্রী হিসেবে নয় রক্ষিতা হিসেবে—আর নূরজাহানকে

এখানকার সিনেমা লাইনে ঢুকিয়ে যদি কিছু টাকা পেটা যায়।

—নূরজাহান ওর নামে মামলা করুক না।

—তা কখনো পারে ! নূরজাহান তো পাকিস্তানের সিটিজেন। ও তো আর নিজেকে সাধনা বলে স্বীকার করতে চায় না। এইটাই তো মুশকিল, বাবা আর মা যদি দু'দেশের নাগরিক হয়, আপাতত দুই শত্রুভাবাপন্ন দেশের—তা হলে ছেলের কী অবস্থা হবে ?

—এক্ষেত্রে নূরজাহানকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তারই দোষ। সেই তো স্বামী আর ছেলেকে ফেলে পালিয়েছিল। তখন মনে ছিল না ? ঐ মেয়েটাকে আমার একদম পছন্দ হয় না।

—তুই যা বলছিস, যুক্তির দিক দিয়ে তা ঠিক। কিন্তু এখানে যে যুক্তি টিকছে না। ছেলের জন্য নূরজাহানেরই বা এত ব্যাকুলতার কী যুক্তি ! মেয়েটার কোনোরকম নীতিজ্ঞান নেই, টাকা আর ভোগ সুখের স্বাদ পেয়ে এখন ওছাড়া আর কিছু জানে না, সেসব তো পেয়েছেই, পূর্ব পাকিস্তানের ফিল্মে ওর নামটাম হয়েছে শুনেছি, অনেক টাকাও করেছে, তবু সামান্য একটা ছেলের জন্য এই পাগলামি কেন ?

আমি কিছুটা বিরক্তভাবে বললুম, তোরা এ জিনিসটাকে বড্ড বাড়িয়ে দেখছিস্। এতো অ্যানিমাল ইন্সটিংকট ! জন্তু জানোয়াররাও নিজের বাচ্চা হারালে ছটফট করে—পৃথিবীতে অন্য অনেক কিছুর চেয়ে এ দুঃখটা এমন কিছু বড়ো নয়।

সুবিমল বললো, জন্তু জানোয়াররা ছটফট করে অনেকটা শারীরিক কারণে। কিছুদিন পর ভুলে যায়। কিন্তু মানুষই ভোলে না। আট দশ বছর পরও নিজের সন্তানের জন্য অন্য জীবন থেকে ছুটে আসা, এর মধ্যে একটা ট্র্যাজিক নোট আছে। তুই এটা মিস্ করছিস কেন ?

—আমার ওসব এখন ভাবতে ভালো লাগে না। আমি এখন নিজের একটা ব্যাপার নিয়ে বিব্রত।

—আমিও নিজের একটা ব্যাপার নিয়ে বিব্রত। তবু এ ব্যাপারটায় অভিভূত হবো না, এমন পাষণ্ড নই ! নিজের সমস্যা থাকলেই অপরের সমস্যা বেশি চোখে পড়ে। শেখর তো ঐ মেয়েটার জন্য চাকরি–বাকরি সব ভুলে গেছে। অবিনাশের মত নিষ্ঠুর ছেলেও ওখানে আটকে আছে কি জন্য ? মেয়েটা সত্যিই একেবারে আকুলি–বিকুলি করছে ! বলছে না পেলে ফিরে যাবে না, এখানেই থাকবে, যে কোনোভাবে হোক, এমন কি ভিক্ষে করতে হলেও।

আমি আস্তে আস্তে বললুম তা আর সম্ভব নয়। ওকে ফিরতেই হবে। যে গেছে, তার আর ফেরার উপায় নেই। বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ছেলেকে পাবার জন্য এখানে ফিরে এসেছে নূরজাহান, কিন্তু পূর্ব বাংলার মাটির জন্য তোর আমার বুক পোড়ে না ? মনে পড়ে না সেই দুর্গাপুজোর আটচালা, বটগাছে তক্ষকের ডাক আর রাত্তিরবেলা ঘরের পাশে জলের ছলছল শব্দ? আমি আর সেখানে ফিরতে পারবো ? ওসব শেষ হয়ে গেছে। পিছুটান থাকলে এখানেও আমি মন বসাতে পারবো না। নূরজাহানকে বল, মানে মানে কেটে পড়তে। জাত খুইয়ে ও তো ওখানেই ফিরে গেছে, আবার এদিকে লোভ কেন ? ওসব হবে না—দরকার হলে আমিই ওকে তাড়াবো—

—তুই এরকম নিষ্ঠুরের মতন বলছিস কেন ? ও একটা অসহায় মেয়েছেলে, ও জাতধর্মের কি বোঝে ? আমার কী মনে হয় জানিস, নূরজাহানই যেন পূর্ববঙ্গের আত্মা, ভুল করে ফেলে এখন কাঁদছে।

— রাখ, ওসব কবিত্ব করতে হবে না তোকে।

— তোর কি মনে হয় না, দুই বাংলা আবার মিলতে পারে ? আমার তো বিশ্বাস, একদিন না একদিন—

— তোর যদি বিশ্বাস থাকে তো ভালোই। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো, আমার জীবনে বোধহয় ও জিনিস আর দেখে যেতে পারবো না।

— তুই একটা ড্যাম পেসিমিস্ট ! দেখছিস না, ওখানে নতুন করে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হচ্ছে। আমরা তো মিলতে রাজিই আছি—ওরাও যদি রাজি হয়, তবে কে আটকাবে, পশ্চিমের ঐ একটা ছোট্ট টুকরো !

— সারা পৃথিবী আটকাবে, সারা পৃথিবীর স্বার্থে। আমাদের কথা কে ভাবে ? তাছাড়া পূর্ব বাংলার আন্দোলন আমাদের সঙ্গে মেলবার জন্য মোটেই নয়। যাকগে, এসব কথা ভাবতে আজ আমার একটু ভালো লাগছে না। চল বেরুবি ?

— বেরিয়ে কোথায় যাবো ?

— তোর বাড়িতে তো চা খাওয়াবার সিস্টেম নেই। অন্তত মোড়ের দোকানটায় গিয়ে খাওয়া যাক।

সুবিমল একটু হেসে বললো, বাড়িতে আমার একেবারে প্রেস্টিজ নেই। চা চাইলে বোধহয় মুখ ব্যাঁকাবে। চল বেরিয়েই পড়া যাক।

সুবিমল ধুতিটা ফেরতা দিয়ে পরে, পাঞ্জাবি চড়ালো। আয়নার সামনে গিয়ে যত্ন করে চুল আঁচড়ে নিয়ে, বেরুবার মুখে লেটার বক্সে একবার উঁকি মারলো। কোনো চিঠি নেই। কয়েক পা এগিয়ে বললো, হঠাৎ যে এতদূরে এলি ? আমি বললুম, আজ আমার বড্ড মনটা খারাপ। একদম ভালো লাগছিল না ! — সুবিমল চট করে বললো, আমারও আজ মনটা খুব খারাপ। তুই না এলে বাড়ি থেকে বেরুতাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর আবার মন খারাপ হলো কিসে ? — সুবিমল আঙুল দিয়ে কোণের একটা একতলা বাড়ি দেখিয়ে বললো, ঐ বাড়িতে একটা মেয়ে থাকে, ঐ মেয়েটার ম্লান মুখখানা খুব মনে পড়ছে সারাদিন। ভাবছি মেয়েটাকে বিয়ে করবো—

আমি সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, আবার একটা মেয়ে ? কেন, সেই মেয়েটা কি হলো ? সেই টেলিফোন অপারেটর ?

সুবিমল রীতিমত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কোন্ টেলিফোন অপারেটর ?

—বাঃ, সেই যে অরুণের অফিসে, রোগা আর ফর্সা, যাকে দেখে এক মুহূর্তে তোর জীবন বদলে গিয়েছিল ? মায়ায় উথলে উঠেছিলি একেবারে, মনে নেই ! নাকি বানিয়ে বলেছিলি ?

—ওঃ, সেই মেয়েটা ? ধ্যুৎ ! সেটা বাজে। খালি টাকার দিকে লোভ। অরুণকে ভেবেছিল শাঁসালো মক্কেল, মেয়েটা জানতো অরুণের বিয়ে হয় নি, তাই অরুণের জন্য অমন ন্যাকামি করেছিল। আমি একদিন আলাপ করতে গেলুম, আমাকে পাত্তাই দিল না !

—পাত্তা দেবে কেন ? তোকে চেনে না, শোনে না, অনেক ছেলে নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে—

—উঁহু, অরুণ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তবু গ্রাহ্য করে নি। তারপর একদিন দেখলুম, অরুণদের বড় সাহেবের সঙ্গে ছুটির পর গাড়িতে উঠছে। আমি আর কি করবো বল, আমি তো ওকে বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিলাম।

—আচ্ছা, বুঝলাম, তা এই নতুন মেয়েটার কি ব্যাপার ?

— আঃ, কী ঠাণ্ডা আর সুন্দরী এই মেয়েটা। কী করুণ মুখ ! ছলছলে দুটো বড় বড় চোখ এমন যে, দেখলে —

—রূপ বর্ণনা শুনতে চাই না। ঘটনাটা কি, সাদা বাংলায় বল্—

—আমি আগে চিনতুম না। পাড়ার মেয়ের দিকে কেই বা নজর দেয় ! ক'দিন আগে মাত্র

দেখলুম ওকে।—ওরা বেশ গরীব, বুঝলি ? পরশুদিন মেয়েটাকে বিয়ের জন্য দেখতে এসেছিল একদল লোক। মেয়েটা খুব তোতলা—পাত্রপক্ষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারবে না, তাই কথাবার্তা বলার জন্য আমাদের বাড়ির একজনকে ডাকতে এসেছিল। আমিই গেলাম। কী নৃশংস ব্যাপার, তোকে কি বলবো ? চারটে হুমদো হুমদো লোক এসেছে, লুচি আলুদ্দম আর সন্দেশ সাঁটালো বেধড়ক, মেয়েটাকে বললো, চুল খোলো তো, হাঁটো তো মা, গান জানো ? রান্না জানো ক'রকম ? ফ্রক সেলাই করতে পারবে ? তারপর ভূদেব মুখুজ্যের লেখা থেকে ডিকটেশান লেখালো, আচ্ছা তুই বল, বাংলাদেশে ক'টা লোক আছে ভূদেব মুখুজ্যে থেকে ডিকটেশান সঠিক লিখতে পারবে ? আর এ একটা সেকেন্ড ইয়ারের কচি মেয়ে, লজ্জায়, অপমানে নীল হয়ে আছে। সেই করুণ মুখ দেখে আমার বুক একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। মুরগি কেনার মতন ওরা মেয়েটার পেট টিপেও দেখতে পারতো, তা দেখে নি অবশ্য, কিন্তু একথা বলেছে, মেয়েটির মুখের তুলনায় হাত–পায়ের রং কালো দেখছি ! তারপর বরের বাবা মেয়ের বাবাকে বললো, মেয়েটার সামনেই, মেয়ের রং তেমন ফর্সা নয়, সুতরাং সোনা কিন্তু কমালে চলবে না ! ঐ বাইশ ভরিই চাই ! ছেলের বাবা কিন্তু যে–সে লোক নয়, একটা ইস্কুলের হেড মাস্টার। আমার ইচ্ছে হলো, লোকগুলোর নাক কামড়ে ছিঁড়ে দিই, পেছনে লাথি মারতে মারতে একেবারে হাত–পা ভেঙে কীচক বধ করে ফেলি। যাই হোক, মেয়েটার সেই অপমান দেখে তখুনি আমি ঠিক করলুম, আমিই মেয়েটাকে বিয়ে করবো।

— তোর সঙ্গে বিয়ে দেবে কেন ?

— জাতে মিল আছে। এবার একটা চাকরি খুঁজে নেবো—

—- তুই আর চাকরি খুঁজেছিস !

— অপমান করিস না। একটা এম এ ডিগ্রি আছে আমার, ভুলে যাস না। নেহাৎ মাস্টারি করার নামে জোচ্চুরি করবো না বলেই এতদিন চাকরি পাই নি। যাক, অপমানের কি আছে ! হরলালবাবুর কোম্পানিতে একটা সেলসম্যানের চাকরি খালি আছে শুনলাম। এবার ওঁকে গিয়ে বলবো। শুধু বলা নয়, ওঁর বাড়িতে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেবো, হরলালবাবুর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে জিভ দিয়ে সবটুকু ধুলো চেটে নেবো, ওঁর ছেলের গু মোছাবো ! ওঁর হেঁপো রুগী বউয়ের বমি খাবো—তাও চাকরি দেবে না ? কী ভাবিস তুই আমাকে ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, চাকরি পেলেই তুই এই মেয়েটাকে বিয়ে করবি ? তোর সঙ্গে মেয়েটার আলাপ আছে ?

—আলাপ থাকার দরকার নেই। আমি ওর অপমানে করুণ মুখ দেখেছি। তাতেই যা জানার আমি জেনে নিয়েছি। আমি ওর অপমান মুছে দিতে চাই।

—তারপর একে বিয়ে করার পর তুই আবার একটা মেয়েকে হয়তো দেখলি, এই রকমই অসহায় কিংবা অপমানে করুণ। তখন কি করবি ? তখন তো আবার তাকেও বিয়ে করে বাঁচাতে পারবি না !

সুবিমল চটে উঠে বললো, তুই সবসময় ওরকম যুক্তি দেখাস কেন বল তো ? কি বাজে অভ্যেস হয়েছে তোর—

আমি হঠাৎ আহত বোধ করলুম। একটু অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, সত্যিই আমি যুক্তি দেখাই না কি রে সবসময় ? আমি নিজে তো বুঝতে পারি না। আমার নিজের বেলায় তো একটাও যুক্তি মেলে না। একরকম ভাবি, অন্যরকম হয়ে যায়। এই কদিন ধরে আমি যে এত ভাবলুম —

—কী হলো তোর এ ক'দিনে ?

আমি সুবিমলকে যমুনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বললুম। বলার সময় আমার অল্প হাত কাঁপছিল, দু'একটা কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল কেন জানি না। আমি সামান্য অসহায়ও বোধ করছিলুম। সব শুনে সুবিমল বললো, যাক, তুই বেঁচে গেলি, তোকে মানুষের মতন দেখাচ্ছে। আমি লাজুকভাবে বললুম, কেন রে ? সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, সত্যি বিশ্বাস কর, এতদিন ছিলি বনমানুষ, এখন মুখোশ ছিঁড়ে মানুষের মতই দেখাচ্ছে তোকে। আমি বললাম, সুবিমল, এ ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি করিস না।

—না, ইয়ার্কি নয়। তুই কোথাও গিয়ে নিজের মনকে খুলে ধরতে পেরেছিস, এই তো যথেষ্ট। মেয়েটা কোথায় ? একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দে।

— মেয়েটার সঙ্গে আমারই আর দেখা হচ্ছে না যে ! কি করি বল তো ? মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করবো !

— খবরদার একেবারে হাতছাড়া হতে দিস না। ওসব সরলতা-ফরলতা হয়তো বাজে কথা। হয়তো দেখবি মেয়েটা বেশ ডেঁপো, পেকে ঝুনো হয়ে গেছে—কিংবা তুই যত বাচ্চা ওকে ভাবছিস, ততটা বাচ্চা মোটেই নয়, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে, অল্পবয়েসী বিশেষ একটা মেয়েকে তোর মনে হচ্ছে পবিত্র, তার কাছে গেলে তোরও মন পবিত্র হয়ে যায়, ব্যস, তুই মেয়েটার কাছেই থাকবি— সোজা কথা।

— কি করে থাকবো ? একটা ঐ রকম বাচ্চা মেয়েকে আমার সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা করতে দিতে ওর বাপ-মা রাজি হবে কেন ?

— মেয়েটাকে বিয়ে করে ফ্যাল।

— দূর ! ঐটুকু মেয়ের বিয়ে হয় নাকি ?

— জোর করে করতে গেলে হয় না, কিন্তু বাপ-মা রাজি হলে ঠিকই হয়। হবে না কেন ? ওর বাপ-মাকে গিয়ে ভজিয়ে ফ্যাল। তুই তো ছেলে খারাপ না।

— তা যদিও বা হয়, কিন্তু পরে যদি আমার এরকম আর না লাগে ? মেয়েটারও যদি ভবিষ্যতে আমাকে ভালো না লাগে ?

কথা বলার সময় আমি ক্রমশই বেশি লাজুক ও কাঁচুমাচু হয়ে যাচ্ছিলুম ! সুবিমল রীতিমত ভারিক্কী চালে আমাকে ধমকে কথা বলতে লাগলো। বললো, তুই বুড়োদের মতন ভবিষ্যৎ ভাবছিস কেন ? বুড়োরা—যারা দু'দশ বছরের মধ্যে মরবেই—তারাই অপরের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চায়। বাপ-মায়েরা ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবে কেন জানিস, নিজেরা তো অতদিন বাঁচবেই না জানে, তাই ছেলেমেয়ের আগাম তিরিশ কি চল্লিশ বছরের জীবনের ছক বেঁধে দিতে চেয়ে কল্পনায় একটু ভবিষ্যৎকে দেখে নেবার সুখ পেতে চায়। আমাদের তো সে ঝামেলা নেই, আমরা আরও চল্লিশ বছরও বাঁচতে পারি, আবার আগামীকালও মরে যেতে পারি। কবে গাড়ি চাপা পড়ে কিংবা অ্যাটম বোমের ঘা খেয়ে মরে যাবো তার ঠিক নেই, আবার বলা যায় না, আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বছরও বেঁচে যেতে পারি। আমাদের অনেকটা ইচ্ছামৃত্যু। আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবার দরকার নেই !

— আর না, আর না, চুপ কর, বড্ড বেশি বকছিস।

— না শোন, ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, সেজন্য এখনকার ভালবাসাটা নষ্ট করিস না। এখনকার ভাললাগাটা চেপে রাখলি, তারপর হয়তো ভবিষ্যতেও শান্তি পেলি না, তাতে কি লাভ ? মেয়েটার সঙ্গ তোর পেতে ইচ্ছে হয়, মেয়েটাকে তুই কাছে নিয়ে আয়। এটা বাংলাদেশ, একটা মেয়ের সঙ্গে রোজ সন্ধেবেলা তুই এমনি এমনি দেখা করবি—তা তো সম্ভব নয়। ওকে

বিয়ে করে ফ্যাল।

— ওর কি আমাকে পছন্দ হবে ?

— আরে ইডিয়েট, সেটা তুই আমার এই গোলমুখের সামনে বসে জিজ্ঞেস করছিস কেন ? ওর কাছ থেকেই জেনে নে। বী ক্লিয়ার। পরিষ্কারভাবে এসব জেনে নেয়াই তো ভালো, যদি রাজি না হয়, চুকে গেল। মনে মনে পুষে রেখে লাভ কি ? তুই এরকম ভ্যাদভেদে হয়ে গেলি কী করে ?

— মেয়েটার সঙ্গে যে আমার দেখাই হচ্ছে না। ওর বাড়িতে যেতে আমার কি রকম অস্বস্তি লাগে।

— লাগুক। বাড়িতে না গিয়ে যদি দেখা হবার উপায় আর না থাকে, তবে বাড়িতেই চলে যা। আজই যা, ওঠ।

— আরে, এক্ষুনি নাকি ? বোস।

— নাঃ, চল উঠে পরি। আমার আজ মন ভালো নেই। তোর কথা নিয়ে আমি বেশি ভাবতে পারবো না। তোর সঙ্গে বসে থাকলে এখন তোর ব্যাপারটাই আলোচনা করতে হবে। আর না, আমাকে এখন একটু নিজের কথা ভাবতে হবে।

চায়ের দোকান থেকে বেরুবার মুখেই একটি লম্বা চেহারার যুবকের সঙ্গে সুবিমলের দেখা হলো। রোগা, লম্বা, চোখে সাদা ফ্রেমের চশমা, বেশ একটা শৌখিন চেহারা। সে সুবিমলের কাঁধ চাপড়ে বললো, চলুন, আর একটু চা খাওয়া যাক। সুবিমল বললো, সুনীল, তোর সঙ্গে বোধ হয় এর আলাপ নেই, ইনি হচ্ছেন ভাস্কর চ্যাটার্জি। আমি হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনার নাম শুনেছি। যুবকটির মুখে একটু গর্বের ভাব, অনুচিত ছোট জাতীয় গর্ব। সুবিমল বললো, জানিস তো, ভাস্করবাবু বাংলা কবিতা অনুবাদ করতে অ্যামেরিকা গিয়েছিলেন।

ভাস্কর চ্যাটার্জি বললো, দাঁড়ান সিগারেট কিনে আনি।

একটু দূরে যেতেই আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললুম, সেদিন একটা মেয়ের কথা শুনলাম, সে কথাকলি নাচ শিখতে চেকোশ্লোভাকিয়া যাচ্ছে ! আজকাল এই হয়েছে একটা ঘোড়ার ডিমের কায়দা ! —সুবিমল আমার হাত টিপে বললো, চুপ শুনতে পাবে। চল আবার চা খাই। ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে দ্যাখ, খুব খারাপ লাগবে না। তাছাড়া এসব লোকের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো ! আমি বললুম, ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে তুই কার কথা ভাববি ? ওর কথা ?

— দেখা যাক।

—আমার ভালো লাগছে না। আমি চলি রে।

ভাস্কর চ্যাটার্জির হাতে সুবিমলকে সঁপে দিয়ে আমি চলে এলাম। সুবিমলের নিজের কথা ভাবার সত্যিই সময় নেই।

১০

বারান্দায় একটা টেনিসের বোর্ড আছে আগের দিন লক্ষ করি নি। বাড়িতে যমুনা স্কার্ট পরে। একটা হালকা নীল রঙা স্কার্ট পরে ব্যাট হাতে যমুনা হরিণীর মত চঞ্চলা। হরিণীর মতন, না, হাওয়ায় গাছের ডালের মতন, না, ইঁদুরের মতন ? আসলে ওর সতর্কতা ও চঞ্চলতার সঙ্গে বাচ্চা

ইঁদুরের ছটফটানিই মেলে, কিন্তু ইঁদুরের সঙ্গে বোধ হয় কোনো রূপসী মেয়ের তুলনা দেওয়া যায় না, না? যমুনার সঙ্গে খেলছে একটি কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন চেহারা, সাদা ধপধপে প্যান্ট ও সার্ট সমেত। আমাকে দেখে যমুনা খেলা থামালো না, কিছুটা অবাক হয়েও উজ্জ্বল গলায় বললো, আসুন, সুনীলদা, একটু দাঁড়ান, তপনদা আমাকে পরপর দুটো গেম দিয়েছে—এবার আমি, পয়েন্ট, পয়েন্ট, আমার পয়েন্ট!

আমি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখলুম। ওদের দু'জনকেই ভারি সুন্দর ও সাবলীল দেখাচ্ছে। নিজেকে আমার খুব বয়স্ক ও ভারি মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, মা কোথায়?

— মায়ের তো অসুখ। দাঁড়ান, দিদি আছে—দিদি—

ডাকার আগেই সরস্বতী এসে হাজির। ভাগ্যিস সরস্বতীও স্কার্ট পরে না।

কি একটা ক্রিম মুখে মাখছিল ঘষে ঘষে, প্রকাশ্য হাসিতে বললো, এলেন তা হলে সত্যি? জানতুম—

আমার কি রকম ভয়-ভয় করতে লাগলো। কেন যে এত দুর্বল হয়ে পড়ছি বুঝতেই পারছি না। ব্যাপারটা কি? আমি ক্ষীণভাবে বললুম, কাকীমার অসুখ শুনলাম—

—অসুখ শুনেই বুঝি দেখতে এসেছেন?

—ঠিক তা নয়, চলো একটু দেখা করে আসি।

—মা তো এখন ঘুমোচ্ছেন। পরে দেখা করবেন, চলুন, আমার ঘরে চলুন।

—ওদের খেলাটা দেখে যাই, এই গেমটায় কী হয়।

—তোর কত পয়েন্ট রে মুন্নি? এবারেও তপনের কাছে নির্ঘাত গেম খাবি। চলুন, আমরা ওপরে যাই।

সরস্বতী এসে আমার হাত ধরলো। আমি যমুনার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। যমুনা ও তপন পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর তপন তাকালো সরস্বতীর দিকে, যমুনা আমাকে দেখলো। যমুনার চোখে সামান্য লজ্জার ছায়া। কিসের জন্য লজ্জা? যমুনা মুখ নিচু করেই আবার পরক্ষণে তাকালো, এবারও লজ্জা, একটু হাসলো। ওর শরীর কি এবার লজ্জা পেতে শিখছে আস্তে আস্তে! নীল ব্যাটটার গায় লেগে সাদা বলটা আগুনের ফুলকির মতন ছিটকে উঠেছে, যমুনার ঠোঁট ও নাকের মাঝখানে—যেখানে কোনো কোনো মেয়েরও গোঁফ থাকে—সেখানে সামান্য ঘাম, ঈষৎ ছোটাছুটিতে রঙিন মেয়েলি ছাতার মতন ফুলে উঠছে ওর স্কার্ট, আমি যমুনার উরুর কিয়দংশ দেখতে পাচ্ছি। এতদিন যমুনার শরীরের দিকে একটুও লোভ করি নি, এখন হঠাৎ ইচ্ছে হলো, খেলা থামিয়ে যমুনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি। ইচ্ছে হলো, বিনা লোভে খুবই শান্তভাবে আস্তে আস্তে ওর ঠোঁটে চুমু খাই, খুবই আস্তে আস্তে ওর উরুর ওপর দিয়ে আমার ঠোঁট দুটো ঘষে নিয়ে যাই, থার্মোমিটারের খাপ খোলার মতন সন্তর্পণে ওর বুকের জামা সরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি কি সুন্দর যমুনা! ভর্তি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার সময় মানুষ যেমন একাগ্র হয়ে পড়ে, আমি যমুনাকে সেইরকম প্রবল একাগ্রতায়, ইচ্ছে হয় আদর করি। স্লো মোশান ছবির মতন, যমুনাকে বুকে তুলে নিয়ে আলতোভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। একজন পুরুষের পাশে এই প্রথম আমি যমুনাকে দেখলুম, এই প্রথম যমুনার শরীরের জন্য আমার সর্বশরীর উন্মুখ হয়ে উঠলো। কথাটা সজাগভাবে ভেবেই আমার খুব কষ্ট হলো, বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো অকস্মাৎ। যেন আমি এই মুহূর্ত থেকে কিছু একটা হারাতে শুরু করলুম। আমি যে এত অসহায়—সেকথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে? আমি খুবই কাতরভাবে মনে মনে বললুম, সরস্বতী, আমায় আজ ছেড়ে দাও না! আমাকে তুমি দয়া করো, আমাকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দাও যমুনাকে—আমি এর চেয়ে

বেশি কিছু চাই না।

সরস্বতী আমার হাত ধরে সামান্য টান দিল। বারান্দার কোণে এসে প্রায় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, এখানে ওরা একটু প্রেম-ট্রেম করবে, কি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন ? আমার ঘরে আসুন !

আমি যমুনার দিকে আবার তাকালুম। যমুনা এদিকে চোখ ফেরালো না। যমুনা একবার সাদা বল ও একবার তপনের মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। হঠাৎ আমার মনে হলো, চিঠি ছাড়া যমুনাকে তপন বোধহয় আরও কিছু দিয়েছে। আমার সঙ্গে মাত্র ক'দিন ওর দেখা হয় নি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, তুমি কতক্ষণ খেলবে ?

যমুনা অতি ব্যস্ততার মধ্যে বললো, দাঁড়ান, আমি ওর গেমটা শোধ দি। আপনি দিদির সঙ্গে ...

সরস্বতী আবার আমার হাতে টান দিল।

সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠেই আড়াইতলায় ছোট ঘরটা সরস্বতীর নিজস্ব। ঘরের সিলিং এত নিচু যে আমার প্রায় মাথা ছুঁয়ে যায়, এসব ঘরে পাখা টানানো বিপজ্জনক, তাই কোণে টেবিল ফ্যান। ঘরের মধ্যেই বেসিন আর জলের কল, দেয়াল আয়না। সরস্বতী বললো, এ ঘরটা আগে দাদা ব্যবহার করতো, এখন আমার, সুন্দর না ?

সরস্বতী মুখে তখনও ক্রিম মাখা হাতটা ঘষছে। বাড়িটা বড় নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু পিংপং খেলার টক্ টক্ শব্দ। কিন্তু সে শব্দও পেন্ডুলামের আওয়াজের মতন মনোযোগের আড়ালে চলে যায়। ক্রিম মাখা শেষ করে একটা ফর্সা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো, এত জোরে যেন মুখের চামড়া উঠে যাবে। তারপর বেসিনে গিয়ে সাবানে মুখ ধুলো সরস্বতী। অন্য তোয়ালে দিয়ে আবার মুখ মুছতে মুছতে বললো, আপনি আজ ভাগ্যিস এলেন। আজ সারাটা দিন আমার এত খারাপ লাগছিল, দিনরাত বাড়ির মধ্যে আটকে থেকে থেকে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন, তুমি বাড়ি থেকে বেশি বেরোও না কেন ?

—বাবার কড়া হুকুম, আমার বেরুনো চলবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেন ?

কিছুটা কৌতুকময় ভ্রূভঙ্গি করে ও বললো, আমি যে বাড়ি থেকে বেরুলেই যার-তার সঙ্গে মিশে একটা না একটা গণ্ডগোল করি !

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এখন চুল আঁচড়াচ্ছে সরস্বতী। ওর সব কিছুই জোরে জোরে, এত জোরে চিরুনি চালাচ্ছে যে যেন চুলগুলো ও উপড়ে আনতে চায়। হাত দুটো উঁচু করার সময় আমি ওর দু'জোড়া স্তন দেখতে পাই—এক জোড়া স্বচক্ষে ও এক জোড়া আয়নার নারীর। আমার দিকে পাশ ফিরে আয়নায় তাকিয়েই সরস্বতী কথা বলছিল। আমি নিশ্চিত অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করলুম, কি গণ্ডগোল ? আয়নার দিকে চেয়েই সরলভাবে হেসে ও বললো, আহা, কিছু বোঝেন না, না ? আমি আপনার সব জানি !

চুল বাঁধা শেষ করে, সরস্বতী মুখে আবার কি একটা ক্রিম মাখছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কি বলো তো ? একবার ক্রিম মেখে সাবান দিয়ে ধুলে, আবার ক্রিম মাখছো। সরস্বতী বললো, কিচ্ছু জানেন না, এটা ক্রিম নয়, এটা ফাউন্ডেশন। এরপর পাউডার।—সত্যিই দেরাজ থেকে বার করে গোলাপি রঙের পাউডার মুখে বুলোতে লাগলো, তারপর ঘাড়ে ও গলায়, কানের লতির পিছনে, বুকে অনেকটা ব্লাউজের মধ্যে পাউডারের পাফ ঢুকিয়ে দিল আমার দিকে পিছন ফিরে—কিন্তু আমি যে আয়নায় ওকে দেখছি, ও সেকথা জানে। আবার একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ ও গলার সেই পাউডার মুছতে লাগলো। যেন ও আমাকে পরপর খেলা দেখাচ্ছে, যেন

আমি একাই বহু দর্শক, অথবা আমি একটা ক্যামেরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, তুমি এখন বেরুবে নাকি, এত সাজগোজ ! সরস্বতী তখন ঠোঁট উল্টে ন্যাচারাল কালার লিপস্টিক ঘষছে, সেইভাবেই বললো, উঁহু ! তারপর লিপস্টিক রেখে ওডি-কোলনের শিশি হাতে নিয়ে ফের বললো, কেন, বাড়িতে থাকলে বুঝি সাজ করা যায় না ? সাজতে ইচ্ছে করে মন ভালো করার জন্য !

আয়নার মধ্যে তাকিয়ে মনে হলো, আমি অনেক দূরে বসে আছি। আমি যেন সরস্বতীকে অনেক দূর থেকে দেখছি। একথা নিশ্চিত; আমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। খানিকটা লোভ হতেও পারে। কিন্তু লোভ আর ভাললাগা তো এক নয় ! আমি পা দুটো কোনাকুনি করে এমন জোরে চাপ দিলুম যে—বাঁ পাটা ব্যথায় টন্‌টন করতে লাগলো ! একটা সিগারেট জ্বেলে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা অনেকক্ষণ ধরে রইলুম, আগুন এসে আঙুলে ছ্যাঁকা দিতে লাগলো, তবু ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

প্রসাধন শেষ করে শরীরময় সুগন্ধ মেখে সরস্বতী আমার খুব কাছাকাছি এসে বসলো খাটের ওপর। খাটের স্প্রিংয়ে ঝপ করে শব্দ হলো। মুখ তুলে সরস্বতী বললো, এবার বলুন !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বলবো ?

—বাঃ, আমার ঘরে এলেন, এতক্ষণ বসলেন, কিছু কথা বলবেন না ? 'আমার ঘরে' কথাটা কানে খট করে লাগলো। খুব চেনা। 'বসলেন' শব্দটাও চেনা। শুধু 'কথা' শব্দটা কেমন যেন অপরিচিত। আমার কাছে ও কথা শুনতে চায় ? আমি দুর্বলভাবে হেসে জিজ্ঞেস করলুম, কি কথা বলবো বলো তো ?

—একটা কিছু অন্তত বলুন !

—একটা কিছু ভালো কথা তা হলে ভাবতে হয় তো। তোমাকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে

—একথাটা তো বলা যায় না, না ? এ তো পুরোনো হয়ে গেছে। অনেকের কাছ থেকেই নিশ্চয়ই শুনেছো।

—অনেক পুরোনো কথাও মাঝে মাঝে শুনতে মন্দ লাগে না। ধ্যাৎ ! আপনি একটা কিচ্ছু না ! আপনি হাত দেখতে জানেন ? তা হলে আমার হাতটাই দেখুন।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এ জিনিসটা একেবারেই পুরোনো। আজকাল আর চলে না। শোনো সরস্বতী, কাকীমার কী হয়েছে ? কঠিন অসুখ ?

—এমন কিছু না, মা'র মাঝে মাঝে হাঁপানির টান ওঠে। ক'দিন বৃষ্টি পড়েছে তো।

—চেহারা দেখলে তো বোঝা যায় না, ওঁর হাঁপানি আছে ?

—চেহারা দেখলে কি সব কিছু বোঝা যায় ? আপনার চেহারা দেখলে কি বোঝা যায়, আপনি একটা মিটমিটে বদমাশ ?

আমি সত্যিকারের অবাক হয়ে সরস্বতীর দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার বলো তো ? আমার সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা হলো কেন ? আমি কি বদমাইশি করেছি ?

—থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। সব জানি। পুরুষ মানুষের ন্যাকামি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। দিন, আমাকে একটা সিগারেট দিন।

—না, মেয়েদের সিগারেট খাওয়া আমি পছন্দ করি না—

সরস্বতী জোরে হেসে উঠলো। ওর হাসিটা হি-হি ধরনের। আমি আগে তেমন শুনি নি। সবারই হাসির আওয়াজ হা-হা বা হো-হো বা খুঁ-খুঁ, সরস্বতীরটা পরিষ্কার হি-হি, কাঠঠোকরা পাখির মতন কর্কশ কিন্তু তেজি। সরস্বতী আমার শরীরের এত কাছে যে আমি ওর উত্তাপ টের পাচ্ছি। সারা বাড়িটা বড় বেশি চুপ, রাস্তা থেকেও কোনো শব্দ আসছে না, এমন কি পিংপং খেলার

শব্দও থেমে গেছে। যমুনা কি এ ঘরে আসবে না ? আমার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে যমুনাকে ডাকি। প্রচণ্ড চিৎকার, ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষক যেমন তার হারানো গাভীকে ডাকে। জানি যদি এখন আমি উঠে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করি, সরস্বতী বাঘিনীর মতন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমার টুটি ছিঁড়ে রক্ত খাবে। ওর মসৃণ মুখ ও সকৌতুক চোখের আড়ালে আমি সেই বাঘিনীর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি। আত্মরক্ষার জন্যই আমি সরস্বতীর অলঙ্কারহীন একটি হাত তুলে নিয়ে বললুম, আমি হাত দেখতে জানি না, কিন্তু হাত ধরতে আমার ভালো লাগে।

—তারপর অতর্কিতে দুম্ করে জিজ্ঞেস করলুম, সরস্বতী, তুমি কারুকে ভালবেসেছো ?

নিস্পৃহের মতন সরস্বতী বললো, নাঃ ! সে-রকম মানুষ পেলাম কোথায় ?

—কেন, এই যে বললে, তোমার সঙ্গে অনেক ছেলে-টেলের ভাব ছিল ?

—তারা কেউ ভালবাসতে জানে না। !

—তারা না জানুক, তুমি নিজে থেকেও তো কারুকে ভালবাসতে পারতে। একদিক থেকেও তো ভালোবাসা হয়। সেইটাই আসল ভালোবাসা।

—আমার মনে হয় নিজে কারুকে ভালবাসতে পারবো না। আমায় যদি কেউ সত্যি-সত্যি ভালবাসে তবে আমিও না হয় চেষ্টা করে দেখতুম। কিন্তু সে রকম কারুকে পেলাম না। ফলে, ভালবাসার ব্যাপারটা এখনো বুঝতেই পারি নি। ছেলেরা আমাকে ভালবাসার আগেই—

আমি প্রায় ফিস্‌ফিস্ করার মতন বললুম, শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?

সরস্বতী বুঝতে পারলো না, সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, এর মানে কি ? আমি বললাম, কিছু না, একটা কোটেশান।

আলস্য ভাঙার ভঙ্গিতে সরস্বতী বিছানায় অর্ধেক হেলান দিল। ওর গ্রীবার নিচে একটা ছোট্ট কাটা দাগ এখন চোখে পড়ে, সূর্যমুখী ফুলের মতন ছড়িয়ে পড়ে দুই বুক, ব্লাউজ ও শাড়ির মাঝখানে ফর্সা পেট উন্মুক্ত, সদ্য টিন কাটা মাখনের মতন উজ্জ্বল, প্রায় নাভি দেখা যায় আর কি। এ মেয়েটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে দেখছি। ওর জন্য আমার মায়াই হলো। ইস্ আর দু'মাস আগেও যদি ও এরকমভাবে আমাকে ডাকতো তবে কি ওর নিষ্কৃতি ছিল ! খুব বাঁচা বেঁচে গেছে সরস্বতী। এখন আর আমাকে ওর ভয় নেই, ওকেই আমার ভয় । বুকের মধ্যে এখন সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছে, সরস্বতী তা বুঝবে না। আমার হাতে আলতোভাবে তখনও সরস্বতীর হাত, সেই হাতে সামান্য চাপ দিয়ে আমি বললুম, সরস্বতী, আমায় ক্ষমা করো। সরস্বতী ধড়ফড় করে উঠে বসে অবাক হয়ে বললো, ওকি, আপনি কি করেছেন যে, ক্ষমা চাইছেন ?

আমি বললুম, সত্যি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

—কি পাগলের মতন কথা বলছেন ? আপনি ক্ষমা চাইবার মতন কি করেছেন ?

আমি কান্না লুকোবার মতন গাঢ় স্বরে বললুম, সরস্বতী, যদি তোমার কাছে কোনো দোষ না করেও থাকি, তবু অন্য যেখানে যত অন্যায় বা দোষ বা পাপ করেছি, তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করবে ?

—আপনার মাথায় কি আছে ? পাগল নাকি আপনি ? ক্ষমার কথা উঠলো কিসে ?

—আমি যে রকমই হই, তুমি আমায় ক্ষমা করবে কথা দাও ?

সরস্বতী এবার কোমল গলায় বললো, কি সব অদ্ভুত কথা ! আচ্ছা সব ক্ষমা করলুম।

—তা হলে আমি এবার যাই !

—কোথায় যাবেন, বসুন না !

—না, এবার যাই, লক্ষ্মীসোনা।

—ধ্যাৎ ! বসুন না।

সরস্বতী আমার হাত হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিল, তারপর আমার চুলের মধ্যে হাত দিয়ে বললো, ছেলেমানুষ একটা।

—আমি আন্তরিক অনুনয়ে বললুম, সরস্বতী, এবার সত্যিই আমাকে যেতে হবে !

—যাবেন তো যান না। আমি কি আপনাকে জোর করে ধরে রেখেছি ?

—তা হলে যাই ?

—আপনি মুন্নির সঙ্গে কিছু করেন নি তো ?

আমি প্রবলভাবে চমকে উঠে বললুম, কী বলছো যা-তা !

সরস্বতী সে কথায় কান না দিয়ে বললো, ওর সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল করতে যাবেন না, ওর কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, তাছাড়া, তপনের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

—কী বলছো কি ? এ তোমার অন্যায়, ছি-ছি !

—আহা রাগ করছেন কেন ! এমনি বললুম। মুন্নিটা দেখতে দেখতে আমার কমপিটিটার হয়ে উঠলো।

—যমুনাকে আমার খুব ভালো লাগে।

—ঐ পর্যন্তই থাক্। আর বেশি না।

—আমাকে এবার যেতেই হবে, উপায় নেই।

—একটু বসুন না। কী এমন রাজকার্যে যাবেন ! একা থাকতে আমার ভালো লাগে না। একটু গল্প করি।

আমি বললাম, যমুনাকে একবার ডাকো না। ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

সরস্বতী স্থিরভাবে আমার দিকে তাকালো। —ও এখন তপনের সঙ্গে আছে, ওকে ডাকলে তপন কী মনে করবে ?

—তপনকেও ডাকো। আমরা সবাই মিলে গল্প করি।

আমার এ কথার কোনো যুক্তি না দেখিয়েই ও বললো, না। আমার সঙ্গে কথা বলতে বুঝি আপনার ভালো লাগে না ?

—কিন্তু তোমার সঙ্গে তো কথা বলার আরও অন্য অনেকে আছে।

—না, আমার কেউ নেই।

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সরস্বতী আমার উরুতে প্যান্টের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলো। তারপর আমার একটা হাত তুলে নিয়ে বললো, বেশ শক্ত হাত ! হঠাৎ আমার একটা আঙুল ওর মুখে পুরে কুট করে কামড়ে দিল। আমি অনড় হয়ে লক্ষ করছি। সরস্বতী বললো, কী চুপ করে রইলেন যে ? ছেলেমানুষ, যে-ক'জনকে দেখলুম, সবাই ছেলেমানুষ।

সরস্বতী আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। আমি তৎক্ষণাৎ দু'হাতে ওর মাথাটা তুলে ধরে বললুম, এই, কি অসভ্যতা করছো ?—অবাক হয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো ?—আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, না, ওসব নয়, আমি চলি—

সেইরকম অবাক ভঙ্গি রেখে ও বললো, এর মধ্যে অসভ্যতার কি হলো ?

সারাদিন আমার মনটা কিরকম ভিজে নরম ছিল। এবার ধুৎ তেরিকা ভাবটা ফিরে এলো। আমি রুক্ষ গলায় বললুম, ওসব আমি ঢের জানি। আমার দ্বারা হবে না, আমি চললুম।

—আপনি একটা ইতর।

—না হয় হলুমই ইতর, কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা করবে বলেছিলে।

—আপনার মনটাই নোংরা, তাই সব জিনিসকে আপনি খারাপ দেখেন।

—আমি যা-ই হই, তুমি আমায় ক্ষমা করবে বলেছিলে।

—আপনি একটা ছোটলোক !

আমি সরস্বতীর দিকে খর চোখে তাকিয়ে ছিলাম। একবার আমার শরীরটা দুলে উঠেছিল, দু'এক মুহূর্ত আমার মাথার মধ্যে ওলটপালোট হয়ে গিয়েছিল, আমি সামান্য নিচু হয়েছিলাম ঝুঁকে পড়ার জন্য, ভেবেছিলাম, ঝুঁকে সরস্বতীকে দু'হাতে ধরে তুলে এনে বুকের মধ্যে পিষে ধরি, দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ে ধরে বলি, শরীর, তুমি কতটা শরীরের খেলা খেলতে পারো, এসো দেখাচ্ছি। কিন্তু, দু'এক মুহূর্ত মাত্র। ঝুঁকে পড়েও আমি সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ গলায় বললুম,—আমার ছোটলোক থাকাই ভালো। ভদ্দরলোক হয়ে আমার দরকার নেই।

ঝট করে দরজা খুলে আমি বেরিয়ে এলুম, সরস্বতীও পিছন পিছন এলো। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেছি এমন সময় বাইরে থেকে জগদীশ রায় ঢুকলেন। রেন্ কোট গায়, মুখ গম্ভীর। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখলেন, গ্রাহ্য করলেন না, ভারি গলায় প্রশ্ন করলেন, সতী, ডাক্তার এসেছিল ?

সরস্বতী আমার পিছন থেকে উত্তর দিলো, হ্যাঁ ! মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন।

—দেখি প্রেসক্রিপশনটা।

বারান্দায় যমুনারা নেই। টেবিলের দু'পাশে দুটো ব্যাট, হালকা সাদা বলটা হাওয়ায় একটু একটু গড়াচ্ছে। আমি অবসন্ন শরীরে বেরিয়ে এলাম। হাত দুটো বারবার মুঠো করতে আর খুলতে ইচ্ছে হয়।

১১

—কী, পাগল হয়ে গেছে ?

কেউ আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। দেখলে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড, নূরজাহান বেগমের পরনে নীল চুমকি বসানো শাড়ি, কিন্তু ব্লাউজ নেই, শুধু ব্রেসিয়ার, সমস্ত চুল এলোমেলো, চোখের জল আর সুরমায় মুখ মাখামাখি, দেয়ালে মাথা ঠুকছে আর বুক নিঙড়ানো গলায় কাঁদছে, চিনতে পারলো না, চিনতে পারলো না !

শেখর আর অবিনাশ খাটের ওপর নীরব হয়ে আছে পা ঝুলিয়ে, খাটের মাঝখানে চিন্তামণিবাবু, আবদুল হালিম সান্ত্বনার হাত এগিয়ে নিবিড়ভাবে বলছে, সাধনা, শোনো, শোনো—। তাকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে নূরজাহান। এবার চোখ পড়লো খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা দশ-এগারো বছরের বাচ্চা ছেলে, ফ্যাকাশে মুখ।

দেয়ালে এতো জোরে কপাল ঠুকছে নূরজাহান যে দুমদুম করে শব্দ, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বললো, জিতু, চিনতে পারলি না ! ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না। নূরজাহান তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করলো, জিতু—। ঐতিহাসিক নাটকের করুণ ভূমিকায় অভিনয়ের সময় নূরজহান নিশ্চয়ই এইরকম কণ্ঠস্বর বার করে, আতিশয্যময় কিন্তু আন্তরিক ও মর্মভেদী। ঘরের হাওয়ায় অনেকক্ষণ ধরে ওর করুণ চিৎকার ভাসতে লাগলো।

চিন্তামণিবাবু অপ্রসন্নভাবে বললেন, আস্তে—। একটা সম্ভব অসম্ভব আছে তো। কি করে চিনতে পারবে—আট ন'বছর বাদে দেখছে, তখন ওর বয়েস দু'বছর না তিন বছর ছিল।

—আমি তো চিনতে পেরেছি, আমি—

— সে কথা আলাদা। এখানে ওই ছেলেটাকে আনা মোটেই উচিত হয় নি, এই পরিবেশের

মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলেকে আনা—

— আপনি চুপ করুন ! জিতু—চিনতে পারলি না, আঃ বড্ড কষ্ট হচ্ছে, আঃ, জিতু, কেন আমি মরে যাই নি !

— ও কি, ছেলেটাকে অত জোরে চেপে চেপে ধরছো কেন ? দম আটকে যাবে যে।

—আপনি চুপ করুন ! ঐ লোকটাকে তোমরা চুপ করতে বলো না। ! আঃ বড্ড কষ্ট হচ্ছে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার।

আবদুল হালিম বললো, সাধনা, সেই ওষুধটা খেয়ে নাও একবার।—চিন্তামণিবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওষুধে আর কি হবে ? নূরজাহান চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ, এতো কথা কেন, চুপ করুন না, ওঃ, কেন মরে যাই নি—

চিন্তামণিবাবু রেগে উঠে বললেন, এটা আমার ঘর, এখানে আমি ওসব সহ্য করবো না। বীণা, বীণা—

বীণা বাইরে থেকে এসে চুপ করে দাঁড়ালো। বীণাও আড়ালে কাঁদছিল। চিন্তামণিবাবু বললেন, বীণা, এখান থেকে এসব বিদায় করে দাও। আমার এসব পছন্দ হয় না ! কাল এসে এদের কারুকেই দেখতে চাই না আমি।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা ভদ্দরলোকের ছেলে, আপনাদেরও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়া উচিত হয় নি। এখানে একটু আনন্দ-ফূর্তি করতে আসা, তা না, এখানেও ঝঞ্ঝাট আর কান্নাকাটি। কাল এসে এসব কিছু দেখতে চাই না !

নূরজাহান হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আঃ, এত কথা কেন ? ওকে চুপ করতে বলো না ! আঃ—

—তুই চুপ কর মাগী !

কান্না থামিয়ে নূরজাহান এবার ঘাড় উঁচু করে তাকালো। অবিকল রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গি। শান্ত-গম্ভীর গলায় বললো, এই ঘরটার জন্য আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে ? আমি এক্ষুনি সব দিয়ে দিচ্ছি। আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে। আব্দুল, টাকা দিয়ে দাও তো লোকটাকে!

চিন্তামণিবাবুর মুখখানা অপমানে বেগুনি হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কি, আমাকে টাকার গরম দেখাচ্ছে ! আমাকে ! আপনারা সবাই সহ্য করছেন। আপনারা কিছু বলছেন না?

আমরা কেউ-ই চিন্তামণিবাবুর কথার কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলুম না। পানের ডিবেটা ফটাস করে বন্ধ করে পকেটে ভরে চিন্তামণিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর, আর একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আবদুল হালিমের মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। বীণার মুখে ভয়। বাচ্চা ছেলেটার মুখে ভয়। একমাত্র অবিনাশ নিরেট মুখে বসে আছে। নূরজাহান সমানভাবে দাপাদাপি করতে লাগলো, পাগল হয়ে যাবার চিহ্ন পুরো ফুটে উঠছে। ব্রেসিয়ার পরা তীক্ষ্ণবুক দুলে দুলে উঠছে প্রতিটি নিঃশ্বাসে, যেন দম টানতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। চোখ দুটি সম্পূর্ণ বিস্ফারিত ও লাল, হাত যখন ছড়াচ্ছে হাত ভর্তি জড়োয়ার গয়নার ঝুমঝুম শব্দ। আবদুল হালিম দু'হাতে ধরে আছে ওকে, নূরজাহান ব্যাকুলভাবে ছটফট করতে লাগলো, বারবার হাত ছাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে ছেলেটাকে, ছেলেটা মুখ-চোখ শুকনো করে তাকাচ্ছে ঘরের সবার মুখের দিকে সাহায্যের আশায়। অসম্ভব জোরে ছেলেটাকে চেপে ধরে তার মুখখানা উঁচু করার এমন প্রবল চেষ্টা করছে নূরজাহান যে, আবদুল হালিমই ছেলেটাকে ছাড়িয়ে দিল। দু' হাতে হাওয়া আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে নূরজাহান ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ার সময় ওর মাথাটা এমনভাবে ঠুকে গেল মেঝেতে যে, আমি শিউরে উঠলুম। বীণা আর শেখর গিয়ে তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিল, আবদুল হালিম

উদ্‌ভ্রান্তের মতন বললো, কেটে গেছে নাকি ? রক্ত বেরিয়েছে !

শেখর ওকে বললো, না, ঠিক আছে ? এখন কি করবেন ! কোনো ওষুধ।

—এখন তো ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। দাঁতে দাঁত চাপা।

—কি করা হবে তা হলে এখন ?

—চোখে মুখে একটু পানি ছিটিয়ে দিলে, একটু পরেই ভালো হয়ে যাবে।

বাচ্চা ছেলেটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা পাতলা ছেলেটা, মুখখানা সুন্দর, মাতৃস্নেহহীন ছেলেরা সাধারণত অল্প বয়সেই বখে যায়, কিন্তু ওর মুখে সে ছাপ নেই। আমি অবিনাশের সঙ্গে চোখাচোখি করলুম। তারপর ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, ছেলেটা এখানে কি করে এলো ?—অবিনাশ নির্লিপ্তভাবে বললো, চুরি করে আনা হয়েছে।

—আমি আঁতকে উঠে বললুম, চুরি ?

অবিনাশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, তা ছাড়া আর তো উপায় ছিল না। অজয়টা একটা স্কাউন্‌ড্রেল, নূরজাহানের কাছ থেকে খালি টাকা খিঁচতে চায়। কিন্তু ছেলেটাকে দিতে চায় না, ছেলেটির জন্য না-কি ওর নিজের খুব মায়া। সে লোকটার যা চেহারা, দেখলে তো মনে হয় না দয়া মায়া বলে শরীরে কোনো পদার্থ আছে। এদিকে নূরজাহানের তো এই অবস্থা, প্রত্যেক দিন চারবার-পাঁচবার করে ফিট হচ্ছে, কেঁদে-ককিয়ে একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটাকে কে আনলো ? অবিনাশ বললো, আমিই।—তারপর একটু থেমে আবার বললো, এখন মনে হচ্ছে, ওকে আমার আনা উচিত হয় নি। ওর জন্য আমার মায়া হচ্ছে। ছেলেটার মুখখানা দেখ, কী রকম অসহায়ের মতো। অবিনাশের মুখে আমি কখনো কোনো ভুল স্বীকার শুনি নি। অবাক হবার মতই কথা।

আমি মুখ ফিরিয়ে আলতো করে ছেলেটার কাঁধে হাত দিলুম। ছেলেটা ভয়ে চমকে উঠলো। আমি বললুম, খোকা, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, শোনো, এদিকে এসো, খাটের ওপর উঠে বসো। তোমার নাম কি?

ছেলেটা শুকনো গলায় বললো, শ্রীইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, বাবার নাম শ্রীঅজয় সেনগুপ্ত।

—তুমি কোন ক্লাশে পড়ো ?

—ক্লাশ সেভেন।

—তোমার মাকে তুমি চিনতে পারছো না ?

—এ আমার মা নয়। মা বাড়িতে আছে।

—বাড়িতে সে তোমার সৎ মা। আচ্ছা, আচ্ছা, না, সৎমা নয়, সেও তোমার মা। তোমার সেই মা তোমাকে ভালবাসে ?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাবা তোমাকে ভালবাসে ?

—হ্যাঁ।

— আচ্ছা, এই যে এ বলছে এ তোমার মা, একে তোমার ভালো লাগছে না ?

—না। আমি বাড়ি যাবো।

—হ্যাঁ, বাড়িতে তো যাবেই, ভয় নেই। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি তো বেশ বড়ো হয়েছো, ভেবে দ্যাখো। তোমার বাড়িতে তো তোমার একজন মা আছেন, আর এই যে এ, এও তোমার আরেকজন মা। অনেকদিন দেখো নি তো, তাই চিনতে পারছো না। তোমার এই মা ঢাকা শহরে থাকে, অনেক দূরে, সেখানে মস্তো বড় বাড়ি, অনেক খাবার-দাবার, সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পাবে, সেখানে গেলে এই মা তোমাকে যত্ন করে রাখবে খুব, তুমি সেখানে

যাবে ?

—না, আমি বাড়ি যাবো।

—বাড়িতে আমরা তোমাকে রেখে আসবো। আমাদের কি তুমি ভয় পাচ্ছো ? কিচ্ছু ভয় নেই। এই মায়ের কাছে তোমার থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না ? দেখো, তোমার জন্য ওর কত কষ্ট !

ছেলেটা চুপ করে রইলো। আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, কি করবে ? ঐ যে অজ্ঞান হয়ে গেছে, ওকে তোমার একটুও মনে পড়ে না ?

ছেলেটা কান্নার উপকণ্ঠে বললো, আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসুন না !

আমি বললুম, যাবে, এক্ষুনি যাবে। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ?

—না।

আমি মুখ ফিরিয়ে ছেলেটা যাতে বুঝতে না পারে, এই জন্য ইংরেজিতে অবিনাশকে বললুম, মুশকিল কি জানিস, নূরজাহানের মুখের মধ্যে কোনো মায়ের ছাপ নেই, সেই জন্যই ওকে চেনা যাচ্ছে না। তাকিয়ে দ্যাখ, ওকে কেউ মা বলে ভাবতে পারে ? মনে হয় না, ঐ দেহটা শুধু পুরুষেরই জন্য, কোনো শিশুর জন্য নয় !

অবিনাশ বললো, কিন্তু ছেলের জন্য ওর এতো ব্যাকুলতা, সেটা খাঁটি। এতো কান্নাকাটি আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

—ওর ব্যাকুলতা যাই থাক, ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে। ছেলেটার পক্ষে ওকে মা বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, সৎমা সম্বন্ধে আমাদের যা–ই ধারণা থাক, আমার মনে হয়, ওর সৎমা ওকে ভালবাসে। ছেলেটার মুখ দেখলে বোঝা যায়, ও একেবারে স্নেহবঞ্চিত নয়।

নিচ থেকে শেখর বললো, কয়েকদিন নূরজাহানের সঙ্গে একসঙ্গে থাকলেই ও চিনতে পারবে। মা–কে ঠিক চেনা যায়, কুড়ি–পঁচিশ বছর পরে দেখলেও চেনা যায়।

অবিনাশ ধমকে উঠলো, বাজে বকিস নি। ওসব নভেল–নাটকের কথা, বাজে যত সব ! ছেলেটার মনে যখন মায়ের অভাব নেই, তখন ওর এখানে থাকারও দরকার নেই। তাছাড়া চুরি করে একটা ছেলেকে লুকিয়ে রাখা সোজা নাকি ? ঝঞ্ঝাট !

নূরজাহানের জ্ঞান ফিরে আসছে। বীণা চামচে করে ওষুধটা ঢেলে দিল। বোবার মতন চোখ চেয়ে নূরজাহান ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

আবদুল হালিম আমাদের কাছে এসে বললো, এখন কি করা যায় বলুন তো ?

আবদুল হালিমের জন্য আমার বেশ মায়া হলো। লোকটির মুখ সত্যিকারের অসহায়ের মতন। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বলেই পায়ে জোর নেই। এই নাটকীয় ঘটনায় ওর ভূমিকাটা ঠিক করে নিতে পারছে না। আমার একবার ইচ্ছে হলো বন্ধুর মতো ওর কাঁধে হাত রাখি।

অবিনাশ ভুরু কুঁচকে বললো, ওকে আপনি কলকাতায় আনলেন কেন ? বিষণ্ণভাবে আবদুল হালিম বললো, না এনে উপায় ছিল না। কত অসুবিধে করে আনতে হয়েছে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু না আনলে সাধনা ওখানে মরে যেতো।

—বেশ তো, এখন তো দেখলেন কোনো সুবিধে হচ্ছে না। বরং ছেলেকে চোখের দেখা দেখতে পেল এই যথেষ্ট, এখন ফিরে যাক।

—কিন্তু ও যে ফিরতে চাইছে না। ও বলছে, ছেলেকে না পেলে ও এখানেই থেকে যাবে।

আমি বললুম, না, তা সম্ভব নয়, ওকে ফিরতেই হবে। ওর এখানে আর থাকা চলবে না।

অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, তুই একথা বলছিস কেন ?

আমি বললুম, তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, সাধনার পক্ষে এখানে থাকা মানায় না। ও একবার এখান থেকে পালিয়েছে, আর ওর ফেরা অসম্ভব। ভোগসুখ আর টাকা-পয়সার লোভে একদিন সব ফেলে পালিয়েছিল, তাতো পেয়েছেই—এখন আবার সন্তানের স্নেহটুকুও চাই—এক জীবনে সব পেতে হবে তার কোনো মানে নেই।

আবদুল হালিম হঠাৎ আমাকে বললে, আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, না ? সেদিনও আমার মনে হয়েছিল।

—আমি যে-কোনো মেয়েরই তৃতীয় পক্ষের স্বামীকে ঘৃণা করি, সেটা কোনো কথা নয়, বোম্বের কোনো ভুঁড়িদাস হলেও করতুম, আপনি এখন ওকে নিয়ে চলে যান বরং—

—আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আমি সত্যিই ওকে ভালোবাসি। ও যেতে চাইছে না, ওকে ফেলে আমি একাও যেতে পারবো না। এখন এই অবস্থায় ওকে দেখে আমার আরও... বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি।

অবিনাশ বিরক্তভাবে বললো, ধুত্তুরি নিকুচি করছি ভালবাসার। এখন এই জট ছাড়াবেন কী করে ?

নূরজাহান আস্তে আস্তে বললো, চলে গেছে ? বীণা ও চলে গেছে ? জিতু—আঃ আমি কেন মরে যাই নি ?

শেখরের বুকে ভর দিয়ে নূরজাহান ফোঁপাতে লাগলো। শেখর আস্তে আস্তে বললো, বীণা, ওকে একটু ধরো তো, আমার মাথা ঘুরছে আবার।

আমি ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মী ছেলে, তুমি একবার ওর কাছে যাও তো ! এমনিই, মনে করো তোমার কেউ হয় না। তবু একবার কাছে গিয়ে বসো।

চোখ দিয়ে শেখরকে ইশারা করলুম, নূরজাহানের শাড়িটা ঠিক করে দিতে। বিস্রস্ত, এলোমেলো, ফর্সা উরু পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে, ছেলের পক্ষে এ দৃশ্য দেখার নয়। ছেলেটি ভয়ে বিহ্বলতায় তবু চুপ করে বসে রইলো। অবিনাশ বললো, চলো, আমার সঙ্গে, চলো, একটু পাশে বসবে—।

হাত ধরে ছেলেটিকে খাট থেকে নামাতেই নূরজাহান ওর ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আকুলভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, জিতু, জিতু, উঃ, হ্যাঁরে, উনি, তোর বাবা তোকে মারে না তো ? ওঃ, তুই আমার সঙ্গে যাবি না ? সোনা, সোনা, তোর জন্য আমি কত বড় বাড়ি বানিয়ে রেখেছি, ওঃ, ওঃ, বুকে বড় লাগছে, আর বাঁচবো না বেশিদিন, তুই আমার সঙ্গে থাকবি, কাছে কাছে।

ছেলেটা এতক্ষণ বাদে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর কান্নায় মুহূর্তে সারা ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই সময় আমরা ঘরের সকলেই বোধ হয় একসঙ্গে ভেবেছিলাম, তাহলে কি ছেলেটা ওর মাকে চিনতে পেরেছে ? মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েই শিশু যেমন কাঁদে সেইরকম দ্বিতীয়বার মাকে পেয়ে ছেলেটা কেঁদে উঠলো ? আমাদের সকলেরই বোধ হয় চোখ জলে ভিজে আসছিল।

ছেলেটা অবিনাশকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন, আমি আর এখানে থাকবো না।

অবিনাশ বললো, আর এতো কান্নাকাটি সহ্য হয় না। খোকা তুমি সত্যিই এখানে থাকতে চাও না ?

—না।

—ঠিক আছে, চলো আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি !

হাঁটু গেঁড়ে বসে নূরজাহান ছেলেটার কোমর চেপে ধরে বললো, না, না, না, যাবে না, যাবে না !

অবিনাশ নিচু হয়ে কোমল গলায় বললো, নূরজাহান, তুমি ওকে চোখের দেখা দেখলে এই তো যথেষ্ট। এবার ছেড়ে দাও, ও এখানে থাকবে না—

—না, না, না, না, আমি পারবো না।

অবিনাশ জোর করে নূরজাহানের হাত ছাড়িয়ে বললো, এসো খোকা। শেখর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, না, এখন নিয়ে যাস নি, আর একটু থাক।

অবিনাশ বললো, কি করছিস, আর ওকে এখানে রাখার কোনো মানে হয় না। ঘণ্টা তিনেক হ'ল এনেছি, ছেলেটা একটা কিছু খাবার মুখে দেয় নি, বারবার বলছে, বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো। নূরজাহান ওর মা নয়, বাড়িতেই ওর মা আছে।

—আমি বলছি ও এখানে থাকবে। দেখছিস না নূরজাহানের কি অবস্থা ? অবিনাশ বললো, নূরজাহানের যা অবস্থা তাতে ওর ছেলের দরকার নেই, চিকিৎসার দরকার।

ছেলেটা জোর করে অবিনাশকে ধরে আছে, শেখর ওকে ছাড়িয়ে নিতে গেল। অবিনাশ চোয়াল কঠিন করে বললো, শেখর, যদি পাগলামি করিস, তোকেও আমি মারবো বলছি। আমি ছেলেটাকে এনেছি, আমি ওকে ফেরত দিয়ে আসবো। ছেড়ে দে—

তবু শেখর আর নূরজাহান দু'জনেই ছেলেটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো। প্রবল শক্তিতে ওদের ধাক্কা দিয়ে অবিনাশ বললো, সুনীল, তুই ওদের আটকাতো। আমি দ্রুত এসে শেখর আর নূরজাহানকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আবদুল হালিমের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বললাম, আপনি এর মধ্যে আসবেন না। আবদুল হালিম বিমর্ষভাবে দেয়ালের দিকে সরে যেতে যেতে বললো, না, আমার এতে কিছু করার নেই। নূরজাহান তবু চেঁচিয়ে উঠলো, আবদুল, ওকে ধরো, জিতুকে আমার চাই—

কিছুক্ষণ ঝটাপটি হলো। নূরজাহান ছেলেটার হাত এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে মুচড়ে গেছে হাতটা, আমি এক হ্যাঁচকায় নূরজাহানকে ছাড়িয়ে নিলাম, অবিনাশ ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল। ছেলেটাকে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অবিনাশ। নূরজাহান দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়লো। অবিনাশের ধাক্কা খেয়ে ঘুরে পড়তে গিয়ে খাট ধরে সামলে নিয়েছিল শেখর, দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসে, আবদুল হালিমকে বললাম, সিগারেট আছে আপনার কাছে ? আমার ফুরিয়ে গেছে।

চুপ করে সিগারেটটা টানতে লাগলাম। বীণা গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া নূরজাহানের পাশে গিয়ে বসলো। আবার ফিট হয়েছে বোধ হয়। বীণার মুখে আজ কোনো কথাই নেই প্রায়। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটই হাফ-গেরস্তদের, চেঁচামেচি একটু-আধটু লেগেই আছে—তাই অন্যরা কেউ এসে উঁকি মারে নি।

শেখরকে দেখে মায়া লাগে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, মাথার চুল জট পাকানো গোছের। এই বুঝি শেখরের চেঞ্জে আসা ? মনে মনে ঠিক করলুম, ওকে আজ এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, ওর মাকে কথা দিয়েছিলুম। আমার তো আর কোথাও ফেরা হলো না ! হঠাৎ যমুনার কথা ভেবে অল্প বুক ব্যথা করতে লাগলো। যমুনাদের বাড়ি থেকে আসার পর দু'দিন পর্যন্ত কোথাও আর যাই নি, সন্ধেবেলা চুপ করে বাড়িতে এসে শুয়ে থাকতাম। আমি যা ভাবি, তার প্রত্যেকটাতেই ভুল হয়ে যায়। যমুনাকে পেয়ে আমি বেঁচে উঠেছিলাম, সেই বেঁচে ওঠার মধ্যে কোনো দোষ ছিল কি ? তবু কেন ভুল হলো, যমুনাকে আর আমি কিছুতে পেলাম না !

আরও দু'বার ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম, দু'বারই ফোন ধরেছে সরস্বতী, আমি বিরক্তিতে ফোন নামিয়ে রেখেছি। তখন বুঝতে পেরেছিলাম, যমুনাকে আমি পাবো না, কিন্তু সন্ধেবেলা একা বাড়ি ফিরে ঘরে শুয়ে থাকাও আমার নিয়তি নয়। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আমি বললাম, চল শেখর, আজ বাড়ি চল।

অবিনাশ চলে যাবার পর দশ মিনিটও কাটে নি, সারা বাড়ি জুড়ে ভারি ভারি পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, একতলায় অস্পষ্ট গোলমাল, বীণার ঘরের দরজা ধাক্কাতেও হলো না। দরজা খোলাই ছিল, পুলিশ এসে ঢুকলো।

পুলিশের সঙ্গে যে রোগা লোকটা সে নূরজাহানকে দেখিয়ে উত্তেজিতভাবে বললো, এই তো, এই তো সেই মাগীটা।

নূরজাহান অবাক চোখ মেলে লোকটার দিকে তাকালো। সেই চাহনি দেখলেই বোঝা যায়, লোকটার নাম অজয়।

ঘরের মধ্যে দু'জন ইন্সপেক্টর, রিভলবার টিভলবার সমেত, বাইরেও কয়েকজন পুলিশ। এদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি, সেই ডগলাসি গোঁপ, সরস্বতী একে সান্যালদা বলে ডেকেছিল, একদিন ওর জিপ গাড়িতে আমি উঠেছিলাম। আমি হাসি হাসি মুখে লোকটির দিকে তাকালাম, কিন্তু সে চিনতে পারার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখালো না। কর্কশ গলায় জনসাধারণের উদ্দেশে বললো, ছেলেটা কোথায় ?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। শুধু নূরজাহান পাগলাটে ধরনের খিলখিল হাসি দিয়ে বললো, ছেলে নেই, ছেলে তো নেই ! কোনো ছেলে নেই ? কেউ ছেলে পাবে না !

বীণাও বললো, কার কথা বলছেন ? আমার কোনো ছেলে-টেলে তো নেই ! একজন ইন্সপেক্টর ওকে এক ধমক দিল। সঙ্গের লোকটা বললো, জিতু ? জিতু—বেরিয়ে আয় !

কোনো সাড়া নেই। ইন্সপেক্টর সান্যাল ঝট্ করে আবদুল হালিমের জামার কলার চেপে ধরে বললো, ছেলে কোথায় লুকিয়েছো ? বার করো !

বেপরোয়া ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টরের হাত চেপে ধরে দৃঢ় স্বরে আবদুল হালিম বললো, গায় হাত দেবেন না ! ইচ্ছে হয় থানায় নিয়ে চলুন, সেখানে যা বলার বলবো !

আমি আর শেখর আবদুল হালিমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। শেখর কড়া গলায় বললো, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

রান্নাঘর সমেত বীণার ফ্ল্যাট ও বাড়ির অন্যান্য জায়গাও খুঁজে দেখা হলো। তারপর ইন্সপেক্টর আবার ঘরে ঢুকে জনসাধারণের উদ্দেশে বললো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের সবাইকেই থানায় যেতে হবে।

জাল বসানো কালো ভ্যানে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে আসা হলো জোড়াবাগান থানায়। খুব আস্তে আস্তে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শেখর বীণার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে নামলো গাড়ি থেকে, ওর এখনো মাথা টলটল করছে। আবদুল হালিম নূরজাহানকে ধরে ধরে নামালো। ওর এখন আচ্ছন্নের মতন অবস্থা। প্রথমেই হাজতে না ঢুকিয়ে বড়বাবুর সামনের কাঠের বেঞ্চিতে আমাদের বসতে বলা হলো। বড়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, আপনারা নিজেদের মধ্যে এখন কোনো কথা বলবেন না।

শেখর তবু সরলভাবে প্রশ্ন করলো, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি দয়া করে বলবেন ?

বড়বাবু চোখ তুলে শুধু শেখরের দিকে তাকালেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। আবার ফাইল ও ডাইরিবুকের মধ্যে ডুবে গেলেন। আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। সিগারেট খাওয়াও সমীচীন হবে কিনা বুঝতে না পেরে সিগারেটও ধরালুম না।

বহু লোকজনের আনাগোনা, এমন কি পুলিশদের মধ্যে হাসাহাসিও হতে লাগলো নানা বিষয়ে। একজন হাজতের বিচারাধীন কয়েদী নাকি রোজ সকালবেলা রামধুন গান গেয়ে ঘুম ভাঙায় সবার, এই নিয়ে দু'জন দারোগা খুব হাসতে লাগলো। কথাটা শুনে আমারও হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু দারোগার কথায় আসামীর বোধ হয় হাসা উচিত নয় ভেবে হাসি গিলে ফেলছিলাম। একজন দারোগা আমাদের সম্পর্কেই বললো, স্যার, এদের কি রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে নাকি ! বড়বাবু চকিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। একটা নেমন্তন্ন লাগিয়ে দাও ! তারপর আবার বললেন, এখনো লালবাজার থেকে ডিরেকশন পাই নি !

দু' তিনটে টেলিফোনের দু' তিনরকম আওয়াজ শুনতে শুনতে ঝিমুনি এসে যাচ্ছিল, একটু বাদে আবার গাড়িতে তুলে লালবাজারে আনা হলো আমাদের। গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকেই থেমে গেল। এর আগে আমি দু'তিনটে থানায় গেছি, লালবাজারে কখনো আসি নি। আমার ধারণা ছিল, গেট দিয়ে ঢুকে বোধ হয় বহুদূরে কোথাও গারদখানা। কিন্তু গারদখানার মতো দেখতে নয়, কাছেই একটা বাড়ির একতলার একটি সাধারণ ঘরে আমাদের বসতে দেয়া হলো, ঘরটার দরজায় শুধু লোহার রেলিং দেয়া। তারপর সেখানে বহুক্ষণ বসে রইলাম, যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। সিগারেটও সব শেষ।

প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করেই ছিলাম সবাই। একটু বাদে শেখর বললো, মন্দ লাগছে না কিন্তু। এখন শরীরটাও একটু ভালো লাগছে। এ ঘরটায় বেশ আলো-হাওয়া আছে। হ্যারে সুনীল, জেলটেল হবে নাকি রে আমাদের ?

আমি বললুম, কী জানি !

—জেল হলে চাকরিটা যাবে ! একদিনের জেল হলেও চাকরি যায় শুনেছি। তোর অবশ্য ভয় নেই, তোর তো জামাইবাবুর অফিস !

আমি হাসলুম। তারপর বললুম, যদি জেল কারুর হয়, তা হলে বীণার হবে।

—কেন, বীণার কেন ? ওর কি দোষ ?

—ওর কোনো দোষই নেই। সেই জন্যই তো। একজনের অপরাধে আরেকজন শাস্তি পায়, তাই তো পৃথিবীর নিয়ম।

—কিন্তু দোষটা কি ?

—তা কে জানে !

—ভাগ্যিস অবিনাশ ঠিক সময় ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছিল !

—তা যাই হোক না, বীণার অন্তত কয়েক বছর জেল কেউ আটকাতে পারবে না।

বীণা চেষ্টা করেও হাসতে পারলো না। শেখর আবদুল হালিমের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনাকেই মিছিমিছি এতদূরে চলে এসে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হলো। বেশ তো ছিলেন ঢাকায় !

আবদুল হালিমের চোখ মুখ কোণঠাসা বিড়ালের মতন। তবু চেষ্টা করে হেসে বললো, না, তা কেন, আমার তো ইয়ে, স্ত্রীর ব্যাপার, আমার তো দায়িত্ব আছেই। আপনারাই বরং মিছিমিছি নিজেদের এতে জড়িয়েছেন। এখন কী বিপদ হয় দেখুন !

শেখর উদাসভাবে বললো, আমাদের আর বিপদ কি হবে ? জেলখাটার মধ্যে বিপদের কি আছে ? কি রে সুনীল ?

আমি বললুম, তুই যাই বলিস্, আমার একটু যে ভয় ভয় করছে—সেটা আমি স্বীকার করতে

বাধ্য। একটা মান–সম্মানেরও ব্যাপার আছে তো ! নূরজাহান হঠাৎ গুম মেরে গেছে, আবদুল হালিমের গা ঘেঁষে বসে আছে। একবার আবদুলকে ও ফিসফিস করে কি যেন বললো। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আবদুলও শেখরকে কাছে ডেকে ফিসফিস করলো। শেখর আবার দরজার কাছে পাহারাদারকে ডেকে ফিসফিস করে বললো সেই কথা। পাহারাদার জোরেই উত্তর দিল, এখন চুপ করে থাকতে বলুন। এখানে মেয়েদের বাথরুম নেই !

শুনে আমার মনে হলো, মেয়েদের বাথরুম আর ছেলেদের বাথরুম আলাদা লেখা থাকে বটে, কিন্তু ভেতরটাও কি আলাদা ? কি জানি, আমি কখনো মেয়েদের বাথরুমের ভেতরটা কী রকম হয়, দেখি নি।

আরও খানিকটা পর করিডোরে নালপরানো জুতোর শব্দ হলো। যেন বহুক্ষণ ধরে বহুদূর থেকে একটা লোক হেঁটে আসছে। তারপর একজন জমাদার এসে আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালো। দরজা খুলে বললো, সুনীল গাঙ্গুলী কিস্‌কা নাম ? আইয়ে হামারা সাথ।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। প্রথমেই আমার ডাক ? কেন ? ওরা সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। শেখর জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার রে ? আমি বললুম, গিয়েই দেখা যাক্ ! বেরিয়ে এলাম। লোকটা খপ করে আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে চললো। আমি বললাম, হাত ছাড়ো না, এমনিই যাচ্ছি। লোকটা শুধু একবার তাকালো, কিন্তু হাত ধরেই নিয়ে চললো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একের পর এক ঘর পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে থামলাম। ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে বসে থাকা লোকটিকে দেখে আমার চমকে ওঠা উচিত হয় নি। একথা তো আমার আগেই মনে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি একবারও এ সম্পর্কে ভাবি নি। যমুনার বাবা জগদীশ রায় আমাকে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বোসো।

তারপর আর কোনো কথা নেই। ইনডেক্স লাগানো একটা মোটা ফাইলের পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। টেবিলের পাশে আরেকজন লোক মুখ নিচু করে খসখস করে কি লিখে যাচ্ছে, জমাদারটা তখনো নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়ে। শুধু দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি লাগতে লাগলো। দু'একবার উসখুস করলুম, কারুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। জগদীশ রায় একবার মুখ না তুলেই জমাদারকে বললেন, ফরেনার্স এনট্রি ফাইলটা নিয়ে এসো। জমাদার বেরিয়ে গিয়ে একটু বাদেই ফাইল নিয়ে ফিরে এলো। ফাইলটা সে আস্তে টেবিলের ওপর রাখতেই সেইরকম মুখ না তুলেই তিনি বললেন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারবো কি না, কে জানে। একটা টেলিফোন করে দিলে হতো। একটু নড়েচড়ে বসে সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কাকাবাবু, এখান থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে ? বাড়িতে একটা খবর দেবো।

জগদীশ রায় ঠাণ্ডাভাবে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। কোনো উত্তর নেই। টেবিলের অন্য লোকটিও অবাক হয়ে একবার চেয়ে দেখে আবার লিখে যেতে লাগলো। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর দেয় না, শুধু চোখের দিকে তাকায়—সব পুলিশের লোকেরই এই স্বভাব দেখছি। টেলিফোন করার সাহস হলো না। আবার বসে বসে দেয়াল ঘড়ির টকটক শব্দ শুনতে লাগলুম।

খানিকটা বাদে অন্য লোকটি বললো, হয়ে গেছে, স্যার। জগদীশ রায় তার হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে মনোযোগ দিতে পড়তে লাগলেন। আমি বুঝতে পারলুম, আমাকে অপেক্ষা করিয়ে করিয়ে অসহিষ্ণু আর নার্ভাস করে দেবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এমন কী ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য এতো উদ্‌যোগ–আয়োজন ! এদের এতো গাম্ভীর্য ও পারিপাট্য দেখলে মনে হয় যেন পৃথিবীর অস্তিত্বই এখন ওদের ওপর নির্ভর করছে।

—ঠিক আছে আপনি যান !—জগদীশ রায় সেই লোকটিকে বললেন। লোকটি উঠে, কাগজপত্র গুছিয়ে কলমটা পকেটে ভরে, বেরিয়ে যাবার সময় জগদীশ রায় আবার বললেন, মিঃ সোম, আপনি আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবেন তো !

এবার খালি ঘরে আমরা মুখোমুখি। আমার বুকের মধ্যে একটু গুরগুর করতে লাগলো। যদিও জানি, কোনো অপরাধ করি নি, কিন্তু জগদীশ রায়ের চেহারায় এমন ব্যক্তিত্ব আছে যে, এসব লোককে পথেঘাটে দেখলে কিছুই মনে হয় না—কিন্তু ওদের টেবিলের উল্টো দিকে বসলে ভয় করে।

তখনো কোনো কথা না বলে উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। একটুক্ষণ ঘুরে একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি মুখ তুলে তাকালাম। ওঁর মুখটা থমথমে হয়ে আছে। মেঘ ডাকার মতন ভারি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে তুমি কি করছিলে ?

গলার আওয়াজে সত্যিই খানিকটা ভয় পেয়ে আমি বললাম, আপনাকে আমি সত্যি ঘটনাটা বলছি। গোড়া থেকে...

—তোমার কাছ থেকে আমি কোনো ঘটনা শুনতে চাই না। তুমি ওখানে কি করছিলে ?

—সবটা না বললে কি করে বোঝাবো ? মানে, আমি...

—আমার কথার জবাব দাও ! ঐ নোংরা জায়গায় তুমি গেলে কি করে ? নাকি প্রায়ই যাও?

আমি তবু দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করলুম, না, ব্যাপারটা শুনুন, মানে আমি... । তিনি আবার ধমকে বললেন, এক কথায় উত্তর দাও ! এ জঘন্য জায়গায় তুমি উপস্থিত ছিলে কী করে ?

অনেকদিন কারুর কাছ থেকে ধমক শোনার অভ্যেস নেই। তাছাড়া ও জিনিসটা খানিকটা আমার অ্যালার্জির মতন, শুনলেই অজান্তে শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমি খানিকটা দৃঢ়ভাবে বললুম, কোনো জায়গাই তো জঘন্য নয়।

দাঁতে দাঁত ঘষে জগদীশ রায় বললেন, রাস্কেল, তোমাকে আমি জেলে পুরবো ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিরাট জোরে আমাকে একটা থাপ্পড় মারলেন। সারা গাল জুড়ে সেই চড়, আমার মুখটা বেঁকে গেল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, একি, আপনি আমাকে বিনা দোষে মারছেন কেন ?

—বিনা দোষে ? উঁঃ, এখনো মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরুচ্ছে। সব গুণই আছে দেখছি!

এ কথা শুনে আমার হাসি পাবার কথা। গত সাতদিনে আমি এক ফোঁটা খাই নি, অথচ উনি আমার মুখে ভক্‌ভকে গন্ধ পেলেন। একেই বলে নিয়তি ! ওঁর প্রচণ্ড থাপ্পড়ে আমার সমস্ত মুখে জ্বালা করছে। তবু আমি অনুনয়ের মতো স্বরে বললুম, কাকাবাবু, আপনি ভুল শুনেছেন...

—ডার্টি সোয়াইন, স্কাম, স্কাউন্ড্রেল, তুমি আমার বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকেছিলে, এতো সাহস—টেবিলের ওপর থেকে একটা কালো রুল তুলে নিয়ে তিনি আমাকে মারতে এলেন। আমি ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যতায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিলুম। আত্মরক্ষার জন্য সরে যাবারও সময় পাই নি। উনি আমার কলারটা চেপে ধরে সপ্‌সপ্ করে মারতে লাগলেন।

যন্ত্রণায়, রাগে আমার শরীর বেঁকে যাচ্ছিল, চোখে অন্ধকার দেখছিলুম। আমি হাত দিয়ে ওঁর রুলারটা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, পারা গেল না। আমি টেবিলের ওপাশে ঘুরে গিয়ে চট করে একটা ভারি পেপার-ওয়েট তুলে নিলাম। তারপর প্রতিটি শব্দকে বিশ্বাস করে উচ্চারণ করে বললাম, খুন করে ফেলবো! আরেকবার মারতে এলে আপনাকে আমি খুন করে ফেলবো ! আমাকে চেনেন না, আমি বাঙাল, খুন করে ফাঁসিতে যেতেও আমার আপত্তি নেই !

দু'জনে চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলাম। জগদীশ রায়ের মুখে রাগ ছাড়া সামান্য

একটা দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল। আমি হিংস্রভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। আর এক পা এগোলে আমি যে পেপার ওয়েটটা ওঁর কপালে ছুঁড়ে মারবো, সে সম্পর্কে কোনো ভুল নেই। ঈষৎ ভাঙা গলায় জগদীশ রায় বললেন, তুমি আমার সংসারেও সর্বনাশ করতে এসেছিলে, তোমার এতো সাহস ! তুমি আত্মীয় সেজে বাড়িতে ঢুকেছিলে—

—আপনার কী সর্বনাশ আমি করেছি ? আমি শুধু নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম—

আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম জগদীশ রায়ের দিকে। ওঁর কপালের দুটো শিরা ফুলে গেছে। সমস্ত মুখের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও হতাশা মাখানো। যেন ওঁর কি একটা বিষম বিপদ হয়ে গেছে। একবার আমার মনে হলো যমুনার মায়ের অসুখ খুব বেশি হয় নি তো ? না, তাহলে এতো রাত পর্যন্ত উনি থানাতেই বা থাকবেন কেন ? আমার সারা শরীর জ্বলছে।

—তুমি আমার মেয়েকে অপমান করতে গিয়েছিলে ! নষ্ট, কুলাঙ্গার, কত কিছু আশা করেছিলাম তোমার সম্বন্ধে। আর তুমি এদিকে কতগুলো গুণ্ডা, বেশ্যা আর স্পাইয়ের সঙ্গে মিশে—উচ্ছন্নে গিয়ে বসে আছো ! আমার মেয়ের বোকামির সুযোগ নিয়ে—

—কি করেছি আপনার মেয়েকে ?

—তুমি যমুনার সর্বনাশ করতে গিয়েছিলে ?

—মিথ্যে কথা !

—ঐটুকু একটা ফুলের মতন মেয়ে, তুমি এতো বড় পাজি, তার—

—মিথ্যে কথা ! মিথ্যে কথা ! আমি চেঁচাতে লাগলুম, আমার দম আটকে আসতে লাগলো, তবু প্রাণপণে মনে হলো, একবার রুখে দাঁড়ানো উচিত, জীবনে একবার অন্তত সমস্ত শরীর দিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। আমি চিৎকার করতে লাগলুম, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।

—সরস্বতী যা বলেছে, তা যদি সত্যি হয় আমি তোমাকে সারা জীবন জেলে পচাবো।

সরস্বতীর নামটা শুনে আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলুম। সরস্বতীর কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আবার ঐ নাম শুনে আমার শরীর অবশ হয়ে এলো। আমি ক্লান্তভাবে পেপার ওয়েটটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, সরস্বতী ! ওঃ ! আপনি আমাকে জেলেই দিন ! আমি আর পারছি না !

খবর পেয়ে বড় জামাইবাবু সেই রাত্রেই আমাকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। শেখরেরও জামিনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের নামে কোনো মামলা ওঠে নি। অবিনাশের বুদ্ধিতে ও কৃতিত্বে ব্যাপারটা বেশ সহজেই মিটে যায়। অবিনাশ অজয়কে হাত করেছিল এবং সেই বাচ্চা ছেলেটা ইন্দ্রজিৎ, অবিনাশের এমন ভক্ত হয়ে পড়ে যে, সে কিছু স্বীকার করতে চায় না, বারবার শুধু বলে যে অবিনাশের সঙ্গে সে সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল এবং তারপরও অবিনাশ ওকে কয়েকদিন বেড়াতে নিয়ে যায়। সুতরাং ছেলে–চুরির কোনো কেস্ উঠতে পারে নি।

আবদুল হালিম আর নূরজাহান দু'জনেরই পাকিস্তানের পাসপোর্ট কিন্তু ভিসার ব্যাপারে কি একটা গণ্ডগোল ছিল, সেইজন্য পুলিশ ওদের কিছুদিন অন্তরীণ করে রাখে। সেই অবস্থায় নূরজাহান একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পারে নি। কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে ওরা দু'জনে ফিরে চলে যায়। বীণা সেই ঘর ছেড়ে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকদিন পর অরুণের ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেতে এসে সব বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হয়। আমার শরীরের ব্যথা মরে গেছে, শেখরের স্বাস্থ্য ফিরেছে, সুবিমল একটা

উপন্যাস লিখে প্রকাশককে গছাতে পেরে বেশ খুশি। আমাদের সকলেরই দাড়ি কামানো, ফর্সা পোশাক পরা, উজ্জ্বল মূর্তি। পৃথিবীতে কোথাও কোনো গ্লানি নেই। মাঝখানে বড় জামাইবাবুর সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া বাধবার উপক্রম হয়েছিল এবং আমাকে চাকরি ছাড়িয়ে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বড়দিকে খোশামোদ করে একমাস সময় চেয়েছিলাম, এই একমাস আমি বিশ্বসংসার ভুলে এমন উঠে পড়ে অফিসে কাজ করেছি যে, বড় জামাইবাবুর মন না গলে পারে নি। কারণ এর মধ্যে তাপসের চাকরি যাওয়ায় ও আমার কাছে টাকা ধার করতে আসে—এবং ওকে দেখে চাকরি হারাবার বীভৎস রূপ বুঝতে পেরে—আমি নিজে চাকরি হারাতে কিছুতে রাজি হই নি।

এখন পৃথিবীতে কোথাও আর কোনো গ্লানি নেই। ম্যারাপ বাঁধা ছাদে নেমন্তন্ন খেতে বসে আমরা প্রবল হল্লোড়ের সঙ্গে কাটলেট ও শোনপাপড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করি। ভিড়ের মধ্যে মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়। মনীষাকে দেখে আমার চোখের একটি পাতাও কাঁপে না। মনীষা আন্তরিকভাবে আমার গায় গোলাপ জল ছিটিয়ে দিতে এলে, আমিও খুবই আন্তরিকভাবে হাসতে হাসতে ওর খোঁপা থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিই। জানি, মনীষার সঙ্গে আমার কখনো একা দেখা হবে না। কারুর সঙ্গেই আর একা দেখা হবে না !

বহু আত্মীয়স্বজনেরও ভিড় ছিল বলে আমরা বন্ধুরা অরুণের বাড়ি থেকে একটু আগেই বেরিয়ে আসি। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পান–সিগারেট খেতে খেতে বহু এলোমেলো আড্ডা হতে লাগলো। বিবাহিত বন্ধুরা এক একজন করে আস্তে আস্তে কেটে পড়তে থাকে। আমি সুবিমলের সঙ্গে ওর লেখা বিষয়ে কথা বলছিলুম, একটি ভিখিরি স্ত্রীলোক দু'তিনটে বাচ্চা নিয়ে বহুক্ষণ ধরে ঘ্যান ঘ্যান করছে। সুবিমল হঠাৎ পকেট উপুড় করে অনেকগুলো খুচরো সেই ভিখারিণীকে দিয়ে দিল। অবিনাশ তাই দেখে এগিয়ে এসে বললো, কি রে কি ব্যাপার, তুই হঠাৎ খাঞ্জা খাঁ হয়ে উঠলি যে ?

সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, সত্যি, আমি নিজেই ভিখিরি, আমার কাছেও কেউ ভিক্ষে চাইলে দিতে আমার ভালো লাগে। দু'তিনজনের সঙ্গে থাকলে, ভিখিরিরা সাধারণত আমার কাছে ভিক্ষেই চায় না। চিনে ফ্যালে। তাছাড়া, আজকের গুড টার্নটা সারা হয় নি।

—ভিক্ষে দেয়া বুঝি ভালো কাজ ?

—আমার খারাপ লাগে না !

—আমার তো গা জ্বলে যায়। সেদিন রাত্তিরে পার্ক সার্কাস দিয়ে—

—আহা বেচারারা থাক্ না। যে–যেমনভাবে বাঁচতে পারে।

—শোন্ না, সেদিন পার্ক সার্কাস দিয়ে আসছিলুম, পার্কের পাশে ভূত দেখলুম। একটা জ্যান্ত ভূত। একটা কালো কুচকুচে রঙের আধবুড়ো ভিখিরি প্লাস পাগল, হাঁটারও শক্তি নেই, উবু হয়ে বসে ঘষড়াতে ঘষড়াতে আসছে। আমার কি মনে হলো জানিস ? ওর বেঁচে থেকে কি লাভ ? রোজ একটু একটু করে মরা ? আমার হাতে দু'খানা ছবির ব্লক ছিল, বেশ ভারি জিঙ্ক ব্লক, ইচ্ছে হলো ওর মাথায় এক ঘা মারি, তাহলেই শেষ হয়ে যাবে ! কিন্তু ধরা পড়লে নিশ্চয়ই আমার নরহত্যার দায়ে ফাঁসি হতো ! ভেবে দ্যাখ্ ! মার্সি কিলিং জিনিসটা চালু হওয়া উচিত। ওকে মারলে ওর উপকারই করা হতো না ?

—ওর হয়তো উপকার করা হতো, কিন্তু তোর একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতো। তুই সারাজীবন আর ঐ লোকটাকে ভুলতে পারতি না।

—আমার ওসব বাজে সেন্টিমেন্ট নেই। রাস্তা ভর্তি এণ্ডিগেণ্ডি ভিখিরি দেখলে আমার এতো রাগ হয় ! এ রকমভাবে বেঁচে লাভ কি ? আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কলকাতার সবক'টা

ভিখিরি মেয়েকে ধরে ধরে লুপ পরিয়ে দিতুম ! ঐ বাচ্চাগুলোর দিকে চেয়ে দ্যাখ, চিরকালই ভিখিরি থাকবে, ওদের জন্মে লাভটা কি ?

—ওরকম নিষ্ঠুরের মতোন কথা বলিস্ কেন ? নতুন ভিখিরির জন্ম বন্ধ করতে পারলে ভালোই, কিন্তু যারা জন্মে গেছে, তারা থাক্ না, আহা !

আমি বললুম, সত্যিই অবিনাশটা মাঝে মাঝে একেবারে দয়ামায়াশূন্য হয়ে যায়। ভিখিরি হোক আর যা–ই হোক, ঐ বাচ্চা মেয়েগুলো—মুখে কেমন সরল সরল ভাব—ওদের দেখে তোর মেরে ফেলার ইচ্ছে হলো ?

অদ্ভুত ধরনের হেসে অবিনাশ বললো, বাচ্চা মেয়ে দেখলেই সুনীলের দয়ামায়া উথলে ওঠে। তোর সেই বাচ্চা মেয়েটার খবর কি ? বেশ ভালো মাল ছিল—

মুহূর্তে আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। আমি ক্রূর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, অবিনাশ, তুই খবরদার ঐ মেয়েটা সম্পর্কে এরকমভাবে কথা বলবি না !

একটু থতমত খেয়ে অবিনাশ কিছুটা পাংশু হয়ে যায়। তারপর দুর্বলভাবে বলে, আহা রাগ করছিস কেন ? খারাপটা কি বললুম, হাওড়া ব্রিজের পাশে ফুলের হাটে গিয়ে দ্যাখ, ওরা ফুলকেও মাল বলে। গাদা করা রজনীগন্ধার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, এ মালটা আজ কতো করে ডজন ? ফুলেরই যখন এই নাম।

আমি বললুম, থাক্ থাক্ হয়েছে। তারপর মনে পড়তেই আমি সুবিমলকে জিজ্ঞেস করলুম, তুই যে তোর পাড়ার সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবি বলেছিলি, তার কি হলো ?

—আরে, আমি তো বিয়ে করতে রাজিই ছিলুম। কিন্তু মেয়েটার বাবা কুষ্ঠি মেলাতে চায়, জাত নিয়ে খুঁতখুতুনি। তারপর মেয়েটা ওর গানের ইস্কুলের এক নমঃশূদ্র মাস্টারকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। এখন বুঝুক ঠ্যালা।

—যাক্, বাঁচা গেছে।

—কিন্তু, আমি আগামী মাসে একটা চাকরি পাচ্ছি, জানিস।

—তাই নাকি ? সেইটা ? তাহলেও আমাদের গ্রুপের ব্যালেন্স ঠিকই রইলো। তুই চাকরি পেলি আর তাপসের চাকরি গেল।

অবিনাশ উদ্গ্রীব হয়ে বললো, চাকরি পাচ্ছিস্ ? সেলিব্রেট কর্ ! চল্, এখন কোথাও গিয়ে বসা যাক!

—এখন মাসের শেষে আমি টাকা পাবো কোথায় ? জয়েনই করি নি। কেউ ধার দে।

— বিমলেন্দুর কাছে যা না।

—বিমলেন্দু আর শেখর দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। বিমলেন্দুর কাছে সুবিমল গিয়ে টাকা চাইতেই ও অবাক হয়ে গেল। বললো, এখন আবার কি খাওয়া ? এই তো নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম?

অবিনাশ বললো, দূর, দূর, আজকাল নেতন্তন্ন খেয়ে পেট ভরে নাকি ? তাছাড়া ও খাওয়ার কথা কে বলছে ?

বিমলেন্দু গম্ভীর হয়ে বললো, ও তোমরা সব খেতে যাবে, তার জন্য আমি টাকা দেবো ? মোটেই না। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।

অবিনাশ হাসতে হাসতে বললো, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে ? টাকা চাইছি থাকলে দিবি, না থাকলে দিবি না।

—থাকলেও দিতুম না। ওসব খেলো বোহেমিয়ানিজমের জন্য টাকা খরচ করা আমি খুব অপছন্দ করি। আমাকে দ্যাখ না, আমিও লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি করছি, বিয়ে করে সংসার পেতেছি, সাহিত্যশিল্প বুঝি, জীবন সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতা তোদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু

আমার তো মদ খাওয়ার দরকার হয় না।

সুবিমল ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, বিমলেন্দু, তুই খুব ভালো, নমস্য লোক, কিন্তু সবাই কি একরকম হয় ? তুই বল না—

জড়িয়ে ধরার ছুতো করে সুবিমল আসলে বিমলেন্দুর পকেট থেকে টাকা তুলে নেবার চেষ্টা করছিল। বুঝতে পেরে মোটা চেহারার বিমলেন্দু ঝটকা মেরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, এই, কী হচ্ছে কি ! তোদের সব গেছে দেখছি !

সুবিমল কাতরভাবে বললো, সত্যি ভাই, সবই গেছে। দে না তিরিশ টাকা ! খুব তো জমাচ্ছিস। শুনলুম সল্ট লেকে জমি কিনবি—

—বেশ করবো। তোদের টাকা দিয়ে বাজে খরচ করবো কেন ? যত রাজ্যের মাতাল কোথাকার—

—হাথ্ তেরি ! কে কে আসবি আয়— ! অবিনাশ একটা চলন্ত বাসের দিকে ছুটে যায়। দল থেকে আমরাও কয়েকজন গিয়ে টপাটপ উঠে পড়ি।

এসপ্লানেডে এসে দেখা যায় ছ'জন। তার মধ্যে তাপস নামতে চায় না, তাকেও জোর করে নামানো হলো। একটা দোকানে ঢুকে এক রাউন্ডের অর্ডার দেবার পর, শেখর খুব উদ্ভাসিত মুখে বলে, অনেক দিন পর এলাম। বেশ ভালো লাগছে আজ। আয়, একটা কোরাসে গান ধরা যাক্।

সুবিমল বললো, দাঁড়া, আগে কিছু পেটে পড়ুক।

নূরুল বললো, উঁহু, গান করবেন না, গান শুরু করলে পাশের টেবিল থেকেও গান ধরবে, তখন সেটা আমাদের পছন্দ হবে না। আমরা যা করি, অন্য লোকেরাও যদি সেটা করে, তখন সেটা আমাদের সহ্য হয় না।

আমি নূরুলকে বললুম, আপনি নিজেকে সবসময় অন্যের চেয়ে আলাদা মনে করতে চান কেন?

নূরুল বললো, ঐটুকু ভুল ধারণার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।

সুবিমল নূরুলকে একটা খোঁচা দিয়ে পাশের টেবিলের একটা মোটা লোককে দেখিয়ে বললো, তোর ধারণা ঐ লোকটা গান গাইবে ?—আমরা সবাই আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম। সত্যি, লোকটাকে দেখলে হাসি পায়। বিশাল মোটা চেহারা, কোটের এখানে সেখানে ঝোল লেগেছে, চুলগুলো কপালে, অত্যধিক নেশায় লোকটার মুখের রং মেটে সিঁদুরের মতন। টেবিলে শুধু একা ও বসে আছে, টেবিলে ছড়ানো খাবারের প্লেট আর সোডার বোতল, অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে নিজের গেলাসে। আর একটা খালি গেলাসে ওর এক গাদা বিল জমা করা।

শেখর বললো, আহা, লোকটা খুব দুঃখী। একা কেউ মদ খেতে আসে ?

নূরুল লোকটার দিকে ফিরে বললো, দাদা, একখানা গান গাইবেন নাকি ?

লোকটা চোখের পাতা উল্টে পুরো দু'টি পাকা লিচুর মতন লাল চোখ দেখিয়ে বললো, এসো, এসো ব্রাদার, গান হবে, নাচ হবে, ফুর্তি হবে ! নূরুল বললো, একটু ফুর্তি হোক না আজ !

লোকটা মাথা ঘুরিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টায় উচ্চারণ করলো, ব্র–উ–উ, ব্র–উ–উ—

আমি নূরুলকে বললুম, সরে আসুন, সরে আসুন, বমি করবে !

তিন রাউন্ড হুইস্কি খাবার পর, সুবিমলই প্রথম খেয়াল করলো, আমাদের বিল দেবার মতন পয়সা আছে কি না। কারুর পকেটেই বিশেষ টাকা নেই, সুবিমল আর তাপস নিঃস্ব, বাকি আমাদের প্রত্যেকের পকেটে চার–পাঁচ টাকার বেশি না। সবেমাত্র জমে উঠেছে, এর মধ্যেই শেষ করতে হবে, তাছাড়া দামও মেটানো যাচ্ছে না। অবিনাশ বললো, দাঁড়া, এখানে আমার চেনা আছে, আমি ম্যানেজারকে বলে ধারের ব্যবস্থা করছি !—উঠে গিয়ে একটু বাদেই অবিনাশ

অপমানিত মুখে ফিরে এলো। বললো, দিলো না ! শালা আমায় চিনতেই পারলো না। শালার উচিত শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা করা, তা না, চৌরঙ্গিতে দোকান ফেঁদেছে। একদিন এমন শিক্ষা দেবো !

সুবিমল বললো, এ বিলগুলোর কি করবি ?

অবিনাশ বললো, কিছু না হয়, বিল না দিয়েই স্রেফ বেরিয়ে যাবো। আমরা ছ'জন যদি রুখে দাঁড়াই, তবে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে—কলকাতা শহরে এমন কেউ আছে ?

তাপস জিজ্ঞেস করলো, তবে আমরা সকলের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াচ্ছি না কেন বল তো ?

আমি বললাম, এক কাজ কর না !— বলে, পাশের টেবিলের দিকে ইশারা করে চোখ টিপলাম। অবিনাশ হাসলো এবার ! এ জিনিস আমরা আগেও দু'চারবার করে ফল পেয়েছি। পাশের টেবিলের মোটা লোকটা একটু আগেই থপ্ থপ্ করে টলতে টলতে বাথরুমে গেছে। অবিনাশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে একটা বিল পাশের টেবিলের গেলাসের মধ্যে রেখে দিল। তারপর আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলুম।

লোকটা আবার ফিরে এলো। ওর গেলাস থেকে সব বিল তুলে তাসের মতন হাতে ছড়ালো, মনে মনে কি গুনলো কে জানে, চেঁচিয়ে ডাকলো, বেয়ারা ! বেয়ারা আসতেই তার হাতে বিলগুলো দিয়ে বললো, জোড়ো, কিৎনা হুয়া ! বেয়ারাটা গুনতে গুনতে একবার অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালো। এখানে ছ'জোড়া চোখ ওকে ভস্ম করে দেবার মতন চেয়ে আছে ! চোখ ফিরিয়ে বেয়ারাটা বললো, আটাত্তর রূপিয়া ! মোটা লোকটা মুচকি হেসে বললো, ঠিক ! আমার ঠিক হিসেব আছে! কত ? আটাত্তর ? আটাত্তর ? আট দশকে আশি। ঠিক।

লোকটা পকেট থেকে এক তাড়া দশ টাকার নোট বার করে, আটখানা নোট বার করে বললো, জলদি ট্যাক্সি ডাকো !

আমরা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লুম। বেয়ারাটাও নিশ্চয়ই টাকা দশেক আরও বাড়িয়ে বলেছে। ওরও কিছু হলো, আমাদেরও কিছু হলো ? লোকটার টাকার তাড়ার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে অবিনাশ ফিসফিসিয়ে বললো, ইস্, আর কয়েকখানা যদি খসানো যেত।

সুবিমল বললো, বেশি লোভ করিস না। যা পাওয়া গেছে, তাই যথেষ্ট।

অবিনাশ বললো, ওর আর কি ! চেহারা দেখলেই, বোঝা যায় ব্ল্যাক মানি, ওর তো খরচ করাই সমস্যা।

বাইরে বেরিয়ে অবিনাশ অস্বস্তিতে নিশপিশ করতে লাগলো। ইস্, মাত্র দশটা বাজে, এর মধ্যেই শেষ! আর একটু না খাবার কোনো মানে হয় ? তোদের ইচ্ছে করছে না ?

স্বীকার করতেই হলো, আমাদেরও ইচ্ছে আছে। কিন্তু উপায় কি ? যা টাকা আছে, তাতে বাইরে থেকে একটা বোতল কিনতে গেলেও কুলোবে না। সুবিমল বললো, কোথায় ধার পাওয়া যায় বল্ তো ?

কারুরই কোনো উত্তর জানা নেই। সবেমাত্র শরীরটা চাঙ্গা লাগছে, এখনই দল ভাঙতে যদিও কারুর ইচ্ছে হচ্ছে না। জানবাজারের পানের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'বোতল দিশি খাওয়া হলো। তবু তৃষ্ণা মেটে না। এতদিন পর বন্ধুবান্ধবরা সব একসঙ্গে মিলেছি। সত্যি ভালো লাগছে। মরিয়া হয়ে সুবিমল বললো, চল্ পার্ক স্ট্রিটের ঐ দোকানটায় যাই। ওখানে চেনাশুনো কারুকে পাওয়া যেতে পারে !

—কাকে পাওয়া যাবে, যে আমাদের ছ'জনকে খাওয়াবে ?

—চল না, আমার দু'একজন চেনা আছে, যদি পাওয়া যায় !

হাঁটতে হাঁটতে পার্ক স্ট্রিটে চলে এলাম। সে দোকানেও কারুকে চেনা পাওয়া গেল না। পার্ক

স্ট্রিটের মুখে ফিরে এসে, আমরা ছ'জন বিষম চঞ্চল হয়ে উঠলুম। ছ'জনের মধ্যে কারুর সাহস নেই মুখ ফুটে বলে, তাহলে চল্, বাড়িই ফেরা যাক্ ! সঙ্গে সঙ্গে সে কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। বারবার ব্যর্থ হয়ে অবিনাশ খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল, বললো, তোরা একটা জায়গা ভাবতে পারছিস না, যেখানে ধার পাওয়া যায় ? হোপলেস্ !

শেখর বললো, দ্যাখ না, আমার ঘড়িটা নিয়ে যদি কিছু হয়।

সুবিমল বললো, না, না, ওসব ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। তার চেয়ে আয় ভিক্ষে করা যাক।

অবিনাশ দাঁত খিঁচিয়ে বললো, এটা একটা জন্ম-ভিখিরি ! ভিক্ষে করে গাঁজা খাওয়ার পয়সা উঠতে পারে, কিন্তু মদ খাওয়ার পয়সা উঠবে ?

—দ্যাখ্ না !

ট্রাফিকের লাল আলোয় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়েছে, সুবিমল সেদিকে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়ির লোকদের সঙ্গে কি কথা বলতে লাগলো। একটু বাদেই হাসতে হাসতে হাত উঁচিয়ে ফিরে এলো, ওর হাতে পতাকার মতন উড়ছে একটা পাঁচ টাকার নোট। আমরা দু'তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, কী করে পেলি, কেউ চেনা ছিল ?

সুবিমল বললো, চেনা-ফেনা কেউ না। স্রেফ ভিক্ষে চাইলুম। ইংরেজিতে বললুম, ভদ্দরলোকের ছেলে, টাকা হারিয়ে গেছে, ট্রেনে ডায়মন্ড হারবার ফিরতে হবে—ব্যস্ দিয়ে দিল !

আমরা হৈ-চৈ করে উঠলুম। অবিনাশ বললো, আচ্ছা আমি দেখি তো ! অবিনাশও ছুটে গেল একটা গাড়ির দিকে। একটু বাদে ফিরে এলো আধা খুশি হয়ে, ও তিন টাকা পেয়েছে। সুবিমল বললো, দেখলি ! ভিক্ষে হচ্ছে এ দেশের একমাত্র সৎ জীবিকা ! দেখলি তো !

গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক করে নিলুম পার্ক স্ট্রিটের এখানে ট্রাফিকের আলোয় অনেকক্ষণ গাড়ি থামে, প্রত্যেকবার লাল আলোয় এক একজন করে যাবে। এক সঙ্গে সবাই গেলে সন্দেহ করবে। ভিক্ষে চাইতে হবে ইংরেজিতে—কেননা, এখন যারা গাড়িতে ফিরছে, তারা ইংরেজি না শুনলে খুশি হয় না। তাপস আপত্তি তুললো—। অবিনাশ এক ধমক দিয়ে বললো, দেখুক না ! ভিক্ষে চাইবি তাতে লজ্জার কী আছে ? তোর চাকরি নেই—তোরই অফিসের লোকের ভয়।—শেখর কিন্তু বললো, আমি বনেদি বংশের ছেলে, আমি ভিক্ষে চাইতে পারবো না। আমি ঘড়ি বিক্রি করে দিতে রাজি আছি।

সুবিমল বললো, যা, যাঃ ! এখানে আমার চেয়ে বড় বনেদি বংশের আর কেউ নেই ! মৈমনসিং-এ আমাদের কত বড় জমিদারি ছিল অবিনাশকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ। অবিনাশরা আমাদের প্রজা ছিল !

অবিনাশ আদর করার মতো সুবিমলের থুতনি ধরে বললো, জমিদারি, না রাজত্ব ? রাজকুমার আমার, আহা, বড় ভালো ছেলে—মাঞ্চু মাঞ্চু—

যাই হোক, শেখর রাজি হলো না কিছুতেই। শেখরকে আমাদের ক্যাশিয়ার করা হলো। আমরা এক একজন ট্রিপ দিয়ে এসে শেখরকে টাকা জমা দিতে লাগলুম। আমি প্রথমবার গিয়ে পড়লুম, একদল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের গাড়ির সামনে ! ওরা পাত্তাই দিল না। সেটা ছেড়ে পরের গাড়িটায় চেষ্টা করতেই লাল থেকে সুবজ হয়ে গেল। খালি হাতে ফিরতে হলো আমায়। পরের বার একজোড়া সুখী চেহারার দম্পতির গাড়িকে ধরলুম, খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে, আমার একটু লজ্জা করছিল, তবু চোখে-মুখে যথেষ্ট কাতরতা ফুটিয়ে বললাম, বিলিভ মি স্যার, কমপ্লিটলি স্ট্র্যান্ডেড, উইল গো টু ডায়মন্ড হারবার, ফাইভ রুপিজ—। মহিলাটি হাত নেড়ে

বললেন, হবে না, হবে না ! পুরুষটি কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুক পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে দিলেন।

ওরা কিন্তু বেশ টাকা পাচ্ছিল। সুবিমল আর নূরুল যাচ্ছে আর চট্‌চট্ করে টাকা নিয়ে আসছে। অবিনাশটা নাছোড়বান্দা হয়ে দৌড়োচ্ছে পর্যন্ত অনেক গাড়ির সঙ্গে। ফিরে এসে অবিনাশ বলছে, এক এক সময় যা রাগ হচ্ছে না ! শালা, চোস্ত ইংরেজিতে ভিক্ষে চাইছে, তা–ও কিনা দু'একটা লোক দু'আনা, চার আনা দিতে আসে ! ইচ্ছে হয়, মুখে মারি একখানা স্কোয়ার কাট্ !

সুবিমল বললো, উঁহু, ওসব করিস্ না, অনেস্টলি ভিক্ষে করতে এসে আবার গুণ্ডামি কেন ?

আমাকে ওরা বললো, তুই একটা কোনো কম্মের না ! কিছুই পাচ্ছিস না ! যাঃ—।

আমি ছুটে গেলাম একটা মাড়োয়ারিদের গাড়ির সামনে, মুখের ভঙ্গি কাতর থেকে কাতর করে বললাম, কিছু দিন ! মেহেরবানি ! — সেবারও কিছু পেলাম না।

শেষ পর্যন্ত, ভিখিরি হিসেবে কে কতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল আমাদের মধ্যে। শেখরের পকেট ভরে উঠতে লাগলো, আমি বারবারই ব্যর্থ হতে লাগলুম যদিও। আজ আমার কপালটা খারাপ। এত চেষ্টা করছি, কিছুই হচ্ছে না ! তিনজন সত্যিকারের ভিখিরি চেহারার ভিখিরি পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছিল আমাদের। শেখর হাসতে হাসতে আমাদের ফান্ড থেকে তিনজনকেই একটা করে টাকা দিয়ে দিল।

সুবিমল বললো, এক একটা গাড়ির মধ্যে যা সব দৃশ্য দেখছি না, ভিক্ষে চাইবো কি, হাঁ করে চেয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। ঐসব দেখে ফেলার জন্যই অনেকে দিয়ে দিচ্ছে।

তাপস বললো, আমাকে তো একটা পাঞ্জাবি ছোকরা মারতেই এসেছিল জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছি বলে। দেখলুম, মেয়েটার—

অবিনাশ একটা গাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে এসে বললো, সুনীল, তুই যা, তোর টার্ন। ঐ নীল গাড়িটা—

অবিনাশ আমাকে ধাক্কা দিল, সেই ঝোঁকেই আমি ছুটে গেলাম, মুখের চেহারা খুবই করুণ করে তুলে। নীল গাড়িটার পাশে এসে কথা বলতে তখনো শুরু করি নি, দেখলুম জানালার পাশে যমুনা। সঙ্গে সঙ্গে আমি চট করে ফিরে এলাম। অবিনাশ যমদূতের মতন দাঁড়িয়েছিল কাছেই, বললো, চেষ্টা না করেই ফিরে এলি যে! যা! আমি বললুম, না, আমি এবার যাবো না। যা-না— বলে অবিনাশ আমাকে ঠেলে দিল আবার গাড়িটার কাছে। আমি কোনোক্রমে গাড়ির বডিতে হাত রেখে ঝোঁক সামলে নিলাম। যমুনা দেখতে পেয়ে বললো, একি সুনীলদা !

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললাম, যমুনা, তোমায় কতদিন পর দেখলুম ! ভালো আছো?

গাড়িতে যমুনা ও সরস্বতী, আর একজন অচেনা বিবাহিতা নারী এবং একজন পুরুষ। যমুনা আজ আবার লাল রঙের পোশাক পরেছে, শরীরে সেই লাল আভা। পুরুষটি প্রশ্ন করলো, আপনি গাড়িতে উঠবেন ? সরস্বতী বললো, ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক ! মুন্নি, কাঁচ তুলে দে।

যমুনা বললো, সুনীলদা, গাড়িতে আসবেন ? আসুন না !

আমি যমুনার দিকে খুবই স্নেহময় হাসি দিয়ে বললুম, যমুনা, আমার টাকা হারিয়ে গেছে, আমাকে পাঁচটা টাকা দাও তো ! গাড়িতে উঠবো না।

—পাঁচ টাকা তো নেই। এক টাকা আছে —

—মুন্নি, কাঁচ তুলে দে—

—না, আমার পাঁচ টাকাই চাই—

—মুন্নি, কাঁচটা তুলে দে না !

আর সময় নেই, আর সময় নেই এক্ষুনি লাল থেকে সবুজ হবে। মজার ব্যাপার এই, সরস্বতীও আজ পরেছে সবুজ শাড়ি, একেবারে মিলে যায় দেখছি। আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, ঠিক আছে যমুনা, তুমি একটা টাকাই দাও ! ওতেই হবে।

কিন্তু আর কথা শোনা গেল না, হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিল। পেছন থেকে অসংখ্য গাড়ির হর্ন ; চাপা পড়ার ভয়ে আমি দৌড়ে ফুটপাথে উঠে এলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এবারেও টাকা পেলুম না। ভিখিরি হিসেবেও বন্ধুদের কাছে হেরে যাচ্ছি। ধুৎ !

সুবিমল বললো, কি রে, এবারও পেলি না ?

অবিনাশ বললো, পাবে না, জানতুম।

এইরকম ভাবেই দিনটিন কেটে যায় আর কি। মানুষের মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তারও হাসিমুখ দাবি করি, অধিকাংশ মুখই ভাবলেশহীন। আকাশে যখন মেঘ থাকে না, তখন সব মানুষের মুখেই এক ধরনের নীলচে ছায়া পড়ে, সেই ছায়া দেখতে পেলে যে–কোনো অপরিচিত মানুষকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কেমন আছেন ? কিন্তু সবাই প্রশ্ন করতেই চায়, কেউ উত্তর দিতে রাজি নয়। এ পর্যন্ত যে কত লোক আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন—কিন্তু কেউ উত্তর শোনার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি। সুতরাং আমার বলতে ইচ্ছে হয়, আপনি যদি ভালো থাকেন, তাহলেই আমি ভালো আছি।

আমি নানারকম ভুল ভাঙতে ভাঙতে আরও নতুন নতুন ভুলের মধ্যে প্রবেশ করি। বেশ ভালো লাগে। বেঁচে থাকার মধ্যে ক্রমশই বেশি করে সুখ পাচ্ছি আজকাল। একটা কমলালেবু কিংবা চিনেবাদাম খেতে গিয়ে মনে হয়, এদেরও প্রাণ আছে, ফিসফিস করে ওরা বলে যায় আমাদের প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখছি, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। না, অকৃতজ্ঞ হই নি, পৃথিবীর যাতে একটুও আঘাত না লাগে, এমন সন্তর্পণে মাটিতে পা ফেলি এখন।

যমুনার সঙ্গে আরও দু'বার দেখা হয়েছিল আমার। একবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে ও নাচতে এসেছিল। দূর থেকে দেখলুম ওকে, শরীরময় ফুলের গয়নায় অপ্সরী সেজেছিল। দেহের ভঙ্গিতে খানিকটা চটুলতা এসেছে, তা হোক, তবু সেই টিয়াপাখির মতন দৃষ্টি, পৃথিবীর রহস্য কিছুটা জেনে নিয়ে এখন ও পৃথিবীকে নিজের রহস্য দেখাতে চায়। বুকটা সেদিন মুচড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়বার দেখা হয় এয়ারপোর্টে, যমুনা তপনের সঙ্গে বম্বে যাচ্ছিল। ছোড়দি আর কল্যাণদা বিলেত যাচ্ছে বলে দমদমে আমিও গিয়েছিলাম। যমুনাদের দলে ওর বাবাও ছিল, কিন্তু আমি জগদীশ রায়কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গিয়ে আলতোভাবে যমুনার কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, কেমন আছো ? যমুনা চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি ?

আমি কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করলে না ? তপন বললো, সত্যি এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, এক সঙ্গেই হলো কিনা ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এক সঙ্গে মানে ? যমুনা বললো, মার খুব শরীর খারাপ বলে বাবা আমার আর দিদির একই দিনে বিয়ে দিয়ে দিলেন ! আপনি বম্বেতে এলে দেখা করবেন কিন্তু !

যমুনার হাসিটা খুব অন্যরকম সুন্দর লাগলো, আমিও সুন্দরভাবে হাসলুম। সেই রকম করেই জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, আমি কি রকম আছি, তুমি জিজ্ঞেস করলে না ? যমুনা বললো, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি ভালো আছেন।

তারপর একদিন সকালবেলা পরিতোষ আবার এলো। অভিমানমাখা মুখ। তখনো আমার খবরের কাগজ পড়া শেষ হয় নি, তৃতীয় কাপ চা খাওয়া হয় নি। ক্ষুব্ধ গলায় পরিতোষ বললো,

কাল আপনি কোথায় ছিলেন ?—আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলুম, কেন, শেখর আবার কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি নাকি ? পরিতোষ বললো, না, কাল আপনাকে খুব খুঁজছিলাম, আপনাদের বাড়ির টেলিফোনটা বোধহয় খারাপ। আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু খুঁজছিলে কেন ?

—দাদা তো আবার একটা পাগলামি শুরু করেছে। কার কাছ থেকে শুনে এসেছিল যে, সাতদিন উপোষ করে প্রাণায়াম করলে কি সব নাকি অলৌকিক অভিজ্ঞতা-টভিজ্ঞতা হয়। তাই তিনদিন ধরে উপোষ করে ধ্যানে বসে আছে। কাল রাত্তির থেকে দেখা যাচ্ছে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। জ্ঞান নেই, কিরকম যেন আচ্ছন্ন অবস্থা। কি সব কাণ্ড বলুনতো আপনাদের ! যাই হোক, মা আপনাকে খবর দিতে বললেন।

—তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে কী করে ?

—সেই তো। যত সব সিলি ব্যাপার ! মায়ের ধারণা আপনি গিয়ে বললে হয়তো খাবে।

—ডাক্তার ডাকলেই পারতে ! আমি গিয়ে কি করব ? যাক্‌গে, ও বোকা ছেলে নয়, সেরকম খিদে পেলে ঠিকই খাবে। সামনে কয়েকটা সন্দেশ আর এক গ্লাশ শরবত রেখে দাও না। এক সময় টপ করে খেয়ে ফেলবে ঠিক।

—আপনি আসবেন না ?

— দুপুরে অফিস থেকে টেলিফোন করে খবর নেবো আমি। যদি শুনি তখনো খায় নি, তাহলে বিকেলের দিকে যাবো। মাকে বলো, ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুবক যুবতীরা

অবিনাশ

আমি লম্বা ভাঙা আরাম কেদারায় এবং পরীক্ষিৎ খাটে ঘুমিয়ে ছিল। পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী। এক এক সময় শীতের শুকনো হাওয়ায় জামা–কাপড়ের নিচে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দূরের বাঁধ থেকে মাটিকাটা কামিনদের অল্প ভেসে–আসা গোলমাল, এছাড়া কোনো শব্দ ছিল না। শুধু শীতের দুপুরে যখন ধপ্‌ধপে ফর্সা নির্জন রোদ, তখন যেহেতু কাকের ডাক ছাড়া মানায় না, বড় বড় মিশমিশে কালো দাঁড়কাকগুলো যা মফস্বলেই সাধারণত দেখা যায়— তাদের ডাকাডাকি মাঝে–মাঝে আমাকে একাগ্র করেছিল। এবং টিনের চালে তাদের কুৎসিত পায়ের শব্দে আমি কখনো–কখনো অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম।

মনে পড়ে সেই দুপুরবেলায় বসে থাকা। খাটে ঘুমন্ত পরীক্ষিৎ, পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রী, এবং আমার চুপচাপ বসে থাকা। সেই দৃশ্যটার কথা ভাবলেই কেমন যেন ঝন্‌ঝন্ করা শব্দ শুনতে পাই, জামার মধ্যে হঠাৎ কোনো পোকা ঢুকে যাওয়ার মতো অস্বস্তিবোধ করি। আমি জীবনে কোনো পাপ করি নি। আমার শাস্তি পাবার ভয় নেই। মাথার ওপর সব সময় দণ্ডাজ্ঞার ছায়া রয়েছে এমন মনে হয় না। তবু সেদিনের সেই দুপুরের কথা মনে পড়লে কেমন যেন ভয় করে। জীবনে কারুর ক্ষতি করি নি সজ্ঞানে, চোখ মেলে পৃথিবীকে যে–রকম দেখা যায়, আমার কাছে পৃথিবী ঠিক সেই রকমই, আর কিছু না, না স্বপ্ন, না আয়না। আমি কোনোরকম বাসনাকে বন্দী করতে চাই নি কখনো, মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, ভেবেছি। জব্বলপুরে আমি কী করেছিলাম, সে কি পাপ ? গত বছর শেষ শীতে, সেই জব্বলপুরের দুপুরে ?

পরীক্ষিৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। অদ্ভুত ঘুম ওর, যেন জন্মের সময়েই প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, জীবনের এক–তৃতীয়াংশ ও ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাবে। ও যখন জেগে থাকে, তখন ভয়ানকভাবে জেগে থাকে, যখন ঘুমোয়, প্রবলভাবে ঘুমোয়। দুপুরে খেয়ে ওঠার পর হঠাৎ আমাদের মনে পড়েছিল যে সিগারেট নেই। ডুবে গেছি মাইরি, সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছি।

পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ভাত খাবার পর এই টক্ মুখ নিয়ে কি করবো ? গায়ত্রী বলেছিল, মশলা খান্ না, আমার কাছে ভাজা মশলা আছে। মশলা আর সিগারেট এক হলো ? পরীক্ষিৎ ধমকে উঠেছিল—তারপর সেই বিখ্যাত জার্মান উপন্যাসের নায়কের মতো বলেছিল, 'সিগারেট

নেই তো ভাত খেলাম কেন ? ভাত খাবার প্রধান কারণই তো এই—তারপর সিগারেট টানতে বেশি ভালো লাগবে। ঘুরঘুরে ইঁদুরের মতো ও তখন বাড়ির সমস্ত কোণ খুঁজে দেখলো—যাবতীয় প্যান্টের পকেট থেকে তরকারির ঝুড়ি পর্যন্ত। সিগারেটের দোকান প্রায় মাইলখানেক দূরে, চাকর চলে গেছে তার বাড়িতে, দরকার হলে পরীক্ষিৎ নিজেই ভরা পেটে এক মাইল ছুটতো কিন্তু হঠাৎ বাথরুমে পৌনে এক প্যাকেট পেয়ে গেল এবং পরম উল্লাসে আমাকে একটি এবং নিজে একটি ধরিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু যে সিগারেটের জন্য ওর এতো ব্যস্ততা—সেটা শেষ হবার আগেই এমনভাবে ও ঘুমোলো যে, যাতে ওর আঙুল কিংবা বিছানা পুড়ে না যায়, তাই আমি ওর ঘুমন্ত হাত থেকে সিগারেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। 'ঘুমন্ত হাত' কথাটা ঠিকই ব্যবহার করেছি। ও যখন ঘুমোয় তখন ওর সমস্ত শরীর ঘুমোয়। ওর শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আলাদা ঘুম আছে। যখন যেমন শোয়—ঠিক, সেইরকমই শুয়ে থাকে আগাগোড়া, একটুও নড়ে না। কখনো ঘুমের মধ্যে ওকে জোর করে ডাকলে ও চোখ মেলে তাকায়—শরীরে সামান্যতম স্পন্দনও দেখা যায় না, আস্তে-আস্তে ওর মুখ, ঘাড়, গলা, হাতের ঘুম ভাঙে। বিখ্যাত ঘুম পরীক্ষিতের। গায়ত্রী তখনও জেগেছিল পাশের ঘরে, মাঝে-মাঝে ওর শরীরের, কাপড়-জামার এবং হার-চুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একবার তবু ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গায়ত্রী, ঘুমিয়েছ ?

— না, শেলাই করছি। আপনি কি করছেন ?

— কিছু না, কি করবো তাই ভাবছি।

— চা খাবেন ?

— না, একটু পরে, এখন এক গ্লাস জল খাবো।

শব্দ করে খাট থেকে নেমে অল্পক্ষণ ও কি জন্য যেন দেরি করলো। তারপর জল নিয়ে এলো ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে। গেলাসটা বোধহয় ওদের নতুন বিয়েতে পাওয়া, নয়তো এতো ঝকঝকে গেলাস কারুর বাড়িতে দেখিনি। সেই গেলাস এবং তার মধ্যকার জলের শীতলতা যেন আমি বুক দিয়ে অনুভব করলাম। তখনই সেই জল খেতে আমার ভয় করলো। বললাম, টেবিলের ওপর রাখো।

নিচু হয়ে যখন ইজিচেয়ারের হাতলে গেলাসটা রাখলো, আমি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ব্লাউজের নিচটা শাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, শোবার সময় সব মেয়েই এরকম বের করে দেয়, নিচের বোতাম খোলা, ওর পেটের কাছে একটা ফর্সা ত্রিকোণ আমার চোখে পড়লো এবং যে-হাত দিয়ে ও গেলাসটা রাখলো, সেই হাতের নিচে ভিজে দাগ। শীতকালেও অনেক মেয়ের বগল ঘামে ভিজে থাকে— এবং সাধারণত তারা কিরকমের মেয়ে, আমি জানি। আপনি ঘুমোবেন না ? গায়ত্রী জিজ্ঞেস করে।

— না, দুপুরে আমার ঘুম আসে না।

আমারও। ইয়ে কি রকম ঘুমোচ্ছে। খানিকটা হাসলো, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, রুমালে একটা ফুল তুলছি, যাই। যাবার সময় আমি ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবো জেনেও ও বেশ সপ্রতিভভাবে চলে গেল।

না, আমার কিছুই ভালো লাগছিল না, আমি দুপুরবেলা ঘুমোতে চাই না, কখনো ঘুমোই নি। অথচ এখন কী করবো। বই পড়তে গেলে বমি আসে। গায়ত্রীকে আবার ডাকবো কিংবা ওর ঘরে গিয়ে গল্প করবো ? কেন জানি না, আমার সমস্ত শরীরে যেন শিকল নাড়াচাড়ার মতো ঝন্ঝন্ করে শব্দ হচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। এদিকে আর বাড়ি নেই, অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, মাঝে মাঝে সবুজ নীল ক্ষেত, বেশ দূরে একটা নৈবেদ্য'র

মতো পাহাড়। এসব কিছুই বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখবার নয়, মাঠের ডানদিকের কোণে একটা অতিকায় শিশুগাছ, ওখানে শ্মশান। অনিমেষের অফিস এখান থেকে দেখা যায় না, ও অবশ্য আজ গেছে তেঘড়িয়ায়, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে, সেখানে হাজিরা দিতে। মফস্বলের সরকারি চাকরি এইজন্যই জঘন্য। ছুটিতে থাকলেও নিষ্কৃতি নেই, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মন্ত্রী এলেই ছুটতে হবে। সকালে বেশ তাস জমে উঠেছিল, এমন সময় আর্দালি এসে ম্যাজিস্ট্রেটের শুভাগমনের কথা জানাতেই অনিমেষের মুখ শুকিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা দেবার জন্য ওকে ছুটির দিনেও দাড়ি কামাতে ও জুতো পালিশ করতে হলো!

আমি চুপ করে বসেছিলাম। পৃথিবীতে কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাটিকাটা কামিনরা এখন বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। খবরের কাগজটা আমার হাত থেকে খসে যেতেই আমি তাতে একটা লাথি মারলাম। আমার চোখ খরখর করছে, আমার কিছুই করার নেই।

কাল সন্ধেবেলা আমরা যখন বাইরে টেবিল পেতে বসে চা খাচ্ছিলাম—সে-সময় দু'জন ভদ্রলোক অনিমেষকে ডাকতে এসেছিল। ওদের দেখে যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়লো অনিমেষ, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, আপনারাই যান, আমার অসুবিধে আছে, আমরা আর যাবো না।

একটুক্ষণ কথাবার্তায় বোঝা গেল, আজ ওদের নেমন্তন্ন ছিল, কোনো কলিগের ছেলের অন্নপ্রাশন, আমরা এসেছি বলে অনিমেষ বিব্রত বোধ করছে। অথচ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুঝতে পারলুম। আমার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা আছে, লোকের সঙ্গে ভালো পরিচিত না হলে বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসিত না হলে কোনো কথা বলতে পারি না। পরীক্ষিৎ ওসব মানে না, চেঁচিয়ে উঠলো, যা না, ঘুরে আয়, আমরা ততোক্ষণ খানিকটা বেড়িয়ে আসি। একটু ওষুধ খেতে হবে— মাথা ধরে যাচ্ছে।

— যাঃ, তোরা একা একা থাকবি।

একাই একশো, পরীক্ষিৎ বলে, ওষুধ কোথায় পাওয়া যায় রে ? একটু চোখ নিচু করে ইঙ্গিত করলো।

স্টেশনের কাছে, এগিয়ে এসে বললো অনিমেষ, এদিকে পাওয়া যায়, দিশি। কথাবার্তার মধ্যে গায়ত্রী উঠে ঘরে চলে গিয়েছিল। অনিমেষও ভেতরে গেল। একটু বাদে গায়ত্রীর তীক্ষ্ণ, অশোভন গলা শুনতে পেলাম, না, আমি যাবো না, তুমি একা যাও। লোক দুটি আমাদের সামনে চেয়ারে বসেছিল। আলাপ করার চেষ্টায় মফস্বলের লোকদের একমাত্র প্রশ্ন, দাদারা কোথায় থেকে, ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করেছিল।

ফরাক্কাবাদ! বলে পরীক্ষিৎ এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে বসলো যে, আর ওরা উৎসাহ পায় নি। গায়ত্রীর গলা শুনে ওরা হ্যা-হ্যা করে খানিকটা হেসে উঠলো, বৌদি ক্ষেপেছে মাইরি, চল্ দেখি। ওরা দু'জনে উঠে ঘরে গেল এবং খানিকক্ষণ চাষাড়ে রসিকতা, হি হি হো, মাইরি যা মশা পড়েছে এবার, ফাসক্লাস পর্দার রঙটা তো, কবে আপনার বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খাবো বৌদি, হ্যা-হ্যা-হ্যা, চলুন দাদা রাত হয়ে যাচ্ছে—ইত্যাদির খানিকটা পর গায়ত্রী এবং অনিমেষ সেজে বেরিয়ে আসে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো, অনিমেষ বললো, গায়ত্রীর মুখ নিচু করা, দাদাদের ফেলে রেখে গেলুম হ্যা-হ্যা---লোক দুটির একজন বা সমস্বরে বলে চলে গেল। আমি এতোক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপ করে ওদের দেখছিলুম। বেশ সরল লোক দুটি, ওদের আমার ভালো লাগাই উচিত, ঐরকম সরল, শুয়োরের মতো নির্ভীক জীবনই তো আমি এতোকাল চেয়ে আসছি।

ওরা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এলো আধঘণ্টার মধ্যে। চুপচাপ

দু'জনে আধাবোতল শেষ করার পর ও প্রথম কথা বললো, কেমন লাগছে রে এদের দু'জনকে ?

— ভালোই। বেশতো সুখেই আছে অনিমেষ বৌকে নিয়ে ?

— হুঁ, সুখে আছে, পরীক্ষিত বিড়বিড় করলো। কী করে বুঝলি তুই সুখে আছে ?

— কেন, দেখাই তো যাচ্ছে, ছোট্ট সুখের সংসার।

— সত্যি, অনিমেষটাকে আর চেনাই যায় না। যেন বাঘের গায়ে কেউ সাদা চুনকাম করেছে। বুঝলি, বাঘের গায়ে! হালুম করার বদলে এখন মিউমিউ করে।

আমি পরীক্ষিতের এই খেলো উপমাটাকে পাত্তা না দিয়ে বললুম, দেখা যাচ্ছে বিয়ে করার পর অনিমেষই বেশ সুখে আছে।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ চটে গেল। কেন সুখে থাকবে ? কি অধিকার আছে ওর সুখে থাকার ?

আমি বললুম, বা, পৃথিবীসুদ্ধু লোককে তুই অসুখী থাকতে বলবি নাকি ?

আমার ঘেন্না করে, পরীক্ষিৎ বললো, রাত্তিরবেলা যখন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে কিরকম তেল-তেল মুখ হয় দেখেছিস ? এতো যে বন্ধুত্ব ছিল, বিয়ের আগে যে নদীর পাড়ে বসে এতো কথা হলো, সব হাওয়া ? কাল বললুম, চারজনে এক সঙ্গে এক ঘরে শোবো— হেসে উড়িয়ে দিল। কি হাসি দু'জনের! আমি কি ভাঁড় নাকি যে হাসির কথা বলে মজা দেবো— মজা তো বৌ যথেষ্ট দিচ্ছে। রাত্তিরবেলা বউগুলোর স্বভাব দেখেছিস— যেন ঘুরঘুরে নেউল, বাথরুমে গা ধোয়, মুখে আরাম করে স্নো, বিছানা পেতে (অশ্লীল), কথাবার্তা বলছে অথচ (ছাপার অযোগ্য)।

— ওকথা থাক পরীক্ষিৎ, অন্য কথা বল্।

— না এসব দেখলে আমার বমি আসে। অনিমেষটা আউট হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে ইলেকট্রিক নেই কেন ? টিমটিমে টেমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আই ওয়ান্ট গ্লোরিয়াস সানসাইন অলসো এট নাইট। আয়, ঐ খড়ের গাদাটায় হ্যারিকেনটা ভেঙে উল্টে দিই। খানিকক্ষণ বেশ আলো হবে। বলার সঙ্গে সঙ্গে ও হ্যারিকেনটা তুলে নিল। তোর কি আধবোতলে নেশা হলো, ছিঃ! আমি বললুম। পরীক্ষিৎ ওর ছোট ছোট করমচার মতো চোখ দুটো সোজা তুলে যেন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে, তুই কি বলছিস অবিনাশ, আমার দোষ হলো? তোর খারাপ লাগছে না ? এতো কথা হলো, এতো প্রতিজ্ঞা, আর একজন বিয়ে করে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।

— তুই-ও একদিন ছেড়ে দিবি।

বিয়ে করে ? পরীক্ষিৎ ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করে।

— অথবা ক্লান্ত হয়ে। সকলেই তাই দেয়। বয়েস উনত্রিশ হলো খেয়াল আছে ?

পরীক্ষিৎ নেশার ঝোঁকে আরও মুখ খারাপ করতে থাকে। আমার একটু একটু হাসি পায়, আমি চুপ করে থাকি। পরীক্ষিতের কি বয়েস বাড়ে না ? এক সময় কি সব ছেলেমানুষি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আমরা, কেউ বিয়ে করবো না, সারাদিনে মেয়েদের জন্য আধ ঘণ্টার বেশি ব্যয় করবো না, শিল্পের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে—এইসব। এসব কেউ বেশিদিন মনে রাখে ? এসব নিয়ে কেউ পরে সিরিয়াসলি অভিযোগ জানায় ? পরীক্ষিৎটা পাগল, অনিমেষ বিয়ে করে সুখে আছে তাতে দোষের কি ? বেশ তো ভালোই আছে। আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললুম, ও পাশে কি ঝাউবন আছে নাকি রে ? অমন শোঁ-শোঁ শব্দ কিসের ?

— পৃথিবীর। ঝাউ কি সুপুরী কি জামরুল, ওসব আমি চিনি না। সবই পৃথিবী। আর পৃথিবী ঠিকঠাক আছে। গায়ত্রী মেয়েটা কেমন ?

— ভালোই তো, বেশ ছিমছাম। হাসির সময় ঠোঁট অল্প ফাঁক করে, সুতরাং অভিমানী।

— কি করে জানলি ? মেয়েদের অভিমান কি হাসিতে বোঝা যায় ? ও জন্যে তো ওদের

শরীর জানতে হয়।

এই কথায় আমি একটু কেঁপে উঠেছিলাম। আমার আঁতে ঘা লাগে— পরীক্ষিৎ আমার কথাটাই ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে এই প্রসঙ্গে। গায়ত্রীর সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেশ সহজভাবেই কথাবার্তা বলে। আমি পারি না।

কোনোরকম শারীরিক বন্ধুত্ব না হলে অথবা করার চেষ্টা করে প্রত্যাখ্যাত না হলে আমার সঙ্গে কোনো মেয়ের কোনোরকম অন্তরঙ্গতা হয় না। বেশিরভাগ মেয়ের কাছেই আমি জঘন্য একটু অভদ্র বা লাজুক বলে পরিচিত। পরীক্ষিৎ আমার ব্যাপারটা জানে বলেই খোঁচা দিয়েছে। আমি ওকে চিনি। ওর হাড়ে-হাড়ে গণ্ডগোল। ও আমাকে কি বলতে চায় তা আমি অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

... তারও আগের দিন রাত্রে খাওয়ার পর আমরা তিনজন বসে গল্প করছিলুম, গায়ত্রী আমাদের সঙ্গে বসে নি, খুটখাট করে সংসারের কাজ সারলো, দু'ঘরের বিছানা পাতলো পরিপাটি করে, তারপর সব কাজ শেষ করেও ও আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এলো না, নিজের শোবার ঘরে চুপ করে বসে রুমালে ফুল তুলতে লাগলো— ওর সেই একা বসে থাকা এক প্রবল প্রতিবাদের মতো, যেন প্রতি-মিনিট ও আশা করছে আমরা কতক্ষণে আড্ডা শেষ করবো এবং অনিমেষ শুতে যাবে— আমার তাই মনে হয়েছিল, সুতরাং আমি বলেছিলাম, চল্ এবার উঠে পড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে ? সেকি, তোর ?— পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠলো, মাঝে-মাঝে সত্যি অবাক করে দিস তুই— ঘুম পাচ্ছে অবিনাশ মিত্তিরের ? রাত এগারোটায়, যে আসলে একটা রাতের ঘুঘু! তোর কি ফর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ? বৌ কোথায় গেল— পরীক্ষিৎ বিরক্তি মিশিয়ে উঁচু গলায় বললো, যে গলায় পরীক্ষিৎ গান গায়— রাগ প্রকাশের সময়ও ওর গলা সেইরকম দীর্ঘ সুরেলা থাকে— অনিমেষ, বৌকে বল, একঘরে বিছানা করতে, চারজনে একঘরে শুয়ে সারা রাত গল্প করবো!

একথা বলার সময় পরীক্ষিতের গলায় কোনো দ্বিধা ছিল না। বন্ধুত্বের চূড়ান্ত সঙ্ঘে ওর বিশ্বাস, বন্ধুদের সঙ্গে মারাত্মক সব পরীক্ষায় জীবন কাটাতে হবে এবং কখনো কোনো ক্লান্ত মুহূর্তে যার-যার ব্যক্তিগত শিল্প সৃষ্টি! পরীক্ষিৎ একথা জোর করে বলে। শিল্প-শিল্প করে ও গেল, শিল্প ওর মাথার ভূত। অনিমেষ ওর প্রস্তাবে বিষম উৎসাহিত হয়ে গায়ত্রীকে ডেকেছিল। গায়ত্রী এলো বারান্দায়। চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে ...

পরীক্ষিৎ শেষ গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে বসেছিল, আমি অনিমেষকে বড় ভালবাসি। ওরকম কবি হয় না। ওকে ডুবিয়ে দিতে চাই। ওরকম সুখী সেজে থাকলে ওর দ্বারা আর কিছু কাজ হবে না জীবনে, আমাকে একটু তোর গ্লাস থেকে ঢেলে দে।

আমি ওকে একটু দিয়ে আমার গ্লাস শেষ করে দিয়েছিলাম।

অনিমেষের সুখের তুই বারোটা বাজিয়ে দে, অবিনাশ। তুই কী করছিস, যাঃ তুই একটা নীরেট— ও একটা মেয়েমানুষ পেয়ে সব ভুলে যাবে ? আমি বললুম, সব ভুলে গেছে কোথায়? অনিমেষ তো আগের মতোই আমাদের সঙ্গে মিশে আড্ডা দিচ্ছে।

কোনো কারণ নেই, তবু পরীক্ষিৎ আমার একথা শুনে একটু মুচকি হাসি হাসলো। রহস্যময় হাসি। বললো, তুই কি ভাবছিস, আমি বিয়ে করার বিরুদ্ধে কিছু বলছি ? করুক না বিয়ে যার ইচ্ছে। কিন্তু অনিমেষ ওর বউয়ের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন দেখলে মনে হয় যেন ও আলাদা

একটা জগতে আছে। এই জগৎটা ভেঙে দিতে হবে। একটা মেয়েমানুষ মানেই কি আলাদা জগৎ ? কি ভয়ানক মেয়েগুলো, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে আপত্তি করলো কেন— যেহেতু এক বছরেই গোটা দুয়েক ডিম পাড়ে নি। তুই ওর বিষ দাঁত ভেঙে দে না।

আমি বললুম, আমি কেন ভাঙতে যাবো ? তাছাড়া, আমার কী-ই বা ক্ষমতা আছে ? পরীক্ষিৎ আমার কথা শুনলো না, নিজের মনেই বলে চললো, কী হচ্ছে কাল থেকে, খালি খাওয়া আর গল্প, কিসব গল্প, ওমুক লোকটা, ওর মেজো শালী, সেদিন হাটে পুলিশ এসে... এসব কি ? মনে আছে গতবার আমরা সকলে মিলে কি নিয়ে যেন মারামারি করেছিলাম ? এই দ্যাখ, আমার থুত্‌নিতে একটা কাটা দাগ আছে— তুই ঘুসি মেরেছিলি। সেসব দিন—।

আমি বললুম, পরীক্ষিৎ, তুই তোর বিশ্বাস বা ইচ্ছে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাস কেন ? এটা তোর একটা রোগ। আমার আর অতটা ভালো লাগে না। কোনো মানুষকেই আঘাত করার ইচ্ছে নেই আমার। সকলে সকলের ইচ্ছেমতো বাঁচুক। আমিও সরল, স্বাভাবিক জীবন চাই, অনেকদিন বাঁচতে চাই। অনিমেষের সংসার দেখে আমার সেইদিক দিয়ে লোভ হচ্ছে।

সে কি রে ? এ যে দেখছি বাংলা সাহিত্যে যাকে বলে 'জীবন–প্রেমিক'। যাঃ, আর হাসির কথা বলিস নি। তোর একটা অকারণে হিউমার করার স্বভাব আছে। অনিমেষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঢুকিয়ে দে। ও ভয় পেয়ে যাক, সন্দেহ করুক নিজেকে। না হলে ও আর কোনোদিন লিখতে পারবে না। ও না লিখলে আমারও আর ইচ্ছে করে না। বাংলা সাহিত্যে আমার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

— কেন, বিমলেন্দু ?

— ঐ মোটা হুঁৎকোটা ? ও তো পাবলিকের হাততালি চায়। তাই পাবে। ওর কথা ছাড়।

— তাহলে বিশ্বদেব ?

— মনীষা বিশ্বদেব বল্, এরপর তুই বুদ্ধি শেখরের নাম বলবি ? তুই আমাকে এত ছোট ভাবিস্।

— তুই কিন্তু বিমলেন্দুর সামনে মুখ নিচু করে থাকিস্। ওকে বলিস্ গ্রেট। আড়ালে নিন্দে করা তোর স্বভাব। চল্, বাইরে ঘুরে আসি। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ভালো লাগবে। তুই ঘোলাটে জল খেতে বড় ভালবাসিস, পরিষ্কার জল দেখলে তোর বমি আসে, নারে ?

একটু হেসে পরীক্ষিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল— ওর পা একটু টলে যায়। আমি ওর হাতটা ধরে বাইরে এলাম। আঃ ভারি সুন্দর চাঁদের আলো দিয়েছে, পরীক্ষিৎ বললো, এই আলো খেলে নেশা হবে ?

— আগেকার কালের লোকদের হতো, যাদের মাথার মধ্যে ভালবাসা ছিল। নেশার ঘোরে উন্মাদ হয়ে যেত শেষ পর্যন্ত। ঐজন্য পাগলের ইংরেজি লুনাটিক। তোর ওসব কিছু হবে না। তুই বড্ড সেয়ানা...

আমি চুপ করে বসে আছি। সেই দুপুরবেলা। আমার কিছুই করার নেই। পরীক্ষিতের বেশ নাক ডাকে দেখছি। অমন কায়দাবাজ নাক দিয়ে একি ভালগার আওয়াজ! একথা মনে করিয়ে দিলে ওর মুখের চেহারা কী রকম হয় বিকেলবেলা দেখতে হবে। চুপ করে বসে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি। ওঘরে গায়ত্রী বসে আছে, ওর সঙ্গে অনায়াসে গিয়ে গল্প করা যায়। যায়, যদি স্বাভাবিকভাবে গিয়ে বসতে পারি। তা পারবো না, কৃত্রিমতা একেবারে ঢুকে গেছে। কোনো যুবতী মেয়ের সঙ্গে যে একা ঘরে দুপুরবেলা বসে শুধু গল্প করা যায়— এ বিশ্বাসটাই যে নেই।

প্রিমিটিভ, একেবারে প্রিমিটিভ। দু'একটা হাল্‌কা গল্প–গুজব রসিকতায় কি গায়ত্রীর সঙ্গে এখন সময় কাটানো যায় না ? কেন আমি শুধু শুধু একা বিরক্ত হয়ে বসে আছি ? কাল আমি পরীক্ষিৎকে বলেছিলাম, গায়ত্রীকে নিয়ে তুই এমনভাবে ভাবছিস কেন ? বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছি, স্বামী–স্ত্রীর ছোট্ট চমৎকার সংসার এখানে, আয়, ঠাট্টা–ইয়ার্কি, ফষ্টি–নষ্টি করি, লুকিয়ে প্রেম করার চেষ্টাও চলতে পারে, ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ লড়াই হোক— কেউ ব্যর্থ হয়ে দুঃখ পাক, কেউ সফল হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ুক, কেউ জ্বলে–পুড়ে মরুক মনে মনে— সেইটাই তো স্বাভাবিক। জীবন এই রকম। তার বদলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে–চিন্তে তুই আমাকে বলছিস ওর সঙ্গে সম্পর্ক করতে— যাতে অনিমেষ দুঃখ পায়, ওর সুখ ভেঙে যায়— আর তুই থাকবি আড়ালে। আমার ব্যক্তিগত লোভ থাক বা না থাক অনিমেষকে কষ্ট দেবার জন্য আমি একটা মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো— একি! পরীক্ষিৎ যথারীতি নিজের ভাষায় আমায় কিছু গালাগালি দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না, অনিমেষ–গায়ত্রীর সুখের সংসার ভাঙতে আমার একটুও লোভ নেই। ওরা সুখে থাক।

আমি উঠে গিয়ে গায়ত্রীর ঘরের দরজা খুলে দাঁড়ালাম।

গায়ত্রী বললো, আসুন।

খাটে পা মুড়ে বসে দু'হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে ও শেলাই করছিল, আমাকে দেখে একটুও ভঙ্গি বদলালো না। লাল শাড়ির নিচে সাদা শায়ার লেশ বেরিয়ে পড়েছে, তার নিচে পদ্মপাতার মতন গায়ত্রীর পায়ের রঙ, সেদিক থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। গায়ত্রীর রং একটু কালো, গোল ধরনের মুখ— তেমন সুন্দর নয়, ছায়া কিংবা মায়ার পাশে দাঁড়ালে গায়ত্রীকে মোটেই রূপসী বলা যাবে না। কিন্তু জলের মাছের মতন গায়ত্রীর চক্‌চকে স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যের অহংকার ওর চোখে–মুখে। দু'এক ফোঁটা ঘাম জমে গড়িয়ে এসেছে থুতনি বেয়ে— ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা, আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডিজাইন–করা ব্লাউজের হাতা টাইট হয়ে চেপে বসেছে ওর বাম বাহুতে— আমার মনে হলো একটা কুমির যেন ওর হাত কামড়ে ধরেছে— আমি সেদিক থেকেও চোখ ফিরিয়ে নিলাম। জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে ওর তৃণভূমির মতো ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়— সেখান থেকে ঠিকরে এসে লাগছে ওর চোখে— অথচ ও সরে বসে নি। ও কি জানতো, আমি এক সময় এসে ওর উদ্ভাসিত মুখ দেখবো ?

— আসুন, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসবেন না ?

কারাগারের দরজায় যখন জহ্লাদ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে কি রকম দেখায় ? আমার নিজেকে মনে হলো সেই জহ্লাদের মতন। আমার হাতে মারাত্মক অস্ত্র। আমি নিজেকে বুঝতে পারি নি, আমার শরীর অন্যরকম লাগছিল। যেন কোথায় ঢং ঢং করে পাগলা ঘন্টি বাজছিল। আমি তো এ ভেবে এ ঘরে আসি নি, সরল পদক্ষেপে এসেছিলাম দরজা পর্যন্ত। এখন আমার বলতে ইচ্ছে হলো— গায়ত্রী শেষবারের মতো ঈশ্বরের নাম করে নাও।

— দেখুন তো ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে ? ওর কণ্ঠস্বর ময়ূরের মতো কর্কশ।

আমি কাছে এসে চেয়ারে কিংবা খাটে বসবো ভাবছিলাম— গায়ত্রী একটু সরে হাত দিয়ে জায়গা দেখিয়ে বললো, বসুন না।

আমি বললুম, গায়ত্রী কেমন আছো ?

ও এক ঝলক হেসে বললো, হঠাৎ এ কথা ?

সত্যিই হঠাৎ ওকথা জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। পরশুদিন এসেছি, আজ কি আর ওকথা জিজ্ঞেস করা যায় ? কিন্তু মেয়েদের কোনো সময় চোখের দিকে তাকালেই আমার মুখ দিয়ে

এই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। এর কী উত্তর চাই তা আমি জানি না। হয়তো ওদের ভিতরের কোনো গুপ্ত খবর ওদের মুখ থেকে আমি বিষমভাবে শুনতে চাই। এরপরেই আমার বলতে ইচ্ছে হয়, কতদিন তোমাকে দেখি নি— কিন্তু একথাও বলা চলে না, কারণ গায়ত্রীর সঙ্গে আগে আমার আলাপই ছিল না, অনিমেষের বিয়ের সময়ও আমি আসি নি, পা ভেঙে বিছানায় শুয়েছিলাম। তবু, কতদিন তোমাকে দেখি নি একথা বলার ইচ্ছে আমার মধ্যে ছটফট করে।

গায়ত্রীর সঙ্গে মিনিট দশেক কি-কি বিষয়ে যেন কথা বললাম। তারপর ও উঠে বললো, দাঁড়ান, চায়ের জল চাপিয়ে আসি। খাট থেকে নামতেই আমি ওর হাত ধরলাম। খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে আমি বসেছিলাম— ওকে হাত ধরে পাশে নিয়ে এলাম। ও বললো, দেখেছেন, আমি কতটা লম্বা, প্রায় আপনার সমান।

আমি ওর বুকে মুখটা গুঁজে দিলাম। গায়ত্রী বললো, একি একি! কিন্তু সরে গেল না। আমি দুই হাতে ওর কোমর শক্ত করে জড়িয়ে ওর দুই বুকের মাঝখানের সমতলভূমিতে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম, একটু একটু করে বুঝতে পারলাম, ওর বুকে তাপ আসছে, ওর শরীর আকন্দ ফুলের আঠার মতো আমার চোখে-মুখে লেগে যাচ্ছে, ও সরে দাঁড়াচ্ছে না। আমি মনে মনে কাতর অনুরোধ করলাম, গায়ত্রী সরে যাও,— মনে মনে বলেছিলাম, — গায়ত্রী আমাকে একটা থাপ্পড় মারো, ডেকে জাগাও পরীক্ষিৎকে, আমাকে বলো নরকের কুকুর, গায়ত্রী, প্রতিবেশী দিয়ে আমাকে মার খাওয়াও, আমি তোমার প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো, তোমাকে খুব ভালবাসবো, সরে যাও গায়ত্রী।

খাটের উপর জায়গা হচ্ছিল না বলে আমি লাথি মেরে পাশ-বালিশটা ফেলে দিলাম মাটিতে। গায়ত্রী সারা শরীর দিয়ে হাসছে। একবার বললো: ও, আপনার মনে এই ছিল। থুতনির এক বিঘৎ নিচে কামড়ে গভীর লাল করে দিতে ও নিঃশব্দে আর্তনাদ করলো। আমি অশ্লীলভাবে হেসে বললুম, তোমার শরীরে তো জোর কম নয়। ও বললো, আপনিও বুঝি কবিতা লেখেন ?

— না, তোমার মুখের ভেতরটা দেখি।

— তবে বুঝি গল্প ?

— দু, একটা। তোমার লাগছে ?

— না আ, কি রকম গল্প পড়লে বোঝা যায় ? নাকি ওদের মতো ?

— মাথা খারাপ!

— কি মাথা খারাপ ? বোঝা যায় না!

— তুমি ওসব পড়তে যাবে কেন ? ওসব পড়ার কি দরকার। মুখটা ফেরাও।

— সবাই বলে অনিমেষ একজন বড় কবি। আমি পড়ে কিছুই বুঝতে পারি না। আমাকে কপি করতে দেয় মাঝে মাঝে। আমি একবর্ণ বুঝি না। অবশ্য বলি, খুব চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে শেষের লাইনটা। ও যা খুশি হয়! গায়ত্রী গোপন আনন্দে হাসলো। তারপর বললো, বুঝতে পারি না কেন ? লেখার দোষ না আমার মাথার দোষ।

— সব তোমার দোষ। তুমি কেন এত সুন্দরী হয়েছো ?

— আমি আবার সুন্দরী! আমার তো নাক ছোট, চোখের রঙ কটা।

সৌন্দর্য বুঝি নাকে-চোখে থাকে ? সৌন্দর্য তো এই জায়গায়। আমি হাত দিয়ে ওর সৌন্দর্য-স্থানগুলি দেখিয়ে দিলুম ও চুমু খেলুম। ও বললো, আপনি একটি আস্ত রাক্ষস। আঃ, সত্যি লাগছে, দাগ হয়ে যাবে যে!

আমি বললাম, গায়ত্রী আমার আর বাঁচার পথ রইলো না।

— কেন ?

— এই যে আমি তোমার মধ্যে ডুবে গেলাম। আমি এর আগে কোনো মেয়েকে ছুঁই নি, কিন্তু পরশুদিন থেকেই তোমাকে দেখে—

গায়ত্রী পোশাক ঠিক করে উঠে বসলো! তাকাল আমার দিকে একদৃষ্টে। আমার মুখে সম্পূর্ণ সরলতা ছিল— মঞ্চে যে সরলতা দেখা যায়, যা ভয়ংকর বিশ্বাসজনক।

ও, আমারই বুঝি দোষ হলো। গায়ত্রীর গলায় একটু ঝাঁঝ।

সব তোমার দোষ, কেন দুপুরে এ ঘরে একা বসেছিলে? একথা বলার সময় গোপনে পিছনে-পিছনে হাত দিয়ে ওর ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিয়ে দিলাম। ও এঁকে-বেঁকে হেসে উঠে আমার বুকে কিল মারতে লাগলো। ওর তীব্র ঘনিষ্ঠতা দেখে হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো, আমার নাম কি অবিনাশ না অনিমেষ? এক বছর আগে আমিই কি ওকে বিয়ে করেছিলাম?

আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি শুয়ে রইলাম। আমি ওর একটা হাত তুলে ঘামের গন্ধ নিতে লাগলুম। এই গন্ধে বেশ নেশা আসে আমার। পরে ঘুম পায়। এই ঘামের গন্ধই মেয়েদের শরীরের গন্ধ। অনিমেষ তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

— হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালবাসে। ওর জন্য আমার মায়া হয়। জানেন, আমি খুব সুখী হয়েছি। আমি তো সব পেয়েছি। এমন সুন্দর স্বামী, সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ইচ্ছেমতো দিন কাটাতে পারি। অথচ মাঝে-মাঝে তবু আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে কেন বলুন তো?

আমি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললাম, ওসব গণ্ডগোলের প্রশ্ন আমাকে করো না।

এই সময় হঠাৎ আমার তাপসের কথা মনে পড়ে। তাপস আমাদের সঙ্গে আসে নি, পরে আসবে বলেছে, যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে। তাপসের স্বভাবই হলো পরে আসা। পরীক্ষিৎ নয়, তাপসই আমার সবচেয়ে সর্বনাশ করেছে! আমার কানের কাছে মন্ত্র দিয়েছে স্ত্রীলোক মাত্রই সুলভ, ওরা ভালবাসা চায় না, ওরা গোপনতা চায়। ওদের জন্য ভালবাসা খরচ করার দরকার নেই। ওরা চায় গোপনে অত্যাচারিত হতে। আমার মনে পড়লো, গায়ত্রীকে একবারও আমি বলি নি, ভালবাসি, এমনকি অভিনয় করেও না, গায়ত্রীও শুনতে চাইলো না। আমি প্রথম ওর ব্লাউজ খুলে স্তনের বোঁটাতে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলেছিলাম, কী সুন্দর তোমার বুক! তাতেই ও খুশিচোখে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু আমি তো বলি নি, কী সুন্দর তুমি! আমি ওর সম্পূর্ণ বসন সরিয়ে বলেছিলুম, কী সুন্দর তোমার উরু, বলি নি, কী সুন্দর তুমি। সে কথা ও শুনতে ও চায় নি। অর্থাৎ ভালবাসা কথাটা শুনতে চায় নি। মাত্র তিনদিনের চেনা এর মধ্যে আবার ভালবাসা! ধুৎ!

কি দুঃসাহস গায়ত্রীর, ওঘরে পরীক্ষিৎ শুয়ে— মাঝখানের দরজাটা ভেজানো— এমনকি বন্ধ না পর্যন্ত। প্রথম যখন ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম, তখনও, ও রেগে উঠলে, অনায়াসে আমি ঠাট্টা বলে চালিয়ে দিতে পারতুম। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এসব ঠাট্টা কি আর চলে না! কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা যেন একটা বিশাল তালাভাঙা দরজার মতো ছিল, একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আসলে এর মধ্যে আমার কোনো লোভ, কোনো পরীক্ষা করার ইচ্ছে, অনিমেষকে যন্ত্রণা দেবার চেষ্টা, কিছুই ছিল না— শুধু দুপুরবেলার ঘুমহীনতা, শুধু এইটুকুই, এইজন্যই এসেছিলাম এঘরে। কিছুদিন ধরে সবসময়ে আমি ছটফট করছি, কোনোরকম ভোগে আসক্তি নেই, মেয়েদের দেখলে তেমন একটা ইচ্ছে সত্যই জাগতো না, গায়ত্রীও তেমন কিছু রূপসী নয়— হঠাৎ আনমনে চলে এসেছি এঘরে, কথা বলতে-বলতে প্রায় অজান্তেই ধরেছি ওর হাত, স্বাভাবিকভাবেই একটা হাত চলে গেছে ওর কোমরে— এবং তারপর বুকে মুখ না গোঁজার কোনোই মানে হয় না। আর বুকে মুখ গোঁজার পর, কে না চায় পাশে টেনে শোয়াতে! ... অথচ যেন কি বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল— লোকে শুনলে তাই ভাববে, এরই জন্য খুনোখুনি হয়, আত্মহত্যা— না শুধু এইটুকুই

না বোধহয়— যারা খুনোখুনি বা আত্মহত্যা করে তারা মাত্র এর জন্যই করে না— আর একটা কিছু জড়িত থাকে— ভালবাসা, সে সম্পর্কে আমার তো কোনোই দাবি নেই, বোধ নেই, বোধ নেই বলা ঠিক হলো না, আছে ছিল— আজ আর মনে পড়ে না। অনিমেষ, তোমার ভালবাসায় আমি কোনো ভাগ বসাই নি, তোমার স্ত্রীর ওপর কোনো লোভ করি নি, সম্পূর্ণ নির্লোভ আমার এই, আজকের দুপুরের একটা ডুব, কোথাও কোনো মলিনতা নেই, এক নদীতে কেউ দু'বার ডুব দেয় না। কী ক্ষতি হয় এতে ?

হঠাৎ বিষম ভয় পেয়ে আমি বিছানায় উঠে বসলুম; ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে মারাত্মক অজগরের মতো একটা নীল রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ক্রমশ স্ফীত হতে-হতে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়ার রেখাটা এসে আমাকে ছুঁয়ে কেটে গেল। এর মানে পরীক্ষিৎ জেগে আছে, আর শেষ পর্যন্ত আমি পরীক্ষিতের প্যাঁচে পড়লুম। ও এখন আমাকে আর অনিমেষকে নিয়ে ভয়ঙ্কর খেলা খেলবে, আমাকে সুস্থ হতে দেবে না, আমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেবে না। ওর এই নেশা আমি জানি। তাড়াতাড়ি আমি গায়ত্রীর মুখ এদিকে ফিরিয়ে দিলাম যাতে নীল ধোঁয়া ও দেখতে না পায়।

— এখন চা খাবেন ? ফিসফিস করে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করলো। চলুন না, আমি রান্নাঘরে গিয়ে তৈরি করবো, আপনি পাশে বসবেন।

— অনিমেষ বুঝি রোজ বসে ?

— না, ও তখন কবিতা লেখে। এই বলে গায়ত্রী নিয়ন আলোর মতো কুৎসিত রঙে হাসলো। তারপর বললো, কলকাতায় আপনাদের বাড়ি যাবো।

— আমি তো মেসে থাকি, সেখানে মেয়েরা থাকতে পারে না।

— তবে কোথায় থাকবো ? যাবো না কলকাতায় ? আর দেখা হবে না।

— বিমলেন্দুদের বাড়িতে থাকবে। ওদের বাড়িতে অনেক জায়গা আছে। বিমলেন্দু ছেলেও খুব ভালো।

— আমি তো চিনি। বিয়ের সময় এসেছিল। বড্ড গম্ভীর।

ওর চোখে-মুখে আমি লোভ দেখতে পাচ্ছি। আহা, অনিমেষের জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হলো। এইসব মেয়েরা স্ত্রী কাঁকড়া বিছের মতো, তাদের স্বামীদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে। 'আমার বুকের মধ্যে তবু হু-হু করে কেন বলুন তো ?' গায়ত্রী একটু আগে আমাকে যে জিজ্ঞেস করেছিল তার উত্তর আমি জানি। পরীক্ষিৎ কিংবা শেখর হলে অনেক বড়-বড় কথা বলতো, নিঃসঙ্গতা, উদাসীনতা এইসব। আসলে মেয়েটা একটু বেশি চায়। অল্পে খুশি হতে চায় না। অনিমেষের মতো সূক্ষ্ম ধরনের ছেলেকে বিয়ে করে ওর আশ মিটছে না, চায় একটা ধারাবাহিক নির্লজ্জ অনুষ্ঠান। অনিমেষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশিদিনের নয়, ও যে ঠিক কী রকম ছেলে আমি জানি না। বিমলেন্দু আর তাপসের বন্ধু হিসেবেই পরিচয় হয়েছিল। তবে ওকে বড় ভালো লাগে আমার, যেন সব সময় তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এমন নিখুঁত। অনিমেষের কোনো ক্ষতি করতে চাই না আমি, আমি সত্যিই অনিমেষকে কোনো দুঃখ দিতে চাই নি। এতে কি আসে যায় অনিমেষের ? এ তো হঠাৎ একটা দুপুরের দুর্ঘটনা। দুপুরবেলা কোনো কাজ ছিল না, ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল—। যাই হোক, অনিমেষ, আমি মনে-মনে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হলো তো ?

— আমার তো কিছুরই অভাব নেই, তবু মাঝে-মাঝে বিষম মন খারাপ লাগে কেন বলুন তো ?

— তোমার মন বলে যে কিছু আছে এই প্রথম জানলুম।— কথাটা বলেই বুঝলাম, খুবই বেফাঁস হয়ে গেছে, তবুও গায়ত্রীর ওপর আমার বিষম ঘৃণা এসে গেল। আমি আদর করার

ভঙ্গিতে ওকে কামড়ে দিলাম। গায়ত্রী আমার কথায় ধড়মড় করে উঠে বসেছিল— কিন্তু আমার মুখে সেই মঞ্চাভিনেতার সরল হাসি দেখে তৎক্ষণাৎ ভুলে গিয়ে নিজেও হাসলো। 'আমাকে বুঝি খুব খারাপ ভাবছেন ?

— তোমাকে খারাপ ভাবতুম যদি না আজ দুপুরে তোমার কাছে আসতুম। তোমাকে মনে হতো নিছক মফস্বলের বউ। তুমি একটি রত্ন। তুমি বিয়ের আগে ক'টা প্রেম করেছ ?

যাঃ! ও হাসলো আবার। আমি মানুষ হয়েছি কাশীতে, ওখানে মেয়েই বেশি, ছেলে কোথায়?

— তবু ?

— সে কিছু না। বলার মতো কিছু না।

আমি চোখ বুঁজলুম। একটু একটু ঘুম পাচ্ছে যেন।

খানিকটা পর চায়ের কাপ নিয়ে এসে আমার থুত্নিতে একটা টোকা মেরে বললো, 'উঠুন, এবার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, লজ্জা নেই আপনার ! বন্ধু দেখলে কি ভাববে— এঘরে এসে খাটে ঘুমোচ্ছেন !

পরীক্ষিৎ ? আমি বললুম, কে ওকে গ্রাহ্য করে, ও আবার মানুষ নাকি ?

এরই মধ্যে গায়ত্রী কখন স্নান করে নিয়েছে এবং আবার শুদ্ধ পবিত্র দেখাচ্ছে ওকে। আমার মধ্যে আবার আলোড়ন হলো, রূপ দেখেই তাকে নষ্ট করার পুরোনো ইচ্ছে জেগে উঠলো, হাতও বাড়িয়েছিলাম কিন্তু হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনলুম হাত— তুড়ি মারার ভঙ্গিতে। ধীরে-সুস্থে উঠে পাশের ঘরের ইজি-চেয়ারে বসলাম। গায়ত্রীও বোধহয় আশা করেছিল আমি যাবার সময় ওকে একবার চুমু খাবো।

গায়ত্রী পরীক্ষিৎকে ডাকতে লাগলো। পরীক্ষিৎ ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। বিষম ডাকাডাকিতে ওঠে না। আমি ওকে একটা লাথি মারতেই আস্তে আস্তে চোখ খুললো, তারপর ঠোঁট ফাঁক করলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, ক'টা বাজে ?

চা। নিন, উঠে মুখ ধুয়ে নিন। গায়ত্রী খুব মিষ্টি করে বললো ওকে।

অনিমেষ এলো সন্ধের পর। খুব লজ্জিত মুখ। গলার টাই খুলতে খুলতে বললো, ইস্ তোদের খুব কষ্ট দিয়েছি। এমন চাকরি, ছুটি নিলেও নিষ্কৃতি নেই ! কী করলি সারা দুপুর। পরীক্ষিৎ বিরক্ত মুখে বললো, সারা দুপুর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোলুম শুধু। বিশ্রী ঘুম। অবিনাশ বোধহয় লিখছিল না কি।

— না, আমি লিখি-টিখি নি।

আসবার সময় একটা জিনিস দেখে মনটা বড় ভালো লাগছে। অনিমেষ বললো অন্যমনস্ক গলায়, শ্মশানের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি শ্মশান ধুচ্ছে। সব চিতাগুলো নেভানো, পরিষ্কার, কোনো লোকজন নেই। ডোমগুলো একটা সদ্য শেষ হওয়া চিতা জল ঢেলে-ঢেলে ধুচ্ছে। আমি খানিকটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনে হলো, পৃথিবী থেকে যেন সব চিতা ওরা ধুয়ে ফেলছে। কোথাও আর কোনো মৃত্যু নেই।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। যাক, অনিমেষের মন এখন কবিত্বে ডুবে আছে। আমাদের দুপুর কাটানো নিয়ে ও আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না।

বাইরে বসে চা খেতে-খেতে খানিকক্ষণ আড্ডার পর পরীক্ষিৎ হঠাৎ অনিমেষকে একটু আড়ালে ডেকে বললো, শোন্—

আমি সাধারণত কেউ আড়ালে গিয়ে কথা বললে সেখানে যাই না, কান পাতি না— কিন্তু এখন আমি কিছুতে অনিমেষ আর পরীক্ষিৎকে একসঙ্গে থাকতে দিতে চাই না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিরীহ মুখে বললুম, কি বলছিস রে ?

রাত্তিরের দিকে একটু খেলে হতো না ? পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করলো।

কিন্তু গায়ত্রীর সামনে, অনিমেষ বিব্রত মুখে বললো, কোনোদিন তো খাই নি। তুই যদি বলিস—

কোনোদিন খাস নি, আজ থেকে শুরু কর! পরীক্ষিৎ ওকে খোঁচা মারে। আমি বুঝতে পারলুম অনিমেষ সত্যিই চায় না, বললুম, তার চেয়ে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে বসে—

নদীর ধারে চমৎকার ঘাট বাঁধানো। দূরে মার্বেল পাহাড় দেখা যায়। বাকি অন্ধকার। একেবারে শেষ সিঁড়িতে একজন সাধু বসে আছে অনেকক্ষণ। দূরে শ্মশান। অনিমেষের ধারণা সত্যি নয়। তিনটে চিতা একসঙ্গে জ্বলছে হু-হু করে। শীতকালের এই শেষ দিকটাতেই বেশি লোক মরে— পুরোনো রুগীরা টেকে না। তিনজনে চুপচাপ বসে— ওয়াটার-বটলের গ্লাসে জল মিশিয়ে খাচ্ছি। পরীক্ষিৎ অস্বাভাবিক চুপ। সাধারণত ও একটু নেশা হলেই বিষম বক্‌বক্ করে। আজ এমন চুপ কেন ? ওর যে-কোনো ব্যবহারই আমার কাছে সন্দেহজনক লাগছে। অনিমেষ বললো, কাল সন্ধেবেলা রূপগিরি ঝর্নায় বেড়াতে যাবো, ভারি সুন্দর জায়গাটা।

এই সময় অন্ধকারে সাইকেল রিকশার আওয়াজ হলো। আমরা সচকিত হয়ে দেখলুম তাপস। আরে বাবাঃ, বহুদিন বাঁচবি তুই, পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে বললো, সোজা এখানে এলি কী করে, গন্ধ শুঁকে ?

— না, বাড়িতে গিয়ে শুনলুম, তোরা নদীর পাড়ে এসেছিস। বাড়িতে বসতে পারতুম— কিন্তু গায়ত্রী রান্নায় ব্যস্ত, মাংস চাপিয়েছে, তাই সোজা চলে এলুম।

আমরা তিনজনে তিনটি বাতিস্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়ে মুখোমুখি বসেছিলুম এতক্ষণ, তাপস এসেই প্রথমে এক চুমুকে বোতলের বাকিটুকু শেষ করে নিজের ব্যাগ থেকে একটা পুরো বোতল বার করলো। তারপর বললো, কলকাতার কাগজ পড়িস ? এখানে বাংলা কাগজ আসে ?

— না! কেন রে ? আমরা সচকিত হয়ে উঠলুম।

— সুধীন দত্ত মারা গেছেন।

— সেকি ? এই সেদিনও তো দেখে এলুম সবিতাব্রতর বাড়িতে। রীতিমত শক্ত চেহারা। কি হয়েছিল ?

— ঠিক জানি না। বিমলেন্দু, শেখর, অম্লান, ছায়া ওরা সব গিয়েছিল ওঁর বাড়িতে। ওরা শ্মশানে যাবার সময় খাটে কাঁধও দিয়েছিল। আমি যাই নি; মৃত্যুর পর মানিকবাবুকে দেখে এমন অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম যে আর কারুর মৃত্যুতে যাই না। শুনলাম, হার্ট ফেলিওর। রাত্তিরবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরেছেন, মাঝ রাত্তিরে উঠে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে একবার কাশি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা, চুপ করে থাকার সময় আমার মন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ভুলে বারবার চলে যাচ্ছিল গায়ত্রীর সঙ্গে দুপুরের দিকে— সেখান থেকে আমার সুটকেসের চাবি হারিয়ে যাওয়ায়, তারপর পকেটের দেশলাইয়ে, হঠাৎ জলের শব্দে, শ্মশানের আগুনে— তারপর আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তে ফিরে এসে খুবই আন্তরিকভাবে তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করলুম। সবিতাব্রতর বাড়িতে তিনি আমাকে কি কি যেন বলেছিলেন, আমার মনে পড়লো না। আহা, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল তাঁকে, মারা গেলেন! যাকগে কি আর হবে— ওয়াটার বটলে একটুও জল নেই। এখন কোথায় জল পাবো ?

একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিস, সুধীন দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ এদের কারুরই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অনিমেষ বললো,— অসুখে ভুগে ভুগে মরলে এদের যেন মানাতো না।

আয়, সুধীনবাবুর নাম করে আমরা বাকি বোতলটা খাই। পরীক্ষিৎ বললো। শেষের দিকে আমাদের চারজনেরই বেশ নেশা লেগে গেল। আমি কতবার মনে করার চেষ্টা করলুম, সুটকেসের চাবিটা আমি কলকাতাতেই ফেলে এসেছি, না এখানে এসে হারালো। কিছুতেই মনে পড়ে না।

পরীক্ষিৎ ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে। সাধুবাবার সঙ্গে কি নিয়ে কিছুক্ষণ বচসা করে ফিরে এসে বললো, না, নেই!

— কি ?

— গাঁজা।

তাপস বললো, রাত্তিরটা কি করবি ?

ঘুমোবো, আমি বললাম।

— ইয়ার্কি আর কি। এতদূরে এলুম ঘুমোবার জন্য ? অনিমেষ ওর বৌকে নিয়ে একঘরে ঘুমোবে— আর আমরা তিন তিনটে মদ্দা এক ঘরে ? ধুৎ, এর কোনো মানে হয় ?

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বললো, আচ্ছা, গায়ত্রী পাশের ঘরে একা থাকুক, আর আমরা চারজনে একসঙ্গে শোবো।

কেন বাবা। তাপস ধমকে উঠলো, আমি না হয় তোমার বৌ-এর সঙ্গে আজ শুই— আর তুমি ওদের সঙ্গে শোও। একটা রাত্তিরে কিছু হবে না। আমি বিয়ে করলে তুমি একদিন শুয়ে নিও। শোধ হয়ে যাবে।

তাই নাকি। হা-হা করে পরীক্ষিৎ অট্টহাসি করে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো, হাসি থামতেই চায় না। চমৎকার বলেছিস, ওঃ, আবার হাসি। শেষে একটা থাপ্পড় মেরে ওকে থামাতে হলো।

অনিমেষ মুচকি হেসে বললো, এসব কি আর এত সহজে হয়। অন্যজনেও তো একটা মতামত আছে !

তাপস বললো, ঠিক আছে, আমি ওর মত যাচাই করে দেখছি। তোর কোনো আপত্তি নেই তো ?

এসব আলোচনা যত হয় ততোই আমার ভালো। ব্যাপারটা হালকার দিকে থাকে। আমার ঘটনা পরীক্ষিৎ বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এরা তিনজনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু— কত স্বপ্ন, পরিকল্পনা করেছি একসঙ্গে। কিন্তু আজ আমার কেমন খাপছাড়া লাগছে। মনে হচ্ছে আমি ওদের দলের বাইরে, আমার সঙ্গে আর মিলছে না। এই ক্ষেপে ওঠানোর সময়, সবরকম নিয়মহীনতা। এখনো তো পৃথিবীতে আছে কত মানুষ, আত্মবিস্মৃত, হেমন্তের অবিরল পাতার মতো। ঘুমোতে যায় ও জেগে ওঠে, দশটায় অফিস যাবে বলে সারা সকালটাই যায় সেই প্রস্তুতিতে, এবং সত্যি-সত্যিই অফিস যায় রোজ, তারা সিনেমা দেখে আনন্দ পায়, বৌকে নিয়ে রিকশায় চাপতে পারে, তাশ খেলায় দু'বাজি জিতে স্বর্গসুখ পায়। আমিও তাদের মতই বাঁচতে চাই, দু'চারটে গল্প-কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার ভার আমাকে কে দিয়েছে ? কি এমন বিষম দরকারি এই বন্ধুসঙ্গ, এই অসামাজিকতা, এই বিবেকহীন, বাসনাহীন রমণীসম্ভোগ ! না, আমি এসব আর চাই না। এখান থেকে কলকাতা গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়বো, বহুদিনের ঘুম, সারাটা জীবন ঘুমন্ত মানুষের মতো ঘুরবো-ফিরবো অজ্ঞানে, আমার শিরা-উপশিরায় সমস্ত রক্ত ভীত এবং ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এসব বখাটে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমি মোটেই মিশতে চাই না আর।

কিন্তু তার আগে যদি এবারের মতো বেঁচে যাই, পরীক্ষিৎকে সামলাতে পারি, যদি দ্বিধাহীন রেখে যেতে পারি অনিমেষের মন। হঠাৎ কেন আজ দুপুরবেলা! খুব অন্যায় কি ? আমি কিন্তু সত্যিই অনিমেষকে কোনো কষ্ট দিতে চাই না।

পরীক্ষিৎ হাই তুলে বললো, অসম্ভব ঘুমিয়েছি দুপুরে। এখনো ঘুম গায়ে লেগে আছে! তুই কি করলি রে ?

অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পরীক্ষিতের। যে যেটা চিন্তা করে গোপনে, ও ঠিক সেই প্রসঙ্গেই কথা বলবে। অন্তত আমার সঙ্গে তো অসম্ভব মেলে। বললুম, দূরের বাঁধের কাছটায় গিয়েছিলাম আদিবাসীদের দেখতে। কিন্তু আজকাল আর আদিবাসী মেয়েরা তেমন সুন্দরী নেই। পাঁচ-ছ' বছর আগেও ছত্রিশগড়ি মেয়েদের যা দেখেছি! এখন ব্লাউজ-শায়া পরে, কাচের চুড়ি পরে না, স্নান করার সময়ও সবকিছু খোলে না।

অনিমেষ বললো, আপনি বুঝি ভেবেছিলেন সবকিছু রেডি থাকবে খুলে-টুলে— আর আপনি গিয়ে চোখ ভরে দেখে আসবেন। আদিবাসীরাও সভ্য আর সজাগ হয়ে যাচ্ছে।

আমি অন্যমনস্ক গলায় বললুম, হয়তো আগেই ওরা বরং সভ্য ছিল, এখন আমাদের মতো অসভ্য হচ্ছে। বলেই মনে হলো, একথাটা বেশ বোকাবোকা হয়ে গেল, কারণ অনিমেষের কথায় বোধহয় ঠাট্টার সুর ছিল। কিন্তু আমার দুপুর-কাটানোর প্রসঙ্গের চেয়ে ছত্রিশগড়ি মেয়েদের নিয়ে সাধারণ কথাবার্তাও ভালো। তাছাড়া, আমি আরও বললুম, সাঁওতালরা... আমার মনে হয় না, হ্যাঁ, আমি ... কি কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে আদিবাসী-প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু মোক্ষম কথা হয়েছিল। কিন্তু মোক্ষম কথা বললো পরীক্ষিৎ, অবিনাশটা মেয়েছেলে ছাড়া কিছু জানে না। এই তিনদিন তুই কাটাচ্ছিস কি করে ? নাকি চালাচ্ছিস কিছু গোপনে ?

আমার চোখ দুটো হঠাৎ ঝিমিয়ে এলো। ইচ্ছে হলো ওকে খুন করি সেই মুহূর্তে। একবার ওর দিকে তাকালুম এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত উদাসীন হাসি হেসে আমি অনিমেষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, আপনি আজকাল কি লিখছেন ?

অনিমেষ বললো, না, কবিতার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি বোধহয়। কলম হাতে নিয়ে বসি, সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু ভাষা নেই।

আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তোদের পায় নি ? তাপস জিজ্ঞেস করে। গায়ত্রীকে দেখে এলুম মাংস চাপিয়েছে। চল যাই।

অনিমেষ উঠে দাঁড়ালো। পরীক্ষিতের পা টলছে। তাপস আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, মুখটা গম্ভীর করলে তোকে একদম মানায় না, অবিনাশ।

চারজনে আমরা একঘরে শুয়েছি। পাশের ঘরে গায়ত্রী। আজ খাবার পর সকলে একসঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম, গায়ত্রীও। তাপস খুব জমিয়ে দিয়েছিল। তাপস এসে পড়ায় খুব ভালো হয়েছে— পরীক্ষিতের পাগলামি আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে না। তারপর বেশ রাত হতে অনিমেষ গায়ত্রীকে বললো, আজ এ ঘরেই থাকি। তোমার একা থাকতে ভয় করবে ?

না, ভয় কেন! না না। গায়ত্রী মিষ্টি হেসে বললো।

ভয় করলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। তাপস সরল মুখে জানালো।

তা হলেই আমার বেশি ভয় করবে। সমস্বরে হাসি। গায়ত্রীর চোখের দিকে তাকাই নি।

গায়ত্রী ওঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দেবার পর আমরা চারজনে খানিকক্ষণ তাস খেললাম। আমার ভালো লাগছিল না। একবার খুব ভালো হাত পেতেই আমি তাসগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললাম,

নাঃ, এবার তোল।

প্রত্যেকেরই অল্প নেশা ছিল তখনও, সুতরাং শুয়ে শুয়ে গল্প করার নাম করে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না।

মাঝরাতে বুকের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে জেগে উঠলাম। অসম্ভব লেগেছিল, স্পষ্ট আর্তনাদ করে আমি উঠে বসলাম। আমার পাশে তাপস, তারপর অনিমেষ, তারপর পরীক্ষিৎ। আমার চোখে তখনও ঘুমঘোর কিন্তু বুকে যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে এরা তিনজনেই বহুক্ষণ ঘুমন্ত। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালতেই পরীক্ষিতের সুরেলা গলা শুনতে পেলাম, অবিনাশ কোথায় গিয়েছিলি রে ?

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারি নি ওর মতলব। বললুম, কোথাও যাই নি তো, হঠাৎ ...

এই যে দেখলুম, তুই বাইরে থেকে এলি, মিটিমিটি হাসলো পরীক্ষিৎ, আলো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সাপখোপ আছে।

এবার বুঝলুম ও কি চায়। ও সাজাতে চায়, আমি চুপিচুপি বাইরে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ গায়ত্রীর ঘরে হয়তো। পরীক্ষিতের খাড়া নাকটার দিকে একবার তাকালাম। তারপর পা-জামার দড়িটা ভালো করে বেঁধে ওর দিকে এগুতে যাবার আগেই অনিমেষ বললো, না, না, আমি দেখেছি পরীক্ষিৎ আপনাকে ঘুসি মেরে জাগিয়েছে।

রাগ ভুলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে পুরোনো হুল্লোড়ের ভাবটা এসে গেল। সেকি মশাই, আপনি জেগে আছেন ? কেন ? ওঃ হো— বলে এমন জোরে হেসে উঠলুম যে তাপসও ঘুম ভেঙে তাকালো। আমার মধ্যে একটা অসভ্য, বিকৃত, মজার ইচ্ছে আগেকার দিনগুলোর মতো হঠাৎ ছটফট করে উঠলো। উঠুন উঠুন, অনিমেষকে হাত ধরে ঠেলে তুললুম— তারপর গায়ত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম বেশ শব্দ করে। এক শরীর ঘুম নিয়ে গায়ত্রী উঠে আসতেই আমি অনিমেষকে হিড়হিড় করে টেনে আনলুম— অমন ডেলিকেট ধরনের ছেলে অনিমেষ— আমার এরকম বর্বরতায় খুব বিব্রত বোধ করছিল, কিন্তু ওর চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি, ওকে উঁচু করে তুলে গায়ত্রীর ঘরে ঠেলে দিয়ে বললুম, এই নাও তোমার জিনিস। তারপর দরজা টেনে দিলাম।

আমার ব্যবহারটা বোধহয় জমলো না, বোধহয় খানিকটা অতি-নাটকীয় হয়েছিল তাই পরীক্ষিৎ বা তাপস যোগ দেয় নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ শোবার পর তাপস জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার রে ?— কিছু না, ঘুমের ঘোরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল তাই বেচারাকে পাঠিয়ে দিলাম। পরীক্ষিৎ বললো, শোন অবিনাশ...। আমি বললুম, আজ নয়, আজ আমার ঘুম পেয়েছে, কোনো কথা শুনবো না।

সেদিন রাত্রে আমি একটা ছোট স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নটা হয়তো ছোট নয়, কিংবা অনেকগুলো স্বপ্ন। কিন্তু আমার অল্প একটু মনে আছে।

স্বপ্নটা এই রকম :

প্রশ্ন : তোমার জিভটার বদলে কি দেবে ?

আমি : আর যাই হোক, দু'চোখের মণি নয়।

প্রশ্ন : তবে ?

আমি : আমার একটা পা—

— তাকি সমান হলো। জিভের সমান একটা পা ?

— তবে, আমার হাতের আঙুলগুলো নিন, ডান হাতের আঙুল, যে হাত দিয়ে আমি লিখি।

— না, জিভ থাকলে তুমি অন্য লোক দিয়েও লেখাতে পারবে।

— তবে কি দেবো ? বুকের একটা পাঁজরা নিন।

— না, জিভের বদলে আর কিছু হয় না। আমি তোমার জিভটাই চাই।

— কেন ? কেন ?

— তুমি এক ধরনের সুখ চাও, তাই-ই পাবে। সে সুখের জন্য মানুষের জিভটা অবান্তর।

— না–না।

— কেন, পৃথিবীতে বোবা মানুষেরা যৌনসুখ পায় না ?

— কি জানি। পায় হয়তো। অন্তত পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, পাবো না। আমায় দয়া করুন!

আমি ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলুম। আমার চোখের জলের ফোঁটাগুলো বিশাল–বিশাল জলস্তম্ভের মতো ঘুরতে লাগলো।

কাজ সেরে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, আপনি কোন্ দেবতা তাতো জানা হলো না! কিন্তু তখন আমার জিভ নেই— সুতরাং আমার কথা বোঝা গেল না, দেবতাটি অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। আমি দরজার পাশে পরীক্ষিৎকে পুরো ব্যাপারটার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ানো দেখতে পেলুম।

পরদিন সকালে আমার ঘুম একটু দেরিতে ভেঙেছিল। স্বপ্নের কথাটা সকালে মনে পড়ে নি। মনে পড়েছিল অনেকদিন পর, আজ, লেখার সময়। আমি মুখ ধুতে বাথরুমে পেস্ট আনতে গেছি, গায়ত্রী বেসিনে কাপ–ডিশ ধুচ্ছিল, আমাকে দেখে চাপা গলায় বললো, আপনি একটি অসভ্য ও ইতর। কাল রাত্তিরে কি করলেন ? উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে পড়লো জিভ–ছোলাটা আনা হয় নি, মুখ ধোবার সময় ঐটা চাই-ই, নইলে বড় নোংরা লাগে। আমি আবার বাথরুমে ঢুকতেই গায়ত্রী : সামান্য একটুও কি, ছি ছি। আমি বললুম, খুব কি খারাপ করেছি? অনিমেষের জন্য আমার মায়া হচ্ছিল।

— লজ্জা করে না আপনার ?

আমি ওর নিচু হয়ে থাকা ঘাড়ে আলতো দাঁত বসিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে–সঙ্গে ও বনবিড়ালির মতো ঘুরে দাঁড়াতেই আমি বেরিয়ে এলাম।

আমলকি গাছের ছায়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছে পরীক্ষিৎ, তাপস খবরের কাগজের একটা শিটের ওপর শুয়ে আর একটা শিট সম্পূর্ণ খুলে ধরে পড়ছে। অনিমেষ নেই। বেশ ঝকঝকে সকালটি, একছিটে মেঘ নেই আকাশে। ফটফট করছে নীল রঙ, তাপস চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, ওর চোখের মণি দুটোও খানিকটা নীলচে। ঘড়ঘড় শব্দ করে একটা তিনচাকার কিম্ভূতকিমাকার গাড়ি চালিয়ে একটা লোক এসে উপস্থিত হলো। আওয়াজটায় বিরক্ত হয়েছিলাম— আমি চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলাম, কি চাই ? লোকটার বেশ তেল–চকচকে গোল মুখখানি, কিন্তু গলা কিংবা ঘাড় বলে কিছু নেই, থুতনির নিচেই বুক। বললো, আমি আজ্ঞে, মনোহারী জিনিসপত্তর এনেছি।

— কি আছে তোমার ?

— পাউরুটি, বিস্কুট, গরম মশলা, বাঁধাকপি, ঘি, তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, শোনপাপড়ি, আসল বাঙালির তৈরি—। লোকটা অনেক কিছু বলতো এমন ওর মুখের ভাব, থামিয়ে বললুম, চাই না।

— আজ্ঞে।

— চাই না।

— আজ্ঞে।

বিরাট চিৎকার করে আমি বললুম, চা–ই না। লোকটা বুঝতে পেরে গাড়ি ঘোরালো। তাপস অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিল, শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ তুলতে পারছিল না, এবার হঠাৎ বললো, ডাক্, ডাক্ লোকটাকে। ভারি চমৎকার ওর মুখখানা, ওকে আমার কাজে লাগবে! বিষম হল্লা করে লোকটাকে অনেকক্ষণ ডাকার পর ঘাড় ফেরালো, ঠিক ঘাড় না, বুক ফেরালো বলা যায়। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এলো। দোকান খোলো, দেখি কি আছে?

— খাবার–টাবার নেবেন, না তরকারি, স্টেশনারি?

— কি খাবার, দেখাও।

— চন্দ্রপুলি, তিলকুটো, শোনপাপড়ি।

— দাম বলো, কত করে?

— দু'আনা পিস। ডজন? দেড় টাকা। খাঁটি এক টাকা ছ'আনা পাবেন স্যার।

— বারো আনা দিতে পারি এর চেঁয়ে বেশি হয় না ভাই।

— না, পারবো না স্যার, কেনা দাম পড়ে না।

— ওঃ, তোমার কেনা জিনিস নাকি? আমরা ভেবেছিলাম ঘরের তৈরি। তবে কে কিনবে?

— না, মানে মালপত্তর স্যার, কিনতেই হয় স্যার, খরচ পোষায় না।

— আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ক্ষতি করতে চাই না। তুমি আদ্দেক–আদ্দেক দিয়ে যাও।

— আধ ডজন করে নেবেন?

— না, সব জিনিসের আদ্দেক। বারো আনায় চন্দ্রপুলির চন্দ্রটা দিয়ে যাও, পুলিটা তোমার থাক।

— চন্দ্র? শুধু চন্দ্র?

— হ্যাঁ! যেমন ধরো তিলকুটোর তিলগুলোই দাও না হয় শালা, তর্পণ করবো একমাস, তাপস আমার দিকে তাকিয়ে বললো— তুমি কুটোগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো।

পারবো না স্যার— লোকটা খানিকক্ষণ কি ভাবলো, তারপর বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তুমি হয়তো ভাবছো, পরীক্ষিৎ বললো, আমরা প্রথমদিকটা মানে ভালো দিকটা নিয়ে নিচ্ছি বলে তোমার ক্ষতি হচ্ছে। বেশতো শোনপাপড়ির প্রথমটুকুই তুমি নাও আমাদের পাপড়িগুলোই দাও! কিহে?

— না হয় না, তা হয় না।

পাউরুটির কোন্ ভাগটা নিবি? তাপস জিজ্ঞেস করলো, পাউ না রুটি?

আমি রুটি খাই না। পরীক্ষিৎ জানালো।

তবে বুঝি পাউ খাস? দাও, ওকে পাউটা দিয়ে দাও। পাউ দিতে পারবে তো? লোকটা চুপ। ওর চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আর কি আছে দেখি? পরীক্ষিৎ এগিয়ে ওর দোকানগাড়ির ঢাকনা খুলে দেখলো। দারচিনি মানে দারুচিনি, শুধু দারু হ্যায় তুমারা পাশ? মহুল কিংবা পচাই?

— না!

অ! দারচিনিকে আবার গরম মশলাও বলে। গরম মশলাটার পুরোটাই নেবো। আমি মশলাটুকু খাবো আর অবিনাশবাবুকে গরমটুকু দিয়ে যাও। তেজপাতারও পাতা চাই না— তেজ দাও অবিনাশবাবুকেই, ওর দরকার। আমি হাসলাম। লোকটা পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল

বার করে মুখ মুছলো। এটা কি ? পরীক্ষিৎ হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো আদা তুললো। 'আচ্ছা, ভালো জিনিস পাওয়া গেছে। পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলো।

পুরোটা নিস্ নি, পুরোটা নিস্ নি, ওর ক্ষতি হয়ে যাবে। শোনো, আমি বললুম, এরও তুমি আদ্দেক বেচে দাও, তোমার লাভই হবে ভাই। আদার আ–টুকু দাও পরীক্ষিৎবাবুকে, তুমি দা–টা নিয়ে যাও। এরপর তুমি 'চাই দা, চাই দা' বলে ফেরি করবে, লোকে কিনতে এলে তুমি দায়ের দামে আদা বেচে দেবে। আর পরীক্ষিৎবাবু আ–নিয়ে যা করবার করবেন।

দূর শালা! যত সব বাজে ঠাট্টা এই নিরীহ লোকটাকে নিয়ে। তাপস বললে, আসল জিনিসটার খোঁজ নে!

পরীক্ষিৎ বললো, দাঁড়া, আমি বার করছি। খুব মনোযোগ দিয়ে বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো দেখলো। তারপর একটা পাউরুটি কাটা ছুরি হাত দিয়ে তুললো! হ্যাঁ, এতেই অনেকটা হবে। শোনো ভাই, সিরিয়াসলি, তোমার কাছে মেরামত করার জিনিস আছে ? এই ছুরিটা মেরামত করতে হবে। লোকটা কিছু একটা উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

— এই ছুরিটা মেরামত করা দরকার বুঝতে পারছো না ? চন্দ্রপুলি তো দেখালে— চন্দ্রবিন্দু আছে ?

লোকটা বিকট ঘড়ঘড় শব্দ করলো।

— আঃ, বুঝতে পারছো না ? ছুরির ছ'য়ের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসাতে হবে— আর একটা অনর্থ ড় লাগবে, মানে ড–এ শূন্য–র। এইটুকু বদলাতে পারলেই অবিনাশবাবু যত ইচ্ছে দাম দেবে। জিনিসটা তা হলে কি হলো ? ছুরি। তোমার হাতে ছুরি–টুরি আছে ?

— আসল কথায় এসো তো ভাই, তাপস বললো নিচু গলায়, তোমার সন্ধানে মেয়েছেলে–টেলে আছে ?

— আজ্ঞে ?

— দেখো না ভেবে। তোমাদের এখানে এসেছি, দাও দু'একটা যোগাড় করে সন্ধ্যের দিকে নিয়ে আসবে—

— পারবো না, স্যার।

— পারবে না একথা বলতে নেই! ছিঃ! চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। চেষ্টা করো আগে, চেষ্টা করার আগেই কী করে বুঝলে যে পারবে না ?

লোকটা অপ্রত্যাশিত কথা বললো এবার। প্রায় ফোঁপানো গলায়। বাবু, আমি লেখাপড়া শিখি নি আপনাদের মতো, আমি গরীব মানুষ, আমি গরীব, ওফ— একটুক্ষণ আমরা তিনজনেই চুপ করে রইলুম। তাপস লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, তুমি গরীব মানুষ, হায়–হায়, আগে বলো নি কেন, আমরাও বিষম গরীব, হায়–হায়। তাপস লোকটার গলা জড়িয়ে ধরতে গেল, ওঃ বুক জ্বলে যায়, আমরা কত গরীব জানো না, আমাদের কিছু নেই, আমরা তোমার আধখানা করেও কিনতে পারবো না, চলে যাও, আমরা ভিখিরি, লেখাপড়া–জানা ভিখিরি ওঃ— তাপস হঠাৎ এমন মড়াকান্না জুড়ে দিল যে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে— আর লোকটাও গাড়ি ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগলো মন্থর পায়ে।

গায়ত্রী লোকটাকে বললো, ও মুকুন্দ, আধ সের পিঁয়াজ দিয়ে যাও।

লোকটা কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধরা গলায় বললো, পুরোটাই নেবেন তো মা, আদ্দেক দিতে পারবো না আমি।

তাপস সমেত আমাদের তিনজনের হাসির চিৎকার অনিমেষ গেটের কাছ থেকে শুনতে পেল।

দুপুরে কি কি করেছিলাম মনে নেই। খুব বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে। আর খাবার সময় গায়ত্রীর হাত থেকে তেঁতুলের টকের বাটিটা ধরতে গিয়ে আমি ভেবেছিলাম গায়ত্রী তখনও ছাড়ে নি, গায়ত্রী ভেবেছিল আমি শক্ত করে ধরেছি— সুতরাং গায়ত্রী ছেড়ে দিল এবং আমি ধরি নি, বাটিটা পড়ে ছিটকে ভেঙে গেল। আমি ব্যতীত সকলে হাসাহাসি করার সময় পরীক্ষিৎ টেবিলের তলা থেকে আমার পায়ে লাথি মেরেছিল।

বিকেলবেলা আমরা একটা সাপ মারলুম। দলবল মিলে বেরুতে যাচ্ছি, বাড়ির গেটে হাত দেবার সঙ্গে-সঙ্গে তাপস বললো, সাপ! সাপ! গায়ত্রী! প্রত্যেকেই এক সেকেন্ডে তিন পা পিছিয়ে দেখলুম, গায়ত্রীর খুব কাছে একটা সাপ— বেশ বড়, কালো বেল্টের মতো, এতগুলো লোক দেখে চট করে ফুলবাগানে ঢুকে পড়লো। সর্বনাশ, বাড়িতে সাপ পুষে রেখেছিস ? লাঠি নিয়ে আয়, তাপস বললো, যা যা। পরীক্ষিৎ গম্ভীর মুখে জানালো, ওটা সাপ নয়, এই শীতে সাপ আসবে কোথা থেকে ? ওটা আসলে শয়তান; গায়ত্রীকে কোনো একটা গোপন কথা বলতে এসেছিল।

যাঃ, ঠাট্টা নয়, আমার বুক কাঁপছে এখনো, উঃ— গায়ত্রী সরে এসে অনিমেষ ও আমার মাঝখানে দাঁড়ালো। পরীক্ষিৎ কথাটা এমন সুন্দরভাবে বলেছে যে আমি ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সাপটা গায়ত্রীর শায়ার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এলো, এই রমণীর দুই উরুর মাঝখানে কোনো গুপ্ত কথা বলে। যেন কোনো পৌরাণিক কাহিনীর সত্য এই মুহূর্তে এখানে ঘোষিত হয়ে গেল। শয়তান শুধু নারীর কাছেই সে সত্য ঘোষণা করে যেতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, চাক্ষুষভাবে দৃশ্যটা সত্যই ভয়ংকর, আমি তাই, অনিমেষকে বললাম, যান লাঠি নিয়ে আসুন, ওটাকে কি এখানে পুষে রাখবেন নাকি ?

আমি আসছি, তাপস দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সুরকির পথ পেরিয়ে। ও এমন ভিতু স্বভাবের— যাবার সময় এমনভাবে গেল পা ফেলে, যেন ওর কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই এখন সাপে ভর্তি।

কি দরকার ওটাকে মারার, অনিমেষ বললো, এর আগেও ওটাকে কয়েকবার দেখেছি, কোনো ক্ষতি করে না কিন্তু।

— কি যা-তা বলছেন। সাপ রোজ ক্ষতি করে না— একদিনই করে। অন্ধকারে গায়ে পা দিলে চৈতন্যদেবের বাণী শোনাবে না। এখন ওদের হাইবারনেশন পিরিয়ড শেষ হচ্ছে, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে নতুন জীবনে। এখন ওদের তেজও যেমন, বিষও সেইরকম মারাত্মক।

পরীক্ষিৎ বললো, যাই বল, জিনিসটা দেখতে ভারি সুন্দর। কী রকম উদাসীন ভঙ্গিতে চলে গেল, অকারণে মারিস নি।

তাছাড়া, ওটার তো বিষ নাও থাকতে পারে, অনিমেষ বলে, অতবড় সাপ— বোধহয় দাঁড়াস, অর্থাৎ যাকে ঢ্যামনা বলে!

মোটেই ঢ্যামনা নয়, ঢ্যামনা হয় ছাই-ছাই হলুদ, এটা একদম কালো।

বিষ নিশ্চয়ই আছে, পরীক্ষিৎ বললো, সম্পূর্ণ বিষহীন কোনো জিনিস কোনো মহিলার কাছে আসবেই বা কেন ?

— ধ্যাৎ, আপনি সব সময় অসভ্য কথা বলেন—

অনিমেষ আর আমি হাসলুম। পরীক্ষিৎ আমার চোখে চোখ ফেলেছে।

তাপস দুটো দরজার খিল এনে এগিয়ে দিয়ে বললো, কে মারবে মারো আমি ওর মধ্যে নেই। তবে মারা দরকার। এই হুস, বেরিয়ে আয়।— বলে একটা খবরের কাগজ আগুন জ্বালিয়ে ঝোপটায় ছুঁড়ে দিল।

সাপটা ওখানেই আছে, কোথাও যায় নি, আমি লক্ষ্য রেখেছি, গায়ত্রী বললো।

কিন্তু, ফুলগাছগুলো নষ্ট হবে, পরীক্ষিৎ নিচু গলায় জানালো।

অনিমেষ লাঠিটা তুলে এগুতে গিয়েও যেন এই কথা শুনেই পিছিয়ে এলো। ওদের অস্বাভাবিক কবিত্ব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একটু বিরক্ত বোধ হলো। ঝাঁঝালো গলায় বললুম, ওগুলো তো দোপাটির ঝোপ, বিনা যত্নেই হয়, আবার হবে। তাছাড়া শোন, সাপ হচ্ছে মানুষের শত্রু। শত্রুকে কখনো আক্রমণের সুযোগ দিতে নেই, তার আগেই মারতে হয়।

ওঃ! পরীক্ষিৎ হঠাৎ চুপ করে গেল— যেন আমি এক অমোঘ যুক্তি দিয়েছি যার উত্তর হয় না। তারপর বললো, যদি মারতেই হয় সব আমি মারছি। পরীক্ষিৎ ঝোপটার অনেকটা কাছে এগিয়ে গেল খিল হাতে— তারপর খুব সহজেই কাজ হয়ে গেল। লাল-সাদা ফুলের ফাঁকের ওপর আন্দাজে একটা বাড়ি মারতেই স্প্রিংয়ের খেলনার সাপের মতো সাপটা তড়াক করে ফণা তুলে উঁচু হলো। আঁ-করে গায়ত্রী একটা সরু আওয়াজ তুলে পিছিয়ে গেল দৌড়ে। পরীক্ষিৎ সাপটার দিকে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলো, একটুও ভয় নেই, যেন ও কোনো এক গুণিনের মতো মন্ত্র দিয়ে বশ করতে চায় সাপটাকে। আমি ওর ডান পাশে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দু'জনের হাতেই খিলের ডাণ্ডা, একটু দূরে সাপটা অল্প অল্প দুলছে। পরীক্ষিৎ আমার দিকে তাকালো, ওকে একেবারে মারতে হবে বুঝলি, পালাবার চেষ্টা করলে মুশকিল হবে। তারপর যেমনভাবে গালে থাপ্পড় মারে— সেই রকম পরীক্ষিৎ ওর লাঠিটা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সাপটার ফণায় মারলো, আমিও সেইরকম লাঠি চালিয়েছিলাম, ঠক করে শব্দ হলো দু'জনেরটা লেগে— সাপটা মাটিতে পড়তেই আমরা দু'জনে ধুপধাপ করে পেটালুম। অল্প সময়েই সাপটা নিস্তেজ হয়ে গেল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরিয়ে পরীক্ষিৎ বললো, এখন এটাকে কি করবি? সাপকে ফেলে রাখলে আবার বেঁচে যায়। বৃষ্টি পড়লেই বেঁচে উঠবে। পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কি করবি ? সাপটা কিন্তু জাতের খাঁটি চন্দ্রবোড়া।

কিন্তু কে এখন ওটাকে পোড়াবে বসে বসে ?

এক কাজ করা যাক, আমি বললুম, ওটাকে নিয়ে চল বড় রাস্তায় ফেলে দিই। কয়েকখানা বড় বড় ট্রাক ওটার ওপর দিয়ে চলে গেলেই হবে।

সেটা মন্দ না। পরীক্ষিৎ ওর লাঠির মাথায় মরা থ্যাৎলানো সাপটাকে তুললো। তারপর সৈন্যবাহিনীর শোক-শোভাযাত্রার আগে নিচু পতাকা হাতে যে লোকটা হাঁটে তার মতো ভঙ্গিতে পরীক্ষিৎ এগিয়ে চললো। যেন ওর সত্যিই দুঃখ হয়েছে। পরীক্ষিৎকে আমি জ্যান্ত মুর্গির ছাল ছাড়াতে দেখেছি। জীবজন্তুর ওপর ওর দয়ামায়া বোধ যে খুব প্রবল তার তো কখনো পরিচয় পাই নি। কিন্তু বোধহয় সাপ, টিকটিকি এই জাতীয় ঠাণ্ডা রক্তের জীবনের প্রতি ওর সত্যিকারের কোনো টান আছে।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। লাল আকাশটার কোনো একদিকে সূর্য। এই সময় সূর্যের রশ্মিগুলো আলাদাভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এখন একটু চেষ্টা করলেই কল্পনা করা যায় যে, সন্ধেবেলার সূর্য থেকে অসংখ্য লাল রঙের সাপ পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে। পরীক্ষিৎ লাঠিটা বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগে একবার সূর্যের দিকে তাকালো।

অনেকদিন আগে আমরা এখানে একবার বেড়াতে এসেছিলাম। বছর সাতেক আগে। তখন এ জায়গাটা অন্যরকম ছিল। একটা ঝিরঝিরে ঝর্না। পাশে ছোট মন্দির। এখন দেখছি রীতিমতো একটা নদী। বেশ গভীর জল মনে হয়, প্রবল স্রোত। ওপারে ব্রিজ বানিয়েছে—এসব ব্রিজ-ট্রিজ কিছুই আগে ছিল না। বেশ ঝকঝকে চওড়া কংক্রিটের—নদীর চেয়ে ব্রিজটাও কিছু কম সুন্দর দেখতে নয়! প্রশস্ত চাঁদের আলোয় ফটফট করছে সাদা রঙ। গায়ত্রী একটা হালকা নীল রঙের

শাড়ি পরে এসেছে— সুতরাং প্রায়ই ও মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার সঙ্গে। আশপাশে লোকজন নেই। মন্দিরের কাছে কয়েকটা দোকান। অনিমেষ কী যেন আলোচনা করছে তাপসের সঙ্গে। আমি রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছিলাম নিচে। কী খুঁজছিলাম মনে পড়ছিল না, গভীর মনোযোগ দিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছি— অথচ কেন, ঠিক কী দেখতে চাই যেন মনে আসছে না। কী খুঁজছি— অনেকক্ষণ পর মনে পড়লো, একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেকে। স্পষ্ট মনে আছে, আগেরবার যখন এসেছিলাম, আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম ঝর্নাটার পাশে। আমার বারবার মনে হলো, ঝুঁকে তাকালে এখনও সেই ছেলেটাকে দেখতে পাবো। ঝর্নার (এখন নদী) পাশে একটি মুগ্ধ যুবা বসে আছে। না, কিছু দেখা যায় না অন্ধকারে। তখন কি সুন্দর চোখ ছিল আমার— ঝর্নার চাঁদের আলো দেখলে কি ভালোই লাগতো। আমি হু-হু করে ভেসে আসা হাওয়ায় বারবার নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম। আজ কিছুই ভালো লাগছে না, অথচ আজও এ জায়গাটা কম সুন্দর নয়। বন্ধুরা, গায়ত্রী, চমৎকার ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না, এমন কি যথেষ্ট সিগারেট আছে পকেটে—। কিন্তু আমার খালি মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাই। বন্ধুদের কারুকে না বলে পালাই। যেন ভুল জায়গায় এসেছি। এই যুগপৎ জ্যোৎস্না ও হাওয়ার রাত আজ আমার জন্য নয়। বুকের মধ্যে ব্যথা ও ভয় হচ্ছে। বিষম পালিয়ে যাবার ইচ্ছে। তবু, নিচে জলের কাছে পাথরের ওপর সেই ছেলেটাকে যদি বসে থাকতে দেখি, তবে হয়তো এবারের মতো বেঁচে যাবো।

তাপস বললো, আই নিড এ উওম্যান, না হলে আমি ঠিক জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াতে পারি না।

এবার একটা চটপট বিয়ে করে ফ্যাল, অনিমেষ বললো।

— ভাগ শালা। চল অবিনাশ, ঐ চায়ের দোকানটায় যাই, যদি ফোক্-টোক্ জোগাড় করা যায়।

— নারে, আমার ইচ্ছে নেই।

বিয়ে করাটাকে অত ঠাট্টা করিস না, অনিমেষ বললো।

— কেন, কী এমন পরমার্থ পেয়েছিস ?

— অনেক সুবিধে আছে। আমি তো ভাই বেশ সুখে আছি।

— কে চার হাত-পায়ে সুখ চায়। তাছাড়া সুখটাই বা কি ? কানের দুল, শাড়ি, মেনস্টুরেশান, ডাক্তার, নেমন্তন্ন— সবচেয়ে মুশকিল, কখনো একা একা থাকা যায় না। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও তো মেয়েছেলে পাওয়া যায় বিয়ে না করে !

— যাঃ, শুধু শুধু থিয়োরিটিক্যাল কথা বলিস না। যে সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা নেই সে সম্বন্ধে কথা বলা উচিত না।

তাপস চকিতে অনিমেষের দিকে সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি মুখে বলি না কখনো, লিখে জানাই। তাছাড়া বিয়ে সম্বন্ধে তোরই বা কী নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে ? তুই কি পৃথিবীতে নতুন বিয়ে করেছিস ! পৃথিবীতে মানুষ বিয়ে করছে অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে— তাদের সকলের অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানি।

— তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা খারাপ ?

— কি গাড়োলামি করছিস্ ? বিয়ে করা উচিত কি উচিত না তাই নিয়ে সিম্পোসিয়াম চালাবি নাকি ? যার ইচ্ছে করবে। কিন্তু একটা মেয়েছেলে চাই— এ কথায় বিয়ের প্রসঙ্গ আসে কি করে ?

— আমার বিয়ের কথাই মনে হলো। কারণ বিয়ে করে আমি স্ত্রীলোক এবং শান্তি দুটোই পেয়েছি।

পরীক্ষিৎ গান গাইছিল। হঠাৎ গান থামিয়ে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, কিন্তু অনিমেষের মতো সুন্দরী বউ থাকলে ভাই শান্তি বেশিদিন রাখা যায় না।

অনিমেষ কথাটা শুনলো কিন্তু কান দিল না। বললো, তাপস তুই আর এ রকম পাগলামি কতদিন করবি ? তোর তো লেখার জন্য সময়ের দরকার।

'আমিও সুযোগ পেলে একটা ছোটোখাটো বিয়ে করে ফেলবো। আমি নিরীহ ভালো মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই।' আমি বললুম।

তাপস একাই চলে গেল চায়ের দোকানের দিকে।

পরীক্ষিৎ ব্রিজের রেলিঙের ওপর উঠে বসেছে। প্রথমে গুনগুন করে গান করছিল, তারপর বেশ গলা ছেড়ে দিল। পরপর তিনখানা ন্যাকা রবীন্দ্রসঙ্গীত না থেমে শেষ করার পর বললো, বিনা নেশায় চেঁচালে বড় গলা ব্যথা করে। গতবার আমরা সবাই মিলে কি গান গাইতাম রে ?

'কি জানি আমার মনে নেই।' আমি একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিতেই সেটা হাত ফসকে জলে পড়ে গেল।

'তাপস জানে। তাপস ওটা খুব গাইতো। গেল কোথায় ছোকরা ?' একটু এদিক-ওদিক তাকিয়েই পরীক্ষিৎ বললো, 'কাণ্ডটা দ্যাখ ! সাধে কি আমি রাগি।'

গায়ত্রী গিয়েছিল মন্দিরে। ফিরে এসে ব্রিজের ওপাশে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছে। অনিমেষ চলে গেছে ওর কাছে, দু'জনে নিবিষ্ট হয়ে কি যেন বলছে।

— দেখেছিস, একটু চান্স পেয়েই জোড়া মেরে গেছে। এইজন্যই (অশ্লীল) আমি (ছাপার অযোগ্য) একটু অন্ধকার পেলেই (অশ্লীল, অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)।

— যাক্ গে, ছেড়ে দে। নতুন বিয়ে করেছে, একেবারে একা থাকতে পারছে না আমাদের উপদ্রবে।

— শুনেছিস্, কাল অনিমেষ কি বললো। একদম লিখতে পারছে না, ভাষা নেই ফাসা নেই যত (অশ্লীল, অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য) বিয়ে করে মজে গেছে। ঐ বললো না, শান্তি পেয়েছি। আমি ওর শান্তির বারোটা বাজাতে চাই। আজই—

— তোর নতুন বইটা কবে বেরুচ্ছে, নাটকটা শেষ করলি না ?

— কার জন্য লিখবো ? তুই কিছু লিখিস্ না আজকাল। তাপসটা লেখে ব্লাডি প্রোজ! এক অনিমেষ— তাও বিয়ে করে শান্তি পেয়েছে! দাঁড়া, ওর শান্তি ভেঙে দিচ্ছি। ওকে বলে দিই, যাকে নিয়ে অত সোহাগ করছো, সেই তোমার বউয়ের (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য)।

— যাঃ কি যা-তা বকছিস। তোর একটুও ডিসেন্সি জ্ঞান নেই।

ওসব চালাকি ছাড়ো অবিনাশ মিত্তির! আমি সোজা কথা বলবো। পরীক্ষিৎ হাতের সিগারেটে জোর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পায়ে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর দোল খেলো।

পড়ে যাবি, পরীক্ষিৎ, ঠিক হয়ে বোস্। আমি দেখতে পেলুম সেই অজগরের মতো নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলি ওর মাথার চারপাশে। লম্বা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ মনে হলো ওর মাথা দিয়ে দুটো শিঙ বেরুচ্ছে। গায়ত্রী মেয়েটা খুব ভালো, আমি বললুম, ওরা দু'জনেই দু'জনকে খুব ভালবাসে।

আমার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালো পরীক্ষিৎ। বললো, আর তুই ?

— আমি হোপ্‌লেস, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

— আমার নাটকটার জন্য কাঁচামাল দরকার। আমার অনিমেষকে চাই।

— এ খুব ছেঁদো কথা হলো। তোর কি মডেল লাগে লেখার জন্য ?

— ওকে নিয়ে লিখবো কে বলেছে। ওর গণ্ডগোল নিয়ে লিখবো। গল্পতো বানাতে পারি না রে, তাহলে তো এতদিনে উপন্যাস–ফুপন্যাস লিখে কেলেংকারি করতুম। অনিমেষকে ঈর্ষা করে লিখতে ইচ্ছে হয়।

— শেক্‌সপিয়ার কিংবা ইয়োনেস্কোকে ঈর্ষা কর না!

— যাঃ, বাজে বকিস না। তুই আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিস। কিন্তু এরই বা কি মানে হয়। বন্ধুরা রইলো একদিকে, আর ওদিকে বউয়ের সঙ্গে গুজুর গুজুর। শোন অবিনাশ, আমিই ওর সত্যিকারের বন্ধু। আমি ওর উপকারই করতে চাই। একটা মেয়ের কাছে ডুবে যেতে দিতে পারি না।

— পরীক্ষিৎ, কাল ক'টার ট্রেনে ফিরবো রে আমরা ?

— জানি না। অনিমেষকে ডাকি !

— কলকাতায় ফিরে তোর নাটকটা স্টেজ করবো। হল ভাড়া নিয়ে।

তুই আমাকে ভোলাতে চাইছিস ? না, আমি অনিমেষকে ডেকে বলতে চাই, আজই, এখনই, অনিমেষ—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, তুই অনিমেষকে কী বলবি ? যত সব পাগলামি!

পরীক্ষিৎ গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকালো, একটাও কথা না বলে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো। কি বিশ্রী ওর সেই হাসি। সেই হাসির মধ্যেও নীল ধোঁয়া। আমি অস্বস্তিকরভাবে ওর হাসির সঙ্গে যোগ দিতে চাইলুম। আমার তখন হাসি পেল না।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ বিষম জোরে অনিমেষের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি থতমত খেয়ে বললুম, পরীক্ষিৎ, আগুনটা দে তো। বলে, ওর মুখের সিগারেট থেকে আমার সিগারেট ধরিয়ে নেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তারপর ডান হাত দিয়ে ওর পেটে একটা আলতো ধাক্কা দিতেই হাত দুটো ওপরে তুলে বাতাস ধরার চেষ্টা করে— পরীক্ষিৎ উল্‌টে পড়ে গেল। নিচের নদীর জলে ঝুপ করে একটা শব্দ হলো। আর শোনা গেল, পরীক্ষিতের আর্তনাদ নয়, জারুল গাছে একটা রাত পাখির কর্কশ ডাক ? গায়ত্রী আর অনিমেষ ছুটে এলো চিৎকার করে।

পর মুহূর্তেই বিষম অনুশোচনায় আমার মন ভরে গেল। ছিঃ, কেন পরীক্ষিৎকে আমি জলে ফেলে দিলাম। খুবই বোকার মতন কাজ হলো এটা। কোনো মানে হয় না। ও খুবই ভালো সাঁতার জানে,— নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। এর বদলে ওকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।

বিমলেন্দু

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে দেখলুম, অত্যন্ত গম্ভীর এবং নিবিষ্ট চোখমুখে তাপস, অবিনাশ আর হেমকান্তি— সামনে তাস ছড়ানো। তিনজনে বসে আছে অথচ চারজনের তাস ভাগ করা। যেন ওরা চতুর্থ লোকের প্রতীক্ষায় ছিল, আমাকে দেখেই বলে উঠলো, আয়, তাস তোল।

— আমি তাস খেলতে জানি না।

— শিখে নিবি, বসে পড়্‌ অবিনাশ বললো।

— না, ওসব আমার ভালো লাগে না।

ও ! অবিনাশ চোখ না তুলেই বললো। ওদের খেলা থামলো না। অবিনাশ বললো, ফাইভ নো ট্রাম্প্‌স। চারজনের তাস বিছিয়েও যে তিনজনে ব্রিজ খেলা যায় আমি জানতুম না। এখন আমাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে, অত্যন্ত বিরক্তিকর, আমি উঠে গিয়ে রেডিওর চাবি ঘোরালুম, যুদ্ধের বোমা বর্ষণের মতো আওয়াজ ও মাঝে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া গানের লাইন। আঃ বিরক্ত করিস না তাপস বললো, দে, একটা সিগারেট দে। আমি উঠে পাশের ঘরে গেলাম। মায়া দাঁত দিয়ে কালো ফিতে চেপে ধরে চুল বাঁধছে আয়নার সামনে। ফর্সা গালে ফিতেটা ! সায়া ও ব্লাউজ পরা, ভাঁজভাঙা শাড়িটা হাঁটুর উপর। আমাকে দেখে চমকে উঠলো না, লজ্জা পেয়ে শাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে বুকে জড়ালো না, ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

— দিদি কোথায় মায়া ?

— বাথরুমে।

— তোমার কাছে একটা খালি খাম আছে ? একটা চিঠি পোষ্ট করবো।

না নেই। আপনি পাশের ঘরে বসুন। মায়া তখনও আমার চোখের দিকে চেয়ে ছিল, অত্যন্ত হিম সেই চেয়ে থাকা।

— বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি ? পিসিমা ?

— না। আপনি পাশের ঘরে বসুন, দিদি যাচ্ছে।

— মায়া, তুমি আমাকে একটা রুমাল দেবে বলেছিলে।

মায়া ঘুরে দ্রুত চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে, ড্রয়ার খুলে একটা ফর্সা ও সোনালি কাজ করা রুমাল এনে বললো, এই নিন্‌, পাশের ঘরে বসুন।

আর কেউ আমাকে দেখে নি, তবু বুঝতে পারলুম, কি বোকা ও নির্লজ্জের মতো আমি রুমালটা চেয়েছিলাম। আর একটু দাঁড়াবার জন্যে। কিন্তু মায়ার সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলতে পারি না, ভয় পাই। একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় মায়াকে ভালো করে দেখবো, মনে মনে ভাবলুম।

ও ঘরে কি কারণে ওরা চেঁচিয়ে উঠতেই মনে হলো, তাস খেলা শেষ হয়েছে। ফিরে এলাম। অবিনাশ পয়সা গুনছে। হেমকান্তি ওর লম্বা মুখ তুলে আমাকে কিছু যেন বলতে চাইলো। পরক্ষণেই আবার মুখ নিচু করলো সতরঞ্জির দিকে। ওর স্বভাবই এই। মুখ দিয়ে ক'টা ওর কথা বের হয়, আঙুলে গোনা যায়। কোন্‌ কথাটা কিভাবে বলবে, ও হয়তো, ভেবে পায় না। আমি বললুম, আজ কিসের মিটিং রে ? হঠাৎ ফোন করে আসতে বললি কেন ?

আজ মাংস খাবো। পয়সা নেই। অবিনাশ বললো, তুই তো ইয়া লাস আছিস, তোর উরু থেকে সেরখানেক মাংস দে'না— মশলা দিয়ে রাঁধি। মানুষের মাংস কেমন খেতে একটু চেখে দেখি।

— যদি খেতেই হয়, তবে আমার কেন, কোনো সুন্দরী মেয়ের মাংস খা না।

— দূর রকহেড ! ওদের মাংস খেতে হয় চেটে চেটে কিংবা চুষে চুষে—চিবিয়ে গিলে ফেললে তো একেবারেই ফুরিয়ে গেল।

মায়া আর ছায়াদি দু'বোন ঘরে এলো। ছায়াদি সদ্যস্নান করে এসেছে—ওর চুল, চোখের পাতা, চিবুক, ভুরু এখনো ভিজে। বললো চা খাবে ? তোমরা যে আজ আসবে তা আগে জানাবে তো ?

কেন, তাহলে কি চায়ের বদলে মদ খাওয়াতি ? তাপস বললো।

— ধেৎ ! তা নয়, মায়া যে দু'খানা সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে।

— তা মায়া যাক না অন্য কারুকে সঙ্গে নিয়ে, তুমি থাকো।

— কে যাবে ওর সঙ্গে ? তোমরা যাবে কেউ ?

— কেন, এত বয়েস হলো; কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে না ?

করে। আমার সঙ্গে। অবিনাশ গম্ভীর গলায় জানালো।

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আপনারা কোন ওষুধ—? হঠাৎ হেমকান্তি বলে উঠলো, বড় যন্ত্রণা করে, রোজ সন্ধে হলেই—

— অ্যাসপ্রো আছে, এনে দেব ?

— না, ওতে কমে না। অন্য কোনো, ... আপনারা, ... ওষুধ।

আমি জানি, হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে তাপস বললো, নেচার ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু শক্ত, পারবেন ?

না না, ও পারবে না,— আমি জানালুম। তাপসের চোখে বদমাইশি।

— কেন পারবে না ? শুনুন, আপনি উঠে দাঁড়ান, ডান হাত দিয়ে বাঁ কান ও বাঁ হাত দিয়ে ভালো করে ঈশ্বরকে প্রণাম করুন, তারপর মাথাটা জোর করে ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়ে ফুঁ দিন— পারবেন তো— তারপর একটা বেগুনি রঙের পাখির কথা ভেবে উল্টো মুখ করে সিঁড়ি গুনে গুনে নেমে যান, শেষ ধাপটায় একবার বসুন, আর ঘাড়ে ফুঁ দিন— এবার রাস্তার পানের দোকান থেকে দুটো পান কিনে নিজে একটা খেয়ে বাকিটা প্রথম যে মেয়ে ভিখারি দেখবেন, তাকে দান করুন। নির্ঘাৎ সেরে যাবে— সারতে বাধ্য।

মায়া ফুলে ফুলে হাসছিল। হেমকান্তি নিচ দিকে মুখ রেখেই বললো, ওঃ, আচ্ছা ? এমনভাবে বললো, যেন অব্যর্থ বলে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু আজ নয় কাল পরীক্ষা করে দেখবে।

যাঃ, কেন ওকে বিরক্ত করছিস তাপস ? সত্যি, মাথা ধরলে ভারি কষ্ট হয়, ছায়াদি বললো, আপনি বরং মায়ার সঙ্গে সিনেমায় যান না। সেরে যেতে পারে।

হেমকান্তি কোনো উত্তর দিল না। ওর রুক্ষ মুখখানা এমনভাবে তুলে ধরলো, যেন ওকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও ভালো হতো এর বদলে।

না, না, একজন অসুস্থ লোককে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না, মায়া জানালো।

আমি যাবো ? আমি নিজেই ব্যগ্র গলায় বললুম।

হ্যাঁ, আপনি আর দিদি যান। মায়া সেই ঠাণ্ডা চোখ আমার দিকে তুলেছে।

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না। অবিনাশ বললো, আমাদের সকলের নামগুলো নিয়ে লটারি হোক। যার নাম উঠবে সেই যাবে।

এই সময় বেশ জুতোর শব্দ করে পরীক্ষিৎ ঢুকলো। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। অনিমেষদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে ও নাকি নদীতে পড়ে গিয়েছিল ব্রিজ থেকে। পরীক্ষিতের চোখ অসম্ভব লাল। অবিনাশ টুকরো-টুকরো কাগজে আমাদের নামগুলো লিখে গুলি পাকাচ্ছিল— জিজ্ঞেস করলো, তোর নাম দেব ? তুই যাবি পরীক্ষিৎ, মায়ার সঙ্গে সিনেমায় ?

— হোয়াই নট ? কি ছবি, বাংলা ?

হ্যাঁ ছায়াদি বললো।

— খারাপ নয়। বই খারাপ হলেও মায়া তো থাকবেই পাশে !

অবিনাশ কাগজের গুলিগুলো হাতে ঝেঁকে ছড়িয়ে দিল সতরঞ্জিতে। বললো, তুমি তোলো মায়া।

— আমি না, দিদি তুলুক।

— না, দিদি কেন ? তুমিই বেছে নাও না, কে যাবে তোমার সঙ্গে। অনেকটা স্বয়ম্বর সভার স্বাদ পাওয়া যাবে। জানিতো আমাকেই বেছে নেবে— সেটা মুখ ফুটে বলতে অত লজ্জা

কিসের ?

কক্ষনো না, মায়া হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলো। আমার ইচ্ছে পরীক্ষিৎদার সঙ্গে যাওয়ার। দেখবেন, ওর নামই উঠবে। মায়া তুলতে যাচ্ছিল, অবিনাশ ওর হাতখানা চেপে ধরে বললো, কিন্তু শোনো মায়া,— যার নাম উঠবে তার সঙ্গেই কিন্তু যেতে হবে— এমনকি হেমকান্তির নাম উঠলেও।

আমি ? অসহায় চোখে হেমকান্তি।

মায়া একটা কাগজের গুলি তুলে একা একা দেখে বললো, পরীক্ষিৎদার নাম! ও ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপছে।

দেখি দেখি, বলে কাড়াকাড়ি করে ছায়াদি আর আমি কাগজটা দেখলুম। না, অবিনাশের—

জানতুম! অবিনাশ হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মোজা পরতে শুরু করে দেয়।

মায়া হাসতে হাসতে বললো, ওঃ, কি গরজ! কি হ্যাংলা আপনি, বাবা !

পরীক্ষিৎ একটা লম্বা চুরুট ধরিয়েছে। মুচকি মুচকি হেসে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললো, তুই চললি, তোর সঙ্গে যে কয়েকটা কথা ছিল। ফিরছিস তো এখানেই ?

— ফিরতে পারি। কিন্তু যদি মায়াদেবী শোর পর আমার সঙ্গে ময়দানে ঘুরতে কিংবা রেস্টুরেন্টে বসতে রাজি হন—তবে দেরি হবে !

খবরদার মায়া, কোথাও যাবি না, মায়ার অভিভাবিকা বলে।

মায়া বললো, আপনি কিন্তু হলের মধ্যে বসে ইয়ার্কি করতে পারবেন না। নিজে সাহিত্যিক বলে যে, যা ইচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্তব্য করবেন— ওসব অহংকার চলবে না।

পাগল হয়েছো, অবিনাশ বললো, তোমার কাছে আমি অহংকার করবো! সুন্দরীর পাশে আবার সাহিত্যিকের কোনো মূল্য আছে নাকি ? বিমলেন্দু, দশটা টাকা দে তো ?

— আমার কাছে নেই।

— নেই কি! খবরের কাগজে লিখে তো খুব টাকা পিটছিস। কিছু ছাড়।

— নারে, সঙ্গে কিছু নেই

— নেই ? যাঃ শালা শ্যামের পাশে গিয়ে ব্যবসা কর।

এই নে। পরীক্ষিৎ চুরুটটা দাঁতে চেপে পকেট থেকে চামড়ার ব্যাগ বার করলো। দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আসবার সময় একটা পাঁইট আনিস !

— তুই তো যথেষ্ট মেরে এসেছিস। আবার কেন ?

— বাড়ি নিয়ে যাবো। রাত্তিরে দরকার।

অবিনাশ মায়ার বাহু ছুঁয়ে বললো, চলো যাই। ছায়া, এদের একটু সামলে-টামলে রেখো। ওঃ, একটা কথা বলি নি, অবিনাশ আবার ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর না হাসার ভঙ্গি করে বললো, কাগজের গোল্লাগুলো খুলে দ্যাখ, সবগুলোতেই আমার নাম লেখা। মায়া যেটা তুলতো, সেটাই আমার। গুড নাইট, বয়েজ !

আমাদের সকলের হাসি থামলে তাপস বললো, হারামজাদা !

আমি খুব অপমানিত বোধ করছিলুম। মায়ার জন্য নয়। মায়ার সঙ্গে যাবার যে আন্তরিক ইচ্ছে হয়েছিল আমার, সেজন্য। মায়ার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করি নি, বরং ওকে সাহায্য করেছি অনেক পরীক্ষার সময়। আসলে মায়া আমাকে ঘৃণা করে ছায়াদির জন্য। ছায়াদি এমন ভাব দেখায় যেন আমাকে কতো ভালবাসে। বেচারীর এ পর্যন্ত বিয়ে তো হলোই না, প্রেমিকও নেই। এতোটা বয়স পর্যন্ত কুমারী। ছায়াদি যদি অনুরোধ করে—তবে অনায়াসেই ওকে বিয়ে করতে পারি আমি। শ্বেতি মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয়— তাছাড়া মেয়েটা বড় শান্ত, অনেকটা

মায়ের মতো, আমার বড় শান্তি লাগে ছায়াদির কাছে। শুধু ওর ওই ন্যাকা পদ্যগুলো লেখার অভ্যেস ছাড়া দরকার। মায়া আমাকে ভুল ভেবেছে— আসলে, যে অবিনাশের সঙ্গে ওর এত মাখামাখি ঐ অবিনাশটাই লম্পট, বিবেকহীন, বদমাশ। ও-ই মজা লুটে পালাবে। মায়াকে নিয়ে ও শেষ পর্যন্ত কী করবে কি জানি। ভাবতেও ভয় হয়— মায়ার ওরকম ঝর্নার জলে ধোওয়া শরীর। লেখার জন্য জীবনটা কলুষিত করতেই হবে ?— তাপস-পরীক্ষিৎ-অবিনাশদের তাই ধারণা। ওদের কারুর অসুখ হলে কপালের ওপর কে ঠাণ্ডা হাত রাখবে জানি না।

আমাদের বাড়ির ছাদে কয়েকটা সুন্দর গোলাপ ফুলের চারা আছে টবে বসানো। একদিন চা খেতে-খেতে গাজীপুরের লালগোলাপটা দেখাচ্ছিলুম ওদের— অনেক চেষ্টার পর একটা গাছে সেদিন প্রথম ফুল ফুটেছে। হয়তো আমার গলায় একটু বেশি উচ্ছ্বাস লেগেছিল, পরীক্ষিৎ হঠাৎ সেই টবটা আছড়ে ভেঙে দিল। আধুনিকতা সম্বন্ধে এরকম ছেলেমানুষি ধারণা ওদের! জানে না, একশো বছর আগে ফুলকে অবহেলা করে এখন আবার ফুলের স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। অবিনাশটা আবার ফুল খায়। গোলাপ, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী— যেখানে যে ফুল দেখে— লোকের বাড়ির ফুলদানিতে বা উপহারে, বাগানে, ও অমনি ছুটে যায়, ফুল আমি বড্ড ভালবাসি— বলে পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খায়। আমি একদিন সরলভাবে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুই ফুল খাস কেন রে ? দ্যাটস্ দা অনলি ওয়ে অভ অ্যাপ্রিসিয়েশান! কথাটা খুবই গর্বের সঙ্গে বলে— যেন ভবিষ্যৎকাল ওর এই বাণীটা মনে রাখবে।

পরীক্ষিৎ বিশাল কাঁধের হাড় দুটো উঁচু করে চেয়ারে উঠে বসলো। ছায়া, চা খাওয়াচ্ছো না কেন ? যাও, চা খাবার-টাবার নিয়ে এসো। ছায়াদি বেরিয়ে যেতেই পরীক্ষিৎ তাপসের দিকে ফিরে বললো, তোদের একটা কথা বলার আছে, ভুলে যাবার আগেই বলি। দিন কয়েক ওপাড়ার দিকে যাস নি কিন্তু!

— কেন ?

— পরশু একটা খুন হয়ে গেছে ওপাড়ায়। পুলিশে ছেয়ে গেছে। দিন কয়েক—

— তুই ওদিকে গিয়েছিলি কেন ? তোর হঠাৎ একা ...

— অবিনাশকে খুঁজতে খুঁজতে। তারপর কি রুক্ষু ঝঞ্ঝাট। এক মক্কেল পুলিশ তো আমাকে ধরে ফেলে আর কি! আমি দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সে বুড়িটাতো আমাকে দেখেই আঁৎকে উঠেছে। আমি বললুম, চেঁচিও না মা লক্ষ্মী, চোর-ডাকাত নই, পুলিশের হামলা কমলেই বেরিয়ে যাবো। ও সেই ক্যানকেনে গলায় বললো, আজ এখানে এসেছো কেন মরতে ?

তাপস জিজ্ঞেস করলো, কোন্ বাড়িতে খুন হয়েছে ?

প্রসন্নর বাড়িতে। লক্ষ্মীর কাছ থেকে সব শুনলাম। প্রসন্নর বাড়ির তিনতলায় মল্লিকার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটা অন্ধকার থাকতো তোর মনে আছে ? ওঘরে হাসিনা বলে একটা মেয়ের কাছে আসতো গোলক গুণ্ডা। সে নাকি খুব মস্তান, ওপাড়ার সবাই তাকে চেনে। প্রসন্ন বাড়িওয়ালা একদিন বললো, তুমি আর এসো না বাবা, তোমার ভয়ে আমার বাড়িতে লোক আসে না। চোপ শুয়ার ! বলে গোলক তাকে ধমকে দিয়েছে। তখন প্রসন্ন হাসিনাকে বললো, তুই ওকে ঢুকতে দিবি না ঘরে। হাসিনা বললো, ও-মরদকে আমার সাধ্য কি না বলি। জোর করে ঢুকবে। তা ছাড়া টাকা-পয়সা ঠিক দিচ্ছে— এবাড়িতে ও আসছে-যাচ্ছে ভদ্দরলোকের মতো। রুপিয়াও জায়দা দিচ্ছে। কোনোদিন তো এখানে হল্লা করে নি। করে নি, করতে কতক্ষণ ?— প্রসন্ন হেঁকেছে, তারপর দিয়েছে হাসিনার ঘরের আলোর লাইন কেটে। গোলক তাতেও কোনো আপত্তি করে নি। রোজ আসবার সময় মোমবাতি কিনে আনতো। কাল মল্লিকার ঘরে সন্ধেবেলা তিনটে

বাবু এসেছিল। তারা আর একজন চেয়েছে। হাসিনা তখন বাথরুম থেকে খালি গায় বেরুচ্ছিলো, তাকে দেখেই বাবুদের পছন্দ। কিন্তু হাসিনা রাজি নয়, ওটা গোলকের আসবার দিন। তখন বাড়িওয়ালা জোর করে দুটো লোককে ঢুকিয়ে দিল ওর ঘরে। খানিকক্ষণ বাদে গোলক হাজির হতেই লেগে গেল।

পরীক্ষিৎ চুরুট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, গোলক ধরা পড়লো?

মাথা খারাপ ! দুটো লোক আর একটা মেয়েকে ছুরি মেরে সে হাওয়া। আমাকে লক্ষ্মী বললো, গোলকের কিন্তু দোষ নেই বাপু, যাই বলো। তার যা ব্যাভার ছিল বাবুদের মাথায় হাগে। কেন তাকে ঘাঁটানো। সে তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যই দুটোকে ছুরি চালিয়েছে।— দেখলুম, গোলকের ওপর ওদের খুব ভক্তি। ওদের হীরো। আমি প্রসন্নর বাড়ি খুন শুনেই ভয় পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম কাছাকাছি। তাতেই তো পুলিশের হাতে পড়ছিলুম প্রায় ! লোক দুটোর চেহারার ডেসক্রিপসন শুনেই বুঝতে পারলুম অবিনাশ নয়,— তাছাড়া অবিনাশ খুন হবার ছেলেই নয়।

— আর মেয়েটা কে ?

মল্লিকা! পরীক্ষিৎ অন্যমনস্ক গলায় বললো।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলুম। মল্লিকার নাম শুনে ওরা সবাই বিষণ্ণ হয়ে গেছে মনে হয়। আমিও মল্লিকাকে চিনতুম। একদিন ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওরা জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।

স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে আলো ঝলমল পরপর ঘর। মল্লিকা মেয়েটার ঘর ছিল চমৎকার সাজানো গোছানো; রেডিওতে ইংরেজি সুর বাজছিল। মা–কালি আর সিগারেট কোম্পানির ক্যালেন্ডারে ন্যাংটো মেয়ের ছবি পাশাপাশি দেয়ালে এবং অশ্বারূঢ় শিবাজী। এছাড়া কয়েকটি নকল টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়াবিছে এখানে সেখানে ঝুলছে। বিরাট ভাসে একঝাড় লালগোলাপ, অমন সাটিনের মতো ঝলমলে লালগোলাপ আগে কখনো দেখি নি। মেয়েটা একেবারে পাগলাটে ধরনের ফর্সা, টান করে চুল বাঁধা, অল্প নেশার ঘোরে দুলছিলো, বলেছিল, তোমরা আবার কেন এসেছো ? মাঝে–মাঝে নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে প্রাইভেট কথা বলবে, একদম দেখতে পারি না। ঐ লোকটা আবার বই লেখে— তাপসের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, ওসব লেখক–টেখক আমার সয় না, মাইরি। অবিনাশ ততক্ষণে ওর বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে হুকুম করেছে, রেডিওটা বন্ধ করে দে মল্লিকা, পাখাটা খোল্ না! তারপর বলেছে, এই নে সিগারেট খাবি, ভালো সিগারেট আছে আজ। তাপসের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হলো মেয়েটার। তাপস বললো, নাও টাকা নাও, একটা বোতল আনাও। দু'ঢোক গিললেই মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে।

— না। আজ ভাগো। আমার শরীর ভালো নয়।

— তাতে কি হয়েছে, না হয় একটু গল্প–গুজবই করবো আজ।

না, হবে না। বেরোও বলছি !—মেয়েটা খুবই রেগে গেছে, কি জানি।

— আচ্ছা বাবা তোমার টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছি।

— টাকা দেখাচ্ছো মল্লিকা মিত্তিরকে ?—কত টাকা—দেখি।

তাপস কুড়িটা টাকা এগিয়ে দিলো। হাসতে হাসতে মেয়েটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে টলে গিয়ে দেয়াল ধরে সামলাতে সামলাতে কাশতে লাগলো।

— আচ্ছা আর পাঁচ টাকা বেশি নাও !

পাঁচ টাকা ! আবার পাঁচ টাকা ! সরু গলায় বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো মল্লিকা।

তাপস চটে উঠল এবার।—তোমার ঐ রূপের জন্য আবার কত চাও ?

কি ! মল্লিকা বাঘিনীর মতো ফুঁসে তাকালো তাপসের দিকে। ঘন নিশ্বাসে ওর বুক ফুলে উঠছে। আস্তে আস্তে বললো, রূপের দাম ? রূপ কি কিম্মৎ পাঁচ ঘা জুতি ! যাবার সময় পাঁচ ঘা জুতো মেরে যেও—বলে দশ টাকার নোট দু'খানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললো। আমি চুপ করে এই নাটক দেখছিলুম। অবিনাশ উঠে বললো, কি ঝঞ্ঝাট করছো মাইরি, দাও, এক গ্লাস জল দাও!

জল! মল্লিকা ছুটে গিয়ে খাটের তলা থেকে কাচের কুঁজোটা টেনে বের করলো, তারপর হঠাৎ দুম্ করে কুঁজোটা ফেলে দিলো মাটিতে। অবিনাশ আর কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল যাই, মাসির আজ মান হয়েছে !—আমরা বেরিয়ে আসার সময় মল্লিকা বললো, দেখো, যেন কারুর পা কাটে না কাচে। আমার ঘরে রক্ত–ফক্ত চলবে না।...

আমি বললুম, খবরটা শুনলে অবিনাশ খুবই দুঃখ পাবে। অবিনাশের ওপর মেয়েটার সত্যিই একটা টান ছিল।

না, পাবে না। তাপস বললো।

সত্যিই পাবে না পরীক্ষিৎ বলে, ঐ হারামজাদার বুকের মধ্যে দয়ামায়া কিছুই নেই। ওর আত্মাই নেই বোধ হয়।

অবিনাশও তোর সম্বন্ধে এই কথা বলে। আমি বললুম।

— যা যা ! আমার বুকে ভালবাসা আছে, তাই আমি কবিতা লিখি। অবিনাশ যা লিখেছে ওগুলো আবার লেখা নাকি ? ওর দ্বারা কিছু হবে না।

— তোদের ভালবাসা কী রকম জানিস্। একটা পিঁপড়ে মরলে তোদের প্রাণ কাঁদে, কিন্তু বাড়িতে তোর মা খেতে পেলো কিনা সে সম্বন্ধে খেয়াল নেই !

তাপস আমাকে বললো, শালা, তোর সব কথার মধ্যে বক্তৃতার ঢঙ এসে যায় কেন রে ?

আমি চুপ করে গেলুম। পরীক্ষিৎ উদাসভাবে বললো, ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছে। মায়ের মুখটাও আমার ভালো করে মনে পড়ে না।

ছায়াদি টেতে করে গরম নিমকি ভাজা আর চা নিয়ে এলো। এতক্ষণ লাগে তোমার চা বানাতে? পরীক্ষিৎ ধমকে উঠলো। তাপস বললো, তোর কবিতাগুলো কখন শোনাবি ?

— চা খাওয়ার পর না হয়—

— না, চা খেতে-খেতেই শোনা যাক্।

ছায়াদি নির্লজ্জের মতো বাঁধানো খাতাখানা এনে সতরঞ্চির একপাশে বসলো।

— খারাপ লাগলে স্পষ্ট করে বলবে কিন্তু, হেমকান্তি বাবু, আপনার কি খুবই শরীর খারাপ লাগছে ?

না–না হেমকান্তি মুখ গুঁজে বসেছিলো। এবার মাথা তুললো। ছায়াদি পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগলো। আমি একদম মনোযোগ দিলাম না সেদিকে। সব ছন্দ–মিল দেওয়া ট্রাস। পরীক্ষিৎ, তাপসও নিশ্চিত শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। ছায়াদির কি যে এই দুর্বলতা। রাশি–রাশি লিখে চলেছে এইসব—ছাপাও হয় নানা জায়গায়—তবু তরুণ সাহিত্যিকদের শোনাবার কি লোভ। মাঝে–মাঝে ওদের পিসিমা বাড়ি থাকে না—বা, মনে হয়, ছায়াদিই ওঁকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়—তখন এবাড়িতে দলেবলে আড্ডা। পিসিমা ভারি ঠাণ্ডা মানুষটি, কাঁচা বেলের ভেতরের মত গায়ের রঙ, সব সময়েই হাসিমুখ—একদিন শেখর এসে বমি করেছিল, পিসিমা নিজের হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। আমাদের বাড়িতে মা–পিসিমারা এসব করার কথা কখনো ভাবতে পারেন ? তা নয়, পিসিমা এদের অভিভাবিকা তো নয়, গলগ্রহ, বুদ্ধিমতি মহিলার

মতো তাই মানিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের পক্ষে অবশ্য ভালোই, চমৎকার আড্ডার জায়গা—তাছাড়া দুটি মেয়ে উপস্থিত থাকলে জমজমাট হয়। একমাত্র মুশকিল, মাঝে মাঝে ছায়াদির লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। তবে মেয়েদের স্তুতি করাটা ঠিক মিথ্যে নয়, চর্চা রাখা ভালো। দুপুরে তাপস যখন ফোন করলো তখনই বুঝতে পারলুম, কপালে আজ কিছু বাজে পদ্য শোনার দুঃখ আছে। মেয়ের লেখা কবিতা—এ যেন গোল বোতলে চৌকো কর্ক মাইরি, অবিনাশ বলে। অনেকটা ঠিকই বলে। ও ধড়িবাজ ছেলে—কি চমৎকার কেটে পড়লো মায়াকে নিয়ে। মায়াকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। কিশোরী অবস্থা থেকে আস্তে-আস্তে ওকে বড় হয়ে উঠতে দেখলুম ! ওর ঐ সুকুমার, স্বর্গীয় শরীর অবিনাশ কবে নষ্ট করে দেবে কে জানে !

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম— দেখলাম ছায়াদিও বেরিয়ে এসেছে। বললো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

— বলো।

— এখানে দাঁড়িয়ে বলবো ! না, চলো ওপরের ঘরে যাই।

ওপরের ঘরের দরজা ঠেলে খোলার আগেই বললো, না থাক্, চলো ছাদে যাই। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। অনেকগুলো টবে সাদা ফুলগুলো ফুটে উঠেছে। তিন-চার রকমের গন্ধ আমার নাকে লাগছে। ছোট্ট একটা ঘর আছে ছাদে। চারদিক চমৎকার নির্জন। ছায়াদিকে কী রকম রহস্যময় দেখাচ্ছে। আমাকে কী বলতে চায় ! আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করাবার মতলব নাকি ? আমি এতক্ষণে ওকে নিশ্চয়ই একটা চুমু খেয়ে খুশি করতুম—কিন্তু মায়ার ব্যবহারে মনটা কী রকম বিষিয়ে আছে। আমাকে ওর ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু আমাকে দেখে ওর ব্রেসিয়ার পরা বুকে শাড়িটা অন্তত জড়িয়ে নিতে পারতো।

— চলো, এই কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে চিলে ছাদে উঠবে ? হু-হু করে হাওয়া ধাক্কা মারবে।

— কি ব্যাপার, মনে হচ্ছে তোমার কথাটা বলার জন্য যেন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা দরকার ?

— হ্যাঁ, সেকথা স্বর্গে দাঁড়িয়ে বলা উচিত।

— আশা করি তুমি এখন বলবে না,— তুমি আমাকে ভালবাসো ?

ছায়াদি থতমত খেয়ে আমার চোখে চোখ রাখলো। তারপর খাদে গলার স্বর নামিয়ে বললো, তুমিও বুঝি প্রাণপণে হৃদয়হীন আধুনিক হবার চেষ্টা করছো বিমলেন্দু ?

— না তা নয়, তুমি বলার আগে আমি বলতে চাই। পৃথিবীর দিন এসে গেলেও—একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি, একথা বলায় কোনো আধুনিকতা নেই। ছায়াদি, তুমি আমার কাছে কি চাও ?

— আমি তোমার কাছে অমৃত চাই।

— আমার কাছে অমৃত নেই। সামান্য ভালবাসা আছে।

— না, ইয়ার্কি নয় বিমলেন্দু, আমি সত্যি তোমাকে কিছু জানাতে চাই।

— আমি ইয়ার্কি করছি না, আমি প্রাণ থেকে বলছি।

— ওকথা থাক। আমি অনেককে জানি, কিন্তু তোমাকেই আমার সবচেয়ে আপন লোক মনে হয়। কারুকে না বলে আমি আর পারছি না বিমলেন্দু, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।

— সে তো আমরা কেউ-ই আর বেশিদিন বাঁচবো না। মানুষ জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

— না, সে কথা নয়, অসুখ। আমার লিউকেমিয়া হয়েছে।

— লিউকোডার্মা ? ওটা আবার একটা অসুখ নাকি ?

— লিউকোডার্মা নয়, লিউকেমিয়া। এ অসুখ হলে মানুষ বাঁচে না। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো

নষ্ট হয়ে যায়। যাকে বলে ব্লাড ক্যানসার! এর কোনো চিকিৎসা নেই। চলো, তোমাকে ডাক্তারের রিপোর্ট দেখাচ্ছি। ডাক্তার বলেছে, আমি আর বড়জোর বছর খানেক।

— ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন হঠাৎ ?

— হঠাৎ নয়, আজ ছ'মাস ধরে যাচ্ছি। তুমি যেদিন আমার শ্বেতির দাগধরা ঠোঁটে আদর করলে সেদিনই মনে হলো শ্বেতি দাগটা না সারিয়ে দিলে আমার চলবে না। কারণ তোমার ঠোঁটে সেদিনই একটা চাপা অহংকার দেখতে পেয়েছিলাম। অহংকার এই জন্য যে, তোমার মন এতো বড়—তুমি ওসব দাগ-টাগ ঘেন্না করো না, এটা দেখাতে পারলে। কেন, তোমাদের কাছে আমি এরকম ছোট হয়ে থাকবো ?— জন্ম থেকে আমার শ্বেতি, তোমার নেই কেন ?

— তোমার ভুল ধারণা—

— আমার সারা শরীর শির শির করে, জ্বালা করে। তাই ডাক্তারের কাছে—

— আজ থাক, এই সন্ধেবেলা ওসব কথা আমার ভালো লাগে না। চলো নিচে যাই।

— না, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি আর সময় পাব না।

— কি ছেলেমানুষি করছো, চলো নিচে।

— না, বিমল, শোনো।

না, নিচে চলো। নিচে। আমার বড় অস্বস্তি লাগছে। আমার তেষ্টা পেয়েছে। ছায়াদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি এগিয়ে ওকে স্পর্শ করলুম। ওর সারা শরীরে যেন কোনো স্পন্দন নেই। আমি হাত ধরে নিচে নিয়ে এলাম। যেন ওর পায়ের তলায় চাকা লাগানো, সমস্ত শরীরটা অস্তিত্বহীন, বাসনা বা প্রতিরোধ নেই, নেমে এলো নিচে।

রাত্তির সাড়ে দশটার মধ্যেও অবিনাশ ফিরলো না মায়াকে নিয়ে। এর মধ্যে আবার গন্ধ শুঁকে-শুঁকে হাজির হয়েছে শেখর আর অম্লান, হৈহৈ ও চিৎকারে কান পাতা যায় নি এতোক্ষণ, শেখর কাচের গ্লাস ভেঙেছে, অম্লান হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জানলা দিয়ে— তাস অদৃশ্য করার ম্যাজিক দেখাবার নাম করে। এখন কী চেহারা হয়েছে ঘরটার। অসংখ্য পোড়া সিগারেটের, চুরুটের ছাই, কাপ উল্টে চা পড়েছে বিছানা ও চাদরে, শ'খানেক দেশলাইয়ের কাঠি, তাপসের কাছে একটা মরা প্রজাপতি। ওটার উপর যতবার আমার চোখ পড়েছে আমি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। প্রজাপতি নয়, হয়তো মথ, যেগুলো রাত্রে ওড়ে। হলুদ ও কালোয় মেশানো দুই ডানা মেলে ওটা পড়ে আছে। একটু আগে হঠাৎ উড়তে-উড়তে ঘরে এসেছিল—সারা ঘরটা যখন পাক দিচ্ছিল অন্ধের মতো, তখন আমাদের সকলের চোখগুলো ছিল ওর পিছনে।—আবার কাকে দল থেকে খসাতে এসেছে ওটা, পরীক্ষিৎ বলেছিল, কার হলুদ খামে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানিক ?

বেশ সুন্দর দেখতেরে পোকাটাকে, যা ছায়ার কপালে দিয়ে বোস। ওর যে বয়েস পেরিয়ে গেল।

এই তাপস, আমি তোর চেয়ে বয়সে ছোট জানিস, ছায়াদি চেঁচিয়ে উঠলো। হেমকান্তি একদৃষ্টিতে ওকে দেখছিল। মাথা ধরার জন্যই কিনা, ওর দুচোখ অসম্ভব লাল, দুই বিস্ফারিত চক্ষুতে প্রজাপতি দেখছিল হেমকান্তি। হঠাৎ ওটা ঝপ করে উড়ে বসলো তাপসের গায়ে। একি রে, একি, উঃ— বলে আরশোলা গায়ে বসলে কোনো কোনো মেয়ের ভঙ্গির মতো ছটফট্ করে উঠলো তাপস। এক ঝটকায় ওটাকে গা থেকে ফেলে দিল। সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল, প্রজাপতিটা

স্থির হয়ে পড়ে রইলো।

একি, মেরে ফেললি নাকি ? পরীক্ষিৎ আলতোভাবে ওর হাতের চেটোয় তুলে নিল, তারপর নিজের দৃষ্টি যেন ওর শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখে বললো, না, শেষ হয়ে গেছে। ওটাকে ফেলে দিয়ে আবার অন্য কথাবার্তা বলতে লাগলো। তারপর থেকে আমরা এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ বাদে চুরুট ধরাবার সময় অন্যমনস্কভাবে পরীক্ষিৎ দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে দিতেই— সেটা গিয়ে পড়লো ওর ছড়ানো ডানায়, দপদপ করে জ্বলতে ও কাঁপতে লাগলো আগুনের ছোট্ট শিখা, ধোঁয়া উঠতে লাগলো সেখান থেকে। ওরা কেউ লক্ষ করে নি। আমি খুব চুপিচুপি, যেন কেউ দেখতে না পায়— যেন কোনো খুব অন্যায় করতে যাচ্ছি, এইভাবে কাঠিটা আস্তে তুলে অন্য জায়গায় ফেলে দিয়েছিলাম।

নাঃ, ভালো লাগছে না, বাড়ি যাই। পরীক্ষিৎ বললো। ওর শরীর যথেষ্ট খারাপ দেখাচ্ছে, তবু কী করে ঘুরে বেড়ায় কে জানে। মাথা ফাটিয়েছে, ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে তারপর কেউ আবার বেঁচে ওঠে, একথা কখনো শুনি নি। ও বলেই বেঁচেছে। শুধু তাই নয়, ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যাওয়াও পরীক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব। কি জানি ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দিয়েছিল কিনা, হয়তো প্রাণে বেশি কবিত্ব এসেছিলো।

আমারও আর বসতে ইচ্ছে করছিল না। ছায়াদিকে বললুম, আজ যাই, কাল পরশু তুমি আমার ওখানে আসবে একবার ! আমিই যেতুম, কিন্তু তোমাদের অফিসের ঐ ব্যানার্জি বড় বিশ্রীভাবে তাকায়।

— তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাবো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারি খোঁজাখুঁজি করে দু'খানা পেপার ব্যাগ গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নিলাম।

এগুলো এখন কেউ পড়ছে নাকি ? জিজ্ঞেস করলুম। ঘাড় নেড়ে ছায়াদি 'না' জানালো।

পরশুদিনের মধ্যে আমাকে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে একটা লিখতে হবে— তার আগে এরকম কিছু হালকা বই না পড়লে আমার কিছুতেই মন বসে না।

— তাপস, তুই এখন যাবি ?

— না, একটু অবিনাশের জন্য বসে যাই।

— আপনি যাবেন নাকি পরীক্ষিৎবাবু ?

— অবিনাশের সঙ্গে আমার দরকার আছে। তাছাড়া টাকাটা নিয়ে গেল।

দেয়ালে পারিবারিক গ্রুপ ফটোগ্রাফের মধ্যে ফ্রকপরা মায়াকে দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হলো ওরা কি আজ সারারাত এখানে বেলেল্লা করবে ?

ছায়াদি বোধ হয় আপত্তি করবে না। কিন্তু মায়া থাকতে দেবে না কারুকে। মায়া এসব ব্যাপারে খুব কঠিন, হয়তো তার কারণ মায়ার কবিতা লেখার রোগ নেই।

আমি যাবো, দাঁড়ান। হেমকান্তি উঠে দাঁড়ালো। যেন ওর বিষম দরকার, এক্ষুনি না গেলে চলবে না। অথচ আমি জানি, আমাদের মধ্যে যেকোনো একজন যদি যাবার কথা না বলতে, তবে হেমকান্তি এখানেই অনন্তকাল বসে থাকতো।

আরেকটু বসে যা বিমলেন্দু, আমি যাবো। শেখর বললো।

— তুই তো অন্যদিকে। আমি যাই—

— বোস্ না, তোকে এগিয়ে দেবো এখন্—

— কতদূর এগিয়ে দিবি ?

— নরক পর্যন্ত।

ওদের ফেলেই আমি আর হেমকান্তি বেরিয়ে এলাম। বাইরে বিষম ঠাণ্ডা। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। 'আপনার মাথা ধরা কমেছে ?'

হেমকান্তি ওর সুন্দর, বিষণ্ন মুখ আমার দিকে তুলে বললো, 'না'। হেমকান্তির মতো রূপবান যুবা—আমাদের বন্ধু–বান্ধবদের মধ্যে তো নেই–ই, দেখেছিও খুব কম। আমার চেয়েও প্রায় আধ হাত লম্বা, চৈতন্যদেবের মতো গায়ের রঙ, ছিপছিপে শরীর, কপালের ওপর জোড়া ভুরু। অথচ মেয়েরা হেমকান্তিকে পছন্দ করে না। অবিনাশের চেহারা গুণ্ডার মতো, একমাথা চুল, চাপা নাক, তবু অবিনাশ ললনাপ্রিয়। হেমকান্তির কি অসুখ আমি জানি না, সবসময় চুপ করে থাকে, কথা বলতে চায় না অথচ বন্ধু–বান্ধবদের সংসর্গ ভালবাসে। যে–কোনো আড্ডায় আসা চাই, শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকবে, না জিজ্ঞেস করলে একটাও মন্তব্য করে না। চরম উত্তেজনা, বিষম তর্কাকর্তির মধ্যেও হেমকান্তি নিঃশব্দ। এমন যখন ওর স্বভাব তখন ও একা থাকলেই পারে॥ কিন্তু কে বলবে একথা। ও কবিতা লেখে না, কিছুই লেখে না। ইকনমিকসে ভালো রেজাল্ট করেছিল, চাকরি–বাকরি করে না, তবু বাড়ির অবস্থা বোধ হয় অসচ্ছল নয়। বাড়ির লোকেরা ওর এই অদ্ভুত জীবন কী করে সহ্য করে বুঝি না! ওর এইরকম নম্রভাবে চুপ করে থাকা আমারও বিরক্তিকর লাগে।

সবচেয়ে মজা হয় মেয়েদের সঙ্গে। যখন মেয়েরা থাকে, স্বভাবতই রূপবান হেমকান্তির দিকে তাদের বেশি কৌতূহল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের দিকে তাকায় নি, কথা বলে নি, প্রশ্ন করলে এক অক্ষরে উত্তর দিয়েছে। মেয়েরা এখন ওকে নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করে। মায়া ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। হেমকান্তি সম্বন্ধে গভীর বিতৃষ্ণা মায়ার চোখে–মুখে ফুটে ওঠে, আমি দেখেছি।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে হাঁটবার পর হেমকান্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি... বাড়ি ফিরবেন ?

'হ্যাঁ', আমি বললুম, 'কেন, আপনি ফিরবেন না !'

'ঠিক... ইচ্ছে,... আমার মায়ের খুব... অসুখ।' হেমকান্তি দাঁড়িয়ে পড়লো।

— তার মানে ? অসুখ বললেই বাড়ি ফিরবেন না ? কী রকম অসুখ ?

— খুবই... বলা যায়—

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বাড়িতে হেমকান্তির অবস্থা। সকলে বিষম ব্যস্ত, উৎকণ্ঠা, ডাক্তার আসা–যাওয়া করছে— হেমকান্তি চুপ করে সারাদিন বসে আছে নিজের ঘরে, অথবা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সকলের ব্যস্ততা দেখছে। তার নিজের কিছুই করার নেই,— কেউ তাকে ডাক্তার ডাকতে বলবে না, ওষুধের দোকানে পাঠাবে না। জীবন–মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেও ওর মা যদি একবার আকুলভাবে ডেকে ওঠেন, 'হেম কোথায়, হেমকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে, হেম'— তখনও হেমকান্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাববে সাড়া দেবো কিনা, জোরে কথা বলতে হবে— না ফিসফিসিয়ে, মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো— না হাঁটু মুড়ে বসবো, কপালে হাত রাখবো— না কাঁদবো পা ছুঁয়ে,— এসব বিপুল সমস্যার বদলে বাড়ির বাইরে থাকাই ভালো— হেমকান্তি ভাবে নিশ্চিত। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। অনেক পোষা কুকুরের মুখের দিকে মাঝে–মাঝে তাকালে যেমন মনে হয়, মানুষের ভাষায় কথা বলার জন্য বেদনা জেগে উঠেছে তাদের মধ্যে— হেমকান্তির মুখেও সেই বেদনা। যেন ও মানুষের ভাষা জানে না।

আমি হেমকান্তিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, কি বলছেন ? খুব বেশি অসুখ নাকি ? এতোক্ষণ কিছু হয়ে যায় নি তো ?

— জানি না।

আমার বিষম ভয় হলো। হেমকান্তি বোধ হয় মায়ের মৃত্যুর সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এতোক্ষণ কিছুই জানায় নি।

— শিগ্‌গির চলুন বাড়ি। আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

কয়েক পা এগিয়েই হেমকান্তি আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, না, আপনি... মানে... আমি একাই যাই। এসব জিনিস দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যায় না।

হেমকান্তির বাম বাহু জোর করে চেপে আমি ছুটে চললুম। কাছেই সাদার্ন রোডের মুখটায় বাড়ি।

বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। সদরের সামনে খোলা জায়গাটায় চড়া পাওয়ারের আলো। রাস্তায় বিপুল জ্যোৎস্না আজ। সুতরাং কাছের ইলেকট্রিকের আলো আর জ্যোৎস্না এক জায়গায় মিশেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মিশ্রিত আলোর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ পেলুম।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে পা দিলুম দু'জনে। এ বিষয়ে আমার অনুভূতি একেবারে নির্ভুল। আমি জানি, হেমকান্তির মা আর বেঁচে নেই। এই নিস্তব্ধতা, সিঁড়ি কিংবা দেয়াল—এর যে-কোনো একটা দেখলেই এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথা বুঝতে পারা যায়। যে বাড়িতে মৃত্যু হয়, সে বাড়িরই দরজা সে রাত্রে হাট করে খোলা থাকে, আমি দেখেছি। কেন ? ডাকাতের কথা তখন মনে থাকে না কারুর ? কেন ? মৃত্যুর থেকে আর বড় চুরি হয় না এই ভেবে ? যাই হোক, মৃত্যুর বাড়িতে কখনো চুরি হয়েছে আমি শুনি নি। সে বাড়ির দরজার একটা পাল্লা ভেজানো পর্যন্ত থাকে না। দুটো দরজাই সম্পূর্ণ খোলা থাকে, আমি বারবার লক্ষ্য করেছি। হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আমার বাড়িতে ভাত ঢাকা দিয়ে মা আমার জন্য জেগে বসে আছেন। আমি কেন এত দেরি করছি। আর কোনোদিন দেরি করবো না। কিন্তু এখন তো হেমকান্তিকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই দেখা গেল তিনজন দামি পোশাক পরা ভদ্রলোক দ্রুত বেরিয়ে আসছেন একটা ঘর থেকে। হেমকান্তিকে দেখেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

— একি, তুমি শ্মশানে যাও নি ? সারা কলকাতা খোঁজা হচ্ছে তোমাকে !

তাঁদের কথার মধ্যে ভর্ৎসনার সুর ছিল না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুক মুচড়ে উঠলো। হেমকান্তি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

চলো, আমাদের গাড়ি আছে, শ্মশানে যেতে হয়, জুতো খোলো ! সেই তিনজনের মধ্যে একজন খুব নরম গলায় বললেন।

— মামাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শ্মশান দেখতে পারি না।

সেই ভদ্রলোক কাছে এসে হেমকান্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বুকের মধ্যে অনেকখানি হাওয়া টেনে নিয়ে হু-হু করা গলায় বললেন, তোকে আমি কি-আর বলবো হেম, চল, যেতে হয়,— যে গেলো সে ছিল আমার দিদি, তোর মা,—তোকে সান্ত্বনা দিতে পারবো না আমি, চল, হিন্দুধর্মের নিয়মগুলো মেনে দেখ্, দুঃখ-কষ্ট আপনি কমে যাবে।

আমি হেমকান্তির মুখের দিকে ভালো করে খুঁজে খুঁজে দেখলুম। সাদা পাথরের মূর্তির মতো স্পন্দনহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কি জানি কি রকম দুঃখ-কষ্ট ওর, চোখে-মুখে যার কোনো চিহ্ন ফোটে না। হঠাৎ হেমকান্তিকে আমার অত্যন্ত নির্লজ্জ রকমের বিলাসী পুরুষ বলে মনে হলো।

ছায়া

ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, ছায়া, তোকে আমি আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেবো, তুই খুব নামকরা শিল্পী হবি। বাবা আমাকে রঙের বাক্স কিনে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমি হরপার্বতী, গাছের মাথায় চাঁদ আঁকতুম। বাবা আমার লেখাপড়া সম্বন্ধেও খুব যত্ন নিতেন। আমার জন্য মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আমি ছেলেবেলায় খুব অসুখে ভুগতুম, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বই পড়তুম শুধু— বাবা আমার জন্য লাইব্রেরি থেকে রোজ বই এনে দিতেন। বলতেন, লেখাপড়া শিখে বড় হবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, পৃথিবীর কাউকে গ্রাহ্য করবি না। আজকাল মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভর না করেও বাঁচতে পারে। পরে বুঝেছিলাম বাবার অতসব কথা বলার মানে, আমার ঠোঁটের নিচে, কানের পাশে সাদা দাগ। শ্বেতি। তাপসই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাপস বলতো, দেখবি, ক্রমশ তোর সারা মুখ, হাত-পা সাদা হয়ে যাবে। তোর আর বিয়ে হবে না।

তাপস আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো— সেই তমলুকে, উনিশশো বেয়াল্লিশে, চুয়াল্লিশে। ওর বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার, আমার বাবা দারোগা। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে আমি আর মায়া ফুলের বাগান করেছিলাম। মা সিঁড়ির ওপর বসে বসে দেখতেন। মায়ের হাঁপানি ছিল বিষম, হাঁটাচলা করতে পারতেন না। মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলতেন, তোদের দু'জনের একজনও যদি ছেলে হতি, আমার কোনো ভাবনা থাকতো না। আমরা আসলে পূর্ববঙ্গের লোক বলে 'বাঙাল বাঙাল' বলতো অনেকে, দারোগার মেয়ে বলে ভয়ও করতো। তাপসরা খুলনার, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতো না। তাপসের মা বলতো, খুকী বাড়ি যাও, ঝড় আসতিছে, পরে আর যাতি পারবা না।

তাপসরা হাতে লেখা পত্রিকা বার করতো— আমাকে দিতো তার ছবি আঁকতে। আমি সুন্দর করে নানা রঙের লতাপাতা এঁকে দিতুম। আমি একবার বলেছিলাম, তাপস, আমার একটা পদ্য ছাপাবি এবারের বইটাতে ? তাপস বলেছিলো, ভাগ, তুই আবার কবিতা লিখবি কিরে ? মেয়েদের দ্বারা কবিতা হয় না। মেয়েদের নিয়েই তো কবিতা লিখতে হয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই কোন্ মেয়েকে নিয়ে লিখিস রে ?

সুরঞ্জনাকে নিয়ে! অম্লান বদনে ও বলেছিলো। চৌধুরী-বাড়ির মেয়ে সুরঞ্জনা— তাপসের কথা শুনে আমার রাগ হলেও খুব বেশি হয় নি, কারণ সুরঞ্জনা ছিল রাজকন্যার মতো রূপসী। আমি বলেছিলাম, যা, যা, সুরঞ্জনা তোর দিকে কোনোদিন ফিরেও তাকাবে না। তাপস আর আমার দু'জনেরই বয়েস তখন তেরো। মায়ার আট।

তাপস ছিল ছেলেবেলা থেকেই একটু বখাটে ধরনের। ইস্কুলে পড়তে-পড়তেই বিড়ি-সিগারেট খেতো। দুপুরবেলা বাবা থানায় চলে যাবার পর তাপস আমাদের বাড়িতে আসতো। মা ঘুমিয়ে পড়লে ও দিব্যি সিগারেট ধরাতো, দেশলাই জ্বালবার সময় খুক করে একবার কেশে শব্দটা চেপে দিতো। নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করতো, রিঙ করতো, আমাকে বলতো, খাবি ? খা-না। মায়া এক একদিন ওকে ভয় দেখাতো, বাবাকে বলে দেবো। তাপস বাবাকে খুব ভয় করতো। তখন থেকেই তাপস অসম্ভব নিষ্ঠুর আর নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাপসরা আজকাল নিজেদের বলে আধুনিক সাহিত্যিক। আধুনিকতা মানে নিষ্ঠুরতা।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় টেস্টের পর আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনো করতুম— তখনও বাবা মারা যান নি। আমাদের বাড়ির পিছনদিকটার ছোটঘরে বই-খাতা ছড়িয়ে বসতুম। তাপস অধিকাংশ সময়ই চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে-টানতে বলতো, তুই থিয়োরেমগুলো চেঁচিয়ে মুখস্থ কর— তোর পড়া ধরবো। আমারটা শুনে-শুনেই তাপসের মুখস্থ হয়ে যেতো। এমনিতে

বদমায়েশি–বখামি করলেও পড়াশুনোয় ও ভালো ছেলে ছিল। নিজের সম্বন্ধে বিষম অহংকার ছিল তখন থেকেই। বলতো, দেখবি এককালে তোদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার সময় আমার গল্প কবিতার ব্যাখ্যা মুখস্থ করবে। দু'জন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে একসঙ্গে দুপুর কাটাতুম কিন্তু কখনো অসভ্যতা করে নি তাপস। আমিই বরং মাঝে–মাঝে ওর একটা হাত অনেকক্ষণ ধরে থাকতুম। তাপসের কোনো ভাবান্তর ছিল না। কখনো কখনো ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো— তারপর আমার ঠোঁটে–মুখে–কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোকে আশীর্বাদ করছি ছায়া, তোর ঐ দাগ একদিন মিলিয়ে যাবে। এমনিতে তোকে বেশ সুন্দর দেখতে। তাছাড়া দাগ না উঠলেও ক্ষতি নেই— ও দাগ ছোঁয়াচে নয়, ওতে কোনো দোষ হয় না। তাপসের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকে মিশেছি,— ছোট–ছোট ছেলেমেয়েরা যে কতগুলো ঠিকে অসভ্যতা করে— আড়ালে চুমু খাওয়া, জড়াজড়ি, কি প্যান্ট–ফ্রক খুলে দেখাদেখি—সেসব কখনও না।

যখন প্রথম আমি বালিকা থেকে নারী হলাম, তখন কয়েক দিনের জন্য আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সবসময় ছটফট করতাম, চুল বাঁধতে ইচ্ছে করতো না, আয়নায় শরীর দেখতুম, নিজেই নিজের বাহুতে চুমু খেতাম—শুয়ে–শুয়ে বা বাথরুমে আমি নানান ছেলের কথা ভাবতাম চোখ বুজে— যেন তারা আমাকে আদর করছে কিংবা পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু কখনও তাপসের কথা ভাবি নি।

তাপস একবার মাত্র একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল। সেদিন দুপুরে ঘোর বৃষ্টি। আমি খাওয়ার পর পড়ার ঘরে বই খুলে বসে আছি—তাপস এলো অনেক দেরি করে, ভিজতে ভিজতে। পরীক্ষার মাত্র একমাস দেরি। তাপস সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ রইলো, কোনো কথা নেই, যেন কান পেতে কোনো শব্দ শুনছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, বৃষ্টির আওয়াজে সর্বত্র শব্দহীন। বাড়িতে কেউ জেগে নেই, মায়া ইস্কুলে। জিজ্ঞেস করলুম, কিরে ভূতের মতো রইলি যে ? আজ না গ্রাফের অঙ্ক কষার কথা ছিল। ভিজে জামাটা খুলে ফ্যাল না !

শুকনো মুখে তাপস বললো, আজ সকালে একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ হলো না। গল্পটা শেষ করতে না পারলে মন স্থির হচ্ছে না, তোকে একটা কথা বলবো ?

— কি ?

— কিছু মনে করবি না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হিসেবেও ধরতে পারিস। মনে কর, আমরা হাইজিন পড়ছি।

— কি ব্যাপার কি ?

— রাগ করা চলবে না কিন্তু। তোর শাড়ি ব্লাউজগুলো সব একবার খুলে ফেলবি ? আমি একবার তোকে দেখবো।

শুনেই কি যে হলো আমার, বৃষ্টির শব্দ ছাড়িয়েও বুকের মধ্যে অন্য একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। বুঝতে পারলুম শরীর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি ঘরের কোণের দিকে সরে গেলুম।

— না, না, মানে জানিস্, খারাপ কিছু না, আমি কোনো মেয়ের সম্পূর্ণ শরীর দেখি নি। একবার দেখতে চাই। শুধু দূর থেকে—

— তাপস !

— তোর ভয় নেই, গায়ে হাত দেবো না, দূর থেকে— একবার, কেউতো নেই এদিকে।

— তাপস, তুই এতোটা—

— সত্যি আমার খুব ইচ্ছে হয় ! গল্পটা শেষ করতে পারছি না। গল্পে এরকম একটা ব্যাপার আছে। অথচ নিজে না দেখে, অভিজ্ঞতা ছাড়া ... লুকিয়ে–চুরিয়ে যে কখনো দেখি নি তা নয়,

ছোট মাসীকে চান করার সময় বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে দেখেছি— কিন্তু সামনা-সামনি স্পষ্ট দেখতে চাই। তোকে ছাড়া আর কাকে বলবো ?'

আমার শরীর কাঁপছিল। বললুম, ইতর কোথাকার। এটুকুও জানিস্ না, একথা কোনো মেয়েকে বলার আগে বলে নিতে হয়, আমি তোমাকে ভালবাসি !

তাপস হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, ও— তুইও বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' পড়েছিস ?

— না, পড়ি নি। তোকে আমার সহ্য হচ্ছে না, তুই চলে যা—

পড়িস নি ? তাহলে সব মেয়েই বুঝি এই কথা বলে। আচ্ছা থাক্। তাপসের চেহারা খারাপ নয়, মাজা-মাজা গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মুখে একটা পাগলাটে ধরনের শ্রী ছিল। কিন্তু সেদিন আমার মনে হলো ওর মধ্যে যেন শয়তান ভর করেছে। আমি বললুম, তুই এক্ষুনি চলে যা, আর আমাদের বাড়িতে আসিস না। তোকে বাদ দিয়েই আমি পাশ করতে পারবো !

সেবার অবশ্য আমার পরীক্ষাই দেওয়া হয় নি।

বছর আষ্টেক বাদে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত তাপস আমার নিরাবরণ শরীর দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ওরই জিত্ হলো। সেটা ছিল সম্পূর্ণ আমার দোষ। তখন তাপসরা তরুণ সাহিত্যিকের দল আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে শুরু করেছে। তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলাম। মাথার ওপর কোনো অভিভাবক ছিল না। এখন আমি নিজেই নিজের অভিভাবিকা হতে পেরেছি। আমার স্বাস্থ্য এমনিতেই ভালো, দু'বেলা ক্ষিদে পায়, মাঝ রাত্তিরেও অন্য রকম ক্ষিদে পেতো। কিন্তু ছেলেরা কেউ আমাকে দিদি বলতো, কেউ বন্ধুর মতো। কিন্তু কেউ আমাকে আড়ালে ডাকে নি, আমাকে একা কেউ চায় নি। আমি সবার সঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কিন্তু কান্না পেত, কারুর বুকে আমি জীবনে মাথা রাখি নি। সেই রকমই এক বৃষ্টির দুপুরে তাপস এলো। এসেই বললো, হঠাৎ তোর কথা মনে পড়লো ছায়া। তাই এলুম। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ অভিমানে আমার বুক ভরে গেল। কেউ আসে না হঠাৎ আমার কথা ভেবে, আমি জানি। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, তাই নাকি ? বোস্।

— তমলুক গিয়েছিলাম— আজই ফিরেছি, স্টেশন থেকে সোজা তোর এখানে এলাম। তোকে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম—হঠাৎ তমলুকে গিয়ে বিষম মনে পড়লো। তোদের কোয়ার্টারে অনেক লোক এসেছে। সামনে বাগানটার ফুলের বদলে বেগুনের চারা লাগিয়েছে। বড় খারাপ লাগলো। হঠাৎ একঝলক হাওয়া দিতেই মনে হলো তোর মা যেন সিঁড়ির ওপর বসে আছেন আর তুই ফ্রক পরে জলের ঝারি হাতে ঘুরছিস। ... আমার ছেলেবেলাটাকে তুই বড় দখল করে আছিস। তখনই মনে হলো, ফিরেই তোর কাছে যাবো। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিবি ?

দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল তখন, পিসিমা ঘুমোচ্ছেন।

— কি খেতে দেবো ? দুধ চিঁড়ে খাবি ?

— হ্যাঁ, তাই দে না, ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে।

তাপস সোজা আমার কাছে চলে এলো, কি করে ওর এরকম দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল জানি না। আমার মুখটাকে জোর করে ধরে ঠিক আমার ঠোঁটের নিচে ও কানের পাশে— যেখানে সাদা দাগ, দীর্ঘ চুমু খেলো। আমার চোখে কান্না এসেছিল, আমি দু'হাতে ওকে ঠেলে দিতে গেলুম। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। ও আমার ব্লাউজ, শাড়ি, শায়া সব খুলে ফেললো। আমি আর বাধা দিই নি। তাপস আমাকে বিছানায় শুইয়ে ফেলে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। আমি ক্লিষ্ট গলায় বললুম, তুই কি এখনো কোনো মেয়ের শরীর দেখিস নি ?

— হ্যাঁ দেখেছি, অনেক। কিন্তু প্রত্যেকে অন্যরকম। ছায়া, আমি তোকে সম্পূর্ণভাবে না দেখলে তোকে কখনো চিনতে পারতুম না। তুই সত্যিই অসাধারণ।

আমার শরীরের অন্য কোনো জায়গায় আর সাদা ক্ষত ছিল না বলে আমি সেদিন খুশি হয়েছিলাম, না হলে আমি চোর হয়ে যেতুম। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তাপস, তুই আমাকে বিয়ে করবি !

— না।

— কেন !

— কারণ, তোর কথা কখনো আমি ভাবি নি।

— তবে আজ কি জন্য এসেছিস্ ? শরীর ?

— হ্যাঁ।

— কেন ?

— কারণ, আমি তোকে ভালবাসি।'

আমি উঠে–বসে কাপড়টা জড়িয়ে বললুম, এর মানে কি ?

— মানে হয় না বুঝি ? তা হলে জানি না। যা মনে হলো তাই বললুম।

— এ কিরকম অদ্ভুত মনে হওয়া ?

— সত্যিই তা জানি না রে ছায়া ? আমার যা মনে হয়, তাই বলি, তাই লিখি। বিচার–বিবেচনা করে অত দেখতে ইচ্ছে করে না। আজ যা বললুম, কাল হয়তো তা মনে হবে না। তাতে দোষ কি? আমি এরকমভাবেই জীবন কাটাতে চাই।

আমি মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। আমার চোখের জল থামছিল না। সম্পূর্ণ বিচার–বিবেচনাহীন চোখের জল। বুক থেকে ঠাণ্ডা একটা গভীর উদাসীনতা উঠে এলো। তারপর তাপসের দিকে ফিরে খাটের ওপর খানিকটা জায়গা করে দিয়ে বললুম, আয়, দেখি, তোকেও দেখে সম্পূর্ণ চেনা যায় কিনা।

সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয় নি, কারণ পরীক্ষার সাতদিন আগে বাবা খুন হয়েছিলেন। বাবা গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন ইন্সপেকসানে। রাত্রে ফিরলেন না। পরের দিন তাঁকে নিয়ে আসা হলো একটা গরুর গাড়িতে, বরফের গুঁড়োয় সারা শরীর ঢেকে। মরা মানুষের চোখ যে কত বিশ্রী হয় সেই প্রথম দেখলুম। সেই ঘটনায় মা কিছুদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন বেশ হাসি–খুশি মানুষ, খুব বড় চরিত্রের নয়। বাবা ঘুষ নিতেন, সন্ধের দিকে রোজ খানিকটা মদ খেতেন আমরা জানতুম। চোর–ডাকাতদের দমন করার বদলে তাদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করাই ছিল তাঁর নীতি। ঘুষের টাকা জমিয়েই তিনি কলকাতায় আমার নামে এই ছোট বাড়িটা কিনে ভাড়া দিয়েছিলেন। তবে মদ চোলাই–এর দলটাকে দমন করবার জন্য তিনি কেন উঠেপড়ে লেগেছিলেন জানি না, বোধহয় তারা বাবার মদেই ভেজাল দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওটা টেররিস্টদের আড্ডা, আগস্ট আন্দোলনের রেশ তখনো থামে নি।

বাবা মারা যাবার পর আমাদের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হলো। তারপরও কিছুদিন আমরা তমলুকে ছিলাম। অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে। কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার সময় মায়া বলেছিলো, দিদি, ফুলগাছগুলো তো আমাদের, ওগুলো নিয়ে যাবো। আমি বলেছিলাম থাক্ না। মায়া ছেলেবেলা থেকেই বিষম জেদি, যাবার সময় টেনে–টেনে ফুলগাছগুলো তুলে নিল। যে বাড়িটায় আমরা গেলাম, সামনে মাঠ নেই, ছোট, অন্ধকার মতন। মায়া একটুখানি জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে গাছগুলো লাগালো, কিন্তু গোলাপ, ডালিয়া, যুঁই, ক্যানা একটাও বাঁচলো না।

আমার পরীক্ষা দেওয়া হলো না সেবার, বর্ধমান থেকে বড় পিসিমা এসে রইলেন কাছে,

তাছাড়া বরদা উকিল বাবার বন্ধু ছিলেন, আমরা জেঠাবাবু বলতুম, তিনি আমাদের দেখাশুনো করতে লাগলেন। বাবার টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করা, কলকাতার বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা সবই করেছিলেন। তাপস ততোদিনে পাশ করে কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো। সেবারই পুজোর ছুটিতে ওর দুই বন্ধু এসেছিল বেড়াতে— পরীক্ষিৎ আর অনিমেষ। তিনটে ঝকঝকে টাটকা ছেলে— সন্ধের সময় রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে যেতো। আমার সঙ্গে একবার বন্ধুদের নিয়ে দেখা করতে এসেছিল তাপস। কিন্তু তখন ওর ওপর আমার রাগ ছিল, সেজন্য ভালোভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলি নি। তখন আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছি, মাঝে-মাঝে ডাকে নানা পত্রিকায় পাঠাতুম। কোনো কোনো সময় তাপস, পরীক্ষিৎ আর আমার লেখা একই পত্রিকায় বেরুতো— কিন্তু আমি ওদের লেখা পড়ে বুঝতে পারতুম না।

কলকাতার বাড়িতে একতলায় নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দোতলায় আমরা উঠে এলাম বছরখানেক বাদে। তমলুক সেই ছেড়ে আসা চিরকালের জন্য —আমার ছেলেবেলার তমলুক। আসবার সময় মনে হয়েছিল, ওখানে আমরা বাবাকে ফেলে এলুম। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা দরকার ছিল।

মা বিছানায় শুয়ে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। মায়া ক্রমে যুবতী হয়ে উঠছে। রাত্তিরে খাবার সময় বহুক্ষণ ধরে গল্প করতুম আমি, মায়া, পিসিমা, মা। মা বলতেন, কলকাতা শহরে থাকার এই সুবিধে, পুরুষমানুষ না থাকলেও চলে। মায়ার নানান রকম ছেলেমানুষি কাণ্ড নিয়ে আমরা রোজ রাত্রে খুব হাসাহাসি করতুম। মায়া কোনো কারণে রেগে গেলে সাতখানা-আটখানা করে কাচের গেলাস ভাঙতো। ইস্কুলে যাবার সময় ছেলে-ছোকরারা যদি কোনো মন্তব্য করতো মায়া সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে তার উত্তর দিতো। মোড়ের মাথায় একটা ছেলে ওর সামনে শিস্ দিয়েছিল বলে মায়া সোজা সেই ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে তার বাবাকে বলে দেয়। সেই ভদ্রলোক পরে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে যান। মায়া একবার বায়না ধরেছিল, শীতকালে প্যান্টকোট পরে রাস্তায় বেরুবে। মা, পিসিমা কত ঠাট্টা করলেন, 'বিবিসাহেব' 'মসিবাবা' কত কি বলে হাসাহাসি করা হলো, কিন্তু মায়া অটল। এ যে সম্ভব না, তা মায়াকে কিছুতেই বোঝানো গেল না— সেই নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি শুরু হয়ে গেল— আমি মায়াকে কোনোদিন বকি নি, কিন্তু ওর বোকা গোয়ার্তুমি দেখে চড় মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মায়া মত বদলাবে না, রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দিল। মা শেষটায় বললেন, দে ছায়া, ওকে এক সেট বানিয়ে দে। বাড়িতে দর্জি ডেকে মাপ দেওয়া হলো। যখন তৈরি হয়ে এলো— সব পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ার কি হাসি। মা বিছানার ওপর উঠে বসেছেন, পিসিমা আর আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মায়া বাবার শোলার টুপিটা পর্যন্ত মাথায় দিয়ে দুলে-দুলে হেসে খুন হলো। মা বললেন, আমার ছেলে ছিল না, এই তো একটা ছেলে হলো ! মায়া সে পোশাক পরে একদিনও বেরোয় নি। কখনও খুব রেগে মায়াকে আমি সেই পোশাকের কথা তুলে ঠাট্টা করি।

মায়া একদিন সন্ধেবেলা এবাড়িতে তাপস আর পরীক্ষিৎকে নিয়ে এসেছিল। পথে দেখা হবার পর তাপস মায়াকে চিনতে পারে নি। ওকে এত বড় হতে তো দেখে নি তাপস। মায়াই 'তাপসদা' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিল—তারপর টেনে এনেছিল বাড়িতে। ক্রমে ক্রমে এলো ওর বন্ধুবান্ধবদের দল—অবিনাশ, হেমকান্তি, অম্লান, অনিমেষ, শেখর, বিমলেন্দু। মা তখনও বেঁচে। বিমলেন্দুর দিদি আমার সঙ্গে বি.এ-তে পড়তো— সেজন্য ও আমাকে 'ছায়াদি' বলে। সেই শুনে-শুনে শেখর, অনিমেষ ওরাও। কেউ আপনি বলে, কেউ তুমি, তুই। অবিনাশ বলে, মেয়েদের মধ্যে একমাত্র আমার কবিতাই নাকি পাঠযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে আমিই প্রথম

আধুনিক। শেখর একটা কবিতা পত্রিকার সম্পাদক, প্রতি সংখ্যায় ও আমার লেখা আগ্রহ করে ছাপে। আমি যদিও আমার গোপন দুঃখের কথা কিছুই এ পর্যন্ত লিখতে পারি নি। মায়া অবশ্য আমার লেখা সম্পর্কে ঠোঁট ওল্টায়। একবার পুজো সংখ্যার লেখার জন্য মনি অর্ডারে টাকা পেয়েছিলাম—মায়া বলেছিল, সে কি রে দিদি, ঐ পদ্য লেখার জন্যও লোকে টাকা দেয় ? কে পড়ে রে ?

মায়ের মৃত্যুর সময় তাপসের বন্ধুবান্ধবরা খুব সাহায্য করেছিল। ওদের মধ্যে কেউ ভয়ংকর নিষ্ঠুর, কেউ উদাসীন, কেউ লোভী— কিন্তু ওরা কেউই অসৎ নয়। মনে মনে ওরা প্রত্যেকেই সম্রাট কিংবা জলদস্যু, কেউই ছিঁচকে নয়; সেইজন্যই ওরা সাধারণ নয় কেউ, ওরা সাহিত্যিক, আমি জানি। একদল পাগল।

মায়ের মৃত্যুর কথা মনে হলেই এখনো আমি সামনে-পিছনে তাকাই। এত ভয়ঙ্কর শান্ত মৃত্যু যে হয় আমি ভাবতে পারি নি। এখন যেটা বসবার ঘর করেছি— আগে ঐ বড় ঘরটায় একটা খাটে মায়ের দুপাশে আমি আর মায়া শুতুম। সেদিন ঘুমোতে যাবার আগে মা আমাদের দু'জনের চুল বেঁধে দিলেন টান করে। সেদিন মায়া ওর তিনজন মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেয়েছে— এই কথা মাকে বললো। মায়ার কোনো কিছুই গোপন ছিল না, আমাকে আর মাকে সব কথা বলে দিত।— ছেলেরা কেন সিগারেট খায় শখ করে সেটা দেখবার জন্য খেয়েছিলাম, জানো মা। প্রত্যেকে তিনটে করে টেনে দেখলুম গীতালিদের ছাদের ঘরে, গীতালি তো কাশতে-কাশতে বাঁচে না, ... আমার কোনো কষ্ট হয় নি— তবে অত আহ্লাদ করে খাবার কি আছে বুঝতে পারি নি।

মা একহাতে মায়ার চুলের গোছা ধরে আরেক হাতে চিরুনি চালাচ্ছিলেন। আমি মায়ার মুখোমুখি বসে। আমি বললুম, ও একদিন খেলে কিছুই বোঝা যায় না,— পরপর ক'দিন খেলে রোজ খেতে ইচ্ছে করবে। সেই রোজ খাওয়ার ইচ্ছেটাই নেশা।

— ওঃ, তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই রোজ খেয়ে দেখেছিস্।

মা হাসতে হাসতে বললেন, দিদি লেখে কিনা, তাই জানে। লেখক-লেখিকাদের সব জানতে হয়।

— আমি রোজ খেয়ে দেখবো মা ? ছেলেরা পারে তো আমরা পারবো না কেন ? খাওয়ার জিনিসে আবার ছেলে-মেয়ে কি ?

খেতে পারিস, তবে বিড়ি সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। মেয়েদের কালো ঠোঁট দেখা তো কারুর অভ্যেস নেই, তাই খারাপ লাগবে।

— তবে মেমসাহেবরা যে খায় ?

— মেমসাহেবরা ঠোঁট লাল করার জন্য লিপস্টিক মাখে। তুই মাখবি ?

— না না, লিপস্টিক বিচ্ছিরি।

আমি আর মা হেসে উঠলুম। ক'দিন ধরে মায়ের শরীর একটু ভালো ছিল। আরো কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। সেদিন সারারাত আমার সুন্দর ঘুম হয়েছিল। একছিটে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখি নি ; সকালবেলা চোখ মেলে দেখলুম, মায়া উঠে বসে আছে— একদৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে। কোনো কথা নেই। মায়ের দু'ঠোঁট খোলা, পাশ দিয়ে রক্ত। মা মায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা বেঁচে নেই। সারারাত আমরা পাশে শুয়েছিলাম। কোনো এক সময় মা আমাদের ঘুম না ভাঙিয়ে চলে গেছেন। সারারাত আমরা মৃতদেহের পাশে। একথা যখনই ভাবি, শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়, মায়া ও আমার মধ্যে মা শুয়ে আছেন। এমনকি অফিসে, ট্রামে, বাসেও মাঝে-মাঝে আমার পাশে মায়ের মৃত

শরীরের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে। এই অনুভূতির মধ্যে কোনো ভয় নেই, মায়ের চরিত্রের মতোই শান্ত স্নেহময়। কখনো-কখনো মনে হয় এই স্নেহময় মৃত্যু আমার শরীরে ঢুকে গেছে। আমারও ইচ্ছে করে ঐ রকম শান্তভাবে মরে যেতে।

সারাদিন আমি কি করি? কিছুই না, মনে হয় চোখ বুজে কাটাচ্ছি। ভোরে ওঠা স্বভাব, উঠেই হিটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিয়েই চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে দিই। তারপর বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, আমি একা অনেকক্ষণ স্নানের ঘরে থাকি। মায়ার স্বভাবটা আদুরে ধরনের হয়েছে, বারবার ডাকাডাকি করলেও উঠতে চায় না। বুনো ধরনের ঘুম ওর, কাপড়-চোপড় এলোমেলো করে দু'পা মুড়ে ঘুমোয়। স্নান করে বেরিয়ে এসে চায়ের কাপ ওর মাথার কাছে রাখি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমি এমন সংসারী হয়েছি, খানিকটা বুড়োটে হয়ে গেছি জানি। সেইজন্যই মায়াকে ওর জলের মতো জীবন কাটাতে দিতে চাই। তাছাড়া ওকে কত সুন্দর দেখতে। আমি যদি মায়া হতাম, আমার এক এক সময় মনে হয়। এক-একদিন রাত্রে আমি যখন সংসার খরচের হিসেব লিখি, তখন হিসেব না মিললে আমার রাগ হয়, তারপরেই হাসি পায়, মনে হয় যদি আমিও মায়ার মতন এখন পাশের ঘরে বসে রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা শুনতে পারতাম! কখনো-কখনো নিচতলার ভাড়াটে ভুবনবাবু এসে বলেন, ছায়াদেবী, আমাদের নর্দমা দিয়ে জল সরছে না—একটা ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া আপনাদের বারান্দা দিয়ে জল ঢাললে আমাদের রান্নাঘরের পাশে হুড়হুড় করে পড়ে। আমি তো বাড়িতে প্রায়ই থাকি না— হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন, কিন্তু আমার ওয়াইফ বললেন, যখন মাস ভাড়া গুনে যাচ্ছি, তখন অসুবিধে ভোগ করবো কেন? তুমি বাড়িউলিকে বলো! (বাড়িউলি শব্দটা উচ্চারণ করেই টুথব্রাস, গোঁপওয়ালা ভদ্রলোক লজ্জা পাচ্ছে আমার সম্পর্কে ওরা নিজেদের মধ্যে যে-ভাষা ব্যবহার করে তাই বেরিয়ে পড়েছে হয়তো। ছিপছিপে, চশমা পরা এম.এ. পাশ যুবতী যদি বাড়ির মালিক হয়—তাহলে যে তাকে সামনা-সামনি বাড়িউলি বলা যায় না, এ বিশ্বাস ওর আছে মনে হলো।) তখন ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে ঠাস্ করে লোকটার গালে চড় মারি। তার বদলে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি মায়া আছে কিনা। ও থাকলে চড় না মেরেও নিশ্চিত ঝগড়া বাধিয়ে দিতো। আমি শান্তভাবে বলি, আপনি একটা লোক ডেকে ব্যবস্থা করুন, খরচ যা হয় ভাড়া থেকে কেটে নেবেন। লোকটা তখনও নড়তে চায় না, বুঝতে পারলুম, পরপর সাতদিন নাইট ডিউটি দেবার পর আজ ওর ছুটি— ভাঁজ করা কাপড়ের লুঙ্গি পরা লোকটা চেয়ারের দিকে গুটি গুটি এগোয়—আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলি, একটা মিস্ত্রি পেলে আমাদের বারান্দাটাও সারিয়ে নেবেন।

আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে ভিড়ের ট্রাম-বাস। হাজার হাজার নিঃশ্বাসের গরমে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসতে চায়। ইচ্ছে হয়, 'ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠি। লোকগুলো আমাকে প্রাণে মারতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই, ঠিক দশটার সময় আমাকে অফিসে যেতে হয়। কাজ ভালো লাগে না, পাবলিসিটি ফার্মের কাজ। নানা লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, লে আউট, ব্লক, কপি, ম্যাট, বিজ্ঞাপনের উমেদার, আর্টিস্ট, মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো কাগজ থেকে ছেলেরা আসে, প্রথমে আমার কবিতা চায় একটা, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিজ্ঞাপনের কথা বলে। রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়, কিন্তু আমার এই-ই চাকরি, সুতরাং মিষ্টি করে হাসি, বলি, বিজ্ঞাপনের বাজেট তো শেষ হয়ে গেছে ভাই, এপ্রিলের আগে আর তো হবে না! কবিতা অবশ্য দিতে পারি— পনেরো পাতা, ছাপবেন? ছেলেগুলো 'কিন্তু কিন্তু' করে হাসে, তারপর নেক্সট উইকে আসছি' বলে সরে পড়ে। তবু এ চাকরিটা একদিক থেকে ভালো, অন্য ঝামেলা নেই, ওপরের অফিসারদের মাঝে-মাঝে গাড়ি করে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলে

ছুটির পর সত্যিই ছুটি। কিছুদিন কলেজে প্রফেসারি করেছিলাম, হাজার প্রশ্ন সেখানে— বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই কেন, কার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি, কারা সব বাড়িতে আসে— অসহ্য!

আমি তো তবু ইচ্ছে মতন চাকরি বদলাতে পারছি। আর তাপস ? একটা ইস্কুলে চাকরি করতো, ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছে, তারপর আজ প্রায় দেড় বছর বেকার ! ছি, ছি, ছেলেদের এতোদিন বেকার থাকা মোটেই মানায় না। কিন্তু তাপসের তো দোষ দিতেও পারি না, ও তো চেষ্টাও কম করছে না। তাপসের মাথা খুব ভালো ছিল, মন দিয়ে পড়াশুনো করলে ব্রিলিয়ান্ট স্কলার হতে পারতো, তবু যাই হোক ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেছিল। শরীরে কোনো রোগ নেই, শক্ত স্বাস্থ্য, বি.এ. পাশ একজন ছেলে কোনো চাকরি পাবে না ? ব্রিলিয়ান্ট স্কলার তো অন্য অনেকেই হয়, কারুকে কারুকে তো লেখকও হতে হবেই, কিন্তু সে কোনো জীবিকার সন্ধান পাবে না ? ইস্কুলের চাকরিটা হারাবার ব্যাপারেও তাপসের কোনো দোষ নেই। পড়াবার সময় ও ক্লাসে বসে সিগারেট খেতো—তাই নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে ওর ঝগড়া। অঙ্কের মাস্টার কিংবা পণ্ডিতরা ক্লাসে বসে নস্যি নেয় তাতে কোনো দোষ নেই, আর ইংরিজির মাস্টার ক্লাসে বসে সিগারেট খেলেই দোষ ? ছেলেরা দেখে দেখে শিখবে ? ক্লাস থেকে বেরুলে ছেলেরা আর কারুকে সিগারেট খেতে দেখে না ? বাবাকে–দাদাকে দেখে না ? ছেলেরা অনেক কিছু না দেখেও শেখে। শিখবেই— সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি ? ইস্কুলে এসে লেখাপড়াটা ঠিকমতো শিখছে কিনা সেটুকু অন্তত দেখলেই যথেষ্ট। আসলে, শুধু সিগারেট খাওয়া নয়, তাপস যে হেডমাস্টারের কথা নত মস্তকে মেনে নেয় নি, সেইটাই আসল দোষ। প্রবীণ হেডমাস্টার যখন সিগারেট খাওয়া নিয়ে আপত্তি করেছিলেন, তখন তরুণ শিক্ষকের উচিত ছিল লাজুক মুখে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলা— ভুল হয়ে গেছে স্যার, আর করবো না। প্রধান শিক্ষককে অন্য শিক্ষকরা শ্রদ্ধা করবে, এইটাই তো নিয়ম। কিন্তু শ্রদ্ধা করবেই বা কী করে? হেডমাস্টার মশাই তাপসকে একটা চিঠি লিখেছিলেন বাংলায়, তাপস সেটা আমাদের দেখিয়েছিল হাসতে–হাসতে, চোদ্দ লাইনের চিঠিতে পাঁচটা বানান ভুল, গোটা দশেক ইংরেজি শব্দ! হেডমাস্টার মশাই ইতিহাসের লোক— তাই তাঁর চিঠিতে বানান ভুল থাকবে ? একটা গোটা বাংলা চিঠিও লিখতে জানবেন না ? এদের হাতে শিক্ষার ভার, এরা প্রধান শিক্ষক, এদের লোকে শ্রদ্ধা করবে কি করে ? নিজের বানান ভুল না শুধরে অন্যের সিগারেট খাওয়ার দোষ ধরতে এসেছে !

তাপস আর একটা ইন্টারভিউ'র গল্প বলেছিল, শুনে হাসতে হাসতে আমরা মরি। রেলওয়ের গুডস্ ডিপার্টমেন্টে একটা কেরানির চাকরি। কেরানির চাকরি, তারই ইন্টারভিউ নিচ্ছে পাঁচজন জাঁদরেল অফিসার। তিনজন বাঙালি, একজন পাঞ্জাবি, একজন মাদ্রাজি। ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে শ'খানেক ছেলেকে, তার মধ্যে এম.এ. পাশই গোটা দশেক। তাপস ঢোকার পর— সবাই নিবিষ্টভাবে ওর অ্যাপ্লিকেশানটা পড়তে লাগলো। রেলের চাকরির অ্যাপ্লিকেশানে নাকি চোদ্দ পুরুষের ঠিকুজী কুষ্টি সব দিতে হয়, তবু ওদের একজন তাপসকে আবার নাম, বয়েস, কতোদূর লেখাপড়া এসব জিজ্ঞেস করলো। তাপস কোনো গোলমাল না করে উত্তর দিয়েছে। গোঁপওয়ালা পাঞ্জাবিটি বললো, তোমার তো স্বাস্থ্য বেশ ভালোই আছে, তুমি এ–চাকরি করতে এসেছো কেন ?

তাপস বললো, একটা কোনো চাকরি তো করতে হবে। আর কোনো চাকরি পাচ্ছি না।

— তুমি এ কাজ পারবে ?

— হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি দায়িত্বের সঙ্গে সব কাজ করবো এবং নিশ্চিত আশা করি, আমার কাজে আপনাদের খুশি করতে পারবো।

অর্থাৎ তাপস বেশ বিনীতভাবেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একজন আচমকা জিজ্ঞেস করলো, তুমি জানো, আকবর কতো সালে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ?

তাপস চমকে গিয়েছিল, তবু বিনীতভাবেই বলেছে, ঠিক মনে নেই! এ চাকরির পক্ষে এটা জানা খুব দরকারি কি ?

— এসব সাধারণ জ্ঞান। সমস্ত শিক্ষিত লোকেরই জানা উচিত।

— না, আমি ঠিক জানি না।

— পৃথিবীতে তুলোর চাষ সবচেয়ে বেশি কোথায় হয় ?

— এটাও আমি ঠিক জানি না। পরে জেনে নিতে পারি।

— ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। নেক্সট।

এইবার তাপস জেগে উঠলো। টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বললো, স্যার আমার ইন্টারভিউ হয়ে গেল ? আমার চাকরি খুবই দরকার, আমার ইংরেজি লেখার পরীক্ষা নিলেন না ?

— তোমার হয়ে গেছে, তুমি যেতে পারো।

— না স্যার, অতো সহজে আমি যাচ্ছি না। আমিও দু'একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আপনাদের কাছে জেনে যাবো। বলুন তো, সিরাজদৌল্লার বাবার নাম কি ? আমি এটা জানি। আপনি জানেন ?

— বলছি তো তুমি এখন যেতে পারো, বেয়ারা !

— মাইরি আরকি, বেয়ারা ডাকলেই আমি যাচ্ছি ? এটা খুব শক্ত, না ? আচ্ছা, বলুন তো, কোন্ সালে প্রথম বাষ্প এঞ্জিন চলেছিল ? বলুন।

— বেয়ারা, বাবুকো দরজা দেখা দেও।

— ওসব বেয়ারা-ফেয়ারা ডেকে কোনো লাভ হবে না। একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আমি জেনে যাবোই! তোমাদের মধ্যেকার ক্যান্ডিডেট ঠিক করা আছে আগে থেকে ?

— বেয়ারা, দরওয়ানকো বোলাও।

— আবার দরওয়ান দেখানো হচ্ছে। ওকথার জবাব না পেলে আমি এখানে ডিগবাজি খাবো, কাপড় খুলে নাচবো, তোমাদের থুতনিতে চুমু খাবো। ইয়ার্কি পেয়েছো শালারা ? তোমাদের গুষ্টির পিণ্ডি করবো আজ!

শেষ পর্যন্ত দরওয়ানরা এসেই ওকে টেনেহিঁচড়ে বার করে দেয়। তাপস অনবরত আস্ফালন করতে থাকে—সেই ইন্টারভিউ বোর্ডের পাঁচজনের ও সর্বনাশ করে দেবে!

কিন্তু কিছুই সর্বনাশ তাপস ওদের করতে পারে নি। ওরা মোটরগাড়ি চেপে ঘোরাঘুরি করে। সাহেব পাড়ায় থাকে, ওদের সমাজ আলাদা— দুর্গের মতন সে সমাজ সুরক্ষিত। তাপসরা সেখানে কিছুই করতে পারে না। তাপস অবশ্য এখনো শাসায়, ও আর সারাজীবনে রেলে চড়ার সময় টিকিট কাটবে না, সুযোগ পেলেই রেলের বাথরুমের আয়নার কাচ ভাঙবে, বাল্‌ব চুরি করবে। কিন্তু তাতে ওদের কি ক্ষতি হবে ?

তাপস আজও চাকরি পেলো না, আমার বড় মায়া লাগে— যখন তাপস বন্ধুদের কাছে গাড়ি-ভাড়া চায়। যে-রকম সাঙ্ঘাতিক লেখক হিসেবে তাপসের নাম, ঐটুকু নামেই ইংরেজ লেখক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতো। এক একদিন তাপসের মুখখানা শুকনো দেখায়— বড় বেশি গম্ভীর থাকে— সেইসব দিন ওকে দেখলে ভয় করে, মনে হয় ও যেন কোনো ভয়ঙ্কর সর্বনাশের প্রতীক্ষায় আছে।

কিন্তু তাপসের কথা আমি ভাবছি কেন ? তাপস নিষ্ঠুর, তাপস আমাকে গ্রাহ্য করবে না। সেই

এক দুপুরবেলা এসেছিল, তার পর থেকে আর আসে নি কখনো একা, ও আর আমাকে একা এসে দেখতে চায় না। আমিই কাঙালিনীর মতন ওর কাছে গিয়েছিলাম কয়েকবার, কী নির্লিপ্ত আর উদাসীন ওর ব্যবহার, একদিন শুধু সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আয় ছায়া তোকে একটা চুমু খাই। বলার সঙ্গে–সঙ্গেই, আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঝট করে এগিয়ে এসে আমায় চুমু খেলো, তারপর চলে গেল। যেন হঠাৎই ওর আমাকে চুমু খাওয়ার কথা মনে পড়লো, সঙ্গে–সঙ্গে সেটা চুকিয়ে নিলো, আবার পর মুহূর্তেই ভুলে গেল আমার কথা। এই মানুষকে কেউ সহ্য করতে পারে ? না। তাপস আমার কেউ না। এর চেয়ে বিমলেন্দু অনেক নির্ভরযোগ্য। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা সান্ত্বনা আছে।

কোনো কোনো দিন বিমলেন্দু খোঁজ করে অফিসে, ছায়াদি, আজ বিকেলে কী করছো, একটা ফিল্মে যাবে নাকি ? বাইবেল হাউসের বারান্দার নিচে বুক খোলা শার্ট গায়ে বিমলেন্দু দাঁড়িয়ে থাকে। একটু নার্ভাসভাবে সিগারেট টানে। আমার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেই আমার গা শিরশির করে— আমার শ্বেতির দাগ ধরা ঠোঁট জ্বালা করে ওঠে যেন। দূর থেকে যখন হেঁটে আসি হাওয়ার বিপরীত দিক দিয়ে, শাড়ি উড়তে থাকে, বিমলেন্দুকে দেখে আমার লজ্জা করে। কেন লজ্জা করে ঠিক জানি না। সিনেমার অন্ধকারে বসে অন্যমনস্কভাবে বিমলেন্দু আমার বাঁ দিকের বুকে চাপ দেয়। আমিও মাঝে–মাঝে ওর হাত ধরে খেলা করি। এক এক সময় ওর কোলের ওপর হাত রাখি।... বোকা, অত্যন্ত বোকা ছেলেটা, বোকা—। আমি হাত সরিয়ে নিই না। আমার ভালো লাগে। বিমলেন্দুকে কোনোদিন চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিই নি। কখনো ইশারাও জানাই নি। দেখতে চাই, ও কী করে। কোনোদিন হঠাৎ হুড়মুড় করে আমায় জড়িয়ে ধরে কি না। অথবা এমন হতে পারে, আমি বিমলেন্দুকে পছন্দ করি না, আসলে ওকে দুচোখে দেখতে পারি না। ওর ঐ নির্লিপ্ত, হাঁসের পালকের মতো মুখ— কেন কোনো মেয়েকে দেখায় ? কেন বিমলেন্দু আসে আমার কাছে, ওর কি অন্য কোনো মেয়ে বন্ধু নেই, না ও আমাকে ভালবাসে ? নাকি ও আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করে সঙ্গ দিতে আসে ? বিমলেন্দু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত— গল্প–কবিতা দুটোই ভালো লেখে, প্রবন্ধ সমালোচনার দিকেও আছে, বড় কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক। প্রবীণ লেখকরা আমাদের মধ্যে বিমলেন্দুকে দেখলেই সাগ্রহে চিনতে পারে— আমাকেও চেনে অনেকে, সেটা আমি মেয়ে বলে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আমি বোধহয় চাই না, আমি চাই একটা ছটফটে, দুর্দান্ত, কেয়ারলেস যুবক— কার মতো ? কার মতো ? অবিনাশের— না, অম্লানের মতো, একটু আনন্দ হলেই যে কোমর থেকে বেল্টখানা খুলে বোঁ–বোঁ করে ঘোরায়।

যে–সব বিকেলে বিমলেন্দু আসে না, সাধারণত কোনো কাগজের অফিসে যাই, অথবা বাড়ি ফিরে আসি, মায়া সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকে না, দু'জনে বসে দাবা খেলি। পিসিমা চায়ের সঙ্গে গরম–গরম ফুলকপি বা ওমলেট ভেজে দেন। রাত্রে খাওয়ার পর লিখতে বসি, অনেক লেখা পছন্দ হয় না, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু না লিখলে আমার ভালো লাগে না।

রাত্রে ঘুম আসে না, সারারাত ঘুমের কথা ভাবি। এক এক রাত্রে আমার শয্যাকণ্টকী হয়, বিছানায় কোনো জায়গায় শরীর ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে না, অসহ্য বমি বমি লাগে। মনে হয়, মা আমার পাশে শুয়ে আছে। মায়ের জন্য কষ্ট হয়।

এই রকম আমার জীবনের দিন কাটে। কিন্তু কিভাবে কাটাতে চাই ? আমার ইচ্ছে করে না চাকরি করতে, ইচ্ছে হয় সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমোই, ইচ্ছে হয়, প্রতি কথায় গালাগালি করি, রাস্তাঘাটের বখা ছেলেরা যে–রকম মুখ–খারাপ কুৎসিত কথা বলে, আমারও ইচ্ছে করে মাঝে–মাঝে সেই রকম বলি, দূর শালা, দূর— ছাপার অযোগ্য, তোর ইয়েতে ইয়ে দিই— ইচ্ছে

হয় খারাপ মেয়ের মতো কোমর দুলিয়ে হাঁটি— কখনো এসব বলতে বা করতে পারবো না, তবু ইচ্ছে হয়, আয়নার সামনে এই রকম ভঙ্গি করে দেখি। ইচ্ছে করে, সারাদিন শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে থাকি। দুটো ষণ্ডামার্কা চাকর থাকবে— হুকুমমতো তারা আমার ফুটফরমাশ খাটবে, ধমকালে কুঁকড়ে যাবে, সাহস করবে না চোখের দিকে তাকাতে। ইচ্ছে করে, গোপনে তাপসের বুকে ছুরি বসিয়ে দিই। কিংবা নিজের বুকে।

এছাড়া, একা একা কান্না পায়। মায়া না থাকলে আমি বাড়িতে শুয়ে কাঁদি। আসলে সারাদিন আমি কী করি, তা জানি না। আমি কী করতে চাই, তা জানি না। আমি খুবই শিগগির মরে যাবো, জানি। আমার কান্না পায়। মা, তোমার জন্য আমার বিষম মন কেমন করে।

অনিমেষ

একটু সন্ধে হয়ে এসেছিল তাই মাঠের মধ্য দিয়েই জিপ চালিয়ে দিয়েছিলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, রণছোড়, তোমার ফিরে যাবার তেল আছে তো? কথাটা জিজ্ঞেস করার পরই আমার লজ্জা হলো। প্রায়ই আমি ভুলে যাই যে ও বোবা। রণছোড় ওর বিশাল দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। বুঝলাম, আছে। বোবা বলেই কি রণছোড়ের চোখ দুটো এতো বড়—? ওর চোখ সব কথার উত্তর দিতে পারে— কোনো মেয়ের চোখও এতো পারে না। তাছাড়া ওর চোখের ভাষাও খুব সরল, শিশুরাও বুঝতে পারে। কিন্তু মেয়েদের চোখের ভাষা পড়তে হলে আলাদা বিদ্যে লাগে—আমার তা নেই।

দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম। সব ঘরে আলো জ্বালা। গায়ত্রী সব ঘরে আলো জ্বেলে রাখতে ভালবাসে। একটা জানলায় ও বসে আছে। ও কি আমার জন্য বসে আছে? নাকি আলোজ্বালা ঘরে বসে দূরে অন্ধকার দেখতে ভালো লাগে। একটা কুকুর ডেকে উঠলো প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করে। ডাকটা খুব মানিয়ে গেল। দূরে আলোজ্বালা বাড়ি, মাঠে অন্ধকার, অন্যমনস্ক নীল আকাশ—এর মধ্যে একটা কুকুরের ডাক না থাকলে মানাচ্ছিল না।

আজ সকালে অবিনাশ একটা চিঠি লিখেছে। কতোবার বলেছি, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিতে—বাড়িতে নয়, ওর খেয়াল থাকে না। গায়ত্রীর একটা খারাপ স্বভাব আছে— চিঠি খুলে পড়া। কলকাতার মেয়েরা এসব করে না— স্বামীর চিঠিও খোলে না। কাশীর মেয়েদের এ শিক্ষা নেই। আমার বন্ধুবান্ধবদের চিঠি গায়ত্রীর পক্ষে হজম করা একটু শক্ত। গায়ত্রী বলেছিল, কী অসভ্য আর কাঠখোট্টা তোমার বন্ধুগুলো। লিখেছে, মল্লিকাটা মারা গেছে! একটা মেয়ে—তাও মারা গেছে, তার সম্বন্ধে 'মল্লিকাটা' কি? কী ভাগ্য আমার, মল্লিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখে নি, তাই আমি বললুম, মল্লিকা হলো শেখরের ছোট বোন। খুব বাচ্চা তো— আর অবিনাশ ওকে খুব ভালবাসতো, ওদের বাড়ি গেলেই খেলা করতো—তাই। মল্লিকা মারা গেছে সে খবর আমাকে জানাবার দরকারই বা কী ছিল— মল্লিকার কাছে আমি কখনও যাই নি, ওদের মুখেই নাম শুনেছিলাম, তাপস খুব বলতো— তাপসের বোধহয় ঐ বেশ্যাটির উপর সত্যিই খুব টান ছিল। আর অবিনাশের তো সবাইকে ভালো লাগে। মেয়েটা নাকি কোন্ বিখ্যাত অভিনেতার বে-আইনী মেয়ে।

অবিনাশ লিখেছে, পরীক্ষিৎ ভালো আছে। মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছে। ওঃ সেদিনের রাত্রের কথা ভাবলেও ভয় হয়। পরীক্ষিতের ওরকম মদ খাওয়া নিয়ে হৈচৈ করা আমি পছন্দ করি না এইজন্য। আর মদ খেয়ে ব্রিজের রেলিঙে বসা কেন? অপঘাতে মৃত্যুই পরীক্ষিতের নিয়তি।

হঠাৎ একটা আর্তস্বর— তারপরেই নিচের নদীতে শব্দ। গায়ত্রী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল, ফিরে এসে ব্রিজের কোণে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। আমি কাছে যেতেই বললো, আমার আজ কেন জানি না ভালো লাগছে না, বোধহয় শরীরটা খারাপ, না এলেই ভালো হতো মনে হচ্ছে। এই সময় ঐ কাণ্ড। হা–হা–হা করে চারপাশের দোকান–জঙ্গল–মন্দির থেকে নিমিষে কয়েকশো লোক ছুটে এলো। আমরা দু'জনে দৌড়ে এলাম। অবিনাশ ততোক্ষণে রেলিঙে উঠে বসেছে— ও নিজেও লাফিয়ে পড়বে। আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বললুম, কী হয়েছে ? পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে— হাত ছাড়ুন, ওকে খুঁজে আনি। কথাটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে— আর অবিনাশ এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য ? কোনটা বেশি ভয়ঙ্কর, পরীক্ষিতের পড়ে যাওয়া, না অবিনাশের এখান থেকে লাফিয়ে ওকে খোঁজা—আমি এক মুহূর্তে বুঝতে পারলুম না। এখান থেকে লাফালে কেউ বাঁচে? পরীক্ষিতের এতোক্ষণে কি হয়েছে কে জানে। এর নাম বন্ধুত্ব— অবিনাশের মতো ওরকম অকপট দুঃসাহসী আমি আগে কখনো দেখি নি। আমি আর গায়ত্রী দু'জনে ওর হাত চেপে ধরলুম প্রাণপণে। অবিনাশ হ্যাঁচকা টান মারতে–মারতে বললো, ছাড়ুন না, আমার কিছু হবে না। দেখি ওকে বাঁচানো যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত চা–ওয়ালা বিষ্টু ওকে জোর করে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে এনে বললো, পাগল হয়েছেন আপনি মশাই, চলুন ব্রিজের নিচে যাই। আমি এক ফাঁকে দেখলুম, ব্রিজের নিচে অন্ধকার, ভাঙা ভাঙা চাঁদের আলো, আর কিছু নেই। পরীক্ষিৎকে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সামনে সকলের আগে ছুটে গেল অবিনাশ, জামা–কাপড় খুলে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমি এসব উত্তেজনা সইতে পারি না, এমন ছুটোছুটি চিৎকার। পরীক্ষিৎ মরে গেছে একথা ভেবে আমার বুকের মধ্যে দ্রিম দ্রিম করে শব্দ হচ্ছিল। আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি নি, পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তার কারণ আমি সাঁতার জানি না। ওরা কি কেউ ভাবলো, আমি শীতের ভয়ে জলে নামলুম না ? বা প্রাণের ভয়ে ? আমি সাঁতার জানি না, একথা গায়ত্রীও হয়তো জানে না। ওর সামনে কখনো নদীতে বা পুকুরে স্নান করেছি বলে মনে পড়ে না। আমি ছেলেবেলায় একবার জলে ডুবে গিয়েছিলাম— সেই স্মৃতি আমি কখনো ভুলি না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, পরীক্ষিৎ জলের নিচের নীল অন্ধকারে কী যেন খুঁজছে। বাতাস— এইমাত্র ওর বুক থেকে যে শেষ বাতাস ও বার করে দিয়েছে সেটুকু আবার ফিরিয়ে আনা যায় কিনা প্রাণপণে খুঁজছে। ওর জন্য বুক ভর্তি বাতাস নিয়ে অবিনাশ গেছে—পরীক্ষিতের মুখের মধ্যে ফুঁ দিয়ে অবিনাশ বাতাস ঢুকিয়ে দেবে। আমিও বুক ভর্তি বাতাস নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি—আমি জলে নেমে পড়ার সাহস পেলুম না।

পরীক্ষিৎ মরার ছেলে নয়, একসময় ও দেশবন্ধু পার্কে ছেলেদের সাঁতার শেখাতো। যখন খুব পয়সার দরকার, পরীক্ষিৎ তখন দেশবন্ধু পার্কের পুকুরের ছোট দ্বীপটায় মাথায় একটা তোয়ালে বেঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচাতো— 'কে কে সাঁতার শিখবে, দু'আনা দু'আনা, ছুটে এসো ছেলেরা, দু'আনা দু'আনা, সাতদিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু'আনা দু'আনা'— তখন পুকুরটা এরকম বাঁধানো ছিল না—ভাঙাচোরা। গরমের দিনে ছেলেরা বিকেলে এসে দাপাদাপি করতো, মন্দ আয় হতো না পরীক্ষিতের। দিনে বার–চোদ্দ আনা। মাঝে–মাঝে এক ডুবে পুকুরের মধ্য থেকে মাটি তোলার খেলা দেখাতো। সুতরাং, জলে ডুবে মরা পরীক্ষিতের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আচমকা অতো উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া, তাছাড়া এসব পাহাড়ী নদীতে আগাগোড়া পাথর ছড়ানো, মাথায় আঘাত লাগলেই আর বাঁচার আশা নেই।

... অবিনাশ জলে ঝাঁপিয়ে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করতেই— আমি চেঁচিয়ে বললুম, ঐ যে, ঐ যে। ব্রিজের একটা থাম ধরে পরীক্ষিৎ জলে ভেসে ছিল, অন্ধকার মুখে একটাও শব্দ নেই।

চা-ওয়ালা বিষ্টু আর অবিনাশ ওকে ধরে নিয়ে এলো পাড়ে। রক্তে জল ভেসে যাচ্ছে— পরীক্ষিতের তখনও জ্ঞান ছিল,— বললো, আর বেশিক্ষণ থাকতে পারতুম না, মাথায় খুব লেগেছে। হাসপাতালে পৌঁছুবার আগেই ও অজ্ঞান হয়ে পড়লো— ভয়ঙ্করভাবে ওর মাথা কেটে গেছে, অবিনাশ ওর মাথাটা চেপে ধরে আছে, চুইয়ে চুইয়ে তবু পড়ছে রক্ত, ডাক্তারের সামনে গিয়ে যখন অবিনাশ হাতটা তুললো, ওর দুই হাতের পাঞ্জা টকটকে লাল। আঙুল বিস্ফারিত করে অবিনাশ ওর ডান হাতের লাল পাঞ্জা আমার চোখের সামনে তুলে ধরলো। মুখে কোনো বিকার নেই— আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল।

... খাওয়া শেষ করে একটা পাইপ ধরিয়ে জানলার পাশে বসলুম। পাইপ খাওয়া নতুন শিখেছি—বেশ চমৎকার লাগে একা একা। গায়ত্রী টুকিটাকি কাজ শেষ করছে। অনেকদিন কিছু লিখি নি। লেখার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে কীরকম যেন একটা শব্দ হয়। সিনেমার থিম মিউজিকের মতো। বেশ তো ঘুরছি ফিরছি— গায়ত্রীকে আদর করছি, বন্ধুবান্ধবদের কথা ভাবছি, নদী দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছি— তবু মনে হয়, কতোদিন একটাও কবিতা লিখি নি— অমনি বুকের মধ্যে ঐ থিম মিউজিকটা ফিরে আসে। সুরটা দুঃখের নয়, রাগের, যে যে জিনিসকে ভালো লেগেছিল তাদের ওপর অসম্ভব রাগ হয়! মনে হয়, তোমাদের ভালো লেগেছিল— তোমাদের তবে কবিতায় আনতে পারলুম না কেন, কেন আমার ভাষা গরিব হয়ে যায়। মনে হয়, হেরে গেলুম— কার কাছে— ঈশ্বরের কাছে, এই গাছপালা, পাহাড়, নদী, আকাশ যে-ঈশ্বরের ভাষা, তার কাছে— তখন মনে হয়, গাছের ছাল ছাড়িয়ে দেখি, ফুলের সমস্ত পাপড়ি খুলে ফেলি। গায়ত্রীর সঙ্গে রাত্রের কাণ্ড করি আমি আলো জ্বেলে, ওর সমস্ত কাপড়-জামা খুলেও ঐ স্ত্রী-শরীরের দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করে না— ইচ্ছে করে ওর ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিই, বুকটা ফাঁক করে দেখি, কেন ঐ বুকে মুখ রাখতে আমার ভালো লেগেছিল।

কেন, কেন, কেন— এর উত্তর খুঁজতেই সময় কেটে যায়। কেন এটা সুন্দর, কেন ওটা কুৎসিত এ প্রশ্ন নয়, কেন এটা আমার ভালো লাগলো, কেন ওটা আমার ভালো লাগে নি— এই অসঙ্গত প্রশ্ন। ভালো লাগে, তবে বিশেষ কিছুই আজকাল নতুন লাগে না। সবই মনে হয় আগে দেখেছি। যে-কোনো দৃশ্য, যে-কোনো মানুষ দেখলেই মনে হয়, আগে দেখেছি। যদি কখনো বিলেত-আমেরিকায় যাই তাহলেও আমার নিশ্চিত ধারণা, সেখানকার সবকিছু দেখেই আমার ধারণা হবে, এসব আমি দেখেছি অনেক আগে। বহু আগেই এসব আমার দেখা। তবে কি যারা এ্যাটম বোম বানাচ্ছে— তারা কবিদের চেয়েও বড় প্রজাপতি— তারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, ওরাও সৃষ্টি করছে— ধ্বংসের দৃশ্য, দৃশ্য হিসেবে তাও নতুন, স্নায়ু আর মাথার ধূসর পদার্থের কম্পনে মানুষ অনেক ধারণা, রসের স্বাদ পেয়েছে—কিন্তু অ্যাটম বোমওয়ালারা একটা নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে—সামগ্রিক মৃত্যুচিন্তা— এতোদিন মানুষ শুধু নিজের মৃত্যুর কথা ভেবেছে— সাহিত্যেও ঐসব মৃত্যুর কথা—। কিন্তু একটা মহাদেশ বা সমস্ত মানুষ জাতটার জন্য মৃত্যুভয় আমি একা একা ভোগ করছি এখন। সাহিত্য এর ধাক্কা সামলাতে পারছে না। প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটার পরীক্ষার সময় ওপেনহাইমার বিড়বিড় করে ভগবৎ গীতা আউড়েছিল। আমি তো গীতা পড়ে ভালো বুঝতে পারি নি।

পরীক্ষিতের কবিতার বইটা উল্টেপাল্টে দেখছিলুম আর একবার। অন্ধের মতো, নির্বোধের মতো লিখেছে—তাই ওর প্রত্যেকটি লাইন এমন জোরালো, এমন বিস্ফোরণের মতো। ওর শব্দ সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান নেই— শব্দ নিয়ে ভাবে না, তাই ওর প্রতিটি শব্দ অব্যর্থ। ওর চোখ ওর মাথার চারপাশে ঘোরে, যে-কোনো একটা জিনিস ওকে হঠাৎ আকর্ষণ করে? না, পরীক্ষিৎ আকর্ষণ কথাটা ব্যবহার করতো না। ও বলতো 'ডাক দেয়।' ওর ভাব খুব কম। মেয়েরাও ওকে

ডাকে, ফুলও ডাকে, ভালবাসাও ডাকে। অবিনাশ লিখতো, হ্যাঁচকা টান মারে। ভালবাসার হ্যাঁচকা টানে ঢুকে গেলুম গর্তে, মৃত্যু বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পরিবর্তে, পেলুম আধঘণ্টা ক্লান্তি— অবিনাশের সেই বিখ্যাত পদ্য যা কলেজের ছেলেরা এক সময় খুব আওড়াতো। পরীক্ষিৎকে চ্যালেঞ্জ করে অবিনাশ এক সময় গুটি আষ্টেক কবিতা লিখেছিল।— প্রত্যেকটি বিখ্যাত হয়েছিল— তারপর হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিল। গল্পও লিখেছিল গোটা কয়েক— তা নিয়ে হৈ-হৈ কাণ্ড, কী বিকট, কী অশ্লীল, সেইসব লেখা, এই রব উঠলো সাহিত্যের বাজারে। অবিনাশ বলেছিল তখন, 'একটা উপন্যাস লিখে দেশটা কাঁপিয়ে দেবো— বারোটা বাজিয়ে দেবো সাহিত্যেই,— বোধহয় দু-তিন পাতা লিখেছিলও— তারপর হঠাৎ একদিন সক্কালবেলা পরীক্ষিৎকে গিয়ে বললো, 'ভাই, মাফ্ কর, ওসব আমার দ্বারা হবে না, বড় ঝামেলা, আমি শান্তিতে পুরোপুরি রকম বাঁচতে চাই— ক'দিন ধরে উপন্যাসের কথা ভাবতে-ভাবতে এমন মজে গেছি যে, কাল সন্ধেবেলায় রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে আমার উত্তেজনা হলো না, এ কী—? নিজের জীবনটা নষ্ট করে গল্পের নায়ক-নায়িকাকে বাঁচিয়ে তোলা আমার দ্বারা হবে না। নিজের জীবনের এমন চমৎকার সময়গুলো নষ্ট করে, খামোকা গল্প-উপন্যাস লিখে লাভ কি? আমি ভাই ভালোভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই। সাহিত্য-ফাহিত্য করে যতো বোকার দল। পরীক্ষিৎ বলেছিল, মেরে তোমার দাঁত খুলে নেব। জানোয়ার নাকি তুই, যে খালি খাবি আর—

অবিনাশ জানে, নির্বোধ ছাড়া কেউ অমরত্বের কথা ভাবে না। যতোদিন বাঁচা সম্ভব, যে রকম ইচ্ছে বাঁচবো— লিখে বা না লিখে। পরীক্ষিৎকে চিনতে ভুল হয় না— ঐরকম মদ খাওয়া, পাগলামি, হৈ-হৈ— পৃথিবীর বহু কবির জীবনীতে এসব দেখা গেছে, পরীক্ষিৎকে দেখলেই মনে পড়ে আমার হফম্যানের সেই গল্পের নায়কের কথা, যে নিজের ছায়াটাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পরীক্ষিৎ সাহিত্য করার জন্য ওর ছায়াটা বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু অবিনাশকে চেনা যায় না। তবে আত্মাটা বিশাল অবিনাশের— বিমলেন্দু ছাড়া ওরকম ক্ষমতাবান লেখক আমাদের মধ্যে কেউ নেই আমার মনে হয়। বিমলেন্দু না তাপস ? পরীক্ষিৎরা বলে, 'তাপসই সত্যিকারের জাত লেখক, বিমলটা কমার্সিয়াল।' আমার তাপসের লেখা ভালো লাগে না! ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু— কিন্তু ওর ঐ অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা, কবিত্বহীনতা আমার সহ্য হয় না। তাপসকে আমি অবিশ্বাস করি, ও লেখে, না কলম দিয়ে থুতু ছেটায় আমি বুঝতে পারি না। মানুষ হিসেবেও তাপস অবিশ্বাসযোগ্য।

বিমলেন্দুকে ওরা পছন্দ করে না, কারণ ও ছন্নছাড়া, ওর মুখ দিয়ে শিল্প সম্বন্ধে কোনো কথা বেরোয় না। আসলে বিমলেন্দু সবচেয়ে নতুন কথা লেখে। একথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে ওসব মদ খাওয়া কিংবা হৈ-হুল্লোড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের মধ্যেও যেমন একদল মদ খায় না, একদল খেতে ভালবাসে, লেখকদের মধ্যেও তাই। আলাদা আর কোনো জাত বিচার নেই। আমিও তো মদ-টদ খেতে তেমন ভালবাসি না, বিমলেন্দু তো একেবারেই খায় না। ওর সঙ্গে আমার আলাপ অদ্ভুতভাবে। ও তখন 'অরুণোদয়' কাগজে সহ-সম্পাদকের চাকরি করে। হস্টেলে থাকি, আমি তখন কবিতা লিখতাম না। ও-কাগজে একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম, গল্পটা একজন মুমূর্ষু কবিকে নিয়ে; সেই গল্পের মধ্যে সেই কবির রচনা হিসেবে কয়েক লাইন কবিতাও ছিল। হঠাৎ একদিন বিমলেন্দু দেখা করতে এলো হস্টেলে, জিজ্ঞেস করলো, অনিমেষ মিত্র কার নাম ? আমরা তখন কমনরুমে টেবিল টেনিস খেলছিলাম, পরীক্ষিৎ বললো ফিসফিস করে— ঐ ভদ্রলোক বিমলেন্দু মুখার্জি। পরীক্ষিৎ তখন বিমলেন্দুকে খুব ঈর্ষা করে।

কবি বিমলেন্দু মুখার্জি— আমাকে খুঁজছেন ? আমি প্রায় শিউরে উঠেছিলাম। বিমলেন্দু তখন থেকেই বেশ নাম করা। তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম। ধুতির সঙ্গে ফুলসার্ট পরা, ফর্সা, শান্ত ধরনের চেহারা, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় খুব আত্মবিশ্বাস আছে। বিমলেন্দুকে প্রথমদিন দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। ও মেয়ে হলে বলা যেতো, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। পরীক্ষিতের দিকে একবার আড়চোখে তাকালো বিমলেন্দু। বেশি ভূমিকা করলো না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে টানতে টানতে বললো, আপনি 'অরুণোদয়ে' যে গল্পটা পাঠিয়েছেন, সেটা ভালো হয় নি।

আমি অবাক। গল্প ভালো হলেও পাত্তা পাওয়া যায় না, আর খারাপ গল্পের জন্য সম্পাদক বাড়ি বয়ে এসেছে সমালোচনা করতে ? আমি আমতা-আমতা করতে লাগলুম। পরীক্ষিৎ এককোণে দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াবার ভান করছিল। হঠাৎ বললো, আমি পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি বলছি, গল্পটা ভালোই, আমি ওটা পড়েছি।

মোটেই না, ওটা যাচ্ছেতাই হয়েছে, বিমলেন্দু বললো, ওটা গল্পই হয় নি, গপ্প।

পরীক্ষিৎ প্রায় মারমুখি হয়ে এগিয়ে এলো।

তবে, ওর মধ্যে যে ছোট্ট কবিতাটা আছে, সেটা আমি আলাদা কবিতা হিসাবে ছাপতে চাই। বিমলেন্দু বললো, কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, এত ভালো কবিতা পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি ছাড়া অন্য কারুর লেখা ইদানীং পড়ি নি।

বুঝলাম, আসলে পরীক্ষিতের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এসেছিল বিমলেন্দু। আমাকে ছেড়ে ও তখন পরীক্ষিতের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলো। তবু বিমলেন্দুকে সেই প্রথম দিনই আমার ভালো লেগেছিল।

শনিবার। আজ হাটে হরিণের মাংস উঠেছিল হঠাৎ, রণছোড়কে দিয়ে খানিকটা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাজারের সব দোকান ঘুরে জাফরান কিনতে ইচ্ছা হলো। নেই। মধ্যপ্রদেশের এইসব শহরে জাফরান মেলে না। ঘি আর রসুন হাজার দিলেও জাফরান ছাড়া হরিণের মাংস জমে না। গায়ত্রী আবার হরিণের মাংস রান্না করতে জানে কিনা কে জানে। ওর বাবা ছিলেন কাশীর সংস্কৃত অধ্যাপক— কি জানি, হরিণের মাংস খেতেন কিনা। আমার বাবা রাকা মাইন্‌সে অনেকদিন ছিলেন—হরিণের মাংস খেতে বড় ভালবাসতেন। হাজারীবাগ গেলেই কিনে আনতেন। লালচে রঙের পচানো হরিণের মাংসের গরম ঝোল রাত্রে বসে খেতাম ছেলেবেলায়, স্পষ্ট মনে পড়ে।

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে— জীবনানন্দর এই লাইনটা হঠাৎ অকারণেই মনে পড়লো। হরিণের মাংস খাবো ভাবতে-ভাবতে একি একটা উল্টো রকমের কবিতার লাইন মনে পড়লো। বিষম গোলমেলে এই লাইনটা তারপর আধঘণ্টা আমার মাথা জুড়ে রইলো। আমি হরিণটাকে খাবো, না হরিণটা আমাকে খাবে ? আমি হরিণের মাংস খাবো আর হরিণটা খাবে আমার হৃদয়। কী স্পষ্ট সেই ছবি। আমি রান্নার তারিফ করতে-করতে আরামে চিবিয়ে চুষে হরিণের মাংস খাচ্ছি, আর হরিণটা খুব গোপনে আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যদিও আমি শিকারী নই, তবু ভেবে আমার বুক শিউরে উঠলো। অসম্ভব! দরকার নেই আমার হরিণ ! কথাটা ভেবে একটু হাসিও পাচ্ছে যদিও। এসব ভাবলে তো কোনো মাংসই খাওয়া যায় না। যখন মুরগির মাংস খাই, তখন মরার আগে সেই মুরগিও কি আমাদের হৃদয়ের একটা অংশ খেয়ে যায় না ? এসব ভেবে কি আমি গান্ধীবাদী নিরামিষাশী হয়ে যাবো নাকি ? তা নয়,

কবিতার মধ্যে আছে বলেই এ ব্যাপারটা এত মর্মান্তিক লাগছে। শিল্পের সত্য বড় ভয়াবহ। আজ অন্তত হরিণের মাংস খেতে পারবো না। খালি একটা হরিণের জ্যান্ত চেহারা আর ছলছলে চোখের কথা মনে পড়ছে। হে ঈশ্বর, আজ যদি গায়ত্রী রাগ করে বলে—হরিণ-টরিনের মাংস আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না—তবে খুব ভালো হয়। আমিও তাহলে একটু রাগ করে রঘুনন্দনের বৌকে অনায়াসে ওটা দিয়ে দিতে পারি। হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে...। রঘুনন্দনের বৌ-এর হৃদয় নেই। ও যখন বাসন মাজে উঠোনে বসে, ওর সম্পূর্ণ বুক আলগা থাকে। ঘুরতে-ফিরতে আমার চোখে পড়ে, ওর কোনো হুঁশ নেই। বুকের নিচে যে স্ত্রীলোকের হৃদয় থাকে, সে কখনও অপর পুরুষের সামনে অবহেলা ভরে নিজের বুক খুলে রাখে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় গোপন রাখার জন্যই বুক গোপন রাখতে হয়। আসলে ও নিজের বুকের ঐ দুই চূড়ার কোনো মানে জানে না। ভাবে বুঝি কাচ্চা-বাচ্চার জন্য দু'খানা দুধ জমাবার ঘটি। গায়ত্রীরও একটা খারাপ অভ্যেস আছে, রাত্রে শোবার আগে বডিস পরে দুই বগলে স্নো মাখে। মুখে গালে বুকে মাখতে পারে, কিন্তু বগলে কেন ? গোড়ার দিকে খাটে শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানতে-টানতে ওগুলো দেখতে আমার খুব লোভীর মতো ভালো লাগতো, মাঝে-মাঝে উঠে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতুম। এখন চোখ জিনিসটাকে মনে হয় শরীরের থেকে আলাদা। শরীর এক জিনিস চায়, চোখ তা চায় না। গায়ত্রীর শরীর আমার শরীরকে চুম্বকের মতো টানে, অথচ চোখ তখনও চায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে, অথচ—

— না, আলো নিবিও না।

— হ্যাঁ এখন ওঠো, কাল আবার ভোরে উঠতে হবে না ?

— না, আর একটু বসি, তুমি শোও।

— কিছু তো লিখছো না ; শুধু-শুধু তো বসে আছো। তার চে—

— না, লেখা নয়, আমার বসে থাকতেই ভালো লাগে এরকম। আজ আমার খুব মন খারাপ লাগছে।

— কেন ?

গায়ত্রী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। এবার ও কাঁধে হাত রাখবে আর তার পরেই কান ধরে টানতে আরম্ভ করবে। এই ওর একটা অদ্ভুত আদর। কান টানা। আমি যে ওর পূজনীয় পতিদেবতা, ওর খেয়াল থাকে না। দুই কান ধরে এত জোরে টানে যে আমার কান জ্বালা করে। আমি রাগ করে ওর নাকটা ধরে টেনে দিই। কিন্তু ওর ফর্সা মুখে নাকটা এত লাল হয়ে ওঠে যে আমার মায়া হয়।

গায়ত্রী আমাকে একা রেখে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল ! আজ আমার মন খারাপ লাগছে একথাটা হঠাৎ বললুম গায়ত্রীকে, কিছু না ভেবে। নিজের স্ত্রীর কাছে, আজ আমার শরীর খারাপ লাগছে, বলার চেয়ে মন খারাপ লাগছে, একথাটা বলা অত্যন্ত নিরাপদ। শরীর খারাপ লাগছে, শুনলেই— কী রকম লাগছে, কোথায়, উপসর্গ কী-কী, কী ওষুধ— এরকম হাজার কথা। কিন্তু মন খারাপ লাগছে বললে অন্তত সভ্য স্ত্রীলোকেরা আর সে সম্পর্কে বেশি প্রশ্ন করে না। আসলে আমার শরীর খারাপ লাগছে না মন খারাপ লাগছে, আমি জানি না। এ সম্পর্কে তাপসের থিওরি ভারি চমৎকার ! তাপস বলে, শরীর খারাপ আর মন খারাপ, এর সীমারেখাটা কোথায় একথা ক'জনে বোঝে ? আমার তো সন্ধের দিকে যদি বিষম মন খারাপ লাগে, যদি মনে হয় হেরে গেছি, পৃথিবীতে আমি একা— তাহলেই বুঝতে পারি, দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। তখন দু'খানা কচুরি, খানিকটা তরকারি ফাউ আর চার পয়সার দই খেলেই বিষম চাঙ্গা লাগে। আমার মনে হয়, বিশ্ববিজয়ী। নিজেকে যখন ব্যর্থ প্রেমিক মনে হবে, তখন বুঝবি—

জুতোর পেরেক উঠেছে, হাঁটবার সময় পায়ে ফুটছে, কিন্তু টের পাচ্ছিস না। জীবনে কিছুই করা হলো না—এই ধরনের উটকো মন খারাপ হলে বুঝবি, নিশ্চিত হজমের গণ্ডগোল হয়েছে। তাপসের একথাগুলো যে সম্পূর্ণ আজগুবি নয়, তা আমি মানি। তবু এ ধরনের গদ্যময় কথা পুরো মানতেও ইচ্ছে করে না। অবিনাশের কতগুলো নিজস্ব কথা আছে। অবিনাশের একটা প্রিয় কথা হলো, প্রায়ই বলে রেগে গেলে, যাঃ শালা, শ্মশানের পাশে বসে ব্যবসা কর। একথাটার মানে আমি বুঝতে পারি নি বহুদিন। এখনও হয়তো অবিনাশ কী ভেবে বলে, আমি জানি না। তবে বছর পাঁচেক আগে আমরা দলবল মিলে শ্মশানে বেড়াতে যেতাম। পাঁচ রকম লোককে দেখতেও ভালো লাগে—তাছাড়া বড় কারণ এই, যখন মদ খাবার জন্য জায়গার অভাব হতো, তখন বোতল কিনে নিয়ে শ্মশানে চলে যেতুম— ওখানে, আশ্চর্য, কোনোও বাধানিষেধ নেই। গঙ্গার পাড়ে বা শ্মশান-বন্ধুদের ঘরে বসে খেতুম— কেউ দেখলেও গ্রাহ্য করতো না, এমন স্বাভাবিক।

গগনেন্দ্র, পরীক্ষিৎ, শেখর, অরুণ ওরা আবার সাধুদের দলে বসে গাঁজা খেতো। বাঃ, বিনে পয়সায় কি ফাস্‌ক্লাস নেশা, এই বলে গগনেন্দ্র ট্রপিক্যালের প্যান্টপরা অবস্থাতেই ধুলোর ওপর বসে পড়তো। অয়েল পেইন্টিং চলবে? চলুক না এক রাউন্ড। এই বলে গগনেন্দ্র তেলেভাজাওয়ালাকে ডেকে মাঠসুদ্ধু লোককে খাওয়াতো। অম্লানটা ছেলেমানুষ, মাঝে-মাঝে কাঁদতো গোপনে। একটা মড়া পোড়ানো শেষ হয়ে গেছে, মৃতের জ্যেষ্ঠ সন্তান একটা মাটির খুরিতে করে শেষ অস্থিটুকু কাদামাটি চাপা দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছে। আমি চুপি চুপি অম্লানকে বললুম, 'আচ্ছা, মানুষের সব পুড়ে যায়, ওটা কি পোড়ে না রে?— কপাল না নাভি? ওটা কি স্টোন দিয়ে তৈরি? অম্লান বললো, শোন—। তারপর আর কিছু বলে না। আমি দেখলুম অম্লানের চোখে জল চিকচিক করছে। বললো, আমার বাবাকে পোড়াবার পর ওটা পাই নি, জানিস্।

— কোনটা?

ঐ যে ঐ অস্থি। আমি তখন অন্যপাশে বসেছিলাম— হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ডোমটা বাঁশ দিয়ে অস্থি খোঁজাখুঁজি করছে। পাওয়া যাচ্ছে না। তখন রাত তিনটে। চিতা প্রায় নিবে এসেছে— এখানে সেখানে একটু আগুন। ডোমটা খুঁজছে তো খুঁজছেই। বললো, অস্থির আগুন দেখলেই চেনা যায়— অস্থি-র ওপরে লাল রঙের আগুন জ্বলে, একটু ঠাহর করলেই দেখতে পাবেন। আমার তখন, জানিস অনিমেষ, বিষম পায়খানা পেয়েছিল, থাকতে পারছিলুম না, ওরকম মারাত্মক পায়খানা আমার সারাজীবনে পায় নি, আমি ভাবছিলুম কোনোরকমে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে স্নান করার সঙ্গে-সঙ্গে ও কাজটা সেরে নেবো— কারণ, ওরকম সময়, বাবার শেষচিহ্নটা খোঁজা হচ্ছে— আর আমি বলবো, আমার পায়খানা পেয়েছে— ভেবে দ্যাখ, এ অসম্ভব,— কিন্তু ডোমটা বহু খুঁজেও অস্থিটা পাচ্ছে না, অথচ অস্থি পুড়ে যেতেও পারে না। আমি আর থাকতে না পেরে, এই যে পেয়েছি, বলেই এক টুকরো কাঠকয়লা তুলে মাটি চাপা দিয়ে ছুটে গঙ্গায় চলে গেলুম। অনিমেষ জানিস, আমার বাবার আসল অস্থি বোধহয় শেষ পর্যন্ত কুকুর-বেড়ালে খেয়েছে। এই বলে অম্লান হঠাৎ রুমাল বার করে চোখ মুছতে লাগলো। ওর এই গল্পটার সঙ্গে কান্নার কী সম্পর্ক আছে ভেবে আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। হায় হায়, আমি যে আগাগোড়াই গল্পটা হাসির গল্প ভেবে মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছিলাম। পায়খানা পাবার গল্প আবার কান্নার হয় নাকি? সেইদিনই অবশ্য বুঝতে পেরেছি, অম্লান কমার্শিয়ালি সাকসেস্‌ফুল লেখক হবে। কারণ, ও এখনো জানে যে, শ্মশানে এলে দুঃখিত হতে হয়। অম্লান ইতিমধ্যেই পাঁচখানা উপন্যাসের প্রণেতা।

অবিনাশ একদিন একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। শ্মশানে। সেদিনও আমরা একটা গাঁজার দলে বসে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ আর শেখর হুস-হুস করে লম্বা টান মেরে মুখের মধ্যে ধোঁয়া আটকে

রাখছে। তারপর পাঁচ মিনিট বাদে দুই নাকের ফুটো দিয়ে মোষের শিংয়ের মতো সেই ধোঁয়া বার করছে। আমি দু'একবার টেনেই কাশতে লাগলুম। আমি রাউন্ড থেকে সরে বসলুম। অবিনাশও এসবে নেশা পায় না। ও একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে আর তাপসকে ডেকে বললো, চল, একটু ঘুরে আসি। খানিকটা হেঁটে পাটগুদামের পাশ দিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, বাংলা আছে ?

— বাংলা পান ?

— না, ছিপি আঁটা।

— সাড়ে তিন টাকা পাঁইট লাগবে।

— এক নম্বর তো ? তিনটে ভাঁড় দিও।

আমি অল্প অল্প নিচ্ছিলাম, বাংলা আমার সহ্য হয় না, অবিনাশ ঢকঢক করে খেতে লাগলো, তাপস খুব গম্ভীর। তাপসের বিখ্যাত অন্যমনস্কতা। মাঝে-মাঝে ওর হয়, তখন ও উৎকট রকমের চুপ করে থাকে। হিউমার শুনলেও হাসে না, তখন বোধহয় কোনো লেখার কথা ভাবে। অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, তোর নভেলটা শেষ হয়েছে তাপস ? তাপস ঘাড় নেড়ে জানালো, না। অবিনাশ অপর দিকে ফিরে বললো, ওসব গাঁজা-ফাঁজা টানতে আমার ভালো লাগে না, বুঝলেন ? ঐ পরীক্ষিৎরা টানছে কেন জানেন ? কবিতার মশলা খুঁজছে। গাঁজায় নাকি নানা রকমের ইমেজ দেখা যায়। এই ভিখিরির মতো ইমেজ খোঁজা কেন ?

আপনার একথা বলা মানায় না, অবিনাশ। আমি বললুম।

— কেন ?

— আপনি তো এখন লেখেন না। আপনার ইমেজের দরকার কি ?

ওঃ। অবিনাশ একটু বিব্রত হলো। অরুণও তো লেখে না। জীবনে কখনো লেখে নি। ও খায় কেন ? আসলে স্বপ্ন দেখার নেশা, দুঃস্বপ্ন দেখার নেশা, স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করার নেশা থাকে অনেকের।

— আপনার নেই ?

— না, আমি আর ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চাই না

আমি হেসে উঠলুম। এ বাসনা আপনার কত দিনের ?

— আমি তো সরল জীবনই কাটাচ্ছি। কী রে তাপস ?

হয়তো। তাপস বললো।

একটা লম্বা চুমুকে বাকিটা শেষ করে অবিনাশ বললো, আমি কলকাতার বাইরে একটা চাকরি খুঁজছি। তাছাড়া আমি যে লিখি না, তা নয়, আমি একটা বড় গল্প লিখেছি। তাপস সচকিত হয়ে বললো, কবে ?

— আজ, একটু আগে। গঙ্গার পাড়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। সম্পূর্ণ গল্প, প্রায় পঞ্চাশ পাতার হবে। আশ্চর্য হু-হু করে যেন ট্রেনের মতো গল্পটা আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। এই দেখাটাই তো যথেষ্ট। লিখে আর কি লাভ ? পাছে ভুলে যাই তাই মদ খেয়ে মনের মধ্যে গেঁথে নিলুম।

— ভাগ শালা, চালাকির আর জায়গা পাস নি !

— বিশ্বাস কর, পুরো গল্পটা কয়েক নিমেষে দেখতে পেলাম।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা শ্মশানের পাড়ে চলে এলাম আবার। সিগারেট আছে ? নেই ? অবিনাশ একটা দোকানে গিয়ে বললো, দেখি এক প্যাকেট সাদা বিড়ি !

লোকটা সিগারেট দিতে দিতে অকারণে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের মড়া চিতায়

চেপেছে ?

— কি ?

— আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে ?

আমাদের মড়া ? অবিনাশ গাঁ-গাঁ করে হেসে উঠলো। আমাদের মড়া কোথায় রে, অ্যাঁ?

বুঝলাম অবিনাশের নেশা হয়েছে। অবিনাশ বললো, চল, আমাদের মড়া খুঁজে আসি।

আমরা শ্মশানের মধ্যে ঢুকলাম। চারটে চিতা জ্বলছে সামনে ধকধক করে। অবিনাশ খুশি মনে বললো, আজ বাজার ভালো। গগন থাকলে বলতো, আজ অনেক লোক পড়েছে। লোক না টোক। জয় কালী জয় কালী বল, লোকে বলে বসবে পাগল হলো।

আমরা শ্মশানবন্ধুদের জন্য পাথর বাঁধানো ঘরে ঢুকলাম। একদল লোক সদ্য পোড়ানো শেষ করে আলকাতরা দিয়ে মৃতের নাম লিখছিল দেয়ালে—

বাবু শিবপ্রসাদ সাঁতরা
বয়স ৭২। মৃত্যু সাতুই জানুয়ারি
রিটায়ার্ড চৌকিদার
গ্রাম ঘোলা। পো: ইত্যাদি।

অবিনাশ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের লেখা দেখলো। তারপর শেষ হলে, কাঁদো-কাঁদো মুখে বললো, দাদা একটু আলকাতরা দেবেন, আমাদের মড়ার নামটা লিখবো।

নিশ্চয়, নিশ্চয় লিন্ না— একজন মুরুব্বি সহানুভূতির সঙ্গে দিল। অবিনাশ গোটা গোটা অক্ষরে লিখলো— সাদা পাথরের দেয়ালে—

বাবু অবিনাশ মিত্র। নিবাস— জানা নাই।
জন্মকাল— জানা নাই। বয়স— জানা নাই।
মৃত্যু তারিখ— জানা নাই।

তাপস বললো, আরও লেখ, বাপের নাম জানা নাই।

আমি মুখ ফিরিয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। অবিনাশকে এতোটা সেন্টিমেন্টাল হতে আমি আগে দেখি নি।

শ্মশানের কথা মনে পড়লেই সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে। সেই ইটালিয়ান ধরনের সুন্দরী পাগলিটার কথা। রোগা, তরুণী, রেনেসাঁস নাক, নীল চোখ। একটা হাফ সায়া আর লাল সার্টিনের ব্লাউজ পরে নিবন্ত চিতার পাশে বসে আগুন পোহাতো। মেয়েটা এতোই রোগা যে ওর শরীরের রস কতখানি আছে বোঝা যায় না, সেজন্যই বোধহয় রাতের বাঘ-ভাল্লুকেরা ওর দিকে তেমন নজর দেয় নি। কিন্তু অমন রূপসী আমি খুব কম দেখেছি—অথবা শ্মশানে, নিবন্ত চিতার পাশে বলেই ওকে অত সুন্দর দেখাতো। মাত্র দিন-চারেক দেখেছিলাম মেয়েটাকে, চিতার পাশে ছাড়া অন্য কোথাও বসতে দেখি নি। কোনোদিন শুনি নি ওর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বার করতে। গগনেন্দ্র বড় ভালবাসতো মেয়েটাকে। সোয়েটারের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে গগনেন্দ্র সোজা তাকিয়ে থাকতো মেয়েটার দিকে। আর বিড়বিড় করে বলতো, হে শ্মশানের ঈশ্বর, ঐ মেয়েটাকে অন্তত একঘণ্টার জন্য আমাকে দাও। তাপস পাশে দাঁড়িয়ে হাসতো, তখন গগনেন্দ্র বলতো, যান না, দেখুন, অন্তত একবার, যত টাকা খরচ হোক।

নিবন্ত চিতার আশপাশেও লোক থাকতো। গেঁজেল, রিক্সাওয়ালা, সাধু-হয়ে-যাওয়া

সিফিলিসের রুগী, রাতকানা ভিখিরি। তাপস গিয়ে মেয়েটার পাশ ঘেঁষে বসে গাঁজার টান মারতে লাগলো। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করতুম। মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নেই। দুই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মেয়েটা কাঠি দিয়ে ছাই নাড়ছে। এমন সময় হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে গেল। শীতকালের মারাত্মক অকাল বৃষ্টি, আমরা তখনই ছুটে বসবার ঘরগুলোয় ঢুকে পড়লুম, সবচেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো ঝানু গাঁজাখোররা— যারা এক ফোঁটা জল শরীরে সহ্য করতে পারে না! মেয়েটা চুপ করে বসে ভিজতে লাগলো। কী অদ্ভুত ওর চুপ করে বসে থাকা। সেইরকম হাঁটু মুড়ে থুতনি ভর দিয়ে কাঠি দিয়ে ছাই খুঁটতে লাগলো, লাল সার্টিনের ব্লাউজ আর হাফসায়া, সেই মেয়েটা, নীল ঝকঝকে চোখ, এখনো চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পাই। তাপস বললো, না, পারলুম না, মাপ করুন, মেয়েটার অসম্ভব দাম্ভিকতাকে ছুঁতে পারলুম না। আমার বন্ধুদের অনেক রকম এলেম ছিল, কিন্তু একটা পাগল মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করার ভাষা কারুর জানা ছিল না। গগনেন্দ্র বললো, কে কে মল্লিকার কাছে যাবেন চলুন, আমি এই মেয়েটার মুখ মনে করে মল্লিকার কাছে যাবো।

আমি কলকাতা ছেড়েছি চার বছর। জানি না ওরা এখনো শ্মশানে বেড়াতে যায় কিনা। গগনেন্দ্র চাকরি করে বম্বেতে, অরুণ বিলেতে গেছে। আমি ক্লান্ত হয়ে জব্বলপুরে রাত্রে বসে আছি। আমার মন খারাপ লাগছে। মন খারাপ না শরীর খারাপ জানি না। গায়ত্রী হয়তো ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে। ঘুমোও একটু, একটু পরে তোমায় জাগাবো। গায়ত্রীকে বোধহয় খুব সুন্দর দেখতে। অন্তত আমারতো মনে হয়— অবশ্য বউয়ের রূপ সম্বন্ধে স্বামীদের মন্তব্য গ্রাহ্য হয় না। পরীক্ষিৎ আমাকে বলেছিল, বউ বেশি সুন্দরী হওয়া ভালো নয়। পাগল, পরীক্ষিৎটা কি আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে, যে বউয়ের রূপে ভুলে থাকবো। বা, কেরানিবাবুদের মতো— বউয়ের দিকে কে কুনজর দিল সেই নিয়ে। আচ্ছা, গায়ত্রী বোধ হয় কখনো ভালবাসা পায় নি, তাই আমাকে এতটা অবলম্বন করতে চায়। ও আমাকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। ওর শরীরের ক্ষিধে একটু বেশি, নবীন যুবতীর কামুকতা যে এমন ভয়ঙ্কর আমার জানা ছিল না, আমার বন্ধুদের মতো মেয়েদের সম্পর্কে আমার বেশি অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু, মনে হয়, গায়ত্রী বোধহয় আমাকে পেয়ে খুশিই হয়েছে— একটা মেয়েকে খুশি করা কম নয়, বহু কবিতা লেখার চেয়েও বড়।

শ্মশানের পাগলিটার থেকেও বোধহয় গায়ত্রী রূপসী। সেই মেয়েটাকে এই বিছানায় মানাতো না। গায়ত্রীকে এই খাটে কি চমৎকার মানিয়েছে, ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার বইয়ের ছবির মতো। আমি ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে গিয়েও হাত তুলে নিলাম। তুমি আর একটু ঘুমোও গায়ত্রী। আমি ইতিমধ্যে দাড়িটা কামিয়ে নিই। কাল ভোরবেলা বেরুতে হবে, তখন দাড়ি কামানো যাবে না। তাছাড়া, রাত্রে দাড়ি কামাতে ভালোই লাগে। একটু গরম জল পেলে ভালো হতো। যাক। আমি সেফটি রেজর, ব্রাশ, সাবান খুঁজতে লাগলুম।

— এ কী গায়ত্রী, তুমি উঠে এলে কেন?

— আমি তো জেগেই ছিলাম।

— না, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, পরে তোমায় জাগাবো।

— যাঃ, দাঁড়াও, আমি গরম জল করে আনি।

গায়ত্রী আমার গালে ওর গালটা ঘষে দিয়ে বললো, কী খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, বাবাঃ।

অবিনাশের চিঠিটা রাখলুম, দাড়ি কামিয়ে সাবান মুছবার জন্য। এখন রাত ঠিক বারোটা— মাইকা মাইনস-এর সাইরেন বেজে উঠলো। একটি মুরগিও ডেকে উঠলো প্রচণ্ড আওয়াজে। মুরগিরা কি রাত্রে ডাকে— কখনো শুনি নি বা লক্ষ করি নি— ভোরবেলা দেখেছি একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সূর্যকে ডাকে। পৃথিবীর লোককে সূর্য ওঠার খবর জানাবার ভার মুরগিগুলোর

ওপর কে দিয়েছে কি জানি। যে মুরগিটা এইমাত্র জেগে উঠলো সেটা বোধহয় চাঁদের খবর জানাতে চায়। ঐ মুরগিটা বোধহয় মুরগিসমাজের মধ্যে বিদ্রোহী আধুনিক— সূর্যের বদলে চাঁদ কিংবা অন্ধকার ঘোষণা করতে চায়। ভেবেই আমার হাসি পেল। ওই মুরগিটা বেছে নিয়ে কাল রোস্ট খেলে কেমন হয় ?

— এ কি, এর মধ্যে গরম জল হয়ে গেল ?

— দাঁড়াও, তুমি চুপ করে বস, আমি তোমার দাড়ি কামিয়ে দিই।

— তা হয় না, পাগল নাকি ?

— বাঃ, কেন হবে না।

— সেফটি রেজর দিয়ে অপরে কামাতে পারে না। পারবে না, পারবে না, আমার উঁচু-নিচু গাল, কেটে যাবে। তোমাদের মতন অমন নরম তুলতুলে গাল হলে কাটা যেতো অনায়াসে। তুমি বরং গালে সাবান মাখিয়ে দাও।

রাত্তিরবেলা গরম জলে ব্রাশ ডুবিয়ে গালে সাবান মাখতে সত্যিই বেশ আরাম লাগে। গায়ত্রী আমার দু'পায়ের ফাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব যত্ন করে সাবান ঘষতে লাগলো। আমি চেয়ারে বসে এক হাতে ওর কোমর ধরে— এই অসভ্যতা করবে না!— বলেই গায়ত্রী আমার চোখে সাবান লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আমাকে দুই হাতে চোখ ঢাকতে হলো। গায়ত্রী হেসে দূরে সরে গেল। আমি ওকে উঠে ধরতে গিয়েও পারলাম না। দাড়ি কামাতে গিয়ে আমার থুতনিটা কেটে গেল।

অন্তত বারো বছর ধরে তো দাড়ি কামাচ্ছো, এখনো শিখলে না, আনাড়ী! গায়ত্রী হাসতে-হাসতে বললো।

— তোমাদের তো এটা শিখতে হয় না, জানবে কী করে কি বিরক্তিকর কাজ।

— আমি সেফটি রেজর দিয়ে খুব কাটতে জানি ! তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিও, আমার একটু লাগবে।

— তুমি কী করবে ?

— আমার দরকার আছে।

— ওঃ, আচ্ছা, তোমারটা আমি কেটে দিচ্ছি।

— না, আমিই পারবো।

— হাতের নিচের চুল কাটবে তো ? বাঁ হাতেরটা তুমি পারলেও, ডান হাতের নিচেরটা পারবে কী করে ?

— খুব পারবো, বাঁ হাত দিয়ে।

— না, এসো না লক্ষ্মী, দেখ আমি কি সুন্দর করে দিচ্ছি।

গায়ত্রীকে ধরে এনে দাঁড় করালুম। ও ভিনাস ডি মেলোর ভঙ্গিতে দুই হাত উঁচু করে দাঁড়ালো। আমি সাবান মাখিয়ে খুব যত্ন করে সাবধানে ওকে কামিয়ে দিলাম।

লাগছে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হুঁ, খুব দুষ্টুমি করে গায়ত্রী।

আমার শেখরের কথা মনে পড়লো। শেখর হস্টেলে থাকতে সাবান খেতো। নতুন চকচকে সাবানের কেক দেখলে শেখর লোভীর মতো এক কামড়ে আধখানা খেয়ে ফেলতো কচকচ করে— আমরা অবাক হয়ে দেখতুম। শেখরের মতো অভ্যেস যদি থাকতো, তবে আমি গায়ত্রীর বগলের সাবান ধুয়ে না দিয়ে চেটে নিতাম। তার বদলে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়ে আমি ওর বুকে মুখ গুঁজলাম।

— গায়ত্রী আমার বিষম ইচ্ছে করে শিশুর মতো স্তন্যপান করতে। তোমার বুকে দুধ নেই কেন ?

বাঃ, তুমি যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম বলতে, আমার বুকে অমৃত আছে! আমরা দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলুম।

তুমি বুঝি তখন আমার কথা বিশ্বাস করতে না ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

তুমিই বুঝি বিশ্বাস করে বলতে ? গায়ত্রী বললো, ওসব বিয়ের পর কিছুদিন বলতে হয়, শুনতেও ভালো লাগে।

— না, সত্যিই, বুকের দুধ খেতে আমার বিষম ইচ্ছে করে।

— আচ্ছা আমার একটা ছেলে হোক, তখন খেও।

— কবে তোমার ছেলে হবে ?

— বাঃ, তার আমি কী জানি! সেটা কি আমার হাত! ওসব আজেবাজে ব্যবহার করতে কেন ?

— ওসব জানি না, কবে তোমার একটা ছেলে হবে বলো না ?

— বা রে, সেটা তো তুমিই জানো !

— সন্তান বুঝি বাবার, মায়ের নয় ?

— বাবা না দিলে মায়ের কী করে হবে ?

ওসব বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা। তোমার পেটের মধ্যে জন্মাবে, তোমার রক্ত চুষে বড় হবে, তোমার শরীর ফুঁড়ে বেরুবে, আর তার জন্য দায়ী হবো আমি, সারাদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবো কি বিদেশে থাকবো—ওসব বাজে কথা, সন্তান আসলে মেয়েদেরই হয়। তুমি আমাকে একটা ছেলে দাও গায়ত্রী। গায়ত্রী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোমাকে একটা ছেলে দেবো ?

— হ্যাঁ !

— আচ্ছা, দেবো, আর আট মাস বাদে।

তার মানে ? আমি গায়ত্রীকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম।

— শত্তুর আমার পেটে এসে গেছে !

— সত্যি, তুমি জানো ?

— হ্যাঁ, জানি, মেয়েদের ওসব জানতে ভুল হয় না।

গায়ত্রী, গায়ত্রী, গায়ত্রী ! আমি ওকে দু'হাতে তুলে একটা ঘুরপাক খেলুম।

— আঃ, ছাড়ো ছাড়ো—

— না না না, তুমি সত্যি বলছো ? বুঝতে তোমার ভুল হয় নি তো ? আমাকে ঠকাচ্ছো না ?

— না গো, ঠকাচ্ছি না, সত্যিই।

— গায়ত্রী ! উঃ, গায়ত্রী, আমার এতো আনন্দ হচ্ছে—

— ছাড়ো, লাগছে। ছেলের জন্য তোমার এতো কাঙালপনা কেন ?

— এতদিনে আমি পূর্ণ মানুষ হলুম। আমি গৃহস্থ, আমি পদস্থ চাকুরে, আমি সন্তানের পিতা! আমি কোথা থেকে জীবন শুরু করেছিলাম তুমি জানো ? না, জানো না। আমার বাবা নেই, মা নেই, একটাও আত্মীয়ের মুখ আজ মনে পড়ে না। তেরো বছর বয়েস থেকেই আমি একা। বাবার এক বড়লোক বন্ধু দয়া করে আমাকে মানুষ করেছেন— কলেজে যখন থার্ড ইয়ারে পড়তুম সেই সময় হঠাৎ তিনিও মারা গেলেন। তখন থেকে বিজ্ঞাপনের এজেন্ট সেজে, প্রুফ দেখে,

তিনবেলা ট্যুইশনি করে হস্টেলে থেকেছি। এইজন্যই তাপস-পরীক্ষিৎদের মতো বাউণ্ডুলে হয়ে যাই নি। আমার ঘর-সংসার ছিল না, তাই— ঘর-সংসার পাতবার বিষম লোভ ছিল আমার। কবে একদিন সুস্থ সাধারণ দায়িত্বশীল মানুষ হবো সেই ছিল আমার বাসনা— ভাগ্যিস আমি তোমাকে পেয়েছিলাম।

— হয়েছে, হয়েছে, এখন শোবে চলো, আমার ঘুম পেয়েছে সত্যি।

— চলো, এখন থেকে খুব সাবধানে থেকো কিন্তু।

— যদি বাচ্চা হবার সময় আমি মরে যাই ?

— পাগল নাকি ? তোমার বয়েস তেইশ, এই তো বাচ্চা হবার ঠিক সময়।

— খুব যন্ত্রণা হবে তখন, না ?

— তা হবে, যত যন্ত্রণা পাবে শিশুর প্রতি ততো ভালবাসা হবে।

— সন্তান কিন্তু সম্পূর্ণ আমার, তুমি বলেছ।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার— আমার সবকিছুই তো তোমার।

— আবার পাগলামি করছো ? তুমি না আধুনিক লেখক— আধুনিকরা এসব বলে নাকি ?

— ওঃ, হো-হো, তুমিও এসব জেনে গেছো !

— চলো, শুয়ে পড়ি, আর না। দাঁড়াও, জানালা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

— কেন, জানালা খোলা থাক না ! ঠাণ্ডা লাগবে ?

— ঠাণ্ডা না। চাঁদের আলো আমার চোখে পড়লে ঘুম আসে না।

— ওঃ, আচ্ছা অন্ধকার করে দাও।

গায়ত্রী সব অন্ধকার করে দিল। এতক্ষণ বুঝতে পারি নি—আমার কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। এবং, হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে— এই লাইনটাও মাঝে-মাঝে মনে পড়ছিল। মাথা ধরার সঙ্গে এই লাইনটির কোনো যোগ আছে কিনা জানি না। অথবা এই দুটোই আলাদাভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে— গায়ত্রীর সঙ্গে এই আনন্দের সময়ে। আঃ, গায়ত্রী, তোমাকে আমি বিষম ভালবাসি !

তা বুঝি আমি জানি না ? গায়ত্রী হাসির শব্দ করলো।

অন্ধকারে ওর হাসি দেখা গেল না।

তাপস

সকালটাই শুরু করলুম মারাত্মক ভুল দিয়ে। রোদ্দুরকে পাশে রেখে শুয়েছিলাম, যতক্ষণ শুয়ে থাকা চলে। ক্রমশ রোদ্দুরগুলো খুব স্বাধীন হয়ে সারা বিছানা ছড়িয়ে পড়লো। তখন পায়ের ধাক্কায় অতিকষ্টে জানলাটা বন্ধ করতেই রামসদয়বাবু সহৃদয় গলায় আপত্তি জানালেন, 'সকালবেলা যতক্ষণ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় শুয়ে থাকুন তাপসবাবু, কিন্তু সকালের রোদ ও হাওয়া গায়ে লাগানো উচিত। এর উত্তরে আমি বললুম, আপনার কাছে একটা খুচরো টাকা হবে? কাল সন্ধে থেকে আমি দশ টাকার নোটটা ভাঙাতে পারছি না।

রামসদয় কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন ও আসন্ন বাথরুমের প্রস্তুতির জন্য পেটে থাপ্পড় মারছিলেন। পরের আওয়াজটা কেমন হয়, সেই অনুযায়ী তাঁর মেজাজ নির্ভর করে। মনে হচ্ছে, আজ মেজাজটা ভালোই আছে। অত্যন্ত বিব্রত মুখে জানালেন, ইস্, তাইতো, আমার কাছেও যে দশ টাকার নোট সব। চাকরটাকে দিন না, ভাঙিয়ে দেবে। আমি জানি রামসদয় মিথ্যে বলে

না, ওর কাছে সত্যিই দশ টাকার নোট। হয়তো অনেকগুলোই দশ টাকার নোট থাকা সম্ভব। কেন চালাকি করতে গেলুম—পুরো একটা দশ টাকার নোট চাইলেই চমৎকার হতো। আর কি শুধরে নেবার সময় আছে? এখন কি ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলবো, বুঝতেই তো পারছেন দাদা কথার কথা, পুরো দশটাই দিন! রামসদয় বাথরুমে ঢুকে পড়লো, ওঁর প্রসন্ন মুখ দেখে বুঝলুম বেগ এসে গেছে। আজ রামসদয়ের মন ভালো ছিল, আজ দশ টাকা না চাওয়াটা চূড়ান্ত বোকামি হয়ে গেল। লোক ভালো রামসদয়, একমাত্র টাক ঢাকবার জন্য চুলগুলো সামনের দিকে টেনে আঁচড়ায়— এছাড়া ওর কোনোই দোষ নেই। নিশ্চিত দিত। তার ওপর যদি বলতে পারতুম, কাল মায়ের চিঠি পেয়েছি, দীর্ঘশ্বাস কিংবা বন্ধুর অসুখ—কুড়ি কি তিরিশ হয়ে যেতে পারতো। ওঃ! সকালেই মোটা হরি শুনিয়ে গেছে, ঠাকুরের অসুখ, আজ সবাইকেই বাইরে খেতে হবে। তার মানে সারাদিন আজ কুহেলিকা। দুপুরবেলাটা শুয়ে-শুয়ে কাটাবো ভেবেছিলাম। ইচ্ছে হলো মোটা হরির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।

স্টিম লন্ড্রিতে কাচানো এক পেয়ার শার্ট-প্যান্ট ছিল— এইটুকুই যা সৌভাগ্য। পকেটের মধ্যে পয়সা না থাকলে জামা-কাপড় নোংরা থাকা মানায় না। তাহলে সত্যিই ভিখিরি মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সকাল ন'টা। সকালের চাও দেয় নি, এমন রাগ হচ্ছে যে ইচ্ছে করছে, নাঃ, সকালবেলাতেই মুখ খারাপ করবো না। মুখে এখনো টুথপেস্টের বিচ্ছিরি স্বাদ লেগে আছে। পকেটে একটা নিঃসঙ্গ দশ নয়া পয়সা। এই দশ পয়সাটা নিয়ে পড়েছি মহা মুকশিলে। কাল সন্ধে থেকে ভাবছি। এটাকে কোনো বাজেটে ফেলা যায় না। চায়ের কাপ দু'আনা। কলুটোলার মোড়ে ছ' পয়সায় পাওয়া যায়— কিন্তু এতদূর হেঁটে গিয়ে চা খেলে সঙ্গে একটা টোস্ট না হলে—। সিগারেট কেনা যায়— কিন্তু সকালেই চা ছাড়া শুধু সিগারেট! চমৎকার হতো, যদি এই দশ নয়া পয়সায় একটা পোচ, দুটো টোস্ট, এক কাপ ভালো চা ও সঙ্গে দুটো সিগারেট পাওয়া যেতো। এইগুলো আমার বিষম দরকার এখন। এর একটাও হবে না বলে, ইচ্ছে হলো পয়সাটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলি। কিংবা কোনো ভিখিরিকে দিয়ে দিই। হঠাৎ একটা মুচিকে দেখে জুতো পালিশ করিয়ে নিলাম দশ নয়াটা দিয়ে। ময়লা জুতোটা মানাচ্ছিল না। এবার শরীর ও মন বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। এখন অনায়াসে বিমলেন্দুর কাছে যাওয়া যায়। বিমলেন্দু সকালে কমার্স কলেজে পড়াচ্ছে। আর বিমলেন্দুর কাছেই যখন যাবো, তখন ট্রামে যাওয়া যাক।

ট্রামটায় ভিড় ছিল না, জানলার কাছে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। কন্ডাক্টরকে দেখে মাঝপথে নেমে পড়া আমি মোটেই পছন্দ করি না। বসবার জায়গা পেয়ে বসে পড়া উচিত। সম্ভব হলে একটা বই খুলে পড়া। আমার কাছে বই ছিল না— কন্ডাক্টরকে খুব ভালো করে লক্ষ করতে লাগলাম। খুব পছন্দসই লোকটি, বেশ অলস স্বভাবের—কারণ প্যান্টের সবক'টা বোতাম আটকায় নি, নিশ্চয়ই কানে কম শোনে—কারণ লোকটার মুখে-চোখে একটা এলোমেলো বোকামি আছে। অনেকটা ভবকেষ্টর মতো। ভবকেষ্টর মুখে অমন নিষ্পাপ বোকামির ছায়া কেন, আমি ততদিনও বুঝতে পারি নি, যতদিন না জানতে পেরেছি ও বদ্ধ কালা। ভবকেষ্টর বউ মালতী ওর ইয়ার ব্যান্ডের কাজ করে— সেইজন্য মালতীর মুখেও বোকামির স্বর্গীয় আলোছায়া খেলে। অনেকক্ষণ পর কন্ডাক্টর আমার কাছে এলো। আমি বাঁ দিকের ঘাড়টা আলতোভাবে বেঁকিয়ে অন্যমনস্কভাবে নরম গলায় বললুম, দিমানচ্ছি। লোকটা চলে গেল। যাক একবারেই সাকসেসফুল! এই অর্ধসত্যগুলোতে আমি খুব উপকার পাই। ঘাড় হেলানো দেখে লোকটা নিশ্চিত হয়েছিল, আমার উচ্চারণ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চলে গেল। দিচ্ছি ও মান্থলি এ দুটি শব্দের সন্ধি করে আমি ঐ শব্দটি সৃষ্টি করেছি। এবং বারবার উচ্চারণ করে রপ্ত করেছি ধাঁধাখানি। দিচ্ছি ও মান্থলি, দিমানচ্ছি। কোনো ত্রুটি নেই। সেই সঙ্গে আছে ঘাড় হেলানো। লোকটার কান যদি

ভালো হতো—তা হলে ও মহা মুকশিলে পড়তো। বুঝতেই পারতো না— আমার কাছে কী আছে— মান্থলি, না টিকিট কাটবো। ও কি জিজ্ঞেস করতো—দেখান? না দিন? দেখান বললে, ধমকে উঠতাম, দেখাবো কি দিচ্ছি বললাম তো! যদি লোকটা লজ্জার মাথা খেয়ে বলতো, দিন। তাহলে বলতাম, দশ টাকার খুচরো আছে ভাই? তখন যদি বলতো, না দশ টাকার খুচরো নেই, আমি আর বাক্যব্যয় না করে চুপ করে বসে থাকতুম। যদি মরিয়া হয়ে লোকটা দৈবাৎ বলেই ফেলতো, হ্যাঁ দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি, তবে ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করতুম, এ–ট্রাম বেলগাছিয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই? না, গ্যালিফ? ওঃ, গ্যালিফ, তাই বলো,— এইটুকুই জানিয়ে লাফিয়ে উঠে ব্যস্তভাবে নেমে যেতুম। আমি টিকিট ফাঁকি দিচ্ছি এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা করার পরও লোকটা কিছুই বলতো না। কারণ, আমার ভদ্রলোকের মতো মুখ। বাপ–মা আমার জন্য টাকা–পয়সা, ভাড়াবাড়ি কিছুই রেখে যায় নি, শুধু দিয়ে গেছে ভদ্রলোকের মতো সুন্দর মুখখানি। এটাও মন্দ ক্যাপিটাল নয়, এতেও খুব অনেকটা কাজ হয়।

বিমলেন্দু ক্লাসে পড়াচ্ছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। তারপর কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে ডবল টোস্ট, পোচ আর চায়ের অর্ডার করে বসলুম। চা শেষ হবার পর বিমলেন্দু এলো হন্তদন্ত হয়ে, হাতে কয়েকখানা বই, টাইপকরা নোট। 'কিরে কি ব্যাপার, আমার যে আজ বিষম চাপ, তারপর তিনটে ক্লাস!

— গুলি মেরে দে।

— না ভাই, আজ পারবো না, আজ ছেড়ে দে।

— দ্যাখ, বিমল, আমি না হয় বি.এ. পাশ! আমার কাছে প্রফেসারি দেখাস নি।

— আস্তে বল, ছেলেরা শুনতে পাবে।

— ক্লাসের পর কি করবি?

— ডঃ মহালনবিশের বাড়ি যেতে হবে একবার।

— কেন, তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে?

— ধ্যাৎ, ডঃ মহালনবিশ আমার রিসার্চ গাইড। আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাছাড়া ওর কোনো মেয়ে নেই। বিয়েই করেন নি।

— আজ সব ছেড়ে দে। আজ সারাদিন আমার কিছুই করার নেই। চল দু'জনে মিলে একটা পার্টি অর্গানাইজ করি। অনেকদিন একসঙ্গে বসা হয় নি।

— আজ হবে না রে। আমার আজ উপায় নেই। তোরাই বেশ আছিস তাপস। চাকরি–বাকরি করতে হয় না, ইচ্ছেমতো দিন কাটাতে পারিস। আমাকে সব মিলে পাঁচটা চাকরি করতে হয়। আমার গলায় দড়ি বাঁধা— দড়ির বাইরে যেতে পারি না।

— আচ্ছা, পাঁচটা টাকা ধার দে।

— নেই। খুচরা পয়সা সম্বল।

— পাঁচটা চাকরি করছিস, আর পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারবি না? একমুঠো খোলো মানিক!

— সত্যি পারি না।

— কত আছে?

বিমলেন্দু পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে গুনলো! চোদ্দ আনা। আমি ওর থেকে সাত আনা নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোর ধারের সিগারেটের দোকান আছে?

— আছে। চল।

— আমাকে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে দে। আজ মেস বন্ধ। দুপুরে কোথায় খাবো ঠিক নেই।

— তুই আমার বাড়িতে আয়! দুপুরে আমার সঙ্গে খাবি।

— দেখি।

ঘণ্টা পড়তে বিমলেন্দুকে ছেড়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ আবার ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই রিসার্চ করছিস, আগে তো শুনি নি। ডক্টরেট হয়ে তোর কি মুকুট হবে ? ছি ছি।

ডক্টরেট হলে মুকুট হবে না, কিন্তু মাইনে বাড়বে— বিমলেন্দু শুকনো মুখে জানালো। আমি ওর মুখের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম, সত্যি-সত্যি ওর গলায় দড়ির দাগ দেখা যায় কিনা !

শীত নেই, বেশ ঝরঝরে রোদ, ভিড় শুরু হয়েছে। রাস্তার দুই বিপরীত মুখেই জনস্রোত, দু'দিকেই কেন লোক ছুটে যায় বুঝতে পারি না। চারদিকেই পরের বাড়ি জলের রেটে নিলাম হচ্ছে—কী করে ওরা টের পায় কে জানে। আমি কোনোদিন টের পেলুম না। পেলেই বা কি। পকেটে নেই কানাকড়ি, দরজা খোলো বিদ্যেধরী! কোথায় যাই এখন ? আশ্চর্য, কোনো জায়গা মনে পড়ে না। বন্ধুবান্ধবের খোঁজ করা যেতে পারে। কি বিষম যাচ্ছেতাই জীবন— এক এক সময় আমার মনে হয়, প্রতিদিন একই বন্ধুবান্ধবের মুখ। আর কি সব মুখ, আহা! হাওড়া স্টেশনে যেসব নিরুদ্দিষ্ট আসামীর ছবি আছে— সব কটা এসে এখানে জুটেছে। হয় এর সঙ্গে দেখা, নয় ওর সঙ্গে আড্ডা, হৈ-হল্লা উত্তেজনা, ভালো লাগে না, সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগে। প্রতিদিন একই রকম কাটছে— একথা ভাবলে বেঁচে থাকার আর কোনো পয়েন্ট থাকে না। মনে হলো, বিমলেন্দুই বোধহয় একা একা জীবন কাটাচ্ছে। আজকাল বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ওকে প্রায় দেখাই যায় না, চারটে চাকরি, রিসার্চ, খবরের কাগজে লেখা, সেই সঙ্গে কবিতা—যেন এসবের মধ্যে ও কী এক গভীর ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সবসময় অনুত্তেজিত ওর মুখ, কিছুটা বিমর্ষ, কি জানি আমাকে দেখে ও খুশি হয়েছিল, না বিরক্ত ! মনে হয়, কিছুদিন পর হেমকান্তির সঙ্গে বিমলেন্দুর কোনো তফাৎ খুঁজে পাবো না।

মায়ের মৃত্যুর পর একমাস অশৌচ করেছে হেমকান্তি, নেড়া মাথায় রোজ হবিষ্যি খেতো। তারপর থেকে এখনও প্রায়ই মাথা কামাচ্ছে, মাছ-মাংস ছেড়েছে। এই রকমই নাকি সারাজীবন চালাবে। ঐ রকম ফর্সা, লম্বা চেহারা, মুণ্ডিত মাথা, হেমকান্তি যখন আমাদের মধ্যে বসে, মনে হয় যেন অতীতের কোনো মর্মর মূর্তি। ও বোধহয় জানে না যে মাথা কামিয়ে ফেলার পর ওকে বিষম অহংকারী দেখাচ্ছে— সেদিন যখন মায়ার দিকে হাত তুলে চায়ের কাপটা সরিয়ে দিলো, অস্ফুট গলায় বললো, আমি চা খাই না আর— মায়া চকিতে কাপটা নিয়ে সরে গেল— আমার মনে হলো এ দৃশ্যটা আমি আগে কোথাও দেখেছি— কোনো ফিল্মে বা রূপকথায় বা উপন্যাসে, বা স্বপ্নে, যেন কোনো অহঙ্কারী রাজপুত্র, বা নবীন সন্ন্যাসী, ফিরিয়ে দিচ্ছে কোনো উপযাচিকাকে। যদিও জানি, হেমকান্তির ওরকম কোনো সাহসই নেই, আর মায়াও হেমকান্তিকে মোটেই পছন্দ করে না। মায়াকে আমারও যেন কেমন লাগে, ঐ কচি মেয়েটাকে আমি বড় ভয় করি। নইলে আমার সময় কাটাবার সমস্যা ? অনায়াসেই মায়ার কাছে গিয়ে চমৎকার বসতে পারতুম, বলতুম, মায়া তোমার হাত দেখি। ওর করতল দু'হাতে ধরে গন্ধ শুঁকতুম, সমস্ত শরীরে চাপ দিতুম, ওর শরীর উষ্ণ হলে অনায়াসে জানানো যেতো, মায়া তোমার জন্য আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয় ! আমি ওর সঙ্গে বিছানায় শুতুম না, ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম কিংবা কানে-কানে কথা বলতুম কিংবা চোখের দুটো পাতা আঙুলে তুলে ফুঁ দিতাম, আমি ওর কৈশোরের রহস্য নিয়ে খেলা করতুম। কিন্তু মায়া আমাকে তা দেবে না, আমি গেলে চা দেবে, ইয়ার্কি করবে, তারপর একসময় বলবে, দিদিকে ডেকে দিচ্ছি, গল্প করুন। দিদি যদি না থাকে বাড়িতে, তাহলে বলবে, আসুন দাবা খেলি। খানিকটা বাদে নিশ্চিন্ত জানিয়ে দেবে— এবার বাড়ি যান। বাঃ।

আমি যদি ওর হাত চেপে ধরি, অন্যরকমভাবে ও হেসে উঠবে খিলখিল করে, যদি বলি, মায়া আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই, তাহলেও হাসবে, বলবে, থাকুন না। যদি জোর করে চুমু খেতে যাই— ও হেসে মুখ সরিয়ে নেবে কিন্তু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না। ওর সঙ্গে জোর করা যাবে না। মায়ার সমস্ত হাসিই অভিমানের, আমার মনে হয়। বরং ছায়া ভালো, ছায়া দুঃখিত কিন্তু বোকা! লোভী কিন্তু ঘুমন্ত। ছায়াকে হয়তো আমি খানিকটা পছন্দ করি ঠিকই— কী জানি! অবিনাশের মতো হাড়হারামজাদা ছেলেই মায়াকে ট্যাক্‌ল করতে পারে।

এখন আমি কোথায় যাই! কোনো মেয়ের সঙ্গেই প্রেম-ট্রেমের সম্পর্ক নেই যে হঠাৎ যেতে পারি। প্রথম কলেজ জীবনে ওসব চুকে গেছে। বাসন্তীর সঙ্গে কি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, আর একটু হলেই ওকে বিয়ে করে ফেলতুম আর কি! সেদিন বাসন্তীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো, নতুন বরের সঙ্গে চলেছে, খুশিতে মোটা হয়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু আশ্চর্য, আমার মধ্যে কোনোরকম ঈর্ষা কিংবা দুঃখ নেই, কিংবা উদাসীনতাও জাগলো না। খুবই সাধারণভাবে মাথা ঝাঁকালুম, কি খবর, কেমন, ভালো, এইসব অনায়াসে বলাবলি করে চলে গেলুম। বাসন্তীও আমাকে মনে রাখে নি। মেয়েরা কেউ আমাকে মনে রাখে না। যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পরই তার চোখে তাকিয়েছি, বসেছি, চলো, রেস্টুরেন্টের কেবিনে বা হোটেল রুমে। চলো, ট্রেনের নিরালা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। ব্লাউজে সেফ্‌টিফিন রেখো না, আমার আঙুলে ফুটে যায়, আমার আঙুল বিষম স্পর্শকাতর এবং দামী, সেফটিপিন ফোটাবার জন্য নয়। কেউ বেশিদিন টেকে নি। দু'একজন শেষ পর্যন্ত এগিয়েছে, অনেকে গোড়া থেকেই কেটেছে। কেউ কেউ বিয়ে করো— বলে এমন বায়নাক্কা তুলেছে, ওফ্! এক একজনকে সামলাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়েছে আমার! কতো চোখের জল— টেলিফোনে চোখের জল, চিঠিতে চোখের জল। অথচ, কেউই আমাকে কোনো অভিজ্ঞতা দেয় নি। উপন্যাসটা লিখলুম, সবাই বললো, খুব কর্কশ এবং নিষ্ঠুর হয়েছে। ভেবেছিলাম উনিশশো ষাট থেকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত নিজে যা যা করেছি, সেই সবই লিখবো। তাই লিখেছি অনেককিছু, যা যা মনে পড়েছে। কোনো নরম মুখ মনে পড়ে নি, চোখের জল মনে পড়ে নি, ভালবাসা শব্দটাই মনে পড়ে নি। জীবনে কখনো আমি ভালবাসা পাই নি বোধহয়। অথচ ভালবাসার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম। স্ত্রীলোকদের কাছে তো কম অভিযান করি নি, কিছুই পাই নি, লোভ ছাড়া, অথবা হয়তো আমার বোধশক্তি নেই, যা পেয়েছি এখনও তা উপলব্ধি করতে পারছি না। পরীক্ষিৎ তো পেরেছে, মেয়েদের সামান্য স্পর্শও ওকে কবিতায় ভরিয়ে তোলে, ওর কবিতা ভালবাসার কথায় মুখর। আমি কিছুই পাই নি, লোভ ছাড়া ; লোভ আমাকে বহুদূর নিয়ে গেছে, ভালবাসার চেয়েও বড় আসনে, ইচ্ছে করছে এখনই কোনো স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে শুই, এই লোভ আমার মধ্যে এনেছে অ্যাকশন, আমাকে তাড়িয়ে চলেছে, এইজন্য আমার শরীরে অসুখ নেই, আমার প্রত্যেকটি স্নায়ু সতেজ, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, আমি শিশিরের পতন শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই।

ট্রাম লাইনের পাশে বহুক্ষণ কাটলো। রোদ্দুর বেশ চচ্চড় করছে। কোন্‌দিকে যাবো এখনো দিক ঠিক করতে পারি নি। মেসে ফিরে গিয়ে শুয়ে থাকা যেতো। কিন্তু দুপুরে একটা খাওয়ার ব্যাপার আছে। কিছু না খেয়ে শুয়ে-শুয়ে কড়িকাঠ দেখা কবিত্বময় না। আমার ঠিক পোষায় না। যতো রাজ্যের কুচিন্তা আসে মাথায়, ইচ্ছে হয়, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করি, অথবা পিছন দিকের জানালার খড়খড়ি তুলে পাশের বাড়ির বাথরুমে উঁকি মারি। এ বয়সে আর ওসব চলে না। আশ্চর্য, সকলেই দিব্যি চাকরি-বাকরি করছে— আমি ছাড়া। এমনকি পরীক্ষিৎও খবরের কাগজের প্রুফ দেখে! ইস্কুলের মাস্টারিটা না ছাড়লেই হতো, আরও কিছুদিন দাঁত কামড়ে লেগে থাকা উচিত ছিল। আসলে ওই ইস্কুলের হেডমাস্টারটার কান মলে দেবার আন্তরিক ইচ্ছেটা আমি

কিছুতেই চাপতে পারি নি। একেবারে জোচ্চোরের ঘুঘু লোকটা। ও শালার উচিত শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা করা।

অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর খেয়াল হলো, কেন দাঁড়িয়ে আছি। যদি ট্রামে বা বাসে যেতে-যেতে কেউ আমাকে দেখে নেমে পড়ে—বস্তুত আমি সেই প্রতীক্ষা করছিলুম। আমি কারুর কাছে যাবার বদলে যদি কেউ আমার কাছে আসে। কেউ আসে না। মেয়েকলেজ ছুটি হবার পর এই যে অসংখ্য লাল-নীল-হলুদেরা, এরা কেউ আমাকে চেনে না, কেউ আমার কাছে এসে বলবে না, আপনি কি তাপস বাবু ? নিশ্চয়ই আপনি! আপনার উনত্রিশ দাঁতের লোকটা উপন্যাস তো আমাদের ক্লাসের সব মেয়ে পড়েছে। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আপনার ছবি দেখেছি। এসব ভাবতে বড়ো লাগে। কতো লোকের উপন্যাস আরম্ভ হয় এরকমভাবে! আমার বেলা শালা কিছু হলো না! কোনো মেয়েই আমার বই পড়ে নি। কোথাও কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর যদি শোনে, আমি একজন লেখক, তখন সেইসব মেয়েরা আমসিপানা মুখ করে জিজ্ঞেস করে, আপনি লেখেন ? তাই তো আমি কী লিখি ; কচুপোড়া লিখি, তাছাড়া আর কি !

কোথায় যাবো ? অম্লান ? দোতলার ছোট গুমোট ঘর, পাশের হোটেলের অ্যাকাউন্টে খাওয়া হো-হো করে হাসবে অম্লান, নার্ভাস গলায় নিজের কবিতা মুখস্থ বলবে, আর চুটিয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করা যাবে। এখন বাড়িতে থাকলে হয়। হে ঈশ্বর, অম্লানের যেন টাইফয়েড কিংবা পক্স, অন্তত মাম্‌স হয়ে থাকে। যাতে বিছানায় শুয়ে থাকবে। নইলে ওকে বাড়িতে পাওয়া এ সময়, ঈশ্বর, তোমারও অসাধ্য। অম্লানের ঘরে বহু রাত কাটিয়েছি। যে-কোনো প্রোগ্রামে বেশি রাত হয়ে গেলেই অম্লানের বাড়িতে— বারোটার পর পরীক্ষিতের আবার বাস বন্ধ হয়ে যায়— দু'জনে কতোবার এসেছি এখানে। ওর বাড়ির দরজার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খিল খোলা যায়, ঢুকে গেছি ভিতরে, ঘুম থেকে উঠে এসে অম্লান একটুও না চমকে আমাদের ঘরে ডেকেছে—হাসি-হাসি মুখ করে বলেছে, রাত্তিরে তো ঘুমোতে দেবে না জানি, বেলেল্লা করবে, সকালবেলা চা, ডবল্ ওমলেট সাঁটাবে, সিগারেট সব কটা ধ্বংস করবে—তারপর গাড়িভাড়াও চাইবে নিশ্চয়ই। ওঃ, পদ্যলেখা শুরু করে কী অন্যায়ই করেছি! তোদের মতো বন্ধু জুটিয়েছি, ভিখিরিরও অধম। তা জগাই মাধাই, আর একটি কোথায়—কাঙাল হরিদাস ?

পরীক্ষিৎ হাসতে-হাসতে বলেছে, সে আবার কে রে ?

— কেন, শেখর ! তিনজন না হলে তো তোমাদের চলে না। অবিনাশ তো শুনেছি কেটে গেছে, সে নাকি আজকাল ভালো ছেলে! হ্যাঁরে, তোদের যে প্রতিভা আছে, ঠিক জানিস তো? নাকি এরকম বাওয়া হয়ে শিল্পী সেজে (অম্লান উচ্চারণ করে 'Sil পি') জীবনটা নষ্ট করবি—শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না? আমি কিন্তু তোদের প্রতিভার এখনও কিছু টের পাই নি।

সারা ঘরে ছড়ানো বই ও পুরোনো তিনবছরের খবরের কাগজ, মাটির খুরিতে চুরুটের ছাই, জীবনে একবারও না কাচা বেড শিট, ঘাটের শিয়রের বই-এর ব্যাক থেকে শবের গন্ধ আসে—অম্লান আমাদের ঠাট্টা করে। অম্লানের ঠাট্টা শুনে পরীক্ষিৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আমি হাসতে হাসতে বলি, অম্লান, আমি শিল্পীও সাজি নি, জীবনটাও নষ্ট করছি না। শিল্পীরা কিরকম সাজে, কিভাবে জীবন নষ্ট হয় কে জানে !

অম্লান বাড়িতে নেই।

তিন জায়গায় ব্যর্থ হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এলাম। অম্লানের ঘরে তালা বন্ধ, অবিনাশের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম অনিমেষ আর গায়ত্রী কলকাতায় এসেছে, আছে ছায়াদের বাড়িতে—অবিনাশ সেখানে। গগনকেও যদি অন্তত পাওয়া যেতো। গগনকে পেলেই সবচেয়ে ভালো হতো, ও নিশ্চিত আমার কথায় অফিস কাটতে রাজি হতো, ওর কাছে সবসময় টাকা থাকে—

ওর মতো ডেসপ্যারেট কেউ নেই— একটা কিছু ঘটে যেতো। গগনকে গিয়ে ডাকলে বাড়ির দরজায় নেমে আসে গগন, কপালে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে আমার বিনীত প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ কীভাবে, তখন ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বোঝাই যায় না ও আমার কথা শুনছে, না অন্য কথা ভাবছে। রাজি হবে কিনা সন্দেহ, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গগন বলে, চুপ, দাঁড়া আসছি। ঠিক এক মিনিট বাদে গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে আসে গগন, বাড়ি থেকে কুড়ি পা পর্যন্ত গম্ভীর মুখে আসে, তারপর একটানে মুখোশটা খুলে বলে, মাইরি, চমৎকার দিনটা আজ, চুটিয়ে ফুর্তি করার মতো, চল, কোথায় যাবি বল।

গগন অফিসের কাজে এলাহাবাদ গেছে। খুব বেঁচে গেছি, মায়ার সঙ্গে প্রেম করার অছিলায় ওদের বাড়ি আজ যাই নি—ওখানে অতো লোক দেখলে খুবই খারাপ লাগতো। তিনটে মেয়ে এক বাড়িতে—ছায়া, মায়া, গায়ত্রী—অনিমেষের মাসতুতো বোন গীতাও কি আর আসে নি! ওখানে গেলেই ভজরৎ-গজরৎ করে সময় কাটাতে হতো। একসঙ্গে অতো মেয়ে আমার সহ্য হয় না, বড্ড বাজে রসিকতা শুনে হাসতে হয়। আজ আমার সে রকম মেজাজই নেই। অবিনাশটা ওখানে কি করছে কে জানে।

অনেকদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসি নি। সুন্দর নরম ঘাসে ভরে আছে এই দুপুরবেলা। ঘাস দেখে গরুর মতো আনন্দ হচ্ছে আমার। কৃষ্ণচূড়া ফুল খসে-খসে পড়েছে। ১৫ই এপ্রিল—সব গাছগুলো সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়—বহু বছর লক্ষ করেছি। ও পাশের ঐ হলদে ফুলগুলো নাকি রাধাচূড়া—একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল। এক সময় এই ঘাসের ওপর বহুক্ষণ শুয়ে কাটাতুম। ছায়া আসতো, ছায়াকে টোপ ফেলে অন্য দু'একটা মেয়েকেও টেনে আনা যেতো। একদিন মনে আছে, পুরো দু'ঘণ্টা ভিজেছিলাম এখানে বসে, ছায়ার সঙ্গে বাসন্তী আর নীলা বলে দুটি মেয়ে এসেছিল—প্রচণ্ড বৃষ্টি, সবাই দৌড়ে-দৌড়ে পালালো—আমরা বৃষ্টির মধ্যে বসে রইলুম, দূরের বারান্দা থেকে সবাই আমাদের দেখতে লাগলো— কেয়ারটেকার এসে বললো, আপনারা করছেন কি, নিউমোনিয়ায় মরবেন যে! আমরা অগ্রাহ্য করে তবু বসে ছিলাম। মেয়ে দুটো হাসছিল খিলখিল করে। ভিজে ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার ফুঁড়ে বুকের গোল স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওদের—আমি ওদের অশ্লীল গল্প শোনাতে লাগলাম, ক্রমশ আধোশোয়া প্রত্যেকটি মেয়ের বুকে ও পিছনে চারটি বাটির মতো গোল দেখে উত্তেজিত হয়ে আমি নীলা বলে মেয়েটির পিছনে আস্তে-আস্তে পা দিয়ে টোকা মেরেছিলাম, তারপর, বৃষ্টিশেষে, নীলা কিরকম চমৎকার আমার সঙ্গে একা বাড়ি ফিরতে রাজি হয়ে গেল। সেই নীলা এখন সর্বেশ্বরকে বিয়ে করে মেয়েকলেজের অধ্যাপিকা হয়েছে। একদিন দেখা হবার পর বললো, লেক টাউনে জমি কিনেছে, শিগগিরই বাড়ি তুলবে। একটি মাত্র ছেলে হয়েছে, তার কী নাম রাখবে— সেজন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিল। বেশ সুখে আছে নীলা, এই তো সুখ, সেই বৃষ্টিভেজা মাঠে আবার কেউ ফিরে আসে না। আজকাল আর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমাদের কেউ আসে না। সবাই পুরো সাহিত্যিক বা চাকরিতে ঢুকেছে। আমিই শুধু বোকা রয়ে গেলুম।

খুব খিদে পেয়েছে আমার। সত্যিকারের ক্ষিদে, বিমলেন্দুর সাত-আনা গাড়িভাড়াতেই হাওয়া। সিগারেটও ফুরিয়ে এলো। দুপুরে যে-কোনোভাবেই হোক পুরো পেট খেতেই হবে, কোনো চালাকি নয়। না খেয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। আমার সুখের শরীর, খিদে একেবারে সহ্য হয় না। তাছাড়া, দুপুরে আর সবাই খাবে, আমি একা কেন না খেয়ে থাকবো ? ইয়ার্কি নাকি ? আজ বড় ইচ্ছে করছে, মাংসের ঝোল দিয়ে লুচি খেতে। লুচির বদলে ভাত হলেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু মাংস আমার চাই-ই।

লাইব্রেরির দরজায় কার্ড চায়। কোথায় পাবো ? বহুদিন ওসব চুকে গেছে। অনেকরকম

বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঘাড়মোটা নেপালী হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটার হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, দে ভাই, একটু ঢুকতে দে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে ! লোকটা তবুও শোনে না। তখন আমি বললুম, লাইবিরিমে হামারা লিখা একটা কেতাব হ্যায়, জান্‌তা ? হামসে কার্ড চাও মাৎ, দু'দশ বরষ বাদ হিঁয়া পর হামরা ফটো ঝুলেগা, সমঝা ? লোকটা বললো, নেই সাব, কার্ড দেখাইয়ে। তখন আমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হলো। এইসব সরকারি বোকামির প্রতিষেধক আমি জানি। গেট থেকে কয়েক-পা পিছিয়ে এলাম, বারান্দায়, যেখানে দু'পাশে ফুলের টব, এদিক-ওদিক তাকালাম, আকাশের দিকে, নেপালীটা আমাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ আমি গণ্ডারের মতো খানিকটা মোশান নিয়ে প্রবল বেগে দৌড়ে নেপালীটাকে ভেদ করে গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। লোকটা আরে আরে বলে পেছনে-পেছনে ছুটলো—আমি তিনজনকে ধাক্কা মেরে, একটা মেয়েকে ধাক্কা থেকে বাঁচাতে গিয়ে পিছলে পড়তে-পড়তে অন্য একটা মেয়ের হাত থেকে সাতখানা বই ফেলে দিয়ে ক্যাটালগ কেবিনখানাকে বোঁ-বোঁ করে তিনটে পাক দিয়ে—যতোক্ষণে নেপালীটা আমাকে ছুঁয়ে ফেললো ততোক্ষণে আমি লেন্ডিং সেকশানের কাউন্টারে একটা লোকের হাত চেপে ধরেছি ও বলেছি, অশোক, অশোক, দ্যাখ, এ কি উৎপাত! তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবো, তবু কার্ড চাইছে ! গোলমালে অনেক লোক পড়া থামিয়েছে ও মজাখোর লোকেরা ভিড় জমিয়েছে আমার চারপাশে, নেপালীটা হাত ধরে টানবার চেষ্টা ছাড়ে নি। দীর্ঘ সবল কালো অশোক শান্ত চোখ তুলে বললো, কি, কার্ড আনেন নি ? ছোড় দেও দারোয়ান, হামারা চেনা আদমি হ্যায় আমি অশোকের ব্যবহারে থমকে গেলুম। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকালুম অশোকের দিকে। 'আপনি' বলে কথা বলছে আমার সঙ্গে, দু'তিন মাস আগেও তো ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অশোক বললো, কোনো বই দরকার থাকে যদি, তবে ঘুরে-টুরে দেখুন, আমি একটু ব্যস্ত এখন।

আমি তবু রাগ করলুম না, গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে বললুম, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে, অশোক। এক মিনিট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের দরজা খুলে বললো, ভেতরে আসুন।

অশোকের কাছে যেতে চাইবো ভেবেছিলাম কিন্তু ওর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ব্যবহারে কি রকম ভ্যাবচ্যাকা মেরে গেলাম। কি ব্যাপার, অশোক আমার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাইছে ? আমি বললুম, তোর কী ব্যাপার, তুই কেমন আছিস্ ? আমি ওর কাঁধে চাপড় মারলুম।

ভালোই ! বিশেষ কিছু বললেন ?—সেই রকমই ঠাণ্ডা গলা অশোকের।

— না বিশেষ কিছু না। এমনিই—

তাহলে—। এই বলে অশোক এমনভাবে থেমে গেল যে এখন যাও আর বলতে হলো না। আমি আচ্ছা চলি বলে পিছন ফিরলুম। অশোক আমার কাছে এসে গলার আওয়াজ নিচু করে বললো, ওঃ, আপনাদের জানানো হয় নি, মাসখানেক আগে আমি বিয়ে করেছি।— আচ্ছা পরে দেখা হবে। আমি স্তম্ভিতভাবে অশোকের দিকে ফিরে তাকালুম। জিজ্ঞেস করলুম, বিয়ে করেছিস মানে ? আমাদের খবর দিলি না ? কী ব্যাপার তোর ? অশোক আলগাভাবে বললো, খুব ব্যস্ত ছিলাম, বেশি লোককে বলা হয় নি। বেশি লোক আর আমি ? অশোক আর একটিও কথা না বলে কাজে মন দিয়েছে। বেরিয়ে এলুম। এরকম আশ্চর্য আমি বহুদিন হই নি। একি রহস্য! খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে, অশোকের সঙ্গে জীবনে কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। টাকা ধার নিয়ে মেরে দিই নি। বেশ চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল এক সময়, এক মেসে একসঙ্গে দু'বছর কাটিয়েছি। হঠাৎ অশোক আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় অস্বীকার করতে চাইছে—। কেন ? কি জানি! বিয়ে করেছে, নেমন্তন্নও করে নি। এর কোনোরকম কারণই মনে পড়ে না। খানিকটা

দূরে গিয়ে অশোকের দিকে ফিরে তাকালুম। মহাত্মা গান্ধীর ছবির নিচে অশোক মুখ নিচু করে কাজ করছে, এদিকে চেয়েও দেখছে না,— সারাদিন এই প্রথম আমার বিষম মন খারাপ লাগলো। খালি পেট ও মন খারাপ এই দুটো একসঙ্গে থাকা খুবই বিচ্ছিরি। অশোকের কাছে খেতে চাইবো ভেবেছিলাম, তাও হলো না, অথচ অশোক আমার মন খারাপ করে দিলে। মানুষ এতো নিষ্ঠুর!

হল ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলাম আস্তে–আস্তে। নিওন আলোর নিচে ঝুঁকে পড়া মুখগুলো ভালো করে খুঁজে–খুঁজে দেখলুম। না, আমার কেউ চেনা নেই। আমাকেও কেউ চেনে না। এক সময় প্রায় আদ্দেক লোক চেনা থাকতো। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে টেবিলে, দু'পাশের ঝুঁকে পড়া পড়ুয়াদের দেখে হঠাৎ যেন মনে হলো— লঙ্গরখানায় ভিখিরিরা খেতে বসেছে। লাইব্রেরি কোনোদিন আমার এতো খারাপ লাগে নি। মহাপুরুষের উক্তি চারদিকে কোলাহল করে। অসহ্য কোলাহল।

উর্দ্ধ অ্যালকভে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিরঞ্জীব রায় চৌধুরী বসে আছেন। বুঝলুম, আর একখানা থান ইট বাজারে ছাড়বার মতলব। আজকাল আবার নভেলের মধ্যে দু'একখানা ইংরেজি কোটেশান–ফোটেশান থাকলে লোকে খুব আধুনিক মনে করে— চিরঞ্জীব রায় চৌধুরীরাও এসব জেনে গেছেন। তাই বুঝি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে—তাছাড়া বিনা পয়সায় পাখার হাওয়া। আমি চিরঞ্জীব রায় চৌধুরীর কাছে গিয়ে বললুম, কেমন আছেন ? নতুন উপন্যাস বুঝি ?

এই যে, কেমন আছো তাপোশ ? তারপর— (হাত দিয়ে যে বইটা থেকে টুকছিলেন তার নাম আড়াল করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বইটা পড়েছি, সবটা পড়েছি, বুঝলে, বেশ ভালোই হয়েছে, প্রথম তো, খুবই ভালো হয়েছে, তোমার হাত আছে তপেশ, লিখে যাও, বুঝলে—

আমি গোল–গোল চোখে মোলায়েম গলায় বললুম, 'আপনি কষ্ট করে সবটা পড়লেন ?

হ্যা, নিশ্চয়ই, বলো কি, তরুণ লেখকদের লেখা না পড়লে কি আর সাহিত্যের পাল্‌স্‌ বোঝা যায় ? ভদ্রলোক হাঃ হাঃ করে হাসলেন। এই নিয়ে সাতাশবার এই অশ্লীলকে আমি বলেছি যে আমার নাম তপেশ নয় তাপস। নামটাই উচ্চারণ শেখে নি— ও আমার বই পড়েছে। আমার বই পড়লে ও এইরকম নিশ্চিন্তে বসে লিখতে পারতো কিংবা বোকার মতো হাসতো ? তাহলে এতোদিনে ওর অম্বলের অসুখ হতো না ? বস্তুত লোকটার ব্যবহারে আমি এমন অসম্ভব চটে গেলুম যে ওকে কী শাস্তি দেবো মনে মনে ভাবতে লাগলুম। এই মুহূর্তে ওর নাক মলে দেবো না পকেট মারবো—এই নিয়ে দ্বিধা করলুম খানিকক্ষণ। পকেটে একটা পাঁচ নয়া পয়সা নিয়ে হেড–টেল করতে লাগলুম। হেড নাকমলা, টেল পকেটমারা। ওর সঙ্গে অন্যান্য কথা বলতে–বলতে পয়সাটা বার করে দেখলুম। টেল। জিজ্ঞেস করলুম, আপনি এবার কী নিয়ে লিখছেন, স্যার ?— এক সময় উনি আমার অধ্যাপক ছিলেন।

—এবার খুব বড় থিম ধরেছি ভাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সব মিলিয়ে বিরাট প্ল্যান। এর মধ্যে একটি নায়ক আর তিনটি নায়িকার জীবনদর্শন। হাজার পাতার বই হবে অন্তত, স্মল পাইকা।

— নায়ক কিসে মরেছে এবার ? ট্রেনের নিচে সুইসাইড ?

— না হে, প্রত্যেকবার একরকম হয় না। বন্যায় ভেসে যাবে।

— ওফ, আমি অভিভূত গলায় বললুম, কতটা লিখলেন ?

— সাতদিনে প্রায় ওয়ান ফিফ্‌থ লিখে ফেলেছি। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে মুসোলিনির একটা স্পিচ ঢোকাবো।

— আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। চলুন চা খেয়ে আসি।

— চলো যাই, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে আছি। খাটতে হয় হে, ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য হয় না। বিনা পরিশ্রমে ইতিহাসে আসন পাওয়া যায় না—

— আপনার আগের বইটা কত এডিশন হলো, তেরো না চোদ্দ ?

— একুশ চলছে। বম্বে থেকে কিনেছে শোনো নি ? তেলেগু ভাষায় অনুবাদ বেরুচ্ছে এমাসে।

ক্যান্টিনে খুব ভিড় ছিল, আমি ওঁকে চিড়িয়াখানার ভেতরের দোকানে নিয়ে এলাম। ঢুকেই আমি পাঁচ-সাত রকমের ঢালাও অর্ডার দিয়ে দিলাম। ওকি, ওকি, ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, অত খাবার কে খাবে ? তুমি কি খেয়ে আসো নি নাকি ?

আমি বিগলিতভাবে বললুম, আপত্তি করবেন না আজ, অনেকদিন বাদে আপনাকে পেয়েছি। আজ, আমি আপনাকে খাওয়াবো। আপনি আমার বইটা পড়েছেন কষ্ট করে—

না, না, তা কি হয়, কি খাবে খাও না, পয়সার জন্য কি। আমি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তুমি পয়সা দেবে কেন ? আমার আবার অম্বলের— খানিকক্ষণ চুপচাপ প্লেট সাবাড় করার পর বললুম, আপনি তবু আমার বইটা পড়েছেন— ওমুক-ওমুক বিখ্যাত লেখকরা তো উল্টেও দেখেন নি। সব শালা বিখ্যাত সাহিত্যিক—

প্রসন্ন মুখে চিরঞ্জীববাবু বললেন, তোমার আবার রাগলে ভাষাজ্ঞান থাকে না। বুঝলে, অনেকে বোঝেন না যে ইয়ং ব্লাডই হলো সাহিত্যের— হঠাৎ চিরঞ্জীব রায় চৌধুরীর মুখের রেখা কোমল হয়ে এলো। একটু আলতোভাবে বললেন, পয়সার লোভটা বড় সাংঘাতিক—সবাই ও লোভ সামলাতে পারে না। আমিও যে ঠিক পেরেছি, তা বলতে পারি না। টাকার লোভে অনেক সময় হেলাফেলা করে বাজে লেখা লিখেছি। কিন্তু কি জানো, এখনো আমার মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে তোমাদের বয়েসটা— যখন সাহিত্যই ছিল ধ্যান-জ্ঞান, সাহিত্যের জন্য সাধনা করেছি। বুঝলে টাকা-পয়সা কিছু না—

আমি অবাক হয়ে বললুম, সেকি, টাকা-পয়সা কিছু না তো আপনি লেখেন কেন ? আমি তো দু'চারটে টাকা পাবার আশাতেই লিখি। নইলে আর লেখার কি দরকার ?

— যাঃ, এটা তোমার বানানো কথা। তোমাদের এই বয়েসে টাকা-পয়সা কিছু না— সাহিত্যই হচ্ছে—।

চিকেন স্টু-টা কিন্তু চমৎকার করেছে, একটু খেয়ে দেখুন। আমি বললুম হাত মুছে কফিতে চুমুক দিতে-দিতে। তিনি বললেন, সিগারেট আছে তোমার কাছে ? ছিল। কী যেন ভেবে তবু বললুম, না তো। তিনি পকেট থেকে একটা লাল দু'টাকার নোট বার করে বেয়ারাকে ডাকতে যেতেই আমি বললুম, দিন, আমি নিয়ে আসছি। কী সিগারেট ?

— গোল্ডফ্লেক।

— বসুন, এসে আপনার উপন্যাসের প্লটটা শুনবো।

দোকান থেকে বেরিয়েই একটি অত্যন্ত সুন্দরী কিশোরী মেয়েকে দেখতে পেলাম। সাদা ফ্রকপরা, রাজহংসীর মতো। মেয়েটার পেছন-পেছন খানিকটা গেলাম। তিনচারজন মহিলা, দুটি বাচ্চা, দু'জন পুরুষের একটি দলের মধ্যে ঐ মেয়েটি। মেয়েটি কী কারণে যেন অভিমান করেছে, মুখখানি তাই ঈষৎ থমথমে। ঐ অভিমানের জন্যই ওর মুখখানা কি অপরূপ হয়ে উঠেছে। মেয়েটিকে মনে হয়—ঐ দলটা থেকে একেবারে আলাদা। বস্তুত সারা পৃথিবীর থেকেই ওকে আলাদা মনে হয়। মেয়েটি চুম্বকের মতন আমায় টানলো। মেয়েটা গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমিও বাইরে এলাম। বেরিয়েই দেখলুম, একটা বিরাট স্টেশন ওয়াগন, মেয়েটি দলবলের সঙ্গে সেটাতে উঠছে। মেয়েটির সঙ্গে একবারও আমার চোখাচোখি হয় নি।

ও আমাকে দেখে নি। আমিও ইহজীবনে ওকে আর দেখবো না। গাড়িটা চলে যেতেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তারপর চোখে পড়লো সামনেই একটা থ্রি বি বাস। এই বাস এমনই দুর্লভ যে দেখামাত্র আর অন্য কোনো কথা আমার মনে হলো না, বাসটা স্টার্ট দেবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি দৌড়ে উঠে পড়লুম। এবং দু'টাকার নোটখানা ভাঙিয়ে টিকিট কাটতে কোনো অসুবিধে হয় না। ফেরত খুচরোটা পকেটে রাখবার পর নিজেকে বেশ ধনী মনে হয়। একটা পাঁচ নয়া ছুঁড়ে সার্কুলার রোডের বুড়ি পাগলিটাকে দিলাম।

এবার ? রোদ্দুর ও ছায়ার মধ্যে দিয়ে বাস ছুটে যায়। লোকজন ওঠে ও নামে। আমি কোথায় নামবো জানি না। এসপ্লানেড পর্যন্ত টিকিট কিনেছি। এবার কোথায় যাবো ? এখনও দীর্ঘসময় পড়ে আছে। আবার কি গোড়া থেকে খোঁজা শুরু করবো ? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেই তো বিকেলটা কাটাতে পারতুম। কোনোরকমে ইংরেজিটা পড়তে পারি— অনিমেষ বা বিমলেন্দুর মতো না হলেও, এককালে তো কিছু ইংরেজি বইও পড়েছি। সিলিনের বইটা আদ্দেক পড়েছিলাম পাঁচ মাস আগে—সেটা শেষ করা যেতো। কিংবা রিকুইজিশান স্লিপের গোছার উল্টোপিঠে একটা ছোটগল্পও মক্‌শ করতে পারতুম, লিখলে দু'চারটে টাকাও কি আর পাওয়া যেতো না, টাকার জন্য এরকম উঞ্ছবৃত্তি না করে। কিন্তু পড়তে বা লিখতে কিছুই ভালো লাগে না। যেন একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দী আছি, দাঁত দিয়ে কেটে খাঁচা ভেঙে সহজেই বেরুতে পারি, বেরুতে ইচ্ছে করছে না বলেই আটকা রয়েছি। হঠাৎ একথাটা কেন মনে হলো ? খাঁচা–ফাঁচা আসলে বাজে, হ্যাক। কিন্তু এ তো মহা মুশকিল, এখন কোথায় যাই ? মহাশূন্যে রকেটে যারা যায়— পৌঁছতে পারুক বা নাই পারুক, তারাও জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানি না। মৃত্যুর পর শরীরের পঞ্চভূত জানে তারা কোথায় যাবে— আমি জানি না। খুনী আসামীও জানে সে কোথায় যাবে, আমি,— নাঃ, এরকমভাবে দিন কাটে না। এবার যার কাছে যাবো, দেখা না পেলে আমি ভয়ঙ্কর চটে যাবো তার ওপর, প্রতিশোধ নেবো, দরকার হলে তার নামে থানায় ডাইরি করে আসবো। বাকি আছে শেখর। দেখি শেখরকে। কিছু পয়সাকড়ি পেলে পুরী কিংবা কাশীতে ঘুরে এলে বোধহয় ভালো লাগতো। চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে পরে যখন আবার দেখা হবে, প্রথমেই পায়ের ধুলো নিয়ে এমন ভুলিয়ে দেবো!

শেখর বাড়িতেই। কারণ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বিনা শব্দে দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে শেখর, একটা ধুতি জড়িয়ে পরা, আমার দিকে ভুরু তুলে বললো, কি ব্যাপার, তুই ?

একটু থতমত খেয়ে বললাম, এমনি এলাম।

— হঠাৎ এ সময় ?

আমি কি ভুল শুনছি, আমি বুঝতে পারলুম না। নাকি কোনো বিদেশে এসেছি, যেখানে কারুকে চিনি না ? নাকি রিপভ্যানের মতো দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে উঠে দেখছি হঠাৎ সব বদলে গেছে ? নচেৎ, শেখর! শেখর বলছে, হঠাৎ এ সময় ? যেন আমাকে চেনেই না, সেই শেখর, যে আমাকে—, আমি যাকে—, যে আমাদের—, আমরা যাকে—। সেই শেখর যে সিনেমা দেখতে গিয়ে অবধারিত গণ্ডগোল বাধাবে—ও দাদা টাক চুলকুনো থামান, ও ডানদিকের মশাই, প্রেমালাপটা একটু আস্তে, কিংবা এই যে, সিনেমাটা পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে— এইসব দিয়ে প্রত্যেকদিন ঝগড়া বাধাবে আর আমরা ওকে বাঁচাবো, আর যে শেখর মদ খেয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়লে আমরা ওকে লরিচাপা থেকে বাঁচাতে চাই—যে শেখর কবিতার জন্য বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারে, ছ'বছর ধরে যে কবিতার পত্রিকা বার করে বাপের টাকা ওড়াচ্ছে, পরশুদিনও যে শেখরের সঙ্গে আমি তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। হঠাৎ কেন জানি না, আমার চোখে জল এসে

গেল। সত্যিকারের কান্নার চোখ, আমি চোখ নিচু করলুম। অশোক প্রথম আঘাত দিয়েছিল, তারপর শেখর।

শেখর মুখ কালো করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, দাঁড়া, আমি আসছি, সিগারেট কিনতে বেরুবো। শেখর আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে গেল ! আমাকে ভেতরে যেতে বললো না। না বলুক, কিন্তু দরজাটা ভেজানো, আমি কি চলে যাবো ? কেন এবং কোথায় যাবো ? আমি শেখরের ওপর যথেষ্ট রেগে যেতেও পারছি না, তার বদলে আমার মন ভেঙে আসছে। শেখর চটি গলিয়ে চট করে ফিরে এলো। কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁটলুম। তারপর সদর পেরিয়ে আসার পর ও বোমার মতো ফেটে পড়লো, (ইডিয়েট, রাস্কেল, অশ্লীল অশ্লীল) তোকে না অতো করে বললুম সেদিন। দুপুরবেলা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখলে খবরদার আমাকে ডাকবি না।

কেন রে ? আমি সম্পূর্ণ আকাশ থেকে নরকে পড়লুম।

— ফের— মি করছিস ?

— সত্যি, আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস কর।

— বিশ্বাস করবো, আমাকে ডোবাবার মতলব—

না, না, সত্যি শেখর, বিশ্বাস কর, আমার কিছুই মনে নেই,— শেখর বুঝতে পারে নি, কিন্তু আমার গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

— সেদিন বলি নি তোকে যে দুপুরবেলা একটা বিরাট বড়লোকের মেয়েকে প্রাইভেট পড়াচ্ছি ? মাসে আড়াই শো দেবে— তাছাড়া গেঁথে ফেলতে পারলে—

— একদম মনে ছিল না, সত্যিই...

মনে ছিল না ? কে–ন ছি–ল না ? যদি দেখে কতগুলো লোফার ছ্যাঁবড়া সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব— শেখর এই কথাটা হেসে বলেছিল। আমি শেখরকে মোটে ঈর্ষা করলুম না। বরং খানিকটা যেন করুণা হলো। বললুম, যাঃ, আমাকে মোটেই লোফার কিংবা ছ্যাঁবড়া সাহিত্যিকের মতো দেখতে নয়। প্রায় তোর মতোই ভালো চেহারা আমার।

— এখন কেটে পড় ভাই। আমাকে চান্স দে।

আমি অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে চোখ মুছে নিলাম। শেখরকে ছাড়তে কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। শেখর আমার শেষ আশ্রয়। একটা মেয়ের জন্য শেখর এমন চমৎকার দুপুরটা নষ্ট করছে। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে ? আমি বললুম—শেখর! শেখর মুখ তুলে বললো, কি। আমি পুনরায় বললুম, শেখর—। শেখর বললো, কি ন্যাকামি করছিস। আমি বললুম, শেখর, সকাল থেকে খুব খারাপ লাগছে, মানে বিচ্ছিরি লাগছে, আর কি! খুব কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে, তাই তোর কাছে এলাম।

শেখর এতেও গললো না। বললো, কবিতা পড়ার ইচ্ছে ? এই দুপুরবেলা ? ন্যাকামির একটা সীমা আছে। তা তোর ইচ্ছে হয়েছে, তুই গঙ্গার পাড়ে বসে দখিন হাওয়া খেতে-খেতে কবিতা পড় গিয়ে। আমার এখন সময় নেই ভাই।

— বিশ্বাস কর, আজ হঠাৎ খুব রিল্‌কের কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে। তোর রিল্‌কের কালেক্‌শানটা দে। পার্কে বসে পড়বো।

— কবিতা পড়বি, তাও আবার রিল্‌কের কবিতা ? শখ কম নয় তো

— তুই তো জানিস, আমি রিল্‌কের কবিতা কতো ভালবাসি। আমি রিল্‌কের মূল্য বুঝি।

— তুই কবিতা কিছুই বুঝিস না। বরং জাঁ জেনের 'আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স পড়, তোর কাজে লাগবে।

— না, আমি রিল্‌কে চাই।

শেখর দাঁড়িয়ে রইলো খানিকটা চুপ করে। সিগারেট টানলো। বললো, আচ্ছা দাঁড়া, এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধের পর দেখা করবো। আমি বললুম, কাপড়টা ফেরতা দিয়ে পরে নে শেখর। জমিদারের মেয়ের সামনে অমনভাবে বসতে নেই।

চামড়ায় বাঁধানো রিল্‌কের কালেক্‌শানটা পেয়ে আমি বুকে চেপে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। যেন মহামূল্যবান সম্পদ আমার বুকে। এতক্ষণে আমার অনিশ্চিত নিঃসঙ্গতার বোঝা কাটবে নিশ্চিত। আ, রিল্‌কে, তোমাকে আমি কতো ভালবাসি। সারা পৃথিবীর লোক তোমার ভক্ত, এখনও তরুণরা তোমার লেখা কিনে পড়ে। কতো সাধনায় তোমাকে পেয়েছি, অথচ এক মিনিটে। আমি জানি তুমি কতো বড় কবি, যদিও জীবনে এক লাইনও পড়ি নি। পৃথিবীময় তোমার ভক্ত, তাই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এতো প্রগাঢ়। তুমি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়, কারণ শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের সুলভ গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে কিন্তু তোমার কোনো পেপার ব্যাক এডিসান নেই। তুমি কি বাংলাদেশের কথা জানতে—বাংলাদেশেও এখন তোমার প্রতি ভক্তির ঢেউ বইছে। তোমার গোলাপ কাঁটায় বেঁধা বুকের রক্তের কবিতা।—বইটার একটা পাতা ওল্টাতেও আমার ভয় করলো, যেন আমার চোখ আটকে যাবে। আমি সোজা বাসে চেপে এলাম কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাতের পুরোনো বইয়ের দোকানে। এসে বললাম, এই নাও ভালো মাল এনেছি।

লোকটা লুঙ্গি তুলে উরু চুলকোচ্ছিল। বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে, আজকাল তেমন চলে না এই বই।

— ওসব ফিকির ছাড়ো মিঞা, রিলকে চলে না তুমি আমাকে বোঝাবে ?

— না, একটু মারকেট পড়ে গেছে। সেদিন যে মারি স্টোপ্‌স এনেছিলেন—

— ভাগ! সোনালি চশমা পরা মেয়েরা, লম্বা চুল বাবুরা কিংবা হাওয়াই কোর্তা পরা ছোকরারা এ-বই লুফে নেবে।

— না, সত্যি বলছি, আজকাল—

— যাঃ যাঃ, কালও আমি এখানে দাঁড়িয়ে শুনে গেছি একজোড়া ছোকরা-ছুকরি খোঁজ করে গেল। ব্রান্ডনিউ মাল, দেখো।

লোকটা একটু হেসে বললো, লেকিন নাম লেখা আছে, তুলতে হবে।

— ও তো একটু ক্লোরিন ঘষার মামলা। ঝুট-ঝামেলা করো না, কত দেবে বলো ?

অনেক দর কষাকষির পর আট টাকা পাওয়া গেল। সারাদিনে এইটাই সবচেয়ে বড় সাকসেস। আর কিছু চাই না। পরশু পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। এখন একটু কফি খাওয়া যেতে পারে। এখন কারুর দেখা না পেলেও আমার আর একা লাগবে না। পকেটে আট টাকা আছে সঙ্গী ! চিরঞ্জীবের টাকাটা দিয়েই কফিটফি খাওয়া যাবে। ঐ টাকায় এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনলাম, কেননা উনি গোল্ডফ্লেকই কিনতে বলেছিলেন। প্রায় বছর পাঁচেক বাদে আমি নিজের হাতে নিজের টাকায় গোল্ডফ্লেক কিনলাম। এতো দাম বেড়ে গেছে জানতুম না। কারা খায় এসব !

কফি হাউসের জানলার পাশের টেবিলে একা পরীক্ষিৎ বসেছিল। বিশাল লম্বা শরীরটা নিয়ে ঝুঁকে আছে পরীক্ষিৎ। একটা দু'বুক পকেটওয়ালা খাঁকির জামা পরেছে। পরীক্ষিৎ আমার চেয়ে প্রায় আধফুট লম্বা, স্পষ্ট, সত্যজিৎ রায়ের মতো চোয়াল, ওর ওই শরীরটা আমি ঈর্ষা করি। আমি পাশে দাঁড়াতেই ও মুখ তুললো। পরীক্ষিতের চোখ দুটো অসম্ভব লাল। বললো, সারাদিন কোথায় ছিলি ? তোর মেসে গিয়েছিলাম দুপুরে।

আমি যে সারাদিন যে-কোনো বন্ধুকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি সেকথা ওকে জানালুম না। বললুম, অনিমেষ আর গায়ত্রী এসেছে, শুনেছিস ?

— শুনেছি।

— দেখা হয়নি তোর সঙ্গে ?

— হুঁ ! ওরা ফিল্ম দেখতে গেল।

— অবিনাশও ?

— না, অবিনাশ ওখানে নেই। ছিল, ছায়ার সঙ্গে কি যেন ঝগড়া করে চলে গেছে।

— কিসের ঝগড়া ?

— কে জানে। ওর মতলব বোঝা আমার কর্ম নয়।

— তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন ? শরীর খারাপ ?

'কাল জ্বর হয়েছিল রাত্রে। কুচ্ছিৎ স্বপ্ন দেখেছি। মাথার ঠিক মাঝখানে খুব ব্যথা হচ্ছে আজ। তোর কাছে টাকাকড়ি আছে কিছু ?

— কেন, ওষুধ কিনবি ?

— হ্যাঁ ! অনেকদিন, দিনসাতেক খাই নি। একটা পয়সা নেই হাতে। দিনসাতেক অফিস–টফিস যাচ্ছি না।

— চল্ যাই। বাংলা–টাংলা হতে পারে, অল্প আছে। কিংবা কলাবাগানেও যেতে পারি। আমারও খুব ইচ্ছে করছে সারাদিন।

পরীক্ষিৎ হাত দিয়ে কপালটা টিপছিল। সত্যি খুব ব্যথা হচ্ছে বুঝতে পারলুম। ব্যথাটা কী রকম রে ? ডাক্তার দেখাবি নাকি ?

— একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জানিস তাপস। বছরখানেক আগে যে অনিমেষের ওখানে ব্রিজ থেকে পড়ে মাথা ফেটেছিল, এতোদিন পর আবার ঠিক সেইখানে ব্যথা হচ্ছে।

— সেলাই গণ্ডগোল হয়েছিল নাকি ! অনেক সময় ও থেকে বিচ্ছিরি জিনিস হয়।

পরীক্ষিৎ আমার দিকে রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকিয়ে অসহায় গলায় বললো, আমি অবিনাশকে খুঁজছি। ওর কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস না করলে আমার ব্যথা কমবে না, আমি জানি।

— অবিনাশ কী করবে ?

— এতোদিন পর, জানিস, আমার মনে হচ্ছে, আমি কি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, না অবিনাশ আমাকে ঠেলে দিয়েছিল ?

— যাস্ শালা, তোর কি মাথা–খারাপ! তুই এক একবার এক এক রকম বলিস।

— কিন্তু অ্যাদ্দিন বাদে, একথাটা আমার মনেই বা হলো কেন ? আর, মনে হওয়ার পর থেকেই মাথায় যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে।

— কিন্তু অবিনাশ যদি তোকে ফেলে দিয়ে থাকে, তবে অবিনাশই আবার বাঁচিয়েছে। একথাটাও জেনে রাখিস। আমি ছিলুম সেখানে।

— একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস ? অবিনাশ আমাকে কিরকম এড়িয়ে–এড়িয়ে পালাচ্ছে ? বহুদিন ওর সঙ্গে ভালো করে কথাই হয় না। দেখা হলেও ভিড়ের মধ্যে চালাকি করে অন্য কোথায় চলে যায়।

— অবিনাশ তো বলছে, ও সরল, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে চায়। লেখা–ফেখার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করে দীর্ঘ সুখী জীবন কাটাবে।

— কিন্তু যে–রকমভাবে দিন কাটাচ্ছে, সেটা কি ?

— ওটা একেবারে দাগী আসামী। সরলতা মানে যে ওর কাছে কি তা বোঝা অসাধ্য। মায়াকে নিয়ে কী কাণ্ড করছে, কে জানে !

— মায়াকে নিয়ে !

— তুই জানিস না, মায়াকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবে ঠিক করেছিল। মায়া হঠাৎ হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে। তারপরও অবশ্য মায়া ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়াকে নিয়ে সম্ভবত ও একটা গভীর গণ্ডগোল পাকাবে। (এ গল্পটা আমি সম্পূর্ণ বানিয়ে বললুম পরীক্ষিতের কাছে। কেন বানালুম, কি জানি—সম্পূর্ণ অজান্তে অবিনাশ ও মায়া সম্বন্ধে এই কাহিনী আমার মুখ থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে এলো।)

না, গণ্ডগোল মায়াকে নিয়ে না, অন্য একজনের সঙ্গে। পরীক্ষিৎ বললো।

— কে ?

— তোকে বলে লাভ নেই, কোনো জিনিস ভালো করে ভেবে দেখতে চাস না। তোর কাছে—জীবন মানে এই মুহূর্তে বসে থাকা। কাল কিংবা ভবিষ্যতে কী করবি তোর কোনো ধারণাই নেই।

— চল্, উঠি—

— অবিনাশকে তুই-ই বেশি পাত্তা দিয়েছিস। ওকে হিরো বানিয়েছিস। ওর মধ্যে কী আছে ? শুধুই স্টান্টবাজি। ওর সঙ্গে আমার আলাদা বোঝাপড়া আছে। কেন আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, জানতে হবে।

জানতে হবে— এই কথাটা পরীক্ষিৎ সন্ত-পুরুষের মতো শান্ত গলায় বললো, যেন ওর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের তৃষ্ণা। আমি বললুম, চল, কোনো ডাক্তারের কাছেই যাই। আমার কাছে গোটা আষ্টেক টাকা আছে।

— থাক, কাল কি পরশু যাবো। আজ চল কিছু খাই। ভালো লাগছে না। তোর ঐ আট টাকাই খরচ করতে পারবি তো ? আমার কাছে কিছু নেই কিন্তু।

— চল অন্য কেউ আসবার আগেই উঠে পড়ি।

পরীক্ষিৎ ক্ষেপে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব টাকা চেটেপুটে শেষ করে দিলো। খালাসীটোলা বন্ধ হয়ে যেতে পরীক্ষিৎ বললো, চল, টালিগঞ্জে শশাঙ্কর কাছে যাই।

বেরিয়ে পরীক্ষিৎ তীরের মতো ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল, আবার লাফাতে-লাফাতে ফিরে এসে বললো, আমার শরীর জ্বলছে, তাপস।

পরীক্ষিতের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে, চোখ দুটি ছল ছল, সারা মুখে শুধু প্রহরীর তলোয়ারের মতো নাকটা জেগে আছে। বুঝলুম, ওকে শয়তান ভর করেছে। বললুম, শশাঙ্কর কাছে কেন ?

— শশাঙ্কর এক বন্ধুর দোকান আছে। মাঝে-মাঝে ব্যবস্থা করে খাওয়ায়। চল না, আঃ, চল না, কেন দেরি করছিস ?

শশাঙ্ক নিরীহ চেহারার একটি বদমাইশির ডিপো। কাতর মুখভঙ্গি করে দুনিয়ার যতো খারাপ-খারাপ কথা বলে। ভালোই লেখে, কিন্তু ওর নভেল আজ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতে পারি নি। পরীক্ষিৎ বিকট মোটা গলায় শশাঙ্ককে ডেকে নামালো। স্পষ্ট বোঝা গেল, শশাঙ্ক লিখছিলো। কারণ, ওর বিব্রত ও বোকামিভরা মুখখানা দেখেই মনে হলো ওর সমস্ত বুদ্ধি এই মুহূর্তে ও ওর গল্পের নায়ককে ধার দিয়েছে।

অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শশাঙ্ককে জড়িয়ে ধরে পরীক্ষিৎ বললো, তুই কেমন আছিস, শশাঙ্ক, কতোদিন তোকে দেখি নি, হঠাৎ বড় দেখতে ইচ্ছে করলো তোকে। এবং এই কথা বলার পর হড়হড় করে বমি করে দিলো ওর গায়। পরীক্ষিৎকে শশাঙ্কর হাতে সঁপে দিয়ে আমি একা বেরিয়ে এলুম।

যতদূর সম্ভব মনে করে–করে তেরোই এপ্রিল ১৯৬১–র কথা লিখছি। কিন্তু কি বাদ গেল ? হ্যাঁ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময় আমি অশোকের দিকে বিস্মিতভাবে আরেকবার তাকিয়েছিলাম। চোখাচোখি হলো হঠাৎ মনে হলো, অশোক কাঁদছে। হা ঈশ্বর, আজ পর্যন্ত অশোকের রহস্য জানা হলো না। তারপর থেকে অশোকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত আর দেখা হয় নি। অশোক যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে তাকে আমি কস্মিনকালেও চিনতাম না। সুতরাং সেদিক থেকেও কোনো গণ্ডগোলের কারণ নেই। অশোক, তোর কাছে কবে কি অপরাধ করেছি, মনে পড়ে না, তবু, কোনো একদিন আমাকে ক্ষমা করিস।

তেরোই এপ্রিলের কথাই বা কেন বেছে নিলাম জানি না। কোনো নতুনত্ব নেই, তবু সেদিন বাড়ি ফেরার পথে যে অনুভব হয়েছিল— সেইজন্যই দিনটা মনে আছে। মনে আছে মন্থর পায়ে মেসে ফিরছিলাম। মেসে কেন ফিরবো— এর কোনো উত্তর জানা ছিল না। যেমন মেস থেকে বেরুবার সময় কোথায় যাচ্ছি জানতুম না। যেন পাশাপাশি দুটো ট্রেন ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে চলেছে, যে–কোনো একটার জানালা থেকে সম্পূর্ণ গতিহীনতা। কোটি–কোটি মাইল দূরে যে নক্ষত্রের আলো এখনো পৃথিবীতে পৌঁছোয় নি, বা যে নক্ষত্রের মৃত্যুসংবাদ এখনো পৃথিবীতে আসে নি— এখনো পরীর চোখের মতো জ্বলছে— যেন আমিও সেইরকম। আমি যে পৃথিবীতে আছি— কেউ জানে না। আমার মৃত্যুর পর জানা যাবে, আমি পৃথিবীতে জন্মেছিলাম, এবং বেঁচে ছিলাম। আমি একদিন অল্প বাতাসের মধ্য দিয়ে অন্ধকার ময়দানের পাশ দিয়ে একা হেঁটে গিয়েছিলাম। আমি এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার সময় সেই গাছটাকে প্রণাম করেছিলাম। আমি একা অন্ধকারে, কেউ শ্রোতা নেই জেনেও আপন মনে একটা গান গেয়েছিলাম। আমার চটি ছিঁড়ে যেতে আমি চটিজোড়া কোলে নিয়ে খালি পায়ে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে–হাঁটতে বলেছিলাম, আমি জানি, সব দৃশ্যই অদৃশ্য জগতের উল্টোপিঠ। মনে পড়েছিল, আমি প্রত্যেক দিন মাথার বালিশ ছাড়া বিছানায় শুই।

মেসে ফেরার কথা মনে পড়লেই রামসদয়ের কথা মনে পড়ে। আমার রুমমেট রামসদয়। বড় ভালো লোকটা, কিন্তু এমন অপমান করেছিল একদিন! একদিন অনেক রাতে ফিরেছি, রামসদয় জেগে ছিল। আমাদের ঘরের পাশেই বাথরুম। বাথরুমে মুখ ধুতে গেছি। সেদিন আমার এমন কিছু নেশা ছিল না, শরীর সুস্থ ছিল, কিন্তু বাথরুমে ঢুকেই আমি চিৎকার করে ভয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে পড়ে গেলুম। আমি দেখলুম, বাথরুমে একটা মানুষের মুণ্ডু ঝোলানো রয়েছে,— শরীরহীন একটা মুণ্ডু, অভিব্যক্তিহীন, ভাবলেশহীন চোখ। মুখখানা ওরকম নিস্পৃহ বলেই বীভৎস। রামসদয় ছুটে এসে ঢোকার আগেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ভয়ে আর মুখ ফেরাই নি, জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কি, কি, কিসের মুখ ওটা ? আমি এতো স্পষ্ট দেখেছিলাম যে সন্দেহ করি নি।

রামসদয় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ওঃ এই, চলুন, শোবেন চলুন।

— কার মুখ ?

— কিছু না, আমার দোষেই—

আমি ফিরে তাকালাম, তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এমন লজ্জা হলো। রামসদয় দাড়ি কামাবার জন্য বড় আয়নাটা এনে ঝুলিয়েছিল, বদমাশ টেকোটো আর আয়নাটা ঘরে নেয় নি। মাঝরাতে মাতালকে ভয় দেখাবার জন্য বাথরুমে ফাঁদ পেতেছে। রামসদয় আমার হাত ধরে নিয়ে এলো ঘরে, বিছানার চাদরটা ঝেড়ে আমাকে শুইয়ে দিলো। আমি সাহিত্যিক বলে লোকটা আমাকে একটু খাতির করে। আলো নিভিয়ে দিই ? রামসদয় জিজ্ঞেস করলো, তারপর অল্প একটু হেসে বললো, শেষকালে নিজের মুখ দেখেই ভয় পেলেন ?

শেষ কথাটাই মারাত্মক। দু'গালে পাঁচটা থাপ্পড়ের মতো। লজ্জায় কিংবা ভয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারি নি। নিজের মুখ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আমার নিজের মুখ সবচেয়ে চেনা। উনত্রিশ বছর ধরে যে মুখ দেখছি। দাড়ি কামাবার সময় বা কতোবার পানের দোকানের আয়নায় বা ট্যাক্সির কাছে, গ্রুপ ফটোতে, লোকে যেমন বলে মেয়েদের চোখের মণিতে আমার এ মুখচ্ছবি আমি কতোবার দেখছি। তবু চিনতে পারলুম না। ভয় পেলুম, যদিও চোখে এমন কিছু রঙ ছিল না। এইরকম ছেদো দার্শনিক হা-হুতাশ কিছুক্ষণ করে আমার ভয় দেখানো মুখখানা বালিশে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর মাস দুয়েক কোনো স্বপ্ন দেখি নি পর্যন্ত।

নাঃ, এবার শেষ করা যাক। আর ভালো লাগছে না। তারপর কী হলো সেই রাতে, পরীক্ষিৎকে ছেড়ে আসার পর ? ওঃ, সেই রাত, সেই—। একা একা অনেকখানি হেঁটে এসেছিলাম— চৌরঙ্গিতে বড় রাস্তা ছেড়ে হেঁটে এলাম মাঠ দিয়ে। একবার পকেটে হাত দিলাম, সিগারেট নেই, কিছুই নেই— শুধুমাত্র একটি পাঁচ পয়সার ঢেলা পড়ে আছে। আবার সেই জঞ্জাল, কাল সকালে আবার ঐ নিয়ে দুশ্চিন্তা! হাসি পেল, বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার ওপর পয়সাটা বসিয়ে বেশ জোরে একটা টুস্‌কি মেরে বললুম, 'যাও সখা, বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।' পয়সাটা ডানা মেলে অন্ধকারে উড়ে গেল। পরক্ষণে নিজের বোকামিতে নিজের আঙুল কামড়ালুম। পাঁচটা নয়া পয়সা ওড়াবো এমন অবস্থা আছে নাকি আমার ? সেটাকে খুঁজতে লাগলুম। অন্ধকার, অন্ধকারে চোখ জ্বলে না, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে লাগলুম। জ্বালতে-জ্বালতে এগোচ্ছি, খালি পা কাদায় বসে যাচ্ছে, কবে বৃষ্টি হলো কি জানি।

পয়সা খুঁজতে-খুঁজতে অনেক দূর চলে এসেছিলাম। হঠাৎ একটা পুকুর। বেশ বড় জলাশয়, চারদিকে মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া। পরিষ্কার জায়গাটা, অল্প জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে পরিষ্কার জল। এখানে এরকম পুকুর ছিল, কোনদিন তা জানতুম না। চারদিক বাঁধানো, কোথাও একছিটে কাদা নেই, পুকুরের চারকোণে পাঁচটা গাছ, কোথা থেকে হাওয়া এসে ওদের পাতা দোলাচ্ছে। এমন পরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী যেন বহুবার স্বপ্নে দেখেছি। হাত-পা এবং জামা-প্যান্ট, পয়সা খুঁজতে জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হলো, এই পুকুরে ভালো করে ধুয়ে নেই। এমনকি, এই পুকুরে স্নানও করা যেতে পারে, একা একা অন্ধকারে সাঁতার কাটতে খুব ভালো লাগলো। এগুতে গিয়ে অদৃশ্য কোনো কিছুতে জোর ধাক্কা খেলাম। বেশ শক্ত কোনো কিছুতে মাথা ঠুকে গেল। কি ? তাকিয়ে দেখলাম কিছু নেই। আশ্চর্য, তবে কি হাওয়ায় ধাক্কা লাগলো। ভয় হলো, মানুষের মৃত্যুকালে হাওয়া পর্যন্ত কঠিন হয়ে যায় শুনেছি। আবার সামনে হাত বাড়ালাম। দুই হাত, কোনো কঠিন অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা লাগলো। নেশায় কি চুর হয়ে আছি নাকি ? মাথা ঠাণ্ডা করে দাঁড়ালুম। আবার হাত বাড়ালুম। সেই অদৃশ্য কঠিন বাধা। এবার বুঝতে পারলুম, কাচ বা মাইকা বা শক্ত প্লাস্টিক বা ট্রান্সপারেন্ট কঠিন কিছু দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। কি অসম্ভব কাণ্ড। একটু পাশে সরে যেতেই একটা নোটিশ চোখে পড়লো।

রিজার্ভড পন্ড
প্রোহফকিন্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংরক্ষিত পুষ্করিণী

এই পুষ্করিণীর পাড়ে বা একশো গজের মধ্যে কাহারো বসা বা বিশ্রাম করা নিষেধ। বিষ প্রতিষেধক গবেষণার্থে এখানে জলজ সর্পের চাষ করা হয়। সাবধান! যদিচ এই সর্পগুলি বিষহীন, কিন্তু ইহাদের সন্ধানে দূর-দূরান্ত হইতে বিষধর সর্প আসিতে পারে। সম্ভব হইলে এই পথ পার হইবার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া যাইবেন। জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

অনুমত্যানুসারে

পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কোনো মাতাল বা গেঁজেলের দলবলের কাণ্ড এসব। বাংলাদেশে কি সাপের অভাব, যে চাষ করতে হবে ? এইরকম এতো বড় একটা পুকুর–সাইজের কাচের জার বসিয়ে রেখেছে এখানে। কলকাতা শহরে প্রত্যেকদিন কেন অসংখ্য লোক সাপের কামড়ে মরে যাচ্ছে এবার বুঝলাম। খবরের কাগজে প্রত্যেকদিনই কলকাতায় সর্পাঘাতে মৃতের খবর থাকে। তার মানে দূর–দূরান্ত থেকে এখানে সাপ আসে।— কিংবা এমনও হতে পারে, পুরোটাই ধাপ্পা। পুকুরটাকে সুন্দর রাখবার জন্য এরকম একটা বাজে নোটিশ লটকেছে। আমি কাচের দেয়ালে দেয়ালে হাত দিয়ে পুকুরটার চারপাশে ঘুরে এলাম। কোথা দিয়েও ভেতরে যাওয়া যায় না, বেহুলার বাসরঘরের চেয়েও শক্ত। চার কোণে পাঁচটা গাছ হাওয়ায় দুলছে। সমান করে ছাঁটা বুকসমান মেহেদির বেড়া। মার্বেল পাথরে বাঁধানো পাড়। পরিষ্কার জল। ঢেউহীন। মেঘভেঙে মাঝে–মাঝে চাঁদের আলো ওখানে অসংখ্য সাপ ও সাপিনী খেলা করছে। ভেতরে ঢোকার অসম্ভব ইচ্ছে হতে লাগলো আমার। কাচের দেয়ালে গালটা ছোঁয়ালুম। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আমি জ্যোৎস্না ও সাপের খেলা দেখতে লাগলুম। অজান্তেই একবার যেন বিড়বিড় করে বললুম, দূর–দূরান্ত থেকে আর তো কেউ আসে নি। শুধু আমি একাই এসেছি। কাল অন্য সবাইকে ডেকে–ডেকে এনে দেখাতে হবে, একথাও মনে পড়লো।

হেমকান্তি

প্রিয় বিমলেন্দুবাবু,

আপনাকে এই চিঠি লিখছি অনেক ভেবে, ভাবনার পর ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত, কারণ, আর হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দেরাদুনে আমার এক আত্মীয় আছেন প্রথম কিছুদিন তাঁর ওখানে থাকবো, তারপর আরও দূরে সরে গিয়ে, ইচ্ছে আছে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। না, আমার ঈশ্বর দর্শন হয় নি, ঈশ্বরকে জানার তৃষ্ণা জাগে নি, সাধু–সন্ন্যাসী হতে চাই না, তবু কোথাও আত্মপরিচয়হীন হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো। এছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় নেই। চেনা লোকদের থেকে দূরে, একটা অন্যরকমের, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে থাকা যায় কিনা দেখি। আমার যদি বেশি অর্থ বা কিছু উদ্দীপনা থাকতো তাহলে আমি হয়তো ইতালি কিংবা কোনো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে চলে যেতুম, সেখানেও হয়তো অন্য মানুষ হওয়া যেতো, কিন্তু তার চেয়ে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চল সহজ মনে হলো। এখানে আমার বেঁচে থাকায় কোনো স্বাদ পাচ্ছি না, আমার মৃত্যুও খুব মূল্যবান নয়।

জানি না, আপনি আমার এ চিঠি পড়ে বিরক্ত হবেন কিনা, কিন্তু এ চিঠি আমাকে লিখতে হবে, কারণ, আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কতগুলি অভিযোগ এই প্রথম আমি জানাতে চাই। আমি আপনাদের মধ্যে গিয়েছিলাম বেঁচে ওঠার জন্য, আপনারা লেখক, আপনারা জীবন সৃষ্টি করছেন, আমি ভেবেছিলুম, আপনারা আমার মধ্যেও জীবন এনে দিতে পারবেন— বেঁচে থাকার জন্য আমার খুব বেশি দাবি ছিল না, আমার দরকার ছিল শুধু খানিকটা বিদ্যুতের মতো ঝলক, ঘুমন্ত মানুষের কানের কাছে 'ডাকাত–ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে যেমন আচমকা ছিটকে ওঠে, আমিও সেরকম চেয়েছিলুম, আমি আপনাদের মুখের কাছে কান পেতে রাখতাম, কিন্তু আমি জেগে উঠতে পারলুম না তবুও। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু আমার একটা নতুন মানুষ হওয়া বিষম দরকার, খুবই দরকার ছিল, নইলে সাধারণ সুস্থ মানুষের মধ্যে

আমার আর থাকা চলে না।

আমি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়েস উনিশ, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের আগে, তখন যদি মৃত্যু হতো, তাহলেই বোধহয় ছিল ভালো, আমার মনে হয় তাহলে দ্বিতীয়বার বেঁচে থাকা আমার পক্ষে এতটা সমস্যা হতো না। আত্মহত্যার কথা শুনলেই তার কারণটা শুনতে ইচ্ছে হয়, জানি না আপনারও হয় কিনা, অবশ্য সে কারণ শুনলে আপনারা এখন হাসবেন, আপনারা আধুনিক লেখক। আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতুম, মনে হতো তাকে না পেলে আমি বাঁচবো না, আমি রাত্রে জ্যোৎস্নায় বসে তাকে চিঠি লিখতুম। অনেকদিন, মনে আছে, মেয়েটি পাশে বসে আছে— আর আমি তাকে চিঠি লিখছি। তার জন্মদিনে এক শিশি আতর কিনে দিয়েছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতো প্রত্যেক দু'বেলা, যত না কথা বলতুম, তার চেয়ে চিঠি লিখতুম বেশি, চিঠি লিখে ওর ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতুম, বলতুম, তোমাকে ও চিঠি পড়তে হবে না, বুকের সঙ্গে লেখা থাক, আমার চিঠির ভাষা তাহলেই তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে। আঠারো-উনিশ বছরের কোন্ ছেলে না বিশ্বাস করে যে বুক মানেই হৃদয়। আর হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়া মানেই হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া! আমি কখনও মেয়েটিকে শরীর দিয়ে ছুঁতে চাই নি, আমি ভাবতুম, আঙুল ছোঁয়ালেই বুঝি ফুলের পরাগের মতো ও-গা থেকে রঙ উঠে আসবে। শুধু একদিন ওর দু'পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, ওকি, ওকি, ওকি বলে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলেও ছাড়ি নি, ওর পায়ে আমার মুখ ঘষেছি, বারবার ইচ্ছে হয়েছে— আমার চোখে যদি অনেক জল থাকতো আমি চোখের জল দিয়ে ওর পা ধুয়ে দিতাম। আপনি ভয় পাবেন না, বিমলেন্দুবাবু, আপনাকে মারি করেলির লেখার মতন কোনো প্রেমের কাহিনী শোনাতে বসি নি। কারণ আজ আমি মেয়েটির নামই ভুলে গেছি, রেণু, রীণা বা বাণী যে-কোনো একটা হতে পারে। চোখ বুজলে মেয়েটির মুখও মনে পড়ে না। সে ছিল আমার সমবয়সী, হঠাৎ ওর বিয়ে ঠিক হলো, মেয়েটি আপত্তি করলো না। ছেলেটি ওদের বাড়ি আসতো, বেশ ভালো ছেলেটি, আমারও ওকে খুব ভালো লাগতো— মেয়েটিকে খুব খুশি মনে হলো। আমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিল, তুমি মন খারাপ করো না, ভালো করে পড়াশুনো করো— তুমি এখনও কত ছেলেমানুষ, আমাকে মনে রাখবে তো?

এইসব—ভেবে দেখুন, এরই জন্য আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম! এ তো প্রতিদিন পৃথিবীতে দু'বেলা ঘটছে। আসলে সাঁতার না জেনেও আমি বন্ধুদের সঙ্গে একবার পুরীর সমুদ্রে নেমে অনেক দূর গিয়েছিলাম। আমার আত্মহত্যার চেষ্টাও অনেকটা সেই রকম। জানি না, আপনারও ছেলেবেলায় এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মেয়েটার বিয়ে হবার পর কিছুদিন আমার কিছু মনে হয় নি, একটু ছোট দুঃখ ছাড়া। তারপর একটা পূর্ণিমা কেটে গেল, একটা অমাবস্যা, আবার পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় চিঠি লেখার কথাও মনে পড়ে নি। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা আমার সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠলো, যেন প্রত্যেকটি লোমকূপ দিয়ে তাপ বেরুতে লাগলো, আমার স্নায়ুমণ্ডলী ও শিরাগুলি দপ্‌দপ্ করতে লাগলো অসম্ভব অভিমানে। জীবনে সেই প্রথম ও মাত্র একবার বুঝতে পারলুম কাকে বলে প্যাশান্। ইচ্ছে হলো একটা ছুরি হাতে নিয়ে খোলা রাস্তা দিয়ে তখুনি ছুটে যাই। প্রেমের ব্যর্থতা মানুষকে বড় অহঙ্কারী করে, তখন কেউ কেউ বিরাট শিল্প সৃষ্টি করতে পারে— বা শিল্পকে ভাঙতে, অর্থাৎ মানুষ খুন, বা নিজেকে ভাঙে। আমি শেষেরটা বেছে নিলাম। দুপুরবেলা বাড়িতে শুধু মা আর আমি, আমার দিদি তখন হাসপাতালে। ছাদের ঘরে আমি পা-জামাটার নিচের দিকটা কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটা শুকনো গাছের মতো আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুড়ে যাবো কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা তেমন সহজ নয়। সেই থেকেই আমি রিয়েলিটি অত্যন্ত

ঘৃণা করি।

প্রথম আগুনের আঁচ গায়ে লাগতেই আমার মনে হলো, না, না, না, অসম্ভব, অসম্ভব। কিন্তু আগুন নেভানো সহজ নয়। দেশলাইয়ের কাঠির খোঁচায় আগুন যে-কেউ জ্বালতে পারে আজ, প্রমিথিয়ুসের আত্মদানে, কিন্তু নেভানো শিখতে হয়। আমি হাতচাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করলুম, হাত ঝলসে গেল, আমি ছুটতে লাগলুম, উদ্‌ভ্রান্ত, মনে হলো দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমার জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে— কিন্তু আমার বেছে নেবার সময় নেই,— আমি ছুটে নিচে নেমে এলুম। আগুন আমাকে তাড়া করে এলো, বস্তুত আগুন আমার সঙ্গেই ছিল। দোতলার বারান্দায়—

থাক্, ওসব আর লিখতে বা মনে করতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি লেখকও নই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে গেলুম খুবই আশ্চর্যভাবে,— সেই বেঁচে ওঠার মতো বিস্ময় আর কিছু নেই আমার কাছে। সেই বেঁচে ওঠা আমাকে চিরকালের মতো হতভম্ব করে দিলো।

আকস্মিকভাবে বেঁচে ওঠার প্রচণ্ড ধাক্কা আমাকে কিছুদিন ভালো রেখেছিল। মন দিয়েছিলাম পড়াশুনোয়। বেশ ছিলাম সাধারণ মানুষ—হাসির কথায় হাসতুম, কখনো ক্রুদ্ধ হয়েছি, কত সময় সাধারণ দুঃখ পেয়েছি। তারপর চার-পাঁচ বছর বাদে আমারি কাছে ফিরে এলো। এসে কৈফিয়ৎ দাবি করলো। আমি বুঝতে পারলুম, এ জীবনটা অতিরিক্ত, এটা ঠিক আমার নয়। মানুষ একটাই জীবন পায়, যেমন ইচ্ছে সেটাকে খরচ করে,— কিন্তু আমি পেয়েছি দুটো, একটা আমি নিজের হাতে নষ্ট করতে গিয়েছিলাম, নিশ্চিত নষ্ট হয়েছিলও, দোতলার বারান্দা থেকে যখন আমি লাফ দিয়েছিলুম—তখন তো নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই গিয়েছিলুম। আমাকে কখনো খালি গায়ে দেখেন নি। দেখলে শিউরে উঠতেন। আমার দু'পা, বুক-পিঠ জুড়ে কালো কালো দাগ। ওরকমভাবে পুড়লে কেউ বাঁচে না। আমি কী করে বেঁচে উঠলুম কে জানে। তাছাড়া আমার মুখে আঁচ লাগে নি বলে আমাকে দেখেও কিছু বোঝা যায় না। অর্থাৎ আমি একবার মরে গেছি। পরে যেটা পেলাম, আমার বাকি জীবন, এটার ওপর আমার আর কোনো অধিকার নেই, এমনকি আমি একে নষ্ট করতেও পারি না। যেন আমাকে অন্য লোকের জীবন ধার দেওয়া হয়েছে। এই জীবন নিয়ে আমি কী করে বাঁচবো যদি এর ওপর নিজের মতো করে মায়া না পড়ে, যদি পরের জামা পরার মতো সবসময় সাবধানে থাকতে হয় ! বেঁচে থাকার মায়া পাবার জন্য আমি চারিদিকে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি রাজনীতিতে গিয়েছিলাম— ফিরে আসতে হলো। রাজনৈতিক নেতাদের হওয়া উচিত কবিদের মতো— তার বদলে কবিরাই আমাদের দেশে পলিটিকস শিখছে ! আমি খেলাধুলায় গিয়েছিলাম— ভেবেছিলাম, খেলাধুলার মধ্যে তো শরীর ছাড়া কোনো কথা নেই, ওরা অমরত্ব জানে না, ওরা জানে শুধু শারীরিক বেঁচে থাকা। আমি সাঁতার, এমনকি ঘুষোঘুষি শিখতেও গিয়েছিলাম— আমার হলো না, কেননা, আমার শরীর কেটে রক্তপাত হলেও আমার ব্যথা লাগতো না, মনে পড়ে যেতো, এ শরীর আমার নয়, আমার নয়, আমার শরীরের সমস্ত ব্যথা আমি আগুন লাগিয়ে একদিন ভোগ করেছি। গান-বাজনা করতে গিয়েও মন বসাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত এলাম সাহিত্যে। নিজে কিছু লিখতে শুরু করার আগেই আপনাদের মতো লেখকদের মধ্যে এসে পড়লুম। ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত বোধহয় আপনাদের মধ্যে এসে আমি বেঁচে যাবো, আমার নতুন জীবনের প্রতি মমতা আসবে।

কিন্তু আপনারাও আমাকে নিরাশ করলেন বিমলেন্দুবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আপনাদের প্রত্যেকের জীবন বিষম স্বার্থপর, জীবনের যে-কোনো সুযোগ-সুবিধে সম্পর্কেই আপনারা অত্যন্ত সজাগ, কিন্তু আপনাদের রচনা মিথ্যাভাষী। আপনাদের লেখার মধ্যে ঔদাসীন্য,

নির্জনতা এসব ছাড়া আর কিছু নেই— কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আপনারা কেউ সেরকম নন। আপনারা কে কতক্ষণ একা থাকেন জানি না, সবসময় দেখি হৈ-হুল্লোড়, বান্ধবসভা, আপনারা প্রত্যেক নিজের-নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কখন সময় পান ? নাকি সেইজন্যই সব অনুভবের কথা বানানো ?

মৃত্যু, ধ্বংস, নীতিহীনতা—এই হয়ে উঠেছে আপনাদের বিষয়। তাপসবাবুকে দেখেছি, কপালে একটা ব্রনো উঠলে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সাতবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যান— অথচ তাঁর উপন্যাসের নায়করা উদাসীন, ক্যান্সার বা সিফিলিসের রোগী। আপনিও বিমলবাবু, আপনার কবিতায় মেয়ে-পুরুষরা অত আত্মহত্যা করে কেন ? অথচ, আপনি জীবনে হয়তো সামান্য আত্মত্যাগও করেন নি কখনো। আমি জানি মৃত্যু কিরকম, তাই আমি জীবন্ত মানুষ দেখতে চাই— আপনি মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই না জেনে মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। কবিতা হলো একধরনের প্রার্থনা, আপনার কবিতায় কিসের প্রার্থনা ? মৃত্যুর মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই, অনেকটা একঘেয়ে।

মৃত্যু— তিন রকম, ভেবে দেখতে গেলে। আত্মহত্যা; দুর্ঘটনা বা আততায়ী; অথবা বিছানায় শুয়ে নানা জনের চোখের জল, দীর্ঘশ্বাসের নিচে। যাবার সময় কেউ কেউ বলে, মা, চললুম। এমন নিশ্চিন্ত সেই বলা যে শেষতম যাত্রার আগে যেন সে কিছুই নিতে ভুলে যায় নি, চন্দনের টিপ পর্যন্ত না। আবার কেউ কেউ বাকরুদ্ধ চোখে প্রবলভাবে চেয়ে থাকে, চোখ দিয়ে দু'হাত বাড়াতে চায়, যেন তার শেষ অস্তিত্ব চিৎকার করে,— যেতে দিও না, আমাকে বাঁচাও,— আমি এই মাটির ঘরে বা রাজপ্রাসাদে, করমচার ঝোপের পাশে, জ্যোৎস্নায়, আরও কিছুদিন থেকে যেতে চাই, যেতে দিও না, কোথায় যাবো জানি না, এখানে চেনা জিনিসগুলো কিছুই চেনা হয় নি, যেতে দিওনা। এই। কিন্তু জীবন বহু রকম, অসংখ্য অসংখ্য, আপনি কখনো বলতে পারবেন না, মানুষ এইভাবে বাঁচে। কেননা, প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা সম্পূর্ণরকম তার নিজের। মাস্তুলের মাথায় বালক ঘুমোয়, সম্রাট অনিদ্রারোগী, খানিক নিচে মাটিচাপা পড়ার তেরদিন পর বেঁচে ফিরে এলো মানুষ, প্রবল পিতৃশোকের মধ্যেও সিগারেট না পেলে মন চঞ্চল হয় কারুর, জানি না মহাশূন্যের রকেটে মানুষগুলো সত্যিই কী ভাবে। আমি এসেছিলাম বাঁচতে বিমলেন্দুবাবু, আপনাদের কাছে জীবনের একটা নতুন মুখচ্ছবি পেতে, দেখলুম, আপনারাও ভ্রষ্ট এবং জীর্ণ, পোকায় ধরা মৃত্যুবিলাসী। পরীক্ষিৎ লোভী, তাপস নিজেকে ঠকায়, অবিনাশ নিজেকে চেনে না, আপনিও মিথ্যে আত্মবিশ্বাসী।

ক্রমে আমার বুকের ভিতরের মৃত্যু আবার জেগে উঠলো। এইভাবে মায়া-মমতাহীনভাবে, পরের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মতন কেউ বাঁচতে পারে ? আমি আমার শরীরে মড়ার গন্ধ পেতে লাগলুম। লোকজনের মধ্যে বসতে আমার ভয়, আমি সবার আড়ালে নিজের হাতটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকি। কেউ টের পায় না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই, পচা গন্ধ, বুঝতে পারি আমার শরীর পচে যাচ্ছে। একটা আত্মাহীন, মায়াহীন, ভালবাসাহীন শরীর কখনো বেঁচে থাকতে পারে না।

কয়েকদিন আগে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি শিউরে উঠলুম,— সম্প্রতি আমার শরীরে কয়েকটা নতুন তিল উঠেছিল, ঠিক কালো নয়, লালচে বাদামী রঙের। জায়গাগুলো একটু একটু উস্‌খুস করতো —একটা তিল একদিন খুঁটতে গিয়ে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। তিলটা জীবন্ত। বুঝতে পারলেন, তিলটা জীবন্ত ? একটু খুঁটতেই সরে গেল। অবাক হয়ে আর একবার আঙুল ছোঁয়াতে সেটা আর একটু সরে গেল। লক্ষ্য করলাম, ওটা তিল নয়, একটা পোকা, আমার শরীর থেকে জন্মেছে, ক্ষুদে অক্টোপাসের মতো, প্রবলভাবে চামড়া আঁকড়ে আছে— সবগুলো

তিলই এই। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। বুঝতে পারলুম, আর নয় ! আমার শাস্তি শেষ হয়েছে। জানি, আপনি কী বলবেন বা ডাক্তার কী বলতে পারে এ ব্যাপারটা শুনে, ও কিছু নয়, এক ধরনের চর্মরোগ, কোনো একটা পাউডার লাগালেই সেরে যাবে। জানি সেরে যায়, অন্য লোকের সারে, কিন্তু আমার নয়। আমার এগুলো, পচা মাংসে যে-পোকা পড়ে— তাই। আর এখানে নয়, আমি বুঝতে পারলুম। আমি বাঁচতে এসেছিলাম, আপনারা আমাকে দূরে ঠেলে দিলেন। জানি না আমার কোথায় স্থান হবে।

আপনাদের
হেমকান্তি

মায়া
তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছে, জানি না, এ চিঠি তোমাকে কোনোরকম আঘাত দেবে কিনা— কারণ, আমি এটুকু অন্তত জানি নিশ্চিত যে আমি নিজেকে কিছুতেই সম্পূর্ণ বোঝাতে পারবো না। তোমাকে কোনো আঘাত দিতে চাই না, মায়া, আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই— অন্য কোনো কথা মাথায় এসে জটিল হবার আগেই তোমাকে একথা জানালুম।

তোমাদের বাড়িতে যাবার তৃতীয় দিনে তুমি আমার সামনে এসে বলেছিলে, আপনার ওটা কিসের বোতাম, চন্দনের ?—বলে তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে বোতাম দেখছিলে। সে প্রায় এক বছর আগে, তখনও তুমি অনেকটা শিশু ছিলে, এমন পূর্ণ যুবতী হও নি, তাই ঐ অকপট হাত রেখেছিলে আমার বুকে, আমার বুকের মধ্যে যে হৃৎ-স্পন্দনের কোনো শব্দ নেই, তাও তুমি টের পাও নি। আমি মাথা নিচু করে নিঃশব্দ ছিলুম। তুমি বললে, আপনি বাইরে কার ওপর রাগ করে এসে এখানে গম্ভীর ? একটু পরে তুমি দিদিকে বলেছিলে, ঐ ফর্সা লোকটা খুব অহঙ্কারী। আসলে আমি মাথা নিচু করে তোমার পায়ের দিকে দেখছিলুম, কি সুন্দর ঝকঝকে দুটি পা, যেন তুমি আমার স্মৃতির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, রঙ লাগাও নি অথচ প্রত্যেকটি নখে লাল আভা, গোড়ালি একটুও ফাটা নয়, একছিটে ময়লা নেই কোথাও।— কতদিন পর আমার বুকে একটি মেয়ের হাত, একথাও মনে পড়ে নি। তখন কোনো কথার উত্তর দেবার সময় ছিল না। সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটিকে যদি আমি ভালবাসতে পারি, তবে হয়তো আমি বেঁচে উঠতে পারি আর একবার। কিন্তু তবু যে কেন আমি শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করেই রইলুম জানি না। ভালবাসার অনিচ্ছা না বেঁচে থাকার অনিচ্ছা, কী জানি।

একদিন হঠাৎ তোমাদের ঘরে ঢুকে দেখেছিলুম, অবিনাশ তোমার হাত ধরে টানছেন, আর তুমি বলছো, ছাড়ুন, ছাড়ুন ! আমাকে দেখেই অবিনাশবাবু হাত ছেড়ে দিয়ে যেন কি একটা হাসির কথা বললেন। তোমরা দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলে। এমন হতে পারে, তোমার হাতের মুঠোয় কোনো জিনিস লুকোনো ছিল, অবিনাশবাবু কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, বা হাত ধরে তোমাকে টেনে নিতে চাইছিলেন ওঁর বুকে। আমাকে দেখে থেমে গেলেন এবং একটু বিব্রত বা দুঃখিত না হয়ে পরবর্তী হাসির কথাগুলি বলেছিলেন। আসলে দুঃখিত হয়েছিলাম আমি, মৃত্যুর চেয়ে বড় দুঃখ। আমার খুব ভালো লেগেছিল, ঐরকম প্রবলভাবে টানাটানি ও হাস্য। আমাকে দেখে থেমে যেতেই আমি বিমূঢ় ও লজ্জিত হয়েছিলাম, ফিরে যাবার জন্য এক-পা তুলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, আবার শুরু হোক, না হয় আমিই তোমার হাত ধরে টানি, প্রবলভাবে বুকের ওপর নিয়ে আসি, তোমার হালকা শরীরটা শূন্যে তুলে সফে নিই, তোমার ঠোঁট থেকে হাসি চলে আসুক আমার ঠোঁটে, কিংবা অবিনাশের, হাওয়ার হুড়োহুড়ির মধ্যে আমরা তিনজন— অনেকক্ষণ বাদে লক্ষ্য করলুম, আমি আমার হাত দুটো

পকেট থেকেই বার করি নি, ঘরের মাঝখানে বিকট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে। ইচ্ছে হলো, তখুনি ছুটে পালিয়ে যাই, তার বদলে তোমার দিদির হাত থেকে শরবতের গ্লাস নিলুম।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে, দোলের দিন। দল বেঁধে সবাই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল, গগনবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনও অবিনাশবাবুকে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। সবাই ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করছে, রঙের স্রোত আর আবীরের ধুলো চারিদিকে, কিন্তু আমি যোগ দিতে পারি নি, এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম অস্পৃশ্যের মতো, সবাই সেদিন আমাকে গঞ্জনা দিয়েছিল, আমাকে জোর করে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। তবু পারি নি, তবু পারি নি ওদের মতো খোলা হতে, লাল রঙকে ব্যবহার করতে। আমি এক ফোঁটা আবীর বুঝি দিয়েছিলাম সকলকে, সেই প্রথম আমি তোমার কপাল ছুঁয়েছিলাম। কত ব্যর্থ সেই ছোঁয়া। অবিনাশবাবু তোমার সারা মুখ ভরিয়ে অবলীলায় তোমার ব্লাউজের মধ্য দিয়ে পিঠে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, সকলের সামনে, সকলের সামনে তোমার জামার মধ্যে পিঠে অবিনাশের হাত ঘুরতে লাগলো, কোনো দ্বিধা নেই। আড়ষ্টতা নেই। আ, আমার এত আনন্দ হয়েছিল। মানুষকে বেপরোয়া, স্বাধীন, গ্লানিমুক্ত দেখলে আমি তার আত্মা থেকে ফুলের মতন গোপন সৌরভ পাই। আমারও ওরকম হতে ইচ্ছে হয়, মনে–মনে বলি, ঈশ্বর, ঈশ্বর আমাকে আর একবার বাঁচার সুযোগ দাও, আমাকে ওরকম স্বাভাবিক, জীবন্ত করো। হয় না, আমি পারি না। কেন পারি না, মায়া, তা তোমাকে আর এখন বলা যাবে না।

কিছুদিন আগে তোমাদের বাড়িতে সিনেমার টিকিট নিয়ে একটা লটারি হয়েছিল— তোমাদের সঙ্গে কে যাবে তাই নিয়ে। আমার সেদিন খুব মাথা ধরেছিল, খুব মন খারাপও লাগছিল, হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো আমি যাই তোমার সঙ্গে। তাহলে আমার সব রোগ সেরে যাবে, আমি অন্ধকারে তোমার পাশে বসে তোমার যোগ্য হয়ে উঠবো। কে যেন একবার আমার নামও বললো, আমি ব্যগ্রভাবে মুখ তুলে তাকালুম, নিঃশব্দে যেতে চাই, যেতে চাই বললুম।— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে গেল অন্য নামে, আমার প্রার্থীপদ বাতিল হয়ে গেল। যেন আমি উপস্থিত নেই, শুধু একটা নাম মাত্র, একজন উথাপন করলো, অপরে বাতিল করে দিল। মায়া, সেদিন রাত্রেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। আজও আমি জানি না, তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখে, তোমাকে আমার সব কথা বলার পর বাড়ি ফিরে যদি দেখতুম মা মারা গেছেন, তাহলে সেইটাই ভালো হতো কিনা। তোমার সঙ্গে যেতে না পারার দুঃখ, মায়ের মৃত্যুর আঘাতও অনেকটা ম্লান করে দিয়েছিল সেদিন রাত্রের জন্য। আমার মধ্যে শোক বা অনুতাপও জেগে উঠতে পারলো না।

তোমাকে আজ এ চিঠি লিখছি, কারণ আজ আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনোদিন ফিরবো না, এই জেনে। আমার পক্ষে আর স্বাভাবিক মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, যেন বুঝতে পারছি। এতদিনেও যখন পারলুম না। কোথাও দাঁড়াতে পারলুম না, কোথাও দাগ রইলো না, ভালবাসার কথা জানাতে পারি নি, এক লাইন কবিতা লেখা হলো না, কিছুই হলো না, একটি ব্যর্থতা তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম একথা তোমাকে আজ জানাবার মধ্যে আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে নেই। আমার জানাবার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি নি। বড় অদ্ভুত এই ব্যর্থতা। আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি ভালবাসতে। আমারই নিজের প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে ভালবাসার—ভালবাসার ইচ্ছে জেগেছিল শুধু, ভালবাসা জাগে নি। মনে মনে হাজার কথা বলেছি তোমাকে লক্ষ্য করে, এমনকি ভেবেছি, তোমাকে মুখে বলার সুযোগ না পেলেও একটা চিঠি লেখা অনায়াসেই চলতো, আজ যেমন লিখছি, তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে, সেই হতো আমার পরম প্রাপ্তি— সেই

আঘাত যদি আমাকে কোনো উত্তেজনা দিতো! কিন্তু আমি মিথ্যে কথা লিখতে পারি না, তোমাকে আমি ভালবাসি একথা লেখা অসম্ভব আমার পক্ষে, আসলে, তোমাকে আমি ভালবাসতে চেয়েছি—এইটাই সত্যি এবং তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্যি, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি নি। একথা কি কাউকে জানানো যায় ? কিন্তু আজ লিখতে হলো, কারণ আজ চলে যাচ্ছি আমি, জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না, কারুকে কারুকে কোনো কোনো কথা জানাবার ইচ্ছে আজ সত্যিই হলো। যদি এ চিঠি তোমাকে কোনো আঘাত দেয় বা অপমান করে, তবে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত তোমার। তুমি আমাকে মনে রেখো বা সামান্য ভালবেসো— এ দাবি আমার নেই। তবু তোমার কাছ থেকে কিছু একটা সামান্য পেতে বড় ইচ্ছে করছে। অন্তত রাগ বা ঘৃণা।
দিদিকে আমার নমস্কার জানিও।

হেমকান্তি রায় চৌধুরী

পরীক্ষিৎ

সাত মাইল রাস্তা হেঁটে এলাম এই রাত্রে। লাস্ট বাস চলে গিয়েছিল, পকেটে পয়সা ছিল না। ফিরে এসেই লিখতে ইচ্ছে হলো। একটা কথাও হারাতে ইচ্ছে করে না। এতক্ষণ যা-যা মনে পড়লে, সবই টুকে রাখতে চাই। নইলে হারিয়ে যাবে। অতিকষ্টে শেখরকে কাটানো গেছে। গড়িয়াহাটার মোড়ের আগে আর কিছুতে যেতে চায় না—সাহিত্য আন্দোলন, কবিতার ফর্ম এইসব নিয়ে বক্‌বক্ শুরু করেছে—রাতদুপুর ... অশ্লীল [illegible]লানো। তারপর বলে যে আমার বাড়িতে আসবে। আমি গেলুম ওর বাড়িতে থাকতে, তার বদলে ও চায় আমার বাড়ি। একদিন ওর বাড়ি আমি থেকেছি, একদিন আমার বাড়িতে ও থাকবেই একি কম্যুনিজ্‌ম নাকি ? আমি ওর বাড়ি থাকবো বেশ করবো— বাপের টাকা আছে, একা টাকা ওড়াচ্ছে, খানিকটা মাল খেয়ে আগড়ম করে— আমি ওর বাড়িতে থাকি, ধন্য হয়ে যায়, পরে জীবনীতে লিখবে। কিন্তু। আমার বাড়িতে জায়গা নেই।

আজ ভবকেষ্ট মিত্তিরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম— শুনলাম আমার নাটকটা এ মাস থেকে ধরবে না, আগে শেখরের উপন্যাস। শুনে গা জ্বলে গেল— শেখরের কি টাকার অভাব ? ওর কী দরকার উপন্যাস লেখার— তাছাড়া যখন শুনেছে আমি ওখানে লেখা দেবো। একশোটা টাকা পেলে আমার কত কাজে লাগতো। ভবকেষ্টর চ্যালা রামকেষ্ট আবার বলে, আপনি বিমলেন্দুবাবুর উপন্যাস একটা যোগাড় করে দিতে পারেন ? দেখ বিমলেন্দু একটা বিরাট কেষ্ট-বিষ্টু। ট্র্যাস লেখে ! রাগে আমার মুখে থুতু এসে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল থুতু লোকটার মুখে মাখিয়ে দিই। তার বদলে হাসি এনে বললাম, ঠিক আছে, আমি এনে দেবো, আপনাদের আর যেতে হবে না ওর কাছে। বিমলেন্দুকে একদিন কথায় বলে দিলেই হবে যে, ভবকেষ্ট তোর খুব নিন্দে করছিল, বলছিল, তোর 'কাছের মেঘে' গল্পটা কাফ্‌কা থেকে টোকা! হারামজাদা, শুয়ারকা বাচ্চারা ফোকটে নাম কিনছে। শিল্পের জন্য সর্বস্ব পণ করলুম আমি—আর ওরা মজা লুটলো। আমি দিন-রাত মানি নি, ভয়-ভাবনা মায়া-মমতা মানি না, জীবনটাকে ছুঁড়ে দিয়েছি শূন্যে। আর ছাপার অযোগ্যরা রাত্রে বাড়ি ফেরা ঠিক রেখে, পরের দিনের গাড়ি ভাড়া বাঁচিয়ে, মা-বোনের কাছে মান ঠিক রেখে, থানা-পুলিশ সামলে শিল্পী সেজেছে। শালারা আমার সঙ্গে ঘুরে—

নাঃ, বড় বেশি রাগ এসে যাচ্ছে। আজ নেশাটা পুরো হয় নি, আর হাফ নেশা হলেই শরীরে বিষম রাগ এসে যায়, ইচ্ছে হয় সব অশ্লীলকে ডুবিয়ে ছাড়ি ওদের নিয়ম, সাবধানের বারোটা

বাজাই। সেই অবিনাশ হঠাৎ ছুটে রাস্তা পার হতে গেল—দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি, প্রচণ্ড ব্রেক কষার শব্দ, আমার মনে-মনে চোখ বুজে খুশি হলাম। নিশ্চয়ই ওটা গেছে। ঈশ্বর, তুমি ধন্যবাদার্হ, ওর একটা কিছু শাস্তি পাওনা ছিল, প্রাণে যেন না মরে, হাত-পা খোঁড়া হয়ে যাক্। ভিড় ঠেলে গেলাম, হা-হরি একটা নিরীহ কুকুর চাপা পড়েছে, অবিনাশ অক্ষত। কুকুরটার জন্য এমন আন্তরিক দুঃখ হলো আমার যে অবিনাশকে চাপা দিতে পারে নি বলে গাড়ির ড্রাইভারের নাকে ঘুষি মারলুম। বেঁচে থাকার আশ্চর্য ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ওটা। তবে ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে দেবো। বুঝিয়ে দেবো শিল্পের সঙ্গে শত্রুতা কী সাঙ্ঘাতিক জিনিস। অনিমেষের সঙ্গেও। সুযোগ পাচ্ছি না।

সেদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম— বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাপস, শেখর, অম্লান, বিশ্বদেব, অবিনাশ, ছায়া, মায়া, কায়া সব। অবিনাশের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। পেচ্ছাপখানার পাশে এসে ওকে বললুম, কিরে, কার মুখ দেখতে এসেছিস ? জবাব দিল না। একপাটি দাঁতের ওপর আর এক পাটি দাঁত ঘষে গেল— চোয়াল নড়া দেখে বুঝলুম। আবার বললাম, অমন ছটফট করছিস কেন ? উত্তর নেই। কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, অবিনাশ— । অত্যন্ত বিনীত গলায় ও বললো, পরীক্ষিৎ, তুই এখন অন্য কারুর সঙ্গে কথা বল্। কোনো কারণে রাগ হলে আমি চুপ করে থাকতে চাই।— আমি চেয়েছিলাম ওকে রাগিয়ে দিতে। রেগে গেলেই ও দু'একটা বোকামি করে, নইলে এমনিতে ভয়ানক শাহেন্‌শা ছেলে। মুখখানা টকটক করছিল অবিনাশের। অনিমেষ একপাশে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছিল, নার্স এসে বললো, কংগ্রাচুলেশান। আপনার ছেলে হয়েছে।

ছেলে! অনিমেষের চেয়ে বেশি চেঁচিয়ে উঠলো শেখর আর ছায়া। যেন বাপের জন্মে কোনো ছেলে হওয়ার কথা শোনে নি। অনিমেষ সামনে এসে বললো, ওরা ভালো আছে তো ? দুজনেই—

—দুজন না, তিনজন ! নার্সটা মুচকি হাসলো। বেশ গোলগাল চেহারা, লেবুর মতো দুটো গাল, তবু মনে হলো পেছনে প্যাড বেঁধেছে। নইলে অতটা উঁচু আর শেপলি ! ইচ্ছে হলো, একটা টোকা মেরে—

তিনজন ? তার মানে ?

হ্যাঁ, তিনজন। সারামুখে নীল কালি মাথার মতো হাসলো নার্স। এবার লক্ষ করলুম, ওর বেশ গোঁফ আছে। একটু না, বেশ নীলের চেক্‌নাই। পা দুটো যখন অতো সাদা, তখন নিশ্চয়ই পায়ের লোম কামায়, সেই সময় কি গোঁফও চেঁছে নেয় নাকি মাঝে মাঝে ? অধিকাংশ মহিলা সাহিত্যিকই গোঁফ কামায় শুনেছি। নিজে যাচাই করে দেখি নি অবশ্য।

তিনজন কে ? অনিমেষ ক্যাবিনের দিকে যেতে গেল। নার্স মিষ্টি হেসে বললো, ঠিক যেন কোনো অশ্লীল কথা শেখাচ্ছে, আপনার যমজ হয়েছে। খুব ভালো ওয়েট, সাড়ে পাঁচ পাউন্ড করে, সবাই ভালো আছে। আসুন আমার সঙ্গে, বেশি কথা বলবেন না। আমাদের সব্বাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।

যমজ ? শুনে আমরা সবাই শব্দে বিস্মিত হয়ে গেলুম। সত্যিকারের যমজ ? বহুদিন বাদে একটা খাঁটি আশ্চর্য ঘটনা শুনলুম। আমাদের চেনাশুনো কারুর কখনো যমজ সন্তান হয়েছে শুনি নি। ইস্কুলে আমাদের ক্লাসে প্রশান্ত আর সুশান্ত নামে দুই ভাই পড়তো। অনিমেষ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে মুখখানা ফ্যাকাশে— নার্সের হাতটা গপ্ করে চেপে ধরে বললো, আপনি ঠিক বলছেন ; আমারই—? ক্যাবিন নাম্বার থ্রি ? কখন ?

নার্সটা যেন ভারি মজা পেয়েছে। কচি খুকির মতোন চোখ ঘুরিয়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনারই, আপনার স্ত্রীর নাম গায়ত্রী তো ? আপনাদের আগে বলা হয় নি, প্রথম বেবি হবার

ঠিক এগারো মিনিট পরেই আরেকটি, কী ভাগ্য আপনার! দুটিই ছেলে, মেয়ে নয়!

অনিমেষ তখনো নার্সের হাত ধরে আছে, জিজ্ঞেস করলো, দুজনেই—

— হ্যাঁ, বলছি তো দুটিই ছেলে।

— না, তা নয়, দু'জনেই—

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুজনেই বেঁচে আছে। খুব নর্মাল ডেলিভারি

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, আর ছেলে দুটির মা কেমন আছে ? গায়ত্রী ?

খুব ভালো। জ্ঞানও ফিরে এসেছে। গিয়ে দেখুন না— হাসছে ! অবিনাশ অনিমেষের কাঁধ ধরে ঝাঁকু নি দিয়ে বললো, কংগ্রাচুলেশান! করিডোর দিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসে বললো, তোমরা খবর শুনেছো ? যমজ হয়েছে—!

শিশুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, দুটো রক্ত-মাংসের পুতুল। ওদের চোখ, নাক, কান ও লিঙ্গ আছে, হাসি ও কান্না আছে, পেশীর শক্তিতে হাত ও পা ছুঁড়তে পারে। দুঃখ আছে— অর্থাৎ ক্ষিদে পেলে বা পিঁপড়েয় কামড়ালে কাঁদতে জানে— সুখবোধও আছে অর্থাৎ, মায়ের বুক পাওয়া। শুধু নেই স্বাতন্ত্র্য। ওরা আলাদা নয়। দুটোকেই আমার একরকম মনে হয়েছিল, হয়তো যমজ বলে ওরা এক রকম দেখতেই হবে— কিন্তু ওরা অন্য শিশুর চেয়েও আলাদা নয়, বস্তুত দুনিয়ার সমস্ত সদ্যোজাত বাচ্চাই আমার কাছে এক। ওরা একইরকমভাবে চেয়ে থাকে। চৈতন্যের কোন্ প্রদেশ থেকে আসে ওরা, কি সরল ও দূরভেদ্য চেয়ে থাকা ! কোথাকার এক বেঁচে থাকার প্রবল দাবি নিয়ে এসেছে, দুটো মায়ার পিণ্ড। ওঃ, বিপুল প্রতীক্ষা ও ধৈর্য নিয়ে আসতে হয় পৃথিবীতে— কতো কি শিখতে হবে— হাঁটা চলা, শব্দব্রহ্ম থেকে বাক্যবন্ধ, খাবার চুরি, স্বর ও ব্যঞ্জন, পোশাক পরা, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এই অভিমানী জ্ঞান, ঘুড়ি বা লাট্টু, ছোঁক ছোঁক, ফ্রক ও হাফপ্যান্টের নিচের রহস্য, নিজেকে লুকোবার জন্য শূন্যতা বোধ, রক্তের ডাক ও কর্মবন্ধন, তারপর আরেকজনকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে এইরকম আর একটা মাংসের পুতুল তৈরি করা। পরা-বিদ্যা বুঝি বলে একেই। অথবা চক্র দিয়ে আরম্ভ কি যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক, পরে দেখে নেবো। অথবা সূক্ষ্মতা বুঝি এই। নাঃ, জীবচক্র জিনিসটা আমার পছন্দ হয় না। আমার পৃথিবীতে আমি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাবো না।

আমি নবজাতকদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে—গায়ত্রীর ক্লান্ত খুশি ছুঁয়ে অনিমেষকে দেখলুম। যেন ওর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, এমন মুখ। খুব ইচ্ছে হলো ওকে একটা ধাক্কা দিই। ওকে বলি, অনিমেষ,—মানুষের অতোটা খুশি আমার সহ্য হয় না। না হয় যমজ ছেলেই হয়েছে। এমন কি দৃশ্য আছে পৃথিবীতে যা মানুষকে সত্যিকারের খুশি করতে পারে? চোখ না বুজলে মুখ জাগে না। আমি বলতে চাইছিলাম, অনিমেষ, চোখ বুজে নিজের মুখ দ্যাখ। ঐ সন্তান তোর কেউ নয়।

... বন্ধুবান্ধব-ফান্ধব আমার মোটেই ভালো লাগে না। অর্থাৎ আমার কোনো বন্ধু নেই। যে আমাকে খাওয়াবে সে আমার বন্ধু। যে আমাকে রাত্রে থাকতে দেবে সে আমার বন্ধু। কোনো কাগজের জন্য যদি কেউ লেখা চেয়ে টাকা দেয়, বা যখন তখন সিগারেট পাওয়া যাবে বা ট্রামে-বাসে ভাড়া দেবে— তাহলে বন্ধু বলা যায়। আর কিছু আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এক একটা আছে, ভিখিরির মতো বসে থাকে আর সাহিত্য-ফাহিত্য নিয়ে কথা বলতে চায়। আমিও তো ভিখিরি। ভিখিরির সঙ্গে ভিখিরির বন্ধুত্ব করে কী লাভ। মোটেই পছন্দ করি না। অনেকে আবার বন্ধুত্ব করে ধার শোধ চায়, যেমন আজ শেখর। কিন্তু সবচেয়ে বড় বদমাশ অবিনাশ, কারণ ও আর আমার বন্ধুত্ব চায় না। ওর কথা ভাবলেই গা জ্বলে যায়।

... অতক্ষণ অন্ধকার দিয়ে হেঁটে এলাম, ওঃ কী অন্ধকার, হেঁটে এলাম না সাঁতরে এলাম।

শরীর ডুবে গেল, গা–হাত–পা দেখা যায় না। চোখে–নাকে–কানে অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছিল, খানিকটা অন্ধকার হড়াৎ করে খেয়ে ফেললাম ভুলে। কিছুক্ষণ পরে দাঁড়িয়ে এক জায়গায় বমি করার মতো অন্ধকার বার করে দিলুম পেট থেকে, নাক ঝেড়ে সিক্‌নির মতো অন্ধকার পরিষ্কার করলুম। তাও শালারা যেতে চায় না। খানিকটা বাদে রাস্তা ভুল হয়ে গেল। কাদার মতো থকথকে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘেন্নায় শরীর গুলোচ্ছিল।

একদিন কল্যাণের সঙ্গে এমন ঘোর অমাবস্যায় হেঁটেছিলুম বহরমপুরে। কল্যাণ একটা চুরুট খাচ্ছিল। মাঝে–মাঝে সেই চুরুটের ম্লান লাল আলো। সেদিন আর কি হয়েছিল মনে নেই, শুধু মনে পড়ে আমাদের দু'জনের বহুক্ষণ পাশাপাশি অন্ধকারে হাঁটা। ও, সেদিন আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আহা, এতোদিন মনে পড়ে নি কেন ? আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার পাড়ে চলে এলাম গির্জার পাশ দিয়ে। আমরা দু'জনে কোনো কথা বলি নি, এমনভাবে হাঁটছিলুম যেন বহুক্ষণ আরও ঐরকমভাবে হাঁটতে থাকবো। কিছুক্ষণ আগে কল্যাণ গান গাইছিল চেঁচিয়ে—জোরালো ও সুরেলা ওর অমন সিড়িঙ্গে চেহারায়। গান অসম্ভব ভালো লাগছিল, সেই সঙ্গে বিরক্ত হয়েছিলামও।

কারণ, ও গান গাইছিল আপন মনে, আমাকে গানের সঙ্গী করে নি। তারপর হঠাৎ চুপ করে উৎকটভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। নদীর পাড়ে এসেও আমরা হাঁটা থামাই নি। মনে হলো আমরা নদীর ওপর দিয়েও হেঁটে যাবো। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের কাছে এলাম, আমার দেখতে ইচ্ছে হলো কল্যাণ কী করে। ও আস্তে–আস্তে জলে নেমে যাচ্ছে, আমি দেখতে লাগলুম, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেললো, যখন বুক জলে, তখন ফিসফিস করে আমি ডাকলুম, কল্যাণ! কল্যাণ পিছন ফিরে তাকিয়েই সঙ্গে–সঙ্গে ফিরে এলো, এসেও কোনো কথা বললো না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ বললো, শ্যামা কথাটার মানে কিরে ? কালো ? তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা ... কালিদাসের নায়িকা কি কালো ছিল ?

আমি বললুম, না। শ্যামা মানে যে স্ত্রীলোকের শরীর শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। হঠাৎ—

কিছু না, ও বললো। আবার খানিকক্ষণ চুপ। পরে বললো, ওপারে একটা লোক দেখতে পাচ্ছিস্ ?

— না।

— ঐ যে দ্যাখ, লাল আলোর একটা ছিটে। হারিকেন হাতে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক হাঁটছে, আমার কি মনে হলো জানিস, আমিই এইমাত্র নদীটা পেরিয়ে গিয়ে ওপারে মাঠে হাঁটছি। তোকে বললুম, একটু দাঁড়া। কি রকম যেন স্বপ্নের মতো এক মুহূর্তে দেখতে পেলুম।

— ওপারে তো কবরখানা, তোর ওখানে রাতে যেতে ইচ্ছে করছে ?

— না। শুধু নদীর ওপারে যে-কোনো জায়গায়।

হঠাৎ আমার মনে হলো, কল্যাণ কি রাতদুপুরে আমাকে একা পেয়ে কবিত্বে টেক্কা দিচ্ছে ? ওর কথায় খানিকটা যেন সত্যিই গভীরতার সুর। বললাম, কী করে পার হবি ? আমার তো মনে হচ্ছে এটা অন্ধকার, কাদায় থিকথিকে নরকের নদীর মতো বিশ্রী।

কল্যাণ আমার দিকে গূঢ় সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, যাঃ, এতো গঙ্গা। পুণ্যসলিলা।

কিন্তু যাই হোক, তোর কি মনে হয় না এটা একটা অদ্ভুত জীবন্ত জিনিস যা কোনোদিন পার হওয়া যাবে না ? (কল্যাণ কোনোদিন পারবে এরকম কথা বলতে ?)

— আমি ঠিক পার হতে চাই না। আমি ডুবে থাকতে চাই।

— কিসে ডুবে থাকতে ? নদীতে ?

— হ্যাঁ, সব নদীতে নয়, এখন, এইমাত্র মনে হচ্ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ডুবে মরি। মরবো ? তুই সাক্ষী থাকবি ?

থাকবো। তার আগে তোর নীল স্যুটটা আমাকে দিয়ে যা। তোর ওটা আমার খুব পছন্দ মাইরি।

তুই জানিস না, পরীক্ষিৎ—কল্যাণ কোট খুলতে-খুলতে বললো, শরীরে বড় মৃত্যুভয় ঢুকেছে আমার। মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। খুবই লজ্জা লাগে। কিছুই হলো না—জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা লেখা-লেখা খেলা করে কাটালুম। যখন চুল পাকবে, দাঁত থাকবে না, চোখের ছানি কাটাতে হবে— তখন হয়তো লেখার জন্য কিছু টাকাকড়ি পাবো—খবরের কাগজের লোকেরা যাকে বলে—সম্মান দক্ষিণা। তোর লজ্জা করে না ? এই কি জীবন নাকি? এর চেয়ে নিজের হাতে—তুই দাঁড়া পরীক্ষিৎ, আমি যাই—

— কোথায় ?

— জলে। নদীর বিছানায় ঘুমোই। কোনো ক্ষোভ থাকবে না—

— আমিও তাই ভেবেছিলাম। সেইজন্যই তো আমিও গিয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে—

— কবে ? তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি ? তোর মতো—

— কেন, জব্বলপুরে ? ব্রিজ থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলাম তোর মনে নেই ?

— তুই লাফিয়েছিলি ? তুই তো হঠাৎ পড়ে গেলি—

— নাঃ। এক মুহূর্তে আমার মৃত্যু খেলে গিয়েছিল, ইট ক্রেনের মতো। নিচে নদীতে অন্ধকার স্রোত দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিল, 'যাই' বলে ঝাঁপ দিই। স্রোত, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। মাঝখান থেকে অবিনাশ এসে—

দেখলুম কল্যাণ পেছন ফিরে উঠতে শুরু করেছে, আমার পুরো কথা না শুনে। সিঁড়ির উপরে গিয়ে মূর্তিটার নিচে দাঁড়ালো—বিশাল মর্মর মূর্তিটা ঝুঁকে আছে, কোনো ইংরেজ রাজপুরুষের, যেন মূর্তিটা— যেন মূর্তিটা, কোনো তুলনা মনে আসছে না, শুধু মূর্তিটাই—চোখে ভাসছে— বিশেষত ঐ অন্ধকারে তালোয়ারের উপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ানো,—মনে পড়ছে মূর্তিটার নিচে কল্যাণকে কি সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর লেগেছিল, ভেবেছিলাম মানুষ কি একটা মূর্তির চেয়েও নগণ্য বা কম জীবন্ত ? পরে ভাবনাটা সংশোধন করে নিয়েছি। মানুষ না, শুধু কল্যাণ। ঐ বাস্টার্ড। ওকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। খালি বড় বড় কথা।

শনিবার, ২৯শে এপ্রিল

কাল সারারাত মাথায় ব্যথা হয়েছে। মাথার যন্ত্রণা কিংবা মাথা ধরা নয়। মাথার পিছনে চার ইঞ্চি জায়গা জুড়ে সমতল ধরনের ব্যথা। শুয়েছিলাম, হঠাৎ মাঝ রাত্রে মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে, খাট ও ঝোলানো আলোটা দুলছে—শুনতে পেলাম দূর থেকে শত শত শাঁখের আওয়াজ, প্রবল ভয়ে উঠে দাঁড়ালুম, মেঝেতে পা রাখতে পারছিলাম না, 'মা মা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম, মা যে বাড়িতে নেই মনে পড়ে নি, শুধু মনে হয়েছে মাকে ডেকে বাইরে কোনো খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁচতে হবে, বাড়ির সামনে খোলা জায়গা নেই,— পুরো গলিটা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে ঘুঁটে দেবার মাঠ, গলিটা পেরুবো কী করে ? 'মা মা' বলে ডেকে দেয়াল ধরে ধরে পাশের ঘরে এলাম, দিদি ওর বাচ্চাদের নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে, এখনও টের পায় নি, দিদিকে ডাকতে গিয়েও মনে হলো, থাক না, ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোক, দেয়াল চাপা পড়ে মরে তো মরুক, বিধবা হয়ে দিদি বেশিদিন বেঁচে কী করবে—পরক্ষণেই মনে পড়লো, একবার আমার ডান হাত ভেঙে যেতে দিদি আমাকে

অনেকদিন নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ দিদিকে ডেকে বাঁচাবার কথা মনে হলো। সেই সময়—শিয়রের কাছে জানলাটা খোলা, ছায়া দুলছে না, আলো দুলছে না, বুঝতে পারলুম দিদির ঘরে ভূমিকম্প নেই। থেমে গেছে, না ভূমিকম্প আরম্ভই হয় নি ? আমি স্বপ্নে ভয় পেয়েছিলাম ? নাকি, পৃথিবীতে এইমাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটা বিষম ভূমিকম্প হয়ে গেল যা শুধু একা আমার শরীর কাঁপিয়েছে! আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো।

সেই সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, রাত দুটো কি সাড়ে তিনটে, বাবাকে দেখতে পেলাম। কোর্ট থেকে ফেরার সময় যে রকম পোশাক পরতেন, ঠিক সেই পোশাকে, কালো সিল্কের কোট, কালো টাই, ধবধবে সাদা স্টিফকলার ও জামার হাতা। চোখে প্যাসনে। জিজ্ঞেস করলুম, বাবা আপনি হঠাৎ ? কি মনে করে—

তোমাদের দেখতে এলাম। তাছাড়া আমার নস্যির কৌটোটা ফেলে গিয়েছিলাম। বাবা খুব ধীর ও পরিষ্কার গলায় বললেন।

— আপনাকে আবার দেখবো আশাই করি নি, আপনি তো—

— তুমি কেমন আছো, পরীক্ষিৎ, একটু রোগা হয়ে গেছো।

— কিন্তু আপনার চেহারা একই রকম আছে। কী করে ফিরলেন ?

— আমার সোনার হাতঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছো শুনলাম।

— আপনি কী করে ফিরলেন ? মরে যাবার সাত বছর পরে—

— ঘড়িটা আমার খুব প্রিয় ছিল, আমার বাবা ওটা দিয়েছিলেন আমাকে। তিনি বলেছিলেন, এই ঘড়ি তোমাকে দিলাম। এটা কখনও বন্ধ হয় না। এটা তুমি তোমার সন্তানকে দিও। কিন্তু সেই সময়কে তুমি রাখলে না, পরীক্ষিৎ।

— মৃত্যুর পরও কি ফিরে আসা যায় ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে—

— আমার মেডেলগুলো সব অশ্বিনীর কাছে বন্ধক দিয়েছো। ওগুলো কি ছাড়াবে ?

— ছাড়াতাম। কিন্তু স্যাকরা বেচে দিয়েছে বললো।

— মিথ্যা কথা বলো না আর এখন। আসলে তোমার—

— আপনি মৃত্যুর কথা বলুন।

— ছাড়াবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুমি নিজে লেখাপড়া করলে না, এমন কিছুই করতে পারবে না যাতে ওরকম মেডেল পাবে—সেইজন্য তোমার বাবার মেডেল তোমার সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু তোমার মা ওগুলো খুব ভালবাসতেন। তাঁকে এখনও বলো নি—

— সাত বছর আগে আপনাকে আমি পুড়িয়ে এসেছি শ্মশানে। সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল। আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু আমার এমন কাঁধে ব্যথা হয়েছিল যে এক সপ্তাহ ব্যথা ছিল। আপনি জানেন না, জেনে রাখুন, আপনার প্রিয়বন্ধু সতীশবাবু শ্মশানে যায় নি। বুলিমাসীর বর আপনার টাকা ফেরত দেন নি। কিন্তু আপনি কী করে মৃত্যুর পর আপনাকে ফিরলেন, সেই কথা বলুন।

— আমার ফটোর কাচটা ফেটে গেছে। ওটাকে সারিয়ে অন্য কোথাও রাখাই তোমার উচিত—

— মৃত্যুর দেশ থেকে যদি ফিরে আসা যায়, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। ফিরে এসে আমি সেই অ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখলে পৃথিবীতে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।

— ওরকম জানলার পাশে মাথা দিয়ে শুয়ো না। ওতে বুকে সর্দি বসে যায়।

— আপনি মৃত্যুর কথা বলুন ! মরার পর আপনি একটুও বদলান নি তো ! কেমন করে—

— আমার বড় শীত করে রে খোকন, আমাকে একটা কম্বল দিতে পারিস্ ?

— না। আমাদের আর একস্ট্রা কম্বল নেই। আপনারটা দিদির ছেলে গায়ে দিচ্ছে—

— কিন্তু আমার যে বড় শীত করে। চিতায় যাবার পর আর আগুন দেখি নি। আমার প্রথমবারের বাৎসরিক কাজটাও করিস নি!

— তখন জামাইবাবুর অসুখ ছিল। ভেবেছিলাম, জামাইবাবুর শ্রাদ্ধ আর আপনার বাৎসরিক একসঙ্গে করবো।

— মরার আগের দিন তোকে—

— আপনি মরার পরের—

— একটা কথা—

— কথা—

— বলতে চেয়েছিলাম। তুই আসিস নি, আমার—

— বলুন, আমি তাই শুনতে চাই—

— আমার ওখানে বড় শীত করে পরীক্ষিৎ। তোর কথা ভেবেও আমার শীত করে।

শেখর

সকালবেলা সারা শরীর ব্যথা করে প্রত্যেকদিন। অধিকাংশ দিনই রাত্রে আলো নেভাতে মনে থাকে না। দিনের বেলা আলোটা নেভাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকাই। কী করুণ মূর্তি ঐ আলোর। তিন-পুরুষের বাড়িতে—এখনও কিছু কিছু ঝাড়লণ্ঠন আছে—আমি সেগুলো নষ্ট করি নি, ভেতরে বালব বসিয়ে জ্বালি। রাত্তিরবেলা খুব জমজমাট দেখায়। প্রাচীন রাজপুরুষের মতো। কিন্তু দিনের বেলা কি মলিন রুগ্ন চেহারা আলোটার—আমি দিনের বেলাতেই এটাকে দেখতে ভালবাসি। রাত্তিরের অতো প্রখরতা স্পষ্ট হয় না। সুইচ টিপে আলোটা একবার নেভাই ও জ্বালি। আলোটা নেভালেই রোদ্দুর চোখে পড়ে বিশেষভাবে—রোদ্দুর দেখলেই মনে হয় দূরে চলে গেছি, ধানবাদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অথবা কুচবিহারে অথবা ছেলেবেলোয় খুলনায় যেমন হাঁটতুম শশাঙ্কর সঙ্গে। সকালে উঠলেই শরীর ব্যথা করে। এ বেশ মজা, রাত্তিরে কোনোদিন ঘুম আসতে চায় না, প্রতিদিন স্লিপিং পিল খেতে হয়, তবু ঘুম আসে না, দেয়ালে ছবি দেখি, ছবি তৈরি করি, ছবি নষ্ট করি। শেষরাত্রে ঘুমের মতো আচ্ছন্নতা। সকালে গা ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্য আবার ট্যাবলেট খাই। শুনেছি, বেশি ট্যাবলেট খেলে রাত্রে ঘুম হয় না। ঘুম হয় না বলে রাত্রে ট্যাবলেট খাই, সেইজন্য সকালে গা ব্যথা। আবার গা-ব্যথা সারাবার জন্য ট্যাবলেট খাই, সেইজন্য আবার রাত্রে ঘুম হয় না। সকালে যার সঙ্গে দেখা হয়, আমার বিরস মুখ দেখে শারীরিক ব্যাপারে প্রশ্ন করে। আমার সেই গা ব্যথার কারণ বলি। ঐ ট্যাবলেটটা খাস না কেন? খুব ভালো কাজ দেয়—শরীর একেবারে ঝরঝরে করে দেবে—এই বলে একটা ট্যাবলেটের নাম করে। রাত্রে যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথায় কথায় বলি, রাত্রে একদম ঘুম হচ্ছে না ভাই। সঙ্গে-সঙ্গে কেউ না কেউ বলে—অমুক ওষুধটা খেয়ে দ্যাখ। মন্ত্রের মতো অ্যাকশান, দশটা ভেড়া গোনার আগেই ঘুমিয়ে পড়বি। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ওষুধ জানে। সবগুলোই কার্যকরী। কিন্তু সবগুলোই আংশিক। সকলেই আংশিক ওষুধ নিয়ে আছে।

তিন ফর্মা প্রুফ জমে গেছে—কখন দেখবো জানি না। একেবারে সময় পাই না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো সরু সরু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। সেই সব কটা রাস্তার ট্র্যাফিক আমাকে একা সামলাতে হয়। সবুজ, লাল, হলুদ আলো জ্বলে আমি টের পাই। মাথার মধ্যে একটা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সবসময় ব্যাটন হাতে রাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারই আশপাশে আর

একটা রোগা উদ্‌ভ্রান্ত লোক, ছেঁড়া জামা, তিনদিন দাড়ি কামায় নি— সেই লোকটা বলছে, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। এই ক্ষমাপ্রার্থী নিরীহ লোকটি ও ক্ষুব্ধ পুলিশ অফিসার ঘুরছে আমার মধ্যে, নানান রাস্তা দিয়ে ছুটছে, কখনো হাঁটুমুড়ে বসছে, লুকোচ্ছে— এরা কী নাটক তৈরি করছে জানি না। এরা আমারই মাথার মধ্যে, তবু এদের চিনি না আমি। কখনো বা পুলিশ অফিসারের মতো লোকটা গর্জন করে বলছে, না, ক্ষমা করবো না, ক্ষমা নেই— এই বলে পাছে ক্ষমা করে ফেলে এজন্য ছুটে পালাচ্ছে—আর নিরীহ করুণ লোকটা ক্ষমা করুন, ক্ষমা করতেই হবে বলে তাড়া করছে তাকে। সেই অদ্ভুত দৌড়-প্রতিযোগিতা মাথায় নিয়ে আমি বসে থাকি টেবিলের সামনে, গায়ে ব্যথা, প্রুফ যেমন তেমন পড়ে থাকে, ডানাভাঙা পাখির মতো উল্টানো আদ্দেক শেষ করা বই, ড্রয়ারে আদ্দেক শেষ করা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। ঐ পাগলাটে দৌড়ের জন্য মাথায়ও ব্যথা হয়।

এছাড়া আছে মাধবী। সপ্তাহে তিনদিন মাধবী আসে আমার বাড়িতে, দুপুরবেলা। এখন কলেজ বন্ধ বলে সন্ধেবেলাটা শুধু-শুধু ছাত্রী পড়িয়ে নষ্ট করতে চাই না। তাই ওকে দুপুরেই আসতে বলেছি। শুধু দুপুরবেলাটুকু ও থাকে— কিন্তু আমাকে ব্যাপৃত রাখে সারাদিন। যেদিন দেখা হয়—সমস্ত দিনটা মাধবীর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। অতিকষ্টে তবু বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দুপুরবেলাটা ছিনিয়ে নিয়েছি। আমার বাড়িতে যে যখন ইচ্ছে আসে, আমি থাকি বা না থাকি আমার ঘরে এসে আড্ডা মারে। মাকে ডেকে চায়ের হুকুম করে। বন্ধুরা বসে থাকবে বলে আমাকে সবসময় তাড়াতাড়ি ফিরতে হয় বাড়িতে। বলতে গেলে আমার স্বাধীন সময় কিছুই নেই। প্রত্যেকে আলাদাভাবে আড্ডা মারতে আসে আমার সঙ্গে—কিন্তু আমার কোনো নির্বাচনের অধিকার নেই। কারণ আড্ডার জায়গা আমার বাড়ি। অনেকে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমার বাড়িতে। কেউ হয়তো এসে বললো, ওমুক এসেছে? বললুম, না। সে বসে রইলো, বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলো। খানিকটা বাদে ওমুক এসে বললো, আরে তুই কতোক্ষণ এসেছিস? আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। খানিকটা বাদে তারা নিজেদের কথা সেরে— তারপর আমার সঙ্গে দু'একটা মুখরাখা কথা বলে, আচ্ছা চলি,—বিদায় নেয়। অতিকষ্টে সবাইকে নোটিশ দিয়ে বলেছি, দুপুরবেলা কেউ আসবে না। দুপুরবেলা আমি একা থাকতে চাই। দুপুরবেলা মাধবী আসে ইতিহাস পড়তে।

টেবিলের ওপাশে বসে যখন আমি ওকে মিউজিয়ামের পাথর বিষয়ে বই-পড়া বক্তৃতা শোনাই, তখন চুপ করে বসে থাকে মাধবী, একটাও শব্দ করে না—খানিকটা বাদে লক্ষ্য করি— ও একটাও কথা শুনছে না আমার, শুধুই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি থেমে যাই, জিজ্ঞেস করি, কী দেখছো?

— ওটা কার ছবি?

তখন বুঝতে পারি—ও আমাকে দেখছে না, দেখছে আমার পিছনের দেয়াল। বলি, সালভাদোর দালি, ছবিটার নাম—জ্বলন্ত জিরাফ।

— ওঃ। আচ্ছা, তারপর বলুন।

কখনো-কখনো শুধুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনো জিজ্ঞেস করি, কি দেখছো?

— আপনাকে।

এরকম পরিষ্কারভাবে কোনো মেয়ে কথা বলে না। অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে কোনো ছাত্রী বলে না, আমি আপনাকে দেখছি। শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে যাই। কিন্তু ছাত্রীদের এসব ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে নেই। তাহলে চাকরি রাখা যায় না। সেইজন্য আমি খানিকটা

নির্বিকারভাবেই বলি, আমাকে কী দেখার আছে? এমন কিছু দর্শনীয় নই। নিয়নডার্থাল স্কাল আমার, লক্ষ করছো?

— তা নয়। আপনাকে আমার একজন চেনা লোকের মতন দেখতে। খুব মিল আছে। সত্যি আপনি অনেকটা অবনীভূষণের মতো দেখতে।

একথা মাধবী আরও কয়েকবার বলেছে। কে অবনীভূষণ আমি জিজ্ঞেস করি নি কখনো। মাধবীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সে কোথায় এখন, বেঁচে আছে কিনা কিছুই জানি না। মাধবী কখনো বলে নি। যেন ওর সঙ্গে আমার একটা লুকোচুরি খেলা চলছে এই নিয়ে। আমিও কিছুতে জিজ্ঞেস করবো না, মাধবীও জিজ্ঞেস না করলে বলবে না। দু'জন মানুষ কখনো একরকম দেখতে হয় না। অবনীভূষণকে আমার মতো দেখতে— অর্থাৎ তার মুখ বা চোয়াল আমার মতো, অথবা তার চোখ, অথবা আমার মতো কোনো ভঙ্গি। কোথাও আমার মতো আর একজন লোক আছে—এই দুশ্চিন্তা আমাকে বিষম বিব্রত করে। লোকটি সম্বন্ধে খুবই কৌতূহল হয়, ঈর্ষা নয়, সে যদি মাধবীর প্রেমিকও হয়, তবুও না। আমি নিজের চিন্তা ভুলে গিয়ে আমারই মতো অন্য একটা লোক, অবনীভূষণ, তার চিন্তায় বিভোর হয়ে যাই। ক্রমশ এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, অবনীভূষণ নিশ্চিতই মাধবীর প্রেমিক—মাধবী যেভাবে নামটা উচ্চারণ করে। লোকটা হয় এদেশে নেই এখন, বা মারা গেছে। মাধবীর মতো ধনীর দুহিতার সঙ্গে যখন প্রেম—তখন সেও নিশ্চয়ই খুব উঁচু বংশের ছেলে। মাধবীর সঙ্গে টেনিস খেলতে খেলতে কিংবা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালাতে-চালাতে কি করে আমারই মতন চেহারার একজন লোক মাধবীকে প্রণয় জানাতো, কি ভাষা ব্যবহার করতো—ভাবতে ভাবতে আমিও একদিন মাধবীর প্রেমিক হয়ে পড়ি। এর আগে, কতো মেয়ের সঙ্গেই তো চেনাশুনো, জানা আরও অনেক কিছু হলো, কিন্তু কখনো কোনো মেয়ের সম্পর্কে আমি এতো বেশি ভাবি নি, বিশেষত ছাত্রীদের সম্পর্কে তো নয়ই। ছাত্রীদের ব্যাপারে আমি কখনো মাথা ঘামাই নি, আগে অনেক সুযোগ এসেছিল, মাধবীর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে— তবুও না, কিন্তু হঠাৎ মাধবী আমার হৃদয়ের তিন ভাগের এক ভাগ দখল করে ফেলেছে। সত্যি, আমি এ ক'দিনে অনেক বদলে গেছি। আমার চিন্তা ও স্বভাবের অনেক বদল হয়েছে। আর, চিন্তার দিক দিয়ে বদলে গেছি বলেই কি আমার চেহারাও বদলে গেছে? কোথাকার কোন্ এক অবনীভূষণের মতন দেখতে হয়েছে আমাকে? রাত্তির বেলা, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমি অবনীভূষণ হয়ে যাই, হয়ে গিয়ে মাধবীর কথা ভাবি। মাধবীর জন্য বিষম মন কেমন করে, নিজেকে অবনীভূষণ ভেবে।

মাধবীর ধরন-ধারণ ঠিক ছাত্রীর মতো নয়, অনেকটা প্রভুপত্নীর মতন। বড়লোকের মেয়ে বলেই বোধহয় একটু দেমাকি স্বভাব। আগে এজন্য ওকে খুব পছন্দ করতুম না। এখন ওর এই অভিজাত ভঙ্গিও আমার খুব ভালো লাগে। আমার সিগারেটের ছাই ঝাড়ার ধরন দেখে একদিন মাধবী বললো, অবনীভূষণও ঠিক এইরকমভাবে ছাই ঝাড়তো। বস্তুত, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ আঙুলে টুস্‌কি মেরে আমিও আগে কখনো ছাই ঝাড়ি নি, আজকেই প্রথম। কী করে এ স্বভাব আমার হলো— তবে কি আমি সত্যিই ক্রমশ অবনীভূষণ হয়ে যাচ্ছি? প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য আমি বানিয়ে বললুম, আমি এ রকম টুস্‌কি মারার কায়দা শিখেছি আমার বন্ধু পরীক্ষিতের কাছ থেকে। তুমি তাকে চেন?

— নাম শুনেছি। লেখেন তো? আপনার বন্ধুদের মধ্যে আমি শুধু অবিনাশ মিত্রকে চিনি, একদিন আলাপ হয়েছিল। খুব চমৎকার লোক।

অবিনাশ কি বিশ্বসুদ্ধ সব মেয়েকে চেনে? অবিনাশের সঙ্গে কবে কোথায় আলাপ হয়েছিল জিজ্ঞেস করতেও ভয় হলো। কি জানি অবিনাশ এর হৃদয়ও রক্তাক্ত করেছে কিনা। না করে নি।

যেরকম আলতোভাবে মাধবী চায়ের কাপে চামচ নাড়ছে—তাতে বুঝতে পারা যায়। এরকম কোমলতা কোনো নারীর আহত থাকে না। আগে মাধবীকে খুব একটা রূপসী মনে হতো না, কিছুটা স্থূল, শরীর থেকে অন্তত দশ পাউন্ড ওজন কমালে ফিগার সুন্দর হবে ভাবতুম, নাকটাও একটু চাপা। ক্রমশ মনে হচ্ছে—ওরকম গ্রীবার লাবণ্য আমি আগে কোনো মেয়ের দেখি নি, ওরকম স্নিগ্ধ অথচ চুম্বকের হাসি। অর্থাৎ মাধবীর প্রতি আমি মায়ায় আবদ্ধ হয়ে গেছি, যাকে বলে ভালবাসা। মনে হয়, মাধবীর দুই বাহু পেলে এ-জীবনে উদ্ধার পেয়ে যাবো। হঠাৎ আজকাল এরকম উদ্ধার পাবার ইচ্ছেই বা কেন মনে জাগছে ?

এছাড়া আর একটা দৃশ্যও আমাকে খুব বিরক্ত করছে আজ কয়েকদিন। ঢালু অন্ধকার রাস্তা, দু'পাশে গাছের সারি, একটা মোটরগাড়ি হেডলাইট জ্বেলে স্পিডে নেমে আসছে। কোনো কিছু লিখতে গেলেই প্রথমে এ দৃশ্যটা চোখে ভাসে। অথচ, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য এটা—কোথায় দেখেছি তাও মনে পড়ে না। অন্ধকার ঢালু রাস্তায় মোটরগাড়ি দু'পাশের গাছের সারির মধ্য দিয়ে তীব্র আলো জ্বেলে নেবে আসছে। কোথাকার অন্ধকার, কোন ঢালু রাস্তা, কে গাড়ির চালক কিছুই জানি না। অথচ দৃশ্যটা তাড়িয়ে দিতেও ইচ্ছে করে না— আপনা থেকে কেন এলো জানতে ইচ্ছে হয়।

সামনে একতাড়া প্রুফ ছড়ানো—আমি মাথার মধ্যে পুলিশ ও ক্ষমাপ্রার্থী, মাধবী, অবনীভূষণ, অন্ধকার ঢালু পথে গাড়ির দৃশ্য নিয়ে চুপ করে বসে আছি। এই সময় পরীক্ষিৎ ও অনিমেষ এলো। অনিমেষ কাল ফিরে যাবে এক ছেলে ও গায়ত্রীকে নিয়ে। আর একটা ছেলে বাঁচে নি। সিগারেটের ছাইয়ের সঙ্গে প্রচুর কথা উড়ে গেল। অনিমেষ শান্ত গলায় থেমে-থেমে পুরোনো দিনের কথা বললো। বললো, ছেলেটাকে শ্মশানে পোড়াতে গিয়ে পুরনো কথা সব মনে পড়লো আবার। বোধহয় বছর চারেক পর শ্মশানে গেলুম।

আগে তো প্রতিদিন সন্ধেবেলা ওখানেই আমাদের আড্ডা ছিল।

এতোদিন পর শ্মশানে গিয়ে অনিমেষের মনটা একটু ভারি হয়ে গেছে মনে হলো। ছেলে মরার জন্য ওর কি খুব দুঃখ হয়েছে! ছেলে মরার পর দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যমজ ছেলের এক ছেলে বেঁচে আছে, একজন মরেছে, সুতরাং একজনের জন্য আনন্দ, আরেকজনের জন্য দুঃখ, কিন্তু কোন্‌টা বেশি ? যাই হোক, অনিমেষকে কিছুটা অন্য কথা বলে ভোলানো দরকার।

আমি বললুম, তোমার মনে পড়ে অনিমেষ, শ্মশানের পাশে আমাদের রাত্রে শুয়ে থাকা ? বগলে ব্র্যান্ডির বোতল, ইঁট বাঁধানো ঢালু গঙ্গার পাড়ে ? কে যেন গান গাইতে-গাইতে গড়িয়ে পড়ে গেল— পরীক্ষিৎ না অরুণাংশু ? ওঃ, গগন, মনে আছে।

— কেন, সেবার সেই দুর্গাপুজোর সময়ে মনে নেই ?

মনে পড়তেই হাসি পেয়ে গেল। অরুণাংশু দুটো হুইস্কির পাঁইট পকেটে নিয়ে ঘুরছে— কোথাও বসে খাবার জায়গা নেই। আমি বললুম, চল, গঙ্গার পাড়ে যাই। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন— কিন্তু গঙ্গার পাড় ভিড়ে ভর্তি। অন্ধকারে জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়ে বসে আছে। আমরা কোথাও আর জায়গা পাই না— ওদের বিরক্ত করতেও ইচ্ছে করে না। শেষ পর্যন্ত বট গাছের নিচে এক সাধুর আশ্রমের কাছে আমরাও সাধু সেজে বসে গেলুম গোল হয়ে। দু'এক চুমুক দেবার পর মনে হলো খানিকটা জল দরকার। সাধুটাকে বললাম। সে বললো, গঙ্গাজীমে ইতনা পানি হায়, পি লেও। তাই নিতাম, কিন্তু তাপসটা খানিকটা শৌখিন— ও কিছুতে গঙ্গার জল মেশাবে না। তখন অরুণাংশু একটা চা-ওলাকে ডেকে চা না কিনে খালি ছ'টা ভাঁড় কিনলো। শুধু ভাঁড় দিয়ে কি করবে দেখার জন্য কৌতূহলী চা-ওলা খানিকটা দাঁড়িয়ে ছিল... হঠাৎ অরুণাংশু জমিদারি কায়দায় তাকে হুকুম করলো, এই চা-ওলা, তোমার কলসিটা রেখে এক বালতি

পরিষ্কার জল নিয়ে এসো তো। লোকটা খানিকটা ইতস্তত করতে— অরুণাংশু বিষম ধমক দিলো, যা— ও! দেখছো কী হাঁ করে? পরীক্ষিৎ গাঁজার খোঁজে সাধুর ঝুলিতে হাত দিয়ে—

— কিরে পরীক্ষিৎ, তোর মনে পড়ে?

পরীক্ষিৎ চুপ করে বসে ছিল। শুকনো হাসি হেসে বললো, হুঁ।

আমি বললুম, কি রে, তোর শরীর খারাপ নাকি?

— না, কিছুটা। ভাবছি অনিমেষের সঙ্গেই বাইরে চলে যাবো। কয়েকদিন ঘুরে এলে ভালো লাগবে। তোর এখানে অবিনাশ আসে?

— না, অনেকদিন আসে নি।

— আমার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল, অনিমেষ বললো, কাল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ওর অফিসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। দু'জনে হাঁটতে-হাঁটতে বহুদূর গিয়েছিলাম— প্রায় খিদিরপুর পর্যন্ত। অনেক কথা বললো অবিনাশ—

— নিশ্চয়ই ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথা? পরীক্ষিৎ বললো।

— না। খুবই আন্তরিক। অনেক বদলে গেছে অবিনাশ। অনেক সরল হয়েছে।

— না সরল না, সরলতার ভান!

— তাতেই বা ক্ষতি কি? ভান করতে করতে কেউ যদি সত্যিই সরল হয়— তাও কম নয়। নিষ্ঠুরতার ভান করার চেয়ে তা অনেক ভালো।

— ওকি বুঝেছে যে, ও সারাজীবনে যত পাপ করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে?

— পাপ কথাটা অত সহজে উচ্চারণ করিস না, পরীক্ষিৎ। কোনো মানুষ যদি নিজেকে সত্যিকারের পাপী মনে করে, তবে তার পক্ষে আর বেঁচে থাকাই মুশকিল।

— হঠাৎ অবিনাশকে নিয়ে এতো কথা কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— আমার অবিনাশকে দরকার, পরীক্ষিৎ বললো, ওর সঙ্গে আমার কয়েকটা অ্যাকাউন্ট মেটাতে হবে।

অনিমেষ পরীক্ষিতের দিকে তেরছাভাবে তাকায়। তারপর আচমকা প্রশ্ন করে, তুই কেমন আছিস রে পরীক্ষিৎ?

পরীক্ষিৎ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না। চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করে, কেন, হঠাৎ একথা?

— কী রকম যেন মনে হচ্ছে, তুই কিছুদিন ধরে মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নিয়ে আছিস্।

— কষ্ট? না, মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নেই। তবে মাথায় যন্ত্রণা হয় মাঝে-মাঝে। সেই যে তোর ওখানে মাথায় লেগেছিল।

— ওঃ, সেই অ্যাকসিডেন্টের কথা ভাবলেও এখন ভয় হয়! ওরকমভাবে ব্রিজ থেকে পড়ে গেলে কেউ—

— ওটা মোটেই অ্যাকসিডেন্ট নয়। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।

— আত্মহত্যা? যাঃ! বেশ তো রেলিংয়ের ওপর বসে-বসে গান গাইছিলি, যাঃ, ওভাবে কেউ আত্মহত্যা করে? কেন, আত্মহত্যা করবি কেন?

— এখন তো করতে চাই না। সেদিন চেয়েছিলাম।

— কেন?

— আজ আর কারণটা মনে নেই। তবে, সেদিন মনে হয়েছিল, আর এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাই না।

আমি চুপ করে অনিমেষের আর পরীক্ষিতের কথা শুনছিলাম। পরীক্ষিতের কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললুম, তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? কিন্তু, অবিনাশ যে অন্যকথা বলে।

— কী বলে অবিনাশ ?

— অবিনাশ তো বলে, ও-ই নাকি হঠাৎ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তোকে ?

অনিমেষ চমকে উঠে বললো, অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেবে ? যাঃ, আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া অবিনাশ তো তখন কাছাকাছি ছিলই না। ও তো সিগারেট কিনতে গিয়েছিল।

— তোমার মনে নেই। সিগারেট তো কিনতে গিয়েছিল তাপস ! অবিনাশ নাকি—

পরীক্ষিৎ গম্ভীরভাবে বললো, অবিনাশ বলে নাকি এই কথা ? অবিনাশ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ? কেন ? সে একথা বলেছে ?

— জানি না। তোর আর অবিনাশের মধ্যে কী যে ব্যাপার আছে। যাক্ গে, তোর মাথায় এখনো ব্যথা করে, তুই ডাক্তারের কাছে যা না।

— যাবো। কিছু টাকা ধার দিবি ?

— ঐ-তো ! কিছু একটা ভালো কথা বললেই অমনি টাকা ! দরকার নেই তোর ডাক্তারের কাছে যাবার।

— দে না। ক'টা টাকা ধার দেনা। বড়লোকের মেয়েকে পড়াচ্ছিস্, তোর অনেক টাকা।

—ধার বলিস কেন ? কোনোদিন টাকা নিয়ে ফেরত দিয়েছিস্ ? ভিক্ষে চাইতে পারিস না ?

ঠিক এই সময় অবিনাশ ঢুকলো আমার ঘরে। শান্ত মুখমণ্ডল। অবিনাশকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হলো—ওর কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে। ও যখন মাধবীকে চেনে তখন হয়তো অবনীভূষণকেও।

অবিনাশকে দেখেই পরীক্ষিৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'তোকে আমি এক মাস ধরে খুঁজছি।'

অবিনাশ ওর বিশাল চেহারাটা নিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। পরিষ্কার দাড়ি কামানো, ওর কপালের কাছে কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে। অবিনাশকে আমি পছন্দ করি ওর স্পষ্ট চোখ দুটোর জন্য। কতরকম বদমাইশি করে অবিনাশ, কিন্তু ওর চোখে কোনো গ্লানি থাকে না। চৌরঙ্গিতে চারটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের সঙ্গে যখন মারামারি করেছিল—তখনও ওর চোখ যে-রকম, কোনো মেয়ের সঙ্গে যখন সর্বনাশের ভূমিকা করে তখনও চোখ একরকম।

পরীক্ষিৎ ও অবিনাশ দরজার আড়ালে গিয়ে কিছু বলাবলি করতে লাগলো। আমি ও অনিমেষ চুপ। পরীক্ষিৎ আস্তে-আস্তে কী বললো, শোনা গেল না। অবিনাশ শান্তভাবে বললো, না। পরীক্ষিৎ আবার অস্ফুট গলায় কিছু বললো, অবিনাশ পুনরায় শান্ত গলায়, না।

পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে বললো, আমি তোর সর্বনাশ করে দেবো। অবিনাশ বললো, আমি তো সর্বস্বান্ত, আমার আবার সর্বনাশ কী হবে ?

অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি করে আমি বললুম, ও দুটো কি করছে ? অনিমেষ উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলো। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য লাগছে। মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে হেমকান্তির অসুখ দেখতে গিয়েছিলাম। হেমকান্তি হয়তো আর বাঁচবে না। সেদিনও, ঘরের মধ্যে গায়ত্রী হঠাৎ অবিনাশকে দেখে থমকে গেল। কঠিন গলায় বললো, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। অবিনাশ আলতোভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, বলো, কিন্তু যত ভয়ঙ্কর কথাই হোক, রাগ করে বলতে পারবে না, হাসতে-হাসতে বলো। গায়ত্রী আমার দিকে তাকালো। কী অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে তখন গায়ত্রীর চোখ। কোনো কারণে ও খুবই রেগে আছে। অবিনাশ আমাকে বলেছিল, তুই একটু বাইরে যা।

ওদের কী এমন কথা ছিল, যা আমার সামনে বলা যায় না ? বন্ধুরা সবাই ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। এখন সবারই আপন কথা বাড়ছে।

খানিকটা বাদে অনিমেষ উঠে গেল ওদের কাছে। একটু পরে তিনজনেই ফিরে এলো ঘরে। অবিনাশের চোখ আগের মতোই অবিচলিত, পরীক্ষিতের মুখ ও চোখ লাল, অনিমেষের চোখ হলুদ। 'হলুদ চোখ'—একথার কী মানে হয় জানি না—কিন্তু পরীক্ষিতের চোখ লাল দেখার পর অনিমেষের চোখ স্বাভাবিকভাবেই হলুদ মনে হলো। দুর্বোধ্যতার রঙ হলুদ। ফুলের মধ্যে যেগুলোর রঙ হলুদ, সেগুলোই অপদার্থ। দুর্বোধ্যতা ফুলের মানায় না।

অবিনাশ ঠাণ্ডাভাবে পরীক্ষিতের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলো, পরীক্ষিৎ—। সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চটাং করে এক থাপ্পড় কষালো অবিনাশের গালে। অনিমেষ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো—আমি হাততালি দেবার জন্য তৈরি হলাম। দু'জনেই বেশ তেজী—মারামারি হলে জমবে ভালো। থাপ্পড় খেয়ে অবিনাশের মুখ নীল হয়ে গেল। তারপর অবিনাশ একটু হাসলো। বললো, এটা হয়তো আমার পাওনা ছিল। কিন্তু তোর জন্য আমার দুঃখ হয় পরীক্ষিৎ।

বা—তোর শাস্তি,— ইত্যাদি কিছু বলে পরীক্ষিৎ আর একটা থাপ্পড় মারার জন্য রেডি হতেই আমি ওকে ধরলাম। কি পাগ্‌লামি করছিস ? তোদের ব্যাপারটা কি ?

— কিছু না। তুই এর মধ্যে থাকিস না শেখর।

— কেন আমি থাকবো না ?

— বলছি, তুই এর মধ্যে থাকিস না। তুই সব ব্যাপার জানিস না।

— আচ্ছা থাকবো না, কিন্তু উল্টে অবিনাশ একখানা ঝাড়লে তোর দাঁত-ক'খানা আস্ত থাকবে ?

— ওকে ছেড়ে দে শেখর, অবিনাশ বললো—যদি মারতে চায় মারুক। সব আঘাতেরই যে প্রতি-আঘাত দিতে নেই, আমি এখন এই কথা শিখছি। রাগ আর ঈর্ষাই হলো পরীক্ষিতের ধর্ম। রাগ আর ঈর্ষা থেকেই পরীক্ষিৎ ওর বিখ্যাত লেখাগুলো লেখে। তাছাড়া ও বাঁচতে পারে না। ওকে থামিয়ে লাভ কি ?

পরীক্ষিৎকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। রেগে গেলেই পরীক্ষিৎকে সুন্দর দেখায়—তখন ওকে মনে হয় অসহায়। ওর দর্প ও অহঙ্কার কোথায় লুকোয়—করুণ মুখখানি ফুটে ওঠে। কি নিয়ে রাগারাগি তা আমি বুঝতে না পারলেও পরীক্ষিতের জন্য আমার দুঃখ হলো। যে পরীক্ষিৎ সবসময় বন্ধুত্ব কিংবা সঙ্ঘবদ্ধতার কথা বলে, হঠাৎ অবিনাশের কথা বলে, হঠাৎ অবিনাশের ওপর ওর এত ক্রোধ কেন, কি জানি।

— কাল তোর সঙ্গে যখন আবার দেখা হবে পরীক্ষিৎ, আমি সব ভুলে যাবো।—অবিনাশ আবার বললো, তুই সব কাজ করিস অত্যন্ত ভেবেচিন্তে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে। কিন্তু আমার সব ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন, সেইজন্যই অনুতাপহীন।

— এইভাবেই জীবনটা চালাবি ?

— জীবন মানে তো পঞ্চাশ কি ষাট-সত্তর বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া ? যার যে রকম ইচ্ছে, সে সেইরকম কাটিয়ে যাবে। যতই চেষ্টা করিস্—সত্তর, আশি, বড়জোর একশো বছর বাদে চলে যেতেই হবে—আর ফেরা হবে না। পাপপুণ্য যাই হোক—চামড়া শিথিল হবেই, চোখে ছানি পড়বেই, যৌনশক্তিও হরণ করে নেবে সময়। সুতরাং এই কটা বছর আমি প্রতি মুহূর্তের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে চাই। কেউ জুয়া খেলে সময় কাটায়, কেউ কবিতা লিখে—কোন্‌টা ভালো বা বড় কেউ জানে না—যার যেটাতে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুবিধে। কিন্তু সাহিত্য কিংবা শিল্পের জন্য আত্মত্যাগ কিংবা নিজেকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ বোকাদের কাণ্ড। জীবনটা নষ্ট করে অমরত্বের লোভ—মাইরি, ভাবলে হাসি চাপতে পারি না ! তিরিশ বছর কেটে গেছে—আর তিরিশ কি চল্লিশ বছরের ভিসা আছে এখানে থাকার। তারপর চলে যেতেই হবে—আর

ফেরা যাবে না। কিছুতেই আর এখানে ফেরা যাবে না—মৃত্যুর পর তোর বইয়ের আর ক'টা এডিশান হলো, কিংবা ইউনিভার্সিটিতে কি থিসিস লেখা হলো—ফিরে এসে দেখতে পারবি না। একটাই জীবন, সেটাতে আমি প্রতি মুহূর্ত বাঁচতে চাই।

পরীক্ষিৎ স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে ছিল অবিনাশের দিকে। এই দীর্ঘ বক্তৃতা ও এতক্ষণ ধরে কী করে শুনলো। কে জানে, অবিনাশও এরকম ঠাণ্ডাভাবে তো কোনো কথা বলে না। ওদের কিছু হয়েছে বোধহয়।

অনিমেষ খুব আস্তে-আস্তে বললো, কথাটা আপনি এমনভাবে বললেন যেন খুবই নতুন এবং নিজস্ব। তা কিছু নয়।

— কিন্তু আমার জীবনটা আমার নিজস্ব। সেটা আমার মত অনুযায়ীই চলবে আশা করি। অবশ্য, যদি না হঠাৎ জেলে আটকে রাখে। আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই।

অনিমেষ একটু হাসলো। তারপর বললো, জেলে আটকে রাখবে কেন ? অবিনাশবাবু, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি যদি আপনার মতন হতে পারতাম।

— আমার মতন মানে ? আমার মতন কি ? আমি তো কিছুই হই নি। লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়েছি। বিশেষ কোনো কাজকম্মও করি না। আমার মতন আবার হবার কী আছে ?

— তবু, আপনার এই যে হাল্কাভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা, আমার বড় ভালো লাগে। যখন যা ইচ্ছে তাই করা, জীবন সম্পর্কে আপনার কোনো ভয় নেই, ভয় নেই বলেই আপনার মুখখানা খুব সুন্দর। যখন যে-কোনো মেয়েকে দেখলেই আপনার ছুঁতে ইচ্ছে করে, ভোগ করতে ইচ্ছে করে, আপনি চেষ্টাও করেন তৎক্ষণাৎ কিছু না ভেবে—জানেন আমি এগুলো একদম পারি না, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমারও এ রকম ইচ্ছে। কিন্তু পারি না।

অবিনাশ হাসতে-হাসতে বললো, আসুন, আপনার সঙ্গে আমার জীবনটা বদলা-বদলি করি।

অনিমেষ ব্যগ্রভাবে বললো, করবেন ? সত্যি যদি করা যেতো। আমি হঠাৎ বিয়ে করে জড়িয়ে গেলাম—মফস্বলে চাকরি। একদম ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে কলকাতায় থেকে আপনার কাছে ট্রেনিং নিই।

পরীক্ষিৎ বললো, মেয়ে পটানো ছাড়া ও আর কি বিষয়ে ট্রেনিং দিতে পারবে ?

অনিমেষ বললো, সেটাই বা মন্দ কি। একটা কিছু পাবার চেষ্টা তো বটে। আচ্ছা অবিনাশবাবু, কোনো মেয়েকে পাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে কেমন লাগে ? আমার এ অভিজ্ঞতাও নেই। আমার প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়, তাকেই বিয়ে করেছি। ও ব্যাপারটা বুঝতেই পারলুম না।

কিছু একটা যেন বলা দরকার, এই জন্যই আমি বললাম, এখনো সময় যায় নি। আফসোসের কিছু নেই। কথাটা বলার পরই আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লুম আবার।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কিসের সময় যায় নি ?

আমি অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ও কী প্রশ্ন করছে বুঝতে পারলুম না। অনিমেষ রোগা-রোগা তীক্ষ্ণ মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর চোখের চাহনিতে প্রশ্ন। কিসের সময় যায় নি ?

এ প্রশ্ন আমিও ওকে জিজ্ঞেস করলুম, কিসের সময় যায় নি ?

—বাঃ, তুমিই তো আমাকে একথা জিজ্ঞেস করলে ?

—আমি জিজ্ঞেস করলুম, সময় গেছে কী যায় নি ? তোমায় ? কেন ? কি মুশকিল—

অবিনাশ হা-হা করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললো, কি রে শেখর, তুই ঘুমোচ্ছিস্ নাকি ?

—কেন, ঘুমোবো কেন ?

—তুই আগের কথা কিছু শুনিস্‌ নি বুঝি ?

—আগের কথা তো তোরা কিছুই বলিস নি আমাকে। যেটুকু বলেছিস, সেটুকু শুনবো না কেন ? কিন্তু ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন, কিসের সময় যায় নি ? সময় আবার কিসের কি ? সময় কি তোর কিংবা আমার, আলুপটলের কিংবা মানুষের—এরকম হয় নাকি? আমি বলেছি, এখনো সময় যায় নি, তার আবার কিসের কি ? সময় যায় নি, সময় যায় নি, ব্যস ফুরিয়ে গেল ! আমার কি চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে ? সুতরাং সময় যায় নি—

অবিনাশ উদাসভাবে বললো, শেখরের মেজাজটা আজ খারাপ হয়েছে। চল্‌ কেটে পড়ি—সত্যিই হয়তো আমি ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না। চোখের সামনে প্রুফ, মাথার মধ্যে ক্ষমাপ্রার্থী আর পুলিশের লুকোচুরি, ঘরের মধ্যে তিন বন্ধুর বকবকানি—এসব কিছুতেই আমার মন লাগছে না, এক একবার বিদ্যুতের মতন মনে ছায়া ফেলে যাচ্ছে—একমাথা কোঁকড়া চুলসুদ্ধ মাধবীর মুখ—সেই মুখও বেশিক্ষণ থাকছে না, তারপরই মনে হচ্ছে, আমি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কি সুন্দরভাবে আমার চুল আঁচড়ানো, বোধহয় ক্রিম মেখেছি—আমার মুখের চামড়া এমন চকচকে, আমার গায়ে একটা হাল্কা সিল্কের শার্ট, আমি জামার হাতায় বোতাম পরাচ্ছি। এ কে ? আমি, না অবনীভূষণ ? আপনাকে অবনীভূষণের মতন দেখতে ? ওঃ ! ড্যাম ইট ! হু দা হেল ওয়াজ অবনীভূষণ ? আমি কেন অবনীভূষণের মতন দেখতে হবো ? অথবা, আমাকে দেখে কেন অবনীভূষণের কথা মনে পড়বে ? আমার নিজেরই বারবার মনে পড়ছে অবনীভূষণের কথা। নিজের কথা ভাবতে পারছি না, অবনীভূষণের কথা মনে পড়ছে আমার। ড্যাম ইট ! আমাকে ভুলতে হবে এসব। আমার রাত্রে ঘুম চাই। আমাকে ভুলতে হবেই এসব কথা, অর্থাৎ আমার নিজের মুখও আমায় ভুলতে হবে—মাধবী-ফাধবী সকলের কথা আমায় ভুলতে হবে। গগনেন্দ্র একটা নেশার কথা বলেছিল, কালো রঙের সন্দেশ—সন্দেশের মধ্যে কী যেন মেশানো থাকে—দুটো সন্দেশ খেলেই পাঁচ-ছ ঘণ্টার মতো আর কিছু মনে থাকে না। গগন খেয়ে দেখেছে—একবার গেলে হয় গগনের কাছে। পরীক্ষিৎ অবিনাশরা এখন বিদায় হলেই বাঁচি।

ওরা এখনো সেই প্রেম-ফ্রেম নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে। এখনো বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেল ! যার যা ইচ্ছে করুক না গিয়ে—তাই নিয়ে অত আলোচনা করার কি আছে ? অনিমেষটা মহা ন্যাকার মতন তখনও অবিনাশকে জিজ্ঞেস করছে, বলুন না, কোনো মেয়ে প্রত্যাখ্যান করলে বুকের মধ্যে কি রকম লাগে ?

পরীক্ষিৎ বললো, অবিনাশ এ পর্যন্ত কোনো মেয়ের কাছে হার মানে নি। একবার যার ওপর চোখ ফেলেছে—তার আর নিস্তার নেই, শালা এমন শয়তান—

অনিমেষ বললো, যাঃ, তা কখনো হতে পারে না। এত মেয়ের সঙ্গে কাণ্ডকারখানা চললে—একবার না একবার আঘাত পেতেই হবে। সব মেয়েই কি অমনি রাজি হয়ে যায় ?

পরীক্ষিৎ বললো, তুই অবিনাশকে চিনিস না। ওকে কোনো ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকতেই দেওয়া উচিত নয়। ও যে বাড়িতেই যাবে, সে বাড়িতে যে-কোনো মেয়ে থাকলেই ... সম্পর্ক যাই হোক না।

অনিমেষ মাথায় চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে চিরুনির মতো চালিয়ে বললো, আমি কিন্তু জানি, অন্তত একটি জায়গায় অবিনাশ হেরে গিয়েছিল। একটি মেয়ে অবিনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয় নি।

অবিনাশ চুপ করে সিগারেট টানছিল, এবার মুখ তুলে তাকালো। আমার অধৈর্য লাগছিল,

এরা গেলে বাঁচি ! তবু আমি অনিমেষকে বললুম, অবিনাশ কোথায় ব্যর্থ হয়েছে, তা তুমি জানলে কী করে ?

অনিমেষ বললো, হ্যাঁ, জানি। অন্তত একটি মেয়ের কাছেও যে অবিনাশ ব্যর্থ হয়েছে, আমি সে কথা জানি।

অবিনাশ এবার বললো, এসব কি হচ্ছে কি ? একটা কেন, আমি বহু মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। বলতে গেলে আমি সব মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। কারুর কাছেই কি কিছু পাই নি। মেয়ের দেবার কিছু নেই। সব গুজব।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, অবিনাশ, তুই মেয়েদের কাছে কী চেয়েছিস রে ? যে ব্যর্থ হয়েছিস ?

অবিনাশ বললো, কী চেয়েছি, তা জানি না। তবে প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, চেয়েছিলাম নাক, পেলাম তার বদলে নরুণ।

—তার মানে ? ঠিক ঠিক মেয়ের সঙ্গে তোর এখনো দেখা হয় নি।

—তুই যদি তেমন মেয়ের দেখা পেয়ে থাকিস্, তাহলেই ভালো। যাকগে ওসব কথা, অনিমেষবাবু, আপনি যা জানতে চাইছিলেন, তার উত্তরে শুনে রাখুন, অনেক-অনেক মেয়ের কাছেই— নেহাৎ শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে গিয়েই আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরীক্ষিৎ যা বলছে তা বাজে কথা—আসলে, বেশির ভাগ মেয়েই আমাকে পছন্দ করে না। কেউ কেউ একবারের বেশি দু'বার আর পছন্দ করে না।

পরীক্ষিৎ উঠে দাঁড়ালো, সোজা এগিয়ে এলো অবিনাশের সামনে, তারপর রুক্ষ গলায় বললো, হারামজাদা— সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষিৎ অবিনাশের ঠিক মুখের ওপর একটা প্রবল ঘুষি চালালো, অবিনাশের নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে এলো রক্ত, অবিনাশ উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি আর অনিমেষ ওদের মাঝখানে দাঁড়ালুম।

অবিনাশ রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো, আমাকে বললো, আমার হাত ছেড়ে দে। আমি পরীক্ষিৎকে কিছু বলবো না। ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না। রাস্তার একটা লোকও এরকম করলে এতোক্ষণে তার মাথা ফাটিয়ে দিতুম, কিন্তু পরীক্ষিৎটা নেহাৎ বোকা বলেই ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না।

পরীক্ষিৎ তখনো গজরাচ্ছিল—আমার খুবই অস্বাভাবিক লাগছিল পরীক্ষিতের ব্যবহার। এরকম শিশুর মতন রাগ দেখাচ্ছে কেন ? কী করেছে ওর অবিনাশ ? আমি জিজ্ঞেস করলুম, পরীক্ষিৎ, তুই এমন পাগলের মতন রাগ করছিস কেন ?

পরীক্ষিৎ গর্জন করে উঠলো, ঐ জোচ্চোর মিথ্যুকটাকে একদিন আমি শেষ করে দেবো বলে দিচ্ছি।

—কি মিথ্যে কথা বলেছে অবিনাশ ?

—ও কেন বলেছে, ও আমাকে ব্রিজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল ! কী ওর মতলব ?

—সত্যি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলে নি ? কী রে অবিনাশ ?

অবিনাশ তখনো মুখ মুছছিল, কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো। পরীক্ষিৎ বললো, মোটেই ও ধাক্কা দেয় নি, ও আমার কাছেই ছিল না। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম !

অনিমেষ বললো, আত্মহত্যার ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক না ? আমার কিন্তু স্পষ্ট ধারণা ওটা একটা দুর্ঘটনা।

আমি অবাক ও বিরক্ত হয়ে বললুম, এসব কী হচ্ছে ! কি গাড়লের কাণ্ড ? আত্মহত্যা, ঠেলে ফেলা, দুর্ঘটনা—যাই হোক না—ব্যাপারটা তো হয়ে গেছে একবছর আগে—তাই নিয়ে এখন

মারামারি করার কি আছে? পরীক্ষিৎ, তোকে যখন অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেয় নি জানিস্, তবু তুই কেন অবিনাশের ওপর রাগ করছিস? তাহলে তো ওর কোনো দোষই নেই।

— ও বলছে কেন ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ও মিথ্যে কথা বলছে কেন? ওর কিছু একটা মতলব আছে এ ব্যাপারে। আমি সেটা জানতে চাই।

অনিমেষ বললো, দু-একটা মিথ্যে কথা বলার অধিকার সবারই আছে। অবিনাশই বা কেন মাঝে মাঝে দু'একটা মিথ্যে কথা বলবে না? এতে রাগের কী আছে?

অবিনাশ আবার হাসলো। এবার সরাসরি পরীক্ষিৎকে বললো, পরীক্ষিৎ, আমি কি দুটো একটা মিথ্যে কথাও বলতে পারবো না—এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম নাকি তোর কাছে? তুই মাঝে-মাঝে দু-একটা মাত্র সত্যি কথা বলতে পারিস্, আমিই বা তাহলে ঠেলে ফেলার মিথ্যে কথাটা বলতে পারবো না কেন? মুশকিল হচ্ছে তোর সত্যি কথাও সবাই মিথ্যে বলে মনে করে। আসলে তুই কি বলতে চাইছিস্, অনিমেষের ওখানে গিয়ে আমি ওর বউ গায়ত্রীর সঙ্গেও কিছু একটা করেছি।

আমি চমকে উঠলুম। অবিনাশের মুখ ভাবলেশহীন। এই কথাটা আমি অন্য কোথাও শুনলে হয়তো হেসে উঠতুম কিংবা একটা অশ্লীল ইয়ার্কি করতুম, কিন্তু যেহেতু আমি নিজের বাড়িতে বসে আছি এবং নিজের বাড়িতে সকলেই কিছু না কিছু সংরক্ষণশীল, তাই আমি বললুম, ছি, ছি, এসব কী বলছিস অবিনাশ? তোর মুখে কিছুই আটকায় না?

অবিনাশ অবিচলভাবে বললো, কেন, এতে দোষের কি আছে? মুখের কথা তো। গায়ত্রীতো আর শুনছে না?

অনিমেষও বিচলিত হয় নি। সে বললো, আপনি কী করে জানলেন পরীক্ষিৎ একথাটাই বলতে চাইছে।

অবিনাশ বললো, পরীক্ষিতের ব্যবহারে তাই তো স্পষ্ট বোঝায়। অনেকদিন থেকেই ও এরকম একটা কথা বলতে চাইছে।

অনিমেষ বেশ সহাস্য মুখে বললো, এসব কথা নিয়ে বন্ধুবান্ধবরা আলোচনা করে নাকি? মনে করুন, যদি ব্যাপারটা সত্যিও হয়, তাহলেই বা পরীক্ষিৎ সেটা বলার জন্য ব্যাকুল হবে কেন? আমি বুঝতে পারছি না—আপনারই বা এত মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কেন, আর পরীক্ষিতেরই বা সত্য প্রকাশ করার এত ব্যাকুলতা কিসের?

অবিনাশ বললো, সেইটাই তো আমিও বুঝতে পারছি না। আমি মিথ্যে কথা বলি এমনিই, সখ করে, কিন্তু পরীক্ষিতের তো সত্য কথা বলার শখ কোনোদিন ছিল না।

পরীক্ষিৎ এবার গম্ভীরভাবে বললো, না ও কথা আমি বলতে চাই নি মোটেই। ওসব কথা আমি কখনো ভাবিই নি। এটাও অবিনাশের আর একটা ধাপ্পা। হঠাৎ কেন একথা বললো, কে জানে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি চেঁচিয়ে বললুম, গেট আউট, সবাই এক্ষুনি গেট আউট। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার মাথা ধরেছে তখন থেকে—আর তোরা এখানে বসে ইয়ার্কি মারছিস। বিদায় হ এখন, ওফ্!

অবিনাশ বললো, দাঁড়া না, পরীক্ষিতের সমস্যাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক্। পরীক্ষিৎ কি চায় সেটা দেখাই যাক্ না। আমি যতই সরলভাবে বাঁচতে চাইছি, পরীক্ষিৎ ততোই আমায় জড়াতে চাইছে কেন, কে জানে।

আমি বললুম, মীমাংসা করতে হয়, ময়দানে যাও। আমার ঘরে এসে ওসব ধাঁধা-মার্কা কথাবার্তা চলবে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে–সঙ্গে আমি ওদের কথা ভুলে গেলাম। সঙ্গে–সঙ্গে আবার ফিরে এলো মাধবী এবং অবনীভূষণের ব্যাপার। এগুলোও ভুলতে হবে। আমি উঠে জামাটা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম গগনেন্দ্রর খোঁজ করতে।

সেদিন সন্ধেবেলা খুব বৃষ্টি, অনেকদিন পর বৃষ্টিতে ভিজে বেশ ভালো লাগছে, মাথার মধ্যটা পরিষ্কার, মনে হচ্ছে মাথা ধরাটাও সেরে গেছে। আর, এমন ঝরঝরে লাগছে শরীর, এই শরীর নিয়ে সন্ধেবেলা আমি কী করবো ? একটা কিছু করা দরকার। আর যাই করি, কোনো বন্ধু–বান্ধবের ছায়াও মাড়াতে চাই না আজ। বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গ অসহ্য লাগছে। ছায়াদির বাড়িতেও যাওয়া যাবে না, ওখানে গেলেও কারুর না কারুর সঙ্গে তো দেখা হবেই। বারীনদার ওখানে গিয়ে তাস খেলারও সেই অসুবিধে—ওখানে তো অবিনাশ থাকবেই।

শরীরটা ছটফট করছে। কিছুক্ষণ বৃষ্টির মধ্যেই ছপছপ করে হাঁটলাম। চৌরঙ্গির রাস্তাটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে—ঘণ্টাখানেক ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই পথে একজনও পথচারী নেই, আমি ছাড়া, গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে শুধু, আর কালো পিচঢালা রাস্তায় আমি একা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে, আমি চুপচাপ করে হাঁটছি। আঃ, এত ভালো লাগছে, একাকিত্ব এত সুন্দর, এমন উপভোগ্য—আগে কখনো ভাবি নি। মিথ্যে–মিথ্যে কি বিশ্রী হুল্লোড়ে সময় কাটিয়েছি। এক একটা রাত অবিনাশ, তাপস, গগনেন্দ্র, পরীক্ষিতের সঙ্গে—মল্লিকা কিংবা রমলার ঘরে—ওসব কথা আর ভাবতেও ভালো লাগে না।

মাধবীকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে না ? মাধবীকে কোনোদিন টেলিফোন করি নি, সন্ধেবেলায় মাধবীকে কেমন দেখতে লাগে—তাও তো দেখি নি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুধু দুপুরবেলা। মাধবীর সঙ্গে অরুণা আর চিত্রলেখা নামে আরও দুটি মেয়ে পড়তে আসতো আমার কাছে—যতদিন ওরা তিনজন ছিল—ততদিন ওরা শুধু ছাত্রীই ছিল, কোনোদিন ওদের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখি নি, এমনকি কোনো মাসে টাকা দিতে দেরি করলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছি পর্যন্ত। তারপর চিত্রলেখার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, অরুণার বাবা বদলি হলেন দিল্লীতে, তখন মাধবী একা, সেই একা মাধবীর দিকেই আমি প্রথম চোখ তুলে তাকালাম। মাধবী একা একা আমার কাছে আসেই বা কেন ? অমন বড়লোকের মেয়ে, ইচ্ছে করলে বাড়িতেই তিনটে প্রফেসার রাখতে পারে, তবু দুপুরবেলা, একা, আমার মতো ছোকরা মাস্টারের কাছে আসে কেন ? তার কারণ কি, আমাকে অবনীভূষণের মতন দেখতে, সেইজন্য ?

আঃ, আবার অবনীভূষণ ! না, আমি অবনীভূষণের কথা কিছুতেই ভাবতে চাই না।

পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে সোজা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, একটা টেলিফোন করতে দেবেন ?

ম্যানেজারটা চিৎকার করে বললো, করছেন কি, করছেন কি ! সারা গা দিয়ে জল পড়ছে, আমার কার্পেটটা ভিজিয়ে দিলেন যে।

দোকানে বেশি ভিড় নেই, সত্যি কার্পেটটা অনেকখানি ভিজে গেছে, আমি একটু অপ্রতিভভাবে বললুম, হ্যাঁ, খুব ভিজে গেছি। একটা জরুরি টেলিফোন—

— টেলিফোন পরে করবেন। আগে গা মুছে ফেলুন। বেয়ারা, সাবকো একঠো টাওয়েল দো—।

বেয়ারা একটা ধপধপে টাওয়েল নিয়ে এলো। আমি কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লুম। পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাংলা কথা বলবে তাই–ই আশা করি নি, তার ওপর এমন সহৃদয়তা। অনায়াসে আমাকে বার করে দিতে পারতো। কিছুদিন আগে এই

দোকানেই তো অবিনাশ এক মাড়োয়াড়ি দলের সঙ্গে হাতাহাতি করেছিল। আমিও দলে ছিলাম। ম্যানেজার আমাকে চিনতে পারে নি। আমি ওকে প্রকৃত ধন্যবাদ জানিয়ে এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে টেলিফোন ডিরেকটারিটা নিলাম। যাঃ চলে, মাধবীর তো বাবা মারা গেছেন জানি, তাহলে টেলিফোনটা কার নামে ? মাধবীর নামে নিশ্চয়ই নয়। ওর মা কিংবা বাবার নামে যদি হয়— জানার উপায় নেই। তবে ওদের বাড়ির ঠিকানা জানি। ইনফরমেশনের ডায়াল ঘুরিয়ে মাধবীদের বাড়ির ঠিকানা বলে টেলিফোন নম্বর জানতে খুব অসুবিধে হলো না।

মাধবীদের নম্বর ঘোরালাম। ওদিকে একজন পুরুষ কণ্ঠ।—বলুন ?

আমি কোনো দ্বিধা না করে বললুম, মাধবীকে ডেকে দিন।

লোকটি যদি জানতে চাইতো কে টেলিফোন করছে—তাহলে কি বলবো আমি ভেবেই রেখেছিলাম। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করলো না, বললো, ধরুন।

তারপর ধরেই রইলাম। বহুক্ষণ, কেউ আর আসে না। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ছেড়ে দেবো কিনা ভাবছিলাম, তখন মাধবীর গলা পেলাম, হ্যালো ? কে ?

— মাধবী, আমি মাষ্টারমশাই কথা বলছি।

মাধবী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করলো, কোন্ মাষ্টারমশাই ?

— তোমার ক'জন মাষ্টারমশাই আছেন ?

— উপস্থিত তিনজন, ছেলেবেলা থেকে হিসেব করলে দশ-বারোজন হবেন নিশ্চয়ই।

— তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ?

— উঁহু।

— আমি তো গলার আওয়াজ শুনেই তোমায় চিনতে পেরেছি।

— কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমি কখনো টেলিফোনে কথা বলি নি, তাই চিনতে পারছি না।

— মাধবী, তুমি কী করছিলে ?

— সাজগোজ করছিলাম। এক্ষুনি সিনেমা দেখতে বেরুবো।

— কার সঙ্গে ?

— তা আপনাকে বলবো কেন ?

— ও—

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। আর কোনো কথা কি বলার আছে ? মাধবীই প্রশ্ন করলো, কোনো দরকারী কাজের কথা ছিল ?

— হ্যাঁ। মাধবী, অবনীভূষণ কে ?

— এইজন্য আপনি ফোন করছেন ? আচ্ছা পাগল তো !

মাধবী হাসলো। জলের মধ্যে কুলকুচো করার মতন টেলিফোনের সেই হাসির আওয়াজ।

আমি তবু বললুম, হ্যাঁ, একথাটা জানা আমার খুবই দরকার। অবনীভূষণকে আমি একবার চোখে দেখতে চাই। সে কোথায় আছে ?

— এক্ষুনি তা শুনতে হবে ? কেন ? কাল দুপুরে যাবো, তখন বলবো। এখন ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যাঁ ?

— কেন, ছেড়ে দেবে কেন ? আরও কথা আছে —

— টেলিফোনে আপনি মোটেই কথা বলতে পারেন না ভালো করে। আপনার গলা কী রকম যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে। বরং আপনি যখন চুপ করে চেয়ে বসে থাকেন, তখন—

— তখন কি ?

— কিছু না।

মাধবী লাইন কেটে দিল। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো না, আঘাত পেলুম না কোনো। খানিকটা অবাক লাগলো—আমি যখন চুপ করে বসে থাকি— তখন কী হয়। তখন কি আমাকে অবনীভূষণের মতন দেখায় ? সেই জন্যই কি আমার চুপ করে বসে থাকতেই আজকাল বেশি ভালো লাগে ? আঃ, অবিনাশের কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করা হলো না আজও।

কফিটা খেয়ে বেরুলাম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ি বারান্দার নিচে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা চোখের পাতায় বোধহয় সবুজ রং মেখেছে। তাই ওর চোখের দিকে আমি দু'বার তাকালাম। মেয়েটিও আমার চোখের দিকে সোজা তাকালো। আমি তো আর চোখে রং মাখি নি, তবে আমার দিকে ও তাকাচ্ছে কেন ? সেইটাই জানার জন্য, আমি ওর দিকে আবার তাকালাম। মেয়েটি এবার আমার দিকে একটু এগিয়ে এলো, একটা ঝলমলে সোনালি রঙের গাউন পরেছে। চুলের রংও কিছুটা সোনালি ওর, কিন্তু চেহারা রোগাটে। মেয়েটি বললো, হ্যালো, মিস্টার !

আমি বললুম, কী ?

— স্যাডার স্ট্রিটটা কোনদিকে বলতে পারো ?

আমি একটু হাসলুম। উত্তর দিলুম, এই বৃষ্টিতে পার্ক স্ট্রিটে এসে একা দাঁড়িয়ে আছো, আর স্যাডার স্ট্রিটে চেনো না ?

মেয়েটি আমার সঙ্গে হাঁটছিল, সেও হেসে বললো, আমি চিনি। দেখছিলুম, তুমি চেনো কি না।

— স্যাডার স্ট্রিটে তোমার ঘর আছে ?

— না, হোটেল রুম, দশ টাকা প্রতি ঘণ্টা।

— আর তোমার ?

— তিরিশ টাকা, যদি একঘণ্টা থাকো।

— তিরিশ আর দশ চল্লিশ, একঘণ্টা তোমার সাহচর্যের জন্য ? বড় বেশি নয় কি ?

— ডোন্ট বি মিন।

— তোমার শরীরের জন্য চল্লিশ টাকা, আর আমারও তো একটা শরীর আছে, তার কোনো দাম নেই ? তার জন্য তোমারও কিছু দেওয়া উচিত। তুমি আমাকে কত দেবে, বলো ?

— আই উইস, আই কুড। কিন্তু তুমিতো জানো—

— শুধু-শুধু তোমার সময় নষ্ট করলে। আমার কাছে তোমার কোনো সুবিধে হবে না।

— কেন ? তোমার কাছে টাকা কম আছে ? কত আছে ?

— টাকার জন্য নয়। আমার ভালো লাগে না।

— ইয়ংম্যান, আজ এই রকম লাভলি ওয়েদার, ডোণ্ডয়ু নিড আ কমপ্যানিয়ন ?

— কিন্তু তোমার কমপ্যানি আমার ভালো লাগবে না।

— কেন, আমি কি দেখতে খারাপ ?

— না, তা নয়। কিন্তু তোমাদের আর আমার ভালো লাগে না। আই অ্যাম ইন লাভ।

— ইন লাভ ? উইথ আ বেঙ্গলি গার্ল ? ডাজ সি লাভ য়ু টু ?

— ঠিক জানি না। আচ্ছা, আমার কি করা উচিত বলো তো ? আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে কিনা জানি না। এখন আমি কী করবো ?

মেয়েটি হাঁটতে-হাঁটতে আমার সঙ্গে চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত এসেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে

খুবই চিন্তিত ভঙ্গি করে বললো, দেয়ার আর সেভারাল ওয়েজ। আচ্ছা, মেয়েটি তোমাকে চেনে তো ? তার বাড়ি কি খুব কনজারভেটিব ?

— না। মেয়েটি আমাকে চেনে।

— মেয়েটিকে খুব সুন্দর দেখতে ? খুব সুইটলুকিং ?

— প্রায় !

— আচ্ছা, ওকে একদিন আলাদা তোমার সঙ্গে ডিনারে নেমন্তন্ন করো না—

আমি হঠাৎ হাসতে লাগলাম। বেশ জোরে হাসি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি একটু আহতভাবে বললো, হোয়াটস্ ফানি ইন ইট ?

—তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার কথা আলোচনা করছি। এটা ফানি নয় ?

—কেন, আমরা স্ট্রিট গার্ল বলে কি আমরা ভালবাসা সম্পর্কে কিছু জানি না ? জানো, আমিও—

—প্লিজ, আমাকে ওসব গল্প শুনিও না। আমি ওগুলো সব জানি।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না ? আমিও—

—বিশ্বাস করছি, কিন্তু গল্পটা শুনতে চাই না। ওসব গল্প একরকম।

মেয়েটি আহত, অপমানিত মুখে চুপ করে যায়। আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজে ওর মুখের চেহারা আরও করুণ হয়ে এসেছে। তখন আর কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই। মেয়েটি শেষ চেষ্টা হিসেবে বলে, চলো না, কাছেই তো আমারই হোটেল—একটুক্ষণ গিয়ে বসবে, আর কিছু না, যাস্ট লাইক ফ্রেন্ডস, সেখানে আমরা তোমার প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবো ? প্লিজ —

— আমার কোনো প্রব্লেম নেই। তোমাকে মিথ্যে কথা বলছিলুম। আসলে আমি জানি, আমি যে মেয়েটিকে ভালবাসি, সে অন্য একটি ছেলেকে ভালবাসে।

— স্যাড। কিন্তু, এ নিয়ে তোমার বেশিদিন দুঃখ করার কোনো মানে হয় না।

— নাঃ, বেশিদিন করবো না।

— তোমার নাম জানতে পারি ? আমার নাম মার্থা হে, আমি এম সি হোটেলে থাকি।

— আমার নাম অবনীভূষণ রায়। আমার দুঃখ কেটে গেলে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করবো।

পরদিন দুপুরে মাধবী এলো না, এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে আর না, কোনো খবরও পাঠালো না। মাধবী না আসায় এক হিসেবে আমি খুশিই হয়েছি। হঠাৎ বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম কাল সন্ধে থেকে, মাধবীর সামনেও হয়তো উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলতুম। হয়তো মাধবীকে বলে ফেলতুম, তোমাকে আমি ভালবাসি। ও কথা বললে খুবই খারাপ হতো, ও কথা বলা যায় না, মাধবীকে এখনো বলা যায় না। আসলে মাধবীকে আমি ভালবাসি কিনা সত্যিই তো জানি না। মাধবীর সামনে শুধু একা বসে থাকতে ইচ্ছে হয়—এর নাম কি ভালবাসা ? না, এখনই ভালবাসার কথা বলা যায় না। তার আগে, অবনীভূষণের সমস্যা আমাকে দূর করতে হবে।

মাধবী আসে নি, কিন্তু আমি জানি মাধবীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবেই। আমি যা চাই, তা চিরকালই পেয়ে থাকি। যা পাবো না কখনো—তা আমি আগে থেকেই জানতে পারি, তা পেতেও চাই না আমি। চেয়ে ব্যর্থ হওয়া আমার স্বভাব নয়। সূর্যকে যে আমার ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখি নি, তার কারণ, আমি কখনো তা চাই নি বলে। যেদিন আমি চাইবো—সেদিন শালা সূর্যকেও আমার ঘরে আসতে হবে। আপাতত, আমি মাধবীকে চাই কিনা ভাবি নি। ওর ভালবাসা

চাই কিনা ভাবি নি, আমি ওকে দেখতে চাই—জানি ওর সঙ্গে দেখা হবেই। অবনীভূষণকে ঠিক আমি দেখতে চাই কিনা জানি না, হঠাৎ অবনীভূষণকে দেখলে আমার কী অবস্থা হবে তাও বুঝতে পারছি না। আমার মুখোমুখি যদি ঠিক আমারই মতো দেখতে আরেকজন মানুষ দাঁড়ায়, তবে সে দৃশ্য তো ভয়াবহ। হয়তো ওকে আমার মতো দেখতে নয়, কোনো একটা ভঙ্গি বা মুখের রেখা, কিংবা অভ্যেসের মিল আছে—আর কিছু না। অবনীভূষণ বেঁচে আছে কিনা, তাও জানতে হবে। অবিনাশের কাছে কিছুই জানা গেল না। এর মধ্যে অবিনাশের সঙ্গে একদিন দেখা হলো। কী ভয়ঙ্কর চেহারা সেদিন অবিনাশের। কোথাকার কোন্ পার্টি থেকে ফিরছিল, সঙ্গে দু'জন অচেনা লোক—ওর দু'হাত ধরে আছে, ধর্মতলায় অবিনাশের সঙ্গে আমার রাত সাড়ে দশটায় দেখা—অবিনাশ তখনও বদ্ধ মাতাল। চোখ দুটো টকটকে লাল, মাথার চুল হাতের মুঠোয়, অসম্ভব করুণ মুখখানা। যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, অবিনাশ আঃ আঃ করে আওয়াজ করছিল, আর্তনাদের মতন, অথচ তখন ওর বেশ জ্ঞান আছে। আমাকে দেখে অবিনাশ জড়িয়ে ধরলো, বললো, শেখর, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে—

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেশি খেয়ে ফেলেছিস ?

ও বললো, না, না, বেশি খাই নি। আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।

— কিসের কষ্ট ?

— তা জানি না। আঃ, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে। বেশি মদ খেয়েছি তো, তাই কষ্টের কথা বলতে পারছি, অন্য সময় তো বলতে পারি না !

— কেন, কষ্ট হচ্ছে কেন ?

— তাই তো জানি না। দ্যাখ শেখর, আমি বারবার সরল জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। সেইজন্যই কি আমার কষ্ট হচ্ছে ? কী জানি! চল্, তুই একটু খাবি !

— না !

— তুই আজকাল আর খেতে চাস্ না কেন রে ?

— আমার আর ভালো লাগে না।

— তোর তো কোনো কষ্ট নেই, তুই আর খাবি কেন ?

— তুই কি কষ্টের জন্য মদ খাস্ নাকি ? দেবদাস হচ্ছিস ?

— উঁহু, ওসব মেয়েছেলের জন্য কষ্ট নয়, অন্যরকম, ওঃ !

অবিনাশকে এরকম কাতর কখনো দেখি নি। অবিনাশ আরও মদ খাবার জন্য পিড়াপীড়ি করে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যাবো ঠিক করেই, হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, তুই মাধবী সান্যালকে চিনিস ?

অবিনাশ বললো, কে মাধবী ? তোর কাছে যে মেয়েটা পড়তে আসে। হ্যাঁ, খুব ফাইন মেয়ে, একটু মোটার ধাঁচ, কিন্তু বুক দুটো কি চমৎকার।

— ওসব বাজে কথা রাখ্। তুই ওর বন্ধু অবনীভূষণ বলে কারুকে চিনিস্ ?

— অবনীভূষণ ? টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আবার এরকম নাম হয় নাকি ? কেন ? তাকে চিনে কি হবে ?

— না, এমনিই। মাধবী প্রায়ই বলে, আমাকে নাকি অবনীভূষণের মতন দেখতে—

—তাই বলে কি ? আশ্চর্য তো! সত্যিই তো, তোকে অবিকল অবনীভূষণের মতনই তো দেখতে ! মাইরি শেখর, বিশ্বাস কর, অবিকল হুবহু অবনীভূষণের মতনই তোকে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ গলা ফাটিয়ে মাতালের হাসি হাসতে থাকে। আমি ওর হাত

ছাড়িয়ে সোজা চলে এসেছিলাম সেদিন।

ক'দিন থেকেই ছায়াদির অসুখ শুনছিলাম—অনেকদিন ওদের বাড়িতে যাই নি। কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে এলো, আর ছুটি নেওয়া যাবে না। কলেজটা ছাড়তে হবে এবার, সকালবেলা গিয়ে পড়ানো, আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। কোনোদিন রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, সকালবেলা দশটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে কলেজে ছুটতে একেবারেই ইচ্ছে করে না।

সকালে চা খেয়েই একবার ছায়াদির বাড়িতে ঘুরে এলাম। গায়ত্রী বারান্দায় রোদ্দুরে বসে ছেলেকে অলিভ অয়েল মাখাচ্ছিল। অনিমেষরা তাহলে এখনো যায় নি। একটা হলদে রঙের শাড়ি পরে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে গায়ত্রী ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে—বেশ দেখাচ্ছে ওকে—মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি। গায়ত্রী আমাকে দেখে বললো, অনেকদিন আপনাকে দেখি নি। একটু রোগা হয়ে গেছেন !

আমি বললুম, আপনিও তো অনেক রোগা হয়ে গেছেন ! গায়ত্রী লজ্জিতভাবে হাসলো। অয়েল ক্লথের ওপর শুয়ে ছেলেটা খল্‌খল্ করে হাসছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি আলগাভাবে বললুম, ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে আপনার ছেলে ! গায়ত্রী এবারও হেসে ছেলেকে বুকে তুলে নিল। কথাটা আমি এমনিই বলতে হয় বলেই বলেছি। ঐটুকু একটা বাচ্চা, নাক-চোখ কিছুই ভালো করে ফোটে নি—ওকে আবার দেখতে সুন্দর আর কুৎসিত কি? যখন বড় হবে—পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে পারবে—তখনই বুঝবো, বাছা মুখের ওপর সুন্দরকে রাখতে পারে, না মুখখানা ভূতের মতন বানিয়ে তুলবে। ছেলেকে বুকে তোলার পর গায়ত্রীকে একেবারে ছবির মাতৃমূর্তির মতন সুন্দর দেখাচ্ছে—হঠাৎ মনে হলো, মা হবার পরেও সেই মেয়ের সঙ্গে পুরুষরা এক বিছানায় শোয় কি করে ? দেখলেই তো ভক্তি আসে—তখন আর ওসব ব্যাপার, যাক্‌গে, এতো আর আমার সমস্যা নয়। গায়ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, অনিমেষ কোথায় ?

ও বললো, অনিমেষ একটু বেরিয়েছে।

সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে ছায়াদি শুয়েছিল। ছায়াদির মুখের ভাব এমন—যেন কোনো গুরুতর অসুখ হয়েছে। আসলো ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়তো—। শীর্ণ হেসে হাত বাড়িয়ে ছায়াদি বললো, এসো শেখর, বসো। না না, বিছানায় বসো না—ঐ চেয়ারটা টেনে নাও।

— কেন, বিছানায় বসবো না কেন ?

— এসব অসুখ বড় ছোঁয়াচে—

আমি একটু হেসে বিছানাতেই ছায়াদির পায়ের দিকে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছো, ছায়াদি ?

অপ্রত্যাশিতভাবে ছায়াদি উত্তর দিল, ভালো আছি। খুব ভালো আছি এখন। খুব ভালো লাগছে।

— জ্বর ছেড়ে গেছে ?

— না, সকালেই আবার জ্বর এসেছে। সেইজন্যই ভালো লাগছে। অসুখ হলেই আমার ভালো লাগে। অন্য সময় কী রকম যেন ঠিক বুঝতে পারি না—।

চাদরের বাইরে ছায়াদির পা বেরিয়েছিল। আমি একটা হাত ছায়াদির পায়ে বোলাতে লাগলাম। বরফের মতন ঠাণ্ডা পা। জ্বর-টর কিছু নেই। তবু ছায়াদি কেন বললো, একটু আগেই ওর জ্বর এসেছে? কেন যে লোকে অকারণে মিথ্যে কথা বলে ! আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম।

ছায়াদি হঠাৎ হাসতে লাগলো। বললো, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাকে খুঁজছো, সে নেই !

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে নেই ? কাকে খুঁজছি আমি।

ছায়াদি সেই রকমই মুখ টিপে হেসে বললো, মায়া পরশুদিন মামার বাড়িতে গেছে।

— আমি মায়াকে খুঁজবো কেন ?

— সবাই তো আজকাল এ বাড়িতে এসে মায়াকেই খোঁজে। আমি বুড়ি হয়ে গেছি, আমাকে দেখতে বিচ্ছিরি—আমার সঙ্গে আর কে কথা বলতে চায় বলো। মায়া কিন্তু তোমাদের কাউকে পাত্তা দিতে চায় না। লেখক-টেখকদের সে একদম পছন্দ করে না।

— শুনে সত্যিই খুব দুঃখিত হলুম।

— আমার অসুখ শুনেই তবু যা হোক এলে। তাই তো বললুম, অসুখ হলেই আমি ভালো থাকি। তাপস তো অসুখ শুনেও একদিনও এলো না।

— কি ব্যাপার, তাপসের নামে যেন গলাটা ছল্‌ছল্ করে উঠলো ?

— মোটেই না। তাপসকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। সেও অবশ্য আমার কথা কখনো ভাবে না।

— বিমলেন্দু আসে ?

— রোজ। সে তোমাদের মতন অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে নয়—

ছায়াদির মুখে তাপসের নাম শুনেই মনে পড়লো, অনেকদিন আমারও তাপসের সঙ্গে দেখা হয় নি। আজ দেখা করলে মন্দ হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ছায়াদি, আমি তাপসের কাছেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলবো নাকি ?

— না, না।

তাপসের মেসে গিয়ে দেখি, তাপস জামা-কাপড় নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়েছে। ওর রুমমেট রামহরিবাবুর একটা প্যান্ট গলিয়ে ও কিছুতেই সেটা ম্যানেজ করতে পারছে না। রামহরিবাবুর কোমর বিষম মোটা, আর তাপসের কোমর—না খেয়ে খেয়ে—মেয়েদের মতন সরু। রামহরিবাবুর প্যাণ্ট ওর লাগে কখনো ? যে জামাটা তাপস গায় দিয়েছে, সেটারও পুট নেমে এসেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত। তাপসের বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললুম। বললুম, কি ব্যাপার ? কোথায় জয়যাত্রায় যাচ্ছিস ?

বিরক্তমুখে তাপস বললো, রেডিওতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছি। চিঠিটা আজই সকালবেলা এসেছে, আজই সাড়ে বারোটার সময় ইন্টারভিউ। এর কোনো মানে হয় ? একটাও ফর্সা জামা কাপড় নেই আমার।

রামহরিবাবু এমন কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যেন ওঁর জামা–প্যান্ট তাপসের না–লাগলে তাঁরই দোষ। আহা, লোকটি বড় ভালো। আমি তাপসকে বললুম, যাঃ ঐরকম হাস্যকর পোশাক পরে কেউ ইন্টারভিউতে যায় ? নিজের যা আছে, তাই-ই পরে যা।

— নিজের কি আছে ? কচু আছে ? এক পেয়ার লন্ড্রিতে দিয়েছি, আর ঐ তো যেটা কাল পরেছিলাম।

সেটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। খাটের পাশে ওর প্যান্টটা তালগোল পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা ভর্তি যে দাগ, তা মাংসের ঝোলের কিংবা বমির। বললুম, জামা-কাপড় লন্ড্রিতে পাঠাস কেন ? বাড়িতে কাচতে পারিস না ?

তাপস খেঁকিয়ে উঠলো, যা যাঃ, ফোঁপর দালালি করতে হবে না।

— তা বলে ঐ পাঁচটা সেফটিপিন লাগানো প্যান্ট পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবি !

— তাহলে কি করবো ?

যাবার দরকার কি ইন্টারভিউ দিতে ? ও চাকরি তো পাবিই না। আজ ইন্টারভিউ, আজ সকালে যদি চিঠি আসে তার মানে বুঝিস না ? ও চাকরি তোর হবে না।

— হবে না মানে ? চালাকি ব্যার করে দেবো। তোরা শালারা প্রফেসারি-ট্রফেসারি জুটিয়ে

খুব হেক্কর দেখাচ্ছিস। এবার দ্যাখ—আমিও রেডিওর চাকরি পাচ্ছি—একবার রেডিওর মাইকটা হাতে আসুক—সারা দেশে বিপ্লব ডেকে আনবো। আমার যা কিছু আছে—রেডিওতে একদিন ঘোষণা করে দেবো।

আমার পরনের প্যান্টটা কিছুটা পরিষ্কার ছিল, সেইটাই তাপসকে আমি খুলে দিলাম। তাপসের মোটামুটি লেগে গেল। বাধ্য হয়ে তাপসের বমি মাখানো প্যান্টটাই আমাকে পরতে হলো। গা ঘিন ঘিন করছে আমার—

তাপস ব্যস্ত হয়ে পাগলের মতন ছোটাছুটি করছে ঘরের মধ্যে। আর বেশি সময় নেই, ঠিক পৌঁছুতে পারবে কিনা সন্দেহ।

তাপসের খুবই দেরি হয়ে গেছে, ঠিক সময় পৌঁছুতে গেলে ওর বোধহয় ট্যাক্সি করে যাওয়া দরকার। কিন্তু সে কথা ওকে বলতে আমার সাহস হলো না। তা হলে নিশ্চয়ই আমার কাছেই ট্যাক্সি ভাড়া চাইবে। একেবারে জাত ভিখিরি তো, টাকা চাইতে একটুও লজ্জা নেই। নেহাৎ বাধ্য হয়েই ওকে আমার জামা-প্যান্টটা খুলে দিতে হলো। ওর বিকট ময়লা, বমির দাগধরা জামা-প্যান্ট পরে এখন আমার মনে হচ্ছে, তাপসের এখানে আজ না এলেই কত ভালো হতো। কেন যে মরতে এখানে এলাম।

তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর খাওয়া হয়ে গেছে তো ?

জুতোয় ফিতে বাঁধছিল তাপস, বললো, না,—

— তাহলে এখন আর তো সময় নেই—

— দুপুরে কিছু খেয়ে নেবো।

— তাহলে আজ আর কিছু খাওয়া হলো না তোর। এসব ইন্টারভিউ-এর ব্যাপার তো জানিস না। ঘণ্টা চার-পাঁচ বাইরে ঠায় বসিয়ে রাখবে—

— তাহলে খাবো না ! একেবারে চাকরিটা পাবার পর খাবো। তখন দেখিস কী রকম খাই। জানিস শালা, আমারও খুব শখ তোদের মতন সকালে চায়ের সঙ্গে রোজ ডিম আর মাখন টোস্ট খাওয়ার। আমারও ইচ্ছে করে মাঝে-মাঝে ভাতের বদলে স্যান্ডউইচ খেতে। দ্যাখ না, একবার চাকরিটা পাই—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এখন চল্, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাপসের। আমার জামা-প্যান্ট পরার পর ওর চেহারাটা মোটামুটি ভদ্রই দেখাচ্ছিল। চুল আঁচড়ানো শেষ করার পর অকস্মাৎ আমার দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতন *হ্যা-হ্যা* করে হাসতে লাগলো। বললো, তোকে কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, শেখর !

আমি রেগে গিয়ে বললুম, তা তো দেখাবেই—ভিখিরির পোষাক পরলে তাই দেখাবে না ?

— সত্যি মাইরি তোর মতন সৌখিন ছেলে, সব সময় ফিটফাট থাকিস—তোকে এরকম পোষাকে কখনো দেখি নি—একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

আমার আবার নতুন করে গা ঘিনঘিন করতে লাগলো। বিরক্ত হয়ে বললুম, তোদের যা কাণ্ড। তুই তো ইন্টারভিউতে যাচ্ছিস— আমি এখন কি করে বাড়ি যাই ?

— তুই এখানে বসে থাক্ না। আমি ফিরে এলে—

— তোর এই বিচ্ছিরি ঘরে আমি কতক্ষণ বসে থাকবো ?

— তাহলে ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যা—

কী অনায়াসভাবে তাপস বললো। ও যাচ্ছে ইনাপারভিউ দিতে, তার জন্য আমায় ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করতে হবে? একটুও ওর লজ্জা নেই পর্যন্ত। তাপসের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি

দিয়ে নামতে-নামতে একটু কৈফিয়তের সুরে তাপস বললো, জামাটা তো কাল নষ্ট হলো পরীক্ষিতের জন্য—এমন গায় বমি করে দিলো কাল !

— কোথায় ? রোজ রোজ এত—

— কে জানে কোথায় ? আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তখন লটপট করছে—

— থাক, ওসব আর আমি শুনতে চাই না।

— শোনারও কিছু নেই। তো একঘেয়ে ব্যাপার—কত নম্বর বাসে উঠবো বলতো ? তিন নম্বর, তিন নম্বরই অনেকটা কাছাকাছি যাবে—

এই সময় ট্যাক্সি পাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং তাপসকে ট্যাক্সি চড়ে যেতে বললেও কোনো লাভ হতো না, এমন কি আমি ভাড়া দিলেও না। ওর সঙ্গে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালুম। মনে হলো রাস্তার সব লোক যেন আমার পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাসে ওঠার আগে তাপস বলে গেল, তুই আমার জামা-প্যান্টটা কাচিয়ে রাখিস্। আমি তোর এগুলো এখন তিন-চার দিন পরবো।

তাপসের বাস চলে যাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা খালি ট্যাক্সি চোখে পড়লো। আমি ট্যাক্সিটা ডাকলুম, একবার মনে হলো, বাসের পরের স্টপে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ছুটিয়ে গিয়ে তাপসকে ডেকে নামানো যায়, তারপর ওকে রেডিও স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসাই আমার উচিত। কিন্তু সে ইচ্ছেও বদলে গেল! ভাবলুম, এতো বেশি বন্ধুত্ব দেখাবার কোনো দরকার নেই। জামা-প্যান্ট খুলে দিয়েছি তাই যথেষ্ট, আর কি চাই ? এখন বন্ধু-বান্ধবদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতেই আমার মন চাইছে।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়িতেই চলে এলাম। আমার বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের গাড়ি ; গাড়িটা দেখেই বুকটা কেঁপে উঠলো। এ আমার চেনা গাড়ি। বাইরের ঘরে মাধবী বসে আছে। হাল্কা গোলাপী রঙের শাড়ি পরা, মাথার চুল স্কন্ধ খোলা, পিঠ ভর্তি ওর কোঁকড়া চুল। মাধবীকে দেখে হঠাৎ আমার বুক অভিমানে ভরে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এ কদিন আসো নি কেন ?

আমাকে দেখেই মাধবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন, কিন্তু সেসব কিছু বললো না, বললো, হ্যাঁ, আসা হয় নি।

বনেদি ঘরের মেয়েরা তো, মনে এলেও সব কথা মুখে বলে না। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন তো করবেই না। সকালের দিকেই আমার এ ধরনের পোশাক দেখলে— যে কারুরই মনে হবে— আমি সারারাত বাড়ির বাইরে কোথাও বেলেল্লা সেরে এখন ফিরছি। কিন্তু মাধবীর সামনে চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট, অর্থাৎ বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছে যে আমি সকালেই বেরিয়েছি। কিন্তু এই রকম পোশাক পরে তো আমি বেরুতে পারি না, এবং এই সাতসকালেই কি আমি বেরিয়ে মদ গিলে বমিটমি সেরে ফেলেছি ? কিংবা অন্য কোনো অসুখে বমি— যে কারুরই এ সম্পর্কে কৌতূহল হয়, যে কেউ আমাকে দেখলে বলতো, কি ব্যাপার ? জামায় ও কি ? — কিন্তু মাধবী তা বলবে না কিছুতেই, মাধবী বারবার আমার পোশাকের দিকে তাকালো, নির্লিপ্ত গলায় বললো, হ্যাঁ, আসা হয় নি।

আমি ফের বললুম, তুমি এ ক'দিন আসো নি কেন ?

মাধবী বললো, আসি নি। আমি আর আসতেও পারবো না।

শুনে আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। মাধবী আর আসবে না ? কেন ! ওর বিয়ে হয়ে যাবে ? কার সঙ্গে, সেই অবনীভূষণের সঙ্গে ? না। তা হতেই পারে না—। কিন্তু মাধবীকে আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারলুম না। মাধবীকে তো আমি এ পর্যন্ত অন্য কোনো কথাই বলি নি—

যা বলেছি সবই আমার মনে-মনে। অবনীভূষণ কে ? একথাও মাধবীকে এ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারি নি। অধ্যাপক ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক তো মাধবীর সঙ্গে আমার হয় নি।

কণ্ঠস্বর যেন বিচলিত না হয়— এই জন্য আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখের ভঙ্গি যথাসম্ভব নির্বিকার রেখে বললুম, একথাই বলতে তুমি এসেছিলে ?'

— হ্যাঁ।

— তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দিচ্ছ ?

— না।

সংক্ষিপ্ততম এক অক্ষরের উত্তর ! মাধবী যেন চাইছে আমি ওকে খোলাখুলি প্রশ্ন করি। নইলে ও কিছুই বলবে না। কিন্তু একথাও বুঝতে পারলুম, মাধবী পড়াশুনো ছাড়বে না— এর একটাই মানে হয়, প্রাইভেট টিউটর হিসেবে আমাকে বরখাস্ত করছে। বরখাস্ত করছে কোনো কারণ না দেখিয়ে, এক কথায়। এরপর আর আমার কোনো কথা বলা চলে না। এরপর, অন্য যে কোনো কথা বলার মানেই হলো — আমি চাকরি হারাবার জন্য দুঃখিত হয়েছি। মাধবী আমাকে আড়াইশো টাকা মাইনে দিতো— সোজা কথা নয়। এখন যদি বলি, মাধবী, তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে—তাহলে, সেকথার সবাই মানে করবে, প্রতিমাসে আড়াইশো টাকা হারাবার কষ্ট। যদি ওকে এখন প্রেম জানাতে চাই— তা হলে সেটারও মানে হবে ও যেন আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত না করে, সেই চেষ্টা করছি। কেন মাধবীকে আগে থাকতেই ভালবাসার কথা বলে রাখি নি ? এখন আর উপায় নেই। সুতরাং, মাধবীকে আমি বিদায় দেবার ভঙ্গি করে বললুম, আচ্ছা—মন দিয়ে পড়াশুনো করো, সন-তারিখ তোমার প্রায়ই ভুল হয়, ওটা লক্ষ রেখো।

মাধবী তবু না গিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, আমি এখানে আসতে পারবো না। আপনি বাড়িতে এসে পড়াতে পারবেন ?

এখানে প্রশ্ন করা উচিত, কাদের বাড়িতে ? ওর যদি বিয়ে হয় এবং তখনও পড়তে চায়— তখন কোন্ বাড়িতে ? বিয়ের পরও কি ও নিজের বাড়িতেই থাকবে—না, অন্য বাড়িতে ? কিন্তু আমি ওকে কোনো প্রশ্ন করবো না ঠিক করেছি, কিছু জানাবো না, তাহলেই তার অন্য মানে হবে। সুতরাং, আমি বললুম, না, অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

— আমাদের বাড়িতে আসিতে পারবেন না ? সপ্তাহে অন্তত দুদিন ?

— না।

— কেন ?

— এমনিই। আমার ভালো লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না।

— হ্যাঁ, আপনার ভালো লাগবে। আসবেন ?

এবার মাধবী ওর নির্লিপ্ততার আবরণ একটু সরিয়েছে। একটু যেন জোর দিয়ে কথা বলতে চাইছে। তবু আমি বললুম, আচ্ছা, কয়েকদিন ভেবে দেখি। পরে তোমাকে জানাবো—

মাধবী দরজার কাছে পৌঁছেছিল, ওকে বিদায় দেবার জন্য আমি এগিয়ে এলাম। এবং একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, আগের মুহূর্তেও ভাবি নি, মুখ ফসকে আমার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, মাধবী, অবনীভূষণ কে ?

মাধবী ফিরে দাঁড়ালো। এক মুখ হাসিতে ওর মুখটা ঝলমলে হয়ে উঠলো। হাসতে-হাসতেই বললো, অবনীভূষণের কথা আপনাকে পেয়ে বসেছে দেখছি। এতো ভাবছেন কেন ?

— অবনীভূষণ কে ?

— কেউ না, একজন মানুষ। অবনীভূষণ সেনগুপ্ত। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়েছিল

আমার। আপনি অনেকটা তার মতো—

— আজ, এই পোশাকেও কি আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখাচ্ছে ?

— হ্যাঁ। আজও আপনাকে প্রথম দেখেই তার কথা মনে পড়েছিল।

— মনে পড়েছিল মানে ? সে এখন কোথায় ?

— সে কথা আজ বলবো না।

— আজ নয়, তবে আর কবে বলবে !

— আবার যখন দেখা হবে। আবার কবে দেখা হবে তা তো আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। আজ যাই।

— মাধবী আর একটু বসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবো।

— আজ নয়। আজ বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। মাকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি ফিরবো। এখন যাই।

— তুমি আমার বাড়িতে আর আসবে না কেন ?

— সে কথাও আজ বলবো না। যদি আমার বাড়িতে আসেন—আজ হঠাৎ এত প্রশ্ন করছেন কেন ?

— না, আর প্রশ্ন করবো না। তুমি যাও।

মাধবী গিয়ে গাড়িতে উঠলো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। একথা তো অবধারিত যে মাধবীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই। হবেই, কেননা, আমি মন থেকে তাই–ই চেয়েছি। দেখা হলে মাধবীকে আর কোনো প্রশ্ন করবো না, কোনো কথা জানাবোও না।

মাধবী আমাকে যেদিন বলেছে আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, সেদিন থেকেই আমি বদলাতে শুরু করেছি। আমি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি—সত্যি–সত্যি অবনীষভূণের মতন কিনা তা অবশ্য জানি না। তাকে তো আমি চিনিই না। কিন্তু একথাও ঠিক, আমি এখন শেখরও ঠিক নই। কে তবে আমি !

ফিরে এসে চট্‌পট স্নান সেরে, আমার সবচেয়ে শৌখিন পোশাক পরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালুম। মাধবী এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। স্নান সেরে মাধবীও কি আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ? অবনীভূষণ কি বেঁচে আছে ? যদি বেঁচে থাকে, তবে ও কি এখন মাধবীদের বাড়িতে ? ছোক্‌রা কি রকম, খুব চালিয়াৎ কিনা কে জানে। ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরিচ্ছন্ন চেহারার অবনীভূষণ মাধবীদের বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বসে ইয়ার্কি দিচ্ছে—এই ছবিটা মনে এলো। কি ধরনের রসিকতা ও করে ঠিক ভেবে পেলাম না। আকাশ থেকে এক ঝলক আলাদা রোদ মাধবীর জন্য এসে ওর পায়ে লুটোচ্ছে। মাধবীর পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। অবনীভূষণ নিশ্চিত সিল্কের পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরে আছে। মুখে সিগারেট না পাইপ—এমনও হতে পারে, অবনীভূষণ সত্যিই বেঁচে নেই। ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, কিছুতে বুঝতে পারি না। যদি বেঁচে থাকে তবে, আপনাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, একথা বলেই মাধবী চুপ করে যায় কেন ? আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা একটি লোকের নাম বলে তার পরিচয় না বলার কী কারণ থাকতে পারে—দুঃখের স্মৃতি ছাড়া ! যদি বেঁচে থাকে, তবে সে কোথায় ? একদিন মাধবীর গা শুঁকে দেখতে হবে— ওর গায়ে অবনীভূষণের গন্ধ আছে কিনা। না না, বেঁচে থাক্, তুমি বেঁচে থাকো অবনীভূষণ, আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো, জীবিত লোককে পরাজিত করা সোজা। যদি মরে গিয়ে থাকে—তবে মাধবীর বুক থেকে ওর দাগ কোনোদিন উঠবে না।

সারা শরীর আবার ব্যথা–ব্যথা করছে। সারাদিন ঘর থেকে আর বেরোলুম না। বিকেলেও

তিনজন বন্ধু এলো, প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরনের অনেক কথা বলে গেল ! যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল না। বাড়িতে একা পড়ে রইলুম। নিজে থেকে কোথাও যেতেও ইচ্ছে হলো না। ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছি ! ভালোই, যত আমি একা হবো—তত আমি মাধবীর কাছাকাছি যাবো। অনেক হুল্লোড় করেছি, এখন স্নেহছায়া চাই। ইচ্ছে করে মাধবীর চোখের সামনে পা ছড়িয়ে বসে থাকি। মাধবীর দৃষ্টি ঝরনার জলের মতো। মনে পড়ে, অনেকদিন আগে সাঁওতাল পরগণায় একটা ছোট্ট ঝিরঝিরে ঝরনার সামনে অনেকক্ষণ একা বসেছিলাম। বসেছিলাম রাখাল বালকের মতো। হাতে বাঁশি ছিল না, পরনে কর্ডের প্যান্ট ও মুখে চুরুট ছিল, তবু রাখাল বালকের মতো, একথার কোনো ভুল নেই। প্রায় তিন ঘণ্টা বসে ছিলাম, চুপ করে, নিজের সঙ্গেও কথা বলি নি, এক লাইন গান গাই নি। আমার স্মরণকালে সেই একমাত্র চুপ করে বসে থাকা। মাধবীর সামনে ঐ রকম চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। চুপ করে বসে থাকলে, একদিন না একদিন আমাকে ঠিক আমারই মতন দেখাবে।
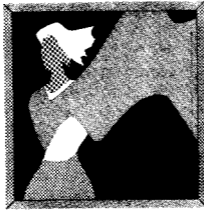
সরল সত্য

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

ডাক্তারের ধারণা, আমি একজন বুদ্ধিজীবী। হাসতে-হাসতে তিনি বললেন, আজকালকার বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই এই আতঙ্ক...। ডাক্তার নিজেও সিগারেট খাচ্ছিলেন।

ডাক্তারটির বয়েস বেশি না, আমার থেকে বয়েসে ছোটই হবে বোধহয়, চল্লিশ পেরোয় নি। বেশ সুশ্রী। বিলেত-ফেরত ডাক্তারদের প্রায় সবারই চেহারা সুন্দর। বিলেতের গুণ না, সাধারণত বড়লোকের ছেলেরাই তো বিদেশে যায়।

ডাক্তার আমার সঙ্গে আগামী মঙ্গলবার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন বটে, কিন্তু ওঁর দৃঢ় ধারণা আমার কিছুই হয় নি। ওরকম ঘুসঘুসে সর্দি আর গলাভাঙা কিছু অস্বাভাবিক না। ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেকেরই হয়।

কিন্তু আমার যে প্রায়ই হয়! মিথ্যেমিথ্যি ভয় পাচ্ছি! ডাঃ চ্যাটার্জি হেসে বললেন, এদেশে ক্যানসারে এত লোক মরে, কিন্তু ওঁর কাছে সত্যিকারের ক্যানসার রুগী প্রাথমিক স্টেজে আসে খুব কমই। অধিকাংশই ক্যানসারের ভয় নিয়ে আসে—তাদের মধ্যেও বেশিরভাগই বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদেরই নাকি আজকাল ক্যানসারে মরার বেশি ভয়। আমার চেহারা দেখেই উনি আমাকে বুদ্ধিজীবী কী করে ভাবলেন, কে জানে! আমি প্রতিবাদ করি নি।

ডাক্তারটি বেশ স্মার্ট এবং কাণ্ডজ্ঞান আছে। মাঝে-মাঝে আমার গলায় ব্যথা হয়, কাশি হয়, রক্ত পড়ে, গলা বসে যায় — এর আগে যতবারই কোনো ডাক্তারের কাছে গেছি সবাই জিজ্ঞেস করেছে, ক'টা সিগারেট খান? দিনে পঞ্চাশ-ষাটটা? সর্বনাশ! সিগারেট একদম ছাড়তে হবে। যত সব বুদ্ধুর দল! ডাক্তারের উপদেশে কেউ সিগারেট ছাড়ে! ছেলেবেলার স্বাস্থ্য বইতে যত উপদেশ পড়েছি— সব মেনে চললে যে স্বাস্থ্য বইয়ের ছবির মতনই চেহারা হতো তা কে না জানে?

ডাঃ চ্যাটার্জি কিন্তু নির্লিপ্তভাবে বললেন, পাঁচ-ছ' প্যাকেট সিগারেট খান আপনি? একটু কমাতে পারলে গলাটাকে রিলিফ দেওয়া হয়—এই ধরুন দিনে এক প্যাকেট, বড়জোর দেড় প্যাকেট—আজকাল দামও এত বেশি—অবশ্য সিগারেটের সঙ্গে যে ক্যানসারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, সে-কথা বলা যায় না। তবে কিডনিতে যে ক্যানসার হয়, তার সঙ্গে

সিগারেটের ...।

প্রথম আমাকে সিগারেট ধরিয়েছিল মিহির। তখন ক্লাশ এইটে পড়ি, তার মানে নাইনটিন থারটি নাইন, হ্যাঁ, সেই বছরই যুদ্ধ লাগলো, মনে আছে। তখন এলাহাবাদে থাকতাম। বাবা রেলে কাজ করতেন। মিহির ছেলেবেলায় খুব অসৎ ছিল। প্রত্যেকবার পরীক্ষায় ফেল করতো, গুণ্ডামি করতো, ক্লাশের ছেলেদের বই চুরি করে নৌসের আলীর দোকানে বিক্রি করে আসতো—তবু ওর খাতির ছিল ফুটবল টিমে ভালো ফরোয়ার্ড খেলতো বলে। মিহিরের পকেটে সবসময় নাবিকের ছবিওয়ালা সিগারেটের প্যাকেট। বেপরোয়া। সেই বয়েসেই মাঝে-মাঝে দাড়ি কামাতো মিহির। চোয়াড়ে ধরনের মুখ, ব্রন ভর্তি, কালচে ঠোঁট।

আমি খেলাধুলোয় কোনোদিনই তেমন ভালো ছিলাম না। গায়ের জোর ছিল না বেশি। তাই নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। ফুটবল খেলায় বিরুদ্ধ পক্ষের ল্যাং খেয়ে আমি আছাড় খেয়ে পড়ে যেতাম, কোনোদিন উল্টে ল্যাং মারতে পারি নি। স্কুল-টিমে কোনোদিন চান্স পাই নি সেজন্য। মাঝে-মাঝে অন্য টিমের সঙ্গে খেলা থাকলে—আমাদের স্কুল-টিমে যারা খেলে, তারা ফোর্থ পিরিয়ডে কিংবা ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ছুটি পেয়ে যেত। আমারও খুব ইচ্ছে হতো ওদের সঙ্গে যেতে। সে-ব্যবস্থা অবশ্য হয়ে গিয়েছিল ক্লাশ এইট-এ উঠে। মিহির ছিল বরাবর স্কুল টিমের ক্যাপটেন। সে আমাকে টুয়েল্‌ফথ্ ম্যান করে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেত।

নিজে খেলতে পারতাম না, কিন্তু মনে-মনে আমি খেলোয়াড়দের খুব শ্রদ্ধা করতাম। বাথরুমে ঢুকলেই, নানারকম অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগতো খুব। আমি যেন একটা অভিযাত্রী দলের নেতা হয়ে এভারেস্টে উঠছি—চূড়ায় উঠে প্রথম আমি পতাকা উড়িয়ে দিলাম, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো আমার নাম, অংশুমান দত্ত বললেই যে-কোনো লোক চিনতে পারবে—তখনও তেনজিং-হিলারী ওঠে নি তো ...। কিংবা জাহাজে করে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, একটা বাচ্চা মেয়ে হঠাৎ রেলিং থেকে পড়ে গেল জলে, সবাই হায়-হায় করছে, মেয়েটা হাবুডুবু খাচ্ছে বিষম ঢেউয়ের মধ্যে, তখন আমি, এই অংশু দত্ত ডাইভ দিয়ে পড়লাম জলে, সাঁতার দিয়ে অনায়াসে বাচ্চা মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনলাম ! সবাই তখন আমাকে নিয়ে ... বাথরুমে বসে এইসব ভাবতে-ভাবতে আমার রোমাঞ্চ হতো !

যদিও, মনে-মনে খুব সুস্পষ্টভাবে জানতুম, এসব আমার দ্বারা কোনোদিনই করা সম্ভব হবে না। সাঁতার কাটতে গেলে একটুতেই আমি হাঁপিয়ে পড়ি, বেশিক্ষণ ফুটবল খেলতে গেলে দম ফুরিয়ে যায়। অ্যাথলিটদের মতন শরীরের গড়ন নয় আমার। সেইজন্যই, যারা ভালো অ্যাথলিট তাদের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। আমার মনে হতো, তারা আমার চেয়ে অনেক উঁচু জাতের মানুষ।

মিহির ছিল সত্যিকারের ভালো খেলোয়াড়। আমাদের নর্থ পয়েন্ট স্কুলের ফুটবল টিম কখনও হারতো না। মিহিরের ড্রিবলিং, পাসিং ছিল সত্যিই দেখবার মতন, হাফ-গ্রাউন্ডের এপাশ থেকে সট্ মেরে ও গোল করে দিতে পারতো। অথচ, মিহিরকে শ্রদ্ধা করা সম্ভব ছিল না। মিহির সবসময় অসভ্য কথা বলতো, মাস্টারমশাইদের নামে আড়ালে এমন সব গালাগালি দিতো, যা আমরা কল্পনাই করতে পারতুম না। আমাদের ক্লাশের অনেক ছেলেকে মিহির সিগারেট ধরিয়েছে। আমি কিছুতেই সিগারেট খেতে রাজি হতুম না। মিহির যখন-তখন আমার গাল টিপে দিয়ে বলতো, মানুচু, মানুচু, তুই মেয়ে হলি না কেন রে ?

সবাই বলে, ছেলেবেলায় আমি দেখতে বেশ ভালো ছিলাম। আমাদের রেলওয়ে কোয়ার্টারসের পেছনে মেথরদের ওঠার যে ঘোরানো সিঁড়ি, সেইখান দিয়ে মিহির তিনতলায় আমার ঘরে উঠে আসতো দুপুরবেলা। মা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

পড়াশুনোয় আমি মোটামুটি ভালোই ছিলাম। বাবা ছিলেন বিষম বদরাগী। ছুটির দিনে প্রত্যেক দিন দুপুরে দশটা অঙ্ক আর পাঁচটা জ্যামিতির একস্ট্রা না করলে বাবা ভয়ঙ্কর রাগ করতেন। মারতেনও মাঝে-মাঝে। একবার বাবার হাতের প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় খেয়ে নাক দিয়ে এমন রক্ত পড়তে শুরু করেছিল যে, মা কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। মিহির আসতো আমার কাছে অঙ্ক বুঝে নিতে।

মিহির বলত, খা না, খেয়ে দ্যাখ না একটা। সিগারেট না খেলে মুখ থেকে দুধের গন্ধ ছাড়ে না ! আমি কিছুতেই রাজি হতুম না। আমার ধারণা ছিল, খারাপ ছেলেরাই সিগারেট খায়। আমি খারাপ ছেলে হতে চাই নি। আমি ভালো হবো, বড় হবো, সুভাষ বোসের মতন হবো, দেশের জন্যে প্রাণ দেবো, এইসব ভাবতাম। মাঝে-মাঝে মাথায় গান্ধী টুপি পরতাম। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং শ্লোক আবৃত্তি না করে কিছু খেতামও না।

সে-সময় আমাদের ধারণা ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বহুদিন ধরে চলবে। আমার বাসনা ছিল, খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠে, আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। সাধারণ মানুষের মতন চাকরি-বাকরি করবো না, বিয়ে করবো না।

কিন্তু মিহির এসে জুটেছিল কুগ্রহের মতন। আমাকে লালটু, রাঙামুলো এইসব বলে রাগাতো—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইতাম না—তবু জোর করে দুপুরবেলা আসতো। একদিন কতকগুলো ছবি দেখিয়েছিল আমায়—সেই ছবি দেখে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে এসেছিল। ছেলেবেলায়, সেই তের বছর বয়েসে মনে হয়েছিল, কী খারাপ ঐসব ছবি—কী ভয়ঙ্কর পাপের দৃশ্য ! এলাহাবাদে ঐ ধরনের খারাপ জিনিস অনেক ছিল, বইয়ের দোকানে—কখনো আমি তাকিয়ে দেখি নি।

ছেলেবেলায় সবচেয়ে আঁতে ঘা লাগে, যদি কেউ কাপুরুষ বলে। মিহির একদিন আমাকে তাই বলেছিল। আমি ভয়ঙ্কর রেগে উঠে বলেছিলাম, যা, যাঃ—তোর বীরত্ব ঢের জানা আছে। আমি সিগারেট খেতে চাই না—তা বলে পারি না ভেবেছিস ? দে দেখাচ্ছি ! ওর হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে হুস করে একটা টান দিয়ে বলেছিলাম, এই তো খেলুম, কী আছে এর মধ্যে ? সেই প্রথম, উনিশশো উনচল্লিশের জুন মাসের এক দুপুরে, তখন আমার বয়েস তের। আজ একচল্লিশ বছর বয়েসে পাঁচ প্যাকেটের কম সিগারেটে আমার চলে না।

মিহির হাসতে-হাসতে বললো, পুরোটা খা, তবে তো বুঝবো ! একটানে আর কী হয় ? আমার তখনও রাগ, আমি সিগারেটটাকে মুঠো করে ধরে বিষম জোরে তিন-চারটে টান দিতেই—আমার অসম্ভব চোখ জ্বালা করে উঠলো, দম আটকে গেল, কাশতে কাশতে আমি নুয়ে পড়লুম। মিহির আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় ফুঁ দিতে-দিতে বললো, ঠিক হয়ে যাবে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। পিঠটা সোজা কর—।

একটু বাদে যখন আমার কাশি কমলো, তখন আমার চোখে জল, মুখখানা লাল—মিহির আমার মুখটা তুলে বললো, ইস্ তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না রে ? তখন কিন্তু মিহিরের গলায় আর ঠাট্টার সুর নেই। যেন ও খানিকটা অনুতপ্ত, সত্যিই আমার জন্য দুঃখ পাচ্ছে। তারপর, মিহির একটা অবিশ্বাস্য (সেই কৈশোর-জীবনের পক্ষে) কাণ্ড করল। টপ্ করে ও আমার ঠোঁটে একটা চুমু খেল। আমি বিস্ময়ে ঘৃণায় শিউরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মিহিরের মুখখানা কিরকম বদলে গেছে। মুখে খানিকটা লজ্জা-লজ্জা ভাব, অথচ চোখ দুটো নেশাখোরের মতন ঘোলাটে। মিহির ফিসফিস করে বললো, অংশু, তুই আমার রানী হবি ?

আমি তখনও ঘোর বিস্ময়ে; জিজ্ঞেস করলাম, রানী হব ? তার মানে কী ? আমি কী করে রানী হব ?

মিহির অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, 'মনে কর, আমি রাজা, তুই আমার রানী ! আর কেউ একথা জানতে পারবে না !

কথা বলতে-বলতে মিহির আমার কাঁধে হাত রেখে আমার ঠোঁটের কাছে ওর মুখ নিয়ে এলো। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাত বাড়িয়ে ওকে আটকাবার চেষ্টা করলাম—ও তবু জোর করে আবার ঠোঁট ছুঁইয়েছে—আমি কনুই দিয়ে ওর মুখ ফাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। ঘেন্নায় আমার গা রি-রি করছে তখন। মিহির উন্মত্তের মতন আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, অংশু, আমি তোকে ভালবাসি, মাইরি—।

আমি মিহিরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলাম। মিহিরের গায়ের জোর ঢের বেশি ছিল, কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর—টেবিলের ওপর জিওমেট্রি বক্স খোলা ছিল—তার থেকে কম্পাসটা তুলে দুটো কাঁটাই আমি মিহিরের পিঠে গেঁথে দিলাম। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে মিহির ছিটকে খাট থেকে পড়ে গেল, আমি ছুটে গেলাম বাথরুমে। বারবার মুখ ধুলাম, সাবান দিয়ে ঠোঁট দুটো ঘষতে লাগলাম, তবু মুখ থেকে সেই বিশ্রী স্বাদ গেল না। শুধু মনে হতে লাগলো, আমার ঠোঁটে মিহিরের থুতু লেগে আছে।

ঐ ঘটনার জন্যই প্রথম সিগারেট খাওয়ার দিনটার কথা আমার মনে আছে। মিহিরের প্রতি রাগ থেকেই আমি তারপর বেশ কিছুদিন সিগারেটের ওপর তীব্র ঘৃণা বুকে পুষে রেখেছিলুম। আজ একচল্লিশ বছর বয়েসেই, অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার দোষে আমার ক্যানসার হওয়ার ভয় জন্মেছে। ক্যানসারই হয়েছে আমার, আর বেশিদিন আয়ু নেই।

২

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

সকালবেলা রতন এসেছিল। রতনও আমার সেই ছেলেবেলাকার এলাহাবাদের বন্ধু। রতনকে আজ একটা মিথ্যে কথা বললাম। রতন বহুদিন এদেশে ছিল না। ফরেন সার্ভিস নিয়ে বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসে ঘুরেছে। শেষবার ছিল ক্যানাডায়, আবার বদলি হবার আগে দু'মাসের ছুটি পেয়ে দেশে ফিরেছে। বেশ উন্নতি করেছে রতন, চেহারাও ফিরেছে, আমারই বয়েসী—অথচ দেখতে ছোকরা বলে মনে হয়।

জীবন কত অদ্ভুতভাবে বদলায় ! ছেলেবেলায়, সেই এলাহাবাদে, কেউ স্বপ্নেও কি ভেবেছিল, রতন কোনোদিনও এমন উন্নতি করবে, এমন স্মার্ট ব্যবহার, সুন্দর চেহারা হবে তার ! আজ চেয়ারে বসবার সময় রতন খুব কায়দার সঙ্গে দু'হাঁটুর সামনে প্যান্ট চেপে ধরে একটু টেনে নেয়। বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে, 'তাই নাকি?' বলার সময় এমন সুন্দরভাবে ভুরু দুটো কোঁচকায়, ঠিক সাহেবদের মতন ! রতনকে আমরা সবাই ইস্কুলে পড়ার সময় ল্যাবা-ল্যাবা বলে খেপাতুম। মিহির ওকে বলতো লেধরুস্ ! টেস্ট পরীক্ষায় রতন দু' সাবজেক্টে ফেল করেছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে। রতনের বাবা ছিলেন এলাহাবাদের খুব নামকরা উকিল, তিনি অনেক চেষ্টা করে রতনকে অ্যালাউ করিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। মাস্টারমশাইরা বলেছিলেন, আমিই সেবার স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবো ! রতন ছিল নেহাত করুণার পাত্র। আজ আমি সরকারি অফিসে সামান্য জুনিয়র অফিসার হয়েছি ! আর রতন ফরেন সার্ভিসে যে-রকম উন্নতি করছে—শিগগিরই ভাইস কন্‌সাল হয়ে যাবে !

কলেজে এসে অবশ্য রতন পড়াশুনোয় উন্নতি করেছিল, তাও এমন কিছু না, কোনোদিনই ও চালাক-চতুর চটপটে ছেলে ছিল না। আমরা কখনো কোথাও পিকনিকে গেলে কিংবা বেড়াতে

গেলে, রতন প্রথমেই বাথরুমের খোঁজ করত। ঐটি ছিল ওর প্রধান দুর্বলতা। কখন যে রতনের ঐটি পাবে ঠিক ছিল না, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে মগ হাতে নিয়ে ছুটতো। রতনের বাবার ক্ষমতা ছিল বাড়িতে প্রফেসার রেখে রতনকে পড়াবার। আর কলেজে পড়তে-পড়তেই আমার বাবা যদি মারা না যেতেন ... থাক ওসব কথা। রতনের উন্নতিতে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। জীবনে অনেক কিছুই এমন আকস্মিকভাবে বদলায়। আমিও তো আগে খুব লাজুক ছিলাম, এখন তা একটুও বোঝা যায়!

রতন সব পুরোনো বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করছিল। এলাহাবাদের সেই বাল্যকালের স্মৃতি নিয়ে খেলা করতে ওর ভালো লাগছিল। কথায় কথায় রতনই জিজ্ঞেস করল—মিহির কোথায় আছে আমি জানি কিনা। মিহিরকে ওর বেশ মনে আছে। আমি মিথ্যে কথা বললাম। এমন ভাব দেখালাম, যেন সেই মিহিরের কথা আমার মনেই নেই। অনেকক্ষণ পর অতিকষ্টে মনে পড়ার ভান করে বললাম, নাঃ, তার সঙ্গে আজ কুড়ি-পঁচিশ বছর আর দেখা হয় নি। এখন রাস্তায় দেখা হলে হয়তো চিনতেই পারব না।

রতন হাসতে-হাসতে বললো, না রে, সব ভোলা যায়, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুদের কিছুতেই ভোলে না মানুষ। এখন তো কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, দু'দিন বাদেই তাদের মুখ ভুলে যাই, নাম ভুলে যাই। কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে যতদিন পরেই দেখা হোক না কেন—চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

আসলে মিহিরকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমার জীবনের নানান সন্ধিক্ষণে মিহির এসে ধূমকেতুর মতন উদয় হয়েছে। যেন আগে থেকে ঠিক করা কোনো চক্রান্তে আমার জীবনে মিহিরকে আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে কেউ। মিহিরের কাছে আমি বারবার হেরে গেছি।

নবনীতাকে কেড়ে নিয়ে মিহির শেষবার আমাকে পরাজিত করেছে। শুধু যে আমি নবনীতাকে হারিয়েছি তাই নয়, আমি প্রেমও হারিয়েছি। আর কারুকে এখন ভালবাসতে পারি না। সব নারীকেই এখন মেয়েমানুষ বলে মনে হয়। থাক, নবনীতার কথা আজ আর মনে করতে ইচ্ছে করছে না।

৩

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

হ্যাঁ, বড্ড লাজুক ছিলাম ছেলেবেলায়। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে হৈচৈ করতে পারতাম ঠিকই, কিন্তু অচেনা লোকদের সামনে, এমন কি আত্মীয়স্বজনদের সামনেও কিছুতেই আমার মুখ খুলতো না। মা আর টুনী পিসীমা ছাড়া আর কোনো মহিলার বা মেয়ের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতে পারি নি কোনোদিন। পিসীমা বলতেন, এ ছেলেটা কী ! পুরুষমানুষের এত লজ্জা কিসের ? দ্যাখ তো তোর দাদা কিরকম ফটাফট কথা বলে, সেদিন সেই দর্জি ব্যাটাকে কীরকম ধমকে দিল !

দাদা আমার থেকে মাত্র চার বছরের বড়, সে-সময় সত্যিই খুব তেজ ছিল দাদার ! দাদা পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল না, কিন্তু কথাবার্তায় খুব বাবাকে অনুকরণ করতো। বাবা বাড়িতে না থাকলে দাদাই হয়ে যেত বাড়ির কর্তা, মাকে পিসীমাকে পর্যন্ত গম্ভীরভাবে হুকুম করত। রজ্জব আলী ছিল বাবার অফিসে খাস পিওন, প্রায়ই বাড়িতে এসে এটা- সেটা পৌঁছে দিয়ে যেত বাবার কাছ থেকে, দাদা তার সঙ্গে কথা বলতো অবিকল বাবার গলার সুর নকল করে। আমাকে

তো দাদা মানুষ বলেই গণ্য করতো না, চাকরের মতন খাটাত, রাত্তিরে ঘুমের আগে প্রত্যেকদিন আমাকে খাট থেকে নেমে আলো নেবাতে হতো। মিহিরও সমীহ করে কথা বলতো দাদার সঙ্গে। সেই দাদা আজকাল বৌদিকে কী ভয়ই করে ! দাদা আজকাল আমাকেও একটু ধমকায় না।

পিসীমা আমাকে সবসময় দাদার উদাহরণ দিয়ে আমার লাজুকতা সম্পর্কে খোঁচা দিতেন। সেই পিসীমাকেই কিন্তু একদিন অন্য কথা বলতে শুনেছি। রান্নাঘরে পিসীমা মাকে বলেছিলেন, জানো বৌদি, লাজুক লোকেরা খুব সৎ হয়, তারা কখনো খারাপ কাজ করে না। তোমার মেজ-ছেলে একদিন মানুষের মতন মানুষ হবে, আমি বলে দিলাম, দেখে নিও! (আমাকে বাড়ির মেজ ছেলেই বলতো সবাই—যদিও আমার ছোট ভাই জন্মাবার তিনদিন পরেই মারা গিয়েছিল—আর কোনো ভাইবোন হয় নি আমার।) সেদিন পিসীমার কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে যেমন লজ্জা পেয়েছিলাম, তেমনি গর্বও হয়েছিল। আমার লাজুকতার জন্য সবার কাছে গঞ্জনাই শুনতে হতো, কিন্তু এর যে একটা ভালো দিকও আছে, সেদিন প্রথম শুনলাম। অবশ্য আজ বুঝতে পারি—পিসীমার কথার মধ্যে কোনো সার সত্য নেই, পৃথিবীতে এরকম কোনো নিয়ম খাটে না। আমি তো মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠি নি ! সেই ব্যর্থতার যন্ত্রণা আমাকে সর্বক্ষণ কষ্ট দেয়।

মিহিরকে কখনো আমি এড়াতে পারি নি। সেদিন ওর পিঠে কম্পাসের কাঁটা বিঁধিয়ে দেবার পর মিহির পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরদিনই, স্কুলে ওকে দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলেও, মিহির আমার হাত চেপে ধরে আমাকে জলের ট্যাঙ্কের পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে শাসানি দিয়ে বলেছিল, দ্যাখ শালা, তুই যদি কালকের কথা কারুকে বলিস, তাহলে তোর ভালো হবে না কিন্তু ! আমিও তাহলে সবাইকে বলে দেব, আমি তোকে চুমু খেয়েছি দু'বার, তুই আমাকে দিয়েছিলি খেতে, দেখিস তখন ! সেই সম্ভাবনার কল্পনাতেই আমি কেঁপে উঠেছিলাম, ক্লাশসুদ্ধ ছেলে যদি জেনে যায়, আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়—আমি তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, না, না—। মিহির হেসেছিল তখন কুৎসিতভাবে। তারপর থেকে, মিহির আর কখনো ওসব চেষ্টা করে নি যদিও, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি কথা বলাও বন্ধ করতে পারি নি। এক ক্লাশে পড়ি, ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলেই সবাই কারণ জানতে চাইত।

মিহিরের যে একেবারে কোনো গুণ ছিল না, তা নয়। ছেলেবেলায় মিহির কখনো মিথ্যা কথা বলতো না। অনেকরকম দুষ্টুমি বদমাইসী করতো, কখনো ধরা পড়ে মার খেতে-খেতেও সেগুলো অস্বীকার করতো না। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারকে মিহির একবার হেড়ু বলে ডেকেছিল। হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম ছিল শিউনারায়ণ মিশ্র, তিনি বাংলা বেশ ভালো বুঝতেন। তিনতলায় আমাদের ক্লাশের জানলা থেকে মিহির বেশ চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলেছিল একদিন, ঐ দ্যাখ হেড়ু যাচ্ছে; শিবু, হেড়ুর মাথার টাকখানা দেখেছিস, এখান থেকে কীরকম ...। দারুণ রেগে গিয়েছিলেন হেডমাস্টার মশাই, একখানা লিকলিকে বেত নিয়ে এসে বলেছিলেন, বল, কে বলেছে? কে? নইলে সবাইকে পাঁচ ঘা করে বেত মারবো ! মিহিরের ভয়ে আমরা কেউ-ই ওর নাম বলে দিতে সাহস করি নি। শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টার মশাই যখন সত্যিই বেত মারতে আরম্ভ করলেন, আমাদের ক্লাশের ফার্স্ট বয় দীপচাঁদকে এক ঘা বেত কষালেন, তখন মিহির এগিয়ে এসে বললো, আমি বলেছি, স্যার ! মাপ কিজিয়ে ! হেডমাস্টার মশাই মিহিরের হাতের চেটোতে গুনে-গুনে পঁচিশ ঘা বেত কষিয়ে দিলেন—সেদিন কিন্তু আমরা মিহিরের দোষটাকে ভুলে গিয়ে ওর মার খাবার ক্ষমতা দেখে ওর দিকে শ্রদ্ধার চোখেই তাকিয়েছিলুম।

মিহিরের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল। সবসময় ওর পকেটে খুচরো পয়সা ঝনঝন করতো। সে-সময় আমরা মাত্র দু'পয়সা করে পেতাম টিফিনের জন্য। তাতে কোনো অভাব বোধ করতুম না অবশ্য। আধ পয়সায় পাওয়া যেত ঝালচানা, লাঠি লজেন্স ছিল পয়সায় চারটে, এক পয়সায়

একটা কড়িটানা চাঁদিয়াল ঘুড়ি পাওয়া যেত। মিহিরের পকেটে অত পয়সা থাকলেও ও এক-একদিন এমনিই কৌতুক করার জন্য ক্লাশের ছেলেদের পকেট থেকে পয়সা কেড়ে নিত, কারুর কাছে নতুন গল্পের বই দেখলে সেটা যে কোনো উপায়ে হোক চুরি করে বিক্রি করে দিয়ে আসতো—আবার সেই মিহিরই এক-একদিন আমাদের দারুণ খাওয়াতো। দোকানে ঢুকে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া আমাদের কাছে তখন ছিল দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এলাহাবাদের বিখ্যাত রাড়েওয়ালার দোকানে মিহির আমাদের এক-একদিন নিয়ে গিয়ে বলতো, নে, কচৌরি, জিলাবি আর রাবড়ি কত খাবি খা !

স্কুল থেকে একবার আমরা অমরাবতীতে আউটিং করতে গিয়েছিলাম, তিনদিন ছিলাম সেখানে। আমাদের স্কুলেরই ব্রাঞ্চ একটা গার্লস স্কুল ছিল, সেখানকার মেয়েরাও গিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো বাড়িতে আমরা থাকতাম। তখনকার এলাহাবাদেও ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় খুব বিধিনিষেধ ছিল না। সন্ধেবেলায় আমাদের একসঙ্গে ক্যাম্প-ফায়ার হতো। মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসতাম— একদিকে আমরা, অন্যদিকে গার্লস স্কুলের মেয়েরা—গল্প, আবৃত্তি, হাস্য-কৌতুক, যার যা খুশি করা হতো। সেইখানে মিহির আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল।

প্রথমদিন মিহির একেবারে মেয়েদের ধার ঘেঁষে বসেছিল, ওর গলা ভালো ছিল না—তবু দু'খানা গান গেয়েছিল, সে গান দু'খানাকেই আমরা হাস্যকৌতুক বলে ধরে নিয়েছিলাম, মেয়েরাও খুব হাসছিল। পরদিন সকালে মিহির আমাকে বললো, এই অংশু, তুই অত মেনিমুখো কেন রে ? ক্যাবলা এক নম্বরের—

আমি অবাক হয়ে বললুম, কেন ? কী করেছি ?

মিহির ভেঙিয়ে বললো, কী করেছি ! ন্যাকা ! দুটো মেয়ে তোর দিকে অত করে তাকাচ্ছিল, আর তুই ঘাড় গুঁজে বসেছিলি কেন ?

—তাকাচ্ছিল তো আমি কী করবো ?

—বুঝতে পারিস না ভেলুরাম, মেয়ে দুটোর তোকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। চেহারাখানা তো করেছিস লালটু লালটু, এদিকে মুরোদ নেই এক ফোঁটা !

—যাঃ !

—শোন, আজ সন্ধেবেলা তুই মেয়ে দুটোর চোখে-চোখে চাইবি—আমি দেখিয়ে দেবো কোন্ দুটো মেয়ে—ওরা হাসলে তুইও হাসবি—তারপর ক্যাম্প ফায়ার শেষ হলে ওদের সঙ্গে আলাপ করবি—আমি গেটের কাছে গুলমোহর গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো—সেখানে ওদের নিয়ে আসবি !

—এনে কী হবে ?

— আমিও ওদের সঙ্গে আলাপ করব। দুটো মেয়ে তো ! তোকে টোপ ফেলে আমিও ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

—আলাপ করে কী হবে ?

—কী হবে ? অ্যাঁ ?

মিহির হো-হো করে হেসে উঠলো। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। সত্যিই, সেই বার- তের বছরের মেয়েদের সম্পর্কে আমার কোনো আকর্ষণই ছিল না। তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করার কোনো কারণই আমার মাথায় ঢোকে নি। বরং মেয়েদের সম্পর্কে একটা করুণামিশ্রিত অবজ্ঞাই ছিল বলা যায়।—ওরা জোরে দৌড়তে পারে না, একটু কিছু হলেই কেঁদে ফেলে, নিজেদের মধ্যে কানে-কানে কী সব গোপন কথা বলে হাসে—দূর দূর, ওদের সঙ্গে ছেলেদের একদম

মিশ খায় না ! তাই মিহিরের আগ্রহ আমি বুঝতে পারি নি।

সেবার মিহিরের টোপ হতে আমি রাজি হই নি। ক্যাম্প ফায়ারের সময় মিহির অনবরত আমাকে চিমটি কেটেছে, কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছে, ঐ যে ঐ শালোয়ার-কামিজ-পরা দুটো মেয়ে, তাকা, তাকা, হাস একটু... । আমি মিহিরের কথা শুনি নি। দুটি মেয়ে সত্যিই মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিল আমার দিকে, হেসে-হেসে কী যেন বলছিল নিজেদের মধ্যে, তাতে আমি বেশ বিরক্তই বোধ করছিলাম, ভাবছিলাম, সেকেন্ড স্যারের কাছে ওদের নামে নালিশ করে দেবো কিনা।

অথচ, তার পরের বছরই নবনীতার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই প্রথম দেখাই আমার জীবনে দাগ কেটে যায়। সেবার সঙ্গে মিহির ছিল না। আমি জব্বলপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের আত্মীয়স্বজন প্রায় সবাই বাংলাদেশের বাইরে— জব্বলপুরে থাকতেন বড় মামা। বড় মামার মেয়ে বড়দি আর সন্তোষ জামাইবাবুও তখন বেড়াতে এসেছিলেন জব্বলপুরে। আমি আগেও দু'বার ওখানে গেছি, কিন্তু কোনোবারই মারবল রকস দেখা হয় নি। সে-সময় তো আর এখনকার মতন মারবল রকসে যাবার জন্য এত ভালো রাস্তা ছিল না, মোটরগাড়িও যেত না। টেমপো কিংবা অটোরিক্সারও চল হয় নি। টাঙ্গা কিংবা এক্কায় যেতে হতো, অনেক সময় লাগতো। বড় মামা ব্যস্ত মানুষ, আমাকে নিয়ে যাবার সময় পেতেন না।

সেবার বড়দি আর জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। ভেড়াঘাটে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলাম নর্মদা নদীর পাড়ে। নর্মদা নদীতে নৌকোয় চড়ে কিছুটা না গেলে মারবল পাথর কিছুই দেখা হয় না। এক একটা নৌকোয় সাতজন-আটজন করে নেয়; আর একটি বাঙালি পরিবার ছিল সেখানে, তাঁরাই এসে জামাইবাবুকে বললেন, আসুন না, আমরা ভাগাভাগি করে এক নৌকোয় যাই। সেই পরিবারের মধ্যে নবনীতা ছিল। নবনীতার মা, বাবা আর দিদি। নবনীতার দিদির সঙ্গে আমার বড়দির মুহূর্তেই ভাব জমে গেল।

নৌকোয় নবনীতা বসেছিল ঠিক আমার মুখোমুখি। মাখনের মতন গায়ের রং, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, একটা সাদা সাটিনের ফ্রক পরেছিল, পায়ে একটা সাদা চটি। আমার মনে হয়েছিল যেন একটা ধপধপে সাদা রাজহংসী। ছোট্ট নৌকো, পাটাতনে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়, নবনীতার হাঁটুর সঙ্গে আমার হাঁটু ঠেকে যাচ্ছিলো। আজও মনে আছে সেই দৃশ্য। কত বছর আগেকার কথা, প্রায় ছাব্বিশ বছর, কিন্তু একটুও ভুলি নি। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিলো নবনীতার চুল, ফ্রকটাও উড়ে যাচ্ছে উরুর কাছে, নবনীতা তাই এক হাতে চুল আর অন্য হাতে উরুর কাছে ফ্রক চেপে ধরেছিল। নবনীতার সেই ভঙ্গিটি একটা বাঁধানো ছবির মতন আমার চোখে ভাসছে। নদীর দু'ধারে ঝকঝকে সাদা মারবল পাথরে রোদ ঠিকরে পড়ছে, তার মাঝখানে ঐ দুধ-বরণ মেয়েটি। প্রথম দর্শনেই প্রেম যাকে বলে, আমার তাই হয়েছিল। কোনো অচেনা মেয়ের অত কাছে বসি নি আগে কখনো—হাঁটুতে হাঁটু ছুঁয়ে আছে—আমার সারা শরীর শিরশির করছিল, বুকের মধ্যে অকারণে এমন টিপটিপ করছিল—যেন মনে হচ্ছিলো, বাইরে থেকেও তা শুনতে পাওয়া যাবে।

অত কাছাকাছি মুখোমুখি বসে কথা বলতেই হয়। আমি আড়ষ্টতা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন ক্লাশে পড় ?

সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে আলতোভাবে ও বললো, ক্লাশ এইট।

আমি তখন টেন-এ পড়ি, সুতরাং খানিকটা অহঙ্কার করতেই পারি। মেয়েটি যতই সুন্দরী হোক, আমার চেয়ে নিচের ক্লাশে তো পড়ে !

— তোমার নাম কি ?

— নবনীতা বসু।

শুনেই আমার মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর নাম আমি কখনো শুনি নি। নবনীতা কথাটার মানেই জানতাম না তখন, বাংলা নলেজ তো কোনোদিনই ভালো নয় আমার ! তবু মনে হয়েছিল কথাটা ভারি নরম আর মধুর এবং নবনীতাকে দেখে ওর গায়ের রং মাখনের মতনই মনে হয়েছিল। আর কোনো মেয়ের এমন চমৎকার নাম নেই, এমনকি, তখন পর্যন্ত কোনো মেয়ের চার অক্ষরের নামই শুনি নি। সেই তুলনায় আমার নিজের নামটা খুব খারাপ মনে হয়েছিল। ধুৎ, অংশু আবার একটা নাম নাকি ! বাবা বেছে-বেছে এমন নামই রেখেছেন ! (আমার দাদার নাম আরও খারাপ। দাদার নাম প্রভাংশু। আমার বাবা এমন গম্ভীর ও রাশভারী মানুষ ছিলেন, কিন্তু ছেলেমেয়ের নাম রাখা নিয়ে এমন চাঁদের বাতিক ছিল কেন, কী জানি ! আমার যে-দিদি গত বছর মারা গেল, তার নাম ছিল চন্দ্রা।)

নবনীতাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা জব্বলপুরেই থাক ?

—না, আমরা এখন নাগপুরে থাকি। জব্বলপুরে বেড়াতে এসেছি। আগে আমরা গোয়ালিয়র থাকতুম !

তৎক্ষণাৎ আমি মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, যে-করেই হোক শিগগির আমাকে নাগপুর যেতেই হবে। জামাইবাবু বোম্বেতে কাজ করেন। ওঁর কাছে যাবার ছুতো করে ... নাগপুর নিশ্চয়ই খুব ভালো জায়গা।

আমি আঙুল তুলে নবনীতাকে দেখিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললুম, ঐ দ্যাখো, দ্যাখো, পাহাড়টা ওখানে ঠিক হাতির মাথার মতন দেখাচ্ছে ! সাদা রঙের হাতি !

নবনীতা বললো, সত্যি, কী সুন্দর, না ?

তখন আমার একেবারে গদগদ অবস্থা তো ! সুন্দর কথাটা যে কত সুন্দর, নবনীতার মুখে শুনেই যেন সেদিন সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

মারবল রকস দেখার পর আমরা কাছাকাছি ধোঁয়াঘাট দেখতে গিয়েছিলাম একসঙ্গে। সেখানে জলপ্রপাত আছে। পাথুরে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি এক সঙ্গে, তখন আর বেশি কথা হয় নি। কিন্তু একটা কথাই শুধু বারবার মনে হচ্ছিলো আমার, এই মেয়েটির সঙ্গে কি আর কখনো দেখা হবে না? হে ভগবান, যেন দেখা হয়, যেন দেখা হয়, আমার এত ভালো লাগছে ওর পাশে-পাশে হাঁটতে—।

তখন তো আর—ঐ বয়েসের ছেলেমেয়ের হঠাৎ কোথাও আলাপ হবার পর ঠিকানা নেওয়া কিংবা চিঠি-ফিঠি লেখার রেওয়াজ ছিল না ! জানি না, এখনকার ছেলেমেয়েদেরও ওসব চলে কিনা। সুতরাং সেদিনের পর থেকে নবনীতা হারিয়ে গেল। আমার আর নাগপুরে যাওয়া হয় নি। গেলেও হয়তো কোনো লাভ হতো না—নবনীতার বাবার ট্রান্সফারের চাকরি—হয়তো আবার কোথাও ট্রান্সফার হয়ে গেছে ওরা। একবার এলাহাবাদে আসতে পারে না ?

জব্বলপুরে থাকার সময়েও আর ওদের সঙ্গে দেখা হয় নি। সেখান থেকে ফিরে, নবনীতার কথা আমি এলাহাবাদে কারুক্কে বলি নি। সেই বয়েসে, নবনীতার কথাই ছিল আমার একমাত্র গোপন সম্পদ। মাঝে-মাঝে, ঘুরতে-ফিরতে যখন আমার মনে পড়তো নবনীতার মুখ, তখন একথাও মনে হত, এই মুখের ছবিখানা আমার সম্পূর্ণ নিজের—আর কেউ একথা জানে না। নবনীতাও না।

পাঁচ বছর বাদে নবনীতাকে দেখে প্রথম আমার চিনতে একটুও অসুবিধে হয় নি। তখন সে শাড়ী পরে, চুল বাঁধে অন্যভাবে, চেহারা অনেক বদলে গেছে—কিন্তু আমার মনের ভেতরে লুকনো সেই মুখচ্ছবির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল। আমি তখন ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিতে এম.এ. পড়ি,

ফিফ্‌থ ইয়ার—আই.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, তাই গেটের সামনে খুব ভিড়। তখন পরীক্ষার ছাপানো রেজাল্ট আশুতোষ বিল্ডিং-এর দেয়ালের গায়ে সেঁটে দেওয়া হতো। সেই ভিড়ের মধ্যে নবনীতাকে দেখলাম আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে। রেজাল্ট জেনে নবনীতা বাইরে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ডিভিশান ?

নবনীতা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ফার্স্ট ডিভিশান !

—আপনার নাম নবনীতা বসু না ? আমাকে চিনতে পারছেন ? সেই জব্বলপুরে দেখা হয়েছিল—।

—জব্বলপুর ? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।

গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম, নবনীতা আমাকে চিনতে পারে নি। তো তো পারবেই না, নবনীতার মনের মধ্যে তো পাঁচ বছর ধরে আমার মুখখানা আঁকা ছিল না ! নবনীতার কিন্তু জব্বলপুরে বেড়াতে যাবার ঘটনা মনে আছে, সেখানে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাও মনে আছে। বললো, আপনার চেহারা কিন্তু অনেক বদলে গেছে !

আমি মনে-মনে ভাবলাম, তা হবে হয়তো ! মেয়েদের কৈশোর আর যৌবন বেশ কাছাকাছি থাকে, ছেলেদের কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে দূরত্ব অনেক।

আমি বললাম, আজ আপনাদের রেজাল্ট বেরুলো, চলুন, আমাদের ক্যান্টিনে চা খাওয়াচ্ছি! আসবেন ?

— আমার সঙ্গে দু'জন বন্ধু আছে যে !

— তাদেরও নিয়ে আসুন !

নবনীতার সঙ্গের মেয়ে দুটির মধ্যে একজন জয়ন্তী। জয়ন্তীকে সেদিনই আমি প্রথম দেখলাম।

৪

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

আমি কুসংস্কার মানি না। মরে যাই সেও ভি আচ্ছা, তবু কোনোদিন কোনো ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করতে যাবো না। শেষ বয়েসে দাঁত পড়ে গেলে অমনি পুজোআচ্চাও শুরু করবো না। পেছন থেকে কেউ হেঁচে উঠলে, সেই সময় বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করি নি আমি কোনোদিন। কিন্তু অসুখ করলে মানুষের মনটা বড় দুর্বল হয়ে যায়। এই ঘুসঘুসে সর্দি আর গলার ব্যথাটা আমাকে ক্যানসারের ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

এই একচল্লিশ বছর বয়েসে—আমার আগেও তো অনেকবার শক্ত অসুখ হয়েছে। ছেলেবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল সাংঘাতিক, তখন টাইফয়েড অসুখটা এখনকার মতন জল-ভাত তো ছিল না, গোটা-কতক ক্যাপসুল গিলে ফেললেই এখন টাইফয়েড ঠাণ্ডা, তখন অনেকে বাঁচতো না। কিন্তু আমি বেঁচে গেছি। ছাব্বিশ বছর বয়েসে একবার ফুড-পয়জন হয়েছিল এবং হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল। আর একবার, সিকসটি থ্রি'র জুন মাসে—আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলাম, নির্ঘাত চাপা পড়ার কথা ছিল, কিন্তু কিছুই হয় নি শেষ পর্যন্ত। কোনোবারই এমন মৃত্যুভয় পাই নি।

রতন বলছিল, তুই কোন্ সাহসে ক্যানসার স্পেশালিস্ট দেখাতে গেলি ? তোর সাহস তো কম নয় ! সত্যি ক্যানসার হলেও লোকে ডাক্তারের কাছে যায় না। ডাক্তার যদি একবার হ্যাঁ বলে, তাহলেই তো মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করা হয়ে গেল। তার চেয়ে যতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় ! তোর

তো সামান্য সর্দি আর গলা ব্যথা !

সাহস নয়, ভয়ের চোটেই ডাক্তারের কাছে গেছি আমি। এবারের মতন মৃত্যুভয় আগে কখনো পাই নি। মরতে যে একদমই চাই না। যে-করে হোক বাঁচতে চাই !

ভয় থেকেই তো কুসংস্কারের জন্ম। ক'দিন ধরেই একটা কথা মনে হচ্ছে—পাপ থেকেই ক্যানসার হয়। আমার পাপের ফলেই আমি ক্যানসারে মরতে যাচ্ছি ! কিছুতেই এ কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না। অথচ, জানি তো, রোগ হয় শরীরে—আর পাপের স্পর্শ লাগে মনে—দুটো আলাদা ব্যাপার, ক্যানসার তো আর মানসিক রোগ নয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তো ক্যানসারে মারা গেছেন, তিনি তো আর পাপী ছিলেন না।

অসুখের আর একটা উপসর্গ হচ্ছে, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাই, হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ে। এটাও একটা ভয়ের কথা। কেননা, শুনেছি, মৃত্যুর আগেই মানুষেরা সারা জীবনের কথা মনে পড়ে। আমি কি তাহলে মরতেই বসেছি ? অথচ, আমাকে দেখলে কেউ কিছু বুঝবে না, আমার স্বাস্থ্য এখনও বেশ ভালোই আছে, একটাও চুল পাকে নি, বেশ খিদে আছে—খেতে একটুও অরুচি হয় না—এই অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো ? তাহলে, এত সমস্ত অন্যায় করলাম কেন ? সবই তো বেঁচে থাকারই জন্যে !

একটু নিরালায় বসলেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে আজকাল। মাত্র পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনাও মনে হয় কত দূরের—বহু পাহাড়-সমুদ্র পেরিয়ে অন্য এক জগতে ছিল যেন আমার শৈশব-কৈশোর !

ছেলেবেলায় সবাই বলতো আমার চেহারা সুন্দর। এখন আমাকে কেউ সুদর্শন কিংবা সুপুরুষ বলে না। রূপ কখনো হারায় না—কিন্তু পবিত্রতা আর সারল্য চলে গেলে রূপেরও বদল হয়। অনেক প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধকেও তো মাঝে-মাঝে খুব সুন্দর মনে হয়, তারা কি সবাই পবিত্র এবং সরল মনের মানুষ ? চল্লিশ-পঞ্চাশ বয়েস পর্যন্তও কেউ সরল পবিত্র থাকতে পারে ? তাও কি সম্ভব ? তাহলে সে বাঁচবে কী করে ? ছেলেবেলায় আমি সত্যিই খুব সৎ ছিলাম—কৈশোরের শেষ পর্যন্তও বলা যায়; তবু, আস্তে-আস্তে বদলাতে হলো শুধু বেঁচে থাকারই জন্য !

কিরকম ভাবে বদলে গেছি—এখন তা ভেবে মাঝে-মাঝে শিউরে উঠি। কিন্তু উপায়ও তো নেই— বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করেই তো বাঁচতে হবে। ছেলেবেলায় ভালো ছেলে হওয়ার ব্যাপারে আমার একটা জেদ ছিল। আমার চরিত্রের গঠনই ছিল এমন যে, কোনো খারাপ কাজ করে আমি নিষিদ্ধ আনন্দ পেতাম না, বরং হঠাৎ কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে আমার অনুতাপই হতো। একটা ছোট ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

এলাহাবাদে ক্যাথলিক গির্জার সামনের মাঠে আমরা রোজ বিকেলে খেলতে যেতাম। তখন আমরা ক্লাশ টেনে পড়ি, সামনেই টেস্ট পরীক্ষা, সন্ধে হতে না হতেই বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হয়। বাবা তখনও বেঁচে, পড়াশুনোর ব্যাপারে বিষম কড়াকড়ি করতেন। পড়ায় একটু ফাঁকি দিলেই শ্লেষের সঙ্গে বলতেন, শেষ পর্যন্ত স্টেশনের পানিপাঁড়ের চাকরি ছাড়া আর কিছু জুটবে না !

বিকেলবেলা গির্জার মাঠে খোলা হাওয়া নাকে নিতে খুব ভালো লাগতো। আমাদের মধ্যে একমাত্র মিহিরেরই কোনোরকম পরীক্ষা সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। পরীক্ষায় ফেল করবো—একথা ভাবলেই বুকের মধ্যে টিপটিপ করতো আমার, অথচ মিহির অনায়াসেই ঠোঁট উল্টে বলতে পারতো, আমি তো শালা এবার পরীক্ষায় গাড্ডু মারবো জানিই—আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ এক চান্সে ম্যাট্রিক পাশ করে নি।

মিহিরদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, এলাহাবাদ স্টেশনের কাছে ওদের বিরাট

দোকান—ইলেকট্রিকের জিনিসপত্র বিক্রি হতো, তাছাড়া, ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছে ওদের দু'খানা বাড়ি ছিল—তীর্থযাত্রীদের কাছে ভাড়া দেওয়া হতো—সুতরাং পরীক্ষায় পাশ করার ব্যাপারে মিহিরের তেমন গরজ ছিল না। তাছাড়া, তখন যুদ্ধের আবহাওয়া—আমরা ছেলেমানুষ ছিলুম বলেই মনে হতো—পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ বহুকাল ধরে চলবে—মিহিরের ইচ্ছে ছিল, ও যুদ্ধে যোগ দিয়ে পাইলট হবে। বোমারু বিমান নিয়ে উড়ে গিয়ে অনেক নগর–বন্দর ধ্বংস করে আসবে।

সন্ধের সময় মিহিরই আমাদের রোজ দেরি করিয়ে দিত। আমরা বাড়ি ফেরার কথা তুললে মিহির বলতো, আরে দাঁড়া, দাঁড়া, লেখাপড়া করে কে কবে রাজ্য উদ্ধার করেছে ! ঐ দ্যাখ না তিনটে মেয়ে আসছে—ওদের আগে চলে যেতে দে ! ওদের সামনেটা দেখলি, পেছনটা দেখবি না ? এই পাঞ্জাবি লেড়কিগুলো এমন ফার্স্ট ক্লাশ পাছা দোলায়—।

মিহিরের এইসব খারাপ কথা আমার একটুও শুনতে ভালো লাগতো না। তখন আমি সব খারাপ কথার মানে জেনে গেছি। আশ্চর্য, কত তাড়াতাড়ি মানুষ এগুলো শিখে যায় ! ছ'মাস আগেও এইসব অনেক শব্দেরই কোনো অর্থ ছিল না আমার কাছে। আমি শুধু জানতুম, জামা–কাপড় না পরে কোনো নারী আর পুরুষের পাশাপাশি শুয়ে থাকা—একটা অত্যন্ত পাপের দৃশ্য। ওরকম ছবি এলাহাবাদে অনেক দেখা যেতো, বেশিরভাগ বইয়ের দোকানেই ঐসব ছবি যুদ্ধের সময় প্রকাশ্যে বিক্রি হত। মিহিরও আমাকে দু' একটা দেখিয়েছিল—আমি পাপের দৃশ্য দেখবো না বলে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। কিন্তু কী আকর্ষণে মানুষ কোনো নারীর কাছে যায়, তাও বুঝি নি। মানুষের জন্মরহস্য সম্পর্কেও কোনো ধারণা ছিল না। একটা সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করতে পারতুম না, বিয়ে হবার পরই কেন মেয়েদের বাচ্চা হয়, আগে কেন হয় না? বিয়ের পর কী বদল ঘটে মেয়েদের ?

নবনীতাকে সেই জব্বলপুরে দেখার পর থেকেই যেন আস্তে–আস্তে এসব ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। একটা রহস্যময় জগতে প্রবেশের অনুভবে আমার গা ছমছম করতো। অথচ নবনীতার সঙ্গে আমার কতক্ষণের জন্যই বা দেখা ! কিন্তু ও যেন আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল ! আগে কোনো গল্পের বইয়ের মধ্যে যদি দেখতাম, একটা ছেলে একটা মেয়েকে আদর করছে—ভালো লাগতো না সে জায়গাটা, তাড়াতাড়ি উল্টে যেতাম। এখন সেরকম জায়গা দেখলেই রোমকূপ পর্যন্ত শিউরে ওঠে। তবু, আমাদের বাড়ির শিক্ষার জন্য এসব কথা আমরা মুখে উচ্চারণের যোগ্য মনে করতুম না। আমি মাঝে–মাঝে বেশ রেগে উঠতুম মিহিরের কথা শুনে। কিন্তু অন্য বন্ধুরা মজা পেয়ে হাসতো। আমার একার আপত্তি শুনে ওরা আমার নাম দিয়েছিল 'গুরুঠাকুর' ! মিহির কোনো একটা খুব খারাপ কথা বললে ওরা সবাই বলতো, এই আর না, আর না, এবার গুরুঠাকুর রাগের চোটে সুইসাইড করবে !

আমি ওদের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করতেও পারতুম না—আর তো কোনো বন্ধু ছিল না আমার। মিহিরকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতুম না—কিন্তু জোর করে ও আমাদের দলে ভিড়ে থাকতো—অন্য বন্ধুরা ওকে তেমন অপছন্দ করত না, মিহির ওদের সিগারেট খাওয়াত। আমাদের চেয়ে বয়েসে তিন–চার বছরের বড় ছিল মিহির। ওর ভাবভঙ্গি ছিল অনেকটা বয়স্ক লোকদেরই মতন। আমাদের অনেকেরই অভিভাবকরা মিহিরের সঙ্গে আমাদের বেশি মেলামেশা পছন্দ করতেন না। কিন্তু মিহিরকে এড়াবার যে–কোনো উপায়ই ছিল না। তাছাড়া, আমাদের কয়েকজন মিহিরের রীতিমতন ভক্তও হয়ে গিয়েছিল। কী জানি, ওদেরও কারুকে মিহির আড়ালে চুমু খেয়েছিল কিনা। এই তো রতন, ফরেন সার্ভিসে আজ এত উন্নতি করেছে, সুন্দরী ফরাসি বউ—একসময় মিহিরের সঙ্গে রতনের খুব ভাব ছিল—ওকেও কি

ছেলেবেলা নিরালা ঘরে মিহির জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁওয়াতো? রতনকে জিজ্ঞেস করলে মন্দ হতো না!

দারুণ ভালো স্বাস্থ্য ছিল মিহিরের, শরীরে যেন তেজ টগবগ করে ফুটছে। কক্ষনো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো না এক জায়গায়—আড্ডা মারার সময়েও সে বই-খাতা নিয়ে লোফালুফি করতো, অথবা পা উঁচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল কপালে ছোঁয়াবার চেষ্টা করতো। অত তেজ আর উৎসাহ ছিল মিহিরের শরীরে, কিন্তু সেটাকে ভালো দিকে চালাবার কোনো শিক্ষা ওকে কেউ দেয় নি। মিহিরের বাড়ির লোকদের সেদিকে কোনো হুঁসই ছিল না বোধহয়। তাই নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য মিহির সব সময় একটা না একটা খারাপ কাজ ভেবে নিত। ভালো জিনিস শেখাতে হয়, খারাপ জিনিস শেখাবার দরকার হয় না। সেই সময়েই আমার ধারণা হয়েছিল, মিহির কোনোদিন অপঘাতে মারা যাবে!

যাই হোক, গির্জার মাঠে বিকেলবেলা আমরা জটলা করতাম। সামনের রাস্তাটায় একটা বিরাট গর্ত ছিল; টাঙ্গা, এক্কা, মোটরগাড়ি মাঝে-মাঝে ঐ গর্তটায় পড়লেই ঝপাং করে লাফিয়ে উঠতো। কত টাঙ্গা ওখানে উল্টেছে তার ঠিক নেই, তবু গর্তটা বোজাবার ব্যাপারে কারুর উৎসাহ ছিল না। মোটরগাড়ি ঐ গর্তটায় পড়লে আটকে যেত—আমরাই একবার ছুটে গিয়ে একটা গাড়ি ঠেলে তুলেছিলাম ঐ গর্ত থেকে। একবার একটা টাঙ্গা এমন ওল্টালো যে ঘোড়াটা সঙ্গে-সঙ্গে ঐখানেই মারা গেল—স্পষ্ট মনে আছে সেকথা, কী সুন্দর স্বাস্থ্যবান কালো ঘোড়াটা ছিল—কপালে চাঁদের মতো একটা সাদা দাগ, উল্টে পড়ে অসহায়ভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিল—তার সেই মর্মভেদী চিৎকার আমি সইতে পারি নি—কান ঢেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

গর্তটা ছিল রাস্তার একপাশে—যারা জানে, তারা অনায়াসেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। নতুন লোক কিংবা অন্যমনস্ক লোকদের পক্ষেই বিপদ।

মাঠে বসে গল্প করতে-করতে আমরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম—কোনো গাড়ি ঐ গর্তটার কাছে এলে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম, কখনো-কখনো চেঁচিয়ে সাবধান করেও দিতাম গাড়িগুলোকে।

সেই রকমই একদিন, একটা এক্কাগাড়িতে চেপে একজোড়া দম্পতি আসছিলেন—দু'জনেরই ভারি সুন্দর চেহারা, বনেদি মুসলমান বলে মনে হয়, মহিলাটি মুখের ওপর একটা পাতলা ওড়না দিয়েছিলেন, পুরুষটি পরেছিলেন চুস্ত্ শেরওয়ানি—আপন মনে গল্প করতে-করতে আসছিলেন ওঁরা, গর্তটার কাছাকাছি আসতেই আমরা হা-হা করে চেঁচিয়ে উঠলাম, এক্কাওয়ালাটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিকে তাকাতেই একটা চাকা সেই গর্তে পড়ে প্রায় উল্টে কাত হয়ে এলো গাড়িটা। আমরা সেদিকে ছুটে গেলাম।

প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে উঠে গাড়িটা একদিকে হেলে পড়েছিল, আমরা দেখেছিলাম, মিহি ওড়নায় ঢাকা সেই রূপসী মহিলার ভয়ার্ত মুখ, ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে চিৎকার করে উঠলো, বোধহয় আর ভার সামলাতে পারবে না, গাড়ি সমেত একদিকে কাত হয়ে পড়ে যাবে। রাস্তার সমস্ত লোক থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে, দু'এক মুহূর্তের ব্যাপার—তখন গাড়িটাকে ধরার কথাও কারুর মনে আসে না। চতুর্দিকে একটা ভয়ার্ত চেঁচামেচি, কিন্তু এক্কার ঘোড়াটা ছিল অসম্ভব তেজী, এক্কাওয়ালাও মুহূর্তের ভুল সামলে নিয়ে অসাধারণ কৌশলে গাড়িটাকে সামলে নিয়েছে। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার আগেই সোজা হয়ে গেছে গাড়িটা। আরোহী পুরুষটি কিন্তু একটুও ঘাবড়ান নি, যেন খুব মজার ব্যাপার—এই ভঙ্গিতে তিনি হো-হো করে হাসছেন, ভয়ার্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর হাসি আরও উচ্চ হয়ে উঠলো। অন্য যেকোনো লোক হলে এই সময় নিজের ভয় ঢাকবার জন্য এক্কাওয়ালাকে গালাগালি করতো, সেদিক থেকে

লোকটি সত্যিই খুব আলাদা, সঙ্গিনীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে এসব তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তিনি মেজাজ খারাপ করতে চান না। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা ছেড়ে গেল। মিহির যথারীতি আফসোস করে বলল, ইস্ উল্টালো না মাইরি ! একখানা সিন দেখা যেত ! মেয়েছেলেটা বহুৎ খাপসুরৎ ছিল, উল্টে পড়লে কীরকম মজা দেখা যেত বল্ !

মিহিরের এই জঘন্য কথায় আমি কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠছিলুম, তীব্র ঘৃণার চোখে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। মিহিরের স্বভাবই ছিল এইরকম, কোনো একটা সুন্দর জিনিস কিংবা সুন্দর দৃশ্য যেন ও কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। সেটাকে নষ্ট করাতেই ওর আনন্দ। অমন সুন্দর দু'জন নারী-পুরুষ বেড়াতে যাচ্ছেন খুশিমনে, তাঁদের গাড়িসুদ্ধ উল্টে পড়ে যাওয়াই মিহিরের পক্ষে মজার ব্যাপার !

এই সময় রতন চেঁচিয়ে বললো, ওটা কী রে? আমরা চমকে উঠলুম, তাকালাম, রতন গর্তটায় নেমে গিয়ে একটা মানিব্যাগ তুলে আনলো।

সুন্দর কারুকার্য করা বেশ চওড়া মানিব্যাগ। দেখি, দেখি, বলে মিহির খপ্ করে সেটা রতনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খুলে দেখলো। সেটার মধ্যে থরে-থরে সাজানো দশ টাকার নোট। আনন্দে মিহিরের চোখ জ্বলে উঠলো, হু-ই-ই শব্দে শিস দিয়ে মিহির বলে উঠলো, আরে মাইরি ! আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলি, রতন ? এ যে হেভি টাকা !

আমরা সবাই ভিড় করে ঝুঁকে দেখলাম। সেই বয়েসে একসঙ্গে অত টাকা আমি নিজের হাতে নিই নি আগে। প্রায় ছ-সাতশো টাকা ! আমি অস্ফুটভাবে বললুম, ঐ লোকটার টাকা, ঐ শেরওয়ানি পরা লোকটার—।

রতনও বললো, হ্যাঁ ভাই, গাড়িটা কাত হয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই লোকটার পকেট থেকে পড়ে গেছে ! এখন কী হবে বল তো !

আমি বললুম, লোকটা অমন হাসতে-হাসতে গেল, যখন দেখবে পকেটে টাকা নেই...অত টাকা...।

মিহির আমার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠলো, ভাগ্! এ কারুর টাকা নয়। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা, যে পায় তার!

রতন ছাড়াও পূর্ণ আর সিদ্ধার্থ বলে আরও দু'টি ছেলে ছিল। তারাও কেউ অসৎ ছিল না। তারা ভয়ে-ভয়ে মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, এটা নিয়ে কী করা হবে ? কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস থানায় জমা দিতে হয় না ?

মিহির বললো, থানায় জমা দেবো ? ইল্লি আর টকের আলু! অত খায় না! থানার পেটমোটা দারোগা শালারা টাকাটা মেরে দেবে। টাকাটা আমার কাছে জমা থাক, তোদের রোজ আমি খাওয়াবো এ থেকে! চল, আজ রয়াল হোটেলে যাবি ?

রতনের পাপ-পুণ্য বোধ ছিল। সে বললো, না রে মিহির, এসব টাকায় খেলে সে খাবার হজম হয় না। ঐ লোকটাকে তার টাকা ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

মিহির চিৎকার করে বললো, ফিরিয়ে দেবো ? আ-হা-হা! তুই কোনোদিন তোর কোনো জিনিস হারিয়ে ফেরত পেয়েছিস! আমি যে ফুটবল খেলার মাঠে আমার ওয়াটারম্যান কলমটা হারিয়ে ফেললুম, সেটা কেউ না কেউ তো পেয়েছেই—ফেরত দিয়েছে আমাকে ? আমি তার আধ ঘণ্টা বাদেই খুঁজতে গিয়েছিলুম, ইস্কুলে নোটিশ দিয়েছিলুম—তবু পাই নি! কেউ দেয় না। আজকাল আর ওসব ন্যাকামি-ফ্যাকামি নেই। তাছাড়া, এ টাকা যে ঐ লোকটার, তার কোনো প্রুফ আছে ?

কোথা থেকে আমার বুকের মধ্যে একটা অসীম শক্তি এসে ভর করলো। আমি হুকুমের সুরে

কঠোরভাবে মিহিরকে বললাম, ব্যাগটার মধ্যে আর কী আছে, আমাকে দেখতে দে!

আমার গলায় স্বর শুনে মিহির একটু হকচকিয়ে গেল। মিহিরের সামনে তাকে ধমকে কথা বলার সাহস কারুর ছিল না। আমারও ছিল না। তবু সেদিন কোথা থেকে যেন আমার মনে জোর এসে গিয়েছিল। অন্য বন্ধুরা ভাবলো, এবার বোধহয় মিহিরের সঙ্গে আমার মারামারি হবে। রতন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি, কিন্তু আমি এসব ব্যাপারের কিছু জানি না ভাই! আমি ও টাকায় কিছু খেতেও চাই না!

আমি রতনকে অগ্রাহ্য করে মিহিরের দিকে ফিরে আবার কঠোরভাবে বললুম, ব্যাগে আর কী আছে আমি দেখতে চাই! দে মিহির, ব্যাগ দে!

আমার হাতে দিল না, মিহির নিজেই খুললো। ব্যাগটার একটা খাপে শুধু টাকা, আর এক খাপে অনেকগুলো কাগজপত্র এবং একটা ফটো। একটু আগের এক্কায় দেখা সেই পুরুষ ও রমণীর ছবি। নির্ভুলভাবে এই টাকা ওদেরই।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের দুঃখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। একটু আগে দেখা, সেই লোকটির হাস্যময় মুখ আমার মনে পড়েছিল। গাড়িটা প্রায় উল্টে যাচ্ছিলো, তবু লোকটা হাসছিল। কিন্তু লোকটা যখন তার টাকা হারানোর কথা টের পাবে—তখনও কি ও হাসবে? কিংবা ঐ হাস্য–উজ্জ্বল মুখখানি দারুণ বিমর্ষ হয়ে যাবে! অমন সুন্দর লোকটির মুখের হাসি মুছে যাবে ভাবতেই আমার দারুণ কষ্ট হতে লাগলো।

আমি ব্যাকুলভাবে বললুম, এখনো ছুটে গেলে লোকটিকে ধরা যায়! চল রতন!

মিহির মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললো, এই গুরুঠাকুর এবার ফোঁস করেছে! তোর কী রে অংশু! তুই তো টাকাটা কুড়িয়ে পাস নি, তোর এতে কী আর্তি?

আমার দ্বিগুণ গায়ের জোর ছিল মিহিরের, তবু আমি দুঃসাহসের সঙ্গে ওকে এক প্রবল ধমক দিয়ে বললুম, তুই ব্যাগটা রতনকে ফিরিয়ে দে!

—সে রতন বুঝবে! তুই মাঝখান থেকে ফোঁপর–দালালি করছিস কেন?

—তুই ফিরিয়ে দিবি কিনা!

—আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস নাকি? খুব যে রোয়াব দেখছি!

—ধ্যাৎ তেরি!

আমি ছোঁ মেরে মিহিরের হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় লাগালাম। মিহির আমার পেছন–পেছন তাড়া করে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রতনরা ওকে ধরে ফেলে।

তারপর আমি পৌনে একঘণ্টা ধরে এলাহাবাদের রাস্তায়–রাস্তায় ছুটেছিলাম। একবার সেই এক্কা, সেই পুরুষ ও রমণীকে দেখি, একবার তাদের হারিয়ে ফেলি, হাত উঁচু করে চিৎকার করে ডেকেছিলাম কয়েকবার—ওঁরা বুঝতে পারেন নি।

ছুটতে–ছুটতে আমার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল, এত হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম যে বুকের মধ্যেটা জ্বালা করতে শুরু করেছিল, নিঃশ্বাসগুলো বুকের ভেতর থেকে যেন আগুন ছড়াচ্ছে, তবু অসম্ভব জেদ আমাকে পেয়ে বসেছিল—ওঁদের খুঁজে পেতেই হবে, ওঁদের হাতে মানিব্যাগটা পৌঁছে দিতেই হবে—তা যদি না পারি—তাহলে মিহিররা ব্যঙ্গবিদ্রুপে আমাকে একেবারে শেষ করে দেবে। কিন্তু ঘোড়ার গতির সঙ্গে কি মানুষ ছুটে পারে?

শেষ পর্যন্ত, ওঁদের আর দেখতে পেলাম না, কিন্তু, একটু বাদেই সেই এক্কাওয়ালাকে দেখতে পেলাম, খালি এক্কা নিয়ে সে ফিরছে, তাকে ধরে জিজ্ঞেস করলাম ওঁদের কথা।

এক্কাওয়ালা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে বলতে চাইছিল ঘটনাটা। অদ্ভুত পরিহাস, যে–রয়াল হোটেলে যাবার কথা মিহির বলেছিল, সেই হোটেলেই গিয়ে থেমেছিল এক্কাটা, ঐ পুরুষ ও

রমণীটি রয়াল হোটেলে খেতে যাচ্ছিলো। এক্কার ভাড়া দিতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে লোকটির মাথায় বাজ পড়ে। লোকটি এমন উচ্চকণ্ঠে হা-হুতাশ ও চেঁচামেচি শুরু করে যে রাস্তায় লোক জমে যায়। শেষ পর্যন্ত এক্কাওয়ালা সেই বাবুজীর এক দোস্তের বাড়ি ওঁদের পৌঁছে দিয়ে এসেছে। আমি এক্কাওয়ালাকে মানিব্যাগটা দেখালাম, সে আমাকে সেই দোস্তের বাড়িতে নিয়ে গেল।

আমার কথা শুনে সেই লোকটির উচ্ছ্বাস ছিল দেখবার মতন। ওঁদের দেখা পাবার পর আমি কিন্তু আবার বেশ লজ্জা বোধ করছিলুম। তখনও আমি হাঁপাচ্ছি, ঘামে আমার সারা শরীর ভিজে গেছে, কিন্তু সে-সব যাতে ওঁরা বুঝতে না পারেন, তাই আমি যথাসাধ্য স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললাম, আপকি মানিব্যাগ গির গিয়া, আপ নে নেহি দেখা—। লোকটি চিৎকার করে তাঁর দোস্তকে ডাকলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ির মধ্যে, সারা বাড়িতে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বেঁধে গেল। অত অপরিচিত লোকের মধ্যে লজ্জায় আমি কুঁকড়ে যেতে লাগলাম। আমি যে এতক্ষণ ধরে তাঁকে খুঁজেছি এবং তাঁর দোস্তের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছি—এটা যেন তিনি বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না! খুশিতে তিনি কেঁদেই ফেললেন। এমনকি সেই মহিলাও মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে নিবিড় বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। আমার নাম, বাড়ির কথা অনেকবার শুনেও ওঁদের তৃপ্তি হলো না, শেষ পর্যন্ত আমাকে ওঁরা বাড়িতে পৌঁছে দিতে এলেন।

বাবা ছিলেন খুব কড়া মানুষ। সেদিন আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি বেশ ক্রুদ্ধভাবে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় নাটকীয়ভাবে আমরা ঢুকলাম। সেই লোকটি আবেগে বাবার হাত জড়িয়ে ধরলেন, সবিস্তারে বললেন পুরো গল্প। যাবার আগে একটা লম্বা কুর্নিশ দিয়ে বাবাকে বললেন, বাবুজি, আপনার ছেলে একেবারে হীরের টুকরো। সারা শহর ঢুঁড়লেও এরকম আর একটা ছেলে মিলবে না।

বাবা মোটেই আবেগপ্রবণ ছিলেন না। নাটকীয়তা তাঁর চরিত্রে ছিল না একফোঁটাও। তিনি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না, ওরকম বলবেন না। এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সব ছেলেই এ কাজ করবে—এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই।

বাবারা ছেলেদের নিয়ে গর্ব করে। আমার বাবা অবশ্য মোটেও সে রকম ছিলেন না, নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কোনো উচ্ছ্বাস দেখাতে কেউ কোনোদিন তাঁকে দেখে নি। সেই ভদ্রলোকটিকে বাবা বারবার নিরস্ত করার চেষ্টা করছিলেন, বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, তাঁর ব্যাগ ফিরে পাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা, রাস্তার যে-কোনো ছেলেই এ ব্যাগ কুড়িয়ে পেলে তাঁকে পৌঁছে দিত। সেই ভদ্রলোক আমাকে সামান্য কিছু উপহার দেবার প্রস্তাব করলে, বাবা দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমার দিকে ফিরে বাবা বলেছিলেন, তুমি আর দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও, পড়তে যাও!—তবু, সেদিন আমি আমার বাবার জন্যে গর্বিত হয়েছিলাম। বাবা ঐভাবে কথাটা বলেছিলেন বলে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। সত্যিই, আমি কোনো অসাধারণ কাজ করছি ভেবে কিংবা বাহাদুরি পাবার লোভে মানিব্যাগটা নিয়ে ছুটে যাই নি। আমার তখন মনে হয়েছিল, এটাই আমার একমাত্র কাজ। সেই হাস্যময় লোকটির মুখের হাসি মুছে যাবে—শুধু এই চিন্তাই আমাকে কষ্ট দিয়েছিল।

সেই আমি। আজ একচল্লিশ বছর বয়েসে কোথায় এসে পৌঁছেছি! এখন আমি অফিসে নিয়মিত ঘুষ নিই। গত মাসেই সবসুদ্ধ ঘুষ পেয়েছি সাড়ে আটশো টাকা। যে ছেলেটিকে পৌনে এক ঘণ্টা ধরে এলাহাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ছুটতে হয়েছিল পরের টাকা পৌঁছে দেবার জন্য, আজ সেই একই মানুষ পরের টাকা নিজের ব্যাগে ভরতে একটুও দ্বিধা করে না। একটুও হাত কাঁপে না।

বড়দির ছেলের পৈতে হলো গত মাসে। মা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন, কোথাও বিশেষ যান না। কিন্তু বড়দির ছেলে সন্তুর পৈতেতে গিয়েছিলেন। জামাইবাবুরা বেশ বড়লোক—তাঁদের বাড়িতে ঐ পৈতে উপলক্ষেই দারুণ জাঁকজমক। মা সেখানে যাবেন, কিন্তু মার আলোয়ানটা বড্ডই পুরনো—রং জ্বলে গেছে; মাকে সেইজন্য সাড়ে দুশো টাকা দিয়ে একটা কাশ্মীরী শাল কিনে দিলাম। মার খুব পছন্দ হয়েছে শালটা, বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই আয়নার সামনে বারবার সেটা গায়ে দিয়ে দেখছিলেন। মা সন্তুকে রুপোর থালা দিয়েছেন ব্রতভিক্ষা হিসেবে—পৌনে দুশো টাকা দাম পড়লো, সে-টাকাও আমি দিয়েছি। এমন একটা দামি জিনিস দিতে পেরেছেন বলে মা দারুণ খুশি।

সবটাই আমার ঘুষের টাকা!

৫

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

সেই আমি। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে এই চাকরিটা পেয়েছিলাম বাবারই এক বন্ধুর সুপারিশে। প্রথম যেদিন চাকরিতে জয়েন করতে যাই, মা ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, তোর বাবার ছবির কাছে প্রণাম করে যা। উনি বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হতেন !

দাদা ঠিক বাবারই গলার স্বর অনুকরণ করে গম্ভীরভাবে বলেছিল, মন দিয়ে কাজ করবে, ওপরওয়ালাদের মুখে-মুখে তর্ক করবে না কখনো। আর মনে রাখবে, অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি। এ কথা শুনে বাবার বন্ধুটি ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন।

গোড়ার দিকে যখন নিচু পোস্টে কাজ করতাম, তখন ঘুষের মহিমা তেমন বুঝতে পারি নি। এখন অফিসার হয়েছি। কন্ট্রাক্টারদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিল পাশ হয় আমার হাত দিয়ে। কন্ট্রাক্টের স্পেসিমেনের সঙ্গে সাপ্লাইয়ের গরমিল লেগেই থাকে—ব্যবসায়ীরা নিজের থেকেই টেবিলের ওপর টাকার গোছাভর্তি খাম গুঁজে রেখে যায়।

এম. এ. পাশ করার পর পুরো দু'টি বছর বেকার ছিলাম। বাবার বন্ধু বিশ্বনাথ কাকা নেহাত দয়া করেই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিলেন। ঢুকেছিলাম কেরানি হয়ে, একশো সাতাশ টাকা মাইনে, তখন সেটাই ছিল আমার কাছে স্বর্গের সমান। বেকারত্বের জ্বালা দু'বছরেই মর্মে-মর্মে টের পেয়ে গেছি।

বিশ্বনাথ কাকা বলেছিলেন, কোনো চিন্তা নেই, দেখো, তাড়াতাড়িই প্রমোশন হয়ে যাবে—এম. এ. পাশ ছেলে, ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে টপাটপ ওপরে উঠে যাবে। আর শোনো, আর একটা কথা—

বিশ্বনাথ কাকা আমাকে একটা খুব দামি উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কেরানি হয়ে ঢুকছে বলেই কেরানির মতন হাবভাব যেন তোমার না হয়! প্রথমদিন থেকেই যেন সবাই বুঝতে পারে, তুমি কেরানি হলেও, আসলে তুমি অনেক ওপরে ওঠার জন্য জন্মেছ ! ময়লা জামা-কাপড় পরে কোনোদিন অফিস যাবে না। পারো তো একটা স্যুট বানিয়ে নাও, টাই পরবে তার সঙ্গে, টিফিনে অন্য কেরানিদের সঙ্গে খেতে বসবে না, একা-একা খাবে—। কেন এসব বলছি জানো তো ? অনেকে কেরানি হয়েই জন্মায়, কেরানি হয়েই মরে। তোমার সঙ্গে যারা এখন কেরানি আছে, তারা অনেকে সারাজীবনই কেরানি থাকবে, তুমি যখন অফিসার হয়ে যাবে—তখন ওরা যাতে তোমার সঙ্গে সমান-সমান হয়ে কথা বলতে না আসে— এখন থেকেই তার জন্য তৈরি

হতে হবে।

খুব খাঁটি কথাই বলেছিলেন বিশ্বনাথ কাকা। অফিসে প্রথম ঢুকে আমি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পাশের টেবিলে বসতাম। মৃত্যুঞ্জয়বাবু এখনো সেই টেবিলেই আছেন—আগে উনি আমাকে বলতেন, অংশুবাবু, এখন বলেন, স্যার। আমি অনুমতি না দিলে উনি আমার সামনে চেয়ারে বসেন না।

প্রথম-প্রথম রেগে লাল হতুম। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি খাম, আমার বিবেক অস্থিরভাবে গর্জন করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নি, হেরে গেছি আমি।

একথা এখনো জোর দিয়ে বলতে পারি, আমার মধ্যে সততার বীজ ছিল। বিবেকটাকে পরিষ্কার রেখে আমি সৎভাবেই বাঁচতে চেয়েছিলুম। কিন্তু লড়াইতে জিততে পারি নি আমি।

প্রথম প্রথম রক্তের তেজ যখন প্রবল ছিল, তখন প্রায়ই চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবতুম। কিন্তু তখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে, অথচ তাই নিয়ে আনন্দ করার মতন অবস্থা অন্তত বাংলাদেশের ছিল না। পূর্ব বাংলা থেকে হাজার-হাজার বুভুক্ষু মানুষ রিফিউজি হয়ে ছুটে আসছে, শিয়ালদা স্টেশন আর কলকাতার সব রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তারা, আর এদিকে চাকরির বাজারে শুধু ছাঁটাই আর ছাঁটাই। তখন চাকরি পেয়েও ছাড়ার কথা বললে সবাই আমাকে পাগল ভাবতো !

প্রথম ঘুষের টাকা পাই চাকরিতে ঢোকার পাঁচ বছর বাদে। তখনও অফিসার হই নি, সেকশান ইনচার্জ হয়েছি—বুঝতে পারি খুবই স্পষ্ট যে অফিসে কারা-কারা ঘুষ নেয়, কারা-কারা কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে দেঁতো হাসি হেসে কথা বলে। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, আমি নিজের মনে কাজ করে যাবো, ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবো না। তারপর একদিন ছুটির পর বাড়ি ফিরছি, আর একজন সেকশান ইনচার্জ, হরিমোহনবাবু, আমাকে একটা সাদা খাম দিয়ে বললেন, ভেতরে একশো চল্লিশ টাকা আছে, গুনে নিন মশাই টাকাটা! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিসের টাকা? তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, বাইরের পার্টির লোকেরাই ঘুষ দিতে আসবে, অফিসের সহকর্মীরা কেন আমাকে টাকা দেবে! হরিমোহনবাবু নির্লিপ্তভাবে বলেছিলেন, বড় সাহেব দিয়েছেন। বড় সাহেব মানে, তখনকার আমাদের অফিসার—মিঃ ভার্মা। আমি বললাম, বড় সাহেব আমাকে টাকা দেবেন কেন? হরিমোহনবাবু বললেন, উনি খুশি হয়ে দেন মাঝে-মাঝে ! আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিক্ত স্বরে বলেছিলাম—মিঃ ভার্মাকেই টাকাটা ফেরত দিয়ে বলবেন, ওর ছেলেমেয়েকে ও টাকায় মিষ্টি কিনে দিতে।... ঠিক পরদিনই আমার ড্রয়ার থেকে একটা জরুরি ফাইল চুরি যায়। সেজন্য আমার চাকরি যেতে বসেছিল।

আমার অফিসে—আমারই সমান পদাধিকারী আরও দু'জন অফিসার আছেন—একদিন তাঁরা আধা-শাসানি, আধা-সমবেদনার সুরে আমাকে বললেন, দেখুন মিঃ দত্ত, মনে করবেন না, আমরা সবাই ঘুষখোর, বিবেকহীন পাষণ্ড, আর আপনি একাই সৎ লোক। আমরাও আপনারই মতন ভদ্র ফ্যামিলির ছেলে, আমরাও ন্যায়নীতির কথা জানি। কিন্তু, এ এক অদ্ভুত যাঁতাকল। এ দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই আন্ডার-কোয়ালিটি মাল সাপ্লাই করবে। নিজেদের মাল ভালো করার বদলে এরা ঘুষ-ঘাষ দিয়েই ম্যানেজ করার চেষ্টা করবে। এরা এতেই অভ্যস্ত। আপনি একা সৎ হয়ে কী করবেন ? আপনার পোস্টে আগে যিনি ছিলেন, মিঃ রঙ্গনাথন, শুনেছেন বোধহয়, তিনি এখন চুরির দায়ে জেল খাটছেন ? সব সাজানো মশাই, সব সাজানো ! রঙ্গনাথনের মতন অনেস্ট লোক সারাদেশ খুঁজলে একটা পাওয়া যাবে না—উনি চেয়েছিলেন অফিসটাকে স্ট্রেট করতে—ঐ ব্যবসায়ীরাই ওঁর নামে মিথ্যে অভিযোগ সাজিয়ে... আমাদের রাঁচী অফিসের একটা অফিসার তো খুনই হয়ে গেল।

কে চায় খুন হতে ? সততা কিংবা চুরি-ডাকাতি, সবই তো বেঁচে থাকার জন্যে। এখন তো

আর স্বর্গ-নরক মানি না, পুণ্য কাজ করে মরে গেলেও স্বর্গে যাবো—এ বিশ্বাস তো আর নেই, এখন সবই শুধু এই জীবনটার জন্যে। জীবনটাই যদি চলে যায়—তাহলে আর কিসের কী! এখন এ বয়েসে চাকরি ছাড়াও যায় না। সব চাকরিই হয়তো এমন খারাপ নয়, কিন্তু আমার আর উপায় নেই। আস্তে-আস্তে সব মেনে নিলাম। শুধু মেনে নেওয়াই নয়, লোভ এসেও বাসা বেঁধেছে। প্রত্যেক মাসেই মাইনের চেয়েও তিনগুণ বেশি টাকা ঘুষ হিসেবে পাই। কোনো মাসে ঘুষের টাকা একটু কম-কম হলে—রীতিমতন মেজাজ খিঁচড়ে যায়। ঘুষ প্রায় সবাই দেয়, কিন্তু যারা কম টাকা ঘুষ দিতে আসে, তাদের ক্ষেত্রেই আজকাল বেশি-বেশি সৎ হয়ে উঠি, তাদের বিল পাশ করতে টালবাহানা করি।

একদিন মিহির এসেছিল আমার অফিসে। এই তো বছর-তিনেক আগে। মিহিরের সঙ্গে তখন আমার যা সম্পর্ক—তাতে ওর সঙ্গে আমার কথা বলাই উচিত নয়। মিহির আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চুরি করে নিয়ে গেছে। মিহির আমার বুকের মধ্যের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে একেবারে। এই মিহিরই একদিন নবনীতাদের বাড়িতে আমাকে বলেছিল, তুই কি গভর্নমেন্টের চাকরি করছিস, ক' পয়সা পাস ওতে? ধুৎ, ধুৎ! গভর্নমেন্টের চাকরি ভদ্দরলোকে করে? তুই বরং ওটা ছেড়ে দে—আমার একটা দোকানে ম্যানেজার করে দিচ্ছি—ওর থেকে অনেক বেশি পাবি। তাছাড়া বিজনেসের ব্যাপারটা যদি শিখে নিতে পারিস—

জানি, ঘৃণায় মিহিরের থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেও লাভ নেই এখন। এখন আমি ইচ্ছে করলেই বেয়ারা ডেকে ঘাড় ধরে মিহিরকে এখান থেকে বার করে দিতে পারি। কোনো লাভ হবে না। আমার জীবনে রাহুর মতন মিহির বারবার আমাকে গ্রাস করতে আসবেই।

মিহির গুণ্ডা-বদমাশ কিছুই হয় নি, বেশ সম্ভ্রান্ত নাগরিকই বলা যায় তাকে। এলাহাবাদে ওদের ব্যবসার প্রসার হয়েছে, এছাড়া কানপুর এবং কলকাতাতেও ওরা ব্রাঞ্চ খুলেছে। বছরের মধ্যে প্রায় মাস-ছয়েক মিহির কলকাতাতেই কাটায়। একটু ভারির দিকে চেহারা, ঘাড় পর্যন্ত চুল ছাঁটা, খুব দামি পোশাক পরে সে এখন।

মিহির এখন ফার্স্ট ক্লাশে ছাড়া ট্রেনে চাপে না। সময় বাঁচাবার জন্য অবশ্য তাকে মাঝে-মাঝে প্লেনেও যেতে হয়। যুদ্ধের শেষদিকেই মিহিরদের ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠছিল, এখন তো রীতিমতন বোলবোলাও। মিহির চুরি-ডাকাতি কিছুই করে না, একমাত্র কালো-বাজার নামে যে সূক্ষ্ম ব্যাপারটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে গড়ে উঠেছে, মিহির সেখানে ঘোরাফেরা করে—সেজন্য অবশ্য সমাজের কাছে মোটেই ঘৃণিত নয় সে—বরং তার বেশ প্রতিপত্তি আছে; চৌরঙ্গির বড় হোটেলে বিজনেস-লাঞ্চের আয়োজন করে, পাড়ার দুর্গাপুজোয় একশো টাকা চাঁদা দেয়, খেলাধুলোয় এক সময় খুব ঝোঁক ছিল—এখন আর নিজে খেলে না—কিন্তু পাড়ার ক্লাবগুলোর সে পৃষ্ঠপোষক, মোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করে। বাড়িতে তার সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী।

ইলেকশানে দাঁড়াবার শখও হয়েছে নাকি মিহিরের, তবে এলাহাবাদ না কলকাতা—কোন জায়গা থেকে দাঁড়াবে, এখনও মনস্থির করতে পারছে না।

মিহিরের তুলনায় আমি কী, কিছুই না! সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সামান্য একটা পেটি অফিসার। যা মাইনে পাই, ইনকাম-ট্যাক্স কেটে নেবার পর তার যেটুকু হাতে আসে—তাতে মাসের প্রত্যেকদিন মাছও খাওয়া যায় না, জুতোও পালিশ করা যায় না। ঘুষের টাকায় বাবুগিরি করি, প্রত্যেকবার ঘুষ নেবার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ হিসেবে একটু ছোটো হয়ে যাই। কোনো একদিন যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যাই, সমস্ত সমাজ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছি-ছি করবে, চাকরি তো যাবেই, জেলও হতে পারে। মাকে যে ঘুষের টাকায় কাশ্মীরী শাল কিনে দিয়েছি, মা-ও হয়তো

আমাকে ঘৃণা করবেন। কেউ বুঝবে না, ঘুষ না নিলেও আমার চাকরি রাখা সম্ভব হতো না। একজন ঘুষ না নিলেই অন্যরা তাকে সন্দেহ করে, ভাবে, সে হয়তো আত্মঘাতীর মতন একদিন বেপরোয়া হয়ে সবকিছু ফাঁস করে দিতে চাইবে। প্রথমদিন ঐ টাকা নিতে অস্বীকার করার ফলে—আমার ড্রয়ার থেকে জরুরি ফাইল চুরি হয়েছিল। পাগলের মতন আমি যখন ফাইল খুঁজছিলাম—তখন হরিমোহনবাবুই গূঢ় হেসে সেটা বার করে দিয়েছিলেন।

আমি জীবনে কিছুই পাই নি, মিহির সবকিছুই পেয়েছে।

সঙ্গে একটি লোককে নিয়ে এসেছিল মিহির, আমার আর্দালিকে শ্লিপ দেওয়ার পরোয়া করে নি, সোজা কামরায় ঢুকে এসে সঙ্গের লোকটিকে চেয়ার দেখিয়ে বলেছে, বসো এখানে। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কি রে অংশু, কেমন আছিস ? রোগা হয়ে গেছিস কেন ? তোকে দেখতেই এলাম—বহুদিন দেখা নেই।

মিহিরের সঙ্গের লোকটিকে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। কী একটা বিল পাশ করার ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হওয়ায় লোকটাকে আমি অফিস থেকে বার করে দিয়েছিলাম। সেই লোকটিকে দেখিয়ে মিহির বললো, এ আমার ভাগ্নে। যা যা, অংশুমামাকে পেন্নাম কর! ও আজকাল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করছে, কাঁচা ছেলে—এখনও ব্যবসা তেমন বোঝে না। তোদের অফিসে ওর একটা সাতাশ হাজার টাকার বিল আটকে আছে, কী যেন গড়বড় হয়েছে, আমার কাছে গিয়ে নাকে-কান্না কাঁদছিল। আমি বললুম, ঠিক আছে, ওখানে অংশু রয়েছে, আমার ওল্ড ফ্রেন্ড, তাকে আমি গিয়ে বললে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

মিহির বিশেষ কোনো অবান্তর কথা বললো না। ব্যক্তিগত কথা বলে সময় নষ্ট করলো না। বিনা স্বার্থে সে যে আমার কাছে আসে নি—সেটা বুঝিয়ে দিতেও তার দ্বিধা নেই। দামি সিগারেট কেস আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নে। তুই সিগারেট খাস তো ?

এই মিহিরের হাত থেকেই জীবনে প্রথম সিগারেট টান দিয়েছিলাম আমি। সে-কথা কি ওর মনে আছে ? মিহিরের মুখ দেখে মনে হয়—ছেলেবেলার কোনো কথা মনে করার কোনো গরজই ওর নেই।

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, কিন্তু তোর ভাগ্নে মিলিটারিতে যে ফ্লাস্ক সাপ্লাই করেছে—সে সম্পর্কে রিপোর্ট এসেছে যে, তাতে গরম জল রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর ঠাণ্ডা জল গরম হয় এত তাড়াতাড়ি যে—

আমার কথায় কানই দিল না মিহির। সামান্য হেসে বাঁ-হাতখানা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, জানি, জানি, আমি নিজেই তো ব্যবহার করে দেখেছি, একমাসও কাটে নি ! আরে দিশি জিনিস আর কত ভালো হবে ? তুই নিজেই তো জানিস, আমাদের কোন্ দিশি জিনিসটা ভালো, তুই বল ? আমাদের সরকারও যেমন, দিশির বাতিকে ধরেছে, বিলেত থেকে ইম্পোর্ট বন্ধ...। আমি বললাম, কিন্তু বাজারে যে এর চেয়ে ভালো দিশি ফ্লাস্ক পাওয়া যায় ! টেন্ডারে কম দাম দেখিয়ে, স্যাম্পেল হিসেবে ভালো জিনিস দেখিয়ে তারপর সাপ্লাই-এর সময় রদ্দি মাল দিলে... মিহির এবারও আমার কথা গ্রাহ্য করলো না, নিজের কথার নেশাতেই সে মশগুল; টেবিলের ওপর সম্পূর্ণ শরীরের ভর দিয়ে মুখখানা ঝুঁকিয়ে এনে ফিসফিস করে বললো, বোকা, ছেলেটা একেবারে বোকা। এসব বিল পাশ করাতে গেলে কেরানি-টেরানিদের জলখাবারের জন্যে কিছু দিতে হয়—তা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবাই জানে। তা ও গিয়েছিল মোটে দুশো টাকা দিতে, কেরানিরা তো ফেরত দেবেই! শুনে আমিও খুব দাবড়ানি দিয়েছি ওকে! আরে বাপু, সাতাশ হাজার টাকার বিল—অন্তত সাতাশশো টাকা তো খরচ করতেই হবে!

আমি তীক্ষ্ণ চোখে মিহিরের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, ও আমাকে বিদ্রুপ করতে চায় কিনা!

কিন্তু ওর মুখে সে রকম কোনো চিহ্নই নেই। দেখলে মনে হয়, ওর এখন প্রধান চিন্তা ভাগ্নের বিলটা পাশ করানো। ঘুষ নেওয়ার কথা শুনে আমি যে চটে উঠলেও উঠতে পারি—সে রকম কোনো চিন্তাই ওর মাথায় আসে নি যেন। রোদ্দুর, বৃষ্টি, ঝড়ের মতন—বিল পাশ করাতে গেলে ঘুষ দিতেই হবে—এ কথাটাও স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে। নবনীতাদের বাড়ি থেকে বেরুবার পর একদিন রাস্তায় কী কথায়-কথায় যেন মিহির বলেছিল, আরে শালা, চাঁদির জুতোয় ঠাণ্ডা হয় না এমন একটা মানুষ তুই আমাকে সারা পৃথিবীতে দেখিয়ে দে তো !—মিহিরের পৃথিবীটাই ঐরকম। ছেলেবেলায় ও আমাকে গুরুঠাকুর, গুরুঠাকুর বলে খেপাতো—সে-কথা একবারও মনে পড়লো না ! আমার একবার ইচ্ছে হলো, প্রচণ্ড চিৎকার করে মিহিরকে বলি, গেট আউট ! গেট আউট !

কিন্তু সে-মনের জোর আমার আর নেই। আমি এখন পাপী। মিহিরও যদি চেঁচিয়ে বলে, তুই অন্যদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিস—আমার কাছ থেকেই বা কেন নিবি না রে শালা ?

ছেলেবেলায় আমার সেই মানিব্যাগ ফেরত দেবার কথাটা মনে করে মিহির কি একবারও আমাকে ব্যঙ্গ করতে চায় নি ? অথবা, আর কারুরই কি কিছু মনে থাকে না পুরোনো কথা, শুধু আমি একাই সব—সব স্মৃতি জাগিয়ে রেখে দুঃখ পাই!

৬

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

কাল রাতে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল বলে আমার অন্য পাপের কথা আর লেখা হয় নি। কোনটা পাপ, আর কোনটা পুণ্য তা ঠিক জানি না যদিও। তবে, এটা বুঝতে পারি, যে কাজের জন্য মানুষকে গোপনে অনুশোচনা আর অনুতাপ করতে হয়—সেটাই পাপ। ঘুষ নেবার ফলে আমি সচ্ছল মানুষ এখন, কিন্তু তৃপ্ত নই। সবসময় মনের মধ্যে অশান্তি আর অনুশোচনার কাঁটা বিঁধে আছে। তবে, আরও একটা সত্যি কথা এই, অনুশোচনা মানেই পরিশুদ্ধি নয়। তাহলে তো এরপরই আমার নিবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জীবনে আমি আরও অনেক পাপ করেছি। সেসব মনে পড়লে আর লিখতে ইচ্ছে করে না—কলম হাতে নিয়ে সাদা পাতার সামনে চুপ করে বসে থাকি। মনে হয়, এই পবিত্র সাদা পৃষ্ঠার ওপর কলমের কালি দিয়ে পাপের কথা লেখাও আর একটা পাপ।

তবু আজ লিখবো ভেবেছিলাম। কিন্তু, আজ গলাটা বেশি ব্যথা করছে। সন্ধে থেকেই গলা ব্যথাটা বেড়েছে বলে আজ আর সিগারেট কিনি নি। কিন্তু এখন সিগারেটের অভাবে বুকের ভেতরটা হাঁসফাঁস করছে। এত রাত্রে আর সিগারেট কেনার উপায় নেই। সিগারেটের অভাবে আজ রাত্তিরে ঘুম হবে না ভালো করে। আর, সিগারেট না থাকলে কি লেখা যায়? অসম্ভব! একেই তো এসব বাংলা-টাংলা লেখার অভ্যেস নেই—

৭

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

না, পৃথিবীতে এখনো ভালো লোক আছে দেখছি। লোকটা আজ আমাকে খুব চমকে দিয়েছে।

ক'দিন ধরেই শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। অফিসে লম্বা ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি। আসলে শরীর খারাপ, না মনই আমাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ক্যানসারের বাংলা নাম কর্কট রোগ, শুনেছিলাম তো খুব নাকি জ্বালা-যন্ত্রণা হয় এতে। আমার সে রকম কিছু

তো হচ্ছে না—গলার মধ্যে ঢোক গিলতে গেলে খানিকটা ব্যথা-ব্যথা করে—আর গলার আওয়াজ ভেঙে ফ্যাসফেসে হয়ে আছে—সেই অস্বস্তি। তবু, সেই অস্বস্তি নিয়েই ক'দিন বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। লিখতে-ফিকতে ইচ্ছে করে নি। তাছাড়া নিজের পাপের কথা লিখেই বা কী লাভ ! আমার পাপের কথা পড়ে অন্য লোক শুধরে যাবে ? তা হয় না। গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে কার্ল মার্ক্স পর্যন্ত মুনি-ঋষিরা কেউই প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত পথের নির্দেশ দিতে পারেন নি।

যাই হোক, আজ এই লোকটিকে দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়েছি। পাপের কথা থাক, আজ এই লোকটির কথাই লিখি!

আমাদের বাড়ির পেছন দিকের ভাড়াটেরা কয়েক বছর ধরে কম জ্বালায় নি। মাসের পর মাস ভাড়া দেয় নি, তার ওপর ঝগড়াঝাঁটি, হৈ-হল্লা, নোংরামি। বৌদি প্রায়ই নালিশ করতেন, ঐ ভাড়াটেদের একটা বখাটে ছেলে প্রায়ই নাকি আমাদের বাড়ির মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির মেয়েরা কে কখন আদুল গায়ে থাকে, ও ঠিক ওত পেতে থাকবে। তাছাড়া, দাদার মেয়ে রুনির সঙ্গে ও প্রায়ই চোখাচোখি করে, ছাদে গিয়ে কথা বলে, তাছাড়া বাইরেও দেখা-টেখা করে কিনা ঠিক নেই। রুনি এমনিতেই সবার কথার অবাধ্য। বৌদি তো রেগে আগুন, যারা ভাড়া দিতে পারে না—তাদের ছেলের অতদূর আস্পর্ধা! আমাদের বাড়িতে দাদা কিংবা মায়ের মতামতের তেমন জোর নেই। বৌদির বাবা এই বাড়িটা তৈরি করে দিয়েছেন, সুতরাং বৌদির রাগ হলে আমাদেরও বিচলিত হতে হয়। আমিও কম রাগি নি। বাড়ির এসব ঝঞ্ঝাটে মাথা গলানোর সময় নেই আমার—কিন্তু রোজ-রোজ নতুন ধরনের অভিযোগ শুনলে—কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে ! মাসের পর মাস ভাড়া দেয় না—এটাই কি কম বিরক্তিকর নাকি ?

গত মাসে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই নৈহাটিতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম—সেদিনই ঐ ভাড়াটেরা পালিয়েছে। চুপিচুপি কিছু জিনিসপত্র আগেই সরিয়েছিল, সেদিন বাকি সবকিছু নিয়ে একেবারে চম্পট দিয়েছে—পুরো সাত মাসের ভাড়া মেরে দিয়ে। টাকাটা খুব বেশি না, তেরশো টাকার মতন—এবং পুরোনো ভাড়াটে উঠে যাওয়ায় নতুন ভাড়াটে এলে বেশি টাকায় ভাড়া দেব—সুতরাং ও টাকাটা কয়েক মাসেই উঠে আসবে, কিন্তু এই ধরনের জোচ্চুরি আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না, রাগে গা জ্বলে যায়! মামলা-মোকদ্দমা চিরকালই এড়িয়ে এসেছি, কিন্তু সাত মাসের ভাড়া মেরে দেবার জন্যে ওদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। দাদা এসব থেকে গা বাঁচিয়ে থাকে, কিন্তু আমাকে খুব ওস্কাতে লাগলো। আমি বিয়েটিয়ে করি নি, আমাকে ছেলেপুলে সামলাতে হয় না, তাই এসব কাজ করার দায়িত্ব যেন আমারই! আমার বন্ধু পূর্ণ এখন বেশ নামকরা উকিল—ওর সঙ্গে পরামর্শ করেছি। পূর্ণ অবশ্য খুব ভরসা দেয় নি—সে বলেছিল, একবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে—সে ভাড়াটের কাছ থেকে বকেয়া ভাড়া আদায় করা খুবই শক্ত, তাছাড়া তারা কোথায় উঠে গেছে সে-ঠিকানাও জানি না—তবুও চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি তীব্র স্বরে বলেছিলাম, আমি যে-করে হোক ওদের ঠিকানা খুঁজে বার করবো, তুই মামলার ব্যবস্থা কর পূর্ণ।

ঠিকানা খোঁজা হয় নি, কিন্তু আজ সকালেই সেই ভদ্রলোক এসে হাজির। ইনিই আমাদের প্রাক্তন ভাড়াটে। লোকটির ব্যবহার ও কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি প্রায়। ভদ্রলোক খুব বিনীতভাবে বললেন, অফিস থেকে তাঁকে ছ'মাসের জন্যে এক ডেপুটেশানে পাঠিয়েছিল আসামে—মাস ছ' মাসের ব্যাপার বলে তিনি আর ফ্যামিলি নিয়ে যান নি—পরিবারের সবাই এখানেই ছিল—তিনি ছিলেন শিলং-এ, তিনি গতকাল ফিরেছেন, ফিরে শুনেছেন যে,

এখানে সাত মাসের ভাড়া দেওয়া হয় নি। বাড়ি বদল করার কথা তিনি জানতেন, কিন্তু ভাড়া না-দেওয়ার কথা জানতেন না—সেই জন্য তিনি ভাড়ার টাকাটা দিতে এসেছেন। ভদ্রলোক পকেটের একটা খাম থেকে গুনে-গুনে তেরশো টাকা বার করলেন, তারপর নম্রভাবে হেসে বললেন, আমার বাড়ির লোক ঠিক সময় ভাড়া না দিয়ে অপরাধ করেছে, সেজন্য ক্ষমা করবেন। আমার বড় ছেলেটার স্বভাবচরিত্র ভালো হয় নি—টাকাগুলো সে-ই নিয়েছিল। যাই হোক, তার যা ব্যবস্থা করার আমি করবো, আপনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনাদের অনেক অসুবিধের সৃষ্টি করেছি।

আমাদের বাড়ির পেছনদিকে নতুন ভাড়াটে এসে গেছে। পুরোনো ভাড়াটেদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম—মাঝে-মাঝে খাবার টেবিলে শুধু নানা কথার মধ্যে ঐ চোর ভাড়াটেদের প্রসঙ্গ উঠলে কিছুটা রাগ প্রকাশ করা হতো। এ ভদ্রলোকের নামও আমার ঠিক মনে নেই, ধনঞ্জয় বা নিরঞ্জন—এই ধরনের একটা কিছু, একটা ব্রিটিশ কম্পানিতে কাজ করেন। উনি নিজে থেকে এসেছেন আমাদের কাছে। এবং বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছেন! আমি হাসবো না কাঁদবো ? পৃথিবীটা কি রাতারাতি বদলে গেল ?

ভদ্রলোক আমার চেয়েও বছর চার-পাঁচেকের বড় হবেন, মুখখানি বেশ শান্ত ধরনের, শিশুর মতন গোল কাঁধ। কথাবার্তা বলেন পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করে। তিনি বললেন, আমি প্রতি মাসে ঠিকই টাকা পাঠিয়েছিলাম—আমার বড় ছেলেটি তার মাকে না জানিয়ে কোনো কারণে অন্য ব্যাপারে হয়তো খরচ-টরচ করে ফেলেছে! বাড়ি ভাড়া না দেওয়া তো অপরাধ—বিশেষত আমি অফিস থেকে বাড়ি ভাড়ার অ্যালাউয়েন্স পাই।

আমি বিশেষ কোনো কথা বলি নি, লোকটিকে খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখছিলাম। এরকম নিপাট ভালোমানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে? ওরা কোথায় উঠে গেছেন সে-ঠিকানা জানি না, উকিলবন্ধু বিশেষ ভরসা দিতে পারে নি, মামলা করলে সেও তো গভীর জলের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে বাড়ি বয়ে এতগুলো করকরে টাকা গুনে দিতে এসেছেন ! উনি একজন নিছক চাকরিজীবী, ভাড়া বাড়িতে থাকেন—সুতরাং এই তেরশো টাকার দাম ওঁর কাছে নিতান্ত কম নয়। শুধু তাই নয়, যতদিন আমাদের বাড়িতে ওঁরা ছিলেন, ততদিন আমাদের কাছ থেকে যে খুবই ভালো ব্যবহার পেয়েছেন এবং সাত মাসের ভাড়া বাকি রেখে যাওয়ার জন্যও কোনো উচ্চবাচ্য আমরা করি নি—সেজন্য উনি বার-বার আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালেন।

ভদ্রলোক যখন বিদায় নিলেন, আমি ওঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলাম। ওঁর সঙ্গে আমি বিশেষ কোনো কথাই বলতে পারিনি। কী আর বলবো ! হয়তো বলা উচিত ছিল, আপনি একটা নেহাত বোকা ! এতগুলো টাকা কেন শুধু শুধু গচ্চা দিতে এলেন! তাও নয়, আমি ও কথা বলতে চাই নি—পৃথিবীতে সৎ মানুষ দেখলে এখনো আমার আনন্দ হয়।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক যখন রাস্তায় পা দিয়েছেন, তখন আমি আচমকা বললুম, আচ্ছা, শুনুন—। ভদ্রলোক ফিরে তাকিয়ে বললেন, কী? আর কিছু বলবেন ? আর কোনো টাকা বাকি আছে ? আমি সঙ্গে-সঙ্গে লজ্জা পেয়ে বললাম, না, না, তা নয়। আচ্ছা ঠিক আছে, নমস্কার! ভদ্রলোককে যে প্রশ্নটা করার জন্য আমি ছটফট করছিলুম, সেটা সত্যিই মুখে বলা যায় না। আমি জানতে চাইছিলুম, রহস্যটা কী? এখনও মানুষ সৎ থাকতে পারে কী করে?

বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা বেশ ভালোমানুষ। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, ঐ লোকটা কি ছেলেবেলা থেকেই এরকম ভালোমানুষ ? ছেলেবেলা থেকেই ভালোমানুষ হয়ে এই চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত এরকম নিরুপদ্রবে বেঁচে আছে কী করে ? তা যে খুবই শক্ত। সবাই বদলায়। ছেলেবেলায় আমিও তো ভালোমানুষ ছিলাম—আমি এরকমভাবে বদলে গেলাম কেন ? নাকি,

ঐ লোকটা ছেলেবেলায় খুব বদমাশ পাষণ্ড ছিল—হঠাৎ কোনো ধাক্কা খেয়ে অনেকে যেমন ধর্মে-কর্মে মন দেয়—সেই রকমভাবেই লোকটা হঠাৎ বিবেকবান হয়ে উঠেছে? কী জানি, ঠিক বোঝা গেল না।

৮

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

টেবিলের ড্রয়ারগুলো গুছোতে-গুছোতে নবনীতার একটা চিঠি বেরিয়ে পড়লো। ভেবেছিলাম নবনীতার কোনো চিঠি আর আমার কাছে নেই। বড় ড্রয়ারটার নিচে যে খবরের কাগজ পাতা ছিল, তারই ভাঁজের মধ্যে রয়ে গেছে চিঠিটা। কবে যেন অত্যন্ত যত্নে গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলাম, নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখার মতন! উনিশ বছর আগে লেখা এই চিঠি—মাঝখানে অনেকদিনের শূন্যতা।

অঃ

পরশু থেকে তোমার এম.এ. পরীক্ষা শুরু। এখন রাত এগারোটা, জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে, সেই সঙ্গে আসছে চাঁপাফুলের গন্ধ। আমাদের পাশের বাড়িতে একটা চাঁপাফুলের গাছ আছে খুব বড়—গাছটা ওদের, কিন্তু, আমরা বেশ গন্ধটা উপভোগ করি। খুব ইচ্ছে করলো তোমাকে চিঠি লিখতে। একটা চিঠি পড়তে গেলেও কি তোমার সময় নষ্ট হবে? হোক গে! তুমি নিশ্চয়ই এখন খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করছো? ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট তোমাকে হতেই হবে। অবশ্য তুমি হবেই আমি জানি। বিজয়লক্ষ্মী তোমার গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দেবেন—আমার প্রার্থনা শুনে তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

আজ সারারাতই পড়বে নাকি? বেশি চা-সিগারেট খেও না লক্ষ্মীটি! এখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর আর কারুর কথা মনে করার সময় নেই তোমার! এই শোনো, তোমার পরীক্ষা তো সতের দিন ধরে চলবে—এর মধ্যে কিন্তু আর আমার সঙ্গে দেখা কোরো না! তুমি এলেও আমি দেখা করবো না। এই সময় অন্যদিকে মন ফেরানো একদম উচিত নয়। বিজয়লক্ষ্মী বড় ঈর্ষাপরায়ণা—তিনি খাঁটি একনিষ্ঠতা চান। তারপর পরীক্ষা হয়ে গেলে তো তোমার অফুরন্ত ছুটি—ডায়মন্ড হারবারের সেই পিকনিকের কথা মনে আছে তো?

আজ দুপুরবেলা তোমাকে বাদ দিয়ে আমি আর জয়ন্তী খুব টো-টো করে ঘুরে বেড়ালুম! নিউ মার্কেটে গিয়েছিলুম, ওখান থেকে লাইট হাউস সিনেমার সামনে এসে আইসক্রিম খেলুম। তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। জয়ন্তীর বন্ধু সেই সিদ্ধার্থ— তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জয়ন্তীটা এমন পাজি না, ভাব দেখালো যেন সিদ্ধার্থের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছে। আসলে ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। যাক গে, চিঠি আর লম্বা করে তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। চিঠিটায় শুধু একবার চোখ বুলিয়েই ছিঁড়ে ফেলবে—তারপর আবার মন দিয়ে লর্ড কন্‌সের খটোমটো তত্ত্ব মুখস্থ করবে, কেমন?

তোমার নবনীতা

নবনীতা আমাকে শুধু অ বলে সম্বোধন করতো। একদিন বলেছিল, অ যেমন বর্ণমালার প্রথম অক্ষর, তুমিও তেমনি আমার জীবনে সবকিছুর মধ্যে প্রথম। অবশ্য নবনীতা এ ধরনের কথা খুব কমই বলতো। ওর চিঠির মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ভাবপ্রকাশ পেলেও—বাইরের ব্যবহারে নবনীতা বিশেষ আবেগ কিংবা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতো না। সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলাই পছন্দ

করতো এবং একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল সবকিছুতে। সেইজন্যই এক আধবার এরকম আবেগের কথা বলে ফেললে আমি সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতুম।

নবনীতা পরীক্ষার সতের দিন ওর সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছিল, কিন্তু প্রথম দিন পরীক্ষা দিয়ে আশুতোষ হল থেকে বেরিয়েই দেখি, রাস্তার ওপাশে নবনীতা দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুরা সবাই কোশ্চেনের আলোচনা নিয়ে দারুণ উত্তেজিত, তক্ষুনি ওদের ছেড়ে আসা যায় না। ঘন-ঘন নবনীতার দিকে চোখ রেখে বন্ধুদের জটলার মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলুম মিনিট-দশেক। তারপর রাস্তার এপাশে চলে আসতেই নবনীতা ঠোঁট টিপে হেসে বললো, ভেব না, রোজ-রোজ তোমার সঙ্গে পরীক্ষার পর দেখা করতে আসবো ! আজ এমনিই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম—কীরকম হলো পরীক্ষা ?

আমিও হেসে জিজ্ঞেস করলাম, এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে ?

—আঃ, তা দিয়ে তোমার দরকার কি ! কীরকম পরীক্ষা হলো আগে বলো !

—তা আর শুনে কী হবে ? যা হবার তো হয়েই গেছে।

—আমি তাহলে চললুম।

—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—না, তুমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোও—কাল সারারাত জেগেছো নিশ্চয়ই !

—ধুৎ, এই বিকেলবেলা ঘুমোবো নাকি ? কালকের দিনটা ফাঁক আছে—চলো কোথাও গিয়ে বসি একটু।

—বেশিক্ষণ নয় কিন্তু, এক ঘণ্টা। খানিকটা ঘুমিয়ে না নিলে তোমার শরীরটা ঠিক থাকবে না—সেটাও তো দেখা দরকার—

—আর, তোমার সঙ্গে কথা না বললে যে আমার মনটা ঠিক থাকবে না!

—যাও, আর ঐসব বলতে হবে না। কোথায় যাবে বল!

—যেখানে তোমার খুশি।

—তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। চলো, তোমাকে আমি আজ চীনে খাবার খাওয়াবো। তুমি আমার চিঠিটা পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ—এই দ্যাখো।

—একি, তুমি পরীক্ষার হলেও আমার চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো ?

আঃ, কী সুখের সময় গেছে জীবনের সেই দু-তিনটে বছর! এক-একসময় মনে হয়, নবনীতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোনো পূর্ণতা পায় নি—তা নাই বা পেল, তবু স্বল্পস্থায়ী হলেও সেই ক'বছর যে আনন্দ পেয়েছি, তাই বা কম কিসের ! শুধু সেইটুকু নিয়েই কি এক জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না ? নবনীতার সঙ্গে গত সাত-আট বছরের মধ্যে একবারের জন্য চোখের দেখাও হয় নি ; অথচ সেই সময় ভাবতাম—পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

নবনীতার সংস্পর্শ ছাড়া, সে-সময় আমার জীবনের বাকি অংশটা ছিল কষ্ট আর অস্বস্তির। কিন্তু নবনীতার দেখা পেলেই আর সবকিছু মুছে যেত। সে-সময় আমাদের বাড়ির অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল।

এলাহাবাদেই আমার বি.এ. পরীক্ষার ছ'মাস আগে বাবা মারা গেলেন। মায়ের শরীর কোনোদিনই ভালো না—বাবার মৃত্যুর পর একেবারেই ভেঙে পড়লো। আবার মৃত্যু অমন

আকস্মিক বলেই আঘাতটা অমন সাংঘাতিক হয়েছিল। রবিবার দিন সকালে বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে বাবার হার্ট ফেইল করে। মরে যাবার আধঘণ্টার মধ্যেও কেউ বুঝতে পারে নি। আমরা ভেবেছিলাম, বাবা রোজ যেমন সকালে ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়েন, সেইরকমই বসে আছেন, কাগজখানা হাত থেকে খসে পড়ে গেছে—হয়তো তন্দ্রা এসেছিল। আমার দিদিই চা দিতে এসে প্রথম বুঝতে পারে।

বাবার মৃত্যুর পর আমি একবারও কাঁদি নি। শেষের দিকে আমি বাবাকে ভালবাসতুম না, ভয়ও করতুম না। বরং টুনি পিসীর সেই ঘটনার পর বাবার প্রতি আমার বেশ একটা অশ্রদ্ধার ভাবই বেড়ে উঠেছিল দিন-দিন।

যাই হোক, বাবা যখন মারা যান, তখন দাদার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল, দিদিরও বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। বাবা তাঁর কোনো ছেলেমেয়েরই বিয়ে দেখতে পেলেন না। মা সেই থেকে প্রায় পাকাপাকিই শয্যা নিলেন। দাদার বিয়ে পিছিয়ে গেল এক বছর। দাদার লেখাপড়া বেশি দূর হয় নি। কিন্তু দাদার চেহারা তখন ছিল খুব সুন্দর, আমার চেয়েও লম্বা, অনেক ভালো স্বাস্থ্য, তেমনি ফরসা রং। দিল্লীতে এক বাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে দাদার আলাপ হওয়ায় তিনিই তাঁর মেয়ের জন্য দাদাকে পাত্র ঠিক করে ফেলেন। আমাদের কায়স্থদের মধ্যেও বেশ জাতের কড়াকড়ি আছে, দাদার শ্বশুররা আর আমরা নাকি একেবারে ঠিক পাল্টিঘর যাকে বলে। দাদার শ্বশুরের ইচ্ছে ছিল, বিয়ে দিয়ে দাদাকে ঘরজামাই করে রাখা—দাদা তাতে অবশ্য রাজি হয় নি—শ্বশুরের কলকাতার ব্যবসা দেখার ভার নিয়ে কলকাতায় চলে এলো—মাকে আর আমাকেও আসতে হলো কলকাতায় দাদার কাছে। দিদির বিয়ে হলো এলাহাবাদেই।

বাবার মৃত্যুর সময়কার ঝামেলার জন্য আমার বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট তেমন ভালো হলো না। ইকনমিক্স অনার্সে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলাম। আমার এম.এ. পড়ার ব্যাপারে দাদার খুব আপত্তি ছিল। দাদা বলেছিল, বি.এ. পাশ করেছিস যথেষ্ট হয়েছে, আর পড়াশুনো করে কী হবে ? আমার শ্বশুরমশাই বলছিলেন, তাঁর ফ্যাক্টরিতে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট দরকার—

আমি বলেছিলাম, না!

তখন দাদাই আমাদের অভিভাবক, দাদার শ্বশুরের টাকায় কেনা বাড়িতে থাকি, দাদারই উপার্জনের অন্ন খাই, দাদার কাছে পড়ার খরচ চাইবার মতন মুখ ছিল না। দুটো টিউশানি জোগাড় করে অতিকষ্টে নিজের খরচ চালিয়েছি। অর্থকষ্টের ব্যাপারটা সেই প্রথম টের পেলাম। বাবা বেঁচে থাকতে আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল। বাবা রেলে চাকরি করতেন, তিনিও ঘুষ নিতেন কিনা জানি না—রেলের চাকরিতে তখন ঘুষ নিত না এমন লোক অবশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। তবুও আমাদের বাড়িতে কাঁচা পয়সার ঝনঝনানি কোনোদিনই ছিল না—বিলাসিতাহীন অনাড়ম্বর সংসার ছিল, কিন্তু, কোনোদিন কিছুর অভাব হয় নি।

কলকাতায় নিজে রোজগার করে পড়াশুনো চালাতে গিয়ে মজাটি টের পেলাম ভালোভাবে। এলাহাবাদের তুলনায় কলকাতায় খরচ অনেক বেশি। ট্রাম-বাসের ভাড়া তো আছেই, তাছাড়া কথায়-কথায় রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা খাওয়া স্বভাব এখানকার লোকদের। পড়াশুনোর দিক দিয়েও বেশ অসুবিধে হতে লাগলো। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার তুলনায় কলকাতা ইউনিভার্সিটির পড়াশুনোর স্ট্যান্ডার্ড বেশ উঁচু—অন্তত তখন পর্যন্ত ছিল। এখনকার ডামাডোলের বাজারে কী অবস্থা হয়েছে জানি না। আমি এলাহাবাদ থেকে বি.এ. পাশ করে এসেছি, সেখানে বেশ ভালো ছাত্র হিসেবেই ছিলুম, কিন্তু কলকাতায় এসে থই পেলুম না। তবু আমি ভালো রেজাল্ট করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলুম, সারা সপ্তাহ টিউশানি করেও মন দিয়ে পড়াশুনো করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই পারি নি! ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হওয়া দূরে থাক, ফার্স্ট ক্লাশও পেলাম না,

বরাতে জুটল একটা মাঝারি সেকেন্ড ক্লাশ। আর ইকনমিক্সের মতন সাবজেক্টে খুব ভালো রেজাল্ট করতে না পারলে সামনে আর কোনো ভালো পথ খোলা থাকে না।

কিন্তু আমার সব গ্লানি মুছে দিয়েছিল নবনীতা। নবনীতা আর আমি একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলুম, যেখানে অভাব অতৃপ্তি সবই ছিল, কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা ছিল না।

নবনীতার অবস্থা তখন অনেকটা আমারই মতন। নবনীতার মা মারা গেছেন, একটা মোটর দুর্ঘটনায় ওর বাবা একেবারে পঙ্গু। নবনীতার দুই দাদাই তখন বেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও, দু'জনে দারুণ ঝগড়া। ওর বাবা তাঁর প্রায় শেষ সম্বল দিয়ে কালিঘাটে একটা বাড়ি কিনেছিলেন—সে বাড়ির দোতলা–তিনতলায় দুই দাদার সংসার, আলাদা রান্না। বাবাকে নিয়ে নবনীতাও থাকতো আলাদা। দুই বৌদির রেষারেষিতে বাড়িতে শান্তি ছিল না নবনীতার।

নবনীতার সঙ্গে আমার আর একটা মিল ছিল। আমাদের দু'জনেরই শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল সচ্ছল অবস্থার মধ্যে। সুতরাং প্রথম যৌবনে খানিকটা আর্থিক অনটনে পড়লেও আমাদের ব্যবহার কিংবা রুচিতে কোনো দারিদ্র্য ছিল না। টাকার অভাব নিয়েও আমরা হাসাহাসি করতে পারতুম। নবনীতার হ্যান্ডব্যাগে কখনো মাত্র দু'টি টাকা থাকলে, তার মধ্যে এক টাকাই ও ভিখিরিদের বিলিয়ে দিতে পারতো। তাছাড়া, আমরা দু'জনেই মানুষ হয়েছি কলকাতার বাইরে, বাংলাদেশের বাইরে, নবনীতা ওর বাবার চাকরির বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফার হওয়ার সূত্রে গোয়ালিয়র, বরোদা, নাগপুর এইসব জায়গায় ছিল, সেই জন্য আমাদের রুচি অনেকভাবে মিলতো। আমরা দু'জনে কেউই কলকাতার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠিক সহজভাবে মিশতে পারি নি। প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদেরই মেলে বেশি।

সেই প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে দেখা হওয়ার পর, নবনীতা আর তার দুই বান্ধবীকে আমি ক্যান্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই দুই বান্ধবীর মধ্যে একজন তো ছিল জয়ন্তী, আর একজনের নাম ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় অরুণা কিংবা অনীতা। নবনীতার বান্ধবী দু'জনই কলকাতার মেয়ে, তারা আমার চা খাওয়ানোর প্রস্তাব শুনে বেশ লজ্জা–লজ্জা ভাব করছিল। সহজে যেতে রাজি হয় নি। পরে বুঝেছিলাম, কলকাতার মেয়েরা ওরকম হুট করে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে (আমি তো ওদের কাছে অচেনাই, এবং নবনীতার সঙ্গেও আমার আগে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল) চা খেতে যায় না। এমনকি কলেজের বন্ধু কিংবা পাড়াতুতো বন্ধু হলেও—প্রথম–প্রথম শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলা পর্যন্ত চলে, তারপর একটু প্রেম–প্রেম ভাব হলে তখনই একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায়। আমি এলাহাবাদের ফিরিঙ্গি স্কুলে–পড়া ছেলে, আমার কাছে ওসব কিছুই মনে হয় নি; স্বভাবিকভাবেই ওদের অনুরোধ করেছিলুম, নবনীতাও কোনো আড়ষ্টতা বোধ করে নি।

আমি নবনীতাকে সেই জব্বলপুরের মারবল্ রক্স আর নর্মদা নদীর ওপর নৌকোয় করে বেড়ানোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলুম। সেই দিনটির প্রতিটি মুহূর্তের কথা আমার মনে ছিল, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করছিলুম। নবনীতার বান্ধবী দু'জন কখনো জব্বলপুরে যায় নি, তারাও শুনছিল আগ্রহের সঙ্গে, নবনীতা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমার কথা শুনতে-শুনতে হঠাৎ নবনীতার মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন এলো। অত লোকজনে ভর্তি ক্যান্টিনের মধ্যেই, আমি দেখলুম, নবনীতার চোখে জল, নীরব জলের ধারা গড়িয়ে আসছে গাল বেয়ে।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, ওকি ? আপনার কী হলো ?

নবনীতা বললো, থাক, আর বলবেন না। আর থাক !

—কেন ? আমি কি কিছু— !

—তখন মা বেঁচে ছিলেন, মা সে–বছর...

আমি থতমত খেয়ে চুপ করলুম। বুঝতে পারলুম, নবনীতার মা আর বেঁচে নেই, হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ায় তার কষ্ট হচ্ছে।

কিছুদিন পরে আরও বুঝতে পেরেছিলুম, শুধু মায়ের জন্যই নয়, সেই সময়কার সুখের দিনের কথা ভেবেও নবনীতার কান্না এসেছিল। তখন নবনীতার মা-বাবা দু'জনেই বেঁচে, দাদাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না, কত জায়গায় বেড়াতে যেত সবাই মিলে—তখন ছিল নবনীতার আনন্দের সুখের কৈশোরকাল—সেই জীবন সে হারিয়েছে—

এই ক'বছরেই অনেক কিছু বদলে গেছে, মা নেই, বাবা অশক্ত, কলকাতার এক অশান্তিময় বাড়িতে সে আটকা পড়ে আছে।

কলকাতায় প্রথম দেখার দিনেই নবনীতা সেই যে কেঁদেছিল, সেই কান্নার সূত্রেই আমরা দু'জনে বাঁধা পড়ে গেলুম। আমরা দু'জনেই আমাদের দু'জনের কাছে সুখী কৈশোরের প্রতীক ছিলাম।

কিন্তু নবনীতা, সেই তুমিই পরে আমাকে এত আঘাত দিলে কেন? কেন তুমি আমাকে সেই চরম অপমানের মধ্যে ঠেলে দিলে? কেন? নিজের প্রিয় নারীর কাছ থেকে আকস্মিকভাবে ওরকম নিষ্ঠুর অপমানজনক ব্যবহার পেলে অনেক পুরুষ আত্মহত্যাও করে ফেলে। আবার অনেকে হত্যাকারীও হয়ে ওঠে। আমি তাই হয়েছিলাম। আমি অন্য কারুকে হত্যা করি নি, আমি আমার নিজের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে হত্যা করেছি; নবনীতার প্রতি বিরুদ্ধ আক্রোশেই আমি এ পৃথিবীর প্রতি আমার সমস্ত দয়া, মায়া, ভালবাসা সব বিসর্জন দিয়েছি। সেই থেকেই আমার পাপের শুরু। নবনীতা, তুমিই আমাকে পাপী করেছ।

৯

১লা মার্চ, ১৯৬৬

ডঃ চ্যাটার্জি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি গান গাই কিনা। আমি প্রথমে ওর প্রশ্ন শুনেও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারি নি; বলেছিলাম, কী বললেন? গান? আমি গান গাইতে পারি কিনা?

ডাক্তারটি তো দেখছি অদ্ভুত! প্রথমদিন আমাকে বলেছিল, বুদ্ধিজীবী; আজ বলছে গায়ক! অথচ আমি এসেছি ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে। এর পরদিন বোধহয় জিজ্ঞেস করবে, ছেলেবেলায় আমি কোনো পাখির ডানা ছিঁড়েছিলাম কিনা, তার সঙ্গেও ক্যানসারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে হয়তো!

আমি মৃদু হাস্যে জানালাম, না, আমি গায়ক নই। ছেলেবেলায় একটু-আধটু অর্গ্যান বাজাতে পারতুম, আমাদের বাড়িতে একটা ভাঙা অর্গ্যান ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে আমার সুর বেরোয় না!

—বাথরুমেও গান করেন না?

—না। কেননা, বাথরুমে ঢুকেও তো আমি নিজের কান দুটো বন্ধ করতে পারি না!

ডাক্তার হো-হো করে হাসলেন। তারপর বললেন, আপনাকে যে জিজ্ঞেস করছি, তার একটা কারণ আছে। আপনার গলার মধ্যে একটা জায়গায় একটুখানি সোলেন হয়ে আছে, একটা ফুস্কুরির মতন— আপনার যে ঢোক গিলতে ব্যথা হয়, খুব সম্ভবত ঐটার জন্যই। যাঁরা খুব গান-টান করেন, মানে গান করাই যাঁদের প্রফেশান— তাঁদের কারুর-কারুর ওরকম হয়। আমরা ওটাকে বলি সিঙ্গারস্ নোট, ঐ থেকেই অনেক সময় গলার আওয়াজ ভেঙে যায়।

— আর সারে না?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, সারে বৈকি? আপনি গরম জলে বেনজয়েনের ভেপার নিয়মিত নিচ্ছেন তো!

— তা নিচ্ছি ! কিন্তু এটা থেকেই কি ক্যানসার হয় ? অনেক গায়কেরও তো শুনেছি—

— আরে মশাই, আপনি ক্যানসার নিয়ে এত ভাবছেন কেন ? আপনার সেসব কিছু হয় নি। ফাইন্যাল রিপোর্ট আপনাকে কাল জানাবো।

— আবার কাল আসতে হবে ! কালকেও কি গলার মধ্যে ঐসব করবেন ?

— না, না, কাল আর কিছু না।

আজ বেশ কষ্ট পেয়েছি। ডঃ চ্যাটার্জি তাঁর কপালের ওপর একটা আলো লাগিয়ে— আমার গলায় একটা চামচের মতন পদার্থ ঢুকিয়ে কিসব দেখার চেষ্টা করছিলেন। সে একটা হাস্যকর অবস্থা। মুখটা হাঁ করা, ভেতরে অনেকখানি ঢোকানো চামচ, সেই অবস্থায় আমাকে আওয়াজ করতে হবে। আওয়াজটা পাঁঠার ডাকের মতন ব্যা–ব্যা শোনাচ্ছিল। তাও বেশিক্ষণ পারি নি আমি। চামচটা কিছুক্ষণ রাখার পরই আমার বমি পাচ্ছিলো— আমি ডাক্তারের হাত ঠেলে সেটা সরিয়ে দিয়েছি। দু'বার তো সত্যিই বমি এসেছে, আমি উঠে গিয়ে বেসিনে বমি করে এসেছি। পাঁচ–ছ'বারের চেষ্টার পর হয়রান হয়ে ডাক্তার বললেন, আপনি একটু কষ্ট করে দু'তিন মিনিট থাকতে পারছেন না ?

আমি বললাম, কী করবো বলুন ! আমার জিভ যে কিছুতে রাজি হচ্ছে না— সবসময় চামচটাকে ঠেলে দিতে চাইছে, তা না পারলেই বমি আসছে।

— তবে তো আপনার জিভটাকেই শায়েস্তা করতে হয় আগে।

এরপর তিনি আমার গলায় অ্যানিসথেসিয়া দিয়ে দিলেন, আমার জিভ ও গলার খানিকটা অংশ অসাড় হয়ে গেল। তখন তিনি আরাম করে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। সেই অবস্থায়, যখন আমি ব্যা–ব্যা আওয়াজ করছি, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি গান–টান করেন ? এর চেয়ে বেশি হাস্যকর আর কী হতে পারে ? মেডিক্যাল সায়েন্সটা সত্যিই এখনো তেমন উন্নত হয় নি। আসবার আগে আবার জিজ্ঞেস করে এলুম, তাহলে কালই ফাইন্যাল রিপোর্ট পাচ্ছি তো ?

নবনীতাও খুব ভালো গান গাইতে পারতো না। অনেক গানই গুনগুন করতো, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি অনেক গানই ওর জানা ছিল, কিন্তু গলা ছেড়ে গায়িকাদের মতন গান করার অভ্যেস ওর ছিল না। নবনীতার মুখেই আমি 'চির সখা হে, ছেড়ো না—' গানটা প্রথম শুনেছিলাম— আউটরাম ঘাটের কাছে, গঙ্গার পারে রেলিং–এ ভর দিয়ে খুব নিচু গলায় গেয়েছিল। অস্পষ্ট সন্ধে তখন, আমি নবনীতার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করছিলুম— আমার বুকের মধ্যে একটু–একটু কষ্ট হচ্ছিলো, একটা দুরন্ত–দুর্দাম ইচ্ছে হচ্ছিলো নবনীতাকে সেই সময় বুকে জড়িয়ে ধরবার। কিন্তু আশপাশ দিয়ে অনেক লোকজন যাচ্ছিলো। সেই ফাঁকে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে লুকিয়ে–চুরিয়ে একটু জড়াজড়ি করে নেবার ব্যাপারটা আমার রুচিতে বাধে— ছেলেবেলা থেকে আমরা এইরকম শিক্ষাই পেয়েছি। নবনীতাও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পছন্দ করতো না।

নবনীতার বন্ধু জয়ন্তী খুব ভালো গান জানে। জয়ন্তী কয়েকটা জলসাতেও গান গেয়েছে। একবার ডোভার লেনে একটা ফাংশানে জয়ন্তীর গান আমরা সবাই মিলে শুনতে গিয়েছিলাম— সেদিন নবনীতা আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল, জানো, আজ প্রথম জয়ন্তীকে আমার হিংসে হচ্ছে। স্টেজের ওপর কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে— গোলাপী বেনারসীটায় ওকে মানিয়েছেও খুব সুন্দর! বল!

আমি অন্যমনস্কভাবে বলেছিলাম, হ্যাঁ, বেশ দেখাচ্ছে! কিন্তু এই সাদা শাড়িতে তোমাকেই আমার চোখে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে।

— মোটেই না। জয়ন্তী আমার থেকে অনেক বেশি সুন্দর।

— আমি তো বললুম, আমার চোখে !

নবনীতা হাসতে–হাসতে বলেছিল, ইস্‌, তুমি তো তখন থেকে জয়ন্তীর দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছো ! আমার দিকে মনোযোগ দিলে কখন !

নবনীতা ভুল বলেছিল। তখন, সেই ক'টা বছর নবনীতা ছাড়া অন্য কিছুর দিকেই আমি মনোযোগ দিই নি। দিলেই বোধহয় ভালো হতো, তাহলে অনেক কিছু আমার চোখে পড়তো। এখন বুঝতে পারি, মানুষের চোখ একটু ছটফটে হওয়াই ভালো। দৃষ্টি স্থির রাখলে, জীবনের বিপদগুলো বিনা নোটিশে অতর্কিতে আসে। এটা তো একটা যুদ্ধ, চতুর্দিক দেখে সবসময় সজাগ না থাকলে চলবে কেন?

কিন্তু এসব কথা আজ আমি কেন ভাবছি ? কাল সঠিক জানতে পারবো, আমার ক্যানসার হয়েছে কিনা। কাল আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবে। আমার সব পাপের দণ্ড! না, না, পাপ করলেই মানুষ শাস্তি পায় না। ওটা ভুল।

১০

২রা মার্চ, ১৯৬৬

ডাক্তার চ্যাটার্জি সবরকম পরীক্ষা করে আজ নিশ্চিন্তভাবে বলেছেন, আমার ক্যানসার হয় নি। আমার একটু কড়া ধরনের ফেরিনজাইটিস হয়েছে। ও কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার। আমার লাংসে একটা প্যাচ হলেও হতে পারে—একবার এক্সরে করে দেখাতে হবে। সেটাও কিছু না। আজকাল টি.বি. কিংবা প্লুরিসিও তো নেহাত জল–ভাত।

যদি হয়ও, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। ও যেন ফাঁসির আসামী শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়ে গেল। কাল রাত্তিরে লিখতে–লিখতে হঠাৎ এক সময় আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, আমি আর বাঁচবো না! যতই যা বলি, এই পৃথিবীটাকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবলে বুক চৌচির হয়ে যেতে চায়, কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তাহলে, এক্ষুনি মরতে হলো না ? আজ আমার হুর–র–রে বলে চেঁচিয়ে ওঠা উচিত। আমার ক্যানসার হয় নি, তার মানে এখনো বেশ কিছুদিনের জন্যে বেঁচে গেলাম।

আজ আমার পরম আনন্দের দিন। কিন্তু তবু সে–রকম আনন্দ হচ্ছে না কেন ? মনমরা ভাবটা কিছুতেই কাটছে না।

অন্যদিনের মতন আজও কোনো কাজকর্ম না করে চুপচাপ শুয়ে–শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। বেশ কয়েকদিন ক্যানসারের ভয় নিয়ে কাটলো, আজ এতবড় একটা মুক্তির খবর পেলাম, তবু তো আমার উল্লাস ফেটে পড়ছে না! ফাঁসির আসামী যদি বেকসুর খালাসের হুকুম পায়, তাহলে কী করে ? আদালতেই নাচতে শুরু করে ?

আসলে, আমার আনন্দ ভাগ করে নেবার মতন কেউ নেই। এমন কেউ নেই আমার, যার কাছে গিয়ে আমি একথাটা বললে সেও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। মাকে কিংবা দাদা-বৌদিকে কিছুই জানাই নি আগে, সুতরাং যাঁরা রোগের ভয়ের খবরটাই জানেন না— রোগমুক্তির খবরে আনন্দের প্রশ্নই ওঠে না তাঁদের। পৃথিবীতে আর কারুর সঙ্গে আমি এমন সম্পর্ক রাখি নি— যে আমার এই খবরে আন্তরিকভাবে খুশি হতে পারে। আমি যদি ক্যানসারে মারা যেতাম, তাহলে আমাদের বাড়ির বাইরে আর কেউ কি আমার জন্য কষ্ট পেত ? অফিসে আমার নিজস্ব আর্দালিটা বোধহয় কাঁদতো একটু। ও বোধহয় আমাকে ভালবাসে !

১১

৩রা মার্চ, ১৯৬৬

ক্যানসার যখন হয় নি আমার, তখন এ কথা নিশ্চিন্তভাবে বোঝা গেল, পাপের ফলে মানুষ কোনো শাস্তি পায় না। তাহলে, এখন অনায়াসে আমার পাপের কথা বলা যেতে পারে।

আমি ঈশ্বর-টিশ্বরে বিশ্বাস করি না। মৃত্যুর পর শরীরটা ছাই হয়ে হাওয়ায় উড়বে, তারপর আর কিছু নেই। মৃত্যুর পর যদি আবার কিছু থাকতো, এমনকি নরকেও যেতে হত, তাহলেও আমি অরাজি হতুম না। কিন্তু নিশ্চিত জেনে গেছি, স্বর্গ-নরক সব গল্প। এ জন্মে পাপ করার ফলে পরের জন্মে কুকুর-বেড়াল হয়ে জন্মাবার কথাও শুনতুম ছেলেবেলায়।

শাস্তির ভয়ে নয়, আমার মনের গড়নই ছিল এই রকম— অন্যায় কিংবা পাপ আমাকে আকর্ষণ করে নি। জীবনে কখনো কারুকে আঘাত দিতে চাই নি। যতদিন বাঁচবো, আমি চেয়েছিলাম এই পৃথিবীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু পারি নি।

বাবা টুনি পিসীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। টুনি পিসীকে আমি আমার জন্ম থেকেই প্রায় বিধবা দেখেছি। মাজা-মাজা গায়ের রং, বেশ ভরাট স্বাস্থ্য, মুখখানি ছিল গোল ধরনের। সকাল থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত টুনি পিসী খাটাখাটনি করতেন— আমার মায়ের স্বাস্থ্য বরাবরই ভগ্ন ছিল— টুনি পিসীই সংসারটা সামলে রেখেছেন। এলাহাবাদের দারুণ গরমে আমি টুনি পিসীকে ছাদে বসে বড়ি দিতে দেখেছি। বাবা বড়ি দিয়ে রান্না মাছের ঝোল ভালবাসতেন।

শুধু বাবা নয়, বাড়ির প্রত্যেকে কে কোন্‌টা খেতে ভালবাসে, কার কী রকম অভ্যেস— সেসব দিকে নজর ছিল টুনি পিসীর। আমার তো মনে পড়ে, ছেলেবেলায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা কখনো মায়ের কাছে কিছু বলি নি, টুনি পিসীর কাছেই আবদার করেছি।

আমরা ছোটখাটো দোষ করলে বাবার রাগ থেকে টুনি পিসীই আমাদের বাঁচাতেন। দাদা যে-বার বাবার হাতঘড়িটা লুকিয়ে পরতে গিয়ে কাচ ভেঙেছিল, সেবার তো বাড়িতে হুলস্থূল কাণ্ড, টুনি পিসীই তখন বাবাকে বলেছিলেন যে, তিনিই টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়ে অসাবধানে ঘড়িটা ফেলে দিয়েছিলেন, তাতেই কাচ ভেঙেছে। বাবা বিশ্বাস করতেন টুনি পিসীর কথায়, ভালোও বাসতেন তাঁকে।

বাড়িতে ক্ষার দিয়ে কাচা সাদা থান পরতেন টুনি পিসী, মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা— অনেকটা পুরুষালি ধরনের চেহারা ছিল তাঁর।

জীবন সম্পর্কে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না, কখনো তাঁকে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখি নি, সতেরো বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর দাদার বাড়িতে আশ্রিত-জীবনই তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

যতদিনের কথা মনে পড়ে, আমি টুনি পিসীর ঐ একই রকম চেহারা, একই রকম অবস্থাই দেখেছি। আমাদের কারুর অসুখ-বিসুখ হলে তিনি দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়তেন, আমার দিদির বিয়ের ব্যাপারে তাঁর কী চেষ্টা, মা চিংড়ি মাছ খেতে ভালবাসেন, অথচ এলাহাবাদে চিংড়ি মাছ তখন পাওয়া যেত না—সেইজন্য চেনাশুনো কেউ কলকাতায় গেলেই তাকে দিয়ে চিংড়ি মাছ আনানোর জন্য টুনি পিসী মহাব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু একমাত্র নিজের সম্পর্কেই তাঁর কোনো চিন্তা ছিল না। ছেলেবেলায় সেটা কিছু অস্বাভাবিক লাগে নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারি, বাঙালি বিধবারা কি অদ্ভুতভাবে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একেবারে ভুলে যেতে পারে ! বাড়ি থেকে কখনো বেরুতেন না। বেরুবেন কখন, সব সময়ই তো কাজ। মাঝে-মাঝে আমরা বাড়িসুদ্ধ

সবাই সার্কাস কিংবা রামলীলা দেখতে যেতাম, টুনি পিসীকে অনেক বলেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় নি। বাবা সিনেমা-থিয়েটার দেখা পছন্দ করতেন না, কিন্তু শহরে সার্কাস পার্টি এলে তিনি পাশ পেতেন—তাই ওতে খুব আপত্তি ছিল না। ব্যবাও বোধহয় চাইতেন না টুনি পিসীর বাইরে যাওয়া। টুনি পিসী যেন ধরেই নিয়েছিলেন, উনি সতেরো বছরে বিধবা হবেন, দাদার সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে, স্বামী কিংবা সন্তানের সুখ তাঁর ভাগ্যে নেই, মাছ-মাংস খাওয়া ভাগ্যে নেই। টুনি পিসীকে মনে হতো একটা যন্ত্র। তবে টুনি পিসীর দু'একটা ছেলেমানুষি দুর্বলতার প্রমাণ পেয়েছিলাম, ওর সঙ্গে রাত্রে শুতে গিয়ে।

আমার মায়ের সেবার কঠিন টাইফয়েড হয়—দীর্ঘকাল ভুগেছিলেন, তখন আমি রাত্তিরে টুনি পিসীর সঙ্গে শুতাম। টুনি পিসীর ঘরে সবসময় আমি একটা নিরামিষ শুক্তোর গন্ধ পেতাম। নিরাভরণ ঘরখানি তাঁর— একখানা চৌকির ওপর বিছানা পাতা, কুলুঙ্গিতে পিতলের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি— প্রতিদিন সন্ধেবেলা সেখানে ধূপ জ্বলতো, দেয়ালে ঝোলানো একজন গোঁপওয়ালা মধ্যবয়স্ক লোকের ছবি— তিনিই টুনি পিসীর স্বামী ছিলেন— আমি তাঁকে কোনোদিন চোখে দেখি নি।

খাটের নিচে টুনি পিসীর একটা টিনের তোরঙ্গ ছিল— তাতেই থাকতো টুনি পিসীর যাবতীয় সম্পত্তি। রাত্তিরে মাঝে-মাঝে টুনি পিসী তোরঙ্গটা গোছাতেন— ছেলেমানুষের মতন রাজ্যের টুকিটাকি জিনিসে সেটা ভর্তি— মাথার চুল নেই টুনি পিসীর— তবু রুপোর তৈরি চুলের কাঁটা রেখে দিয়েছেন, একটা হাতির দাঁতের তৈরি নস্যির কৌটো, কিছু রঙিন রুমাল, কয়েক জোড়া উলের মোজা— টুনি পিসী বলতেন, তুই বড় হ, তোর পিসেমশাইয়ের এই মোজাগুলো আমি তোকে দিয়ে দেব।

টুনি পিসী মাছ-মাংস-পেঁয়াজ ছুঁতেন না, কোনো অলঙ্কার পরতেন না, কোনোদিন সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যান নি। কিন্তু একটা বিলাসিতা ছিল তাঁর। তিনি লুকিয়ে-লুকিয়ে পান খেতেন রাত্তিরে। তখনকার দিনে, বিধবাদের পান খাওয়াও ছিল দোষের ব্যাপার। অনেক বিধবারা পান খাওয়ার বদলে শুধু দোক্তা পাতা চিবোতো। সেই সময়ই আমি জেনেছিলুম, খয়ের ছাড়া পান খেলে ঠোঁট লাল হয় না, সুতরাং কেউ জানতে পারে না। কোথা থেকে পান জোগাড় করতেন টুনি পিসী তা জানি না, কিন্তু বেশ অনেকখানি দোক্তা দিয়ে আরাম করে পান চিবুতেন তিনি— সে-সময় দরজা-জানলা বন্ধ করে নিতেন। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি বলতেন, এ কথাটা কারুকে বলিস না, সোনা! তোর দুঃখী এই পিসীটার দুঃখ আরও বাড়াবি না তো?

সেদিন প্রথম শুনলাম, টুনি পিসীরও জীবনে দুঃখ আছে। কোনোদিন তো দুঃখিত ভাব তাঁর মধ্যে দেখি নি! আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলুম, না, না, বলবো না, কারুকে বলবো না।

টুনি পিসীর পান খাওয়ার মধ্যে আমি কোনো অন্যায় দেখি নি। বরং টুনি পিসীর একটা গোপন ব্যাপারের অংশীদার হওয়ায় বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করতুম। আমাকে জড়িয়ে ধরে টুনি পিসী অনেক গল্প বলতেন, আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ার আগে টুনি পিসীর শরীরের গন্ধ, তার মুখে দোক্তার গন্ধ আমাকে একটা আবেশময় জগতে নিয়ে যেত।

আমাদের বাড়িতে ঘড়ি ধরে খাওয়া হত, পৃথিবীতে যা-ই ঘটুক না কেন, রাত সাড়ে ন'টায় আমাদের খেতে বসতে হবেই। সোয়া দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে বিছানায়। আমি বিছানায় শুয়েও জেগে থাকতুম, টুনি পিসীর আসতে অনেক দেরি হতো, তিনি খাবার-দাবার সবাইকে পরিবেশন করে, সবার খাওয়া শেষ হলে, জিনিসপত্র গোছগাছ করে, তারপর নিজে খেতে বসতেন। তারপরেও অনেক টুকিটাকি কাজ থাকতো। আমি জেগে থাকতুম, টুনি পিসীর মুখে গল্প শোনার জন্য। তখন মা-পিসীমার মুখে গল্প শোনার বয়েস আমার ঠিক নয়, টুনি পিসীও ঠিক

যে খুব ভালো গল্প বলতে পারতেন তাও নয়, কিন্তু তাঁর মুখে আমাদের নানান আত্মীয়-স্বজনের কথা, মজঃফরপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ির কথা শুনতেই আমার ভালো লাগতো। টুনি পিসীও যে এক সময় আমার বয়েসী ছিলেন, তখন অনেক দুষ্টুমি করতেন— এবং আমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবার সঙ্গে মারামারিও করতেন একসময়— এসব কথা অবিশ্বাস্য লাগতো আমার।

তখন আমার বয়েস মাত্র বারো, নারীর শরীরের মারাত্মক আগুনের কথা তখনও প্রত্যক্ষভাবে টের পাই নি। শিশুর সারল্যেই টুনি পিসীকে জড়িয়ে ধরতুম, তাঁর শক্ত গোল দুটো স্তনে কখনো আমার হাত লেগেছে, কখনো সেখানে মুখ গুঁজেছি— টুনি পিসীর বিশাল দুই উরুকে ছুঁয়েছে আমার বালকোচিত কচি উরু, অচেতনভাবে ভালোও লেগেছে, কিন্তু আর কিছু না, আর কোনো কথা মনে জাগে নি।

এখন সেইসব কথা ভাবলে আমার গা শিরশির করে। মানুষের যত বয়েস বাড়ে, ততই সে শরীরের আনন্দ হারিয়ে ফেলে। এখন এক বিছানায় দুটো শরীরের কথা ভাবলে শুধু একটা চিন্তাই মাথায় আসে। সত্যিকারের আনন্দ থাকে কৈশোরে, যখন চেতনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আর শরীর সামান্য একটু আঙুলের ছোঁয়া কিংবা নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় অপরূপ আনন্দ পায়।

দু'একখানা রগরগে বাজে উপন্যাস–টুপন্যাসে আমি পড়েছি, এইরকম কোনো কচি ছেলে আর বয়স্কা নারী পাশাপাশি শুলে হঠাৎ এক সময় নিষিদ্ধ সম্পর্ক হয়ে যায়। যত সব বানানো কথা! তা কখনো হতে পারে? আমি তো কল্পনাই করতে পারি না। টুনি পিসী ছিলেন আমার কাছে টুনি পিসীই, তাঁকে কখনো কোনো নারী বা মহিলা হিসেবে আমার মনে হয় নি। আর একটু বড় হয়ে আমি দাদার সঙ্গে একঘরে শুতাম। কিন্তু ঐ সময়টায়— প্রায়ই দাদার সঙ্গে আমার ঝগড়া–মারামারি হতো, মা তাই আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। মার অসুখের সময় পাছে আমার ছোঁয়াচ লাগে, তাই আমাকে টুনি পিসীর সঙ্গে শুতে বলেছিলেন। তাছাড়া, আমাদের বাড়িতে প্রায়ই অতিথি আসতো— কলকাতা বা পাটনা থেকে আমাদের আত্মীয়স্বজন বা চেনাশুনো কেউ এলাহাবাদে বেড়াতে বা কোনো কাজে এলে উঠতেন আমাদের বাড়িতে। তখন ঘরের খুব টানাটানি পড়তো। মোটকথা, টুনি পিসীর ঘরে আমার শোয়ার ব্যাপারে কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সেই সময়টা ছিল আমার অবিমিশ্র নির্মল আনন্দের দিন।

এখন আমি সেইসব দিনের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেও দেখেছি, টুনি পিসীর মধ্যে কোনো বিকৃত লালসা ছিল না, কোনোদিনই তিনি আমাকে অস্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে ধরেন নি, কোনোদিন আমাকে নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশের ইঙ্গিত জানান নি, স্নেহের হাতেই তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বাড়ির আর সবাই সামান্য ছুতোতেই টুনি পিসীর ওপর খিটখিট করতেন, কিন্তু টুনি পিসীর ওপর আমার ছিল একটা মায়া–মেশানো ভালবাসা।

একটু বড় হবার পর আমি আর দাদা আলাদা একটা ঘরে শুতাম। একদিন ভোররাত্রে কিসের একটা চাপা গণ্ডগোলে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অনেক লোক যেন একসঙ্গে নিচু গলায় কথাবার্তা বলছে। তাকিয়ে দেখি, আমার পাশে দাদা নেই।

আমার অসম্ভব ভয় করছিল, আমার মৃত্যুর কথা মনে পড়েছিল। কেননা, অস্পষ্টভাবে মনে আছে, আরও অনেক ছেলেবেলায় আমার এক জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন ঐ রকম এক ভোররাত্রে। আমার সেই জ্যাঠামশাই (বাবার আপন ভাই নন, মামাতো ভাই) ছিলেন পাগলাটে বাউণ্ডুলে ধরনের লোক, কাজকর্ম কিছু করতেন না, নানান তীর্থে শুধু ঘুরে বেড়াতেন। এলাহাবাদে আমাদের বাড়িতেও আসতেন মাঝে–মাঝে, একমাস–দেড় মাস থাকতেন।

সেই রকমই একবার, ভোররাত্রে টুনি পিসী আমাকে ডেকে তুলে বলেছিলেন, এই খোকা, ওঠ, ওঠ, তোর কাছে কড়ি আছে? দে তো ক'টা কড়ি? তখনও ভালো করে ভোর হয় নি,

কাক ডাকে নি, চারদিকে ছমছমে নৈঃশব্দ, তার মধ্যে টুনি পিসী হঠাৎ আমার কাছে কড়ি চেয়েছিলেন কেন— ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন খুব কড়ি খেলতাম, আমার কাছে সত্যিই অনেক কড়ি ছিল। টুনি পিসী বলেছিলেন, ওঠ, তোর জ্যাঠামশাই স্বর্গে যাচ্ছেন, এখন শিয়রের কাছে কড়ি দিতে হয়! তড়াক করে উঠে এসে দেখেছিলাম, জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, তাঁকে খাটে চাপিয়ে উঠোনে রাখা হয়েছে।

সেদিনও ভোররাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে, বাইরে সবার ফিসফাস শুনে মনে হয়েছিল, কেউ নিশ্চয়ই মারা গেছে। হয়তো আমার বাবাই মরে গেছে। একটা ভয়ের শব্দ করে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। তখনও ভালো করে আলো ফোটে নি, উঠোনে টুনি পিসীকে শোয়ানো, তাঁকে ঘিরে বাড়ির সবাই। টুনি পিসীর কাপড় বিস্রস্ত, মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে, চোখ দুটো ওল্টানো। টুনি পিসী মরে গেছেন দেখে আমি একটা আর্তচিৎকার করে সেদিকে ছুটে গিয়েছিলাম। দাদা আমার হাত ধরে আটকে ছিলেন, নইলে আমি হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তাম সেই শায়িত শরীরের ওপর।

টুনি পিসী মরেন নি সেবার। তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন— কী যেন একটা বিষের গুঁড়ো খেয়েছিলেন মাঝরাত্রে, তারপর বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিজেই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, মরে গেলুম, মরে গেলুম, জ্বলে গেল, বাঁচাও, বাঁচাও! সেই ভোররাত্রেই ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। সব পরীক্ষা করার পর পারসি ডাক্তার যখন মুচকি হেসে আত্মহত্যার আসল কারণটা জানালেন— তখন অপমানে বাবার মুখখানা কালো হয়ে গেল। ডাক্তার চলে যাবার পর, শান্তস্বভাব বাবা চিৎকার করে উঠেছিলেন, হারামজাদী, বিষই যখন খেলি, তখন মরলি না কেন ? মর, মর, এখন মর! তোর ঐ মুখ যেন আমাকে আর দেখতে না হয়!

টুনি পিসীর গর্ভে তখন সাত মাসের সন্তান! এতদিন কেউ টের পায় নি ভেবে সবাই থ হয়ে গেল। বাবা আর একদিনও টুনি পিসীকে বাড়িতে রাখলেন না। তার পরদিনই টুনি পিসীকে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। আজও মনে আছে টুনি পিসীর সেই চলে যাওয়ার দৃশ্য। সেই বিষ খাওয়ার রাত্রের তিন দিন পর, তখনও তার শরীর ভালো করে সুস্থ হয় নি— তাঁকে চিরকালের মতন এ বাড়ি থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো। এতদিন ধরে টুনি পিসী যে আমাদের ভালবেসেছেন, সেবা–যত্ন করেছেন, তা ঐ একটা ঘটনায় মিথ্যে হয়ে গেল ! এই তিন দিন টুনি পিসী একটাও কথা বলেন নি, যেন সম্পূর্ণ বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। সেই তিন দিন খাবার–দাবারও স্পর্শ করেন নি। কিছু না খেয়ে বাঙালি বিধবারা তিন দিন কেন, তিন শ' দিনও বেঁচে থাকতে পারে।

সেই টিনের তোরঙ্গ আর একটা কাপড়ের পুঁটুলি সঙ্গে নিয়ে ভোররাত্রে টুনি পিসীকে টাঙ্গায় তুলে দেওয়া হলো। সেবার আমায় কেউ জাগিয়ে দেয় নি— কিন্তু নিজে থেকেই আমার ঘুম ভেঙেছিল— জানলার দিকে মুখ চেপে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, চোখের জলে আমার সারা মুখ ভাসছিল। টুনি পিসী আর একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না, আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হলো না। কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোন নি যে টুনি পিসী, তাঁকে একা–একা কোন নিরুদ্দেশের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হলো !

আমাদের বাড়িতে টুনি পিসীর নামটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আর কোনোদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন নি। কিন্তু ক্রমে–ক্রমে সবই জানতে পারলাম। ঐ আত্মহত্যার চেষ্টার ফলে টুনি পিসীর গর্ভের সন্তানটি বাঁচে নি। কাশীর বাঙালিটোলায় টুনি পিসী ঘর ভাড়া করে থাকেন— বাবা প্রতি মাসে তাঁকে পনেরো টাকা করে পাঠান। কার সঙ্গে টুনি পিসীর ঐ ব্যাপারটা হয়েছিল— তা কোনোদিন জানা যায় নি, টুনি পিসী সে–কথা বলেন নি কিছুতেই। বাবা তাঁকে পুলিশের চেয়েও বেশি নৃশংসভাবে জেরা করেছিলেন, কিন্তু আর

একবারও মুখ খোলেন নি টুনি পিসী। বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, তুই মরলি না কেন? অ্যাঁ? এর চেয়ে তোর মরা মুখ দেখলেও আমি খুশি হতুম! টুনি পিসীর জন্যে বহুদিন আমার মন কেমন করেছে, বহু রাত্রি টুনি পিসীর কথা ভেবে আমার চোখের পাতা টনটন করেছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমরা বন্ধুরা মিলে বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে এসেছিলাম। বিন্ধ্যাচলে রতনের মামার বাড়ি ছিল। বাবা আমাকে যেতে দিতে রাজি হন নি প্রথমে, কিন্তু রতন এসে আমার মায়ের কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করায় মা শেষ পর্যন্ত বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন। মিহিরও আমাদের সঙ্গে গেল।

পরীক্ষায় পাশ করা সম্পর্কে আমার কোনোরকম ভয়ই ছিল না। বাবা আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন, ফার্স্ট ডিভিশান না পেলে আমাকে আর পড়াবেন না, আমাকে রেলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। সেই বয়েসেই চাকরিতে ঢোকার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। আমার ভয় ছিল, স্কলারশিপ পাবো কিনা! স্কলারশিপ পেলে, আমার ইচ্ছে, কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বো। এলাহাবাদ জায়গাটা আমার খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু বাবার আওতায় থাকতে আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না। মাঝে-মাঝেই বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো অনেক সুখী, এখন দেখছি, অনেক বাবা-মাই তাদের ছেলেমেয়েদের ভয় পায়। অতটা না হলেও, আমি বিশ্বাস করি, বাবা-মায়েদের উচিত বাড়ির যে-কোনো ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মতামত জিজ্ঞেস করা এবং মন দিয়ে শুনে তা বিচার করে দেখা। আমার বাবা ছিলেন একেবারে অটোক্র্যাট। হিটলারের চেয়েও বড় স্বৈরাচারী। আমাদের তিনি মানুষ বলেই গণ্য করতেন না।

যাই হোক, পরীক্ষার পরের ঐ ছুটিটায় অনেকখানি স্বাধীনতা পেয়েছিলুম, তখন পড়াশুনোর অজুহাত ছিল না, প্রায়ই বাবার চোখ এড়িয়ে বাড়ির বাইরে থাকতাম। মিহির সেই সময় আমাদের বখানোর জন্য যত রকম চেষ্টা করা যায় সবই করেছিল। মিহিরেরও পরীক্ষায় পাশ করা সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, অর্থাৎ পাশ করা না-করায় কিছু আসে-যায় না। আশ্চর্য, তবু মিহির সেবার পাশ করেছিল।

বিন্ধ্যাচলে গিয়েই কাশী যাবার জন্যে মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। আগেও দু'তিনবার কাশীতে বেড়াতে গেছি, কিন্তু সেবার কাশী যাবার জন্যে ভিতর থেকে যে প্রেরণা বোধ করছিলুম— তার কারণ তখন বুঝতে পারি নি। বিকেলের দিকে কাশী চলে এলাম, কিন্তু একা আসতে পারি নি, মিহির আর পূর্ণও সঙ্গে এলো। সেবার ট্রেনের ঐটুকু পথে মিহির আমাদের কাছে যত অসভ্য কথা বলেছিল, তার ফলে মেয়েদের সম্পর্কে আর কিছুই আমাদের জানতে বাকি রইলো না। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে, মিহির আমাদের চেয়ে দু'এক বছরের বড় হলেও অধিকাংশ সময় তো সে আমাদের সঙ্গেই মেশে—তবুও এতসব রহস্যময় ব্যাপার সে একা একা জেনে যায় কী করে? কীরকমভাবে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে মেয়েরা একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যায়—মিহির তাই আমাদের শেখাতে লাগলো।

আমি বরাবরই মিহিরকে ঘৃণা করতাম, কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গ এড়াতে পারি নি। সেই বয়েসে মন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, অত্যন্ত রোমান্টিক ধরনের ছেলে ছিলাম আমি—সবে অল্প-অল্প নবীন তৃণের মতন গোঁপ-দাড়ি উঠছে, গলার আওয়াজ ভাঙতে শুরু করেছে—হাফ-প্যান্ট পরলে নিজের পা দু'খানা অতিশয় লম্বা আর বিসদৃশ মনে হয়— তখন মেয়েদের সামনে দাঁড়ালেই আমি অহেতুক লজ্জা পাই, অনাত্মীয় কোনো মেয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা কিংবা দৈবাৎ একটু ছোঁয়া লাগলে রোমাঞ্চে অভিভূত হয়ে পড়ি—আর সেই সময়, মিহির উলঙ্গ মেয়ের রূপ বর্ণনা আর নানান সব ক্রিয়াকলাপের এমন বীভৎস বিবরণ দিচ্ছিলো যে আমার প্রায় দম আটকে

আসছিল। আমি সেদিন ভেবেছিলুম, মিহির জীবনে সুখ পাবে না। আমি ভুল ভেবেছিলুম। পৃথিবীতে নানান মানুষের কাছে সুখের চেহারা নানান রকম।

মিহির সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই মেলে নি। মিহিরের মধ্যে অসৎ প্রবৃত্তি এমন প্রবল ছিল যে, আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, মিহির কোনোদিনই এই সমাজে কোনো সুস্থ নাগরিক হতে পারবে না। কিন্তু ও তো এখন বেশ ঠিকঠাক মানিয়ে আছে। পড়াশুনো করে নি কোনোদিন, মাথাও ছিল না একেবারে, তবুও তো কয়েকটা পাশ করেছে। মাস্টার মশাইরা চিরকাল বলেন, টুকে কেউ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না। তাহলে মিহির সেকেন্ড ডিভিশানে ম্যাট্রিক পাশ করলো কী করে? মেয়েদের সম্পর্কে মিহিরের যে-রকম বীভৎস রক্ত-মাংস মাখা ধারণা, তাতে একথা মনে না হয়ে পারে না যে, মিহির জীবনে আর যাই পাক, নারীর প্রেম কী জিনিস তার মর্ম বুঝবে না! তাও তো ভুল প্রমাণিত হয়েছে! কবি-টবিরা মেয়েদের সম্পর্কে খুব একটা রোমান্টিক ছবি ফুটিয়ে রেখেছে, মেয়েদের মন খুব নরম আর সূক্ষ্ম, তারা শুধু ফুলের গন্ধ আর পাখির ডাক ভালবাসে, তারা বিস্কুটও চিবিয়ে খেতে জানে না! যত সব বাজে! মেয়েরা এখনো অসভ্য বর্বর পুরুষদেরই পছন্দ করে! কোনো ছেলের এক্সারসাইজ করা মাস্‌ল ফোলানো চেহারা দেখলেই মেয়েরা বলে, কী সুন্দর চেহারা!

কাশীতে পৌঁছেই মিহির আর একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব দিয়েছিল। মিহিরের পকেটে মানিব্যাগে অনেক টাকা ছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, অল্প বয়েস থেকেই ও টাকা খরচ করতে শিখেছিল। মিহির ফিসফিস করে আমাদের বললো, চল্, তোদের আজ এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবো—হোল্ লাইফের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকবে!

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোথায়? কোথায়?

মিহির রহস্যময়ভাবে বলেছিল, চল্ না! গেলেই বুঝবি!

কিছুদূর গিয়ে মিহির আর চেপে রাখতে পারে নি, বলে ফেলেছিল। মিহির চোখ কুঁচকে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলেছিল, কাশীতে অনেক বাঈজী বাড়ি আছে, তোদের সেখানে নিয়ে যাবো। আমার চেনা বাড়ি আছে— মেয়েটা যা নাচে না, মার-মার কাট-কাট—

আমি আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে মিহিরের দিকে তাকিয়েছিলাম। বাঈজী বাড়ি? মিহিরের বয়েস তখন বড়জোর সতেরো, থাকে এলাহাবাদে—অথচ কাশীর বাঈজী বাড়ি তার চেনা আছে? বাঈজী বাড়ি ব্যাপারটা কী— তখন ঠিক স্পষ্ট ধারণা ছিল না। দু'একটা রগরগে উপন্যাসে বাঈজী বাড়ির যে বর্ণনা পড়েছিলাম সেই বয়েসে, তাতে মনে হয়েছিল, ওসব নরকের মতনই ভয়ঙ্কর জায়গা।

মাতালরা ওখানে ঘরের মধ্যে গড়াগড়ি যায়, চোখে সুরমা লাগানো বাঈজী মেয়েরা অসভ্যভাবে নাচে, আর গুণ্ডারা দরজার কাছে বসে ছুরি শানায়। 'রহস্য লহরী' সিরিজের একটা বইতে পড়েছিলুম, একটি পারসি যুবককে তার একটি দুষ্ট বন্ধু কু-প্ররোচনা দিয়ে বউয়ের গয়না চুরি করিয়ে বাঈজী বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে বাঈজীটির সঙ্গে কী গণ্ডগোল হবার পর বাঈজীটি হাতের ধারালো কঙ্কণ দিয়ে আঘাত করে পারসি যুবকটির চোখ অন্ধ করে দেয়। সেইসব মনে পড়ায় আমি শিউরে উঠেছিলুম। আমি বুঝতেই পারছিলুম না, সেইরকম ভয়ঙ্কর জায়গায় আমরা নিজে থেকে যাবো কেন! মিহিরের কি মাথা খারাপ!

একটু বেপরোয়া ধরনের ছেলেদের হয়তো ঐসব নিষিদ্ধ জায়গায় কেউ নিয়ে যেতে চাইলে—অন্তত একবার গিয়ে দেখে আসতে চাইবে। কিন্তু আমি ছিলুম শান্ত ধরনের। খারাপ আর ভালো—এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে আমার স্পষ্ট নিজস্ব ধারণা ছিল, আমি জানতুম, খারাপ লোকেরাই বাঈজী বাড়ি যায়—আমার একটুও কৌতূহল হয় নি, আমি ঘৃণার সঙ্গে মিহিরের

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। মিহির আমাকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি এক ঝটকায় ওর হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছি ভিড়ের মধ্যে।

এখন আমি মাঝে-মাঝে ভাবি, মিহিরের গায়ের জোর অনেক বেশি ছিল, তবু মাঝে-মাঝেই আমি ওর হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছি কী করে ? হয়তো, মানুষ যতদিন খাঁটি সৎ থাকে, ততদিন তার মনের জোর এত বেশি থাকে যে, কোনো গায়ের জোরই তাকে আটকাতে পারে না।

ছুটতে-ছুটতেই আমার মনে পড়েছিল, আমি কোথায় যাবো। আসলে আমার অবচেতনে টুনি পিসীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা বরাবরই ছিল। বাবার মনি-অর্ডার ফর্মে টুনি পিসীর ঠিকানা আমি অনেক আগেই দেখেছিলাম। কাশী আমার চেনা শহর, ঠিকানা খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হয় নি।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই এক সরু গলির মধ্যে দোতলার স্যাঁতসেঁতে একখানা ঘর ভাড়া করে টুনি পিসী থাকেন। আমি যখন গিয়ে পৌঁছুলাম, টুনি পিসী তখন ছিলেন না। পাশের ঘরের এক বৃদ্ধা মহিলা আমার পরিচয় শুনে আমাকে বসতে দিলেন। অনেক আদর করে আমাকে নারকোল নাড়ু আর ঘোলের সরবত খাইয়ে অনেক গল্প করতে লাগলেন। একবার তিনি বলে উঠলেন, ঐ তো, ঐ বুঝি টুনি এলো।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। তিন বছর আগেও টুনি পিসীকে দেখেছি, ভরাট স্বাস্থ্য আর হাসি-খুশি মুখ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। হাত দু'খানি ছিল সুডৌল, চোখ দু'খানি ঝকঝকে। এখন টুনি পিসীকে চেনাই যায় না। রোগা, নিষ্প্রভ চোখ, মুখখানা বিষম ক্লান্ত। টুনি পিসী আগে কখনো ময়লা কাপড় পরতেন না— তাঁর সাদা থান সবসময় থাকতো ধপধপে— আজ তিনি একখানা মলিন কাপড় পরে আছেন।

টুনি পিসী আমাকে চিনতে পারলেন সঙ্গে-সঙ্গেই, মুহূর্তে তাঁর মুখখানা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আবেগের সঙ্গে তিনি বললেন, তুই এসেছিস ? ও মাগো মা, তুই এই পিসীকে মনে রেখেছিস ? তুই—

হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল। প্রথমটায় আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না। ইচ্ছে হলো, ছেলেবেলার মতন টুনি পিসীর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদি। তা করি নি, কিন্তু উঠে গিয়ে টুনি পিসীকে প্রণাম করার জন্য ঝুঁকতেই টপটপ করে জল পড়তে লাগলো চোখ দিয়ে। আঃ, কী সরল আর পবিত্র ছিল কৈশোরের সেই কান্না, দুঃখের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না তখন, ছিল না কোনো স্বার্থচিন্তা। যেন, টুনি পিসীর ওপর যত অন্যায় করা হয়েছে, সব আমি কান্না দিয়ে ধুয়ে দেবো। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, টুনি পিসী, একি চেহারা হয়েছে তোমার ?

টুনি পিসী আমার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। আমাকে নিয়ে তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। আঁচল দিয়ে আমার মুখের ঘাম মুছিয়ে দিলেন, হাত-পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। টুনি পিসীর বয়েস তখনও আটত্রিশের বেশি না—কিন্তু ভাবভঙ্গি একেবারে বুড়িদের মতন হয়ে গেছে—এই তিন বছরে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমাকে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বাবার কথা, মা, দাদার কথা, আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীর খবর, পরীক্ষার পর আমি এখন কোথায় গিয়ে পড়বো—এই সব। আমার মা টুনি পিসীকে কোনোদিনই তেমন পছন্দ করতেন না—কিন্তু টুনি পিসী মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করলেন, কারুর প্রতি কোনো রাগ বা অভিযোগ তাঁর কথায় প্রকাশ পায় নি। আমি জিজ্ঞেস করলুম, টুনি পিসী, তুমি কেমন আছ তাই বল।

টুনি পিসী ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, আমি ভালোই আছি। বিশ্বনাথের চরণে নিজেকে

সঁপে দিয়েছি রে। বিশ্বনাথ কারুকে পায়ে ঠেলেন না।

কিন্তু টুনি পিসী ভালো নেই। খাওয়া-পরার কষ্ট যে খুব হচ্ছিলো তা নয়। তখনকার দিনে গোটা পনেরো টাকায় কাশীতে একজন বিধবার খরচ মোটামুটি কুলিয়ে যেত। কিন্তু টুনি পিসীর কষ্টটা অন্যরকম। টুনি পিসী ছিলেন পুরোপুরি সংসারী ধরনের মানুষ। অকালে বিধবা হয়ে নিজস্ব কোনো সংসার পান নি, আমাদের সংসারটাই আঁকড়ে ধরেছিলেন। আমাদের সংসারে তিনি আশ্রিতা হিসেবে থাকলেও, তিনিই ছিলেন আমাদের সংসারের কর্ত্রী। সমস্ত কাজ তিনি একা হাতে করতেন। কে কী খেতে ভালবাসে, কার জন্য কখন জলখাবার বানাতে হবে—মাসকাবারী জিনিসপত্র কী আসবে দোকান থেকে—এই সবই ছিল তাঁর হাতে। তিনি এতে আনন্দ পেতেন।

এখন কাশীতে এই স্যাঁতসেঁতে ঘরে, স্পষ্টই বোঝা যায়, বিশ্বনাথের চরণে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে পারেন নি, ধর্মে তাঁর মন বসে নি। ঠাকুর-দেবতারা সারাজীবন তাঁকে কী দিয়েছেন, শুধু দুঃখই লিখে দিয়েছেন ভাগ্যে, সেই ঠাকুর-দেবতাদের ভালবাসবেন তিনি কী হিসেবে! একলা জীবন তাঁর পক্ষে অসহ্য।

এসব বলতে-বলতে টুনি পিসী হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। কিছুতেই সে-কান্না থামে না। হেঁচকি তুলে কাঁদতে-কাঁদতেই তিনি বললেন, সব আমারই দোষ। আমার কপাল! খোকা, যখন তুই বড় হবি, এই পিসীটাকে ক্ষমা করবি তো? আমার কথা মনে রাখবি? রাখবি না, না? আমি যে নিজেই নিজের—

কান্নায় কান্না টানে। আমার চোখেও জল এসে গেল। বুকের ভেতরটা কিন্তু রাগে জ্বলতে লাগলো। বড় হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় নি, সেই তখনই আমি টুনি পিসীকে ক্ষমা করেছিলুম—কিন্তু সেই অজ্ঞাত লোকটা— যে টুনি পিসীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর শরীরের সর্বনাশ করেছে, তারপর সর্বক্ষণ নিজেকে আড়ালে রেখেছে—একবারও টুনি পিসীর দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে নি—তার ওপর অসম্ভব ক্রোধে আমার মাথা দপদপ করতে লাগলো। আমি বললুম, টুনি পিসী, তুমি তার নাম বলো, বলো, কে তোমার এই সর্বনাশ করেছে, আমি তাকে এমন শিক্ষা দেবো—

টুনি পিসী কাঁদতে-কাঁদতেই বললেন, কেউ না, কেউ না রে, সে জেনে তোর দরকার নেই, সব আমারই দোষ!

—না, তবু তুমি তার নাম বলো! আজ হোক—কাল হোক—

—না, না, না।

—টুনি পিসী, বলো, বলো, শুধু আমাকে বলো—

—না, না, না।

টুনি পিসী কিছুতেই নাম বলেন নি। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, সেই লোকটা যে-ই হোক, সে নিশ্চয়ই জোর করে কিংবা চতুরতায় টুনি পিসীকে ঠকিয়েছে। টুনি পিসী নিজে থেকে ওরকম একটা ব্যাপার করতেই পারেন না— সেরকম মহিলাই ছিলেন না তিনি। মেয়েদের ঠকানো তো খুব শক্ত নয়, কেউ হয়তো নানারকম কলাকৌশল করে...। তাছাড়া টুনি পিসী যদি ওরকম লোভীই হবেন, তাহলে আমাদের বাড়ি থেকে চলে এসে কাশীতে থাকার সময় তো আরও দুশ্চরিত্রা হয়ে যেতে পারতেন! তখন না বুঝি, এখন তো বুঝতে পারি—কোনো সোমথ নারীর পক্ষে নষ্ট হয়ে যাবার কত রকম প্রলোভন আছে কাশীতে!

কে সেই পাষণ্ড, তা নিয়ে অনেক ভেবেছি। বাইরের কোনো লোক হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন কিংবা তাদের চেনাশুনো লোক, এলাহাবাদে এলে আমাদের বাড়িতে উঠতেন। আমরা অনেক সময় বিরক্ত হতুম, ভদ্রতা করে কিছু বলতে পারতুম না।

তাদেরই মধ্যে কেউ একজন! বিচিত্র কিছু না। যদি তার নাম জানতুম, আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে নেবার জন্যও তৈরি ছিলুম। কিন্তু জানতে পারি নি কখনো। টুনি পিসী কিছুতেই বললেন না সেদিন। আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসে কিছুক্ষণ কেঁদেছিলাম।

আজ আমি জানি, আমিই সেই লোক। আমিই সেই লোভী পাষণ্ড। এই তো কয়েকদিন আগে টুনি পিসীর কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল। টুনি পিসী মারা গেছেন বছর কয়েক আগে; গঙ্গার ঘাটে সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়েন। মরার দু'এক বছর আগে ওঁর একটু-একটু মাথার গোলমাল হয়েছিল, ভালো করে লোক চিনতে পারতেন না, শুচিবাই হয়েছিল সাংঘাতিক। টুনি পিসীর মৃত্যু-সংবাদে খুব একটা দুঃখিতও হই নি। তারপর ভুলেই তো গিয়েছিলাম টুনি পিসীকে।

ক'দিন আগে হঠাৎ তার কথা মনে পড়তে আমি নিজেই একটু অবাক বোধ করেছিলাম। কাশীর সেই ঘরে টুনি পিসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনটার কথা মনে হচ্ছিলো—টুনি পিসীর যে সর্বনাশ করেছিল, আমি তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম—হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতন আমার মাথায় খেলে গেল, সে আর আমি তো একই লোক। তফাত কী? আমিও তো... না, টুনি পিসীর ক্ষেত্রে ঠিক আমি ছিলাম না, আমার তখন সেই বয়েস হয় নি, কিন্তু ঠিক আমারই মতন একজন লোক ঐ কাজ করেছিল। তার ওপর রাগ করার কোনো অধিকার আমার নেই। আমিও আজ ঠিক তারই মতন। এই জন্যই টুনি পিসীর কথা ক'দিন ধরে এমন ভাবে মনে পড়ছিল—সেই আমি, টুনি পিসীর ঘরে বসে তাঁর দুঃখে কেঁদেছিলাম, আর আজ আমি ঠিক তাঁরই মতন একটি বিধবা মেয়েকে...। সারাজীবনে আমার যেটুকু সৎ উদ্দেশ্য বা বাসনা ছিল, সব বিসর্জন দিয়ে আমি বিবেকহীন শয়তানের মতন জয়ন্তীকে...। সেই অজ্ঞাত লোকটি আর আমি একই—জয়ন্তীর ঘরে যেদিন... জয়ন্তী যখন ভয় পেয়ে আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল...আমি ঠিক একটা পশুর মতন...

১২

৪ঠা মার্চ, ১৯৬৬

জব্বলপুরে নবনীতাকে প্রথম দেখার পর আমার মনে হয়েছিল, কী দুর্লভ এই মানুষের জীবন, কী সৌভাগ্য আমার যে, মানুষ হয়ে জন্মেছি। সুন্দর কথাটাও কী সুন্দর! যতদিন বাঁচবো, প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থক করার চেষ্টা করবো! কেন তা পারলাম না? কেন এই জীবনটা ছন্নছাড়া, অন্তঃসারহীন, বঞ্চিত হয়ে গেল!

জয়ন্তীর ঘর থেকে সেই সেদিন বেরিয়ে আসার পর মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীতে মানুষের জন্মটাই একটা অ্যাকসিডেন্ট, সূর্য-ভাঙা টুকরো এই গ্রহগুলোর মধ্যে শুধু পৃথিবীতেই যে মানুষের জন্ম হয়েছে, তা যখন অ্যাকসিডেন্ট, তখন আমার মানুষ হয়ে জন্মানোও তো তাই। এ জীবনের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই আশা করার নেই—কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকা যায়, তাই যথেষ্ট! জয়ন্তীও তো খারাপ মেয়ে নয়, আমারও কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, তবুও জোড়া লাগলো না। সারাজীবনে আর আমি কখনই সরল সাবলীল হতে পারবো না। এই পৃথিবীতে অন্য সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের ওপর প্রভুত্ব করে মানুষ, তাই বোধহয় মানুষের ওপর সব জন্তু-জানোয়ারের অভিশাপ লাগে। টুনটুনি পাখি কিংবা খরগোশের যে-রকম গ্লানিহীন ফুরফুরে জীবন, মানুষ কোনোদিনই তার সন্ধান পাবে না।

জয়ন্তীর কথা আমাকে বলতেই হবে, তবু দ্বিধা হচ্ছে বারবার। কলমের মুখে অন্য সব কথা

এসে যাচ্ছে। অন্য কারুর জীবনে এ–রকম ঘটনা শুনলে আমি হয়তো ঘৃণায় শিউরে উঠতুম। কিন্তু নিজেকে ঘৃণা করতে–করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। জয়ন্তীর জন্য এখনো আমার দুঃখ হয় না, কিন্তু টুনি পিসীর জন্য নতুন করে দুঃখ বোধ করছি ক'দিন ধরে। টুনি পিসীর তো মনের মধ্যে কোনো জটিলতা ছিল না ! তিনি তো অন্য কারুকে দুঃখ দিতে চান নি, শুধু নিজেই দুঃখ পেয়েছেন !

১৩

৫ই মার্চ, ১৯৬৬

জয়ন্তী ছিল নবনীতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা দু'জন প্রায় সবসময়ে একসঙ্গে থাকতো। নবনীতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেই আমি জয়ন্তীকে দেখতাম—সেই থেকে ভালো করে আলাপ–পরিচয় হয়েছিল।

একটা বয়েস পর্যন্ত ছেলেতে–ছেলেতে যেমন নিবিড় বন্ধুত্ব থাকে, তার চেয়েও বোধহয় বেশি নিবিড় বন্ধুত্ব থাকে মেয়েতে–মেয়েতে। কলকাতায় আমার ঠিক কোনো বন্ধু ছিল না—এলাহাবাদের স্কুলের বন্ধুদের ছেড়ে আসার পর কলকাতার ছেলেদের সঙ্গে আমি ঠিক নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি নি। কিন্তু নবনীতার সঙ্গে জয়ন্তীর বন্ধুত্ব ছিল দারুণ গাঢ়, দু'জনে দু'জনের সব কথা জানতো। নবনীতার সঙ্গে একা–একা দেখা করার সুযোগও আমি খুব কম পেয়েছি—সবসময়ই প্রায় জয়ন্তী উপস্থিত থাকতো। অনেকদিন নবনীতাদের বাড়ি থেকে ফেরবার সময় জয়ন্তী আমার সঙ্গে এসেছে, আমরা পাশাপাশি হেঁটেছি রাস্তা দিয়ে, দু'একদিন জয়ন্তীকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়েছি।

কিন্তু তখন নবনীতার ওপর আমার অন্ধ আকর্ষণ ছিল, জয়ন্তীর দিকে মনোযোগ দেবার সময় পাই নি। তুলনামূলকভাবে খুঁটিয়ে বিচার করলে হয়তো নবনীতার চেয়ে জয়ন্তীকেই বেশি সুন্দরী বলা যেত—কিন্তু তখন আমার প্রথম যৌবন, তেইশ–চব্বিশ বছর বয়েস, যুক্তিহীন উদ্দামভাবে আমি নবনীতাকে ভালবাসতাম—এক–একসময় আমার বলতে লোভ হয় যে, নবনীতাকে আমি যে–রকম ভালবেসেছি, পৃথিবীর আর কোনো পুরুষ কোনো নারীকে অত ভালবাসে নি ! কিন্তু জানি, ওটা ছেলেমানুষি, সবাই ওরকম ভাবে। তবে, কৈশোরে যে বালিকাকে দেখে আমি দারুণভাবে বিচলিত হয়েছিলাম, যৌবনে তাকেই ফিরে পেয়ে আমি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বলা যায়, আমার মনে হতো এই মেয়েটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী ! তাছাড়া, তখন তো আর মেপে–মেপে যাচাই করে দেখার বয়েস নয়—আমি রূপ কিংবা নারীর কথা ভাবি নি, শুধু ভাবতাম নবনীতা নামের ঐ বিশেষ একটি মেয়েকে—তার সম্পূর্ণ সত্তার প্রতি ছিল আমার আকুল আকুতি।

বলাই বাহুল্য, আমি আর সব প্রেমিকের মতনই মূর্খ ছিলাম। প্রথম যৌবনে আমি মনে করতাম, প্রেমই বুঝি জীবনের সবকিছু। প্রেম ছাড়া আর সবকিছুই অবান্তর। কী ভুল!

একদিন নবনীতার ছোট্ট সিল্কের রুমালটা নিয়ে আমি নাকে গন্ধ শুঁকছিলাম। নবনীতা একটু আগে সেই রুমালে তার ঘামে ভেজা মুখখানি মুছেছিল, আমি তাতে নবনীতার সমগ্র অস্তিত্বের সুগন্ধ পাচ্ছিলাম। আমি বলেছিলাম, নবনী, এই রুমালটা আমাকে দাও, এটা আমার কাছে রেখে দেবো।

নবনীতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন, লেডিজ রুমাল নিয়ে কী করবে ? তোমার বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে, কী ভাববে ?

আমি তখন অন্ধ প্রেমিক, সেই ধরনের বোজা-বোজা গলায় বলেছিলাম, না, কেউ দেখবে না, আমি লুকিয়ে রাখবো! মাঝে-মাঝে গন্ধ শুঁকলে মনে হবে, তোমাকে আমি কাছে পেয়েছি!

নবনীতা হাসতে-হাসতে বলেছিল, নাও না! তুমি তো জানো, আমার সবকিছুই তোমার! সারা শরীরে আমার শিহরণ খেলে গিয়েছিল, সেই মুহূর্তে আমি ভেবেছিলাম, নবনীতাকে আমি পেয়ে গেছি। কী ভুল!

মানুষের কথা কিংবা ইচ্ছারও তেমন দাম নেই। জীবন অনবরত বদলায় তার নিজস্ব নিয়মে। নবনীতাও বদলে গেছে, আমিও বদলে গেছি। নবনীতাকে আমি পাই নি, মিহির ওকে বিয়ে করেছে।

এটাকে কী বলবো? নিয়তি? যে মিহিরকে আমি এলাহাবাদে ফেলে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম যার সঙ্গে আর জীবনে দেখা হবে না—বাবার মৃত্যুর পর আমাদের এলাহাবাদের পাটই চুকে গেছে—সেই মিহির ঠিক আবার আমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে কলকাতায় আমারই প্রেমিকার সামনে এসে দাঁড়ালো!

মিহির যখন প্রথম-প্রথম নবনীতাদের বাড়িতে আসা শুরু করলো, তখন ও জয়ন্তীর সঙ্গেই বেশি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতো। আমি মিহিরকে জানি— মেয়েদের জয় করবার তার নিজস্ব কায়দার কথা সে-ই আমাকে বলেছিল। সেই কায়দার প্রথম ধাপ ঠাট্টা-ইয়ার্কি। প্রথম-প্রথম মেয়েদের নাকি প্রশংসা করতে নেই, তখন ওদের শুধু কথায়-কথায় রাগিয়ে দিতে হয়। এরকম রাগিয়ে দিলেই নাকি মেয়েদের আকর্ষণ বাড়ে, তারা তখন প্রতি-আক্রমণের জন্য তৈরি হয়—সেই সময় একদিন সুযোগ বুঝে বলে ফেলতে হয়, রাগলে আপনাকে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখায়! তাই সবসময় আপনাকে রাগাতে লোভ হয়! তাতেই মেয়েরা একেবারে গলে জল!

কোথা থেকে মিহির এসব যে শেখে তা কে জানে! মিহির বাঈজী বাড়িরও ঠিকানা জানে, আবার নবনীতা-জয়ন্তীদের মতন সূক্ষ্মরুচির বুদ্ধিমতী মেয়েদের সঙ্গে কেমন কায়দা করে কথা বলতে হয়, তাও জানে! হাওয়া থেকেই কি এসব জ্ঞান এসে যায় কারুর-কারুর কাছে? আড়ালেও একদিন মিহির আমাকে জয়ন্তী সম্পর্কে ওর পরিকল্পনা খুলে বলেছিল, কী করে জয়ন্তীকে ও ম্যানেজ করে ওর এক ব্যাচেলার বন্ধুর ঘরে নিয়ে যাবে—এইসব। কিন্তু ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনো সময় ছিল না আমার তখন। তাছাড়া, আমি জানতাম, জয়ন্তী একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে, তাকেই বিয়ে করবে। জয়ন্তীর যথেষ্ট আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, মিহির ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর মিহির যখন—

১৪

১৬ই মার্চ, ১৯৬৬

শরীরটা ক'দিন ধরে আবার খারাপ যাচ্ছে। ক্যানসার হয় নি, এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার পরই শরীরটা যেন হঠাৎ বেশি গড়বড় শুরু করেছে। অথচ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা উচিত ছিল আমার, এখন কিছুদিন হালকা ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়ানো উচিত ছিল। রতন এতদিন পর বিদেশ থেকে ফিরেছে, উচিত ছিল ওকে খাওয়ানো—ওর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারা—কিন্তু শরীর ভালো না থাকলে মেজাজও ঠিক থাকে না।

১৫

১৭ই মার্চ, ১৯৬৬

রতন আজ আবার এসেছিল। এতদিন পর বিদেশ থেকে ফিরে ও ভেবেছিল এই ছুটির দু'মাস চুটিয়ে আড্ডা মেরে যাবে। কিন্তু ওর ছুটি, আর সকলের তো ছুটি নয় ! রতন খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছে। বললো, বন্ধুবান্ধবরা সব নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, তাছাড়া সবারই চল্লিশের ওপর বয়েস—প্রায় সকলেই ঘোরতর সংসারী, এ বয়েসে আর কেউ আড্ডাবাজ থাকে না। সেই কলেজ জীবনে সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত শুধু আড্ডা দিয়েই সময় কাটাতে ভালো লাগতো—কলেজ জীবনের পরই রতন দেশ ছেড়েছে—এতদিন পর ফিরে এসে ও কী করে আর সেই জীবন খুঁজে পাবে !

বন্ধুদের মধ্যে আমিই শুধু এখনো বিয়ে করি নি—এবং কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছি—রতন তাই আমার কাছেই আসে। গল্পে-গল্পে ও আমাদের এলাহাবাদের সেই বাল্যকালটা জাগিয়ে তুলতে চায়। আমি গত আট বছরের মধ্যে আর এলাহাবাদ যাই নি—আমার আর কোনো আকর্ষণ নেই এলাহাবাদ সম্পর্কে।

রতনের সঙ্গে মিহিরের দেখা হয়েছে। মিহির এখন কলকাতায় আছে, আমি জানতুম, ইচ্ছে করেই রতনকে বলি নি। মিহিরের সঙ্গে যে পরে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে—একথাই আমি রতনকে জানতে দিতে চাই না। রতন দু'দিনের জন্যে এসেছে, আবার চলে যাবে—ওকে জানিয়ে কী লাভ যে, মিহির বারবার আমার মুখোমুখি এসে—প্রত্যেকবারই জিতে গেছে।

রতন নবনীতাকে আগে দেখে নি। রতন ওর খুব প্রশংসা করছিল। রতন বলছিল, মিহিরের বউয়ের সঙ্গে আলাপ হলো, ভারি চমৎকার মহিলা—যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। মিহিরটা একটা লাকি ডগ্—এমন ভালো বউ পেয়ে মিহির বেশ বদলে গেছে—বেশ সুখে আছে ওরা মনে হলো।

রতন আর বাইরের থেকে কী বুঝবে! কিন্তু নবনীতার কথা আমি মনে করতে চাই না। তবে টুনি পিসীর কথা বলার পর জয়ন্তীর কথা আমাকে বলতেই হবে। আজ বড় দুর্বল লাগছে, আজ থাক।

১৬

১৯ মার্চ, ১৯৬৬

এই দু'দিন কলকাতা শহরে কী কাণ্ডই হয়ে গেল! মারামারি, ট্রাম-বাস পোড়ানো, টিয়ার গ্যাস, গোলাগুলি। আমাদের বাড়িতেও টিয়ার গ্যাসের ঝাঁজ এসে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়েছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে একদল ছাত্র হুড়মুড় করে আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। ঝামেলার ভয়ে দাদা চাইছিলেন—ওদের বার করে দিতে। আমি বারণ করলাম। ছাত্রদের চটানো আজকাল মোটেই সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

তাছাড়া, কচি-কচি ছেলেগুলোর ঐ উত্তেজনা মাখানো মুখগুলো দেখতে আমার বেশ ভালো লাগছিল। ওরা ভালো করছে কী মন্দ করছে, সে চিন্তাই ওদের মাথায় আসে না। ওরা শুধু জানে পুলিশ এলে ইট ছুঁড়তে হবে, পুলিশ যদি গুলি চালায় তাহলে বাস পোড়াতে হবে—আপাতত পুলিশই ওদের চোখে পৃথিবীর সব অন্যায়ের প্রতীক। যৌবনের ধর্মই হচ্ছে প্রতিবাদ জানানো। ফরটি সিক্স-এর ছাত্র আন্দোলনে আমিও পুলিশের টিয়ার গ্যাস খেয়েছিলাম। অবশ্য সেটা ছিল

বৃটিশ আমল, তখন উত্তেজনা ছিল আরও বেশি।

আজ সকালে একজন লোকের হাত দিয়ে জয়ন্তী একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। বিশেষ দরকার, আমাকে একবার দেখা করতে বলেছে। বাড়িতে চিঠি পাঠাতে আমি জয়ন্তীকে বারণ করেছিলাম—তবু পাঠিয়েছে দেখে বিষম রেগে উঠেছিলাম। জয়ন্তী নিশ্চয়ই অফিসে অনেকবার আমার খোঁজ করেছে, ক'দিন ধরে অফিস যাচ্ছি না, ওর সঙ্গেও দেখা করি নি, তাই ব্যস্ত হয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বাড়িতে। চিঠিতে অবশ্য জয়ন্তী আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো খোঁজ নেয় নি। রাগের মাথায় লোকটার হাতেই উত্তর লিখে দিলাম—এখন কিছুদিন আমি খুব ব্যস্ত, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।

লোকটা চলে যাবার পরই আমার রাগটা কমে মন খারাপ হয়ে এলো। না, কাল একবার যাব। এছাড়া আর কীই-বা করার আছে ! দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকারও কোনো মানে হয় না। জীবনটা আবার একঘেয়ে লাগছে।

নবনীতা আমাকে আঘাত দেবার পর আমি সমস্ত স্ত্রী-জাতির ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। যে-কোনো মেয়ের দিকেই ঘৃণার চোখে তাকাতাম। আমার মনের অবস্থা তখন অনেকটা জ্যাক দি রিপারের মতন। মনে-মনে আমি ঠিকই করে ফেলেছিলাম, বাকি জীবনটা আমার কোনো নারী-সংসর্গ ছাড়াই চলে যাবে ! একটি মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবার পর টপ্ করে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করার আইডিয়াটা আমার অসহ্য লাগে ! মা-ও আমাকে বিয়ে করার জন্য আর বেশি পেড়াপীড়ি করেন নি, মা নিঃশব্দে বুঝে গিয়েছিলেন, আমি নিজের খেয়াল মতোই চলব, আমাকে দিয়ে জোর করে কিছু করানো যাবে না।

তাছাড়া বিয়ে করবই বা কাকে! তখনও পৃথিবীর সব মেয়েই আমার চোখে নবনীতা—সবাই আমার কাছে অসহ্য। সেই সময় অনেকদিন বাদে একদিন জয়ন্তীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল রাস্তায়, প্রায় মুখোমুখি, জয়ন্তী আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে কথা বলার জন্যে সবে ঠোঁট ফাঁক করেছে, আমি তার আগেই আমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি, ওকে না-দেখার ভান করে হনহন করে এগিয়ে গেছি। জয়ন্তী অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপর।

নবনীতার বাড়িতেই জয়ন্তীর সঙ্গে আলাপ, তাই নবনীতার ওপর সবটুকু রাগ জয়ন্তীর সম্পর্কেও পোষণ করেছি। সেই ব্যর্থতার রাগ ও অভিমান এমন তীব্র ছিল যে, ঐ অবস্থায় অনেক প্রেমিক আত্মহত্যা করে। আমি আত্মহত্যার কথা ভাবি নি, জীবন আমার বড় প্রিয়, বেঁচে থাকার জন্যই তো এত কাণ্ড—মরতে চাই না আমি, শেষ আয়ুবিন্দুটুকু অবধি বেঁচে থাকতে চাই। নিজে মরতে চাই নি, কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকে হত্যাও করি নি—সে-সাহসও আমার নেই। অন্য কারুকে হত্যা করি নি, শুধু নিজের হৃদয়েরই অনেক অনুভূতিকে হত্যা করেছি।

মিহির জয়ন্তীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল—সে যে কেন হঠাৎ নবনীতার দিকে ফিরলো, তা আজও জানি না। হয়তো নবনীতা সম্পর্কে আমার আন্তরিক ভালবাসার কথা টের পেয়েই ও নিতান্ত খেলাচ্ছলেই, আমাকে অপমানিত ও বঞ্চিত করার জন্যই নবনীতাকে জয় করার খেলায় মেতে উঠেছিল। অন্য সব খেলার মতন এ খেলাতেও জিতে গেল মিহির। কিন্তু এমন খেলাচ্ছলে কেউ কি বিয়ে করে ? মিহির জানত নবনীতাকে আমি ভালবাসি, নবনীতাও আমাকে ভালবাসে। মিহির শুধু ষড়যন্ত্র করে সেই ভালবাসা ভেঙেই খুশি হয় নি, নবনীতাকে বিয়েও করলো সব জেনেশুনে। এবং নির্লজ্জের মতন ওর বিয়ের পর বার-বার আমাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে চেয়েছে !

কিন্তু ও খেলায় আমি হেরে গেলেও আমার কোনো দোষ ছিল না—আমার চেয়ে মিহিরের সুযোগ ছিল বেশি, মিহির সমান-সমানের খেলা খেলে নি, মিহির জোচ্চুরি করেছিল। আমার

শুধু অধিকার ছিল নবনীতাদের বাইরের ঘরে গিয়ে বসবার, মিহির অনায়াসে সে-বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে যেতে পারতো। নবনীতার সঙ্গে হঠাৎ যে-কোনো সময় দেখা করার সুযোগও আমার ছিল না। বেশিরভাগ দিন বাইরে দেখা করেছি, হয় আমি দাঁড়িয়ে থাকতুম ওর কলেজের সামনে, কিংবা ও নিজেই চলে আসতো ইউনিভার্সিটিতে। ছুটির সময়, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা থাকতো, নবনীতা ঠিক ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসতো স্টেটসম্যান অফিসের পাশে বাস-স্টপে। মাত্র দু'একবার আমি নবনীতার সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেছি। হঠাৎ ওদের বাড়িতে গিয়ে নবনীতাকে ডাকার সাহস আমার ছিল না—ওদের বাড়িতেও সেটা পছন্দ করতো না।

অথচ কী কপাল মিহিরের, ও ঠিক নবনীতাদের বাড়ির সঙ্গে একটা সম্পর্ক বার করে ফেললো। সেখানেই প্রথম আমাকে টেক্কা দিয়ে মিহির এগিয়ে গেল অনেকখানি। মিহির ওদের আত্মীয় ছিল, মিহির ছিল নবনীতার বৌদির ভাই। আপন ভাই না, মাসতুতো ভাই, তবু ঐটুকু আত্মীয়তাই বাড়ির ভেতরে ঢোকার পক্ষে যথেষ্ট।

নবনীতার সঙ্গে এসপ্ল্যানেডের এক রেস্টুরেন্ট থেকে চা খেয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় মিহিরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—মিহিরকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় নি, মিহির কোনোদিনই ভদ্রতা-সভ্যতার ধার ধারে না, বিশেষত মেয়ে দেখলেই ওর চোখ চকচক করে। আমার কোনো কুসংস্কার নেই, কিন্তু নবনীতার পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন মিহিরকে প্রথম দেখেই আমি কীরকম যেন ভয় পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, একটা অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে শিগগিরই। নবনীতার বাহু সামান্য ছুঁয়ে আমি অন্যদিকে চলে যাবার চেষ্টা করেছিলাম—কিছুই সুবিধে হয় নি তাতে, মিহির দূর থেকেই আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, নবনীতাই বললো, তোমাকে কে যেন ডাকছে, ঐ যে ঐ লোকটি! বাধ্য হয়েই দাঁড়াতে হলো।

মিহির হাত তুলে— সোজা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে কাঁধে চাপড় মেরে বললো, কী রে ? তারপর, নবনীতার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবার সুযোগটুকুও না দিয়ে, নবনীতার দিকে তাকিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে বললো, আরেঃ! একে তো চিনি, কাজুদির বিয়ের সময় দেখেছিলাম। আপনার নাম কী যেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নবনীতা, ঠিক, মনে পড়েছে। আপনারা কোথায় থাকেন !

সেই থেকে শুরু। মিহির তার মাসতুতো দিদির শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাও জানতো না, নবনীতাকে দেখেই তার কাছ থেকে ওদের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিল, তারপর আঠার মতন লেগে রইলো।

নবনীতাকে আমি অসম্ভব বিশ্বাস করতাম। তাই মিহিরকে আমি এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত ভয় পাই নি। আমি সমান-সমান খেলা খেলতে চেয়েছি। আমি মিহিরের নামে কোনো নিন্দে, কোনো অপবাদ নবনীতাকে জানাই নি। নবনীতাই একদিন বলেছিল, তোমাদের দু'বন্ধুর মধ্যে কিন্তু কোনোই মিল নেই। দু'জনে সম্পূর্ণ দু'রকম, অথচ তোমাদের বন্ধুত্ব হলো কী করে ?

আমি নবনীতাকে মুখ ফুটে বলতে পারি নি, মিহির আমার মোটেই বন্ধু নয়, শত্রুর চেয়েও বেশি, আমার জীবনে ও একটা কুগ্রহ ! এসব কিছুই বলতে পারি নি, বরং স্বাভাবিক ভদ্রতাবশত বলেছিলাম, আমরা দু'জনে একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম তো ! সেই এলাহাবাদ থেকে চেনা—।

মিহির প্রথম দিন থেকেই নবনীতাকে তুমি বলে কথা বলতে লাগল, ও হয়ে গেল নবনীতার মিহিরদা ! 'বাড়ির ছেলের মতন' ও যখন-তখন এসে ওদের বাড়িতে খাওয়ার আবদার করতো, নিজেও নিয়ে আসতো অনেক খাবার-দাবার ! মিহির তো কারুর পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা করে না, নিজেই জাঁকিয়ে বসে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে। তাছাড়া, নবনীতার বাড়ির

লোকদের কাছ থেকেও প্রশ্রয় পেয়েছিল।

মিহিরের স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো আমার চেয়ে, লেখাপড়ায় ঠুকঠুক করে এগিয়েও শেষ পর্যন্ত বি.এ. পাশ করতে পারে নি—কিন্তু তাতে কী আসে যায়—পারিবারিক ব্যবসায় ঘোরতরভাবে নেমে পড়ে ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি করছে। শুধু এলাহাবাদ নয়, কলকাতা, পাটনা আর কানপুরেও ওরা দোকান খুলেছে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মিহির একটা বুইক গাড়ি কিনে ফেললো। সেই গাড়ি কেনার পরই তো নবনীতার বৌদি নিজের মাসতুতো ভাইয়ের গর্বে একেবারে গদগদ।

আমার চেয়ে বয়েসে মাত্র কয়েক বছরের বড় মিহির, কিন্তু তখনই ওকে দেখায় পুরোপুরি ভদ্রলোকের মতন—আর আমি এম.এ. পাশ করে বেকার বসে আছি—আমাকে নেহাতই একটা ছোকরা মনে হয়। মিহির বলিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠিত, অর্থবান পুরুষ, আর আমি একটা ফ্যা-ফ্যা করা ছোকরা হলেও আমি জানতাম, আমি নবনীতাকে ভালবাসি, নবনীতা আমাকে ভালবাসে—মিহিরকে হারিয়ে দেবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট বেশি। মিহির তো ভালবাসতে জানে না ! কী বোকাই ছিলাম, ভালবাসার ওপর কী ভুল বিশ্বাসই ছিল তখন !

অবশ্য, প্রথম-প্রথম মিহির কোনো উৎপাত করে নি। বরং আমাকে সাহায্য করারই আশ্বাস দিয়েছিল। একদিন নবনীতাদের বাড়ি থেকে মিহির আর আমি একসঙ্গে বেরিয়েছি, মিহির আমাকে বললো, নবনীতা মেয়েটা বেশ খাসা মাইরি—তুই শালা বেশ ভালো জিনিস বাগিয়েছিস! আমি বিস্মিতভাবে বলেছিলাম, তোর না আত্মীয় ! তুই এই রকমভাবে কথা বলছিস ?

মিহির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার বললো, তুই কি ওর সঙ্গে শুধু ফুর্তি লুটতে চাস, না বিয়ে করবি ঠিক করেছিস ?

আমি কড়াভাবে উত্তর দিলাম, তাতে তোর দরকার কি ? আমি তোর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না।

—আরে, রাগ করছিস কেন ? আমি তোকে হেল্‌প করবো !

—তোর কোনো হেল্‌প আমার দরকার নেই।

—দেখিস, দরকার আছে কিনা ! তুই জয়ন্তীর ব্যাপারে আমাকে হেল্‌প কর, আমিও নবনীতার ব্যাপারে ওর বাড়ির ভেতর থেকে—।

— তুই চুপ করবি কিনা ! আমি এই ট্রামটায় উঠবো !

মিহির তবুও হাসতে-হাসতে বলেছিল, ইস্, তেজ কী বাবুর ! যেন মনে হচ্ছে নবনীতাকে তুই পেয়েই গেছিস !

আমি দীপ্তভাবে উত্তর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, পেয়ে গেছিই তো ! মিহির আর কিছু না বলে নিঃশব্দে হাসলো। তারপর থেকেই ও রাস্তা বদলালো।

মিহির নবনীতাদের পরিবারে আমার নামে গরল ঢালতে শুরু করলো।
আমার নামে, আমাদের পরিবারের নামে এমন সব মিথ্যে কথা বলতে লাগলো—যা কল্পনাতীত ! কিন্তু মিহির মিথ্যে কথা বলার ব্যাপারে এমনই সুদক্ষ ছিল যে কল্পনাতীত কথাও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারতো। আমার বাবা গোঁড়া রক্ষণশীল লোক ছিলেন— কিন্তু মিহির ওদের জানালো—তিনি নাকি অতিরিক্ত মদ খেয়ে লিভার পচে মারা গেছেন। আমার মাতৃকুলে নাকি পাগলামির ধারা আছে— আমার মা যে সারাবছরই প্রায় বিছানায় শুয়ে থাকেন— তাঁর রোগটা নাকি আসলে মাথার রোগ। আমার নাকি ছেলেবেলায় একবার টি.বি. হয়েছিল, তখন মিহিরই কত সেবা করেছে আমার— এবং সে সময় আমি যে-রকম অনবরত চা-সিগারেট খাই, তাতে যে-কোনোদিনই নাকি আবার টি.বি. রিলাপ্স করতে পারে।

আসলে আমার তখন একটাই দোষ ছিল, আমি বেকার ছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার

পরের কয়েকটি বছর এবং আমাদের স্বাধীনতা পাবার পর প্রথম কয়েকটি বছর চাকরি পাওয়া কী কঠিন ছিল— তা নিশ্চয়ই অনেকের এখনো মনে আছে। তখন এম.এ. পাশের কোনোই দাম ছিল না। চারিদিকে শুধু ছাঁটাই আর ছাঁটাই— কৃত্রিমভাবে ফোলানো যুদ্ধকালীন চাকরির বাজার তখন চুপসোতে শুরু করেছে।

যে-সে জায়গায় যে-কোনো চাকরি পেলেও অবশ্য আমি তখন নিতুম না। যুদ্ধের সময় কালোবাজার করে যে-সব কম্পানি বড় হয়েছে, সে-সব কম্পানিতে চাকরি নিতে আমি কিছুতেই রাজি ছিলুম না। তখনও বেশ আদর্শবাদী ছিলাম তো। আর, কালোবাজার করেই মিহিরদের ব্যবসা ফেঁপে উঠেছিল।

নবনীতাদের বাড়ির সকলের মন আমার বিরুদ্ধে বিষাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল মিহির, কিন্তু নবনীতাকেও যে কী করে দূরে সরিয়ে নিল— সে-ই এক রহস্য। নবনীতার বাড়ির লোক যদি আমাকে পছন্দ না করে, সেজন্য তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। বিয়ের পাত্র হিসেবে যাচাই করলে মিহিরকে তো আমার তুলনায় বেশি পছন্দ হবেই! বাড়ির লোকতো আর ভালবাসা-টালবাসা নিয়ে মাথা ঘামায় না—তারা বোঝে টাকা-কড়ি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ! সেদিক থেকে, আমাদের বাড়ির অবস্থাও তেমন কিছু নয়, তার ওপর আমি ছিলাম বেকার। অবশ্য নবনীতার তক্ষুনি বিয়ে হওয়ারও তো কোনো দরকার ছিল না। দু'এক বছরের মধ্যে আমি চাকরি নিশ্চয়ই পেতাম। আর যাই হোক, আমি এম.এ. পরীক্ষায় ইকনমিক্‌সে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ তো পেয়েছিলাম!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বাড়ির লোক যাই বলুক, নবনীতা কিছুতেই রাজি হবে না। নবনীতার পক্ষে মিহিরকে পছন্দ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, নবনীতা যে আমাকে বলেছিল, আমার সবকিছুই তোমার! সে-কথা নবনীতা ভুলে যাবে ? নবনীতা যদি একবার বাড়ির বিরুদ্ধে রুখে উঠতো, আমি ওর জন্য সমস্ত কলকাতা লণ্ডভণ্ড করে দিতেও প্রস্তুত ছিলাম। আমি মিহিরের বুকে ছুরি বসাতেও পারতুম। কিন্তু নবনীতা নিজেই যে বদলে গেল! অমন সূক্ষ্ম ধরনের মেয়ে ছিল নবনীতা— মিহিরের মতন একটা মোটা রুচির লোককে কী করে তার ভালো লাগল, কে জানে ! যে-মিহির পুরুষের ঠোঁটে চুমু খায়, সতেরো বছর বয়েসেই যে বাঈজীপাড়ার রাস্তা চিনেছে, প্রকাশ্যেই যে কালোবাজারি ব্যবসার পরিকল্পনা আলোচনা করে— নবনীতা তারই গলায় বরমাল্য দিল। আমি চুপ করে ছিলাম, আমি প্রবল অভিমান নিয়েই মিহিরের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলি নি।

শেষের দিকে নবনীতার সঙ্গে আর আমি দেখা করার সুযোগ পেতাম না, নবনীতাও কোনো গরজ দেখায় নি। আমি আস্তে-আস্তে দূরে সরে গেলাম। একটামাত্র চিঠি লিখেছিল নবনীতা— তাতে ও আমাকে অনুরোধ করেছিল ওকে ক্ষমা করতে। আমি উত্তরে জানিয়েছিলাম— আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো— যে-কোনো সময় আমার সাহায্যের যদি দরকার হয় ওর— আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

এখন এক-একসময় আমার মনে হয়, আমি বোধহয় তখন কাপুরুষতাই দেখিয়েছিলাম! অভিমান করে দূরে সরে যাওয়ার বদলে, আমি ওকে জোর করে কেড়ে নিই নি কেন ? কেন ওর কাছে গিয়ে বলি নি, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, তা কি এত সহজে ফেরত নেওয়া যায় ? আমার জীবনের এতগুলো বছর যে আমি তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছি, তা কে ফেরত দেবে ?

কিন্তু, আমি তা বলতে পারি নি। আমার চেতনা যেন সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ঘটে গেল, তবু যেন মনে হয়েছিল, এসব কিছুই সত্যি নয়। এ কখনো সত্যি হতে পারে! মিহিরের সঙ্গে নবনীতার বিয়ে তো একটা অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার!

নবনীতা নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরে আসবে। আমার আশা ছিল, মিহিরের সঙ্গে বেশিদিন টিকতে পারবে না নবনীতা। ও আমার কাছেই ফিরে আসবে।— আমার কোনো সংস্কার নেই, তখনও আমি ওকে আবার গ্রহণ করতে রাজি ছিলাম।

নবনীতা কখনো আমার সাহায্য চায় নি। রতন তো বললো, নবনীতা আর মিহির খুব সুখে আছে। খুব ভালো কথা, তাই যদি হয় তো হোক না! এতদিন হলো বিয়ে হয়ে গেছে, এখনো ওদের কোনো সন্তান হয় নি।

১৭

২০শে মার্চ, ১৯৬৬

কিন্তু, নবনীতার কথা আমি আর ভাববো না ঠিক করেছিলাম, তবু বার-বার ওর কথাই এসে যাচ্ছে কেন? আমি তো বলতে চাই জয়ন্তীর কথা—টুনি পিসীর প্রসঙ্গে জয়ন্তীর কথাই বলা উচিত।

জয়ন্তী যে-লোকটিকে ভালবাসতো, তার সঙ্গে আমার আর নবনীতার বেশ ভালো আলাপ হয়ে গিয়েছিল, চন্দননগর কলেজের লেকচারার ছিল, আমার থেকে বয়সে দু'তিন বছরের বড়, কথায়-কথায় হাসতে পারতো খুব।

নবনীতাই একদিন আমাকে বলেছিল, জানো তো, অরূপের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে হওয়া খুবই শক্ত। জয়ন্তী ওর বাবার খুব আদুরে মেয়ে, চিরকাল আরামে থেকেছে, ও কি কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন, জয়ন্তীর বাড়ি থেকে খুব আপত্তি হবে বুঝি?

নবনীতা বলেছিল, আপত্তি মানে? জয়ন্তীর বাবাকে তো চেন না, সাঙ্ঘাতিক গোঁড়া লোক— এখনো ওদের বাড়িতে নেমন্তন্নর সময় ব্রাহ্মণ আর কায়স্থরা একসঙ্গে খেতে বসে না! আর অরূপরা তো—।

অরূপরা কী তা আমি জানতাম, অরূপ নিজেই একদিন হাসতে-হাসতে বলেছিল, আমরা ঘোষ হলেও কিন্তু কায়স্থ নই, আমরা গয়লা। ঘোষ গয়লা— এক সময় দুধ বেচতাম, এখন বিদ্যে বিক্রি করি!

জয়ন্তী আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, বিক্রি না, দান। বিদ্যে কখনো বিক্রি করা যায় না। আমি সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম, 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে!'

এখন কলকাতা শহরে জাতের বিচার ওরকম আর নেই। যুদ্ধের সময় নানান ধরনের লোক নানান কায়দায় পয়সা উপার্জন করে বড়লোক হয়ে যায়— তারপর থেকে বড়লোকরাই হয়ে যায় একটা আলাদা জাত— তখন আর ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ থাকে না। সেই অনুযায়ী, চাকরিতেও পাশাপাশি কাজ করার জন্য, মধ্যবিত্তদেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জয়ন্তীর বাবা ছিলেন গোঁড়ামির শেষ প্রতিনিধিদের একজন।

আমি ঠোঁট উল্টে বলেছিলাম, জয়ন্তী একবার বিয়ে করলে দেখবে ওর বাবা-টাবা মেনে নিতে বাধ্য হবে! যত সব ন্যাকামি!—নবনীতা আর আমার ব্যাপারে অবশ্য জাতের সে রকম বাধা ছিল না।

জয়ন্তী বড়লোকের মেয়ে হলেও ছিল খুব দৃঢ় ধরনের মেয়ে। এক-একদিন দারুণ সাজপোশাক করতো—আবার এক-একদিন কোনো প্রসাধন ছাড়াই সাধারণ পোশাকে ওকে রাস্তায় দেখেছি। অর্থাৎ ওসব ব্যাপারে ওর কোনো মোহ ছিল না। দারুণ সুন্দরী ছিল জয়ন্তী—

অনেক ছেলেরই ওর জন্য পাগল হওয়ার কথা, কিন্তু অন্য ছেলেদের সম্পর্কে ও যেন ছিল খানিকটা উদাসীন। মাঝে কিছুদিন ওর বাবার বন্ধুর ছেলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে দু'চারবার দেখা করেছিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ ছেলেটি বড়ই হালকা স্বভাবের আর চালিয়াৎ। অরূপকেই বলা যায় জয়ন্তীর প্রথম যৌবনের একমাত্র পুরুষ। আর অরূপকে শুধু ও ভালবাসতো না, রীতিমতন ভক্তিও করতো। অরূপের প্রত্যেকটা কথা শুনতো গভীর মনোযোগ দিয়ে। অরূপকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করার যেন প্রশ্নই ওঠে না জয়ন্তীর পক্ষে।

অরূপ সৌভাগ্যবান, শুধু জয়ন্তীর ভালবাসা পাবার জন্যই নয়—মিহির জয়ন্তীর দিক থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে নবনীতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, সেই জন্য। মিহির জয়ন্তী সম্পর্কে আগে যা মতলব এঁটেছিল, যদি লেগে থাকতো, তাহলে হয়তো তা সম্ভবও করে ফেলতো। মিহির তো এ পর্যন্ত কোনো কাজে ব্যর্থ হয় নি ! মিহির চাইলে হয়তো জয়ন্তীকেও বিয়ে করতে পারতো ! ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না !

মাঝে-মাঝে আমি, নবনীতা, জয়ন্তী আর অরূপ একসঙ্গে বেড়াতে বেরুতাম। অরূপ খুব মজা করে গল্প করতে পারতো—গঙ্গায় নৌকো করে বেড়াতে-বেড়াতে সেইসব হাসি-হুল্লোড়ের দিন... নবনীতা, নবনীতা, তুমি আমাকে কেন এত কষ্ট দিলে ? কেন তুমি আমাকে... না, থাক।

একদিন দূর থেকে দেখলাম, মিহির আর নবনীতা যাচ্ছে অরূপ আর জয়ন্তীর পাশাপাশি। আমি এসপ্ল্যানেডের ট্রাম-গুমটিতে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, ওরা হেঁটে যাচ্ছে কার্জন পার্কের দিকে। কী জানি, ওরা একবারও আমার নাম উচ্চারণ করেছিল কিনা ! তখন মিহির আর নবনীতার বিয়ে হয়ে গেছে, নবনীতার সিঁথিতে চওড়া করে আঁকা নতুন সিঁদুর, নবনীতাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। নাটক-ফাটকে যে ব্যর্থ প্রেমিকদের কথা লেখে— সেদিন বুঝেছিলাম, খুব একটা মিথ্যে লেখে না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও সেদিন বুক খালি-করা দুটো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়েছিল।

এর কিছুদিন পরই জয়ন্তী বাড়ি থেকে চলে এসে বিয়ে করলো অরূপকে। ওরা দু'জনেই আমাকে বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন করেছিল বিয়েতে যাবার জন্য। আমি যাই নি। কারণ, সেখানে গেলেই মিহির আর নবনীতার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হতো। আমি তখন মিহিরের মুখদর্শনও করতে চাই না।

তারপর, নবনীতা আর জয়ন্তী দু'জনেই হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। ওরা পেয়ে গেল সুখী দাম্পত্য জীবন, আমি পড়ে রইলাম একা। সেই যে কথায় বলে না, আম আর দুধ মিশে গেল, আঁটি পড়ে রইলো বাইরে। আমি সেই শুকনো আঁটি—আমাকে কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল একটা রুক্ষ মাঠের মধ্যে।

জীবন তার নিজস্ব নিয়মে বদলেছে। নবনীতার চেয়ে বেশি রূপসী ছিল জয়ন্তী, ওদের বাড়ির অবস্থাও ছিল অনেক সচ্ছল— স্বাভাবিক নিয়মে, অনেক ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল তার। কিন্তু জয়ন্তী তার ভালবাসার সম্মান রাখার জন্য সবকিছু তুচ্ছ করে বেরিয়ে এসেছিল। তবু, জয়ন্তী জীবনে সুখ পায় নি।

অবশ্য, বাড়ির পছন্দ করা অন্য কারুকে বিয়ে করলেই যে সুখ পেত—তারও কি কোনো মানে আছে ? আমার দিদিরই তো বিয়ে হয়েছিল অনেক দেখেশুনে—বাবা একেবারে জাত-কুল-বংশ, কুষ্ঠি—সব মিলিয়ে দেখেছিলেন, টাকা-পয়সাও ছিল—কিন্তু আমার দিদি সারাটা

জীবন কী রকম দুঃখ পেয়েছেন, তা আমি কিছুটা জানি। আমার জামাইবাবু ছিলেন একেবারে পাষণ্ড, তাঁর এমন একটা দোষ ছিল, যা মুখেও উচ্চারণ করা যায় না; সেই জন্যই দিদির জীবনটা ছারখার হয়ে গেল।

তাছাড়া, জয়ন্তীর দুর্ভাগ্য তো এলো সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। অরূপ অধ্যাপক হিসেবে বেশ নাম করেছিল, চন্দননগর থেকে চলে এসেছিল সেন্ট পল্‌স কলেজে। কি একটা স্কলারশিপ পেয়ে ওর বিলেতে যাবার কথাও হচ্ছিলো— এমন সময় একটা ট্যাক্সি দুর্ঘটনা। হাসপাতালে তিন মাস বেঁচে ছিল অরূপ— ভাঙা শিরদাঁড়া জোড়া দেবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। বরং দুর্ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গেলে পারতো অরূপ— তাহলে তার চিকিৎসার জন্য জয়ন্তীকে সর্বস্বান্ত হতে হতো না। বিয়ের আট বছর বাদে জয়ন্তী যখন বিধবা হলো, তখন তাকে দেখলে মনে হয়, এক ঝলক গরম হাওয়া দিয়ে একটা টাটকা ফুলকে কেউ যেন এইমাত্র শুকিয়ে দিল।

আমার সঙ্গে আবার অনেকদিন পর যখন দেখা হলো— তখন হাতে বেঁটে ছাতা নিয়ে জয়ন্তী ক্লান্ত মুখে টিউশানি করে ফিরছে। সর্বাঙ্গে তার দারিদ্র্যের চিহ্ন। ততদিনে আমি অনেক পোড়-খাওয়া ঝানু হয়েছি, চাকরির উন্নতিতে মন দিয়েছি, ভিখিরি দেখলে মুখ খিঁচোই, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেলে হিসেব করে উপহার কিনি। তবু জয়ন্তীকে দেখে আমার মায়া হলো। জয়ন্তীর এরকম পরিণতি আমি চাই নি।

জয়ন্তীকে যখন আমি চিনতাম তখন সে ছিল নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন, একটু অহঙ্কারী, তার পাশে দাঁড়ালে কখনো-কখনো দুর্লভ প্রসাধনের সৌরভ ভেসে আসতো। সেই জয়ন্তীর মুখখানা আজ ক্লান্তিতে কালো, ভালো করে চুলও আঁচড়ায় নি।

একদিন জয়ন্তীকে দেখে মুখ ফিরিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন জয়ন্তীর সঙ্গে আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম। বললাম, চলো ঐ চায়ের দোকানে একটু বসি।

বিধবা হবার পর বাপের বাড়ির দয়া নিতে চায় নি জয়ন্তী। বাড়ির অমতে, অন্য জাতের ছেলেকে বিয়ে করায় তার বাবা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, জয়ন্তী বিয়ে করার ফলে তাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। জয়ন্তী বাড়ি থেকে চলে আসার পর তার বাবা পুলিশের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যক্ষুনি শুনলেন, ইতিমধ্যেই ওদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্ট্রোক হলো। এতটা বাড়াবাড়ি হবে, কেউ ভাবতেই পারে নি, জয়ন্তীও পারে নি। হয়তো স্ট্রোক হবার সময় এমনিতেই ওঁর ঘনিয়ে এসেছিল, এটা একটা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু ওর বাড়ির কেউই আর জয়ন্তীকে ক্ষমা করতে পারে নি— সবাই এজন্য জয়ন্তীকেই দায়ী করেছিল। বাবার স্ট্রোকের খবর পেয়ে জয়ন্তী ছুটে গিয়েছিল দেখতে— বাড়ির একটা লোকও কথা বলে নি তার সঙ্গে। জয়ন্তীর মাও বেঁচে নেই।

স্বামী মারা যাবার পর প্রায় অসহায় অবস্থায় পড়েছিল জয়ন্তী, তবু তারও জেদ সাঙ্ঘাতিক— সে আর নিজের বাড়িতে যায় নি কোনোদিন। তার বড়দাদা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, জয়ন্তী গ্রাহ্য করে নি। তিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন, জয়ন্তী ফেরত দিয়েছে। জয়ন্তীর বাবা অবশ্য মেয়েকে কোনো সম্পত্তি দিয়ে যান নি।

জয়ন্তীর একটি ছ'বছরের ছেলে আছে, তাকে নিয়ে জয়ন্তী আলাদা থাকে। গয়না-টয়না সব গেছে, টিউশানি করে, গান শিখিয়ে অতিকষ্টে সংসার চালাচ্ছে। জয়ন্তী আমাকে বললো, আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিন না, অংশুদা ?

আমি বলেছিলাম, আচ্ছা, খোঁজ করে দেখবো।

জয়ন্তী বলেছিল, না, না, আপনার অনেক চেনাশুনো— আপনাকে একটা যোগাড় করে দিতে হবেই। আমি আর পারছি না! আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে খবর নেবো।

— আমার বাড়িতে তো আমার দেখা পাবার কোনো সময়ের ঠিক নেই। তুমি বরং আমার অফিসে টেলিফোন কোরো!

— আপনাদের অফিসে কোনো কাজ দিতে পারেন না ?

— আমাদের অফিসে ? আমাদের অফিসে মেয়েরা কাজ করে না— নেওয়া হয় নি এখনো— তাছাড়া ওখানে আমি চাকরি দেবার মালিকও নই!

— আচ্ছা তাহলে অন্য কোথাও ? আপনি সত্যিই খুঁজবেন তো ? বলুন, কথা দিন, আপনি আমার জন্যে চেষ্টা করবেন ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !

আমরা দু'জনে কেউই আর ছেলেমানুষ নই, দেখা হবার পর পুরনো কালের সেইসব হালকা মধুর মুহূর্তের জন্য কেউই হা-হুতাশ করলাম না। নবনীতার সূত্রেই জয়ন্তীর সঙ্গে আমার পরিচয়, কিন্তু জয়ন্তী ওর নাম একবারও উচ্চারণ করলো না আমার সামনে। সংক্ষেপে ওর জীবনের বিপর্যয়ের কথা বলে নিয়েই জয়ন্তী আমার কাছে কাজের কথা শুরু করলো। আগে দেখা হলে আমরা কেউ কোনো কাজের কথাই বলতাম না, শুধু অকাজের হাসি আর আনন্দ, আর এখন দু'একটা কাজের কথা বলার পর আমাদের কথা ফুরিয়ে গেল।

জয়ন্তী আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলো না— ও যেন ধরেই নিয়েছিল, পৃথিবীতে ওর চেয়ে আর সবাই ভালো আছে। অমন আত্মভিমানী মেয়ে ছিল জয়ন্তী, আর সেদিন ব্যাকুলভাবে চাকরির জন্য অনুরোধ করতে লাগলো— একটুও লজ্জা নেই। আমার চোখের দিকে ভয়ার্ত সরল চোখ রেখে বললো, একদিন আপনি আমায় রাস্তায় দেখেও চিনতে পারেন নি! আমি ভেবেছিলুম, আপনিও অন্যদের মতন আমাকে এড়িয়ে যেতে চান।

আমি লজ্জিতভাবে বলেছিলুম, না, না, সেদিন নিশ্চয়ই দেখতে পাই নি তোমায়। আমি সত্যিই তোমার চাকরির জন্য চেষ্টা করবো।

জয়ন্তী বললো, শুধু চেষ্টা নয়, আপনাকে যে-করে হোক ব্যবস্থা করতেই হবে। আমার যে আর উপায় নেই !

জয়ন্তী এমন ব্যাকুলভাবে বলেছিল যে, আমার মন স্পর্শ করেছিল। আমি দু'এক জায়গায় একটু চেষ্টাও করলাম। কয়েকদিন পর, টেলিফোন নয়, জয়ন্তী নিজেই আমার অফিসে এসে হাজির হলো। সেদিন জয়ন্তীর সঙ্গে আমি ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম।

ওর ছেলে, বাবলু, ভারি মিষ্টি দেখতে ! জয়ন্তী অনেক সুখ-দুঃখের কথা বললো। বুদ্ধিমতী মেয়ে, নবনীতার প্রসঙ্গ সেদিনও একবারও তুললো না আমার সামনে। জয়ন্তীর প্রতি আমার সহানুভূতি গাঢ় হলো— তারপর থেকে জয়ন্তীর একটা চাকরির জন্যে জোর চেষ্টা শুরু করলাম। দৈবাৎ পেয়েও গেলাম একটা।

আমাদের অফিসেরই এক মাড়োয়ারি সাপ্লায়ার একদিন বাঙালি মেয়েদের খুব প্রশংসা করছিল। তার কোম্পানিতে বাঙালি ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি কাজ করে বলছিল— সেই সময় আমি ঝপ করে বলে ফেললাম, তাহলে শেঠজী, আমার চেনা একটা বাঙালি মেয়ে আছে, খুব নিডি— তাকে একটা চাকরি দাও না!

প্রস্তাবটা এমনই আকস্মিকভাবে করেছিলাম যে শেঠজী আর তৎক্ষণাৎ সেটা অস্বীকার করতে পারল না। খানিকটা তো-তো করে বললো, হ্যাঁ, সে আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ যদি হয়, বেশ রিলায়েবল্— তাহলে...। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ, মেয়েটি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একে চাকরি দিলে আমি খুশি হবো।

খুশি কথাটা একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করলাম— একজন সরকারি অফিসারের খুশি হওয়াটা

তো কম কথা নয়! প্রায় দু'চার কথাতেই চাকরি হয়ে গেল— খুব মন্দ চাকরি না, প্রায় আড়াইশো টাকা মাইনে পাবে জয়ন্তী।

চাকরিটা পেয়ে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেল জয়ন্তী। জয়ন্তী হয়তো চাকরির জন্য আরও অনেককেই বলেছিল। আমার ওপরেও বোধহয় খুব বেশি আস্থা রাখে নি, শুধু একটা চান্স নিয়েছিল। আমাকে কোনোদিনই তো দায়িত্ব নিয়ে কিছু করতে ও দেখে নি। সেই আমিই যে অত সহজে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবো— তা ও যেন প্রথমটায় বিশ্বাস করতেই পারে নি। আনন্দে ও আমার হাত জড়িয়ে ধরলো। একদিন নেমন্তন্ন করে বাড়িতে খাওয়ালো। আমার অফিস থেকে ওর অফিস খুব দূরে না— প্রায়ই ছুটির পর আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতো।

আমারও অহঙ্কারে বেশ খানিকটা সুড়সুড়ি লাগলো। পরোপকার করার একটা রোমাঞ্চ আছে। আমার মুখের দু'চারটে কথায় চাকরি হয়ে গেল— আর তাতেই একজন যুবতী মহিলা— নবনীতার প্রাণের বান্ধবী এবং এককালের রূপ-অভিমানী জয়ন্তী রায় কৃতজ্ঞতায় আমার কাছে বিগলিত হয়ে রয়েছে, এতে পুলকিত হতেই হয়। আমি অবশ্য এমন ভাব দেখাতে লাগলুম, যেন এটা একটা কিছুই না। বন্ধু-বান্ধবের জন্য মানুষ তো এটুকু করেই থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। মাসখানেক বাদেই জয়ন্তী বললো, তার পক্ষে ওখানে চাকরি করা সম্ভব হবে না। ঐ অফিসে যে ক'জন মালিক পক্ষের মাড়োয়ারি ছোকরা আছে, তারা সবসময় মেয়েদের জ্বালাতন করে, ছুটির পর বাইরে নিয়ে যেতে চায়, রাজি না হলে নানারকম অপমানজনক কথা বলে। আত্মসম্মান বজায় রেখে ওখানে চাকরি করা যায় না।

এরকম একটা সম্ভাবনার কথা যে আমার একেবারে মনে আসে নি, তা নয়। প্রাইভেট অফিস-টফিসে রসিক ছেলেদের অভাব নেই। মধ্যবিত্ত ছেলেদের মধ্যে এখনো অনেকের এই ধারণা যে, যে-সব মেয়ে অফিসে চাকরি করতে আসে, তারা খানিকটা সুলভ হতে বাধ্য! কিন্তু জয়ন্তীর বেশ ব্যক্তিত্ব আছে, সে এসব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে— ভেবেছিলাম। আমি জয়ন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ওদের কড়াভাবে ধমকে দিতে পারো না !

জয়ন্তী বিমর্ষভাবে বললো, অন্য ছেলেদের পারি, কিন্তু আপনার ঐ শেঠজীর দু'জন ভাগ্নে আছে, তারা এত বিশ্রী ব্যবহার করে— লেখাপড়া শিখেছে, অথচ...

আমি বললাম, মাত্র এক পুরুষে লেখাপড়া শিখেছে তো, তাই সব শিক্ষা এখনো হয় নি। তাহলে, এখন কী করবে ?

জয়ন্তী বললো, ওরকম রোজ-রোজ বিরক্ত করলে কাজ করা যায় না। আমাকে ও চাকরি ছাড়তেই হবে !

শুনে আমি গম্ভীরভাবে বলেছিলুম, চাকরি ছাড়লে তো তুমি আবার সেই অসুবিধেয় পড়বে। ঠিক আছে, তুমি অফিসে যেমন যাচ্ছো যাও, কাল থেকে আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।

পরদিন অফিসে এসেই মাড়োয়ারিটিকে টেলিফোনে ডেকে খুব ধমকে দিলাম। বলে দিলাম, সাবধান, তোমার সাপ্লাই অর্ডার যে-কোনোদিন ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে ! শুধু তাই নয়, গভর্নমেন্টকে চিট করার অভিযোগে তোমার নামে মামলা তুলবো কিনা তাও ভাবছি।

লোকটি হতভম্ব হয়ে বললো, কেন স্যার, আমার ডেলিভারি দেওয়া মালে এবার তো কোনো গণ্ডগোল নেই!

আমি চিবিয়ে-চিবিয়ে বললাম, মালে এখনো গণ্ডগোল নেই, কিন্তু আমার আত্মীয়াকে তুমি চাকরি দিয়েছো বটে, কিন্তু তোমার কোনো লোক যদি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে কখনো, তাহলে—। তখন আমার কাছে ওদের তিনখানা বিল পড়ে আছে পাশ না হয়ে, আমার কথা না শুনে উপায় কী !

জয়ন্তীর সঙ্গে আবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করলাম, কী, কেউ আর তোমাকে বিরক্ত করে ?

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে বললো, সত্যিই অবাক কাণ্ড, এখন সবাই আমাকে বেশি-বেশি খাতির করতে আরম্ভ করেছে, অন্য মেয়েরা হিংসেয় মরে! কী ব্যাপার বলুন তো ?

আমি বললুম, সে একটা ব্যাপার আছে। যাই হোক, আর কেউ যদি কখনো কিছু করে, আমাকে বলে দিও।

ও বললো, না, আর কেউ করবে না বোধহয়— তবে শুধু ওখানকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বিশ্রী বিকট চেহারা লোকটার— মুখে একটা বিরাট আব— সেই শুধু সবসময় আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে— আর ওর হাতে কোনো কাগজ দিতে গেলে ইচ্ছে করে হাতে হাত ঠেকাবেই; তা সে যাক গে—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ওটুকু তোমাকে সহ্য করতেই হবে। কারুর তাকানোটা আর বন্ধ করতে পারি না! তাছাড়া, তুমি এখনো যথেষ্ট সুন্দরী আছো, সুতরাং—

জয়ন্তী আমার দিকে ভ্রূভঙ্গি করেছিল।

জয়ন্তীর সঙ্গে আমার একটা নিষ্পাপ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো ! আমি ওর চাকরির যোগাড় করে দেওয়ায় জয়ন্তী তো কৃতজ্ঞ ছিলই, তাছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও ও আমার ওপর নির্ভর করতে লাগলো।

একা একজন রমণীর পক্ষে এই হিংস্র, ভয়ংকর শহরে সম্ভ্রম বজায় রেখে বেঁচে থাকা এখনো সহজ নয় ! সেই রমণীর শরীরে যদি সামান্য যৌবনও অবশিষ্ট থাকে এবং সঙ্গে কোনো পুরুষ না থাকে—তাহলেই এ শহরের অন্য পুরুষের রস গজিয়ে ওঠে। অফিসে জয়ন্তীকে বিরক্ত করা আমি বন্ধ করেছিলুম, কিন্তু পাড়ায়, গানের ইস্কুলে, ওকে প্রায়ই অস্বস্তিকর অবস্থা সহ্য করতে হয়েছে—একমাত্র আমিই জয়ন্তীকে সেভাবে বিরক্ত করার সামান্য চেষ্টাও করি নি দেখে জয়ন্তী আমার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে শুরু করলো।

সেই কয়েকটা মাস আমার জীবনে আবার খানিকটা আনন্দ এনে দিয়েছিল। জয়ন্তীর সঙ্গে আমার এমন একটা সহজ সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো, যা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। জয়ন্তীর কাছ থেকে আমি কোনো প্রতিদান চাই নি, শুধু তার সাহচর্যই আমার ভালো লাগতো। তাছাড়া, জয়ন্তীর চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল শ্রদ্ধা জাগাবার মতন। একটুও ভেঙে পড়ে নি সে, একা-একা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধেও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই করে চলেছে—সম্পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে। মেয়েদের মধ্যে এই গুণটা তো সহজে দেখা যায় না, দেখলে সত্যিই শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে করে।

এর আগে, বিকেল বা সন্ধের সময় কী করবো, তাই ভেবে পেতুম না। বাড়িতে মন টেকে না, অথচ কোথাও যাবারও জায়গা নেই। এখন জয়ন্তীর সঙ্গে ওর বাড়িতে বসে গল্প করতে করতে সুন্দর সময় কেটে যায়। একটা শুধু অলিখিত শর্ত আমাদের, নবনীতার নাম কেউ উচ্চারণ করবে না। অরূপের কথাও খুব কমই উঠতো।

এইরকম অবস্থায় অনেকে হয়তো ভাবতে পারে, আমাদের দু'জনের মধ্যে আবার নতুন করে প্রেম জন্মাবে। কিন্তু না, সে-রকম কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমাদের দু'জনের জীবনই ছিল দু'জনের কাছে জলের মতন স্পষ্ট। দু'জনে দু'রকম দুঃখের টানে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছি। এই অবস্থায় প্রেম হয় না। আমরা শুধু বন্ধু ছিলাম।

নিজের শরীর কিংবা খাওয়াদাওয়া কিংবা পোশাকের দিকে আর কোনো মনোযোগ ছিল না জয়ন্তীর, ছেলেকে মানুষ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। জয়ন্তীর ছেলে বাবলু, এমনই সুন্দর যে, তাকে দেখলেই ভাল না বেসে পারা যায় না। ফুটফুটে ফরসা রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, টলটলে দু'টি চোখ—একটু দুরন্ত, কিন্তু কথার অবাধ্য নয়।

ওর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করা, দুধের কার্ড করবানো, স্বামীর ইন্‌সিওরেন্সের বাকি টাকা আদায় করা—এইসব ব্যাপারে জয়ন্তী আমার পরামর্শ ও সাহায্য চাইতো। আমিও আগ্রহের সঙ্গেই যথাসাধ্য সাহায্য করতুম।

নিজের বাড়িতে আমি কোনোদিন সংসারের কোনো কাজ করি না, মাথাও ঘামাই না, কিন্তু জয়ন্তীর ছেলের দুধের কার্ড করবার জন্যে মিল্ক সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে চেনাশোনা একজনকে খুঁজে বার করে রাইটার্স বিল্ডিং-এ তিনদিন ছোটাছুটি করলুম।

আসলে পরোপকার করার একটা নেশা আছে তো! প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে পরোপকার। কিছু একটা কাজ উদ্ধার করে দেবার পর জয়ন্তী যখন চোখের কোণে চিকচিকে হাসি ফুটিয়ে আমার দিকে তাকাতো—তাতেই আমি মনে-মনে খুব তৃপ্তি পেতাম।

একদিন জয়ন্তীকে বলেছিলাম, তোমার কী-ই বা এমন বয়েস, তুমি আবার বিয়ে কর না!

কথাটা বলে ফেলেই বুঝেছিলাম, খুব ভুল করেছি। জয়ন্তীকে আমার এ কথা বলার একটা অন্য অর্থ হতে পারে। আমি নিজেই অবিবাহিত, আমি এ কথা বলার একটা মানে হতে পারে যে, আমিই জয়ন্তীকে বিয়ে করতে রাজি আছি। না, না, না। সে-রকম আমি মোটেই ভাবি নি। এমনিতেই বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই—তাছাড়া, জয়ন্তীর প্রসঙ্গে তো সে প্রশ্নই ওঠে না ! জয়ন্তীর সঙ্গে পরিচয়ের সেই প্রথম থেকেই আমি তার সম্পর্কে কোনো ভালবাসার টান বোধ করি নি। এখনো আমাদের সম্পর্ক অনেকটা দু'জন পুরুষ বন্ধুর মতন।

কোনোদিন আমি বিরলে জয়ন্তীর হাতখানাও জড়িয়ে ধরি নি আবেগের বশে। সরল স্বাভাবিকভাবেই দু'জনে মিশেছি—জয়ন্তীও কখনো কোনো ইঙ্গিত দেয় নি। তবে, সরল সত্যি কথা যদি বলতে হয়—নির্জনে নিজের ঘরে বসে লিখছি, সত্যি কথা বলবো না-ই বা কেন, তা হলে অস্বীকার করতে পারবো না, সে রকম একটু-আধটু ইচ্ছে আমার জাগতো মাঝে-মাঝে। জয়ন্তী যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতো কিংবা বেরিয়ে আসতো বাথরুম থেকে—তখন ওর ওই অকৃত্রিম সৌন্দর্যের দিকে আমি শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকতুম। বুকের মধ্যে শিরশির করতো। তখনও পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, কোনো মেয়েকে ভাল না বাসলে তার শরীর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। অন্তত আমার করবে না! কিন্তু জয়ন্তীর শরীরের দিকে যে আমার ওরকমভাবে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করতো, তাকে আর কী বলা যায় ? বস্তুত, আমার মনে-মনে একটু ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল—জয়ন্তী হয়তো কোনোদিন আমার প্রতি একটু আবেগ দেখাবে—কোনো এক ক্লান্ত সন্ধ্যায় আমার বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়াবে—আমি তখন সান্ত্বনার আঙুলে ওর চুলে বিলি কেটে দেবো। কিন্তু জয়ন্তী সে-রকম কিছু করে নি কখনো। আজ যদি জয়ন্তী ভাবে, আমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানাচ্ছি—সেটা খুব বিশ্রী হবে—আমি সে-রকম কিছুই ভেবে বলি নি!

জয়ন্তীই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। মাটিতে বসে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চা বানাচ্ছিল জয়ন্তী, মুখখানা তুলে অকৃত্রিম ত্রস্ততায় বললো, না, না, আমি আর বিয়ে করতে চাই না ! এই তো বেশ আছি, বেশ স্বাধীনভাবে—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, কেন, অত আপত্তি কেন ? পাশে সবসময় একজন নির্ভর করার মতন পুরুষ থাকলে, মেয়েদের—

—না, না, আর দরকার নেই বাবা ! তাছাড়া যাকে বিয়ে করবো সে বাবলুর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে—

—বাবলুকে সবাই ভালবাসবে ! অত সুন্দর ছেলে—

—পরের কথা কিছু বলা যায় না ! মানুষ কতরকম ভাবে বদলে যায়! তাছাড়া কেই-বা আমাকে বিয়ে করবে ! বুড়ি হয়ে গেছি—

আমি বললাম, তুমি বুড়ি হয়ে গেছ ? তাহলে আমি তো থুথ্‌ড়ে বুড়ো !

জয়ন্তী আমার দিকে না তাকিয়েই মন্তব্য করলো, না অংশুদা, আপনি এখনো যথেষ্ট ইয়ং। আপনিই এবার একটা বিয়ে করলে পারেন। কদ্দিন আর এরকম ভাবে থাকবেন ! বলুন, মেয়ে দেখবো আপনার জন্য ?

—আমার কথা থাক। চেনা মেয়েদের কাছেই পাত্তা পেলাম না, তারপর আবার অচেনা মেয়ে ! তুমি কি সারাজীবন এরকম একা-একাই থাকবে ঠিক করেছো ? তুমি বিয়ে করতে চাইলে এখনো অনেকে সেটা সৌভাগ্য মনে করবে !

—না, অংশুদা, ওসব আর আমি চিন্তাই করি না এখন !

—চিন্তা করলে হয়তো বুঝতে পারতে...

আমি নিজের ব্যবহারে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। একটু আগেও জয়ন্তীকে বিয়ে করার কথা আমি একটুও ভাবি নি। বরং সেই সম্ভাবনার কথায় ভয় পাচ্ছিলুম। কিন্তু জয়ন্তী রাজি না হওয়ায় আমার ঝোঁক চেপে গেল।

হঠাৎ মনে হলো, জয়ন্তী যদি রাজি হয়—আমিও এক্ষুনি ওকে বিয়ে করতে রাজি আছি। বাবলুকে নিয়ে কোনো অসুবিধে হবে না— আমি বাবলুকে ভালবাসি, বাবলুও আমার খুব বাধ্য। এখন আমি চাকরি-বাকরি ভালোই করি, আয়ও আমার যথেষ্ট, কতকাল আর ছন্নছাড়া জীবন কাটাবো ! এক পলকের জন্য আমি আমার নিজের বিবাহিত জীবনের দৃশ্যটা একবার কল্পনাও করে ফেললুম—জয়ন্তী আমার জামার বোতাম সেলাই করে দিচ্ছে!

জয়ন্তীকে বিয়ে করলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। জয়ন্তী বিধবা একথা আমি যেমন মেনে নিচ্ছি—জয়ন্তীও মেনে নেবে যে, আমি একসময় নবনীতাকে বিয়ে করার জন্যে উন্মত্ত হয়েছিলাম। আমি প্রায় প্রস্তাব জানাবার মতোই ব্যগ্রভাবে বললুম, জয়ন্তী, তুমি যদি একবার রাজি হও, তোমাকে বিয়ে করতে অনেকেই...

আমার কণ্ঠস্বর শুনে জয়ন্তী নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। আমার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর ঐ প্রসঙ্গে ইতি টানার জন্যেই বললো, না, অংশুদা, ও কথা আর আমাকে বলবেন না। অন্য কেউ আমায় ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু আপনি তো আমাকে চেনেন। আমি সত্যিই আর চাই না। এই বেশ স্বাধীনভাবে আছি, আপনারা সাহায্য করছেন, এতেই বেশ চলে যাচ্ছে, আর জড়াতে চাই না।

আমি বোকার মতন ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো, সেই ভালো। তোমার যা ভালো মনে হবে...

স্পষ্টতই আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো জয়ন্তী। কিন্তু আশ্চর্য, আমার কোনো রাগ হল না, দুঃখ হলো না। জয়ন্তী নিজেকে বুড়ি বুড়ি বলে, কিন্তু ওর বয়েস মোটে তিরিশ-বত্রিশ, এখনো ওর স্বাস্থ্য ও ফিগার অনেক কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েকে লজ্জা দেবে। প্রসাধন করে না, তবু জয়ন্তীর নাক-চোখ-ঠোঁটের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য—তাতে ভিড়ের মধ্যেও তার দিকেই প্রথম তাকাতে ইচ্ছে করে। সেই জয়ন্তী যে দুর্বল নয়, অসহায় নয়, স্বাধীনভাবে একা বাঁচতে চায়—এতে তার প্রতি আমার আবার শ্রদ্ধা হলো।

কয়েক মাস এইভাবে বেশ কেটে গেল। প্রায়ই জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়, কোনে-কোনোদিন ওর সঙ্গে ওর বাড়ি পর্যন্ত যাই, চা খেয়ে আসি। নানান রকমের কাজের কথাই হয় বেশি, তবু বেশ সময় কেটে যায়। জয়ন্তীর বাড়িওয়ালা অভদ্র ব্যবহার করছিল বলে আমিই ওকে টালিগঞ্জে একটা ছিমছাম ছোটো ফ্ল্যাট খুঁজে দিলাম।

কিন্তু এরকম তো চলতে পারে না। সংঘর্ষ বাধবেই। অনবরত হারজিতের খেলা চলছে, কেউ

হারবে কেউ জিতবেই, পাশাপাশি দুটো আত্মা চিরকাল সমান–সমান হয়ে হেঁটে যেতে পারে না। জয়ন্তী আর আমি বেশ কিছুদিন সমান–সমান হয়ে হেঁটেছিলাম।

তারপর একদিন, এসপ্ল্যানেডের একটা দোকানে বসে আমি একা চা খাচ্ছি, দারুণ বৃষ্টি নেমেছে সেদিন, চা খাওয়া শেষ হলেও বাইরে বেরুবার উপায় নেই, একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ে আছি উদাসভাবে—এমন সময় আমি ভূত দেখবার মতন চমকে উঠলাম।

আমার টেবিল থেকে একটু দূরে, একটা কেবিনের পর্দা একটু উড়তেই তার ভেতরে আমি জয়ন্তীকে দেখতে পেলাম—একটি যুবকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, ভুল দেখেছি। তীব্র চোখে আমি সেই পর্দা–ঘেরা কেবিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যদি আবার পর্দা একটু ফাঁক হয়।

বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে ঢুকলো, সেই সময় আমি আবার দেখতে পেলাম। না, কোনো ভুল নেই, জয়ন্তী ঠিকই, পাশাপাশি বসে আছে এক যুবকের সঙ্গে, দু'জনেই খুব হাসছে। এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক ছিল উঠে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু সেই পর্দাফেলা কেবিনে ওকে এক পলক দেখেই আমার কী রকম যেন অস্বাভাবিক লেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল, এ যেন আমার চেনা সেই জয়ন্তী নয়। বাবলুর মা নয়। কিংবা সে–ই, কিন্তু মঞ্চের ওপর অন্য কোনো ভূমিকায় অভিনয় করছে। জয়ন্তীর চোখের চাহনি, কথা বলার ভঙ্গি সবই অন্যরকম।

অরূপ মারা যাবার পর থেকে, জয়ন্তীর কথা বলা ও দৃষ্টির মধ্যে একটা শুদ্ধ সংযত ভাব এসেছিল। কেউ বলে না দিলেও বোঝা যেত, ও বিধবা। কিন্তু আজ ওকে মনে হলো কুমারী মেয়ে, ওর মুখে আমি যা দেখলাম, তাকে হাসি না বলে লাস্যই বলা উচিত। কুমারী মেয়েরা যখন তাদের পছন্দসই কোনো যুবকের সঙ্গে এইরকম রেস্তোরাঁয় কেবিনে খেতে যায়—তখন তাদের মধ্যে এমন একটা ভাব আসে, যেন সেই টেবিল, সেই মুখোমুখি বসে থাকা— ঐ-টুকুই সেই মুহূর্তে জীবনের সবকিছু— এর বাইরে আর পৃথিবীর কিছুই নেই, আর কিছুরই কোনো মূল্যও নেই।—জয়ন্তীর মুখে অবিকল আমি সেই ভাবভঙ্গি দেখতে পেলাম। এমনকি একটা তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজও বাইরে আমার কানে এলো।

অদ্ভুত ধরনের একটা আঘাতে আমি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। সিগারেটের ধোঁয়া মুখে তেতো লাগতে লাগলো, মনে হলো, সমস্ত পৃথিবী আমাকে ঠকাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে।

পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করলাম। এসব আমি ভাবছি কেন ? জয়ন্তীর সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্পর্কও নেই, আমি জয়ন্তীর অভিভাবকও নই। তার যা খুশি করার, যে–কোনো লোকের সঙ্গে মেশার অধিকার আছে। তাছাড়া, কোনো লোকের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে চা খেতে আসায় দোষটাই বা কী ? আজকাল স্বামীরাও স্ত্রীদের এটুকু স্বাধীনতা দেয়, আমি তো নেহাতই জয়ন্তীর বন্ধু— তাও দূর সম্পর্কের।

কিন্তু পাশাপাশি বসেছে কেন ? নারী আর পুরুষ রেস্টুরেন্টে গিয়ে টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসাটাই তো স্বাভাবিক। পর্দা–ঘেরা কেবিনে পাশাপাশি বসা— এর মধ্যে কি অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার চিহ্ন নেই! জয়ন্তীকে অনেকদিন আমি ওরকম মুখোজ্জ্বল হাসি হাসতে দেখি নি।

আমার ইচ্ছে ছিল সে–দোকান থেকে উঠে চলে যাওয়ার। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে বেরুবার উপায় নেই। সেই কেবিনের দিকে তাকাতে আর আমার সাহস হচ্ছিলো না, যদি কোনো বিসদৃশ দৃশ্য দেখে ফেলি— তা আমি সহ্য করতে পারবো না। অথচ না তাকিয়েও পারছিলুম না। পর্দা-ঘেরা সেই কেবিনটা প্রচণ্ড রহস্যময়ভাবে আমাকে কেবলই টানছিল।

মাঝে–মাঝে পর্দা একটু সরে যাচ্ছে, তখন ভেসে আসছে দু'একটা কথা ও হাসির টুকরো,

একবার দেখলুম, যুবকটি জয়ন্তীর হাতব্যাগ খুলে দেখার চেষ্টা করছে আর হাসতে–হাসতে জয়ন্তী সেটা কাড়াকাড়ি করছে। খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে ওরা।

একটু বাদে ওরা বেরুলো, পোষা পাখি যেমন মানুষের হাত থেকে খাবার খায়, সেইরকমই যুবকটি জয়ন্তীর প্রসারিত হাত থেকে মৌরি–মশলা তুলে নিল। পরস্পর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা, জয়ন্তী আমাকে দেখতে পেল না।

আমি একবার ভেবেছিলুম ওকে ডাকবো, ডেকে লক্ষ করব, আমাকে ওখানে বসে থাকতে দেখে, জয়ন্তীর মুখের চেহারা কী রকম হয় ! আবার, একটু –একটু ভয়ও করতে লাগলো। আমাকে দেখতে পেয়ে জয়ন্তী যদি বেশি চমকে ওঠে, ওর মুখের চেহারা অপরাধীর মতন হয়ে যায়, তাহলে কি আর কখনো ওর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারবো ? তার চেয়ে বরং দেখা না–হওয়াই ভালো, তাহলে তবু অন্তত আমি ভাবতে পারবো, এটা এমন কিছু নয়— এমনিই বৃষ্টির দিনে জয়ন্তী একজন চেনা লোকের সঙ্গে এখানে চা খেতে এসেছিল। আর কিছুই না!

কিন্তু, আমি যেখানে বসেছিলাম, কেবিন থেকে বেরুবার পর আমাকে ওর দেখতে পাওয়া খুবই সম্ভব ছিল। তা যে পেল না, তার কারণ সঙ্গের যুবকটির দিকে ও একেবারে নিবিষ্টভাবে তাকিয়েছিল। যুবকটি জয়ন্তীর থেকে দু'এক বছর বয়েসে ছোটোই হবে— অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা, সিনেমা অভিনেতার মতন চুল ছাঁটা, বেশ একখানা গদগদ ভাব মাখানো তার মুখে।

বেশ কয়েকদিন আমি বিমর্ষ হয়ে রইলুম। কোনো কারণ নেই, জয়ন্তীর ওপর আমার কোনো দাবি নেই, তবু বিমর্ষ ভাব কাটাতে পারলুম না। আমি জয়ন্তীর সঙ্গে কোনোদিন প্রেম–ট্রেম করার চেষ্টা করি নি, কিন্তু জয়ন্তী অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করবে— এ চিন্তাও আমার সহ্য হচ্ছিলো না। দিন–চারেক জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করি নি, দেখা করার ইচ্ছেও হয় নি, অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি।

কয়েকদিন বাদে জয়ন্তী অফিসে টেলিফোন করলো। সরল স্বাভাবিকভাবেই বললো, কি অংশুদা, ক'দিন দেখা নেই, কী ব্যাপার ?

আমি উদাসভাবে বললুম, কিছু না, এমনিই, এই শরীরটা তেমন ভালো নেই—

জয়ন্তী অনুরোধ করলো, সেদিন সন্ধেবেলা ওর বাড়িতে অবশ্য যেতে। আমি রাজি হলাম, গেলাম অবশ্য, কিন্তু চুপচাপ বসে রইলাম সেখানে। অন্যদিনের মতন বাবলুর খোঁজ করলুম না, চললো না কথার ফোয়ারা। জয়ন্তী প্রথমটা লক্ষ করে নি। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, আপনার মন খারাপ ?

আমি উত্তর দিলুম, মন খারাপের তো তেমন কোনো কারণ নেই, মনে হচ্ছে, শরীরটাই কী রকম খারাপ–খারাপ লাগছে !

ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তী বললো, কী হয়েছে ? অসুখ–বিসুখ করেছে নাকি ?

— না, তেমন কিছু না, এমনিই।

— আপনার চোখ দুটো একটু যেন লালচে হয়েছে, জ্বরটর হয় নি তো?

— কী জানি! মনে তো হয় না। না, সে–রকম কিছু না। এমনিই একটু ম্যাজমেজে লাগছে।

আমার মা দীর্ঘকাল ধরে শয্যাশায়ী। বহুদিন আমার কপালে বা বুকে হাত দিয়ে কেউ জ্বর দেখে না। অনেকদিন ওসব জায়গায় কোনো নারীর হাতের ছোঁয়া পড়ে নি। জয়ন্তী যদি আমার কপালে হাত দিয়ে একটু দেখতো, তাহলে কী খুব অস্বাভাবিক হতো ?

জয়ন্তী আমার শরীর খারাপ বিষয়ে আর কোনো আগ্রহই দেখাল না। আমি নিরুত্তাপভাবে ওকে বললুম, তুমি ভালো আছ তো ? এ ক'দিন তোমার কোনো অসুবিধে-টসুবিধে হয় নি তো?

— শুনুন, আপনার সঙ্গে যে দরকার আছে !

— কী দরকার ?

— বাবলুর একখানা বই কলেজ স্ট্রিটে কোথাও পেলাম না। ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার— পার্ক স্ট্রিটের কোন দোকানে নাকি পাওয়া যায়— অফিসের পর আসবেন কাল জি.পি.ও'র সামনে ? দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে কিনবো। ওদের ক্লাশ-টিচার বলে দিয়েছে, এই সপ্তাহের মধ্যেই কিনতে হবে। কাল আপনার কোনো কাজ আছে ? অবশ্য, আপনার যদি কোনো কাজ থাকে, তাহলে আমি নিজেই না হয় গিয়ে, আমি তো ঠিক চিনি না—

— না, ঠিক আছে। তোমাকে যেতে হবে না। তুমি বাড়ি চলে যেও। আমি দেখবো এখন—

শুধু দরকারের সময়ই আমাকে মনে পড়ে ? আমি বুঝি একটা ভারবাহী পশু ! যত ইচ্ছে কাজ শুধু আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়! ভেবেছিলাম, জয়ন্তীর সঙ্গে আর দেখা করবো না। সেদিন একটু পরেই উঠে এসেছিলাম ওর বাড়ি থেকে। পরদিন কিন্তু অফিসের পর ঠিক হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে পার্ক স্ট্রিট ঘুরে বইটা যোগাড় করলাম। তাছাড়া বাবলুর ওপর আমার একটা মায়া ছিল, তার বই বলেই গেলাম। বাবলুকে মিশনারি স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, লেখাপড়ায় ভালো হবে ছেলেটা।

বাবলু, ঝিয়ের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে গেছে, বইটা পেয়ে আগের মতনই খুশি আর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো জয়ন্তী। বললো, অফিস থেকে আসছেন, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই ? বসুন, আজ প্রেসার কুকারে মাংস রেঁধেছি, সঙ্গে কী খাবেন ? লুচি না পরোটা ?

আমি জয়ন্তীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছিলুম না। আগের দিনও আমি ওকে সেই রেস্টুরেন্ট প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ সেই কথাটাই ঘুরছে। এ কী পরিবর্তন হলো আমার ? আজকাল তো লোকে নিজের স্ত্রী সম্পর্কেও এত স্পর্শকাতর হয় না! এক দৃষ্টিতে শুধু ওকে লক্ষ করছিলুম। ওর শরীরে যে একটা আলাদা চাঞ্চল্য এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জয়ন্তীর ব্যবহারে কোনো জড়তা নেই। ব্যস্ত হয়ে সে স্টোভে আগুন ধরিয়ে ময়দা মাখতে লাগলো। কিন্তু সেদিনের ঘটনাটা আমার মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। বার-বার ইচ্ছে করছিল জয়ন্তীকে জিজ্ঞেস করি— কিন্তু আমার রুচি ও ভদ্রতাবোধে আটকাচ্ছিল। জয়ন্তী নিজের থেকেই আমাকে সব কথা বলে, একথাটা ও নিজে থেকেই না বলতে চাইলে— আমার পক্ষে জিজ্ঞেস করা শোভন নয়।

আটা আর ময়দা সমান-সমান মিশিয়ে লেচি পাকাতে-পাকাতে জয়ন্তী বললো, অংশুদা, আপনাকে আর একটা কাজ করে দিতে হবে। ইলেকট্রিক কোম্পানিতে আমি আলাদা মিটার করার জন্যে চিঠি দিয়েছিলুম, ওরা লিখেছে—

আবার কাজ ? কাজ ছাড়া আমার সঙ্গে কোনো কথা নেই ? আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু রুক্ষ স্বরে বললুম, জয়ন্তী, সেদিন তোমাকে কাফে-ডি-মনিকো'তে দেখলুম, সঙ্গে কে ছিল ?

অবাক চোখে জয়ন্তী বললো, আমি ? কবে বলুন তো ?

— সোমবার!

— সোমবার ? না তো ? সোমবার তো কোথাও যাই নি, সেদিন আমার গানের ইস্কুল ছিল!

একবার ভদ্রতার আবরণ চলে গেলে, তখন আর কোনো বাধাই থাকে না। জয়ন্তীকে এই ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার কোনো অধিকার আমার নেই। এরকম ব্যবহার আমার স্বভাবেও কখনো ছিল না। জয়ন্তীও তো হঠাৎ বলে বসতে পারতো, আমি কখন কোথায় কার সঙ্গে গেছি না গেছি, আপনি তার কৈফিয়ত চাইছেন কেন ?

কিন্তু জয়ন্তী তা বললো না। শুধু অস্থির চোখে আমাকে দেখতে লাগলো। আমরা দু'জনেই যেন খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছি, এখন আর কোনো সীমানা নেই। আমি খানিকটা রূঢ়ভাবেই বললাম, চোখে আমি ভুল দেখি নি। তোমাকে আমি দেখলাম—

জয়ন্তী তবুও এড়াতে চেয়ে বললো, কই, মনে পড়ছে না তো! সোমবার তো আমি অফিস থেকে সোজা—

— না, সোমবারই। আমি তোমাকে দেখলাম, তুমি আমাকে দেখতে পাও নি, তোমার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল— সেই যে-দিন খুব বৃষ্টি পড়লো?

— ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! বৃষ্টির দিন তো? আপনি ছিলেন বুঝি? আমাকে ডাকলেন না কেন?

— ছেলেটা কে?

— ও তো আমাদের অফিসের রণবীর দাশগুপ্ত, সেল্‌স রিপ্রেজেনটেটিভ—বিষম নাছোড়বান্দা, রাস্তায় দেখা, বললো, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবেন, চলুন চা খাই— যেতেই হলো বাধ্য হয়ে—

স্পষ্ট বোঝা যায়, জয়ন্তী মিথ্যে কথা বলছে। বাধ্য হয়ে গিয়েছিল? মুখোমুখি না বসে পাশাপাশি বসে নি ওরা? জয়ন্তীর হাসির রঙ কি আমি দেখি নি? প্রথমদিন চা খেতে গেলে কখনো অত ঘনিষ্ঠতা হয়? অফিসে কালো কুঞ্চিত মুখে আবওলা অ্যাকাউন্ট্যান্ট ওর দিকে তাকালে, কিংবা পান চিবুনো মাড়োয়ারি অসভ্য ইঙ্গিত করলে সে-সম্পর্কে আমাকে জানাতে জয়ন্তীর দেরি হয় না। কিন্তু ফুটফুটে চেহারার সেল্‌সম্যান যদি চা খেতে ডাকে—সে সম্পর্কে আমাকে মিথ্যে কথা বলে জয়ন্তী। তার সঙ্গে আড়ালে ফষ্টিনষ্টি করতে ওর আপত্তি নেই।

তবু আমি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলুম। ভদ্রতা-সভ্যতা মানুষের বহুদিনের সংস্কার, হঠাৎ তা বিসর্জন দেওয়া যায় না। নিজের গলার আওয়াজ শুনেই আমার মনে হল, একি বিশ্রীভাবে আমি কথা বলছি! আমি শান্ত হয়ে, মুখে একটা হাসির ছায়া আনার চেষ্টা করে বললুম, ছেলেটিকে তুমি আগে থেকেই চিনতে বুঝি?

জয়ন্তী বললো, না, মানে, বুঝলেন, ও একেবারে ছেলেমানুষ! কী করে যে চাকরি করে? গল্প করতে শুরু করলে আর থামে না!

— ছেলেটির চেহারা কিন্তু বেশ সুন্দর!

জয়ন্তীর মুখখানা কি একটু আরক্ত হলো? মুহূর্তের জন্য ও কি অন্যমনস্ক হয়ে গেল না!

— ও কিন্তু অফিসে আমার কাজের অনেক সুবিধে করে দেয়।

— তাই বুঝি?

— ওদের ট্যুর রিপোর্ট আমাকেই তৈরি করতে হয় তো, ওরটা ও নিজেই টাইপ করে একেবারে তৈরি করে আনে। তারপর বলে, আপনার কাজ কমিয়ে দিলুম, আসুন এখন গল্প করা যাক! এমনিতে খুব ভদ্র—

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জয়ন্তী আমার কাছে অনেক কিছু লুকোচ্ছে। ওর মুখে ফুটেছে অপরাধীর ছাপ। শুধু একসঙ্গে বসে চা খাওয়াতেই ওদের সম্পর্ক শেষ হয় নি। আমার কাছে এত ব্যাখ্যা করে বলছেই বা কেন জয়ন্তী? আমার সামনেই শুধু সতীসাধ্বী সেজে সম্মান আদায় করতে চায়। আমি একটা ভারবাহী পশু? আমি শুধু ওর জন্যে কাজ করে যাবো, দায়িত্ব পালন করবো, তার বদলে শুধু একটু কৃতজ্ঞতার হাসি! কেন, আমিই বা আমার দাম নেবো না কেন? আমি জয়ন্তীর জন্যে এত করছি, ও কখনো কোনো প্রতিদান দিয়েছে?

আমি আর কিছুই বললাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগালাম নিঃশব্দে। জয়ন্তী ত্রাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, ও কী করছেন? আমি কোনো উত্তর দিলাম না। এগিয়ে

মাটিতে নিচু হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে জয়ন্তীকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললাম, জয়ন্তী, আমি তোমাকে চাই।

আমার পূর্ব-জীবনের সেখানেই শেষ। সমস্ত সুকৃতি আমি সেদিন তুচ্ছ করলাম। আমার মধ্যেও যে একটা পশু ছিল, আমি নিজেই জানতাম না। 'তোমাকে চাই' একথা বলার সময় আমি সম্পূর্ণ হৃদয়হীন ছিলাম, চেয়েছিলাম শুধু একটা শরীর।

জয়ন্তী বাধা দেবার খুব চেষ্টা করেছিল। ওর দু'হাতে তখনও ময়দা মাখা, চেঁচায় নি, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে আমাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেছিল, আমি শক্ত হাতে ওকে আঁকড়ে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছি। পায়ের ধাক্কায় স্টোভটা উল্টে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে জ্বলতে লাগলো, তাও গ্রাহ্য করি নি।

এক হাতে জয়ন্তীর দু'হাত চেপে ধরে অন্য হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি ওর ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারটা ছেঁড়া শক্ত বলে টেনে নামিয়ে দিয়ে ওর পুরন্ত কেঁপে-কেঁপে ওঠা স্তনে রেখেছি মুখ। আমার ভিতরের বহুদিনের তৃষ্ণার্ত বুভুক্ষু একটা প্রাণী যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আমি শুষে নিতে চাইছিলাম জয়ন্তীর প্রাণরস। ছটফটিয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে জয়ন্তী বলছিল, না, না, না, অংশুদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন! গ্রাহ্য করি নি। আমি জয়ন্তীর সমগ্র শরীরটা আমার বুকে পিষে ফেলতে চাইছিলাম, এটাও টের পাচ্ছিলাম যে এত বাধা দেওয়া সত্ত্বেও জয়ন্তীর শরীর ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

সারা মেঝেতে গড়িয়ে-গড়িয়ে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছিলো। আমার হাত থেকে প্রাণপণে ছাড়া পাবার চেষ্টা করেছিল জয়ন্তী, কিন্তু আমার শরীরে তখন অসুরের শক্তি। আমি দুই হাঁটু দিয়ে জয়ন্তীর হাত দুটো মাটির সঙ্গে চেপে ধরে ওর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি ঐ ছেলেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই—

জয়ন্তী কেঁদে ফেলে বলেছিল, না, না, ছিঃ ছিঃ, ও কী কথা বলছেন, ওসব কিছু না, দয়া করে আমাকে— অংশুদা, ছেড়ে দিন আমায়, এক্ষুনি বাবলু এসে পড়বে—

আমি বলেছিলাম, মিথ্যে কথা বলছো! এখনো মিথ্যে কথা? আমি জানি, তুমি ঐ ছেলেটির সঙ্গে—

— না, না, ছাড়ুন, ছাড়ুন আমায়, লাগছে আমার— সত্যি কথা বলছি আপনাকে, ও শুধু একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চেয়েছিল।

— কেন বল নি সে-কথা আমাকে? মিথ্যেবাদী!

— ভুলে গিয়েছিলাম, আমার দোষ হয়েছিল।

— জয়ন্তী, আমি তোমাকে চাই! আমি তোমাকে চাই!

— না, না, ছেড়ে দিন আমায়।

ছেড়ে দেওয়ার বদলে আমি ওর ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। মনে-মনে আমি গর্জন করছিলাম, অন্য কেউ যদি তোমায় নিতে পারে— তাহলে আমিই বা তোমায় ছেড়ে দেবো কেন? আমি কেন হারবো? আমিও কি যুদ্ধক্ষেত্রে নামি নি?

স্টোভের তেল মাটিতে গড়িয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছিল, একটুর জন্যে সেই আগুনে আমার পা পোড়ে নি। আমার শরীরে আগুনের তেজও কম ছিল না।

সব হয়ে গেলে, জয়ন্তী কিছুক্ষণ কাঁদলো। আমার হাত জড়িয়ে ধরে আপ্লুতভাবে বলতে লাগলো, এ আপনি কী করলেন? আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম এত! কেন আপনি—

আমি ওকে ফিসফিস করে বললাম, জয়ন্তী, আমি তোমার শ্রদ্ধা চাই নি! আমি তোমার বন্ধুত্ব চেয়েছিলুম। তুমি তা দাও নি, তুমি আমাকে ঠকিয়েছো।

— আপনাকে ঠকিয়েছি ? কোনোদিন স্বপ্নেও আপনাকে ঠকাবার কথা ভাবি নি!

— ও কথা যাক। জয়ন্তী, এখন থেকে আমরা আবার বন্ধু হতে পারি না ? এখন আমাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, এখন আমরা পৃথিবীর সবকিছু জানি। এখন আমরা কতকগুলো সহজ-সরল সত্যি কথাকে কিছুতেই এড়িয়ে থাকতে পারি না— তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই যদি দেখা হয়— তাহলে আমাদের এক ধরনের আকর্ষণ বোধ হবেই। এটা প্রকৃতির দাবি— এটাকে অস্বীকার করলে...

জয়ন্তী আমার একটা কথাও শুনছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আবার ওর চোখ জলে ভরে গেল। বললো, না, না, কেন আপনি... যদি কিছু হয়ে-টয়ে যায়, আমার কী সর্বনাশ হবে—

আমি ওকে হালকাভাবে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম, না, কোনো ভয় নেই। কোনো ভয় নেই। আমি তো আছিই।

মনে-মনে তাচ্ছিল্যভরে বললুম, কিছু হয়ে-টয়ে গেলে কী আর এমন সর্বনাশ হবে ? অ্যাবরশান করবার ব্যবস্থা করে দেবো— আজকাল ওসবের কত জায়গা আছে!

জয়ন্তী খানিকটা বিমূঢ় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আমার মুখ থেকে এ ধরনের নির্মম রুক্ষ কথা শুনবে, ও যে সেটা কল্পনাও করতে পারে নি। আমার নিজের কানেই আমার গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ অচেনা মনে হচ্ছিলো। কিন্তু একটুও অনুতাপ বোধ জাগে নি আমার।

একমাস অপেক্ষা করলাম। এর মধ্যে কিছু হয়-টয় কিনা। কিছুই হলো না। একমাস বাদে প্রস্তুত হয়ে গিয়ে আবার জয়ন্তীকে আমি আক্রমণ করলাম। সেবারও জয়ন্তী বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে শরীরও তপ্ত হয়েছে— আমি লোভীর মতন হেসে ওর নাভিতে জিভ ছুঁইয়েছি। সে মাসেই জয়ন্তীকে আমি একটা নতুন গানের টিউশানি যোগাড় করে দিয়েছি— ওর দেড়শো টাকা আয় বাড়লো, আমি তার মূল্য নেবো না ? আজকাল মানুষ সামান্য দাবিও ছাড়ে না, কেউ কিছু ছাড়ে না, আমিও নিয়মিত জয়ন্তীর কাছ থেকে মূল্য আদায় করেছি।

তা বলে অবশ্য এই নয় যে, জয়ন্তীর আমি যা যা উপকার করেছি, তার মূল্য ওর শরীর থেকে নিয়েছি। কিংবা আমাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে নিছক দেওয়া-নেওয়ার। আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরি, মার্জিত ভাষায় কথা বলি, মধ্যবিত্ত মানসিকতা আমাদের প্রতি স্নায়ুতে— আমরা নারী-পুরুষের এ ধরনের সম্পর্কের কথা কল্পনাই করতে পারি না।

সুতরাং ব্যাপারটাকে একটা আবরু দেবার জন্য আমরা পরস্পর প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে গেলাম। যদিও আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে, জয়ন্তী আমাকে একটুও ভালবাসে না, তবু জয়ন্তী প্রায়ই আমার কাছে ভালবাসার কথা বলে। আমাকে বাদ দিয়ে জয়ন্তীর পক্ষে বাঁচা ঠিক সম্ভব ছিল না। কিংবা বাঁচা হয়তো সম্ভব ছিল, তবে খুব সম্মানজনকভাবে নয়।

আমি টের পেয়েছিলাম, সেই সেল্‌সম্যান, ছোকরার সঙ্গে জয়ন্তী এরপরেও আমাকে লুকিয়ে দেখা করে, কিন্তু সেই ছোকরা বিয়ে করার ব্যাপারে খুব উৎসাহী নয়। আমিও জয়ন্তীকে আদর করার সময় বানিয়ে-বানিয়ে ভালবাসার কথা বলতাম। ওকে বলেছিলাম, এতদিন আমার জীবনের ঠিক নারীকে চিনতে না পেরে আমি শুধু কষ্টই পেয়েছি। আর আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

জয়ন্তীর বাড়িতেই নবনীতার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল আমার। একসময় জয়ন্তী আর নবনীতার মধ্যে গোপন কিছুই ছিল না, দু'জনে দু'জনের সব কথাই বলতো। এখনো কী তা বলে ? জয়ন্তী কি আমার কথাও নবনীতাকে বলতে পেরেছে ? কী জানি, ঠিক জানি না।

জয়ন্তীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম আমি, নবনীতা উঠছিল। মিহির আসে নি সঙ্গে, বাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে এসেছে। নবনীতাকে দেখেই এক পলকের জন্য আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গেল ! ছেলেমানুষদের এরকম হয়— কিন্তু আমার বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে, কত চাঁছাছোলা হয়ে গেছি— তবু সেই সময়টায় ছেলেমানুষ হয়ে গেলাম। নবনীতার সঙ্গে সামান্য মৌখিক ভদ্রতা করে কথা বলতেও পারলুম না। নবনীতা কিন্তু বেশ স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলো, অংশুদা, তুমি কেমন আছো ? খুব রোগা হয়ে গেছো কিন্তু!

তবু আমি উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে নেমে গেছি। বড্ডই ছেলেমানুষি করেছিলুম। নবনীতার বিয়ে হবার পরও আমি ভেবেছিলাম— মিহিরের সঙ্গে যদি ওর বিচ্ছেদ হয়, নবনীতা যদি আমার কাছে আবার ফিরে আসে, আমি আবার ওকে বুকে জড়িয়ে রাখবো। নবনীতার মতন মেয়েদের কোনো দোষ স্পর্শ করে না, ওরা দেবীর মতন! কিন্তু মনের যে পবিত্রতা থাকলে কোনো নারীকে দেবী ভাবা যায়, আমি সে পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছি। আমি আর তার স্মৃতি ধরে রাখারও যোগ্য নই।

না, এখনো আমি আমার পাপের কথাটা বলি নি। সেটা গোপন করে যাচ্ছিলাম, বলার সাহস পাই নি।

এখন কত রাত, তাও জানি না। দুটো–তিনটের কম নয় নিশ্চয়ই। ডায়েরির তারিখ পালটে যাওয়া উচিত। কেন ঝোঁকের মাথায় এরকম পাতার পর পাতা লিখছি? আমার জীবনের এইসব কথা শুনে কার কি লাভ হবে ? একটা কোনো মহৎ দৃষ্টান্ত নেই, শুধু ব্যর্থতা। একটা শুধু ক্ষীণ আশা এই, যদি কখনো কেউ এটা পড়ে, তাহলে আমার ভুলগুলো দেখে সে যেন নিজের ভুলগুলো শুধরে নেয়। আমি সৎ ও সুন্দর জীবন পেতে চেয়েছিলাম, পাই নি। পরের যুগের ছেলেমেয়েরা যেন পায়।

কিন্তু যেটা আমাকে বলতেই হবে— এ পর্যন্ত জয়ন্তীর সঙ্গে কী পাপ করেছি ? কিছুই না! জোর করে জয়ন্তীকে শারীরিক মিলনে বাধ্য করার মধ্যে তেমন কিছু অন্যায় নেই। জয়ন্তী মনে–মনে এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল, সেইদিকে ও এগোচ্ছিল। আমার সঙ্গে না হোক, অন্য কারুর সঙ্গে। সচেতনভাবে না হোক, অবচেতনে। এই ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছি, শরীরকে যারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে, জয়ন্তী সে জাতের মেয়ে মোটেই নয়। অরূপের স্মৃতি ওর মনে আর কাঁটা বেঁধায় না। আমি ওকে আকারে–ইঙ্গিতে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তাতে তখন রাজি হয় নি, আমার কাছে একজন স্বাধীন সাধ্বী রমণীর ছবি ফোটাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জয়ন্তী এগোচ্ছিল অন্যদিকে। আমাদের মধ্যে যে একটা অব্যক্ত চুক্তি ছিল— তুমি যদি ভালো থাকো, তাহলে আমিও ভালো থাকবো— জয়ন্তী নিজেই সে চুক্তি ভেঙেছে। সেদিন রেস্টুরেন্টের কেবিনে যুবকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকার ভঙ্গি ও জয়ন্তীর মুখের হাসি দেখে আমি নির্ভুলভাবে বুঝেছিলাম, আমি যদি না নিই, তাহলে জয়ন্তীকে অন্য কেউ নেবে। তাহলে শুধু–শুধু আমি বঞ্চিত হবো কেন ? কেন আমি জয়ন্তীকে অন্যের হাতে তুলে দেবো ? সেটাই তাহলে হতো আমার কাপুরুষতা ও পরাজয়। সেটাই অন্যায়। আমি কোনো অন্যায় করি নি।

এক রবিবার দুপুরবেলা আমি জয়ন্তীর ফ্ল্যাটে গেছি। দারুণ বৃষ্টি সেদিন, দুপুরবেলা খেয়ে ওঠার পর এক মুহূর্তও আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। বৃষ্টিতে ভিজেই চলে এলাম জয়ন্তীর কাছে। দরজায় ধাক্কা দেবার বেশ কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্তী এসে দরজা খুললো। আলুথালু পোশাক, জয়ন্তী ঘুমোচ্ছিল। আজকাল স্বাস্থ্য আরও ভালো হয়েছে জয়ন্তীর, ঘুম–মাখানো ঈষৎ ফোলাফোলা মুখ, পিঠে ছড়ানো একরাশ চুল, পাতলা শাড়ি ফুঁড়ে উঠেছে লাল ব্লাউজ–পরা ভরাট

বুক— অসম্ভব ভালো দেখাচ্ছিল ওকে। আমার শরীর খানিকটা কেঁপে উঠলো।

ইদানীং জয়ন্তী আমাকে দেখলে খানিকটা ভয়, খানিকটা খুশি মেশানো এক বিচিত্র ভঙ্গি করে। সেদিন বললো, একি, এই বৃষ্টির মধ্যে এলে ? একেবারে ভিজে গেছো দেখছি। মাথাটা মুছে ফেলো তাড়াতাড়ি! একেই তো তোমার গলা ব্যথা আর সর্দির ধাত।

ফিসফিস করে কথা বলছিল জয়ন্তী। খাটের ওপর বাবলু ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগাতে চায় না। ঐ বৃষ্টির মধ্যেও বাবলুর জন্য চকলেট কিনে এনেছিলাম আমি, ওতে আমার কোনোদিন ভুল হয় না। সেগুলো পকেট থেকে বার করে রাখলাম। রুমালটাও ভিজে জবজবে— সেটা দিয়ে মাথা মোছা যায় না, জয়ন্তী একটা শুকনো তোয়ালে এনে নিজেই আমার মাথা মুছে দিল। শার্টটাও খুলে ফেললাম।

বাবলু খাটে ঘুমোচ্ছে, সুতরাং আমি মাটিতে বসে জয়ন্তীকে ইশারা করলাম পাশে বসতে। জয়ন্তী একটু দূরে বসলো। আমি হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত ধরতে যেতেই জয়ন্তী বাবলুকে দেখিয়ে বললো, এই, এখন ওসব কিছু না! বাবলু রয়েছে!

আজকাল কাজের কথা অনেক কমে গেছে, এখন দেখা হলে দু'জনে অনেক গল্প করি। শরীরের ব্যবধান একবার ঘুচে গেলে সবকিছুই সহজ হয়ে যায়। এখন জয়ন্তীও অরূপের কথা বলে, আমিও বলি নবনীতার কথা। নবনীতার নিন্দে করার সুযোগ পেলে আমি আর ছাড়ি না। নবনীতা যে জয়ন্তীর চেয়ে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই, এটা বোঝাবার জন্য মিহিরের নানা কীর্তি–কাহিনী আমি ফাঁস করে দিই জয়ন্তীর কাছে। প্রমাণ করবার চেষ্টা করি যে, নবনীতার স্বামী মিহির একটা অতি পাষণ্ড, নবনীতার জীবন ও দুর্বিষহ করে দেবে। কত কাপুরুষ ও নিচ হয়ে গেছি আজকাল, আড়ালে নিন্দে করাও শুরু করেছি।

কিন্তু সেদিন তেমন জমলো না। ফিসফিস করে কথা বললে গল্প জমে না।

দু'চারটে কথা বলার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আমি জয়ন্তীর সঙ্গে খুনসুটি শুরু করলাম। জয়ন্তীর ছড়ানো পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দিতে জয়ন্তী পা সরিয়ে নিল। আমি একটু এগিয়ে বসে জয়ন্তীর উরুতে হাত রাখতে যেতেই ও ত্রস্তে আবার বাবলুকে দেখিয়ে চোখ দিয়ে আমাকে ধমকালো। আমি তখন ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত সরিয়ে এনে আবার ঝপ করে ওর মুখখানা টেনে এনেই একটা চুমু দিলাম। মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে জয়ন্তী বললো, কী করছ কি ? একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই ?

আমি নিচু গলায় হেসে বললুম, বাবলু যা ঘুমোচ্ছে, ও জাগবে না।

খুনসুটি করতে–করতে দু'জনেই কখন উত্তেজিত হয়ে পড়েছি, টের পাই নি। জয়ন্তীর শরীর আবার উষ্ণ হয়ে এসেছে। আমার চোখের দু'কোণ আর কানের পাশটা ঝাঁ–ঝাঁ করছে। জয়ন্তীকে জোর করে শুইয়ে ফেলে একটা চুমু খাবার সময় জয়ন্তী বাধা দিল না, কিন্তু সঙ্গে–সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, এই, কী হচ্ছে কি ? লক্ষ্মীটি, এখন ওসব না— বাবলু যদি হঠাৎ উঠে পড়ে—।

আমিও ব্যাপারটা অনুভব করে বললুম, আচ্ছা, আচ্ছা, না, আর কিছু না।

আবার গোড়া থেকে শুরু হলো। আবার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি, উরুতে হাত, আলটপকা চুমু, মাঝে-মাঝে বাবলুর দিকে ফিরে দেখে আর একটা ছোটোখাটো অসভ্যতা। তারপর, মাতাল যেমন মদ খেতে-খেতে হঠাৎ কোনো একটা সময় থেকে সবকিছু ভুলে যায়, আমিও, কিংবা বলা যায়—আমি আর জয়ন্তী দু'জনেই—কোনো একটা সময়ে বাবলুর কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলুম।

জয়ন্তী অবশ্য বাধা দিয়েছিল, অন্যদিন যেমন দেয়, বাবলুর কথাও বলেছিল, কিন্তু তত তীব্র

ছিল কি তার বাধা ! তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছে থাকলে কি আমি কিছু করতে পারতুম ? কিংবা, মায়ের সহজাত হিসেব অনুযায়ী সে জানতো, বাবলুর তখন ঘুম ভাঙার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সব মায়েরাই জানে, ছেলে কতক্ষণ ঘুমোবে, কখন জাগবে। আমিও জানতুম, বাবলু সাধারণত বিকেল চারটের আগে ওঠে না। জয়ন্তী আপত্তি করছিল, কিন্তু উঠে যায় নি আমার পাশ থেকে। আমিও জয়ন্তীর লাল ব্লাউজটা খোলার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলুম, তারপর আর থামা যায় নি।

মাঝপথে, কিছু একটা শব্দ পেয়ে জয়ন্তী আর আমি দু'জনেই খাটের দিকে তাকিয়েছি। বাবলু ঘুম ভেঙে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তখনও তার দু'চোখে ঘুম-ঘোর, যেন স্বপ্ন দেখছে— এরকম বিস্ময় ভরা দৃষ্টি। মুহূর্তে শাড়িটা গুটিয়ে নিয়ে সরে গেল জয়ন্তী, আমিও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

জয়ন্তীর ফ্ল্যাটটার ঘর মাত্র দেড়খানা। ছোটো ঘরটা ভাঁড়ারের, বুড়ি ঝিটা শোয় ওখানে। সেদিন অবশ্য ঝি ছিল না, কিন্তু পাশের ঘরে যাবার কথা জয়ন্তী একবারও বলে নি। সেদিন বরং জয়ন্তী একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল। আমার কাছে আদর নিতে-নিতেই ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, অংশুদা, আপনি আমাকে এই পাপের মধ্যে কেন টেনে নিয়ে এলেন ! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পাপ ? তুমি আবার ওসবে বিশ্বাস কর না কি ? ও বললো, আগে করতাম না, এখন করি। মনে হয় আমার সারা শরীরটা নোংরা। অথচ, এর থেকে মুক্তি নিতেও পারি না। আপনি কেন আমাকে এমন করলেন ?

আমি বললাম, জয়ন্তী, আমাকে তোমার একটুও ভালো লাগে না ? জয়ন্তী তীব্র স্বরে বললো, আপনাকে দারুণ ভালো লাগে, আপনাকে দারুণ ঘেন্না হয়। ইচ্ছে করে, আপনাকে খুন করে আপনার পাথরের মূর্তি গড়িয়ে পুজো করি। কিন্তু তা তো পারবো না। তাই আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে।

কথায়-কথায় বাবলুর কথা আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবলু হঠাৎ জেগে উঠে বড়-বড় চোখ করে চেয়ে রইলো।

কী করবো ঠিক বুঝতে পারছিলুম না, টেবিল থেকে চকোলেটগুলো মুঠো করে নিয়ে বাবলুর হাতে গুঁজে দিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললাম, এই নাও, এগুলো আজ অন্যরকম—। ক্ষীণভাবে মনে হচ্ছিলো, বাবলু হয়তো ঘুম-চোখে কিছু বুঝতে পারে নি। চকোলেটগুলো হাতে নিয়ে বাবলু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে— একটা কথাও বলে নি।

আর কিছু একটা করা দরকার— এই ভেবে ছটফট করে আমি হঠাৎ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে বললাম, বাবলু, আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনবে ? লক্ষ্মীটি, ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো, তারপর তোমাকে ভালো-ভালো গল্প বলবো। বেড়াতে নিয়ে যাবো আজ, যাও এক দৌড়ে—

আমি বাবলুর হাত ধরে টানলাম। বাবলু নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো, একবার মায়ের দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে-তাকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অসমাপ্ত বাসনা বড় সাঙ্ঘাতিক, তখন ন্যায়, ধর্ম, বিবেক— এই পৃথিবী— কিছুর কথাই মনে থাকে না। বাবলু জেগে উঠতে যে চরম অপ্রস্তুত হয়েছিলুম, বাবলু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সেটা দূর হয়ে অসমাপ্ত বাসনা আবার ফিরে এলো। দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে আমি জয়ন্তীর কাছে ফিরে এসে বললাম, ও কিছু বুঝতে পারে নি—

জয়ন্তী তখন চোখের জলে ভাসছিল, বাধা দিল না, আপত্তি করলো না, আমার আকর্ষণে যন্ত্রের মতন আবার শুয়ে পড়লো, কাঁদতে-কাঁদতেই জড়িয়ে ধরলো এবং একসময় আমার কাঁধটা

কামড়ে ধরলো ভয়ঙ্করভাবে।

খেয়াল করি নি, বৃষ্টি তখনও থামে নি। বৃষ্টির মধ্যেই বাবলুকে বাইরে পাঠিয়েছি। সব শেষ হবার পর— এসব খেয়ালই ফিরে আসে। ফিরে আসে বিবেক ও লজ্জাবোধ। পাশে যে ছোটো ঘরটা আছে, যদি সে ঘরটায়ও যেতাম— কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, তখন কোনো কিছুই মনে থাকে না।

জয়ন্তী বসেছিল নিঝুমভাবে, হাঁটুতে থুতনি ভর দিয়ে। আমার মনে হলো, ওকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। আমি তেলতেলে হাসিমাখা মুখে ওকে বললুম, তোমার ছেলে কিছু দেখতে পায় নি, টেবিলটা ছিল এপাশে—।

জয়ন্তী আমার একথার কোনো মূল্যই দিল না। অদ্ভুত ধরনের শুকনো গলায় বললো, আপনাকে যে পাপের কথা বলছিলুম, আজ থেকে শুরু হলো তার প্রতিফল। যতদিন না আত্মহত্যা করবো, ততদিন আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে মারবে আমি জানি।

— ও কী জয়ন্তী, তুমি এভাবে ভাবছো কেন?

জয়ন্তী তীক্ষ্ণ গলায় পাগলাটেভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, আমার ছেলে কোথায়? তাকে আপনি কোথায় পাঠিয়েছেন?

— তাই তো। বাবলুকে তো সিগারেট কিনতে পাঠিয়েছিলুম!

তাড়াতাড়ি উঠে ছিকটিনি খুললাম। দরজার পাশেই বাবলু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে। কী করুণ ওর সেই বসে থাকার ভঙ্গি! ওকে সেই অবস্থায় দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। বাবলু সিগারেট আনতে যায় নি, ওখানেই বসে আছে আগাগোড়া।

আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, বাবলু! বাবলু! এখানে বসে আছো কেন? ওঠো!

বাবলু যন্ত্রের মতন উঠে দাঁড়ালো, চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। আমি বললাম, এসো, ঘরে এসো! বৃষ্টির জন্য যেতে পার নি বুঝি? থাক, তোমায় যেতে হবে না!

বাবলু এবারও কোনো কথা বললো না। তার শিশু হৃদয়ে কোথাও যেন একটা আঘাত লেগে সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেছে। ওর সেই নির্বাক ভাবলেশহীন মুখ দেখে আমার বুকটা কাঁপতে লাগলো। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে দেখতে পেলে মানুষের যে-রকম ভয় পাওয়ার কথা, বাবলুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমারও সে-রকম ভয় হচ্ছিলো।

বাবলুর দু'হাতে তখনও আমার দেওয়া কয়েকটা চকোলেট। সাধারণত চকোলেট খেতে ও দারুণ ভালোবাসে, সেদিন একটাও খায় নি তখনও, হঠাৎ একসময় তার হাতের ফাঁক দিয়ে ঝরঝর করে খসে পড়ল। ও সেগুলো ইচ্ছে করে ফেলে নি, এমনিই যেন পড়ে গেল, কিন্তু ও সেগুলো আর তোলার চেষ্টা করল না মাটি থেকে।

সাত বছর বয়েস বাবলুর। ঐ বয়েসে ও কী বুঝেছে, কতখানি বুঝেছে জানি না। কিন্তু সাত বছরের স্মৃতি সহজে মোছে না। বড় হয়ে একদিন বাবলু সব বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই। তখন সে হয়তো তার মাকেও ক্ষমা করবে। সে ভাববে, তার মাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে আমি সুযোগ নিয়েছি কিংবা অত্যাচার করেছি। বাবলু আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। আমাকে হয়তো খুন করতে চাইবে। এই আমাকে।

সেই আমি। যে আমি একদিন টুনি পিসীর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। টুনি পিসীর সর্বনাশ যে করেছে, আমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার আর কোনো অধিকার নেই। সে আর আমি তো একই লোক। সেই আমি, কী করে এমন বদলে গেলাম?

১৮

২১শে মার্চ, ১৯৬৬

দাদার ছেলে সানুকেও আমি খুব ভালবাসতুম। আমি যতক্ষণ বাড়ি থাকি সানু এসে আমার ঘরে ঘুরঘুর করে। আমি ওকে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিয়েছি, বই কিনে দিয়েছি, দু'হাতে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে আদর করেছি। আজকাল সানু ঘরে এলে ধমকে বিদায় করে দিই। মুখ-ঝামটা দিয়ে বলি, আবার এসেছিস ? খালি সব জিনিসপত্তরে হাত দেওয়া। যা, নিজের ঘরে যা, কিংবা ছাদে যা ! পয়সা দেবো ? এই বয়েসেই অত পয়সার লোভ কেন রে ?

বৌদিকেও ডেকে রাগের সঙ্গে বলেছি, বৌদি, তোমার নিজের ছেলেকে সামলাতে পারো না ! খালি আমার ঘরে এসে জিনিসপত্র নষ্ট করে ! — বৌদি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছেন : তারপর বললেন, তুমিই তো আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছো ! তুমিই তো যখন-তখন ওকে পয়সা দাও !

আমি বলেছি, পয়সা দিই, না পয়সা চুরি করে ? যখন-তখন এসে আমার কাগজপত্র ঘাঁটে!

বৌদি গর্জন করে উঠলেন, কী ? পয়সা চুরি করে ? এই প্রথম শুনলাম। এই হতভাগা ছেলে, এই—।

বৌদি দুমদাম করে মারতে লাগলেন সানুকে। সানু দৌড়ে এসে আমাকেই জড়িয়ে ধরল। আগে আমি ওকে অনেকবার মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছি—ও সেই ভরসায় আমার কাছে এসেছিল। এবার আমি ওকে জোর করে ছাড়িয়ে ফের বৌদির হাতে তুলে দিয়ে বললাম, আর কোনোদিন আমার ঘরে এসে ডিসটার্ব করবি না !

সেদিন বাবলুকে দরজার বাইরে হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঐরকম বসে থাকতে দেখে আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লেগেছে। সেই থেকে আমি আর কোনো ছোটো ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারি না, ছোটো ছেলের কথা শুনতে পারি না পর্যন্ত।

অফিসে আমার আর্দালি ভজন সিং একবার যদি ছুটি নিয়ে দেশে যায়, আর সহজে আসতে চায় না। বিনা দরখাস্তে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছুটি নিয়ে বসে থাকে। এবার সেরকম করায় ক্যাশ সেকশানে আমি বলে রেখেছিলাম, ওর মাইনে কেটে নিতে। ফিরে এসে, সেই নিয়ে ভজন সিং এসেছিল আমার কাছে দরবার করতে। কাঁচুমাচুভাবে বলছিল, হুজুর, সব তলব কাট লিয়া, ঘর মে বালবাচ্চা হ্যায়—।

আমি ধমক দিয়ে বলেছি, যা-যা, মাইনে কেটেছে বেশ করেছে ! দেশে গেলে আর ফেরার নাম নেই—।

— নেহি হুজুর, হামারা লেড়কাকো বোখার হুয়া—।

— ভাগ্ ! কিছু হলেই লেড়কার বোখার কিংবা জরুর বোখার ! এসব আমার জানা আছে ! এরপর ওরকম করলে চাকরিই চলে যাবে !

ভজন সিং তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগলো, এবার সত্যিই ওর ছেলের খুব শক্ত অসুখ করেছিল, টাইফয়েড, বাঁচার আশা ছিল না, অতিকষ্টে বেঁচেছে, ভগবানের আশীর্বাদে।

কিন্তু এসব শুনে আমার মায়া হচ্ছিলো না। আমি ধমকে বললাম, যা, এখন যা, বিরক্ত করিস না। তোর ছেলের অসুখ করেছে তো আমি কী করবো ? সেই জন্যে অফিসের কাজকর্ম বন্ধ থাকবে ?

আমার জ্যাঠতুতো ভাই বিপুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বিপুল একদিন আমাকে বলেছিল, বুঝলে মেজদা, একটা জেনারেশান তৈরি হচ্ছে— যারা এই পচা-গলা সমাজকে ঝাড়েবংশে একেবারে খতম করে দেবে ! তোমরাও বাদ যাবে না। তোমরাও তো বুর্জোয়া জীবন-যাত্রা আর আমলাতন্ত্রকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করছো !

আমি বলেছিলাম, বিপুল, তারা কি শুধু খতমই করবে সবকিছু, না কিছু তৈরিও করবে ?

বিপুল বলেছিল, আগে জঞ্জাল সাফ না করলে নতুন কিছু তৈরি করা যায় না। জঞ্জালেই সমাজটা ভরে গেছে। তার মধ্যে তোমরাও আছো। মানে, আমি ঠিক তোমাকে বলছি না— কিন্তু আমাদের বাবা-কাকা শ্রেণীর যারা, তারা আমাদের কত মিথ্যে কথা শিখিয়েছে। তারা আমাদের বলেছে সৎ হতে, সত্যবাদী হতে— আর তারা নিজেরা ? তারা তো চুরি জোচ্চুরি নোংরামিতে দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছে। তারা যদি নিজেরাও সৎ হতো, তাহলে আজ দেশের এই অবস্থা হতো ?

হয়তো বিপুল ঠিকই বলে। এখনকার বাচ্চা ছেলেরা বড় হয়ে আমাদের একেবারে খতম করে দেবে। দিক। আমার আপত্তি নেই। আমি প্রতীক্ষায় আছি।

১৯

২২শে মার্চ, ১৯৬৬

জয়ন্তীর কাছে তারপর আর দিন পনেরো যাই নি। সেদিনকার সেই ঘটনায় আমি প্রচণ্ড রকম একটা ধাক্কা খেয়েছিলুম, আমার মনে হয়েছিল, আমি আর কোনোদিন জয়ন্তীর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবো না। জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি সেদিন আমার মর্মভেদ করে দিয়েছিল। তার ফলেই একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বোধহয়। জয়ন্তীর প্রতি আমার আগ্রহ হঠাৎ কমে গেল। একসময় আমার মধ্যে যে পশুটা জেগেছিল, সে কোথায় আবার মিলিয়ে গেল, জয়ন্তীর শরীরের প্রতি আমার আর আকর্ষণই রইলো না। এখন আমার কাছে জয়ন্তী আর কোনো নারী নয়, সে শুধু বাবলুর মা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, জয়ন্তীই কিন্তু দিন-দশেকের মধ্যে আমার খোঁজ নিয়েছিল। আমি জয়ন্তীকে সুযোগ দিয়েছিলুম, জয়ন্তী যদি ওর জীবনের এই লজ্জাময় অংশটা মুছে ফেলে আমাকে এড়াতে চায়— আমি ওকে আর কখনো বাধা দেবো না। আর যাই হোক, আমি মনে-মনে সত্যিই চাইতাম, ও যেন জীবনে সুখ পায়। তা সে সুখের চেহারা যেমনই হোক না, সুখ নামে ও যা বেছে নিতে চায়— সেটাই ওর পাওয়া উচিত। আমার কাছ থেকে ও শুধু গ্লানিই পেয়েছে।

কিন্তু জয়ন্তী যেন ধরেই নিয়েছিল, আমি ওর নিয়তি। আমাকে এড়ানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। জয়ন্তী সম্ভবত অনুমান করেছিল, যে উপায়ে আমি ওর চাকরিটা করে দিয়েছি, সেই একই উপায়ে আমি ওর চাকরিটা খেয়েও দিতে পারি। আমাকে এতটা নিচ ভাবা জয়ন্তীর পক্ষে আর আশ্চর্য কী ! আমি লক্ষ করে দেখেছি, চাকরি জিনিসটা ছেলেদের চেয়েও মেয়েরা বেশি ভালবাসে। ছেলেরা অনেক সময় আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে ঝোঁকের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিতে পারে, মেয়েরা অত সহজে পারে না। কিংবা হয়তো ছেলে আর মেয়েদের কাছে আত্মসম্মানের সংজ্ঞাটাই আলাদা। তা তো হতেই পারে; সত্য জিনিসটাও যেমন স্থির ও অবিচল কিছু নয়, এক একজন মানুষের জীবনে তার রূপ এক-একরকম।

জয়ন্তী টেলিফোনে ডাকার পরও আমি ওর বাড়িতে যাই নি অবশ্য। এসপ্ল্যানেডে একটা চায়ের দোকানে দেখা করেছিলাম। জয়ন্তী একটু গম্ভীর, কিন্তু আর কোনো পরিবর্তন হয় নি,

সেদিনকার ব্যাপার উল্লেখও করলো না। শুধু একবার বললো, অংশুদা, তুমি আমার ওপরে রাগ কর নি তো ? আমি একটা জিনিস খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি, তোমাকে ছাড়া আমার আর চলবে না।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন ?

— কী জানি ! কিন্তু তোমাকে কয়েকদিন না দেখলেই আমার কীরকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগে ! তুমি ক'দিন আসো নি, আমার মনে হয়েছিল, তুমি বোধ হয় খুব রাগ করেছো।

— আমি রাগ করবো কেন ? রাগ করার কথা তো তোমারই !

— আমি ? অংশুদা, আমি বড় দুর্বল ! তুমি আমাকে ছেড়ে কখনো দূরে সরে যাবে না, কথা দাও ?

সেদিন জয়ন্তীর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আন্তরিকভাবে, প্রতিটা কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলছিল জয়ন্তী। রেস্টুরেন্টের টেবিলে পড়ে-থাকা আমার হাতের ওপর ওর হাত রেখেছিল। এ তো রীতিমতন প্রেম নিবেদন ! এতদিন পরে, সেদিনের ঐ কেলেঙ্কারির পর— জয়ন্তী বলছে, আমাকে ছাড়া ওর চলবে না ! কিন্তু আমার মনে সে-কথা তেমন সাড়া জাগালো না, নিরুত্তাপভাবেই শুনছিলাম আমি। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতন আমার মাথায় এসে গেল। জয়ন্তী আর আমার উদ্ধার পাবার আর একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। আমরা দু'জনে যদি বিয়ে করি, তাহলে আমাদের গ্লানি কেটে যেতে পারে।

আমি বললাম, জয়ন্তী, এরপর থেকে আমরা আর কখনো দূরে সরে যাবো না, এরকম কোনো ব্যবস্থা করলে হয় না ?

জয়ন্তী যেন কথাটা একেবারেই বুঝতে পারলো না। প্রায় এক মিনিট আমার মুখের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে বললো, কী ?

— এরপর থেকে আমরা বরাবরের জন্য কাছাকাছি থাকতে পারি না ?

— কী জানি !

— জয়ন্তী, কথাটা একবার ভেবে দেখ।

— আমার মনে হয়, আমার আর কিছু ভাবারও ক্ষমতা নেই।

— সেই ছেলেটির সঙ্গে তোমার আর দেখা হয় ?

— কোন ছেলেটি ?

— তোমাদের অফিসের সেই সেল্‌সম্যান— ।

— ও, রণবীর ! ওর সঙ্গে আমার মাস দু'এক দেখা হয় নি। ও তো পাটনায় বদলি হয়ে গেছে। অংশুদা, তুমি ওর সম্পর্কে ভুল করেছিলে।

— ভুল করেছিলুম ? জীবনে আমি একটাও ঠিক কাজ করতে পারলুম না ! সবই ভুল হয়ে যাচ্ছে !

— অংশুদা, আবার তুমি রাগ করছো !

— তুমি একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখ। এরপর, হয় তোমার ও আমার আর দেখা হওয়াই উচিত নয়, অথবা আমাদের আইনসঙ্গতভাবে একসঙ্গে থাকা উচিত। তুমি বরং কয়েকদিন সময় নিয়ে এটা ভেবে দেখ !

আমি হাত সরিয়ে নিয়েছিলুম, জয়ন্তী আবার আমার হাতটা টেনে নিল। গভীরভাবে বললো, তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই হবে।

জয়ন্তীর এতখানি পরিবর্তন আমার কাছে কী রকম যেন নতুন লাগছিল। জয়ন্তী কোনোদিনই এতটা নির্ভরশীল ধরনের মেয়ে নয়। বিধবা হবার পর সে একা-একা বেঁচে থাকার সংগ্রামে

নেমেছিল। আমার সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শে আসবার আগে তবুও ও আমার মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতো, কিন্তু তারপর থেকে আমাদের দু'জনের মধ্যে আর যাই থাক, কোনো শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল না। বরাবরই সে জেদি, একরোখা মেয়ে, নিজের ইচ্ছে–অনিচ্ছেটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে, অথচ আজ সে আমাকেই অবলম্বন করতে চাইছে কেন ?

সেদিনকার সেই ঘটনার পর আমি লজ্জা–ঘৃণায় মরে যাচ্ছিলুম মনে মনে, ভেবেছিলুম জয়ন্তী সারাজীবনে আমাকে কখনো ক্ষমা করবে না ! কিন্তু জয়ন্তী এখন বেশি করে আমাকে চাইছে ! মেয়েদের চরিত্রের রহস্য আমি বোধ হয় কোনোদিনই বুঝতে পারবো না।

আমি খুব নিবিড়ভাবে জয়ন্তীকে লক্ষ করতে লাগলুম। জয়ন্তীর মুখে কোনো মালিন্য আসে নি, এই কয়েক মাসে তার চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে, একটা গাঢ় হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে জয়ন্তী, তাকে অনায়াসে এখনো কুমারী মেয়ে বলে ভুল করা যায়। তবুও আমার অস্পষ্টভাবে মনে হলো, জয়ন্তীর মনের অবস্থা খুব স্বাভাবিক নয়, ভেতরে–ভেতরে কী যেন একটা চঞ্চলতা সে দমন করে রেখেছে, কথা বলতে–বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে ওর মনের ওপর বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয়। আমি বললুম, আচ্ছা থাক, ওসব কথা পরে হবে। চল, ওঠা যাক।

রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে এসে ও বললো, আমার সঙ্গে আসবে না ?

আমি বললুম, না, আজ থাক ! এখন কয়েকদিন থাক, তুমি মনটাকে একটু সামলে নাও।

— আমি আবার মন কী সামলাবো ? আমার কী হয়েছে ?

— কিছু না। বাবলু কেমন আছে ?

— এই দেখ, তোমাকে একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গেছি ! বাবলুর ক'দিন জ্বর হয়েছিল, এখন ভালোই আছে— তুমি বাবলুর জন্য বাইরের কোনো ভালো স্কুলের খোঁজ দিতে পার ? ওকে ভাবছি, হোস্টেলে রেখে পড়াবো।

আমি স্তম্ভিতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, বাবলুকে তুমি হোস্টেলে রাখবে।

জয়ন্তী অনায়াস ভঙ্গিতেই বললো, হ্যাঁ, ওর পড়াশুনো যাতে ভালোভাবে হয়— আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে পাঠালে কেমন হয় ?

— তুমি বাবলুকে ছেড়ে থাকতে পারবে ?

— কেন পারবো না ? ওর পড়াশুনোর দিকটা তো দেখতে হবে। তোমাকে এই কথাটা বলার জন্যই টেলিফোন করেছিলুম, অথচ সেটাই বলতে ভুলে গেছি ! তুমি বলো, এতে ওর ভালো হবে না ?

আমি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। এটাই কি আমার প্রতি জয়ন্তীর প্রতিশোধ ? শেষকালে আঘাত করার জন্য এতক্ষণ চুপ করে ছিল ? বাবলুকে সরিয়ে দিতে চায় আমারই জন্য। আমার পাশবিক ইচ্ছেটাকে বিদ্রূপ করার জন্য ! জয়ন্তী আমাকে কতবার বলেছে, বাবলুকে ছেড়ে ও একদিনও থাকতে পারবে না ! বাবলুই ওর জীবনের কেন্দ্রমণি, বাবলুকে বড় করে তোলার জন্য, ভালোভাবে মানুষ করার জন্য ও যে–কোনো কষ্ট সহ্য করতে পারে। আজ, সেই বাবলুকে ও হোস্টেলে পাঠাতে চাইছে। সেদিনের ঘটনার পর। আমাকে শাস্তি দেবার জন্য !

জয়ন্তীর মুখে অবশ্য প্রতিশোধের আনন্দ কিংবা আঘাত দেবার উল্লাস ছিল না। ও তখনও অর্ধ অন্যমনস্ক, আমি ওকে দৃঢ়ভাবে বললুম, না, বাবলু কোথাও যাবে না। ও তোমার কাছেই থাকবে !

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমাদের কাছেই থাকবে, কিন্তু তখনই অতটা বলা সমীচীন হবে না ভেবে বললুম, তোমার কাছেই থাকবে, কোথাও যাবে না। যাও, বাড়ি যাও !

২০

২৯শে মার্চ, ১৯৬৬

আমি আবার একটা ভুল করলুম।

জয়ন্তীকে বিয়ে করবো ঠিক করার ফলে, আমার মনের অস্বস্তি ও অপরাধবোধ অনেকটা কেটে গেল। ভালবাসা জিনিসটাকে আমি বড় বেশি মূল্য দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, ভালবাসা না পেলে জীবনটাই নষ্ট। দূর, দূর, চল্লিশ বছর বয়েসেও ভালবাসা নিয়ে অত প্যানপ্যানানি করাই আমার ভুল হয়েছে। জয়ন্তী ও আমি হয়তো পরস্পরকে তেমন ভালবাসি না— কিন্তু তাতে কী, মানিয়ে চলাটাই বড় কথা— জয়ন্তী বুদ্ধিমতী মেয়ে, নিশ্চয়ই মানিয়ে চলতে পারবে, তাহলেই সবকিছু সহজ হয়ে আসবে। আমি বাবলুকে ভালবাসি, তাকে আমি পিতৃস্নেহের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু দিতে পারবো।

এক সময় তো আমি ভেবেছিলাম, নবনীতা যদি একটি সন্তান নিয়েও আমার কাছে ফিরে আসে, তবু আমি ওকে গ্রহণ করবো। নবনীতার এ পর্যন্ত কোনো সন্তানই হয় নি। নিয়তির সামান্য পরিহাসে, জয়ন্তীই একটি সন্তান নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে, ব্যাপারটাকে এভাবে ধরলেই হয় !

অরূপ মারা গেছে, জয়ন্তীর জীবনে সে আর কখনো ফিরে আসবে না। নবনীতাও তো আমার কাছে অরূপের মতনই। বলা যায়, নবনীতা আমার কাছে একটা ভুলে যাওয়া গানেরই মতন, কখনো আবার মনে পড়লে বড়জোর একবার গুনগুন করতে ইচ্ছে হয়, এই পর্যন্ত।

টুনি পিসীর জীবনে সেই পাপিষ্ঠের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেও আমি ভুল করেছি। সে লোকটার মতন আমি তো পলাতক নই, আমি তো সব দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছি। আমি তো সব অতীতকে মুছে ফেলে আবার নতুন পরিচ্ছন্ন জীবন শুরু করতে পারি !

মিহিরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেও আমি ভুল করেছি। আমি সৎ ও সভ্য থাকতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পারি নি, আর মিহির সারাজীবনই অপকীর্তি করেও সার্থক, প্রতিষ্ঠিত— এই দেখে আমি ভেবেছিলাম, জীবনটা বুঝি এই রকমই। কিন্তু পৃথিবীতে আরও অনেক মিহির আছে, যারা অপকর্মের জন্য শাস্তি পেয়েছে—জেলে পচেছে অথবা ফাঁসি গেছে। অনেক অংশুও নিশ্চয়ই সৎ থাকতে চেয়ে সৎ-ই থেকেছে, তারও উদাহরণ আছে। আমি সেটা ভাবি নি কেন ? এখনো নতুন করে শুরু করা যায় নিশ্চয়ই !

কিন্তু তার আগে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া দরকার। নতুন জীবন পাওয়ার যোগ্য হতে হবে আমাকে। আমার জীবনটা যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, এর মধ্যে বেছে নিতে হবে একখণ্ড। সেই হ্যামলেটে একটা লাইন আছে না, 'ও থ্রো অ্যাওয়ে দা ওয়ার্সার পার্ট অফ ইট, অ্যান্ড লিভ পিওরার উইথ দা আদার হাফ্ !' ছেলেবেলার সেই সারল্য, সেই নিষ্ঠা আর ফিরে পাবো না, কিন্তু অনেক কুসঙ্গী নিশ্চয়ই ত্যাগ করতে পারি।

এর মধ্যে বিপুলকে একদিন বেশি রাত্রে রাস্তায় দেখেও আমি আমার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পেয়েছিলাম। বিপুল সম্পর্কে আমার ভাই, সিক্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ে। ও আমাকে ভবিষ্যতের নতুন সমাজের কথা প্রায়ই শোনাতো। বিপুলকে দেখলাম পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে মদ খেয়ে টলছে, ঝগড়া করছে একটা ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে। দৃশ্যটা দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। বিপুল আমাকে বলেছিল, একটা জেনারেশান তৈরি হচ্ছে, যারা সমাজের সব আবর্জনা ঝাঁটিয়ে নতুন সমাজের পত্তন করবে। কিন্তু কোথায় সেই জেনারেশান ? বিপুলও কি তাদের একজন, না নিছক

বাক্যবাগীশ ! না, না, আমি চাই, বিপুলরা সত্যিই আলাদা হোক ! ওরা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক !

আবার এও ভাবলাম, বিপুলদের জন্য অপেক্ষা করলেই শুধু চলবে না। যে-যেখানে এখনো সুস্থ আছে, সবাইকেই কাজ শুরু করতে হবে। আমিও সুস্থ হতে চাই !

এই ভেবে, দু'টি জিনিস করবো ঠিক করলুম। এক, অফিসে আর ঘুষ নেবো না। তাতে যা হয় হোক ! পরশু থেকে এটা শুরু করেছি। অফিসের সব লোক অবাক।

পরশু দিনই একটা পাঞ্জাবি পার্টি আমার ব্লটিং প্যাডের পাশে একটা খাম গুঁজে রাখছিল। বেশ মোটা খাম। আমরা সাধারণত এক টাকা বা দু'টাকার নোটের বান্ডিল ছাড়া অন্য কিছু নিই না। অনেক সময় দশ টাকা বা একশো টাকার নোট ঘুষ দিয়ে— পুলিশের কাছে আবার সেই নম্বর পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি সার্চ করিয়েছে—এ-রকম দৃষ্টান্ত আছে। পুরনো এক টাকা দু'টাকার নোটের বান্ডিলে সে ঝুঁকি কম। আমি হঠাৎ মোটা খামটা দুমড়ে-মুচড়ে লোকটার মুখে ছুঁড়ে মেরে বললাম, গেট আউট ! গেট আউট !

বিশাল চেহারার পাঞ্জাবিটা যেন কুঁকড়ে গেল, সে বুঝতেই পারলো না কী হয়েছে, টাকা কম হয়েছে কিনা। কিন্তু টাকা কম হলে অফিসাররা যে রাগ দেখায়— সে রাগ তার চেনা। আমি একেবারে রুদ্র মূর্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আভি গেট আউট ! ডোন্ট কাম ! কোনোদিন আর আমার চেম্বারে ঢুকবে না ! যা বলার চিঠিপত্র লিখে জানাবে !

অফিসের কেরানিরা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। অনেকের ধারণা, আমার মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে। অনেকদিন ছুটি নিয়ে থাকবার পর জয়েন করেই এইরকম ব্যবহার করায় ওদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, পাগল হতে আমার আর বাকি নেই ! এর মধ্যে পাঁচটা লোককে আমার ঘর থেকে তাড়িয়েছি। কাজও করছি খুব মন দিয়ে, সমস্ত খুঁটিনাটি দোষ ধরে এই মাড়োয়ারি-পাঞ্জাবিগুলোকে টাইট দিতে চাই। কিন্তু পারছি না ঠিকমতো। কেরানিগুলোও তো সব ঘুষখোর। দরকার মতন চেয়ে সব ফাইল পাচ্ছি না। সব লুকিয়ে ফেলেছে হতভাগারা। আজ সবাইকে ডেকে সাফ বলে দিয়েছি, এই নিয়ে পুলিশ দপ্তরে আমি যাবো কথা বলতে।

প্রকারান্তরে কয়েকজন আমাকে শাসিয়েও গেছে। আমার সমপদস্থ দু'জন অফিসার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে গেল, আমার মতন গোয়ার্তুমি করতে গিয়ে এর আগে দু'একজন প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছে। আমি হাসতে-হাসতে বললুম, জীবনে কোনো থ্রিল নেই, দেখাই যাক না ! সবসময় মরার সম্ভাবনা থাকলে সেটাই একটা থ্রিল হবে !

আর একটা জিনিস ঠিক করেছি, মিথ্যে কথা বলবো না। আজ যদি কোনো বিচারকের সামনে আমাকে হাজির করা হয়, আমি একটা কথাও লুকোবো না। সত্যি কথা সব বলে দেবো, তাতে যা হয় ! এখনো বিচারকের কাছে যাবার কোনো সম্ভাবনা আসে নি অবশ্য, কিন্তু এই সাদা কাগজগুলোই আমার বিচারক— এর কাছে সব স্বীকার করেছি। তাই বেশ শান্তি পাচ্ছি !

২১

৭ই এপ্রিল, ১৯৬৬

আজ সন্ধেবেলা জয়ন্তীর ওখানে গিয়েছিলাম অনেকদিন পরে। জয়ন্তী চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিল, তবু এ ক'দিন যাওয়া হয় নি। ইদানীং জয়ন্তীর সঙ্গে বাইরেই দেখা করতাম। আজ জয়ন্তীর কাছে গিয়েছিলাম একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। জয়ন্তীকে আজই সোজাসুজি বলবো, আমি

ওকে বিয়ে করতে চাই। বিয়ে করলেই সব ব্যাপারটার একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়। তাহলে বাবলুও বড় হয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাবে। এবারে আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নয়—সহজ, স্পষ্ট ভাষায়। জয়ন্তীকে আমি ভেবে দেখার জন্য বেশ কয়েকদিন সময় দিয়েছি। আমি নিজে জয়ন্তীকে বিয়ে করবো বলে স্থির করার পরই মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। জয়ন্তীকেও আমি তার ভাগ দিতে চাই। আর, জয়ন্তী যদি বিয়ে করতে না রাজি হয়— তাহলে আর জয়ন্তীর সঙ্গে আমি দেখা করতে রাজি নই।

জয়ন্তী যা বললো, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

জয়ন্তী বিশেষ দরকারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমি কিছু বলার আগে সে নিজের কথাটাই আগে বললো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নয়, সহজ স্পষ্ট ভাষাতেই। আমাকে দেখে হাসলো না জয়ন্তী আজ, একটু ভয়ও পেল না, নিজের বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলে ফেললো। সেটা এই যে, জয়ন্তী ওর অফিসের সেই সিনেমার নায়কের মতো চেহারার সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ছোকরাকে বিয়ে করতে চায়। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, এখন আমি মত দিলেই হয়।

আমি প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারি নি, বলেছিলাম, তুমি সত্যি বলছো ? না, ঠাট্টা করছো আমার সঙ্গে ?

ঠাট্টা করার মতন মুখের ভাব ছিল না জয়ন্তীর। বললো, বা, প্রায় সব ঠিক। বাবলুকে আপাতত কার্শিয়াঙের স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখন তুমি যদি রাজি হও।

আমি বিমূঢ় হয়ে ভাবলুম, জয়ন্তীর সঙ্গে সেই ছোকরার দেখাই বা হতো কখন, বিয়ের কথা তোলার মতন ঘনিষ্ঠতাই বা নতুন করে হলো কবে ? এই তো সেদিনও চায়ের দোকানে বসে জয়ন্তী বললো, ওর সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্কই নেই। হাসতে-হাসতে জয়ন্তী আমাকে বলেছিল, অংশুদা, ওর সম্পর্কে তুমি ভুল ভেবেছো ! আমার তো ধারণা ছিল, আমিই জয়ন্তীকে অধিকার করে ছিলাম। সব ভুল ! আমার শয্যাসঙ্গিনী হয়েও জয়ন্তী অন্যের ভালবাসা গ্রহণ করেছে। কেন ? ছোকরা কি আমার চেয়ে বেশি মাইনে পায় ? জয়ন্তী আমার ঘুষ নেবার কথা জানে না। আমার চেহারা একটু রোগা, আর ঐ ছোকরার চেহারা সিনেমার নায়কের মতন— সেইজন্য ?

জয়ন্তী যেন আমার মুখের ওপর একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আজ সে বেপরোয়া। আমাকে সে আর গ্রাহ্য করে না— কোথা থেকে এই শক্তি পেয়ে গেছে ! আমার সূক্ষ্মভাবে সন্দেহ হলো, হয়তো ইতিমধ্যেই ওদের রেজেস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে— সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে জয়ন্তী, যাতে আমি কোনো বাধা দিতে না পারি ! শুধু আমাকে ঠকাচ্ছে না জয়ন্তী, ঐ রণবীর নামের ছেলেটাকেও ঠকাচ্ছে। ওর কথা যেমন আমার কাছে লুকিয়ে ছিল, তেমনি ওর কাছেও কি কোনোদিন জয়ন্তী বলতে পারবে যে, দীর্ঘ চার মাস ধরে আমরা...

আমি বললাম, আমার মতামতের কি দাম আছে ?

জয়ন্তী বললো যে, আমাকে কথা দিতে হবে— আমি আর কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবো না। জয়ন্তী চাকরিও ছেড়ে দিচ্ছে। আর আমাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা যদি আমি ঘুণাক্ষরেও কখনো প্রকাশ করি, তাহলে জয়ন্তী আত্মহত্যা করবে।

আমি রাজি হবো না কেন ? আমার তো রাগ করার কোনোই কারণ নেই, আমার তো খুশি মনেই রাজি হবার কথা তক্ষুনি ! আমার তো এখন হাসতে-হাসতে, মনে-মনে বলা উচিত, যাক বাবা, খুব জোর বেঁচে গেছি ! একটা বাচ্চার বোঝাসুদ্ধ একটা আধবুড়িকে বিয়ে করতেও হলো না, বিবেকের কাছে কোনো জবাবদিহিও করতে হলো না। কী লাকি আমি !

আমি বললাম, নিশ্চয়ই ! কংগ্র্যাচুলেশান্‌স জয়ন্তী। নো রিগ্রেটস্ ! রণবীর ছেলেটি দেখতে

সুন্দর, তোমার সঙ্গে খুব মানাবে ! আর বাবলু তো হোস্টেলে চলে যাচ্ছে। একটা কথা শুধু তোমায় জিজ্ঞেস করি, মাত্র সপ্তাহ দু'এক আগে তুমি আমাকে ধর্মতলায় রেস্টুরেন্টে ও কথা বলেছিলে কেন ?

একটাও মুখের রেখা কাঁপলো না জয়ন্তীর। বললো, ওঃ সেদিন ! সেদিন রণবীর আমাকে একটা খুব খারাপ চিঠি লিখেছিল, তাই ভেবেছিলাম— ওর সঙ্গে আর জীবনে কথা বলবো না। সেদিন আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

যেন একটা মস্ত কৌতুকের ব্যাপার, আমি সুর করে টেনে বললাম, ও, আচ্ছা! এই ব্যাপার!

রাজি হয়ে জয়ন্তীর কাছে কথা দিয়ে এলাম। কিন্তু কেন যে তেমন আনন্দ হচ্ছে না ! জিভে একটা তেতো স্বাদ লেগেই রইলো। তাহলে ঘুষ নেওয়া বন্ধ করলাম কেন ? কী লাভ জীবনটা পালটে ? প্রথম তিন–চার মাস আমি জয়ন্তীর সঙ্গে ভদ্র ও সংযত ব্যবহার করেছিলাম। এরপর যদি আবার জয়ন্তীর মতন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, তবে প্রথম থেকেই এসব শুরু করার চেষ্টা করতে হবে। এই তো নিয়ম। শুধু–শুধু নিয়মটা শিখতে আমার দেরি হয় ! কত যে সময় নষ্ট হয় এইভাবে— অথচ হুহু করে বয়েস বেড়ে যাচ্ছে।

২২

১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৬

কাল রাত্তিরে খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছি ! নিশ্চিত মৃত্যু ছিল, অথবা গুরুতরভাবে আহত হতুম ঠিক। কিন্তু এভাবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি ?

কয়েকদিন ধরে কিছুই ভালো লাগছিল না। অফিসে গণ্ডগোল, ঘুষ নেওয়া বন্ধ করে খুব কড়াকড়ি শুরু করেছি বলে সারা অফিসে আমার বিরুদ্ধে একটা চাপা বিক্ষোভ। অন্য দু'জন অফিসার আমার সঙ্গে বাঁকা–বাঁকাভাবে কথা বলছে। দু'জন সাপ্লায়ার তো ঠাণ্ডা–গরম ভাষায় ভয় দেখিয়েই গেল আমাকে। কে জানে, তারাই গুণ্ডা লাগিয়েছিল কিনা।

অফিসে এ ব্যাপারটা করছি, এখন আর সততার জন্য নয়, নেহাত জেদের বশে। এখন আবার হাল ছেড়ে দিলে, ওরা সবাই ভাববে, আমি হেরে গেলুম। কিন্তু জীবনে অনেক জায়গায় হারতে-হারতে আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি, এখন আমি প্রাণপণে লড়াই করে যাবোই। এই জেদটাই যা কিছু, নইলে এখন আর আমার পক্ষে ঘুষ নেওয়া কিংবা না নেওয়ায় কিছু যায় আসে না।

রতন কাল আবার ফিরে গেল, বিদেশে। আমাকে এয়ারপোর্টে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল, আমি যাবো বলে কথাও দিয়েছিলাম— তবু যেতে ইচ্ছে করলো না। কারণ জানি, মিহির যাবেই। মিহির এ সুযোগ ছাড়বে না। এয়ারপোর্টের পরিচ্ছন্ন বিশিষ্ট মানুষজনের মধ্যে মিহির নিজেকে একটা কেউ–কেটা হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করবেই। এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয় ঢুকে দুর্দান্ত দামের খাবার খাওয়াতে চাইবে সবাইকে। মিহিরের সঙ্গে আমি কিছুতেই দেখা করতে চাই নি। তবু মিহিরের সঙ্গে দেখা হবেই— জীবনের আর একটা সঙ্কটজনক মুহূর্তে। কিন্তু কাল রাত্রেই যে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি।

বাড়িতেও থাকতে ভালো লাগে না, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। একটা অর্থহীন অস্বস্তি। এ ক'দিন অফিসে অনেকক্ষণ কাজ করে সাতটা সাড়ে সাতটা আন্দাজ বেরোই, কিছুক্ষণ রাস্তায়–রাস্তায় ঘুরে যে–কোনো একটা সিনেমা হলে নাইট শোতে ঢুকে পড়ি।

কালও সেইরকম একটা ইংরেজি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। ছবির আদ্দেকই দেখি নি, অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলাম। শো ভাঙার পর হাঁটতে শুরু করেছিলাম বাড়ির দিকে। বেশি দূরের

রাস্তা নয়।

অনেকখানি চলে এসেছি, রাস্তা ফাঁকা— হঠাৎ একটা অন্ধকার গলি থেকে তিনটে লোক বেরিয়ে এসে বললো, দাদা, ক'টা বাজে ?

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করি নি। বাঁ-হাতের কব্জিটা তুলে দেখতে যাচ্ছি ঘড়িটা, একজন আমার হাতটা চেপে ধরে সাপের মতন হিস হিস গলায় বললো, ঘড়িটা খুলুন ! আর কী !

এমনিতেই মন খারাপ ছিল, তার মধ্যে এইসব ব্যাপারে চড়াৎ করে আমার রাগ চড়ে গেল। এত রাগের সময় কাপুরুষও সাহসী হয়ে ওঠে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, ঘড়ি খুলবো কেন ? মামদোবাজি ? এটা আমার পাড়া। পুলিশ ! পুলিশ ! চোর ! গুণ্ডা !

দড়াম করে আমার ডান চোখের ওপর একটা ঘুষি লাগলো, আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। পড়ার মুহূর্তেও মনে হলো, বড় রাস্তার ওপর ব্যাপার— এখন রাত বারোটাও বাজে নি — পুলিশের গাড়ি বা লোকজন এসে পড়বেই— যদি কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারি... হোক না তিনজন... আমাকে লড়তেই হবে—এমনি ছেড়ে দেবো না !

কিছু একটা কঠিন জিনিস দিয়ে ওরা আমার হাঁটুতে মারল, তবু আমি ছিটকে সরে গিয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালুম। কোমর থেকে বেল্টটা খুলে নিয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে ফের চেঁচালুম, পুলিশ! পুলিশ! কে আছো ! আমায় গুণ্ডা ধরেছে।

ওদের একজন আমার সামনে এগিয়ে এলো, হাঁটু ভাঁজ করে একটু নিচু হয়ে এগোতে লাগলো আমার দিকে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে সপাং করে চাবুকের মতন বেল্টটা দিয়ে মারলাম তার মুখে। সেই মারার সময়ই দেখলাম, আর একজন একটা থান ইট তুলেছে আমার দিকে। অতি দ্রুত সরে গিয়ে ইটটা থেকে নিজেকে বাঁচালুম।

প্রথম জন কিন্তু চাবুক খেয়েও একটুও বিচলিত হয় নি, আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে আমার দিকে— আমি আবার বেল্টটা ঘুরিয়ে মারতে যেতেই সে লাফিয়ে উঠে বেল্টটা ধরে ফেললো। এক ঝটকায় বেল্টটা আমার হাত থেকে কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই সে তার জামার তলা থেকে ছুরি বার করলো। লম্বা, ফলা-বেঁকানো ছুরি। আমার পিছনে দেয়াল, আর পালাবার উপায় নেই, আমি স্থির চোখে লোকটার দিকে তাকালুম, এই প্রথম ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এলো। ঘড়িটা চাওয়া মাত্রই খুলে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার। কলকাতা শহরে এটাই নিয়ম— তা কি আমি জানি না !

কিন্তু নেশা না করেও আমি যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলুম। যুদ্ধ করার নেশা। আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, বিনা প্রতিরোধে কারুকে আর কিছু ছেড়ে দেবো না। আমি কোনোদিন মারামারি করি নি কারুর সঙ্গে, তিনজন গুণ্ডা দেখেও আমার লড়াই করার সাহস হলো কী করে ? আনাড়ির মতন আমি বেল্ট খুলে ওদের মারতেও গিয়েছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল, ওরা শুধু আমার ঘড়ি চায় না— আরও অনেক কিছু চায়।

এখন ছুরি হাতে ঐ লোকটার চোখ দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে এলো। এই যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু! কী মারাত্মক হিংস্র সেই চোখ দুটো, সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, কোনোরকম দুর্বলতা নেই, শাদা দাঁতগুলো ঝলসে সে বললো, এবার শালা ? খুব চাবুক কষিয়েছিস ! হারামির বাচ্চা—

ঝুপ করে একটা কালো অ্যাম্বাসেডর গাড়ি এসে থামলো, সঙ্গে-সঙ্গে সেটার দরজা খুলে একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক নেমে এলো, হাতে তার একটা লোহার হ্যান্ডেল, বিকট চিৎকার করে সে তেড়ে এলো গুণ্ডাগুলোর দিকে। ছুরিওয়ালা লোকটার পিছন দিক থেকে কাঁধে ঝাড়লো

রডের বাড়ি, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, তারপর অন্য দুটোর দিকে ফিরে বললো, আয়, দেখি কে কত গুণ্ডা আছিস! আয় শালারা—

আমি হতবাক হয়ে আমার উদ্ধারকারীর দিকে চেয়ে দেখলাম। আর কেউ নয়, মিহির। হাতের রডখানা বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলো মিহির। দু'জন গুণ্ডা ছুটে পালালো, ছোরাওয়ালা পালাতে পারে নি, মিহির তার কলার চেপে টেনে তুললো, ইতিমধ্যে কোথা থেকে লোকজন এসে বেশ একটা ভিড় জমিয়ে ফেললো। হাঁপাতে-হাঁপাতে মিহির আমাকে বললো, কি রে, তোর লাগে নি তো! গাড়িতে নবনীতা বসে আছে, ও-ই প্রথম তোর চিৎকার শুনতে পায়, বললো, গলাটা চেনা-চেনা—

কনস্টেবলের হাতে গুণ্ডাটাকে সঁপে দিয়ে মিহির ভিড় ঠেলে আমাকে নিয়ে এলো গাড়ির কাছে। গাড়ির মধ্যে অন্ধকার আলো করে নবনীতা বসে আছে। নবনীতা মিষ্টি করে হেসে বললো, আপনার কিছু হয় নি তো ?

হঠাৎ প্রচণ্ড অভিমানে আমার বুক ভরে গেল। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে উঠি ! মাটিতে গড়াগড়ি দিই। মিহিরকে ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কেন আমাকে বাঁচালি ? কেন ? এরকমভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ ? এর থেকে ওরা আমাকে ছুরি মারলেই ভালো ছিল, আমি রক্তে রাস্তা ভিজিয়ে কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতুম— সেও ভালো ছিল! কেন ? কেন ? কেন আমি সব জায়গায় হেরে যাবো, আর মিহির শুধু জিতে যাবে ? গাড়িতে হেলান দিয়ে বীরের মতন দাঁড়িয়ে আছে মিহির, আর আমি কেন কৃপার পাত্র ?

ছেলেবেলা থেকেই তো আমি ভালো হতে চেয়েছিলাম, সৎ হতে চেয়েছিলাম—মাঝে-মাঝে ভুল করেছি— আবার শুধরে নেবার চেষ্টা করেছি। মিহির ক্রমশ খারাপের দিকেই গেছে, খারাপের চেয়ে আরও খারাপ— অথচ দু'জনের জীবনে তার কী রকম ফল হলো ? আমি সব জায়গায় হেরে যাচ্ছি, আর মিহির জিতে যাচ্ছে সব জায়গায়— সে কালো মোটরগাড়িতে চেপে স্ত্রীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বেড়াতে বেরোয় মধ্যরাত্রে। সে সার্থক, সে বীর, সে-ই নবনীতার চোখে আর এই জনতার চোখে শ্রদ্ধার পাত্র! কেন ? এ কীরকম খেলার নিয়ম ? এ কী অন্যায় যুদ্ধ! ভালো-মন্দের অর্থ কি তাহলে ভুল জেনেছি ?

মিহির বললো, একটু আগেও তোর কথা হচ্ছিল। তুই এয়ারপোর্টে এলি না কেন ? রতন বার-বার বলছিল !

আমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। মিহির বললো, সিগারেট আছে তোর কাছে ? আমারটা ফুরিয়ে গেছে! আজকাল শালা রাস্তাঘাট যা হয়েছে না—গুণ্ডা-বদমাসে ভরা— আমি তো গাড়িতে সবসময় লোহার রড রাখি—বেশি ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই দেখলেই ঝেড়ে দেবো ঘাড়ে। আয় ওঠ, গাড়িতে ওঠ! ও, তোর বাড়ি তো এ পাড়াতেই ... তুই সেই ভালো মানুষই রয়ে গেলি...

মিহির আরও কী সব বলে গেল, আমি একটি কথাও উচ্চারণ করি নি। প্রাণে বেঁচে গিয়েও আমি বাঁচার আনন্দ পাচ্ছিলাম না। মিহির গাড়িতে উঠে স্টার্ট নেবার সময় বললো, শোন, তোর অফিসে আর একবার যাবো। আমার ভাগ্নের ব্যাপারে— তুই যদি একটু হেল্প না করিস—

নবনীতা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, সামনের বুধবার জয়ন্তীর বিয়ে— আপনি আসছেন ? দেখা হবে তাহলে—

এবারও আমি একটাও কথা বললুম না। রাস্তার লোকেরা ভাবলো, আমি বোবা। কিংবা ভয়ে-আঘাতে এইমাত্র বোবা হয়ে গেছি।

২৩

২১শে এপ্রিল, ১৯৬৬

ক্যানসার হয়েছে এই ভয় পেয়ে আমি অকারণেই ডায়েরি লিখতে শুরু করেছিলাম। ক্যানসার আমার হয় নি। এমনকি, মাঝখানে যে শরীরটা খারাপ–খারাপ যাচ্ছিলো, তাও সেরে গেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তাহলে আর ডায়েরি লেখার কি মানে হয়?

এখন রাত্রে ঘুম আসে না। অধিকাংশ রাত্রেই বিছানায় শুয়ে–শুয়ে রাজ্যের কথা ভিড় করে আসে মনে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই লেখা। কিন্তু তাও আর লিখবো না। কী হবে লিখে! আমার জীবন তো কারুর কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারবে না! শুধু আজকের ঘটনাটা লিখতে হবে, তবু যদি আমার একটা প্রার্থনা কারুর মন স্পর্শ করে!

অফিস থেকে আবার এক মাসের ছুটি নিয়েছি। কলকাতার বাইরে কোথাও কিছুদিন থেকে আসতে ইচ্ছে করছে। না, আমি পলাতক নই। আমি হেরে যাই নি। জীবনটা বড় প্রিয়, কিছুতেই মরতে ইচ্ছে করে না। আর যদি বেঁচে থাকতেই হয়, তাহলে বঞ্চিত কিংবা পরাজিত হয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই। আমি নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম সিমলা কিংবা রাণীখেত যাবো, তারপর হঠাৎ ঠিক জায়গাটার কথা মনে পড়লো, আমাকে এলাহাবাদেই যেতে হবে। বহুদিন এলাহাবাদ যাই নি, এলাহাবাদের কথা মনে পড়তেই মন কেমন করে উঠলো। মানুষের শৈশব–কৈশোর যেখানে কাটে, সেখানকার চেয়ে প্রিয় জায়গা তার আর হয় না। এলাহাবাদের রাস্তায় রাস্তায় একবার ঘুরে দেখি, সেখানে কোথাও আমার শৈশব–কৈশোরের পায়ের ছাপ পড়ে আছে কিনা। আমাকে আবার ওখান থেকেই শুরু করতে হবে।

ব্যর্থতার আঘাত কী সাঙ্ঘাতিক! জয়ন্তীর নাম মনে পড়লেই আমার মাথার মধ্যে হু–হু করে আগুন জ্বলে। আমি বরাবরই শান্ত ধরনের মানুষ, কিন্তু আজ আমারও এক–একসময় মনে হয়, একটা ছুরি নিয়ে জয়ন্তীর বুকে বসিয়ে দিয়ে আসি। আমার চল্লিশের ওপর বয়েস, নিতান্ত নিরীহ ভদ্রলোক— আমারই যখন এরকম ইচ্ছে হয়, তখন ছেলে–ছোকরাদের যে খুন–জখমের জন্য রক্ত নাচবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

কিন্তু নবনীতাকে যখন আমি হারাই, তখন আমিও নিতান্ত ছোকরা ছিলুম, তখন আমার ওরকম ইচ্ছে জাগে নি— তখন আমি প্রাণপণে চেয়েছিলাম নিজের কাছে নিজেকেই লুকোতে। আসলে এক–একটি মেয়ের ক্ষেত্রে এক–একরকম হয়। কোনো মেয়ের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে, আবার কোনো মেয়ের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ইচ্ছে করে তাকেই খুন করতে! নবনীতার ক্ষেত্রেই তো আমি জোর করতে পারি নি, জয়ন্তীর সঙ্গেও পারলুম না। অথচ আমার অধিকার ছিল। কয়েকদিন ধরে মনের মধ্যে অসম্ভব জোর পাচ্ছি। নারীকে জোর করে কেড়ে নিতে আমার রুচিতে বেধেছে, কিন্তু পৃথিবীর কাছ থেকে জোর করে আমার মনুষ্যত্বের অধিকার কেড়ে নিতে আর ভুল হবে না।

গতকালই এলাহাবাদে চলে যেতে পারতাম। ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা জমেছে, প্লেনেই যাবো ভাবছিলাম। পরশু প্লেনের টিকিট কাটতে গিয়েও ফিরে এসেছি। একটা কাজ এখনো বাকি আছে। সেটা হয়ে গেলেই পূর্ব জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ!

আর দু'দিন বাদে জয়ন্তীর বিয়ে। আজ বিকেলবেলা আমার মন খুব প্রফুল্ল হয়ে গেল। সাধারণত বিকেলে স্নান করার অভ্যেস নেই আমার, তবু আজ ওডিকোলন সাবান দিয়ে অনেকক্ষণ স্নান করলাম। শরীরটা সুগন্ধে ভরে গেল। চুল আঁচড়ালাম অনেকক্ষণ ধরে। শখ করে

একবার একটা সিল্কের শার্ট করেছিলাম, সেটা আর পরাই হয় না, আজ সেটা পরলাম সাদা বাটার-জিন প্যান্টের সঙ্গে। আয়নার সামনে দেখলাম, আমাকে আজ বেশ ছোকরা-ছোকরা দেখাচ্ছে। শরীরে চর্বি জমে নি, চোখের দৃষ্টি একটুও খারাপ হয় নি, আমার অম্বলের অসুখও নেই— সুস্থ স্বাভাবিক দেহ, অন্যান্য সুস্থ মানুষেরা যে-রকমভাবে বাঁচে, আমিও সেইরকমভাবে বাঁচবো। দু'একটা ছোটোখাটো ভুলের জন্য মানুষের জীবন নষ্ট হয় না।

বৌদি জলখাবার খেতে ডাকতে এসেছিলেন, আমি বললাম, খাবো না। আমার অতিরিক্ত সাজপোশাক দেখে বৌদি একটু রসিকতা করার চেষ্টা করে ঠোঁটে ভেজা-ভেজা হাসি এনে বললেন, কী ব্যাপার ? আজ বুঝি কারুর সঙ্গে—

বৌদির কথার কোনো উত্তর দিলাম না, নীরবে হাসলাম শুধু। অকারণে কথা বলতে আজকাল একদম ইচ্ছে করে না। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম, এলাহাবাদ থেকে ফিরে আমি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকবো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলুম জয়ন্তীদের বাড়ির দিকে। জুতোয় কালি দেওয়া ছিলই, তবু আর একবার পালিশ করিয়ে নিলাম মাঝপথে। আজ আমি ভেতরে-বাইরে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন।

বেল টিপতে জয়ন্তীই দরজা খুললো। কী যেন একটা হাসির কথা বলতে-বলতে উঠে এসেছিল, মুখখানা ছিল ঝলমলে, আমাকে দেখে দপ করে নিভে গেল, আস্তে-আস্তে বললো, আপনি ! পরমুহূর্তেই আবার মুখের ভাব পালটে শুকনো হেসে বললো, কী ব্যাপার ? আসুন ! কিন্তু আমরা এক্ষুনি বেরুচ্ছি !

জয়ন্তীর পাশ দিয়ে দেখা যায়, ঘরের মধ্যে চেয়ারে-বসা পুরুষের একজোড়া পা। রণবীর এখন থাকবে, একথা জানলে আমি আসতাম না। রণবীরের কথা আমার মনেই পড়ে নি। কিংবা অবচেতনে হয়তো ভেবেছিলাম, বিয়ের মাত্র দু'দিন আগেও ভাবী স্বামী-স্ত্রীর দেখা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিংবা দৃষ্টিকটু। কিন্তু ওদের বিয়ের ব্যাপারটাই যে অন্যরকম। হয়তো রণবীরই সঙ্গে গিয়ে জয়ন্তীর বিয়ের শাড়ি কিনে দেবে।

স্পষ্ট বোঝা যায়, জয়ন্তী আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি কথা দিয়েছিলাম, জীবনে আর কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা করবো না। কিন্তু মানুষ কি সব কথা রাখে ? জয়ন্তী কি সব কথা রেখেছে ? মাত্র একমাস আগেই তো জয়ন্তী আমাকে রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে বলেছিল...। কিন্তু জয়ন্তী অত ভয় পেয়েছে কেন ? অন্তত দু'বার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো চোরা চাহনিতে। নিজের ত্রস্তভাব কিছুতে লুকোতে পারছে না। ও কি ভাবছে, মেলোড্রামার ভিলেনের মতন শেষ দৃশ্যে আমি পকেটে পিস্তল বা ছুরি নিয়ে এসেছি ? কিংবা রণবীরের সামনে হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে ফাঁস করে দেবো সব গোপন কথা ? আমি এরকম ক্যাড হবো, জয়ন্তী ভাবতে পারে কখনো ? আমাকে এতদিন ধরে দেখছে, ও কি জানে না, আমার চরিত্রের পক্ষে এসব একদম মানায় না ? কিংবা, যে-কোনো মানুষই যে-কোনো মুহূর্তে হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে বদলে যেতে পারে বলেই বোধহয় কেউ কারুকে বিশ্বাস করে না। জয়ন্তীর চোখে-মুখে সেই আশঙ্কা।

আমি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে-মনে বললাম, জয়ন্তী, তোমার কোনো কিছুতেই আমি একটুও বাধা দেবো না। আমি চাই, তুমি সুখী হও। পৃথিবীতে সুখী মানুষ বড় কম, অন্তত একজন কেউ সুখি হয়েছে জানতে পারলেও ভালো লাগে।

জয়ন্তী আর আমি মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত মাত্র দাঁড়িয়েছিলাম। এরপর ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো, কে, জয়ন্তী ? রণবীর উঠে এগিয়ে এলো। জয়ন্তী সঙ্গে-সঙ্গে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি অংশুদা, সেই যে বলেছিলাম— আর এ হচ্ছে...

রণবীর আমার দিকে সহাস্যে নমস্কার করে বললো, ও, আপনার কথা অনেক শুনেছি জয়ন্তীর কাছে। আপনি ওকে অনেক সাহায্য করেছেন!

আমি ওকে কিছু না বলে ভদ্রতাসূচকভাবে একটু হাসলাম। অকারণে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

রণবীর বললো, আসুন, বসবেন আসুন ভেতরে।

এবার কিছু বলতেই হয়; বললাম, না, না, আপনারা এখন বেরুচ্ছেন।

— তবু একটু বসুন। এককাপ চা।

আমার হঠাৎ রণবীর ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল। বেশ হাসিখুশি হালকা ধরনের সুদর্শন ছেলে, হিন্দি ফিল্মে এই ধরনের চরিত্র খুব দেখা যায়। আমি ওর ওপর রাগ করবো না। মনে- মনে ওকে বললাম, রণবীর, জয়ন্তী যদি তোমার জীবনে প্রথম নারী হয়, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে। তোমরা দু'জনে সমুদ্রপারে একবার বেড়াতে যেও। মুখে বললাম, না থাক, চা আর খাবো না। এমনিই এসেছিলাম— চলুন, আপনাদের সঙ্গেই বেরোই।

রণবীর বেরিয়ে এলো বাইরে। জয়ন্তী আর একবার ঘরে ঢুকে বললো, বাবলু, তুমি একটুক্ষণ লক্ষ্মী হয়ে থেকো। আমি একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো। তোমার জন্য নতুন জামা কিনতে যাচ্ছি!

নিচে নেমে আমি সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন? রণবীর বললো, আমরা একটু গড়িয়াহাট মার্কেটে যাবো। আপনি কোথায় যাবেন বলুন? আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

— না, আমি যাবো একেবারে উল্টোদিকে। গড়িয়ায় আমার এক বন্ধুর কাছে।

— চলুন না, সেখানেই আপনাকে আগে নামিয়ে দিয়ে আসি।

— না, না, আমি ট্যাক্সি ধরে নিচ্ছি একটা।

জয়ন্তীর মুখ তখনও ভয়ে পাংশু। রণবীর ঘুরে গিয়ে রাস্তার দিক দিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে গেল, সেই ফাঁকেই কাঁপা গলায় জয়ন্তী আমাকে ফিসফিস করে বললো, তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে?

আমি হালকাভাবে হেসে বললুম, না, শুধু তোমাকে আর একবার দেখতে এসেছিলুম।

খুব সেজেছে জয়ন্তী, একটা টকটকে লাল শাড়ি পরেছে। আমি সোজাসুজি ওর দিকে তাকালুম, তবুও লজ্জায় আরক্ত হলো না, তখনও ভয় কাটলো না।

ওদের সামনেই আমি চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম। চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে আজ সন্ধেবেলা, পৃথিবীতে আজকের দিনটা বড় মধুর। ট্যাক্সি প্রায় নাকতলা পর্যন্ত চলে আসার পর আমি ড্রাইভারকে বললাম, গাড়ি ঘুরাও! আবার চলে এলুম জয়ন্তীদের বাড়ির সামনে, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে ওপরে উঠে এলাম। এবার বেল টিপতেই ঝি দরজা খুলে দিল, আমি ভেতরে ঢুকে গিয়ে বাবলুকে বললাম, চলো, বাবলু, আমার সঙ্গে বেড়াতে চলো! জামা যা পরে আছো তাই ঠিক আছে, শুধু জুতোটা পরে নাও।

বাবলু নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। সেদিনের পর, বাবলুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমার একটু-একটু ভয় করছিল, যদি বাবলু আমার সঙ্গে আসতে না চায়? যদি হঠাৎ কেঁদে ওঠে? কিন্তু বাবলু আমাকে আগে খুব ভালবাসত, আমার সঙ্গে বেড়াতেও গেছে কয়েকবার। আমি ওর হাত ধরে বললাম, এসো, আমরা খুব সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যাবো। জুতো পরে নাও। মা রাগ করবেন না, এসো।

বাবলু আপত্তি করলো না, নেমে এলো আমার সঙ্গে। লেকের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে

দিলাম। বাবলু কোনো কথা বলছিল না তখনও, আমি আইসক্রিমের কাপ কিনে দিলাম ওর হাতে, তারপর লেকের মধ্যে ঢুকলাম। অন্ধকার দেখে বসলাম ঘাসের ওপরে। আমার সাদা প্যান্ট নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করলাম না।

ছোটো ছেলেরা অনেক কিছু বোঝে, আমরাই শুধু ওদের অবোধ ভাবি। আমরা আমাদের বাল্যকালটা ভুলে যাই, কয়েকটা ঘটনা মনে থাকলেও, ভুলে যাই সেই সময়ের মনটার কথা। বাবলু আমার গলার আওয়াজ শুনেই হয়তো কিছু একটা বুঝতে পেরেছিল, আস্তে-আস্তে ওর জড়তা ভাঙলো। বসার পর নিজে থেকেই বললো, অংশুমামা, আমি কার্শিয়াঙের স্কুলে পড়তে যাব!

আমি বললাম, তোমার মন কেমন করবে না?

— না। মা বলেছেন, প্রত্যেক গ্রীষ্মের ছুটি আর পুজোর ছুটির সময় আমাকে নিয়ে আসবেন।

— বাঃ। তাহলে তো খুবই ভালো। ওখানে অনেক ভালো ভালো ছেলে পড়ে, তোমার অনেক বন্ধু হবে। পড়াশুনোও খুব ভালো হবে। তোমার কিন্তু ফার্স্ট হওয়া চাই।

বাবলু লাজুকভাবে হাসলো, আমি অন্ধকারেও তা দেখতে পেলাম। বাবলুর সঙ্গে আমি পড়াশুনো নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, বাবলু, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলার জন্য আজ এখানে ডেকে এনেছি।

বাবলু উদ্‌গ্রীবভাবে বললো, কী?

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম। মনে-মনে একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম, আমার সাত বছর বয়েসের চেহারাটার কথা, কিন্তু মনে পড়লো না। একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি, ছেলেবেলায় অনেক ঘটনার আমরা মানে বুঝতে পারি না— বড়দের অনেক কথা আমাদের কানে অদ্ভুত লাগে। তার বহুদিন পর, যৌবনে বা মধ্য বয়েসে বিদ্যুতের মতন সেইসব মনে পড়ে যায়— তখন তার মানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, বাবলু, তুমি যখন বড় হবে, তখন বুঝতে পারবে— আমরা যারা তোমার গুরুজন, আমরা তোমাদের অনেক মিথ্যে কথা বলি। আমরা নিজেরা অনেক অন্যায় করেও তোমাদের অন্যায় করতে বারণ করি। বাবলু, আমিও জীবনে অনেক ভুল করেছি, অনেক দোষ করেছি, কিন্তু সেজন্য আমি আর কারুর কাছে ক্ষমা চাইবো না— আমি তোমার কাছে শুধু ক্ষমা চাই, শুধু তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

বাবলু খুব বেশি চমকে গেল না। স্থিরভাবে আমার দিকে চেয়ে একটু দুর্বলভাবে বললো, কেন, অংশুমামা, কেন?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। আজ থেকে পনেরো-কুড়ি বছর বাদেও যাতে ওর আজকের এই সন্দেহটার কথা মনে থাকে, সেইজন্য প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে, দু'তিনবার করে বলতে লাগলাম, আমি ক্ষমা চাইছি— তার মানে, তোমাকে ক্ষমা করতে বলছি না, তোমাকে ক্ষমা করতে বলছি না, তোমাকে ক্ষমা করতে বলছি না— ক্ষমা চাওয়াটা আমার দরকার, আমার দরকার, আমার দরকার—

একটা চিনেবাদামওয়ালা ঘুরতে-ঘুরতে এদিকে এসেছিল বলে আমি থেমে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। লোকটা হয়তো আমাকে পাগল ভাববে। বাবলু নিথর হয়ে বসে আছে। ওর এই বসে থাকার দৃশ্য— আজ থেকে পনেরো-কুড়ি বছর বাদে নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আমি শিশুদের সঙ্গে বেশি মিশি নি— ওদের সঙ্গে ঠিক কী ভাষায় কথা বলতে হয় আমি জানি না— কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, একদিন না-একদিন আমার কথা ও বুঝতে পারবে।

আইসক্রিমের ফেনা লেগে আছে ওর মুখের পাশে, আমি রুমাল বার করে দিয়ে বললাম,

এই নাও, মুছে নাও। বাবলু মুখ মুছে রুমালটা আমাকে ফেরত দিয়ে বললো, অংশুমামা, আমরা লেক দেখবো না ?

— এই তো লেক। আমরা তো লেকেই বসে আছি।

— জলের কাছে যাবো না ?

— যাবো, একটু পরে। তোমাকে আর কয়েকটা কথা বলে নিই ! এই লেক তো এখানেই থাকবে চিরকাল, তুমি বড় হয়ে আবার কতবার এখানে নিজে-নিজে আসবে। একদিন ঠিক এই জায়গাটায় এসে বসো— জায়গাটা মনে থাকবে তো ? তাহলে মনে পড়বে অংশুমামা একদিন এখানে বসে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। সেদিন যদি আমার ওপর খুব রাগ হয়, তুমি প্রতিশোধ নিও। কারুকে ছেড়ো না। বড় হয়ে যার-যার ওপর তোমার রাগ হবে— তুমি কারুকে ক্ষমা কোরো না। বাবলু, আমি তোমাকে কোনো উপদেশ দেবো না। বড় হয়ে তুমি ভেবে দেখো, আমরা যারা তোমার গুরুজন, আমরা কী কী অন্যায় করেছি— তুমি নিজের জীবনে সেগুলো আর কোরো না। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, আমরা মানুষের মধ্যে অনেক অন্যায় দেখেছি, কিন্তু আমরা নিজেদের তা দেখে শোধরাতে পারি নি, কিন্তু তোমাদের পারতে হবে! মনে থাকবে ?

বাবলু খুব চিন্তিতভাবে মাটি থেকে ঘাস ছিঁড়তে লাগলো। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসেছে, হঠাৎ যেন ওর বয়েস অনেক বেড়ে গেছে, মাঠে ছুটোছুটি করার ইচ্ছে একটুও নেই। আমি বললাম, তোমার মা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, তাঁকে কখনো কষ্ট দিও না।

অপ্রত্যাশিতভাবে বাবলু হঠাৎ বললো, আর রণবীর কাকা ?

ছোটো ছেলেদের এই রহস্য আমরা বুঝতে পারবো না। হঠাৎ রণবীরের কথা কেন ওর মনে পড়লো এই সময় ? আমারই তো মনে পড়ে নি। কিংবা আমি হয়তো জোর করেই রণবীরের কথা মনে করতে চাই নি। আমি বাবলুর হাত ছুঁয়ে বললাম, রণবীর কাকাও তোমাকে খুব ভালবাসবেন। নিশ্চয়ই ভালবাসবেন। চলো, এবার আমরা জলের কাছে যাই।

বাবলুর হাত ধরে সমস্ত লেকটা একবার চক্কর দিলাম। কী একটা অকারণ উত্তেজনায় শরীরটা তখনও একটু-একটু কাঁপছে, কিন্তু মনটা হালকা হয়ে গেছে একেবারে। সেই অন্ধকার হাওয়ার সন্ধ্যায় হাঁটতে-হাঁটতে মনে হলো, বহুদিন এমন স্বচ্ছন্দ আনন্দের সঙ্গে হাঁটি নি।

বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির কাছে ফিরতেই দেখলাম, দরজার সামনে অনেক ভিড়। রণবীর নেই, কিন্তু জয়ন্তীর মুখ উদ্‌ভ্রান্ত, পাশে ঝি— এবং বাড়ির সব লোক নেমে এসেছে। ট্যাক্সি থেকে বাবলুর হাত ধরে নামতেই জয়ন্তী ছুটে এসে বাবলুকে আঁকড়ে ধরে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন তাকাল আমার দিকে। ঝি তো জানতোই আমি বাবলুকে নিয়ে গেছি, তবু জয়ন্তী কি আমাকে ছেলে-চোর ভেবেছিল ? এতটা ও ভাবতে পারে ?

তবু আমি লাজুকভাবে হেসে বললাম, হঠাৎ বাবলুকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। আর তো বহুদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে!

তারপর বাবলুর দিকে ফিরে বললাম, বাবলু, মনে থাকবে তো ?
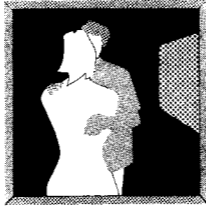
গভীর গোপন

বিকেলবেলাটা ছিল শুধু আমার ছুটি। বিকেলবেলা আমি বেড়াতে বেরুতাম একা-একা। বাজার কিংবা বৈদ্যনাথের মন্দিরের দিকটায় যেতে আমার একটুও ভালো লাগতো না। বম্পাস টাউন ঘুরে আমি চলে যেতাম নন্দন পাহাড়ের দিকে, লাল ধুলোর রাস্তায় একা-একা হাঁটতে-হাঁটতে আমি মনে-মনে কথা বলতাম নিজের সঙ্গে। ঐটা আমার অনেকদিনের দোষ, বেশ কিছুক্ষণ একা থাকলেই নিজের মনে-মনে কথা বলি।

দেওঘরে, ঐ শীতের সময়, আমার বয়েসী বাঙালি ছেলে চোখে পড়তো খুবই কম। পূজোর সময় দল বেঁধে অনেক ছেলেই আসে, কিন্তু শীতকালে সাধারণত বুড়ো-বুড়িদেরই ভিড়। মাঝে- মাঝে আমার বয়েসী দু-একটি ছেলেকে দেখলে আমি সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকতাম কিন্তু বড় লাজুক ছিলাম আমি, যেচে কারুর সঙ্গে কথা বলা কিংবা আলাপ করা আমার স্বভাবে মোটেই ছিল না। দিনের পর দিন আমি শুধু বাবা-মা আর বাড়ির মালি, বাজারের দোকানদার, দুধওয়ালা, ডিমওয়ালা ছাড়া আর কোনো কথা বলার লোক পেতাম না, এমন কেউ ছিল না—যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়।

নন্দন পাহাড়ে যাবার রাস্তায় একটা বাড়ির দিকে রোজ আমার চোখ আটকে যেত। একটা সাদা রঙের একতলা বাড়ি, বাড়িটার চারপাশে অনেকখানি বাগান, গেটের ঠিক সামনেই দুটো প্রকাণ্ড ইউক্যালিপটাস গাছ। বাড়িটার সব ঘরে নীল পর্দা লাগানো, সব ঘরে নীল আলো জ্বলতো সন্ধেবেলা। বাড়িটা ছিল বড় মোহময় রহস্যময় আমার কাছে। বাড়িটার ভেতর থেকে প্রায় প্রতি সন্ধেবেলাই গানের আওয়াজ ভেসে আসতো। প্রথম-প্রথম আমি ভাবতাম বুঝি গ্রামোফোনের রেকর্ড, খানিকটা চেনাচেনা গান, দারুণ সুরেলা গলা। কিন্তু দু-একদিন বাদেই বুঝতে পেরেছিলাম, রেকর্ড নয়, কেউ খালি গলায় এমনিই গায়—কেননা, দু-এক লাইন গানের পরেই হঠাৎ ভেসে আসে হাসির আওয়াজ, দারুণ উচ্ছ্বসিত হাসি, যেন এক সঙ্গে শত-শত কাচের বাসন ভেঙে পড়ছে। আমার খুব ইচ্ছে হতো, যে গাইছে তাকে একবার দেখার জন্যে। কিন্তু নীল পর্দার ভেতরের কিছুই দেখতে পাই নি।

নন্দন পাহাড়ে যাওয়া এবং আসার পথে আমি ইচ্ছে করে থামতাম বাড়িটার সামনে।

শুধু-শুধু তো আর একটা বাড়ির সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তাই আমি ইউক্যালিপটাসের শুকনো পাতা কুড়োবার ছুতো করতাম। আমরা যে-বাড়িতে থাকতাম, সে-বাড়িটার মাঠেও ছিল ইউক্যালিপটাস গাছ—সুতরাং রাস্তা থেকে পাতা কুড়োবার কোনো দরকারই ছিল না। তবু আমি ইউক্যালিপটাসের পাতা নিয়ে হাতে গুঁড়িয়ে ভেঙে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকতাম আর আড়চোখে তাকিয়ে থাকতাম বাড়িটার দিকে। কোনো-কোনোদিন একেবারে বাড়িটার লোহার গেটের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি।

দেওঘরের সেই জানালায় নীল পর্দা দেওয়া সাদা একতলা বাড়িটার গেটের সামনে, হাতে ইউক্যালিপটাসের পাতা নিয়ে আমার দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা আমার বুকের মধ্যে আজও গেঁথে আছে। কারণ সেইখানেই আমি কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। আমি ভীরু-ভীরু রহস্যময় জগৎ থেকে কঠিন বাস্তব জগতে প্রথম পা দিয়েছিলাম।

একদিন ঐ রকম বাড়িটার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়োবার ছলে ভেতরের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ গেটের সামনে একটা টাঙ্গা এসে থামলো। কোঁচানো ধুতি ও ফিনফিনে পাঞ্জাবির ওপর দামী শাল জড়ানো দু'জন বেশ বড়লোক-বড়লোক চেহারার লোক তা থেকে নামলো। একজন আমাকে মিষ্টি করে প্রশ্ন করলো, তোমার এখানে কী চাই ভাই ?

তখন আমার যা বয়েস, তাতে দোকানদার-টাররা সবেমাত্র আপনি বলে কথা বলা শুরু করলেও অন্যরা তখনও তুমি বলে। কিন্তু আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্যদের মুখে তুমি শুনলে তখন আমি একটু চটতে শুরু করেছি। সদ্য তো ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি সে বছর!

ভদ্রলোকটি যদিও আমাকে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যেন আমি কোনো কিছু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, না, কিছু না, এই ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়োচ্ছিলাম!

— তুমি কোথায় থাকো ?

— আমরা থাকি পুরানদায়!

— সেই পুরানদা থেকে এখানে এসেছো পাতা কুড়োতে ? তোমাকে কালও দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।

— আমি নন্দন পাহাড়ে গিয়েছিলাম তো।

— নন্দন পাহাড়ে গিয়েছিলে ? একা ? তোমার সঙ্গে কেউ নেই ?

ততক্ষণে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। আমি কী অপরাধ করেছি তা জানি না, কিন্তু লোক দুটো যদি হঠাৎ আমাকে ধমকাতে শুরু করে ? যদি চোর বলে ? আমি তাড়াতাড়ি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, আমার বাবা-মা দু'জনেরই অসুখ !

অন্য লোকটি এবার বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, চল্ সুখেন ! ও ছেলেমানুষ, এমনি নিজের মনে খেলা করছে!

লোক দু'টি গেট ঠেলে ভেতরে চলে গেল। ছেলেমানুষ বলতেও আমার রাগ হলো না, তবু তো খুব জোর বেঁচে গেছি! ইস্, যদি চোর বলতো, তাহলে কী হতো! ভেতরে সে-মেয়েটি গান করছিল, তা থেমে গেল হঠাৎ!

আমাদের পুরানদায় আসতে গেলে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। পৌনে আটটার সময় জসিডি থেকে একটা ট্রেন ছাড়ে, সেই ট্রেন আসবার আগেই যাতে আমি রেললাইন পেরিয়ে আসি, আমার ওপর সেইরকম হুকুম ছিল। ট্রেন আসার শব্দ বাবা-মা বাড়িতে বসেই শুনতে পেতেন, প্রায় সমস্ত দেওঘরের লোকই শুনতে পায়। ট্রেন আসার পরও আমি বাড়ি না ফিরলে

বাবা-মা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়তেন আমার জন্য।

যদিও, আমার তখন সতেরো বছর বয়েস, আমি কি আর ট্রেনলাইন পার হতে পারি না? কিন্তু বাবা-মা'র চিন্তার জন্য আমাকে পৌনে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হতো।

আমার বাবা-মা'র দু'জনেরই অসুখ। মা ভুগছেন অনেক দিন থেকেই হাঁপানিতে, আগে তবু বছরের দু-একমাস মাত্র বেশি কষ্ট পেতেন, অন্য সময়টা চলাফেরা করতে অসুবিধে হতো না। কিন্তু একবছর ধরে মা একেবারে শয্যাশায়ী, সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান শীতের সময়। তাই ডাক্তার বলেছেন, অন্তত একমাস-দেড়মাস কোনো শুকনো শীতের জায়গায় কাটিয়ে না এলে মায়ের উপকার হবে না। ডাক্তার বলেছিলেন দেরাদুন কিংবা সিমলার কথা—কিন্তু অতদূরে যাবার সামর্থ্য নেই বাবার, নেহাত এক বন্ধুর কাছ থেকে দেওঘরের এই বাড়িটার সন্ধান পেয়েছেন, সেইজন্য এখানে আসা। আমার বাবার বদলির চাকরির জন্য আমরা ছেলেবেলা থেকেই বিহারের নানা শহরে কাটিয়েছি। সুতরাং দেওঘরের কোনো নতুনত্ব নেই আমার কাছে।

আমার বাবার অসুখ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আমার বাবা বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যও খারাপ নয়, বাহান্ন বছর বয়সেও বাবার একটাও চুল পাকে নি। কিন্তু আমার বাবার হার্টের অসুখ। হার্ট ডাইলেশান না কী যেন অসুখটার নাম। বাবা বেশিক্ষণ হাঁটতে পারেন না, বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেন না, কোনো ভারি জিনিস তোলা নিষেধ। কারুর ওপর রাগারাগি করা তো একদমই বারণ। ডাক্তার কাকা বিশেষ করে আমাকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, শোনো তপু, তোমার ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে। তোমাকে খুব ধীরস্থির হয়ে সবদিক বুঝে শুনে চলতে হবে। তোমার কোনো ব্যবহারে যদি তোমার বাবা উত্তেজিত হন, কিংবা রাগারাগি করেন—তাহলে তার ফল খুব খারাপ হবে, হয়তো একটা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যদি বাবাকে বাঁচাতে চাও, তাহলে খুব সাবধানে—

অসুখ হয়ে বাবা আর মা খুব মজা পেয়ে গেছেন। আমাকে বাড়িতে বন্দী করার উপায় পেয়ে গেছেন ভালোমতন। এক বছর আগেও আমি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরতাম, দল বেঁধে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সিনেমার লাইনে, দুপুরবেলা পড়ার নাম করে গেছি পাশের বাড়িতে ক্যারাম খেলতে। বাবা-মা বকাবকি করেছেন, আমি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছি।

কিন্তু বাবা যেদিন আমাকে বকুনি দিতে-দিতে হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, আমার মাথা ঘুরছে, আমার গা-টা কেমন যেন করছে, শিগ্‌গির ডাক্তার ডাক—সেইদিন থেকে আমার অনেক কিছু বদলে গেল। এখন বাধ্য হয়ে আমি বাবার সব কথা মেনে চলি, কলেজে ভর্তি হয়েও যে একটু বড়োদের মতন আনন্দ করে বেড়াবো তারও উপায় নেই, আমাকে ঠিক সময় বাড়ি ফিরে আসতে হয়। আর যাই হোক, আমার বাবা-মারা যান্‌ এটা তো আমি চাই না ! বাবা কিংবা মা এরা কেউ একদিন থাকবেন না, একথাটা এখনো মেনে নিতেই পারি না কিছুতে।

দেওঘরে, আমি বলতে গেলে এখন সংসারের অভিভাবক। মা তো বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না, বাবাও পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে হার্টটাকে একটু সুস্থ করে নেবার চেষ্টা করছেন। আমার বাবা আর মা—দু'জনেরই এমন অসুখ যে, তা কোনোদিনই আর সম্পূর্ণ সারবে না, শুধু সাবধানে চললে একটু ভালো থাকবেন। আমিই এখানে সকালবেলা বাজার করি, যে কম্পাউন্ডার রোজ বাবাকে আর মাকে ইঞ্জেকশান দেবে, আমিই তাকে যোগাড় করে দিই। বাড়ির মালি আর তার বউ আমাদের রান্না করে দেয়—তারা জিনিসপত্র চুরি করে কিনা, মায়ের নির্দেশে আমাকেই সে নজর রাখতে হয়। আর আমার ছোট ভাই বিলটুকেও সামলাতে হয় আমাকে। বিলটুর বয়েস

এখন পাঁচ বছর, ভারি দুরন্ত ছেলে সে। আর সে তো বাবার হার্টের অসুখের কথা বোঝে না, তাই কথায়-কথায় সে অবাধ্য হয়, আমিই শাসন করি ওকে। বিশেষ করে ও যাতে কুয়োর ধারে চলে না যায়, সেটা দেখা আমারই দায়িত্ব।

একমাত্র বিকেলবেলা আমার ছুটি। বাবাই বলেছেন সে কথা। মা'কে বাবা একদিন বললেন, তপুর বড্ড খাটুনি যাচ্ছে, ওরও তো একটু খেলাধুলো করতে ইচ্ছে করে ! বাবা আমার খেলাধুলোর জন্য আগে রাগারাগি করতেন, এখন তিনিই আমাকে খেলাধুলো করতে পাঠাতে চান! কিন্তু একা-একা তো খেলাধুলো করা যায় না। দেওঘরের মতন জায়গায় কারুকে চিনিও না, সুতরাং ঐ সময়টা শুধু আমি একা-একা বেড়াতে যেতাম।

মা'কে হাত ধরে-ধরে এনে বসিয়ে দিতাম আমাদের বাড়ির ছোট্ট বাগানটার পাথরে বাঁধানো বেদিতে। বাবা বসতেন একটা চেয়ার পেতে। বিলটু আপন মনে খেলা করতো। বিলটু যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য আমি বেরুবার সময় ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে যেতাম বাগানের গেট। প্রত্যেকদিন বেরুবার মুখে বাবা বলতেন, ট্রেন আসবার আগেই ফিরবি কিন্তু! অত তাড়াতাড়ি ফিরতে একটুও ইচ্ছে করতো না আমার—কিন্তু আমার জন্য দুশ্চিন্তা করলে বাবার হার্টের অসুখ বেড়ে যাবে—সুতরাং না ফিরে উপায় কি!

প্রথম-প্রথম নানা দিকে যেতাম। কখনো ঘুরতাম মাঠের মধ্যে একা-একা। কখনো চলে গেছি জসিডির দিকে। জসিডি তো মোটে মাইল চারেক দূরে। নদীর ওপারে ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কোনো-কোনোদিন দেখেছি তিরতিরে জলে ছোট-ছোট মাছদের খেলা। কিন্তু নন্দন পাহাড়ের রাস্তায় সেই নীল পর্দা লাগানো বাড়িটা আমার এমন কৌতূহল আকর্ষণ করে নিল যে, তার পরদিন থেকে আমি প্রত্যেকদিন ঐ একই রাস্তায় যেতাম।

বাড়িটা এমন কিছু অসাধারণ তো ছিল না। দেওঘরে ওর চেয়ে সাজানো সুন্দর আরও অনেক বাড়ি আছে। হাসপাতাল ও হাইস্কুলটা পেরিয়ে এলেই আর একটা বাড়ি ছিল, সেই বাড়িটার বাগান গোলাপ ফুলে-ফুলে একেবারে ছয়লাপ। সে বাড়িটায় সবসময় হৈ-চৈ লেগেই আছে, সামনের লম্বা বারান্দায় এক দঙ্গল ছেলেমেয়েকে দেখেছি প্রত্যেকদিন। ফ্রক পরা দু-তিনটে মেয়ে ছিল, আর একটি মেয়েকে দেখলেই মনে হতো সদ্য শাড়ি পরেছে। সেই মেয়েটিকে দেখতে ছিল অনেকটা আমার রাণুমাসীর মতন, যে রাণুমাসীকে আমি এক সময়ে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতাম।

কিন্তু, সে বাড়িটার দিকে আমি যাবার পথে দু-এক পলক তাকিয়ে দেখতাম শুধু, কিন্তু কখনো থমকে দাঁড়াই নি সেখানে। সমবয়েসী মেয়েদের চোখে চোখ পড়লে তখন আমি অকারণে লজ্জা পেতাম। একদিন ও-বাড়ির দু'টি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুব হাসছিল, হয়তো এমনিই হাসছিল, মেয়েদের তো আর হাসির জন্য কারণের দরকার হয় না। তবু আমার মনে হয়েছিল, ওরা বুঝি আমারই দিকে তাকিয়ে হাসছে—আমার পাগুলো লম্বা-লম্বা, আমার জামার একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে বলে সেপটিপিন লাগিয়েছি, সেজন্য দারুণ লজ্জা করতো আমার।

অথচ সেই নীল পর্দা দেওয়া বাড়িটা ছিল আমার কাছে রহস্যময়। সে বাড়িতে যে গান গায়, তাকে আমি চোখে দেখি নি, তাকে দেখার জন্য আমার অদম্য ইচ্ছে হতো। সেদিন সেই লোক দু'জনের সঙ্গে দেখা হবার পর, ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় ভয়ে আমার গা ছম্‌ছম্ করতো, যদি আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি আবার এসেছো ? আর ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়োবার সাহস হয় না, কিন্তু ওখান দিয়ে যাবার সময় খুব আস্তে-আস্তে যাই, মনে-মনে এই ভেবে ভরসা আনার চেষ্টা করি, এটা তো সরকারি রাস্তা, এখান দিয়ে আমি আস্তে-আস্তেই যাই কিংবা জোরেই যাই, কার কী ? রাস্তা থেকে ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়োলেই বা কার কী বলার আছে ?

২

নন্দন পাহাড়ে একদিন সেই লোক দুটোকে দেখলাম। আমি উৎসুকভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, তাদের সঙ্গে আর কেউ আছে কিনা। কোনো মেয়ে থাকলে হয়তো বুঝতে পারতাম কে গান গায়। কিন্তু আর কেউ ছিল না ! লোক দুটো পাহাড়ের ওপর এসেও পাহাড় দেখছে না, দেখছে না মাথার ওপর দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত আকাশ, দেখছে না পাশা খেলার রঙিন ছকের মতন নিচের শস্যক্ষেত। নন্দন পাহাড়টা খুব বেঁটে আর ছোটখাটো পাহাড়, কিন্তু ওর ওপরে উঠলেই দেখা যায় দু'পাশে দুই মেঘ ছোঁয়া গিরি—এক পাশে ত্রিকুট, অন্য পাশে দিগরিয়া, ঐ দুটো পাহাড় দেখার জন্য নন্দন পাহাড়ে উঠতে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু ঐ লোক দু'জনের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই, ওরা পাহাড়ের মাথাতে উঠেও নিজেদের মধ্যে মগ্ন হয়ে কি সব যেন আলোচনা করছে। আমি দু-একটা কথা শুনতে পেলাম, বারো হাজার টাকা...

... একটু চাপ দিলে সাড়ে বারো হাজার হয় না ?... আরে টাকার জন্য কি আছে, আসলে যদি জিনিস পছন্দ হয়...

কথা বলতে-বলতে একজন লোক আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। এই সেই লোকটি, যে সেদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিল। আমার হঠাৎ আবার একটু-একটু ভয়ে গা শিরশির করে উঠলো। লোকটা কি আমাকে চিনতে পারবে ? যদি এখানেও আমাকে বকুনি লাগায় ? আমি কী দোষ করেছি, তা জানি না, একটা বাড়ির ভেতর থেকে গানের আওয়াজ শুনে সে বাড়ির দিকে ঘনঘন কয়েকবার তাকানো কি দোষের ? লোকটি কিন্তু আমাকে চিনতে পারলো না, কিংবা চিনলেও গ্রাহ্য করলো না। আবার সঙ্গীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, ভাবছি, আগামী সোমবার নাগাদ এখান থেকে পাটনা চলে যাবো! তার সঙ্গী বললো, এই সোমবার ? এত তাড়াতাড়ি!

লোকটিকে দেখে আমার ভয় পাবার কোনো কারণই ছিল না। কিন্তু মানুষের ইনস্টিংক্ট বোধহয় কখনো-কখনো ভবিষ্যৎ ঘটনারও আঁচ পায়। তখন একথা আমার মনে ঘুণাক্ষরেও জাগে নি—এক সময় এই লোকটিই হয়ে উঠবে আমার জীবনের কঠিনতম শত্রু।

লোক দু'টি পাহাড় থেকে নেমে আসার পর আমিও এলাম ওদের পেছন-পেছন। সেদিন আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, এক্ষুনি ট্রেন এসে পড়বে, তার আগেই আমায় পৌছুতে হবে বাড়িতে। ট্রেন পাস করার পরও বাড়ি না পৌছুলে বেড়ে যাবে বাবার হার্টের অসুখ। আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম। ছুটেও লাইন পেরুতে পারলাম না, আমার সামনে দিয়েই ঝম্‌ঝম্‌ করে ট্রেন এসে ঢুকলো প্ল্যাটফর্মে, আর আমি দেখলাম একটা সেকেন্ড ক্লাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন নীলাঞ্জন মেসোমশাই।

নীলাঞ্জন মেসোমশাই আর নন্দিতামাসী থাকেন শিমূলতলায়। নীলাঞ্জন মেসোমশাই ওখানে রেলস্টেশনে কাজ করেন। সপ্তাহে একবার দু'বার করে এসে তিনি আমাদের খবর নিয়ে যান। নীলাঞ্জন মেসোমশাইকে দেখে আমার খুব আনন্দ হলো, ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বাবা-মা আর আমায় বকতে পারবেন না !

নীলাঞ্জন মেসোমশাই একা এসেছেন, নন্দিতামাসীকে আনেন নি। আমাকে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি তো অবাক। বললেন, আরে, তপু যে কী করে জানলে, আমি এই ট্রেনে আসবো !

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ওঁর সুটকেশটা তুলে নিলাম।

— মা কেমন আছেন ? বাবা ?

— ভালো আছেন। এই সপ্তাহে মা'র একবারও টান ওঠে নি!

— আর তোমার বাবা বেশি হাঁটাহাঁটি করেন নি তো।

— না।

— বাজারে কে যায় ?

— আমি।

— বাঃ! দেখো, বাবাকে একদম বেরুতে দিও না।

লোকেরা অন্য বাড়িতে গিয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের খবরই আগে নেয়। কিন্তু আমাদের বাড়িতে সবাই এসে শুধু জিজ্ঞেস করে, বাবা কেমন আছে ? মা কেমন আছে ? কেউই আমার কিংবা বিল্টুর কথা জিজ্ঞেস করে না। বিল্টু আর আমার গত দু'বছরের মধ্যে একবারও অসুখ করে নি।

নীলাঞ্জন মেসোমশাই কথায়-কথায় একটা দারুণ খবর দিলেন। বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বললেন, পরশু পাটনায় গিয়েছিলাম। ওদের সব দিলাম আপনাদের খবরাখবর!

পাটনা শুনেই আমার বুকটা ধক্ করে ওঠে। পাটনায় আমার মামার বাড়ি, ওখানে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছি আমি। ওখানেই আমি প্রথম, আমার বারো বছর বয়েসে রাণুমাসীর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে গিয়ে হঠাৎ এক সময় অব্যক্ত একটা আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম।

নীলাঞ্জন মেসোমশাই বললেন, ওখানে রাণুর তো এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাই রাণু আসতে চাইছিল আপনাদের এখানে। কয়েকদিন এসে থাকতে পারতো, আপনাদেরও সুবিধে হতো—

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি আনলেন না রাণুমাসীকে ?

বাবাও বললেন, হ্যাঁ, নিয়ে এলেই পারতেন। দীপু একা-একা সবদিক সামলাতে পারে না!

নীলাঞ্জন মেসোমশাই বললেন, আমার ঠিক অফিসের কাজে ভাগলপুর হয়ে ফিরতে হলো! সঙ্গে আনতে পারলাম না।

—তা রাণু তো একাই আসতে পারে!

—সেই কথাই তো বলে এসেছি। পাটনা থেকে ট্রেনে কেউ চড়িয়ে দিলে জসিডিতে এসে নামবে। তারপর ওখান থেকে এইটুকু... দেখবেন হয়তো কাল পরশু এসেও পড়তে পারে !

—তারপর থেকে দু-তিনদিন আমার আর নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া হলো না। আমার একমাত্র কাজ হলো, সকাল-বিকেল শুধু স্টেশনে এসে প্রতীক্ষায় বসে থাকা। যদি রাণুমাসী আসে! রাণুমাসী এলে আমার দিন কত আনন্দে কাটবে—সেই কল্পনাতেই আমি মশগুল হয়ে রইলাম। রাণুমাসী এলে আমি সত্যিকারের একজন সঙ্গী পাবো, সারা দুপুর গল্প করবো দু'জনে, রাণুমাসীকে আমি নিয়ে যাবো নন্দন পাহাড় দেখাতে।

পাটনায় চার বছর আগে রাণুমাসীকে যখন শেষবার দেখেছি, তখন রাণুমাসীর বয়েস সতেরো—হাইস্কুলের পাশের বাড়িটায় নতুন শাড়ি-পরা যে-মেয়েটিকে দেখি, তার মতন। এখন রাণুমাসী অনেক বড় হয়েছেন, এখন কি খুব বদলে গেছেন ? আমি স্টেশনের সিগনাল পোস্টটাকে সম্বোধন করে আপন মনে বললুম, রাণুমাসী, তুমি আমায় ভুলে যাও নি তো ? তুমি আমায় আগের মতনই ভালবাসো ?

দু-তিনদিন ট্রেনে কত লোক এলো গেল, রাণুমাসী এলো না। রাণুমাসী সত্যিই ভুলে গেছে। তিনদিন বাদে রাণুমাসীর চিঠি এলো, কলেজের মেয়েরা মিলে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা দেখতে যাচ্ছে, তাই রাণুমাসীও গেছে তাদের সঙ্গে। শান্তিনিকেতন আগে কখনো যায় নি রাণুমাসী, তাই এ সুযোগ ছাড়তে চান নি। সুতরাং এবার আর দেওঘর আসা হলো না। সে

চিঠিতে আমার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে নি রাণুমাসী ! মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয় !

তীব্র অভিমানে আমার বুক ভরে রইলো তার পরের কয়েকদিন। রাণুমাসী তো এলোই না, এই ক'দিন আমার নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়াও হলো না। এই ক'দিন দেখি নি সেই নীল পর্দা-ঘেরা সাদা বাড়ি। শুনি নি সেই ভেসে আসা গান। রাণুমাসীর ওপর অভিমান থেকেই সেই নীল পর্দা-ঘেরা বাড়িটার ওপর টান আরও বেড়ে গেল। মনে হলো, সমস্ত দেওঘরে ঐ বাড়িটাই আমার একমাত্র আকর্ষণ।

সেদিনও নন্দন পাহাড় থেকে ফেরার পথে বাড়িটার সামনে দিয়ে আস্তে-আস্তে আসছি। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠেছে সন্ধ্যাবেলাতেই, আকাশে অসংখ্য তারায় তারাময়। এত তারা কলকাতা কিংবা পাটনার আকাশে কোনোদিন দেখা যায় না। অল্প-অল্প হাওয়ায় ভেসে আসছে নানারকম ফুলের মিষ্টি গন্ধ, ইউক্যালিপটাসের ঘ্রাণই সবচেয়ে তীব্র, ভারি সুন্দর লাগছিল বলেই একাকিত্বের কষ্টটা আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল।

সেদিন মনে হলো যেন ঐ বাড়িটার বাগানে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ছায়ার মতন মানুষ। চেনা গলার গানও ভেসে আসছে সেখান থেকে। কিছুতেই আর তখন বাড়িটার সামনে থেকে সরে আসার ইচ্ছে হলো না। ট্রেন আসার তখনও ঢের দেরি। আমি প্রথমে জুতোর ফিতে বাঁধার ছল করে রাস্তার ওপর নুয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে-মনে কাতরভাবে বললাম, আমাকে ওরা একটু ভেতরে ঢুকতে দিতে পারে না ? আমি তো আর কিছু চাই না, শুধু একটু কাছে বসে গান শুনতে চাই, একটু মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই !

বেশিক্ষণ জুতোর ফিতে বাঁধার অভিনয় করা যায় না। সিধে হয়ে দাঁড়াতেই হলো, তবু ইচ্ছে করে না চলে যেতে। কে গাইছে গানটা—তাকে দেখার একটা দুর্দমনীয় বাসনা আমার বুকের মধ্যে। কেন যে আমার ঐ রকম ইচ্ছে হয়েছিল, তা বড়দের বোঝানো যাবে না। ছেলেবেলায় মাথার মধ্যে যখন একটা ঝোঁক চাপে, তখন কিছুতেই সেটা আর মন থেকে তাড়ানো যায় না। যতদূর সম্ভব চোখ উজ্জ্বল করে ভেতরে তাকালাম। মনে হলো চার পাঁচজন নারী-পুরুষ, অন্তত দু'টি মেয়ে আছে ওদের মধ্যে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় মুখ দেখা যায় না! ওরা গেট থেকে বেশ অনেকখানি দূরে। আমার মনে হলো, ওরা আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। এখানে জ্যোৎস্না রাতে রাস্তার আলো জ্বলে না, রাস্তাটা বেশ অন্ধকার। সুতরাং, আমি যদি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনি, কেউ লক্ষই করবে না আমাকে।

নির্জন রাস্তা, মাঝে-মাঝে ঝম্‌ঝম্‌ আওয়াজ করে চলে যাচ্ছে দু-একটা টাঙ্গা। পায়ে হাঁটা মানুষ প্রায় নেই। দারুণ শীত পড়েছে, কোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি গেটের সামনে। তন্ময় হয়ে গান শুনছি।

হঠাৎ ভেতর থেকে চিৎকার এলো, কে ওখানে ?

আমি ছিট্‌কে সরে আসবার আগেই ওদের একজন টর্চ ফেললো আমার মুখে। দারুণ শক্তিশালী টর্চ, আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে, আমি ওদের কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না।

ওদের একজন বললো, আরে, এ তো সেই ছেলেটা ? ক'দিন আগেও দেখেছিলুম গেটের সামনে ঘুরঘুর করছে!

আমি ততক্ষণে পেছন ফিরে দৌড়োতে শুরু করেছি। যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম, যদি বলতাম, আমি এমনিই এখানে দাঁড়িয়ে গান শুনছি, তাহলে সেটা কি খুব অন্যায় হতো ? কিন্তু সেসব ভাবারই সময় ছিল না আমার। কিছু যেন একটা অন্যায় করছি, এই রকম অনুভূতিই পেয়ে বসেছিল আমাকে প্রথম থেকে। ছুটতে-ছুটতেই শুনলাম, কে যেন একজন বলছে, কি চায়

ছেলেটা। ওর মতলব কি?

আমার ধারণা হয়েছিল, ওরা বুঝি আমাকে তাড়া করে আসবে। আমি পড়ি কি মরি বলে ছুটছি। একটা টাঙ্গায় চাপা পড়তে–পড়তে বেঁচে গেলাম। ছুটতে–ছুটতে যখন রেললাইনের ধারে এলাম, তখন প্রায় ট্রেন এসে পড়েছে। আমি বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে তবু লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম লাইন, বাড়ি যখন পৌঁছেছি, তখন সেই শীতের রাতেও দরদর করে ঘামছি আমি।

বাড়ি ফিরে দেখি, বাগানে একা মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন বিল্‌টুকে নিয়ে। বাবা নেই। আমাকে দেখেই মা বললেন, তুই আজও ট্রেনের আগে ফিরতে পারলি না? দ্যাখ গে, তোর বাবার বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে আবার, ভেতরে শুয়ে আছে !

আমি কোনো কথা বললুম না, চুপ করে রইলাম। মা আবার বললেন, তপু, তুই কী বল তো? তোর একটু দায়িত্বজ্ঞান নেই? তোর যদি কিছু একটা হয়–টয়, আমরা এই অচেনা জায়গায় কী বিপদে পড়বো বল তো ! আমরা দু'জনেই রুগী মানুষ—

আমার অনুতাপ হলো। সত্যিই তো, নীল পর্দা–ঘেরা বাড়িটার মোহে আমি বাবা–মাকে আবার কষ্ট দিচ্ছি। অথচ, ও বাড়িটা আমাকে কি দিচ্ছে? কিছুই না! হঠাৎ অভিমানে প্রায় কান্না এসে গেল। আমার কোনো বন্ধু নেই, আমাকে কেউ ভালবাসে না। রাণুমাসীও আমাকে ভুলে গেছে।

৩

এক সময়ে রাণুমাসীই ছিল আমার বন্ধু। আমার কোনো ভাইবোন ছিল না, ছেলেবেলায় আমার আর কোনো বন্ধুও ছিল না। বাবার বদলির চাকরি বিহারের নানা শহরে আমরা ঘুরে বেড়াতাম বছর–বছর। ধানবাদে যখন ছিলাম, তখন আমার বয়স ন'বছর, স্টেশনের খুব কাছেই একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমরা থাকতাম। বাড়িটার সামনে একটা ছোট মাঠ ছিল, সেখানে মা আর আমি অনেক যত্ন করে তৈরি করেছিলাম একটা বাগান।

ধানবাদে আমার দু'জন বন্ধু হয়েছিল, পোস্টমাস্টারের মেয়ে সুরযকুমারী আর প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টারের ছেলে ভগীরথ। ধানবাদে স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলাম আমি, কিন্তু আবার হঠাৎ বাবার বদলির অর্ডার এলো। আবার যেতে হবে মুঙ্গের।

সেবার আমাদের কান্না পেয়ে গিয়েছিল। মা বাবাকে গঞ্জনা দিয়ে বলেছিলেন, আরও তো কত মানুষ চাকরি করে, তোমার মতন এমন পোড়ার ছাই চাকরি আর কেউ করে না। তখন আমাদের ধানবাদের বাড়ির বাগানে চন্দ্রমল্লিকা ফুটতে শুরু করেছে, মা বেগুন গাছের চারা পুঁতেছিলেন, সেই গাছে সবেমাত্র ছোট্ট–ছোট্ট বেগুন হয়েছে সাদা রঙের—সব ফেলে আমাদের চলে যেতে হলো।

সেবার যাবার সময় আমরা বাগান থেকে চন্দ্রমল্লিকা আর বেগুন গাছের চারাগুলো উপড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। মুঙ্গেরের বাড়িতে বাগান করার জায়গা ছিল না, তবু উঠোনে সেগুলো পুঁতে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচলো না। গাছগুলো যেমন বাঁচলো না, তেমনি সুরযকুমারী কিংবা ভগীরথের স্মৃতিও আমার মন থেকে মুছে গেল আস্তে–আস্তে। আজ যদি কোথাও সুরযকুমারীকে দেখি, তাহলে চিনতেও পারবো না। অথচ কী বন্ধুত্বই ছিল তার সঙ্গে, রেল কোয়ার্টারের পার্কে কতদিন দুপুরবেলা টেঁক–কুচকুচ খেলেছি তার সঙ্গে।

আমি লাজুক ধরনের ছেলে ছিলাম। মুঙ্গেরে গিয়ে আবার নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে আমার অনেক দেরি লাগলো। বাবা অফিসে চলে যান, মা সংসারের কাজে ব্যস্ত, আমার

কোনো সঙ্গী ছিল না। বছরের মাঝখানে এসেছি বলে, কোনো স্কুলেও আমাকে ভর্তি করা হয় নি।

মুঙ্গেরে নতুন করে কোনো বন্ধু হবার আগেই আবার বাবা বদলি হলেন দুম্‌কায়। প্রথম কিছুদিন বাবা একা গিয়ে দুম্‌কায় রইলেন, আমরা মুঙ্গেরেই থেকে গেলাম। বার বার জিনিসপত্র টানাটানি করায় খরচও যেমন, ঝামেলাও কম নয়। কিন্তু মাস দেড়েক বাদেই বাবা দুম্‌কা থেকে লিখলেন যে পাঞ্জাবি হোটেলে খেয়ে-খেয়ে তাঁর রক্ত-আমাশার মতন হয়েছে, এভাবে তাঁর শরীর টিকছে না। এদিকে মুঙ্গেরে আমি আর মা-ও খুব ভয়ে-ভয়ে থাকতাম। মুঙ্গেরে চুরি-ডাকাতি প্রায়ই লেগে থাকতো, একদিন তো আমাদের পাশের বাড়িতেই চুরি হয়ে গেল। রাত্তিরে ভয়ে আমাদের ঘুম আসতো না। মা আর আমি জেগে বসে থাকতাম জানালার কাছে।

সুতরাং আবার আমরা চলে এলাম দুম্‌কায়। দুম্‌কায় আমরা টানা দেড় বছর ছিলাম। সেখান থেকে আবার যখন বাবাকে ভাগলপুরে বদলি করলো, তখন মা বললেন, এমনভাবে চললে, ছেলেটার লেখাপড়া হবে কী করে? এক-এক বছর এক-এক ইস্কুল,—ছেলেটার ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে না? বাবাও চিন্তিতভাবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক করে ফেললেন, আমাকে পাটনায় মামার বাড়িতে রাখা হবে। আমি কিন্তু যেতে রাজি হলুম না, কেঁদে-কেটে বাড়ি একেবারে মাথায় করে তুললুম। আমার তখন এগারো বছর বয়েস, সেই বয়েসের ছেলেরা বাবা-মাকে ছেড়ে অনায়াসেই থাকতে পারে। কিন্তু আমার কোনো ভাইবোন ছিল না, কোনো বন্ধু ছিল না, বাবা-মাই ছিলেন আমার দু'জন মাত্র বন্ধু। তাঁদের বাদ দিয়ে যে জগৎ, সেটা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। আর, সেই বয়েসটায় যা অচেনা, তাই বিভীষিকাময়।

তবু আমাকে জোর করে পাটনায় রেখে আসা হলো। সারা রাস্তায়, ট্রেনে, আমি কেঁদে চোখ লাল করেছিলাম। মায়ের মুখটা যতবার মনে পড়ছিল, মুচড়ে-মুচড়ে উঠছিল আমার বুক। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, মাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবো না মামাবাড়িতে। দু-এক মাসের মধ্যেই আমার এমন অসুখ করবে যে আমাকে বাবা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন। মাকে ছেড়ে বাবাই যখন থাকতে পারেন না, আমিই বা তাহলে থাকবো কেন?

কিন্তু এক মাসের মধ্যেই আমি মামাবাড়ির আবহাওয়ায় খাপ খেয়ে গেলাম। দেওয়ালীর ছুটিতে বাবা আমাকে ভাগলপুরে নিয়ে যাবার জন্য এলেন—তখন আমি গেলাম অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে। এবং ছুটি ফুরোবার আগেই আবার পাটনায় ফিরে আসবার জন্য উতলা হয়ে উঠলাম।

পাটনায় আমি বন্ধু পেয়ে গিয়েছিলাম। পাটনায় আমার তিনজন মাসী ছিল। তারাই হয়ে উঠলো আমার বন্ধু। মাসীদের বয়েস চোদ্দ, সতেরো আর কুড়ি। নন্দিতা, বরুণা আর দীপ্তি। এর মধ্যে নন্দিতামাসী বেশ ভারিক্কি ধরনের, গুরুজন-গুরুজন ভাব, তাঁর বিয়ের কথাবার্তাও চলছে। আর দীপ্তিমাসীর বয়েস আমার চেয়ে মাত্র তিন বছর বেশি—তার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে মারামারিও বেধে যেত।

প্রথম-প্রথম এসে যখন মায়ের জন্য লুকিয়ে কাঁদতাম, তখন দীপ্তি মাসী আমাকে ঠাট্টা করে রাগাতো। আমাকে কাঁদতে দেখলেই বলতো, এ-মা, এত-বড়-ছেলে কাঁ-দে! এ-মা! আর নন্দিতামাসী এসে বকুনি দিয়ে বলতো, এই তুই কাঁদছিস্ কেন! ছি-ছি-ছি, তুই বড় হয়েছিস না! চোখ মুছে ফ্যাল! আবার যদি কাঁদিস তোর ইস্কুলের বন্ধুদের বলে দেবো! জানিস তো, পাটনার ছেলেরা কক্ষনো কাঁদে না! এমনকি, হাত কেটে রক্ত বেরুলেও এখানকার ছেলেরা হাসতে পারে।

একমাত্র, মেজমাসী বরুণা, যার ডাক নাম রাণু, সে-ই আমাকে বকতোও না রাগতোও না। আমাকে ছাদের সিঁড়িতে বসে লুকিয়ে কাঁদতে দেখলেই রাণুমাসী এসে আমার পাশে বসে

পড়তো, আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে মিষ্টি গলায় বলতো, আর কাঁদিস না, লক্ষ্মী ছেলে, এই তো দেওয়ালীর ছুটিতে আবার মাকে দেখতে পাবি ! কাঁদছিস কেন, আমরা তো রয়েছি।

রাণুমাসীর কথা শুনে আমার আরও বেশি কান্না পেত, কিন্তু ভালোও লাগতো খুব। আমি রাণুমাসীর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সব কান্না ফুরিয়ে ফেললাম। আমার হৃদয়ে যতখানি কান্না জমা ছিল, চোখের ভেতরে ছিল যত জল, সব খরচ হয়ে গেল। অনেকটা রাণুমাসীর জন্যই আমি মায়ের বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলেছিলাম।

পাটনার ছেলেদের সঙ্গে, যে ছেলেরা ছুরিতে হাত কেটে গেলেও হাসতে পারে, আমার অনেকদিন বন্ধুত্ব হয় নি। ইস্কুল থেকে সোজা বাড়ি চলে আসতাম, খেলা করতাম মাসীদের সঙ্গে। ছাদে নেট টাঙিয়ে আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলা হতো, কিংবা সারা বাড়িতে হুটোপুটি করে আমরা চোর-চোর খেলতাম।

মাসীরাই আমার প্রথম বন্ধু। অবশ্য মাসীদের তখন যা বয়েস তাতে আমার মতন একটা এগারো বছরের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার কথা নয়। ওদের তখন সমবয়েসী ছেলেদের সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখানোরই কথা। কিন্তু বড় মামা ছিলেন বড্ড কড়া ধরনের মানুষ। বাড়ির মেয়েদের একদম বাইরে বেরুতে দিতেন না, অন্য ছেলেদের ঘেঁষতে দিতেন না বাড়ির ধারে কাছে। নন্দিতা মাসীকে তো ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর কলেজে পড়তেই দিলেন না। রাণুমাসী আর দীপ্তিমাসী ইস্কুলে যেত দারোয়ানের সঙ্গে, ছুটির সময়ও দারোয়ান না পৌছানো পর্যন্ত ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে হতো ইস্কুলে গেটের সামনে। একদিন দারোয়ানের যেতে খুব দেরি হওয়ায় ওরা নিজেরাই চলে এসেছিল বলে কী বকুনিই খেয়েছিল সেদিন! বড় মামার গলার আওয়াজে সারা বাড়ি গম্‌গম্‌ করে কেঁপেছিল।

তিন মাসীই আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু আমি ভালবাসতাম রাণুমাসীকে। হ্যাঁ, ভালবাসাই তো তার নাম, সত্যিকারের নিখাদ ভালবাসা, যে ভালবাসার মধ্যে কোনো স্বার্থের সম্পর্কমাত্র নেই। রাণুমাসী প্রথম দিন থেকেই আমার মন জয় করে নিয়েছিলেন। আমি রাণুমাসীর পেছনে-পেছনে ছায়ার মতন ঘুরতাম। মনে-মনে আমি ছিলাম ক্রীতদাস। আমাকে তিনি সামান্য একটা কাজের ফরমাস করলে, আমি ধন্য হয়ে যেতাম একেবারে। 'তপু, যা তো, ছাদের ঘর থেকে গঁদের শিশিটা নিয়ে আয় তো।' শোনা মাত্র আমি তীর বেগে ছুটে যেতাম সিঁড়ি দিয়ে। ছাদের ঘরে তখন দীপ্তিমাসী ক্যালেন্ডারের পাতা দিয়ে বই বাঁধাচ্ছে। গঁদের শিশি তারও দরকার। আমি বললাম, এই দীপ্তিমাসী গঁদের শিশিটা এক্ষুনি দাও তো !

দীপ্তিমাসী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন কী করবি ?

— দাও না, ভীষণ দরকার। এক্ষুনি!

— কি দরকার বলবি তো ! দেখছিস, আমি কাজ করছি!

— রাণুমাসী চেয়েছে ! এক্ষুনি দাও।

— ছোড়্দি চেয়েছে ! দাঁড়া একটু বাদে দিচ্ছি।

— না, আগে দাও ! তোমার থেকে রাণুমাসীর ঢের বেশি দরকার !

— ইস্, ভারি যে! চুপ করে দাঁড়া ওখানে! নয়তো কাগজের এইখানটা একটু চেপে ধর তো।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। টপ্ করে গঁদের শিশিটা তুলে নিয়েই দে ছুট ! দীপ্তিমাসী রেগে উঠে, এই পাজি ছেলে, এই শিগ্‌গির দে—বলতে-বলতেই আমি ততক্ষণে আবার নিচে। হাঁপাতে-হাঁপাতে গঁদের শিশিটা রাণুমাসীর সামনে এমনভাবে রাখলাম, যেন রাজ্য জয় করে এসেছি। রাণুমাসী একটা চিঠির খাম জুড়বে, সেইজন্য আঠার দরকার।

আমার তিন মাসীই সুন্দরী ছিল, অন্তত আমার চোখে সুন্দর মনে হতো। নন্দিতামাসীর

চেহারা ভারি গড়নের, হাঁটার ভঙ্গিতে গজেন্দ্রগামিনী, তাঁর বিয়ের কথাবার্তা চলছে বলে সবসময়ে সেজে গুজে থাকেন। দু'বেলায় স্নান করে উঠে নন্দিতামাসীই শুধু স্নো মাখেন। ছোটমাসী দীপ্তি তখনও ফ্রক পরে, মাঝে-মাঝে কখনও শাড়ি। হাঁটাচলার মধ্যে সবসময় একটা ছটফটে ভাব, নাকটা খুব টিকোলো। দীপ্তিমাসী প্রায়ই নন্দিতামাসীর স্নো চুরি করে, ধরা পড়লে ছুটে পালায়। দীপ্তিমাসীর সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাঁটি, এমনকি মারামারিও হয়েছে দু-একবার! দীপ্তিমাসীর সঙ্গে আমি গায়ের জোরে পারতাম না, ও ছিল আমার চেয়ে তিন বছরের বড়ো। একদিন আমি ওর গানের খাতা নিয়ে পড়ছিলাম বলে এমন মারামারি লাগলো যে দু'জনের ঘরের মেঝেতে ঝটাপটি, শেষ পর্যন্ত দীপ্তিমাসী আমার বুকের ওপর বসে পড়ে গুমগুম করে কিল মারতে লাগলো। রাণুমাসী এসে ছাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে দীপ্তিমাসীকে রাগাবার জন্য আমরা সবাই বলতাম, হামিদাবানু ! আমাদের র‍্যাপিড রিডারে হামিদাবানু বলে একজন মেয়ে-কুস্তিগিরের ছবি ছিল। কিন্তু দীপ্তিমাসীর একটা গুণ ছিল, বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতো না। খানিকটা বাদেই সব ভুলে গিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতো, তপু, তোর খুব লেগেছে ? আর মারবো না কোনোদিন।

রাণুমাসীকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম বলে, রাণুমাসীই আমার সবচেয়ে সুন্দরী মনে হতো। রাণুমাসী ঠিক রোগা নয়, কিন্তু ছিপছিপে চেহারা। টানাটানা দুটো চোখ, আর চোখের পল্লবগুলো কি বড়ো বড়ো ! সাজপোশাকের দিকে কোনো মানোযোগ ছিল না রাণুমাসীর, পিঠের ওপর ছড়ানো একরাশ চুল, বেণী বাঁধতো না প্রায়ই। কাপড়-চোপড়ও পরতো এলোমেলোভাবে। স্নো-পাউডার মাখতো না রাণুমাসী, তবু আমি তার কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেই একটা চমৎকার সুগন্ধ পেতাম। সে গন্ধ তার চুলের না চোখের চাহনির, না হাসির, না সম্পূর্ণ শরীরের—তা জানতে পারি নি, কিন্তু সেই সুগন্ধ আমার কাছে অত্যন্ত সত্য। রাণুমাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই গন্ধটাও ভালবাসতাম।

রাণুমাসী খুব গল্পের বই পড়তে ভালবাসতো। প্রায়ই তাকে দেখতাম, ছাদের সিঁড়ির জানালায় বসে বই পড়ছে। আমি রাণুমাসীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলতাম, কি পড়ছো ? গল্পটা বলো না।

রাণুমাসী কোনো কোনোদিন বলতো, এ তুই বুঝবি না। এটা বড়দের গল্প।

আমি বলতাম, হ্যাঁ, বুঝতে পারবো! তুমি বলো! আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি!

—তুই বড় হয়ে গেছিস ? কত বড়ো ?

—আমি তো এখন প্রায় দীপ্তিমাসীর সমান লম্বা!

—শুধু লম্বা হলেই বড়ো হয় না। অনেক কিছু বুঝতে শিখলে তারপর বড়ো হয়। তুই এই সব ব্যাপার এখন বুঝতে পারবি না।

এটা ঠিক, আমার মাঝে-মাঝেই মনে হতো, বড়দের জগতে কতগুলো রহস্য আছে, যা আমি এখনও বুঝি না। বড়োরা অদ্ভুত কারণে হাসে, অদ্ভুত কারণে রেগে যায়! বড়োরা অনেক সময়ই নিশ্চয়ই ছোটদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, এবং সেই সব ষড়যন্ত্রের কথা ছোটদের শুনতে দিতে চায় না। বড়োমামা আমাকে তো প্রায়ই বলেন, তপু, এখন এখান থেকে যাও! এখানে বড়োদের কথা হচ্ছে। ছোটদের থাকতে নেই। বড়োদের কী এমন কথা যা ছোটদের সামনে গোপন রাখতে হবে ? নিশ্চয়ই ছোটদের বিরুদ্ধে কোনো কথা। এসব ব্যাপার নিয়ে আর কারুর কাছে প্রতিবাদ জানানো যেত না। কিন্তু রাণুমাসীকে আমি বলতাম, তুমি বলোই না গল্পটা, আমি ঠিক বুঝতে পারবো।

রাণুমাসী তখন বলতো শুনবি ? তাহলে শোন্! শেখর বলে একটা ছেলে ললিতা বলে একটা

মেয়েকে ভালবাসতো—ভালবাসতো কাকে বলে বুঝিস্ ?

— হ্যাঁ!

— বুঝিস্ ! ইস্, ছেলে একেবারে পাকা।

রাণুমাসী তখন আমার হাত টেনে জড়িয়ে ধরে হাসতো। সে হাসি আর থামে না। আমি লজ্জা পেয়ে হাত ছাড়িয়ে সরে যেতাম। আমার বলতে ইচ্ছে করতো, আমিও তোমায় ভালবাসি! শেখর বলে ঐ গল্পের বইয়ের ছেলেটা আর ললিতাকে কতটা ভালবাসে, তার থেকে আমি তোমাকে ঢের বেশি ভালবাসি। কিন্তু লজ্জায় একথাটা বলতে পারতাম না!

যে-কোনো ভাবে রাণুমাসীর একটু সেবা করার জন্য, রাণুমাসীকে একটু খুশি করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। রাণুমাসীর গলার আওয়াজ, তার কাপড়ের খসখসানি—সবই শুনতে ভালো লাগতো আমার। এমনকি রাণুমাসী যে জায়গাটা দিয়ে হেঁটে যেত, সেই জায়গাটাকে আদর করতে ইচ্ছে করতো। রাণুমাসী ময়লা ব্লাউজটা কাচতে দেবার জন্য ফেলে রাখলেও আমার ইচ্ছে করতো, সেটার গন্ধ শুঁকি!

একদিন রাণুমাসী ঐ রকম জানালার বেদিতে বসে গল্পের বই পড়ছে। আমি তাকে বললাম, রাণুমাসী, তোমার জন্য একটা বালিশ এনে দেবো!

রাণুমাসী তার বড়ো-বড়ো চোখ দু'টিতে বিস্ময় ফুটিয়ে বললো, কেন রে, বালিশ কি হবে?

—তুমি বালিশটা পিঠের কাছে দিয়ে বসবে, তাহলে তোমার আরাম লাগবে।

রাণুমাসী পুরো এক মিনিট স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বই ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে-করতে বললেন, তপু, তুই সত্যি আমাকে ভালবাসিস্! তোর মতন আমাকে আর কেউ ভালবাসে না।

রাণুমাসীর সেই কথা শুনে যে অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার শরীর আবেগে কাঁপতে লাগলো! রাণুমাসী যে আমার ভালবাসার কথা বুঝতে পেরেছেন, সেটাই আমার ছোট্ট জীবনে সবচেয়ে বড় কথা। রাণুমাসী তার পাতলা নরম দু'টি ঠোঁট দিয়ে আমার গলার কাছে আদর করছে, আর আমি শুঁকছি তার চুলের দুর্বোধ্য গন্ধ।

ক্রমে-ক্রমে রাণুমাসী আমার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লো নিজের জিনিসপত্রের ব্যাপারে। পড়াশুনো করতে বসে রাণুমাসী জিজ্ঞেস করে, তপু, দ্যাখ তো আমার রবারটা কোথায়, খুঁজে পাচ্ছি না? আমিই তখন খুঁজে দিই সেটা। কিংবা, তপু, কলমে কালি ভরে দিতে পারবি ? আমি তক্ষুনি রাজি। কিংবা, তপু, আমার সাদা রুমালটা দু'দিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না—সারাবাড়ির জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে আমি বার করি সেই সাদা রুমাল।

একথা ঠিক নন্দিতামাসীও আমাকে ভালবাসতো। নন্দিতামাসীই আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যত্ন করতেন খুব। দাদু দিদিমা বেঁচে নেই, বড়োমামা আর মামীকে আমি যেন ভয় করে চলতাম, নন্দিতামাসীই দেখতেন আমি ঠিক জলখাবার খাচ্ছি কি না। ভাত খাবার সময় আমার মাছের কাঁটা বেছে দিতেন নন্দিতামাসী। আর দীপ্তিমাসীর সঙ্গে আমার যতই ঝগড়া মারামারি হোক, আমার জামার বোতাম সেলাই করে দিত দীপ্তিমাসী; প্যান্টের পকেটগুলো প্রায়ই ফুটো হয়ে যেত, তার জন্যও আমি দীপ্তিমাসীর শরণাপন্ন হতাম। রাণুমাসী ওসব সেলাই-ফেলাই নিয়ে মাথা ঘামাতো না, খাওয়ার দিকেও তার তেমন মনোযোগ ছিল না। রাণুমাসীর ছিল শুধু ঐ বই পড়ার নেশা। তবু আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল রাণুমাসীর দিকে। আমি যে রাণুমাসীর সেবা করতাম, সেটা ছিল নিতান্তই একতরফা, রাণুমাসী যে আমার সেবা গ্রহণ করতো তাতেই ধন্য হয়ে যেতাম আমি।

মাঝে-মাঝে ক্যারাম খেলতাম আমরা চারজনে। আমি সবসময় হতাম রাণুমাসীর পার্টনার।

ব্যাডমিন্টন খেলতেও তাই। রাত্তিরবেলা কখনো খুব ঝড়-বৃষ্টি হলে আমার গা ছম্ছম্ করতো, বজ্রপাতের শব্দ শুনলে আমি একা থাকতে পারতাম না, তখন গা ঘেঁষে বসতাম রাণুমাসীর। রাণুমাসী তখন আমায় গল্প বলতো অনেক—। একদিন মাঝ রাতে ঐ রকম ঝড়ের আওয়াজে ভয় পেয়ে আমি রাণুমাসীদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। সে রাতটা আমি ঘুমিয়েছিলাম রানুমাসীকে জড়িয়ে ধরে।

মামাবাড়ির পেছনে একটা পুকুর ছিল। জল বেশ নোংরা। সেটায় আমাদের নামা বারণ। তবু, বর্ষার সময় খুব বৃষ্টি হলে পুকুরটা যখন টইটম্বুরভাবে ভরে যেত, তখন, বড়োমামা অফিস যাবার পর আমরা ওখানে স্নান করতে লাগতাম। আমি সাঁতার জানতাম না, আমি ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে জল ঘোলা করতাম, তিন মাসী সাঁতার দিতে-দিতে চলে যেত মাঝ পুকুর পর্যন্ত। নিজেদের মধ্যে জল ছিটিয়ে ওরা খেলা করতো জলপরীদের মতন।

দীপ্তিমাসীটা প্রায়ই আমাকে ভয় দেখাতো জলে নেমে। এইবার তপুকে ডুবিয়ে দেবো—এই বলে আমার পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত অনেকখানি গভীর জলে। আমি আঁকুপাঁকু করতাম ভয়ে, আর দীপ্তিমাসী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলতো, পা ছোঁড়, নইলে ডুবে যাবি। আমি দিশেহারা হয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইতাম দীপ্তিমাসীকে, আর ও হি-হি করে হাসতো।

রাণুমাসী তাড়াতাড়ি এসে বলতো, কেন ছেলেটাকে ভয় পাওয়াচ্ছিস ! আয় রে তপু, আমি তোকে সাঁতার শিখিয়ে দিচ্ছি ! এই আমি তোকে ধরছি, তোর কোনো ভয় নেই, তুই এক সঙ্গে হাত আর পা ছুড়বি, বুঝলি ?

আমার তখন প্রায় বারো বছর বয়েস, অত বড় ছেলেকে তো আর কেউ কোলে নেয় না, কিন্তু জলের মধ্যে নিয়মকানুন অন্য। রাণুমাসী আমাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে সাঁতার শেখাতে লাগলেন।

কোনো পুরুষ বন্ধু ছিল না, তিন মাসীই ছিল আমার বন্ধু, তবু আমি যেন আনন্দেই ছিলাম। অনেকের ধারণা, এই রকম অবস্থায় ছেলেদের স্বভাবটা মেয়েলি হয়ে যায়। মোটেই তা নয়, আমার বরং অনেক উপকারই হয়েছিল। আমি মিথ্যা কথা বলতে শিখি নি, গালাগাল শিখি নি, মেয়েদের সম্পর্কে অস্বাস্থ্যকরভাবে উঁকিঝুঁকি মারার কৌতূহলও আমার জাগে নি। আমার স্কুলের সহপাঠীরা সেই বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে কি সব অদ্ভুত রকমের খারাপ কথা বলতো। সে সব শুনলে আমার গা রি-রি করতো, আমি মেয়েদের সম্মান করতে শিখেছিলাম। ভালবাসতে শিখেছিলাম, তাদেরও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণুমাসীর প্রতি ভালবাসা আমার জীবনে একটা পবিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। হায়, শেষ পর্যন্ত রাণুমাসীই তা ভেঙে দিলেন।

আমাদের এই আনন্দের জগৎ বেশি দিন টিকলো না। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি গেলাম মা-বাবার কাছে, ওঁরা তখন টাটানগরে থাকেন। বাবা আশা করেছেন, টাটানগর থেকে ওঁকে আর বদলি করা হবে না। ওখানেই পাকাপাকি থাকবেন—আর আমাকেও এখানকার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন। কিন্তু, তাতে আমার ঘোর আপত্তি। সেবার টাটানগরে পৌছুবার কয়েকদিন বাদেই আমার একটি ভাই জন্মালো। নতুন ভাই পাবার আনন্দে কয়েক সপ্তাহ বেশ কেটে গেল। ছোট্ট একটা তুলতুলে বাচ্চা একদিন বড়ো হয়ে আমাকে দাদা বলে ডাকবে, এটা ভাবতেই কেমন যেন লাগে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি পাটনা ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠলুম। আমার তিন মাসীই মাকে যখন চিঠি লেখে, তাতে থাকে আমার কথা, কিন্তু রাণুমাসীই আমাকে একটা আলাদা চিঠি লিখলো মায়ের খামে। চার লাইনের সেই চিঠিটা যে আমি কতবার পড়েছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। পাটনায় ফেরার জন্য আমি যখন বাবাকে খুব জ্বালাতন করতে লাগলাম, তখন বাবা ঠিক করলেন, আমার ভাই যতদিন না একটু বড় হয়, ততদিন আমি পাটনাতেই থাকবো।

পাটনায় পৌঁছে দেখলাম, আমার মাসীদের একজন নতুন বন্ধু জুটেছে, তার নাম রথীনদা। রথীনদা বড় মামীমার ভাই, কি একটা ওষুধের কোম্পানিতে চাকরি করেন, বদলি হয়ে এসেছেন পাটনায়। বড়োমামা অন্য কোনো ছেলেদের সঙ্গে নিজের বোনদের মিশতে দেন না, কিন্তু নিজের শ্যালক সম্পর্কে নির্বিকার, তাছাড়া বড়োমামা এমনিতে রাশভারি হলেও নিজের বৌকে ভয় করেন যথেষ্ট।

রথীনদাকে প্রথম থেকেই আমার অপছন্দ হলো, প্রত্যেক দিন বিকেলের পর তিনি আসতেন আমাদের বাড়িতে, মাসীদের সঙ্গে গল্প করার সময় আমার দিকে এমনভাবে তাকাতেন যে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম, উনি চান না আমি সেখানে থাকি। আমি কিন্তু যেতাম না তা বলে। আমি রাণুমাসীর পাশে চুপ করে বসে থাকতাম।

কিন্তু ক্যারাম খেলায় কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলায় আমি নিয়মিত বাদ পড়তে লাগলাম। ওরা এখন চারজন, আমাকে আর দরকার নেই। রাণুমাসীর জন্য আগে আমিই লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই এনে দিতাম, এখন রথীনদাই নতুন-নতুন বই নিয়ে আসে। ওদের খেলার পাশে আমি বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকি। আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলারও অবকাশ হয় না ওদের।

রথীনদা প্রায়ই আমায় শক্ত-শক্ত ইংরেজি বানান জিজ্ঞেস করে সবার সামনে অপদস্ত করতে ভালবাসতেন। আমি রাইনোসেরাস বানান বলতে না পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছি, আর রথীনদা হো-হো করে হাসছেন, সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলেছেন, এঃ হে, ছেলেটাকে একেবারে মেয়েলি করে তুলছো তোমরা!

তারপর রথীনদা, আমাকে ডেকে বলতেন, এই খোকা, এদিকে আয়, শোন তো! তুই এক্সসারসাইজ করিস ?

আমি ভয়ে-ভয়ে বললুম, না।

— সেইজন্যই তো এরকম লালটু-মার্কা চেহারা হচ্ছে! দেখি, মাস্‌ল দেখি! ফোলাতো।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রাণপণে হাতের মাস্‌ল ফোলালাম, আর রথীনদা এমনভাবে বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার মাস্‌ল টিপে দিলেন যে আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম, আর রথীনদা হাসতে লাগলো। আশ্চর্য, আমার একজন মাসীও প্রতিবাদ করলো না, বরং তারাও হাসতে লাগলো। দীপ্তিমাসীটা তো হাসবে জানিই, নন্দিতামাসীও হাসতে পারে, তা বলে রাণুমাসীও ?

একদিন একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস আমি দেখে ফেললাম। সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল, রথীনদা অনেকক্ষণ পর্যন্ত রইলেন মামাবাড়িতে। খেয়েও নিলেন ওখানে। তারপর সবার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, তুমি এখানে কেন ডেঁপো ছেলে ? যাও, ঘুমোও গে! বড়ো মাসীও বললেন, যাও তপু, শুয়ে পড়ো! আমি কাতরভাবে তাকালাম রাণুমাসীর দিকে। রাণুমাসী কিছুই বললো না আমার হয়ে। রাণুমাসী কি জানে না যে, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমার একা একা থাকতে ভয় করে; আমি কি শুধু বড়োদের গল্প শোনার জন্য বসে আছি! রাণুমাসীর কি দরকার এখানে গল্প শোনার, রাণুমাসী তো বলতে পারতো, চল তপু, তোতে আমাতে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে গল্প করি। রাণুমাসী কিছুই বললো না, আমি মন খারাপ করে উঠে এলাম।

শুয়ে রইলাম চাদর মুড়ি দিয়ে কিন্তু ওদের কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ আমার কানে আসছে। তারপর একসময় বুঝতে পারলাম রথীনদা নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে, কে একজন তাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সঙ্গে। একটু বাদেই দেখি, আমার ঘরে ঢুকেছে রথীনদা আর নন্দিতামাসী। ওদের দেখেই আমি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছি—পাছে এখনো আমি ঘুমোই নি বলে বকুনি খাই!

রথীনদা নন্দিতামাসীকে বললেন, বৃষ্টিটা আর একটু না কমলে বেরুনো যাবে না! আর একটু

বসে যাই বরং। নন্দিতামাসী বললেন, হ্যাঁ, বসুন না। বড় বৌদিকে ডাকবো ?—না, দিদিকে ডাকতে হবে না। তুমিই থাকো না একটু। আপত্তি আছে ? দিদি হয়তো শুয়ে পড়েছে—তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

— না, না, আপত্তি কী !

— আসলে, তোমাকে একটা কথা বলার আমার ইচ্ছে। তোমাকে কক্ষনো একা পাই না—

— আমাকে কি বলবেন ?

—নন্দিতা তোমাকে আমার দারুণ ভালো লাগে। তুমি এত সুন্দর...

বলতে-বলতেই রথীনদা কিরকমভাবে যেন জড়িয়ে ধরলেন নন্দিতামাসীকে। নন্দিতামাসী ত্রস্তে বলে উঠলেন, ওকি, ওকি করছেন। এখানে তপু শুয়ে আছে।

মুহূর্তে নন্দিতামাসীকে ছেড়ে রথীনদা কাত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, ও তো ঘুমোচ্ছে !

রথীনদা এগিয়ে এসে আমার মুখের সামনে মুখ এনে কী যেন দেখলেন। আমি তখন ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ বুজে আছি। আমার দৃঢ় ধারণা, আমি ঘুমোই নি জানতে পারলে, রথীনদা নির্ঘাত আমাকে মারবেন। রথীনদা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে গিয়ে বললেন, না, না, ও ঘুমিয়ে একেবারে কাদা।

রথীনদা আবার দরজার পাশটায় নন্দিতামাসীকে জড়িয়ে চেপে ধরে বললেন, তুমি এত সুন্দর, তোমাকে এত আদর করতে ইচ্ছে করে—

নন্দিতামাসী বললেন, না, না, প্লিজ ওরকম করবেন না, এই, এই...

আমি কৌতূহল সামলাতে পারি নি। মার খাবার ঝুঁকি নিয়েও সামান্য চোখ পিটপিট করে দেখছি। নন্দীতামাসীর মুখখানা কি রকম বোকা-বোকা হয়ে গেল। নন্দিতামাসী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যাঃ আপনি এমন অসভ্য—

তারপর রথীনদা আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিলেন। রথীনদার মুখটাও আজ অদ্ভুত, সম্পূর্ণ অন্যরকম। নন্দিতামাসীকে জড়িয়ে ধরে টেনে আনলেন। সেই সময় নন্দিতামাসী কিন্তু সত্যিকারের ভয়পাওয়া গলায় বললেন, না, না আর কিছু না, আপনার পায়ে পড়ি—ও কি... না... না...

রথীনদা ফিসফিস করে বলছেন, কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।

— না, ছেড়ে দিন, আর একমাস বাদে আমার বিয়ে।—

— কোনো ভয় নেই।

— না ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন... ছে...।

— নন্দিতা, সোনা মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে।

তখন নন্দিতামাসী এক ধাক্কা দিয়ে রথীনদাকে সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে বললেন, যান্, আপনার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবো না। আপনি একটা—তপু বোধহয় সব দেখেছে।

রথীনদা ক্রুদ্ধভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি তখন আবার চোখ বুজে আছি। রথীনদা আবার ধরতে যেতেই নন্দিতামাসী এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললেন, বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এরপরও রথীনদা আবার ঠিকই নিয়মিত আসতে লাগলেন ও বাড়িতে। তবে লক্ষ করেছি, নন্দিতামাসী ওঁর সঙ্গে আর বিশেষ কথা বলেন না। নন্দিতামাসীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, একমাস দশদিন বাদেই বিয়ে।

আমিও রথীনদাকে দেখলেই পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াই। আমার শুধু ভয়, রথীনদা যদি কোনোক্রমে জেনে ফেলেন যে, সেদিন রাত্রের সেই ব্যাপার আমি দেখে ফেলেছি, তাহলে

নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবেন। সেদিন ঠিক কী হয়েছিল, আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু একটা কিছু অন্যায় যে হচ্ছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম। নন্দিতামাসী বার-বার অসভ্য–অসভ্য বলছিল কেন ? অসভ্য মানে তো খুব খারাপ।

নন্দিতামাসীর বিয়ের ঠিক দু'দিন আগে সেই ব্যাপারটা ঘটলো। সারা বাড়িতে খুব ব্যস্ততা, জিনিসপত্র কেনা–কাটা চলছে, ছাদে শুরু হয়ে গেছে ম্যারাপ বাঁধা। এই উপলক্ষে মা–বাবাও এসেছেন। বড়ো মাসীমা রাণু রাণু বলে ডাকছেন, কিন্তু রাণুমাসীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একটু আগে রাণুমাসীকে আমি পুকুরের দিকে যেতে দেখেছিলাম, তাই ওদিকে খুঁজতে গেলাম রাণুমাসীকে।

সন্ধে হয়ে গেছে, পুকুরধারটা আবছা–আবছা অন্ধকার, সেখানে গিয়ে দেখি, রথীনদা রাণুমাসীকে জড়িয়ে ধরেছে! আমাকে দেখেই ঝট্ করে দু'জনে আলাদা হয়ে গেল। সেই আবছা অন্ধকারেই বুঝতে পালাম, রাণুমাসীর মুখটা সেদিন রাত্রে নন্দিতামাসীর মতনই বোকা–বোকা হয়ে গেছে। আমি আড়ষ্টভাবে রাণুমাসীর হাত ধরে বললাম, রাণুমাসী, তোমায় বড়ো মাসীমা ডাকছেন।

রাণুমাসী বললো, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, তুই যা!

আমি কিন্তু রাণুমাসীর হাত ছাড়লাম না। আবার বললাম, এক্ষুনি চলো।

— যা না, বললাম তো আমি যাচ্ছি একটু বাদে।

— না, চলো।

রথীনদা এক ধমক দিয়ে বললেন, তোমাকে যেতে বলা হচ্ছে তুমি যাও! রাণু পরে যাবে। ওর সঙ্গে আমার জরুরি কথা হচ্ছে।

রথীনদা সম্পর্কে আমার কী করে সব ভয় ভেঙে গেল, তা আমি জানি না। আমি দুম্ করে বলে ফেললাম, রাণুমাসী। তুমি রথীনদার সঙ্গে কথা বলো না, রথীনদা অসভ্য!

রাণুমাসী রেগে গিয়ে বললেন, ওকি বিচ্ছিরি কথা! গুরুজনদের সম্পর্কে বুঝি ওভাবে কথা বলতে হয়!

রথীনদা বাঁকা হেসে বললেন, আমি দেখেই বুঝেছিলাম, ছেলেটা একেবারে এঁচোড়ে পাকা। তোমরাই ওকে লাই দিয়ে–দিয়ে—

আমার তখন কান্না পাবার মতন অবস্থা। আমি তখন মনে–মনে বলছি, রাণুমাসী, তুমি এই লোকটার সঙ্গে মিশো না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে আমি ওর চেয়ে অনেক— অনেক বেশি ভালবাসবো।

রথীনদা আমার চুলের মুঠি ধরে বললেন, তোমাকে যেতে বলা হচ্ছে সেটা বুঝি গ্রাহ্য হচ্ছে না ?

আমি হঠাৎ ফুঁসে উঠে বললাম, আপনি আমাকে মারবেন না বলে দিচ্ছি! আমি তাহলে সেদিনকার সব কথা বলে দেবো !

— কি বলে দিবি, অ্যাঁ? কি বলে দিবি ? হতভাগা ছেলে। রথীনদা আমাকে প্রবল এক চড় কষালেন। এক মুহূর্তের জন্য আমার সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। রথীনদা আবার বললেন, ফের যদি একটা কথা বলবি—

আমি ছুটে রাণুমাসীর কাছে আশ্রয় চাইবার জন্য তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

এই প্রথম রাণুমাসী আমাকে আশ্রয় দিল না। আমার কান ধরে বললো, তপু, তুই আজকাল এরকম অসভ্য হয়েছিস—

রাণুমাসী আমাকে বললো অসভ্য ! রথীনদাই অসভ্যতা করছে, তাকে কিছু বললো না, আর

আমাকে বললো—। প্রচণ্ড অভিমানে আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হলো।

নন্দিতামাসীর বিয়ের চার পাঁচদিন পরেই বাবা আমাকে জামসেদপুর নিয়ে এলেন। আমি নিজের কানে শুনেছি, রাণুমাসী মাকে বলছে, বড়দি, তপুর এখানে কিন্তু লেখাপড়া হচ্ছে না একদম! সব সময় বড়োদের সঙ্গে মিশতে চায়! পাটনার ইস্কুলগুলোও তো তেমনি, যতসব বখাটে ছেলে...।

রথীনদা মাকে বাবাকে শুনিয়ে মন্তব্য করলেন, আজকালকার ছেলেদের কিছুই তো আর শিখতে বাকি থাকে না—গোঁফ গজাবার আগেই একেবারে পেকে ঝুনো।—

পাটনা থেকে ফিরে প্রথম রাত্রে আমি একা ঘরে শুয়ে আছি। বাবা তখনও ফেরেন নি বাড়িতে। সেদিনও খুব বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, কিন্তু আমার আর ভয় করছে না। আমার শুধু বার-বার মনে পড়ছে রাণুমাসীর কথা। একা বিছানায় শুয়ে আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম, মনে-মনে বলতে লাগলাম, রাণুমাসী তোমাকে আমি এত ভালবেসেছিলাম, সব তুমি ভুলে গেলে ? আমাকে কেন তুমি এরকম দুঃখ দিলে ? কেন ! একবারও তো তুমি আমাকে পাটনায় থাকতে বললে না ! আমি তোমার চাকরের মতন হয়েছিলাম, তবু, তবু তুমি আমাকে এত কষ্ট দিলে কেন ?

আমার বারো বছরের অনভিজ্ঞ হৃদয় প্রবল অভিমান ও দুঃখে কেঁপে উঠেছিল। সেদিন আমি জানতাম না, মেয়েদের কাছ থেকে সারা জীবনে আমাকে আরও অনেক দুঃখ পেতে হবে।

আমি আবার পাটনায় ফিরে গিয়েছিলাম অবশ্য। কিন্তু রাণুমাসীর সঙ্গে সেই বন্ধুত্ব আর রইলো না। ক্রমশ আমি একা হয়ে গেলাম। এখন তো আমার কথা রাণুমাসীর মনেই পড়ে না।

৪

তারপর দিন দুয়েক আর ভয়ে ও-বাড়ির দিকে গেলাম না। নির্ঘাত ঐ লোক দুটো আমায় দেখলে ধরে থানায় দিয়ে দেবে ! ওরা বোধহয় আমাকে চোর-টোর ভেবেছে !

তৃতীয় দিনের পর সকালে বাজার করতে গিয়ে আমার মনে হলো, তাই তো, কি বোকা আমি! সন্ধেবেলা কোনোদিন ও-বাড়ির ভেতরের কিছু দেখতে পাই না, কিন্তু দিনের বেলা তো পাওয়া যেতে পারে! দিনের বেলা তো আমি ও-বাড়ির সামনে দিয়ে একদিনও যাই নি।

বাজার শেষ করে আমি রেললাইন না পেরিয়ে হাঁটতে লাগলুম নন্দন পাহাড়ের দিকে। বুকের মধ্যে একটু দুপ্‌দুপ্‌ করছে, যদি সেই লোক দু'টির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা কী বলবে আমাকে ? কিন্তু দিনের আলোয় আমার চেহারা দেখে তারা নিশ্চয়ই চোর ভাববে না। চোরদের কি আর এরকম দেখতে হয় ?

রাণুমাসী তো বলতো, আমাকে নাকি সুন্দর দেখতে। অবশ্য, নিজের মাসীরা ওরকম বলেই থাকে। তবে, ইস্কুলের ছেলেরাও আমাকে কার্তিক-কার্তিক বলে রাগাতো। যাই হোক, মোটেই আমাকে চোরের মতন দেখতে নয়!

সেই বাড়িটার বারান্দার সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে আছে দুই নারী। তারা দু'জনেই আমার রাণুমাসীর চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু মায়ের থেকে ছোট। তাদের চুল বাঁধা নেই। মেঘের মতো এলো-চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে ! দু'জনেরই চোখে কাজলের দাগ, পরনের গোলাপি আর হলুদ শাড়ি দুটো দামী, কিন্তু অগোছালোভাবে পরা। একটা ঘি-ওয়ালা ওদের সামনে নানা রকম ঘিয়ের নমুনা দেখাচ্ছে, ওরা দরদাম করছে মন দিয়ে। দু'জনেরই মিষ্টি সুরেলা গলা।

সেই নারী দু'জনের চেহারা ও বসে থাকার ভঙ্গিতে কি যেন একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিল, যেজন্য ওরা আমার চোখ চুম্বকের মতন টেনে রইলো। প্রথমত, ওদের দু'জনকেই মনে হয় চেনা-চেনা, আগে কোথাও দেখেছি, এজন্মে না হোক, পূর্ব জন্মে। ওদের গলার আওয়াজ, বসে থাকা, সাজপোশাক—সবই অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা।

কতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়েছিলাম, জানি না। এক সময় সম্বিৎ ফিরলো। সেই লোক দু'জন কাছাকাছি নেই, কিন্তু আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো। তারপর নিজেই বুদ্ধি বার করলাম, এমনও তো হতে পারে, আমি ঐ ঘি-ওয়ালার কাছ থেকে ঘি কেনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি !

ঘি-ওয়ালা একটি মেয়ের হাতের ওপর খানিকটা ঘি ঘষে দিয়ে বললো, দেখুন মা, গন্ধ শুঁকে দেখুন।

ঘিয়ের মতনই গায়ের রঙ মেয়েটির, এবং ওর নিজের শরীরেরও নিশ্চয়ই একটা আলাদা গন্ধ আছে, নিজে গন্ধ শুঁকলো না, পাশের মেয়েটির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দ্যাখ রে নীলা—।

নীলা নামের মেয়েটি গন্ধ শুঁকতে গিয়ে হেসেই লুটোপুটি, হাসতে-হাসতে বললো, ঘিয়ের গন্ধ পাবো কি, তোর হাতে যে এখনও ডিমের গন্ধ লেগে আছে।

মেয়ে দু'টি এখনও আমাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু আমার বোধহয় আর দাঁড়িয়ে থাকা ভালো দেখায় না। আমি ডাকলুম, এই ঘি-ওয়ালা ! ঘি-ওয়ালা !

ঘি-ওয়ালা আমার ডাক শুনতে পেল না, কিন্তু মেয়ে দু'টি শুনলো। তারা দু'জনেই চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। যার নাম নীলা নয়, যার নাম জানি না, সেই মেয়েটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী বলছো ভাই ? কাকে ডাকছো ?

হঠাৎ আমার বুক কাঁপতে লাগলো কেন ? পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল। বাজারের থলিটা বিষম ভারি মনে হলো হাতে। আমি বললাম, ঘি-ওয়ালাকে একটু ডেকে দিন না !

ঘি-ওয়ালা এবার পেছন ফিরে তাকালো ! আমার চেহারাটা একবার দেখে নিল শুধু, কিছু বললো না। সে বোধহয় আমার মতন খরিদ্দারকে গ্রাহ্য করলো না তেমন।

মেয়েটি বললো, কিন্তু আমাদের যে এখনো কেনা হয় নি। তুমি ভেতরে এসো না !

এক একটা কথা শুনলে একই সঙ্গে আনন্দ হয় আবার ভয়ও হয়। ঐ বাড়ির মধ্যে ঢোকার আহ্বান পেয়ে আমি খুশি হয়েছিলুম নিশ্চয়ই, আবার ভয়ও করতে লাগলো, সেই লোক দু'জন আছে নিশ্চয়ই, এবং তারা আমায় ঠিক চিনে ফেলবে। যদি তারা ভাবে, আমি কোনো মতলব নিয়ে এসেছি। অথচ আমার তো কোনো মতলব নেই, আমি কেন ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাইছি, তা-ও জানি না। কিন্তু আমার নিয়তি যেন টানছে আমাকে ওখানে, আমার নিয়তি দু'টি চুম্বকের মতন ভাগ হয়ে বসে আছে ঐ বাড়ির সিঁড়ির ওপর।

আমি আস্তে-আস্তে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করে নিলাম, বাজার-ফেরত তিনটে টাকা ঠিক আছে কি না। ঘি তো কিনতেই হবে। জানি এজন্য বাবা-মার কাছে বকুনি খাবো। আমাদের বাড়িতে ঘি-ওয়ালা আসে, বাবা-মাই তার কাছ থেকে ঘি কেনেন। এখানকার ঘি-ওয়ালারা এমনিতেই খুব ঠকায়, হলদে রঙ আর সেন্ট মিশিয়ে গাওয়া ঘি বলে চালায়। আমাকে ঠকানো তো ওদের পক্ষে খুব সোজা।

নীলা নামের মেয়েটি বললো, এসো, এখানে এসে বসো না ! লজ্জা কি ?

ওদের পাশে বসতে তবু আমার লজ্জা হলো। আমি বললাম, না, না, আমি শুধু একটু ঘি কিনেই চলে যাবো !

দু'টি মেয়ে আবার অকারণে হাসলো। হাসতে-হাসতেই নীলা নামের মেয়েটি বললো,

কেন, ঘি কিনেই চলে যাবে কেন ? বাড়িতে বুঝি ভাববে দেরি হলে !

— না, না।

— তুমি বুঝি বাজার করে ফিরছো ? তুমি কোথায় থাকো ?

আমার কান ঝাঁ–ঝাঁ করতে লাগলো। আমি যেখানে থাকি, বাজার করে সেখানে ফিরতে হলে, এ রাস্তায় মোটেই আসতে হয় না। দেওঘরে গণ্ডায়–গণ্ডায় ঘি–ওয়ালা বাড়িতে এসে সবসময় জ্বালাতন করে। কেউ কি বিশ্বাস করবে, আমি শুধু ঘি কেনার জন্যই এতদূরে ঘুরে এসেছি ? আমাদের পাড়ার নাম না বলে, আমি হাত দিয়ে দেখালাম, ঐ ওদিকে !

— তোমার নাম কি ?

— তপনকুমার সান্যাল।

— আমার নাম নীলা, আর ওর নাম বন্দনা। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছো না তো ? তুমি তো আমাদের থেকে অনেক ছোট।

— না, না।

— তাহলে এখানে এসে বসো।

বাজারের থলিটা এক পাশে রেখে আমি গিয়ে সিঁড়ির ওপরে বসলাম। ওদের থেকে একটু দূরে।

ওরা দু'জন ঘি–ওয়ালার সঙ্গে কিছুক্ষণ দরাদরি করলো, কিন্তু পছন্দ হলো না, বিদায় করে দিল ঘি–ওয়ালাকে। আমিও কিনলাম না, বেঁচে গেলাম খুব। ঘি–ওয়ালা বক্রভাবে আমার দিকে তাকাতে–তাকাতে চলে গেল। ওর বোধহয় ধারণা হলো, আমার জন্যই ওর এমন দু'জন খদ্দের নষ্ট হলো !

বন্দনা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা দেওঘরে কতদিন হলো এসেছো ? নাকি এখানেই তোমাদের বাড়ি ?

— না, আমরা থাকি ভাগলপুরে। এখানে দশ বারো দিন হলো এসেছি !

বন্দনা নীলার দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের তো প্রায় দেড়মাস হয়ে গেল, নারে ? আরও যে কতদিন থাকতে হবে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বাড়িতে কারুর অসুখ বুঝি ?

ওরা দু'জন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর নীলা হাসতে–হাসতে বললো, কেন, শুধু অসুখ হলেই বুঝি লোকে এখানে এসে থাকে ? আমাদের কি দেখে মনে হয়, আমাদের অসুখ ?

আমি আড়ষ্টভাবে বললাম, না, বাড়িতে অন্য কারুর—

— আমাদের বাড়িতে আর কেউ নেই !

কথাটা শুনেই আমি বাড়ির ভেতর দিকে একবার তাকালাম। শরীর থেকে জ্বর ছেড়ে যাবার মতন আমার ভয় কেটে গেল। তাহলে সে লোক দুটোও এখন বাড়িতে নেই। ওরা বোধহয় মাঝে–মাঝে আসে আর চলে যায়।

নীলা এবার বন্দনার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি একে চেন ? আমি ঘাড় হেলিয়ে বললাম, হ্যাঁ !

— কে বলো তো ?

— তিন চার মাস আগেই দেখেছি ওঁর বই। **'হাসি ও অশ্রু'**। ওঁর একটা নাচ আর গান ছিল। গলা শুনেও চিনতে পেরেছিলাম।

বন্দনা বললো, গলা শুনেই চিনতে পারলে; গানের গলা আর কথা বলার সময় গলা কি এক

থাকে ?

— আমি আপনাকে গান গাইতেও শুনেছি। এই রাস্তা দিয়ে সন্ধেবেলা যাবার সময় মাঝে-মাঝে আপনার গান শুনেছি।

নীলা বন্দনার শরীরে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, দ্যাখ বন্দনা, তুই যে ভাবিস্ তোর এখনো তেমন নাম হয় নি— এই দ্যাখ, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোকে তোর গান শুনেই চিনে ফেলে—

বন্দনা বোধহয় একটু লজ্জা পেল। তারপর কথা ঘোরাবার জন্য বললো, তুমি ভাই কি করো ? পড়াশুনো নিশ্চয়ই ?

আমি ঈষৎ গর্বের সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ আমি কলেজে পড়ি। আমার মায়ের অসুখ, তাই এখানে এসেছি।

নীলা হঠাৎ উঠে গেল, একটু বাদেই আবার ফিরে এসে আমায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি চা খাবে ?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না।

যাওয়ার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। নীলা তবু জোর করে বললো, উঠলে কেন, বসো না! চায়ের জল চাপিয়েছি, এক্ষুনি হয়ে যাবে—আমরাও খাবো—তুমি চা খাও তো ?

— হ্যাঁ খাই, সকালে শুধু এক কাপ। এখন খাবো না—তাছাড়া আমার দেরি হয়ে যাবে— আমি বাজার করে নিয়ে গেলে তবে তো রান্না হবে!

বন্দনা বললো, তবে থাক, তবে আর তোমাকে আটকাবো না। তুমি পরে আবার এসো। গল্প করবো তোমার সঙ্গে। আসবে তো ?

—হ্যাঁ।

সেই রহস্যময় নীল পর্দা-ঘেরা বাড়ির দরজা আমার জন্যে খুলে গেল। আমি সেখানে প্রবেশের ও ফিরে আসার অধিকার পেয়ে গেলাম। রুপোলি পর্দা থেকে বেরিয়ে আসা দু'জন জলজ্যান্ত নারী আমার সঙ্গে বন্ধুর মতন হেসে কথা বলছে।

৫

মা বেশিক্ষণ রান্নাঘরে বসতে পারেন না, রান্নার ব্যাপারেও মাকে আমি সাহায্য করি। দুর্বল শরীর নিয়ে মা কোনোক্রমে গিয়ে বসেন একটু রান্নাঘরে, একটুক্ষণের মধ্যেই হাঁপ ধরে যায়। মালির বৌকে ঠিক করা হয়েছিল আমাদের রান্না করে দেবার জন্য, কিন্তু সে এত অসম্ভব ঝাল দেয় যে আমি খেতে পারি না। মায়ের তো একদমই ঝাল খাওয়া বারণ। এত বলে-বলেও মালির বৌটাকে সামলানো গেল না, ঝাল সে দেবেই। কাল থেকে সে আবার আসছে না। মা রাগ করে বললেন, ঠিক আছে, আমি নিজেই রান্না করবো! অথচ জানি, রান্নাঘরে বেশিক্ষণ বসলে মায়ের শরীর আরও বেশি খারাপ হবে, তখন আমাকেই তো ঝক্কি সামলাতে হবে! তাই ভাতের হাঁড়ি আমাকেই নামাতে হচ্ছে উনুন থেকে, আমিই মাছের ঝোলে খুন্তি নাড়ছি, মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে বলে-বলে দিচ্ছেন।

আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে কখন শেষ হবে। রাগ হচ্ছে রাণুমাসীর ওপর ! নিজের দিদিকে দেখতে না এসে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাবার কী দরকার ছিল? রাণুমাসী এলে আমাকে আর হাঁড়ি কড়া ঠেলতে হতো না !

আমার আজ ভেতরে-ভেতরে ছটফটানি রয়েছে আর একটা কারণে। আজ নীলাদি আর বন্দনাদি আমাকে দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে। কিন্তু সেকথা আমি মাকে বলি নি। ওদের

সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাই কেউ জানে না এখনো। দু'টি মেয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে শুনলে মা আমাকে কিছুতেই যেতে দিতেন না, আমি জানি। এদিকে নীলাদি বন্দনাদিও বলেছে, মাকে একদিন দেখতে আসবে, আমি ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছি !

আমাদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার শেষ হয় খুব তাড়াতাড়ি। বারোটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে বাবা-মা শুয়ে পড়েন। মুশকিল হয় বিল্টুকে নিয়ে। ও কিছুতেই ঘুমোতে চায় না ! আর এত দুরন্ত ছেলে, ওকে একা ফেলে কোথাও যাওয়াও যায় না ! দুপুরে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না, কিন্তু আজ বেরুতেই হবে। কোনো ছলছুতোতেই বাবা-মার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া যাবে না জানি। না বলেই পালাবো, উপায় কি ? আমি এখন এক সঙ্গে বাড়ির চাকর, রান্নার ঠাকুর আর ছেলে রাখবার আয়ার কাজ করছি, আমারও যে মাঝে-মাঝে ছুটি দরকার, সেটা কেউ বোঝে না ! কলেজের বন্ধুরা তো বাড়ির এত কাজ করে না ! কলেজের বন্ধুরা যদি দেখে ফেলতো, আমি এখন রান্না করছি!

হুড়ুস ধাড়ুস করে রান্না শেষ করে ফেললাম সাড়ে এগারোটার মধ্যে। তারপর কুয়োর জলে চান করে এসেই মাকে বললাম, আমার খিদে পেয়েছে, এসো খেয়ে নিই ! মা বললেন, এত তাড়াতাড়ি কি রে ! তাহলে যে আবার বিকেল হতে-না-হতেই খিদে পেয়ে যাবে ! দাঁড়া, একটু পরে—

আমি বললাম, না মা, রান্না যখন হয়ে গেছে তখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়াই তো ভালো। তাহলে মালিটাকে দিয়ে থালা-বাসনগুলো ধুইয়ে রাখা যায় !

জায়গা করে খেতে বসলাম। আমি বসেছি একটু দূরে। আমার ভাতগুলো মেখে-মেখে মাঝে-মাঝে খুব কায়দা করে গেলাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখছি। মা-বাবা দেখতে পান নি, বিল্টুটা ঠিক দেখে ফেললো। এমন বিচ্ছু ছেলে, অমনি চেঁচিয়ে উঠলো, মা, দাদা ভাত ফেলে দিচ্ছে ! যা রাগ হলো না ! ইচ্ছে হলো, বিল্টুর মুখে এক থাবড়া মারি !

মা বললেন, ওকি তপু, ভাত ফেলছিস কেন ?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, খিদে নেই !

— এই যে বললি খুব খিদে পেয়েছে ? বারণ করলুম এত তাড়াতাড়ি খেতে !

— তখন খিদে পেয়েছিল। এখন খানিকটা খাবার পর...

আসলে বাবা-মায়ের সামনে মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস আমার একদম নেই। এতদিন মিথ্যে কথা বলার কোনো দরকারও হয় নি। কিন্তু এখন আমার নিজস্ব একটা গোপন জগৎ হয়েছে, যেখানে মা-বাবার কোনো ভূমিকা নেই। মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে আমি গুলিয়ে ফেলেছি। একটার সঙ্গে আরেকটার তাল সামলাতে পারছি না।

সেইজন্যই, খাওয়ার পর, বাবাকে যখন আমি বললাম, আজ সকালে আমাদের কলেজের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হলো বাজারে—ওর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসছি—তখন আমার গলা কেঁপে গেল। বাবা অবশ্য গলার কাঁপুনি লক্ষ করলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন, তা এই দুপুরবেলা যাবার কি দরকার ? বিকেলে যাবি!

জানি বাবার সঙ্গে যুক্তিতর্ক দেখাতে গেলে হেরে যাবো। বাবা যদি সরাসরি একবার না বলে দেন, তখন হবে আরও মুশকিল। তাই আমি পায়ে চটি গলাতে-গলাতে বললাম, দুপুরবেলা একসঙ্গে পড়াশুনো করবো বলেছি ওর সঙ্গে, আমার তো এখানে পড়াশুনো কিছুই হচ্ছে না।

বাবা আর একবার কি বললেন, আমি ভালো করে শুনতে পেলাম না, ততক্ষণে আমি বেরিয়ে পড়েছি। বাগানের গেট পর্যন্ত আমি আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগলাম। তারপর রাস্তায় বেরিয়েই আমার সমস্ত ধৈর্য শেষ হয়ে গেল, আমি দৌড়োতে শুরু করলুম, দৌড়োতে-দৌড়োতেই কখন

রেললাইন পেরিয়ে গেছি, সর্টকাট করার জন্য মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটছি।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছুলাম, তখন দারুণ হাঁপাচ্ছি আমি, আমার বুক ধড়ফড় করছে, নিঃশ্বাসে নাকের ভেতরটা জ্বলছে যেন! এরকমভাবে গেলে তো ওদের বাড়িতে গিয়েও হাঁপাবো, তাতে ওরা কী ভাববে ? যাঃ তা হয় না। আমি আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা মিনিটও আর নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না, অথচ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতেই হচ্ছে!

ভাগলপুরে গিয়ে যখন কলেজের বন্ধুদের বলবো, ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে! ওরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। 'হাসি ও অশ্রু' বইতে বন্দনাদির অনেকখানি পার্ট ছিল। আরও অনেক বইতে নেমেছে বন্দনাদি, সেগুলো আমি দেখি নি। এইজন্যই, প্রথমবার বন্দনাদিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল চেনা-চেনা, অনেক জায়গায় বন্দনাদির ছবি দেখেছি আগে।

বন্দনাদি অবশ্য নায়িকার পার্ট করে না, সাধারণত নাচগানের পার্ট পায়, নাচতে পারে খুব ভালো, অনেক ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্সেও নেচেছে, সে-সব আমি দেখি নি অবশ্য, শুনেছি নীলাদির মুখে। বন্দনাদি গানও জানে খুব ভালো, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা আধুনিক জানে না, ঠুংরি আর ভজন গাইতে ভালবাসে। পাটনায় থাকবার সময় বরুণ কাকার মুখে ঠুংরি খেয়াল শুনতাম অনবরত। শুনে-শুনে আমিও একটু-একটু শিখেছিলাম। এখন ঠুংরি আমার খুব ভালো লাগে।

নীলাদিও পার্ট করে সিনেমায়, তবে দু-এক সিনের পার্ট। নীলাদি হাসতে-হাসতে নিজেই বলেছেন, আমার কিরকম জানো, কোনো বইতে হয়তো চান্স পেলাম, শুটিং হলো, টাকাও পেলাম, কিন্তু বই যখন দেখানো হলো, তখন আমার সিনটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে! তাই না-রে বন্দনা ?

সেই লোক দুটোকে কিন্তু ওদের বাড়িতে আর দেখি নি। পরে জানতে পেরেছি, ওরা খুব ব্যস্ত লোক, প্রায়ই পাটনা কিংবা কলকাতায় চলে যান। তবে শনি-রবিবার দিন ঠিক আসবেনই এখানে। লোক দুটোকে না-দেখে আমি অনেক নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। শনি-রবিবার আমি ও-বাড়িতে যাবো না। কলেজের ছেলেরা কি বিশ্বাস করবে, বন্দনাকুমারী আমাকে স্বয়ং নেমন্তন্ন করে নিজে হাতে রেঁধে খাইয়েছে ?

আমার কলারটা ঠিক করে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আমি আস্তে-আস্তে ও-বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকলাম। লাল শুরকি-ঢালা পথ দিয়ে হেঁটে এসে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা খুললো নীলাদি। নীলাদির মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকে। একগাল হেসে বললো, এসেছো ? ও বন্দনা, আমাদের অতিথি ঠাকুর এসে গেছেন ! খুব খিদে পায় নি তো ? এখনও রান্না হয় নি কিন্তু।

আমি দুষ্টুমি করে বললুম, কেন রান্না হয় নি ? আমার দারুণ খিদে পেয়েছে!

গাছ-কোমর করে শাড়ি পরা, বন্দনাদি মাংস কষছে মহা উৎসাহে। একজন রান্নার লোক আছে ওদের, কিন্তু আজ ওরা নিজেরাই রাঁধছে! বন্দনাদির ফর্সা মুখখানা আগুনের আভায় লালচে। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে রান্না দেখবে, না ও-ঘরে বসবে ?

— আমি এখানেই থাকবো !

— এখানে থাকলে কিন্তু কাজ করতে হবে। এই ডেকচিটা চেপে ধরো তো ওদিক থেকে! বড্ড ঢকর-ঢকর করছে! পারবে তো ?

— কেন পারবো না ?

ওরা তো আর জানে না যে আমি একটু আগেই রান্না করে এলুম। বন্দনাদিই বরং রান্না জানে

না একদম ! যেভাবে খুন্তি নাড়ছে, তাতেই বোঝা যায় আনাড়ি। ওর থেকে আমিও ভালো পারি। নীলাদি বসে গেছে লঙ্কা বাটতে ! রাঁধুনি বললো, দিন না দিদিমণি, আমি বেটে দিচ্ছি! আপনার হাত জ্বালা করবে! নীলাদি শুনলো না। রাঁধুনিকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো বরং।

নেমন্তন্নটা হলো পিকনিকের মতন। রান্না করলাম তিনজনে মিলে, তারপর খেতে বসে তিনজনেই তিনজনকে পরিবেশন করলাম ! খাওয়া হলো প্রায় এক ঘণ্টা ধরে, মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ হাড় চিবিয়ে ! বন্দনাদি নিজে রেঁধেছে কিনা, তাই রান্নার খুব প্রশংসা করতে লাগলো। আর নীলাদি বলতে লাগলো, এত বিচ্ছিরি রান্না আমি তিন জন্মে খাই নি ! শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থ মানা হলো আমাকে, আমি কিছু না বলে মুখ টিপে হাসতে লাগলাম। রান্না সত্যিই ভালো হয় নি অবশ্য, কিন্তু বন্দনাদি রেঁধেছে বলেই আমার খেতে ভালো লাগছে। নীলাদি বললো, তপনের মোটেই ভালো লাগছে না, দেখছিস না, তপন খাচ্ছে না তেমন!

এদিকে আমি যে বাড়ি থেকে একবার খেয়ে এসেছি, সে-কথা তো বলতে পারি না! আমি তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে খেতে-খেতে বললুম, না, না, আমার খুব ভালো লাগছে। খুব সুন্দর হয়েছে রান্না!

বন্দনাদি বললো, নীলা, তুইও তো কম খাচ্ছিস না বাপ ! এদিকে বলছিস ভালো লাগছে না!

নীলাদি বললো, বেশ করবো খাবো, দে আর একটু দে।

ওদের মধ্যে কোনো রাগ নেই। যে-কোনো কথাতেই হাসির ধুম পড়ে যায় ! আবার হাসতে লাগলো !

খাওয়ার পর আঁচিয়ে এসে আমরা বসলাম সামনের বড় ঘরটায়। আদ্দেক ঘর জুড়ে নিচু খাট পাতা, সামনে দুটো চেয়ার পাতা। আমি বসলাম চেয়ারে, বন্দনাদি এসে বসলো আমার পাশে, নীলাদি গা এলিয়ে দিল খাটে। বন্দনাদি আমার হাত টেনে নিয়ে তাতে মশলা ঢেলে দিল। তারপর মশলা চিবুতে-চিবুতে বললো, ইস্‌, পান নেই, কি হবে এখন ! নীলা, তুই তো মঙ্গুর মা'কে দুটো দিয়ে দিলি!

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে, আমি এনে দিচ্ছি!

— তুমি চেনো পানের দোকান ?

— আমি দেওঘরের সব চিনি!

সঙ্গে-সঙ্গে আমি উঠে পড়েছি। পয়সা তো আমার কাছে আছেই, আমাদের বাড়ির বাজার খরচের টাকা আমার কাছেই থাকে। সুতরাং বন্দনাদি পয়সা দেবার কথা বলতেও আমি গ্রাহ্য করলাম না। তখন নীলাদি ডেকে বললো, এই তপন, শোনো-শোনো আর একটা কথা আছে।

আমি ততক্ষণে দরজার বাইরে এসেছি, বললাম, কি?

— শোনো, তুমি সিগারেট খাও না ?

— সিগারেট ?

— তুমি খাও না বুঝি ?

— হ্যাঁ, খাই!

— তাহলে আমাদের জন্যও কয়েকটা সিগারেট নিয়ে এসো, কেমন ?

এর আগে মাত্র দু'বার সিগারেট খেয়েছি আমি। একবার সেই পাঁচ ছ'বছর আগে, পাটনায় বড়ো মামার প্যাকেট থেকে চুরি করে সিগারেট টানতে গিয়ে কাশতে-কাশতে ধরা পড়ে যাই আর কি ! আর একবার, এই তো দু'মাস আগে, কলেজে ভর্তি হবার পর। একটা ছেলে, যেন ধরেই নিয়েছিল আমি সিগারেটখোর, আমার দিকে একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এই নাও! বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খুব ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু ছেলেটার সামনে কাপুরুষ

সাজতে পারি নি। বেপরোয়াভাবে সিগারেটটা ধরিয়েছিলাম, সেদিনও দারুণ কাশি পেয়েছিল। আজ ঠিক করে নিলাম, নীলাদি–বন্দনাদির সামনে কিছুতেই কাশা চলবে না।

একটু বাদেই এক ঠোঙা মিঠে পান ও এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে ফিরে এলাম। বন্দনাদিও এবার খাটের ওপর বসেছে। আমাকে বললো, এসো, তুমিও এখানে এসো। শোবে ? এত খেয়েছি, আমি তো আর বসতে পারছি না!

— না, না আমি শোবো না!

— এসো না, লজ্জা কি!

আমার খুবই লজ্জা–লজ্জা করছিল, কিন্তু ওরা কিছুতেই আমার আপত্তি শুনলো না। নীলাদি সরে গিয়ে জায়গা করে দিল, আমি দু'জনের মাঝখানে শুয়ে পড়লাম। তিনজনে তিনটে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছি, আমি কাশি চেপে আছি প্রাণপণে। নীলাদি কিন্তু সিগারেট খাওয়ায় পাকা ওস্তাদ, ছাই ঝাড়ার সময় আঙুলে একটা টুসির শব্দ পর্যন্ত। বন্দনাদি একমুখ ধোঁয়া টেনে হাওয়ায় রিঙ করতে লাগলো। আমি রিঙ করতে পারি না কিছুতেই।

আগে কখনো আমি কোনো মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখি নি। আগে কখনো আমি কোনো অনাত্মীয় মেয়ের পাশে শুয়ে থাকি নি। আমার গা–টা কি রকম যেন শিরশির করছে, মনে হচ্ছে যেন আমি বিছানায় শুয়ে নেই, শূন্যের ওপর ভাসছি! নীলাদি–বন্দনাদি দু'জনেই আমার খুব কাছে, আমার নাকে এসে লাগছে ওদের চুলের গন্ধ, শরীরের গন্ধ। কখনো বা ওদের কারুর কাঁধে বা পিঠে লেগে যাচ্ছে আমার হাত, সঙ্গে–সঙ্গে আমার শরীর ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে। ব্যাপারটা কী হচ্ছে, আমি ঠিক যেন বুঝতে পারছি না, আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি আমার আগেকার জীবনটা ভুলে যাচ্ছি, বাড়িতে মা–বাবা কিংবা বিল্টুর কথা একবারও মনে পড়ে নি। একবার মাত্র রাণুমাসীর কথা মনে পড়েছিল, কিন্তু বন্দনাদি যখন আমার দিকে ফিরে টুকটুকে লাল ঠোঁট দু'খানি দিয়ে হাসলো, তখন আমার মনে হলো রাণুমাসীর চেয়ে বন্দনাদি অনেক—অনেক বেশি সুন্দর।

বন্দনাদি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তপন, তুমি আমাকে কোনো সিনেমায় কিংবা ফাংশানে দেখেছো ?

— একটা মাত্র সিনেমায়।

— তুমি আমাকে এখানে দেখেই চিনতে পেরেছিলে ?

— না।

— চিনতে পারো নি ? তাহলে যে তুমি বললে, তুমি আমাদের এ বাড়ির সামনে রোজ এসে দাঁড়িয়ে থাকতে ?

— সে তো আপনাদের না–দেখে। তখনও তো আপনাদের দু'জনের কারুকেই দেখি নি! শুধু গান শুনতাম, কে যেন ঠুংরি গাইতো!

নীলাদি হাসতে–হাসতে বললো, ওরে বাবা, এ যেন না–দেখেই ভালবাসা ! সেই যে একটা গান আছে না, তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি !

বন্দনাদি বললো, তারপর যখন আমাদের দেখলে, তখন তোমার কী মনে হলো !

আমি একটু কাঁপা গলায় বললুম, আপনাদের দু'জনকেই খুব ভালো লাগলো !

নীলাদি বললো, দু'জনকেই ? একসঙ্গে ?

বন্দনাদি বললো, তুই থামতো নীলা!

তারপর বন্দনাদি বেশ গাঢ়স্বর বললো, আমাদেরও কিন্তু তোমাকে খুব ভালো লেগেছে। তুমি খুব সুন্দর ছেলে ! তুমি কি কম বাবা–মা'র যত্ন করো, তুমি অন্য ছেলেদের মতন অসভ্য নও।

আমি তো বাইজী, আর নীলা সিনেমায় পার্ট করে, আমাদের সঙ্গে যে–সব লোকের দেখা হয়, তারা কেউ বাবা–মার যত্ন করে না, এমন কি নিজের বৌ বা ছেলেমেয়েরও যত্ন করে না। তারা প্রায় সবাই স্বার্থপর !

— যে দু'জন লোক শনি–রবিবার এখানে আসে তারাও ?

— তা হ্যাঁ, তারাও!

— ওরা আপনাদের কে হয়?

— কেউ হয় না! ওরা আমাদের শত্রু, আমরাও ওদের শত্রু। কিন্তু দেখা হলেই হেসে কথা বলি!

আমি একথাটার মানে বুঝতে পারলুম না। আমি চুপ করে রইলুম।

বন্দনাদি আবার বললো, আমাদের কেউ ভালবাসে না ! অথচ সবাই দেখা হলেই ভালবাসার কথা বলতে চায়। তোমার মতন বন্ধু আমরা আগে একজনও পাই নি, তাই তোমাকে এত ভালো লাগছে !

নীলাদি হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললো, আমি পাশের ঘরে গিয়ে শুচ্ছি !

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, কেন, পাশের ঘরে যাবি কেন ? এখানে জায়গা হচ্ছে না!

— না, তুই এখানে তপনের সঙ্গে গল্প কর না!

নীলাদি কিরকম রহস্যময়ভাবে যেন বন্দনাদির দিকে চেয়ে হাসলো। বন্দনাদি বললো, তুই বড় অসভ্য, নীলা ! তুইও গল্প কর না তপনের সঙ্গে। এত হিংসুটে কেন ?

নীলাদি বালিশের তলা থেকে এক প্যাকেট তাস বার করলো। ফরফর করে সেই তাস ভাঁজতে–ভাঁজতে বললো, শুধু শুধু আর কি গল্প করবো, তার চেয়ে তাস খেলি ! তপন, তুমি তাস খেলতে জানো ?

— না।

— কোনোরকম খেলাই জানো না? ফ্ল্যাস, টুয়েন্টিনাইন ?

— শুধু গাদা পেটাপেটি জানি। আমি তাস চিনি না!

নীলাদি আঙুল দিয়ে আমার থুতনি ছুঁয়ে বললো, তুমি এখনও সত্যি ছেলেমানুষ! কলেজে ভর্তি হয়েছো, এদিকে কিছু জানো না! ঠিক আছে আমি আর বন্দনা খেলছি, তুমি দ্যাখো !

কি খেলা বুঝতে পারলুম না, দু'জনে তাস বেঁটে নিল। তাস তুলে নীলাদি জিজ্ঞেস করলো, কত করে বাজি ?

বন্দনাদি বললো, এক টাকা !

— তুই কি রে বন্দনা, তুই আজকাল বড়লোক, অথচ এত কিপ্টে হয়ে যাচ্ছিস কেন ?

— ঠিক আছে বাপু, পাঁচ টাকা করে ? দেখিস্, তুই–ই হারবি।

— পাঁচ টাকা নয়। আয় এক কাজ করি, আজ আমরা তপনকে বাজি রাখি !

আমি হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তার মানে ?

নীলাদি এমন তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে হাসলো, যেন ঘরের দরজা জানলা ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো! বললো, তুমি কি ভাবছো, তোমাকে আমরা কিনে নেব নাকি ?

বন্দনাদিও মুচকি হেসে বললো, তা নয় ! আমাদের মধ্যে যে জিতবে তার সঙ্গে তোমার বেশি বন্ধুত্ব হবে কেমন ?

নীলাদি বললো, সে তোমার সঙ্গে একা–একা গল্প করবে। রাজি ?

খেলা আরম্ভ হতে দু'জনেই গম্ভীর। দারুণ মনোযোগ দিয়ে খেলছে। বন্দনাদি একবার বললো, তপন, তুমি আমাকে ছুঁয়ে থাকো তো ! তাহলে আমি জিতবো !—বন্দনাদি আমার

একখানা হাত মুঠো করে ধরলো। সঙ্গে–সঙ্গে নীলাদি বললো, এই বন্দনা, তা চলবে না। তাহলে তপন আমাকেও ছুঁয়ে থাকবে ! তুই ওর লাক্ নিয়ে নিবি কেন ? দাও তপন, তোমার আর একটা হাত দাও !

আমি বললাম, তাহলে, কারুকেই ছুঁয়ে থাকবো না! এমনি এমনি খেলো তোমরা!

নীলাদি বললো, ছেলে খুব চালাক!

প্রথম খেলায় নীলাদি জিতলো। ছেলেমানুষের মতন হাততালি দিয়ে নীলাদি বললো, এবার ? এবার কী হবে ? এবার তপন এসো আমার পাশে!

নীলাদি আমার একটা হাত টেনে রাখলো ওর ঊরুর ওপরে। শাড়ির আঁচলটা কোনোরকমে গায়ে জড়ানো, বার বার খসে পড়ে যাচ্ছে, ব্লাউজের দুটো বোতাম খোলা—নীলাদির সেদিকে হুঁস নেই। বন্দনাদি বললো, মোটেই না, তিনবার খেলা হবে! এই নীলা, তুই এখনো জিততে পারিস নি!

দ্বিতীয় খেলায় জিতলো বন্দনাদি। তৃতীয় খেলায় হার–জিৎ ঠিক হবে। আমি মনে–মনে নিরপেক্ষ হতে চাইছি, তবু উদ্গ্রীবভাবে তাকিয়ে আছি বন্দনাদির হাতের তাসের দিকে। নীলাদি আর বন্দনাদি দু'জনেই ভালো, কিন্তু যদি একজনকে বেছে নিতে বলা হয়, তবে আমি বন্দনাদিকেই চাই। এরকম দু'জন মেয়েই আমাকে জিতে নেবার জন্য উদ্গ্রীব, এতে আমি বেশ গর্ব অনুভব করলুম !

নীলাদি ফস্ করে জিজ্ঞেস করলো, তপন, তুমি কখনো মেয়ের প্রেমে পড়েছো ?

ফস্ করে আমার রাণুমাসীর মুখ মনে পড়লো আবার। আমার ছেলেবেলাটা যে–ভাবে কেটেছে, তাতে আমি বাইরের কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাই নি। ভালবেসেছি একমাত্র রাণুমাসীকে। কিন্তু নিজের মাসীকে ভালবাসার কথা কি ওরা জিজ্ঞেস করছে ? কলেজের ছেলেরা যে–সব প্রেমে পড়ার গল্প বলে, সে তো অন্যরকম। আর তাদের মুখ-চোখও অন্যরকম হয়ে যায়।

আমি লাজুকভাবে বললুম, না।

— তোমার সতেরো বছর বয়েস হলো, এর মধ্যে একবারও প্রেমে পড়ো নি ! তুমি কী ছেলে গো ?

বন্দনাদি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আমি এ পর্যন্ত এমন একজনও পুরুষমানুষ দেখি নি, যে আগে অন্তত তিন চারটি মেয়ের সঙ্গে—

নীলাদি বললো, আমিও ভাই তাই। সেই চোদ্দ বছর বয়েস থেকে তো পুরুষমানুষ দেখছি, সবাই লোভী আর হ্যাংলা আর মিথ্যাবাদী! এমন ভাব দেখায় মাইরি, যেন শালারা—

বন্দনাদি চোখের ইশারায় ধমকালো নীলাদিকে। নীলাদি থতমত খেয়ে গেল! নীলাদির মুখে এরকম ভাষা আমি আগে শুনি নি। মেয়েরা আবার শালা বলে নাকি ?

এবারেও জিতলো বন্দনাদি! সে কি আনন্দ তার। সারা ঘরে তাস ছড়িয়ে ফেলে হৈ–হৈ করতে লাগলো। নীলাদি বললো, বরাবরই তোর ভাগ্য ভালো বন্দনা। তুই সব খেলাতেই জিতে যাস্।

নীলাদি খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। রহস্যময়ভাবে হাসতে–হাসতে বললো, ঠিক আছে ভাই, আমি পাশের ঘরে ঘুমোতে যাই। তোমরা এ ঘরে বসে বন্ধুত্ব করো !

তারপর আমার পাশে এসে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, আমি হেরে গেলেও আমার সঙ্গে একটু–একটু বন্ধুত্ব করবে তো ভাই ? আমার ভাগ্যটা চিরকালই খারাপ।

নীলাদির জন্য দুঃখ হলো একটু। যারা হেরে যায়, তাদের জন্য সবসময়ই আমার দুঃখ হয়।

নীলাদি চলে যাবার পর বন্দনাদি আমার একখানা হাত ধরে বললো, তোমার ঘুম পেয়েছে, তপন ? তুমি এখন ঘুমোবে, না গল্প করবে ?

আমি ঠিক উত্তর দিতে পারলুম না। না, ঘুমোবার তো কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। কিন্তু প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে, একবার বাড়ি না ফিরলে তো চলবে না। আমার বাবা-মার এমন অসুখ যে বেশি দুশ্চিন্তা করলেই তাঁদের অসুখ বেড়ে যায়—এই তো মুশকিল! এরকমভাবে তো কোনোদিন দুপুরে বাইরে কাটাই নি ! বাবা আমার অজুহাত নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন নি! কিন্তু এখানে থাকতে এত ভালো লাগছে আমার! সমস্ত শরীরে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমি এখন বন্দনাদির বন্ধু !

বন্দনাদি আবার জিজ্ঞেস করলো, তপন, তুমি আমাকে ভালবাসবে ? আমাকে সত্যিকারের কেউ ভালবাসে না !

আমি আরক্ত মুখে বললুম, বন্দনাদি, আমি তোমাকে আগে থেকেই ভালবাসি। নীলাদি জিতলেও আমি তোমাকেই ভালবাসতুম !

বন্দনাদি এবার আরও এগিয়ে এসে ওর দু'খানা হাতই রাখলো আমার কাঁধে। আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, তোমার মতন এত সুন্দর ছেলে আমি আগে দেখি নি! তোমাকে আমি একটা জিনিস দেবো।

— কী জিনিস ?

— যা তোমার ইচ্ছে। তুমি আমার কাছে যা চাইবে, তা-ই তোমাকে দিতে রাজি আছি।

আমি চুপ করে রইলাম। আমার গালে এসে লাগছে বন্দনাদির নিঃশ্বাস, আমার বুকের কাছে বন্দনাদির বুক, বন্দনাদির শরীরের মিষ্টি গন্ধ আচ্ছন্ন করেছে আমার শরীর। যেন একজন দেবী আমাকে বর দিতে এসেছেন, আমি চাইলে এক্ষুনি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য পেতে পারি। কিন্তু এইরকম বন্দনাদির মুখোমুখি বসে থাকা তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দের আমার কাছে।

আমার মুখে কথা জোগালো না। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম বন্দনাদির দিকে। কেন যে আমার চোখ ও নাকের কাছটা জ্বালা করে উঠছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার আঙুলগুলো জ্বলন্ত লোহার শিকের মতন। আমার সমস্ত শরীরটাই যেন একটু-একটু কাঁপছে।

বন্দনাদির মুখ-চোখও তো খানিকটা যেন বদলে গেছে। চোখ দুটো যেন বেশি জ্বলজ্বলে, কিসের প্রতিক্ষায় যেন উদ্গ্রীব। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন, হাত দুটো প্রায়ই খামচে ধরেছে আমার কাঁধ। বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, বলো, কী চাও ?

আমি আস্তে-আস্তে বললুম, বন্দনাদি, আমি যা চাই, সত্যি তুমি তাই দেবে? আমি আর কিছু চাই না, আমি শুধু একবার তোমার নাচ দেখতে চাই—শুধু আমার জন্য নাচবে তুমি। আর কেউ থাকবে না! শুধু আমাকে এক একটা গান শোনাবে—আর কেউ শুনবে না। আমি সারাজীবন মনে রাখবো, তুমি শুধু আমার জন্য একা—

বন্দনাদি আমার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিল। মধুর গলায় বললো, তপন, আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর নাচ তোমাকে দেখাবো। এমন গান তোমাকে শোনাবো— যে-রকম আর কারুকে কখনো শোনাই নি। তোমার জন্য আমি আলাদা করে সাজবো। শুধু তুমি আর আমি থাকবো সেখানে, আর কেউ নয়। শুধু তোমার জন্য, জীবনে একবার মাত্র আমার সমস্ত শরীরে জেগে উঠবে নাচের ছন্দ, রক্তের মধ্যে বেজে উঠবে গানের সুর! এমন করে তো আর কেউ চায় নি আমার কাছে। কিন্তু এখন তো পারবো না। এখন আমার ভার পেট, এখন তো নাচ হবে না।

— এখন নয়, পরেই। এখন আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না বন্দনাদি ! বাবা-মার যদি

অসুখ বেড়ে যায়—

— তাহলে এখনই তুমি ছুটে চলে যাও! অসুখ বেড়েছে নাকি ? আগে বলো নি কেন ?

— না, অসুখ বাড়ে নি। যদি হঠাৎ বেড়ে যায়!

— তাহলে তুমি এখানে আর বেশিক্ষণ থেকো না! তপন, আমার বাবাকে আমি চোখেই দেখি নি, আর আমার মা মারা গেছেন আমার ন'বছর বয়েসে। আমি তো বাবা-মার সেবা করতে পারি নি! তুমি এমন লক্ষ্মী ছেলের মতন সেবা করো, তাই আমার এত ভালো লাগে তোমাকে। আমি যদি একদিন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তিনি কি রাগ করবেন ?

— না, না, রাগ করবেন কেন ?

— তুমি কি বলবে মাকে ? যখন জিজ্ঞেস করবেন, আমি কে ? বলবে কি একজন দিদি ?

— না, আমি দিদি চাই না ! আমি তখন বলবো, আমার একজন বন্ধু!

— বন্ধু বলবে ! এ-মা, তোমার বয়েসি ছেলের যে মেয়ে-বন্ধু থাকতে নেই!

— আর কারুর না থাক, আমার থাকবে! তুমি কবে আমাকে নাচ দেখাবে বলো !

— আজই। আজ সন্ধেবেলা তুমি আবার আসতে পারবে না ?

— আজই সন্ধেবেলা ?

— হ্যাঁ, পরে যদি সময় না পাই, আমার জীবনের একটা দুঃখ থেকে যাবে। আজই! তুমি আসতে পারবে না ?

এক মিনিটও না ভেবে বললাম, হ্যাঁ, পারবো ! এখন যাই বন্দনাদি ? আর দেরি করতে পারছি না !

ঘর থেকে বেরিয়েছি, অমনি দেখি দরজার কাছ থেকে শীলাদি সরে যাচ্ছে। হাসতে-হাসতে বললো, ও-মা, এরই মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ?

৬

বাড়ি ফেরার পর বাবা আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। দেখেই বুঝতে পারলুম, বাবা রেগে রয়েছেন। কিন্তু বেশি রাগ দেখাতে পারবেন না, কারণ, বাবা এখন অসহায় আমার কাছে। আমি যদি বিগড়ে যাই এখন, তাহলে কে ওঁদের দেখাশুনো করবে ? তাছাড়া বেশি রাগ করা হার্টের পক্ষেও অপকারী।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলিরে সারা দুপুর ? অ্যাঁ ? বিল্টুটা সারা দুপুর দুরন্তপনা করেছে, আমাকে একটু চোখ বুজতে দেয় নি।

অম্লানবদনে আমি বললাম, আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে তার দাদা-বৌদির সঙ্গে বেড়াতে এসেছে, তার কাছে গিয়েছিলুম পড়াশুনো করতে!

— কে তোর কলেজের বন্ধু ?

— সে আছে সন্তোষ বলে একজন, তুমি চিনবে না। এখানে এসে তো আমার পড়াশুনো একদম হচ্ছে না। সন্তোষ পড়াশুনোয় দারুণ ভালো।

এখন মিথ্যে কথা বলতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না ! এক দুপুরেই আমি আমার কৈশোর থেকে চলে এসেছি বড়োদের জগতে। বড়োরা যেমন অনায়াসেই মিথ্যা কথা বলে, সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারে মনের ভাব, রাগের সময়ও হাসিমুখে কথা বলতে পারে— আমি সেগুলো আপনি-আপনিই শিখে গেলাম এক বেলায়। আমি এখন আর ছোট নই, আমি এখন বিখ্যাত বন্দনাকুমারীর বন্ধু। মা এসব কিছুই জানে না।

মা অবশ্য আমার সব কথা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, কি রকম ভালো ছেলে তা তো বুঝতেই পেরেছি। তোর সারা গায়ে সিগারেটের গন্ধ !

আমি একেবারে চুপসে গেলুম। তবু কোনোক্রমে সামলে ওঠার চেষ্টা করে বললুম, হ্যাঁ, সন্তোষের দাদা ঘরে বসে সারাক্ষণ সিগারেট খাচ্ছিলেন। উনিই আমাদের অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তো।

মা এবারও বিশ্বাস করলেন না। তবু আর কিছু বললেন না। আমি জানি, অন্তত এক বছর আগে হলেও, মা আমার সিগারেট খাওয়ার ব্যাপার অত সহজে ছাড়তেন না, নিশ্চয়ই বাবাকে বলতেন, চেঁচামেচি করতেন ! কিন্তু অসুখে মা এখন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মা শুধু বললেন, আজ আর সন্ধেবেলা বেরোস্ না। তোর বাবার শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই!

অথচ আজ সন্ধেবেলা আমাকে বেরুতেই হবে। সারা পৃথিবীও যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও আমাকে আজ সন্ধেবেলা বেরুতেই হবে। অন্তত আজ সন্ধেবেলা বাবার অসুখ, মায়ের নিষেধ কিছুই আমাকে আটকাতে পারবে না !

আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম চা বানাতে। বিল্টুর জন্য মা আগেই দুধ গরম করে ফেলেছেন।

নাঃ, এভাবে আর চলে না। কাল সকালে বাজারে গিয়ে যে করেই হোক একজন রান্নার লোক ঠিক করতেই হবে। কিন্তু রান্নার লোক কোথায় পাওয়া যায়, তাই যে জানি না ! দোকানে-দোকানে জিজ্ঞেস করবো না-হয়!

মা-বাবাকে বাগানে বসিয়ে দিলাম। বিল্টুটা আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। আমি অস্থির পায়ে একবার বাড়ির মধ্যে যাচ্ছি, আর একবার বাগানে আসছি, একবার যাচ্ছি কুয়োর ধারে, বিল্টু ঠিক ঘুরছে আমার পেছন-পেছন। একথা অবশ্য ঠিক, এক-এক সময়ে বিল্টুকে নিয়ে খেলা করতে আমার ভালোই লাগে, বিল্টুও খুব ভালবাসে আমায়। আজ কিন্তু ওকে আমার অসহ্য লাগছে। আমি মাঝে-মাঝে ওকে ধাতানি দিয়ে বলছি, পাজি ছেলে, যা না মার কাছে গিয়ে বোস্ না। বিল্টু আমার ভাবান্তরের কারণ বুঝতেই পারলো না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

একবার আমি একটা বই খুলে বসলাম। তখন বিল্টুও ওর বই এনে বললো, দাদা, আমাকে একটু ইংরেজি পড়িয়ে দাও! আমি ওর কান মুলে বললাম, সবসময় খালি জ্বালাতন! যা, যা, বলছি! বিল্টু ডুকরে কেঁদে উঠলো, তবু আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম না। আমি অনবরত ভাবছি কি করে বাড়ি থেকে বেরুবো! এখন কোনো ছুতোতেই মা-বাবা আমাকে বেরুতে দেবেন না। আমার গতিবিধিতে যদি বেশি সন্দেহ হয়, তাহলে মা হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবেন ! ঐ একটা সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র এখনো মায়ের হাতে আছে। কিন্তু আজ সন্ধেবেলা আমাকে যেতেই হবে!

একসময় আমি বই মুড়ে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মা-বাবার চোখের সামনে দিয়ে বেরুনো আজ অসম্ভব। অনুমতি নেবারও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে, আমি আর দেরি করতে পারছি না। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে আমি চলে এলাম কুয়োতলায়, সেখান থেকে সট করে লুকিয়ে অন্ধকারে-অন্ধকারে পেছনের বাগান দিয়ে এসে পাঁচিল টপকে পড়লাম মাঠে। তারপর দৌড়োলাম। কিছুই চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গর্ত কিংবা পাথর আছে জানি না, কিন্তু সেই নীল পর্দা-ঘেরা বাড়িতে আমাকে পৌঁছতেই হবে। একবার শুধু মনে-মনে বললাম, হে ভগবান, শুধু আজকের রাতটা যেন আমার জন্য মা-বাবার অসুখ না বাড়ে! কাল থেকে আবার আমি ভালো হয়ে থাকবো!

ছুটতে-ছুটতে একবার দড়াম করে পড়ে গেলাম মাঠের মধ্যে! উঠে দাঁড়াতে যেতেই পায়ের গোড়ালির কাছে টন্‌টন্ করে উঠলো ! অসহ্য ব্যথা। মচ্‌কে গেছে বোধহয়, তাহলে কি পৌঁছুতে পারবো না? কিন্তু প্রবল একটা চুম্বকের মতন আমাকে কে যেন টানছে, না যাওয়ার ক্ষমতাও

আমার নেই। দাঁতে দাঁত চেপে অতিকষ্টে ব্যথা সহ্য করে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগোতে লাগলাম!

দরজা খুলে দিল বন্দনাদি। বললো, একি, তোমার এত দেরি? আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি আর এলেই না !

কথা বলবো কি, বন্দনাদিকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি ! পেশাদার নর্তকীদের মতন বন্দনাদি আজ এখন পরে আছে ঘাগরা আর কাঁচুলি। দু'হাত ভরা গয়না, দু'কানে দুটো হীরের দুল, পায়ে নূপুর। মুখের রঙে কি রকম গোলাপি-গোলাপি আভা, এক বেণী করে বাঁধা দীঘল চুল।

নীলাদি কোনো সাজ-পোশাক করে নি, অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে খাটের ওপর। হাসতে হাসতে বললো, তুমি এত দেরি করলে তপন ? বন্দনা যে তোমার জন্য একেবারে ছটফট করছিল! আর দেরি সইছিল না !

বন্দনাদি বললো, হ্যাঁ, আমি কখন থেকে সেজেগুজে বসে আছি !

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে বন্দনাদি ! ঠিক যেন দেবীর মতন।

কিন্তু মুখ দিয়ে একথা বেরুলো না লজ্জায়। আমি শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সত্যি, মানুষ কখনো এত সুন্দর হয় ! সুন্দর জিনিসের সামনে দাঁড়ালে, মনটাও কি রকম হালকা হয়ে যায়! আমি বাড়ির কথা সেই মুহূর্তে একেবারে ভুলে গেলাম।

বন্দনাদি বললো, একি তোমার জামায় এত ধুলো কেন? পড়ে গিয়েছিলে বুঝি ?

— না, এমনিই, কই ধুলো কই।

— এই তো ধুলো।

বন্দনাদি নিজে এগিয়ে এসে আমার জামা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগলো। তখন আমি দেখতে পেলাম বন্দনাদির হাতের পাতায় রঙ মাখানো। ঐ রঙকেই বলে মেহেদি। অমন সুন্দর হাতে বন্দনাদি জামার ধুলোয় হাত দিচ্ছে!

বন্দনাদি বললো, চলো তপন, আজ আমরা ছাদে যাই। এখানে কাছাকাছি তো বাড়ি নেই, কেউ দেখতে পাবে না। নীলা চল।

নীলাদি হাই তুলে বললো, না, ভাই! তোমাদের ব্যাপারে আমি আর কেন ভিড় বাড়াবো? আমি এখানেই শুয়ে থাকি।

— এই ভর সন্ধেবেলা শুয়ে থাকবি কেন? চল না।

— না ভাই, তোমরা যাও। শীতকালে ছাদে উঠবো? আমার অত গরম নেই!

নীলাদির কথা শুনে আমি খুশিই হলাম। বন্দনাদি আমাকে কথা দিয়েছিল, আমাকে একা নাচ দেখাবে। সেখানে নীলাদিকেও চাই না!

বন্দনাদি বললো, ঠিক আছে, চলো আমরা দু'জনেই যাই। এসো—

বন্দনাদি আমার হাত ধরে টানলো, আমরা চলে গেলাম ছাদের সিঁড়ির দিকে! নীলাদি সেই দুপুরবেলার মতন রহস্যময় গলায় বললো, দেখিস বন্দনা, সবটা নিজেই শেষ করিস না! আমার জন্য একটু রাখিস। আমিও ক'দিন ধরে উপোসী রয়েছি।

বিশাল বড় ছাদ, নন্দন পাহাড়টা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। একটু আগেও অন্ধকার ছিল, এখন আস্তে-আস্তে জ্যোৎস্না উঠছে। তিন চারটে ইজিচেয়ার রাখা আছে ছাদে, বন্দনাদি আর আমি পাশাপাশি বসলাম। ভর্তি পিন কুশানের মতন আকাশে গিস্‌গিস্ করছে তারা। রীতিমতন ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এই শীতের রাতে দেওঘরে কেউ ছাদে ওঠে না। কিন্তু আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বন্দনাদি আমার যে হাতটা ধরে আছে, সেই হাতটা গরম হয়ে উঠেছে। আমার তো তবু জামার তলায় মোটা সোয়েটার আছে, বন্দনাদি তো শুধু কাঁচুলি পরা। আমি বললাম,

বন্দনাদি, তোমার শীত করছে না ?

— এখন একটু করছে। কিন্তু নাচতে শুরু করলে এমন গরম লাগবে যে তখন এটাও খুলে ফেলতে ইচ্ছে করবে।

বন্দনাদি হাত দিয়ে বুকের কাঁচুলিটা দেখলো। কথাটা শুনেই আমার কানের পাশে ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো।

বন্দনাদি বললো, কিন্তু তবলা নেই, নাচ কি জমবে? তপন, তুমি তবলা বাজাতে জানো না?

— না তো!

— তুমি হাত দিয়ে তাল দিতে পারবে ? তুমি দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল বুঝতে পারো ?

— হ্যাঁ, তা পারি। আমি হাত দিয়ে তাল দিতে পারবো। বন্দনাদি, তুমি সত্যিই শুধু আমাকে নাচ দেখাবে বলেই এমন করে সেজেছো ?

— আমি জীবনে আর কারুর জন্যে এমন করে আগে সাজি নি। আর কেউ তো তোমার মতন এমন আন্তরিকভাবে আমার নাচ দেখতে চায় নি। আমি তোমাকে একটা কিছু দিতে চাইলাম, তুমি শুধু আমার নাচ দেখতে চাইলে। আর সবাই অন্য জিনিস চাইতো !

— কি চাইতো তারা ?

— সে তুমি বুঝবে না।

বন্দনাদি উঠে দাঁড়ালো। প্রথমে পায়ের নূপুরে কয়েকবার তাল দিল। তারপর বললো, নাচ আর গান কিন্তু একসঙ্গে বেশিক্ষণ পারবো না। হাঁপিয়ে যাবো। কোনটা আগে চাও, নাচ না গান?

— আগে তাহলে একটা গান করো।

বন্দনাদি আবার এসে আমার পাশে বসলো। বললো, আমি কিন্তু বাংলা গান তেমন জানি না। যে দু-একটা জানি, তা তোমার ভালো লাগবে না। তুমি ঠুংরি শুনবে ?

— হ্যাঁ। আমি ঠুংরি ভালবাসি।

— আচ্ছা, এটা শুনেছো, 'পানিয়া ভরেলি কৌন্ রে, আলবেলি কিনারে ?'

— না শুনি নি, তুমি এটাই গাও!

একটু চুপ করে থেকে বন্দনাদি গান শুরু করলো। এই সেই গলা, এই গলার গান শুনেই এই নীল পর্দা–ঘেরা বাড়িটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল জেগেছিল। সূক্ষ্ম সুরেলা গলা বন্দনাদির, সেই গান যেন আকাশের জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে ভাসতে–ভাসতে বহু দূর চলে যাচ্ছে। গান গাইবার সময় বন্দনাদির চোখ দুটো বুজে যায়, মুখ দেখলে মনে হয় ওর মনটা এখন আর এ জগতে নেই। আমি এক দৃষ্টিতে বন্দনাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কান বেশি আনন্দ পেতে লাগলো, না চোখ, তা বলা যায় না।

গান শেষ করে বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, তোমার ভালো লেগেছে ?

— খুব। তুমি আর একটা গাও।

— তপন, গান গাইতে আমার কখনো এত আনন্দ হয় নি। অনেক ফাংশানে নেচেছি, আমার গান অবশ্য লোকে তেমন পাত্তা দেয় না—অনেক হাততালি পেয়েছি—কিন্তু কখনো এমন মন ভরে যায় নি !

— বন্দনাদি আজকের রাতটাও আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর রাত। সারা জীবন মনে থাকবে।

— ইস্। এর মধ্যেই যে পাকাপাকা কথা শিখে গেছ ! যে গানটা গাইলাম, সেটা কী–রাগের ওপর আছে, বুঝতে পারলে ?

— না তো ! অতটা বুঝি না !

— আচ্ছা, আর একটা সোজা গান গাইছি। 'কউন ব্যাটারিয়া গেইলো, মায়ি দে বাতায়ে'— এটা হচ্ছে বিলাবল রাগে, একেবারে শুদ্ধ বিলাবল নয়, আলহিয়া বলে একে, শোনো—

গাইতে-গাইতে হঠাৎ মাঝপথে গিয়ে বন্দনাদি বললো, গানের কথার মানে বুঝতে পারছো ? তুমি তো পাটনায় ছিলে, নিশ্চয়ই হিন্দি জানো ?

— একটু-একটু।

— 'লেনে গেয়ি সওদা আরে হাটোয়ারে, ইতনি গলিমে ভইলো কাহ্নোয়া'— মানে হাটে সওদা করতে গেছি, অমনি গলি দিয়ে কানাই অর্থাৎ কৃষ্ণ বেরুলো। মা, বলে দাও, কোন রাস্তা দিয়ে আমি যাবো ? রাধার গান। তপন মনে করো, তুমি কৃষ্ণ আর আমি রাধা। তোমাকে আমি শোনাচ্ছি আমার শ্রেষ্ঠ গান।

আমি হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বললুম, যাঃ, আমি কৃষ্ণ নয় !

বন্দনাদি হাসতে-হাসতে বললো, কেন ? ও-মা তুমি এত লজ্জা পাচ্ছো কেন? এ তো মিছিমিছি... তুমি ভাবছো, তোমার সঙ্গে আমাকে রাধা হিসেবে মানাবে না? রাধার বয়স শ্রীকৃষ্ণের থেকে অনেক বেশি ছিল ! রাধা তো কৃষ্ণের মামীমা।

আমি ওসব কথা এড়াবার জন্য বললুম, ঠিক আছে, তুমি এবার নাচ দেখাও!

— আমি তোমাকে রাধার নাচ দেখাবো!

বন্দনাদি উঠে দাঁড়ালো, প্রথমে পায়ের নূপুর ঝুমঝুম করে নিল। তারপরই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললো, নীলাটা কি রকম হিংসুটে দেখলে ? নিচেই বসে রইলো ! যাক্ গে। তালটা দেখে নাও, ধা ধিন্ ধিন্ ধা—

ঠিক সেই সময় গম্‌গম্ করে চলে এলো পৌনে আটটার ট্রেন। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মনে পড়লো মা-বাবার কথা। আমি না বলে চলে এসেছি, এমনিতেই ভাবতে শুরু করেছেন, তারপর ট্রেনের সময় চলে গেল, তবু ফিরলাম না। দু'জন অসহায় মানুষ শুধু চিন্তাই করবেন? কিন্তু আমার এখন ফেরার উপায় নেই, আমার মাথার মধ্যে ছলাৎ-ছলাৎ করছে।

বন্দনাদি আরম্ভ করলো নাচ। প্রথমে খুব ধীর লয়ে, সমস্ত শরীরে জেগে ওঠে ছন্দ, আস্তে আস্তে গতি বাড়ছে ! বন্দনাদির নাচটা যেন প্রার্থনার মতন, আমি যেন সত্যিই কৃষ্ণ—নাচের তালে তালে মাঝে-মাঝে চলে আসছে—আমার কাছে, হাত দুটো জোড় করা মুদ্রায় কি যেন বলতে চাইছে, আবার সরে যাচ্ছে দূরে !

আমার মনে হলো, আমি যেন হাওয়ায় ভাসছি। আমার মাথার মধ্যে আর কোনো চিন্তা নেই, চোখের সামনে বন্দনাদির শরীর ছাড়া আর কিছু নেই। আমার আর একটুও শীত করছে না। সমস্ত শরীরটা যেন আগুনে জ্বলছে।

ক্রমে বন্দনাদির লয় দ্রুত হতে লাগলো। ঘাগরা উড়ে-উড়ে যেতে মাঝে-মাঝে চোখের সামনে ঝলসে যেতে লাগলো বন্দনাদির সোনার থামের মতন উরু, ঘনঘন নিঃশ্বাসে বুক ফুলে-ফুলে উঠছে, হাত দু'খানা ঘুরছে তলোয়ারের মতন, এক-একবার সমের মাথায় এসে বন্দনাদি বলছে, ধা !

দৃশ্যটা সুন্দর, এত সুন্দর যেন সহ্য করা যায় না। আমার চোখে ঘোর লেগে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে বন্দনাদির হাত-পা-মুখ সব মিলিয়ে গিয়ে শুধু আমি কয়েকটা রঙ দেখে যেতে লাগলাম। চারদিকে আর কোথাও কোনো শব্দ নেই, চতুর্দিকে ঠাণ্ডা চাদরের মতন বিছিয়ে আছে নিস্তব্ধতা, এবং এই পৃথিবীতে আমরা দু'জন ছাড়া যেন আর কেউ বেঁচে নেই!

ক্রমে বন্দনাদির নাচের লয় এমন বেড়ে গেল যে আমার মনে হলো, বন্দনাদিরও ঘোর লেগে গেছে। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দারুণ জোরে ঘুরে যাচ্ছে, নূপুর এত দ্রুত বাজছে যে তাল

বোঝা যায় না, তলোয়ার খেলার চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি চলছে হাত-পা। হঠাৎ আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো। মনে হলো বন্দনাদির আর জ্ঞান নেই, অজ্ঞান অবস্থাতেই নেচে যাচ্ছে এরকম।

আমি একবার আস্তে ডাকলাম, বন্দনাদি ! কোনো সাড়া নেই। আবার একটু জোরে ডাকলাম, বন্দনাদি! বন্দনাদি! এবারও কোনো সাড়া নেই, নাচও থামলো না।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, এগিয়ে গেলাম দু'পা। তখনো বন্দনাদির হুঁস নেই। এত তীব্র গতিতে কোনো মানুষ নাচতে পারে ? বন্দনাদিকে অলৌকিক কিছু ভর করে নি তো! আমি আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে বন্দনাদিকে জড়িয়ে ধরলাম। বন্দনাদি ঘুরে পড়ে যেতে-যেতে কোনোক্রমে সামলে নিল। দারুণ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, তোমার ভালো লেগেছে ? আমার কৃষ্ণ, আমার কানু, তোমার ভালো লেগেছে ?

বন্দনাদি শক্ত করে আঁকড়ে আছে আমাকে। ওর বিশাল বুক দু'টি লেগে আছে আমার বুকে, উরুতে লেগে আছে উরু, গালে গাল ঠেকানো। আমি বললাম, আমার এত ভালো লাগছিল যে কী বলবো... কিন্তু তুমি হাঁপিয়ে গেছ, তুমি একটু বসো !

বন্দনাদি ঝট করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, তপন, তুমি এবার বাড়ি যাও।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো ?

— হ্যাঁ। তুমি খুব ভালো ছেলে। তুমি আর আমাদের কাছে এসো না।

— আর আসবো না ? কেন, আমি কি কোনো দোষ করেছি ?

— না, তুমি কোনো দোষ করো নি ! তপন, তুমি এবার চলে যাও, লক্ষ্মীটি।

— বন্দনাদি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো ?

বন্দনাদি আবার ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, তুমি বুঝতে পারছো না, আমি তোমায় কত ভালবাসি ? তোমাকে তাড়িয়ে দেবো কেন ? কিন্তু তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। তোমার মা-বাবার [illegible]... তপন, আমরা খারাপ মেয়ে !

আমি রাগে ফুলে উঠে বললাম, কে তোমায় খারাপ বলেছে ?

বন্দনাদি ক্লান্তভাবে হাসলো। আমার গালের কাছে গলাটা নিয়ে এসেও আবার সরে গিয়ে বললো, সত্যিই, আমরা খারাপ। তপন, আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসাও খারাপ ভালবাসা ! কিছুতেই দিদির মতন কিংবা বন্ধুর মতন ভালবাসতে পারি না ! তুমি এই লাইনটা জানো, 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়'— এরকম প্রেম আমারও পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ জন্মে আর হবে না ! আমার বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখো, আমার এখানটা জ্বলছে। আমার চোখ জ্বালা করছে, আমার হাত... আমি শুধু একটাই জিনিস চাই, আমরা নেশাখোর তো, কিছুতেই খারাপ জিনিসের নেশা ভুলতে পারি না—।

— কি ? কি চাও ?

— কিছু না ! কিছু না ! তপন, তুমি চলে যাও লক্ষ্মীটি !

— না, আমি যাবো না ! তুমি আগে বলো।

— তা বলা যায় না। কিছুতেই বলা যায় না।

এবার আমি নিজে থেকেই বন্দনাদিকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার বুকের মধ্যে কিসের একটা যন্ত্রণায় যেন দারুণ কষ্ট হচ্ছে। আমি বন্দনাদির ঘাড়ের কাছে মুখ রেখে অনুনয় করে বললাম, বন্দনাদি, আমার দারুণ ভালো লাগছে, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না !

বন্দনাদি দুর্বলভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। পারলো না। আমার মুখের একেবারে কাছে মুখ এনে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি

যাবে না ?

— না, আমি আরও দেখতে চাই।

— কী দেখতে চাও ?

— তোমাকে।

আমি আগে কোনোদিন কোনো মেয়েকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরি নি, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিতে হলো না, আমার মনে হলো, বন্দনাদির ঐ যে মেহেদি লাগানো সুন্দর হাত, ঐ হাতটা আমার মুখের কাছে আনি, ওখানে আমার ঠোঁট না ছোঁয়ালে কিছুতেই শান্তি পাবো না। আমি বন্দনাদির হাতটা আমার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম, বন্দনাদি মুখে বললো, না, না, তপন—। কিন্তু হাত সরিয়ে নিল না। বন্দনাদির সুগন্ধমাখা হাতটা আমার ঠোঁটে আলতো করে ছোঁয়া লাগতেই আমার মনে হলো, আমি আরও এক হাত লম্বা হয়ে গেছি, আমার গায়ে অসুরের শক্তি, আমি এখন এই পৃথিবীটা পায়ের তলায় রেখে দিতে পারি। বন্দনাদি ফিসফিস করে বললো, তপন, তুমি বড্ড ভালো ছেলে! চিরকাল এরকম থেকো, আমি তোমাকে খুব ভালবাসবো। অন্যরা যা চায় তুমি তা চেও না!

সঙ্গে–সঙ্গে দড়াম করে ছাদের দরজাটা খুলে গেল। সেই দু'জন লোক, পেছনে নীলাদি। ওদের দেখামাত্র আমি বন্দনাদির আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। ভয়ের থেকেও বেশি লজ্জাতেই আমার মাথা কাটা যেতে লাগলো। দুটো ডানা থাকলে উড়ে যেতে পারলেই আমার সম্মান বাঁচতো। ইস নীলাদিই বা কী ভাবছে ?

একজন লোক চিবিয়ে–চিবিয়ে বললো, দেখতে এলাম, নতুন নাগরটি কে! এ যে দেখছি কচি নাগর !

আরেকজন বললো, এ তো সেই ছোঁড়াটা। বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করতো!

বন্দনাদির মুখটা কিন্তু শান্ত এবং কঠিন, একটুও ভয় বা লজ্জার চিহ্নও নেই। ধীর গলায় বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, তোমরা আজ হঠাৎ এলে যে ? পরশু তো আসবার কথা ছিল ?

— তাতে তোমার রসের খেলায় খুব ব্যাঘাত ঘটালাম মনে হচ্ছে !

— কে তোমাদের ছাদে নিয়ে এলো ? নীলা, তুই বুঝি বলেছিস ? নীলাদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, বা রে, আমার কি দোষ ? আমি তো তোকে এসব বারণই করেছিলাম। আমাকে শশাঙ্ক এসে জিজ্ঞেস করলো।

নীলাদি কি মিথ্যুক। এর মধ্যেই ওদের দলে চলে গেছে। মেয়ে হয়ে একজন মেয়ের দল ছেড়ে পুরুষের দলে যেতে লজ্জা করে না!

একজন লোক নীলাদির কাঁধে হাত রেখে বললো, বাঃ ! নীলা বলে দিয়ে বুঝি দোষ করেছে ? আর তুমি লুকিয়ে–লুকিয়ে...।

বন্দনাদি তেজের সঙ্গে বললো, লুকিয়ে লুকিয়ে কেন করবো ? আমি কি কারুর কেনা নাকি ! তোমার যদি পছন্দ না হয়... আচ্ছা ওসব কথা পরে হবে।

বন্দনাদি আমার দিকে ফিরে খুব মিষ্টি করে বললো, তপন অনেক রাত হয়ে গেছে, তুমি এবার বাড়ি যাও ! তোমার সঙ্গেও পরে কথা হবে—।

একজন পুরুষ কড়া গলায় বললো, কোথায় যাবে ! দাঁড়াও !

আমি কিন্তু তার কথা গ্রাহ্য করলুম না। এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দরজার দিকে। ওদের একজন ঝট্ করে আমার কলার চেপে ধরে বললো, এই ছোঁড়া, তুই এখানে এসেছিস কোন সাহসে ? তুই নিজে থেকে এসেছিস, না তোকে এরা কেউ ডেকে এনেছে ? বল্ ?

আমি চুপ করে রইলাম।

বন্দনাদি আবার রূঢ়ভাবে বললো, শশাঙ্ক, ওকে ছেড়ে দাও। ওর কোনো দোষ নেই !

— দোষ আছে কিনা আমি দেখছি ! এই কুত্তার বাচ্চাটাকে আমি মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো ! হারাধন, তুই ধর তো এটাকে !

— শশাঙ্ক, ওকে ছেড়ে দাও আগে। তারপর তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে।

যার নাম হারাধন সে বিরাট তাগড়া জোয়ান। সে কাছে এসেই প্রথমেই আমাকে বিরাট এক থাপ্পড় মারলো। আমার চোখ অন্ধকার হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য, আমি ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলাম, হারাধনই আমার ঘাড় ধরে আটকে রাখলো।

আমি কোনোরকমে নিজেকে সামলে এক ঝটকায় হারাধনের হাত সরিয়ে নিলাম আমার কাঁধ থেকে। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে মারলেন কেন ? হারাধন বললো, চোপ ! আবার মারার জন্য হাত তুললো, আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলাম একটু। হারাধন আবার আমার জামার কলার ধরে ফেললো। আমি বুঝতে পারলাম, এদের সঙ্গে আমি কিছুতেই গায়ের জোরে পারবো না। হারাধনের তো দৈত্যের মতন চেহারা !

হঠাৎ দারুণ ভয় হলো আমার। লোক দুটো যদি আমাকে মারতে-মারতে মেরে ফেলে ? নিজের মৃত্যুর জন্য আমি ভাবি না, কিন্তু আমার অসুস্থ বাবা-মার কী হবে ? সারারাত যদি আমি বাড়ি না ফিরি, দুর্বল হৃদয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে-করতে বাবা হয়তো হার্টফেল করবেন। আর মা...। আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার চোখের কোণ জ্বালা করতে লাগলো !

হারাধন বললো, এইটুকু ছেলে, তার রস কি ! আজকালকার ছেলেরা মাইরি—এই ছোঁড়া, তুই এইজন্যই বুঝি বাড়ির গেটের সামনে ঘোরাঘুরি করতিস ! অ্যাঁ ?

— আমাকে ছেড়ে দিন ! আমাকে ছেড়ে দিন !

— ছেড়ে দেবো ? মাইরি আর কি ? তোকে পুলিশে দেবো আজ !

পুলিশ ? পুলিশ শুনে আমি আরও নিস্তেজ হলাম। এমনি মার-ধোর করে যদি ছেড়ে দিত, তাহলে তবু কথা ছিল। কিন্তু পুলিশে ধরালে নিশ্চয়ই সারারাত আটকে রেখে দেবে, তারপর সকালে বাড়িতে গিয়ে সব বলে দেবে, তখন আমি...। ওঃ, কেন যে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু পুলিশে ধরাবেই বা কেন ? আমি কি চোর নাকি ? আমাকে বন্দনাদি নীলাদি দু'জনে নেমন্তন্ন করেছিল আজ। পুলিশের সামনে কি বন্দনাদি সে কথা বলবে না ? কিংবা ওরা যদি বন্দনাদিকেও আটকে রেখে দেয় ? কিছুই করার উপায় নেই। হারাধনের গায়ে যে-রকম জোর। তাতে আমি কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারবো না। কিন্তু আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।

আমি ঝুপ করে হারাধনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন। আমার মায়ের ভীষণ অসুখ।

হারাধন ক্যাঁৎ করে আমাকে এক লাথি মেরে বললো, মায়ের অসুখ। হারামজাদা। এদিকে বেলেল্লাপনা করছিলে, এখন ধরা পড়ে অমনি মায়ের অসুখ ; ওঠ্ হারামজাদা।

— সত্যি বিশ্বাস করুন। আমি এখন বাড়িতে না গেলে দারুণ বিপদ হয়ে যাবে।

— কুত্তার বাচ্চা।

বন্দনাদি বাঘিনীর মতন হারাধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তীব্র স্বরে বললো, কেন মারছো ওকে। তোমরা ভেবেছো কি ? আমি কি তোমাদের কেনা নাকি ? আমার যা খুশি করবো।

শশাঙ্ক বললো, যা খুশি করবে? তোকে আমি দাঁড় করিয়েছি, তোর পেছনে কত টাকা ঢেলেছি ! এই হারাধন, ছেলেটাকে বেঁধে রাখ্ !

হারাধন বললো, বেঁধে রাখার দরকার হবে না। আমার এই একখানা হাতই যথেষ্ট। এই হারামির বাচ্চা, ওঠ্।

বন্দনাদি হারাধনের হাত চেপে ধরে বললো, তুমি কি মানুষ, না অন্য কিছু? ঐটুকু ছেলেকে ওরকম ভাবে মারছো? লজ্জা করে না। ছাড়ো আগে।

শশাঙ্ক লাফিয়ে এসে বন্দনাদিকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, এঃ, এখনও কত দরদ। দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা পরে করছি!

বন্দনাদি রুখে উঠে বললো, কি করবে কি? মেরে ফেলবে? ঠিক আছে তাই ফেলো। আগে এই ছেলেটাকে ছেড়ে দাও।

— তোদের দু'জনকে এক সঙ্গে—

শশাঙ্ক খপ করে বন্দনাদির একখানা হাত ধরে দারুণভাবে মুচড়ে দিল।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো বন্দনাদির মুখ, তবু একটা কাতর শব্দ না করে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শশাঙ্ক, তুমি এর ফল টের পাবে। আমি কলকাতায় গেলে।

— চোপ্ হারামজাদী।

আমি আর থাকতে পারলাম না। ঘ্যাচ করে হারাধনের হাতে কামড় বসিয়ে দিলাম প্রাণপণে। হারাধন উরেঃ বাবারে বলে চিৎকার করে আমার হাত ছেড়ে দিল। আমি ছুটে গিয়ে শশাঙ্কর মুখে এক ঘুষি মারলাম। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল যে শশাঙ্ক তাল সামলাতে না পেরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলো আর একটু হলে! আমি বন্দনাদিকে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, চলো বন্দনাদি, আমরা পালিয়ে যাই। সিঁড়ির দরজার কাছে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে নীলাদি!

এর আগে ওরকম দু'জন শক্তিশালী বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে মারামারির কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কিন্তু এখন আমার সমস্ত ভয় উবে গেছে, গায়ে এসেছে অসীম ক্ষমতা! বন্দনাদিকে নিয়ে আমি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে চলে যেতে পারি।

বন্দনাদি ব্যাকুলভাবে বললো, না, তপন, তুমি শিগগির চলে যাও।

আমি পালাবার সময় পেলুম না। হারাধন ততক্ষণে সামলে উঠে তার বিশাল থাবা দিয়ে আমার ঘাড় ধরতে এসেছে। আমি পাগলা কুকুরের মতন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার কামড়ে দিতে গেলুম ওর হাতে, এলোপাতাড়ি ঘুষি চালাতে লাগলাম। হঠাৎ আমার নাকের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো, আমি সব অন্ধকার দেখলুম।

যখন জ্ঞান হলো, দেখলুম আমার হাত দু'খানা রুমাল দিয়ে বাঁধা, আমি নিচের ঘরে বসে আছি। বন্দনাদি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে, তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক। হারাধনের হাতেও রুমাল দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। নীলাদি এক গ্লাস জল এনে আমাকে বললো, তপন, এই জলটা খেয়ে নাও। আমি নীলাদির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

নীলাদি বললো, শশাঙ্ক, এবার ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না। ওর ওপর আমারও মায়া পড়ে গিয়েছিল। তোমরা যা ভাবছো তা নয়। ও খুব ভালো ছেলে!

নীলাদির কথা শুনে অভিমানে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি তবু নীলাদির দিকে তাকালাম না।

হারাধন বললো, ছেড়ে দেবো? ওর বিষদাঁত আমি ভেঙে দেবো। তাতে আমার যদি জেল হয়, সেও ভি আচ্ছা! যা জোর কামড় দিয়েছে।

শশাঙ্ক আস্তে-আস্তে সামনে এসে দাঁড়ালো। খানিকটা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, এই খোকা, তোমার নাম কি?

শশাঙ্কর কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। শশাঙ্কর মুখে তখন আর সেই বিকৃত রাগ নেই। মুখে একটা দুঃখের ছাপ। লোকটা হয়তো খুব খারাপ নয়।

আমি বললাম, বললো না!

— নাম বলবে না ? কোথায় থাকো ? কে আছে বাড়িতে তোমার ?

— বলবো না।

— এখানে এসেছিলে কেন ?

— বেশ করেছি।

শশাঙ্ক এবারও রাগলো না। অনুচ্চ গলায় হাসলো। বললো, বেশ তেজী ছেলে। আমারও এক সময় এই বয়েস ছিল। সেই বয়েসটার কথা মনে পড়ছে। খোকা, তুমি আমাদের বাড়িতে চুরি করতে এসেছিলে বলে যদি তোমায় ধরিয়ে দেই ? চুরি করতেই তো এসেছিলে, আমার সবচেয়ে দামী জিনিস। পারো নি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ! দিই পুলিশে ধরিয়ে?

— আপনার যা খুশি করতে পারেন!

—হুঁ ! তেজী ছেলেদের আমারও ভালো লাগে। মেয়েদের তো লাগবেই। হারাধন, দে ওর বাঁধন খুলে দে।

হারাধন বললো, খুলে দেবো ? মাইরি আর কি!

শশাঙ্ক গর্জন করে উঠলো, যা বলছি তাই কর্। ছেড়ে দে ছেলেটাকে!

নীলাদিই এসে আমার বাঁধন খুলে দিল। জলের গ্লাসটা দেখিয়ে বললো, ভালো করে মুখ ধুয়ে নাও, তোমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে!

আমি নীলাদির দিকে তবু তাকালাম না, আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। একবার চেয়ে দেখলাম বন্দনাদির দিকে। বন্দনাদি তখনও উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শশাঙ্ক আবার তার শিয়রের কাছে গিয়ে কোমল গলায় বললো, বন্দনা, ওঠো, আমি ছেড়ে দিয়েছি ছেলেটাকে।

আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা খুলে বাইরে পা দেবো, এই সময় বন্দনাদি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। ভুরুর কাজল, গায়ের রঙ সব মিলেমিশে গেছে চোখের জলে। বন্দনাদি বললো, তপন, তুমি আর এসো না এখানে! আমরা কালই চলে যাবো।

আমি একটাও কথা বলতে পারলাম না। বেরিয়ে গেলাম দরজা দিয়ে।

সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করছে, পায়ের যন্ত্রণাটাও বেড়ে গেছে। ও বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন হেঁটে বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

দাঁড়িয়েই রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর ভাগ্যক্রমে একটা টাঙ্গা এলো। সেটায় উঠে বসলাম।

সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, কত রাত হয়েছে কে জানে। আমার ইচ্ছে হলো, সেই টাঙ্গার মধ্যেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার সতেরো বছরের জীবনের প্রথম ক্লান্তি এসে আমাকে ভর করেছে। কিন্তু না, ঘুমোলে চলবে না। ঠিক মতন বাড়িতে পৌঁছুতেই হবে।

স্টেশনের কাছে টাঙ্গা থামিয়ে স্টেশনের কলে ভালো করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিলাম। নাকের মধ্যে তখনও রক্ত জমাট বেঁধে ছিল, জল লাগতেই জ্বালা করে উঠলো। রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছে আবার উঠে বসলাম টাঙ্গায়। জোর করে সোজা করে রাখলাম শরীরটা, বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে ফিরতেই হবে। একটু-একটু করে মনে পড়তে লাগলো, আজ সারাদিনের সব ঘটনা। আশ্চর্য ব্যাপার, মার খাওয়ার ঘটনা তেমনভাবে আর দুঃখ জাগালো না, বার বার চোখে ভাসতে লাগলো, ছাদের ওপর জ্যোৎস্নায় বন্দনাদির সেই নাচের দৃশ্য। বন্দনাদি যখন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখন দু'জনের শরীরে কি মধুর উত্তাপ! এরপর যদি আমি মরেও যেতাম, তাও দুঃখ ছিল না।

বাড়ির গেটের একটু দূরে টাঙ্গা ছেড়ে দিলাম। আমাদের বাড়িতে এখনো আলো জ্বলছে, ভেসে আসছে অনেক মানুষের গলার আওয়াজ ! বুক আমার কেঁপে উঠলো। বাড়িতে কোনো বিপদ হয়ে গেছে ! প্রতিবেশীরা ডাক্তার ডেকে এনেছে ! ইচ্ছে হলো ছুটতে-ছুটতে যাই, কিন্তু শরীরে সে ক্ষমতা নেই।

কিছুই হয় নি কারুর, বরং সন্ধের ট্রেনে রাণুমাসী, বড়মাসী আর বড় মেসোমশাই এসেছে। বাড়িতে তাই এতটা উৎসবের ভাব। রাত খুব বেশি হয় নি, সাড়ে ন'টা। ওরা এসেছে বলেই মা-বাবা আমাকে খুব বেশি বকুনি দিল না। মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত! অ্যাঁ! আমরা ভেবে মরছি।

আমি অস্পষ্টভাবে বললুম, কলেজের বন্ধুর বাড়িতে—

বাবা তিক্ত গলায় বললেন, বুঝলে রাণু, ছেলেটাকে দিয়ে একটু উপকার পাওয়া যায় না! আমাদের এ রকম অসুখ, অথচ ও সবসময় টো-টো করে ঘুরছে!

আমি যে এতদিন ঝি-চাকর-রাঁধুনির মতন খাটলুম, সেটা কিছুই না, একদিন শুধু একটু দায়িত্ব ফাঁকি দিয়েছি বলেই সব মিথ্যে হয়ে গেল!

রাণুমাসীরা মুরগি ছাড়িয়ে এনেছিলেন, সেই রান্না চেপেছে। তারপর খাওয়া হবে, এখনো অনেক দেরি। আমার সঙ্গে বেশি কথা বলার সময় নেই রাণুমাসীর, শান্তিনিকেতনের গল্পেই মশগুল।

আমার শরীর আর মানছে না। কোনো রকমে চারটি খেয়ে শুতে পারলেই হয়। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার জ্বর আসছে। আমি কোনোদিন কারুর কাছে মার খাই নি, আমি আমার মামাবাড়িতে বড় আদরের ছেলে ছিলাম, কেউ কখনো আমার গায়ে হাত তোলে নি। আজ আমার নাকটা যন্ত্রণায় অসাড়, সারা গায়ে ব্যথা, নরম বিছানার জন্য মনটা ছটফট করছে। কিন্তু আজ রাত্তিরে বাড়ির কাউকে বুঝতে দিলে চলবে না।

রান্না হতে দেরি আছে, আমি চুপচাপ এসে বাইরের বারান্দায় বসলাম। জ্যোৎস্নায় এখন চারদিক ফটফট করছে। আমি এখনো যেন শুনতে পাচ্ছি নূপুরের উন্মাদ ঝুমঝুম শব্দ, দেখতে পাচ্ছি বন্দনাদির বিদ্যুতের মতন নাচের ছন্দ।

একসময় রাণুমাসী এসে বললো, একি রে তপু, তুই বাইরে বসে আছিস কেন ?

— এমনিই!

— তোর মুখটা অমন শুকনো দেখছি আজ ?

— কই না তো!

আমি রাণুমাসীকে এড়িয়ে আবার ঘরে চলে এলাম। তিন চার বছর আগে যখন পাটনায় ছিলাম, তখন এই অবস্থায় আমি নিজেকে সামলাতে পারতুম না। রাণুমাসীর গলা জড়িয়ে ধরে হয়তো কেঁদে ফেলতুম, খুলে বলতুম আজকের সমস্ত দিনের কথা। কিন্তু আজ আর তা হয় না। আজ রাণুমাসীকে আমার কিছুই বলার নেই।

৭

তারপর দু-তিনদিন আমি জ্বরে ভুগলাম। একশো তিন পর্যন্ত জ্বর উঠলো। কি ভাগ্যিস, এই সময় রাণুমাসীরা সবাই এসেছিলেন, নইলে কী মুশকিল যে হতো। আমি ছাড়া বাড়ি যে অচল। অনেকদিন আমার কোনো অসুখ-বিসুখ করে নি, তাই বাড়ির সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেসোমশাই একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, আহা, ছেলেটা এত খাটা–খাটনি করে—ওরও তো শরীর বলে পদার্থ আছে! কেউ কিন্তু আমার অসুখের আসল কারণটা জানতে পারলো না। জীবনে আমি প্রথম মার খেয়েছি।

এতদিন আমি বাবা–মায়ের সেবা করেছি, এই তিনদিন আমিই অন্যদের সেবা ভোগ করলাম। বেশ লাগলো। সত্যি কপালে একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেতে বড্ড ভালো লাগে।

রাণুমাসী মাঝে–মাঝে এসে বসে আমার মাথার কাছে। অনেক রকম গল্প করে। তবু আমি বুঝতে পারি, রাণুমাসী অনেক বদলে গেছে। পাটনায় রাণুমাসীর সঙ্গে আমার যে–রকম বন্ধুত্ব ছিল সে–রকম বন্ধুত্ব আর কখনো হবে না। এখন রাণুমাসীর একটা নিজস্ব জগৎ আছে, সেখানে আমার স্থান খুব সামান্য। এখন বন্দনাকুমারীই আমার একমাত্র বন্ধু। এখনো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, আমি একটা নগণ্য সাধারণ ছেলে, তার সঙ্গে উজ্জ্বল তারকা বন্দনা রায়ের বন্ধুত্ব! কিন্তু কত অসম্ভবও তো সম্ভব হয়!

চতুর্থদিন আমি পথ্য করলাম। জ্বর একদম সেরে গেছে, কিন্তু শরীর বেশ দুর্বল, হাত-পায়ে এখনো ব্যথা আছে। হারাধন বলে লোকটা আমার কানের ওপর এমন থাপ্পড় মেরেছিল যে বাঁ কানের পাশটা এখনো টনটন করে, সে কথা কেউ জানে না।

মা বলেছিল, প্রথম দিন জ্বর থেকে ওঠার পর রুটি আর ঝোল খেতে। আমিই জোর করে ভাত খেলাম। ভাত না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না। একদম বাচ্চা ছেলের মতন আমি ভাত খাবার জন্য বায়না ধরেছিলাম।

জ্বর থেকে উঠে প্রথমদিন পথ্য করার পর দুপুরে ঘুমোতে নেই। একখানা বই হাতে নিয়ে আমি বাগানে রোদ্দুরে চেয়ার পেতে বসলাম। বইয়ের একপাতাও পড়ি নি, মন ছিল অন্য জায়গায়। কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময়ে মনে হলো, সারা বাড়ি একেবারে নিঝুম। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বিলটু পর্যন্ত।

বই মুড়ে রেখে আমি কিছুক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমার মনও স্থির করতে দেরি হলো না। প্যান্ট–শার্ট পরাই ছিল, চটিটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

হারাধন আর শশাঙ্করা আমাকে মারুক, ধরুক, খুন করে ফেলুক, তবু বন্দনাদির সঙ্গে আমার আবার দেখা করতেই হবে। সে যে কী সাঙ্ঘাতিক আকর্ষণ, কেউ তা বুঝবে না। এই তিনদিন বিছানায় জ্বরের মধ্যে আর কী ভেবেছি, বন্দনাদির কথা ছাড়া? বন্দনাদি নীলাদির মতন পাজি নয়—শশাঙ্ক আর হারাধনকে দেখেই তাদের দলে চলে যায় নি। বন্দনাদি বলেছিল, তপন, তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।

শরীর বেশ দুর্বল লাগছে, অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে। ঘোর দুপুরবেলা পথে কোনো টাঙ্গাও দেখছি না—সব টাঙ্গা এখন বিকেলের গাড়ির প্যাসেঞ্জার ধরার জন্য স্টেশনে গিয়ে বসে থাকে। তাছাড়া, আমি তো পয়সাও আনি নি, এ জামাটার পকেটে টাকা থাকে না।

পথ ছেড়ে রাস্তা কমাবার জন্য এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে আমি যেতে লাগলাম। দুপুরবেলাটায় দেওঘর শহরটা ভীষণ ফাঁকা মনে হয়। কোথাও আর একটাও মানুষ নেই, আমি ছাড়া।

সেই নীল পর্দাঘরা বাড়ির সামনে তিনটে টাঙ্গা দাঁড়ানো। লোকজনের ব্যস্ত আনাগোনা। বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না যে ওরা আজ চলে যাচ্ছে। বন্দনাদির সঙ্গে আর দেখা হবে না? বুকের মধ্যে দুপদুপ–দুপদুপ আওয়াজ হচ্ছে আমার—বন্দনাদির সঙ্গে আর দেখা হবে না—এই বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না!

এখন বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায় না, এত লোকজনের সামনে যদি ওরা আমাকে আবার অপমান

করে, আমি কি করবো? আমি কিছুই করতে পারবো না! কিন্তু ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। বাড়ির গেট থেকে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ট্রেনের সময় আমার মুখস্থ। জানি, ওদের বেরুতে আর দেরি নেই, তবু প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে এক-একটা ঘণ্টা, যেন আমি অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। মাঝে-মাঝে বন্দনাদি আর নীলাদির গলা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখের দেখা হয় নি। যাবার আগে বন্দনাদিকে আর একবার অন্তত দেখে যাবো।

খানিকটা পরে হারাধন একটা টাঙ্গাতে মালপত্র বোঝাই করলো। এত মালপত্র যে ওদের সঙ্গে—তা তো বুঝতে পারি নি। হারাধনকে দেখে আমি গাছের আড়ালে ভালো করে লুকোলাম। কিন্তু হারাধন আমাকে স্বস্তি দিয়ে একাই মালপত্র নিয়ে আগে চলে গেল স্টেশনে।

একটু বাদেই বেরিয়ে এলো শশাঙ্ক। তাকে কি রকম যেন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। চুলগুলো এলোমেলো, মুখে হাসি নেই, মনের মধ্যে কি নিয়ে যেন তোলপাড় চলছে। দু'তিনবার সে বাড়ির মধ্যে গেল ও আবার এলো।

হারাধন চলে যাবার ফলে আমার একটু সাহস বেড়েছিল, আমি একটু এগিয়ে দাঁড়ালাম। তাতেই চোখে পড়ে গেলাম শশাঙ্কর। আমি পালালুম না, দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির হয়ে। শশাঙ্ক আমাকে দেখে অবাক। পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলো। মুখে একটা বিচিত্র হাসি হেসে বললো, তুমি আবার এসেছো?

উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

শশাঙ্ক আরো এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, কেন এসেছো ভাই? মরার শখ হচ্ছে?

আমি বললাম, আমি বন্দনাদির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

— এসব মেয়েদের সঙ্গে দিদি-টিদি পাতাতে এসো না! এ বড় ডেঞ্জারাস জায়গা! ভালো কথা বলছি, বাড়ি যাও! লেখাপড়া করো; এই বয়েসে—

আমি ফের গোঁয়ারের মতন বললাম, আমি একবার অন্তত বন্দনাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই!

— আরে ভাই, আমিও তোমার মতন বয়েস থেকে বলতে শুরু করেছিলুম, তাই আজ আমার এই দশা! আমার আর বেরুবার রাস্তা নেই। তোমাকে আমি ভালো কথা বলছি, এসব আজেবাজে মেয়েছেলেদের সঙ্গে দিদি পাতাতে যেও না!

— আমার ভালো আমি বুঝবো!

হঠাৎ শশাঙ্কর মেজাজ পাল্টে গেল। কড়া গলায় ধমক দিয়ে বললো, আরে, এ ছোঁড়াটা তো মহা তেঁরেটে! যা ভাগ্ এখান থেকে!

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে শশাঙ্ক হনহন করে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। একটু বাদে নীলাদি, বন্দনাদি সবাই বেরিয়ে এলো। বন্দনাদি আজ আবার দারুণ সেজেছে, নতুন বৌয়ের মতন মাথায় ঘোমটা দিয়েছে অনেকটা, চোখে গগল্‌স।

আমার কেন যেন ধারণা ছিল, বন্দনাদি আমাকে দেখতে পাবেই। একবার নিশ্চয়ই চোখে চোখ পড়বে। বন্দনাদি কি জানে না, চলে যাবার আগে আমি একবার দেখা করবোই! আমার জ্বর হয়েছিল বলে তিনদিনের মধ্যে আসতে পারি নি, বন্দনাদি কি সেটা ভুল বুঝবে?

আশ্চর্য, বন্দনাদি আমাকে দেখতে পেল না। কিংবা ওর চোখে সানগ্লাস বলে কোন্ দিকে যে তাকাচ্ছে, তাও আমি বুঝতে পারছি না। শশাঙ্ক কি বন্দনাদিকে বলে নি আমার কথা?

বন্দনাদিরা টাঙ্গায় উঠে বসলো, টাঙ্গা চলতে লাগলো। আমার এমন মন ভেঙে গেল যে, একবার মনে হলো যে আমি আর দাঁড়াতে পারবো না, মাটিতে বসে পড়তে হবে। পায়ে আর

জোর নেই। তবু কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে চললো। আমি প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতেই টাঙ্গার পেছনে স্টেশন পর্যন্ত চলে এলাম।

ফার্স্ট ক্লাস কামরায় জানলার ধারে বসে আছে বন্দনাদি। চোখে এখনো কালো চশমা। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করছি। বন্দনাদি যদি কালো চশমাটা খুলে ফেলতো তাহলে আমি হাত দিয়ে ইশারা করতে পারতাম। ইস্ বন্দনাদি এখনো আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ট্রেন ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়ার পর আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সত্যি আর দেখা হবে না ? কামরার দরজার কাছেই শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। তা থাক, এত লোকজনের মধ্যে স্টেশনে কি ওরা আমাকে মারধর করতে পারবে ?

এক দৌড়ে জানলার কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে আমি ডাকলাম, বন্দনাদি ?

জানলা দিয়ে অনেকখানি মুখ বাড়িয়ে বন্দনাদি ব্যাকুলভাবে বললো, তপন ? আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

চোখ থেকে কালো চশমা খুলেই আবার বললো, একি! তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন ? তোমার অসুখ করেছে নাকি?

এক ধরনের সহানুভূতিতে আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল। বন্দনাদি আমাকে একবার দেখেই বুঝতে পেরেছে আমার অসুখের কথা। মানুষে-মানুষে টান থাকলেই এরকম হয়।

বন্দনাদি চোখের দৃষ্টি গাঢ় করে বললো, তপন, আমরা চলে যাচ্ছি।

বন্দনাদির পাশে বসে নীলাদি মুচকি-মুচকি হাসছে। শশাঙ্ক চোখ সরু করে দেখছে আমাকে। আমি ওদের গ্রাহ্য করলুম না, কিন্তু বন্দনাদিকে কি বলবো, সে কথাও খুঁজে পেলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে।

বন্দনাদি বললো, তুমি তো কলকাতায় আসো না, না? যদি কখনো আসো, আমার সঙ্গে দেখা করো। ঠিক আসবে তো? ভুলে যাবে না তো আমাকে?

আমি দু'চোখ ভর্তি বিস্ময় নিয়ে বললাম, বন্দনাদি, আমি তোমাকে কখনো ভুলতে পারি?

বন্দনাদি হাত বাড়িয়ে আমার বাহু স্পর্শ করে বললো, আমিও তোমাকে কখনো ভুলবো না।

আর কোনো কথা হলো না। একটু বাদেই ট্রেন ছেড়ে গেল। যতদূর দেখা যায়, বন্দনাদি আমার উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগলো। বিপজ্জনকভাবে মুখ বার করে রইলো জানলা দিয়ে। তারপর ট্রেন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, আমি তখনও দাঁড়িয়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মে!

আমার মনে হলো, পুরো ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের মতন। কয়েকদিনের জন্য বন্দনাদির সঙ্গে দেখা। এতেই আমার জীবনে একটা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বন্দনাদির সঙ্গে আর কোনোদিন হয়তো দেখা হবে না— কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কলকাতা আমার কাছে একটা বহু দূরের জগৎ।

তখন আমি জানতাম না, আর কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই কলকাতায় চলে যাবো।

৮

একটি ছেলে অনেকক্ষণ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে, চঞ্চলভাবে তাকিয়ে দেখছে এদিক-ওদিক। অনেক বাস আসছে, থেমে আবার চলে যাচ্ছে, কোনো বাসই ছেলেটির পছন্দ নয়। বারবার ঘড়ি দেখছে ছেলেটি। মুখে-চোখে অস্বস্তির চিহ্ন। দূর থেকে যখন বাসগুলোকে আসতে দেখা যায়,

সে ব্যগ্রভাবে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে সেই বাসের নম্বর পড়ার চেষ্টা করছে, মনে হয় ওর খুব তাড়া আছে। বাস থামার পর যাত্রীর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে এগিয়েও যাচ্ছে একটু, কিন্তু উঠছে না। সব বাসে অবশ্য তেমন ভিড় নেই।

একটু বাদেই বুঝতে পারলুম ছেলেটি বাসের প্রতীক্ষা করছে ঠিকই, কিন্তু কোনো বাসেই উঠতে চায় নি। কারণ একটা লাল রঙের দোতলা বাস এসে যে-ই থামলো, অমনি ছেলেটির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাস থেকে নামলো একটি লাল শাড়ি পরা মেয়ে, হাতে একটি বাঁধানো খাতা, তার একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল ও কালো চশমার মাঝখানে ফর্সা মুখটি ভারি সুন্দর মানানসই। মেয়েটির পায়ের চটির রঙও লাল।

বাস থেকে নেমে মেয়েটি কোনোদিকে না তাকিয়ে এমনভাবে ফুটপাতে উঠে এলো, যেন সে কারুকে খুঁজছে না। তার চোখে তো কালো চশমা, তাই বোঝা যায় না, দৃষ্টি কোন্‌দিকে। ফুটপাতে চিঠির বাক্সটার পাশে দাঁড়িয়ে যেন চিঠির বাক্সটাকেই জিজ্ঞেস করলো, কতক্ষণ ?

চিঠির বাক্সের ওপাশ থেকে ছেলেটি উত্তর দিল, এক যুগ।

দু'জনেই হাসলো।

তারপর দু'জনে পাশাপাশি খুব মন্থর পায়ে হেঁটে গেল সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে। মেয়েটি এরপর তার চশমা খুলে ফেলেছে, সিগারেট ধরিয়েছে ছেলেটি। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় আমি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ছেলেটি আমার মুখচেনা। আমাদের কলেজে ফার্স্ট ইয়ারেই পড়ে। তবে আমি আর্টস, ও সায়েন্স, তাই পরিচয় হয় নি। আমি ওকে চিনি, কারণ একদিন স্ট্রাইকের সময় ও কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে খুব বক্তৃতা দিচ্ছিলো। ওর নামও জানি আমি, দু'তিনজন ওকে রণজয় রণজয় বলে ডাকছিল। ওর অবশ্য আমাকে চেনার কোনো কারণই নেই, কারণ আমি মফস্বলের মুখচোরা ছেলে, কলেজে এখনও কোনো পাত্তাই পাই না। এখনও কলেজে আমার একজনও বন্ধু হয় নি।

এই মুহূর্তে রণজয়কে আমার খুব ঈর্ষা হলো। রণজয় আর আমি দু'জনেই শ্যামবাজারের মোড়ে একটু দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। রণজয়ের প্রতীক্ষা করার ফল কী সুন্দর— লাল শাড়ি পরা একটি টুকটুকে ফর্সা মেয়ে যেন আকাশ থেকে নেমে এলো ওর জন্য; তারপর ওরা গোধূলির মধ্য দিয়ে বেড়াতে চলে গেল।

আর আমি প্রতীক্ষা করছি কী জন্য ? সামনের ডাক্তারখানায় মায়ের কয়েকটা ওষুধের জন্য প্রেসক্রিপশন জমা দিয়েছি, একটা মিকশ্চার বানাতে খানিকটা দেরি লাগবে, তাই আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। আমি তাই রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রণজয়কে লক্ষ করছিলাম। রণজয় আর সেই মেয়েটি চলে যাবার পর, আমার মনটা খুব ভারি হয়ে গেল। ডাক্তারখানায় ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ওষুধটা হয়েছে?

— না, আর দশ মিনিট বাদে আসুন!

বিরস মুখে আমি আবার বেরিয়ে এলাম। একা-একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কারু ভালো লাগে? এদিকে বাড়ি ফেরার পর বাবা ঠিক বকুনি দেবেন, ক'টা ওষুধ আনতে এতক্ষণ সময় লাগে? কোথায় আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল?

বাবা জানেন না, আমার আড্ডা দেবার কোনো জায়গা নেই। বাবা দেখেছেন, বিকেলবেলায় কলকাতার সব রাস্তার মোড়ে-মোড়ে আমার বয়সী ছেলেরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। কিন্তু আমি তো ওদের কারুর দলে এখনও ঢুকতে পারি নি।

আমি ঠিক করলাম, যে করে হোক, রণজয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করে নেবো। ওর সঙ্গে

যদি আমার বন্ধুত্ব থাকতো, এতক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা দু'জনেই বেশ গল্প করতে পারতাম। রণজয় কি এ মেয়েটির সঙ্গে আমারও আলাপ করিয়ে দিতো? আর কিছু নয়, মেয়েটি যদি আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসতো, তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যেতাম।

বাঙালি হলেও আমি বাংলাদেশে এসেছি এই তো মাত্র দু'মাস আগে আমার সতেরো বছর বয়েসে। এর আগে অবশ্য দু'বার কলকাতায় এসেছিলাম, তবে তা তো নিছক বেড়াতে আসা। তখন আমি টিপিক্যাল মফস্বলের লোকেদের মতন চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে গিয়েছিলাম। কোথাও বেড়াতে যাওয়া আর থাকা তো এক কথা নয়। বাংলাদেশ এখনও আমার কাছে অচেনা।

আমাদের আত্মীয়স্বজনও বেশিরভাগই থাকে বিহারে। আমি পাটনায় আমার মামার বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। তাছাড়া মুঙ্গের, ভাগলপুর, ডাল্টনগঞ্জে। আমার বাবার বদলির চাকরি, মিলিটারি অ্যাকাউন্টসে কাজ করেন। এর আগে বাবা চেষ্টাচরিত্র করে বিহারেই নানা জায়গায় পোস্টিং নিতেন, কলকাতায় আসতে চান নি— কারণ, কলকাতার বাড়ি ভাড়া বেশি, খরচ বেশি। তাছাড়া কলকাতার ট্রাম বাসের ভিড়ের জন্যও প্রবাসী লোকদের খানিকটা ভয়–ভয় ভাব থাকে।

এবার অবশ্য বাবা নিজের গরজেই কলকাতায় বদলি হতে রাজি হয়েছেন। তার প্রধান কারণ, কলকাতায় মায়ের চিকিৎসার সুবিধে হবে। আমার ছোটবেলা থেকেই দেখছি মায়ের অসুখ। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, খুব ছোটবেলায় মা শাড়িটা গাছ-কোমর করে বেঁধে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতো আমাদের মজঃফরপুরের বাড়িতে। তখনও আমার ছোটভাই বিল্টু জন্মায় নি, তখন মায়ের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। মা হাসতে পারতো কথায়–কথায়। নীলাঞ্জন মেসোমশাই এসে অনেক মজার–মজার গল্প বলতেন, আর হাসতে–হাসতে মায়ের খিল ধরে যেত, হাত নেড়ে বলতো, উঃ, আর না, আর না, বাবাঃ! হঠাৎ এই বিশ্রী হাঁপানির অসুখটা হয়ে মায়ের শরীরটা সেই যে ভেঙে গেল, আর সারলো না। এখন মায়ের মন–মেজাজও ভালো থাকে না। আমার দুঃখ হয় বিল্টুর জন্য। আমি তো তবু মাকে হাসিখুশি প্রাণবন্ত দেখেছি, আর বিল্টু একেবারেই মায়ের সঙ্গ পেল না বলতে গেলে।

বাবার কলকাতায় আসার আরও একটা কারণ, বাবা শুনেছিলেন, কলকাতার অফিসে কাজ কম করতে হয়। কলকাতায় নানারকম গোলমাল দাঙ্গা–হাঙ্গামা লেগেই থাকে, তাতে প্রায় দিনই অফিসে কাজ করতে হয় না। ছোটখাটো শহরে তো আর নিত্যনতুন এমন হাঙ্গামা হয় না, সেখানে নিস্তরঙ্গ জীবন, সেখানকার অফিসে কাজে ফাঁকি দেবার সুযোগ নেই। আমার বাবা অবশ্য কাজ করতে ভয় পান না মোটেই! কিন্তু আমার বাবারও হার্টের অসুখ, ডাক্তার বলেছেন, সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে থাকতে—অথচ বিশ্রাম নেবার সুযোগই বা কোথায়? ছুটি নিতে–নিতে বাবার সব ফুরিয়ে গেছে। এই তো দেড় মাসের ছুটিতে আমরা সবাই মিলে দেওঘর থেকে এলাম।

কলকাতা শহরে আমার বয়সী আমার মতন এমন নিঃসঙ্গ ছেলে আর আছে কি না আমি জানি না। আমি ভাগলপুর কলেজে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছিলাম, সেখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসতে হলো। এখানে কারুকে চিনি না। আর সবারই বন্ধু আছে, আমার কোনো বন্ধু নেই। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সময়ই বা কোথায় আমার? কলেজ ছুটির পর অন্য ছেলেরা দল বেঁধে কোথায় কোথায় আড্ডা দিতে যায়, আর আমি এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে বাড়িতে ফিরে আসি! কি করবো, উপায় যে নেই! মায়ের অসুখ বেড়েছে, মা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না এখন। বাবাও অফিস থেকে ফিরেই বিছানায় শুয়ে পড়েন—উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা করা বাবার হার্টের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। বাড়ির সব কাজ তো আমাকেই করতে হয়, বিল্টুকেও সামলাতে হয়

আমাকেই। এই আত্মীয় স্বজনহীন শহরে আমার অসুস্থ বাবা-মার সেবা আর কেই-বা করবে!

ওষুধটা তৈরি হয় নি এখনো, কতক্ষণ আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে! এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় হরেক রকম বিজ্ঞাপনের ছবি, অধিকাংশই সিনেমার বিজ্ঞাপন। আমি সেগুলো খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। না, আমি বেশি সিনেমা দেখি না, তেমন আগ্রহও নেই। আমি খুঁজছিলাম, বন্দনাদির ছবি আছে কি না। বিখ্যাত অভিনেত্রী বন্দনা রায়কে রাস্তায় দেখলে লোকের ভিড়ে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবে। কিন্তু দেওঘরে এই বন্দনা রায়ের সঙ্গে আমার দারুণ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কি বিশ্বাস করবে, আমার মতন একটা এলেবেলে ছেলেকে ঐ বন্দনা রায় নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছে? বন্দনাদি গানও শুনিয়েছিল আমাকে। আমার এই একঘেয়ে জীবনে সেই কয়েকটা সুন্দর ছবি বাঁধিয়ে রাখার মতন দিন।

বন্দনা রায়ের কোনো ছবি কিংবা নাম এই বিজ্ঞাপনগুলোতে নেই। হয়তো বন্দনাদির সঙ্গে আমার আর কোনো দিনই দেখা হবে না।

ঘুরতে-ঘুরতে একটা চায়ের দোকানের কাছে চলে এলাম। ইচ্ছে হলো চা খেতে। কিন্তু একা-একা চায়ের দোকানে ঢুকতে আমার কি রকম যেন ভয়-ভয় করে। পাটনায় আমাদের স্কুলের সামনে একটা টালির ঘরে চায়ের দোকান ছিল বুড়ো হুকুম সিংয়ের। রাস্তার পাশেই দুটো বেঞ্চ পাতা ছিল, সেখানে বসে মাঝে-মাঝে আমরা দলে মিলে ভাঁড়ের চা খেতাম। আমরা চেঁচিয়ে বলতাম, হুকুম, পাঁচ ঠো চা। হুকুম একগাল হেসে বলতো, যো হুকুম। এছাড়া আর কোনো চায়ের দোকানে বসে আমি এ পর্যন্ত চা খাই নি।

না, না, আর একবার খেয়েছিলাম। আগেরবার যখন কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম, তখন নীলাঞ্জন মেসোমশাই আমাদের সবাইকে পার্ক স্ট্রিটের একটা দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা ঠিক চা খাবার জন্য নয় অবশ্য। তার আগে আমি কখনো কোনো এয়ারকন্ডিশান ঘরে ঢুকি নি—সেইজন্যেই নীলাঞ্জন মেসো আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতার চায়ের দোকানে ঢোকার কোনো নিয়ম আছে নাকি? আমি একা-একা ঢুকলে যদি ম্যানেজার এসে বলে, এখানে ছোটদের কিছু দেওয়া হয় না, শুধু বড়রাই এখানে চা খেতে পারবে। কিন্তু আমিও তো এখন বড় হয়ে গেছি, আমার সতেরো বছর বয়েস, আমি এখন কলেজে পড়ি। চালাকি নাকি?

একটু ভয়-ভয় করছে যদিও কিন্তু মুখে বেশ সাহস ফুটিয়ে আমি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। কোনো টেবিল খালি নেই, সব টেবিলেই দু'জন একজন করে বসে আছে, তাহলে কি আমার বেরিয়ে যাওয়া উচিত? রীতিমতো দ্বিধায় পড়ে গেলাম আমি। দোকানে ঢুকেই আবার বেরিয়ে গেলে যদি কেউ কিছু ভাবে। কেউ অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করছে না আমার দিকে। আর কিছু না ভেবে আমি ঝপ করে সামনের একটি খালি চেয়ারে বসে পড়লাম।

সেই টেবিলে আর একটি মাত্র লোক ছিল। লোকটির গায়ে একটা ঝ্যালঝেলে ময়লা সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে একটা সোনার তৈরি অথবা সোনালি রঙের ঘড়ি। একটা খুব ছোট বই মন দিয়ে পড়ছে। তখন জানতাম না, পরে জেনেছিলাম, ওগুলো রেসের বই। লোকটি সেই বই পড়ায় এমন গভীরভাবে মগ্ন যে আমি বসার পরে আমার দিকে চাইলোও না। তার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করলো, কী দেবো?

— চা।

— আর কি?

'আর কি' এই প্রশ্নটা এমন ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো যে, মনে হয় যেন চায়ের সঙ্গে

আরও কিছু খাওয়াই এখানকার নিয়ম। আমি যদি শুধু চা বলি, তাহলে গাঁইয়া বলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। পকেটের পয়সাগুলো হাত দিয়ে চেপে আমি বলে ফেললাম, আর একটা কাটলেট।

— কী কাটলেট ?

— যে-কোনো।

বেয়ারাটা নিরাসক্ত মুখে আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে তারপর ঠক করে এক গেলাস জল আমার টেবিলে রেখে চলে গেল।

খানিকটা বাদে একটা বেশ বড় কাটলেট যখন আমার টেবিলে এনে রেখে গেল, তখন আমার বুক দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। যাক, তাহলে কলকাতা শহরের সঙ্গে আমি ঠিক মিশে যেতে পেরেছি। এখানকার চায়ের দোকানও আমাকে মেনে নিয়েছে, আমাকে গাঁইয়া ভাবে নি।

কাটলেটটার কত দাম কে জানে। যতই হোক, আমার সঙ্গে টাকা আছে। আমাকেই বাড়ির সব কাজ করতে হয় বলে আমাদের সংসার খরচের টাকা আমার কাছেই থাকে। তার থেকে দু-এক টাকা এদিক-ওদিক হলে কেউ ধরতে পারবে না। টাকার জন্য কিছু নয়, কলকাতার কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়াই বড় কথা।

আমার বয়সী আরও কয়েকটি ছেলে আছে অবশ্য এই চায়ের দোকানে। আমারই বয়সী বা আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড়। একটা টেবিলে ওরা সাত-আটজন মিলে বসে খুব হল্লোড় করছে। কিন্তু ওরা হচ্ছে জন্ম থেকেই কলকাতার ছেলে, ওদের অধিকারই আলাদা। ওরা এখানে যা খুশি করতে পারে? এ-মা, তাই বলে সিগারেট খাবে এখানে বসে ? ওরা বুঝি অন্য পাড়ার ? যে পাড়ারই হোক, এখানেও তো কত বয়স্ক-বয়স্ক লোক বসে আছে, তাদের সামনে ওরকম সিগারেট খাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। এমনিতেও অবশ্য সিগারেট খেতে ভালো লাগে না আমার, কলেজের ক্যান্টিনে দু-একবার খেয়ে দেখেছি, শুধু-শুধু গলা জ্বালা করে।

ওরা চেঁচামেচি করছে এমন যে বাকি টেবিলের অন্যরা কেউ কোনো কথাই বলতে পারছে না। ওদের মধ্যে একজন টেবিল ছেড়ে উঠে দরজার কাছে যেতেই আর একজন চেঁচিয়ে বললো, এই মনা, কোথায় যাচ্ছিস ? এই শালা বো— ইস্! কি বিচ্ছিরি গালাগাল দেয় ওরা। যাকে গালাগাল দেওয়া হলো, সে তো রাগলো না, হাসছে। আদর করে বন্ধুর সঙ্গে কোনো বন্ধু এমন খারাপ কথা বলে!

কাটলেটটা খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, বেয়ারা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু দেবো বাবু?

আমি বললাম, না, শুধু চা।

ও আমাকে বাবু বলে ডেকেছে বলে এত ভালো লাগলো যে তক্ষুনি ঠিক করলুম ওকে চার আনা বকশিশ দেবো। ও তাহলে আমাকে ছোট ভাবে নি, বড় বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কাটলেটটা বেশ ভালো খেতে, মুরগির, একদিন বিল্টুকে এনে এই কাটলেট খাওয়াবো। ঐ বেয়ারার কাছেই অর্ডার দেবো।

টেবিলের অন্যদিকের সেই সিল্কের জামা পরা লোকটা ছোট বইটা মুড়ে রেখে এখন আমার দিকে একদৃষ্টে দেখছে। চোখাচোখি হতেই লোকটা জিজ্ঞেস করলো, খোকা, তোমাকে তো আগে এখানে দেখি নি। নতুন বুঝি এ পাড়ায়?

লোকটার মুখে খোকা সম্বোধন শুনেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, আমি এ পাড়ায় থাকি না।

— কোথায় থাকো ?

— রাজবল্লভ পাড়ায়।

— ও তাই বলো। আমি এখানে রোজ আসি, তোমায় দেখি নি। তুমি এক্সারসাইজ-টেক্সারসাইজ করো বুঝি ?

— কেন বলুন তো ?

— না, মনে হচ্ছে এমনি। ভারি সুন্দর চেহারা তোমার।

একথাটা শুনে আমি খুব খুশি হবো কি না বুঝতে পারলুম না। ছেলেবেলা থেকেই সবাই আমাকে সুন্দর বলে, আগে মাসী–টাসীরা দেখা হলেই আমার গাল টিপে দিত। কিন্তু যতবারই লোকের মুখে ঐ কথাটা শুনি ততবারই আমার লজ্জা করে। ছেলেদের চেহারা সম্পর্কে এরকম বলা উচিত নয়। তাছাড়া কিই–বা সুন্দর আমি ! রঙটা অন্যদের চেয়ে ফর্সা এই যা, কিন্তু সাহেবরাও তো সবাই ফর্সা। তাই বলে তো সব সাহেবই সুন্দর দেখতে নয়।

লোকটা তার মুখ আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে নিচু গলায় বললো, তোমাকে একটা কথা বলবো ভাই, কিছু মনে করবে না ?

— কি বলুন ?

— তোমার কাছে কি বেশি টাকা আছে ?

আমার বুক টিপটিপ করতে লাগলো, ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি কলকাতা শহর চোর–জোচ্চোর–গুণ্ডায় ভরা। লোকটা কি আমার টাকা–পয়সা কেড়ে নেবে নাকি ? আমার পকেটে মায়ের ওষুধ কেনার টাকা আছে।

লোকটা কিন্তু ভীতু–ভীতু মুখ করে বললো, তোমার কাছে দুটো স্পেয়ারেবল্ টাকা হবে ? আমার একটু সর্ট পড়ে গেল। এক্ষুনি যদি একটা বুকির কাছে লাগাই, শিওর উইন, বুঝলে। তুমি কাল সন্ধেবেলা ঠিক এইখানে এলেই টাকা ফেরত পেয়ে যাবে। চাইকি কিছু বেশিও দিতে পারি!

আমি জলজ্যান্ত একটা মিথ্যে কথা খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলার চেষ্টা করলাম, আমার কাছে আর একদম টাকা নেই! সত্যি বিশ্বাস করুন।

— ভেবে দ্যাখো, আজ দু'টাকা দিলে কাল চার টাকা পেতে পারো—

ছি ছি ছি, লোকটা এরকম কেন ? সিল্কের জামা পরেছে, দেখেও ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, অথচ একটা অচেনা ছেলের কাছ থেকে টাকা ধার চাইলো! লোকটা কি পাগল–টাগল নাকি! পাগলদের আমার দারুণ ভয় করে!

বেয়ারা বিল আনা–মাত্রই আমি টাকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বেয়ারা প্লেটে করে অনেকখানি মসলা এনেছিল। ইচ্ছে ছিল মুঠো ভর্তি করে মসলা নিয়ে যাবো, লোকটার জন্য ভয়ে তা হলো না।

এতক্ষণে ওষুধ তৈরি হয়ে গেছে। ওষুধগুলো নিয়ে খানিকটা হালকা মনে আমি হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু পুরোপুরি সন্ধে নামে নি এখনও ; পশ্চিম আকাশে টকটকে লাল রঙ। বেশ হালকা–হালকা হাওয়া দিচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে।

শ্যামপার্কের পাশে, আকাশের লাল রঙের প্রতিফলন নিয়েই যেন সেই লাল শাড়ি পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, নিবিষ্ট হয়ে কথা বলছে রণজয়ের সঙ্গে। রণজয়ের এক পা রাস্তায়, এক পা পার্কের রেলিং–এ, দু'পকেটে ভরা দুটো হাত, খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে। মেয়েটির ঠোঁটে একটু পাতলা হাসি, কি যেন একটা হাসির কথা শুনেছে। ওর চোখের দু'টি পাশ কাজল দিয়ে ধারালো করা।

আমি ওদের একেবারে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। রণজয় একবার চোখ তুলে দেখলো

আমাকে, চিনতে পারলো না। কলেজে তো কত ছেলেই পড়ে, সবাই কি আর সবাইকে চেনে! আমি ঠিক করে ফেললাম, যে করেই হোক রণজয়ের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করে নেবো! একজনও বন্ধু না থাকলে কেউ বাঁচতে পারে নাকি ? রণজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে এখন অনায়াসেই একটুক্ষণ এখানে ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করতে পারতাম। রণজয় নিশ্চয়ই মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিত। তাহলে মেয়েটি ঐ রকম পাতলা হাসিমাখা ঠোঁটে আমার দিকেও তাকাতো।

কি নাম মেয়েটির?

৯

— মেয়েটির নাম কি রে?

— কোন মেয়েটা?

— সেই যে একদিন যাকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলি শ্যামবাজারের দিকে ?

— কবে?

— এই ধর দিন দশেক আগে?

রণজয় খুব কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর খুব উদাসীন ভঙ্গি করে বললো, কোন্ মেয়েটা ঠিক মনে পড়ছে না তো! আমি তো এক একদিন এক একটা মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাই।

রণজয় যদিও আমার সমবয়সী, কিন্তু এখনও বড্ড ছেলেমানুষ। বাড়ির আদুরে ছেলে, আমার মতন সংসারের চাপ তো ওকে সহ্য করতে হয়নি, তাই মেজাজটা খুব ফুরফুরে। রণজয় প্রায়ই চালিয়াতি করে মিথ্যে কথা বলে।

আমি বললাম, ভাগ, চালাকি করিস না! শ্যামপার্কের কাছে ক'দিন আগে তুই একটা মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলি, তার কথা তোর মনে নেই বলতে চাস?

রণজয় খুব একটা চিন্তার ভান করে বললো, কে বল তো ? শম্পা না ইন্দ্রাণী ? কি রকম দেখতে বল তো মেয়েটাকে।

— দারুণ দেখতে ? একটা লাল শাড়ি পরেছিল—

রণজয় একগাল হেসে বললো, মেয়েদের মতো তুই তো খুব শাড়ির রঙ মনে রাখিস। আমি তো শাড়ি-ফাড়ির দিকে কখনো লক্ষই করি না—আমি শুধু মেয়েটাকে দেখি।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিন্তু কী করবো, সেদিন সন্ধেবেলা আকাশটা লাল হয়েছিল—লাল রঙের বাস থেকে নেমেছিল লাল শাড়ি আর লাল চটি জুতো পরা ঐ মেয়েটি, হাতে একটা লাল রঙের খাতা— সেই জন্যই তো লাল রঙের ব্যাপারটা আমার এখন মনে আছে।

রণজয় বললো, হ্যাঁ, শম্পাই হবে। ইন্দ্রাণীর রঙটা একটু কালো, সে সাধারণত গাঢ় রঙের শাড়ি পরে না। শম্পা আমার মাসতুতো বোন গীতালির বন্ধু, ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।

— কোথায় থাকে ? তোদের বাড়ির কাছেই বুঝি?

—থাকে বেলগাছিয়ায়। কেন রে, মেয়েটা সম্বন্ধে তোর এত ইন্টারেস্ট কেন ? আলাপ করবি?

— না, না, এমনিই। মানে সেদিন তোর সঙ্গে দেখলুম—

— আমার সঙ্গে ওরকম অনেককেই দেখবি। কারুর সঙ্গে আলাপ করতে চাস তো বলবি।

রণজয় চাল মারতে পারে, আর আমি পারি না! আমি বললুম, আলাপ করার কোনো ইচ্ছে নেই। আমারও অনেক মেয়ের সঙ্গে চেনা আছে।

যদিও কলকাতায় এসে এ পর্যন্ত আমি একটিও অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে একদিনও কথা বলি নি। একদিন শুধু বাড়িওয়ালার মেয়ে আরতি দুটো চিঠি এনে বলেছিল, এই নিন, আপনাদের চিঠি। বাড়িওয়ালার মেয়ে আরতির বড্ড অহংকার, কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

রণজয় আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। আমরা কথা বলছিলাম কলেজের পেছন দিকের সিঁড়ির এক কোণে বসে। পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজলো। রণজয় উঠে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, তোর এখন কার ক্লাস?

— কেজিবি'র। হিস্ট্রি ক্লাস।

— চল, চা খাবি? লক্ষ্মী কেবিনে এই সময়টায় গরম সিঙ্গাড়া ভাজে।

— এখন যাবো কী করে ? ঘণ্টা পড়ে গেল, এক্ষুনি তো ক্লাস শুরু হবে।

— এ ক্লাসে যেতে হবে না। কাট মার।

— না ভাই ক্লাস কাটাবো না। এর পরেরটা আমার অফ আছে, তখন যাবো—

— পরেরটা অফ আছে ? তাহলে তো ভালোই হলো—আর কলেজে আসতে হবে না। নে চল।

— না, এখন নয়।

— আরে তুই তো আচ্ছা ছেলে। ভারি তো একটা হিস্ট্রির ক্লাস, তাও কেজিবি'র। তোদের আর্টসের একটা ক্লাস কাটলে কি যায় আসে ? আমি আমার কেমিস্ট্রির ক্লাসেই যাচ্ছি না—আর তুই—

—আ হা হা হা। আর্টসের ক্লাসের দাম নেই, আর তোদের সায়েন্সের ক্লাসের খুব দাম আছে!

—আর্টস আবার কিছু পড়তে হয় নাকি ? ও তো যে-সে—

—আর্টস শুধু পড়লেই হয় না বুঝতে হয়। আর তোদের সায়েন্সে তো খালি মুখস্থ বিদ্যে—

—যা, যা ভাগ। যত আগমার্কা ছেলে ভ্যাড়ার পালের মতন আর্টস পড়তে যায়। তোর কথা বলছি না অবশ্য, দু'চারটে ভালো ছেলে আর্টস পড়তে যায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার জন্য। কমপিটিশন কম তো—বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা—হাঃ হাঃ—

রণজয়ের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকার উপায় নেই। আমি ক্লাস করবোই বলে ওর কাছ থেকে জোর করে চলে গেলুম। দ্রুত পায়ে মাঝখানের মাঠটা পেরিয়ে আমাদের বিল্ডিং-এ এসে ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ বারান্দার কোণ থেকে খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরলো। কোন্ ফাঁকে যে রণজয় আমার চেয়েও আগে চলে এসেছে, বুঝতে পারি নি।

ঝক্‌ঝকে হাসিমুখে রণজয় বললো, আরে চল চল। একদিন ক্লাস না করলে বিদ্যের জাহাজ ফুটো হয়ে যাবে না।

শক্ত করে হাত ধরে আছে রণজয়, ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে জোরাজুরি করা ভালো দেখায় না। যেতেই হলো ওর সঙ্গে।

পাটনার ইস্কুলে আমি ফার্স্ট হতাম। বাবা অবশ্য বলেছেন, পাটনার ইস্কুলে ফার্স্ট হওয়া আর কলকাতার ইস্কুলে ফার্স্ট হওয়া এক কথা নয়। কলকাতার পড়াশোনার স্ট্যান্ডার্ড অনেক উঁচু। আমি হায়ার সেকেন্ডারিতে পনেরো টাকার স্কলারশিপ পেয়েছি। এখানে পড়াশুনো যা হয় দেখছি, খুব একটা ভয় পাবার মতো কিছু নেই—শুধু অনার্সটাতে যাতে ভালো করা যায়—আমার ইকনমিক্সে অনার্স।

কিন্তু রণজয় আর একটা ব্যাপার বুঝবে না। রণজয়ও ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, ছাত্র খারাপ নয়। তাছাড়া রণজয়রা বড়লোক, ওর বাবা নিশ্চয়ই পরীক্ষার আগে ওকে প্রাইভেট পড়াবার

জন্য কোনো প্রফেসরকে রেখে দেবে। আমার বেলায় সে প্রশ্ন তো ওঠেই না, আমি বাড়িতেও পড়ার তেমন সময় পাই না। আমাকে বাবা-মায়ের সেবা করতে হয়, বাজার করা থেকে ওষুধ কেনা সবরকম কাজ, তার ওপর আবার বিল্টুকে সামলাতে হয়, আমি নিজে পড়বো কখন? তাই আমি যতদূর সম্ভব ক্লাসে বসে মন দিয়ে প্রফেসরদের পড়ানো শুনি। কেজিবি বড্ড আস্তে-আস্তে পড়ান, গলার আওয়াজ ভাঙা-ভাঙা, তাই ছেলেরা ওঁর ক্লাসে খুব গোলমাল করে। কিন্তু আমি ফার্স্ট বেঞ্চে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনে দেখেছি, উনি পড়ান খুব ভালো, অনেক রেফারেন্স দেন।

তবুও, মাঝে-মাঝে ক্লাস ফাঁকি না দিলে ঠিক কলেজের চালু ছেলে হওয়া যায় না, তাই রণজয় আমাকে ছাড়বে কেন? রণজয় যে আমার গাঁইয়া ভাবটা কাটাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে!

সিঙ্গাড়াগুলো বাইরে যত গরম, ভেতরে আরও বেশি। তাড়াতাড়ি তুলে মুখে দিতেই ভেতর থেকে একটা গরম ধোঁয়া বেরিয়ে এসে মুখ প্রায় ঝলসে দেয়। মুখের মধ্যে গরম আলু নিয়ে হাঁসফাঁস করতে-করতে রণজয় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোরা কলকাতায় এলি কেন রে? বেশ তো ছিলি মফস্বলে, আবার কলকাতায় আসার ইচ্ছে হলো কেন?

আমি দৃঢ় স্বরে বললাম, আমি মোটেই মফস্বলে ছিলাম না। আমি পাটনার স্কুলে পড়েছি। কলকাতার মতন এত বড় শহর না হলেও, পাটনাও বেশ বড় শহর!

—আরে ঐ হলো। কিছু মনে করিস না তপন, কলকাতায় আজকাল বড্ড ভিড় বেড়ে যাচ্ছে! একে তো রিফিউজিরা এসে এক ইঞ্চি জায়গাও বাকি রাখে নি—তারপর যদি তোদের মতন বিহারীও আসে—

আচ্ছা, কোনো মানে হয়, আমাকে বিহারী বলার? আমরা চিরকালের বাঙালি, না হয় বিহারে ছিলাম কিছুদিন। বিহারে থাকতে কোনো-কোনো জায়গায় আমাদের বাঙালি-বাঙালি বলে অবজ্ঞা দেখিয়েছে—আর এখানে যদি আমাদের বিহারী বলে—

তবে, এটা রণজয়ের স্মার্ট হওয়ার কায়দা। আমি এ ক'দিনেই লক্ষ করেছি যে, স্মার্টনেস বলতে এরা বোঝে নিষ্ঠুরতা, দয়া-মায়া ভালবাসা, এইসব কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা হবে না, শুধু অন্যদের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলতে হবে।

কিন্তু রণজয়ের ওপর কোনোক্রমেই রাগ করা যায় না অবশ্য। রণজয়ের মনটা যে খুবই সরল আর উদার—তা এই দু-একদিনেই বুঝতে পেরেছি। রণজয়ের চেহারাটা যেমন সুন্দর, মনটাও তেমনি সুন্দর—শুধু বাইরে একটা ধারালো আবরণ রাখতে চায়। কালো রঙের সরু টেরিলিনের প্যান্ট আর একটা সাদা টি শার্ট পরেছে রণজয়, কোমরে চওড়া বেল্ট।

এই লক্ষ্মী কেবিনেই আলাপ হয়েছিল রণজয়ের সঙ্গে। আমিই ইচ্ছে করে আলাপ করেছিলাম। অন্য একটা টেবিলে চার-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে বসে তুমুল আড্ডা দিচ্ছিল রণজয়, একটা খালি চেয়ারে রাখা ওর বইপত্তর, একটা বই ছিল, অস্কার ওয়াইল্ডের 'পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে'। ওদের আড্ডার মধ্যিখানে আমি হঠাৎ রণজয়ের সামনে উঠে গিয়ে বলেছিলাম, আপনার এই বইটা একটু দেখতে পারি?

আমার দিকে তাকিয়ে একটু অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে রণজয় বলেছিল, নিন, আবার মনে করে ফেরত দেবেন।

বইটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে আমি অপেক্ষা করছিলাম ওদের আড্ডা ভাঙার। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন উঠে গেল ক্লাস করতে। রণজয়কে একা পেয়ে আমি বললাম, এই নিন বইটা। আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে একটু পড়তে দেবেন?

আমি সেদিন ধুতির ওপর শার্ট পরেছিলাম। এই পোশাকের ছেলেদের রণজয়ের মতন ছেলেরা একেবারে পাত্তা দেয় না। রণজয় তাই রুক্ষভাবে বললো, আপনাকে তো আমি চিনি না। বই দিলে ফেরত পাবো কি না জানবো কি করে ? ইচ্ছে হলে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়তে পারেন।

—আমি তো এই কলেজেরই ছেলে। আমি আর্টস পড়ি, ইকনমিক্সে অনার্স, আমার রোল নাম্বার ফর্টি এইট।

আমার ধৃষ্টতায় রণজয় আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল। আমি এবার খানিকটা চাপা গর্বের সঙ্গে বললাম, এ বইটা আমি আগে একবার পড়েছি অবশ্য, এটা আমার খুব ফেভারিট বই, আর একবার পড়তে ইচ্ছে করছে।

—বইটা আপনি পড়েছেন আগে?

— হ্যাঁ, বছর দুয়েক আগে। বইটা দারুণ না? ছবিটা যেখানে আস্তে-আস্তে বদলে যাচ্ছে, সেখানে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে না?

আস্তে-আস্তে রণজয় আমার সঙ্গে বইটা নিয়ে কথা শুরু করলো। তারপর আমরা একসঙ্গে হেঁটে কলেজ পর্যন্ত গেলাম। আপনি থেকে তুমি ডিঙিয়ে তুইতে নামতে আমাদের দু'দিনও সময় লাগলো না।

কলকাতায় রণজয় আমার প্রথম বন্ধু। আমার মধ্যে যে একটা এরকম কাঙালপনা ছিল মানুষের বন্ধুত্ব পাবার জন্য—এটা আমি নিজেই জানতাম না। রণজয় আমার মনে আঘাত দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেও, আমি যে ওর কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ তা-তো ও জানে না। নিজে থেকে আমি কিছুতেই ক্লাস বাদ দিতাম না কোনোদিন, কিন্তু রণজয় যে আমাকে টেনে আনলো—এখন বেশ ভালোই লাগছে। আমার কাছে রণজয়ের মতন একজন বন্ধু দরকার ছিল। ডানা শক্ত হলে পাখির বাচ্চা একা-একা আকাশে উড়ে যায়। সেইরকম আমারও এখন মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের জগৎ ছেড়ে অন্য একটা আকাশ চাই।

আমি রণজয়কে বললাম, আমরা কলকাতায় কেন এসেছি জানিস? আমার মা-বাবা দু'জনেরই অসুখ তো, তাঁদের চিকিৎসার সুবিধের জন্যে—

— তোর মা-বাবা দু'জনেরই অসুখ, বাড়িতে আর কে আছে ?

— আমার ছোট একটা ভাই, আর কেউ নেই।

রণজয় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমার বাবা-মায়ের অসুখের বিবরণ শুনলো, যেন সে একটা ডাক্তার। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো। বললো, তাহলে তো তোর খুবই অসুবিধে! চল, একটা সিনেমা দেখে আসি?

আমার বাবা-মায়ের অসুখের কথার পরই সিনেমা দেখার প্রস্তাবটা কি রকম অদ্ভুত।

আমি বললাম, সিনেমা? এখন তিনটে পনেরো বেজে গেছে—এখন কোথায় সিনেমায় যাবো।

ইভনিং শো-তে যাবো। চল, আমার বাড়ি চল, খানিকক্ষণ ক্যারাম খেলি, তারপর সন্ধেবেলা একটা সিনেমা দেখবো। কী ছবি দেখবি? ইংরেজি না বাংলা ? নাকি, তোরা বিহারী, তোদের হিন্দি বই ছাড়া অন্য কিছু ভালো লাগে না। আমি কিন্তু হিন্দি বই দেখি না।

আমি এবার একটু রেগে গিয়ে বললাম, আমিও হিন্দি বই দেখি না।

— চল টকি শো হাউসে বার্ট লাঙ্কাস্টারের একটা বই হচ্ছে সেটা দেখবো।

— না ভাই, আমি সন্ধেবেলা সিনেমা দেখতে পারবো না। অসম্ভব আমার পক্ষে।

— চল, চল, রোজ-রোজ আর ভালো ছেলে সাজতে হবে না।

— তবু বুঝতে পারছিস না, ভালো ছেলে সাজার প্রশ্ন নয়। আমি না ফিরলে আমার বাবা-

মা এমন ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—

— আরে একদিনে কিচ্ছু হবে না।

— অসম্ভব। আমাদের বাড়িতে আমি ছাড়া দেখাশুনো করার আর কেউ নেই।

—তোর ভালোর জন্যই বলছি। বাবা-মায়ের সেবা করছিস, বেশ ভালো কথা, কিন্তু মাঝে-মাঝে মনটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে আনবি তো। একটু সিনেমা-টিনেমা না দেখলে—

— সন্ধের শোতে সত্যি আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।

— ঠিক আছে। চল তাহলে এক্ষুনি চল।

— এখন তো সব বই আরম্ভ হয়ে গেছে।

— হোক গে। প্রথম দিকে নিউজ রিভিউ, বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন অনেক কিছু দেখায়—চল, চল ওঠ—

রণজয় আমার হাত ধরে টানতে-টানতে বাইরে এলো। ছুটতে-ছুটতে আমরা একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লাম। চলন্ত ট্রামে আমি আগে কখনো উঠি নি, সাহস করি নি—এখন ঝোঁকের মাথায় উঠে পড়ে দেখলাম, এমন কিছু শক্ত নয়। চলন্ত ট্রামের সঙ্গে-সঙ্গে কিছুক্ষণ দৌড়ে-দৌড়ে ওঠার কায়দাটা রণজয়কে দেখে শিখে নিতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। আস্তে-আস্তে আমি কলকাতার জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছি, খুব স্বাভাবিকভাবে। এরপর রাস্তার কোনো লোক আমাকে ভাবানীপুর বা টালিগঞ্জের কোনো ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেও অনায়াসে বলে দিতে পারবো।

টকি শো হাউসে টিকিট পাওয়া গেল না। যে দুটো বাংলা বই কাছাকাছি হলে চলছে, দুটোই রণজয়ের দেখা। আমি অবশ্য একটাও দেখি নি। আমাকে ডেকে এনেছে বলেই, রণজয় ওর একটা দেখা বই-ই আবার দেখতে রাজি হলো।

ছবিটা তেমন ভালো নয়। গোড়া থেকে শুরু হয়েছে কি রকম ন্যাকা ন্যাকাভাবে। নায়ক এক বিরাট ফ্যাক্টরির মালিকের ছেলে অথচ হাবভাব অবিকল গ্রাম্য জমিদারের মতন। জমিদারি প্রথা কবে উঠে গেছে, তা যেন পরিচালকের খেয়ালই নেই। শ্রমিকের সঙ্গে নায়ক এমনভাবে কথা বলছে, ঠিক যেন ওরা প্রজা। ওদিকে আবার গরিবের মেয়ের প্রেমে পড়া হয়েছে।

একটা নাচের দৃশ্যে আমি উত্তেজনায় রণজয়ের হাত চেপে ধরলাম। ফিসফিস করে বললাম, ঐ তো বন্দনাদি!

রণজয়ের দেখা ছবি, তাই সে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল না। অন্ধকারেই হেসে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, মফস্বলের সব ছেলেরাই অ্যাকটর অ্যাকট্রেসদের দাদা-দিদি বলে! সব সিনেমার ম্যাগাজিন দেখেছি মফস্বল থেকে লেখা চিঠিতে থাকে উত্তমদা, সৌমিত্রদা, মাধবীদি, সুচিত্রা সেনদিদি—

আমার চোখ ছবির পর্দার গায়ে আটকে আছে, নাচের দৃশ্যটা এ ছবির পক্ষে অবান্তর, কিন্তু কি সুন্দর নাচছে বন্দনাদি। জরির চুমকি বসানো নীল ঘাঘরা আর রুপোলি চোলি—গাঢ় কাজল দিয়ে আঁটা দু'টি চোখ। জানিই তো যে সিনেমায় ছবি সত্যি নয়, তবু ইচ্ছে করলো চেঁচিয়ে ডেকে উঠি বন্দনাদি! আশ্চর্য, নাচের সময় এক এক পাক ঘুরে এসে বন্দনাদি ঠিক আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি রণজয়কে বললাম, এর সঙ্গে না আমার খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল দেওঘরে। আরে, ঐ তো নীলাদিও রয়েছে এই সিনে। এরা দু'জনে একটা বাড়িতে থাকতো—আমি সেখানে রোজ যেতাম—

পেছনের সারি থেকে একজন লোক বললো, আস্তে ভাই, আস্তে !

রণজয় একবার পিছনদিকে মাথা ঘুরিয়ে কটমট করে তাকিয়ে লোকটাকে একবার দেখে নিল। তারপর তাকে অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞেস করলো, তুই অটোগ্রাফ নিয়েছিলি?

— কার ?

— বন্দনা রায়ের।

— না তো, আমার অটোগ্রাফ খাতাই নেই!

— তাহলে বুঝবো কি করে তুই সত্যি বলছিস না গুল ঝাড়ছিস?

— শুধু–শুধু গুল ঝাড়বো কেন ?

— আশ্চর্য হবার কিছু নেই, অনেকেই অকারণে গুল মারে।

— তুই বিশ্বাস কর, ওরা দু'জন একদিন রান্না করে আমাকে খাইয়েছিল।

পেছনের সারি থেকে এবার দু'জন লোক বললো, আঃ, কি হচ্ছে ভাই? আস্তে! কিছু শুনতে পাচ্ছি না!

রণজয় আমাকে বললো, চল উঠে যাই, তোর আর দেখার ইচ্ছে আছে ? ছবিটা আমারও ভালো লাগছিল না, তবু যদি বন্দনাদিকে আবার দেখা যায়, এইজন্য আমি শেষ পর্যন্ত থাকতে চাইলাম। বাকি সময়টা দেখলাম চুপ করে।

হল থেকে বেরিয়ে আমি রণজয়কে বললাম, তুই বিশ্বাস করলি না, বন্দনা আর নীলার সঙ্গে আমার চেনা আছে, দেওঘরে দারুণ আলাপ হয়ে গিয়েছিল, এই তো গত শীতকালে—

রণজয় গম্ভীরভাবে বললো, তা হতেও পারে। কিন্তু এখন তোকে দেখলে চিনতেও পারবে না। ওরা যখন যার সঙ্গে মেশে, খুব ভাব দেখায়, তারপর ভুলে যায়।

— মোটেই নয়। বন্দনাদি আমাকে বার বার বলেছে, যখন খুশি ওর সঙ্গে দেখা করতে।

রণজয় মুখটা ভারি করে আছে, ব্যাপারটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। এই একটা ব্যাপারে আমি যে ওকে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছি। রণজয় কলকাতার চৌকস ছেলে, ও যাকে চেনে না, তাকে আমি বিহারের গাঁইয়া ছেলে হয়েও চিনে বসে আছি।

আমি ফের বললাম, তুই জানিস, বন্দনা রায় কোথায় থাকে ?

— জানি! গ্রেস্ট্রিট এক্সটেনশনে। আমাদের পাড়ার কাছেই!

— ঠিক আছে। একদিন তোকে নিয়ে যাবো ওর বাড়িতে তখন দেখিস আমাকে কি রকম খাতির করে!

— একদিন কেন, আজই চল না—

— ঠিক আছে, চল! এখন ওদের বাড়িতে পাওয়া যায়?

— গিয়েই দেখা যাক! দেখতে তো দোষ নেই!

— চল এক্ষুনি যাই।

রাস্তা পেরিয়ে আমরা উল্টোদিকে বাস স্টপে দাঁড়ালাম। রণজয়কে বললাম, যদি আমার কথা সত্যি হয়, কী দিবি ?

রণজয় খানিকটা উদাসীনভাবে বললো, আগে গিয়ে দেখা যাক্ তো!

বাস আসতে, আমি তড়তড় করে এগিয়ে যাচ্ছি, রণজয় আমার কাঁধটা ধরে হা হা করে হেসে উঠলো।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। রণজয় বললো, বাঃ, তুই বেশ ছেলে তো? এই খানিকক্ষণ আগে বললি, সন্ধের পর এক মিনিটও বাইরে থাকতে পারবি না ! বাবার অসুখ, মায়ের অসুখ, কত দায়িত্ব—আর এখন একটা ফিল্‌ম্‌ অ্যাকট্রেসের বাড়ি যাওয়ার নামেই সব ভুলে গেলি।

লজ্জায় আমি মুখ নিচু করলাম। আশ্চর্য তো, এরকম ভুল আমার হলো কি করে? সত্যিই তো, বাবা–মায়ের অসুখের কথা আমার এই সময়টুকুর মধ্যে একবারও মনে পড়ে নি। উৎসাহের আতিশয্যে আমি অন্য সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বন্দনাদিকে রণজয় যেভাবে বলছে ফিল্‌ম্‌, অ্যাকট্রেস, আমি তো আর সেভাবে চিনি না! আমি ওকে দেওঘরে বন্দনাদি বলে ডাকতাম, উনিও আমাকে দিদির মতন ভালবাসতেন। নীলাদিটা একটু হিংসুটে ছিল—তবুও তিনজনে মিলে আমরা কত গল্প করেছি—রণজয় সেটা বুঝতে পারবে না।

রণজয় বললো, কি রে লালটু, লজ্জায় যে মুখটা লাল হয়ে গেল!

আমার গায়ের রঙ ফর্সা তবুও আমায় কেউ লালটু বললে আমার দারুণ রাগ হয়!

আমি জোর করে রণজয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললাম, ছাড়! আমি বাড়ি যাচ্ছি!

— ইস্‌, আমি মনে করিয়ে দিলুম বলেই তো—

— থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট—

— রাগ হলেই মফস্বলের ছেলেদের মুখে ইংরেজি বেরোয়! চল, আমি তোকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসছি।

— না, তোকে যেতে হবে না।

— বারে, আমি তোকে মনে করিয়ে দিলুম, আর আমার ওপরেই রাগ করছিস?

আমি সত্যিই রণজয়ের কাছে কৃতজ্ঞ, মুখে তো আর সে–কথা চট করে বলা যায় না। ভেতরে–ভেতরে আমার রাগও হচ্ছে—আর সবাই এখন বেড়াতে যাবে, আড্ডা দেবে, চায়ের দোকানে বসবে, শুধু আমাকে কেন এখন বাড়ি ফিরে বাবা–মায়ের সেবা করতে হবে? এই রাগ কার বিরুদ্ধে আমি জানি না, বাবা–মায়ের বিরুদ্ধে তো নয়—তবু রাগ হতে লাগলো।

রণজয় সেই রকম মিচকি–মিচকি হাসতে–হাসতে বললো, ধর তুই যদি আমার সঙ্গে ঝোঁকের মাথায় ঐ ফিল্‌ম্‌ অ্যাকট্রেসের বাড়ি যেতিস—বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যেতো—তখন তোর বাবাকে কী বলতিস?

— ফিল্‌ম্‌ অ্যাকট্রেস ফিল্‌ম্‌ অ্যাকট্রেস বলবি না বলছি! ওঁর সঙ্গে আমার অন্যভাবে চেনা ছিল—

— সে যে সম্পর্কই হোক! দেরি করে ফিরলে তুই বাবাকে কী বলতিস?

— তা দিয়ে তোর দরকার কি!

— তুই যদি ঠিক মতন বানাতে না পারিস তাহলে তোকে একটা কিছু শিখিয়ে দিতাম। গাঁইয়া ছেলেরা তো শহরে চট করে ছুতো বানাতে পারে না!

১০

বাবা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরি হলো কেন তপু? কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

আমি বিষণ্ন গলায় বললুম, আমাদের এক প্রফেসরের বাবা মারা গেছেন, দেখতে গিয়েছিলাম। সব ছেলে গেল, আমিও না গিয়ে পারলুম না!

বাবা একটু থমকে গেলেন। বাবা আমার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ির দরজায়। রাত ন'টা বেজে গেছে—বাবা যে আমার জন্য কতটা দুশ্চিন্তা করছিলেন তা তাঁর মুখ–চোখ দেখলেই বোঝা যায়। আমারও মনের মধ্যে সত্যিই খুব অনুতাপ হচ্ছে, কিন্তু কোনো উপায় ছিল না!

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল?

— কার?

— তোমাদের সেই অধ্যাপকের বাবার?

কিছুই হয় নি বলতে গেলে—সুস্থ মানুষ, হঠাৎ হার্ট ফেইল করেছেন। প্রফেসর তখন আমাদের ক্লাসে বসে পড়াচ্ছিলেন, সেই সময় খবর আসে। ছাত্ররাও ওঁর সঙ্গে বাড়িতে গেল। প্রফেসর পি কে বি আমাদের ইংরেজি পড়ান, খুব ভালবাসেন আমাদের।

— কত বয়েস হয়েছিল?

— পি কে বি'র বাবার? তা প্রায় ষাট–পঁয়ষট্টি হবে বোধহয়। কিন্তু স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল।

— কোথায় বাড়ি?

— আলিপুরের দিকে।

— গেছিস, ভালো করেছিস। কিন্তু বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যেতে পারলি না? আমরা ভেবে–ভেবে মরছিলাম—তুই তো কলকাতার রাস্তাঘাট এখনো ভালো চিনিস না—

— খবর দেবার কোনো উপায়ই যে ছিল না। অতদূর থেকে আমি একা–একা চলে আসতেও পারছিলুম না।

— ঠিক আছে, ঘরে ঢুকিস না এখন। আগে চান করে নে।

— এত রাত্তিরে চান কেন?

— শ্মশানে যাস নি? শ্মশানে গেলে চান না করে ঘরে ঢোকে না।

আমি অবশ্য শ্মশানে যাই নি, কোনো অধ্যাপকের বাড়িতেও যাই নি, গিয়েছিলাম ডায়মন্ডহারবার, তবু বাবার কথা অনুযায়ী স্নান করবার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেলাম। মনে হলো, আমার অন্যায়ের জন্য একটা কিছু প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।

আজ কলেজে ফার্স্ট পিরিয়ডেই রণজয় বলেছিল, আজ একটার সময় আমরা ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছি, তুই যাবি।

ডায়মন্ডহারবার কোথায় আমি জানতাম না। নামটা শোনা–শোনা, কিন্তু তার বেশি আর কিছু জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, ডায়মন্ডহারবার কত দূরে রে?

রণজয় অবহেলার সঙ্গে বললো, কাছেই। গাড়িতে আর কতক্ষণ লাগবে! আমার মেসোমশাই একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গা আছে, তুই যাবি তো বল।

ডায়মন্ডহারবার সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা আমি বেশি জাহির করতে চাইলুম না। কলকাতা শহরটাই আমি এখনো ভালো করে চিনি না। বালীগঞ্জ শুনলেই মনে হয় অনেক দূরের জগৎ। মনে–মনে ভাবলুম, হারবার মানে তো বন্দর, তাহলে কলকাতারই বন্দরের নাম ডায়মন্ডহারবার। কলকাতা ছাড়া আর তো কাছাকাছি কোনো বন্দর নেই।

তবু কায়দা করে জেনে নেবার জন্য আমি খানিকটা উদাসীনের ভান করে বললাম, কী–ই বা দেখবার আছে সেখানে! গিয়ে কি হবে!

রণজয় বললো, গাড়িতে খানিকটা বেড়ানো হবে! তুই আগে যাস নি তো কখনো? তাহলে দেখবি—গঙ্গা ওখান থেকে কত সুন্দর দেখায়!

গঙ্গা শুনেই আমার দ্বিধা কেটে গেল। কলকাতার পাশ দিয়ে গঙ্গাকে বয়ে যেতে দেখেছি, এরই পারে যখন, তখন আর ডায়মন্ডহারবার কত দূরে হবে। এরকম একটা বেড়াবার সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়! আমাকে আর কে গাড়িতে নিয়ে যাবে! এতদিন কলকাতায় এসেছি, কিছুই তো দেখি নি!

— রণজয়, ক'টার মধ্যে ফিরতে পারবো রে?

— এই ধর, সাড়ে পাঁচটা–ছ'টা!

মস্ত বড় স্টেশন ওয়াগন, আমি আর রণজয় বসেছি সামনে ড্রাইভারের পাশে। ডায়মন্ডহারবারের কাছে রণজয়ের মেসোমশাইয়ের একটা বিরাট পোলট্রি ফার্ম আছে। সেটার দেখাশুনো করার জন্য অন্য লোক আছে, মেসোমশাইও মাঝে–মাঝে পরিদর্শন করতে যান। আজ গাড়িতে রণজয়ের মাসীমা, তাঁর দুই ছেলে মেয়ে, আর শম্পাও রয়েছে। রণজয়টা দারুণ মিথ্যুক ! ও আমাকে বলেছিল যে শম্পা ওর মাসতুতো বোনের বন্ধু—মোটেই তা নয়। রণজয়ের মাসতুতো বোন মিলির বয়েস মাত্র দশ–এগারো বছর, আর শম্পা ওর মাসীমার জায়ের মেয়ে। শম্পা তো আমাকে চেনে না, তাই আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি গাড়ির মধ্যে, যদিও আমার মনে হচ্ছে, শম্পাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। অথচ, শম্পাকে তো আমি মাত্র একবারই দেখেছি, তবুও মনে হয় যেন বহুকালের চেনা। কেন এ–রকম মনে হয় যে, কে জানে!

আমাকে যে সঙ্গে নিয়ে আসছে সে কথা রণজয় আগে কাউকে বলে নি। আমাকে দেখে ওরা বেশ অবাকই হয়েছে। গাড়িতে অবশ্য জায়গার অভাব হয় নি, কিন্তু একটা বাইরের ছেলেকে সঙ্গে নেওয়ায় ওরা বিরক্ত হন নি তো? কি জানি, কিছুই বুঝতে পারি না। যদিও রণজয়ের মাসী বেশ হাসিমুখেই বললেন আমার দিকে চেয়ে, তুমি রণজয়ের সঙ্গে পড়ো? দেখলে তো মনে হয় আরও বাচ্চা। কত বয়েস তোমার ?

— আমি লাজুকভাবে বললাম, সতেরো।

— সতেরো? দেখলে মনে হয় ইস্কুলের ছেলে!

রণজয়ের মেসো বললেন, মোটেই তা মনে হয় না। বেশ তো স্বাস্থ্য ভালো ছেলেটির। কি নাম তোমার !

— তপনকুমার সান্যাল !

— সান্যাল, বারেন্দ্র ? কোথাকার? পূর্ববঙ্গের না পশ্চিমবঙ্গের?

রণজয় হাসতে–হাসতে বললো, কোনো বঙ্গেরই নয়! ও তো বিহারী!

আমি রণজয়ের দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে, আবার ওর মেসোমশাইয়ের দিকে ফিরে বললাম, আমাদের দেশ আগে ছিল হুগলী জেলার কি একটা গ্রামে, কিন্তু আমরা বহুকাল বিহারে ছিলাম।

— তবে তো ঘটিই! আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা ঘটি হলেও আমি কিন্তু বাঙাল।

রণজয়ের মেসোমশাই খুব বড়লোক, অনেক ব্যবসা–ট্যাবসা আছে, কিন্তু এমনিতে খুব খোলামেলা মানুষ। মর্যাদা বোঝাবার জন্য মুখ গোমড়া করে থাকেন না।

রণজয় আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়, তাহলেও লম্বায় আমার সমান–সমান, তবু যে ওর মাসী ওর তুলনায় আমাকে ছোট দেখায় বললেন, কারণ বোধহয়, শহুরে ছেলে বলে রণজয়ের মুখে চোখে একটা অভিজ্ঞ ভাব এসেছে, আমার এখনো সেটা নেই।

ট্রাম লাইন যেখানে শেষ হলো, রণজয় বললো, সেই জায়গাটার নাম বেহালা। কি মজার নাম। জায়গার নামও বেহালা হয় ? বিহারে জায়গার নাম হয়, কেচকি, লাতেহার, হেসাডি, গালুডি—এইরকম সব বিদ্‌ঘুটে। কলকাতার আশেপাশে কি সেতার, তবলা, সারেঙ্গী—এইরকম নামেরও জায়গা আছে নাকি!

বেহালা ছাড়াবার খানিকটা পর রাস্তা অনেক সুন্দর হয়ে এলো, ভিড়ও কম। রণজয় ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, শম্পা, একটা গান করো না ?

শম্পা বললো, ঘ্যাট্! গাড়ির মধ্যে আবার গান কি ?

— কেন, কি হয়েছে কি ? বেশ গলা খুলে গাও!

— না, তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি গাও না!

— ও, তোমার বুঝি তানপুরা–তবলা ছাড়া গলা খোলা বারণ ? যত সব মেয়েলি ব্যাপার!

রণজয়ের মেসোমশাই বললেন, তোমরা ছেলেরা দুজনেই একটা গান ধরো না! তোমার বন্ধু গান জানে না ?

— এই তপন, তুই কি গান জানিস?

আমি একেবারে লজ্জায় মরে গিয়ে বললুম, আমি তো গান জানি না।

—যা জানিস, তাতেই হবে। কোন্‌টা গাইবি বল।

—সত্যিই আমি কোনো গান জানি না।

—ধ্যাৎ তেরিকা!

রণজয় নিজেই চেঁচিয়ে গাইলো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। আমি চুপ করে শুনতে লাগলুম। রণজয়ের কণ্ঠস্বর বেশ জোরালো, খুব সুরেলা নয় অবশ্য, মাঝে–মাঝে একটু কেঁপে যাচ্ছে, তা হোক, গাইছে বেশ তেজের সঙ্গে। আমি যে গান জানি না একেবারে, ঠিক তা নয়। কলকাতায় ছেলেরা গান বলতে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতই বোঝে—আমি একটাও রবীন্দ্রসঙ্গীত পুরোপুরি জানি না। শুনেছিও খুব কম। পাটনায় আমার বড়মামা খুব সঙ্গীতরসিক ছিলেন, মাঝে–মাঝেই বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসাতেন, সেইসব শুনে–শুনে ঠুংরি আর ভজন শিখেছিলাম আমি, খেয়াল গানের কিছু–কিছু রাগ–রাগিণীও চিনতে পারি—কিন্তু চলন্ত গাড়িতে যেতে–যেতে সে–সব গান মানায় না!

একটা গান শেষ করে রণজয় আমাকে বললো, তপন, তুই ইন্টার ন্যাশনালটা জানিস না!

— ইন্টারন্যাশনাল কি ?

— আচ্ছা ছাতুমার্কার পাল্লায় পড়েছি দেখছি। তাও জানিস না?

মেসোমশাই বললেন, তোমাদের কম্যুনিস্টদের গান তো? গাও, গাও, গাও, বেশ লাগে শুনতে—

রণজয় বললো, আমি এক লাইন করে গাইবো, তারপর তুই ধরবি তপন। তাড়াতাড়ি শিখে নে গানটা।

রণজয় ভরাট গলায় চেঁচিয়ে গাইতে লাগলো, অ্যারাইজ ও প্রিজনার অফ স্টার্ভেশান। অ্যারাইজ ও রেচেড অফ দ্য আর্থ।

আমি গলা না খুলে ঠোঁট নেড়ে–নেড়ে গানটা শেখার চেষ্টা করলুম। শম্পা এক সময় পেছন থেকে বললো, এই, এই, সুর ভুল হচ্ছে।

আমি এই প্রথম পেছন ফিরে তাকিয়ে শম্পাকে দেখলাম। জানলার পাশের সিটে বসে আছে শম্পা, তার ফর্সা মুখে খুব রোদ লাগছে বলে মুখখানা মনে হয় রুপো দিয়ে তৈরি—আজও একটা গাঢ় হলুদ রঙের শাড়ি পরে আছে।

রণজয় বললো, মোটেই না। আমার কক্ষনো সুর ভুল হয় না!

শম্পা জোর দিয়ে বললো, আগাগোড়া সুর ভুল!

শম্পার সঙ্গে লেগে গেল রণজয়ের তর্ক। বেশ খানিকটা বাদে, ঠিক সুরটা দেখাবার জন্য শম্পা মাত্র দু'টি লাইন গেয়ে শোনালো খুব চাপা গলায়। আমি তখুনি বুঝতে পারলাম, অপূর্ব গানের গলা শম্পার। একদিন ও হয়তো খুব বড় গায়িকা হবে।

রণজয় বলেছিল বেশি দূর নয়। গান শুনতে-শুনতে খেয়াল করি নি, কিন্তু এ তো অনেক দূরের রাস্তা! তখনই বাড়ি ফেরার চিন্তা আমার মনে এলো, কিন্তু সব মিলিয়ে এত ভালো লাগছিল যে সে চিন্তাটা তখন আমি চাপা দিয়ে দিলাম।

রণজয়ের মেসোমশাইয়ের পোলট্রি ফার্মটা সত্যিই খুব বিরাট। আগাগোড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা মস্তবড় কম্পাউন্ড, মাঝখানে একটা পুকুর ও ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ি। মুরগি রয়েছে প্রায় কয়েক হাজার, গরুও প্রায় তিরিশ চল্লিশটা, এছাড়া হাঁস আর শুয়োর। শুয়োরগুলোর চেহারাই ভারি মজার। বিহারের নানা শহরে থাকতে কুৎসিত চেহারার শুয়োর অনেক দেখেছি মেথরদের বস্তিতে, বুনো শুয়োরও দেখেছি হাজারিবাগে, কিন্তু এ রকম লাল আর সাদায় মেশানো থলথলে চেহারার শুয়োর আমি আগে কখনো দেখি নি। এগুলো বিলিতি শুয়োর, প্রত্যেকটার চেহারার মধ্যেই কি রকম যেন বড়বাবু-বড়বাবু ভাব। চায়ের সঙ্গে সসেজ বলে কয়েকটা লম্বা-লম্বা জিনিস খেতে দিল আমাকে। সসেজ কথাটা ইংরেজি বইতে অনেকবার পড়েছি, কিন্তু সেটা যে শুয়োরের মাংস দিয়ে তৈরি কোনো খাবার, তা জানতুম না। কি অপূর্ব খেতে! ঐ রকম বিদ্‌ঘুটে চেহারার জানোয়ারের মাংস দিয়ে এমন সুন্দর খাবার হয়।

চা খেতে-খেতেই সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। বাড়ি ফিরবো কখন? পুকুর পাড়ে এসে আমি রণজয়কে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলাম, রণজয়, বাড়ি ফিরবো কখন রে?

— কেন, তোর এখানে ভালো লাগছে না?

— না, না, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু—

— তাহলে এক্ষুনি বাড়ি ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন?

— তুই তো জানিস, আমাকে সন্ধেবেলা বাড়িতে ফিরতেই হয়। আমার বাবা-মা দু'জনেরই—

— বাজে কথা বলিস না! সেদিন তো সেই একটা ফিল্ম অ্যাকট্রেসের কথায় এমন নেচে উঠেছিলি যে বাবা-মায়ের অসুখের কথা কিছুই মনে ছিল না!

— আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, সেটা হঠাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া হয়তো শেষ পর্যন্ত যেতাম না—একটু পরেই মনে পড়তো—

— ঠিক আছে, তোর চিন্তার কিছু নেই, তোকে আমি দারুণ একটা ছুতো বানিয়ে দেবো—

— তা নয়, হঠাৎ যদি মা কিংবা বাবার অসুখ বেড়ে যায়।

— এখন চুপ কর তো! ওরকম হঠাৎ-হঠাৎ কিছু হয় না।

— তোর মেসোমশাই কখন ফিরবেন ?

— দাঁড়া, আগে ওঁর কাজ শেষ হোক। ন'টার মধ্যে ঠিক পৌঁছে যাবি।

— ন'টা ? তুই যে বলেছিলি, ছ'টা-সাড়ে ছ'টার মধ্যে—

— বলেছিলাম তো বলেছিলাম। সব কি ঘড়ির কাঁটায় হয় নাকি!

— এখান থেকে ট্রেন নেই ? আমি তাহলে আলাদা—

— তুই একা-একা ট্রেনে যাবি। কিছু চিনিস না শুনিস না, তোকে একা-একা ছেড়ে দেবো নাকি ? তা ছাড়া, এখান থেকে স্টেশন অনেক দূরে। নে, পুকুরের ওপাশটায় চল, খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে—

মাসীমা-মেসোমশাই হাঁস-মুরগির তদারক করতে ব্যস্ত, ছেলেমেয়েরা গাড়ির মধ্যে। আমি আর রণজয় পুকুরের ওপাড়ে চলে এলাম। এখানে ছোট একটা বাগান, মাঝখানে ফোয়ারা, পাথরের বাঁধানো বেদি। এখানে কত রকম ফুল, অনেকগুলোরই আমি নাম জানি না।

পাথরের বেদিটায় বসে রণজয় ফস্ করে পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বার করে আমাকে বললো, নে খা।

আমি একেবারে শিউরে উঠে বললাম, এখানে বসে সিগারেট খাবি? মাসীমা কিংবা মেসোমশাই যদি দেখে ফেলে?

— ওঁরা এখানে আসবেন না। এখন ফার্মে রয়েছেন।

— যদি ধর হঠাৎ এসে পড়েন?

— আরে, তুই আচ্ছা তো। এসে পড়লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি ? বড় জোর সিগারেটটা একটু লুকোবি, তাতে রেসপেক্ট দেখানো হবে। সিগারেট খাওয়া তো আর অন্যায় নয়। আমরা তো আর ড্রিঙ্ক করছি না।

আমি সদ্য সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়েছি, এমন সময় বাগানের মধ্যে কার যেন আসার শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি সিগারেট আর ধোঁয়া লুকোতে গিয়ে বিষম লেগে গেল।

মাসীমা কিংবা মেসোমশাই নয়। বন থেকে এক রাজকন্যা বেরুবার মতন মাধবীলতার ঝাড় ভেদ করে এলো শম্পা। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, এখানে বসে লুকিয়ে-লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে ? দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি কাকীমাকে!

রণজয় হাসতে-হাসতে বললো, তোমাকে আর বলতে হবে না। তোমাকে দেখেই তপনের কি অবস্থা। এরপর যদি মাসীমা-মেসোমশাইকে দেখে!

শম্পা আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। গ্রাহ্যই করলো না। রণজয়কেই আবার বললো, তুমি আবার সিগারেট খাচ্ছো? কাকীমা তোমাকে একদিন বারণ করেছেন না?

— কাকীমা বারণ করলেই সবকিছু শুনতে হবে নাকি?

— দ্যাখো না, এবার বলে দিলে তোমায় কি রকম বকেন।

— বলো না, এক্ষুনি গিয়ে বলো।

— বলতে না পারি, একটা শর্তে। আমাকে একটা সিগারেট দাও।

— ঠিক জানি, গন্ধ পেয়েই তুমি এসেছো।

আমার আর রণজয়ের মাঝখানের জায়গাটায় বসে পড়লো শম্পা, তারপর পা দোলাতে-দোলাতে সিগারেট টানতে লাগলো। একটু আড়ষ্টতা নেই ওর ব্যবহারে। বাচ্চা হরিণের শরীরে যে রকম মসৃণতা আর চঞ্চলতা থাকে শম্পারও যেন সেইরকম!

আমি এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখি নি, দেখবো বলে ভাবিও নি। বিহারে থাকতে নিচু শ্রেণীর হিন্দুস্থানী বুড়িদের দেখতাম তামাক খাচ্ছে কিংবা বিড়ি খাচ্ছে! আর দেখেছিলাম দেওঘরে বন্দনাদি আর নীলাদিকে। কিন্তু ওরা তো সিনেমার মেয়ে। সিনেমার মেয়েদের তো সিগারেট খেতেই দেখেছি। হিন্দি সিনেমায় অনেকবার দেখেছি। কিন্তু শম্পার মতন মেয়ে... অথচ একটুও খারাপ লাগছে না। শম্পার চাঁপা ফুলের মতন নরম আঙুলে যা ছোঁবে, সবই মানিয়ে যাবে।

শম্পা কিন্তু আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি এতক্ষণ। শম্পা আমার এত কাছে বসে আছে যে ওর শাড়িটা লাগছে আমার গায়ে, ওর মাথায় দু-এক গাছা চুল হাওয়ায় উড়ে আমার গালে সুড়সুড়ি দিল, অথচ শম্পা যেন জানেই না। ওর পাশে আর একজন বসে আছে, রণজয়ের সঙ্গেই কথা বলায় মত্ত। আর ওরা দু'জনে যখনই কথা বলে, কি রকম যেন ঝগড়া-ঝগড়া সুর থাকে।

রণজয়টাই বা কি, আমার সঙ্গে ওর আলাপও করিয়ে দিল না। ভারি অসভ্য। আলাপ না করিয়ে দিলে আমি নিজে থেকে কিছুতেই কথা বলতে পারবো না। এ পর্যন্ত আমি কোনো অনাত্মীয় মেয়ের এত পাশাপাশি বসি নি যার সঙ্গে আমার একটাও কথা হয় নি। একমাত্র রেলের কামরায় ছাড়া।

শম্পা ঝট করে আমার দিকে ফিরে বললো, এই তুমি তো গান জানো। তখন বললে কেন, জানি না ?

তুমি! প্রথমেই তুমি ? আমি প্রায় কেঁপে উঠেছিলাম। শম্পা আমার সমবয়েসী হলেই বা কি,

কলেজের এক ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কি প্রথমেই তুমি বলে?

আমি মিনমিন করে বললাম, না তো, গান জানি না সত্যিই। কে বললে?

শম্পা আমার চোখের ওপর সরাসরি চোখ রেখে বললো, কারুকে বলতে হবে না। আমি ঠিক জানি। আমি দেখলাম, রণজয় যখন গান গাইছিল তুমি আঙুলে আস্তে-আস্তে তাল দিচ্ছিলে। তোমার তাল ভুল হয় নি একবারও।

রণজয় বললো, তুমি আবার সেটা দেখলে কখন?

—আমি সব দেখি, সব লক্ষ করি।

আমি তবুও বললাম, না, আমি গান জানি না।

—তবে কি তবলা বাজাও কিংবা সেতার?

—না, তাও না।

—দেখি তোমার হাত? তবলা কিংবা সেতার বাজালে আঙুল দেখলেই বোঝা যায়।

এবার আমি একটু মজা পাচ্ছিলাম। আমার দুটো হাত মেলে ধরলাম ওর সামনে। শম্পা আমার দুটো আঙুল ছুঁয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখলো, তারপর ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ আমার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গিয়ে রণজয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। আমার কথা যেন আবার ভুলে গেল।

এবার আমার মনে লাগলো। তিনজনে মিলে এক সঙ্গে কথা বলা যায় না? আমার সম্পর্কে এই অবহেলা কেন। আমি কি ফেলনা নাকি ? গান না–জানলে বুঝি সে মানুষ সম্পর্কে আর কোনো উৎসাহ দেখাতে নেই?

আমি খানিকটা গর্বের সুরে বললাম, আমি একটু–একটু গান জানি ঠিকই, কিন্তু সে গান তোমাদের পছন্দ হবে না।

শম্পা আবার মুখ ফিরিয়ে বললো, কী গান? কাওয়ালি ? একমাত্র কাওয়ালি গান আমার ভালো লাগে না।

—না, খেয়াল, ঠুংরি?

—খেয়াল, ঠুংরি?

শম্পা তার রক্তিম ওষ্ঠাধরে ফুরফুর করে হাসতে লাগলো। তারপর প্রথমে রণজয়ের দিকে ফিরে বললো, রণজয়দা, তোমার বন্ধু কি ওস্তাদজী নাকি ? তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, কী রকম খেয়াল জানো, শোনাও তো একটা।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কী রাগ গাইবো ? শুনে চিনতে পারো কোন্‌টা কি রাগ রাগিণী?

শম্পা আবার হাসতে–হাসতে বললো, ইস্, পোজ আছে খুব। তোমার বুঝি ধারণা, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ওসব গান জানে না ? খুব হয়েছে, গলা খোলো তো একটু দেখি।

আমি একটা গানের প্রথম মুখটা শুরু করতেই শম্পা বলে উঠলো, কালেংড়া। এ তো কালেংড়া।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে শম্পার মুখের দিকে তাকালাম। তবু ওকে একটু খোঁচা মারার জন্য বললাম, কালেংড়া কোন্ ঠাট বল তো ?

রণজয় আমার পেটে খোঁচা মেরে বললো, কি রে গাঁইয়া। তোর পেটে–পেটে এত?

তারপর কিছুক্ষণ সময় পাখা মেলে উড়ে যেতে লাগলো। আমি দুটো ঠুংরি শোনালাম। শম্পা শোনালো একটা ক্লাসিক্যাল অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত। রণজয় গাইলো—দু-তিনটে আই, পি, টি-এর গান। গানের মধ্য দিয়ে আমরা অল্পক্ষণেই বন্ধু হয়ে গেলাম? শম্পা বললো, তপন, তুমি আমাদের বাড়িতে এসো একদিন। আমাদের বাড়িতে প্রায় গান-বাজনা হয়।

এক সময় আমি দেখলাম, ঘড়িতে পৌনে সাতটা বাজে। আমি শিউরে উঠলাম। সর্বনাশ।

আমি অসহায়। আমি যদি এক্ষুনি আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে পারতাম।

রণজয় আমার মুখের ভাব বুঝতে পেরে শম্পাকে জিজ্ঞেস করলো, শম্পা, আমরা ক'টার মধ্যে ফিরবো বলো তো?

শম্পা হালকাভাবে উত্তর দিল, দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবো। রাত্তির বেলা ফাঁকা রাস্তা, দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

দশটা শুনে আমার বুকে মধ্যে যেন হাতুড়ির আওয়াজ হলো। তবে, একথাও ঠিক, একরাশ লজ্জাও জমা হয়েছে আমার বুকের মধ্যে। শম্পা তো সব বুঝবে না, ও ভাববে, আমি গোবেচারা ভালো ছেলের মতন সন্ধে হতে না হতেই বাড়ি ফিরে যাই।

রণজয় বললো, দশটা হলে খুব দেরি হয়ে যাবে। তপনের একটু তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

শম্পা সঙ্গে-সঙ্গে বললো, ঠিক আছে, আমি কাকাকে বলছি।

আমার মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে গেল, না, না, ওঁকে কিছু বলতে হবে না।

আমার বাড়ি ফেরার খুবই দরকার ঠিকই, কিন্তু আমার জন্য ওঁদের কাজ অসমাপ্ত থাকবে, কিংবা বেড়াবার আনন্দ নষ্ট হবে, এটা ভাবতেও ভালো লাগে না।

রণজয় বললো, তপন বাড়ি গিয়ে কি বলবে, এসো, একটা সেই গল্প বানানো যাক।

শম্পা সঙ্গে-সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলো ; দুষ্টু-দুষ্টু চোখে বললো, তুমি তো কলকাতায় নতুন এসেছো। কলকাতায় অনেক ছেলে-ধরা আছে, বাড়ি গিয়ে বলবে, তোমাকে ছেলে-ধরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তুমি তাদের সঙ্গে লড়াই করে অতিকষ্টে উদ্ধার পেয়েছো। বানাতে পারবে না?

রণজয় বললো, ধ্যাৎ! ঐ সব গল্প সত্যি হলেও কেউ বিশ্বাস করে না। তপন, তুই বলবি যে, তোদের ইংরেজির প্রফেসরের বাবা মারা গেছেন, তুই তাই অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলি।

আমি আস্তে-আস্তে বললাম, ওরকম ডাহা মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না। বাবা আমার মুখ দেখলেই বুঝতে পারবেন।

— মিথ্যে কথা তোকে কে বললো ?

রণজয় এরপর আমাকে একটা অপূর্ব যুক্তি শেখালো। ও বললো, কখনো কারুর কাছে পুরো মিথ্যে কথা বলবি না, ধরা পড়ে যাবি! বলতে হলে বলবি, হাফ ট্রুথ কিংবা হাফ লাই। তাহলে, বলার সময় বুক কাঁপবে না। এই ধর না, তোদের ইংরেজি প্রফেসরের সত্যিই বাবা মারা গেছে—আজ নয় অবশ্য, গত সপ্তাহে। তোদের ক্লাসের অনেক ছেলে ওঁর সঙ্গে বাড়িতে গিয়েছিল, তুই যাস নি অবশ্য, কিন্তু গেলেও যেতে পারতিস। অর্থাৎ, সাতদিন আগেকার ঘটনা, তুই আজকের বলে চালাবি। কেউ অবিশ্বাস করবে না।

সত্যিই তাই, রণজয়ের শেখানো কথাগুলো বাবার সামনে বলতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। ফেরার পথে গাড়িতে আবার আমরা আনন্দে হৈ-হৈ করতে করতে এলাম—তখন বাড়ির কথা ভুলেছিলাম। কিন্তু বাড়ির গলির মোড়ে এসেই রাজ্যের অপরাধবোধ ও দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল—আমার সেই মুখ দেখে বাবা অবিশ্বাস করেন নি।

শুধু আমি শ্মশানে গিয়েছিলুম ভেবে, বাবা আমাকে এত রাত্রে স্নান করতে বাধ্য করালেন। অথচ, শ্মশান নয়, আমি গিয়েছিলাম স্বর্গের মতন একটা সুন্দর বাগানে, সেখানে সারল্যের দেবমূর্তির মতন একটি মেয়ে ঐ শম্পা, সে আমার বন্ধু হয়েছে, সে আমার দু'আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছে। সেই স্পর্শ আমার সারারাত বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু শ্মশানের অপবিত্রর মতন তাকে আমি ধুয়ে ফেললাম। যাক্, শম্পার সঙ্গে তো আবার দেখা হবেই।

স্নান করে বেরিয়ে আমি সোজা মায়ের ঘরে চলে এলাম। বসলাম মায়ের শিয়রের কাছে।

মায়ের মুখখানা আজ বেশি শুকনো দেখাচ্ছে। চোখের নিচে অনেকখানি কালো ছায়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মা, তোমার শরীর কি আজ বেশি খারাপ লাগছে?

একটা চাদর মুড়ি দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়েছিলেন মা। আমার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, না। ভালো আছি। তুই কোথায় গিয়েছিলি?

মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতে বুক কেঁপে গেল। কিন্তু উপায় নেই তো। বললাম এই তো, কলেজের কয়েকজন ছেলের সঙ্গে আমাদের এক প্রফেসরের বাড়িতে—ওনার বাবা—

আমার গল্পটাকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না মা। প্রফেসরের বাবার মৃত্যু সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে বললেন, এই বয়সের ছেলে কি রোজ-রোজ বিকেলবেলা বাড়িতে বসে থাকতে পারে? কিন্তু তুই কী করবি বল, তোর বাবা-মা যে এই রকম। তুই যাস মাঝে-মাঝে, বন্ধুদের সঙ্গে একটু-আধটু বেড়িয়ে আসিস—শুধু বলে যাবি, না বলে গেলে খুব চিন্তা হয়।

মা আমার বানানো গল্প বিশ্বাস করেন নি। মা ঠিক বুঝতে পেরেছেন যে আমি আজ বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবাকে ভোলাতে পেরেছিলাম, কিন্তু মায়েরা ঠিক বুঝে যায়।

১১

— ছিঃ, তোর লজ্জা করে না। আজ তুই বই-খাতা নিয়ে কলেজে এসেছিস।

— বাঃ, বই-খাতা না নিয়ে কলেজে আসা যায়?

— আজ তুই ক্লাস করতে চাস? দিন-দিন প্রতিক্রিয়াশীলদের দালাল হচ্ছিস বুঝি?

— প্রতিক্রিয়াশীল কারা? তাদের আমি চিনিই না— তাদের দালাল হবো কি করে?

— ন্যাকাপনা করিস না। আজ আমরা স্ট্রাইক কল দিয়েছি, তুই আগে থেকে জানতিস না?

— জানতাম।

— তাহলে? তুই যদি কলেজে ঢোকার চেষ্টা করিস, বোমা মেরে তোর মাথা উড়িয়ে দেবো, শালা।

কলেজের গেটের সামনে দারুণ ভিড়। রণজয় এত চেঁচিয়ে কথা বলছে যে আরও অনেক ছেলে শুনতে পেয়ে আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাচ্ছে। যে রকম আবহাওয়া, হয়তো সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মারধোর শুরু করবে। এর আগে কোনোদিন কোনো ধর্মঘটে যোগ দিই নি। পাটনায় থাকবার সময়, যখন স্কুলে দু-একবার ধর্মঘট হয়েছে, সেদিন আমি বাড়ি থেকে আর বেরুই নি।

আমি বিগলিতভাবে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, যাঃ মাইরি তুই বুঝিস না। বই-খাতা না আনলে তো বাড়ি থেকে আমাকে বেরুতেই দিত না।

রণজয়কে শান্ত করার জন্য আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। রণজয়ের মেজাজ তবুও শান্ত হলো না। প্রায় ধমক দিয়ে আমাকে বললো, যা, বই-খাতা চায়ের দোকানে রেখে আয়। এখানে ব্যারিকেড করতে হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিশ ঢুকে ছাত্রদের মেরেছে, সেই প্রতিবাদে আজ সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট। বর্ধমানে চৌদ্দজন ছাত্র আহত হয়েছে, একজনের অবস্থা গুরুতর, সুতরাং সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ওখানে পাঁচজন পুলিশও অবশ্য বোমার ঘায়ে দারুণ চোট পেয়েছে—কিন্তু সে পুলিশের কথা পুলিশ ভাববে, আমরা ভাববো ছাত্রদের কথা। তবে ছাত্ররা সেদিন বই-খাতা

না নিয়ে বোমা পকেটে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল কেন, তা অবশ্য আমি বুঝি না। এসব কথা কারুকে জিজ্ঞেস করাও যায় না, করতে নেই।

আমাদের কলেজের গেটের সামনে শ্লোগানের ঝড় বইছে। রণজয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নার্ভাস গলায় আমিও যোগ দিয়েছি তাতে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আমাদের দাবি মেনে নাও। রক্তের বদলে রক্ত চাই। প্রথম-প্রথম একটু আড়ষ্ট লাগে, তারপর কিন্তু চিৎকার করতে আর খারাপ লাগে না, বরং একটা নেশার মতন আরও চ্যাঁচাতে ইচ্ছে করে।

একটি ছেলেও কলেজে ঢুকতে সাহস করলো না। অনেক ছেলেই বই-খাতা আনে নি, যারা এসেছিল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই সরে পড়লো। একটু বাদে, সেকেন্ড ইয়ার-থার্ড ইয়ারে পড়া কয়েকজন দাদা শ্রেণীর ছাত্র এসে বলে গেল যে, সাড়ে বারোটার সময় মিছিল বেরুবে, সবাইকে যেতে হবে।

বিরাট মিছিল বেরুলো দুপুরবেলা, আমি রণজয়ের কাছাকাছিই রইলাম। মাঝে-মাঝে অন্য কলেজের ছেলেদের মিছিল এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, লম্বা হয়ে যাচ্ছে লাইন। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল, আমরা ইচ্ছে করেই রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে গাড়ি-ঘোড়ার পথ আটকে দিলাম। অনেকগুলো দোকানে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে, কিছু দোকান আধ-খোলা।

রণজয় এর নেতা গোছের হয়ে গেছে—সে দু'লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্লোগানের লিড দিচ্ছে। বেশ জোরালো তেজী গলা রণজয়ের।

ওয়েলিংটনের কাছাকাছি এসে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। দুটো পুলিশের গাড়ি মিছিলের সামনের দিকে আসতেই হৈ-হৈ করে উঠলো ছাত্ররা। শ্লোগানে প্রবল চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম। এই পুলিশই তো মেরেছে বর্ধমানের ছাত্রদের। এরা না হয় অন্য পুলিশ, কিন্তু সব পুলিশই এক। দমাদম করে ইট পড়তে লাগলো পুলিশের গাড়িতে। এবং আশ্চর্যের কথা, গাড়ি দুটো তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। ছাত্রদের পক্ষে প্রথম জয়েই আমরা আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠলাম।

খানিকটা যাবার পর আরও দু'খানা পুলিশের গাড়ি এলো। মিছিল ভাঙার সাহস তাদেরও নেই, তারা শুধু মিছিলের আগে-আগে যেতে চায়। তখন জানা গেল, আগের দুটো পুলিশের গাড়ি ছিল না—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা যাচ্ছিলো পুলিশ পাহারায়— তাকেই পুলিশের গাড়ি বলে ভুল করা হয়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙবার সময় নেই। আগেরবারের জয়ের আনন্দে এবার দ্বিগুণ উৎসাহে ইট পড়তে লাগলো পুলিশের গাড়িতে। তার মধ্যেই, ঢাল হাতে নিয়ে দশ বারোজন পুলিশ নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। সামনের দিকে বোধহয় লাঠিচার্জ শুরু হয়েছে, কেননা পেছনের দিকে মিছিল চঞ্চল।

এই সময় জলদ-গম্ভীর শব্দে একটা বোমা ফাটলো। কে ছুড়লো বোমাটা? আমি কি বোমা ছোড়ার কথা ভাবতে পারি? আমার আশেপাশে যেসব ছাত্ররা রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ বোমা ছুড়বে তাও কল্পনা করা যায় না। অথচ আমারই মতন কেউ, এতক্ষণ পকেটে বোমা রেখে দিয়েছিল? এত সব কথা ভাবার সময় ছিল না অবশ্য, বোমাটা ফাটার সঙ্গে-সঙ্গেই ফটফট করে পুলিশ টিয়ার গ্যাস চার্জ করলো। মিছিল তছনছ হয়ে গেল, ছুটলো যে যেদিকে পারে। আমার খুব কাছেই একটি টিয়ার গ্যাসের শেল পড়েছিল, আর একটু হলে হয়তো আমার মাথাতেই পড়তো। ধোঁয়ার ঝাপটা প্রথম চোখে লাগতে আমার মনে হলো আমি বুঝি একেবারে অন্ধই হয়ে গেলাম। ছুটতে লাগলাম দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কার পায়ে পা লেগে যেন পড়ে গেলাম মাটিতে। প্রায় আমার গায়ের ওপর দিয়েই দৌড়ে গেল আর একদল ছেলে, কেউ আমাকে তুললো না।

একটু বাদেই দাঁড়ালাম। চোখ চেয়ে দেখলাম, অন্ধ হই নি, তবে অসম্ভব জ্বালা করছে। ডান হাতের কনুইয়ের কাছে কেটে গেছে খানিকটা। পকেট থেকে রুমাল বার করে তাড়াতাড়ি রাস্তার কলে সেটা ভিজিয়ে নিয়ে চোখে চেপে ধরলাম। তাতে খানিকটা আরাম হলো। তখন ভয় হচ্ছে পুলিশ এসে বুঝি ধরে ফেলবে। ছুটতে শুরু করলাম আবার।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে বুঝতে পারলুম, আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। অবশ্য ছাত্রদের কাছ থেকে আমি ছিটকে সরে এসেছি, এখানকার রাস্তাঘাট আমার অচেনা, দু'পাশে বড়ো-বড়ো বাড়ি, সবই প্রায় অফিস মনে হয়—এখান থেকে আমি কী করে ফিরবো।

মনটাকে শান্ত করে রাখলাম, দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। বাড়ি ফিরতেই হবে। রাস্তার কোনো মানুষকে কিছু জিজ্ঞেস করতে খানিকটা ভয় করছে, খানিকটা লজ্জা লাগছে। ভয়ের কী আছে, কলকাতার সব রাস্তা দিয়েই বাস চলে, যে বাসে শ্যামবাজার লেখা দেখবো, সেটাতে চড়ে বসবো।

গলি ঘুঁজি এড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলাম। রণজয়ের ওপর খুব রাগ হতে লাগলো। কেন ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য আমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম ? ওর জন্য তো আজ আমার ওই দুর্ভোগ ? কত ছেলেই তো মিছিলে আসে নি, স্ট্রাইক দেখে বাড়ি চলে গেছে। টিয়ার গ্যাসের শেলটা যদি আমার মাথায় ফাটতো? কিংবা বোমা লেগে আমি যদি রাস্তায় মরে পড়ে থাকতাম ? না মরলেও, আহত অবস্থায় যদি হাসপাতালে নিয়ে যেত—তাহলে সেই খবর পেয়ে আমার বাবা কিংবা মা হার্টফেল করতো। শুধু স্নেহের জন্যে নয়, দু'জনেরই হার্ট দুর্বল।

একটা ন' নম্বর বাস দেখে খুব চেনা আত্মীয়ের মতন মনে হলো। বাসটায় দারুণ ভিড়, কিন্তু আমি সেটা ফস্কাতে কিছুতেই চাইলাম না। কোনোরকমে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে লাগলাম, সেই অবস্থাতেই, একজন লোক নেমে যাবার সময় আমাকে ধমক দিয়ে বললো, এই যে ভাই, ভেতরে যাও না। ভেতরে অনেক জায়গা, তবু বাইরে না ঝুললে চলে না। এখনো গোঁফ গজায় নি, এই বয়েসেই—

লোকটার ওপর আমার অসম্ভব রাগ হলো—আমি পাদানিতে পা রাখতেই পারছি না—হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে আমার হাত জ্বালা করছে, আর লোকটা বলে কিনা—

আমাকে কিছু বলতে হলো না, আমার পাশ থেকে আর একটা ছেলে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, যান দাদু, নামার সময় আর লেকচার ঝাড়তে হবে না।

আমি বার বার লক্ষ করেছি, কলকাতার লোকেরা বাসে ওঠবার সময় একরকম ব্যবহার করে আর নামবার সময় অন্যরকম। প্রত্যেকটি লোকই অন্য সব অচেনা লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করে শত্রুর মতন।

শ্যামবাজার থেকে বাড়ির গলিতে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় মনে পড়লো, আমার বই-খাতা তো রেখে এসেছি কলেজের কাছে চায়ের দোকানে। সেগুলো না নিয়ে বাড়ি ফিরবো কি করে। বাবা অবশ্য এখন বাড়িতে নেই, তবু মা যদি কোনোক্রমে দেখে ফেলেন।

মাত্র আড়াইটে বাজে, স্ট্রাইক না হলে এ সময় তো আমার কলেজ থেকে ফেরার কথা নয়। এখন বাড়িতে না গেলেও চলে। বই-খাতা আনবার জন্য আমি আবার অন্য বাসে চড়ে বসলাম।

কেন জানি না, হঠাৎ মনটা খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধু নেই, কেউ আমাকে ভালবাসে না, আমার কথা কেউ ভাবে না। যদিও আমার মা-বাবা আছেন, ছোটভাই আছে, পাটনায় তিন মাসী। তবু আমার মনে হলো পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা।

বাসে যেতে-যেতে চোখে পড়লো, একটা সিনেমা হাউসের সামনে দারুণ ভিড়। নতুন ছবি রিলিজ করছে, হাউসটা তাই ফুল-টুল দিয়ে খুব সাজানো, আর পঁয়ষট্টি পয়সার লাইনে প্রবল

ঠ্যালাঠেলি আর চিৎকার। একবার আমার মনে হলো, হাতে তো অনেক সময় আছে একটা সিনেমা দেখলে হতো না। কিন্তু এ পর্যন্ত কখনো আমি একা সিনেমা দেখি নি— বখাটে ছেলেরাই তো শুধু একা-একা সিনেমা দেখে। আচ্ছা শম্পা সিনেমা দেখে না। শম্পার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ওকে যদি আমি সিনেমা দেখার কথা বলতাম, ও কি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হতো? ধুৎ, যত সব আজেবাজে চিন্তা। কিন্তু শম্পা আমাকে বলেছিল, ওদের বাড়ি যেতে। রণজয় নিয়ে গেল না একদিনও।

সিনেমা দেখার চিন্তা থেকেই আমার মনে পড়লো বন্দনাদির কথা। এখন বন্দনাদির বাড়ি গেলে হয় না? রক্ত-মাংসের একজন সিনেমা অভিনেত্রীকে আমি চিনি— একথা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। কলেজের অনেক ছেলেকেই দেখেছি, প্রায় সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা নিয়ে আলোচনা করে—ওদের কাছে যখন আমি বলেছি যে বন্দনা রায়ের সঙ্গে একসময় আমার খুব ভাব ছিল, ওরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। আমি রণজয়কে বলেছিলাম, তুই আমাকে নিয়ে চল ওর বাড়িতে, দেখবি আমায় চেনেন কি না। রণজয় বলেছিল যা যা গুলবাজ। আমি তোর সঙ্গে যাই—তারপর আমাকে ইনসাল্ট করুক আর কী। ওরকম কত ছেলেমেয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য হন্যে হয়ে থাকে।

ঠিক আছে, আমি একাই যাবো বন্দনাদির সঙ্গে দেখা করতে। বন্দনাদির কাছ থেকে এবার ওর সই করা একটা ছবি চেয়ে নিয়ে আসবো।

বন্দনাদির বাড়ি তো আমি চিনি না। রণজয় বলেছিল, বন্দনা রায় গ্রে স্ট্রিট এক্সটেনশনে থাকেন, কিন্তু নম্বর জানি না। আমার ধারণা হলো, বন্দনাদি যখন এরকম বিখ্যাত তখন ঐ রাস্তায় গেলেই বন্দনাদির বাড়ি দেখতে পাবো। নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ির দরজায় বড় করে তাঁর নাম লেখা থাকবে। তখন বুঝতে পারি নি, কলকাতায় বিখ্যাত মানুষরাই নিজেদের বেশি করে লুকিয়ে রাখে।

বাস থেকে নেমে পড়ে গ্রে স্ট্রিট ধরে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। বাড়ি তো খুঁজে পেলামই না, এমনকি কোন ধরনের বাড়িতে বন্দনাদি থাকতে পারেন, তাও আন্দাজ করতে পারলুম না। আমার কেন যেন একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল, বন্দনাদির বাড়ি হবে নীল রঙের, সব ঘরে নীল পর্দা, বাড়ির সামনে বাগান। দেওঘরে ঠিক ঐ রকম বাড়িতেই আমি বন্দনাদিকে দেখেছিলাম। ওরকম বাড়ি ও রাস্তায় একটাও নেই।

সার্কুলার রোডের পর উল্টোডিঙ্গির খাল পর্যন্ত গ্রে স্ট্রিটের যে অংশটা সেখানে আমি ঘুরে বেড়ালাম বেশ কিছুক্ষণ। কারুকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। যদি কেউ বলে, এইটুকু ছেলে, তুমি সিনেমা অ্যাকট্রেসের বাড়ি খুঁজছো কেন হে?

নিরাশ হয়ে যখন ফিরে আসছি, ঠিক সেই সময় একটা সাদা রঙের মোটর গাড়ি আমার সামনে থেমে গেল। জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো অত্যন্ত রঙ আর প্রসাধনময় একটি নারীর মুখ। আর কে, বন্দনাদি। এত আশা নিয়ে এসেছিলাম, তবু বন্দনাদিকে প্রথম দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

বন্দনাদি বললেন, তপন না? কলকাতা কবে এলে? এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

আমি আস্তে-আস্তে বললাম, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

— সত্যি! এসো, উঠে এসো গাড়িতে।

গাড়িতে আরও দু'জন লোক ছিল, ড্রাইভার ছাড়া। দেওঘরে বন্দনাদিদের বাড়িতে যে লোকদের দেখেছি, এরা তারা নয়। বন্দনাদি তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, তপন, সত্যি, তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে ভাবি নি। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমায় ভুলে যাবে।

সত্যি আমায় খুঁজতে এসেছিলে ?

এ বন্দনাদি আমার অচেনা। এত জমকাল পোশাক-প্রসাধনে বন্দনাদিকে আমি কখনো দেখি নি। সিনেমার পর্দাতে দেখেছি অবশ্য, বিশেষত বন্দনাদির যখন নাচের পার্ট থাকে—তখন বেশি বেশি সাজতে হয়। কিন্তু দেওঘরে বন্দনাদিকে দেখেছিলাম সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে। বাড়ির সিঁড়িতে বসে ঘিওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর করছিলেন ঠিক আমাদের মতন সাধারণ বাড়ির কোনো দিদি বা বৌদির মতন—ঠোঁটে ছিল না রঙ, চোখে ছিল না কাজল।

বন্দনাদি এখন বোধহয় কোনো শুটিং থেকে ফিরছেন। তাছাড়া আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও খানিকটা অভিনয়ের সুর এসে যাচ্ছে, বোধহয় শুটিংয়ের রেশ এখনো রয়ে গেছে, কিংবা গাড়ির অন্য লোক দু'জনের সামনে এই রকম সুরে কথা বলাই ওর অভ্যেস?

বন্দনাদি আবার বললেন, তুমি যে আমাকে খুঁজতে এসেছিলে, আমার বাড়ির ঠিকানা জানতে?

— এই রাস্তায় আপনার বাড়ি, সেটা শুনেছি, কিন্তু নম্বর জানতাম না।

— নম্বর না জেনে তুমি কলকাতার রাস্তায় বাড়ি খুঁজতে এসেছিলে? পাগল ছেলে! কারুকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করো নি তো।

— না।

— ভালো করেছো। জিজ্ঞেস করলে পাড়ার ছেলেরা তোমার পেছনে লাগতো।

গাড়ির একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, ছেলেটি কে মিস রায়?

বন্দনাদি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমার খুব আত্মীয় হয়। অনেকদিন বাদে দেখা এর সঙ্গে।

লোকটি আবার বললো, ছেলেটির চেহারা তো বেশ ভালো। ফিল্মে নামার ইচ্ছে আছে নাকি ? তাহলে একটা স্ক্রিন টেস্ট নিতে পারি।

বন্দনাদি আমার দিকে ফিরে বললেন, কি তপন, ফিল্মে নামবে?

এক মুহূর্তও না ভেবে আমি দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলাম, না, আমি সিনেমায়-টিনেমায় নামতে চাই না।

এরকম প্রস্তাব পেলে আমার বয়েসী অনেক ছেলেই হয়তো আনন্দে লাফিয়ে উঠতো—কিন্তু আমার পক্ষে একথা চিন্তা করাও অসম্ভব। আমার বাবা-মাকে তো চেনে না এরা। শুনলে তক্ষুনি হার্টফেল হবে দু'জনেরই। বাবা-মাকে লুকিয়ে আর যাই করা যাক, সিনেমায় নামা যায় না।

বন্দনাদির বাড়ি পৌঁছে সোজা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম ওর সঙ্গে। পুরো বাড়িটা বন্দনাদির নয়, দোতলার ফ্ল্যাটটা শুধু ওর। গাড়ির লোক দু'টিও ওপরে উঠে এসেছে, তাদের একটা ঘরে বসিয়ে বন্দনাদি একটু মিষ্টি করে হেসে বললেন, আপনারা একটু বসুন, অ্যাঁ?

তারপর আমাকে নিয়ে এলেন অন্য একটা ঘরে। বললেন, এখানে চুপটি করে বসে থাকো। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না। আমি একটু বাদেই আসছি। তোমার খিদে পেয়েছে?

— না।

— ঠিক আছে, বসো তাহলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বন্দনাদির আর আসার নামটি নেই। দেওঘরের সেই বাড়ির সঙ্গে কলকাতায় বন্দনাদির এই ফ্ল্যাটটার কত তফাত। দেওঘরের সেই নীল পর্দা-ঘেরা বাড়িটা ছিল কত রহস্যময়—আর এটা কলকাতার যে-কোনো একটা ফ্ল্যাট বাড়ির মতন—এমনকি আমাদের সঙ্গেও খুব একটা তফাত নেই—শুধু এই বাড়িটা বেশি নতুন আর খানিকটা ঝকঝকে, এই যা। ঘরখানাতে বড় বেশি ছবি—বন্দনাদির নানা পোজের অনেকগুলো ছবি বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো। একটা মাঝারি কাচের আলমারি। তার এক তাক ভর্তিই কাচের

গেলাস। এত কাচের গেলাস লাগে কিসে ? নেমন্তন্ন বাড়ির এক ব্যাচকে খাওয়ানো যায়। কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়িতে তো মাটির ভাঁড়ে জল দেয়। আলমারির মাথায় দু'তিনটে নানা সাইজের বোতল। একটা বোতল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা লতানো গাছ। একেই বোধহয় মানি প্ল্যান্ট বলে।

পাশের ঘরে লোক দু'টির গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কি এত বকবক করছে লোক দুটো। মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে বন্দনাদির হাসির আওয়াজ। আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে বন্দনাদি ওদের সঙ্গে হাসি-গল্প করে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছে হলো, ওরা কি বলছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনি। কিন্তু মা আমাকে বারবার শিখিয়েছেন, কক্ষনো অন্যের কথা আড়াল থেকে শুনতে নেই।

রণজয়ই বোধহয় ঠিক বলেছিল, এইসব সিনেমা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কত লোকের দেখা হয়—সবাইকে কি ওরা মনে রাখতে পারে ? আমাকে দেখে বন্দনাদি খুশি হয়েছেন— কিন্তু সেটা বোধহয় সত্যিই অভিনয়। দেওঘরে ক'দিনের জন্য দেখা হয়েছিল, সে পরিচয় হয়তো বন্দনাদি আর মনে রাখতে চান না। আর বসে থেকে কি করবো, আমার পক্ষে এখন চলে যাওয়াই ভালো।

পাশের ঘরের আওয়াজ কখন থেমে গেছে লক্ষ করি নি, বন্দনাদি এসে ঘরে ঢুকলেন। আশ্চর্য, এর মধ্যে বন্দনাদির স্নান হয়ে গেল কি করে ? এখন আর মুখে রঙ নেই, ভুরুতে নেই সেই তীক্ষ্ণ রেখা—এখন বন্দনাদি আবার সেই দেওঘরের মতন সরল সাদাসিধে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বন্দনাদি বললেন, উঃ, লোকগুলো কি আর উঠতে চায়। আমি ছটফট করছি, কখন তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করবো, তা ওরা আর ওঠে না। তুমি রাগ করেছো তপন?

যেটুকু অস্বস্তি বা দ্বিধা আমার মনে জেগেছিল, এই এক কথাতে গলে জল হয়ে গেল। এমন আপনভাবে আমার সঙ্গে আর তো কেউ কথা বলে না। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, রাগ করবো কেন ?

বন্দনাদি আবার বললেন, লোকগুলোকে একটু খাতিরও করতে হয়। ওরা একটা ছবি তুলবে বলছে, তাতে আমাকে নায়িকার পার্ট দেবে। এ পর্যন্ত তো আমি নায়িকার পার্ট একবারও পাই নি। শুধু নাচ-গান, বাঈজী কিংবা নায়িকার বান্ধবী। এটাতে চঞ্চলকুমারের অপজিটে মেন রোল, যদি একবার লেগে যায়—

আমি আর সবকিছু ভুলে আগ্রহে অধীর হয়ে বললাম, চঞ্চলকুমারের সঙ্গে? কী বই? কী বই ?

চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বন্দনাদি বললেন, নাম এখনো ঠিক হয় নি। শুনছি একজন বড় রাইটারের লেখা স্টোরি। তোমাকেও তো ওরা পার্ট দিতে চেয়েছিল, তুমি রাজি হলে না কেন ? তাহলে দু'জনে মিলে বেশ এক সঙ্গে সুটিং-এ যেতাম।

আমি বললাম, না বন্দনাদি, আমি সিনেমায় নামতে পারবো না। অসম্ভব আমার পক্ষে।

বন্দনাদি ঝপ করে আমার পাশে বসে পড়ে বললেন, সেই ভালো। যত লোক আমার কাছে আসে, যত লোকের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হয়, সবাই সিনেমা লাইনের। তুমিই শুধু আলাদা। তুমি সেই রকমই থেকো।

— দেওঘরে আপনার সঙ্গে নীলাদিকে দেখেছিলাম। নীলাদি এখন কোথায়?

— নীলা আর এ লাইনে নেই। ও মুখপুড়ি নিজের কপাল নিজেই পুড়িয়েছে।

— কেন, কী হয়েছে?

— সেকথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। তুমি ছেলেমানুষ।

— আর সেই হারাধন আর শশাঙ্ক নামে লোক দুটো?

— ওঃ ওরা ! ওরা আর নেই। আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি। ওদের চেয়ে দামী লোক আমায় এখন খোসামোদ করে।

এই সময় একজন ঝি দুটো প্লেটে করে আমাদের জন্যে অনেকটা করে মুরগির মাংস আর পরোটা নিয়ে এলো। বন্দনাদি বললেন, তোমার জন্য মুরগির মাংস আনিয়েছি। তুমি মুরগির মাংস খেতে ভালবাসো, দেওঘরে দেখেছি।

— সেকথা মনে আছে আপনার?

— ওমা, মনে থাকবে না? মোটে তো আট মাস আগের কথা।

— সত্যিই আট মাস, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই তো সেদিন—এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দেওঘরের বাড়ির সেই ঘরটা, জানলার পাশে একটা চাঁপা ফুলের গাছ।

— ইস্, বেশ কথা শিখেছো তো। এই ক'মাসে তুমি বেশ বদলে গেছ তপন!

— কী রকম বদলে গেছি ?

— তা ঠিক বলা মুশকিল। তবে কলকাতা শহরের হাওয়া লেগেছে তোমার গায়ে। তোমাকে এখন বেশ বড় লাগে, ঠোঁটের ওপর গোঁফের একটু রেখা উঠেছে। কিন্তু দেওঘরে তুমি বেশ বাচ্চা বাচ্চা ছিলে।

গোঁফের কথাটা শুনে আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। ওটা আমি লক্ষ করেছি। আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুদিন আগেও ছিল না, হঠাৎ যেন নাকের নিচে একটা নীল রেখা পড়েছে। তবু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, বাঃ, চিরকাল কেউ একরকম থাকে নাকি।

বন্দনাদি একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন, তা অবশ্য সত্যি, কেউ থাকে না। কিন্তু আমরা অভিনেত্রীরা বহুকাল নিজেদের এরকম চেহারা রাখার চেষ্টা করি তো—

এবার শুরু হলো আমাদের দেওঘরের গল্প। সে গল্প আর ফুরোতেই চায় না। এক সময় চোখে পড়লো, দেয়াল ঘড়িতে পাঁচটা প্রায় বাজে। এবার আমাকে উঠতে হবে।

বন্দনাদিকে সে কথা বলায় বন্দনাদি চমকে উঠে বললেন, ও তোমার বাবা–মায়ের কথা এখনো জিজ্ঞেস করাই হয় নি। ওঁদের অসুখ সেরে গেছে?

— না।

— তোমার মায়ের কি অসুখ? কেমন আছেন তোমার মা?

বন্দনাদি খুঁটিয়ে–খুঁটিয়ে আমার বাবা–মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তারপর বললেন, তপন, তোমার মাকে আমি একদিন দেখতে যাবো। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না ?

কথাটা শুনে আমি একটু ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। বন্দনা রায়ের মতন নাম করা অভিনেত্রী, যদি আমাদের বাড়িতে যায় তাহলে আমাদের বাড়ির সামনে নিশ্চয় ভিড় জমে যাবে। এসব খবর লোকেরা ঠিক জেনে যায়। তাতে পাড়ায় আমাদের সম্পর্কে কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। তাছাড়া, বাবা–মাকেই বা আমি কী বলবো। বন্দনাদির কী পরিচয় দেবো? দেওঘরে ওর সঙ্গে পরিচয়ের কথাও তো মা–বাবা জানেন না। বাবাকে তো আমি জানি, সিনেমার অভিনেত্রী শুনলেই বাবা শিউরে উঠবেন— হয়তো বন্দনাদির মুখের ওপরেই কিছু বলে বসবেন। মানুষকে এইভাবে বিচার করা কক্ষনো উচিত নয়। বন্দনাদি যে কত ভালো, সে কথা বাবাকে আমি কী করে বোঝাবো?

তার চেয়ে বরং এক কাজ করলে হয় না। বন্দনাদিকে যদি কোনোদিন আমাদের কলেজে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে সবাইকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। সবাই যে আমাকে গাঁইয়া গাঁইয়া বলে, তখন একেবারে মুখ হাঁ হয়ে যাবে।

বাড়িতে নিয়ে যাবার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, বন্দনাদি, আপনি একদিন আমাদের কলেজে যাবেন?

— যা, তোমাদের কলেজে আমি যাবো কী করে?

— কেন, আড্ডা মারতে যাবেন। আমাদের একটা ফার্স্ট ক্লাস চায়ের দোকান আছে।

— তা হয় না! আমরা ওরকমভাবে সবার সামনে বেরুতে পারি না। একে তো লোকজন ঘিরে ধরে নানারকম জ্বালাতন করে, তাছাড়া ওতে আমাদের গ্ল্যামার চলে যায়।

চট করে আমার মাথায় একটা অন্য বুদ্ধি এসে গেল। আমি বললাম ঠিক আছে, আমাদের কলেজের যখন সোস্যাল ফাংশন হবে, তখন আপনি আসবেন ? অনেক টাকা খরচ হয়, আপনারও যা রেট—

বন্দনাদি রহস্যময়ভাবে হেসে বললেন, না, সেখানেও যাবো না।

— কেন ? আপনি কোথাও নাচের কন্ট্রাক্ট নেন না।

— আগে নিতাম। এখন আর নিই না।

— আমার কথাতেও একবারের জন্য নিতে পারবেন না ?

বন্দনাদি আস্তে-আস্তে মাথা দুলিয়ে বললেন, না।

তারপর আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে অন্য রকম গলায় বললেন, তপন আমার কাছে যারা আসে, তারা সবাই কোনো না কোনো স্বার্থ নিয়েই আসে। আমিও যাদের সঙ্গে কথা বলি, আমার কোনো স্বার্থের কথা ভেবেই বলি। একমাত্র তোমার সঙ্গেই আমার কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই। তুমি আমার বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমি শুধু সুখ-দুঃখের কথা বলবো। মানুষ তো চায় কারুর কাছে মন খুলে কথা বলতে। আমার সে রকম কেউই নেই। তুমি আমার সেই রকম বন্ধু হবে?

বন্দনাদির গলায় এমন একটা কিছু ছিল, যাতে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটা বিষণ্ণ হৃদয় যেন আমার হৃদয় স্পর্শ করে গেল। বন্দনাদির এত নাম, কত ভক্ত তাঁর, টাকা-পয়সাও নিশ্চয়ই অনেক আছে—কিন্তু তবু ওঁর মনের মধ্যে এরকম একটা বিষণ্ণ শূন্যতা।

আমি আপ্লুত কণ্ঠে বললাম, বন্দনাদি, আমি তোমাকে আর এসব কথা কক্ষনো বলবো না।

— তপন তোমার যখন যে-কোনো দরকার হবে, তুমি আমার কাছে চলে আসবে।

— না, আমি কোনো দরকারের জন্য তোমার কাছে আসবো না। এমনিই—

— সে রকম দরকারের কথা বলছি না। যদি কখনো তুমি কোনো ব্যাপারে খুব দুঃখ পাও, কিংবা খুব আনন্দের কিছু ঘটে—তখন তুমি আমার কাছে এসো—সেটা আমরা দু'জনে ভাগ করে নেবো। ঐসব সময়ে মানুষ তার মনের ভার আর কারুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে না পারলে সহ্য করতে পারে না। তুমি যদি সে রকম কখনো আসো, আমি আমার যত কাজই থাক সব ফেলে তোমার কাছে এসে বসবো।

১২

হাসপাতালে রণজয়কে দেখতে গিয়ে শম্পার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। সাঙ্ঘাতিকভাবে মাথা ফেটে গেছে রণজয়ের, একটুর জন্য ডান চোখটা বেঁচে গেছে। প্রায় দু'দিন জ্ঞানই ছিল না রণজয়ের, আজ জ্ঞান ফিরেছে, মোটামুটি ওর বিপদ কেটে গেছে।

সেদিনকার ঘটনার পর ছাত্র আন্দোলন আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। পরপর রোজই ধর্মঘট আর মিছিল ! আমি আর কোনোটাতেই যাই নি। রণজয় আমাকে টানতে চেয়েছিল, আমি কিছুতেই রাজি হই নি। ওকে বুঝিয়ে বলেছি যে, ঐসব আন্দোলনে আমার সমর্থন থাকলেও পুলিশের সঙ্গে মারামারি করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রথম কথা, ওসব আমি পারবোই না— কারুকেই মারতে হাত ওঠে না আমার। তাছাড়া, আমার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, আমার বাবা-মা দু'জনেই দারুণ বিপদে পড়বেন, ওঁদের বেঁচে থাকার কোনো উপায়ই থাকবে না— আমার ছোট ভাইটারও সেই অবস্থা হবে। আমার হুজুগেপনার জন্য ওদের তিনজনের জীবনে আমি জড়াতে চাই না।

আমাকে ছেড়ে দিয়েছে রণজয়, নিজে নিবৃত্ত হয় নি। ওর মধ্যে দারুণ প্রাণশক্তি টগবগ করছে, একটা কোনো উত্তেজক ঘটনা ঘটলে ও তার থেকে দূরে থাকতে পারে না। সচ্ছল পরিবারের ছেলে, বাড়ির কথা কখনো চিন্তা করে নি। তারই ফলে, পুলিশের কাছে প্রাণ দিতে বসেছিল অকারণে।

রণজয়ের এখনো কথা বলা বারণ, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে শুধু। ওকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে, তারাও সবাই নির্বাক। আজই প্রথম জানলাম, রণজয়ের মা বেঁচে নেই, আগে একথা কখনো বলে নি রণজয়। মাতৃহীন ছেলেরাই বুঝি এত বেশি বেপরোয়া হয়।

এসেছেন রণজয়ের বাবা, দুই কাকা-কাকীমারা, ওর মেসো-মাসীমা, শম্পা, তার বাবা-মা, আরও অনেকে। রণজয়ের বিছানার চারপাশ ঘিরে অনেক লোক! আমি পেছনের দিকে দাঁড়িয়েছিলাম—একবার শুধু রণজয়কে চোখের দেখা দেখতে।

শম্পা আমাকে দেখেছে কি না জানি না, একবারও আমার দিকে তাকায় নি। রণজয়ের মাসীমা শুধু আমাকে দু-একটা কথা বললেন। শম্পা বোধহয় ওর বাবা-মাকে বেশ ভয় পায়, কেননা, বাবা-মায়ের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, একবারও নড়ে নি। রণজয়ের মেসোমশাই বেশ হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু শম্পার বাবাকে মনে হয় খুব রাগী। বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারা, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, দুঃখ কিংবা উদ্বেগের বদলে মুখে একটা অপ্রসন্নতার ছায়া।

আমাকে এখানে প্রায় কেউই চেনে না, আমি আর এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি করবো। শুধু-শুধু ভিড় বাড়ানো। রণজয়ের সঙ্গে কোনো কথা বলাও যাবে না। এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়লাম ওখান থেকে।

হাসপাতালের বাইরে এসে দেখি শম্পা আগে থেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কি করে এলো আমার আগে? নিশ্চয়ই লিফটে নেমেছে।

শম্পা বললো, এই, আমাকে না বলে চলে যাচ্ছিলে যে ?

— তোমাকে বলে আসবো কি? তুমি তো আমাকে দেখতেও পাও নি!

— কেন দেখতে পাবো না? আমি কি অন্ধ নাকি ? আমি ভেবে রেখেছি তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে যাবো। তুমি দিব্যি না বলে-কয়ে—

— কেন, তুমি তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে যাবে না !

— না, বাবা-মা যাবেন অন্য জায়গায়। আমি যাবো আমার গানের স্কুলে।

— আমি সেটা জানবো কি করে ? পরশুদিন হাতিবাগান বাজারের সামনে তোমাকে দেখলাম, তুমি তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিলে, আমাকে তো দেখেও দেখলে না।

— মোটেই দেখতে পাই নি তোমাকে।

— এই মিথ্যুক! স্পষ্ট আমার চোখের দিকে তাকালে, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলে। আমি বুঝি-বুঝি না।

— আহা, ভারি চেহারার অহঙ্কার। ঐ চেহারার দিকে বুঝি আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে?

— সেকথা হচ্ছে না। একটা কথা তো অন্তত বলতে পারতে। অচেনার মতন চোখ ফিরিয়ে নেওয়া—

— তুমিও যখন দেখতে পেয়েছিলে, তুমি কথা বললে না কেন?

— তোমার বাবা-মা ছিলেন, কী ভাববেন না ভাববেন—

— কি আবার ভাববেন ? আর আমি যে গত সোমবার তোমাকে নিজে থেকে ডাকলাম বাসের জানলা থেকে ? তুমি সেই বাসে উঠে পড়তে পারলে না কেন ?

— কি করে উঠবো, বাসটা যে তখন ছেড়ে দিয়েছে। এরকম চলন্ত বাসে ওঠা যায়?

— সত্যিই তো, তুমি উঠতে পারবে কি করে? গ্রামের ছেলে তো।

— এ, একথাটা রণজয়ের কাছ থেকে শেখা হয়েছে, না?

রণজয়ের নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা হালকা ভাব ছেড়ে একটুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলাম। আমার চোখে, সম্ভবত শম্পার চোখেও আর একবার ভেসে উঠলো রণজয়ের বিরাট ব্যান্ডেজ-বাঁধা মুখখানা। তবে রণজয়ের আহত হওয়ার দিনের ঘটনা এতবার বলা হয়ে গেছে যে আমরা সেটা আর উল্লেখ করলাম না।

একটু বাদে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার গানের ইস্কুলটা কোথায়?

শম্পা আমাকে আবার বকুনি দিয়ে বললো, কতবার বলবো। কিছু মনে থাকে না। সেদিন বললাম না, বিডন স্ট্রিটে আমার গানের ইস্কুল।

কোনো-কোনো মেয়ের মুখ দুঃখ পেলে বেশি মানায়। কারুর হাসিতে, কারুর লজ্জায়, কারুর রাগে। রেগে গেলেই শম্পার মুখটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখায়। শম্পা বোধহয় সেটা জানে, সে জন্যই প্রায় সবসময় মুখখানাতে ছদ্ম রাগ-রাগ ভঙ্গি করে থাকে।

অফিস ছুটি হয়েছে, বাসে-ট্রামে এখন দারুণ ভিড়। এখন বাসে উঠবো কি করে। আমি নিজে ঝুলতে-ঝুলতে যাওয়া শিখে গেছি, কিন্তু শম্পা। আমি বললাম, চলো, হেঁটে যেতে পারবে ? বিডন স্ট্রিট তো বেশি দূর নয়।

—তোমার কাছে বেশি দূর না হতে পারে, আমার কাছে অনেক দূর। একটা রিক্সা ডাকো না।

— তাহলে রিক্সায় তুমি একা যাও। আমি রিক্সায় চড়ি না। পুরুষমানুষ রিক্সায় চাপলে আমার খুব বিচ্ছিরি লাগে।

— ইস্, তুমি কখনো রিক্সায় চাপো নি বুঝি।

— সে কলকাতার বাইরে, সেখানে সাইকেল রিক্সা। তাতে খারাপ লাগে না। কিন্তু মানুষ-টানা রিক্সা, কি অমানুষিক।

— আহা, রিক্সায় না চাপলে যে রিক্সাওয়ালারা খেতে পাবে না, তখন কী হবে? তুমি ওদের খাওয়াবে ?

তর্ক করতে করতে আমরা হেঁটেই যেতে লাগলাম। কলকাতার রাস্তায় অবশ্য ট্রামে বাসে না চড়ে হেঁটে গেলে বেশি খরচ হয়। প্রথমে আমরা এক ঠোঙা বাদাম কিনে খেতে-খেতে গেলাম, তারপর আবার গলা শুকিয়ে গেল বলে ঝপাং করে কিনে ফেললাম দুটো আইস-ক্রিমের কাপ। আমার কখনো পয়সার অভাব হয় না, কারণ আমার পকেটেই থাকে আমাদের বাড়ির সংসার খরচের টাকা। বাবা কখনো হিসেব চান না, আমিও, নিজের জন্য খরচ করি খুবই কম।

শম্পা আবার বললো, এই, তোমাকে কতবার আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছি, তুমি

আসো না কেন ?

— বাঃ, আমাকে কে নিয়ে যাবে, আমি কি তোমাদের বাড়ি চিনি?

— কলকাতা শহরে এখনো একটা বাড়ি খুঁজে বার করতে পারো না?

আমার মনে পড়লো ঠিকানা না জেনেও আমি বন্দনাদির বাড়ি খুঁজতে গিয়েছিলাম একা-একা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি তো— হঠাৎ বন্দনাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বারবার কি আর ওরকম হয়।

বললাম, না, পারি না। তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারো না?

— ইস্ বাবুর হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে ? তাছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায় যে তোমাকে নিয়ে যাবো? তোমাদের বড়িতে টেলিফোন আছে?

— না। আমি এক কাজ করতে পারি, আমি তোমার গানের ইস্কুল তো আজ চিনে যাচ্ছি। এরপর একদিন এসে তোমাদের গানের ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো—তারপর তোমার সঙ্গে একসঙ্গে যাবো—

এই কথা শুনে শম্পা কেন খিলখিল করে হেসে উঠলো কে জানে। মেয়েরা যে কখন কেন হঠাৎ-হঠাৎ হেসে ওঠে, তা কিছুই বোঝা যায় না। হাসতে-হাসতেই শম্পা বললো, থাক, তোমাকে আর গানের ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। খুব হয়েছে।

— কেন কি হবে তাতে ?

— কী হবে তা আর তোমায় বুঝতে হবে না বোকারাম।

— ইস্, কি একটা বুদ্ধির ঢেঁকি রে!

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা বিবেকানন্দ রোড ছাড়িয়ে এসেছি। কখন যে এতটা রাস্তা পেরিয়ে এলাম, তা টেরই পাই নি। ভারি হালকা আর ফুরফুরে লাগছে মনটা। একদিন রণজয়ের সঙ্গে শম্পাকে বেড়াতে দেখে আমার মনে হয়েছিল, ইস্, কোনোদিন কি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হতে পারে না? ও কি কখনো দু-এক পলক আমার মুখের দিকে তাকাবে?

আজ সেই শম্পার সঙ্গেই আমি নিজে বেড়াতে-বেড়াতে চলেছি, কতবার শম্পার হাতের সঙ্গে আমার হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে, কতবার ভিড়ের ধাক্কা এড়াবার জন্য শম্পা বন্ধুর মতন দাঁড়াচ্ছে আমার গা ঘেঁষে—ঝনঝন করে উঠছে আমার শরীর। শম্পা আজ আমার বন্ধু।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটু খচ করে উঠলো। রণজয় এখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে, সেই সুযোগেই কি আমি শম্পার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিচ্ছি। না, না, তা নিশ্চয়ই নয়— রণজয়কে আমি ভালবাসি, কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। প্রাণ গেলেও না। যাকে আমি একবার বন্ধু বলে মনে করি, তার জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি, যেমন রণজয়, যেমন বন্দনাদি। একসময় রাণুমাসীও ছিল আমার বন্ধু, এখন শম্পার জন্যও—

শম্পা বোধহয় রণজয়ের ঠিক সেই রকম বন্ধু নয়। কারণ প্রথম যেদিন আমি রণজয়কে শম্পার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, রণজয় ঠিক চিনতে পারে নি, চাল মেরে বলেছিল, কোন্ মেয়েটা ? আমার সঙ্গে তো অনেক মেয়েই ঘোরে। ইন্দ্রাণী বলে একটা মেয়ের কথাও রণজয়ের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। তাছাড়া, শম্পাও তো রণজয়ের কথা বেশি বলে না।

শম্পা বললো, তোমাকে বললুম না, আমাদের গানের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। বিপুলদা খুব ভালো শেখান—তোমার ক্লাসিক্যালের দিকে ঝোঁক আছে, বিপুলদা ক্লাসিক্যালও খুব ভালো তালিম দেন।

— নাঃ, আমার গান-টান শিখতে ইচ্ছে করে না।

— কেন?

— কি হবে গান শিখে? নিজের আনন্দের জন্য আমি যেটুকু জানি, তাই যথেষ্ট।

— তুমি কিছুই জানো না এখনো। শুধু গলা ভালো হলেই হয় না— তোমার এখনো স্কেল ঠিক থাকে না।

— থাকে না তো থাকে না। আমি তো আর গায়ক হতে চাই না।

— কি হতে চাও?

— ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্ট।

— ইস্, দেখি দেখি মুখটা।

গান শেখার ইচ্ছে আমারও হয়। কিন্তু কেন আমি শিখতে পারবো না— সে কথা শম্পাকে বলতে ইচ্ছে করে না। বাড়িতে মায়ের ওরকম অসুখ, আমি গলা খুলে গানের চর্চাও করতে পারবো না, কিংবা নিয়মিত কয়েকদিন সন্ধেবেলা গানের ইস্কুলে আসাও যাবে না। শম্পা কিন্তু কক্ষনো আমাকে আমার বাড়ির কোনো কথা জিজ্ঞেস করে না। যদিও আমার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে নিয়েছে আগের দিন।

বিডন স্ট্রিটের মোড়ে এসে শম্পা বললো, এবার তুমি যাও, আমি বাঁদিকে বেঁকবো।

— চলো তোমাদের ইস্কুলটা দেখে আসি।

— না, তোমাকে আর যেতে হবে না।

— কেন?

হঠাৎ লজ্জায় শম্পার মুখটা লালচে হয়ে গেল। ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললো, ক্লাসের অন্য মেয়েরা যদি তোমাকে দেখতে পায়, আর আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কার সঙ্গে এসেছি, কি বলবো তখন?

কেন জানি না, দারুণ ভালো লাগলো কথাটা শুনে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। লাজুকভাবে বললাম, আচ্ছা, তুমি যাও।

এই সময় একজন লম্বা মতন লোক, আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় হবে, এগিয়ে এসে ডাকলো, এই শম্পা।

শম্পা যেন একটু কেঁপে উঠলো ডাকটা শুনে। হয়তো ভেবেছে, ওর কোনো আত্মীয়-টাত্মীয়। তারপর উদ্ভাসিত মুখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, ও কচিদা, আপনি?

— কোথায় যাচ্ছো? গানের ইস্কুলে?

— হ্যাঁ।

— চলো, আমিও ওখানে যাচ্ছি।

শম্পা আমাকে মুখে কিছু বললো না। ঘাড় ঘুরিয়ে চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে বললো, চলি।

শম্পা চলে যাবার পরও আমি খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আজ কেন যে এত ভালো লাগছে, কিছুই বুঝতে পারছি না! মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীই যেন আমাকে ভালবাসে। কয়েকদিন আগেই মনে হচ্ছিলো, এই পৃথিবীতে আমি একা। আজ আমি জানি, আমার বন্ধু আছে। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে কেউ কথা বলে!

১৩

শম্পা বললো, এই ঘরটায় আমি শুধু একা থাকি।

আমি বললাম, একা থাকো, রাত্তিরে তোমার ভয় করে না?

শম্পা হাসতে–হাসতে বললো, বাঃ, ভয় করবে কেন? আমি তো দশ বছর বয়েস থেকেই আলাদা ঘরে শুই। তোমার ভয় করে বুঝি?

— আমরা তো পুরুষ, আমাদের কথা আলাদা। কিন্তু মেয়েরা তো একটুতেই ভয় পায়।

— ইঃ ভারি আমার পুরুষ। সেদিন রাস্তায় দেখলাম, একটা ষাঁড়কে ছুটতে দেখে তুমি এমনভাবে লাফিয়ে উঠলে—

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, পৃথিবীতে একমাত্র পাগলা ষাঁড়কেই শুধু আমি ভয় পাই। পাগল ঘোড়াকেও আমার এতটা ভয় করে না।

শম্পা এমন হাসতে লাগলো যে কিছুতেই সে হাসি থামাতে চায় না।

আজ রণজয়কে আবার দেখতে গিয়েছিলাম। রণজয় অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, লোকজন সবাইকে চিনতে পারছে, কথা বলছে, আমার সঙ্গেও কথা বললো।

আজ আর শম্পার বাবা–মা যান নি। শম্পার মা তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, শম্পার বাবার অফিসে বেশি কাজ আছে। তবে, রণজয়ের মাসীমা– মেসোমশাই গিয়েছিলেন। ওঁদের সামনে শম্পা আমার সঙ্গে অনেক কথা বলেছে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি ওঁদের সঙ্গেই ছিলাম। শম্পার মাসীমা বললেন, তুমি এখন কোথায় যাবে, তপন? চলো না আমাদের বাড়িতে। আমি সঙ্গে–সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, দারুণ কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম মাসীমার ওপর। শম্পা একদিনও ওদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে সাহস করে নি, আমিও একা আসতে সাহস পাই নি। অবশ্য একজনের বাড়িতে একজন যাবে, এর মধ্যে সাহসের কি আছে, তাও তো বুঝি না, তবুও আসা হয়ে উঠে নি।

কিছুক্ষণ মাসীমার ঘরে বসে গল্প হলো। সন্দেশ আর শরবত খাওয়ালেন। মাসীমার পেড়াপীড়িতে আমাকে দু'খানা গানও গাইতে হলো। কেন জানি না, শম্পার সামনে গান গাইতে আমি বেশ নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলাম, বার বার স্কেল ভুল হয়ে যাচ্ছিলো। শম্পা একবার বললো, ধুৎ। ওরকম উঁচু স্কেলে ধরলে কেন, তাই তো সামলাতে পারছো না। এই দ্যাখো, আমি ধরছি, আমার সঙ্গে–সঙ্গে ধরো। যে গানখানা আমরা প্রায় ডুয়েটে গাইলাম, সেটাই সবচেয়ে ভালো হলো।

তারপর শম্পা এক সময় বললো, কাকীমা, আমি তপনদাকে একটু আমার ঘরটা দেখিয়ে আনছি।

আজ আমার মন অনেক ভারমুক্ত, আজ আমার বাড়ি ফেরার তাড়াও নেই। পাটনা থেকে আমার দুই মাসী এসেছেন, তাঁরা অনেকটা দেখাশুনোর ভার নিয়েছেন। তাছাড়া, দু'দিন ধরে মা অনেকটা ভালো আছেন, অনেকদিন পর মা বিছানা থেকে উঠে বসেছেন, ঘুরেও বেড়াচ্ছেন রীতিমতন। মা–ই আজ আমাকে বলেছেন, যা তুই আজ একটু ঘুরে আয় তপু। কতদিন আর বাড়িতে বসে থাকবি।

শম্পার ঘরটা ছোট কিন্তু খুব ছিমছাম করে সাজানো। ছোটখাটো শান্তিনিকেতনি বেডকভার পাতা। একটা টেবিল-চেয়ার, একটা বেঁটে আলমারি, তার ওপরে তানপুরা আর তবলা। গানের দিকেই ঝোঁক বেশি শম্পার, পড়াশুনোয় বেশি মন নেই। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে বটে, কিন্তু দু'একবার আমি ওর সঙ্গে পড়াশুনোর কথা বলে দেখেছি, পড়াশুনো তেমন করে না বোঝাই যায়।

আমি শম্পাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন যে ভদ্রলোক তোমাকে ডাকলেন, তিনি কে?

— কবে বলো তো?

— সেই যে গানের স্কুলের কাছে তোমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

— কে বল তো। মনে পড়ছে না তো।

কলকাতার ছেলেমেয়েদের এই এক দোষ। রণজয়কে দেখেছি, শম্পাকেও দেখছি, এইসব কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে না-পড়ার ভাব দেখায়। আমার মনে আছে, ওর মনে নেই! যেন রোজ-রোজই রাস্তায় ওর নাম ধরে অনেক লোক ডাকছে।

আমি বললাম, সেই যে বিডন স্ট্রিটের মোড়ে, যার সঙ্গে তুমি গানের স্কুলে গেলে। লম্বা মতন, সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, বড়ো-বড়ো জুলফি।

— ওঃ হো! ও তো কচিদা। তুমি চেনো না ওকে। কচিদার ভালো নাম আনন্দ সরকার, নাম শুনেছো নিশ্চয়ই। গীটার বাজান, রেডিও আর্টিস্ট, খুব নাম।

না, আনন্দ সরকারের নাম আমি শুনি নি। গীটার নামক যন্ত্রটার আওয়াজ আমার ভালো লাগে না। যে-কোনো কারণেই হোক, গীটার যারা বাজায়, তাদের আমার ঠিক আর্টিস্ট বলতে ইচ্ছে করে না। আমি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

শম্পা আবার ছেলেমানুষি উৎসাহের সঙ্গে বললো, কচিদা আমাকে একদিন রেডিও স্টেশনে নিয়ে গিয়ে সব দেখাবেন বলেছেন।

আমি বললাম, ও। তারপর উঠে শম্পার আলমারির বইগুলো দেখতে লাগলাম। আমি যদি বলি, শম্পা, তুমি ঐ গীটার-বাজানো রেডিও আর্টিস্ট-এর সঙ্গে বেশি মিশো না, তাহলে কি শম্পা সে কথা শুনবে। কিন্তু আমি সে কথা বলবোই বা কেন। তবু এত বলতে ইচ্ছে করছে।

শম্পা ওর বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছে। শম্পা কখনো চুপচাপ থাকতে পারে না, সবসময় ছটফট করে। আমি বসলাম চেয়ারে। শম্পার চোখের দিকে একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলাম। শম্পা ফিক করে হেসে ফেলে বললো, ওরকমভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি দেখছো?

কি যেন বলতে গিয়েও আমার গলা আটকে গেল। মনের মধ্যে আমার অসহ্য সুখ। এই যে একটা নিরিবিলি ঘরে শুধু শম্পার মুখোমুখি বসে থাকা এর চেয়ে আনন্দের যেন আর কিছুই নেই।

শম্পা বললো, তুমি কিন্তু ভারি ছেলেমানুষ!

— আর তুমি একটি বুড়ি, তাই না।

— আমার চেয়েও তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

এই সময়ে ঘরের বাইরে ভারি পায়ের জুতোর শব্দ হলো। শম্পার বাবা ঘরে ঢুকলেন। প্রথমে আমাকে অগ্রাহ্য করে শম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, শুমি, তোমার মা কখন ফিরবে?

— মা মণি বলেছে আটটার মধ্যে ফিরবে।

— কেউ পৌঁছে দেবে, না আনতে যেতে হবে?

— ছোট মামা পৌঁছে দেবে।

এবার শম্পার বাবা আমার দিকে ফিরে ভালো করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেটি কে, কোথায় থাকে, আগে তো দেখি নি।

শম্পার বাবা একদিন আমাকে হাসপাতালে রণজয়ের কেবিনে দেখেছিলেন। কিন্তু লক্ষ করেন নি। শম্পা একটু আড়ষ্টভাবে বললো, রণজয়দার বন্ধু। কাকীমার সঙ্গে এসেছেন।

আমাকে আর একবার আপাদমস্তক দেখলেন তিনি; তারপর ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার? রণজয় আজ কিরকম আছে?

আমি আমার নাম বলে বললাম, রণজয় আজ বেশ ভালোই আছে।

— হুঁ! আচ্ছা বসো।

শম্পার বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার যেন গা থেকে জ্বর ছেড়ে গেল। শম্পার

বাবা হয়তো খারাপ লোক নন। আমাকে তো একটাও কথা বলেন নি, তবু আমার ভয়-ভয় করছে কেন ? বড্ড রাশভারি লোক, সামনে দাঁড়ালেই ভয় করে!

আর বোধহয় বসা উচিত নয়, আমি উঠে পড়লাম। শম্পা কিছু বললো না। আমাকে সিঁড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। দরজার কাছে এসে বললো, এবার তো বাড়ি চিনে গেলে, এবার নিজেই আসবে তো!

— হ্যাঁ আসবো।

তারপর চারদিকে এক পলক তাকিয়ে শম্পা ফিসফিস করে যে কথাটা বললো, সেটা শম্পার কাছ থেকে কখনো আশা করি নি। শম্পা সাধারণত রাগ-রাগ মুখে কিংবা ঝগড়া-ঝগড়া গলায় কথা বলে। এবার খুব নরমভাবে বললো, তোমাকে মাঝে-মাঝে না দেখলে আমার খুব মন কেমন করে।

আঃ, পৃথিবীতে এত আনন্দও আছে ? আমি যেন আর মাটিতে পা রাখতে পারছি না। এখন কলকাতার সব রাস্তা ধরে আমার ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করছে। কিংবা গঙ্গার পারে দৌড়ে-দৌড়ে নিজের নাম ধরে চিৎকার করবো ? এখন যদি কোনো ভিখিরি পয়সা চাইতে আসে আমি পকেটের সব খুচরো পয়সা তাকে দিয়ে দিতে পারি।

আমার মনে পড়লো, বন্দনাদির কথা। বন্দনাদি বলেছিলেন, খুব দুঃখ কিংবা আনন্দের মুহূর্তগুলো ওর সঙ্গে ভাগ করে নিতে। আর দেরি করলাম না, সোজা চলে এলাম বন্দনাদির বাড়িতে।

বন্দনাদি আর শম্পা, এরা দু'জন দু'রকম। শম্পার সঙ্গেও আমার খুব দেখা করতে ইচ্ছে করে। আর বন্দনাদির সঙ্গেও। কিন্তু দুটো যেন আলাদা ধরনের। কিরকম আলাদা, তা আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না।

আজ সন্ধেবেলা বন্দনাদি বাড়িতে একাই ছিলেন! একটা হাতেলেখা স্ক্রিপ্ট দেখে-দেখে পার্ট মুখস্থ করছিলেন। বন্দনাদিকে কিন্তু আমি শম্পার কথা বলতে পারলাম না, খুব লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো।

বন্দনাদি আমাকে দেখে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি মনে-মনে এক্ষুনি তোমার কথা ভাবছিলুম, তুমি বিশ্বাস করবে ? সত্যি বলছি—

আমি লাজুক মুখে বসে রইলাম।

— সেদিনের পর তুমি আর এলে না। আমি রোজ ভাবছি তুমি আবার কবে আসবে।

— আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন।

— ব্যস্ত কিসের ? তুমি এলে আমি সব কাজ সরিয়ে রাখবো। কথা দাও, তুমি আমার কাছে সপ্তাহে অন্তত একদিন আসবে? আমি তোমার দিদির মতন, কথা দাও, আমাকে তুমি ভুলবে না ?

— না, বন্দনাদি, আপনাকে কখনো ভুলতে পারি ?

— তপন, তুমি কি ভীষণ লাকি, তুমি জানো না! সেদিন যে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, সেদিনটা আমার কি দারুণ সৌভাগ্যের দিন। সেদিনই একটা সিনেমায় প্রথম পুরোপুরি নায়িকার পার্ট পাবার অফার পেলাম—ওরা সেটার জন্য পাকা কথা দিয়েছে পরে। আর সেদিনই সন্ধেবেলা আবার একটা থিয়েটারে পার্টের প্রস্তাবও এলো। বিশ্বরূপার নতুন নাটকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট রোল—এক দিনে দু'দুটো ব্যাপার।

থিয়েটারের ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আমি বললাম, সিনেমাটা ফাইনাল হয়ে গেছে? চঞ্চলকুমারের সঙ্গে?

উদ্ভাসিতমুখে বন্দনাদি বললেন, প্রায় ঠিকই বলতে পারো। এখন শুধু চঞ্চলবাবু আমার সঙ্গে একদিন কথা বলবেন। উনি নিজেই সব নায়িকা পছন্দ করেন, জানো তো ? কি, তোমার কি মনে হয়, আমাকে ওর পছন্দ হবে না?

—— নিশ্চয়ই।

আবেগে বন্দনাদি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি দারুণ লাকি, তোমার জন্যই এটা পাচ্ছি। তুমি কী খাবে বলো ? পৃথিবীর যা খেতে চাও——

বাড়ি ফিরেও সেদিন খুব ভালো লাগলো। অনেকদিন পর আমাদের বাড়ির গুমোট অসুস্থ হাওয়াটা কেটে গেছে। মা হেসে কথা বলছেন, মাসীরা বাড়িটাকে ভরিয়ে রেখেছেন, দেরি করে ফেরার জন্য আমাকে কেউ কিছু বললেন না। রাণুমাসী বললেন, এই তপু, তুই আমাদের একদিন সিনেমা দেখাবি?

রাণুমাসীদের একদিন বন্দনাদির একটা ছবি দেখাতে হবে। তারপর যদি বলি, ঐ বন্দনা রায় আমার চেনা, তাহলে কী রকম অবাক হবে।

এক একটা দিন আসে, যেদিন সবকিছুই আনন্দের হয়। তখন বুঝতে পারি নি, এর ঠিক বিপরীত রকমের দিনও হঠাৎ আসে।

১৪

ট্রাম থেকে নেমেই বুকটা কি রকম করে উঠলো। পকেটটা হালকা, আমার মানি ব্যাগটা নেই। কখন পড়ে গেল, কিংবা পকেটমার নিল। আমি এত সাবধানে থাকি, তবু ? ইস, ছি ছি, ব্যাগে পঁয়ত্রিশ টাকার মতন ছিল, আমাদের সংসার খরচ, এখনো একবার র‍্যাশন আনতে হবে, তিনদিন বাজার করতে হবে——বাবা বলেছিলেন এই দিয়ে চালাতে। বাবাকে আমি কী বলবো ? নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছে হলো।

তবু, টাকা হারাবার দুঃখটা বেশিক্ষণ রইলো না। শম্পার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় মনটা এমন খুশি-খুশি হয়ে থাকে যে, কোনো ব্যাঘাতই স্থায়ী হয় না। বাবাকে না বলে মাকে যদি বলি টাকাটা হারিয়ে গেছে, মা ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন একটা কিছু। সত্যি তো টাকাটা আমি বাজে খরচ করি নি।

শম্পার সঙ্গে দেখা হলেই সব রকম ক্ষতিপূরণ আছে। শম্পার চোখে কিংবা ঠোঁটের হাসিতে কী রহস্য আছে জানি না, আমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। শম্পা যেদিন প্রথম বললে, আমাকে না দেখলে ওর মন কেমন করে, সেদিন থেকে রহস্যটা টের পাই।

এখন আর শম্পাকে নিচে থেকে ডাকতে হয় না, সোজা দোতলায় উঠে যাই। এর মধ্যে দু'দিন এসে শম্পার সঙ্গে আমি গানের রেওয়াজ করেছি, ওর মা কাকীমারা শুনেছেন।

শম্পার ঘরে ওর বাবা-মা দু'জনেই বসে ছিলেন। শম্পার মুখটা নিচু করা——দেখেই মনে হয়, এক্ষুনি সে কোনো কারণে বকুনি খেয়েছে। আজ এক অশুভ মুহূর্তে আমি এসেছি।

শম্পার বাবা প্রথমে অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে, তারপর তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। গম্ভীরভাবে বললেন, এই যে এসেছে দেখছি।

উঠে গিয়ে শম্পার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজ বার করে নিয়ে হাতটা আমার দিকে এগিয়ে কর্কশভাবে বললেন, শুমিকে তুমি এই চিঠি লিখেছো?

আমার ঘাড়ে কি কেউ এই মুহূর্তে একটা লোহার রড দিয়ে মারলো? বজ্রপাত হলে কি মানুষের এই রকম লাগে? আমার মনে হলো, আমি আর দাঁড়াতে পারবো না, দড়াম করে পড়ে

যাবো মাটিতে! বুকের মধ্যে এত জোরে দুপদুপ শব্দ হচ্ছে যেন নিজের কানেই তালা লেগে যাচ্ছে।

— বলো, এই চিঠি লিখেছো তুমি?

প্রতিবাদ করার শক্তি নেই আমার। শম্পা মুখ নিচু করে আছে, শম্পার মা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না। শম্পাকে সত্যিই আমি চিঠি লিখেছি। আজ তো নয়, পাঁচ-ছ'দিন আগে। আমার চিঠি পেয়ে শম্পা উত্তরও দিয়েছে। শম্পা আমাকে চিঠি লিখেছে দুটো, আমি লিখেছি একটা। চিঠি লেখা এত অন্যায়? আমার যাই হোক, আমাকে উনি যতই অপমান করুন আমি কিছুতেই বলে দেবো না যে শম্পাও আমাকে চিঠি লিখেছিল।

শম্পার প্রথম চিঠি পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! শম্পা যে-রকম কথা বলে, ওর চিঠি একেবারে অন্যরকম! কথা বলার সময় শম্পা নরম হয় না সচরাচর, কিন্তু চিঠিতে কি কোমল স্নিগ্ধ ভাষা। আমার সঙ্গে মাত্র তিনদিন দেখা হয় নি, শম্পা তাই লিখেছিল, ওর খুব একা-একা লাগে, রাত্তিরে ঘুম আসে না— অনেক রাত্তিরে ছাদে গিয়ে বসেছিল, তখন মনে হয়েছিল আমি যেন ওর পাশে বসে আছি, ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি— এইসব। চিঠিটা পেয়ে যেমন ভালো লেগেছিল আমার, তেমন ভয়ও পেয়েছিলাম। তার কারণ, আমি যে এরকম চিঠি লিখতে পারি না, ইংরেজিতে যদিও বা দু-চার লাইন লিখতে পারি, কিন্তু বাংলা লিখতে গেলেই আমি ভাষা-টাসা সব ভুলে যাই। শম্পার এমন সুন্দর চিঠির উত্তরে আমি কী লিখবো? অনেক কাটাকুটি করার পর শেষ পর্যন্ত আমি খুব ছোট্ট একটা উত্তর দিয়েছিলাম ওকে—তার মধ্যে কবে ওর সঙ্গে আবার দেখা করবো, সেই কথাটাই ছিল প্রধান।

সেই চিঠি লেখা এতখানি দোষের? শম্পার সঙ্গে আমি তো বাড়িতেই দেখা করতে আসি, কিন্তু চিঠিতে সেই কথা লেখাই অপরাধ?

আমি চুপ করে আছি দেখে শম্পার বাবা আমার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। যেটুকু ভদ্রতার আবরণ ছিল তাও খসে গেল, উনি প্রায় গর্জন করে বললেন, অভদ্র ইতর ছেলে! বাড়িতে আসার সুযোগ পেয়েই এরকম নোংরামি করতে তোমার লজ্জা হলো না? এইটুকু বয়েস, তার মধ্যেই—চেহারা-টেহারা দেখে ভেবেছিলাম ভদ্রলোকেরই ছেলে—রণজয়ের বন্ধু যখন—তোমার বাড়ির ঠিকানা বলো, তোমার বাবার কাছে আমি কমপ্লেন করবো।

আমি মুখ নিচু করে রইলাম! আমাকে যতই বকুক, আমি শম্পার চিঠি লেখার কথা কিছুতেই বলবো না।

রাগের চোটে শম্পার বাবা চিঠিখানা আমার মুখের ওপর ছুড়ে মারলেন। বললেন, বেরিয়ে যাও স্টুপিড! লোফার!

আমার কপালে ঠক্ করে লেগে পাকানো চিঠিখানা মাটিতে পড়লো। চিঠিখানার দিকে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়ে রইলাম। নীল কাগজ! এ জীবনে কোনোদিনই আমি সাদা কাগজ ছাড়া অন্য কিছুতে লিখি নি! শম্পাকেও চিঠি লিখেছিলাম আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে।

নিচু হয়ে চিঠিখানা আমি কুড়িয়ে নিলাম। এই প্রথম আমি পরের চিঠি পড়ছি। সুন্দর হাতের লেখা, ইনিয়ে-বিনিয়ে বাংলায় দু'পাতা চিঠি। ইতি কচিদা। স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে শম্পার চিঠির উত্তরেই এই চিঠি লেখা। ছি, ছি, এরকম অসভ্য কথা মানুষ লিখতে পারে? তোমার কোমল ঠোঁট— চুমু— তোমার বুকে মাথা রাখতে ইচ্ছে করে— তুমি যদি আমায় একটু আদর করো, আমি মস্ত বড় শিল্পী হবো— এসব কথা মানুষ মনে-মনে ভাবতে পারে ঠিকই, কিন্তু মুখে বলা কিংবা চিঠিতে লেখা সম্ভব?

চিঠিটা মুড়ে আমি আবার ফেলে দিলাম, তারপর দৃঢ় গলায় বললাম, এ চিঠি আমার নয়।

— তোমার লেখা নয় ? স্টুপিড, আবার মিথ্যে কথা বলছো?

— আমি লিখি নি এ চিঠি! এটা আমার হাতের লেখা নয়।

— ফের মিথ্যে কথা!

শম্পার বাবা উত্তেজনার মাথায় এগিয়ে এসে আমার কাঁধের কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরলেন। বোধহয় আমাকে একটা ধাক্কা দিতে যাচ্ছিলেন, আমি উদ্ধতভাবে বললাম, আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন ? আমি মিথ্যে কথা বলি না। দেখছেন না ওতে কচিদা না কি নাম রয়েছে।

— ওটা তো তোমারই নাম।

— ওটা আমার নাম নয়। আমার নাম তপন।

— শম্পা বলেছে, ওটা তোমার ডাক নাম।

হাজার-হাজার কামানের গর্জন কি এর চেয়ে বেশি জোর হয়! কথাটা আমার কানে এত অসম্ভব জোরে লাগলো। আমি স্তম্ভিতের মতন শম্পার দিকে তাকালাম। শম্পা তখনো মুখ নিচু করে আছে, তখনও কোনো প্রতিবাদ করলো না!

আমি ফিসফিস করে বললাম, শম্পা, তুমি একথা বলেছো?

শম্পা তবু কোনো উত্তর দিল না। একবারও তাকালো না আমার দিকে। আর আমার কিছু বলার নেই। কচি যে আমার ডাক নাম নয়, ঐ চিঠির হাতের লেখা যে আমার নয়—এগুলো প্রমাণ করা খুব শক্ত ছিল না—কিন্তু আমার আর বিন্দুমাত্র উৎসাহ রইলো না, শম্পা যখন প্রতিবাদ করলো না, তখন পৃথিবীতে আমার আর কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সন্দেহ নেই, শম্পা আমাকে আর ঐ কচিদাকে এক সঙ্গেই চিঠি লিখতো—হয়তো একই রকম চিঠি। এখন ধরা পড়ে গিয়ে, ওর কচিদাকে বাঁচাবার জন্য আমাকে বিসর্জন দিতে ওর দ্বিধা নেই। শম্পা যে আমাকে বলেছিল, আমাকে না দেখলে ওর মন কেমন করে—সে সবই অভিনয়! এর চেয়ে, অভিনেত্রী হয়েও বন্দনাদি অনেক বেশি সৎ।

শম্পার বাবা চেঁচিয়ে আরও কী যেন বলে যাচ্ছিলেন—সে সবকিছুই আর আমার কানে ঢুকছে না। আমার ঠোঁট কাঁপছে, হাঁটু কাঁপছে, আমি বোধহয় এবার ভেঙে পড়বো। কিন্তু তার আগেই, আমি এক ঝটকায় শম্পার বাবার হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে, সিঁড়ি পেরিয়ে সোজা রাস্তায়।

হন্‌হন্ করে কোনদিকে হাঁটছি জানি না। বুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা, নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত বুক জ্বালা করছে—নিঃশ্বাস দারুণ গরম, চোখের কোণে, আঙুলের ডগাতেও সেই জ্বালার অনুভব। আমি তো কোনো দোষ করি নি, তবু আমাকে এরকম অপমান কেন সইতে হলো! কেন শম্পা আমাকে, আমার জীবনটাকে অর্থময় করে তুলেছিল, আজ এক নিমেষে সব ভেঙে দিলো! শম্পা যদি একবার আমার চোখের দিকে তাকাতো, যদি আমাকে অনুনয় করতো, আমি সব অপবাদ মেনে নিতাম। কিন্তু শম্পা আমার বদলে কচিদাকে।—

আমি এখন কোথায় যাবো! একমাত্র বন্দনাদির কথাই মনে পড়লো। বন্দনাদি আমাকে বলেছিলেন সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে। সেদিন আনন্দের কথাটা বন্দনাদির সামনে বলতে পারি নি—কিন্তু আজ দুঃখের কথাটা ঠিক বলতে পারবো। দুঃখ অনেক বাধা ঘুচিয়ে দেয়, মানুষকে অনেক কাছাকাছি এনে দেয়। আজ কারুকে বলতে না পারলে আমার বুকটা বোধহয় ফেটেই যাবে। বলতে না পারলে আমি হয়তো আত্মহত্যা করবো। এক্ষুনি যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

খুব সম্ভবত গোটা রাস্তাটা আমি ছুটতে-ছুটতে এসেছিলাম বন্দনাদির বাড়ি পর্যন্ত। কেননা,

যখন পৌঁছুলাম, তখন আমি দারুণভাবে হাঁপাচ্ছি। আর কিছু মনে নেই, খালি চোখের সামনে ভাসছে—শম্পার বাবার কথা শুনেও শম্পার মুখ নিচু করে থাকা। কাল রণজয় হাসপাতাল থেকে ফিরবে। রণজয় সব জেনে যাবে, রণজয়ের মাসীর কাছে আমি আর কোনোদিন মুখ দেখাতে পারবো না। সবাই আমাকে একটা বখাটে—বদমাইস ছেলে ভেবে ছি, ছি, করবে। অথচ, আমি কোনো দোষ করি নি।

বন্দনাদির ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। হয়তো আমি একটু বেশি জোরেই বেল বাজিয়েছিলাম। বন্দনাদির ঝি এসে বিরক্তভাবে দরজা খুলে বললো, দিদিমণি বাড়িতে নেই।

তার মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম তাই জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ বাড়িতে আছে। বলো, তপনবাবু এসেছে, বিশেষ দরকার।

— না, এখন দেখা হবে না।

— তুমি আমার নাম বলো।

বন্দনাদি বলেছিলেন, আমি যখন নিজের কোনো দরকারে ছুটে আসবো, তখন যত কাজই থাক, বন্দনাদি ঠিক আসবেন। সেই জোর আমার আছে।

ঝিকে সরিয়ে দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে এলাম। পৃথিবীতে একমাত্র যার কাছে আমি আমার দুঃখের কথা বলতে পারি, তার কাছে এসেছি। আমি এখন বাধা মানবো কেন?

বসবার ঘরে কেউ নেই। তবে কি সত্যিই বাড়ি নেই বন্দনাদি? না, তা নয়। ওর শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। একটু বাদে ওর গলার আওয়াজও শুনতে পেলাম। সেই বন্ধ দরজার সামনে আমি দাঁড়ালাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে ফিসফিস করে ডাকলাম, বন্দনাদি! বন্দনাদি!

কোনো সাড়া পেলাম না। তবে, ভেতরের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বন্দনাদি ছাড়া আরও একজনের গলা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দেওঘরের সেই দিনটার কথা। সেই দুটো লোক নয় তো! পরক্ষণেই ভাবলাম, তারা হলেই বা! এখানে মারধোর করা সহজ নয় অত। এটা কলকাতা শহর! তাছাড়া, বন্দনাদি এখন ওঁদের ওপর নির্ভরশীল নন।

আবার ডাকলাম। এবারেও কোনো সাড়া নেই। তৃতীয়বার ডাকার পর, ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ পুরুষের গলা শোনা গেল; আঃ! আবার জ্বালাতন! বন্দনাদি বললেন, কে ?...

আমি বললাম, বন্দনাদি, আমি তপন!

বন্দনাদি কি একবারও আমার কথা শুনতে পেলেন না? তাহলে কেন আবার জিজ্ঞেস করলেন, সুরো নাকি? কি বলছিস?

— আমি তপন!

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। চোখেমুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বন্দনাদি বললেন, কি বলছিস। তারপর আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলেন। দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক গলায় বললেন, ও তুমি! কখন এলে?

আজ বন্দনাদির আবার সেই দারুণ উগ্র সাজ। ঠোঁটে আর গালে তার গোলাপি রঙ, চোখে কাজল, ভ্রূতে কাজল। শাড়িটা খুব দামী। গলার লকেটে বড় একটা হীরে ঝুলছে। চোখের দৃষ্টি যেন একটু বেশি চকচকে।

বন্দনাদি আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে এসে হঠাৎ খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, তপন, দারুণ ব্যাপার! তোমার ভীষণ লাক! আমি সেই পার্টটা পেয়ে যাচ্ছি! এ বাড়িতে আর থাকবো না। নিউ আলিপুরে একটা ফ্ল্যাট দেখছি! কাল কন্ট্রাক্ট সই হবে—

বন্দনাদি গড়গড় করে আরও অনেক কিছু বলে গেলেন। বন্দনাদির সার্থকতায় আমার

নিশ্চয়ই আনন্দ হওয়া উচিত কিন্তু আজ যে আমার মনের অবস্থা সেই রকম নয় ! আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। বন্দনাদির কথা মাঝে-মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসে একটা গন্ধ আসছে— এ রকমভাবে ওকে আগে কখনো দেখি নি। বন্দনাদিকে আমি যে অনেক উঁচু আসনে বসিয়েছিলাম।

ভেতর থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গেলে বন্দনা ? কে এসেছে ?

বন্দনাদি মুখে-চোখে দারুণ একটা গর্বের ভাব এনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ আমার বাড়িতে কে এসেছে বলো তো ?

— কে?

— তুমি ভাবতেই পারবে না। ভেবেছিলাম চিরকাল সাইড রোলই করে যেতে হবে। হঠাৎ এই অফারটা ...। বুঝলে তপন, তোমার বন্দনাদি এখন সত্যিকারের স্টার! এই বইটাতে একটা নাচের সিকোয়েন্স আছে। আমি ছাড়া বাংলাতে আর কোন নায়িকা নাচতে পারে বলো তো ? তোমার মনে আছে, দেওঘরে ছাদের ওপর তোমাকে যে নাচটা দেখিয়েছিলাম, সেইটা নাচবো, ওর থেকেও অনেক ভালো হবে—

অস্ফুটভাবে কথার মাঝখানে ডাকলাম, বন্দনাদি!

বন্দনাদি বললেন, কি?

বন্দনাদি আমার মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারলেন না। অনেকদিন কথায়-কথায় দেওঘরের সেই নাচটার কথা উঠেছে। বন্দনাদি তখন বলেছেন, ওরকম নাচ তিনি আর কখনো নাচতে পারবেন না। ওটা তো দর্শকদের জন্য নয়, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য। সেই নাচটাই এবার দর্শকদের কাছে হাজির করবেন।

আমি ফিসফিস করে বললাম, বন্দনাদি, একটা বিশেষ কারণে আজ তোমার কাছে এসেছি। আজ আমার—

বন্দনাদি সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ঝুঁকিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, কি? তোমার টাকার দরকার আছে ? এতে লজ্জা কি ? বলো না, কত টাকা?

আমি বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। টাকা? বন্দনাদির কাছে আমি টাকা চাইতে আসবো কেন ? মা-বাবার কাছে ছাড়া, অন্য কারুর কাছে কেউ টাকা চায় নাকি?

আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিলো, অতিকষ্টে চেপে আমি বললাম, বন্দনাদি, আজ আমাকে একজন ভীষণ আঘাত দিয়েছে।

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে আবার পুরুষ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল।

বন্দনাদি একটুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন। তারপর নীরসভাবে বললেন, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। তুমি পরে আর একদিন এসো, তপন। আমি অবশ্য কয়েকদিন কলকাতায় থাকবো না, তারপর একদিন—

ব্যস্ত আছি, একথা বলার মানে কি! খুবই যদি জরুরি কাজ থাকে, আমাকে এই ঘরে অপেক্ষা করতে বলতে পারতেন না ? আর একদিন যেমন বলেছিলেন—যেদিন, আমার সৌভাগ্যে বন্দনাদি নায়িকার পার্ট পেয়েছিলেন। আমি কি কানে ভুল শুনেছি।

— কে, কে। কে এসেছে! রাজীবটা আবার এসেছে বুঝি!

বলতে-বলতে একজন পুরুষ দরজা দিয়ে উঁকি মারলো। আমার বুকের মধ্যে দপ করে উঠলো। আর কেউ নয় স্বয়ং চঞ্চলকুমার, প্রত্যেক রাস্তায় যার ছবির পোস্টার, বছরের সবসময় যার একটা না একটা বই চলে, সেই চঞ্চলকুমার রক্তমাংসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার দিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই আমার এখন। আমি বন্দনাদির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চঞ্চলকুমার বললেন, এ ছোঁড়াটা আবার কে ? চাঁদা-ফাঁদা চাইতে এসেছে বুঝি ? আঃ, চাঁদার জ্বালায় পাগল হয়ে যেতে হবে এবার।

সিনেমার চেহারার সঙ্গে চঞ্চলকুমারের এখনকার চেহারার কোনো মিল নেই। চোখ দুটো বেশ লাল, চুলগুলো উস্কখুস্ক, গলার আওয়াজ রীতিমতো রুক্ষ। আমি মনে-মনে বললুম, বন্দনাদি, চঞ্চলকুমারের সঙ্গে তোমার তো শুধু স্বার্থের সম্পর্ক, আর তো কিছু নয়। কিন্তু আমি তোমার বন্ধু। তোমাকে আজ খুব দরকার, তুমি ওকে চলে যেতে বলো।

চঞ্চলকুমার জড়ানো গলায় বললেন, যাও যাও ভাই, আজ যাও। অটোগ্রাফ হবে না, চাঁদা হবে না, এখন কিস্যু হবে না। এখন দু'জনে আমরা প্রাইভেটলি একটু বিজনেস টক্ করছি। কি, চাঁদা না নিয়ে ছাড়বে না? কি পূজো? পেট পূজো তো? বুঝেছি!

বুক পকেটে হাত দিয়ে চঞ্চলকুমার এক মুঠো টাকা তুলে আনলেন, তার থেকে একটা দশ টাকার নোট আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এই নাও! রসিদ-ফসিদ চাই না। যাও এবার কাটো।

নোটটা উড়তে-উড়তে মাটিতে পড়লো। আমি নির্বাক হয়ে চঞ্চলকুমারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষকে আমি কখনো এতো ঘৃণা করি নি। চঞ্চলকুমারের ওপর যেমন ঘৃণা হলো।

বন্দনাদি আস্তে-আস্তে বললেন, তপন, তুমি আজ যাও, কয়েকদিন পরে এসো—

চঞ্চলকুমার হেসে বললেন, অ্যাঁ, তুমি চেন ওকে ? কে ? তোমার ইয়ং লাভার নাকি ? ক'টি আছে এরকম ?

এটা কি এমন হাসির কথা, আমি জানি না, বন্দনাদি তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে পড়েই যাচ্ছিলেন, চঞ্চলকুমারকে ধরে সামলে নিয়ে বললেন, কি যে বলেন আপনি! ও এমনি চেনা—

আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। শ্মশান থেকে মানুষ যেভাবে ফেরে, আমিও ঠিক সেইভাবে ফিরে চললাম। এক রাত্রে দু'জন অস্বীকার করলো আমাকে। পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধু নেই।

চঞ্চলকুমার ডেকে বললেন, এই যে, ওহে, চলে যাচ্ছো যে! টাকাটা নিলে না ?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। বন্দনাদি বললেন, না। ঠিক আছে। ও টাকার জন্য আসে নি।

— কে ? কি চাই তাহলে ?

— এমনিই চেনা আর কি। মাঝে-মাঝে আসে! চলুন, ভেতরে চলুন—

— কে ? আসে কেন ?

বন্দনাদি কি বললেন আমি আর শুনতে পেলাম না। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

লাথি খাওয়া কুকুরের মতন আমি আবার রাস্তায় নেমে এলাম। সব মিথ্যে, সবাই মিথ্যে কথা বলে, আমি বোকা, তাই বিশ্বাস করেছিলাম। এ পৃথিবীতে সত্যি আমাকে কেউ চায় না, আমি একটা অপদার্থ।

প্রাই দু'ঘণ্টা ধরে কত সব অচেনা রাস্তায় ভূতে পাওয়া মানুষের মতন ঘুরে বেড়ালাম। শম্পা কিংবা বন্দনাদির কথাও আর মনে একেবারে পড়ছিল না, খালি মনে হচ্ছিলো, আমার বুকটা একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না।

বাড়ি ফিরলাম প্রায় দশটার সময়। কেউ এখনো খেতে বসে নি, সবাই একঘরে বসে গল্প

করছে। রাণুমাসী হালকা অনুযোগ করে বললেন, কী রে কোথায় ছিলি এতক্ষণ! আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বুঝি আর ভালো লাগে না? তোর তো আর পাত্তাই পাওয়া যায় না।

মা আমার মুখ দেখেই কিছু একটা বুঝতে পারলেন। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ও কিরে তপু, তোকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে তোর?

আমি কিছু বলতে পারলাম না, চুপ করে তাকিয়ে রইলাম মার দিকে।

মা উঠে এসে বললেন, এ কি, কথা বলছিস না কেন। কি হয়েছে কি, বল না।

আমি শুকনো গলায় বললাম, মা—আমার চুরি হয়ে গেছে।

— কি চুরি হয়ে গেছে?

— টাকা। আমার ব্যাগটা নেই!

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাগ চুরি গেছে ? কত টাকা ছিল?

— পঁয়ত্রিশ টাকা—এ মাসের সব খরচ।

— মা বললেন, তুই কি এত রাত পর্যন্ত সেই টাকা খুঁজছিলি নাকি? যাক্, গেছে যাক্। খুব বেশি তো যায় নি।

এতক্ষণ কাঁদি নি, কিন্তু মায়ের মুখের একটা সান্ত্বনার কথা শুনেই আমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, বুকের মধ্যে হু-হু করে বান ডাকছে। জলে ভেজা চোখে আমি বললাম, মা, আমি ভাবি নি, একটুও ভাবি নি আগে—এরকমভাবে—

টপটপ করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে মাটিতে। রাণুমাসী বললেন, একি, তুই কাঁদছিস কেন? ক'টা তো মোটে টাকা গেছে—কলকাতায় যা চোর—ছ্যাঁচোড় আর পকেটমার—তুই ছেলেমানুষ—

তবু আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না। উথাল-পাথাল করা ঝড়-বৃষ্টির মতন আমার বুক-চোখ ভেদ করে প্রবল কান্না বেরুতে চাইছে। আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আমার ঘরের দরজা ধরে হু-হু করে কাঁদতে লাগলাম। আমার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে কান্নার ধাক্কায়, ফোঁপানির চোটে আমার গলা আটকে আসছে।

মা আর রাণুমাসী দু'দিক থেকে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, ওরা কি বলছেন, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

খানিকটা বাদে রাণুমাসী আমাকে একা নিয়ে গেলেন বারান্দায়। পিঠে হাত রেখে খুব নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি হয়েছে সত্যি করে বল তো আমাকে?

কান্না থামিয়ে আমি চুপ করে রাণুমাসীর দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার আসল দুঃখের কথা আমি ওদের বলতে পারবো না। কারুকেই বলতে পারবো না। আমি আর ছেলেমানুষ নই, আজ থেকে আমি বড়দের জগতে চলে এসেছি—আজ যে দুঃখ পেয়েছি, সেটা বড়দের দুঃখ। এ দুঃখের জন্য মা কিংবা মাসীদের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। এখন থেকে এ দুঃখ আমাকে একাই সহ্য করতে হবে।

দর্পণে কার মুখ

সকালের ডাকে তিনটি চিঠি এসেছে। খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে অবনীশ চিঠিগুলো টেনে নিলেন। বসবার ঘরে এখন অবনীশ একা। একটি চেয়ারে বসে পা তুলে দিয়েছেন আর একটি চেয়ারে। জানালা দিয়ে একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে তাঁর পায়ের কাছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে রোদ্দুরের ফালিটা বড় হবে—কিন্তু তখন আর রোদ্দুরের প্রয়োজন থাকবে না, পর্দা টেনে দিতে হবে।

চিঠি খোলার আগে খামগুলো উল্টে-পাল্টে দেখা অবনীশের স্বভাব। খামের ওপর হাতের লেখা দেখে কিছু বোঝবার চেষ্টা করেন—পরিচিতদের হাতের লেখা চিনতে তাঁর কখনো ভুল হয় না।

এই তিনটি চিঠির হস্তাক্ষরই অপরিচিত। একটি নীল রঙের খাম দেখে তাঁর মনে হলো মেয়েলি হাতের লেখা। নারী ও পুরুষের হাতের লেখার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবেই। এ পর্যন্ত কোনো মেয়েরই পুরুষালি ধরনের হাতের লেখা দেখেন নি অবনীশ।

মেয়েলি হাতের লেখা খামটি পাশে রেখে অন্য দু'টি চিঠিই আগে খুললেন। একটি চিঠি লিখেছেন একজন নতুন প্রকাশক। তিনি অবনীশের সঙ্গে তাঁর কলেজে ও বাড়িতে কয়েকবার দেখা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দেখা পান নি। তাই বাধ্য হয়েই এ চিঠি লেখা—অবনীশ রায় যেন এজন্য কিছু মনে না করেন। তাঁর খুব ইচ্ছে অবনীশ রায়ের একটি উপন্যাস প্রকাশ করা, তিনি যদি দয়া করে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করেন...।

চিঠিটা পড়ে অবনীশ একটু ভাবলেন। এই প্রকাশকের কাছ থেকে কি তাঁর কিছু অগ্রিম টাকা নেওয়া আছে? অগ্রিম নেওয়া থাকলে একটা বাধ্যবাধকতা এসেই যায়। অবনীশ এসব টাকার হিসাব রাখতে ভুলে যান—অনেকবার ভেবেছেন কোনো খাতায় লিখে রাখবেন, কিছুতেই হয়ে ওঠে না। তবে, এক্ষেত্রে বোধহয় সে-রকম কিছু নেই, থাকলে, চিঠির মধ্যে আকারে-ইঙ্গিতে তার উল্লেখ থাকতোই। সুতরাং এ চিঠির উত্তর না দিলেও চলে।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এসেছে পুরুলিয়া থেকে। সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে আগামী মাসে—তাতে অবনীশকে প্রধান অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চিঠিখানা খুব

ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা, দু'টি বানান ভুল—এবং শেষে জানানো হয়েছে যে এই ব্যাপারে সব ঠিকঠাক করার জন্য ওঁদের একজন প্রতিনিধি আগামী সপ্তাহেই এসে অবনীশের সঙ্গে দেখা করবেন।

এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবনীশের দু'চক্ষের বিষ। পারতপক্ষে যেতে চান না। কিন্তু এঁদের নিবৃত্ত করাও সহজ নয়। অবনীশ এইজন্য একটা বাঁধা কৌশল অবলম্বন করেন। তাড়াতাড়ি উঠে টেবিলের ওপর থেকে চিঠি লেখার প্যাড নিয়ে এলেন। খসখস করে লিখলেন যে, ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত বোধ করছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আগামী মাসের ঐ সময়ে তাঁকে রাজস্থান যেতে হবে—অনেক আগে থেকেই সেটা ঠিক হয়ে আছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে পুরুলিয়া যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না—অতএব তাঁকে যেন ক্ষমা করা হয়।

চিঠি লেখার ব্যাপারে অবনীশ অত্যন্ত অলস। মাসে তিনি অন্তত একশোখানা চিঠি পান, তার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচখানার উত্তর দেন কি না সন্দেহ। অধিকাংশ চিঠিরই অবশ্য উত্তর দেবার মতো কিছু থাকে না। নিছক ভদ্রতা রক্ষার জন্য চিঠির উত্তর দেওয়া ধাতে সয় না অবনীশের। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় চিঠিখানির উত্তর সঙ্গে-সঙ্গে লিখতে হলো, নইলে ঐ সাংস্কৃতিক কোম্পানির প্রতিনিধি এসে আবার তাঁর কিছুটা সময় নষ্ট করবে।

এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে অবনীশ তৃতীয় চিঠিখানা খুললেন। তাঁর অনুমান নির্ভুল, একটি মেয়েরই লেখা। তিন পাতার চিঠি, পড়ার আগেই শেষ পৃষ্ঠায় অবনীশ নামটা দেখলেন। মায়া চৌধুরী। নামটার দিকে অবনীশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কোনো উপন্যাসে তিনি কোনো নায়িকার নাম মায়া রাখবেন না। কারণ নামটাতে বেশ খানিকটা পুরনো গন্ধ আছে। একালের কোনো নায়িকার ঐ নাম মানায় না—পাঠক-পাঠিকারা বলবে অবাস্তব। অথচ, বাস্তবের একালের মেয়ের ঐ নাম থাকে। উপন্যাসে এক ধরনের বাস্তবতার ছাপ রাখতে হয়—যা আসলে বাস্তব না হয়েও বাস্তবের মরীচিকা সৃষ্টি করে।

মেয়েটির ঠিকানা নিউ আলিপুরের একটি রাস্তা। হাতের লেখাটি সুন্দর। সে লিখেছে :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার একজন সামান্য পাঠিকা। জানি না, এই চিঠি লিখে আপনার সময় নষ্ট করছি কি না। হয়তো আপনি বিরক্ত হবেন, সবটা না পড়েই ফেলে দেবেন। তবু—

এইটুকু পড়েই অবনীশ সামান্য হাসলেন। অধিকাংশ মেয়েই এইভাবে চিঠি আরম্ভ করে। অপরিচিত একজন পুরুষকে চিঠি লেখার সময় অদ্ভুত দ্বিধা ও লজ্জা ঘিরে থাকে তাদের। নইলে, একটা সাধারণ সত্যিকথা নিশ্চয়ই তাদের মনে পড়তো। কোনো মেয়ের চিঠি পেয়ে কোনো পুরুষ কখনো বিরক্ত হয়? বিশেষত, অচেনা মেয়ের চিঠি পেয়ে? আর সময়ের অভাব? পৃথিবীতে এমন ব্যস্ত মানুষ কে আছে, একটি চিঠি পড়ারও যার সময় নেই? ততোটা ব্যস্ত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

অচেনা মেয়ের চিঠি অবশ্য অবনীশ আগেও অনেক পেয়েছেন, প্রায়ই পান। তবু তাঁর ভালো লাগে। আগের মতন রোমাঞ্চ বোধ না হলেও কিছুটা সময় মনটা খুশিতে ভরে থাকে। অন্য অনেক লেখককে দেখেছেন, কোনো পাঠিকার চিঠি পেলে তাঁরা সেটা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান ও আকারে-ইঙ্গিতে বন্ধুদের কথাটা জানাবার চেষ্টা করেন। অবনীশ ততোটা কখনো করেন নি।

মেয়েটি তারপর লিখেছে : তবু আপনাকে চিঠি লিখছি, কারণ, আজ সন্ধেবেলা বাড়িতে আমি সম্পূর্ণ একা। কিছুই করার নেই। একটু আগে ছাদে গিয়ে ফুলের টবগুলোতে জল দিলাম,

ভারি সুন্দর রজনীগন্ধা ফুটেছে আমাদের ছাদে। হঠাৎ খুব মিষ্টি হাওয়া দিল। সেই সময় কেন জানি না মনে পড়ল আপনার কথা। তাই ঝোঁকের মাথায় চিঠি লিখতে বসলাম।...

অবনীশ আবার একটু থামলেন। অন্য কেউ শুধু এইটুকু অংশ পড়ে ভাববে, এটা একটা প্রেমপত্র। বিকালের ছাদে ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে একটি মেয়ে ভাবছে একজন পুরুষের কথা। কিন্তু আসলে প্রেমপত্র নয়—একটি নিষ্পাপ চিঠি। কারণ, মেয়েটি এই চিঠি কোনো পুরুষকে লিখছে না, লিখছে একজন লেখককে। যে লেখক একজন মায়াবী কিংবা দৈবজ্ঞ, যে সকলের মনের কথা জানে—এমন কী ছাদে একা-একা একটি মেয়ে কী চিন্তা করে—সে কথাও ফুটিয়ে তুলতে পারে। সেই জন্যই লেখককে মনে হয় খুব কাছের মানুষ, তার কাছে গোপন কথা বলা যায়। এবং এটা খুব নিরাপদ, কারণ লেখক কোনো প্রতিদান চাইবে না। লেখক সবসময় দূরের মানুষই থেকে যাবে।

চিঠির পরের অংশ; আপনার 'সমুদ্রের সামনে একা' উপন্যাসের নায়িকা বিশাখাও ঠিক এমনি একদিন বাড়িতে একা ছিল, ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার ওপর আঙুল দিয়ে বার বার একটা ছবি আঁকছিল। জানেন, আপনার ঐ বিশাখার সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল আছে। আপনি কি ঐ রকম কোনো মেয়ে দেখেছেন ? আমার কিন্তু মনে হয়, ঠিক যেন আমাকে নিয়েই লেখা। অথচ আপনি যে আমাকে চেনেন না, সে-কথাও ধ্রুব সত্যি। কী করে এসব লেখেন বলুন তো ? আপনার 'অনেক আকাশ' উপন্যাসে যে লিখেছেন...

আর পড়া হলো না। চাকর এসে খবর দিল, দু'জন ভদ্রলোক ডাকতে এসেছেন। অবনীশ চেয়ার থেকে পা নামিয়ে বসে, ভদ্রলোক দু'জনকে ভেতরে আসতে বললেন।

দু'জন সুসজ্জিত প্রৌঢ়, হাতে দামী সিগারেটের প্যাকেট ও পাথর-বসানো আংটি। একজনের পোশাক নিখুঁত সুট-টাই, অন্যজন ফিনফিনে ধুতি ও পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি পরা লোকটি বললেন, আপনিই অবনীশবাবু, ও আচ্ছা! আমি ভেবেছিলাম—

ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন, অবনীশ রায়কে আরও বয়স্ক মানুষ দেখবেন। কিন্তু খ্যাতির তুলনায় অবনীশ রায়কে এখন প্রৌঢ় বলা যায় না। চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস।

অবনীশ তাঁদের বসতে বললেন, এবং আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন লোক দু'টির হাবভাব। এটাও তাঁর স্বভাব। অপরিচিত মানুষের মুখোমুখি বসলেই তিনি তাদের চেহারা ও আচার-আচরণ দেখে তাঁদের চরিত্র বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে, অবনীশের মনে হলো, এঁরা ফিল্ম লাইনের লোক। অবনীশ গোপনে একটু বিরক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঘরে ঢুকেই সরাসরি কেউ কাজের কথা শুরু করে না। সুট-পরা লোকটি বললেন, আপনার বাড়ির ঠিকানা জানতাম না, মোটামুটি শুনেছিলাম আপনি এ পাড়াতেই থাকেন। বাড়ি খুঁজে পেতে অবশ্য খুব অসুবিধা হয়নি—পাড়ার ছেলেদের কাছে আপনার নাম বলতেই বাড়ি দেখিয়ে দিল, আপনাকে তো অনেকেই চেনে।

অবনীশ কোনো মন্তব্য না করে চুপ করে রইলেন। তিনি জানেন, কাজের কথায় আসতে মিনিট দশেক সময় লাগবে। অবনীশ রায় আড্ডাবাজ কিংবা চতুর স্বভাবের লোক নন। হঠাৎ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করা তাঁর স্বভাবে নেই। ঠোঁটে শুকনো হাসি ফুটিয়ে রেখে মোটামুটি হুঁ-হাঁ করে যেতে লাগলেন।

লোক দু'টি নাম বললেন, নমস্কার-বিনিময় হলো। তারপর অবনীশ রায়ের লেখার প্রশংসা করার পালা। অবনীশ রায় যে কত ভালো লেখেন, আজকালকার তরুণ ছেলেমেয়েদের সমস্যা তাঁর কলমে যে কত নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে—এইসব কথা অবনীশ এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিতে লাগলেন। কথা শুনলেই তিনি অনুমান করে নিতে পারেন, কে

সাহিত্য বোঝে আর কে বোঝে না। এই লোক দু'টি মোটেই সাহিত্য-বোদ্ধা নয়, পাঠকও নয়। এরা যা বলছে, তা সবই শোনা কথা। অবনীশের যে চারখানি উপন্যাস চলচ্চিত্র-রূপ পেয়েছে, এরা শুধু সেগুলোরই উল্লেখ করছে।

মনে-মনে ভাবছিলেন, এঁদের চা খাওয়ানো উচিত কিনা। চা তৈরি হয়ে আসতে মিনিট পনেরো সময় লাগবে, তাহলে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের আগে কথাবার্তা শেষ হবে না। কিন্তু সকালের এই সময়টায় কেউ বাড়িতে এলে চা খেতে না বলা খুবই অভদ্রতা। অবনীশ মনস্থির করে ফেলে ওঁদের চায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। লোক দু'টি প্রথমে ক্ষীণ আপত্তি, তারপর গররাজি ও তারপর বললেন, যদি কোনো অসুবিধে না হয়—!

ফিল্মের জন্য তাঁর কোন উপন্যাসের স্বত্ব বিক্রি হলে অবনীশের পক্ষে খুশি হবারই কথা। কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যায়। আর, একটা বইয়ের বিনিময়ে কিছু টাকা পেলে কার না ভালো লাগে! কিন্তু অবনীশ এই লোক দু'টির আগমনে খুশি হতে পারছেন না। এঁরা কেন যে সব ঠিকঠাক করার পর আসে না ! এই রকম লোক মাঝে-মাঝেই আসে, একই ধরনের কথা হয়, সব কথা পাকা হয়ে যায়—তারপর কালকেই আসছি বলে চলে যাবার পর আর কোনোদিন আসে না। যেন ঠিক মেয়ে দেখার ব্যাপার। এমন ঘটনাও ঘটেছে, কলম খুলে চেক লিখতে উদ্যত প্রযোজক কন্ট্রাক্ট ফর্মে সামান্য ভুল লক্ষ করে—'দু'ঘণ্টা পরেই আসছি' বলে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি সারাজীবনে। অবনীশের এই ব্যাপারটা ঘোর অপছন্দের অথচ, এরা এলে খারাপ ব্যবহার করা যায় না—কারণ কেউ-কেউ তো সত্যিই টাকা দিতে আসে।

কথাবার্তা ক্রমশ অবনীশের সদ্য-প্রকাশিত একটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগলো এবং ভদ্রলোক দু'জন সেটির চিত্রস্বত্ব কেনার কথা পাড়লেন। অবনীশের চোখে-মুখে কোনো উৎসাহের আলো জ্বলে উঠল না। চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, বেশ তো!

টাকার অঙ্ক নিয়ে আলোচনা হলো পাঁচ মিনিট। দরাদরি করা অবনীশের স্বভাব নয়। একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বলে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন। লোক দু'টি শেষ পর্যন্ত বললেন, টাকার ব্যাপারে খুব অসুবিধে হবে না, কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ, সাতদিনের মধ্যে এ বই কারুকে বিক্রি করবেন না—আমরা তার মধ্যেই আবার এসে... এই আমাদের কার্ড রইলো—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনীশ ওঁদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। মনে-মনে তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে গেছেন যে, এই লোক দু'টি আর আসবেন না। শুধু-শুধু ওঁরা এসে এই সকালটায় অবনীশের মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে গেলেন। সকালবেলায় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে অবনীশের লেখায় মন বসে না। টেবিলের ওপর রাখা অসমাপ্ত চিঠিখানার কথা ভুলেই গেলেন তিনি। রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে চোখের সামনে খবরের কাগজখানা মেলে ধরলেন। খবর পড়ায় মন নেই, অবনীশ তাঁর পরবর্তী উপন্যাসের কথা ভাবছেন।

দমকা হাওয়ায় চিঠিখানা টেবিল থেকে পড়ে গেল মাটিতে। পাতাগুলো আলাদা হয়ে মেঝেতে গড়াতে লাগলো। অবনীশের খেয়াল নেই। আর একবার হাওয়া এসে অবনীশের দরকারি কাগজপত্র যখন এলোমেলো হয়ে গেল, তখন খেয়াল হলো অবনীশের। অতো কাগজ গুছোতে গিয়ে চিঠিখানা আবার চোখে পড়লো। ভুরু কুঁচকে চিঠিখানা পড়ে শেষ করলেন। মেয়েটির চিঠি শুধু উচ্ছ্বাসে ভরা নয়, সত্যিই সে মনোযোগী পাঠিকা—অবনীশের অনেক লেখাই পড়েছে এবং ঠিক জায়গাগুলো ধরতে পেরেছে।

একেবারে শেষের দিকে মেয়েটি লিখেছে, আপনাকে আমার মনে হয় খুব চেনা। আপনিও আমাকে খুব ভালো করেই যেন চেনেন। আপনার লেখার মধ্যে আমি দর্পণের মতন নিজেকে দেখতে পাই। আমি যদি আপনাকে নিয়মিত চিঠি লিখি, আপনি উত্তর দেবেন তো ? অন্তত, এই

চিঠির যদি উত্তর না পাই, আপনার ওপর ভীষণ রাগ করবো। ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ ! বুঝলেন ? কাল থেকে প্রত্যেক দিন আপনার চিঠির অপেক্ষা করব। ইতি মায়া চৌধুরী।

অবনীশ ভাবলেন, বিষম কথাটা আজকাল ভীষণ হয়ে গেছে ! এ আর বদলানো যাবে না। ভীষণ রাগ, ভীষণ ভালো, ভীষণ মিষ্টি—এগুলো আজকাল আর কানে লাগে না।

পরে উত্তর দেবেন ভেবে অবনীশ চিঠিখানা খামে ঢুকিয়ে ড্রয়ারে রাখতে গেলেন। তারপর একটু হেসে আবার বার করে আনলেন। পরে উত্তর দেবার জন্য রেখে দেওয়া এরকম কত চিঠি জমে আছে। উত্তর দেওয়া হয় না—দু'তিন মাস বাদে টেবিল পরিষ্কার করার সময় সব একসঙ্গে ফেলে দিতে হয়। এ চিঠিখানাও তাই হবে। মেয়েটি এতো আবেগ ও অনুরাগের সঙ্গে, এত যত্ন করে চিঠিখানা লিখেছে—তবু অবনীশের উত্তর দেওয়া হবে না। কী লিখবেন তিনি ? তিনি তো লিখতে পারেন না, তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে, তোমাকে আমি ভীষণ দেখতে চাই—তুমি দর্পণের মতন তোমার বুকে আমার মুখ দেখতে দেবে ?

চিঠিখানা মুড়ে অবনীশ ফেলে দিলেন ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে।

২

অবনীশ একটা কলেজে ইংরেজি পড়ান। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি চাকরিটা ছেড়ে দেবেন ভাবছেন, অথচ ছাড়াও হচ্ছে না। লেখার থেকে তাঁর যা আয় হয়, তাতে তাঁর সংসার চলে যাবার কথা। কিন্তু আয় বাড়লেই ব্যয় বাড়ে এবং নির্দিষ্ট মাইনের চাকরি হাত-ছাড়া করতে সাহস হয় না। অধিকাংশ লেখকের মতন অবনীশ এখন সংসার-বন্ধনে জড়িয়ে গেছেন। হঠাৎ সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে পড়ার মতন শক্তি তাঁর আর নেই। বছর দশেক আগেও এই অবনীশ রায় যে মাঝে-মাঝেই এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন—এখন আর তাঁকে দেখে সেটা বোঝাই যায় না। লেখক হিসেবে অবনীশ রায় যখন পরিচিত হন নি, তখন পরিচিতজনরা তাঁকে একটি বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে জানতো। এখন বহু পাঠক-পাঠিকা তাঁকে একটি শান্তশিষ্ট লেখক হিসেবে চেনে।

কোনোদিনই বারোটার আগে অবনীশের ক্লাস থাকে না। কলেজেও কাজের চাপ বেশি নেই। নানা গোলমালে প্রায়ই ক্লাস বন্ধ থাকে—অবনীশ কলেজ প্রশাসন বা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না বিন্দুমাত্র। প্রফেসরদের ঘরে বসে আড্ডা দিতেও দেখা যায় না তাঁকে, ক্লাসে পড়াবার সময়ও তিনি নির্লিপ্ত। যুবকদের নিয়ে তিনি এতো গল্প-উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন। তিনি একটু দূর থেকে দেখা পছন্দ করেন। যেসব ছাত্র প্রক্সি দেয় কিংবা নিয়মিত ক্লাস পালায়—তাদের সম্পর্কে তিনি কঠোর হন না। প্রতি বছরই তাঁর ক্লাসে যে দু'তিনজন উৎসাহী মনোযোগী ছাত্র থাকে—তাদের তিনি সাহায্য করেন যথাসম্ভব। যারা ফাঁকি দিতে চায় পড়াশুনো—তাদের সম্পর্কে অবনীশের কোনো দায় নেই। যার যা খুশি করুক, এই হচ্ছে অবনীশের মনোভাব।

সকালবেলা ন'টার মধ্যে চিঠিপত্র ও কাগজ পড়া শেষ করে তিনি এগারোটা পর্যন্ত রোজ লেখেন। এই সময়ে কোনো লোকজন এলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। অথচ আসেই। একজন লেখকের কাছে নানা ধরনের লোক আসবেই। বাধ্য হয়েই, খুব লেখার চাপ থাকলে, অবনীশকে কলেজে এসেও লিখতে হয়। কলেজে ইংরেজি বিভাগের চারজন অধ্যাপকের জন্য একটা আলাদা ঘর আছে, কখনো-কখনো সেই ঘরটা অবনীশ সম্পূর্ণ ফাঁকা পেয়ে যান। ইংরেজির হেড অফ দা ডিপার্টমেন্টই এখন অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল, তাই তিনি আলাদা ঘরে বসেন। আর, একজন

অধ্যাপক প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। এছাড়া যিনি আছেন, সেই জগৎ সাহা যখন ক্লাসে থাকেন, তখনই অবনীশ ঘরটা ফাঁকা পান।

জগৎ সাহা মানুষটি খুব বিচিত্র। ইংরেজির অধ্যাপক হলেও তাঁর মুখে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ক কোনো আলোচনা কখনো শোনা যায় না। ওটা যেন ছাত্রদের পড়াবারই ব্যাপার, তার নিজের কোনো আলাদা উৎসাহ নেই ও ব্যাপারে। মানুষটি রোগা ও ছোটখাটো চেহারা, সবসময় ছটফট করছেন। বাথরুমের পাইপ ফেটে গেল কিংবা কলেজ ক্যান্টিনে কেন ডিম-সেদ্ধ ঠাণ্ডা দেওয়া হয়—এই নিয়ে খুব ব্যস্ত। ছাত্রদের মন জুগিয়ে চলতে-চলতে তিনি এমন এক জায়গায় এসে পড়েছেন যে, এখন যদি কোন ছাত্র তাঁকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার হুকুম করে, তিনি তাতেও রাজি হয়ে যাবেন।

এই ঘরে একটা টেলিফোন আছে। লেখার সময় টেলিফোন বেজে গেলেও অবনীশ টেলিফোন ধরেন না। কখনো-কখনো বাইরে থেকে বেয়ারা এসে টেলিফোন তোলে, অন্য সময় বাজতে বাজতে থেমে যায়।

অবনীশ খুব নিবিষ্টভাবে লিখছিলেন, বেয়ারা কেষ্ট এসে বলল, স্যার, আপনার টেলিফোন!

অবনীশ অন্যমনস্কভাবে বললেন, বল এখন আমি ব্যস্ত আছি।

কেষ্ট বললো, বোধহয় বাড়ি থেকে দিদিমণি টেলিফোন করছেন।

কলম খাপে ভরে অবনীশ উঠলেন। তাঁর স্ত্রী রুমা সাধারণত কলেজে টেলিফোন করে না। তাছাড়া, কিছুদিন ধরে রুমার সঙ্গে অবনীশের সম্পর্ক ভালো নেই, প্রায়ই কথাবার্তা বন্ধ থাকে। চার-পাঁচ দিন যাবৎ রুমা রাগ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে আছে।

টেলিফোন তুলে অবনীশ নিরাসক্ত গলায় বললেন, হ্যালো ?

রুমাই ফোন করেছে। যেন কোনোদিন স্বামীর সঙ্গে তার ঝগড়াঝাঁটি হয় নি এমন হাসিখুশি গলায় রুমা বললো, এই শোন, তোমার কি আজ বিকেলের দিকে ক্লাস আছে ?

— কেন ?

— বলই না আছে কি না ?

— আছে একটা।

— সেটা বাদ দিয়ে দাও।

— হঠাৎ ?

— আজ গ্লোবে সিনেমা দেখতে যাব। দিদি-জামাইবাবুরাও যাচ্ছে, তুমি টিকিট কেটে দেবে ?

— আজই ? এখন আমি টিকিট কাটবো কি করে ?

— এখন বেরিয়ে গিয়ে চট করে কেটে নিয়ে এস। কতক্ষণ লাগবে ?

— কিন্তু এখন যে আমি একটা কাজ করছিলাম।

— কী কাজ ?

অবনীশ একটু চুপ করে রইলেন। লেখাটাই যে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ একথা রুমার মনে থাকে না। অথচ, রুমার জন্যেই তাঁর লেখার চাপ বেড়েছে। রুমার শাড়ি, গয়না, বিলাসিতা, দান-ধ্যান, অন্যদের সঙ্গে সমান হয়ে চলার ধাক্কায় অবনীশ খরচ সামলাতে পারেন না। বেশি রোজগারের জন্যই তাঁকে বেশি লিখতে হয়।

রুমা বলল, কি, চুপ করে রইলে যে ? যখনই সিনেমা দেখা হয় দিদি-জামাইবাবুরা আমার টিকিট কাটে। আমার বুঝি মানসম্মান নেই ?

— মাঝে-মাঝে তুমি টিকিট কিনলেই পার।

— বোকার মতন কথা বোল না! ওদের সঙ্গে গেলে আমাকে টিকিট কাটতে দেবে কক্ষনো জামাইবাবু ? সেইজন্যই তো বলছি, তুমি টিকিট কেটে এনে দাও।

— কিন্তু দু'একদিন আগে থেকে ঠিক করলে হয় না ? এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে আমি টিকিট কাটব কি করে ?

— সিনেমা যাওয়ার কথা ওরকম হঠাৎই ঠিক হয়। ভেবে-চিন্তে প্ল্যান করে তো বুড়োরা যায়। লক্ষ্মীটি, আজকের দিনটা একটু ছুটি নাও !

— আচ্ছা ঠিক আছে, কেষ্টকে পাঠাচ্ছি। ও যদি টিকিট পায় তাহলে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

— পৌঁছে দিতে হবে না। টিকিট পেলে আমাকে ফোন করে দিও। তুমি ছ'টার সময়ে গ্লোবের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো—আমরা যাব, তুমি দেরি কোর না কিন্তু !

— আমি তো যাচ্ছি না।

— তার মানে ?

— আমি কেষ্টকে দিয়ে টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার যাওয়ার দরকার কি ?

— বাঃ আমি দিদি-জামাইবাবুকে বলে রেখেছি, তুমি যাচ্ছ। তোমার কি ছ'টা পর্যন্ত ক্লাস নিতে হবে নাকি ?

— তা নয়। আমার সিনেমা যাওয়া হবে না। তুমি তো জানো, আমার ভালো লাগে না।

— প্লিজ একদিন চল। অন্তত আজকের দিনটা—

— শোন রুমা, রাগ কোরো না। আমার সিনেমা দেখতে ভালো লাগে না—শুধু-শুধু জোর করে যাবার তো কোনো মানে হয় না। তাছাড়া, আমি এখন একটা লেখা দেখছি, এখন অন্য ধরনের ডিসটারবেন্স হলে মুশকিল হবে। তোমার জামাইবাবু টিকিট কাটলে তোমার লজ্জা করে, আমি তো টিকিট পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

— তুমি দয়া করছ নাকি ?

— এখানে দয়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে ? পরে আমি যখন ফ্রি থাকব—তখন না হয় সবাই মিলে একদিন একটা সিনেমা দেখা যাবে। এখন—

— থাক দরকার নেই।

হঠাৎ রুমা লাইন কেটে দিল। একটুক্ষণ বিমূঢ় অবস্থায় অবনীশ দাঁড়িয়ে রইল টেলিফোনের সামনে। রুমার এই রকমই মেজাজ। কিছুতেই কোন যুক্তি বুঝবে না। এখন মুশকিল হলো, টিকিট কিনে পাঠাতে হবে কি না, সেটা বোঝা গেল না। কেষ্টকে দিয়ে টিকিট পাঠালে যদি সেগুলো ছিঁড়ে-টিঁড়ে ফেলে সবার সামনে একটা নাটক করে ? রুমাকে বিশ্বাস নেই।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। অবনীশ ভাবল, রুমাই নিশ্চয়ই আবার টেলিফোন করেছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে তার মত বদলায়।

কিন্তু এবার অন্য নারী-কণ্ঠ। আমি কি অবনীশ রায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি ?

নৈরাশ্য লুকিয়ে অবনীশ সংযত গলায় বলল, হ্যাঁ বলুন। আমি অবনীশ রায় কথা বলছি।

অদেখা মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। উঃ কত কষ্ট করে আপনাকে খুঁজে পেলুম। কতদিন ধরে চেষ্টা করছি। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলুম আপনি এই কলেজে—। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন ?

অবনীশ একটু হেসে বলল, কি করে চিনব ? আপনি তো এখনো আপনার নাম বলেন নি।

— গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারছেন না ?

— একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।

টেলিফোনের ওপাশের মেয়েটি ঝিরঝির করে হাসল। হাসতেই বলল, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ? তাহলে আর একটু ভেবে বলুন তো আমি কে ? আমি কিন্তু নাম বলব না।

সব মেয়েই রহস্যময়ী সাজতে ভালবাসে। বিশেষত টেলিফোনে অচেনা পুরুষের সঙ্গে রহস্য করা বেশ উপভোগ্য। অবনীশ এই রকম টেলিফোন মাঝে-মাঝে পেয়ে থাকেন—খুব সম্ভবত মেয়েটি টেলিফোনের কাছে একা নেই, আরও দু'তিনটি মেয়ে সঙ্গে আছে। তিন-চারজন বান্ধবীর দুপুরবেলা গল্প করতে-করতে হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, একজন লেখককে টেলিফোন করা যাক।

অবনীশ বললেন, আপনার নাম মণিকুন্তলা। পরশুদিন আপনি টেলিফোন করেছিলেন। কি, ঠিক বলি নি ?

অবনীশ ঐ নামের কোনো মেয়েকে চেনেন না। পরশুদিন তাঁকে কেউ টেলিফোন করে নি।

ওপাশ থেকে সামান্য হাসির সঙ্গে উত্তর এলো, ঠিক ধরেছেন তো। আপনার সব মনে থাকে ?

— হ্যাঁ, থাকে।

— আচ্ছা, আজ কেন টেলিফোন করছি বলুন তো ? আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন ?

অবনীশ উত্তর না দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটু আগে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, তিনি একটা জরুরি লেখা শেষ করতে পারছেন না, তাঁর স্ত্রী আবার টেলিফোন করার চেষ্টা করে-করে এনগেজ্‌ড্ পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে—এসব কথা কি কোনো ভক্ত পাঠিকাকে বলা যায় ?

— না, ব্যস্ত নই।

— তাহলে আপনার গলার আওয়াজটা কী রকম যেন গম্ভীর-গম্ভীর শোনাচ্ছে।

— আমার গলার আওয়াজ তো এই রকমই।

— তাহলে বলুন, আমি কেন ফোন করেছি ?

— তা আমি কি করে জানব ? আপনি তো বলেন নি এখনও।

— আপনি আমাকে আপনি না বলে তুমি বলবেন।

— কেন ? আমি তো আপনার বয়েস জানি না।

— বাঃ, আমার গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছেন না আমি আপনার থেকে অনেক ছোট?

— গলার আওয়াজ শুনে তো ইন্দিরা গান্ধীরও অনেক কম বয়েস মনে হয়।

— বাঃ, আপনি বুঝি এতক্ষণ আমাকে বুড়ি ভেবেছেন ?

— না, তা ভাবি নি। তবে কমবয়েসী মেয়েদেরও আপনি বলে কথা বলতেই আমার ভালো লাগে। তাতে মনে হয়, আমি নিজেও বুড়ো হয়ে যাই নি।

— আপনিও তো সত্যিই বুড়ো নন। আপনার ছবি দেখেছি আমি।

অতিশয় অর্থহীন সংলাপ। নিছক সময় কাটানো। অবনীশ গম্ভীর ধরনের মানুষ, এ ধরনের ব্যাপার সাধারণত প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু আজ হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর বেশ ভালোই লাগছে। মেয়েটির গলার আওয়াজ বেশ মিষ্টি। টাটকা সারল্যের স্পর্শ আছে।

অবনীশ একটুক্ষণ নীরব থাকায় মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলো, কই, এখনো বুঝতে পারলেন না আমি কেন ফোন করেছি ? আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো ?

— না, বিরক্ত হই নি। কিন্তু আপনি না বললে আমি বুঝব কি করে ?

— বাঃ, লেখকরা তো সবার মনের কথা বুঝতে পারে।

— তা পারে বোধহয়। কিন্তু চোখে না দেখে কি মনের কথা বলা যায় ? চেহারা, মুখের

ভাব, কী রঙের শাড়ি পরা পছন্দ—এইসব দেখেই তবে মনের কথা বলা যায়। লেখকরা তো জ্যোতিষী নয়।

— আপনি যাদের কথা লেখেন, তাদের সবাইকে চোখে দেখেছেন ?

— হ্যাঁ। সবাইকে।

— তাহলে বুঝতে পারছি, আমাকে নিয়ে আপনি কোনোদিন কিছু লিখবেন না। কারণ, আপনার সঙ্গে আমার কোনোদিনই দেখা হবে না।

— আচ্ছা।

— আচ্ছা মানে ?

— দেখা হবে না, সেই জন্যই বললাম আচ্ছা।

— আর কিছু বলবেন না ?

— না।

— আপনি কিছুই কথা বলছেন না। আমিই শুধু বলে যাচ্ছি। অথচ ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে গল্প করব।

— আমি গল্প লিখতে পারি হয়তো। মুখে কিছুই বলতে পারি না।

— শুনুন, আপনি আমার চিঠির উত্তর দেন নি কেন ?

— বাঃ, দিলাম যে।

— মিথ্যে কথা! আমি মোটেই আপনার চিঠি পাই নি।

— কিন্তু মণিকুন্তলা মজুমদারকে পরশুই তো লিখলাম।

— আপনি বুঝি মণিকুন্তলা মজুমদার ছাড়া আর কারুকে চিঠি লেখেন না ?

— মণিকুন্তলা মজুমদারকে তার চিঠির উত্তর দিই। অন্য কারুকে অন্য উত্তর।

— আমি মণিকুন্তলা নই।

— জানি।

— জানতেন ?

— নিশ্চয়ই !

— আমার নাম মায়া চৌধুরী।

এই নামটি অবনীশের মনে কোনোরকম দাগ কাটলো না। কিছুই মনে নেই। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর নামই সবসময় মনে থাকে না—অচেনা-অদেখা মেয়েদের নাম মনে রাখা তো আরও শক্ত। তবু অবনীশ বলল, ও, তাই বলুন, কি খবর ?

— এবার চিনতে পেরেছেন ?

— কেন চিনব না।

— তাহলে বলুন, উত্তর দেন নি কেন ?

— এই তো উত্তর দেওয়া হয়ে গেল। এই যে টেলিফোনে এতক্ষণ কথা হলো।

— যাঃ! জানেন, আপনাকে লেখার পর থেকে প্রত্যেকদিন ডাকবাক্স খুলে দেখেছি। পিওন দেখলে দৌড়ে গেছি। দশদিনের মধ্যেও আপনার উত্তর এলো না। ভীষণ রাগ হয়েছে আপনার ওপর। আপনারা লেখক হয়েও এত নিষ্ঠুর কেন ?

— এতক্ষণ যে কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে রাগের কোনো চিহ্ন তো খুঁজে পাই নি।

— আমি আর কোনোদিন আপনাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করবো না! একটু জনপ্রিয় হয়ে গেলেই আপনাদের বড্ড অহঙ্কার হয়ে যায়। আর কোনোদিন আপনাকে টেলিফোনও করবো না, চিঠিও লিখবো না।

— যাঃ, তা কি হয় !

— আপনি কি ভেবেছেন, এরপরেও আপনার কাছে ধর্ণা দেব ?

— তাহলে দিও না।

— আপনি কি আমাকে টেলিফোন নামিয়ে রাখতে বলছেন ? তাই রাখছি তাহলে।

মেয়েটির কথাবার্তায় এতক্ষণ একটা হালকা কৌতুকের ভাব ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে তেজী অভিমান ও বিষাদ এসে গেল। অবনীশ গলার আওয়াজ নরম করে হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন। বললেন, শোন ভাই, রাগ কোরো না। চিঠির উত্তর দিতে আমার খুবই ইচ্ছে করে, কিন্তু কীভাবে চিঠির উত্তর দিতে হয়, আমি জানি না!

— বাজে কথা বলবেন না!

— সত্যি বলছি! আমি উপন্যাস লিখতে জানি, চিঠি লিখতে জানি না।

— আপনি কখনো কারুকে চিঠি লেখেন নি ?

— তা লিখেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু যাকে আমি কখনো চোখে দেখি নি, যার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না—তাকে কি ধরনের চিঠি লিখতে হয়, আমি বুঝতে পারি না।

— আমিও তো আপনাকে দেখি নি, আপনাকে চিনি না। তবু আমি লিখলাম কি করে ?

— আমার লেখা-টেখা পড়ে তুমি আমার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে নিয়েছ, ভেবেছ, লেখকটিও বুঝি ঐসব উপন্যাসের নায়কের মতন। কিন্তু আমি তো তোমার সম্পর্কে সেটুকুও জানি না! তাছাড়া, এমন চিঠি লিখতে হবে যা তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই হয়তো পড়বে। সে রকম সর্বজনগ্রাহ্য চিঠি কি রকম হয় ?

— আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যদি আমাকে চিঠি লেখেন, আর কারুকে পড়াব না। সেটা হবে শুধু আমার নিজের।

— তাহলে তো প্রেমপত্র লিখতে হয়। তাতে রাজি ?

— যাঃ! আপনি ঠাট্টা করছেন! কেন, এমনি সাধারণ ভদ্রতার চিঠিও বুঝি লেখা যায় না ?

— হ্যাঁ, যায়। প্রথম-প্রথম আমি তাই লিখতাম। তাতেও পাঠক-পাঠিকারা রেগে যান। তাঁরা বলেন, যাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে এ-রকম মনে হয়, তাঁর চিঠি এত মামুলি ? এর থেকে চিঠি না লেখাই ভালো।

— তাহলে, আপনি যে বললেন, মণিকুন্তলা মজুমদার না কাকে পরশুদিনই চিঠি লিখেছেন!

— দু'একজনকে তো লিখি নিশ্চয়ই! যাদের চিঠির মধ্যে এমন কিছু থাকে, যা বুকের মধ্যে নাড়া দেয়—মনে হয় এইসব গল্প-উপন্যাস লেখা এবং বেঁচে থাকাটা সার্থক—তাদের উত্তর না দিয়ে পারি না।

— আমার চিঠির মধ্যে সে-রকম কিছু নেই বুঝি!

— আছে কি ?

— ওসব আমি জানি না। আপনি অন্তত দু'লাইনের হলেও আমাকে একটু চিঠি লিখবেন কী না বলুন ? কথা দিন, লিখবেন ?

উদাসীনভাবে হেসে অবনীশ বললেন, আচ্ছা লিখবো। ঠিক লিখবো।

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, অবনীশ নিজেই বুঝতে পারলেন। খুব সম্ভবত এই মায়া চৌধুরীর চিঠিটা তিনি জমিয়ে রাখেন নি। ইদানীং রাখেন না। কিন্তু মেয়েটিকে তা বলা যায় না, বিষম দুঃখিত হতো। ওর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে ও বুঝতে পারতো। বিদায় মায়া চৌধুরী!

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে অবনীশ আবার শ্বশুরবাড়িতে রুমাকে টেলিফোন করলেন। রুমা বেরিয়ে গেছে।

রিসিভার রেখে দিয়ে অবনীশ আবার এসে টেবিলে বসলেন। কলম খুলে তাকিয়ে রইলেন অর্ধ-সমাপ্ত রচনার দিকে। কয়লাখনির পরিবেশে একটা গল্প—কিন্তু সেই পরিবেশ থেকে অবনীশ অনেক দূরে সরে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর আবার যখন মনঃসংযোগ হলো, সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর জগৎ সাহা। ঘরে ঢুকেই জগৎ সাহা বললেন, ও মশাই শুনেছেন, আজ অ্যাসেম্বলিতে বাজেট পাস হয়ে গেছে। আমাদের ডি এ বাড়লো বারো টাকা করে—

অবনীশ বুঝলেন, আজ আর এখানে লেখাটা শেষ করার আশা নেই। লেখার প্যাড রেখে দিলেন ড্রয়ারে।

থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনের গল্প প্রতিযোগিতায় অবনীশ একটা গল্প দিয়েছিলেন। সেই গল্পই ফার্স্ট হয়। তার আগে অবনীশের কোনো ধারণাই ছিল না নিজের সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে। বন্ধুরা খুব হৈ-চৈ করল, ধর্মতলায় গিয়ে মোগলাই পরোটা খাওয়া হলো এই উপলক্ষে। তারপরেও কিন্তু বেশ কিছুদিন অবনীশ আর কিছু লেখেন নি। পরপর গল্প-কবিতা লিখে সম্পাদকদের দপ্তরে পাঠানো এবং ফেরত পাওয়া—অন্য লেখকদের জীবন যে-রকমভাবে শুরু হয়, অবনীশের ক্ষেত্রে সে-রকম ঘটে নি।

ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি নিয়ে পড়তে শুরু করার সময় অবনীশের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, বিলেত যাওয়া। অক্সফোর্ডে পড়বেন, জ্ঞানের তীর্থস্থান অক্সফোর্ড। ক্রমশ বুঝতে পারলেন, আজকাল অক্সফোর্ড যাওয়া কত শক্ত, স্কলারশিপ অনেক কমে গেছে, নিজস্ব প্রচুর টাকা থাকা দরকার। তাছাড়া বি.এ.-তে অবনীশের রেজাল্ট আশানুরূপ ভালো হয় নি।

ইংরেজির ছাত্র হলেও অবনীশ বাংলা সাহিত্য পড়েছিলেন ভালো করে। ছেলেবেলা থেকেই বই পড়া অভ্যেস। তাঁদের বাড়িতে প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল। কিন্তু অবনীশ কখনো লেখক হবার স্বপ্ন দেখেন নি। বরং অক্সফোর্ড যাবার সুযোগ না পেয়ে অবনীশ আফসোস করেছিলেন। কেন ডাক্তারি পড়লেন না। ডাক্তারদের পক্ষে বিদেশ যাবার সুযোগ আরও বেশি। বেশ কিছুদিন পর অবশ্য অবনীশের বিদেশ যাবার নেশা একেবারে ঘুচে যাবার পর একবার বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই বাংলা বিভাগের ছাত্ররা তাদের একজন ছাত্রকে মস্ত লেখক ভেবে খুব হৈ-চৈ করতো। সে-রকম তরুণ প্রতিভাবান লেখক নাকি বহুদিন দেখা যায় নি। অবনীশের সঙ্গে তখন রুমার পরিচয় হয়েছে, রুমাও সেই লেখকটির খুব ভক্ত। অবনীশ একটু ঈর্ষা বোধ করতেন। সেই বয়েসে যে নারীকে ভালবাসা যায়, তার সংস্পর্শে আসা অন্য যে-কোনো পুরুষ সম্পর্কেই ঈর্ষা ও রাগ হয়।

রুমাদের বাড়িতেই সেই লেখকটির সঙ্গে পরিচয় হল অবনীশের। কথাবার্তা বলেই তিনি বুঝলেন, বাংলার ছাত্র ও লেখক সেই ব্যক্তিটি অবনীশের চেয়েও বাংলা বই অনেক কম পড়েছেন। অবনীশের মনের মধ্যে একটা অবজ্ঞা জন্মালো। ভাবলেন, ওরকম লেখা আমিও ডজন-ডজন লিখতে পারি। পরপর দু'রাত্রি জেগে একটা গল্প লিখে ও তিনবার কপি করে শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন 'দেশ' পত্রিকায়। অবনীশের আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু সেই গল্পটি ছাপা হল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবনীশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। আড়াই মাস বাদে ফেরত এলো গল্পটি। অবনীশের আত্মসম্মানে দারুণ ঘা লাগলো। এ ঘটনা কেউ জানে না, তবু অবনীশের

মনে হয় সবাই যেন তাঁর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। অবনীশ এরপর ঠিক করলেন যে জীবনে আর এক অক্ষরও বাংলা লিখবেন না। লিখতে হলে ইংরেজিতে। কিন্তু দিন সাতেক বাদে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা কাগজ–কলম টেনে নিয়ে খসখস করে একটানা লিখে ফেললেন আর একটা গল্প। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল, তক্ষুনি পাঠিয়ে দিলেন পত্রিকায়। সেই গল্পের নাম 'বাঘের চোখ'। সেই গল্প পাঠকদের মধ্যে হৈ-চৈ জাগিয়ে তোলে। প্রশংসা যেমন হয়েছিল, নিন্দেও সেইরকম। কে এই নতুন লেখক? সেই বছরেই তিনটি পূজা সংখ্যায় লেখার জন্য আমন্ত্রণ আসে অবনীশের কাছে। কয়েকজন প্রবীণ লেখক অবনীশের খোঁজখবর করলেন পিঠ–চাপড়ানি ও উপদেশ দেবার জন্য।

অবনীশ কোথাও গেলেন না। এমনকি রুমাকেও প্রথম প্রথম বলতেন যে ঐ গল্প তাঁর লেখা নয়, তাঁর নামে অন্য কোনো লোকের। রুমা বেশ কিছুদিন সেটা বিশ্বাসও করেছিল।

এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই রুমাকে বিয়ে করে ফেললেন অবনীশ। সেই উপলক্ষে তাঁকে নিজের বাড়ি ছেড়ে আলাদা ফ্ল্যাট নিতে হলো। খরচ চালানো মুশকিল, বেশ তাড়াতাড়িই পেয়ে গেলেন একটা কলেজে লেকচারারের চাকরি। রুমার বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল। তাদের বাড়ির সবারই ইচ্ছে অবনীশ আই.এ.এস. পরীক্ষা দিক। কলেজের প্রফেসরি অন্য লোকেরা করলে ভালো দেখায়, নিজেদের লোকদের মধ্যে না করাই ভালো। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির কথা মতন জীবনযাত্রার মান ঠিক করার মতন পাত্র অবনীশ নন। চিরকালই তিনি জেদী। জেদ করে বললেন, পরীক্ষা দেবেন না। কানপুর কলেজে পাকা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে।

রুমার সঙ্গে মনোমালিন্য তখন থেকেই শুরু। কলকাতার বাইরে রুমার মন টেকে না। কানপুরের গণ্ডিবাঁধা জীবনে অধ্যাপকের বউ সেজে থাকা তার পক্ষে অসহ্য। অবনীশের সেই সময় ঝোঁক চাপে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘোরার। একটা বন্দুক কিনে প্রায়ই শিকারে যেতেন। রুমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু গ্রামে বা জঙ্গলে বাথরুম করার খুব অসুবিধা বলে রুমার ভালো লাগে না। অবনীশ একাই যেতেন, তিন–চারদিন তাঁর কোনো পাত্তা পাওয়া যেত না। রুমা উৎকণ্ঠা–উদ্বেগে সময় কাটাতো। একবার অবনীশ পাঁচদিন বাদে জঙ্গল থেকে ফিরলে রুমা তুমুল ঝগড়া করে এবং সেই রাত্তিরেই রাগের চোটে একা–একা কলকাতার ট্রেনে চেপে বসে। অবনীশ জানতে পেরে শ্বশুরবাড়িতে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন হাওড়া স্টেশনে রুমাকে রিসিভ করার জন্য। কিন্তু নিজে তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টা করলেন না। মাস দু'এক বাদে চিঠিপত্রে রুমার সুর বেশ নরম হয়ে আসায় অবনীশ কলকাতায় গেলেন, রুমা নিজের গরজে সঙ্গে এল। তিন-চার মাস বাদে আবার সেইরকম ঝগড়া, আবার কলকাতায় প্রস্থান।

রুমার সঙ্গে ঝগড়া ও কানপুরে একা থাকার সময়েই অবনীশের লেখার ইচ্ছে খুব প্রবল হয়ে ওঠে। এর আগে যে গল্প লিখেছেন, তা নিছক জেদের বশে। কিন্তু এখন তাঁর নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে সাহিত্যই হয়ে উঠল একমাত্র আশ্রয়। মনের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ জমে উঠেছিল, সেই রাগ থেকেই পৃথিবীতে কিছু চিহ্ন রেখে যাবার ইচ্ছে হয়।

অবনীশ সেই গল্পগুলো কলকাতার পত্র–পত্রিকায় পাঠাতে লাগলেন, ছাপা হবার পর অনেকে ভালো বলেছে বটে কিন্তু খুব একটা সাড়া জাগাতে পারে নি। তবে, রুমা সেই গল্পগুলো খুব মন দিয়ে পড়তো—এবং তার মধ্য থেকেই সে যেন আসল অবনীশকে চিনতে পারলো। মেয়েদের সম্পর্কে অবনীশের কি ধারণা, তারও খানিকটা আভাস পেল যেন। রুমার ধারণা হলো, মেয়েদের ব্যাপারে অবনীশ অত্যন্ত হিংস্র, অচেনা মেয়ের সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে কোনো দ্বিধা নেই—এবং এ পর্যন্ত অনেক মেয়ের সঙ্গেই যে তার সম্পর্ক হয়েছে, তাতেও সন্দেহ

নেই। যদিও অবনীশ মুখচোরা স্বভাবের মানুষ, রুমার বান্ধবীদের সঙ্গেও কখনো ভালো করে কথা বলে নি এবং রুমাকে বিয়ে করার আগে অবনীশ শিশুর মতন কাতরভাবে তার ভালবাসা চেয়েছে।

রুমা খুব অনুতপ্তভাবে, অনেকখানি চোখের জল মিশিয়ে চিঠি লিখল অবনীশকে। মাস দেড়েক তারা পরস্পরকে একটা লাইনও লেখে নি। রুমা জানতো, সে নিজে থেকে আগে না লিখলে অবনীশ কিছুতেই চিঠি লিখবে না।

অবনীশ দ্বিতীয়বার কলকাতায় গেলেন রুমাকে আনতে। রুমা অনেক কান্নাকাটি করলো, সারারাত জেগে গল্প করলো, কিন্তু কিছুতেই আর কানপুরে যেতে রাজি হলো না। সনির্বন্ধ অনুরোধ করল, অবনীশকে আবার কলকাতায় চাকরি নিতে।

কলকাতায় চাকরির বাজার তখন টাইট। অনেক চেষ্টায় একটি ব্যাঙ্কে জুনিয়ার অফিসারের চাকরি জুটল। কিন্তু অধ্যাপনার কাজে বাঁধা-ধরা সময় ছিল না। অনেক খোলামেলা জীবন ছিল—তার বদলে এই চাকরির জীবন বড় আঁটসাঁট। প্রথম সুযোগেই অবনীশ আবার এ চাকরি ছেড়ে অধ্যাপনায় ফিরে এলেন। তখন জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে, মাইনের সামান্য টাকায় সংসার চালানো খুবই কষ্টকর—রুমা আবার বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত। অবনীশ রীতিমতো অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়ে গেলেন। চিরকাল তাঁর মাথা উঁচু করে চলা স্বভাব! তাঁর সহকর্মীরা অনেকে নোট লেখে, টিউশানি বা কোচিং ক্লাস করে—অবনীশের ওসব পছন্দ হয় না। ওদিকে অবনীশের নিজের বাড়ির সঙ্গে যদিও যোগাযোগ নেই—কিন্তু তাঁর বাবা রিটায়ার করেছেন, সেখানে কিছু সাহায্য করা উচিত, ছোট ভাই-বোনদের পড়ার খরচ হিসেবে কিছু-কিছু দিলে ভালো হয়।

এই সময় একটি পত্রিকা থেকে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব আসে অবনীশের কাছে। বদলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। টাকার তখন খুবই দরকার—কিন্তু অবনীশ আগে কখনো উপন্যাস লেখেন নি, মনের মধ্যে একটু দ্বিধা ছিল। তবু রাজি হয়ে গেলেন। কানপুরের একটি চাষী পরিবারকে তিনি খুব ভালোভাবে লক্ষ করেছিলেন—তাদের দারিদ্র্য, তাদের সারল্য, তাদের বেঁচে থাকার সাহস অবলীলাক্রমে ফুটে উঠলো অবনীশের কলমে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি কিনে নিলেন বাংলা সিনেমার একজন প্রযোজক—এবং বাংলায় সেটি সার্থক হবার পর হিন্দি রাইটও বিক্রি হয়ে গেল। একটি দরিদ্র চাষী পরিবারের কাহিনী লিখে অবনীশ বেশকিছু টাকা পেলেন।

অবনীশের আচার-ব্যবহার হাব-ভাব দেখলেই মনে হয়, ইনি একটি অনিচ্ছুক সাহিত্যিক। সাহিত্য রচনা করার কোনো ইচ্ছেই এঁর নেই, নেহাত অন্য লোকে জোর করে লেখায়। অথচ অবনীশের প্রতিটি লেখার পেছনে থাকে অনেক পরিশ্রম, বহু বিনিদ্র রজনী তাঁকে কাটাতে হয় একটা লেখার জন্য। বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে কঠোর ও অভদ্র ধরনের মনে হয়, কিন্তু লেখার মধ্যে তিনি একেবারে অন্য মানুষ।

অবনীশের ছাত্র বয়েসে অন্য যে লেখকটি খুব নাম করেছিল তাঁর নাম অসিত মজুমদার। এই অসিত মজুমদারের খ্যাতি দিন-দিন বৃদ্ধি পায়—তিনি এখন রীতিমতন প্রতিপত্তিশালী লেখক, ইতোমধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। রুমা ছেলেবেলা থেকেই এই অসিত মজুমদারের ভক্ত এবং আশ্চর্যের বিষয়, এখনও সে অসিত মজুমদারের লেখাই বেশি পছন্দ করে। অবনীশ অহঙ্কারী ধরনের মানুষ, অন্য লেখকদের তিনি প্রায় গ্রাহ্যই করেন না—কিন্তু অসিত মজুমদার সম্পর্কে তিনি নিরন্তর ঈর্ষা বোধ করেন—এই ঈর্ষা তাঁর বুকের মধ্যে সবসময় ধিকিধিকি করে জ্বলে। অবনীশ একথা মুখে কখনো প্রকাশ করেন নি, কিন্তু মনে-মনে একটা

কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, অসিত মজুমদারের চেয়েও ভালো লিখে তাঁর খ্যাতি ম্লান করবেনই। তা হয় নি অবশ্য, অসিত মজুমদারের খ্যাতি এখনও জ্বলজ্বল করছে—তবে এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে অবনীশ রায়ের রচনাই বেশি প্রিয়।

অসিত মজুমদার বিয়ে করেন নি, বেশ লম্বা চেহারা, কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন ভালো। অবনীশের মতন গম্ভীর প্রকৃতির নন, লোকজনের মাঝখানে আড্ডা-গল্পে খুব জমিয়ে রাখতে পারেন। রুমার দাদা হীরকের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের বন্ধুত্ব, রুমাদের বাড়িতে এখনও আসেন প্রায়ই। রুমার মুখ থেকেই অসিতের নানা রকম খবরাখবর শুনতে পান অবনীশ।

একদিন রাত্রে বিছানায় অবনীশ আর রুমা আলিঙ্গনাবদ্ধ, অবনীশের একটা হাত ঘুরছে রুমার সারা দেহে, রুমা খুব নরম হয়ে গিয়ে আদর খাচ্ছে, সেই সময় রুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তুমি অসিতদার 'হৃদয় জ্বালা' উপন্যাসটা পড়েছ ?

অবনীশ বললেন, না পড়ি নি। কেন ?

— আমার দাদাকে অসিতদা এক কপি উপহার দিয়েছেন। এনে দেব ? তুমি পড়বে ?

— পড়তেই হবে ?

— তোমার পড়া উচিত।

অবনীশ একটু সচকিত হয়ে উঠে বললেন, কেন ? পড়া উচিত কেন ?

— বাঃ, তুমি তো আগে অনেক বই পড়তে। এখন কিছুই পড়তে চাও না কেন ?

— সে কথা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ এই বইটা পড়তেই হবে কেন ?

— তার কারণ, সবাই বলছে, তোমার 'সমুদ্রের সামনে একা' উপন্যাসটার সঙ্গে নাকি ওটার খুব মিল আছে।

— তা হতে পারে। কোন্‌টা আগে বেরিয়েছে ? আমার ঐ উপন্যাসটা তো বেরিয়েছে বছর চারেক আগে।

— সে-কথা হচ্ছে না। আমি তো তোমাকে বলি নি যে তুমি ওটা থেকে টুকেছ! অনেক গল্পই তো এক হতে পারে। দুটো বই একই বিষয় নিয়ে লেখা—কিন্তু অসিতদার লেখাটা অনেক ভালো হয়েছে।

— তাই বুঝি ?

— তোমার লেখা বড্ড গুরুগম্ভীর হয়ে যায়। অসিত মজুমদার কত সরল-স্বাভাবিকভাবে একেবারে ঘটনার গভীরে ঢুকে যেতে পারেন। আর একটা জিনিস, তুমি যাই বল আর তাই বলো, মেয়েদের চরিত্র তুমি ঠিক মতন ফোটাতে পার না। তুমি নীল শাড়ির সঙ্গে সবসময় নীল ব্লাউজ লিখবে। ম্যাচ করার ফ্যাশান আজকাল আর তেমন নেই—কন্ট্রাস্ট কালার ব্যবহার করতে যারা জানে—তুমি তো তাকিয়েও দেখ না আমি কখন কী পরি—অসিতদা এত ভালো জানেন !

— হুঁ।

— জানো, আমার সামনে যদি কেউ তোমার চেয়ে অসিতদার বেশি প্রশংসা করে তাহলে আমার খুব রাগ হয়।

— কেন ? অসিত মজুমদার তো ভালোই লেখেন শুনেছি।

অবনীশের হাত এখন আর রুমার শরীরে নেই। বরং খুব সাবধানে রুমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। রুমা সেটা বুঝতে পেরে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললো, তুমি রাগ করলে ?

অবনীশ শুকনো হেসে বললেন, না, রাগ করবো কেন ? আমি নিজেও তো অসিত মজুমদারকে ভালো লেখকই মনে করি।

—মোটেই উনি তোমার চেয়ে ভালো লেখেন না। তোমার লেখা একটু শক্ত, সবাই বুঝতে পারে না। তুমি একটু সোজা করে লিখতে পার না ? সেই জন্যেই তো তোমাকে বলছিলাম অসিতদার বইটা পড়তে। তাহলে তুমি বুঝতে পারতে—

—অসিত মজুমদারের লেখা পড়ে আমাকে লেখা শিখতে হবে ?

—বাঃ, আমি বুঝি তাই বললাম ?

—জানো রুমা, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে আমার সাহিত্য আলোচনা করতে একটুও ভালো লাগে না।

—আচ্ছা থাক তাহলে।

রুমা উঁচু হয়ে এসে অবনীশকে চুম্বন করলো। অবনীশের ঠোঁট ঠাণ্ডা। ক্লান্তভাবে বললেন, ঘুম পাচ্ছে আমার।

সাহিত্যের সঙ্গে বেশি জড়িয়ে পড়ে অবনীশ অনেক বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এক সময় তিনি ব্যাডমিন্টন খেলতেন—এখন কোনো খেলাধুলোতেই তাঁর মন বসে না। তাস খেলার আড্ডাতেও যেতেন খুব, কিছুদিন তাসের জুয়ার নেশা ধরেছিল—কিন্তু এখন আর সেই পুরনো সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না। সাহিত্যিকদের আড্ডাতে যেতেও তাঁর রুচি নেই। কলেজে যেটুকু সময় থাকতে হয় সেইটুকু সময় কাটিয়ে অবনীশ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন—সন্ধ্যার দিকে একা ঘুরে বেড়ান—এই শহরের শব্দ, গন্ধ, রং তাঁর অস্তিত্বে-মজ্জায় মিশে গেছে—কখনো পুরনো লাগে না। তাঁর লেখার সমস্ত বিষয়বস্তুও মাথায় আসে এই রকম একা-একা ঘোরার সময়।

তবু, বেশিক্ষণ একা-একা ঘুরতেও কারুর ভালো লাগতে পারে না। দৈবাৎ কখনো রাস্তায় কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, কিংবা কখনো কোনো অপরিচিত লোকও এসে বলে, আপনি অবনীশ রায়, না ? আপনার লেখা আমি...।

অবনীশ এইসব লোকের সঙ্গেও সহজ হতে পারেন না। ভদ্রতার হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে যান। নিজেই বুঝতে পারেন, তাঁর কোনো বন্ধু নেই—মনের কথা বলার মতন কেউ নেই—একমাত্র সাদা কাগজ ছাড়া। তাই সাদা কাগজের ওপর কালির অক্ষরে অবনীশকে সব কথা বলতে হয়।

লিখতে-লিখতেও মানুষের তো এক সময় ক্লান্তি আসে। মন হালকা করার জন্য কোথাও যেতে হয়। অবনীশের কোথাও যাবার নেই। একমাত্র মেয়েদের সংস্পর্শে এসেই অবনীশ খানিকটা উত্তেজনা বোধ করেন, লেখার ব্যাপারে বেশি প্রেরণা পান। কোনো মেয়ের সামান্য হাসি কিংবা মুখে দুঃখের একটা রেখা বা স্তব্ধ অভিমান তাঁর কল্পনাকে আন্দোলিত করে। মেয়েদের শরীরের রহস্যের শেষ নেই। কিন্তু অহঙ্কারী অবনীশ যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন না। গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে আলাপ করা কিংবা নিজের থেকে বেশি উৎসাহ দেখানোও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। কোনো সদ্য-পরিচিতা মহিলার হাত একটু ছোঁয়ার জন্য অবনীশের বুকের মধ্যে হয়তো আকুলি-বিকুলি করছে—কিন্তু অবনীশ বাইরে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে রাখেন।

রুমা আজকাল আর অবনীশের সেই তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। প্রায় এগারো বছর বিয়ে হয়েছে ওদের, দু'টি সন্তান হলেও রুমার স্বাস্থ্য এখনও চমৎকার, সেজে-গুজে সিনেমায় যেতে খুব ভালবাসে, কিন্তু অবনীশের মনের খোঁজ রাখে না রুমা। অবনীশের সার্থকতায় খুশি হয় কিন্তু ব্যর্থতার ভাগ নিতে পারে না।

দিন-দিন অবনীশের খ্যাতি বাড়ছে—কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একটা হাহাকারও বেড়ে যাচ্ছে। এক-এক সময় তাঁর মনে হয়, সাহিত্যিক না হয়ে সাধারণ চাকরিজীবী হলে বোধহয় তিনি সুখী হতেন। যেমনভাবে আর সবাই ঘর সংসার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সুখে থাকে। কিন্তু তাঁর পক্ষে আর উপায় নেই।

৪

সভা-সমিতিতে পারতপক্ষে যান না অবনীশ, তবে দু'একটা জায়গায় যেতেই হয়। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত প্রবীণ একজন ঔপন্যাসিক মারা গেছেন, তাঁর শোক-সভা। এই সভাতে না যাওয়া চূড়ান্ত অভদ্রতা। মঞ্চে ওঠার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও অবনীশ ওঠেন নি, দর্শকদের সঙ্গে পেছনের এক কোণে বসে আছেন।

নিছক নিয়মরক্ষার জন্যই আসা, নইলে এই ধরনের শোক-সভা অসহ্য লাগে অবনীশের। শোকের কোনো আবহাওয়াই নেই, দর্শকরা অনেকেই এসেছে অন্য সাহিত্যিকদের দেখতে, সিনেমাস্টার দেখার মতন। এক একজন বক্তৃতা করছেন প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে, তাতে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে যতো না কথা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে বক্তার নিজের সম্পর্কে। আশ্চর্য, এইসব বক্তার একবারও মনে পড়ে না যে এঁদের জন্যও একদিন এই রকম শোক-সভা হবে, সেদিন অন্য বক্তারাও এই রকম বাজে বকবে।

একমাত্র অসিত মজুমদারের বক্তৃতাই কিছুটা বুদ্ধিমানের মতন। অবনীশ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে ঐ ভদ্রলোক গুছিয়ে কথা বলতে জানেন। কিন্তু বক্তৃতার শেষে অসিত মজুমদার যখন রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন, তখন উঠে পড়লেন অবনীশ।

দরজার কাছে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতেই হয়, চট করে চলে আসা যায় না। দু'জন কবিকে দেখে মনে হলো, তাঁরা বেশ খানিকটা মদ্যপান করে এসেছেন, তাঁদের পা সুস্থির নেই। অবনীশের মনে হলো, শোক-পালনের এই রীতিটা মন্দ নয়। শোক-সভায় লম্বা-লম্বা বক্তৃতা করার চেয়ে মদ্যপান করে দুঃখিত হওয়া ভালো।

একজন কবি অবনীশের হাত চেপে ধরে বললেন, এই যে অবনীশদা, আপনার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না! আজ আপনাকে ধরেছি।

অন্য কবি সত্যি-সত্যি অবনীশকে জড়িয়ে ধরে বললো, চলুন।

অবনীশ বিব্রত হয়ে বললেন, কোথায় ?

— চলুন না, যেখানে আপনাকে নিয়ে যাবো, সেখানেই যেতে হবে।

— তবু কোথায় যেতে হবে, জানলে ভালো হতো না ?

— আরে চলুন তো আগে !

— কিন্তু আমাকে যে বাড়িতে যেতে হবে !

— বেশি বাড়ি দেখাবেন না! সবারই বাড়ি আছে—আমরাও বাড়ি যাবো। তার আগে চলুন, আপনি আজ আমাদের খাওয়াবেন।

অবনীশ আর কিছু বলার আগেই একটি মেয়ে এসে ওঁদের কাছে দাঁড়ালো। একটি ছোট খাতা একজন কবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, একটা অটোগ্রাফ !

কবি দু'জনেই চেহারায় বেশ পরিচিত। কলকাতার নানা সভা-সমিতিতে ওঁদের দেখা যায়, ওঁদের সম্পর্কে নানারকম রোমহর্ষক গল্প প্রচলিত আছে।

মেয়েটি কবি দু'জনের অটোগ্রাফ নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন একজন বললো, এই যে, ইনি অবনীশ রায়, এঁর নিয়েছেন ?

অবনীশের দারুণ অস্বস্তি লাগছিল। এ যেন তাঁর কাছ থেকে জোর করে অটোগ্রাফ নেওয়ানো। হয়তো মেয়েটি অবনীশ রায়ের নামই শোনে নি। কিংবা নাম শুনলেও, তাঁর লেখা পছন্দ করে না।

মেয়েটি স্থির চোখে অবনীশের দিকে তাকিয়ে খাতাটা এগিয়ে বললো, শুধু সই না, কিছু লিখে দেবেন।

অবনীশ শুকনো গলায় বললেন, এখন কিছু মনে আসছে না।

শুধু সই করে দিলেন।

মেয়েটি তবু অবনীশের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে-আস্তে বললো, আমার নাম মায়া চৌধুরী।

অবনীশ বললেন, ও।

— আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি নিশ্চয়ই। আমি আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম, চিঠিও লিখেছিলাম, উত্তর দেন নি।

অবনীশের সেই মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল। মেয়েটির দিকে এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। চওড়া লালপাড়ের সাদা শাড়ি পরে আছে মেয়েটি, বয়েস তেইশ বা চব্বিশ, সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু লম্বা, এক বেণি করা চুল, খুব একটা সুন্দরী নয়, তবু মেয়েটির চেহারায় একটা ছিমছাম লাবণ্য আছে। চোখের দৃষ্টি বেশ গাঢ়।

যে-কোনো কারণেই হোক মায়া চৌধুরীর চিঠি পড়ে বা টেলিফোনে তার গলা শুনে অবনীশ এই মেয়েটির চেহারা অন্যরকম আশা করেছিলেন। খুব ঝলমলে শাড়ি পরা, আরও কম বয়সের কোনো হালকা ধরনের মেয়ে।

অবনীশ একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি। আমি ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি।

— ঠিক আছে, আপনাকে আর উত্তর দিতে হবে না।

সেই দু'জন কবিদের মধ্যে একজন অবনীশের হাত ধরে টেনে ঈষৎ জড়িত গলায় বললো, অবনীশদা, চলুন, চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মায়া চৌধুরী জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আপনার বাড়িতে একদিন দেখা করতে পারি ? আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

অবনীশ কোনো উত্তর দেবার আগেই সেই কবি বলে দিল, হ্যাঁ যাবেন। যেদিন খুশি যাবেন—অবনীশদা সবসময় বাড়িতে থাকেন। এই প্রোজ লেখকদের নিয়ে আর পারি না।

অবনীশকে কবি দু'জন কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, যতো মেয়ে খালি গদ্য-লেখকদের পেছনে ঘুরবে! আমাদের কাছে তো কেউ আসে না। অথচ আমাদের যে মেয়ে-টেয়ে খুব দরকার, সেটা কেউ বোঝে না।

অবনীশ ওদের সঙ্গে গিয়ে বসলেন একটা চীনে দোকানে। খাবারের অর্ডারের আগেই হুইস্কির অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল। অবনীশ এক সময় একটু-আধটু মদ্যপান করেছেন। কানপুরে থাকার সময়ে জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে গ্রাম্য লোকের সঙ্গে তাদের ঘরে তৈরি ঝাঁঝালো দিশি মদও খেয়েছেন—কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো আকর্ষণ নেই। কলকাতায় ফিরে অনেকদিন খান নি। সেদিন ভাবলেন, মন্দ কী। এদের সঙ্গে মিশে একটু খেয়েই দেখা যাক না—যদি আনন্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু ঠিক খাপ খাওয়াতে পারলেন না ওদের সঙ্গে। ওরা দু'জন ঢকাঢক গেলাস শেষ করছে, কথা বলছে চেঁচিয়ে, হাসছে ঘর কাঁপিয়ে, একজন তো সরাসরি গান জুড়ে দিল। সেই তুলনায় অবনীশ কত আড়ষ্ট। তিনি যে শুধু একজন লেখকই নন, অধ্যাপকও, এবং দুই সন্তানের পিতা একজন দায়িত্ববান মানুষ—একথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। অথচ কখনো কখনো ভুলতে পারলে কত ভালো হতো।

অবনীশ আফসোসের সঙ্গে বললেন, আমার যদি তোমাদের মতন কবিতা লেখার ক্ষমতা থাকতো—তাহলে আমিও বোধহয় তোমাদের মতন এরকম জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু আমি জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখি নি।

কবি দু'জনেই অবনীশের চেয়ে বয়সে ছোট, তবু একজন অবলীলাক্রমে অবনীশের থুতনিতে আঙুল দিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, কবিতা লেখা কি সহজ নাকি ? সহজ ? এ কি প্রোজ, যে ভ্যাড় ভ্যাড় করে লিখে গেলেই হয়? কবিতা লেখার জন্য লাইফ রিস্‌ক্ করতে হয় বুঝলেন ? কবিতা লিখলে জীবনে আর কিছু পাওয়া যায় না। মাণিকবাবুরও কবিতা লেখার উইকনেস ছিল।

আর একজন হাসতে-হাসতে বললো, জানেন অবনীশদা, আপনি যে লেখক, এটা আমি লোকের মুখে শুনেছি। আপনার এক লাইন লেখাও আমি পড়ি নি। আমি গল্প-উপন্যাস পড়ি না।

অবনীশ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সুখী লোক। আচ্ছা, এবার তাহলে আমি উঠি ?

একজন কবি বললো, যাচ্ছেন কোথায় ? টাকা দিয়ে যান!

অপর কবি বললো, পকেটে যতো টাকা আছে, সব টাকা! আমরা আরও অনেক খাবো।

এই সময় অসিত মজুমদার সদলবলে এসে ঢুকলেন সেই দোকানে। কবি দু'জন হৈ-হৈ করে উঠলো, অসিত মজুমদার এগিয়ে এলেন সেদিকে। দু'খানা টেবিলে জোড়া লাগিয়ে সবাই একসঙ্গে বসা হলো। অবনীশ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অসিত মজুমদার তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আরে মশাই উঠলেন কেন, বসুন, বসুন। আপনার সঙ্গে আমার ভালো করে আলাপই হলো না। অথচ আপনার স্ত্রী রুমা, সে আমার ছোট বোনের মতন, এইটুকু বয়েস থেকে তাকে দেখছি।

অবনীশ সৌজন্যের হাসি হাসলেন। তাঁকে তখন যেতে দেওয়া হলো না। জোর করে টেনে বসানো হলো। অসিত মজুমদার একটুক্ষণের মধ্যেই টেবিল জমিয়ে দিলেন—টেক্কা দিয়ে মদ খেতে লাগলেন তরুণ কবিদের সঙ্গে। অবনীশের মনে হলো, এই লোকটির সত্যিই অনেক গুণ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ উনি বিয়ে করেন নি, অথচ মেয়েদের অনেক কিছু জানেন। এই রকম লোকেরই লেখক হওয়া মানায়।

অবনীশ টের পেলেন, মনের মধ্যে সেই ঈর্ষাটা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে অসিতকে। অথচ অসিতের গলা জড়িয়ে ধরে বন্ধুত্ব করতে পারলে কতো ভালো হতো! সাহিত্যিক হলে কি অন্যদের ঈর্ষা করতেই হবে ? অসিত মজুমদারের ব্যবহারের মধ্যে তো কোনো ঈর্ষা বা রাগের ভাব নেই। কিন্তু উনি কেন বললেন, রুমা ওঁর ছোট বোনের মতন। মিথ্যে কথা!

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে অবনীশ রুমাকে বললেন, আজ অসিত মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হলো।

রুমা বললো, তুমি মদ খেয়ে এসেছ ?

— তোমার অসিতদাই জোর করে বেশি খাওয়ালেন।

— জোর করে কেউ কারুকে খাওয়াতে পারে ?

— জোর করে আমার মুখে গেলাস চেপে ধরেন নি, একথা ঠিক। তবে, উনি অনেক করে বসতে বললেন।

—অসিতদাকে যা মানায়, তোমাকে তা মানায় না।

—কেন ?

—তুমি একটা কলেজে পড়াও, তোমার ছাত্র-টাত্র যদি কেউ দেখতে পেতো ? অসিতদার তো এ রকম ঝঞ্ঝাট নেই।

—আমি রাত্রিবেলা কী করবো না করবো—তাও কি ছাত্রদের দেখার বিষয় নাকি ? দেখলেই

বা।

—মাতালের মতন চেঁচিও না।

—তুমি কবি রবি সেনগুপ্তের নাম শুনেছ? শোন নি বোধহয়। সে-ও কিন্তু একটা কলেজে পড়ায়—মদ খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে গান করছিল।

—ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওদের কোনো দায়িত্বজ্ঞান আছে নাকি?

—রবি সেনগুপ্ত বিবাহিত। ছেলেমেয়েও আছে।

—ওদের সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করবে? তাছাড়া, মদ-টদ খেয়ে হৈ-হৈ করা—এই কি সাহিত্যিকদের যোগ্য কাজ নাকি! তারা মানুষের সুখ-দুঃখের কথা লিখবে—তাদের ওপর সমাজের কতোটা দায়িত্ব—আর তোমরা—

অবনীশ হাসলেন। লেখকের কি করা উচিত না উচিত, লেখক ছাড়া আর সবাই জানে। লেখকের স্ত্রীও জানে। হাসতে হাসতেই বললেন, তোমার অসিতদা সত্যি খুব ভাগ্যবান। এত রাত্তিরেও রবি সেনগুপ্তের কাঁধ ধরাধরি করে চলে গেলেন সারারাত কলকাতা ঘুরতে। আমি ও রকম পারি না, তুমি না বকলেও পারতাম না।

শাড়ি-ব্লাউজ ছেড়ে রাত্রিবাস পরে শুয়ে পড়েছে রুমা। অবনীশ সিগারেট ধরিয়ে একটা বই নিয়ে বসেছেন জানালার ধারে। রুমা জিজ্ঞেস করলো, এখন বই পড়বে? শুয়ে পড় না। অনেক রাত হয়েছে।

অবনীশ বললেন, না, একটু পড়বো। তোমার অসুবিধে হচ্ছে? যদি আলো নেভাতে চাও, আমি তাহলে বারান্দায় গিয়ে বসতে পারি।

—না, আমার অসুবিধে হবে না।

বইটা চোখের সামনে খোলা, কিন্তু অবনীশের পড়ায় মন নেই। দু'একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখছেন ঘুমন্ত রুমার দিকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে রুমার বুক দু'টি উঠছে নামছে। একগোছা চুল এসে পড়েছে গালের উপর। অবনীশের বুকের মধ্য চিনচিন করে উঠলো, হঠাৎ মনে হলো, রুমা যেন তাঁর এগারো বছরের চেনা স্ত্রী নয়, একজন অচেনা নারী। হঠাৎ ইচ্ছে করলেও অবনীশ ওর পাশে শুয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারবেন না।

হঠাৎ অসিত মজুমদারের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। একজন হাসিখুশি চমৎকার মানুষ। রুমার হীরো। শুধু মেয়েরা কেন, ছেলেরাও ওকে পছন্দ করবে। রুমা বলছিল, অসিত মজুমদারকে যা মানায়—অবনীশকে তা মানায় না। একথার মানে কি? এমন কি কিছু আছে, যা অবনীশকে মানায়—কিন্তু অসিতকে মানায় না? অসিতকে রুমা অনেক ছেলেবেলা থেকে চেনে, দাদার বন্ধু। তাহলে অসিতকেই কেন বিয়ে করলো না রুমা? হয়তো রুমার ইচ্ছে ছিল, অসিত এড়িয়ে গেছে। বিয়ের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মাথা না গলিয়ে সে মুক্ত মানুষ থাকতে চেয়েছে। অসিত কি রুমাকে কোনোদিন একটু-আধটু চুমু-টুমুও খায় নি? না খেয়ে থাকলে রুমার পক্ষে সত্যিই খুব দুঃখের কারণ হবে।

অবনীশ আর একটা ব্যাপারও টের পেল। অসিত মজুমদারকে ঈর্ষা করায় তাঁর ক্ষতির চেয়ে লাভই হয় বেশি। এটা সাহিত্যিক ঈর্ষা নয়, ব্যক্তিগত। অন্য কার কতখানি সুনাম হলো কিংবা কে বেশি টাকা রোজগার করলো, তাতে অবনীশের কিছু আসে যায় না, কিন্তু অসিতের কথা ভাবলেই তাঁর বুকের মধ্যে একটা চাপা রাগ এসে যায়—তার ফলে নতুন লেখার ইচ্ছেটা জোরালো হয়। ইচ্ছে হয় এমন একটা কিছু লেখার, যা পড়ে পাঠকরা হতবাক হয়ে যায়।

অবনীশের আরও মনে হলো, রুমা অনেকদিন রাগ করে বাপের বাড়ি যায় নি। এবার তাঁর দিক থেকেই একটা ঝগড়া লাগিয়ে কিছুদিনের জন্য রুমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে

কেমন হয় ? কয়েকটা দিন একলা থাকলে বেশ হতো। কিন্তু কোন্ ছুতোয় ঝগড়া লাগানো যায়? আর যাই হোক, অসিত মজুমদারের নাম করে কোনোরকম মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে অবনীশের রুচিতে বাধবে।

বই মুড়ে রেখে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। একবার তাকালেন রুমার শরীরের দিকে। পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে রুমা, তার নিটোল বুক ও বগলের চুল দেখা যাচ্ছে। অবনীশ শুতে গেলেন না, বারান্দায় গিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ে রইলেন অন্ধকারের দিকে।

৫

কয়েকদিন পরের একটি সকাল। সেদিন অবনীশের কলেজ বন্ধ। সকালে চা-টা খেয়ে, কাগজপত্র দেখা শেষ করে অবনীশ লিখতে বসেছেন। মাত্র পাতা দেড়েক লেখা এগিয়েছে এই সময় রুমা এসে বললো, এখন আর তোমার লেখা হবে না।

অবনীশ লেখা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, তোমার যদি কোনো কিছু আনাবার থাকে, তাহলে বিকেলে এনে দেব, এখন বেরুতে পারবো না।

রুমার মুখে চাপা হাসি। বললো, বেরুতে হবে না। বসবার ঘরে যেতে হবে।

—কেন ?

—একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—তুমি গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলো। আমি এখন ব্যস্ত।

—আমি তো এতক্ষণ কথা বললাম। বেশ মেয়েটি। কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে নি, তোমার কথাই শুনতে এসেছে, উঠে পড়। এমন কিছু জরুরি লেখা নয়—কাল লিখবে।

অবনীশ একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রুমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কি তোমার চেনা ? তোমাকে এত খুশি-খুশি দেখাচ্ছে কেন ?

—বাঃ, তোমার কাছে কোনো মেয়ে-টেয়ে এলে তো আমার খুশি হবারই কথা ! তার মানে, মেয়েরাও এখন তোমার বই পড়তে শুরু করেছে।

আগে বুঝি পড়তো না ?

—আমার চেনাশুনো কোনো মেয়েকে তো পড়তে দেখি না বিশেষ। এই মেয়েটিও আমার চেনা নয়। যাও, কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে বেচারাকে!

কাগজপত্র চাপা দিয়ে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। রুমা আবার হাসতে-হাসতে বললো, মেয়েটি দেখতে কিন্তু মন্দ নয়। তোমার ভালোই লাগবে। আমি একটু দেরি করে চা পাঠাচ্ছি।

মায়া চৌধুরী আজ গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি পরে এসেছে। খোঁপা বেঁধেছে যত্ন করে, সুগন্ধ আসছে শরীর থেকে। অবনীশ ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললো, নমস্কার।

অবনীশ বললেন, বসুন, বসুন !

দু'জনে বসলো মুখোমুখি দু'টি চেয়ারে। তারপর দু'এক মিনিট আর কোনো কথা নেই। অবনীশ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছেন, পাঞ্জাবির বোতাম লাগানো ছিল না—দেখা যাচ্ছিলো বুকের রোম, সেটা খেয়াল করে বোতাম লাগালেন। অন্যমনস্কভাবে ঠিক করলেন অবিন্যস্ত মাথার চুল। মায়া মুখ নিচু করে বসে আছে।

মুখ তুলে বললো, আপনাকে কি বিরক্ত করলাম?

—না, না !

মায়া এবার লাজুকভাবে হেসে বললো। তারপর বললো, ভেবেছিলাম, আপনাকে কতো

কথা বলবো—অথচ এখন কিছু মনেই আসছে না। মানে, আমি কোনো দরকারি কথা বলতে আসি নি, এমনিই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে—

অবনীশ বললেন, আলাপ করতে এলে সহজে আলাপ করা যায় না। এমনি-এমনি যখন আলাপ হয়ে যায়—তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো সেদিন আমার আলাপ হয়েই গেছে।

—কিন্তু এখন যে-কোনো কথা বলতে পারছি না!

—পারবেন। একটু সময় যাক। আপনি কোথায় থাকেন?

—নিউ আলিপুর। আপনার বাড়ি খুঁজে পেতে কিন্তু বেশ কষ্ট হয়েছে। এ পাড়ার লোক জানেই না যে আপনি এখানে থাকেন। যাকেই জিজ্ঞেস করি—

—তা নয়। আপনি আশা করেছিলেন, আমার নাম শুনলেই সবাই চিনতে পারবে। তা তো হয় না। এ দেশের শতকরা তিরিশজন কোনোরকম লেখাপড়া জানে, তাদের মধ্যে বড়জোর পাঁচজন গল্পের বই পড়ে—আমার বই পড়ে হয়তো একজন, ছেলে-ছোকরারা হয়তো বলতে পারতো—আপনি নিশ্চয়ই সাহস করে ইয়াং ছেলেদের জিজ্ঞেস করেন নি।

—আমি দুটো দোকানে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—কোনো দোকানে আমার ধার নেই। তাই দোকানদাররা আমার নাম জানে না।

মায়া হেসে বললো, আপনার বাড়ির লেটারবক্সেও আপনার নাম নেই। পিওনরা নিশ্চয়ই আপনাকে চেনে?

—তা চেনে।

—আপনি কি অনেক চিঠি পান?

—অনেক না, কিছু-কিছু।

—কেন লোকে আপনাকে চিঠি লেখে? কারুর উচিত নয় আপনাকে চিঠি লেখা।

কিছু না বলে অবনীশ হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। ওর মুখে স্পষ্ট অভিমানের রেখা। বেশ দেখাচ্ছে। অবনীশের ইচ্ছে হলো যে বলেন, বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে। তুমি মুখটা আর একটু উঁচু কর, তোমার চোখ দুটো ভালো করে দেখি।

তার বদলে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ছাত্রী?

—কেন বলুন তো?

—এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।

—ছাত্রীও বলতে পারেন, নাও বলতে পারেন। আমি এবার এম. এ দিয়েছি, এখনো রেজাল্ট বেরোয় নি—সুতরাং এখনও ছাত্রী।

—আর রেজাল্ট বেরিয়ে গেলেই বেকার কিংবা বিয়ের কনে!

মায়া অন্যমনস্কভাবে জানালার দিকে তাকালো। হাঁটুর কাছে শাড়ি প্লেন করতে লাগলো হাত দিয়ে। তারপর বললো, আপনি যদি আমাকে তুমি বলতেন, আমার ভালো লাগতো।

—আরও কিছুদিন চলুক। তারপর যদি হঠাৎ বেরিয়ে যায়—

—বউদি আসবেন না? বউদির সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো।

—চা দিতে আসবেন। আমার স্ত্রী বুঝে গেছেন যে আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আসেন নি—আমার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছেন।

—কিন্তু আপনি তো কিছু বলছেন না।

—কী বলবো?

—বাঃ, আপনার কাছ থেকে কতো কী শুনতে এলাম।

—কি বলবো, সেটা বলে দিন।

—বাঃ, আপনি লেখক আর আপনাকে আমি বলে দেব!

—কোনো-কোনো লেখক খুব জমিয়ে গল্প করতে পারেন বটে, কিন্তু আমি একদম পারি না।

—আচ্ছা, কার–কার লেখা আপনার ভালো লাগে ?

—কার লেখা ভালো লাগে ? শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ।

—যাঃ, ওঁদের কথা বলছি না। এখনকার, মানে সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত মজুমদার—এঁদের লেখা আপনার ভালো লাগে?

অবনীশ ধীরে-সুস্থে সিগারেট ধরিয়ে বেশ সময় নিয়ে বললেন, আপনার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওঁদের কারুর একটাও লেখা আমি পড়ি নি। সমসাময়িকদের লেখা আমি পড়ি না—আপনার কেমন লাগে ওঁদের লেখা ?

—বলবো না।

—কেন ?

—তার কারণ আপনার পছন্দ হবে না। আমি একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু বলে দিয়েছিল, কোনো লেখকের কাছে গিয়ে কক্ষনো অন্য কোনো লেখক সম্পর্কে আলোচনা করতে নেই। কেউ পছন্দ করেন না।

অবনীশ হাসতে-হাসতে বললেন, বাঃ, আপনার বন্ধু তো অনেক কিছু জানে। ছেলে না মেয়ে?

একটু ইতস্তত করে বললো, ছেলে।

—মেয়েদের বুঝি ছেলে–বন্ধু থাকে ?

—কেন, থাকতে নেই বুঝি ?

—থাকে না। ইংরেজিতে যাকে বয়ফ্রেন্ড বলে, তা থাকতে পারে। এছাড়া মেয়েদের থাকে শুধু প্রেমিক অথবা গুটিকতক দাদা—অমুকদা, তমুকদা—বন্ধু থাকা অসম্ভব।

—আমি আপনার কথা মানি না।

—মানতে হবে না। এটা আমার ধারণা।

—আপনাকে আমি কতো বছর ধরে চিনি জানেন ?

অবনীশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে আগে থেকে চিনতেন ? তার মানে ?

—ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, লেখার মধ্য দিয়ে। আপনার প্রথম লেখা, সেই যে, 'বাঘের চোখ'—তারপর থেকে আপনার প্রত্যেকটি লেখা আমি পড়েছি।

—আমার স্ত্রীর ধারণা, মেয়েরা আমার লেখা একেবারেই পড়ে না।

—আপনার 'সমুদ্রের সামনে একা' উপন্যাসটা আমি প্রত্যেক মাসে একবার করে পড়ি। আমার এতো ভালো লাগে—

—লেখার প্রশংসা শুনলে আমার ভালোই লাগে, কিন্তু সামনাসামনি কেউ বললে লজ্জা পাই। আপনি অন্য কথা বলুন।

রুমা নিজে আসে নি, চাকরের হাত দিয়ে চা আর মিষ্টি পাঠিয়েছে। অবনীশ অনুরোধ করে মায়াকে সব ক'টা মিষ্টি খাওয়ালেন—ফিগার–কনসাস মেয়েরা সহজে তো খেতে চায় না। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অবনীশ বললেন, আপনার মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে অন্য কিছু একটা কথা বলতে এসেছিলেন, সেটা কিন্তু এখনও বলেন নি।

—আমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ। সেদিন সন্ধেবেলা সেই মিটিংয়ের পরও তাই মনে হয়েছিল।

—আপনি বুঝি মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারেন ?

—কিছুটা।

—সত্যিই আপনাকে অন্য একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম—কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না আপনাকে বলা উচিত কিনা।

—আরও কয়েকদিন না হয় ভেবে দেখে ঠিক করুন।

—আসলে ব্যাপার কি জানেন, আমার যদি কোনো একটা ব্যাপারে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জমে—সে সম্পর্কে আলোচনা করার মতন কেউ নেই আমার।

— কেন, আপনার সেই ছেলে বন্ধু ? আমার চেয়ে তিনিই তো আপনার সমস্যা ভালো বুঝতে পারেন ?

—ব্যাপার তাঁর সম্পর্কেই।

অবনীশের হাতে ঘড়ি নেই, আড়-চোখে মায়ার হাতের ছোট ঘড়িতে সময় দেখার চেষ্টা করলেন। নিশ্চয়ই একটি প্রেমের কাহিনী শুনতে হবে। একজন লেখকের কাছে কোনো মেয়ে তার প্রণয়-ঘটনা শোনাতে পারে—কারণ, লেখকরা এরকম কত ঘটনা বানাতে পারেন, কতো নায়ক-নায়িকার সমস্যা মিটিয়ে দেন। কিন্তু এই মুহূর্তে অবনীশ তো লেখক নন, একজন পুরুষমানুষ। একজন পুরুষ কি কোনো মেয়ের মুখে অন্য কোনো পুরুষকে ভালবাসার কথা শুনতে চায় ? পুরুষমানুষ বড় অতৃপ্ত। এই পৃথিবীর সমস্ত নারীকে পেলেও তার তৃষ্ণা মেটে না।

—সবটা শুনলে আপনি অনায়াসে একটা গল্প লিখে ফেলতে পারবেন।

—না, পারবো না! অন্য লোকের মুখে কোনো কাহিনী শুনে আমি প্লট বানাতে পারি না।

—সবকিছুই কি বানিয়ে-বানিয়ে লেখেন ? চোখের সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছেন, তাদের নিয়ে গল্প হয় না ?

—চোখের সামনে কতটুকু দেখতে পাচ্ছি ? উপন্যাসের নায়িকা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধে, তখন লেখক তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্তির বেলা একা শুয়ে-শুয়ে সে যখন মন খারাপ করে, তখনও লেখক তা দেখছে। এমনকি, সে যখন স্নান করছে তখনও যেন বাথরুমে ঢুকে লেখক দাঁড়িয়ে থাকে তার খুব কাছাকাছি। তার মুখের রেখার সামান্য বদলও তার চোখে পড়ে। বাস্তবের কোনো মেয়ে কি লেখককে সেই সুযোগ দেবে ?

এতটা খোলাখুলি কথা শুনে মায়ার মুখ লজ্জায় আরক্ত হলো। ছোট্ট রুমাল বার করে মুখ মুছে বললো, গল্প লেখার দরকার নেই। আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপারে সাহায্য চাই। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?

—বলুন ! যদি পারি—

—ব্যাপারটা কি জানেন, এই ব্যাপারটা এতোই আমার নিজস্ব আর গোপন—যে অন্য কারুকে তা বলা যায় না। অথচ আমি একটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়েছি—কারুর কাছ থেকে মতামত নেওয়া খুব দরকার। আপনার লেখা এতো পড়েছি, আপনার চিন্তার সঙ্গে আমার এমন মিলে যায় যে আপনাকে আমার খুব কাছের মানুষ মনে হয়। তাই অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম—আপনার কাছে এসে যদি খুলে বলা যায়—

—লেখকরা কিন্তু ডাক্তার নয়। কোনো সমস্যার সমাধান করার সাধ্য তাদের নেই। দেশের সমস্যাও না, কারুর ব্যক্তিগত সমস্যাও না। উপন্যাসের মধ্যে তারা নিজে-নিজেই সমস্যা তৈরি করে, নিজেই আবার তা মিটিয়ে দেয়। এসব সমস্যা সর্বজনীন, কারুর ব্যক্তিগত নয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তবু শুনে দেখি। আপনি একটি ছেলেকে ভালবাসেন—আপনার বাবা-মায়ের খুব আপত্তি।

—তার মানে ?

—আপনার বয়েসী মেয়েদের ভালবাসার সমস্যা এসব থেকেই আরম্ভ হয়।

—না, ব্যাপারটা ওরকম নয়। ভালবাসার ব্যাপারও নয়। একটি ছেলে, তার আসল নামটা বলছি না—কারণ আছে। ধরুন তার নাম ইয়ে, মানে প্রশান্ত।

—না। ঐ নামটা চলবে না। ঐ নামে আমার একজন বন্ধু আছে। নাম দেওয়া যাক রঞ্জন।

—আচ্ছা রঞ্জন। সে আমার থেকে দু'বছরের বড়। নিউ আলিপুরে আসবার আগে আমরা ভবানীপুরে একটা বাড়িতে থাকতাম—সেই বাড়িতেই আমার জন্ম। সে বাড়ির পাশের বাড়িটা রঞ্জনদের। জন্ম থেকেই আমি রঞ্জনকে চিনি। ওর বাবা বেশ নাম-করা উকিল। নাম শুনলেই আপনি চিনবেন। ওর এক মামা দিল্লীতে—

—না, মামা-টামা সম্পর্কে শুনতে চাই না। মেয়েদের গল্পে বড্ড অপ্রাসঙ্গিক জিনিস থাকে। তার বদলে আমার জানা দরকার, এই ছেলেটিকে, অর্থাৎ রঞ্জনকে কি আপনি নাম ধরে ডাকেন, না দাদা-টাদা বলেন ?

—নাম ধরেই ডাকি। ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে খেলা করেছি—কতদিন দুপুরে একসঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়েছি—মানে যখন খুব ছোট ছিলাম।

অবনীশের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঁকি মারলো, বড় হয়েও কি একসঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়েছেন ? কিন্তু এ প্রশ্ন করা যায় না, মেয়েটি আহত হবে। বলিলো, তারপর ?

—দু'জনে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে রকম প্রেম হয়—আমাদের সে রকম কিছু হয় নি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ও বরং একটি মেয়ের সঙ্গে কিছুদিন প্রেম করেছিল। তাও বেশিদিনের জন্য নয়। মানে, আমরা দু'জনে খুব কাছাকাছি ছিলাম। ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মত্ত হয়ে থাকলেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। বছর দু-এক ধরে একদম যোগাযোগ ছিল না অবশ্য। হঠাৎ খবর পেলাম ও ধরা পড়েছে, জেলে আছে।

—জেলে ?

—হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, চুরি-ডাকাতি এসব কিছু করেছে ? এমনিতে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।

—ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, অর্থাৎ উগ্রপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল ?

—আগে ওর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্কই ছিল না, এমন কী কলেজেও। ইউনিভার্সিটিতে গিয়েই—

—শুনুন একটা কথা বলি। উগ্রপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওঁরা ওঁদের প্রোগ্রাম প্রকাশ্যে জানান নি—ওঁদের নীতি নির্ধারিত হয় গোপনে—সুতরাং এ ব্যাপারে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। কী বললে ওঁরা খুশি হবেন বা হবেন না—আমি জানি না। হঠাৎ কোনো এক সকালে কেউ এসে কুচ করে আমার গলাটা কেটে দিলে আমার মোটেই পছন্দ হবে না।

—আপনাকে ওরা মারবে কেন ?

—যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেকের সম্পর্কেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। সে যাক, আমি রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না।

—আপনাকে রাজনীতি বিষয়ে কিছু বলতে বলছি না। আপনার সঙ্গে আলোচনা করছি মানুষের জীবন বিষয়ে। তাছাড়া, এই কথা আর কেউ জানবে না।

—ঠিক আছে, বলুন।

—ও জেলে থাকে খবর পেয়ে প্রথমটায় আমার খুব রাগ হয়েছিল। তারপর ভয় হলো। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, বিভিন্ন জেলে বন্দী পালানোর মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এইসব

ছেলেদের পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে? সেজন্য কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না—এমনকি আপনারা লেখকরাও কোনো প্রতিবাদ করেন নি।

অবনীশ কিছু একটা মন্তব্য করতে গিয়েও থেমে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, তারপর বলুন!

—না বলুন, আপনারা কেন প্রতিবাদ করছেন না?

—আমি প্রতিবাদ করি, মনে-মনে। যে-কোনো অজুহাতেই মানুষকে মেরে ফেলার প্রতিবাদ করি আমি। আমার সব লেখার মধ্যেও সেই প্রতিবাদ আছে, আমি মনে করি।

—মনে-মনে করার কোনো মূল্য নেই। কেউ তো আপনার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে যাচ্ছে না।

—আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করতে আসেন নি?

—আপনি রাগ করছেন?

—না। তবে একটু আগেই যা বললাম, মেয়েরা কোনো ঘটনা বলতে গেলেই অনেক কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে আনে।

—যাই হোক, ও মরে যাবে এটা আমি ভাবতেই পারি না। ওর সঙ্গে আমার জীবনটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে ও নেই একথা কল্পনা করাও অসম্ভব। আমি ওর সঙ্গে জেলখানায় একদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ওর মাও গিয়েছিলেন।

—ওর মায়ের কান্নাকাটির বিবরণ দেবার দরকার নেই। সেটা আমি বুঝে নেব।

—ওর মা একটুও কাঁদেন না। তিনি অত্যন্ত শক্ত মহিলা। আচ্ছা আমি সংক্ষেপে বলছি। রঞ্জন জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু লুকিয়ে আছে। পাড়ায় ঢোকা ওর পক্ষে অসম্ভব। ওর বিরুদ্ধ-পার্টির ছেলেরা ওকে পেলে ছাড়বে না।

—কিংবা ও যাদের খুন করেছে, তাদের আত্মীয়-স্বজন।

—ও কারুকে খুন করে নি, সেটা আমি খুব ভালোভাবেই জানি।

—অন্যদের নির্দেশ দিয়েছে খুন করার জন্য। তাতে বোধহয় গ্লানি কম হয়।—তারপর?

—রঞ্জন আমাকে বিয়ে করতে চায়।

—খুব ভালো কথা।

—পুলিশের অত্যাচারের পর ও অনেকটা বদলে গেছে। ওর মনটা এখন শিশুর মতন নরম। বাচ্চাদের মতন আবদার করে। ও কোনদিন আমাকে ভালবাসা-টাসার কথা বলেনি। কিন্তু সেদিন বললো, ও আমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে, আমাকে বিয়ে করলেই ওর জীবনটা বদলে যেতে পারে। বুঝতেই পারছেন আমার বাবা-মা এতে রাজি হতেই পারেন না—সেটাও না হয় গেল—কিন্তু ও যে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাতেই আমার ভয় হয়। পাড়ার ছেলেরা যদি জানতে পারে—অথচ ও যে কতো ভালো ছেলে, আপনি ওর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারতেন। ওর নামে কোর্টে কেস ঝুলছে, নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারে না—এই অবস্থায় বিয়ে করার কোনো প্রশ্ন আসে না অথচ ও যেন পাগলের মতন হয়ে গেছে—সবসময় আমাকে কাছে না পেলে ও কিছুতেই থাকতে পারবে না বলছে—আবার তাহলে হিংসার রাজনীতি করে নিজের প্রাণ বিপন্ন করবে। এখন আমি কী করবো বলতে পারেন?

অবনীশ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে জানেন। এক্ষেত্রে আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই।

—আমার কাছে আছে। আমি আপনার মতামত শ্রদ্ধা করি।

—আমার লেখার মতামত, না মানুষ হিসেবে আমার মতামত?

—দুটো কি আলাদা ? আপনার উপন্যাসের কোনো নায়িকা যদি এই অবস্থায় পড়তো, তখন আপনি কী করতেন ?

—উপন্যাসের কথা থাক। উপন্যাসে আমি কলমের খোঁচায় কারুকে মেরে ফেলতে পারি, কারুকে অন্ধ করে দিতে পারি—তাতে কারুর কিছু যায় আসে না। কিন্তু জীবন্ত মানুষ নিয়ে এসব ছেলেখেলা চলে না।

দু'জনেই চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। অবনীশের মুখখানা কঠিন, যেন তিনি শুধু ভদ্রতা করে এই কাহিনী শুনছেন, তাঁর মনে কোনো আলোড়ন উপস্থিত হয় নি।

মায়া বললো, আমি কি আপনার সময় নষ্ট করছি ?

অবনীশ বললো, না, না, তা নয়। আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না।

—তবু আপনি বলুন, আমার কী করা উচিত ?

—আমি কিচ্ছু বলবো না।

—বলবেন না ?

—না। কারণ, আমি যা-ই বলি না কেন, তার ফলে আপনার জীবনে যদি কোনো আঘাত আসে, তাহলে কি আমিও কষ্ট পাবো না ? আপনি রঞ্জনকে বিয়ে করলেও আঘাত পেতে পারেন, না করলেও আঘাত পেতে পারেন, সুতরাং আমি কি বলবো ?

—কিন্তু আমাকে তো একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—হ্যাঁ, আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর কেউ সেটা আপনার হয়ে করে দিতে পারবে না।

—কিন্তু আমি যে বড্ড দুর্বল, নিজে কিছু ঠিক করতে পারি না। ভেবেছিলাম অন্তত একজন কেউ আমাকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেবে।

—আমি সেই মানুষ নই।

—জানেন, আমি যে ওকে ঠিক ভালবাসি, তাও নয়। ও যদি অন্য কারুকে বিয়ে করতো, আমি একটুও দুঃখিত হতুম না। কিন্তু ও এমন পাগলামি করছে। ওকে কষ্ট দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব।

—আপনারা দু'জনেই আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারেন না ?

—ও কিছুতেই শুনবে না। একটা দিনও অপেক্ষা করতে চায় না। ওর এখন পশ্চিম বাংলায় না থেকে বাইরে কোথাও থাকাই নিরাপদ। কিন্তু আমি সঙ্গে না গেলে ও যাবে না।

—বিয়ে না করেও আপনি ওর সঙ্গে কোথাও কিছুদিন থেকে আসতে পারেন না ?

—বাঙালি মেয়েরা বুঝি তাই পারে ?

—পারে না ? কেন, অসুবিধেটা কি ?

—আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন, সেটা সম্ভব নয়।

—বাধাটা কোথায় ? সামাজিক ? না আপনার মনে ?

—দুটোই।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মায়া বললো, আচ্ছা, আমি চলি। শুধু-শুধু আপনার এতোটা সময় নষ্ট করলাম। আমি ভেবেছিলাম, আপনি আমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারেন।

অবনীশ দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সে ক্ষমতা নেই।

—আমি যাচ্ছি তাহলে।

—আর একটু বসুন।

—আমার আর বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

পর্দার ওপাশে রুমাকে বেশ কয়েকবার হাঁটা-চলা করতে দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলা—রুমার তো কৌতূহল হবেই।

৬

দু'তিন দিন পর অবনীশ হঠাৎ খেয়াল করলেন, রঞ্জন নামের ঐ ছেলেটির কথা তিনি প্রায়ই ভাবছেন। একটি ছেলে পলাতক জীবন-যাপন করছে, যে-কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু আসতে পারে—ছেলেটি তার বাল্য-সঙ্গিনীকে বিয়ে করে শান্তি খুঁজতে চাইছে। ছেলেটির সম্পর্কে অবনীশের সহানুভূতি না এসে পারে না। আহা, ওরা যদি সুখী হতে পারতো। একটি পুরুষ এবং একটি নারী পরস্পরকে পেয়ে সুখী—এর চেয়ে বেশি আনন্দের কোনো দৃশ্য পৃথিবীতে আর নেই। রঞ্জনকে নিয়ে কোনো গল্প লিখলে অবনীশ নিশ্চয়ই মায়ার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দিতেন। কিন্তু জীবন অন্যরকম—মৃত্যু আজকাল ছেলেখেলা হয়ে গেছে।

—ছেলেটির নাম আসলে রঞ্জন নয়—অন্য কিছু। ছেলেটির চেহারা কি রকম মায়া সে কথাও বলে নি। অনুমান করা যায়, ছিপছিপে চেহারার একটি যুবক। তার স্নায়ু সবসময় সতর্ক—সে সবসময় মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চাইছে ভালবাসার বদলে। ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে মন্দ হতো না। ছেলেটি কি দেখা করতে চাইবে ? তাছাড়া, অবনীশ মায়ার ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার কিছুই রাখেন নি। রঞ্জন এবং মায়ার কথা অনবরত মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল বলে অন্য লেখায় মন বসলো না অবনীশের।

রুমাদের বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল অসিত মজুমদারের সঙ্গে। রুমার দাদা হীরক অসিত মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেন তুই-তুই করে। যদিও অবনীশকে বলেন তুমি। এদিকে অসিত মজুমদার অবনীশের চেয়ে দু-তিন বছরের বড়।

হীরকের ছেলের মুখে-ভাত। খুব ধুমধাম করে খাওয়ানো হচ্ছে। অসিত মজুমদার অনেক খরচ করে উপহার এনেছেন একটা রুপোর থালা। এ বাড়িতে অসিত মজুমদারকে সবাই খুব খাতির করে। বিয়ের আগে অবনীশ এসব জানতেন না। রুমার সঙ্গে দেখা হতো বাইরে-বাইরে। রুমা তখনও অসিতের কথা বলতো মাঝে-মাঝে—সে তো মেয়েরা অনেক সাহিত্যিক নিয়েই এ রকম কথা বলে থাকে। কিন্তু এক বাড়িতে দু'জন লেখকের আনাগোনা অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়।

অসিত মজুমদার রুমাকে দেখে বললেন, কী রে রুমা, তোদের বাড়িতে একদিনও আমায় নেমন্তন্ন করলি না ? তোর কর্তা তো যা গম্ভীর—কথাই বলতে চায় না !

রুমা বললো, বাঃ, ওর সঙ্গে আপনার একদিন নাকি খুব আড্ডা হয়েছে ? অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরলো।

— সে তো আমিই একলা গল্প করলাম। উনি তো কিছুই বলে নি।

— অসিতদা, আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে আর ড্রিঙ্ক করবেন না। ওর ওসব সহ্য হয় না।

— বাঃ, তোর বর কি ছেলেমানুষ নাকি ? মাঝে-মাঝে একটু-আধটু করলে কী হয় ?

— অত রাত করে বাড়ি ফিরলে আমার ভয় করে।

অবনীশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে। যেন সত্যিই ওরা অবনীশকে ছেলেমানুষ ভেবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করছে।

অসিত মজুমদার আবার রুমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কবে খাওয়াচ্ছিস বল্ ? নাকি খাওয়াবি না ?

অবনীশ এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললেন, সত্যিই একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে। কবে আসবেন বলুন ? আপনি যা ব্যস্ত থাকেন !

অসিত মজুমদার বললেন, কিচ্ছু ব্যস্ত নয়। খাওয়ার নেমন্তন্ন পেলে আমি সব কাজ ফেলে রাখতে পারি। তাহলে এই শনিবার ?

অবনীশ বললেন, হ্যাঁ, শনিবারই ভালো। রুমার দিকে তাকালেন। রুমাও বললো, শনিবারই ভালো।

অসিত রুমাকে বললেন, বেশি কিছু আইটেম দরকার নেই কিন্তু। তুই নিজে হাতে যা রান্না করবি, শুধু তাই। আমি ভোজন-রসিক কিন্তু পেটুক নই। আর কে আসবে ? তোর দিদি-জামাইবাবুকেও বল্।

রুমার দিদি জামাইবাবু সে শনিবার আসতে পারলেন না, সেদিন তাঁদের অন্য জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল। অসিত মজুমদার একলাই এলেন। হাতে বিরাট এক বাক্স কেক নিয়ে। ব্যাচিলর মানুষ, রোজগারও প্রচুর—তাই এরকম দিলদরিয়া হতে পারেন। লজ্জিতভাবে কেকের বাক্সটা রুমার হাতে দিয়ে বললেন, তোর ছেলেমেয়ের জন্য নিয়ে এলাম।

ছেলেমেয়েকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে রুমা। ঘরদোর তকতকে করে সাজিয়েছে, খাবার টেবিলের ফুলদানিতে এক ঝাঁক গোলাপ ফুল। রুমাও সেজেছে খুব সুন্দরভাবে—সাজতে-গুজতে সে ভালবাসে।

কথায়-কথায় অসিত মজুমদার অবনীশকে বললেন, আপনার কাছে মায়া চৌধুরী বলে একটা মেয়ে এসেছিল ? আমাকে বললো সেদিন।

অবনীশ একটু চমকে উঠেছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ।

অসিত রুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েটি তো অবনীশবাবুর দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছে। দেখিস রুমা, তোর বরকে সামলে রাখিস ! মেয়েটি দেখতেও বেশ।

রুমা বললো, হ্যাঁ, আমি দেখেছি মেয়েটিকে। আপনিও ওকে চেনেন বুঝি ?

—হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে চিনি। আমার বাড়িতে যায় মাঝে-মাঝে। আমার মা তো একবার ভাবলেন, ঐ মেয়েটিকেই তাঁর পুত্রবধূ করে ফেলবেন। আমি স্রেফ জানিয়ে দিলাম, বিয়ে-ফিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না।

—কেন, বিয়ে করবেন না কেন ?

—আমার ভাই অতো সাহস নেই। তাছাড়া, আমার মনে হয় লেখক-শিল্পীদের বিয়ে না করাই উচিত।

রুমা অবনীশের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমিও কি তাই ভাব নাকি ? দ্যাখো, তাহলে এখনও ডিভোর্স-টিভোর্স যদি চাও—

অসিত মজুমদার হেসে উঠে বললেন, কি মশাই, সত্যি কথা বলুন তো।

এই ধরনের ছেঁদো কথায় যোগ দিতে ইচ্ছে করে না অবনীশের। উত্তর না দিয়ে একটু ভদ্রতা দেখিয়ে হাসলেন শুধু। এইসব কারণেই অবনীশকে সবাই গম্ভীর বলে।

রুমা বললো, লেখক-শিল্পীরা বুঝি কারুকে ভালবাসে না ? কারুকে ভালবাসলে তারপর বিয়ে করবে না ? পৃথিবীর বড়-বড় লেখকরা বুঝি করেন নি ?

অসিত কৃত্রিম দুঃখ দেখিয়ে বললেন, আমাকে আর কে ভালবাসবে বলো ? কেউ তো পাত্তাই দিলো না। আর এখন আমার চল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেল—এখন আমার দিকে আর মেয়েরা তাকাবে কেন ?

— বাজে কথা বললেন না। কতো মেয়ে আপনার পেছনে পেছনে ঘোরে—আমি সব জানি।

দিদির ননদ মঞ্জু যে কলেজে পড়ে—সেই কলেজের মেয়েরা তো আপনার নামে পাগল। এই তো বললেন, মায়া চৌধুরী নামের একটা মেয়ে আপনার কাছে প্রায়ই যায়। কেন যায় ?

— মায়া চৌধুরীর কথা আলাদা। ওর আগে থেকেই একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম আছে, আমি জানি। তবে মেয়েটি সাহিত্য খুব ভালবাসে—নিজেও একটু লেখে-টেখে—আজকাল তো অবনীশবাবুর খুব ভক্ত হয়েছে। অমুক কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। তাতে অবনীশবাবু সম্পর্কে অনেক কথা আছে।

মায়া চৌধুরীর নাম শুনে অবনীশ মনে-মনে একটু দুঃখবোধ করলেন। মেয়েটি তো একবারও বলেনি যে সে অসিত মজুমদারের কাছে যায়। অবনীশ নির্বোধের মতন ধারণা করেছিলেন, মায়া নামের ঐ মেয়েটা শুধু তাঁরই লেখা পড়েছে, শুধু তাঁর লেখাই ভালবাসে। কিন্তু সেটা অবাস্তব। অবনীশ বেশি লেখেন না—এযাবৎ তাঁর মাত্র সাতখানা বই বেরিয়েছে। তাহলে মায়া তার জীবনের সমস্যা সম্পর্কে অসিত মজুমদারের কাছেই পরামর্শ চাইতে গেলে পারতো। তাঁর কাছে আসার দরকার কি ছিল ?

অসিত মজুমদার বললেন, ওই মেয়েটার জীবনে একটা খুব সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই ?

অবনীশ মিথ্যে করে বললেন, না, আমি মেয়েটি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। ওর সঙ্গে আমার মাত্র একদিনের পরিচয়।

অসিত বললেন, আহা, বেচারা! খুব মুশকিলে পড়েছে। বুঝলি রুমা, মেয়েটি একটি ছেলেকে অনেকদিন ধরে চেনে। ছেলেটি এমনিতে ভালোই ছিল—তারপর নকশাল হয়ে গিয়ে খুন-জখম শুরু করে দিলো। ধরা পড়ে জেলখানাতেও ছিল, জামিনে খালাস পেয়েছে—এখন আবার অপোনেণ্ট পার্টির ছেলেরা ওকে খুঁজছে—পেলেই কাটবে। এই অবস্থায় ছেলেটি ঝুলোঝুলি করছে ওই মায়াকে বিয়ে করার জন্য। কোনো মানে হয়? আবার ভয় দেখিয়েছে মায়াকে—বিয়ে না করলে মায়াকে সে খুন করতে পারে।

রুমা আঁতকে উঠে বললো, ওম্মা, কি সাঙ্ঘাতিক কথা। জোর করে বিয়ে করবে। ও-রকম খুনে স্বামীর সঙ্গে কেউ সারা জীবন ঘর করতে পারে ?

— আমি তো মায়াকে বলে দিয়েছি, তুমি কিছুতেই বিয়ে করবে না। বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। তাছাড়া, অবস্থা এখন অনেক বদলে গেছে—এখন খুন করা অমন মুখের কথা নয়।

— মেয়েটা এখন বাইরে কোথাও গিয়ে থাকলেই পারে কিছুদিন।

— না, না, বাইরে নয়। কলকাতা শহরই সবচেয়ে ভালো—এতো লোকজনের মধ্যে কিছু করতে পারবে না—বাইরে কোথাও গেলেই ছেলেটা সেখানে গিয়ে হাজির হবে—জোর-জবরদস্তি করবে।

অবনীশ ভাবলেন, মায়া বলেছিল, তার এই সমস্যা সম্পর্কে কথা বলার মতন কোনো মানুষ নেই, তাই সে এসেছিল অবনীশের কাছে এবং একথা আর কেউ জানবে না। মেয়েরা কি রকম অদ্ভুত, মিথ্যেবাদী! নিশ্চয়ই সে কয়েক ডজন লেখককে এই বলে বেড়িয়েছে।

অসিত মজুমদারের মুখে অতো স্থূলভাবে ঐ ঘটনাটা শুনে অবনীশের আরও বেশি সহানুভূতি হলো রঞ্জনের ওপর। তাঁর মনে হলো, মায়াকে বিয়ে করাই তো রঞ্জনের একমাত্র বাঁচার পথ। ভালবাসা ছাড়া আর কী অতিক্রম করতে পারে মৃত্যুকে? কালকেই অবনীশ খোঁজ করবেন মায়ার, ওদের বিয়ে হবার জন্য তিনি যতোটা সম্ভব সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই সাহায্য করা উচিত।

খেতে বসে আরও অনেক প্রসঙ্গ এসে গেল। অসিত মজুমদার তাঁর অনেকগুলো ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার গল্প বললেন। অবনীশ মনে মনে স্বীকার করলেন, অসিত মজুমদার সত্যিই সারা

ভারতবর্ষ ঘুরেছেন ভালো করে এবং অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার লক্ষ করার ঝোঁক আছে তাঁর, সেগুলোই তাঁর লেখায় সাহায্য করে নিশ্চিত।

কথায়-কথায় অবনীশও বলে ফেললেন কানপুরে থাকার সময় তাঁর শিকারে যাওয়ার কথা। শিকারের উত্তেজনার চেয়েও জঙ্গলের দীন-দরিদ্র মানুষের কথাই এসে পড়ে বেশি। অসিত মজুমদার শুনলেন খুব মনোযোগ দিয়ে। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, বাঃ আপনার সম্পর্কে তো এসব কিছুই জানতাম না। আপনি সত্যি সত্যি বন্দুক ধরে শিকার করেছেন ? কোনো উপন্যাসে সে-কথা লেখেন নি তো!

অবনীশ বললেন, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার মারার গল্পের চেয়ে জঙ্গলের মানুষের কাহিনীই আমাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি।

আবার কবে শিকারে যাচ্ছেন, বলুন ? এবার আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি জীবনে কখনো বন্দুক ধরি নি যদিও।

— আমিও পাঁচ-ছ' বছর আর বন্দুক ধরি নি। হাতে কলম তুলে নেবার পর আর বন্দুক ধরা হয় নি বিশেষ।

— বন্দুকটা আছে , না বিক্রি করে দিয়েছেন ?

— আছে অবশ্য। বিক্রি করি নি।

রুমা বললো, থাকলেও আমি ওকে আর কোনোদিন বন্দুক ছুঁতে দেব না। আমার ভীষণ বিশ্রী লাগে—জঙ্গলে গিয়ে নিরীহ জন্তুগুলো মারা—। জানো অসিতদা, ও কানপুরে থাকার সময় শিকার নিয়ে এইসব বাড়াবাড়ি করার জন্য ওর সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হত।

অসিত রুমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুই থাম তো। আমরা কি বাঘ-সিংহ শিকার করতে যাচ্ছি নাকি ? এই দু'একটা হরিণ-টরিণ—মানে শিকার করতে যাওয়ার রোমাঞ্চটাই তো আসল।

— না অসিত দা, আপনি জানেন না। শিকারের নেশা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক নেশা। ও তো অনেকদিন ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েছে—এখন আবার যদি শুরু করে, তাহলে ঐ নিয়েই আবার মেতে উঠবে।

—কিছু হবে না। অবনীশবাবু, বলুন, কবে যাওয়া যায়। সারান্ডা ফরেস্টের এক ডি.এফ.ও.র সঙ্গে আমার খুব জানাশুনো আছে—ভদ্রলোক খুব বই-টই পড়েন—আপনার লেখাও নিশ্চয়ই পড়েছেন। তাঁকে বলে একটা ব্যবস্থা করা যাক। আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি নেই তো ?

— না, না, আপত্তি কিসের ?

— আমরা দু'জনেই দু'রকম লেখার খোরাক পেয়ে যাবো। কি বলেন ? রুমা তুই যাবি নাকি ?

— আমার একদম ভালো লাগে না।

—সেই ভালো, মেয়েদের নিয়ে যাওয়া আবার এক ঝামেলা! শিকারে পুরুষমানুষদেরই যাওয়া উচিত। তাহলে অবনীশবাবু, এই শীতকালেই ব্যবস্থা করা যাক। আমি একটা জিপ জোগাড় করে রাখতে বলবো—

অবনীশ হঠাৎ লক্ষ করলেন, টেবিলের তলায় রুমার পা ছুঁয়ে আছে অসিতের পা। তিনজন বসেছেন টেবিলের তিনদিকে। অবনীশের সূক্ষ্ম চোখে এড়ালো না যে তাঁকে কথা বলায় ব্যস্ত রেখে রুমা আর অসিত টেবিলের তলায় পায়ে পা ছুঁইয়ে খেলা করছে। রুমা তো অসিতের ছোটবোনের মতোন, তাই এতে কোনো দোষ দেওয়া যায় না।

অবনীশ উঠে পড়ে বললেন, আপনারা কথা বলুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

অবনীশ গিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অসিত আর রুমাকে একটুক্ষণ আলাদা থাকতে দেওয়া উচিত। ওরা যদি টপ করে দু'একটা চুমু-টুমু খেতে চায় তো খাক না। এতেও দোষের কিছু নেই। মেয়েদের ঠোঁটে কোনো পরপুরুষ যদি দু'একটা চুমু খায়—তাতে তো এঁটো হয়ে যায় না। অপরের খাওয়া জলের গেলাস একবার ধুয়ে নিয়েই আমরা ব্যবহার করতে পারি, আর এ তো মানুষ।

ঠিক কতোক্ষণ বাথরুমে সময় কাটালে বিসদৃশ দেখাবে না, অবনীশ সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। কোনো গল্পে যদি এরকম একটা সিচুয়েশান থাকতো, তাহলে সেখানে লেখক কী করতেন ? স্ত্রী তাঁর পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে একটু খুনসুটি করছে, আর স্বামী দাঁড়িয়ে আছে বাথরুমে। গল্প-উপন্যাসে সাধারণত এরকম পরিস্থিতি থাকে না—লেখকরা এড়িয়ে যান। অথচ বাস্তবে যে ঘটে, অবনীশ তো নিজেই বুঝতে পারছেন।

বাথরুমের আলো জ্বালেন নি অবনীশ। দেয়ালের ছোট আয়নায় তিনি তাঁর মুখখানা ঠিক চিনতে পারলেন না অন্ধকারে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে অবনীশ দেখলেন, তখনও রুমা আর অসিত টেবিলের দু'পাশে বসে আছে মুখোমুখি। কোনো কথা নেই। টেবিলের ওপর এতোখানি ঝুঁকে এসে কি চুমু খাওয়া সম্ভব ? কিংবা ওদের মধ্যে একজন কেউ দ্রুত উঠে এসে চুমু খেয়েই আবার ফিরে গেছে নিজের চেয়ারে ? এক মিনিট তো মোটে লাগার কথা। কে উঠে এসেছিল, রুমা না অসিত ?

অবনীশের ঠোঁটে খানিকটা হাসি খেলে গেল। তাঁর মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি এসেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি আলমারির মাথা থেকে খাপে মোড়া রাইফেলটা নামালেন। অনেক দিনের ধুলো জমেছে সেটাতে।

রুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ও কী করছো ? ওটাকে এখন নামালে কেন ?

অবনীশ বললেন, একটা ঝাড়ন-টাড়ন দাও তো, এটা মুছে ফেলি। অসিতবাবু বললেন তো, তাই মনে পড়ে গেল। অনেকদিন পরিষ্কার করা হয় নি—খারাপ হয়ে গেছে কি না দেখতে হবে তো!

রুমা বিরক্তভাবে বললো, খাবারের টেবিলে বন্দুক! তোমার সবই অদ্ভুত।

অবনীশ রুমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না।

খাপ থেকে রাইফেলটা বার করে অবনীশ ধুলো মুছলেন। তারপর রুমা আর অসিতের মাঝামাঝি নলটা উঁচিয়ে এক চোখ বুজে বললেন, না ঠিকই আছে। ব্যবহার করা যাবে।

অসিত মুগ্ধভাবে দেখছিলেন রাইফেলটা। বললেন, আমি কখনো বন্দুক-পিস্তল ছুঁয়ে দেখি নি। দিন তো একটু দেখি।

অবনীশ রাইফেলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন না।

সন্তর্পণে সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতে-দেখতে অসিত জিজ্ঞেস করলেন, কোথা দিয়ে গুলি ভরে ?

অবনীশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, গুলি ভরাই আছে। দেখবেন, একটু সাবধানে—সেফটি ক্যাচে হাত দেবেন না—হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।

অসিত ভয় পেয়ে বললেন, গুলি ভরাই আছে ? ওরে বাবা!

রুমা বিরক্ত হয়ে বললেন, গুলি-ভরা রাইফেলটা তুমি ওঁর হাতে দিয়েছ ? হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় ? তুমি এমন ছেলেমানুষি করো।

অবনীশ সেটা ফেরত নিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর হালকাভাবে অসিতকে

বললেন, চলুন, তাহলে একসঙ্গে শিকারে যাওয়া যাক। রুমাও যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। যাবে না রুমা ?

রুমা ধমক দিয়ে বললো, ওটা সরিয়ে রাখো। খাবার টেবিলে রাইফেল! তাও গুলি–ভরা। তোমার কি কোনোদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না ?

অবনীশ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আমি তো খাবার টেবিলে বসে অনেকদিন লেখালেখি করি। তখন তো ভয় পাও না! কলম কি বন্দুকের চেয়ে শক্তিশালী নয় ?

অসিত রসিকতাটায় খুব হাসলেন একচোট। বললেন, যাই বলিস রুমা, ব্যাপারটা খুব থ্রিলিং! অবনীশবাবু আমার ওপর খুব টেক্কা মেরে দিলেন। আমি কারুকে খাবার নেমন্তন্ন করে রাইফেল দেখাতে পারবো না।

অবনীশ রাইফেলটা খাপে ভরে রাখতে রাখতে বললেন, রুমা, তুমি একটুতেই এতো ভয় পাও কেন ? পাঁচ–ছ'বছর ধরে কেউ রাইফেলে গুলি ভরে রাখে ? গুলি ভরে রাখলে সে ব্যবহারও করে। ওটা আমি এমনি বলছিলাম।

বাকি সময়টা রুমা প্রায় গুম হয়ে রইলো। কথাবার্তায় আর তেমন উৎসাহ নেই।

অবনীশ ভাবলেন, আর একবার তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া উচিত কি না। এখন রুমার কাঁধের ওপর হাত রেখে অসিত যদি একটু সান্ত্বনা দিতো, তাহলে বেশ মানাতো। কিন্তু কী ছুতোয় অবনীশ আবার বাইরে যাবেন ? বার বার বাথরুমে যাওয়া যায় না। শোওয়ার ঘর থেকে পারিবারিক অ্যালবামটা এনে দেখাবেন ? সেটা আবার অন্যদিক থেকে অভদ্রতা হবে।

অসিত মজুমদার চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, চলি আমি, এবার বেশ রাত হলো।

অবনীশ আন্তরিকভাবে বললেন, না, না আর একটু বসুন। এমন কিছু রাত হয় নি। রুমা, আর একবার কফি বানাবে নাকি ?

অসিত মজুমদার বললেন, না, আমাকে এক্ষুনি সত্যিই যেতে হবে। কাল খুব ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হবে। দিল্লী যাচ্ছি। অবশ্য দু'দিন বাদেই ফিরবো। শুনুন, এক কাজ করা যাক। এবার আপনারা একদিন আমার বাড়িতে আসুন। কবে আসবেন ? নেক্সট শনিবার ? রুমা ? পরের শনিবার ঠিক আছে ?

রুমা বললো, ওর যদি অসুবিধে না থাকে—

অবনীশ বললেন, না, কোনো অসুবিধে নেই।

অসিত বললেন, তাহলে চলে আসবেন, সাতটার মধ্যে। রুমা তো আমার বাড়ি চেনেই—

রুমা অসিতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, অসিতদা, আমি তো আপনার বাড়ি চিনি না। আপনাদের মনোহর পুকুরের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে। কিন্তু এখন তো আপনারা অন্য কোন্ ফ্ল্যাটে থাকেন। টালিগঞ্জে না কোথায় ?

অবনীশ তাড়াতাড়ি বললেন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিকানা থাকলে খুঁজে নিতে কতোক্ষণ!

অসিত চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে রুমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন অবনীশ।

নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেমেয়েরা ও বাড়িতেই থাকবে ?

রুমা বললো, হ্যাঁ।

— আচ্ছা, তাহলে তুমি শুয়ে পড়। আমার একটু দেরি হবে।

রুমা কাছে এগিয়ে এসে অবনীশের গায়ে হাত রেখে বললো, তুমি রাগ করেছ ?

অবনীশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাগ করবো কেন ? হঠাৎ ?

— তোমাকে আজ ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলছো

না। তোমার কী হয়েছে বল তো ?

— কিছু হয় নি তো।

— অসিতদাকে আজ নেমন্তন্ন না করলেই হত। বড্ড বকবক করেন। তোমার সঙ্গে কি রকম একটা পিঠ–চাপড়ানির ভাব নিয়ে কথা বলছিলেন—আমার খুব খারাপ লাগছিল।

অবনীশ হেসে বললেন, একজন লোক চলে গেলেই সঙ্গে–সঙ্গে তার নিন্দে করা মেয়েদের স্বভাব। আমার কিন্তু অসিত মজুমদারকে বেশ ভালোই লেগেছে। যতোই দেখছি, ততোই আমি ওঁর ভক্ত হয়ে যাচ্ছি। তোমার দাদার কাছ থেকে ওঁর বইগুলো নিয়ে এসো তো, সত্যিই পড়ে দেখবো।

শোয়ার ঘরের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে শাড়ি–ব্লাউজ খুলতে–খুলতে হাল্কা গলায় রুমা বললো, এসো আজ সারারাত দু'জনে গল্প করি!

অবনীশ ভ্রূ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, সারারাত ? কী গল্প ?

— আমার সঙ্গে বুঝি গল্প করতে তোমার আর ইচ্ছে করে না ?

অবনীশ কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন রুমার দিকে। আশ্চর্য, কতো কিছু বদলে যায়! ব্রেসিয়ার খুলে ফেলে রুমা আলনা থেকে রাত্তিরের জামা নিচ্ছে। তার বুক এখন নগ্ন। সায়ার দড়ি আলগা—অথচ তারা দু'জন এখন রাগারাগির কথা বলছে। অনেক সময় রুমার নগ্ন বুকের দিকে অবনীশের চোখ পড়লেও কোনো ভাবান্তর হয় না। অথচ এক সময় বুকের সামান্য একটু আভাস দেখতে পেলেই কী রোমাঞ্চ হতো। এক সময় যে শরীরটা একটু ছুঁতে পারলে মনে হতো জীবন ধন্য হয়ে যাবে—পরে শত–সহস্রবার ছোঁয়াছানির পরেও জীবন ধন্য হয় না। শরীরের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু মেটে না। অচেনা কোনো মেয়ের শরীরের গোপন অংশ দেখবার জন্য কি চোখ লালায়িত নয় ?

কিন্তু এই ইচ্ছেটা যদি গোপন রাখা যেতো!

রুমা পোশাক পাল্টে অবনীশের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অভিমানের সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে আর একটুও ভালবাসো না, না ?

অবনীশ ক্লান্তভাবে বললেন, ভালবাসা কি ? ভালবাসা কথাটার মানে মানুষের জীবনে অনবরত বদলায় না ? আমি তোমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যতোটা ভালবাসতে পারে। এইজন্যই তো তোমার ছোটখাটো দোষগুলোও আমার চোখে পড়ে না।

রুমা কামার্ত নারীর মতন বললো, আমাকে জড়িয়ে ধরো না গো! খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরো!

অবনীশ দু'হাত দিয়ে রুমার কোমর জড়িয়ে ধরে আস্তে–আস্তে বললেন, আমি যদি তোমাকে বিয়ে না করতাম তুমি আমাকে অনেক বেশি ভালবাসতে, তাই না ?

৭

কলেজ ধর্মঘট। গেটের কাছেই পরপর দুটো বোমা ফাটলো। সাধারণত এইসব বোমায় কেউ আহত হয় না। দোতলায় অধ্যাপকরা আটকা পড়ে আছেন, এখন বেরুনো সম্ভব নয়। বাইরে ছাত্ররা মুহুর্মুহু শ্লোগানে তোলপাড় করছে, অধ্যাপকরা দোতলায় বসে আছেন মুখ গুঁজে। যেন দুই প্রতিপক্ষ। কোনো অধ্যাপক এই মুহূর্তে কোনো ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারবেন না। কেউ–কেউ ফিসফিসিয়ে নিন্দে করছেন ছাত্রদের—এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে

পারে না যে সরকার, সেই সরকারের। জগৎ সাহা একটু গলা চড়িয়ে বললেন, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ করে দিলেই তো হয়। শুধু-শুধু লাইফ আর প্রপার্টির ক্ষতি করা কেন ?

অবনীশ চোখের সামনে একটা বই মেলে বসেছিলেন চুপচাপ। এডমান্ড উইলসান-এর একটি সমালোচনার বই। এইসব হুড়োহুড়ির সময় প্রবন্ধ পড়তে তাঁর বেশ ভালো লাগে। পাশ থেকে একজন বাংলার অধ্যাপক বললেন, ও অবনীশবাবু, একটা কিছু বিহিত করুন। আপনারা আপনাদের লেখার মধ্য দিয়ে যুব সমাজকে গাইডেন্স দিতে পারছেন না ? সাহিত্যিকরা এই সময় যদি দায়িত্ব পালন না করেন...

বাংলার অধ্যাপকটি একজন ব্যর্থ সাহিত্যিক। গোটা দু'এক উপন্যাস লিখেছিলেন, পাঠকরা সমাদর করে নি, যদিও ওর রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনা বিষয়ক একটা নোট-বই ছাত্রদের মধ্যে বেশ চলে। সুযোগ পেলেই তিনি খ্যাতনামা গল্প-উপন্যাস লেখকদের আক্রমণ করেন। অবনীশ বুঝতে পারলেন, ইনি একবার কথা শুরু করলে সহজে থামবেন না। এবং অন্য অধ্যাপকরাও যোগ দেবেন, কারণ ডাক্তারি উপদেশ দেওয়া এবং সাহিত্য সমালোচনা করার অধিকার সকলেরই আছে। এইসব শোনার চেয়ে অবনীশের পক্ষে গরম তেলের কড়াইতে ভাজা হওয়াও অনেক আরামের। দু'একটা ভদ্রতাসূচক হুঁ-হাঁ করে অবনীশ উঠে পড়লেন।

জগৎ সাহা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন ?

— যাই। বাড়ি চলে যাই। বসে থেকে কি করবো ?

— এই গোলমালের মধ্যে যাবেন কি মশাই। বোমা মেরে বসবে তো !

— আমাদের বাড়ির সামনেও মাঝে-মাঝেই এরকম গোলমাল হয়। তার মধ্য দিয়েই তো বাড়ি ফিরি। ওরা যাকে-তাকে মারবে না।

— বসুন, বসুন, গোয়ার্তুমি করবেন না।

— এক একদিন মনে হয়, প্রত্যেকদিন এরকম ভয় পাওয়ার চেয়ে একদিন মরে যাওয়াই ভালো।

— আপনার আর কী, মোটা টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়েছেন।

অবনীশ তবু বেরিয়ে পড়লেন। একটু-একটু ভয় যে করছিল না, তা নয়। তবে এখন ভয় পাওয়াটাও একঘেয়ে হয়ে গেছে। যারা উগ্রপন্থী রাজনীতি করছিল—তারা সাধারণ মানুষের ভয়টা ভেঙে দিয়েছে—এটা ওরা নিজেরাও বুঝতে পারে নি, আজ তাই প্রতি-আঘাত আসছে।

গেটের সামনে দিয়ে বেরুবার সময় কেউ তাঁকে বোমা ছুড়ে মারলো না। কয়েকজন ছাত্র আপনি সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলো, কয়েকজন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রম দেখিয়ে হাসলো—কয়েকজন পেছন থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে শালা এবং বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার দালাল বললো। এমন কিছু না—অবনীশ প্রায় সসম্মানেই বেরিয়ে এলেন।

বেরিয়ে এসে ভাবলেন, এইসব ছাত্রদের মধ্যে কেউ কি রঞ্জনের খোঁজ দিতে পারবে ? কয়েকদিন থেকেই রঞ্জনের সঙ্গে খুব দেখা করতে ইচ্ছে করছে। রঞ্জন যেন তাঁর আর একটা সত্তা হয়ে গেছে। একজন পলাতক মানুষ, যে ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। হিংসার বদলে ভালবাসা। অবনীশও তাই চান। তিনিও অসিত মজুমদারকে হিংসে না করে রুমাকে ভালবাসতে চান। কিন্তু এইসব ছাত্ররা কি করেই বা চিনবে—রঞ্জন তো ওর আসল নাম নয়। ওর আসল নাম অবনীশ জানেন না। ওকে কখনো চোখে দেখেন নি, চেহারার বর্ণনা দিতেও পারবেন না। মায়ার খোঁজখবর নেবারও কোনো উপায় নেই।

কলেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ি না গিয়ে অবনীশ একটা পত্রিকা অফিসে এলেন। পত্র-পত্রিকার অফিসে তাঁকে কদাচিৎ দেখা যায়। সেইজন্যই হঠাৎ কখনো গেলে তাঁর বেশ খাতির হয়।

সম্পাদক অনেকক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখে গল্প করেন। চা খাওয়ান। অন্য সাহিত্যিকরাও এসে বসেন। সাহিত্য ছাড়া পৃথিবীর আর সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

পত্রিকা অফিসের যে কর্মচারীটি খাতাপত্র ঠিকঠাক রাখেন, অবনীশ তাঁর সামনে এসে চেয়ারে বসলেন, তারপর বললেন, রোহিনীবাবু, আমার একটা উপকার করবেন ? আমার একটি মেয়ের ঠিকানা দরকার। মেয়েটি লেখে-টেখে—হয়তো তার কোনো লেখা আপনাদের কাগজে ছাপা হয় নি—অমনোনীত লেখাও তো ফেরত দেন—তাদের নাম-ঠিকানা কোথাও লেখা থাকে ?

রোহিনীবাবু বললেন, না তো! অমনোনীতদের তো নাম-ঠিকানা রাখি না।

অবনীশ বললেন, তাহলে কী করা যায় ? মেয়েটি আমার বাড়ি থেকে একটা দামী রেফারেন্স বই নিয়ে এসেছিল—এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেবে বলেছিল—বইটা এখন আমার হঠাৎ দরকার হয়ে পড়েছে—ওর বাড়ির ঠিকানা জানি না—নিউ আলিপুরের দিকে থাকে।

— নাম কি মেয়েটির ?

— মায়া চৌধুরী।

— এই নামে তো কেউ লেখা পাঠিয়েছে বলে মনে পড়ছে না। আচ্ছা দাঁড়ান দেখছি, নিউ আলিপুরের দিকে থাকে বললেন তো ?

খাতাপত্র ওল্টাতে-ওল্টাতে রোহিনীবাবুর চোখ এক জায়গায় থেমে গেল। বললেন, পেয়েছি। এর তো দুটো লেখা ছাপাও হয়েছে। প্রবন্ধ লেখে বেশ ভালোই। তবে ছদ্মনামে লেখে—বাসনা মজুমদার এই নামে বেরিয়েছে।

বাসনা মজুমদার অবনীশের 'সমুদ্রের সামনে একা' উপন্যাসের নায়িকার নাম। মায়া তো এই নাম গ্রহণের কথা অবনীশকে বলে নি। এমনকি, মায়ার যে লেখার অভ্যেস আছে সে কথাও জানায় নি অবনীশকে। অবশ্য অবনীশও তো এসব কথা জানার কোনো উৎসাহ দেখান নি। অবনীশ ঠিকানাটা টুকে নিলেন। টেলিফোন অফিসে ফোন করে জেনে নিলেন ঐ ঠিকানার নাম্বার। কিন্তু সেই নাম্বারে চার-পাঁচবার ফোন করেও লাইন পাওয়া গেল না—প্রত্যেকবার এনগেজ্‌ড।

তারপর অবনীশ যা করলেন, সেটা তাঁর চেনাশুনো কেউ শুনলেও বিশ্বাস করবে না। এটা তাঁর সম্পূর্ণ চরিত্র-বিরোধী। অবনীশ কখনো কারুর বাড়িতে যান না—কিন্তু সেদিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিউ আলিপুরে চলে গেলেন মায়াদের বাড়িতে।

লোহার গেট পেরিয়ে ছোট্ট একটি বাগান, তারপরেই লাল রংয়ের দোতলা বাড়ি। তখনও ভালো করে বিকেল হয় নি, খুব চড়া রংয়ের রোদ্দুর লাল গোলাপ ফুলের ওপর পড়ে পাপড়িগুলোকে সাদা করে দিয়েছে। একটা বিড়াল পেট বিছিয়ে শুয়ে আছে করবী গাছের ছায়ায়—দুটো কাক বাগানের দু'পাশ থেকে অবিশ্রান্ত গলায় ডেকে যাচ্ছে অনেকক্ষণ।

গেট ঠেলে ঢুকতে প্রথম একটু ইতস্তত করলেন অবনীশ। এত দূর আসার পর তাঁর নিজেরই এখন লজ্জা লাগছে। তবু এ পর্যন্ত এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না। বাগান পেরিয়ে এসে সদর দরজায় বেল টিপলেন।

চাকরের কাছ থেকে খবর পেয়ে মায়া নেমে এলো একটু পরেই। খুব সম্ভবত সে শুয়েছিল, চুল ও শাড়ি কিছুটা অবিন্যস্ত। অবনীশকে দেখে চমকে উঠে বললো, আপনি ? সত্যি ?

অবনীশের সঙ্গে যারা দেখা করতে যায় এবং সাধারণত প্রথমে যে কথাটা দিয়ে আরম্ভ করে, আজ অবনীশও সে কথাটাই বললেন মায়াকে।—হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম না তো ?

বসবার ঘরটা খুব নিখুঁতভাবে সাজানো। বসলেই, গভীরে ডুবে যাওয়ার মতন সোফা-কৌচ। সারা বাড়িটা নিঝুম। আপনি বলার বদলে প্রথমেই তুমি দিয়ে শুরু করে অবনীশ বললেন,

তুমি আর দেখা করলে না কিংবা টেলিফোন করলে না তো ?

— সে-রকম কি কথা ছিল ?

— আমি আশা করেছিলাম, একটা কিছু খবর পাবো। সেদিন তোমার ব্যাপারটা শোনার পর থেকে আমি খুব কৌতূহলী হয়েছিলাম।

— কিন্তু সেদিন আপনি এমন ব্যবহার করলেন, যেন আপনার এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

— আমি ঐ রকমই।

— সাহিত্যিকরা যে এরকম দুর্বোধ্য ধরনের মানুষ—সেটা আমার আগে ধারণা ছিল না।

— সবাই কি এরকম ? তুমি অবশ্য অনেক সাহিত্যিককে চেনো—আমি ততোজনকে চিনি না।

— না, আমিও বেশি লেখককে চাক্ষুষ দেখি নি। আপনার সঙ্গেই সাহস করে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

অবনীশ আহত বোধ করলেন। মায়া মিথ্যে কথা বলছে। মিথ্যে কথা বলা তো ওকে মানায় না।

মায়ার কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে। একটা হাত আর একটা হাতের ওপর রাখা। পায়ের পাতার কাছে দেখা যাচ্ছে সায়ার লেস। চোখ দুটো শীতল দীঘির জলের মতন টলটলে। অবনীশের ইচ্ছে হলো মায়ার একটা হাত টেনে নিয়ে খুব নরমভাবে বলেন, মায়া, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার কাছে কোনো মিথ্যে কথা বোলো না। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

মায়া বললো, আপনি এতো ব্যস্ত লোক, আপনি যে নিজে থেকে আমার বাড়িতে আসবেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না এখনও। আমার মতন সামান্য মেয়ে—

— তুমি তো সামান্য নও! ভালো কথা, তুমি বাসনা মজুমদারের ছদ্মনামে দুটো প্রবন্ধ লিখেছ শুনলাম—ঐ নামটা বেছে নিলে কেন ?

— ঐ চরিত্রটির সঙ্গে আমার জীবনের খুব মিল খুঁজে পাই। তাই অত আগ্রহ করে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

— তুমি অসিত মজুমদারের কাছে প্রায়ই যাও। ওঁর কাছে তোমার কথা শুনলাম।

— প্রায়ই যাই ? একবারই মাত্র গিয়েছিলাম, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় দলবেঁধে। একটা ফাংশানের ব্যাপারে। একবছর আগে। উনি সেদিন আপনার কথা খুব জিজ্ঞেস করছিলেন। আপনি যে-রকম অন্য কারুর কথা জানতে চান না—উনি সে-রকম নন।

— উনি তোমার সব কথা জানেন। এমনকি তোমার জীবনের সমস্যা পর্যন্ত।

— জানতে পারেন। উনি আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সঙ্গে প্রেম করছেন, তার কাছ থেকে শুনতে পারেন। আমি অসিত মজুমদারের লেখা পছন্দ করি না।

অবনীশ আবার একটু আঘাত পেলেন। তাহলে কি অসিত মজুমদার মিথ্যে বলেছেন ? সেটাও তো ওঁকে মানায় না।

এর আগের বার মায়াকে দেখেছিলেন অনেক ছটফটে, অনেক ছেলেমানুষ। এরই মধ্যে তার চেহারায় ও কথায় একটা শান্ত গাম্ভীর্য এসেছে। অবনীশের এরকম হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়ায় তার যতোটা চঞ্চলতা দেখানো উচিত ছিলো—তা দেখা যাচ্ছে না। মায়া যেন কিছুটা ধরেই নিয়েছিল, অবনীশ আসবেন।

মায়া বললো, আপনি যদি কয়েকদিন আগেও আসতেন, আমি বাড়ির সবাইকে ডেকে পাঠাতাম, খুব হৈ-চৈ করতাম আপনাকে নিয়ে। কিন্তু আজ আমার অবস্থা অন্যরকম। বাড়ির

সকলের সঙ্গে আমার ঝগড়া। আপনি কী কফি খাবেন ?

— আমি কিচ্ছু খাব না। তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রঞ্জন কেমন আছে ?

— রঞ্জন কে ? ও বুঝতে পেরেছি, আপনি ওর কথা বলছেন, হ্যাঁ, ও ভালোই আছে। আপনাকে তো একটা কথা বলাই হয় নি। গতকাল সন্ধেবেলা রঞ্জনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আপনাকে আমার বিয়ের সময় থাকতে বলবো। কিন্তু আপনি কোনো উৎসাহই দেখালেন না।

অবনীশ স্থিরভাবে তাকালেন মায়ার দিকে। চোখে চোখ রেখে চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি করে বিয়েটা হলো ?

মায়া আলতো করে হেসে বললো, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা রেজিস্ট্রি অফিসে। আমার সঙ্গে আমার এক বান্ধবী ছিল। আর একজন ওর, মানে রঞ্জনের বন্ধু। সেই বন্ধুটির সঙ্গেই আমরা গিয়েছিলাম—রঞ্জনের ঠিক সাড়ে ছ'টায় আসবার কথা—কিন্তু আসে নি, অপেক্ষা করতে-করতে একসময় আমরা ভেবেছিলাম, ও বুঝি আসবেই না। কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও ওরা এখন ঠিক সময়ে আসে না—কারুকেই বিশ্বাস করতে পারে না—যদি অন্য পক্ষ জেনে যায়। সাতটার পর এলো একটা ট্যাক্সি করে—সই-টই করতে মিনিট দশেক লাগলো—তারপরই ও আবার চলে গেল। আবার দেখা হলো এক ঘণ্টা বাদে, ভিক্টোরিয়ার সামনে, আমরা দু'জনে মাঠে বসলাম—একটু দূরে ওর একজন বন্ধু পাহারা দিতে লাগলো—সেই আমাদের বাসরঘর। তারপর যে-যার বাড়িতে।

— খুব রোমহর্ষক ব্যাপার!

— আমার বাড়ির কেউ এখনো জানে না।

— তোমার এখন কি রকম লাগছে ?

— আমার ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে, ও এতো খুশি হয়েছে, আপনাকে কি বলবো। প্রায় বছর দেড়েক ধরেই তো পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে—মাঝখানে কিছুদিন জেলে ছিলো, জেল থেকে বেরিয়েও সেই একই অবস্থা—একটা দুর্বিষহ জীবন—এর মধ্যে শুধু কাল সন্ধেবেলাই ওকে দেখলাম সত্যিকারের খুশি। একেবারে শিশুর মতন। কারুকে যদি সত্যিকারের খুশি করা যায়—

— তোমার কি রকম লাগছে বুঝতে পারছ না ?

— কী রকম যেন অদ্ভুত। কাল সন্ধেবেলা আমার বিয়ে হয়েছে—এক হিসেবে আজও তো আমি বিয়ের কনে। কোনো বিয়ের কনেকে এই অবস্থায় দেখেছেন এর আগে ?

— না। বিয়ের কনে বিয়ের পরদিন দুপুরবেলা একা ঘরে পরপুরুষের সঙ্গে গল্প করছে, এরকম দেখা যায় না সত্যিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না ?

— না। বিয়ের পরের রাতটাকেই কালরাত্রি বলে না ? কালরাত্রিতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। আমাদের কালরাত্রি বেশ কয়েকদিন চলবে—দিন চারেক আর দেখা হবে না। তারপর আমরা হায়দ্রাবাদ চলে যাচ্ছি। ঐখানেই আমাদের বৌভাত আর হানিমুন হবে।

— কথাটা বলে মায়া অদ্ভুতভাবে একটু হাসলো। তার কথার মধ্যে কোনোরকম আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই। অবনীশের মনে হলো বিয়ের রাত্তিরের গল্প মেয়েরা তাদের বান্ধবীদের কাছে যখন বলে তখন তার মধ্যে কতো রকম লজ্জা ও রোমাঞ্চ মিশে থাকে। অথচ মায়া একজন পুরুষের সঙ্গে এ বিষয়েই কথা বলতে পারছে কতো নির্লিপ্তভাবে।

— মায়া, তোমাকে একটা কথা বলবো, বিশ্বাস করবে ? আমি অসম্ভব খুশি হয়েছি। সেদিন তোমাকে আমি কোনো উপদেশ দিতে পারি নি। কিন্তু তুমি নিজে থেকেই যে সাহসের সঙ্গে

এরকম করতে পেরেছ—এটা খুব বড় ব্যাপার। এইসব দুঃসাহসই মানুষের জীবনকে বড় করে।

— অনেকটা ভরসা পেলাম। সবাই আমার বিরুদ্ধে।

— একদিন রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পার ?

— আপনার সঙ্গে ? কিন্তু ওর পক্ষে তো কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক। ও কি আপনার বাড়িতে যেতে পারবে ?

— আমার বাড়িতে যদি না যেতে পারে—ও যেখানে বলবে, আমি সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

— কিন্তু এ ব্যাপারটা অন্য কেউ জেনে ফেললে আপনার পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে।

— তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

— কেন, আপনি ওর সঙ্গে এতো ঝুঁকি নিয়ে দেখা করতে চাইছেন কেন ?

— জানি না। কয়েকদিন ধরে আমি ওর কথা খুব ভাবছি। ও যেন আমারই আর একটা সত্তা। ওর সঙ্গে একটু কথা বলা আমার পক্ষে বিশেষ দরকার।

মায়া এবার একটু হেসে বললো, আপনি কি ওকে আর আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন নাকি ?

অবনীশ একটু চমকে উঠলেন। মায়াকে নিয়ে কোনো গল্প-উপন্যাস লেখবার কথা তিনি একবারও ভাবেন নি। রঞ্জন ছেলেটি সম্পর্কে কয়েকদিন ধরে তিনি এমনিই কৌতূহল বোধ করছিলেন। কিন্তু অন্যরা বোধহয় ভাবে, উপন্যাসের প্লট খোঁজা ছাড়া লেখকদের আর কোনো বিষয়ে উৎসাহ থাকতে পারে না।

— লিখতেও পারি।

— কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন কোনো ঘটনার সঙ্গে আপনি নিজে জড়িত না থাকলে তা নিয়ে আপনি লিখতে পারেন না।

— এখন তো খানিকটা জড়িয়ে পড়েছি।

— কি করে ?

অবনীশ তার অসহায় ধরনের মুখখানা তুলে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, মায়া, আমি তো শুধু লেখক নই, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিজস্ব আনন্দ, দুঃখ, লোভ—এ সবই আছে।

মায়া চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলো অবনীশের দিকে। ঠিক যেন কথাটা বুঝতে পারলো না। বললো, জানেন, কাল সকাল পর্যন্ত আমি যা ছিলাম—এখন আমি তার থেকে একেবারে আলাদা, তাই না ? আমার জীবন এখন অন্যরকম। আমি মা-বাবাকে ছেড়ে একটা অনিশ্চিত জীবনে চলে যাচ্ছি। এ জন্য আমার দুঃখও হচ্ছে—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি।

একটু চুপ করে থেকে মায়া আবার বললো, আমি আপনাকেও ছেড়ে যাচ্ছি।

অবনীশ বললো, আমাকে ছাড়ার তো কোনো প্রশ্ন নেই। আমার সঙ্গে তো তোমার তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না।

— ছিল। আপনি সেটা জানতেন না। আপনার লেখার সূত্র ধরে আমি আপনার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। রঞ্জনের ভীষণ ঈর্ষা। আমি প্রায়ই আপনার কথা বলে ফেলি। আমি অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বললেও ওর রাগ হয়। আমি আপনাকে চিঠি লিখলে ওর বোধহয় সহ্য হবে না।

— চিঠি লিখো না।

— আপনার তাতে কিছু যায় আসে না অবশ্য। আচ্ছা আমি রঞ্জনকে বলবো, যদি যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারে।

অবনীশ উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে মায়াও উঠে দাঁড়ালো। কাছে এগিয়ে এসে বললো, আপনাকে একবার প্রণাম করবো ?

অবনীশ একটু পিছু হটে গিয়ে শশব্যস্তে বললেন, না, প্লিজ, প্রণাম-টনাম করো না। তাতে নিজেকে খুব বুড়ো-বুড়ো লাগে। আমি তো সেরকম বুড়ো নই।

মায়া বললো, আপনি আমার চেয়ে মাত্র দশ-বারো বছরের বড়, সেটা জানি। সে হিসেবে বলছি না। এটা ঠিক শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্রণাম নয়। এটা অন্যরকম। আপত্তি করবেন না।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে মায়া অবনীশের চোখের দিকে তাকালো। অবনীশ তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত ডান হাতখানা আস্তে করে ছোঁয়ালেন মায়ার কাঁধে। মায়া সঙ্গে-সঙ্গে অবনীশের বুকে মাথা ছুঁইয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে-কাঁদতে বললো, কেন আপনি আজ এলেন ? কে আপনাকে আসতে বলেছিল ?

৮

ভোরবেলা চোখ খুলেই অবনীশ বুঝতে পারলেন, তাঁর জ্বর এসেছে। সারারাত ধরেই শরীরের মধ্যে একটা ঝাঁ-ঝাঁ ভাব ছিল, ঘুম কখনো গাঢ় হয় নি, বার বার অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করেছেন। নিজের কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ টের পেলেন— তবু যেন বিশ্বাস হয় না। সাত-আট বছরের মধ্যে অবনীশের কোনো অসুখ হয় নি। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে অনুভব করলেন, সর্বাঙ্গে বেশ ব্যথা। রুমা তখনও ঘুমিয়ে আছে। রুমাকে জাগালেন না।

বেশ কয়েকদিন অবনীশের জ্বরের ঘোরে কাটলো। এক ধরনের ভাইরাস ইনফেকশান, একশো চার সাড়ে চার ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ ওঠে। সেই বেশি জ্বরের সময় একটা আচ্ছন্ন অবস্থা আসে, অবনীশ তখন শুনতে পান কোথায় যেন অনবরত ঝনঝন করে টেলিফোন বাজছে। বেজেই চলেছে। কোথায় ? কলেজে, তাঁর নিজস্ব ঘরে। ঘরটা একেবারে ফাঁকা—জগৎ সাহা নেই, কেষ্ট নেই, টেলিফোনটা একা-একা বেজে চলেছে আর্ত ভঙ্গিতে। কেউ যেন খুব একটা জরুরি কথা অবনীশকে জানাতে চাইছে—অথচ কিছুতেই অবনীশের সন্ধান পাচ্ছে না।

তারপর অবনীশ শুনতে পেলেন একটা ট্রেনের শব্দ। বহুক্ষণ ধরে চলছে ট্রেন, ধোঁয়ার মধ্যে, কুয়াশার মধ্যে। ট্রেনটা দেখা যায় না, শুধু শব্দ, অসম্ভব তীব্র শব্দ। আস্তে-আস্তে ধোঁয়া ও কুয়াশা কেটে যায়, অবনীশ দেখতে পেলেন ট্রেনের জানালায় দু'টি মুখ। মায়া আর রঞ্জন। রঞ্জন রোগা আর লম্বা চেহারার একজন দুর্ধর্ষ তরুণ, কপালে একটা কাটা দাগ। কি একটা কথায় সে খুব হাসছে। হাসতে-হাসতে মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বলছে, ওঃ, ওঃ। মায়ার হাসিতে কোনো শব্দ নেই, সারা মুখে ছড়িয়ে আছে খুশির আভা।

তারপর ছবিটা মুছে গেল। অবনীশ কপালে অনুভব করলেন ঠাণ্ডা স্পর্শ। রুমা জলপটি দিচ্ছে। অবনীশ চোখ মেলে রুমার দিকে তাকিয়ে ক্লিষ্টভাবে হাসলেন। এই ক'দিন জ্বরের মধ্যেও অবনীশ টের পেয়েছেন—রুমা কী রকম যত্ন নিয়ে সেবা করেছে তাঁকে। রাত্তিরেও ঘুমোয় নি। বিয়ের পর অবনীশের যখন আর একবার অসুখ করেছিল, সেই সময়েও দেখেছিলেন রুমার এই সেবা-প্রবণতা। এক একটি মেয়ের চরিত্রে এই রকম এক একটা আলাদা দিক থাকে। রুমা এমনিতে একটু হালকা স্বভাবের ফুরফুরে ধরনের মেয়ে, সেজে-গুজে থাকতে ভালবাসে—কিন্তু অন্য কারুর অসুখের সময় তার রূপ বদলে যায়। তার প্রতিটি আঙুলে তখন

মমতা ঝরে–ঝরে পড়ে। কপালের ওপর তার হাতখানা রাখলে মনে হয়, এরই নাম ভালবাসা

অবনীশ রুমার হাতখানা টেনে নিজের গালে ছোঁয়ালেন। রুমা জিজ্ঞেস করলো, এখন কেমন লাগছে ? গায়ের ব্যথা একটু কমেছে ?

অবনীশ বললেন, তুমি এতো কাছাকাছি এসো না। তোমার ইনফেকশান লাগতে পারে।

—লাগুক।

রুমা বিছানার ওপর বসলো অবনীশের পাশে। নরম হাতে অবনীশের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। অবনীশ রুমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কতোক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল কে জানে। হঠাৎ চমকে উঠে অবনীশ খেয়াল করলেন, রুমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তিনি আসলে তাঁর একটা গল্পের কথা ভাবছিলেন—যে গল্পটা এখনো লেখা হয় নি। এক দম্পতি একটা খুব উঁচু পাহাড়ে উঠছে—সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দির আছে—তার মধ্যে কোনো দেবতা নেই—তবু ওরা সেখানে যাবেই—আর এই রোগশয্যায় শুয়েও অবনীশ মনে–মনে সেই দম্পতির সঙ্গে পাহাড় ভাঙছিলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনীশ বললেন, সত্যি রুমা, লেখকদের জীবনটা বড় অভিশপ্ত। আমি একজনকে বলেছিলাম, লেখকরাও মানুষ—তাদেরও সুখ–দুঃখ–লোভ–হিংসে আছে—সেটা কতোখানি সত্যি কে জানে। এই যে দেখো না, তুমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ, আমার ভালো লাগছে খুবই—অথচ সেটা উপভোগ না করে আমি আমার একটা ইনকমপ্লিট গল্পের কথা ভাবছিলাম।

রুমা রীতিমতন চিন্তিত হয়ে ধমকে বললো, তুমি এতো জ্বর নিয়েও গল্পের কথা ভাবছো ? তোমার একদম বুদ্ধি–সুদ্ধি নেই। এই সময় মাথার ওপর কেউ চাপ দেয় ! চুপ করে শুয়ে থাকো তো।

—কী করবো, আমার যে উপায় নেই। ডস্টয়েভস্কিকে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারার জন্য সৈন্যরা যখন রাইফেল তুলেছিল, তখনও তিনি গল্পের প্লট ভেবেছিলেন।

—তুমি ডস্টয়েভস্কি নও। তোমাকে অতো চিন্তা না করলেও চলবে। অবনীশ মনে সামান্য আঘাত পেলেন। তিনি যে ডস্টয়েভস্কির সমান লেখক নন, সেটা তিনি ভালোই জানেন। এরকম কোনো মিথ্যে অহঙ্কার তাঁর নেই। কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে সে কথা শুনতে ভালো লাগে না, অন্যমনস্কভাবে বললেন, কী করবো বলো, কখন মাথায় কী চিন্তা আসবে—সেটা তো আগে থেকে ঠিক করা যায় না।

—ওসব আমি শুনতে চাই না। এখন কিছুদিন আর তোমাকে লেখা–টেখা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কিছুদিন তুমি রেস্ট নাও।

রুমার শরীরে সুস্থতা ও স্বাস্থ্যের সুন্দর ঘ্রাণ। লালচে রংয়ের ঠোঁট দু'টি কাছে এনে অবনীশের জ্বরতপ্ত ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

অবনীশ ফিক করে হেসে ফেললেন হঠাৎ।

রুমা জিজ্ঞেস করল, ও কি, পাগলের মতন একা–একা হাসছো কেন ? কী ভাবছিলে আবার ?

অবনীশ বললেন, কিছু না।

অবনীশ যে কথাটা রুমাকে বললেন না সেটি হচ্ছে এই অবনীশ সেই মুহূর্তে ভাবছিলেন, চিরকাল তিনি এই রকম অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলে বোধহয় রুমার সঙ্গে সম্পর্কটা মধুর থাকতো। কিন্তু তা তো আর হয় না। দু'দিন বাদেই সেরে যাবে। তখন ? আমি নারীদের ভালবাসি। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে কীভাবে ভালবাসতে হয়, তা জানি না।

রুমার দাদা হীরক একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। তাছাড়া অবনীশের স্কুলের এক সহপাঠী এখন বড় ডাক্তার, খবর পেয়ে এসেছিলেন তিনিও। ভয়ের কিছুই নেই। কলেজের অধ্যাপকরা এবং অনেক পরিচিত ও অনুরাগীরাও দেখতে আসে, এক-এক সময় ঘরের মধ্যে রীতিমতন ভিড় হয়ে যায়।

অবনীশ সত্যিই যতোটা দুর্বল, তার চেয়েও বেশি দুর্বলতার ভান করে চোখ বুজে থাকেন সেই সময়। কারুর-কারুর সঙ্গে দুটো একটা কথা বলতেই হয়—কিন্তু চোখ বুজে থাকতেই তার ভালো লাগে, জ্বরের মধ্যে ঘোর-ঘোর অবস্থা অনেকটা নেশার মতন। চোখ বুজলেই দুটো দৃশ্য পরপর ভেসে ওঠে। একটা সেই দম্পতির পাহাড়ে ওঠার দৃশ্য—কষ্ট হচ্ছে খুব, ঘেমে যাচ্ছে—তবু তারা চায় শেষ পর্যন্ত কোনো একটা জায়গায় পৌঁছতে। অবনীশ ইতোমধ্যেই সেই দম্পতির চেহারা তাঁর নিজের আর রুমার মতন করে নিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী নিঃশব্দে উঠছেন পাহাড়ে—যেন চূড়ায় পৌঁছনো না-পৌঁছনোর ওপর নির্ভর করছে তাঁদের জীবন-মরণ। অবনীশকে ভবিষ্যতে এই রকম বিষয় নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতেই হবে। আর একটা দৃশ্য সেই ট্রেনের—কতো নদী, প্রান্তর, অরণ্য পার হয়ে যাচ্ছে সেই ট্রেন—চলছে তো চলছেই—জানালায় সেই দু'টি সহাস্য মুখ। রঞ্জন তার বহুদিনের বঞ্চিত হাসি হেসে নিচ্ছে এখন। অনেকদিন সে পলাতক, পুলিশের ভয়ে নানা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছে, প্রাণ ভরে হাসতে পারে নি—আজ সে প্রচণ্ড খুশি। মস্তবড় নদীর ওপর ব্রিজ, ঝমঝম করে তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ট্রেন—জানালা দিয়েই নদীর জলে রঞ্জন ছুড়ে ফেললো সিগারেটের টুকরো। তারপর একটা কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে হঠাৎ সেই খোসাটা মায়ার চোখের সামনে এনে পিচ করে রস দিয়ে দিল মায়ার চোখে। সেই দৃশ্যে চোখ বোজা অবস্থায়ও অবনীশ হেসে উঠলেন।

রুমা দেখতে পেয়ে বললো, আবার তুমি পাগলের মতন একা-একা হাসছো ? তোমার কি হয়েছে বলো তো ?

অবনীশ চোখ খুলে বললেন, কিছু না। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, চল রুমা, আমি সেরে উঠলে কিছুদিনের জন্য কোথাও একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই।

রুমা খুশি হয়ে বললো, তোমার তাহলে ইচ্ছে হয়েছে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার ? নৈনিতালে গেলেই হয়—বড় মামা এখন ওখানে পোস্টেড, মস্তবড় কোয়ার্টার, কতোবার করে যেতে লিখেছেন, আমরা গেলে যা খুশি হবেন!

—নৈনিতাল-টৈনিতাল নয়—একটা কোনো অচেনা পাহাড়ে। একদম শুরু থেকে ওপরে উঠতে হবে। শুধু তো গল্প লিখলেই হয় না—নিজের জীবনেও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

—গল্প! তুমি বুঝি গল্প লিখতে পাহাড়ে যাবে। সেদিন তোমাকে বলেছি না, কিছুদিন ঐসব লেখা-টেখার চিন্তা ছাড়ো।

—মৃত্যুর আগে ছাড়তে পারবো না। আমাকে যদি কেউ জোর করে লেখা ছাড়িয়ে দেয়—হাত দুটো বেঁধে রাখে, তাহলেও, আমাকে এসব ভেবে যেতেই হবে।

দিন দশেক বাদে অবনীশ যখন বেশ সেরে উঠেছেন, উঠে বসে খাবার-টাবার খাচ্ছেন, আর দিন দুয়েকের মধ্যেই বাইরে বেরুতে পারবেন—সেই রাত্রে অবনীশ আর একটা মনে রাখার মতন স্বপ্ন দেখলেন।

সে রাত্রে খুব ঝড়-জল হচ্ছিল। বছরের প্রথম কালবৈশাখী শুরু হয়েছিল রাত সাড়ে এগারোটায়। অবনীশের ঘরের দরজা-জানালা শক্ত করে আটকানো, তবু চতুর্দিকে ঠকাস্-ঠকাস্ করে জানালা-দরজা আছড়ানোর শব্দ হচ্ছে—সেই সঙ্গে ঝড়ের নিজস্ব শোঁ-শোঁ শব্দ। অবনীশের খুব ইচ্ছে হলো সেই ঝড়ের মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেতে।

অনেকদিন প্রকৃতিকে দেখেন নি। কয়েকদিন রাত্রি জাগরণের ফলে রুমা খুবই ক্লান্ত, সে আজ ঘুমিয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি। দুর্বল পায়ে অবনীশ গিয়ে দাঁড়ালেন বাইরের বারান্দায়। ঝড়ের গতি প্রচণ্ড, ধুলোবালিতে সব দিক আচ্ছন্ন, আকাশে লাল মেঘ। রাস্তাঘাট ফাঁকা—এমনিতেই এতো রাত্রে কেউ রাস্তায় থাকে না আজকাল—দু'একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। রাস্তার ওপাশে খেলার মাঠটির দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বেশ লাগছিলো অবনীশের—সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে। ঝড়ের ঝাপটা এসে গায়ে লাগছে—দুর্বল শরীরে অবনীশের মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা সত্যি ভারি সুন্দর। মরে যাবার কোনো মানে হয় না।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত মন্থর পায়ে হেঁটে আসছে একজন লোক। ঝড়ের দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কোথায় একটা টিনের চালের আওয়াজ হচ্ছে ঠাস–ঠাস করে। এলোমেলোভাবে পাগলের মতন হাত–পা ছুড়ছে মোড়ের বকুলগাছটা। লোকটি তার তলা দিয়ে হেঁটে এলো, একবারও তাকালো না গাছটির দিকে। লোকটা এতো রাত্রে কোথা থেকে আসছে, কেন তার বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই? পৃথিবীতে আছে এ–রকম কিছু–কিছু রহস্যময় মানুষ। সমস্ত রাস্তার সম্রাট হয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে একা। লোকটিকে যতোক্ষণ দেখা গেল—অবনীশ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। লোকটি চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ অবনীশ ভাবলেন ওর কথা। এমন দুর্যোগের রাত্রে ঐ উদাসীন লোকটি কোথা থেকে এলো, কোথায় যাচ্ছে? অনেক বন জঙ্গলে নাকি একজন করে বনদেবতা থাকে—আদিবাসীদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস আছে। এই লোকটিকেও পথের রাজা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

রুমা এসে না ডাকলে অবনীশ হয়তো আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন সেখানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানা খালি দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল রুমা। বারান্দার দরজা খোলা দেখে চমকে উঠেছিল। অবনীশের গায়ে হাত রেখে বললো, তুমি করছো কি বলো তো? এই হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে—মরার শখ হয়েছে বুঝি?

—মরবো কেন, পাগল! অসুখ সেরে গেছে, এখন একটু হাওয়া লাগলে কিছু হবে না। আমার শরীর শক্ত আছে।

রুমা জোর করে ঘরে টেনে আনলো অবনীশকে। বুকের সবটুকু নরম জায়গা দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো। তবু রুমা ঘুমিয়ে পড়ার পরও অবনীশের ঘুম এলো না। আস্তে–আস্তে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে পাশ ফিরলেন।

শেষ রাত্রে দেখলেন সেই স্বপ্ন।

সেই ট্রেনটা এতোক্ষণ পর থেমেছে। একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে হাঁফিয়ে পড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ফোঁস–ফোঁস করে। ট্রেনের কামরা থেকে নামলো রঞ্জন আর মায়া। তাদের পোশাক এমন ধপধপে ও ঝকঝকে যে মনেই হয় না ওরা এতোক্ষণ ট্রেন–জার্নি করেছে। ওদের দু'জনের হাতে দু'টি ছোট্ট ব্যাগ, আর কোনো মালপত্র নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা কোনো গাড়ি নিলো না। হাঁটতে লাগলো, যেন সে জায়গাটা ওদের খুব চেনা।

অথচ অবনীশ তো জায়গাটা চিনতে পারছেন না। এতো হায়দ্রাবাদ নয়, তিনি হায়দ্রাবাদ গেছেন। এ একেবারে অন্যরকমের জায়গা। বিরাট চওড়া রাস্তা, দু'পাশে ফুলগাছ—থোকা–থোকা লাল রংয়ের ফুল। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে রঞ্জন আর মায়া যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে। কিছুদূর যাবার পর ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো একজন লোক, অবনীশ চিনতে পারলেন তাকে। এ সেই লোকটি যে ঝড়ের রাত্রে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে একা–একা হেঁটে গিয়েছিল। সেই পথের সম্রাট এসে অভিবাদন জানাল ওদের এবং আঙুল দিয়ে একটা দিক দেখাল। অর্থাৎ সেই দিকে যেতে হবে।

যেদিকে আঙুল দেখালো, সেদিকে অনেক লোকজনের ভিড়। হয়তো কোনো সাপুড়ে সাপ-খেলা দেখাচ্ছে কিংবা ম্যাজিক দেখাচ্ছে কেউ। ভিড়ের লোকজনের চোখ-মুখ খুব উৎসুক। মায়া আর রঞ্জন গিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে দাঁড়ালো—উঁকি মারলো ভেতরে।

সাপ খেলা-টেলা কিছু নয়, একজন মানুষ মরে পড়ে আছে, চতুর্দিকে রক্ত ছড়ানো। চিত হয়ে দু'হাত ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে লোকটি। স্বপ্নের মধ্যে অবনীশও মায়া আর রঞ্জনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই ভিড়ের মধ্যে। সেই মৃত লোকটিকে দেখার জন্য তিনিও উৎসুক। তার মুখ দেখে অবনীশ অসম্ভব চমকে উঠলেন। মৃতদেহটি তাঁর নিজের। অবনীশ রায়ের মৃতদেহ ভিড় করে দেখছে অত মানুষ। অবনীশ রায় একটু-আধটু বিখ্যাত লোক হলেও তাঁর জন্য কোনোদিন রাস্তায় এত লোকের ভিড় হবে না। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ দেখার জন্য কতো লোক উৎসুক। যদিও কেউ তাঁকে চেনে না এখানে। সকলের মুখেই বিস্ময় চিহ্ন। মৃত্যুটা দুর্ঘটনা না হত্যা তা বোঝা যায় না—মৃতদেহের ঠোঁটের পাশে তখনও লেগে আছে টাটকা রক্ত।

মৃতদেহটা দেখেই রঞ্জন চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে যেতে চাইলো, রুমা তার হাতটা চেপে ধরতে গিয়েও পারলো না। রঞ্জন একেবারে মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ে অবনীশের মৃতদেহের মাথাটা কোলে তুলে নিলো। তারপর মায়ার দিকে তাকালো শূন্যদৃষ্টিতে।

ভীষণ অস্বস্তির সঙ্গে ঘুম ভাঙলো অবনীশের। ঘর অন্ধকার, রুমা পাশে ঘুমোচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে, উঠে গিয়ে জল খেয়েছে অবনীশ। এ রকম অদ্ভুত স্বপ্ন আগে কখনো দেখেন নি। নিজের মৃতদেহ দেখার অভিজ্ঞতায় শরীরটা অবশ লাগছে। কি মানে হয় এসব স্বপ্নের? কোনোই মানে হয় না!

ফিরে এসে শুয়ে চোখ বোজার পরই দৃশ্যটা আবার স্পষ্টভাবে ফিরে এলো। রঞ্জন সেই একইভাবে মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে, স্থির পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে মায়া। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন অবনীশ। তাঁর দু'চোখের পাশ দিয়ে জলের রেখা গড়িয়ে গেল।

সকালবেলা অবনীশের ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। রুমা উঠে পড়েছে অনেকক্ষণ। মাথার কাছে এককাপ চা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। একটু বাদেই রুমা হালকা পায়ে ঘরে ঢুকে বললো, তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে ডাকি নি। দাঁড়াও, আবার চায়ের জল বসিয়ে দিচ্ছি।

সকালে এরই মধ্যে স্নান সেরে ফেলেছে রুমা। অবনীশ তাঁকে ডেকে বললেন, রুমা, শোন! আমি রাত্তিরে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখলাম, আমি মরে গেছি।

রুমা বললো, কী যা তা বলছো, সকালে উঠেই।

— সত্যি দেখলাম। স্বচক্ষে আমার ডেডবডি দেখেছি!

— তা আবার কেউ কখনো দেখে নাকি?

— আমি দেখলাম। রাস্তার মাঝখানে—ধারে কাছে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই।

আমি শুনতে চাই না ওসব কথা —

— শোন না, সব ব্যাপারটা ছবির মতন—

— তোমাকে দেখছি এমনি ডাক্তার দেখালে চলবে না। সাইকো-অ্যানালিস্ট ডাকতে হবে।

— ও সবে আমি বিশ্বাস করি না।

— তাহলে সকালবেলাতেই এসব আজেবাজে কথা বলছো কেন?

— বাঃ, মানুষ স্বপ্ন দেখে না। এক একটা স্বপ্ন এমন অদ্ভুত হয় যে সকালবেলাতেও মাথা থেকে যায় না।

—তা বলে কেউ নিজের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে নাকি?

—আমি দেখলাম। আমার নিজের মরা মুখ।

—শিগগির উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে নাও। গরম জল করে দেব, আজ চান করবে।

রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অবনীশ উঠলেন না, শুয়ে রইলেন। তাঁর আটত্রিশ বছরের জীবনে এই মৃত্যুবোধ তাঁকে অনেকটা হাল্কা করে দেয়। নিজেকে তাঁর খুব নির্লোভ মনে হয়। পৃথিবীতে তাঁর আর কিছুই পাবার নেই। বেশ তো কাটলো একটা জীবন।

চায়ের ট্রে মাথার কাছে রেখে রুমা বললো, তুমি চা-টা খেয়ে নাও, আমি আসছি এক্ষুনি। তিনতলার ফ্ল্যাটের মিসেস মুখার্জি হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি খবরের কাগজ পড়বে?

—না।

—তুমি মুখটা ধুয়ে নাও আগে। তারপর চা খেও। আমি আসছি এক্ষুনি।

রুমা ফিরে এলো একটু বাদেই, প্রায় ছুটতে-ছুটতে। চোখ-মুখ উদ্ভাসিত। হাতে একগোছা ফুল। রহস্য করে বললো, তুমি এখনও কাগজ পড় নি তো! ভালোই হয়েছে।

অবনীশ সামান্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কেন, কী আছে কাগজে? বিশেষ কেউ মারা গেছেন নাকি?

—মিসেস মুখার্জি এই ফুল পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে। ওর এখনো ছেলেকে স্কুলে পাঠানো হয় নি বলে নিজে আসতে পারলেন না। কেন ফুল পাঠিয়েছেন বলো তো?

—উনিও বোধহয় স্বপ্ন দেখেছেন যে আমি মরে গেছি!

—ধ্যাৎ! তোমার খালি আজে-বাজে কথা। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখলে আসলে ভালো খবর পাওয়া যায়। তুমি অনেক টাকা পাবে।

—আমি তো লটারির টিকিট কাটি নি!

রুমা আর চেপে রাখতে পারলো না। বললো, তুমি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছ—তোমার 'সমুদ্রের সামনে একা' বইখানা।

অবনীশ জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বৃষ্টির পর আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। এমন খাঁটি নীল রঙের আকাশ কদাচিৎ দেখা যায়। এইসব সময়ে আকাশকে সত্যিই যেন স্তব্ধ এক নীল যবনিকা মনে হয়।

রুমা জ্বলজ্বলে চোখে জিজ্ঞেস করলো, কি, তুমি খুশি হও নি?

অবনীশ অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কি?

—তুমি পুরস্কার পেয়েছ।

—কিসের পুরস্কার?

—অ্যাকাডেমি—পাঁচ হাজার টাকা।

—আমি?

—হ্যাঁ গো, বলছি না—

অবনীশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কি আজে-বাজে কথা বলছ! পুরস্কার পেলেই হলো নাকি? আমি তো কোন তদ্বির-টদ্বির করি নি। তদ্বির ছাড়া ঐসব পুরস্কার কেউ পায়?

—আমি কি মিথ্যে কথা বলছি নাকি? কাগজে বেরিয়েছে—তাছাড়া রেডিওতেও বলেছে—মিসের মুখার্জি শুনেছেন, উনিই তো বললেন।

রুমা বারান্দা থেকে সুতোয় বাঁধা খবরের কাগজ নিয়ে এলো। অতি ব্যস্ততায় ফরফর করে এপাতা-ওপাতা খুলে প্রথমটায় খুঁজেই পায় না। হঠাৎ একটু হতাশ হয়ে গেল রুমা। তাহলে কি মিসেস মুখার্জি ঠাট্টা করছিলেন তার সঙ্গে? রুমা আশা করেছিল খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই অবনীশের ছবি ও নাম দেখতে পাবে। তারপর চোখে পড়লো। অবনীশের ছবি নেই,

পাঁচ-ছ' লাইনের খবর।

রুমা অবনীশের চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরে বললো, এই দ্যাখ, নিজের চোখে দ্যাখ।

অবনীশ নিরাসক্তভাবে বললেন, আমার কিছু যায় আসে না।

রুমা সেটা লক্ষই করলো না। উচ্ছ্বসিতভাবে বললো, আমি তোমাকে আগেই বলেছি না, এই বইটাই তোমার বেস্ট! বাসনা বলে মেয়েটার চরিত্র খুব দারুণ! শোন, প্রাইজ নিতে তো দিল্লি যেতে হয়—তখন কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—আমি দিল্লি যাবো না।

রুমা বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলো, যাবে না! কেন? এক্ষুনি তো যেতে হচ্ছে না—ততোদিনে তুমি একদম সেরে উঠবে।

অবনীশের সব মনে থাকে। তাঁর মনে পড়লো, রুমা বেশ কয়েকবার বলেছিল, তাঁর এই বইটার সঙ্গে অসিত মজুমদারের কোন্ বইয়ের নাকি বিষয়ের মিল আছে— এবং অসিত মজুমদারের বইটাই বেশি ভালো। এবং আজ সকালে, প্রথমে পুরস্কারের কথা না বলে রুমা বলেছে, তুমি অনেক টাকা পেয়েছ।

তবু রুমার সম্পর্কে অবনীশের একটু মায়া হলো। জোর করে মুখে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে বললো, দিল্লি না গেলেও ওরা পুরস্কারের টাকাটা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবে। তোমার একটা ফ্রিজ কেনার শখ ছিলো, ঐ টাকা দিয়ে কিনো। দিল্লি গিয়ে কি হবে—তার বদলে অচেনা কোনো পাহাড়ে—দু'জনে আমরা হেঁটে-হেঁটে চূড়ায় উঠবো।

রুমা খুব খুশি। চোখে-মুখে বেশ একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠেছে। ফুলগুলো যত্ন করে সাজালো ফুলদানিতে। চাকরকে দোকানে পাঠালো মিষ্টি আনার জন্য। এবং তক্ষুনি মুখে বাজেট ঠিক করে ফেললো, টাকাটা পেলে কী-কী কেনাকাটা করা যাবে।

অবনীশ নীরবে রুমাকে লক্ষ করতে লাগলেন। রুমার হাসিখুশি মুখ দেখলে তাঁর ভাল লাগে। রুমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, টাকাটা তার নিজের উপার্জন। সত্যিই তো তাই—রুমা মনে মনে চেয়েছিল বলেই পেয়েছে—অবনীশ তো কোনোদিন প্রত্যাশা করেন নি। আজ রুমাকে সত্যিই তার স্বামীর জন্য গর্বিত মনে হয়। বাইরের স্বীকৃতিই তার কাছে বড়। পাঁচজনে বলাবলি করবে, অভিনন্দন জানাবে—এতেই রুমার আনন্দ।

অবনীশ ক্লান্তভাবে বললেন, কেউ দেখা করতে এলে বাইরের ঘরে বসিয়ো। আমার এখানে এনো না—বলো, আমার শরীর খুব খারাপ।

— আজ তো তুমি অনেকটা ভালো আছো। সবাইকে কি আর আমি ঠেকাতে পারবো? কেউ কেউ তোমাকে নিজের মুখে অভিনন্দন জানাতে চাইবেই।

— আমার আজ কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

— তোমার বন্ধুরা যদি আসে?

— তোমায় কতোবার বলেছি রুমা, আমার কোনো বন্ধু নেই। লেখকদের কোনো বন্ধু থাকে না।

ঘণ্টাখানেক পর থেকেই লোকজন আসা শুরু করলো। অনুরাগী আর আত্মীয়স্বজনরা অভিনন্দন জানাতে আসছে। অবনীশের আবার জ্বর এসেছে কাঁপিয়ে—অজ্ঞানের মতন আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছেন। বার বার চোখে ভাসছে সেই দৃশ্যটা। তাঁর মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে আছে রঞ্জন। নিজের চোখে নিজের মৃতদেহ দেখেও অবনীশের এখন আর কোনো দুঃখবোধ নেই। বরং এক ধরনের প্রশান্ত উদাসীনতা। রক্তের বদলে তাঁর ঠোঁটের পাশে সামান্য হাসি লেগে আছে।

প্যারা টাইফয়েডে ভুগে দিন পনেরো বাদে অবনীশ সেরে উঠলেন। আবার কলেজে যেতে শুরু করেছেন। তবে লেখায় এখনো মন বসে নি। অভ্যেসবশত প্যাড খুলে কলম হাতে চুপ করে বসে থাকেন, মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা ঘোরে।

এখন অবনীশের কাছে চিঠিপত্র অনেক বেশি আসে। অবনীশ আজকাল মোটামুটি সকলেরই চিঠির উত্তর দেন, সংক্ষিপ্ত, ভদ্র। মেয়েদের চিঠি পেলে হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকেন—কল্পনা করার চেষ্টা করেন সেই সব মেয়ের মুখ। মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান, একটি চিঠির প্রতীক্ষায়। যদিও মায়া বলেছিল চিঠি লিখবে না। না লিখুক, আশা করি ওরা ভালো আছে। কোনো পত্র-পত্রিকায় বাসনা মজুমদারের নামে কোনো লেখাও বেরোয় না। অবনীশ আর কোনোদিন মায়া কিংবা রঞ্জনকে স্বপ্নে দেখেন নি। অবনীশের জগৎ থেকে ওরা লুপ্ত হয়ে গেছে।

অসিতের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। অসিতের বাড়িতে সেই নিমন্ত্রণও রক্ষা করা হয় নি, কারণ ঠিক সেই দিনই অবনীশের জ্বর এসেছিল। অবনীশ পুরস্কার পাবার পর অনেক সাহিত্যিক বাড়িতে এসেছিলেন অভিনন্দন জানাতে—বিশেষত তখন অবনীশের বেশি অসুখ বলেই এসেছিলেন অনেকে—তখনও অসিত মজুমদার আসতে পারেন নি—একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন পাটনা থেকে।

একদিন সকালবেলা সাড়ে দশটার সময় অসিত মজুমদার এসে উপস্থিত হলেন। রুমা তখন ছিল না, ব্যাঙ্কে গিয়েছিল গয়না আনতে। বাড়িতে অবনীশ একা। গণ্যমান্য অতিথির আগমনে অবনীশ বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অসিত মজুমদার বললেন, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার কোনো বিশেষ কাজ ছিল না তো! রুমা আসুক না, আমি বসছি। তারপর, খুব ভুগে উঠলেন তো ? চেহারাটা একটু কাহিল দেখাচ্ছে।

অসিত মুজমদার প্রায় গায়ে পড়েই সেদিন অবনীশের লেখা-টেখার দারুণ প্রশংসা করতে লাগলেন। এতো প্রশংসা যে, অবনীশের পক্ষে রীতিমতন অস্বস্তিকর। বিশেষত 'সমুদ্রের সামনে একা' উপন্যাসটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অবনীশ প্রথম-প্রথম অসিতের প্রশংসার মধ্যে একটা পিঠ-চাপড়ানির ভাব লক্ষ করছিলেন। তারপর আর একটা জিনিসও টের পেলেন। 'সমুদ্রের সামনে একা' বইটার বার বার উল্লেখে বুঝতে পারলেন অসিত মজুমদারের ঈর্ষা হয়েছে। অসিত মজুমদার এখনও পুরস্কার পান নি। পুরস্কারটার তাহলে একটা অন্তত মূল্য আছে দেখা যাচ্ছে—অন্য লেখকদের ঈর্ষা আদায় করা যায়। একদিন অবনীশই ঈর্ষা করতেন অসিতকে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে অবনীশের একটু হাসি এলো। পুরস্কারের এই দিকটা কি সকলে টের পায় ?

অসিত মজুমদারকে আজ একটু চঞ্চল দেখাচ্ছে। ঘনঘন সিগারেট ধরিয়ে আবার নিভিয়ে দিচ্ছেন। কথাবার্তায় ঘনঘন চলে যাচ্ছেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। এক কাপ চা খাবার পর নিজেই আবার অনুরোধ করলেন আর এককাপ চায়ের জন্য।

অসিত মজুমদারের ব্যবহার দেখে মনে হলো, তিনি বিশেষ কিছু একটা কথা বলতে এসেছেন কিন্তু রুমা না এলে বলবেন না। এদিকে রুমা ফিরতে দেরি করছে। মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরুলে আর কিছু মনে থাকে না। বলে গিয়েছিল আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে—ব্যাঙ্ক থেকে গয়না আনতে এর বেশি সময়ও লাগার কথা নয়—কিন্তু আবার কোথায় আটকে গেছে কে জানে।

অবনীশ সঙ্কুচিতভাবে বললেন, ইস, রুমা এতো দেরি করছে !

অসিত বললেন, আমার কিন্তু কোনো ব্যস্ততা নেই। অবশ্য আপনাকে যদি মিছিমিছি আটকে

রেখে থাকি।

—না, না।

রুমা এসে অসিত মজুমদারকে দেখেই একেবারে কলকল করে উঠল। হাতের জিনিসপত্তর ধপাস করে নামিয়ে রেখে বলল, আমি ঠিক জানতাম, আপনি দু'একদিনের মধ্যে আসবেন। আমি সব শুনেছি !

—সব শুনে ফেলেছিস!

—দাদা বলেছে আমাকে।

অবনীশ একটু অবাক হলেন। অসিত সম্পর্কে কী শুনেছে রুমা যা সে নিজের স্বামীকেও বলে নি ? কোনো স্ত্রীর এরকম গোপন কথা থাকে ?

রুমা বললো, শেষ পর্যন্ত সেই বিয়ে করছেন !

অসিত অবনীশের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাস্যে বললেন, আমি আগামী সোমবার বিয়ে করছি। কার্ড দিতে এসেছি।

অবনীশ এটা কল্পনাই করতে পারেন নি। অসিত মজুমদার শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চলেছেন! উনি যে এতোদিন বিয়ে না করে ছিলেন—এজন্য অসিতের সম্পর্কে অবনীশের মনে-মনে একটা প্রশংসার ভাবই ছিল। অসিত মজুমদারই তো একদিন বলেছিলেন, আর্টিষ্টদের বিয়ে করা উচিত নয় ! শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নিজেই ডুবলেন ?

রুমা জিজ্ঞেস করলো, কোন্ মেয়েটি ? সেই স্নিগ্ধা ?

—হ্যাঁ ! তুই তার নাম জানলি কি করে ?

—কলকাতাসুদ্ধু সবাই জানে। আপনি আজকাল সর্বসময় ঐ মেয়েটির সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। আমি মেয়েটিকে দেখি নি অবশ্য, তবে বৌদি বললেন, দেখতে নাকি দারুণ !

অসিত মজুমদার স্তুতি করে বললেন, তেমন থেকে সুন্দরী নয়। তবে দেখতে মন্দ নয়।

অবনীশের দিকে ফিরে বললেন, আপনি চেনেন স্নিগ্ধাকে ? আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি ?

অবনীশ একটু অবাক হয়ে বললেন, আমার সঙ্গে ? না তো!

—ঐ যে মায়া বলে মেয়েটি প্রায়ই আপনার কাছে আসে-টাসে, তারই খুব বন্ধু। সেইজন্য ভেবেছিলাম, বোধহয় আপনার সঙ্গেও পরিচয় আছে।

মায়ার নাম শুনে অবনীশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মায়া তো হারিয়ে গেছে। আস্তে-আস্তে বললেন, মায়া আমার কাছে একবারই মাত্র এসেছিলো।

রুমা অসিতকে বললো, সেই বিয়েই যখন করলেন, তখন এই বুড়ো বয়েসে করলেন কেন ?

অসিত ছদ্মকোপে বললেন, আমি বুড়ো ? মোটেই না। তোমার কর্তার থেকে কত আর বড় ?

—আমরা কিন্তু আপনার বিয়ে সম্পর্কে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলুম!

—সত্যি কথা বলতে কি, আমার বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু আমাদের সমাজ তো লেখক-শিল্পীদের আলাদা কোনো মূল্য দেয় না! লেখক-শিল্পীদের কাছ থেকে সমাজ চায় অনেক, কিন্তু দেয় না কিছুই। আমার তো মনে হয়, আমাদের কিছুটা অসামাজিক থাকাই দরকার—সাধারণ মানুষের মতন সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে পড়লে—অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, স্নিগ্ধার বাবা-মা পছন্দ করছেন না তাঁদের মেয়ের আমার সঙ্গে মেলামেশা। ওঁরা জোর করেই প্রায় স্নিগ্ধার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন অন্য জায়গায়। তাই আমি হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম।

রুমা বললো, ভালো করেছেন। বেশ করেছেন। একবার অন্তত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

অসিত মজুমদার মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েরা তো শুধু আনন্দের সঙ্গীই নয়। অসুখ করলে কোনো মেয়ে কপালে হাত রাখবে—এমন ইচ্ছেও তো মানুষের হয়! অনেকদিন একলা একলা কাটালাম। মাঝে-মাঝে বড় মন খারাপ লাগে। আনন্দ ফূর্তি কম করি নি। যখন হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ হয়, নার্সিং হোমে গিয়ে বিশ্রাম করি, সেবা-যত্ন ঠিকই হয়—তবু পরিচিত বিশেষ কেউ কপালে হাত রাখলে—

অবনীশ আড়-চোখে তাকালেন রুমার দিকে। তারপর অসিতকে দেখলেন। মুখের কথা ছাড়াও এরা এমন একটা ভাষায় কথা বলছে, যা অবনীশের বোঝার কথা নয়। অন্তত বোঝার চেষ্টা না করাই ভালো। সবসময় মানুষের চরিত্র অনুধাবন করা লেখকদের একটা বদ অভ্যেস—মাঝে-মাঝে তার থেকেও বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

অসিত মজুমদারের বিয়েতে অবনীশকে যেতেই হলো। খুব জাঁকজমকের ব্যাপার, বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এসেছেন। বন্দোবস্তও খুব এলাহী। এইসব উৎসবে গেলে অনেক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবেই। কেউ তাঁর লেখার খুব প্রশংসা করলে উত্তরে কী বলতে হবে অবনীশ এখনো শিখতে পারলেন না। কিংবা কেউ তাঁর লেখা সম্পর্কে নিন্দাসূচক বক্রোক্তি করলেও কী উত্তর দেবেন—সে সম্পর্কেও অবনীশের কোনো ধারণা নেই।—বস্তুত, কোনো উত্তর দিতেই অবনীশের ইচ্ছে করে না—আবার এই ধরনের আনন্দের উৎসবে এসে কোনো কথা না বললেও খুবই অভদ্রতা হয়। সবচেয়ে খারাপ লাগে, কেউ যখন তাঁর সঙ্গে ছাত্রদের রাজনীতি বা পরীক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে আসে। তখন অবনীশের মনে হয়, আমি যে অধ্যাপক, সেটা তো আমার প্রধান পরিচয় নয়, আমি লেখক। আবার কেউ প্রকাশ্যে সাহিত্য-আলোচনা করলেও তাঁর ভালো লাগে না। অবনীশ নিজেই বুঝতে পারেন—তাঁর স্বভাবের মধ্যে একটা গভীর গোলমাল আছে। অন্য কারুর সঙ্গে মেলে না। অথচ, তাঁকে এই মানুষের সমাজেই মিলে-মিশে থাকতে হবে।

এই বিয়ের ব্যাপারে রুমার উৎসাহ খুব প্রচণ্ড। সে চলে এসেছিল সকালেই। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি ফিরে আবার চলে এসেছে সন্ধেবেলা—ফুলশয্যার ঘর ও বৌকে সাজানোর ব্যাপারে তার প্রধান ভূমিকা। রুমা অসিতের বাড়ি ভালোই চেনে।

অন্য নিমন্ত্রিতরা চলে যাবার পরও অবনীশকে কিছুক্ষণ থাকতে হলো। রুমা দেরি করছে। ফুলশয্যার সমস্ত খুটিনাটি উপভোগ না করে সে ছাড়বে না। যে-কোনো বিয়ে-বাড়িতেই মেয়েরা একটু চঞ্চলতা বোধ করে। বাইরে আর বিশেষ লোকজন নেই বলে অবনীশও তিনতলায় উঠে বর-বৌয়ের ঘরের কাছে উঁকি মারতে গেলেন। কিন্তু কোনো সুবিধে হলো না—সেখানে মেয়েদেরই আধিপত্য, পুরুষদের জায়গা পাওয়া মুশকিল।

অবনীশ আবার নেমে এলেন নিচে, রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। সুসজ্জিত নিমন্ত্রিতদের বদলে সেখানে এখন ভিখিরিদের ভিড়। এবং কিছু কুকুর। ঝুড়ি ভর্তি-ভর্তি এঁটোকাঁটা ফেলা হচ্ছে পথের পাশে—কুকুরগুলো হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছে সেদিকে—কিন্তু ভিখিরিরা আজ আঁস্তাকুড় থেকে খুঁটে খাবে না—তারা পাত পেড়ে বসে খেতে চায়। অবনীশ সেইদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে একমনে সিগারেট টানতে লাগলেন।

কোনো একটা সময়ে, বাড়ির নিচের তলায় আর একজনও লোক নেই, শুধু অবনীশ একলা দাঁড়িয়ে। আর সকলেই তখন ওপরে। রুমা কি এতো হৈ-চৈয়ের মধ্যে ভুলে গেছে অবনীশের কথা ? তবু অবনীশকে অপেক্ষা করতেই হবে।

কাছাকাছি আর একটা বাড়িতেও বিয়ে হচ্ছিল। সে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হৈহল্লা এখনো

শেষ হয় নি। বারান্দায় দেখা যায় অনেক সুসজ্জিতা রমণীকে। সিগারেট টানতে-টানতে অবনীশ পর্যায়ক্রমে একবার ভিখিরির লাইন ও দূরের উৎসব বাড়ির বারান্দায় রমণীদের দেখছিলেন।

রুমা যখন এলো, তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। ট্যাক্সি পেতে একটু অসুবিধে হলো, কিন্তু সেজন্য রুমার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন অত্যধিক উৎসাহ এবং খুশিতে ছটফট করছে। ট্যাক্সিতে উঠেই বললো, অসিতদাটা কি মিথ্যুক ! সব্বাইকে বলেছে ঐ মেয়ের বয়েস তেইশ কি চব্বিশ। কিন্তু আমি বলে রাখছি তোমাকে—তিরিশের একটুও কম নয়। কি, তোমার তাই মনে না ?

অবনীশ একটু হেসে বললেন, আমি লক্ষ করি নি।

—তুমি কনেকে দেখ নি ?

—দেখেছি একঝলক। কিন্তু অতো সাজগোজ—বয়েস কি বোঝা যায় ? বেশ কমবয়েসীই তো মনে হলো।

—মোটেই না। আমি তো ওকে সাজালাম। আর একটা ব্যাপার কি জান, বলতে নেই, মেয়েটির নিন্দে করা হয়ে যায়—কিন্তু অনেকেই লক্ষ করেছে—ওর দাঁত উঁচু। ঐজন্য দেখবে, হাসবার সময়েও বেশি হাসে না—সামান্য একটু ঠোঁট ফাঁক করে।

—কতোটা ঠোঁট ফাঁক করে তাও লক্ষ্য করেছো ?

—মেয়েরা এসব ঠিক লক্ষ্য করবেই। যাই বল, ঐ মেয়ে যে কী করে অসিতদার মাথা ঘোরালো, কে জানে !

—মাথা যদি ঘোরবার জন্য তৈরি থাকে।

—তা বলে এই চল্লিশ বছরে ? বরের পোশাকে অসিতদাকে এমন মজার দেখাচ্ছিল, দিব্যি ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। আমার কি মনে হয় জানো, অসিতদা নিশ্চয়ই চুলে কলপ দেয়। নইলে এই বয়েসেও একটাও চুল পাকে নি—এ কখনো হয় ? তোমার তো বেশ চুল পেকেছে।

—অনেকের চুল বেশি বয়েসেও পাকে না। লিভার ফাংশান ভালো থাকলে...

—আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। মুখে এমন একটা গদগদ ভাব—যেন বিয়ে করে একটা রাজ্য জয় করেছেন। মেয়েটি শুনলাম কোন একটা ইস্কুলে পড়ায়—অসিতদাকে খুব শাসনে রাখবে মনে হচ্ছে।

রুমাকে আজ যেন অসিতের নিন্দেয় পেয়ে বসেছে। অসিতের কতোরকম খুঁত যে সে বার করছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেও এ প্রসঙ্গ চললো। এক একটা কথা বলছে—আর হেসে ঢলে পড়ছে অবনীশের গায়ে।

অবনীশ বুঝতে পারে এসব কথার মর্ম। একজন লেখকের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এই, সে যে-কোনো সাইকো-অ্যানালিস্ট বা গোয়েন্দার চেয়েও বেশি বুঝতে পারে মানুষের চরিত্র। অবনীশ মনে-মনে হাসতে লাগলেন।

পাজামা পরে অবনীশ বিছানায় শুয়ে পড়েছেন, হাতে সিগারেট। রুমা তখনও আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে নিজেকে। যেদিনই কোনো উৎসব-বাড়িতে বা কোথাও কোনো মেয়ে আরও অনেক মেয়েকে দেখে—সেদিনই সে বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে নিজের রূপ যাচাই করে। আমি হেরে যাচ্ছি না তো—এই প্রশ্ন মনে জাগে।

শরীর থেকে শাড়িটা খুলতে-খুলতে রুমা বললো, এই শাড়িটা তুমি গত ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে দিয়েছিলে। আগে পরি নি। আমাকে কি রকম মানিয়েছিল—একবারও তো বললে না তুমি ?

অবনীশ রুমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হাসিমুখে বললেন, তোমাকে আজ ঠিক কোনো

ব্যর্থ প্রেমিকার মতন সুন্দর দেখাচ্ছিল।

রুমা ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তার মানে ?

অবনীশ হালকাভাবে বোঝালেন, এমনিই বললাম। পৃথিবীতে ব্যর্থ প্রেমিকাদেরই সবচেয়ে সুন্দর দেখায়, তাই না ? আমার তো তাই মনে হয়।

—তুমিই ভালো বলতে পারবে। তুমি নিশ্চয়ই সে রকম অনেক মেয়েকে দেখেছো।

—তুমি রেগে যাচ্ছো নাকি ?

—না, রাগবো কেন! মাঝে–মাঝে তোমার অদ্ভুত কথার কোনো মানে বুঝতে পারি না।

—এটা কি খুব অদ্ভুত কথা ?

—লেখক হলেই সবজান্তা হয় না। নিজেকে সবসময় অত বেশি বুদ্ধিমান মনে করো না।

অবনীশ তখন রুমার শরীর থেকে চোখ সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো, তোমাকে একটু আদর করি। খুব ইচ্ছে করছে।

রুমা বিছানায় আসবার পর অবনীশের মনে হলো, সারাজীবন তাকে একজন ব্যর্থ প্রেমিকার সঙ্গে ঘর করতে হবে। তবে এ অনুভূতিটা ঠিক দুঃখ বা রাগ বা ঈর্ষার নয়। খানিকটা প্রশান্তির। কেন না, অবনীশ নিজেও তো ব্যর্থ প্রেমিক। এ পর্যন্ত কতো মেয়ের প্রেমে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, এমন কি যে–সব মেয়েকে তিনি চোখেও দেখেন নি, যাদের চিঠি পেয়েও উত্তর দেন নি—তাদেরও তো তিনি প্রেমিক।

রুমাকে আলিঙ্গন করায় সত্যিই তাঁর মনে হলো, এ যেন তাঁর এতোদিনের চেনা রুমা নয়, যেন অন্য কারুর প্রেমিকাকে তিনি গোপনে আদর করছেন। বেশ একটা রোমাঞ্চ জাগলো সেই অনুযায়ী।

৯

লাল রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূরে গেলে একটা ছোট্ট নদী। সেই নদীতে এতো কম জল যে হেঁটেও পার হওয়া যায়। বড়–বড় পাথরের চাঙাড় পড়ে আছে, তার ওপর পা ফেলে–ফেলে হেঁটে গেলে পায়ে জল লাগে না। অবশ্য নদীর ওপরে একটা ব্রিজও আছে গাড়ি–চলাচলের জন্য। ব্রিজের ওপাশ থেকেই রাস্তাটা উঁচু হয়ে গেছে, অল্প–অল্প জঙ্গল, তারপর পাহাড়ের খাড়াই।

অবনীশ একদিন তাঁর বন্ধু হিরণ্ময়ের সঙ্গে গাড়ি চেপে ঐ ব্রিজ পেরিয়ে গিয়েছিলেন ওপারে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একটু দূর যেতে না যেতেই গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তারপর আর হেঁটে বেশি দূর যাওয়া যায় নি। বরং গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

হিরণ্ময় বলে রেখেছে, আর একদিন যাবে ঐ পাহাড়ে শিকার করতে। এখানে প্রায়ই সম্বর ও নীলগাই দেখতে পাওয়া যায়, মাঝে–মাঝে চিতাবাঘও আসে। অবনীশ বন্দুক আনেন নি, কিন্তু হিরণ্ময়ের বন্দুক আছে, তবে হিরণ্ময় এখন কয়েকদিন সময় পাচ্ছেন না।

এই ছোট্ট নদীটি অবনীশের খুব ভালো লাগে। রোজই বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে আসেন এখানে। লোকজনের ভিড় নেই—চারিদিকটা অদ্ভুত শান্ত—এমনকি একটা পাখির ডাকও বহুক্ষণ ধরে শুনতে পাওয়া যায় না। আস্তে–আস্তে সন্ধে হয়ে আসে—ঠাণ্ডা ধরনের নীরবতা মিলে যায় অন্ধকারের সঙ্গে—পাহাড়ের মাথার কাছে মেঘ অনেকক্ষণ লাল হয়ে থাকে।

রুমা আসতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। অসুখ থেকে ওঠার পর অবনীশ বাইরে কোথাও যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোন জায়গায় যাওয়া যায়—কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। এমন সময় অবনীশের কলেজের বন্ধু হিরণ্ময় একদিন এসে হাজির। হিরণ্ময় খুব ইংরেজি–নবিশ

সাহেব-ঘেঁষা মানুষ। মস্তবড় চাকরি করে একটা সিমেন্ট কোম্পানিতে। সম্প্রতি তার কোম্পানির নতুন একটা ফ্যাক্টরি হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট শহরে—সেখানে কিছুদিন থাকতে হচ্ছে হিরণ্ময়কে। হিরণ্ময়ের সেখানে মস্তবড় বাংলো, সম্পূর্ণ ফাঁকাই পড়ে আছে—কারণ তার মেম-বউ বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে গেছে নিজের দেশে। হিরণ্ময় সেই জায়গাটার এমন বর্ণনা দিলো—যেন সেটা সভ্যতা থেকে বহুদূরে আদিম জগতের মধ্যে—অথচ সভ্যজগতের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে আছে। অর্থাৎ তাঁর বাংলোতে স্নানের জন্য গরম জল এবং বাথরুমে কমোড—অথচ জানালা খুললেই দেখা যায় নিবিড় জঙ্গলমাখা পাহাড় এবং রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ঘাই হরিণীর ডাক শোনা যায়।

হিরণ্ময় ছটফটে ধরনের মানুষ। বাংলা তিনি পড়েন না, অবনীশের লেখক সত্তা সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়েছেন অবনীশের সঙ্গে—তারপর কানপুরে আবার দেখা। তখন কয়েকবার অবনীশের সঙ্গে শিকারে গেছেন। সেই হিসেবেই তিনি অবনীশকে চেনেন—মাঝখানে বেশ কয়েক বছর দেখা না হলেও তাঁর উৎসাহ একটুও কমে নি। সেইদিনই তিনি ওঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।

রুমার খুব পছন্দ হয়ে গেল—হিরণ্ময়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও হয়ে গেল—কিন্তু সেই সময় হঠাৎ আবার ঠিক হয়ে গেল রুমার এক মাসতুতো বোনের বিয়ে—মাসতুতো বোন, কিন্তু মায়ের পেটের বোনের মতনই আপন। তার বিয়ের সময় রুমা কি বাইরে থাকতে পারে? সে প্রশ্নই ওঠে না। যাত্রা বাতিল হয়ে যাচ্ছিলো, তখন অবনীশ ঠিক করলেন যে তিনি একাই যাবেন। মাসতুতো শালিকার বিয়েতে তাঁর না থাকলেও চলে কিন্তু এমন বেড়ানোর সুযোগটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। রুমা খুব একটা আপত্তি করলো না—অবনীশ তাঁর প্রাইজের টাকার পুরোটাই তুলে দিয়েছেন রুমার হাতে। ইচ্ছে মতন টাকা খরচ করার সুযোগ পেয়ে রুমার মনে ইদানীং একটা ফুর্তি আছে। তাছাড়া, সে-ও স্বীকার করে, অবনীশের কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম দরকার। কলকাতায় থাকলেই তো দিন রাত লেখা-টেখার চিন্তা। মানুষ কি এতো পারে!

এখানে এসে দেখলেন, হিরণ্ময়ের অনেক কিছুই বাড়িয়ে বলা। অবনীশ মনে মনে যে-রকম কল্পনা করেছিলেন, সে-রকম কিছু না। হিরণ্ময়ের বাংলোটি বেশ ভালোই, তবে তার জানালা থেকে অরণ্য-পর্বত দেখা যায় না, হরিণের ডাকের বদলে বহু রাত পর্যন্ত মাইকে হিন্দি গান বাজে। ছোট, ঘিঞ্জি শহর। শহর থেকে বেরিয়ে পাঁচ-ছ' মাইল দূরে গেলে নিরালা শুরু হয়—তারপর থেকে সত্যিই সুন্দর। তার পর থেকে জঙ্গলের রেখা দেখা যায় এবং ঐ নদী।

হিরণ্ময় অফিসের কাজে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যদিও আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন যে দিন পাঁচ-ছয় বাদে তিনি সম্পূর্ণ ফ্রি হয়ে যাবেন। তখন দিনরাত ঘুরবেন পাহাড়ে-জঙ্গলে। তার আগে অবনীশ যদি চলে যাবার চেষ্টা করেন, তাহলে অবনীশের হাত-পা বেঁধে রাখা হবে।

হিরণ্ময় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও অবনীশের কিন্তু খারাপ লাগছে না। বরং সমস্ত সময়টা একা থাকা তাঁর পক্ষে বেশ উপভোগ্য। হিরণ্ময়ের অফিসের বড়কর্তারা এসেছেন বলে হিরণ্ময় সকাল দশটার পরই কনফারেন্সে বেরিয়ে যান—তারপর প্রায় সন্ধে সাত-আটটা পর্যন্ত অবনীশের একা কাটে। দুপুরে অবনীশ বেরুতে পারেন না—অসহ্য গরম। শুয়ে-শুয়ে সময় কেটে যায়। লেখা থেকে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়েছেন, এক লাইনও লেখেন নি এখানে এসে, চিঠিপত্রও না—পৌঁছবার পর শুধু রুমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন।

একগাদা ইংরেজি গোয়েন্দা-গল্প ছাড়া হিরণ্ময়ের বাংলোতে আর কোনো বই নেই। দুপুরে ঘুমোবার বদলে একটার পর একটা সেই বই পড়েই শেষ করতে লাগলেন। আগে কখনো ডিটেকটিভ গল্প পড়তেন না, এখন রীতিমতন নেশা লেগে গেল।

সন্ধের পর রোদ পড়ে এলেই ভারি চমৎকার হাওয়া দেয়। সূর্যদেব সব তাপ সঙ্গে নিয়ে চলে যান, তারপর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে। এককাপ চা খেয়ে অবনীশ বেরিয়ে পড়েন। হাঁটতে-হাঁটতে চলে আসেন সেই নদীটির ধারে। প্রায় পাঁচ-ছ'মাইল—বহুদিন অবনীশ এতোটা হাঁটেন নি। ফেরার সময় একটু একঘেয়ে লাগে।

নদীর গর্ভে নেমে একটা বড় পাথরের ওপর অবনীশ বসে থাকেন চুপ করে। পায়ের কাছে তিরতিরে জলের রেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখা যায়—সেই জলে খুব ছোট-ছোট মাছ খেলা করছে। অবনীশ সিগারেটের ছাই ফেলে-ফেলে মাছগুলোকে ভয় দেখান।

তিন চারদিন এই নদীর ধারে আসবার পর অবনীশের বেশ একটা নেশা ধরে গেল! এখানে কেউ নেই, তিনি নিজেই নিজের সঙ্গী। জলে তাঁর মুখের ছায়া পড়ে, অবনীশ সেই ছায়ার সঙ্গে কথা বলেন। এমন অবকাশ সহজে পাওয়া যায় না।

তখনও বিকেলের আলো মেলায় নি, একটা টাঙ্গা এসে থামলো ব্রিজের কাছে। তার থেকে নামলো একটি যুবতী মেয়ে এবং একজন বয়স্ক পুরুষ। দূর থেকে অবনীশ তাদের মুখ দেখতে পেলেন না। মেয়েটি পরে আছে সাদা শাড়ি—শেষ বিকেলের আলোর সঙ্গে সেই রং মিশে যাচ্ছে। পুরুষটির পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবি।

এরকম ভ্রমণার্থী এখানে বিশেষ চোখে পড়ে না। অবনীশ আগে একদিনও দেখেন নি। এ জায়গাটার কোনো খ্যাতি নেই ভ্রমণকারীদের কাছে—নিতান্তই একটা ছোট শহরের পাশে পাহাড়ী জংলা জায়গা, আর সামান্য একটা নদী।

বয়স্ক পুরুষটি উঠে দাঁড়ালেন ব্রিজের ওপর, মেয়েটি নেমে এলো নদীতে। অবনীশ যেদিকে বসে আছেন, তার উল্টোদিকে। পাথরের ওপর চটি খুলে রেখে মেয়েটি জলে পা ডুবিয়ে হেঁটে গেল ওপারে, পুরুষটিও ততোক্ষণে ওপারে পৌঁছেছেন। আবার ঐ একইভাবে ফিরে এলেন দু'জনে।

এবার অবনীশ চিনতে পারলেন। মায়া! মায়াকে এই জায়গায় দেখে অবনীশ একটুও চমকে উঠলেন না। তিনি যেন মনে-মনে প্রতীক্ষা করছিলেনই—কোথাও দেখা হয়ে যাবেই মায়ার সঙ্গে। হায়দ্রাবাদ থেকে এই জায়গাটা তো দূরে নয়।

কিন্তু সঙ্গের বয়স্ক পুরুষটি কে? এতো রঞ্জন হতেই পারে না। রঞ্জনের এতো বয়েস কী করে হবে? অসম্ভব, তা অসম্ভব! হয়তো রঞ্জনের কোনো আত্মীয় থাকেন এখানে—হায়দ্রাবাদ থেকে তাই ওরা বেড়াতে এসেছে।

অবনীশ মায়াকে ডাকলেন না। মুখ নিচু করে বসে রইলেন বরং। তাঁর পক্ষে উচিত নয় বেশি উৎসাহ দেখানো। রঞ্জনের নাকি খুব ঈর্ষা। সে হয়তো পছন্দ করবে না অবনীশকে। হয়তো বিরক্ত হয়ে ভাববে, এতো দূরের নাম-না-জানা জায়গাতে এসেও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা! যারা হানিমুন করতে যায়—তারা চেনা মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে না।

তাছাড়া মায়া সম্পর্কে তিনি বেশি উৎসাহ বোধ করবেনই বা কেন? মায়া কে? তাঁর লেখার একজন পাঠিকা মাত্র। ওরকম পাঠিকা অবনীশের আরও অনেক আছে—অনেকেই চিঠি লেখে, কেউ দেখাও করে। তবু, অবনীশ হঠাৎ একদিন মায়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং মায়া কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল, আপনি কেন এলেন?

টাঙ্গাটা অপেক্ষা করেই আছে। মায়া আরও একটুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো নদীর পারে। কয়েকটি আদিবাসী ছেলে সারাদিন মাঠে কাজ করে এসে এখন ঐ শুকনো নদীতেই হৈ-হৈ করে স্নান করতে লেগে গেছে। মায়ার মনোযোগ সেদিকে। অবনীশ সেখান থেকে অনেক দূরে। অন্যমনস্কভাবে ঢিল কুড়িয়ে-কুড়িয়ে জলে ফেলতে লাগলেন। একবার চোখ তুলে দেখলেন এই

টাঙ্গাটা মায়াকে নিয়ে চলে গেছে।

তখন অবনীশের বুক খালি করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। মায়াকে এই জায়গায় আকস্মিকভাবে দেখেও তিনি কোনো কথা বললেন না! এটা কি তাঁর অহঙ্কার না দুর্বলতা? আসলে, মায়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য কি তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন না? মায়াকে এতো সহজে তিনি চলে যেতে দিলেন! আর কোনোদিন দেখা হবে না। মায়া তাঁকে দেখতে পায় নি, তার দিক থেকে কোনো দোষ নেই। কিন্তু অবনীশ মায়াকে দেখেও ডাকেন নি।

আরও বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন অবনীশ। আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাখিরা বাসায় ফেরার আগে প্রাণপণে শেষবার ডেকে নিচ্ছে খুব। আকাশের রং লালচে—খুব সম্ভবত বৃষ্টি হবে। নদীর ওপারের পাহাড়টাকে মনে হয় খুব রহস্যময়। নিঃস্ব রিক্ত মানুষের মতন অবনীশ সেখানে একা।

অবনীশ ফেরার জন্য উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময় আর একটি টাঙ্গা এসে থামলো। সেই টাঙ্গা থেকে এবার শুধু একটি মেয়ে নামলো। এখানে এই সময় একা কোনো মেয়ে আসবেন? আর কেউ নয়, মায়া।

অবনীশের মনে হলো, তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। প্রথমত এই জায়গায় মায়াকে দেখতে পাওয়াই অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। তারপর আবার ঠিক একই রকমভাবে টাঙ্গা চেপে মায়ার ফিরে আসা যেন অলৌকিক ব্যাপারের মতন। বিশ্বাস হতে চায় না।

মায়া কোনো দ্বিধা না করে সোজা অবনীশের দিকে এগিয়ে এসে পরিষ্কার গলায় বললো, আমার ভয় হচ্ছিলো এসে আর আপনাকে দেখতে পাবো না। আপনি চলে যাবেন।

অবনীশ সত্যিকারের বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, একি, তুমি এখানে?

মায়া সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন তো? টাঙ্গাটাকে ছেড়ে দিই?

অবনীশ কিছু বলার আগেই মায়া ফিরে গিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিলো। অবনীশকে পয়সা বার করার সুযোগও দিলো না। তারপর অবনীশের পাশে দাঁড়িয়ে বললো, একবার ভেবেছিলাম আসবো না। আপনি তখন আমার সঙ্গে কথা বলেন নি কেন?

—তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

—নিশ্চয়ই। আমিও আপনাকে দেখতে পেয়েছি, আপনিও আমাকে দেখেছেন। এই রকম ফাঁকা জায়গায় সবাই-সবাইকে দেখতে পায়।

—দেখলেও কি চিনতে পারা যায়?

মায়া রীতিমতন ধমক দিয়ে বললো, আপনি ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন আমাকে। বলুন সত্যি করে, চিনতে পেরেছিলেন কিনা?

সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে অবনীশ বললেন, তুমিও তো চিনতে পেরেছিলে। তুমি কথা বল নি কেন?

—আমি তো মেয়ে, আমার কি প্রথম কথা বলা উচিত?

—তাহলে এখন এসে কথা বললে কেন?

—সেটা তো আমি নিজেও জানি না। বাড়ি ফিরেই কী রকম যেন মনে হলো—আবার সঙ্গে-সঙ্গে চলে এলাম। বোধহয় ভাবলাম, নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কি? আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে—একথা তো ঠিক—সুতরাং না-বলার কোনো মানে হয় না।

—তা বলে তুমি আবার চলে এলে একা-একা?

—কেন, এসে কোনো দোষ করেছি?

—না, সে কথা বলছি না। হঠাৎ এরকমভাবে অনেকেই আসে না। আমার সঙ্গে কি বিশেষ কিছু কথা আছে তোমার।

— বিশেষ কিছু ? না, সেরকম কিছু না।

— তুমি টাঙ্গা ছেড়ে দিলে—আমার সঙ্গে হেঁটে ফিরতে কিন্তু অনেক রাত হবে।

— হোক গে রাত। যতো দেরিই হোক—আমার কিছু যায়-আসে না।

দু'জনে আপনমনে হেঁটে যাচ্ছিলো ব্রিজের দিকে। হঠাৎ মায়া থমকে দাঁড়ালো। আহতভাবে বললো, আমি এসেছি বলে বিরক্ত হলেন ? আপনি বসে-বসে কারুর ধ্যান করছিলেন, আমি সেই ধ্যান ভেঙে বিরক্ত করলাম ?

অবনীশ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না বিরক্ত হবো কেন ?

—তাহলে আপনি ওরকম কাটা-কাটা কথা বলছেন কেন ? প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন যে-রকম বলছিলেন ?

— সেটা বোধহয় আমার স্বভাবের দোষ। আমি কিন্তু সত্যি খুব খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে।

— আমি আবার ফিরে এলাম কেন বলবো ? আপনি হঠাৎ নিজে-নিজে আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন দুপুরবেলা ?

— ঠিক কারণটা আমি নিজেই জানি না।

— আমারও তাই। বিনা কারণে অনেক সময় এক-একটা জিনিস করতে খুব ভালো লাগে।

— ওসব কথা থাক ! কেমন আছো তাই বলো ?

— আমি ? আমি এখন খুব ভালো আছি। তবে, মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য আমি নাকি একটু পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই তাই বলে। এখন কিন্তু সেরে উঠেছি।

অবনীশ চমকে উঠে বললেন, কি বলছো কি ?

মায়া তার সুন্দর মুখখানি অবনীশের দিকে পুরোপুরি মেলে দিয়ে বললো, হ্যাঁ, সত্যি। আমি কয়েকদিনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এখন একদম ভালো হয়ে গেছি আবার। বলুন, ভালো হয়ে যাই নি ? আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয় ?

অবনীশ আলতোভাবে মায়ার কাঁধ ছুঁয়ে আন্তরিকভাবে বললেন, কি হয়েছে কি তোমার, সত্যি করে বলো তো ?

মায়া সাবধানে অবনীশের স্পর্শ থেকে সরে গেল। তারপর বললো, এখন আমি সত্যি ভালো আছি। আপনি কি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন ?

অবনীশ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মতন চাপা ধরনের মানুষেরও মুখখানা বেশ বিচলিত দেখায়। মায়ার পাগল হয়ে যাওয়ার কথাটায় তাঁর বুকে একটা আকস্মিক আঘাত লাগে। তিনি মানুষের পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারেন না। মায়া কেন পাগল হবে ? ওকি হঠাৎ এই সন্ধেবেলা অচেনা জায়গায় অবনীশের সঙ্গে ঠাট্টা করার জন্য ফিরে এসেছে ?

রঞ্জন কোথায় ?

মায়া খট্‌খট্ করে জুতোর শব্দ তুলে ব্রিজ দিয়ে হাঁটতে লাগলো নদীর ওপাশের দিকে। অবনীশ সত্যিই একটু ভয় পেলেন। দ্রুত এগিয়ে মায়ার পাশে এসে বললেন, এখন ওদিকে যাচ্ছো ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে। রঞ্জন খুব চিন্তা করবে। তাছাড়া রঞ্জন যদি শুনতে পায় তুমি অন্য কারুর সঙ্গে এতোক্ষণ পর্যন্ত...

মায়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। তার হাসি যেন টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল হওয়ায়। কিছুটা গিয়ে নদীর জলে মিশলো, কিছুটা দুলতে-দুলতে চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

হাসতে–হাসতেই মায়া বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। রঞ্জন খুব চিন্তা করে। রঞ্জন বড্ড হিংসুক। রঞ্জন চায় না আমি অন্য কারুর সঙ্গে মিশি। কিন্তু আমি রঞ্জনকে আর গ্রাহ্য করি না। আমার আর কিছু যায়–আসে না।

— তার মানে ? রঞ্জনের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

— না, ঝগড়া করার আর সুযোগ পেলাম কোথায় ? আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য রঞ্জন যদি আমার ওপর রাগ করতো, তাহলে আমি ওর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতাম। কিন্তু রঞ্জন সে সুযোগ আমাকে দেবে না।

— কী ব্যাপারটা হয়েছে খুলে বলো তো ? রঞ্জন কোথায় ? রঞ্জন এখানে নেই ?

— শুধু এখানে কেন, রঞ্জন বলেই কেউ নেই। 'রক্তকরবী' নাটকটা মনে আছে নিশ্চয়ই ? সেই নাটকের নায়ক রঞ্জনকে যেমন কখনো দেখা যায় নি।

— রঞ্জন নামটা তো আমি বানিয়ে ছিলাম।

— আমি তোমার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

— আমার স্বামী ! আমার স্বামী আবার কে ?

— বাঃ, তোমার বিয়ের পরদিনই তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। তোমার স্বামী—যার নাম আমি রঞ্জন রেখেছিলাম।

— ও, আপনি জানেন না বুঝি ? তাই তো, আমার কিছুদিন মাথা খারাপ ছিল তো, সেই জন্য অনেক কিছু ভুলে গেছি। আপনি কী করে জানবেন, আপনার তো তখন অসুখ। আপনি যার নাম রঞ্জন দিয়েছিলেন, তার আসল নাম শান্তনু। শান্তনু দাশগুপ্ত। এখন আর আসল নাম বলতে কোনো বাধা নেই। শান্তনুর সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি বিধবা। শান্তনু মারা গেছে।

— অ্যাঁ ? কি বলছো কি ?

— এতো আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ? মানুষ কি মরে না ? অনেকেই তো মরে। বিশেষত আজকাল যারা রাজনীতি করতে যায়—তাদের যে কেউ তো যখন তখন...

— একথা তুমি আমাকে এতোক্ষণ বলো নি কেন ?

— আমি কি করে জানবো যে আপনি আগেই এটা শোনেন নি ? তাছাড়া আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তো, তারপর থেকে আমার সবকিছুই উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

— ওর নাম ছিল শান্তনু ? ওকে আমি একবার চোখের দেখাও দেখলাম না ?

— থাক। ওর কথা বলে আর কী হবে ? ও হারিয়ে গেছে ! ও আর কোথাও নেই।

ততোক্ষণে ওরা নদী পেরিয়ে এসে পা দিয়েছে জঙ্গলের রাস্তায়। অবনীশ একটা গাছে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়ালেন। কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। কোনো কাজও খুঁজে না পেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর আস্তে–আস্তে বললেন, মায়া, তোমাকে কী করে সান্ত্বনা দেবো আমি জানি না। সে–রকম ভাষা আমার জানা নেই।

বিষাদের সঙ্গে সামান্য হাসি মিশিয়ে অদ্ভুতভাবে মায়া তাকালো অবনীশের দিকে। বলল, তার কিছু দরকার নেই। খবরটা শুনে প্রথমটায় আমি এমন আঘাত পেয়েছিলাম যে আমার মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছি। ও–কথার বদলে আসুন আমরা অন্য কথা বলি। আপনার 'সমুদ্রের সামনে একা' বইটা পুরস্কার পেয়েছে বলে আমি খুব খুশি হয়েছি।

— মায়া, প্লিজ, ও–কথাও থাক।

— ঐ উপন্যাসের বাসনা নামের মেয়েটির সঙ্গে আমার নিজের খুব মিল খুঁজে পেতাম।

কিন্তু এখন একটা কথা মনে হচ্ছে, আপনি বাসনাকে শেষ পর্যন্ত বিধবা করলেন কেন ?

— ওটা তো গল্প।

— আমার সঙ্গে কী রকম মিলে গেল।

— মায়া, আমার জীবনী-শক্তির অর্ধেক দিয়েও যদি রঞ্জনকে বাঁচাতে পারতাম—তাহলে নিশ্চয়ই তা করতাম।

— আচ্ছা, এমন হতে পারে না—ভবিষ্যতে কোনো একটা ঘটনা ঘটবে এটা আগে থেকেই লেখকরা দেখতে পান। সেইজন্য তাঁরা যা লেখেন—পরে অন্য কারুর জীবনে সেটা মিলে যায়। লেখকরা এরকম পারেন না ?

— কোনো কোনো লেখক হয়তো পারতে পারেন, আমার সে ক্ষমতা নেই।

— রাম না জন্মাতেই যেমন রামায়ণ লিখেছিলেন বাল্মীকি।

— আমি বাল্মীকির নখেরও যোগ্য নই। লেখক হিসেবে আমার কোনো কৃতিত্বই নেই। মানুষ হিসেবেই যদি আমি রঞ্জনকে বাঁচাতে পারতাম—যে-কোনো মূল্যে এমন কী আমার আয়ুর বিনিময়েও।—

— এটা কি আপনি আমার কথা ভেবে বলছেন, না ওর কথা ভেবে ? ওকে কখনো দেখেন নি—

— দু'জনের কথা ভেবেই। রঞ্জনকে আমি কখনো চোখে না দেখলেও ওকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

— আশ্চর্য তো।

— ব্যাপারটা কি করে ঘটলো ? রঞ্জনের কি হয়েছিল ?

— যেটা খুব স্বাভাবিক, সেটাই হয়েছে। যারা শান্তনুকে মেরে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছিল—তারাই একদিন ওকে বাগে পেয়ে গেল। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছে, তারপর পেটে ছোরা বসিয়ে—

— থাক, আর বলতে হবে না।

— ওরা যখন সেই মারলোই ওকে—আর কয়েকদিন আগে তো মারতে পারতো। শুধু-শুধু আমাকেও বিধবা করে দিলো।

— রঞ্জন শেষ ক'টা দিন অন্তত শান্তি পেয়েছিল।

— আপনি এখনো ওকে রঞ্জন বলছেন। সেটাই ভালো। ওর নাম রঞ্জনই থাক।

— ব্যাপারটা কবে ঘটেছিল ? আমি তোমার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, তার দু'তিনদিন বাদেই তো তোমাদের বাইরে চলে যাবার কথা ছিল ? যেতে পারো নি ?

— না, ওরই নানান অসুবিধের জন্য পিছিয়ে যাচ্ছিল। পরপর কয়েকদিন ও আমার সঙ্গে দেখাও করে নি। তারপর হঠাৎ এক সন্ধেবেলা—ওর ঘটনাটা কিন্তু কাগজে বেরিয়েছিল। কবে জানেন ? যেদিন আপনার পুরস্কার পাবার খবর বেরিয়েছিল, ঠিক সেদিনই। আপনি পড়েন নি ?

অবনীশের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচলের গতি দ্রুত। উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছে। মায়ার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না! এ কখনো সম্ভব ?

মায়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বললো, কি সম্ভব নয় ?

— আমি সেদিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখেছিলাম, তোমরা দারুণ ফুর্তিতে আছো, তোমরা ট্রেনে করে বহুদূর বেড়াতে গেলে—তারপর একটা অচেনা জায়গা—সেখানে

আমি রাস্তায় মরে পড়ে আছি—আর রঞ্জন আমার মাথাটা তার কোলে তুলে নিলো—

মায়া বললো, এ কি,—আপনি অতো কাঁপছেন কেন ?

— মায়া, তুমি বুঝতে পারছ না ? সেদিন আমি আমার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, আমি মরে গিয়ে রঞ্জনকে বাঁচাতে!

— কেন ?

— আমার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই সেই ইচ্ছেটা খুব তীব্র ছিল। রঞ্জন যেন আমারই সত্তার একটা অংশ। না হলে, সেই রাত্তিরেই ওরকম স্বপ্ন আমি দেখলাম কেন ?

— যদি সত্যিই তাই হতো—আপনি মরে গিয়ে রঞ্জন বেঁচে উঠতো—তাহলে আমি পুরোপুরি পাগল হয়ে যেতাম। আর কোনো দিন সেরে উঠতাম না।

— যাঃ, এসব কি বলছো ! পাগল হবে কেন ?

— আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ? রঞ্জনের মৃত্যুর কথাটা হঠাৎ যখন ওর এক বন্ধু এসে বললো—শুনে আমি একটুও অবিশ্বাস করি নি—আমার মাথাটা কী রকম ঝিমঝিম করে উঠলো—আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর দশ-এগারো দিন কী হয়েছে, কী করেছি আমি—সে-সব কথা আমার কিছু মনে নেই। আমি নাকি অনবরত কথা বলতাম—কি সব আবোল-তাবোল, আপনার কথাও বলেছি, যখন-তখন রাস্তায় বেরিয়ে যেতে চাইতাম—তারপর আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে গেল।

— হঠাৎ একটা মানসিক আঘাতে ও-রকম হয়।

— খুব হঠাৎ কি বলা যায় ? এরকম একটা আশঙ্কা তো ছিলই। তবু যেন মনে-মনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। আমরা একসঙ্গে হায়দ্রাবাদ যাবো বলে আমার বাক্স-টাক্স সব গুছানো হয়ে গিয়েছিল। শান্তনু দাড়ি রেখেছিল—বাইরে যাবার পর দাড়ি কামিয়ে ফেলবে বলে আমি ওর জন্য শেভিং-সেট, সাবান-টাবান কিনে রেখেছিলাম। ও হ্যাঁ, শুনুন। ঐ ঘটনা ঘটে যাবার দিন পনেরো পর আমি একটা চিঠি পেলাম। গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা—লেখকের কোনো নাম-ঠিকানা নেই। তাতে লেখা আছে, রঞ্জনের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমরা জানতাম না। আমরা দুঃখিত। তবে আর একটা ঘটনাও জেনে রাখুন। রঞ্জনের নেতৃত্বে চারজনের একটি দল অশোকনগরে একজন স্কুল-মাস্টারকে খুন করে। সেই ভদ্রলোকেরও মাত্র দেড় বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, তাঁর স্ত্রীর একটি পাঁচ মাসের বাচ্চা ছিল। রঞ্জনরা তো সে কথা ভাবে নি। এই ঘটনা শুনে আপনি একটু সান্ত্বনা পেতে পারেন।

— একটা মৃত্যু দিয়ে কখনো আর একটা মৃত্যুকে যাচাই করা যায় না। তবে, সবচেয়ে দুঃখের কথা এই—রঞ্জনদের দল ভেঙে গেছে, ওদের পদ্ধতি ভুল প্রমাণিত হয়েছে—মাঝখান থেকে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারালো—এবং সেই ট্রাজেডি বুকে নিয়ে রইল আরও কয়েক হাজার মানুষ। আদর্শের উন্মাদনায় যখন মানুষ ছোটে—তখন আলাদা-আলাদা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কেউ ভাবে না। অথচ মানুষের—

— আপনার সঙ্গে যেদিন আমি প্রথম দেখা করতে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন, আপনি রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন না। তাহলে আজ এসব কথা বলছেন কেন ?

— এ তো রাজনীতি নয়, এ আমি বলছি—একটা ট্রাজেডির কথা।

— এ ট্রাজেডির কথা আপনি আগে জানতেন না ? আমি যখন আপনার মতামত নিতে গিয়েছিলাম—আপনি কেন আমাকে বারণ করেন নি রঞ্জনকে বিয়ে করতে ?

— সে অধিকার আমার ছিলো না।

— জানেন, আমি এখন বিধবা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল—অথচ আমরা একটা

দিনও একসঙ্গে থাকি নি। তবু তো আমি বিধবা। যদি ঐ রেজিস্ট্রি বিয়ের কথা আমি গোপন করে রাখতাম—যে দু'তিনজন বন্ধু জানে তাদের বারণ করে দিতাম—তাহলে আর কেউ জানতেও পারতো না। কিন্তু আমি নিজেই বলে ফেলেছি। যখন প্রলাপ বকতুম, তখন সব বলে দিয়েছি। এখন আমি কী করবো বলুন তো ? আমি কি সারাজীবন ওর স্মৃতি নিয়ে থাকবো ? না, ওকে ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করা উচিত ?

অবনীশকে একটু অসহায় দেখালো। মায়ার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। হাল্কা ধরনের জ্যোৎস্নায় এখন জায়গাটায় আবছায়া। অবনীশ ঘড়ি দেখে বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার বাড়ি চলো।

মায়া ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, আপনি আমার কথার উত্তর দিলেন না ?

— মায়া, তুমি আমাকে পথ দেখাবার কথা জিজ্ঞেস করছো। কিন্তু মানুষের জীবনের পথ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। সেটা তোমাকে নিজেকেই ঠিক করতে হবে।

— পথ দেখাতে পারেন না তো গল্প-উপন্যাস লেখেন কেন ?

— গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের ইলিউশান তৈরি হয়। মনে হয় বুঝি জীবনটা এই রকম। আসলে কিন্তু তা নয়, প্রত্যেক মানুষের জীবনই আলাদা। কিন্তু এ-সব কথা পরে আলোচনা করলেও চলবে। এখন বাড়ি চলো।

— আপনি উত্তর না দিলে আমি মোটেই ফিরবো না। আমি উল্টো দিকে যাবো।

— উল্টো দিকে মানে ?

— এই যে রাস্তাটা পাহাড়ে উঠে গেছে—এই রাস্তাটা আমি চিনি না। আপনি চেনেন ? গেছেন এদিক দিয়ে ?

— না।

— তাহলে এখানে আপনার পথ দেখাবার প্রশ্ন নেই। আমি এই রাস্তা দিয়ে যাবো।

— এখন ? এতো রাত্তিরে ?

— তাতে কি হয়েছে ?

— কি পাগলের মতন বলছো ?

— আমি তো সত্যিই পাগল!

— শোন, আগে যিনি তোমার সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি তোমার কে হন ?

— আমার বাবা। আমাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ করার জন্য বাবা আমাকে দু'সপ্তাহ হলো নিয়ে এসেছেন।

— আর আশ্চর্য, আমিও পাকে-চক্রে এখানে এসে পড়েছি—তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

— এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতোই। এই নিরিবিলি জায়গায় দেখা হলো—এই যা।

— শোনো মায়া, আজ বাড়ি ফিরে চলো। আবার কাল দেখা হবে। বাড়ির লোকজন খুব চিন্তা করবেন।

— একদিন চিন্তা করলে কিছু যায়-আসে না।

মায়া সত্যিই পাহাড়ের রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করেছে। অবনীশ কি করবেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। ওর হাত ধরে জোর করে টেনে ফেরাবেন ? মায়া যে-রকম জেদি তাতে কি সুবিধে হবে ?

অবনীশও বাধ্য হয়ে মায়ার কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। মিনতি করে বললেন, শোনো,

লক্ষ্মীটি, এ রকম কোরো না। এখন বাড়ি ফিরে চলো, আবার কাল আসবো না হয়, একটু সকাল-সকাল।

মায়া শব্দ করে হেসে বললো, কি আশ্চর্য, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন এতো ? চলুন না যতদূর যাওয়া যায় যাই একসঙ্গে ! কতো আর দেরি হবে ?

— এই জঙ্গলে বুনো জন্তু-টন্তু আছে শুনেছি। মাঝে-মাঝে নাকি চিতাবাঘ বেরোয়।

— তাতে কী হয়েছে ? আপনি তো সঙ্গে আছেন। আপনি শিকার-টিকার জানেন, আপনার লেখায় পড়েছি—আপনি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি ?

— আমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই।

— বুদ্ধি তো আছে ? নাকি তাও বাড়িতে রেখে এসেছেন ?

মায়া তো আগে কখনো এভাবে কথা বলে নি অবনীশের সঙ্গে। অবনীশ আহত হলেন, অবাক হলেন। অথচ মায়াকে একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। ওকে ফেরাবার শেষ চেষ্টা করে তিনি বললেন, দ্যাখো, এখন কৃষ্ণপক্ষের রাত চলছে—এক্ষুনি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন পথ চেনা তো দূরের কথা—আমরা নিজেদেরও চিনতে পারবো না।

মায়া তার হাতব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা দু'ব্যাটারির টর্চ বার করে জ্বেলে অবনীশের মুখে আলো ফেলে বললো, এই তো টর্চ।

— ঐটুকু টর্চে কী হবে ?

— তবু তো একটা আলো সঙ্গে আছে। আর ভয় পাওয়া উচিত নয়।

— তবু কিন্তু তুমি এখন ফিরলে ভালো করতে। আমি তোমাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

— ইস্, জোর করে দেখুন দেখি। তাছাড়া আপনি বলেছেন, আপনার পথ দেখাবার ক্ষমতা নেই—তাহলে এখন জোর করতে চাইছেন কেন ? আমার যাই হোক না কেন, আপনার যদি আসতে ইচ্ছে না করে আপনি ফিরে যান।

— তোমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে ফিরে যাওয়া যায় না।

—এরপর অন্য কোন সময়ে যখন আমি একা থাকবো—আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জায়গায় একা থাকবো—তখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিতে আসবেন ?

— ওসব হেঁয়ালির কথা।

মায়া প্রায় চিৎকার করে বললো, মোটেই হেঁয়ালির কথা নয়। আপনি সোজাসুজি উত্তর দিন। আমি যখন অন্য কোথাও একা থাকবো, কোনো বিপদের মধ্যে পড়বো—তখন আপনি আমাকে বাঁচাতে আসবেন ?

অবনীশ বিষণ্ণভাবে বললেন, সে প্রশ্ন এখন ওঠে না।

— কেন উঠবে না ? আমার সামনে একটা দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। বলুন, আমি কী করবো ? যদি পথ দেখাবার ক্ষমতা আপনার না থাকে, তাহলে আটকাবার অধিকারও আপনার নেই। সামনে থেকে সরে যান।

—আমি না গেলে তুমি একলাই যাবে ?

—আপনি যেতে ভয় পাচ্ছেন ?

— আমার জন্য নয়, তোমার জন্য। এই অন্ধকারে তুমি—

— সত্যি বলুন তো, আপনার ইচ্ছে করে না—এই রকম অন্ধকারের মধ্যে একটা অচেনা রাস্তা ধরে পাহাড়ের ওপর উঠতে আপনার ইচ্ছে করে না! মনে হয় না, ওপরে উঠলেই আমরা যেন একটা কিছু পেয়ে যাবো ?

— অবনীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঐ সংলাপটি তাঁর চেনা। তাঁর নিজেরই বানানো— অথচ শুনতে হলো মায়ার মুখ থেকে। পৃথিবীতে কতো আশ্চর্য ব্যাপার আছে। অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে-শুয়ে তিনি যে গল্পটার কথা চিন্তা করতেন—যে গল্প আজও লেখা হয় নি—অবিকল সেই গল্পটিরই একটি লাইন আজ মায়া উচ্চারণ করছে। একথা এখন মায়াকে বললে মায়া বিশ্বাস করবে না হয়তো। কেউই বিশ্বাস করতে চাইবে না।

অবনীশ বললেন, ঠিক আছে। শেষ পর্যন্ত উঠতে পারবে ?

— দেখি পারি কি না!

— যতো রাতই হোক, ভয় পাবে না ?

— ভয় পাবো না, হয়তো হাঁপিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত না পৌঁছতেও পারি। তবে অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে থামবো না।

যেন দু'জনে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, এইভাবে ওরা দু'জন এরপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। চারিদিকে একটানা ঝিঁঝির ডাক! মায়া মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বালছে, নিভিয়ে ফেলতেই গাঢ় অন্ধকার।

অবনীশ বললেন, অত জোরে-জোরে পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে নেই। তাহলে এক্ষুনি হাঁপিয়ে যাবে। সমানভাবে পা ফেলে-ফেলে—

কথাটা বলতে বলতেই মায়া একটা পাথরে পা দিয়ে পিছলে গেল। পড়ে যাচ্ছিলো, অবনীশ ধরে ফেললেন তার আগেই। অবনীশ বললেন, সাবধানে—। আমার হাত ধরে চলো—

মায়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তার দরকার নেই। আমি নিজে-নিজে ঠিকই যেতে পারবো।

অবনীশ বললেন, কলকাতা থেকে অনেক দূরে, এই সময় রঞ্জনের সঙ্গে তোমার পাশাপাশি হেঁটে যাবার কথা ছিল। হয়তো ঠিক এই রকমভাবে তোমরা কোনো পাহাড়েও উঠতে।

মায়া কোন উত্তর দিলো না।

অবনীশ আবার বললেন, তোমার মনে হয় না, রঞ্জন যেন ঠিক আমাদের পাশাপাশি যাচ্ছে! সে আমাদের সবসময় দেখছে।

— আপনি বুঝি আত্মা-টাত্মায় বিশ্বাস করেন ?

— তুমি করো না বুঝি ?

— না।

— আমিও ঠিক করি না। তবে, দু'একটা অলৌকিক ব্যাপার আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। সে-রকম কিছু থাকলে ভালোই হতো। মানুষ যাকে ভালবাসে—তার মৃত্যুর পরেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না—তার অস্তিত্ব এখনো কোথাও রয়ে গেছে ? তীব্র ভালবাসা থেকে সেই ইচ্ছেটা অনেক সময় সত্যি বলেও ভুল হতে পারে।

মায়া থমকে দাঁড়ালো। অদ্ভুত ধরনের পাগলাটে গলায় বললো, আপনি আর একটা কথা শুনলে খুব আশ্চর্য হবেন। আমি ওকে ভালবাসতাম না। ও মরার আগে একটা মিথ্যে ধারণা নিয়ে মরেছে। আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম অনেকটা বাধ্য হয়ে, খানিকটা বোধহয় দয়া কিংবা করুণার সঙ্গে। অনেকটা ওকে বাঁচাবার জন্য। ও বাঁচতে পারলো না তবু, এটা ওর দোষ।

— এরকম নিষ্ঠুরভাবে বলো না।

— সত্যি কথা অনেক সময় নিষ্ঠুর শোনায়। ও বেঁচে থাকলে হয়তো কোনোদিনই উচ্চারণ করতাম না—কিন্তু আজ আমার বলতে আপত্তি নেই, আমি রঞ্জনকে ভালবাসতাম না।

— এটা তুমি রাগের কথা বলছো।

— মোটেই রাগের কথা নয়। ও যখন খুনোখুনীর রাজনীতি নিয়ে মাতলো—তখন আমি ওকে রীতিমতন অপছন্দই করতাম। তারপর যখন আবার ফিরে এল, আমার জন্য বাঁচতে চাইলো—তখন আমি নিরুপায় হয়ে গিয়েছিলাম। ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনি—বহুদিন একসঙ্গে খেলেছি—দু'জন দু'জনকে জানি—কিন্তু একেই কি ভালবাসা বলে ? বলুন, এর নাম ভালবাসা ?

অবনীশ ম্লান গলায় বললেন, ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না।

মায়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললো, জানেন না মানে ? চালাকি পেয়েছেন ? আপনারা গল্প-উপন্যাসে এতো ভালবাসার কথা লেখেন, এখন বলছেন, মানে জানেন না ?

— মায়া, তুমি আজ আমার নামে এতো অভিযোগ জানাচ্ছো কেন ? আমি কি সব জানি ? আমি তো সামান্য মানুষ!

— না, আপনি একজন লেখক।

— লেখকদেরও তো ক্ষমতার সীমা আছে ?

— তা বলে ভালবাসার মানে না জেনে ভালবাসার কথা লেখেন ?

— সত্যিই বোধহয় জানি না। নানান লেখার মধ্য দিয়ে ভালবাসার একটা সঠিক রূপ খোঁজার চেষ্টা করি। কিংবা অনেক সময় আমার কাছে যেটা ভালবাসা মনে হয়—অন্য কেউ সেটা শুনলে বিশ্বাস করবে না। যেমন, তুমি কি বিশ্বাস করবে, যদি আমি বলি আমি রঞ্জনকে কখনো চোখে দেখি নি, তবু যেন তাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমি তোমাকেও গভীরভাবে ভালবাসি। তুমি বিশ্বাস করবে ?

মায়া তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করলো, কি বললেন ?

অবনীশ শান্তভাবে উত্তর দিলেন, মায়া, তুমি কি বিশ্বাস করবে, আমার উপন্যাসের কোনো প্রিয় চরিত্রের মতন আমি তোমাকেও গভীরভাবে ভালবাসি ?

মায়া অবনীশের গায়ে আছড়ে পড়ে ঝটকট করে কাঁদতে-কাঁদতে বললো, না, বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, একটুও বিশ্বাস করি না।

মায়া যতোক্ষণ কাঁদলো, অবনীশ হাত বুলিয়ে দিলেন তার পিঠে। রুমাল বার করে নিজে মুছে দিলেন তার চোখ। নিজের মনকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি কি মিথ্যে কথা বললাম ? এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক ভাষাহীনা যুবতীকে কি মিথ্যে কথা বলা যায় ? তবু তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁর ভালবাসার কথাটা সত্যি কি মিথ্যে। কিন্তু একথা ঠিক, মায়ার জীবনের পথ দেখাতে না পারলেও এই অন্ধকার থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভালবাসাই একমাত্র উপায়। তিনি পুনরায় আন্তরিকভাবে বললেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। মায়ার মুখখানা উঁচু করে তুলে বললেন, তোমার টর্চটা এবার আমাকে দাও। আমার হাত ধরে এসো।

হাত ধরে সেই জঙ্গলের অন্ধকার রাস্তা ধরে ফিরতে লাগলো দু'জনে। বহুক্ষণ আর একটিও কথা বললো না। চাঁদ মেঘের আড়ালে লুপ্ত, কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। দূরে কোথায় ছড়ছড় করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে, আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। মাঝে-মাঝে টর্চের সরু আলো দেখা যায়। টর্চ নিভিয়ে দিলে মনে হয়, এই রহস্যময় সুমহান প্রকৃতির মধ্যে ঐ দু'জন দুঃখী মানুষ কোথায় হারিয়ে গেছে।

সুদূর ঝর্নার জলে

মানিব্যাগ রাখার অভ্যেস আমার নেই কখনো। যখন যা দু'চার টাকা থাকে, বুক পকেটেই রাখি। আর প্যান্টের পকেটে রাখলে চেপ্টে যায় বলে সিগারেট–দেশলাইও ঐ বুক পকেটেই রাখতে হয়। হাওয়াই শার্টের ঐ একটাই পকেট।

চক্রধরপুর থেকে ট্রাকে চেপে যাচ্ছিলাম টেবো–হেসাডির দিকে। হেসাডির বাংলোয় ইন্দ্র আর হেমন্ত আছে। ওরা এসেছে দু'দিন আগে। এ রাস্তায় দিনে দু'বার বাস চলে, কিন্তু ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার আরাম আরও বেশি। চমৎকার রাস্তা। পাহাড়ী ঘাট, এক পাশে খাদ, আর এক পাশে জঙ্গল। বিকেলের সূর্য অতিশয় গাঢ় হয়ে একটু স্থির হয়ে আছেন, এক্ষুনি অস্ত যাবেন কি না মনস্থির করতে পারছেন না। হু–হু করা হাওয়া যেন আকাশের গায়ে গিয়েও ঝাপ্টা মারছে। ডান পাশের অরণ্যের বড় বড় বনস্পতি মাথা নোয়াচ্ছে, বার বার স্বাগতম জানাচ্ছে বৃষ্টিকে। দূরের উপত্যকায় বৃষ্টি নেমে গেছে, এখান থেকেই দেখা যায়।

এই সময় প্রকৃতি আমার সঙ্গে একটু রসিকতা করলেন।

ট্রাক ড্রাইভারটি বেশ আমুদে। সেকেন্ড গিয়ারে গতি রেখে গান গেয়ে যাচ্ছে অনবরত, দুর্বোধ্য ছেকাছেনি ভাষায় গান, যার একবর্ণ আমি বুঝি না। মাঝে–মাঝে আমাকে চমকে দেবার জন্য এই বিপজ্জনক পাহাড়ী রাস্তায় সে স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নেয়। একটু আগে খাদের মধ্যে একটা ওল্টানো বাস দেখে এসেছি। তবু তাকে উৎসাহ দেবার জন্য আমি বললাম—আউর জোরে চালাইয়ে। এ কেয়া বয়েল গাড়ি চলতা হ্যায়।

রোগা মতন ক্লিনারটি আমার আর ড্রাইভারের মাঝখানে বসেছে। সে কথা বলে না, শুধু গানের তাল দেয়। ট্রাক ভর্তি সিমেন্টের বস্তা। ক্লিনারটির হাতে এবং জামায় এখনো সিমেন্টের গুঁড়ো লেগে আছে। লোকটার রঙ যা কালো, মুখেও কিছু সিমেন্ট মেখে নিলে পারতো। তারপর বৃষ্টিতে ভিজলেই একেবারে পাকা রং।

একবার সে বললো, বাবু, ম্যাচিসঠো দিজিয়ে তো !

তখন আমারও সিগারেট টানার ইচ্ছে হলো। হাওয়ায় বেশ শীত–শীত ভাব, পকেট থেকে সিগারেট, দেশলাই বার করতে যেতেই ফরফর শব্দে টাকাগুলোও বেরিয়ে এলো। এবং আমি

খপ করে ধরবার আগেই প্রবল হাওয়ায় সেগুলো চলে গেল গাড়ির বাইরে।

'রোক্‌কে রোক্‌কে' বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলেও সঙ্গীতপ্রেমিক ড্রাইভারের ব্যাপারটা বুঝতে খানিকটা সময় লাগলো। তাছাড়া সেটা বাঁকের মুখ। গাড়ি থামলো, একটু দূরে।

ছুটে এসে দেখলাম, হাওয়ায় চড়ুই পাখির মতন আমার নোটগুলো উড়ছে। কিংবা কার্পাসের বীজের মতন। দৌড়োদৌড়ি করে সেগুলো ধরার চেষ্টা করলুম, কোনোটাই ধরা যায় না। টাকা জিনিসটা যে মানুষের হাত ছাড়িয়ে সবসময়েই পালাতে চায়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে নোটটাকে আমি প্রায় ছুঁই ছুঁই, সেটাই টুপ করে পালিয়ে যায় খাদের দিকে। দু'একটা উড়ে গেল আকাশের দিকে। আমার রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পাওয়া টাকাগুলো ছন্নছাড়ার মতন চলে গেল এদিক–সেদিক। এত হাওয়া যে আমার চোখের ওপর নিজের চুলের ঝাপ্টা লাগছে, ভালো করে দেখতেই পাচ্ছি না।

কোনোক্রমে দেখলাম, একটা দশ টাকার নোট খাদের সামান্য নিচে একটা বনতুলসী গাছের ওপর চুপ করে বসেছে। দু'তিনটে পাথরে পা দিয়ে নেমে গেলে ওটাকে উদ্ধার করা যায়। একটা পাথরে পা দিয়ে নেমেছি, পেছন দিক থেকে ড্রাইভারটি আমার এক হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধমকে উঠলো! সঙ্গে–সঙ্গে আর এক হাওয়ার ঝাপটায় নোটটা গাছের শুকনো পাতার মতন আবার উড়ে গেল, আমারই চোখের সামনে সেটা দুলতে–দুলতে নেমে গেল অনেক নিচে। বৃষ্টিতে ভিজে যদি একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় তাহলে হয়তো কোনোদিন কোনো রাখাল বালক ওটা কুড়িয়ে পাবে।

ক্লিনারটি হা-হা করে হাসছে। ড্রাইভারটি বললো, দশ রুপিয়ার জন্য জান দিতে যাচ্ছিলেন?

বাতাসে আমার একটা বড় নিঃশ্বাস মিশিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই আকস্মিক ঘটনায় ড্রাইভার ক্লিনার দু'জনেই বেশ মজা পেয়েছে। ওদের আর দোষ কি? অন্য কারুর টাকা উড়ে গেলে আমিও হাসতাম।

— কিৎনা রুপিয়া থা?

বেশি নয়, মাত্র বত্রিশ টাকা। এ কথা শুনেও ওরা হাসি থামালো না। যাক, এই বত্রিশ টাকার বিনিময়ে একটা মজার খেলা দেখা গেল। ঠিক বত্রিশ নয়, উনত্রিশ টাকা, কারণ ড্রাইভার আর ক্লিনার দু'জনে মিলে তিনটে এক টাকার নোট উদ্ধার করতে পেরেছে, আমি একটাও পারি নি।

টাকাটা সত্যিই বেশি না। কিন্তু সেটাই যে আমার যথাসর্বস্ব, সেটা তো ওরা জানে না! বলাও যায় না। আমি এসেছি ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর ভরসায়, ওদের এখন রোজগার আছে, আমি বেকার।

আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। বুকের ভেতরটা ফাঁক–ফাঁকা লাগছে। সিগারেটে স্বাদ নেই। আমার তুলনায় এই ট্রাক ড্রাইভারও অনেক বড়লোক। ও উনত্রিশ টাকা নিয়ে এখনো হাসি–ঠাট্টা করছে। কিংবা, ও নিশ্চয়ই ভাবছে আমার প্যান্টের পকেটে সুদৃশ্য কোনো চামড়ার ব্যাগে থরে–থরে একশো টাকার নোট সাজানো আছে, বাবুদের যে রকম থাকে।

সন্ধের কাছাকাছি হেসাডি ডাকবাংলোর মুখটায় ওরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। কোনো রকম দীনতা প্রকাশ না করে আমি ড্রাইভারের হাতে পূর্ব প্রতিশ্রুত দু'টাকা দিয়ে দিলাম। এবং বিদায় সম্ভাষণের পর দু'জনকে আমার প্যাকেট থেকে দু'টি সিগারেট উপহার।

পকেটে একটি মাত্র টাকা নিয়ে আমি বাংলোর গেট খুলে ভেতরে এলাম, বারান্দায় আলো জ্বলছে। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তকে খুব রোমহর্ষকভাবে বলতে হবে ঘটনাটা।

কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস তখনো শেষ হয় নি। বাংলোতে দু'টি ঘর। দু'টি ঘরেই দু'জন সরকারি অফিসার সপরিবারে উপস্থিত। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর পাত্তা নেই। এ বাংলোতে আগেও

দু'বার এসেছি, কোনোবারই রিজার্ভ করে আসি নি, প্রত্যেকবারেই ফাঁকা পেয়েছি।

বাংলোর সামনে একটা বড় মাঠ। তার ওপাশে চৌকিদারের ঘর এবং রান্নাঘর। মাঠ পেরিয়ে এসে ডাকলাম, লেমসা, লেমসা !

চৌকিদারটি আগের দু'বারই আমাদের খুব খাতির করেছিল। ওর নাম আসলে নেলসন, ওঁরাও খৃষ্টান, কিন্তু নিজেই নাম বলে, লেমসা।

সে বেরিয়ে এসেই বললো, ঘর খালি নেই !

আমি বললাম, কি রে, চিনতে পারছিস না ?

সে এমন একটা ভাব করলো, যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হয়। এর স্মৃতিশক্তি এত খারাপ কেন ?

তখনই আমার মনে পড়লো, এর আগে এসে প্রথমেই লেমসাকে বকশিশ দিয়েছি কিছু। কাজের আগে টাকা না দিলে ওর উৎসাহ আসে না। এমনি ছেলেটি বড় ভালো, কিন্তু আগে ওকে সন্তুষ্ট না করলে এক পা–ও হাঁটতে চায় না। কিন্তু আমার কাছে আছে একটি মাত্র টাকা ও কিছু খুচরো। পকেট একেবারে শূন্য করলে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, আমার দুই বন্ধু এখানে এসেছিল, তারা কোথায় ?

সে জানালো যে দু'দিন আগে দুই বাবু এসেছিল ঠিকই, তারা এখানে জায়গা না পেয়ে বদগাঁও চলে গেছে। আমাকেও সেখানে যেতে বলেছে।

সে তো কালকের কথা। সন্ধের পর এখানে বাস চলে না, অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাক যেতেও ভয় পায়। আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে, এবং খেতেও হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, পকেটে টাকা না থাকলেই আমার খিদে আরও বেড়ে যায়।

হাতে ঘড়ি নেই, সঙ্গে কলম কিংবা একটা এমন দামী জিনিসও নেই, যা জমা রাখতে পারি। আছে শুধু একটা সস্তা ডট্ পেন, যার কোনো মূল্যই নেই লেমসার কাছে। আর দু'জোড়া প্যান্ট–শার্ট, দু'টি পাজামা, দু'টি গেঞ্জি। এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে আর কী !

লেমসা তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, তার পেছনে–পেছনে গিয়ে খুব মোলায়েম গলায় বললাম, লেমসা, আমাকে রাতটা যে এখানেই থাকতে হবে ?

লেমসা স্বভাবগম্ভীর। টাকা না পেলে আরও গম্ভীর হয়ে যায়। বললো, জায়গা নেহি !

উনুনের পাশে বসে আছে লেমসার স্ত্রী ফুলমণি। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী রমণী। সুতরাং আমি লেমসার ঘরেও থাকতে চাইতে পারি না।

— একটা খাটিয়া যদি পেতে দাও বারান্দায় !

— খাটিয়া নেই।

— তাহলে গ্যারাজ ঘরটা খালি আছে না ?

— ও ঘরে এক বাবু আছে !

এই প্রায়–কেউ–নাম–জানে–না বাংলোয় হঠাৎ এত লোক সমাগম কেন ? গ্যারাজটা পর্যন্ত ভর্তি! অল্প–অল্প শীত আছে, একেবারে মাঠে শুয়ে থাকা যাবে না। তাছাড়া, যে–কোনো সময়ে বৃষ্টি আসবে।

ঝোলা থেকে আমার শ্রেষ্ঠ জামাটা বার করলাম। র–সিল্কের। লেমসাকে বললাম, তোর জন্য এই জামাটা এনেছি, দ্যাখ তো গায়ে লাগে কি না।

পাহাড়ী লোকেরা জামাকাপড় সম্পর্কে বেশ খুঁতখুঁতে। ডাকবাংলোর চৌকিদার হলেও লেমসা তার খৃষ্টান–গর্ব ঠিক রেখেছে, সে প্যান্ট ছাড়া ধুতি পরে না, এবং কোমরে চওড়া বেল্ট। জামাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো। তারপর পরে ফেললো। চমৎকার ফিট করে গেছে, ঠিক

যেন আমার যমজ ভাই।

এবার তাকে সস্নেহ ভর্ৎসনার সঙ্গে বললাম, কী রে বোকা! চিনতে পারছিস না আমাকে? সেই যে দু'বছর আগে এসেছিলাম আমরা চারজন, একটা বাবু খুব ভালো নাচতে জানতো?

লেমসা বললো, হুঁ!

কে জানে তা ওর মনে পড়েছে কিনা! যাই হোক, কাল সকাল পর্যন্ত তো ওকে খাতির করে চলতেই হবে। বললাম, 'আজ রাতটা এখানেই থাকবো আর খাবো। তোকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে, বুঝলি?

লেমসা ঘরের মধ্যে চলে গেল। ফুলমণি একমনে উনুনে পাখার হাওয়া করে যাচ্ছে, এই সময় গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। আর টেকা যায় না এখানে।

গ্যারাজটা দেখতে গেলাম। একজন পাকানো-চেহারার লোক খাটিয়ার ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বিড়ি টানছে আর অনবরত কাশছে। লোকটি বাঙালি।

লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কাশির দমকে লোকটির অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না অবশ্য। লোকটি বললো, আরে মশাই, কাল ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে ছিলাম কিনা সারারাত, ওঃ, যা ঠাণ্ডা বসে গেছে!

— কেন, সারারাত বাইরে ছিলেন কেন?

— কোথাও জায়গা পাই না। এদিকে সব সার্ভের লোক এসেছে কিনা, বাংলোগুলো ভর্তি। তাই গাড়িতে শুয়ে রইলাম।

— গাড়ি?

বাংলোতে তো কোনো গাড়ি দেখি নি এখন পর্যন্ত। এমন কী যে সরকারি অফিসাররা রয়েছে, তাদেরও গাড়ি নেই।

লোকটি বললো, আমার গাড়ি দেখেন নি? গেটের বাইরে রয়েছে, ও গাড়ি কি কারুর চোখে না পড়ে পারে। পাঁচ টন ওজন— হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।

লোকটা দম ফুলিয়ে হাসতে লাগলো। একটু পরে পরিষ্কার হলো রহস্য। গাড়ি মানে রোড রোলার। পিচরাস্তা সারাবার সময় যেগুলো দেখা যায়। লোকটি সেইরকম একটি রোড রোলার রাঁচী থেকে চক্রধরপুরে ডেলিভারি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়ী রাস্তায় সারা দিনে আট-দশ মাইলের বেশি চলে না।

এত কাশি সত্ত্বেও লোকটির বিড়ি খাওয়ার শখ খুব। একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে যাচ্ছে। আমি সিগারেটের প্যাকেট বার করতেই হ্যাংলার মতন তাকালো। প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, নেবেন একটা?

—দিচ্ছেন? তাহলে দুটো নিই? কাল সকালে ইয়ে করার সময় একটা পেলে বেশ যুৎসই হয়।

আমি হেসে বললাম, তাহলে এই ভাঙা প্যাকেটটা আপনার কাছেই রাখুন!

ঝোলার মধ্যে আরও তিন প্যাকেট সিগারেট আছে। ও ব্যাপারে আপাতত নিশ্চিন্ত। তাছাড়া লোকটিকে খুশি রাখা দরকার। রাত্রে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখানেই ওর সঙ্গে শুতে হবে।

আবার লেমসার ঘরের বারান্দায় চলে এলাম। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। উনুনের আঁচটা গায়ে বেশ আরাম দেয়। এক কাপ চা পেলে বেশ হতো।

লেমসা আর বউ চা-ই বানাচ্ছে তখন। দেয়ালের কাছে বসে পড়ে আপনজনের মতন বললাম, দে রে লেমসা, আমাকে এক কাপ চা দে।

লেমসা মুখ তুলে বললো, এ চা-চিনি-টিনা-দুধ বাবুলোককো হ্যায়!

মনে পড়লো লেমসার কাছে কিছুই থাকে না, সবই পয়সা দিয়ে কিনে আনাতে হয়। কাছেপিঠে কোনো দোকান নেই। সিগারেট কিনতে গেলেও সাত মাইল দূরে বদগাঁওর হাটে যেতে হবে। তবে কাছাকাছি গ্রামের মধ্যে চাল আর মুরগি পাওয়া যায়।

বললাম, ওর থেকেই একটু দে না বাবা ! বাবুরা কি আর দেখছে !

লেমসা কোনো উত্তর দিল না। মান খুইয়ে চাইলাম, যদি এরপরও না দেয়! স্বামী-স্ত্রী কি যেন বলাবলি করতে লাগলো নিজেদের মধ্যে। তারপর আমার মান রাখল ফুলমণি। সে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি তাকালাম তার দিকে। যদিও সে কোনো বিখ্যাত শিল্পীর কালো পাথরের ভাস্কর্যের মতন রূপসী, তবু তখন তার সম্পর্কে আমার মনোভাব, নারীজাতি সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন অনেকটা।

চায়ের ব্যাপারেই লেমসার ব্যবহারে খটকা লেগে গেল। ব্যাটা রাত্তিরে খেতে-টেতে দেবে তো ? বাতাস থেমেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মাত্র সাতটা বাজে, সামনে একটা লম্বা রাত। চতুর্দিক এত নিস্তব্ধ যে নিস্তব্ধতারও যেন একটা শব্দ শুনতে পাই।

তিনটে মুরগি ছাড়িয়ে রাখা আছে শালপাতার ওপর। ফুলমণি মশলা বাটছে। বাংলোর সাহেবদের জন্য লেমসা এখন ওমলেট ভাজছে, তার থেকে নিশ্চয়ই আমায় দেবে না। দেখতে দেখতেই আমার খুব জোরে ক্ষিধে পায়। যেন পেটের মধ্যে একটা রেলের হুইস্‌ল!

— রাত্রে কী খেতে দিবি লেমসা ?

— চাউল লা'নে হোগা, রুপিয়া দিজিয়ে।

লোকটা তো সাঙ্ঘাতিক চশমখোর ! একটু আগে একটা অত দামী জামা দিলাম, তার জন্য একটুও কৃতজ্ঞতা নেই! এরা জিনিসপত্র ততো গ্রাহ্য করে না, টাকাটাই আসল। আগেরবার এসে দেখেছি, প্রত্যেক রাত্রে লেমসা প্রচুর মহুয়া খেয়ে হৈ-হল্লা করে। আজ বোধহয় এখনো মহুয়া কেনার টাকা জোটে নি। সরকারি অফিসারদের কাছে তো সহজে বকশিশ পাওয়ার উপায় নেই।

আমার একটা টাকা ওকে দিয়ে কিছু লাভ হবে না। ডাকবাংলোর কোনো বাবু এসে চৌকিদারের হাতে কক্ষনো মাত্র এক টাকা দেয় না। গ্রামের মধ্যে যদি চাল কিনতে যায়— তাহলে সেজন্য ওর পারিশ্রমিকই হবে অন্তত দু'টাকা।

—লেমসা, এদিকে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

উনুন ছেড়ে লেমসা সহজে আসতে চায় না। দু'খানা ওমলেট ভাজবার পর সেগুলো আর চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে সাজিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেই লেমসা বাবুদের দিয়ে এলো। তারপর তাকে আমি বারান্দার এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, শোন্ লেমসা, আমার ব্যাগ হারিয়ে গেছে, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। বদগাঁওতে আমার বন্ধুরা আছে, কাল সকালেই তুই সব টাকা পেয়ে যাবি। ঠিক আছে তো ? কোনো চিন্তা নেই।

কিন্তু লেমসার কাছে বোধহয় আজ রাত্রের মহুয়া কেনার টাকা জোগাড় করাই সবচেয়ে জরুরি। সে কোনো সাড়া-শব্দ করলো না। আবার নিজের কাজে ফিরে গেল। তারপর আমারও আর কিছু করার নেই, শুধু বসে-বসে ওদের রান্নাবাড়ি দেখা। শুধু-শুধু উনত্রিশটা টাকা গেল! সে টাকাটা থাকলে আজ একটা রাত অন্তত লেমসার কাছে কত ফাঁটের সঙ্গে থাকা যেত। কত কষ্টের টাকা! যে বাড়িতে টিউশানি করি, তারা সাত তারিখের আগে মাইনে দেয় না বলেই তো ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তর সঙ্গে আমার আসা হল না। ওরা পাঁচ তারিখে ট্রেনের টিকিট কেটেছিল। সেই পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর ছোটকাকার কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার। কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে আর ট্রেনের টিকিটে বাকি টাকাটা গেছে। ভেবেছিলাম এক টিন চিজ্ কিনে আনবো, শেষ পর্যন্ত কিপ্টেমি করে কিনি নি। ইস কেন যে কিনি নি! চিজের টিন তো আর টাকার মতন

উড়ে যেতে পারতো না! আমার মতন এরকম কেউ কখনো সত্যিকারের টাকা উড়িয়েছে?

— থোড়া গরম পানি দাও না। হরলিকস্ বানায়গা!

দু'টি মেয়ে বৃষ্টি ভিজতে-ভিজতে দৌড়ে উঠে এলো বাংলোর বারান্দায়, একজনের হাতে একটা ফ্লাস্ক। আর একজন লেমসাকে ধমক দিয়ে বললো, এতক্ষণ ধরো ডাকতা হ্যায়, শুনতা নেই?

আমি আড়ষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম। দু'জনের মধ্যে একজন বেশ সুন্দরী। সুন্দরী মেয়েরা কাছাকাছি এলে আমি চোখভরে না দেখে পারি না। এখন মনে হল, ওরা যেন আমার মুখটাও দেখতে না পায়। বুকের মধ্যে চড়চড় করছে। কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকলে নিজেকে মানুষ বলেই মনে হয় না।

গরম জল চেপেছে। বৃষ্টিও জোরে এসেছে। মেয়ে দু'টি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কল্‌কল্ করে কথা বলতে লাগলো। অন্য যে-কোনোদিন হলে, এদের সঙ্গে আমার ভাব করা ছিল নদীতে স্নান করার মতনই সহজ। কিছুটা সময় অন্তত সুন্দরভাবে কাটতে পারতো। আমি ঘুমের ভান করে মুখ গুঁজে রইলাম।

মেয়ে দু'টি বোধহয় ইঙ্গিতে একবার ফুলমণিকে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি কে? ফুলমণি ভাঙা-ভাঙা ভাষায় যা উত্তর দিল, তাতে কিছুই বোঝা গেল না। মেয়ে দু'টি নিশ্চিত আমাকে সন্দেহ করছে, ভয়ও পেতে পারে। প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোকের মতন চেহারার একজন যুবক চৌকিদারের ঘরের বারান্দায় বসে ঝিমোয় কেন? মেয়ে দু'টি তাদের বাবার কাছে নালিশ করে আমাকে এক্ষুনি এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে। সুন্দরী মেয়েরাও কতো নিষ্ঠুর হয় তা জানি! ডাকবাংলোতে যারা জায়গা পায় আর যারা জায়গা পায় না, তাদের মধ্যে একটা প্রকৃত হ্যাভ আর হ্যাভ নট্‌স-এর মতন শ্রেণীবৈষম্য গড়ে ওঠে। তাও আমার বুক পকেটে পয়সা থাকলে আমার বুকের জোর বাড়তো, যে-কোনো লোকের সঙ্গে ধমকে কথা বলতে পারতাম।

একটু বাদে লেমসা বাংলো থেকে ছাতা নিয়ে এলো। সেই এক ছাতা মাথায় দিয়ে মেয়ে দু'টি নেমে পড়লো বারান্দা থেকে। হাওয়ার তোড় এখনো কমে নি। ছাতা উড়ে যেতে চায়, মেয়ে দু'টি আউ! উঃ! এই, এই, এই! হি-হি-হি শব্দ করছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, যাক না ছাতাটা উড়ে! কিংবা ছাতাটা উল্টে গিয়ে শিক-ফিক ভেঙে যাক্। মেয়ে দু'টি মাঠের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লে আরও ভালো হয়! আমার মধ্যে একটা প্রতিশোধ কিংবা হিংসের আগুন জ্বলে উঠছিল। গ্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডে যে-সব ভিখিরিরা বসে থাকে, তাদের মনেও নিশ্চয়ই এইরকম চিন্তা জাগে।

বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাবার উপায় নেই, শুধু চুপচাপ বসে থাকা। হাতকাটা সোয়েটারে শীত মানে না। সঙ্গে কম্বল-টম্বলও নেই। ডাকবাংলোয় আসবার সময় কে আবার বিছানা আনে? উনুনের আঁচে ফুলমণির লালচে মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি যেন তার শরীর থেকে উষ্ণতার ভাগ নিচ্ছি, দশ ফুট দূরে বসে থেকে তাকে না ছুঁয়ে।

রান্না চলতে লাগলো, নানারকম গন্ধ। দু'একটা রাত না-খেয়ে থাকা এমন কিছু নয়, এরকম আমি আগেও থেকেছি। কিন্তু রান্নার উনুনের পাশে এরকম বসে থাকা যে কী কষ্টকর! লোভী শিশুর মতন আমি খিদের জ্বালায় ছটফট করছি। ছেলেবেলায় জ্বর হবার পর যেমন রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে ঘ্যান-ঘ্যান করতাম। খালি মনে হচ্ছে, লেমসা কখন খেতে দেবে! কখন খেতে দেবে!

উনুনের ওপর মুরগির মাংসতে শেষবার ঘি ঢালবার পর লেমসা ভাত বাড়তে শুরু করলো। এতক্ষণ ওর সঙ্গে আমি একটি কথাও বলি নি, অন্যমনস্ক থাকবার জন্য সিগারেট ধ্বংস করছিলাম

শুধু। পা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, এবার পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসলাম, ভাতের থালার জায়গা করার জন্য সামনে থেকে সরিয়ে রাখলাম ঝোলাটা।

কিন্তু কয়েক প্লেট ভাত বেড়ে লেমসা নিয়ে গেল ডাকবাংলোয়। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। ফিরে এসে আবার ডাল আর আলুভাজা নিয়ে গেল। তারপর মাংস। আমি মাথা হেঁট করে মাটিতে দাগ কাটছি। মুনিঋষিরা কীভাবে ইন্দ্রিয় জয় করতেন ? আমি পারবো না কেন ? ধরা যাক, এই মুহূর্তে খবর পেলাম আমার বাবা মারা গেছেন, তাহলে কী আর আমার খাওয়ার ইচ্ছে হতো ?

খানিকটা বাদে লেমসা একটা কাচের প্লেটে খানিকটা ভাত এনে দিল আমার সামনে। ছোট প্লেটে একটু ডাল। আমি তবু হাত গুটিয়ে বসে রইলাম চুপ করে। হাজার হোক, আমি বাবুদের বাড়ির ছেলে, শুধু ডাল আর ভাত তো খেতে পারি না। আর কিছু দিক, তারপর দেখা যাবে।

কিছুই দিল না আর। এবার রাগ হয়ে গেল। আমি কি বিনা পয়সায় খাচ্ছি ? কাল সকালেই সবকিছুর দাম বকশিশ সমেত চুকিয়ে দেবো। গম্ভীর গলায় বললাম, লেমসা, আর কিছু নেই?

লেমসা বললো, ভাজি খতম হো গিয়া। মুর্গা তো বাবুলোকক্য হ্যায়। অর্থাৎ আমি আর বাবু নই। যার পয়সা থাকে না, সে আবার বাবু কি! কে বলে যে ব্যবসায়ীরাই শুধু পয়সা চেনে ? গরিবরা আরও বেশি চেনে। এ তো মা নয় যে, রাগ করে ভাতের থালা ঠেলে ফেলে উঠে যাবো ? তবু সেইরকমই অভিমান হয়। ঢোক গিলে বললাম, ঠিক হ্যায়, একঠো পেঁয়াজ আর হারা মির্চে দেও!

তখন ফুলমণি বললো, একটু ঝোল লিবেন ?

পোর্সিলিনের পাত্রে মুরগির খানিকটা তলানি ঝোল আর কুচো দু'এক টুকরো মাংস পড়ে আছে। ফুলমণি সেটা নিয়ে এলো কাছে। আমি না-না বলে হাত দিয়ে থালা চাপা দিলাম। ফুলমণি তবু শুনলো না, একহাতা কুচো মাংস আর ঝোল ঢেলে দিল আমার প্লেটে। ওর দিকে রক্তচক্ষে তাকালাম। তারপর সেই ঝোল ও মাংস সমেত সেই জায়গার ভাত তুলে ফেলে দিলাম মাটিতে। বাকি ভাতটা ডাল আর পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়েই খেয়ে শেষ করলাম।

মাত্র সাত মাইল দূরের ডাকবাংলোতে ইন্দ্রনাথ আর হেমন্ত এখন কতরকম কী খাচ্ছে কে জানে। ওরা দু'জনেই দিলদরিয়া। ইন্দ্রনাথ আবার দারুণ খাদ্যরসিক, অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের কাটসিনস্কির মতন যে-কোনো দুর্গম জায়গাতেও ও দারুণ সুখাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই এখন ভাবছে আমার কথা, তাই একবার বিষম খেলাম।

খেয়ে উঠে হাত ধুতে গিয়ে দেখি বালতিতে জল নেই। জিজ্ঞেস করলাম, লেমসা, পানি ?

লেমসা বললো, বালটিমে নেই হ্যায় ? কুঁয়াসে লে লিজিয়ে।

অর্থাৎ কুয়ো থেকে আমাকেই জল তুলতে হবে। এরপর পাছে ও আমাকে বাসন মেজে দেবার জন্য হুকুম করে, তাই নিজেই আমি এঁটো প্লেটটা তুলে নিলাম। দুঃখ হতে লাগলো জামাটার জন্য। বড্ড প্রিয় জামা ছিল আমার। ব্যাটাকে বগলের কাছে ছেঁড়া তাঁতের শার্টটা দিলেই তো হতো। যাক্ একটা রাত তো। কেউ তো আর দেখছে না আমার এই অপমানের দৃশ্য।

রোড-রোলার চালক সঙ্গে পাউরুটি আর শুকনো খেজুর রাখেন, তাই খেয়েই শুয়ে পড়েছেন। বাকি রাতটা সেই কেশো রুগীর পাশে শুয়েই কাটলো।

ঘুম ভাঙলো খুব ভোরেই। ডাকবাংলোর অধিবাসীরা জাগবার আগেই আমি কুয়োর কাছে গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নিলাম। কতক্ষণে হেমন্ত আর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবে! এখানে আর এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই। লেমসা নিশ্চয়ই সকালের চা দেবে না।

প্রথম বাস আসে প্রায় দশটার সময়। সকালের দিকে বেশি ট্রাকও চলে না। লেমসার

সাইকেলটা নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তারপর লেমসা বাসে করে গিয়ে সাইকেলটা ফেরত নিয়ে আসবে। বিশ্বাস করে দেবে তো ?

এই সময় লেমসা নিজেই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ ?

লেমসা জানালো, ওকে বদগাঁওতে যেতে হবে আণ্ডা আর মাখন আনবার জন্য।

দমে গেলাম। পাহাড়ী চড়াই রাস্তা, এক সাইকেলে দু'জন যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমি চাইলেও ও নিশ্চয়ই রাজি হবে না। এখন ট্রাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর গতি কি ?

লেমসা আজ আমারই শার্টটা পরেছে। যদিও মুখে একটুও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নেই, তবু ওকে অনুরোধ করলাম, তুই একটা কাজ করবি লেমসা ? বদগাঁও ডাকবাংলোতে যে দু'বাবু আছে, তাদের খবর দিয়ে আসবি ? বলবি যে আমি একটু পরেই আসছি। আচ্ছা, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তোকে ওরা পাঁচ টাকা বকশিশ দেবে।

চিঠি নিয়ে লেমসা চলে গেল। আমি বাংলোর কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কালভার্টের ওপর বসে রইলাম ট্রাকের প্রতীক্ষায়। মাত্র সাত মাইল রাস্তা, এক টাকায় নিয়ে যেতে যে-কোনো ট্রাক রাজি হবে।

একটু বাদে দু'জন বয়স্ক লোক, দুই মহিলা, পাঁচটা বাচ্চা আর কাল সন্ধেবেলা দেখা সেই দুই যুবতী এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাংলো থেকে। এঁরা মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে একটা বই বার করে অখণ্ড মনোযোগে পড়তে শুরু করি। এঁদের সঙ্গে একটাও কথা বলতে চাই না। যে-কোনো কারণেই হোক, এরা আমার শত্রু হয়ে গেছে।

ট্রাক এলো না, কিন্তু দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলো লেমসা। সঙ্গে একটা চিঠি। ইন্দ্রনাথ লিখেছে, হঠাৎ এদিকে সার্ভে-ডিপার্টমেন্টের অনেক লোকজন এসে গেছে, কোনো ডাকবাংলোতে জায়গা নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেও থাকার জায়গা পেলাম না। আমরা রাঁচীর দিকে চলে যাচ্ছি। নেতারহাটে থাকবো। তুই চলে আয়। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করবো। বাংলোর চৌকিদারের কাছে চিঠি রেখে যাচ্ছি।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কথা ছিল। তার বদলে হাসি পেল। ওদের তো দোষ নেই, ওরা জানবে কি করে যে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসেছি। ওদের রোজগার আছে, আমার নেই, তবু নিজের গাড়ি-ভাড়াটা অন্তত আমি সবসময়েই জোগাড় করে আনি।

এখন আমার কাছে দু'দিকের পথই সমান। রাঁচী যাবারও ভাড়া নেই, কলকাতা ফেরারও ভাড়া নেই। তাছাড়া আছে লেমসার বকশিশের দায়। পকেটের একটা টাকা এখন আর কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়। লেমসা চিঠিটার মর্ম জানে না। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, শোন্, বাবুরা চক্রধরপুর আছে। আমরা দু'দিন পরে আবার আসছি, তোকে ভালো করে বকশিশ দিয়ে দেবো তখন। কিরে, ঠিক আছে তো ?

লেমসা উল্টো দিকে হাত দেখিয়ে বললো, চক্রধরপুর নেহি, বাবুলোক ইধার গিয়া।

এই রে, ধরে ফেলেছে দেখছি। তবু জোর দিয়ে বললাম, না, না, চক্রধরপুরেই গেছে। আমরা আবার ফিরে আসছি, তোর কোনো চিন্তা নেই।

লেমসা মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আর কথা না বাড়িয়ে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলুম।

খানিকটা পরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। এবার কোন্‌দিকে যাবো ? মন টানছে বন্ধুদের দিকে। ওরা দু'জনে মিলে আনন্দ করছে, আর আমি এখানে পরিত্যক্ত, একা ! নিজের দোষেই

আমার এই অবস্থা, তবু মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অভিমান জন্মায়। মনে হয়, পৃথিবীর কেউ আমাকে চায় না। বন্ধুরাও আমাকে ভুলে গেছে। আমার জন্য কেউ কোথাও অপেক্ষা করে নেই।

রাঁচীর দিকে যাবার কোনো মানে হয় না। নেতারহাট ভিড়ের জায়গা। টিপিক্যাল টুরিস্ট স্পট। ওসব আমার ভালো লাগে না। কথা ছিল, এদিক থেকে আমরা সারাণ্ডা ফরেস্টের দিকে যাবো, কারো নদীর উৎস সন্ধান করে আসবো। তাছাড়া, ভিক্ষে করেই যখন যেতে হবে আমাকে তখন কলকাতার দিকে ফেরার চেষ্টা করাই ভালো। এবার যে-কোনো উপায়েই হোক একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে, আমিও হেমন্ত বা ইন্দ্রনাথের মতন প্যান্ট-শার্টের বিভিন্ন পকেটে গোছা-গোছা টাকা রাখবো।

আসবার সময় পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল, ফেরার পথটা ঢালু। হাঁটা খুব কষ্টকর নয়। যদিও পুরো রাস্তাটা হেঁটে ফেরা একটা অবাস্তব প্রস্তাব, তবু কিছু দূর হেঁটে গিয়ে বাস বা ট্রাকের ভাড়া কমানো যায়। তাছাড়া আর একটা কথা বারবার আমার মাথায় ঘুরঘুর করতে লাগলো। আজ সকালে বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই। যে-জায়গায় আমার নোটগুলো উড়ে গিয়েছিল, সেখানটায় গিয়ে আর একবার খুঁজলে হয় না ! প্রকৃতি তো এখন আমার ওপর প্রসন্নও হতে পারেন। যদি অন্তত একটা দশ টাকার নোটও পাওয়া যায়।

খানিকটা এগোবার পর রাস্তার পাশে একটা বাড়ি চোখে পড়লো। বাড়িটা আমার চেনা। সাদা রঙের এই দোতলা বাড়িটা একজন ঠিকাদারবাবুর। গতবার আলাপ হয়েছিল। বেশ ছটফটে ধরনের দিলদরিয়া লোক, সেবার ওর জিপে করে আমাদের জঙ্গলের অনেক গভীরে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। ঐ ঠিকাদারবাবুর কাছে আমার পরিচয় দিয়ে কিছু টাকা ধার চাইলে কেমন হয়! লোকটার তো অনেক টাকা। কলকাতায় গিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেই হবে।

খানিকটা এগিয়েও থেমে গেলাম। যদি না দেয় ! যদি অবিশ্বাস করে ? সেই বাড়তি অপমানটুকু নিতে যাবো কেন ? তাছাড়া সেবারই সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা মেয়েমানুষ চালান দিয়েও পয়সা রোজগার করে। খেতে না-পাওয়া সাঁওতাল-ওরাওঁ মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুর্গাপুর বা আসামে চালান করে দেয়। সেবার আমি একটি আদিবাসী মেয়ের রূপের প্রশংসা করায় লোকটা বলেছিল, চান ? এর মধ্যে কোন্‌টাকে চান বলুন, সবাই তো আমার হাতের মুঠোয়। কুৎসিত লেগেছিল শুনে।

কোথায় যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম : যাঞ্চা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা। যে অধম, তার কাছ থেকে কোনো কিছু চেয়ে পাওয়ার চেয়েও, আমার চেয়ে যে গুণে বড়, তার কাছ থেকে কিছু চেয়ে ব্যর্থ হওয়া অনেক ভালো। আর গেলাম না।

রাস্তার দিকে তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে-চেয়ে হাঁটতে লাগলাম। যদি একটা টুকরো কাগজও চোখে পড়ে অমনি উল্টেপাল্টে দেখি। মাঝে-মাঝে উল্টো দিক থেকে ট্রাক আসছে, তখন ধার ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছি। আবহাওয়া খুব সুন্দর বলে হাঁটায় কোনো কষ্ট নেই সত্যিই।

কোন্ জায়গায় আমার টাকা হারিয়েছে, তা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। পাহাড়ের অনেক বাঁকই এরকম। তবু এক সময় ঠিক চিনতে পারলাম। এই তো খাদের পাশে সেই বনতুলসী গাছটা, যার ওপর অন্যরকম ফুলের মতন আমার দশ টাকার নোটটা ফুটেছিল !

তন্নতন্ন করে খুঁজলাম জায়গাটা। টাকাগুলোর চিহ্ন নেই। তবু কেন যে আমাকে আরও কষ্ট দেবার জন্য এখানেই পাউরুটির খোলসের কয়েকটা টুকরো পড়ে থাকবে ! সেগুলো বারবার কুড়িয়ে আমাকে আহম্মক হতে হয়। এই কাগজগুলো উড়ে যেতে পারতো না !

জায়গাটা আমাকে চুম্বকের মতন আটকে রাখলো, ছেড়ে যেতে পারলাম না। একটা পাথরের ওপর বসলাম। এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে একটুক্ষণ টানবার পর লক্ষ করলাম, জায়গাটা

অসম্ভব সুন্দর। সামনে বিশাল ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। নিচের সমতলভূমি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, পৃথিবীটা কী নির্জন! মানুষের বসবাস করার পক্ষে পৃথিবীটা এখনও কত সুন্দর! চতুর্দিকে এতো সবুজ, এমন শান্ত সুগম্ভীর পাহাড়, এমনি-এমনিই ফুটে আছে কতো বুনো ফুল। এমনকি শালের মতন কঠিন গাছও কত নরম সুন্দর ফুল ফোটায়। এখানে আকাশ বেশি নীল, এবং এই নীল রঙের মধ্যে কোনো বিষাদ নেই।

কে বলে খালি পেটে সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না? যে-জায়গাটা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, সেই জায়গাটারই রূপে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। নেতারহাট মোটেই এর চেয়ে ভালো জায়গা নয়। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্ত আমার চেয়ে বেশি কিছু উপভোগ করছে না। চক্রধরপুরে ফেরার কোনো তাড়া অনুভব করলাম না। ইতোমধ্যে দু'দিক থেকে দুটো বাস চলে গেছে। পকেটে যা পয়সা আছে, তাতে কোনোক্রমে চক্রধরপুরে পৌঁছোনো যায়।

এমন সময় বেশ জোরে একটা ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘট্ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দে যেন পাহাড় কাঁপছে। তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তার মাঝখানে এলাম। দূরে একটা জিনিস দেখে কিন্তু বেশ কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ হলো।

রোড রোলার চালিয়ে সেই কেশো রুগীবাবু আসছেন। রোড রোলারটা তো চক্রধরপুরেই যাবে। এটায় উঠে বসলে তো আমার ভাড়ার টাকাটা বেঁচে যায়। যাক্ না আস্তে। আমার জন্য তো কেউ কোথাও অপেক্ষা করছে না। হাত তুলে সেটা থামালাম।

রোড রোলারটা চক্রধরপুরে আমাকে পৌঁছে দিল রাত দশটায়। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম ভদ্রলোকের কাছ থেকে। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবার জোগাড়। বিকেলে শুধু এক কাপ চা খেয়েছি। সারাদিনে ঐ আমার একমাত্র খাদ্য। সেই সময় রোড রোলার চালকবাবুকেও এক কাপ চা খাওয়াতে হয়েছিল এবং তাতে আমার খুচরো পয়সাগুলো খরচ হওয়ায় গা কড়কড় করছিল। অবশ্য এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছি ভদ্রলোককে।

আসবার পথে ভেবেছিলাম, চক্রধরপুরে অনেক বাঙালি আছে, যে-কোনো একজনের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে সব খুলে বলবো। কেউ কি সাহায্য করবে না? কলকাতায় ফেরার ভাড়াটা কেউ ধার দেবে না? কিন্তু কয়েকটা বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করেও ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না। অনেক রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক ঠক জোচ্চোরও তো গাড়ি ভাড়া নেই, টাকা হারিয়ে গেছে বলে লোককে ঠকায়। কাগজে প্রায়ই পড়ি। আমাকে যে সে রকম ভাববে না, তার নিশ্চয়তা কী? পকেট থেকে হাওয়ায় টাকা উড়ে গেছে, এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে?

এবং মনের মধ্যে রয়ে গেছে সেই অহঙ্কার। যাঞ্চা মোঘা বরমধি গুনে নাধমে লব্ধকামা। কোনোদিন তো কারুর কাছে কিছু চাই নি। ভিক্ষাবৃত্তি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন পেশা, আমি ভিক্ষুক হিসেবেও অযোগ্য।

রাত কাটানো যায় রেল স্টেশনে। কিন্তু কিছু না খেলে কিছুতেই ঘুম আসবে না। স্টেশনের বাইরে দেখলাম, রিক্সাওয়ালারা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে ছাতু খাচ্ছে। চিরকাল শুনেছি ছাতু খুব স্বাস্থ্যকর খাদ্য, খুব সস্তাও বটে। ছাতুওয়ালার কাছ থেকে চল্লিশ পয়সার ছোলার ছাতু কিনলাম। দুটো কাঁচা লঙ্কা ফ্রি। পেতলের থালায় জল দিয়ে মেখে নিলাম অন্যদের দেখাদেখি। খিদের মুখে খেয়েও ফেললাম টপাটপ করে। মাঝখানে একটু দম বন্ধ করেছিলাম, আর গোল্লাগুলো জিভে না ঠেকিয়ে একেবারে গলার মধ্যে। বেশ পেট ভরে গেল। তারপর স্টেশনের কল থেকে অনেকখানি জল খেয়ে নেবার পর মনে হলো, এতো চমৎকার সস্তা খাবার থাকতে অন্য আজেবাজে স্বাস্থ্যহীন খাবারের জন্য মানুষ বেশি পয়সা খরচ করে কেন?

একটু পরেই পেটটা গুলিয়ে উঠতেই আমি রেল লাইনের পাশে বসে পড়লাম। এতো বেশি

বমি হলো যে মনে হলো যেন আগের দিনের ভাতসুদ্ধ উঠে আসছে। দমকে–দমকে বেশ কয়েক দফায় বমি করলাম। উঠে এসে মুখ ধুতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথা ঘুরছে, শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। কোনোক্রমে একটা অন্ধকার মতোন জায়গা খুঁজে প্লাটফর্মের মেঝেতে ঝোলাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চোখ বুজে পরবর্তী কর্মসূচীটা ঠিক করে নিতে হলো। যদি রাত্তিরটা বেঁচে থাকি, তাহলে কাল সকালেই বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। ধরা পড়লেও, আশা করা যায়, জেলে ওরা ছাতুর বদলে ভাতই খেতে দেয়। আর যদি ধরা না পড়ি, তাহলে খড়গপুরে মানবেন্দ্রর কাছে যেতে হবে। কাছাকাছির মধ্যে আর কেউ চেনা নেই।

সকালে ঘুম ভাঙলো ট্রেনের শব্দে। একটা লোকাল ট্রেন তখনই খড়গপুর যাবে। চড়ে বসলাম। ফার্স্ট ক্লাসে। ধরা পড়তে গেলে ভালো জায়গাতেই ধরা পড়া ভালো। থার্ড ক্লাসে অসম্ভব ভিড়, এখন আমার দাঁড়িয়ে যাবার একটুও ইচ্ছে নেই, বরং শোওয়ার জায়গা পেলে ভালো হয়।

ট্রেনে কেউ বিরক্ত করলো না। খড়গপুর স্টেশনের একটু আগে ট্রেনটার গতি মন্থর হতেই ঝুপ করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। লাইন পেরিয়ে রাস্তায় এসে মনে হলো আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে আছে ? পকেটে এখনো বারো আনা পয়সা, অনায়াসে কফি আর নোনতা বিস্কুট খাওয়া যায়। তাই খেয়ে নিলাম আগে। প্যাকেটে এখনো দুটো সিগারেট। রিক্সা ডেকে চেপে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, ‘চলো, আই আই টি।’

আই আই টি ক্যামপাসে মানবেন্দ্রর কোয়ার্টার আমার চেনা। ওখানে গিয়ে অন্তত একটা দিন বিশ্রাম না নিয়ে আর কলকাতায় ফেরা নয়। সারা গায়ে দারুণ ব্যথা। এটা নিশ্চিত রোড রোলারে চাপার ফল। প্রথম ঘোড়ায় চড়লেও গায়ে এতো ব্যথা হয় না।

মানবেন্দ্রর ঘর তালাবন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করে তার চাকরকে খুঁজে বার করা গেল। এই চাকরটি নতুন, আগেরবার এসে একে দেখি নি। বাবু কোথায় ?

চাকর ঠিক জানে না। বাবু খেয়েদেয়ে বেরিয়েছেন।

— কোথায় ? কলেজে ?

— তা হতেও পারে।

আমি চাকরকে হুকুম দিলাম, যাও দেখে এসো। বাবুকে ডেকে আনবে এক্ষুনি, বলবে কলকাতা থেকে এক বন্ধু এসেছে, খুব দরকার।

সে ডাকতে চলে গেল। আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম, একটু দাঁড়াতে হবে ভাই !

সামনের কম্পাউন্ডে পায়চারি করতে লাগলাম আমার শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে। দেয়ালের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো লজ্জাবতী লতা। একটু পা লাগলেই গুটিয়ে যায়। উবু হয়ে বসে আমি সবক'টা পাতায় হাত বুলোতে লাগলাম। ইচ্ছে হলো, ওদের সঙ্গে কথা বলি।

পাতাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল একটা বড় আকারের সবুজ ঘাসফড়িং—বাঙাল ভাষায় যাকে বলে কয়া। সেটা তিড়িং করে লাফ দিল। অনেক দিন বাদে এরকম একটা ঘাস ফড়িং দেখলাম। সেটাকে ধরার জন্য আমি ক্ষেপে উঠলাম। যতবার ধরতে যাই, লাফিয়ে-লাফিয়ে পালায়।

এরকমভাবে বেশ সময় কাটছিল। রিক্সাওয়ালা ডাকলো, বাবু !

হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। চাকরটা আসতে অনেক দেরি করছে। মানবেন্দ্র যদি কলেজে না থাকে ? যদি হঠাৎ সে কলকাতায় চলে যায় ! কিংবা যদি এখানেই কোনো বন্ধু বা প্রেমিকার কাছে সারাদিনের জন্য গিয়ে থাকে ? আমি রিক্সার ভাড়া দিতে পারবো

না। পকেট এখন সত্যিকারের শূন্য। খাঁটি সর্বহারা বলা যেতে পারে। চাকরটা যদি আমাকে দরজা খুলে না দেয় ?

এই প্রথম আমার মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। মনে হলো, আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না। মুখটা কুঁচকে আমি লজ্জাবতীর গুটিয়ে যাওয়া পাতাগুলোয় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললাম, এইভাবে আর চলে না। এবার জীবনটার একটা পরিবর্তন দরকার। সত্যি এইরকম ছন্নছাড়াভাবে আর চলে না।

২

কলকাতায় ফিরে বিদেশী খামের একটা চিঠি পেলাম। প্রায় আট ন'খানা ঝকমকে স্ট্যাম্প আঁটা। চিঠিটা এসেছে জাপানের কিওটো শহর থেকে, লিখেছে একজন অ্যামেরিকান। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি।

আরও চার পাঁচখানা চিঠির সঙ্গে ওটাও ছিল আমার টেবিলের ওপর। সেখানে চারদিনের ধুলো জমেছে। চিঠিটা পড়তে-পড়তে আমি দেয়ালে হেলান দিলাম। নইলে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারতাম !

"তুমি কি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে যোগ দিতে রাজি আছো ? তোমাকে এক বছরের জন্য প্রতিমাসে দু'শো ডলার হিসেবে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। তোমার যাতায়াত ভাড়ারও আমরাই বন্দোবস্ত করবো। আয়ওয়া শহরটি খুব ছোট, তবু আশা করি তোমার অপছন্দ হবে না। সেখানকার মানুষগুলো খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। তোমার সম্মতি আছে কী না তা আমাকে অবিলম্বে জানাও!"

তিনবার চারবার চিঠিটা পড়লাম। তবু ঠিক বিশ্বাস হয় না। কেউ ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে ? তবে চিঠিটা জাপান থেকে এসেছে ঠিকই, একটি বিখ্যাত হোটেলের নাম লেখা প্যাডের কাগজ।

নাম সই দেখে মনে হলো, এ নিশ্চয়ই সেই সাহেবটা। কিছুদিন আগে এক বুড়ো সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। সেই সাহেবটি নাকি একজন নামকরা কবি, যদিও আমি তার নাম আগে কক্ষনো শুনি নি। সেবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে এক দুপুরে খাঁটি বাঙালি খাদ্যের এক ভোজসভা হয়েছিল। এক বন্ধুর সুবাদে সেখানে আমিও জুটে গিয়েছিলাম। সাহেবটি বসেছিল ঠিক আমার পাশেই। বাঙালি খাবার খেতে খেতে ইংরেজি কথা বলা আমার ধাতে সয় না। সাহেব-টাহেব দেখলে এমনিতেই অস্বস্তি লাগে। তবু সাহেবটি আমাকে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করছিল।

হঠাৎ সাহেবটি একটা পটোলভাজা তুলে নিয়ে বললো, এটার নাম কি ?

এই সেরেছে, পটোলের ইংরেজি আবার কি রে বাবা ? কোনোদিন শুনি নি। ছেলেবেলা যে ওয়ার্ডবুক মুখস্থ করেছিলাম, তাতে কি পটোল ছিল ? সাহেব আমাদেরই একটা খাবারের নাম জিজ্ঞেস করলো, আর আমি তা বলতে পারবো না ? মরিয়া হয়ে বলে দিলাম, দিস ইজ কল্ড ফ্রায়েড পাট্‌ল্ !

আশেপাশের কয়েকজন সে কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু আমার ধারণা, তারাও পটোলের ইংরেজি জানে না। না হলে বলে দিল না কেন ?

তারপরে সেই সাহেবটির সঙ্গে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল। বুড়ো হলেও বেশ প্রাণশক্তি আছে। খুব লম্বা, মাঝে-মাঝেই হাসতে-হাসতে পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। ওর নাম

পল্ ওয়েগনার। আমরা মিঃ ওয়েগনার বলছিলাম প্রথম দিকে, সে-ই বললো, শুধু পল্ বলে ডাকতে। ওদের দেশে বড়-ছোট সবাই নাকি সবার নাম ধরে ডাকে। সাহেবটি আমাদের সঙ্গে একদিন নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের চিতাস্থান দেখতে গিয়েছিল। আর একদিন আমাদের কয়েক বন্ধুকে খাইয়েছিল গ্র্যান্ড হোটেলে। সেই প্রথম আমার জীবনে গ্র্যান্ড হোটেলে পা দেওয়া। পরের পয়সায় খুব খেয়েছিলাম সেদিন।

সেই সাহেবটি আমাকে বিদেশ যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করেছে ? কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। কলকাতায় ওর তো কম লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় নি, তবু আমাকেই পছন্দ করলো কেন ? আমার মুখখানা গোল, সেইজন্য ? অচেনা লোকের সঙ্গে আমি এমনিতেই বেশি কথা বলতে পারি না, তারপর ইংরেজিতে বলতে হলে তো কথাই নেই !

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যদি সত্যি হয়, তবে এরকম সুযোগ মানুষের জীবনে বেশি আসে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে কী করতে হবে ? ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম ব্যাপারটি কি? বিশ্ববিদ্যালয় যখন, তখন আমাকে ছাত্র বা মাস্টার হতে হবে নাকি ? অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে ছাত্রজীবন শেষ করেছি, আবার কিছুতেই স্কুল-কলেজের ছাত্র হতে পারবো না ! সে আমায় যে যতই লোভ দেখাক। মাস্টার হবার মতনও যোগ্যতা আমার নেই। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে হলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবো ! বেশিক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলতে গেলেই আমার বুক ধড়ফড় করে, কানে কট্‌কট্ করে, হাঁচি পায়, পেট কামড়ায়।

এমনও হতে পারে, চিঠিটা ভুল করে আমার কাছে এসেছে। বুড়ো সাহেব অন্য কারুর কথা ভেবে ভুল করে আমার ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো হোমরাচোমরা লোকদেরই নেমন্তন্ন আসে। একটা সাধারণ বেকার—কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করি নি। কথাটা ভেবেই খুব নিরাশ হয়ে পড়লাম। দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, ভুল করে চিঠিটা এসেছে আমার কাছে ! যদি সত্যি একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করতাম !

যাই হোক, এসব পরে ভাবা যাবে। কয়েকখানা পুরনো বই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিলাম কলেজ স্ট্রিটে। পকেটে একদম পয়সা না থাকলে কি এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা যায় ! কফি হাউসের সামনে হীরেন আর স্বপ্নার সঙ্গে দেখা। ওরা সদ্য কফি হাউস থেকে নেমে এসেছে। আমি ওদের বললাম, চল, আবার চল, আমি তোদের মাট্‌ন ওমলেট খাওয়াবো।

সত্যি হোক মিথ্যে হোক, আমার পকেটে একটা আমেরিকার নেমন্তন্ন চিঠি। এই উপলক্ষে কারুকে কিছু খাওয়াতে না পারলে কি মন ভরে ?

ছেলেবেলা থেকে কত স্বপ্ন দেখেছি বিদেশে যাবার। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে ভেবেছিলাম, জাহাজে আলুর খোসা ছাড়াবার চাকরি নিয়ে একদিন সমুদ্রে ভেসে পড়বো। তা আর হয় নি, স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করার যাবতীয় দোষ আমার ঘাড়ে চেপে বসে গেল। কলেজে পড়ার সময় আমার বন্ধু অসিত হঠাৎ জার্মানি চলে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম, অসিত, আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করিস, যে-কোনো চাকরি, কুলিগিরি হলেও আপত্তি নেই, শুধু দেশগুলো একটু দেখে আসবো ! অসিত চিঠি লিখে জানালো, তুই তো আর্টসের ছাত্র, তাই এখানে কোনো সুযোগ নেই—সায়েন্স পড়লে চেষ্টা করা যেত ! আর্টস পড়লে নাকি কুলিগিরিও পাওয়া যায় না।

তারপর একবার বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, রাশিয়াতে কয়েকজন বাংলা ভাষায় অনুবাদক নেবে। দিলাম দরখাস্ত করে। এক বন্ধুকে ধরে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চরিত্রের সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিলাম। তিনি বাঁকা হেসে বলেছিলেন—সার্টিফিকেট দিচ্ছি বটে, কিন্তু ও চাকরি তুমি পাবে না; অনেক বড়-বড় লোক এজন্য চেষ্টা করছে। কথাটা প্রায়

অভিশাপের মতন ফলে গেল, দরখাস্তের উত্তর পর্যন্ত এলো না !

এখন হঠাৎ এই চিঠি ? এ কি মরীচিকা ! খড়গপুরে লজ্জাবতী গাছের লতাগুলো ছুঁয়ে বলেছিলাম, এবার একটা কিছু পরিবর্তন দরকার। এই কি সেই ?

পরদিন চিঠি লিখে দিলাম, আমি যেতে নিশ্চয়ই রাজি আছি। আমার কী করতে হবে আগে জানাও ! আমার কী কী যোগ্যতা আশা করছো তাও আমি জানি না।

সাহেবটি তখন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চার পাঁচদিন পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন শহর থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগলো। এবং নানা রকম ফর্ম, রংচঙে পুস্তিকা। পল্ ওয়েগনার আমাকে জানালো, তোমার যা যোগ্যতা আছে তাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি খুশি হয়েছি। তোমাকে পড়াতে হবে না, ছাত্রও হতে হবে না। তুমি তোমার দেশের সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করবে। আমরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান থেকেও এরকম এক একজনকে আনাচ্ছি।

যেটুকু দোনামনার ভাব ছিল আমার, তাও কেটে গেল আর একটি ঘটনায়। এর মধ্যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা খাকি খামের চিঠি পেলাম। আমাকে একটা লোয়ার ডিভিশনের ক্লার্কের চাকরি দেওয়া হয়েছে। চকরি ! এর আগে কত জায়গায় যে ইন্টারভিউ কিংবা পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু পাইনি। হঠাৎ এই সময় চাকরির প্রলোভন ! বাড়ির কারুকে কিছু না জানিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম সেই চিঠিটা। কেরানীগিরি করার চেয়ে যে–কোনো জায়গায় পালানো অনেক ভালো। আর গবেষণায় তো ভয় কিছু নেই। গবেষণা মানে তো পাঁচখানা বই দেখে টুকে দেওয়া।

দিন দশেক বাদে বন্ধুদের ব্যাপারটা জানাতেই হলো। না জানিয়ে উপায় নেই।

পাসপোর্ট, ভিসা, ডাক্তারি পরীক্ষা—এরকম নানান ঝামেলা আছে। ওসবের আমি কিছুই জানি না। এক রঙের প্যান্ট আর কোট, যাকে স্যুট বলে, তা আমি জীবনে পারি নি। খুব অল্প বয়সে একটা কোট ছিল, যার নাম তখন ছিল অলেস্টার। এখন তো সোয়েটার আর আলোয়ান দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই। সাহেবদের দেশে তো এরকম চলবে না। গলায় কখনো টাই বাঁধি নি, সেটাও শিখতে হবে।

বন্ধুবান্ধবরা চাঁদা করে প্যান্ট–কোট বানিয়ে দিল। রিডাকশন সেলের দোকান থেকে কিনলাম এক জোড়া বুট। আর কিছু গেঞ্জি আর রুমাল—বিদেশে নাকি সুতোর জিনিসের খুব দাম। তারপর সত্যিই একদিন রাত দুটোর সময় দমদম থেকে জেট প্লেনে চড়ে বসলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা বিদায় দিয়ে গেল।

তবু ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হয় স্বপ্ন। প্যান্ট কোট পরে আমি বিশাল বিমানের জানলার ধারে বসে আছি, ঠিক যেন মানাচ্ছে না। অন্য যাত্রীরা বেশ স্বাভাবিক, আমিই একমাত্র আড়ষ্ট। যেন ঝকঝকে পিন কুশানের মধ্যে একটা বাবলা কাঁটা।

পকেটে মাত্র আট ডলার। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কারুকে চিনি না। শুধু ভরসা এই, বিদেশে কোথাও আমি মারা গেলে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আমার মৃতদেহটাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করবেন। পাসপোর্ট ফর্মে এইরকম লেখা ছিল।

সিটবেল্ট বাঁধতে পারি নি, অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করবার পর পাশের লোকটি দেখিয়ে দিল। হেমন্ত গলায় টাই বেঁধে দিয়েছে। ঠিকই করে ফেলেছি, টাইয়ের গিঁটটা কক্ষনো আর খুলবো না। রাত্রে শোবার সময় গিঁটসুদ্ধুই টাইটা খুলে ঝুলিয়ে রাখবো, আবার দরকারের সময় পরে নেবো।

করাচী আর বেইরুটে দু'বার থামলো। অন্য যাত্রীদের দেখাদেখি আমিও নিচে নামলুম। কিন্তু বেশি দূরে গেলাম না। যদি কোনো গোলমাল হয়ে যায়। মাইক্রোফোনের ঘোষণা ভালো করে

বুঝি না। এ তো আর বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া কিংবা ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসে ভ্রমণ নয়।

রোমে চা জলখাবার খেয়ে দুপুরের আগেই প্যারিস। ভাবা যায়। গতকাল এই সময় আমি দমদমের রাস্তায় বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অসম্ভব ভিড়ের জন্য তিনটে বাস ছাড়তে হয়েছিল, আর এখন আমি প্যারিসের বিখ্যাত নীল আকাশের নিচে। বিমান থেকে নেমে গম্ভীরভাবে হেঁটে যাচ্ছি ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে। টাই ঠিক আছে তো? কোটের নিচ দিয়ে জামা বেরিয়ে যায় নি তো? পাসপোর্ট? ওটা হারালেই সর্বনাশ।

প্যারিসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বিমান বদল হবে এখানে। ওর্লি বিমানবন্দরটা চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম, যদি প্যারিস শহরটা একটু দেখা যায়, যদি দেখা যায় ইফেল টাওয়ার। তখন তো জানি না, বিমানবন্দর থেকে শহর অনেক দূরে। তবু যাই দেখি, তাতেই দারুণ উত্তেজনা। প্যারিসের মাটিতে তো দাঁড়িয়ে আছি, স্বপ্নের প্যারিস! প্রত্যেক মানুষেরই নাকি দু'টি মাতৃভূমি থাকে। একটা, যেখানে সে জন্মায়, আর একটি প্যারিস। কাছাকাছি যেসব ফরাসি ঘোরাফেরা করছে, তাদের সকলকেই আমার কবি কিংবা শিল্পী মনে হয়।

এক সময় শখ করে ফরাসি শিখতে গিয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের হুজুগ। বেশি দূর এগুনো হয় নি, তাও এতদিনে সব ভুলে মেরে দিয়েছি। তবে সেই সময়ই একটা জিনিস শিখেছিলাম, খুব ভালো ফরাসি ভাষা না জানলে ফরাসিদের সঙ্গে ফরাসিতে কথা বলার চেষ্টা করা একদম উচিত নয়। ওরা ফর্‌ফর্‌ করে এমন কথা বলবে, যার একবিন্দু বোঝা যাবে না। সুতরাং আমি কাউন্টারের সুন্দরী মেয়েটিকে ইংরেজিতেই বললাম—টু পোস্টকার্ড প্লিজ!

বিমানবন্দর থেকে রঙিন ছবির পোস্টকার্ডে চিঠি লেখা নিয়ম না? সেই জন্যই কিনলাম কার্ড দুটো। কিন্তু কাকে চিঠি লিখবো? একটাতে না হয় বাড়ির চিঠি। কিন্তু আর একটা? কোনো একটা মেয়েকে চিঠি লিখতে পারলে কি চমৎকার হয়! কিন্তু কে সে? আমার জন্য তো কোথাও কেউ প্রতীক্ষা করে বসে নেই। কোনো মেয়ে তো আমাকে কখনো নিভৃত সময় দেয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়! যেসব মেয়েকে চিনি, তারা সবাই অন্য কারুর না কারুর বান্ধবী। কলম খুলে বসে রইলাম চুপ করে।

কাছাকাছি কত লোভনীয় দোকান। কিন্তু কিছু কেনার সাহস নেই। আট ডলার থেকে কমে সাড়ে সাত ডলার হয়ে গেছে এর মধ্যেই। এখনো অনেক রাস্তা বাকি, কোথায় কী লাগবে জানি না। কলকাতায় একজন বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুশো ডলার মানে আসলে কত? তিনি বলেছিলেন, দুশো ডলার মানে দুশো টাকা। আমাদের দেশে ডলারের যা দামই হোক, আমেরিকার এক ডলার মানে এক টাকা! তাহলে ওখানে দুশো টাকায় আমার একমাস চলবে তো? যে কেরানীগিরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলাম, তার মাইনে ছিল দুশো সাতাশি টাকা।

হেসাডিতে বেড়াতে যাবার সময় তবু বত্রিশ টাকা আমার সঙ্গে ছিল। এখন পকেটে মাত্র সাড়ে সাত ডলার নিয়ে পাড়ি দিচ্ছি চোদ্দ হাজার মাইল দূরে। ইন্দ্রনাথ আর হেমন্তের মতনই, যদি পল্‌ ওয়েগনারের সঙ্গে আমার কোনোক্রমে দেখা না হয়?

হঠাৎ শুনলাম, মাইক্রোফোনে আমার নাম ঘোষণা করছে। প্রথমে মনে হলো, ভুল শুনছি। এ কখনো হতে পারে? আমার নাম ধরে কে ডাকবে? কেন ডাকবে? আবার কয়েক মিনিট পরে সেই ঘোষণা, যদিও বীভৎস উচ্চারণ, তবু আমার নাম ঠিকই। দৌড়োলাম সিঁড়ির দিকে। তখন আমার পেছন থেকে কেউ আমাকে ডাকলো। কাউন্টারের সেই সুন্দরী মেয়েটি। আমি পাসপোর্ট সমেত আমার হাতব্যাগ ফেলে যাচ্ছি। মেয়েটিকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আবার ছুটলাম।

বিমান ছাড়বার জন্য গজরাচ্ছে। আমাকে দেখে একজন লোক তড়বড় করে অনেক

কিছু বলে গেল, একটি অক্ষরও বুঝলাম না। অতি দুঁদে ফরাসি ! এরকম অবস্থার জন্য তৈরি ছিলাম আগে থেকেই। মুখস্থ করা বাক্যটা বললাম, জ্য ন্য পার্ল ফ্রাঁসে! আমি ফরাসি জানি না!

লোকটা আমার একথাও বুঝতে পারলো না। আবার সে বাক্যবন্যা শুরু করলো। আমি এবার প্রায় বানান করার মতন করে উচ্চারণ করলাম, আ–মি ফ–রা–সি জা–নি–না।

তখন সে আর একজনের উদ্দেশে হাঁক পাড়লো। সে ইংরেজি জানে। সেই লোকটি আমাকে খুব মিষ্টি করে বললো, ভদ্রমহোদয়, ঐ যে আপনার বিমান ছেড়ে যাচ্ছে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সেদিকে ছুটতে যাচ্ছিলাম, লোকটি আমার হাত চেপে ধরে বললো, আপনার কী মাথা খারাপ ? দেখছেন না সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

—তাহলে আমি কী করে যাবো ?

—আপনি যেতে পারবেন না।

আমার ইচ্ছে হলো প্রচণ্ড গর্জন করে বলি, আবার সিঁড়ি লাগাও ! আমাকে যেতেই হবে !

মিনমিন করেই বললাম কথাটা। কিন্তু একবার সিঁড়ি সরিয়ে নিলে আর নাকি লাগাবার নিয়ম নেই। আমারই চোখের সামনে বিমানটা আমার সুটকেশ পেটে নিয়ে উড়ে গেল।

আসলে বৈরুটের পর আমি ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে ভুলে গেছি ! সময়ে গোলমাল হয়ে গেছে আমারই ! ছোটকাকার ঘড়িটা ধার করে এনেছি, বেশি নাড়াচাড়া করতেই ভয় করে।

বাস থেকে একবার নেমে পড়লে সেই টিকিটে যেমন অন্য বাসে চাপা যায় না, প্লেনের বেলাতেও সেই নিয়ম নাকি ? এরকম সন্দেহ একবার উঁকি মেরেছিল মনের মধ্যে। জামাকাপড়ের সুটকেশটাও চলে গেল। পকেটে সাড়ে সাত ডলার নিয়ে প্যারিসে আমি পরিত্যক্ত। এবার ?

সেরকম কিছু হলো না অবশ্য। দেড়ঘণ্টা বাদে আর একটি বিমানে আমাকে তুলে দেওয়া হলো। এবার সাড়ে সাত ঘণ্টা অবিরাম উড়ে যেতে হবে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে। প্রত্যেকবার বিমান ছাড়ার পরই একটি মেয়ে এসে নেচে–নেচে দেখায়, অ্যাকসিডেন্ট হলে কীভাবে লাইফ জ্যাকেটটা খুঁজে নিয়ে পরতে হবে, কোন্ দরজা দিয়ে লাফাতে হবে। কোনোদিন এইভাবে কেউ বেঁচেছে বলে শোনা যায় নি।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠিক আকাশের মতনই নীল বিশাল মহাসাগর। মোটেই ভয়াবহ মনে হয় না। যদি মরতেই হয়, তবে সমুদ্রে ডুবে মরতে আমি পছন্দ করবো। ক্রমে আটলান্টিকও ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। এখন শুধু মেঘ। ধপধপে সাদা। বিমানটি এখন এভারেস্টের চূড়ার থেকেও অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই মেঘের রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে–থাকতে হঠাৎ এক সময় মনে হয় এটা যেন আর একটা পৃথিবী, এখানেও মাঠ, পাহাড়, বাড়ি, দুর্গ রয়েছে—শুধু সবকিছুই সাদা আর ঘুমন্ত।

বিকেল থেকে সন্ধে হলো, তারপর রাত হয়ে গেল, খেয়ে নিয়ে অনেকে ঘুমিয়ে পড়লো। এবং তার খানিকটা বাদে নিউইয়র্কে যখন পৌছোলাম, তখন সেখানে সন্ধে। আইড্‌ল ওয়াইল্ড বিমানবন্দরটি এত বড়, এত আলো, এত মানুষজন যে, প্রথমটায় দিশেহারা হয়ে যেতেই হয়। আমার সুটকেশটা খুঁজে বার করাই প্রথম কাজ। কিন্তু তার আগেই একজন আমায় দাঁড় করিয়ে দিল একটা কাউন্টারের সামনে। হাত বাড়িয়ে বললো, প্লেট ?

ভাগ্যিস এক্সরে প্লেটটা সুটকেশে না রেখে বাইরেই রেখেছিলাম। এক্সরে প্লেট না দেখে ওরা কারুকে দেশে ঢুকতেই দেয় না। জোরালো আলোয় অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখে লোকটি পছন্দ করলো। তারপর চালান করে দিল আরেক কাউন্টারে। সেখান থেকে আর একটায়। ব্যাগাটেলির গুলির মতন এই রকম ঘোরাঘুরি চললো কিছুক্ষণ। সুটকেশটাও উদ্ধার হলো। কাস্টমস চেকিং–

এর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি শিকাগো যাবো, কোন্‌দিক দিয়ে ?

লোকটি গম্ভীরভাবে বললো, টেক অ্যাল !

এই প্রথম আমেরিকান ইংরেজির ভালোমতন স্বাদ পেলাম। অ্যাল আবার কী জিনিস ? সবকিছু ছোট করে বলা এদের স্বভাব। আমরা চিরকাল শুনেছি, আধঘণ্টার ইংরেজি হাফ অ্যান আওয়ার, এরা বলবে হ্যাফ আওয়ার। এমন কী, বাঘকে বলবে ক্যাট।

এক লোককে দু'বার জিজ্ঞেস করে বোকা বনার চেয়ে আর একজনকে আবার ধরলাম। সেও বললো, টেক অ্যাল !

তারপর আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, হোয়াট ইজ অ্যাল ?

অনেক কষ্টে উদ্ধার করা গেল। বিমানবন্দরটা এত বড় যে একদিক থেকে আর একদিকে যেতে বাস লাগে। আমেরিকান এয়ারলাইনসের বাস ধরলে সেটা নিয়ে যাবে তাদের প্লেনের কাছে। সেটা যাবে শিকাগো। ঐ কম্পানির নামই সংক্ষেপে অ্যাল।

শিকাগোয় পৌঁছোলাম রাত বারোটায় প্রায়। এখান থেকে আবার ছোট প্লেন। এবারে কাউন্টারের লোকটি জানালো, সে তো কাল সকালে ! আজ রাত্রে আর কোনো প্লেন যাবে না।

তাহলে রাতটা কোথায় কাটাবো ?

তখন আমি একটা দারুণ নির্বোধের মতন কাণ্ড করলুম। আমি কত রাত মাঠে, গাছতলায় কিংবা শ্মশানঘাটে শুয়ে কাটিয়েছি, আর একটা রাত যে এয়ারপোর্টেই কাটানো যায়, সেটা আমার মাথায় এলো না। আমি ভাবলাম, সাহেবদের দেশে বোধহয় কেউ বাইরে থাকে না ! চমৎকার সব গদি মোড়া বেঞ্চ, সুটকেশটা মাথায় দিয়ে অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়া যায়, কিন্তু তাহলে যদি কেউ আমাকে বাঙাল ভাবে ? এয়ারপোর্টটা একেবারে নির্জন হয়ে এসেছে, আমি ছাড়া আর একটিও যাত্রী নেই।

কাউন্টারের লোকটিকে বললাম, আমার জন্য একটা হোটেল ঠিক করে দিতে পারো ?

সে বললো, ঐ তো অ্যাপ্রুভড হোটেলের লিস্ট টানানো আছে। তুমি ফোন করো।

সেইসব হোটেলের রেট কুড়ি থেকে সত্তর ডলার। কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বললাম, কাছাকাছি কোনো ছোটখাটো হোটেল নেই। শুধু রাতটা থাকবো, কাল ভোরেই আমার প্লেন।

সে বললো, আট দশ মাইলের মধ্যে দু'একটা হোটেল আছে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখছি তোমার জন্য।

গল্প-উপন্যাসে পড়েছি শিকাগো বিখ্যাত গুণ্ডাদের জায়গা। এত রাত্রে পথে ঘুরে-ঘুরে হোটেল খুঁজতে ভয় করবে। তাছাড়া সবচেয়ে কাছের হোটেলটাই নাকি আট দশ মাইল দূরে।

লোকটি ফোন নামিয়ে বললো, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমার জন্য গাড়ি আসছে।

—ওদের রেট কত ?

—খুব রিজনেবল।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা গাড়ি এসে থামলো, হর্ন বাজলো। লোকটি বললো, ঐ যে তোমার গাড়ি এসে গেছে।

দশ মাইল দূরের হোটেল থেকে এত তাড়াতাড়ি গাড়ি আসে কী করে ? সে কথা জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম না। গাড়িটা জোরে-জোরে হর্ন দিতে লাগলো।

সুটকেশটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বড় ভ্যানের মতন নীল রঙের গাড়ি। ড্রাইভার একটি নিগ্রো, আর কেউ নেই। সে আমার সুটকেশটা পেছন দিকে ছুড়ে দিয়ে আমাকে সামনে এসে বসবার ইঙ্গিত করলো।

নিগ্রোটি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, চকচকে চামড়ার পোশাক পরা, অবিকল একটি দৈত্য। গাড়ির মধ্যে একটি যন্ত্র থেকে মাঝে–মাঝে কে যেন কথা বলছে, নিগ্রোটি তার উত্তরও দিচ্ছে। বুঝলাম, হোটেল থেকেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে। গাড়িটা রাস্তাতেই ঘুরছিল, হোটেল থেকে তাকে বলে দেওয়ায় সে অত তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। সে একটু দেরি করে এলে আমি অনেক লজ্জা থেকে বাঁচতাম।

রাস্তার পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এই আমার প্রথম আমেরিকা দর্শন। কিছুই দেখা যায় না, বেশ চওড়া একটা আলো ঝলমল রাস্তা, দু'পাশে অন্ধকার মাঠ। যে–কোনো দেশের রাস্তাই এরকম।

নিগ্রোটি কোনো কথা বলে না। সে একটা চুরুট টানছিল, এক সময় সেটা ফেলে দিল। সেই সুযোগে আলাপ জমাবার ছুতোয় আমি বললাম, তুমি কি আমার দেশের একটা সিগারেট খাবে?

ভেবেছিলাম, নিগ্রো যখন, নিশ্চয়ই কড়া সিগারেট পছন্দ করবে। এগিয়ে দিলাম চারমিনারের প্যাকেট।

সে সন্দিগ্ধভাবে প্যাকেটটা নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর একটা সিগারেট নিয়ে ফটাস করে লাইটার জ্বেলে ধরালো।

আমি বললাম, তোমার ভালো লাগছে ? তাহলে তুমি পুরো প্যাকেটটা নিতে পারো।

সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে সে বললো, ম্যান ! দিস ইজ পয়জন।

সিগারেটের ব্যাপারে সুবিধে হলো না। তখন সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, যে হোটেলে যাচ্ছি, তার ভাড়া কত ?

—সিঙ্গল রুম দশ ডলার। দু'ডলার গাড়ি ভাড়া !

তৎক্ষণাৎ আমার গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়া উচিত ছিল। ষাট–সত্তর মাইল গতিতে গাড়ি ছুটছে, আত্মহত্যা করার জন্য ধরণীকে আর দ্বিধা হতে হতো না !

আমি বললাম, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো !

— হোয়াট ?

নিগ্রোটির সাদা দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু আমি তখন ভয়–ভাবনার ঊর্ধ্বে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। অনেক দারিদ্র্য সহ্য করেছি কিন্তু কখনো কারুর কাছে দীনতা প্রকাশ করি নি। বিদেশ–বিভুঁয়ে এসে তাই করতে হবে ?

নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, আমার কাছে অত টাকা নেই।

রাস্তার ডান দিকে খুব জোরে গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গেট পেরুতে পেরুতে সে বললো, হিয়ার ইউ আর !

হোটেলের কাউন্টারে একটি মাত্র লোক জেগে আছে। বাইশ– তেইশ বছরের একটি তরুণ, নীল চোখ, চুলগুলো রুপোলি, ঠিক কোনো দেবতার মতন রূপবান। এই সুন্দর চেহারার ছেলেটি সিনেমায় নায়ক না হয়ে হোটেলের কেরানি হয়েছে কেন ?

তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে হাত বাড়িয়ে বললো, ইয়োর পাসপোর্ট প্লিজ !

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম একটুক্ষণ। কী রকম যেন বিষণ্ন। আমিও মুখটা বিষণ্ন করে বললাম, আগে একটা কথা বলি ? একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে ! আমি আজই এদেশে এসে পৌঁছেছি। আমার কাছে বেশি টাকা নেই। আগে রেট জানলে আমি এখানে আসতাম না।

ছেলেটি আমার সম্পর্কে কোনোরকম কৌতূহল দেখালো না। আমি কোন্ দেশ থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কিছুই জানতে চাইলো না। বোধহয় ওর ঘুম পেয়েছিল। রাত প্রায় একটা।

সে শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে বললো, তুমি এখন কী করতে চাও ?

—কাল ভোর ছ'টার সময় আমার প্লেন। সেই প্লেন ধরতেই হবে। আমাকে যদি এখনই এয়ারপোর্টে ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমি গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিতে পারি। নিজে থেকে কোনো গাড়ি ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ছেলেটা এবার হাসলো একটু। বললো, সেটা সত্যিই অসম্ভব। তোমার কাছে যা টাকা আছে দাও !

আমি সাড়ে সাত ডলার বার করে দিলাম। সে সাত ডলার নিয়ে বাকি পঞ্চাশ সেন্ট আমাকে ফেরত দিয়ে বললো, এটা রেখে দাও কাল সকালে যে তোমার সুটকেশ গাড়িতে তুলে দেবে, তাকে টিপস্ দিও।

—না, না। আমার সুটকেশ আমি নিজেই তুলে নিতে পারবো।

—তাহলেও। তুমি রাত্রে কিছু খাবে না ?

—না, খাবারের দরকার নেই।

—এসো, তোমায় ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালে আমাকে কেউ ডেকে দেবে তো ? প্লেনটা না ধরতে পারলে কিন্তু—

—কোনো চিন্তা নেই। এখান থেকে আরও লোক যাবে।

ছেলেটিকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারলাম না। বললাম, বাকি টাকাটা আমি পরে দিয়ে দিতে পারি।

—তার দরকার হবে না।

হোটেলটাতে অন্তত পঞ্চাশখানা ঘর, কিন্তু বাড়িটা একতলা। লাল ইঁটের দেয়াল, প্রায় আগাগোড়াই আইভি লতা দিয়ে মোড়া। আমার ঘরে ঢুকে আমি একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেললাম। অনেক, অনেকক্ষণ বাদে আমি নিশ্চিন্তভাবে একা। গত রাত্রে প্রায় এই সময়েই দমদমে প্লেনে চেপেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। আমার আয়ুর সঙ্গে বেহিসেবী অতিরিক্ত দশ-বারো ঘণ্টা যোগ হয়ে গেল। এখন কলকাতায় আগামীকালের দুপুর।

এতটা সময় একই জামাকাপড় পরে আছি। এমন কী জুতো-মোজা পর্যন্ত। টেরিলিনের জামা গায়ে চিটচিট করছে। গরমও লাগছে খুব। শীতের দেশ বলে সবাই বেশ ভয় দেখাচ্ছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটুও শীত পাই নি।

ঘরটা আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। এক পাশে টেলিভিশন সেট। বিছানার চাদরটা যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ। মাথার কাছে টেলিফোন ও বাইবেল। টেলিভিশনটা একটা নতুন খেলনা। আগে এটা নিয়ে আমি কখনো খেলি নি। সুতরাং প্রথমেই সেটার সুইচ টেপাটেপি করলাম খানিকক্ষণ। অনেকরকম আলোর ঝলক, সমুদ্রের ঢেউ, কিচিরমিচির শব্দ, তারপরই দুমদাম গোলাগুলি। যুদ্ধের ছবি।

আট-দশ ঘণ্টা পেটে কিছু কঠিন খাদ্য পড়ে নি। নিউ ইয়র্কে বিমানবন্দরে অনেক ভালো ভালো খাবার দোকান ছিল, হুড়োহুড়িতে কিছু খাওয়া হয় নি। শিকাগো আসবার সময় প্লেনে দিয়েছে শুধু এক কাপ কফি।

মোজা খোলার পর খালি পায়ে খানিকক্ষণ হেঁটে বেশ আরাম লাগলো। দরজা খুলে বাইরে এলাম। দু'একটা ঘর থেকে কিছু কথাবার্তা, হাসির টুকরো ভেসে আসছে। লনটা ফাঁকা। মোরাম বিছানো পথ পার হয়ে ছোট বাগানটাতে এলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল বাগানের মাঝখানে একটি মেয়ে একা বসে আছে। কাছে এসে দেখলাম, মেয়ে ঠিকই, তবে পাথরের, নগ্ন। তার সামনে তবু আমার বলতে ইচ্ছে হলো— দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা।

ভোরবেলা টেলিফোনের আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বিমানবন্দরে যাবার ডাক। ধড়মড় করে উঠে তৈরি হয়ে নিলাম। প্যান্ট–কোট চাপিয়ে গিঁট বাঁধা টাইটা গলিয়ে নিলাম গলায়। বাইরে গাড়ি তৈরি। সেই নিগ্রো।

প্লেনটা ছাড়তে কিন্তু অনেক দেরি করলো। কী যেন যান্ত্রিক গোলযোগ। ছোট প্লেন। অনেকটা ডাকোটার মতন। জীবনে এর আগে আমি একবারই মাত্র প্লেনে চেপেছি, কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি, এই রকম প্লেনেই। তাতে অবশ্য এয়ার হস্টেসের বদলে একজন ধুতিপরা ঢ্যাঙা লোক চা দিয়েছিল।

প্লেনটা যখন ছাড়লো, তখন মাত্র পাঁচ ছ'জন যাত্রী। অন্যরা দরজার কাছেই বসেছে। অনেক ফাঁকা জায়গা বলে আমি একটু দূরে বসলাম। এই বিমানের জানলা থেকে নিচের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজ সমতলভূমি, মাঝে–মাঝে চৌখুপ্পি কাটা শস্যের খেত, আর রাস্তার ওপর ডিঙ্কি টয়ের মতন মোটর গাড়ি। ওপর থেকে সত্যি মনে হয়, এই পৃথিবীটা একটা পুতুলের সংসার।

মোটাসোটা এয়ার হস্টেসটি আমাকে একটু ধমকের সুরে বললো, সিটবেল্ট বাঁধো নি কেন?

একটু অবাক হয়ে গেলাম। সবসময় কৃত্রিম ভদ্রতা করাই তো এদের নিয়ম। বেল্ট বাঁধতে ভুলে গেছি বলে বকুনি খাবো ?

একটু বাদে মেয়েটি কফি এনে অন্যদের দিতে লাগলো। সকাল থেকে চা–টা কিছু খাই নি। তেষ্টা পেয়েছে খুব। মেয়েটি কিন্তু অন্য লোকদের কফি দিয়েই থেমে গেল, আমার কাছে আর এলো না। ওখানেই বসে পড়ে গল্প করতে লাগলো অন্য যাত্রীদের সঙ্গে।

মেয়েটি কি আমার কথা ভুলে গেছে ! একি হতে পারে কখনো ? আমি ঐ দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলাম, যদি চোখে চোখ পড়ে। তাকালোই না। চেঁচিয়ে চাইতে পারতাম। কিন্তু কেন চাইবো ? আমার কাছে ন্যায্য টিকিট আছে, তবু কফি দেবে না কেন ?

অন্য লোকগুলো দিব্যি কফি আর বিস্কুট খেতে–খেতে হাসাহাসি করছে। হঠাৎ মনে হলো, ওরা আমার সম্পর্কেই কিছু বলছে। [illegible] হতে পারে। কিন্তু এই রকম অনুভূতি একবার এলে তাড়ানো শক্ত। আমি কান খাড়া করে রইলাম। এই বিমানে আমিই একমাত্র কালো লোক। সেইজন্যই কি অবহেলা করছে আমাকে ? কলকাতায় অবশ্য আমাকে কেউ ঠিক কালো বলে না, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে ওদের কাছে কি আমি এ্যানাদার ডার্টি নিগার !

অপমানে গা জ্বলতে লাগলো। এবং খিদে। এইভাবে আমি আমেরিকায় আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছোলুম খাঁটি ভারতীয়ের মতন। ক্ষুধার্ত এবং নিঃস্ব। এখন এয়ারপোর্টে যদি আমার জন্য কেউ অপেক্ষা না করে, তাহলেই খুব চমৎকার ব্যবস্থা হয়।

৩

প্লেন থেকে নামতেই দেখলাম একজন লম্বা মতন লোক দু'হাত মেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। পল্ ওয়েগনার।

—ভালো আছো তো ? রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয় নি তো ? কোনো জিনিস হারাও নি তো ?

টানতে–টানতে আমাকে নিয়ে এলো বাইরে। একটি আঠারো–উনিশ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখিয়ে বললো, এই আমার মেয়ে, সেরা।

মেয়েদের সঙ্গে শেক হ্যান্ড করতে হয় কি না ঠিক জানি না। হাতটা বাড়াতে গিয়েও একটু

অপ্রস্তুত হয়ে রইলাম। মেয়েটিই কপালের কাছে দু'হাত জোড় করে বললো, নামাস্কার! তারপর হাসলো। সেই হাসিতেই ব্যবহারটা সহজ হয়ে গেল।

প্যান্টের ওপর নীল একটা গেঞ্জি পরা। সোনালি চুল, তীক্ষ্ণ নাক। নাকটা দেখলে একটু অহঙ্কারী মনে হয়, যদিও হাসিটা খুব সরল। সে-ই গাড়ি চালাচ্ছে।

পেল্লায় গাড়ি। ভেতরটা এয়ার কন্ডিশান্ড তো বটেই, বোতাম টিপলে জানলায় কাচ আপনি বন্ধ হয় বা খোলে। এই রকম একটা জটিল যন্ত্র ঐটুকু একটা মেয়ে কী অবলীলাক্রমে চালায়!

পল্ বললো, তোমার জন্য আমি ঘর ভাড়া করে রেখেছি। বেশ ভালো ঘর, তোমার পছন্দ হবে। প্রথমে কয়েকটা দরকারি কাজ সেরেই তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেবো।

প্রথমেই যাওয়া হলো ব্যাঙ্কে। সেখানে তক্ষুনি আমার নামে পাঁচশো ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো, একশো ডলার ক্যাশ দেওয়া হলো আমার পকেটে। সব ব্যাপারটা সারতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগলো না। ব্যাঙ্কের প্রায় সব ক'টা কাউন্টারেই বসে আছে কয়েকটা ফচকে চেহারার মেয়ে। তারা চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে নাকিসুরে কথা বলে আর অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ফরফর করে টাকা গোনে এবং একবার মাত্র গুনেই টাকা দিয়ে দেয়। এতোকাল আমার ধারণা ছিল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ব্যাপার।

সেখান থেকে বেরিয়ে পল্ আরও কয়েক জায়গায় গাড়ি থামালো। এক একটা দোকান বা অফিসের মধ্যে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে। কোনোবার বলে, তোমার গ্যাস কানেকশান দিতে বলে এলাম। কোনোবার বলে, তোমার টেলিফোন লাইন দিতে বললাম।

তারপর একবার বললো, সব হয়ে গেছে। এবার খেতে যাওয়া যাক, তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই !

আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, না, না, না।

সৌভাগ্যবশত আমার আপত্তিতে গুরুত্ব না দিয়ে পল্ তখন একটা খাবারের দোকানে ঢুকলো। টেবিলে বসে বললো, কী খাবে বলো ?

সুপ আর হ্যামবার্গার এলো। প্রথমদিনই বেশি খাওয়া উচিত নয় বলে আমি পেটে খিদে রেখে পাতে অনেক কিছু ফেলে রেখে বললাম, ও ! পেট ভরে গেছে।

পল্ বললো, 'চলো, এবার তোমার বাড়ি দেখে আসি। এখন সেখানে বিশ্রাম নাও, বিকেলবেলা আমি আবার আসবো।'

তিনতলা কাঠের বাড়ি। এদিকে অনেক বাড়িই কাঠের। তবে নানারকম আকারের। আমার ঘরটা দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পল্ চাবি দিয়ে দরজা খুললো। দেখলাম, ভেতরে একটি খুব বুড়ো লোক জানলার পর্দা সেলাই করছে।

পল্ বললো, এই তো ম্যাক এখানেই রয়ে গেছে। ম্যাক, তোমার নতুন ভাড়াটে নিয়ে এলাম।

ম্যাক বললো, হাই দেয়ার।

লোকটি এতোই বুড়ো যে শরীরটা কুঁজো হয়ে গেছে, ভুরু এসে পড়েছে চোখের ওপর। এতো বুড়ো লোক পর্দা সেলাই করে কী করে ?

পল্ বললো, ম্যাক খুব ভালো লোক। আগে আমাদের অঙ্কের প্রফেসার ছিল।

আমি চমৎকৃত হলাম। কোনো অঙ্কের অধ্যাপককে ভাড়াটের পর্দা সেলাই করতে এর আগে নিশ্চয়ই দেখি নি।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করলাম। তিনি বললেন, তোমার রেফ্রিজারেটারে একটু শব্দ হয়, সেটা আমি কালই ঠিক করে দেবো।

একটা বড় ঘর, একটা রান্নাঘর, বাথরুম, পর্দাঘেরা অনেকখানি জায়গায় ওয়ার্ডরোব।

বাড়িটা বড় রাস্তার ওপরে। উল্টো দিকে একটা পেট্রল পাম্প, এদেশে যার নাম গ্যাস স্টেশন। আমার ঘরের জানলায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, এমন কি দূরে একটা নদী পর্যন্ত।

ওরা চলে যাবার পর আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁটিয়ে দেখলাম। দেয়াল-জোড়া একটা মস্ত বড় আয়না। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা টিপেটুপে দেখলাম, এতোক্ষণ ধরে ইংরেজি বলার জন্য, চোয়াল-টোয়াল বেঁকে গেছে কিনা !

ধড়াচূড়া ছেড়ে পায়জামা আর গেঞ্জি পরে বাঙালি হলাম। তারপর চটি ফটফট করে সবেমাত্র একটু ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছি, অমনি দরজায় বেল বেজে উঠলো। আবার কে ?

দেশেই একজন বলে দিয়েছিল, সাহেবদের সামনে কখনো পাজামা পরে বেরুতে নেই। হয় ড্রেসিং গাউন পরে থাকবে, না হলে পুরো প্যান্ট-শার্টে। ড্রেসিং গাউন আমার নেই। সুতরাং চটপট সেই পাজামার ওপরেই প্যান্ট পরে নিয়ে দরজা খুললাম।

টেলিফোনের যন্ত্র নিয়ে একটি লোক এসেছে কানেকশান দেবে।

মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগে টেলিফোন কম্পানিতে খবর দিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের দেশে টেলিফোন পেতে দশ-বারো বছর লাগে না ? ওঃ, সাহেবগুলো কী স্বার্থপর। নিজেদের জন্য সব ভালো-ভালো ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আধঘণ্টা বাদে আপনাআপনি টেলিফোন বাজলো। এবার গ্যাস কম্পানির লোক।—আপনার গ্যাসের কানেকশান দেওয়া হয়ে গেছে, একটু টেস্ট করে দেখুন তো।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনটা আগেই দেখেছি। ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারি নি। আলমারির মতন উঁচু একটা জিনিস। নিচের দিকের পাল্লা খোলা যায়। ওপর দিকে চারটে উনুন। অনেকগুলো সুইচ, ঘড়ির ডায়ালের মতন কয়েকটা জিনিস, কী রকমভাবে ব্যবহার করতে হয় জানি না। যাই হোক, একটা সুইচ টিপলাম, অমনি সো-সো করে শব্দ করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করে ফিরে এসে টেলিফোনে বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানেকশান এসে গেছে, অনেক ধন্যবাদ !

বিকেলের দিকে পল্ আবার এলো। এবার তার সঙ্গে অন্য একটি মেয়ে। এর বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, বেশ লম্বা, হলুদ রঙের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরা। ব্লাউজের সামনের দিকটা এতোখানি খোলা যে সোজাসুজি তাকাতে লজ্জা করে।

পল্ বললো, এর নাম ডোরি। ডোরি ক্যাটজ। খুব ভালো মেয়ে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করবে। তুমি একদিনে অতো দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছো, নিশ্চয়ই মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে। আমার মতন বুড়োর সঙ্গে কথা বললে কি আর মন ভালো হবে ?

ডোরি নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। বেশ উষ্ণ হাত। সে বললো, গ্ল্যাড টু সি ইউ !

পল বললো, তোমাকে তো ছোটখাটো কিছু জিনিস কিনতে হবে! সেগুলো ডোরিই তোমাকে বলে দেবে। নতুন সংসার পাততে গেলে মেয়েদের সাহায্য ছাড়া চলে না।

একটু পরেই পল বিদায় নিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপাং করে। ঘরের মধ্যে আমি আর একটি যুবতী মেয়ে। একদম অচেনা। এর সঙ্গে ঠিক কী রকম ব্যবহার করা উচিত কে জানে।

আমার এই ঘরে খাট নেই। একটা বড় সোফা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম, ঐ জিনিসটার নাম ড্যাভেনপোর্ট, বাংলায় যাকে বলে সোফা-কাম-বেড। বাড়িওয়ালা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই অনুযায়ী দুপুরে একবার টেনে খুলেছিলাম। কিন্তু কোনো মেয়েকে কি বিছানায় বসতে বলা উচিত ? সেটাকে ঠেলে আবার সোফা বানালাম। তারপর ডোরিকে বললাম, বসো।

ডোরি খুব সপ্রতিভ। হ্যান্ডব্যাগটা নামিয়ে রেখে পায়ের ওপর পা তুলে বসলো। মনে হয়,

ওর পা দুটো মোমের তৈরি। মানুষের পা কি এতো ধপধপে সাদা হতে পারে ?

ডোরি বললো, তোমার অ্যাপার্টমেন্টটার ভাড়া কতো ?

—তা তো জানি না !

—এটা আমারও নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কখন খালি হলো টেরও পেলাম না। তুমি কি আজ এসেই পেয়ে গেলে ?

—না। পল ওয়েগনারই ভাড়া করে রেখেছিলেন।

—তুমি খুব লাকি দেখছি ! আচ্ছা দাঁড়াও, লিস্ট করি, তোমার কী কী জিনিস কিনতে হবে। বিছানার চাদর—তুমি নিশ্চয়ই আগের লোকের চাদরে শোবে না ?—বালিশ, একটা কম্বল—আচ্ছা কম্বলটা পরে কিনলেও চলবে—রান্নার জিনিস, সসপ্যান, কেটলি।

ডোরি নিজেই একটা লম্বা লিস্ট বানালো। তারপর বললো, চলো, বেরিয়ে পড়ি।

দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে। বেশ মোলায়েম। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠলেও দিনের আলো মেলায় নি। ডোরি তার হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি খাও ?

আমি ঘাড় নেড়ে ওর প্যাকেট থেকে একটা তুলে নিলাম। ডোরি লাইটার বার করতেই আমি বললাম, দাঁড়াও ! পকেট থেকে দেশলাই বার করে ফটাস করে জ্বেলে ধরলাম ওর মুখের কাছে। তারপর বললাম, এইটাই নিয়ম না ?

ডোরি হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ। তবে আর একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। তুমি কলকাতার মতন অতো বড় শহর ছেড়ে এই গ্রামে আসতে গেলে কেন ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটা গ্রাম ?

রাস্তাগুলো চৌরঙ্গির মতন চওড়া, দু'পাশে অনেক বেশি আলো, ছবির মতন সুন্দর বাড়ি, গ্যাস লাইন, টেলিফোন, ট্যাক্সি—এর নাম গ্রাম ?

ডোরি বললো, গ্রাম ছাড়া আর কী ?

—কিন্তু জায়গাটার নাম যে আয়ওয়া সিটি ?

ডোরি ঝরঝর করে হেসে বললো, সিটি ? লোকসংখ্যা কতো জানো ? সবসুদ্ধ তিরিশ-বত্রিশ হাজার। তোমাদের ক্যালকাটার কতো ?

আমরা সাধারণত লক্ষ-কোটি দিয়ে হিসেব করি। তা এখানে চলবে না। মিলিয়ান মানে যেন ঠিক কতো? মনে-মনে হিসেব করে বললাম, ছ'সাত মিলিয়ান হবে !

ডোরি একটা শিস দিয়ে উঠলো। হাসলে ওর বুক দোলে। দেখা যায় দু'টি তুষার মণ্ড। আমার মুখের ত্বকে একটা গরম-গরম ভাব আসছে টের পাচ্ছি। চোখ ফেরালাম, রাস্তার দু'পাশে উইলো গাছে। আস্তে-আস্তে বললাম, আমার দরকার ছিল কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যাবার। এই জায়গাটা আমার তো বেশ ভালোই লাগছে।

—তোমাদের ক্যালকাটা কতো পুরোনো ? চার হাজার ? পাঁচ হাজার ?

—না, দুশো আড়াই শো বছর মাত্র !

—রিয়েলি ? আমার ধারণা ছিল ইন্ডিয়ার সবকিছুই চার-পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। তোমার বয়েস কতো ?

—এবারে একটা মুখস্থ করা রসিকতা শুনিয়ে দেবার লোভ হলো। বললাম, একটা গির্জার বয়েসের তুলনায় আমি ছেলেমানুষ হলেও কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বয়সের তুলনায় আমি বৃদ্ধ।

রসিকতাটি মাঠে মারা গেল প্রায়। কারণ ডোরি ক্রিকেট খেলার নামই শোনে নি। বললো,

বয়েস সাতাশ।

আমরা হাঁটছিলাম যে-দিকে, সে-দিকে দুপুরে আসি নি।

ডোরি বললো, তোমাকে এ অ্যান্ড পি চিনিয়ে দিচ্ছি—এর পর থেকে তোমার যা দরকার, এখানেই পাবে।

—এ অ্যান্ড পি কী জিনিস ?

—তুমি এ অ্যান্ড পি জানো না ? আমার ধারণা ছিল, এটা বিশ্ববিখ্যাত। এটা হচ্ছে চেইন সুপার মারকেট। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেখানেই যাও এই দোকান পাবে। সেইজন্যই এই রকম নাম—পুরো কথাটা হলো অ্যাটলান্টিক অ্যান্ড প্যাসিফিক।

—ডোরি, তোমাকে ধরে নিতে হবে, আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি এর আগে কখনো ভারতের বাইরে যাই নি। এবং সোজা দেশ থেকে এতোদূরে উড়ে এসেছি!

—শোনো, তাহলে তোমাকে আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি। কোনো মেয়ের সঙ্গে যখন হাঁটবে তখন মেয়েটিকে রাখবে সবসময় ভেতরের দিকে, তুমি থাকবে রাস্তার দিকে। এই যে, এটা হচ্ছে স্ট্রিট সাইড, তুমি এই দিকে যাও। এবং ইচ্ছে করলে তুমি মেয়েটির হাত ধরতে পারো!

ডোরি খপ করে আমার একটা হাত মুঠোয় পুরে নিয়ে আবার সারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে অন্য যেসব ছেলেমেয়ে যাচ্ছে, তারা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে বা কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। কখনো-কখনো তারা থেমে পড়ে চুমু খেয়ে নিচ্ছে। সেদিকে তাকানো উচিত নয় বলে আমি বার বার চোখ ফেরাচ্ছিলাম।

এ অ্যান্ড পি দোকানটা আমাদের কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের প্রায় অর্ধেক। ভেতরে ঢুকে নিজেকেই বেছে নিতে হয়। ফর্দ মিলিয়ে আমরা সব জিনিস কিনলাম। চারটে বিরাট প্যাকেট হলো। বাইরে এসে বললাম, দাঁড়াও, একটা ট্যাক্সি ডাকি।

ডোরি বললো, ট্যাক্সি ? এইটুকু তো রাস্তা, হেঁটেই যাবো। তুমি দুটো নাও, আমি দুটো!

বিরাট বোঝা দুটো ডোরি অবলীলাক্রমে বইতে লাগলো। আমি একেবারে মরমে মরে গেলাম। কোনো সুন্দরী মেয়েকে এতো বড়-বড় বোঝা নিয়ে আমি আগে কখনো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখি নি, নিজের দেশেও না।

শুধু তাই নয়, আমার ঘরে এসে ডোরি সবকিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে দিল। বিছানার চাদর পেতে, বালিশের ওয়াড় ভরে, রান্নার জিনিসগুলো ঠিকঠাক সাজিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা ঝকঝকে করে তুললো। গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিল কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। তারপর বললো, তোমার জন্য আজ আমি রান্নাও করে দিতে পারি। দেবো ?

ডোরি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা। তাকে দিয়ে এতোখানি খাটিয়ে সত্যিই আমার লজ্জা করছিল। ব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না, আজ আর রান্নার দরকার নেই। আজ আমরা বাইরে খাবো। চলো, এখানে যেটা সবচেয়ে বড় হোটেল।

ডোরি বললো, আমি তো খেয়ে এসেছি !

—কি ? খেয়ে এসেছো ?

—হ্যাঁ, আমার তো ডিনার হয়ে গেছে।

যদিও ঘড়িতে আটটা বাজে, তবু আকাশে এখনো একটু একটু দিনের আলো আছে। ডোরি এসেছে সাড়ে ছ'টায়। তার আগেই ডিনার ?

ডোরি বললো, এখানে সবাই সাড়ে ছ'টায় ডিনার খায়। আমি একটু আগেই খেয়ে নিয়েছি! বলেই আবার সর্বাঙ্গে সেই উচ্ছকিত হাসি। এই হাসিতে আমি আরও বোকা হয়ে যাই। তবু জোর দিয়ে বললাম, হোক ডিনার। এতো খেটেছো। নিশ্চয়ই তোমার খিদে পেয়ে গেছে

আবার। চলো, আমার সঙ্গে খাবে চলো।

—তুমি নতুন বলে তোমাকে ক্ষমা করলাম!

চমকে উঠে বললাম, কোনো দোষ করেছি ?

—কোনো মেয়েকে কেউ এভাবে খেতে বলে না। তুমি ডেটিং কাকে বলে জানো? জানো তার নিয়ম ?

—ডেটিং কথাটা শুনেছি ঠিকই। নিয়ম তো জানি না।

—কোনো মেয়েকে যদি তুমি বেড়াতে বা খেতে নিয়ে যাও, তাহলে অন্তত চারদিন আগে তাকে নেমন্তন্ন করবে! ধরো, শনিবার তুমি কোনো মেয়েকে বাইরে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে তাকে বলতে হবে মঙ্গলবার। খুব ঘনিষ্ঠ হলে বুধবারও বলতে পারো। বেস্পতি শুক্রবার বললে তাকে অপমান করা হবে। তাতে মনে হবে, মেয়েটা দেখতে বাজে কিংবা ওকে কেউ পছন্দ করে না—সেইজন্যই ও খালি আছে !

ওরেব্ বাবা, এ যে অনেক ঝঞ্ঝাট। বললাম, আমি ক্ষমা চাইছি, ডোরি! আজ সোমবার। আমি আজই তোমাকে আগামী শনিবারের জন্য ডেট করে রাখলাম। কিন্তু এই ক'দিন কি আমি না খেয়ে থাকবো ?

ডোরি বললো, না, চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তুমি পোশাক বদলাবে না ?

ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছি বটে, সাহেবরা খেতে যাবার সময় ইভনিং সুট পরে নেয়। কিন্তু আমার তো একটাই প্যান্ট-কোট। সুতরাং অবহেলার ভঙ্গি দেখিয়ে বললাম, নাঃ, আর এখন জামা-টামা বদলে কি হবে! চলো—

এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেলের নাম শেরাটন। শুনলাম সাধারণত বাইরের বড় বড় হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা এখানে এসে থাকেন। ডিলান টমাস ছিল এখানে। স্থানীয় লোকেরা বড় একটা যায় না। অনেকটা আমাদের গ্র্যান্ড হোটেলের মতন।

টেবিলে বসে দু'জনের জন্য এক গাদা খাবারের অর্ডার দিলাম। ডোরিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার জন্য আর কি নেবো ? এক বোতল ওয়াইন ? স্যাম্পেন ?

ডোরি বললো, তুমি কি পাগলের মতন অর্ডার দিচ্ছো। এক গাদা টাকা খরচ হবে। তুমি কি ভারতের কোনো মহারাজা-টহারাজা নাকি ?

আমি হাসলাম। এটা বেশ একটা উপভোগ্য রসিকতা। হাসতে হাসতেই বললাম, হ্যাঁ, আমি মহারাজাই! এই সামান্য পয়সা তো আমি দেশে থাকতে যখন-তখন খরচ করেছি !

বিল হলো ভারতীয় হিসেবে দু'শো সাতাশ টাকা। সেই সঙ্গে বকশিশ দিলাম তেইশ টাকা (অন্তত টেন পার্সেণ্ট, ডোরি ফিসফিস করে বলে দিয়েছিল)—প্রায় একজন কেরানির সারা মাসের মাইনে, আমি যা হতে যাচ্ছিলাম! ডোরির হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বেশ একটা অহঙ্কারের ভাব ফুটে উঠলো মুখে। স্যাম্পেনের গুণে মেজাজটাও ফুরফুরে।

রাস্তায় এসে ডোরি বললো, এবার তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

— এই রে। তাহলে আমি বাড়ি ফিরবো কী করে ? আমি তো রাস্তা চিনি না।

—তা হোক বোকারাম! সবসময় একটি মেয়েকেই বাড়িতে পৌঁছে দিতে হয়। কোনো মেয়ে কোনো ছেলেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে একা ফেরে না। এটা ছোট জায়গা, তুমি ঠিকই রাস্তা খুঁজে পাবে।

ডোরির বাড়ি উল্টো দিকে। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছোলাম সেখানে। পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে ডোরি বললো, গুড নাইট !

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে আমিও বললাম, গুড নাইট ডোরি !

ডোরি তবু দাঁড়িয়ে রইলো। নিঃশব্দে হাসছে। আবার কী হলো !

—তোমাকে কতো আর শেখাবো? তুমি জানো না, কোনো মেয়েকে বিদায় দেবার সময় তাকে চুমু খেতে হয় ? চুমু না খেলে বুঝতে হবে, সারা সন্ধে সেই মেয়েটার সাহচর্য তোমার পছন্দ হয় নি।

আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হলো, না, না, ডোরি, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে! শুধু পছন্দ মানে কী, এ তো আমার দারুণ সৌভাগ্য।

কিন্তু চুমু ? ঠোঁটে না গালে ? আদরের না নিছক ভদ্রতার ? নাঃ, সত্যিই আমি একটা বাঙাল। কিছুই শিখে আসি নি।

মুখটা এগিয়ে দিতে ডোরি নিজেই আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট চেপে ধরলো। নরম বিদ্যুৎ। এই সময় কি ওর পিঠে আমার হাতটা দেওয়া উচিত ছিল, বুকে মেশানো উচিত ছিল বুক ? কিছুই করলাম না। সেই একটা চুমুর স্বাদ মুখে নিয়ে চলে এলাম। অনেকক্ষণ সেটা লেগে রইলো, আমি সিগারেট ধরালাম না।

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে খুঁজে পেলাম বাড়ি। যদি গ্রামই হয়, তবে এতোগুলো আলো-ঝলমল রেস্টুরেন্ট কেন? অন্তত তিনটে ব্যাঙ্ক, চারটে সিনেমা হল চোখে পড়লো। রাস্তাগুলো প্রায় সব একই রকম। চওড়া কংক্রিটের। এরকম গ্রাম ভালো না। গ্রাম হবে জয়নগর-মজিলপুর-চম্পাহাটির মতন।

সে রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি আবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কি একটা জরুরি জিনিস আনা হয় নি, তাই এক্ষুনি আমার একবার যাওয়া দরকার। টেবিলের ওপর পড়ে আছে আমার রিটার্ন টিকিট। সেটা তুলে নিয়ে কোটটা গায়ে দিয়ে ছুটলাম এয়ারপোর্টের দিকে। প্লেনে ওঠবার পরই মনে হলো, এই রে, কারুকে তো কিছু বলে আসা হলো না! পল ওয়েগনারও কিছু জানে না। তাহলে যদি আর ফিরতে না দেয়। একবার ফিরলেই তো টিকিট ফুরিয়ে যাবে। তাহলে ফেরা হবে না? আর ফেরা হবে না ? প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

জেগে উঠে নির্জন ঘরে এক গেলাস জল খেলাম।

৪

সকালবেলা পল ওয়েগনার টেলিফোন করলো, দুপুর বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে আমাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের একটি পরিচয় সভা হবে। তখনই ঠিক করে ফেললাম, দেশে আমাকে কেউ চিনুক না চিনুক, এখানে বেশ একটা কেউকেটা সেজে থাকতে হবে। এ গাঁয়ের মেধো ভিন্ গাঁয়ের মধুসূদন। আর কেউকেটা সাজার প্রধান উপায় গাম্ভীর্য। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দু'-একটা কথা বলবো মাত্র।

আগের সন্ধেবেলা ডোরি কিনে দিয়েছিল ডিম, সসেজ, পাউরুটি, আপেল। সব ফ্রিজে সাজানো। বিলেতের মতোন এখানে বাড়ির দরজায় দুধের বোতল দিয়ে যায় না। দোকান থেকে কিনে আনতে হয়। শক্ত মোম-কাগজের ঠোঙায় পাওয়া যায় দুধ। কাল এক গ্যালনের বিশাল এক ঠোঙা কিনে আনা হয়েছে। জন্মের পর মাতৃস্তন্য ছাড়া আর কখনো দুধ খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঠোঙার গায়ে প্রোটিন ফর্টিফায়েড, ভিটামিন অ্যাডেড—এরকম নানা রকম কথা। বুঝতে পারলাম, দুধটা জ্বাল দেবার দরকার নেই, একেবারে তৈরি করাই আছে। ওপরে একটা ফুটো করে খানিকটা মুখে ঢাললাম। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। দুধ যে এতো সুস্বাদু হয়, তা তো আগে জানতাম না। অনেকটা দুধ খেয়ে ফেললাম। তারপর একটু কষ্ট হলো। আমার

ভাই–বোন, বন্ধু–বান্ধবদেরও যদি এই দুধ খাওয়ানো যেত। ওরা তো এর স্বাদ পেল না! কখনো কোনো ভালো জিনিস খেলে কিংবা ভালো একটা বই পড়লে ইচ্ছে হয়, অন্যদেরও তার ভাগ দিতে। একলা–একলা কি কোনো জিনিস ভালো লাগে? যাচ্ছে তাই!

দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করে তৈরি হয়ে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আমার বাড়ি থেকে খুবই কাছে। জানলা দিয়ে ক্যাপিটলের চূড়া দেখা যায়।

একটা ক্ষীণ আশা ছিল, ডোরি হয়তো সকালে একবার আসবে। কিংবা টেলিফোনে খবর নেবে। আমি নির্বোধের মতোন ডোরির টেলিফোন নাম্বার লিখে নিই নি। গাইড খুঁজলাম, ওর নাম নেই। হয়তো আমারই মতোন নতুন।

পোশাক পরতে গিয়ে একটা হাঙ্গামা হলো। টাইটা গিঁট বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ওয়ার্ডরোবে। সেটা বেশি সাবধান গলায় ঝোলাতে গিয়ে ফাঁসটা খুলে গেল। সর্বনাশ! এখন কি করে টাইটা আবার বাঁধবো? হেমন্তর কাছ থেকে শিখে আসা উচিত ছিল, তাড়াতাড়িতে হয় নি। টাই ছাড়া কেউ রাস্তায় বেরোয় এখানে? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টা করলাম। কী যেন বলে দিয়েছিল হেমন্ত, প্রথমে ডান হাত, তার ওপর দিয়ে বাঁ হাত—দূর-ছাই, আয়নার সামনে আবার হাতগুলো উল্টো হয়ে যায়। এদিকে দেরি হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ঢ্যাপলা মতোন একটা নট্ বেঁধেই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম মুখ নিচু করে। নিশ্চয়ই সবাই আমার টাই বাঁধা দেখে হাসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন পল ওয়েগনার। প্রথমে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন একটা ঘরে। সেখানে দৈত্যের মতোন বিরাট ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুঁচকে মেয়ে। ফটফট করে কয়েকবার আলো জ্বললো। তারপরই মেয়েটা ক্যামেরার পেছন থেকে কাগজের রিল ছিঁড়ে নিজে খানিকটা রাখলো, আমাকে খানিকটা দিল। দেখলাম, তাতে আমার চার–পাঁচখানা ছবি। একি ম্যাজিক নাকি! যাই হোক, চিন্তা করার সময় নেই। এবার পাশের ঘরে। এখানে একজন ডাক্তার আমার হাঁটুতে ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে কয়েকবার টোকা মারলো। তারপর জিভ দেখাতে বললো। তারপর বললো—এক্সলেন্ট। আবার আর একটা ঘরে। এখানে মাঝবয়েসী একজন লোক একটা খাতা খুলে বসে আছে। আমাকে বললো—সই করো। দেখি, সেই খাতায় আমার নাম, বয়েস, ডিগ্রি ইত্যাদি সব লেখা আছে। যেন আমি ফ্রানৎস কাফ্‌কার কোনো উপন্যাসের জগতে চলে এসেছি। সই করে বেরিয়ে এলাম।

এবার একটা হলঘরে। সেখানে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন নানা বয়েসী নারী–পুরুষ। পল ওয়েগনার খুব রসিকতা করছে একজনের সঙ্গে। এরা এসেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে এবং আমি ছাড়া একজন পুরুষ মানুষও টাই পরে নেই!

লজ্জায় আমার প্রায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা। এতোক্ষণ লক্ষই করি নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপকদের মধ্যেও টাইয়ের পাট একেবারে প্রায় উঠেই গেছে। এদের মধ্যে শুধু আমারই গলায় একটা ঢ্যাপলা গিঁট বাঁধা টাই—এখন সকলের সামনে খুলে ফেলাও যায় না! যতটা গাম্ভীর্য অবলম্বন করবো ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরে এলাম ঘণ্টা খানেক বাদে। আসবার পথে টাইটা গলা থেকে খুলে দলামোচা করে ছুড়ে ফেলে দিলাম রাস্তার পাশে। কলকাতার বাঙালি সাহেবরা যত ইচ্ছে টাই পরুক, আমি আর কক্ষনো সাহেবদের দেশেও টাই–ফাই গলায় দেবো না। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে!

এখন লাঞ্চের সময়। কিন্তু আজ আর রান্না শুরু করার ইচ্ছে নেই। সন্ধেবেলা পল ওয়েনগারের সঙ্গে যেন কোথায় যেতে হবে। দুটো ডিম সেদ্ধ করে দু' স্লাইস পাউরুটির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। ফ্রিজে অনেক খাবার মজুত থাকলে দেখছি তেমন খিদেও পায় না। যতো খিদে

পায় পকেটে পয়সা না থাকলে!

হাতে এখন অনেকটা সময়। কিছু চিঠিপত্র লিখলে হয়। পোস্ট অফিসটা দেখে এসেছি, কিছু খাম-টাম কিনে আনতে হবে। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে বুক কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! চাবিটা তো ভেতরে রেখে এসেছি। দরজায় ইয়েল লক্‌, টেনে দিলেই তালা বন্ধ—এরকম দরজা তো ব্যবহার করার অভ্যেস নেই! এখন উপায় ? দরজা ভেঙে ফেলতে হবে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। একটাই উপায় আছে, বাড়িওয়ালাকে খবর দেওয়া। বাড়ির সামনের রাস্তার উল্টো দিকে গ্যাস স্টেশনে টেলিফোন আছে। গাইডে ম্যাকফারসন ট্রেভেলিয়ান–এর নাম খুঁজে, টেলিফোন যন্ত্রে দুটো ডাইম ফেলে (কুড়ি পয়সা) কাঁপা–কাঁপা গলায় বললাম—মিঃ ট্রেভেলিয়ান !

বৃদ্ধ বললো, হাই দেয়ার !

—মিঃ ট্রেভেলিয়ান, আমার নাম এই। আমি তোমার বাড়ির...

বৃদ্ধ আমাকে থামিয়ে দিয়ে খিক্‌খিক্‌ করে হাসতে লাগলো। তারপর বললো, ব্যাস, ব্যাস, তোমার আর কিছু বলতে হবে না। তুমি আমার নতুন ভাড়াটে তো ? চাবি না নিয়ে এসেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছো তো ? প্রত্যেকেই তাই করে ? অল ইউ কিডস্‌ আর দা সেম ! শোনো, তোমার দরজার সামনে যে কার্পেট পাতা আছে, সেটার ডান দিকের কোণটা তুলে দেখবে আর একটা চাবি—কিন্তু শোনো, যদি ও চাবিটা ঠিক ঐ জায়গায় আবার না রেখে দাও, তাহলে তোমার ঘাড় ভেঙে দেবো, ইউ ফলো মি ?

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। এতো সহজ সমাধান ! ছুটে আবার ফিরে এলাম। কার্পেটটা তুলে সবে মাত্র চাবিটা দেখেছি, এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ডোরি, সঙ্গে আর দু'টি মেয়ে।

ডোরি হাসতে–হাসতে বললো, কী ? চাবি হারিয়ে ফেলেছো নিশ্চয়ই ? আমিও প্রথম দিন এসে...

ঘর খুলে ওদের ভেতরে এনে বসালাম। ডোরির সঙ্গে আর দু'টি মেয়েকে দেখে মনে–মনে একটু বিরক্তই হয়েছি। একটা মেয়ের সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতে পারি না, তাতে আবার একসঙ্গে তিনজন। আর কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে একা একটি মেয়ের সঙ্গে বলাই তো ভালো।

ডোরির সঙ্গের মেয়েদের মধ্যে একজন ফরাসি। অন্যজন আমেরিকান—টেক্সাস থেকে এসেছে। ডোরি আলাপ করিয়ে দিল। ফরাসি মেয়েটির নাম মার্গারিট ম্যাতিউ। গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ফরাসি পড়ায়, তাছাড়া নিজে পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ করছে। টেক্সাসের মেয়েটির নাম লিন্ডা হপকিনস্‌।

টেক্সাসের নাম শুনলেই কাউ বয়দের কথা মনে পড়ে। লিণ্ডার চেহারাও কাউ বয়দের প্রেমিকাদেরই মতন। নীল রঙের জীনস্‌ পরা, উজ্জ্বল লাল রঙের জামা, মাথা ভর্তি সোনালি চুল একটা রিবন দিয়ে বাঁধা, আঁট স্বাস্থ্য। মনে হয়, সে দুদ্দাড় করে ঘোড়া ছোটাতে পারে, বন্দুক চালাতে পারে অবহেলার সঙ্গে।

ফরাসি মেয়েটির চেহারাটা প্রায় পাগলির মতোন। মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু অনেক দিন বোধহয় আঁচড়ায় নি। সাধারণ একটা স্কার্ট পরা। পায়ে মোজা। সাজপোশাকের দিকে একটুও যত্ন নেই। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, ছাই–চাপা আগুন। এমন রূপ, এমন সারল্য আগে কখনো দেখি নি মনে হয়। চোখের দৃষ্টি ঠিক শিশুর মতোন কৌতূহলী।

ডোরি বললো, শোনো, ওদের কাছে তোমার গল্প বলছিলাম, তাই ওরা আমার সঙ্গে চলে

এলো। মার্গারিট কখনো কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলে নি।

লিন্ডা নিজে থেকেই বললো, আমি শুনেছি, ভারতীয়রা ভালো চা বানায়। তাই তোমার হাতের চা খেতে এলাম !

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

চা কেনা আছে বটে, কিন্তু টি ব্যাগ। এক চামচে চা দিয়ে একটা করে কাগজের প্যাকেট। ওপরে সুতো বাঁধা। গরম জলে ডুবিয়ে দিলেই হলো। এতে চা বানাবার কোনো কৃতিত্ব নেই। তবু আমি কাপে–কাপে দুধ ঢেলে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কার ক' চামচ চিনি ?

ওরা কেউ কখনো দুধ–চিনি মিশিয়ে চা খায় নি। চিনি যে মেশাতে হয় তাই জানে না। আমার তৈরি চা খেয়ে লিন্ডাও বললো বটে যে, বাঃ বেশ ভালো, চমৎকার—কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভদ্রতা করছে। দ্বিতীয়বার ও আর চিনি মেশানো চা খাবে না।

ফরাসি মেয়েটি ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো, তোমার ঘরে কোনো বই নেই !

সত্যি, একটা বইয়ের র‍্যাক আছে বটে, সেটা শূন্য। আমার কাছে বই তো দূরের কথা, একটা পত্র–পত্রিকাও নেই।

সেই মেয়েটি বললো, বাড়িতে একটাও বই না থাকলে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় না ? ঘরগুলো খুব খারাপ দেখায় !

আমার ভালো লাগলো ওর কথা শুনে। নতুন আলাপ করতে এসে কেউ এরকমভাবে কথা বলে না।

ডোরি বললো, ও তো নতুন এসেছে, বই–টই কেনার সময় পায় নি। শোনো নীল, তুমি লাইব্রেরিতে যেতে পারো। এখানকার লাইব্রেরি খুব ভালো। সকাল আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখান থেকে তুমি যতো ইচ্ছে বই আনতে পারো।

—যতো ইচ্ছে বই ?

—হ্যাঁ, অনেকে পঞ্চাশ-ষাটখানা বইও এক সঙ্গে আনে। তিনমাস পর্যন্ত রাখা যায়।

খানিকক্ষণ গল্পের পর ডোরি বললো, চলো বেরুনো যাক। নীল, তুমি যাবে ?

—কোথায় ?

—পাবে। এখানকার অনেকে যায়।

—ছ'টার সময় পল এঙ্গেলনার আমাকে নিতে আসবে।

—তার তো অনেক দেরি, এখন তিনটে বাজে।

লিন্ডার গাড়ি আছে, সেই গাড়িতে আমরা সবাই মিলে উঠলাম। কী অসম্ভব জোরে গাড়ি চালায় মেয়েটা ! দু'তিন মিনিটের মধ্যে পাবের সামনে পৌঁছে গেলাম। লিন্ডা বললো, আচ্ছা, তোমরা যাও, বাই–বাই !

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঃ সেকি, তুমি যাবে না ?

লিন্ডা হেসে বললো, ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারবো না। আমার এখনো একুশ বছর হয় নি।

লিন্ডার চেহারা দেখে আমি তাকেই সবচেয়ে বড় ভেবেছিলাম। বললাম চলে এসো না, কে আর বুঝবে ?

ডোরি বাধা দিয়ে বললো, না, তার দরকার নেই। এখানে এসব নিয়ম খুব কড়া। একুশ বছর বয়েস না হলে ঢোকা যায় না। লিন্ডার তো আর মাত্র পাঁচ ছ'মাস দেরি !

লিন্ডাকে বিদায় জানিয়ে আমরা ভেতরে এলাম। আবছা অন্ধকারে প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া। এখানে শুধু বিয়ার পাওয়া যায়। ছাত্র, অধ্যাপক আর লেখক বা শিল্পীরাই আসে। অনেকটা আমাদের কফি হাউসের মতন। এক টেবিলের একটি জঙ্গলের মতোন দাড়িওয়ালা ছেলে

সাড়ম্বরে নিজের কবিতা পড়ছে। এখানে ডোরি আর ফরাসি মেয়েটিকে অনেকেই চেনে। আমরা কোণের টেবিলে বসলাম। বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়ে উঠে-উঠে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে যেতে লাগলো। এ পর্যন্ত শুধু তিনটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, এবার কয়েকটি ছেলের সঙ্গেও অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বের মতোন হয়ে গেল। শুনেছিলাম, সাহেবরা সহজে ঘনিষ্ঠ হয় না, এই ছেলেগুলো কিন্তু বেশ খোলামেলা। মার্ক লকলিন নামে একটি ছেলে আমাদের টেবিলে এসে বসলো, সাঙ্ঘাতিক সুপুরুষ, তার খুব ঝোঁক ফরাসি মেয়েটির দিকে। ভাঙা-ভাঙা ফরাসি ভাষায় সে প্রেমের কথা জানাতে লাগলো। মেয়েটা শুধু হাসে আর বার বার ফরাসির ভুল শুধরে দেয়।

বার মেড-এর নাম আইরীন। ছোট্টখাট্টো মিষ্টি চেহারা। তার কোমরে একটি রেশমি দড়িতে অনেকগুলো ছোট্ট রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, হাঁটলেই চমৎকার শব্দ করে। এক হাতে পাঁচ ছ'টা বিয়ার ক্যান নিয়ে সে অবলীলাক্রমে দৌড়োদৌড়ি করে। যে-কোনো টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ই ছেলেরা ফষ্টিনষ্টি করার চেষ্টা করে তার সঙ্গে। কোনোরকম অসভ্যতা নেই, ব্যাপারটা বেশ মধুর। জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগে গেল। আসতে হবে তো মাঝে-মাঝে।

সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ উঠে পড়লাম। ছ'টার সময় পল ওয়েগনার এসে নিয়ে গেল আমাকে একটা পার্টিতে। দুপুরে যাদের দেখেছি, তারাই সেখানে উপস্থিত। এবার টাই পরে আসি নি বলে স্বচ্ছন্দে অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে পারা গেল।

পার্টি থেকে রাত সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পল আমাকে বললো, তুমি কিন্তু আজ বাড়ি ফিরছো না। তুমি আমার সঙ্গে আমার গ্রামের বাড়িতে যাবে। ওখানেই দু'দিন থাকবো আমরা। দেশ থেকে এতদূরে এসেই তুমি একলা-একলা থাকবে, এটা ঠিক নয়।

বেশ মজা ! বাড়িতে কারুকে বলে আসার দরকার নেই। কেউ আমার জন্য চিন্তা করবে না। আমার তালা দেওয়া ঘরটা বোবা হয়ে থাকবে।

জ্যোৎস্না রাত। চারিদিক পরিষ্কার দেখা যায়। দু'পাশে গমের খেত। প্রায় সমতল ভূমি, কোথাও-কোথাও সামান্য ঢেউ খেলানো। এদিকে বাড়ি-টাড়ি বেশি নেই, তবু হঠাৎ দূরে দেখা যায় ছোট্ট একটা গির্জা, ঠিক যেন আঁকা ছবির মতোন।

পলের গ্রামের বাড়িটি আসলে ছোট্ট একটি টিলার ওপরে দুর্গ ধরনের বিরাট একটি প্রাসাদ। বহুদূর থেকে দেখা যায় বাড়িটা। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে পল আমাকে বললো, আমরা এসে গেছি। তবে শোনো, তোমাকে আগে থেকে একটা কথা বলে রাখি, আমার স্ত্রী যদি হঠাৎ রেগে যান, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বা তোমাকে মারতে যান, তাহলে তুমি কিছু মনে করো না কিন্তু !

এ আবার কী কথা ? যে বাড়িতে যাচ্ছি, সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমাকে মারতে আসবেন ? পল কি রসিকতা করছে ?

গাড়ি থেকে নেমে পল সন্তর্পণে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। তারপর ভেতরটা খানিকটা দেখে এসে ফিসফিস করে বললো, যাক, আমার স্ত্রী মেরি ঘুমিয়ে পড়েছে। এসো আমরা একটা নাইট ক্যাপ নিই, তারপর আমরাও শুতে চলে যাবো।

এই বুড়ো লোকটি তার বউকে এতো ভয় পায় ? আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। নাইট ক্যাপ কথাটার মানে জানতাম না। পল দু'টি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এলো। তারপর একটা বিশাল আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে বসে বললো, রিল্যাক্স ! দু'দিন আমরা এখানে থাকবো, সাঁতার কাটবো, জঙ্গলে গিয়ে মাছ ধরবো, আমার বন্ধু টম পাওয়েলকে ভুট্টা চাষে সাহায্য করবো, এ

বাড়ির বাইরের গেটটা সারাবো—অর্থাৎ শুধু বিশ্রাম। তারপর ফিরে গিয়ে আবার কাজ !

বিশ্রামের তালিকাটা তো পেলাম, তাহলে কাজটা কি ?

পলকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাজটা এখানে ঠিক কী বলো তো ? আমাকে কী করতে হবে ?

পল হেসে উঠলো। বললো, তোমাকে এতো চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ? তোমাকে কি আমরা খাটিয়ে মারবো নাকি ?

—না মানে, কাজটা কী ধরনের !

—আমার মনে হয়, তোমার পক্ষে খুব সোজা। তোমাদের ভাষার সাহিত্য কী রকম হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পর নতুন কী ধারা দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখবে। আর কিছু লেখা অনুবাদ করবে।

—এ কাজ যদি আমি না পারি ? কিংবা...

—পারবে না কেন ?

—মানে, যদি আমার ভালো না লাগে ? ইচ্ছে না হয় ?

—তাহলে যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাবে। তোমার কাছে তো রিটার্ন টিকিট আছেই। দিস ইজ আ ফ্রি কান্ট্রি। ওসব কথা ভেবো না। তোমার ইচ্ছে মতোন কাজ করো, যখন যতোটা খুশি।

—আসলে, সত্যি কথা বলবো ? আমি তো ভালো ইংরিজি জানি না, অনুবাদ কি ভালো পারবো ?

— তুমিই ভালো পারবে। কারণ তুমি তোমার ভাষাটা জানো। ইংরিজিতে তুমি প্রথমে যা লিখবে, সেটার ভাষা একটু মেজে-ঘষে দেওয়া যাবে পরে। সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। অন্য দেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের কেউ-কেউ তো তোমার থেকেও কম ইংরিজি জানে। তুমি যে ইংরিজিতে কথা বলছো, তাই তো যথেষ্ট। আমি তো তোমার ভাষায় কথা বলতে পারি না !

পলের গলার স্বরে এমন একটা শান্ত ভাব আছে, যাতে খুব আশ্বস্ত হওয়া যায়।

ও আবার বললো, 'আসল ব্যাপারটা কি জানো ? এই যে প্রোগ্রামের টাকা ইউনিভার্সিটি পুরো দেয় না। এখানে অনেক বড়লোক চাষা আছে, এতো বড়লোক যে প্রত্যেকেরই দু'তিনটে নিজস্ব এরোপ্লেন। তাদের কাছ থেকে আমি চাঁদা তুলি। ওদের বোঝাই যে, সাহিত্য-শিল্পের জন্য কিছু দান না করলে পরলোকে গোল্লায় যাবে। পাঁচ দশ হাজার ডলার দেওয়া ওদের পক্ষে কিছুই না। সেই টাকায় আমি চাই যথাসম্ভব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকদের সাহায্য করতে। তারা যাতে নিশ্চিন্তে এখানে কিছুদিন কাটাতে পারে, ইচ্ছে মতন লিখতে পারে—

ইস্, এজন্য আমার থেকে কতো ভালো-ভালো যোগ্য লোক ছিল ! আমি কি কোনোদিন লেখক হতে পারবো ? বিশ্বাস হয় না !

সারা বাড়িটা দারুণ নিস্তব্ধ। এতো বড় বাড়িতে কি আর লোকজন নেই ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেয়ে, সেরা, সে কোথায় ? তোমার আর ছেলেটেলে নেই !

আমার দুই মেয়ে। বড় মেয়ে, মাঞ্চি, তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে কলোরাডোতে থাকে। ছোট মেয়ে সেরা, ওর বিয়ের দিকে মন নেই। ও ভীষণ ঘোড়া ভালবাসে। আমার একটা ফার্ম আছে এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে, পাঁচটা ঘোড়া আছে সেখানে, সেরাই দেখাশুনো করে। ঘোড়ার গন্ধ ছাড়া ওর ঘুম হয় না বোধহয়, তাই রাত্তিরেও সেখানেই শোয় !

—একা !

—না, না ! কোনো না কোনো বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে থাকে নিশ্চয়ই !

এমন নিশ্চিন্ত পিতা আমি দেখি নি কখনো !

আমাকে শুতে দেওয়া হলো ওপরের একটি ঘরে। খাটটা দেখে মনে হলো রাজকুমার-টুমাররা এ রকম খাটে শোয়। সারা ঘরে অসংখ্য বই। এতো বই দেখলেই আমার দু' একটা চুরি করতে ইচ্ছে করে। বইগুলো বিভিন্ন ভাষায়। ফরাসি, ইটালিয়ান, এমনকি জাপানি পর্যন্ত। বাংলা একটাও নেই। ওঃ, কতদিন যে বাংলা অক্ষর দেখি নি, কতদিন যে বাংলায় কথা বলি নি !

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে বাংলায় বলতে লাগলাম—ওহে নীলু চন্দর, কেমন আছো ? এসব দেখেশুনে কি মাথা ঘুরে যাচ্ছে ? দেখো বাবা ! প্রথম দিনই একটা মেয়ে চুমু খেয়েছে ! আর যাই করো না কেন, মেম বিয়ে করো না ! কবে দেশে ফিরবে ? এর মধ্যেই আর ভালো লাগছে না যে !

ভালো লাগছে না? চারদিকে এতো ভালো-ভালো জিনিস, এতো আরাম, তবু ভালো না-লাগার কি কারণ থাকতে পারে ? তবু এতে স্বাচ্ছন্দ্যও যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়, কী রকম অস্বস্তি লাগে। এতো চমৎকার বিছানায় শুয়েও কেন ঘুম আসছে না ? কলকাতায় নিজের বিছানায় শুলেই তো...

ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। ঘড়িটা বন্ধ। ক'টা বাজে জানি না। এদের বাড়িতে সবাই কখন ওঠে ? যদি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করে ? তাড়াতাড়ি নেমে এলাম নিচে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আন্দাজে আন্দাজে চলে এলাম খাবার ঘরে। সেখানেও নেই কেউ। তাহলে বোধহয় আমি খুবই আগে উঠে পড়েছি। আর বিছানায় ফিরে যাবার মনে হয় না। বেরিয়ে এলাম বাইরে। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ জুড়িয়ে গেল।

চারদিকে নরম আলো। আকাশ কি অদ্ভুত নীল ! যতদূর পর্যন্ত গাছপালার সবুজ। তার মাঝখানে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মেপল গাছ, তার পাতাগুলো গাঢ় রক্তিম। পরিপূর্ণ শরৎকাল। এদেশে যার নাম অটাম্ নয়, ফল, আগেই শুনেছি। মেপ্‌ল পাতার রঙ বদলানো দেখে শরতের আগমন বোঝা যায়।

কয়েকটা চড়ুই পাখি দেখে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। চড়ুই পাখি আমার ধারণায় খাঁটি বাঙালি জিনিস। এরপর কয়েকটা কাক দেখতে পেলেই হয়। এমনকি দাঁড় কাক হলেও চলবে। কাক চোখে পড়লো না, কিন্তু গেটের ঠিক পাশেই একটা ম্যাগনোলিয়া গ্লান্ডিফোরা গাছে লুকোচুরি খেলছে কয়েকটা বাচ্চা কাঠবিড়ালি। এরাও আমার চেনাশুনো মানুষের মতন, খুব সম্ভব বাংলা বললেও বুঝবে।

টিলার নিচের রাস্তা দিয়ে উঠে আসছে একটা সুদৃশ্য নীল রঙের গাড়ি। ঐ রাস্তা এ বাড়িতেই শেষ হয়েছে। বোধহয় পল ওয়েগনারের কাছে কোনো অতিথি এসেছে। গাড়িটা একেবারে গেটের সামনে থামলো, মিলিটারির মতন পোশাক পরা একটা গাট্টাগোট্টা লোক নামলো এবং চিঠির বাক্সে কতকগুলো চিঠি গুঁজে দিয়ে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। ও বাবা রে, মোটরগাড়ি চড়া পিওন ! আরো কতো কায়দাই যে দেখবো !

মুখ ফেরাতেই দেখলাম একজন মহিলা। প্রায় প্রৌঢ়া। ছেলেদের মতন প্যান্ট শার্ট পরা, খানিকটা খর্বকায়া। সোজা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

এই নিশ্চয়ই পলের স্ত্রী। কারণ বাড়িতে আর কোনো জনপ্রাণী নেই। ইনি নাকি হঠাৎ রেগে যান, আমাকে মারতে আসতেও পারেন। পাগল ? নাকি কালো লোকদের পছন্দ করেন না !

কিছু তো বলতে হবেই ! সকালবেলা প্রথম দেখা হলে গুড মর্নিং না বলা এদেশে পাপ। কিন্তু সম্বোধন করবো কি বলে ? নামও জানি না।

মায়ের বয়েসী মহিলা, সুতরাং মুখে সেই সম্বোধন এসে গেল। বললাম, গুড মর্নিং মাদার। ওঃ, এই একটা সম্বোধনের জন্য পরে আমাকে কি হেনস্তাই সহ্য করতে হয়েছিল ! আমি

নাকি সাঙ্ঘাতিক অন্যায় কররছিলাম। মার্কিন দেশে শৈশব কিংবা বার্ধক্যের কোনো মূল্য নেই। সবটাই যৌবন।

মহিলা উত্তর দিলেন, গুড মর্নিং। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বললে ?

আমি গাড়লের মতন ঐ কথাটারই পুনরুক্তি করলাম !

উনি একেবারে হাসতে–হাসতে গড়িয়ে পড়লেন, যাকে বলে প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মতন অবস্থা। অতো হাসি দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সত্যি পাগল নাকি ? আমি তো হাসির কথা কিছু বলি নি !

মহিলাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন—মাদার, মাদার, মাদার—আর হাসি। শেষ পর্যন্ত চোখে জল আসায় হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তা মুছতে গেলেন, তখন আমি একটা রুমাল এগিয়ে দিলাম।

একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, তুমিই সেই ইন্ডিয়ান বয় ? কি নাম তোমার ?

নাম জানালাম ভয়ে–ভয়ে।

—শোনো, আমার নাম মেরি। মিসেস ওয়েগনার। আমি তোমার মাদার নই। এরপর আর কক্ষনো কোনো মহিলাকে মাদার বলো না। নিজের মা ছাড়া অন্য কাউকে মা বলতে নেই ! তুমি আমাকে শুধু মেরি বলবে।

ইংরেজি ভাষায় তুমি–আপনি নেই। বয়েসে যারা অনেক বড়, তাদের শুধু নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন বাধো–বাধো লাগে। কিন্তু উপায় কি ? যবনের হাতে পড়েছি যখন, তখন সেই খানাও খেতে হবে।

মেরি অবশ্য রাগ করলো না, মারতেও এলো না। আমাকে খাবারের ঘরে নিয়ে এসে কেটলিতে কফির জল বসালো। তারপর ফ্রিজ থেকে বিরাট লম্বা একটা স্যালামি আর একটা ছুরি আমাকে দিয়ে বললো—কাটো।

স্যালামি আগে খেলেও কাটার অভ্যেস নেই। মোটামুটি চাকা–চাকা করে কাটলুম। তারপর পাউরুটি কাটতে হলো। এর ফাঁকে–ফাঁকে মেরি জিজ্ঞেস করতে লাগলো আমার বাড়ির খবর। তারপর হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা আফসোসের সুরে বললো, ইস, তোমাকে স্যালামি কাটতে দিলাম কেন ? তুমি তো নিরামিষ খাও !

—না তো।

—ইন্ডিয়ানরা তো শুধু নিরামিষ খায় !

—অনেকে খায় বটে। কিন্তু আমি...

—তুমি বিফ খাও !

—খাই।

—এর আগে একজন ইন্ডিয়ান এসেছিল এ বাড়িতে—আ রিয়াল ইন্ডিয়ান ফ্রম ইন্ডিয়া, সে নাকি মস্ত বড়লোক, কিন্তু তার খাওয়া নিয়ে কি ঝামেলা, আমার বাড়িতে ভেজিটেবল বিশেষ কিছু থাকে না... তুমি নিশ্চয়ই মোজলেম।

শূকর মাংসের চাক্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম, আমি সবই খাই। আমি গরিবের ছেলে তো, মা বলে দিয়েছেন, লোকের বাড়িতে গিয়ে এটা খাবো না, সেটা খাবো না বলতে নেই। যে যা দেবে সোনা মুখ করে খেয়ে নেবে !

মেরি হাসতে–হাসতে বললো, তুমি সবই খাও ? তাহলে এটা দিয়ে আজ ব্রেকফাস্ট করো। মেরি একটা প্যাকেট আমার দিকে ছুড়ে দিল। দেখলাম, প্যাকেটটার গায়ে লেখা আছে, ডগ

বিস্কিট !

এই দু'দিনেই বুঝে গেছি, আমেরিকানরা সবসময় মজা করতে ভালবাসে। যে-কোনো বিষয় নিয়েই এরা হাসি-ঠাট্টা করতে পারে।

সুতরাং মেরিকে মজা দেবার জন্য আমি গ্রাউ, আউ, আউ, গ্রাউ করে খানিকটা কুকুরের ডাক ডাকলাম। তারপর একখানা বিস্কিটে এক কামড় দিয়ে বললাম, ইয়া, আই লাইক ইট !

মেরি ছুটে এসে আমার মুখ থেকে বিস্কিটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তুমি সত্যি-সত্যি খাচ্ছিলে ? ভারি দুষ্টু ছেলে তো !

সকালটা মেরির সঙ্গে আমার ভালোই কাটলো। তবে, পরবর্তী দু'দিনে বাড়িতে যত অতিথি এসেছে, সবার সঙ্গেই মেরি আমার পরিচয় করে দেবার পর বলেছে—জানো, ও প্রথম আমায় দেখে কি-কি বলেছিল ? বলেছিল, গুড মর্নিং মাদার ! তাই শুনে মেরির সঙ্গে-সঙ্গে অতিথিদেরও কি হাসি ! সেই সময় আমার বোকা বোকা মুখ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

পলের ঘুম ভাঙলো দশটার সময়। একটু পরেই সে একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এলো, হাতে একটা বিদঘুটে যন্ত্র। আমাকে বললো, তুমি রেডি তো ? চলো !

কোথায় যাচ্ছি, জানি না। বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। টিলার উল্টোদিক দিয়ে নামলে একটা ছোট মতন জঙ্গল। সেখানে খুঁজে-খুঁজে পল একটা শুকনো ওক গাছ বার করলো। গাছটা বিরাট, কিন্তু ছাল বাকল খসে গেছে। পল বললো, আমাদের এই বাড়িটাতে এখনো ফায়ার প্লেস আছে। এখানে কাঠের খুব দাম। কিনতে গেলে ফতুর হয়ে যাবো। সামনেই শীত আসছে, তাই কিছু কাঠ জোগাড় করে রাখা দরকার।

তারপর সে গাছটা কাটতে শুরু করলো। তার হাতের যন্ত্রটা একটা ইলেকট্রিক করাত। কী প্রচণ্ড তার শব্দ ! কিছুক্ষণের জন্য সেটা আমি ধরে ছিলাম। অতিশয় ভারী এবং এতো কাঁপে যে ধরে থাকা রীতিমতন কষ্টকর। এবং করাতের ফলাটার সামনে যদি একবার হাতটা পড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে কুচুং করে উড়ে যাবে। ষাট বছরের বৃদ্ধের এই শখের আমি মানে বুঝতে পারি না। কাঠের দাম-ফাম সব বাজে কথা !

প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় গাছটাকে ভূপাতিত করা গেল। মহাকাব্যের প্রতিনায়কের মতন সে হাত-পা ছড়িয়ে ঢলে পড়লো মাটিতে। পল খুব খুশি। বড়-বড় কয়েকটা ডাল সে আলাদাভাবে টুকরো করে বললো, এবার ম্যাক গ্রেগরকে খবর দিতে হবে। সে হচ্ছে প্লাম্বার। সে এসে বলবে, কোন্ কোন্ কাঠ আমাদের গেটটা সারাবার জন্য দরকার হবে।

ম্যাক গ্রেগর একজন মধ্যবয়সী, শক্ত-সমর্থ লোক। কথা প্রায় বলেই না। তবে দারুণ পরিশ্রমী। তক্ষুনি পলের গাড়িতে দুটো ডাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং গেট সারানো চললো আরও দু'ঘণ্টা। তারপর পল তাকে তার মজুরির টাকা মিটিয়ে দেবার পর বললো, 'ম্যাক গ্রেগর, একটা ড্রিঙ্কস্ নেবে নাকি ? দুপুরের খাবারটা আমাদের সঙ্গেই খেয়ে যাও না !'

আমরা তিনজন এক সঙ্গে খাবারের টেবিলে বসলাম। কাজ শেষ হবার পর ছুতোর মিস্তিরির সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসার ব্যাপারটা গরিব দেশের লোকেরা জানে না।

গ্রাম হলেও জায়গাটার নাম স্টোন সিটি। যদিও এখানেও অধিকাংশ বাড়িই কাঠের। আয়ওয়ার সঙ্গে জায়গাটির তফাত এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যদিও দু'টি দৈনিক পত্রিকা আছে। দুটো পত্রিকা পরস্পরের দারুণ শত্রু। প্রতিদিন সকালেই পরস্পরের প্রতি প্রচুর গালমন্দ থাকে। যদিও দুটো পত্রিকারই মালিক এক ব্যক্তি। মালিক সেই টম পাওয়েলের সঙ্গে আলাপ হলো সন্ধেবেলা। বেঁটে মোটাসোটা, খুব হাসিখুশি মানুষ। হাসতে-হাসতে বললো, এটা

কেন হয় জানো ? প্রথমে আমার একটাই কাগজ ছিল। অন্য কাগজটা আমার নাম করে খুব গালাগালি দিত বলে আমি সেই কাগজটাও একদিন কিনে নিলাম। তারপর ভাবলাম, এ কাগজটার যদি চরিত্র হঠাৎ বদলাই তাহলে পাঠকরা আর নাও পছন্দ করতে পারে। তাই আরও বেশি কড়া ভাষায় আক্রমণ চলতে লাগলো। অন্য কাগজটা তার উত্তর দেয়। পাঠকরা সেইজন্য দুটো কাগজই পড়ে।

এই কাহিনী শুনিয়ে টম পাওয়েলের কী হাসি ! লোকটি বেশ রসেবশে আছে বোঝা যায়। সন্ধের পর তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল খাবার জন্য। মেরি অবশ্য গেল না। মেরি নাকি সচরাচর বাড়ির বাইরে যায় না। টম পাওয়েলের স্ত্রী জেরিও হৈ-চৈ খুব ভালবাসে। সেই রাত্রে আমাদের সুইমিংপুলে নেমে সাঁতার কাটতে বাধ্য করলো। আমার সুইমিং ট্রাঙ্ক নেই, টম পাওয়েলের বিরাট ঢলঢলে একটা ট্রাঙ্ক পরতে বাধ্য হলাম এবং ঝপাং-ঝপাং করে হাত-পা ছুঁড়ে খুব এক চোট বাঙালি সাঁতার দেখিয়ে দিলাম।

পাওয়েলদের ছেলে নেই, চারটি মেয়ে। পনেরো থেকে সাতাশের মধ্যে বয়েস। চারজনই বেশ সুশ্রী ও চটপটে। পরে জেনেছিলাম, একটি মেয়েও ওদের নিজস্ব নয়, অনাথ আশ্রম থেকে গ্রহণ করা। অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়ে শুনলেই আমাদের চোখে অন্য একটি ছবি ভাসে, ঐ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণীদের সঙ্গে একটুও মেলে না। ওরা চারটিই মেয়ে এনেছে, বিয়ে দেবার চিন্তায় একটুও শুকনো মনে হয় না স্বামী-স্ত্রীকে।

স্টোন সিটি থেকে ফিরে এলাম আড়াই দিন বাদে। পল আমাকে আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। মেরিও ফিরলো আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সারাক্ষণ উৎকট গম্ভীর।

ওদের গাড়ি আমাকে আমার বাড়ির দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাড়ি ? মাত্র একটা রাত কাটিয়েছি এখানে। তবু যেন বেশ একটা নিজের বাড়ি নিজের বাড়ি ভাব হলো। এর আগে কক্ষনো আমি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকি নি।

চাবি খুলতে গিয়ে দেখলাম, দরজার পাশে একটা কাগজ গোঁজা। একটা চিরকুট, তাতে লেখা আছে, "আমি পরপর দু'দিন এসে তোমাকে খুঁজে গেলাম। তুমি ফেরার পর আমাকে একবার টেলিফোন করবে ? বিশেষ দরকার।" ইতি—এম ম্যাতিউ।

এম ম্যাতিউ কে ? ঠিক চিনতে পারলাম না। এই ক'দিনের মধ্যে এতো লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে যে নাম মনে রাখা খুবই শক্ত। হঠাৎ এতো সাহেব-মেমের ব্যাপারে কি তাল রাখা যায় ? তাছাড়া কে আমাকে অত বিশেষভাবে খুঁজতে পারে ?

তক্ষুনি ফোন করলাম। ওপাশে একটি কড়া গলার মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে বললাম, 'এম ম্যাতিউর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

উত্তর এলো—এখন না, এক ঘণ্টা বাদে ফোন করো।

কট করে লাইন কেটে গেল। রহস্যই রয়ে গেল ব্যাপারটা। কে এই এম ম্যাতিউ ?

যাই হোক, সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ তো কিছু রান্নাবান্নার চেষ্টা করতেই হবে। ক'দিন ভাত খাই নি। মনে হয় যেন এক যুগ। শুধু সসেজ-ফসেজ খেয়ে কি আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয় ? প্রথম দিন বাজার করার সময় চাল কিনে এনেছিলাম। দু'পাউন্ডের প্যাকেট। প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে, ইনস্ট্যান্ট রাইস, ফুটন্ত গরম জলে এই চাল ফেলে দিলে ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাত হয়ে যায়।

সসপ্যানে গরম জল চাপিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। সত্যিই বেশ চমৎকার যুঁই ফুলের মতন নরম, সাদা ঝরঝরে ভাত হয়ে গেল, ফ্যান গালারও ঝামেলা নেই। এবার ? শুধু ভাত তো খাওয়া যায় না। ডাল নেই, মাছ-মাংস নেই, তরি-তরকারি নেই। আগের দিন 'এ এ্যান্ড পি'তে দেখে

এসেছি এসবই পাওয়া যায়। এমনকি বেগুন, ফুলকপি পর্যন্ত চোখে পড়েছিল। কিন্তু আনা হয় নি। এখন বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনা যায়, কিন্তু খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। আলু আর পেঁয়াজ আছে, তাই ভেজে নেওয়া যেতে পারে। মাখন আছে যথেষ্ট। গরম ভাত, মাখন আর আলু ভাজা–খিদের মুখে রাজা–মহারাজারাও এ রকম খাবার পেলে ধন্য হয়ে যাবে। কতদিন মাখন দিয়ে ভাত খাই নি। ভাবলেই চোখে জল এসে যায়।

আলু কুটতে বসলাম। সঙ্গে–সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে ধড়ফড় করে বললাম—হ্যালো।

আমি মার্গারিট ম্যাতিউ।

ওঃ হো, এ তো সেই ফরাসি মেয়েটি, ডোরির সঙ্গে যে এসেছিল। গলার আওয়াজেই চিনতে পারলাম। ট–গুলো বলে ত–এর মতন, র–গুলো অনেকটা হ–এর মতন।

—আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। কি ব্যাপার বলো তো ?

—শোনো নীল, তোমাকে বিরক্ত করছি—খুবই দুঃখিত।

—না, না, বিরক্ত কেন হবো ?

—তোমার বাড়িতে কি সেদিন আমি একটা বই ফেলে এসেছি ? নাও হতে পারে, মানে বইটা খুঁজে পাচ্ছি না, বইটা ক্লাসে পড়াবার জন্য আমার খুবই দরকার লাগে।

—বই, দাঁড়াও দেখছি।

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল। সোফার পাশে পড়ে গিয়েছিল। আগাগোড়া ফ্রেঞ্চ ভাষায় একটি কবিতার বই।

—হ্যাঁ, পেয়েছি।

—সত্যি ? ওঃ বাঁচলুম। বইটা এখানে পাওয়া যায় না, যদি হারাতো—

—আমি কি বইটা তোমাকে কোথাও পৌঁছে দেবো ?

—না, না, তুমি কষ্ট করবে কেন? আমিই গিয়ে নিয়ে আসবো। আমি দু'বার গিয়ে তোমায় পাই নি।

—আমি তিনটের সময় ইউনিভার্সিটিতে যাবো, তখন বইটা নিয়ে যেতে পারি।

—ঠিক আছে, হয় সেই সময়, অথবা অন্য কোনো সময় আমি গিয়ে... অনেক ধন্যবাদ।

৫

আবার রান্নাঘরে ফিরে এলাম। আলুর খোসা ছাড়াবার পর পেঁয়াজ কুটতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হলো। কিন্তু ভাজবো কী দিয়ে ! তেল তো নেই ! দূর ছাই ! এর বদলে তো শুধু আলু সেদ্ধ করলেই হতো। পাঁচ মিনিটে কি আলু সেদ্ধ হয় ? আলাদা জলে সেদ্ধ করে নেবো ? তাহলে আলুগুলো টুকরো–টুকরো করলাম কেন ? যখন আলু ভাজা খাবো ঠিক করেছি, তখন খাবোই। মাখন দিয়েও তো সবই ভাজা যায়।

আর একটা চ্যাপটা প্যান উনুনে চাপিয়ে খানিকটা মাখন ছেড়ে দিলাম। মাখনটা গলবার সময় দিয়ে আমি পাশের ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর কৌতূহল বশে বইটা একটুমাত্র উল্টেছি, এমন সময় ধোঁয়া ভেসে এলো রান্নাঘর থেকে। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, প্যানের ওপর মাখনটা দাউদাউ করে জ্বলছে। এতো তাড়াতাড়ি ? এক মিনিটও হয় নি ! আগুনটা দেখে মাথা গুলিয়ে গেল, গ্যাস বন্ধ করার কিংবা প্যানটা নামিয়ে ফেলার কথা মনে এলো না, খানিকটা জল ঢেলে দিলাম দূর থেকে।

সঙ্গে–সঙ্গে একটা আগুনের গোল্লা প্যান থেকে লাফিয়ে ছাদের দিকে উঠে গেল। এখানে প্রত্যেকটি ঘরের দেয়ালে ও ছাদে নানান রঙিন ছবি আঁকা ওয়াল পেপার। ওপর দিকটা কালো হয়ে গেল। সারা বাড়িটা কাঠের তৈরি, আগুন ধরে গেলে কী করতাম জানি না। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা স্রোত নেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্যানটা কালো হয়ে গেছে। ঘষে–ঘষে খানিকটা পরিষ্কার করে আবার চাপালাম সেটাকে। আলু ভাজা খাবোই। এবার খুব কম মাখন দিয়ে, গলতে না গলতেই আলুগুলো ছেড়ে দিলাম, তারপর পেঁয়াজ, বেশ জল বেরুতে লাগলো, আর ভয় নেই।

রান্না যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন দরজায় শব্দ। এবার আর ভুল করলাম না, গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুললাম। বাইরে যে একটা দেবীমূর্তি দাঁড়ানো। সেই ফরাসি মেয়েটি। মাথার চুল সেরকম অগোছালো। একটা হালকা নীল রঙের স্কার্ট পরা, গাঢ় নীল রঙের চোখ, এবং অদ্ভুত সরল দৃষ্টি।

সে ঘোষণা করলো—আমি চলে এলাম।

—নিশ্চয়ই, এসো, এসো।

দরজা বন্ধ করে মার্গারিটকে ভেতরে বসালাম। তার হাতে একটা বড় প্যাকেট, সেটা টেবলের ওপর নামিয়ে রেখে বললো, নিয়ে এলাম তোমার জন্য।

প্যাকেটের মধ্যে ছ'টা বিয়ারের ক্যান। ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাই জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি বইটার বদলে?

—না, না, এমনিই। তুমি বইটা পড়েছো?

—এ তো খাঁটি ফরাসি ভাষায়। আমি বুঝবো কী করে?

—তুমি অনুবাদে নিশ্চয়ই ফরাসি কবিতা পড়েছো? কার কবিতা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?

বাংলায় অনুবাদ আছে বলে নির্ভয়ে বললাম—বোদলেয়ার।

মার্গারিট মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, আমার ওঁর কবিতা একটুও ভালো লাগে না। খুব বড় কবি নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ও তো নাস্তিক! ওর কবিতায় বিশ্বাস নেই, ভালবাসাও নেই। আমার খুব প্রিয় কবি আপোলিনেয়ার। তোমার ভালো লাগে না!

একটু ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ, ভালোই তো।

পাশের ঘরে আমার স্বহস্তে রান্না করা খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে, এখন কি কাব্য আলোচনা চলে? কিন্তু মেয়েটিকে তো কিছু বলতে পারি না। বিশেষত আগের দিন দেখেছি, একে সবাই খুব খাতির করে। তার প্রথম কারণ, এর স্বর্গীয় ধরনের সৌন্দর্য। দ্বিতীয় কারণ, জাতে ফরাসি।

ফট্‌ফট্ করে দুটো বিয়ার ক্যান খুলে ওকে একটা দিয়ে নিজেও নিয়ে বসলাম। ও আমার দিকে একটু যেন কৌতূহলের সঙ্গে তাকালো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি ফ্রান্সে গেছো?

—শুধু প্যারিস এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। শহরের ভেতরে যেতে পারি নি।

—কেন?

—পয়সা ছিল না। তবে যাবো নিশ্চয়ই। একবার না একবার। জানো, ওখানকার এয়ারপোর্টে যখন বসেছিলাম, ফরাসি নারী–পুরুষদের দেখে মনে হচ্ছিল, এরা নিশ্চয়ই কবি বা শিল্পী। তুমি কি কবি?

মার্গারিট দারুণভাবে হাসতে লাগলো। ঠিক যেন ঝর্নার জলের শব্দ। মাথা ঝাঁকাতে–ঝাঁকাতে বললো, না, না, আমি কক্ষনো এক লাইনও কবিতা লিখি নি। কবিতা লেখা কি

সহজ? আমি পড়তে খুব ভালবাসি। তোমার ধারণা ফরাসিরা সবাই কবি বা শিল্পী? এয়ারপোর্টে তো বেশির ভাগ ব্যবসায়ী কিংবা চোর-ডাকাতরা ঘুরে বেড়ায়!

একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নিজের শরীরের দিকে চোখ গেল। চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। কি দারুণ কেলেঙ্কারি করে ফেলেছি! আমি গেঞ্জি ও পাজামা পরে আছি। দরজায় খটখটের পর তাড়াহুড়োতে প্যান্ট-শার্ট পরে নিতে ভুলে গেছি। সাহেব-মেমের সামনে এই পোশাক? শুনেছি, ঠিক মতন সজ্জিত না হয়ে তাদের সামনে এলে তাকে নাকি অপমান করা হয়। ড্রেসিং গাউন-ফাউন একটা না কিনলে আর চলছে না!

এখন কী করবো, দৌড়ে পালিয়ে যাবো? আস্তে-আস্তে বললাম, কিছু মনে করো না। আমি রান্না করছিলাম তো, তাই পোশাক পরে নেই!

পোশাকের কথাটা গ্রাহ্য না করে ও ব্যগ্রতাবে জিজ্ঞেস করলো, রান্না করছিলে? ইন্ডিয়ান কুকিং?

যদিও ভাত এবং আলু-পেঁয়াজ তাজা, তবু ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

—মে আই সি ইট? আমি কখনো দেখি নি!

নিজেই উঠে চলে এলো রান্নাঘরে। আলু আর পেঁয়াজ এক সঙ্গে ভাজার জন্য রংটা লালচে হয়ে গেছে। ও জিজ্ঞেস করলো, এটা কি?

কী বলবো, ফিংগার চীপ্স ফ্রায়েড পটাটো না পটাটো চীপ্স? বললাম, ফ্রায়েড পোটাটো অ্যান্ড ওনিয়ান!

রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, মে আই টেস্ট ইট?

হাত দিয়ে খানিকটা তুলে নিয়ে খুব সন্তর্পণে জিভে ঠেকালো। তারপর বললো, সে বঁ! সে ত্রে বঁ! খুব ভালো!

ডোরি বলেছিল, শনিবার খাওয়াতে গেলে মঙ্গলবার নেমন্তন্ন করতে হয়। এ মেয়েটা যে নিজেই খাবার তুলে খাচ্ছে। সুতরাং একে অনায়াসেই আর একটু বলা যায়। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমার সঙ্গে একটু ভাত খাবে? আগে কখনো ভাত খেয়েছো?

— খেতে পারি একটু। হ্যাঁ, আগে ভাত খেয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু কোনো ইন্ডিয়ানের নিজের হাতের রান্না তো খাই নি!

ভাতটা তখনো গরম আছে। তার মধ্যে খানিকটা মাখন ফেলে দিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে দিলাম। এই তো ঘি-ভাত হয়ে গেল। দুটো প্লেটে সেই ভাত আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা বেড়ে ফেললাম চট করে। রান্নাঘরে কিছু সসার, প্লেট, কাঁটা-চামচ আগে থেকেই ছিল। আমার অবশ্য খুবই ইচ্ছে ছিল হাত দিয়ে খাবার, কিন্তু খাঁটি ফরাসি মেমসাহেবের সামনে কাঁটা ব্যবহার করতেই হলো। যাই হোক, দিব্যি জমলো খাবারটা। নিজে রেঁধেছি বলে বলছি না, আলু-পেঁয়াজটা সত্যি দারুণ খেতে হয়েছিল; নুন দিতে ভুলে গেছি, তাতে কী! নুন তো পরে মিশিয়ে নিলেই হয়!

খাওয়ার শেষের দিকে ঝড় উঠলো। হঠাৎ সোঁ-সোঁ শব্দ, তারপর পাগলা হাওয়া। মার্গারিট জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে শিশুর মতন কলকণ্ঠে বললো, উঃ, কী সুন্দর, কী চমৎকার, এ বছরের প্রথম ঝড়—নীল, তুমি দেখবে এসো—

আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর্দাগুলো উড়ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। উড়ছে মার্গারিটের মাথার চুল, গায়ের জামা, উড়ে যাচ্ছে ওর কথা। বাইরে উইলো গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ঝাঁক-ঝাঁক পাখির মতন আকাশে উড়ছে অসংখ্য শুকনো পাতা।

মার্গারিট বললো, তুমি একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছো ? বৃষ্টি আসবার আগে উইলো গাছগুলো এরকম কাঁদে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাইরের প্রকৃতির চেয়েও এই নারীটিকে আমার আরও বেশি অপরূপ মনে হয়। প্রকৃতি উদ্দাম হয়েছে বলেই এই মুহূর্তে ওর রূপ আরও বেড়ে গেছে। ওর সর্বাঙ্গ ভরা অজস্র খুশি, যেন তার ঝাপটা এসে লাগছে আমার গায়ে।

খানিক পরেই বৃষ্টি নামলো। আমার ধারণা ছিল, আসাম বা বাংলাতেই বুঝি সবচেয়ে জোরালো বৃষ্টি হয়। বর্ষা যেন আমাদেরই একচেটিয়া। কিন্তু এখানকার বৃষ্টিও তো কম তীব্র নয়। ঝমঝমে শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। তিনটের সময় ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কথা ছিল, সে প্রশ্ন আর ওঠে না।

সোফার কাছে ফিরে এসে আর এক জোড়া বিয়ারের ক্যান খুললাম। আমার কানের কাছটায় একটু গরম-গরম লাগছে। নিশ্চয়ই বিয়ারের জন্য নয়। এখানকার বিয়ার খুব পাতলা, সহজে নেশা হয় না।

মার্গারিট জিজ্ঞেস করলো, তুমি সাকোনতালের কথা জানো ? আমাকে বলবে ?

— সেটা কি জিনিস ?

— সাকোনতাল, তোমাদের দেশের—

— ঠিক বুঝতে পারছি না!

ও তখন ঝরঝর করে আবৃত্তি করলো :

লোপো রইয়্যাল দ্য সাকোনতল
লা দ্য ড্যাঁক্‌র স্য রেজুই
কাঁ ইল লা র‍্যাট্রভা প্‌ প্‌ল ...

আমি বললাম, ইংরেজি করে বুঝিয়ে দাও!

— এর মানে—অনুবাদ করা খুব শক্ত ... তবু, মানে সাকোনতালের স্বামী, রাজ্য জয় করতে-করতে ক্লান্ত, সত্যিকারের আনন্দ পেলেন যখন দেখলেন তাকে (সাকোনতালকে), প্রতীক্ষা ও ভালবাসায় ম্লান, আদর করছিল হরিণ শিশুটিকে...

আমি আবিষ্কারের আনন্দে বললাম, ও, শকুন্তলা! দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা!

মার্গারিট উজ্জ্বলভাবে বললো, বুঝতে পেরেছো ? আপোলিনেয়ারের কবিতায় আছে ... তুমি ওদের পুরো কাহিনীটা জানো ?

আমি হ্যাঁ বললাম। মার্গারিট ব্যগ্রভাবে আমার বাহু ছুঁয়ে বললো, বলো না! আমাকে বলো ওদের গল্প! কতদিন ধরে আমার জানবার ইচ্ছে, কোথাও পাই নি।

মহাভারতের নয়, কালিদাসের নাটকের শকুন্তলা-কাহিনী আমি ওকে শোনালাম। মহাভারতের কাহিনীটা তুলনায় অনেক নীরস। গল্পটা শুনতে শুনতে মার্গারিট এক সময় কেঁদে ফেললো। যেখানে দুঃখিনী শকুন্তলা গেছে রাজসভায়, রাজা তাকে চিনতে পারছেন না, সপারিষদ বসে কটু ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন—সেখানে মার্গারিটের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো। আমি বুঝলাম, ওর চোখ দু'টি আসলে ওর মনেরই দু'টি ছোট আয়না।

গল্প শেষ করার পর আমি বললাম, তুমি একটু বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিলে।

— হ্যাঁ, কী নিষ্ঠুর অথচ কী অপূর্ব সুন্দর গল্প!

— তোমার জীবনে কি কখনো এরকম হয়েছে ? কেউ ভালবেসে তোমাকে ভুলে গেছে ?

ও অবাক হয়ে বললো, 'না তো। আমায় তো কেউ কখনো সেরকম ভালবাসে নি। আমি

তো ভালবাসার স্বাদই এখনো জানি না।'

কথা ঘোরাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি তোমাকে এত বড় একটা গল্প শোনালাম, এবার তুমি আপোলিনেয়ারের পুরো কবিতাটা আমাকে শোনাও!

ও বললো, 'নিশ্চয়ই। তুমি শুনবে ?'

আপোলিনেয়ারের 'লা সাঁজোঁ দু মালএইমে' বেশ দীর্ঘ কবিতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রণয় কাব্যগুলোর মধ্যে একটি। মার্গারিট আমাকে খুব যত্ন করে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে শোনাতে লাগলো : ১৯০৩ সালে যখন আমি ঐখানে গিয়েছিলাম, তখন জানতাম না আমার ভালবাসা সেই সুন্দর ফিনিক্স পাখির মতো, এক সন্ধেবেলা তার মৃত্যু হলে পরের সকালটিই তার পুনর্জন্ম দেখে...

এমন চমৎকারভাবে কবিতা পড়া আমার জীবনে আগে কখনো হয় নি। ও যেন প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন অত্যন্ত ভালবেসে উচ্চারণ করছে। যেন এই শব্দগুলোর তুলনায় পৃথিবীর আর সবকিছুই মূল্যহীন। শুনতে-শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আমার মনটা প্রসারিত হয়ে যেন আমার শরীর ছাড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার দেখা এবং শোনা—এই দুটো জিনিস মিলেমিশে গেছে। আমি শব্দগুলোকে দেখছি, আর এই বালিকার মতন যুবতীর রূপ যেন গানের মতন আমার ভেতরে চলে আসছে।

মাঝে-মাঝে সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্য আমাকে উঠে আসতে হচ্ছিল, তাই এক সময় আমি মেঝেতেই ওর কাছাকাছি এসে বসেছিলাম। পুরো কবিতাটা শেষ হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। দু'জনেই। আমার মনে হলো, এতক্ষণের এই শব্দতরঙ্গ আমাদের দু'জনকে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে। আমি মার্গারিটের উরুর ওপর আমার মাথাটা হেলিয়ে দিলাম।

ও সেদিকে স্থিরভাবে তাকালো।

আমার মুগ্ধতা আমি কিভাবে ওর কাছে জানাবো, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ কবিতাটাই যেন ওর অবয়বের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই কবিতাটিকে আরও বেশি উপভোগ করার জন্যই যেন আমার ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হলো।

আমি বললাম, এটা আবার একদিন শুনবো। মার্গারিট, মে আই কিস ইউ ?

ওর মুখে একটা পাতলা দুঃখের ছায়া ছড়িয়ে পড়লো। আমার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ম্লান গলায় বললো, আমি দুঃখিত। আমেরিকান মেয়েরা এতে কিছু মনে করে না বটে, কিন্তু আমি পারবো না। আমি মাঝে-মাঝে এখানে আসতে পারি, আমরা এক সঙ্গে কবিতা পড়বো, কিন্তু আমার কাছে অন্য কিছু পাবে না।

আমি তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত গলায় বললাম, না, না, তুমি আসবে। আমি আর অন্য কিছু চাই না।

— তুমি পারবে না।

— নিশ্চয়ই পারবো।

— আমি চেয়েছিলাম তোমার বন্ধু হতে, তোমার কাছে এসে অনেক কিছু জানবো, কবিতা পড়বো—কিন্তু আমি তো তার বদলে আর কিছু দিতে পারবো না।

— আমি সেরকম ভাবে চাই নি!

— বাট ইউ মাস্ট প্রমিস।

— নিশ্চয়ই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

— তুমি কিছু মনে করলে না তো ? আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম ?

— না, না, না।

— সত্যি বিশ্বাস করো, আমি ওসব পারি না। এই যে ছেলেমেয়েদের যখন-তখন শারীরিক

আনন্দ, এটা ঠিক আনন্দ নয়—ভালবাসা ছাড়া কি সত্যিকারের আনন্দ হয় ? এরা শরীরকে এত প্রশ্রয় দেয় বলেই শেষ পর্যন্ত ভালবাসতে শেখেই না।

আমি চুপ করে রইলাম। একটু বাদে বইটা নিয়ে মার্গারিট উঠলো। বললো, যাই, আমাকে একবার হস্টেলে ফিরতে হবে। আজ আমার ঘর সাফ করার ডিউটি আছে।

দরজার বাইরে গিয়ে ও আবার বললো, আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম ?

ওর চোখ ছলছল করছে। আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'না, না, আমিই বোকার মতন ... তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

সিঁড়ির নিচ পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। শরীরে অসম্ভব ছটফটানি। এক একবার মনে হলো, আমি সাঙ্ঘাতিক দোষ করেছি। আবার মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বঞ্চিত মানুষ।

শেষ পর্যন্ত আমার হতাশা ও গ্লানি শুধু রাগে পরিণত হলো। ইচ্ছে হলো, হাতের কাছে যা পাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই! আয়নাটা, কাপ, প্লেট, বাসনপত্তর! কী হবে এসব দিয়ে ? কেন বোকার মতন মার্গারিটের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে গেলাম ? নিজেকে ক্ষমা করবো কি করে ? ডোরি বলেছিল, অনেকক্ষণ এক সঙ্গে কাটাবার পর কোনো মেয়েকে চুমু না খেলে সে দুঃখ পায়। আবার আর একটি মেয়েকে সে কথাটা শুধু উল্লেখ করলেই যে দুঃখ পাবে, তা আমি জানবো কি করে ? দূর ছাই, এ ছাতার দেশে আর থাকবো না।

কী হবে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে থেকে!

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এই জানলা পুব দিকে। এদিকেই তো কলকাতা। কত হাজার মাইল দূরে। তবু আমি জানলা দিয়ে যেন সোজা কলকাতাকে দেখতে পাচ্ছি। সেখানকার বন্ধু–বান্ধবরা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওদের চোখের ভাষা পর্যন্ত আমি বুঝি, ওরা আমার ভাষা বোঝে। ওখানে আমি জলের মাছ, এখানে কেউ না। চলে যাবো, দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবো!

৬

দিন দশেকের মধ্যেই অনেক কিছু ধাতস্থ হয়ে গেল। চেনা হয়ে গেল রাস্তাঘাট, কোথায় কোন্ দোকান। এমনকি প্রতি শনিবার কোন্ দোকানে রুই মাছ আর ইলিশ–ইলিশ–গন্ধওয়ালা স্যামন পাওয়া যায়, সেটা পর্যন্ত জানা। হ্যালোর বদলে হাই কিংবা হাফ–এর বদলে হ্যাফ বলাও রপ্ত হয়ে গেছে। তবু মনমরা ভাবটা কাটে না।

অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই ছোট্ট জায়গাতেও বাঙালি আছে পঞ্চাশ–ষাটজন, দুই বাংলার মিলিয়ে। কয়েকজন নিজে থেকেই আমার বাড়ি যেচে আলাপ–পরিচয় করে গেছে। একজন তো আমার একেবারে প্রতিবেশী, দু'তিনখানা বাড়ি পরে থাকে, রাধারমণ ব্যানার্জি, চন্দননগরের ছেলে। অতিশয় কট্টর বামুন, কেমিস্ট্রির ডক্টরেট হলেও ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন ভীষণভাবে। বাড়ির বাইরে কোথাও কখনো রান্না করা জিনিস খান না, এক টুকরো মাছ ভাজাও নয়, কারণ কুকিং অয়েলের মধ্যে যদি কোনোক্রমে গরু বা শুয়োরের চর্বি মেশানো থাকে, তাহলেই জাত যাবে! উনি কখনো বাসে ওঠেন না, কারণ ভিড়ের সময় মেয়েদের গায়ের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যেতে পারে। মেমদের গায়ে নাকি বিশ্রী ঘামের গন্ধ ! যার নাম রাধারমণ, সে যে কি করে এরকম অটলবিহারী হয়, সেটাই বিস্ময়ের। বেস্পতিবার ক্ষুর ছোঁয়ানো নিষেধ বলে

উনি বুধবার মাঝ রাত্রে উঠে দাড়ি কামান।

রাধারমণ ব্যানার্জির সঙ্গে আমার কোনোদিক থেকেই কিছু মিল থাকার কথা নয়, শুধু বাংলা ভাষা ছাড়া। ওর বাঙালিত্ব আবার সাঙ্ঘাতিক প্রবল, ওর মতে বাঙালিরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, জোর করে তাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, সত্যজিৎ রায়, ইলিশ মাছ এবং বাঙালি মেয়ে ওর প্রিয় আলোচ্য বিষয়। ভারতী নামে একটি বাঙালি মেয়ে এখানে এসে একটি ক্যানেডিয়ান ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে উনি সাঙ্ঘাতিক মর্মাহত, যেন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের মতন একটা ঘটনা।

লোকটি কৃপণ স্বভাবের। সিগারেট বা চায়ের পর্যন্ত নেশা নেই। তবে একটি মাত্র শখ আছে। নিউইয়র্কের একটি পাঞ্জাবির দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে শর্ষের তেল আনান এবং সারা সন্ধে ধরে অনেক রকম রান্না করেন। বেছে বেছে কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেও খাওয়ান— যদিও আগে থেকেই বলে দেন, আমি কিন্তু ভাই তোমার বাড়িতে কখনো খেতে যাবো না, সে ব্যাপারে কিছু মনে করতে পারবে না। দু'একদিন আমাকেও রান্না করে খাইয়েছিলেন বটে, কিন্তু লোকটির সংসর্গ আমি খুব বেশিদিন পছন্দ করতে পারি নি।

পরপর কয়েকদিন বেশ কয়েকজনই আমাকে বলছিল, আমার নাকি মুখটা খুব শুকনো শুকনো। অসুস্থের মতন দেখাচ্ছে। অসুখটার নাম হোম সিকনেস।

রাধারমণ ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাইটি, বাড়ির জন্য খুব মন কেমন করছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, দাদা, আর ভালো লাগছে না থাকতে। নেহাৎ দৈব দুর্বিপাকে এখানে এসে পড়েছি!

অভিজ্ঞভাবে হেসে বললেন, হয়–হয়, ওরকম হয়। প্রথম একটা বছর এরকম হয়, কিছুতেই মন টেকে না! তারপর যেই একটা বছর পার হয়ে যায়, তখন আর কেউ এসব দেশ ছেড়ে যেতেই চায় না। ভিখিরির মতন মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, তাও সই!

— আপনার ক' বছর হলো?

— সাড়ে চার বছর। ঠিক হিসেব করলে চার বছর আট মাস। এরপর কিছুদিন ক্যানাডায় কাটিয়ে আসতে হবে। আমার ভাই সাফ–সাফ কথা। পিঁপড়ের মতন টিপে–টিপে টাকা জমাচ্ছি, যেদিন এক লাখ ডলার জমবে, সেইদিনই পিঠটান দেবো। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাবো!

— আমার এক বছরও কাটবে না।

— দেখা যাবে। ওরকম অনেক শুনেছি। প্রথম–প্রথম এসে সবাই বলে।

— আমি ফিরবোই!

— ঠিক আছে, বাজি রইলো!

প্রত্যেকদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি, আমি দেশে ফিরে গেছি! কফি হাউসে বন্ধুদের আড্ডায় হাজির হয়েছি হঠাৎ। সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে, আরেঃ! কিংবা এসপ্লানেড থেকে বাসে ঝুলতে–ঝুলতে যাচ্ছি ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে, পকেটে তখনও আমার পাসপোর্ট আর প্লেনের টিকিট।

টেবিলের ওপর সত্যিই আমার রিটার্ন টিকিট পড়ে আছে। যে-কোনো দিন ফিরে যেতে পারি কলকাতায়। সত্যি যে ঝোঁকের মাথায় চলে যাই নি, তার কারণ পল ওয়েগনার এর মধ্যে আমার একটা নেমন্তন্নের ব্যবস্থা করেছে অ্যারিজোনায়। বেশ দূরের পথ। বেড়াবার নেশা আছে আমার, সেই টানে খানিকটা উত্তেজিত বোধ করি আবার।

মার্গারিটের সঙ্গে দু'তিনবার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে। যখনই দেখা হয়েছে, ও উৎফুল্লভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি সেই নরম

হাতটা ধরে মৃদুভাবে বলেছি—ভালো আছো ? ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার সামান্য অপরাধবোধ হয়। মার্গারিট বলেছিল, আবার আমার বাড়িতে কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য আসবে ! কিন্তু আর আসে নি, আমিও আসতে বলি নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'একদিন অন্তর কিছুক্ষণের জন্য যাই। বাকি সময়টা ঘরে শুয়ে থাকি। পল ওয়েগনারকে জানিয়ে দিয়েছি যে সেই প্রবন্ধটা লেখার কথা চিন্তা করে যাচ্ছি ! লাইব্রেরি থেকে একদিনে সত্তরখানা বই এনে সাজিয়ে ফেলেছি ঘর। পড়ার জিনিসের অভাব নেই। তবু নিঃসঙ্গতা কাটে না। পূর্ব দিকের জানলাটার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ঐ দিকে কলকাতা।

ডোরির সঙ্গে এক শনিবার সন্ধেবেলা ডেটিং করা ছিল আগের থেকেই। সেটা রাখতেই হয়। কিন্তু ডেটিং-এর অনুষ্ঠান কী ? যাদের গাড়ি আছে তারা চলে যায় খানিকটা দূরের কোনো শহরে, সিডার র‍্যাপিডস কিংবা ডেময়নসে। অথবা কোনো খোলা মাঠের মুভিতে, যেখানে গাড়িতে বসে বসেই সিনেমা দেখা যায়। সিনেমা কেউ বিশেষ দেখে না, গাড়ির মধ্যে চুমু আর জড়াজড়িতেই কেটে যায়। ডোরি বা আমার গাড়ি নেই। সুতরাং এখানেই রাস্তায়-রাস্তায় একটু বেড়ানো, তারপর কোনো হোটেলে খেতে যাওয়া। খাওয়ার পর ডোরি বললো, চলো, আমার ফ্ল্যাটে চলো, সেখানেই গল্প করা যাবে।

ডোরির ঘরটা অ্যাটিকে। অর্থাৎ ছাদের ওপর তিনকোনা ঘর। খুবই ছোট। তবু প্রচুর জিনিসপত্র সাজিয়েছে। সোফা নেই, বিছানা পাতা। সেখানেই আমাকে বসার ইঙ্গিত করে বললো, বী কমফর্টেবল !

দেরাজ খুলে ডোরি একটা নতুন ব্র্যান্ডির বোতল বার করলো। দুটো গেলাসে ঢেলে বললো, মার্গারিট এর মধ্যে তোমার কাছে গিয়েছিল ?

খানিকটা শঙ্কিতভাবে বললাম—হ্যাঁ। মার্গারিট কি ডোরির কাছে কিছু নালিশ করেছে ? বলেছে যে ভারতীয়রা কোনো ভদ্রতা জানে না ? এতোকাল গল্প-উপন্যাসে পড়ে এসেছি যে ফরাসি মেয়েদের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। তারা যখন-তখন যার তার সঙ্গে—।

ডোরি বললো, মার্গারিট খুব ভালো মেয়ে। বড্ড বেশি ভালো। ও এই পৃথিবীর কোনো নিয়ম-কানুন জানে না।

আমি চুপ করে রইলাম। ডোরি একেবারে আমার গা ঘেঁষে বসে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল। ডোরির সেইরকম প্রায় বুক খোলা জামা। গা থেকে দামী পারফিউমের সুগন্ধ ভেসে আসছে। আগে লক্ষ্য করি নি ওর পা থেকে উরু পর্যন্ত স্কিন-কলার মোজা পরা। ও আমার বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি এত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছো কেন ? রিলাক্স।

আগের দিন যাকে চুমু খেয়েছি, তাকে আজও নিশ্চয়ই খাওয়া যায়। কিন্তু তারপর কতোটুকু ? কোন জায়গায় গিয়ে বলবে—ছিঃ, তোমরা ভারতীয়রা ভদ্রতা জানো না।

দু'তিন গেলাস ব্র্যান্ডি খেয়ে অনেকখানি জড়তা কেটে গেল। তখন মনে হলো, দরজা-বন্ধ ঘরে বিছানার ওপর পাশাপাশি বসে ব্র্যান্ডি খাওয়ার একটাই মানে হতে পারে। নারী-পুরুষের মধ্যে যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক। ডোরিই আমার সঙ্গিনী। ডোরিও তো কম সুন্দরী নয়। শুধু তার মুখে একটা উগ্র বুদ্ধির ছাপ। তার স্বাস্থ্য যতোটা উপছে উঠেছে, ততোটা কমনীয়তা নেই। তাতে কি আসে যায় ! মুখটা ঝুঁকিয়ে আমি ডোরির ঘাড়ে চুমু খেলাম।

ডোরির ডান হাতে সিগারেট ছিল, সেই হাতটা উঁচু করে বগলটা দেখিয়ে বললো, এখানে একটা—আই লাভ ইট বেস্ট হিয়ার।

সেখানে মুখ রেখে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ডোরি বললো, তোমার জ্যাকেটটা খুলে ফেল।

আর বেশি দূর এগুবার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ডোরি টেলিফোন ধরে বললো—ইয়া, আছে... নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, খুব খুশির সঙ্গে... কাম অন আপ—ফোন ছেড়ে ডোরি বললো, এ বাড়ির নিচতলা থেকেই একজন ফোন করছে। ওদের রুজ ফুরিয়ে গেছে—এখন তো দোকান বন্ধ—ওরা ওপরে আসছে, উই'ল হ্যাভ মোর ফান।

ওরা না আসা পর্যন্ত আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বনে নীরব হয়ে রইলাম। তারপর দরজা খুলে দিতে হলো।

ওরা চারজন, দু'টি ছেলে, দু'টি মেয়ে। রীতিমতন নেশাচ্ছন্ন। পোশাক দেখলেই মনে হয়, দারুণ জড়াজড়ি চলছিল। ডোরি আরও গেলাস বার করলো। ওরা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠলো বিছানায়। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। তারপরই এক একটা ছেলে এক একটা মেয়েকে বুকে নিয়ে বসলো। ডোরিও মাথা হেলালো আমার বুকে। এক বোতল ব্র্যান্ডি শেষ হয়ে যাবার পর ডোরির দেরাজ থেকে আর একটা বোতল বেরুলো। লজ্জা নামক জিনিসটার কোনো অস্তিত্বই নেই। বরং অপরের চোখের সামনে চুম্বন-আলিঙ্গনেই যেন বেশি আনন্দ।

একটা ছেলে হঠাৎ জড়ানো গলায় বললো, স্ট্যাম্প জমাবার মতোন ডোরির স্বভাব হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রেমিক সংগ্রহ করা। লাস্ট সেমেস্টারে ডোরির একজন ইজিপশিয়ান প্রেমিক ছিল না ? তার আগে একজন স্প্যানিশ, একজন জাপানি, ফিনল্যান্ডেরও একজন ছিল না ডোরি ?

ডোরি হাসতে লাগলো। মেজাজটা একটু খিঁচড়ে গেল আমার। আমি কি একটা ভারতীয় ডাকটিকিট ? কিছুক্ষণ বাদে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমার বাড়ির সামনে দরজার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তাকে দেখে আমি চমকে উঠে বললাম, আরেঃ, আপনি আমাকে খুঁজছেন নাকি ?

সে বললো, না তো, আমি তো এই বাড়িতেই থাকি ! আপনি ?

আশ্চর্য, লোকটিকে আমি আগে থেকেই চিনি, আমাদেরই বিভাগের একজন, পোল্যান্ড থেকে এসেছে। ওর নামের পদবিতে তিনটে জেড থাকায় প্রথমে আলাপ করতে ভয় পেয়েছিলাম। পুরো নাম ক্রিস্তফ জারজেলকি। ওয়ারশ শহরে অনুবাদকের কাজ করে। এক বছরের জন্য এখানে এসেছে। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখের চামড়া কোঁচকানো, গলার আওয়াজ ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু লোকটি মোটেই বৃদ্ধ নয়, বছর ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বয়েস। একই বাড়িতে দু'জনে থাকি, তাও জানি না। ও থাকে ঠিক আমার ঘরের নিচেই।

ক্রিস্তফ বললো, ঘরটা বড্ড স্টাফি লাগছে, তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এখানে বড্ড লোনলি লাগে। তোমার লাগে না ?

অভ্যেসবশে ডানদিকে ঘাড় হেলালুম। এরা ঘাড় হেলোবার মানে বোঝে না। আমরা যেমন মাদ্রাজীদের দু'দিকে ঘাড় হেলিয়ে না বলার মানে বুঝতে পারি না।

ক্রিস্তফ বললো, এসো। আমার ঘরে এসে একটু বসবে ? হোয়াইট রাম আছে, যদি পছন্দ করো—

মোহময়ী নারীর সান্নিধ্য ছেড়ে এসে এখন এই বৃদ্ধ চেহারার লোকটির সঙ্গে আড্ডা। তবু রাজি হলাম। খানিকটা বাদেই অবশ্য বেশ ভালো লেগে গেল। লোকটি বেশ সিরিয়াস ধরনের, বিশ্বসাহিত্য মোটামুটি পড়া আছে, কথাবার্তায় এলোমেলো ভাব নেই।

এরপর ক্রিস্তফের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মাঝে-মাঝেই ওপরে চলে আসে আমার ঘরে। ও আমারই মতন একাকিত্বের রোগে ভুগছে।

অ্যারিজোনার নেমন্তন্নর পাকা চিঠিটা এখনো আসছে না। রোজই অপেক্ষা করছি। পল ওয়েগনার মাঝে-মাঝেই অন্য জায়গায় বক্তৃতা দিতে যায়। আয়ওয়ায় থাকলে প্রায়ই নেমন্তন্ন

করে ওর বাড়িতে। অন্যদের বদলে আমাকেই যে বেশি নেমন্তন্ন করে তার কারণ ওর স্ত্রী মেরি এখনো আমার ওপরে রাগ করে নি বা একদিনও মারতে আসে নি। লোকমুখে শুনেছি, মেরির মাথার গোলমাল আছে, কখন কি কাণ্ড করবে তার ঠিক নেই।

পল বুঝে গেছে, বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আমার স্বভাবে নেই। তাই মাঝে–মাঝে জোর করে বড়–বড় পার্টিতে নিয়ে যায়। বড় পার্টি আমার বিরক্তিকর লাগে।

ইংরিজি বিভাগের অধ্যক্ষ একটা খুব বড় পার্টি দিচ্ছেন, আমারও নেমন্তন্ন এসে গেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, যাবো না। ক্রিস্তফ সেদিন সন্ধেবেলা সেজেগুজে এসে বললো, কই, তুমি এখনো তৈরি হও নি ?

আমি যাবো না শুনে সে রীতিমতন অবাক। প্রায় আমার অভিভাবকের মতন ধমক দিয়ে বললো, কেন যাবে না ? এর কোনো মানে হয় ? এই পার্টিগুলোই তো আমেরিকার একটা প্রধান চরিত্র–চিহ্ন। এইসব পার্টিতে লোকজনের সঙ্গে মিশলে এদের ভালো করে চেনা যায়। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও!

অগত্যা যেতেই হলো। বিরাট ব্যাপার, অন্তত শ'খানেক নারী–পুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফদের মধ্যে বোধহয় সকলেই উপস্থিত। ডোরি এবং মার্গারিটকেও দেখলাম।

অতিথিদের বয়েস একুশ থেকে ষাট–পঁয়ষট্টি পর্যন্ত। কিন্তু কারুর সামনেই কারুর কোনো আড়ষ্টতা নেই। কেউ এখানে লুকিয়ে মদ বা সিগারেট খায় না। সবাই সবার নাম ধরে ডাকে। এ জিনিসটা তো আমাদের দেশে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। অথচ এখানে কেউ তো কারুর প্রতি অসৌজন্য দেখাচ্ছে না।

তিন–চারখানা ঘরে পার্টিটা ছড়ানো। পার্টির দিন এরা গোটা বাড়িটাই উন্মুক্ত করে দেয়। এক–একটা ঘরে এক–এক রকমের আড্ডা। এখানে কেউ কারুকে এড়িয়ে যায় না। একদম কোনো অচেনা লোকও সামনাসামনি পড়ে গেলে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে শুরু করে। আমি ডোরি আর মার্গারিট যে ঘরে, সেদিকেই বারবার ঘুরে যাচ্ছিলাম।

খাওয়া–দাওয়ার পর অনেকে নাচ শুরু করলো। আমি দর্শকদের দলে। কিন্তু ক্রিস্তফের খুব উৎসাহ নাচের ব্যাপারে। পুরোনো ইওরোপীয় কায়দায় সে এক–একজন যুবতীর সামনে গিয়ে বাউ করে বলছে—মে আই ? মেয়েদের শরীর ছুঁয়ে ও নিঃসঙ্গতা কাটাতে চায়। মুশকিল হচ্ছে এই, বেচারাকে সবাই বুড়ো ভাবছে। মেয়েরা বদলে যাচ্ছে বারবার। তবু ক্রিস্তফ একটুও দমছে না। একবার মার্গারিটকে পেয়ে ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। একে সুন্দরী, তার ওপরে ফরাসি। পোল্যান্ডের লোকেরা সবাই কিছু–কিছু ফরাসি জানে। ক্রিস্তফ ওর সঙ্গে গড়গড় করে ফরাসিতে কথা বলার শুরু করলো, তারপর নাচের অনুমতি চাইলো।

একটু বাদে ডোরি এসে বললো, এই, তুমি নাচবে না ?

আমি বললাম, আমি তো নাচ জানি না!

— তাতে কি হয়েছে ? গোমড়া মুখে বসে আছো কেন ? উঠে এসো, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

ডোরি আমার কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলো না। হাত ধরে টেনে তুলে বললো, শক্ত কিছু নয়, শুধু বিটটা মিলিয়ে যাবে, আর দেখবে আমি কী রকম পা ফেলছি।

আনাড়ির মতন কয়েকবার ডোরির পা মাড়িয়ে দিলাম। অনেকবার এমনভাবে জড়াজড়ি হয়ে গেল, যেন মনে হবে আমি ইচ্ছে করেই করছি। ডোরি তবু আমাকে স্তোক দিয়ে বলতে লাগলো, ঠিক আছে, এতেই হবে, এই তো হচ্ছে, তোমার হাতটা আমার কোমরের কাছে দাও—

দেখলাম, অল্প দূরে ক্রিস্তফ নাচছে মার্গারিটের সঙ্গে। কেন যেন বুকের মধ্যে জ্বালা করতে লাগলো। এর মানে কি ? আমিও তো আরেকজনের সঙ্গে নাচছি ! তবু আমার হিংসে হবে

কেন ?

রাত দুটো বাজে, পার্টি তখনও সমান উৎসাহে চলছে। মনে হয় সারারাত চলবে। আমার পক্ষে আর বেশিক্ষণ থাকা বিপজ্জনক। রন কুলিজ নামে একটি ছেলে আমার হাতের গেলাস খালি দেখলেই বার-বার জোর করে হুইস্কি ভরে দিচ্ছে। মাথাটা বেশ টলটলে লাগছে, আর একটুতেই বেশি নেশা হয়ে যাবে। সে ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। বড় পার্টিতে কারুর মাতাল হয়ে পড়া রীতিমতন নিন্দনীয় অপরাধ। আগে আমার ধারণা ছিল আমেরিকান মাত্রই বদ্ধ মাতাল। এখানে এসে দেখছি, যে-কোনো পার্টিতে শতকরা অন্তত ত্রিশজন লোক অ্যালকোহল স্পর্শ করে না। সামাজিকভাবে মদ্যপান এখানকার সভ্যতার একটা অঙ্গ হলেও যে-কোনো মাতালকে সবাই ঘৃণা করে। ছোটখাটো নিজস্ব আসরে যা খুশি চলতে পারে—বড়-বড় পার্টিতে একটা সীমারেখা থাকেই।

কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম। একটু বাদে পেছনে পায়ের শব্দ। একটি মেয়ে আসছে। মার্গারিট। ওর জন্য অপেক্ষা করলাম, কাছে আসবার পর বললাম, তুমি এতো তাড়াতাড়ি চলে এলে যে ?

মার্গারিট বললো, কাল ভোরবেলা আমাকে চার্চে যেতে হবে! কিন্তু তুমি এলে কেন ?'

— আমার আর ভালো লাগছিল না।

— আমারও না।

— চলো, তোমাকে পৌঁছে দি।

— আমাকে পৌঁছে দেবে ? কিন্তু আমি যে অনেক দূরে যাবো।

— কেন, হস্টেলে ফিরবে না ?

— না। আমি অনেকদিন ধরে বব্ বাকল্যান্ডদের বাড়িতে থাকছি। ওরা সন্ট্‌লেক সিটিতে গেছেন তো, আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

আমি হেসে উঠে বললাম, রাত দুটো পর্যন্ত তুমি বাইরে, তাহলে কীরকম বাড়ি পাহারা দিচ্ছো ?

মার্গারিট বললো, পাহারা মানে কি ? ওদের একটা কুকুর আছে, সেটাকে খাবার দেওয়া, সকালবেলা একজন লোক বাগানে জল দিতে আসে, তাকে গেট খুলে দেওয়া। এখানে চুরি তো হয় না। আমি প্রায় দেড় বছর আছি তো, কোনোদিন কোনো বাড়িতে চুরির কথা শুনি নি। এরা এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না—ব্যাঙ্ক ডাকাতি, হাইজ্যাকিং বা কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারেই চোর-ডাকাতরা ব্যস্ত।

— তবু একদম ফাঁকা বাড়িতে তুমি একলা থাকো, তোমার ভয় করে না ?

— না, ভয় কি!

দারুণ নির্জন রাস্তা। বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ি প্রায় দু'আড়াই মাইল দূরে। একবার পৌঁছে দেবো বলেছি। দূরত্বের কথা শুনে তো পিছিয়ে আসা যায় না। এই গভীর রাত্রে এতোখানি নির্জন রাস্তা এই মেয়েটি একা যাবে ভেবেছিল। চুরি না হলেও নারীহরণের ঘটনা এখানে সুবিদিত। ফাঁকা রাস্তায় একলা মেয়ে দেখলে যখন-তখন কোনো গাড়ি তাকে জোর করে তুলে নেয়। তারপর কিছু দূর গিয়ে মেয়েটাকে একেবারে ছিবড়ে করে কোনো ফাঁকা জায়গায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে যায়। অধিকাংশ সময়েই মৃত অবস্থায়।

বললাম—চলো—

— তুমি আবার অত দূর থেকে একা ফিরবে ?

— তাতে কি হয়েছে ?

দু'জনে রাস্তার খুব ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে-মাঝে দু'একটা অতিকায় ট্রাক এমন উল্কার বেগে ছুটে যায় যে, সামনে কোনো হাতি পড়লেও বোধহয় গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

কিছু দূর গিয়ে বললাম, তুমি বুঝি প্রতি রবিবার চার্চে যাও!

মার্গারিট হেসে বললো, না। যাওয়া উচিত, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমার বাবা-মা জানতে পারলে খুব শক্ড হবেন। জানো তো আমরা রোমান ক্যাথলিক। আমাদের পরিবার বেশ গোঁড়া, আমার দু'বোন নান্ হয়েছে। আমার ছোটবোন জান্ তো মাত্র গত বছর কনভেন্টে যোগ দিল। শুধু আমিই বাইরে—আমি ততোটা ধার্মিক হতে পারি নি।

— তোমার কোনো ভাই নেই?

— একজন দাদা ছিল, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার-এ মারা গেছে। রেজিস্টান্স মুভমেন্টে ছিল।

— ও।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগলাম। সামনেই আয়ওয়া নদীর ব্রিজ। ছোট নদী, কিন্তু ব্রিজটা বেশ চওড়া। ব্রিজ পেরুলেই জাতীয় হাইওয়ে। আমরা ডান দিকে যাবো। যত দূর দেখা যায় সোজা রাস্তা। দু'পাশে উঁচু-উঁচু গাছ। অবিরল পাতা খসে-খসে পড়ছে। বাতাসে রীতিমতন শিরশিরে ভাব। শীত এসে গেল বলে। কোটের তলায় একটা সোয়েটার পরে আসা উচিত ছিল, টাই বিসর্জন দিয়েছি বলে আরও ঠাণ্ডা লাগছে।

মার্গারিট বললো, তুমি কিন্তু বড় কম কথা বলো!

— তুমিও তো!

— আমি কী বলবো! আমি তো তোমার দেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। যদিও জানতে ইচ্ছে করে—

— আচ্ছা মার্গারিট, তুমি তোমার দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছো কেন?

— ব্যাপারটা খুব হাস্যকর, তাই না? আমি ফরাসি ভাষায় পোস্ট ডক্টরেট করছি, তা তো সোরবোর্নেই করা উচিত ছিল, আমেরিকায় ছোট একটা জায়গায় কেন? কিন্তু সোরবোর্নে পড়ার মতন টাকা কোথায়? আমার বাবা তো রিটায়ার্ড। আমেরিকায় অনেক স্কলারশিপ পাওয়া যায়, তাছাড়া এরা এ্যাসিস্ট্যান্টশিপও জোগাড় করে দেয়, যেমন আমি গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়াচ্ছি, আরও ছোটখাটো কাজ করি, খরচ উঠে যায়। তাছাড়া এখানকার ফরাসি ডিপার্টমেন্টটা কিন্তু সত্যি ভালো। প্রফেসার অ্যাসিপেলের খুব নাম আছে।

— তুমি ইংরেজি শিখলে কোথা থেকে? ফরাসিরা তো ইংরিজি ভাষাকে খুবই অবজ্ঞা করে শুনেছি।

— তা করে। বোকার মতন করে। আমি ছেলেবেলায় প্রায়ই লন্ডনের কোনো ইংলিশ ফ্যামিলিতে গিয়ে থাকতাম—তাদের বাচ্চাদের ফরাসি শেখাবার জন্য। আমারও ইংরিজিটা মোটামুটি শেখা হয়ে গেছে। এবার তোমার কথা বলো!

হাসপাতাল ভবনটির পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম কথা বলতে বলতে। এ পর্যন্ত একজনও পথচারীর সন্ধান আমরা পাই নি। এতখানি রাস্তা এই মেয়েটা একা একা হেঁটে আসতো কি করে? কথা বলতে-বলতে তবু সময় কাটে এবং পথ ফুরোয়।

বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ি পৌঁছে গেছি। বাড়িটা খুব বড় না হলেও বাগানটা দেখবার মতন। চারপাশে ফাঁকা। পেছন দিকে অনেকগুলো বড়-বড় ঝাউ গাছ। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুব চেনা একটা চাঁদ। চাঁদের ধূসর আলোয় বাড়িটা দারুণ গম্ভীর আর নিঃসঙ্গ মনে হয়। এই বাড়িতে এই সরল মেয়েটা একা থাকবে। এরা সব পারে।

শুভরাত্রি বলবার বদলে বললাম—বঁ নুই।

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ফরাসি জানো ?

হেসে উত্তর দিলাম, একটা–আধটা শব্দ কে না জানে ?

— কিন্তু আমি তো বাংলা একটা অক্ষরও জানি না !

— বাংলা তো অনেক অজানা ভাষা !

— মোটেই না। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি এনসাইক্লোপিডিয়া দেখেছি। ফরাসি যতো লোকের মাতৃভাষা, তার চেয়েও অনেক বেশি লোক বাংলায় কথা বলে। ইন্দো–ইওরোপিয়ান ভাষায় কনিষ্ঠা কন্যার নাম বাংলা। তোমাদের ভাষায় এক কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

— তুমি তো অনেক কিছু জেনে ফেলেছো দেখছি। তুমি রোম্যাঁ রলাঁর লেখা পড়ো নি ?

— কে ?

— রোম্যাঁ রলাঁ ?

মার্গারিটের মুখে সাকোনতাল শুনে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, ওরও অবস্থা অনেকটা তাই। একটু চিন্তা করে বললো, ও, তুমি হোম্যাঁ হ্রলাঁর কথা বলছো ? কেন, কি হয়েছে ?

— উনি আমাদের রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দর জীবনী লিখেছেন।

— হ্যাঁ, একটু–একটু শুনেছি বটে। তুমি পাগল হয়েছো ! হোম্যাঁ হ্রলাঁর লেখা এখন কেউ পড়ে ? জাঁ ক্রিস্তফই এখন পড়া যায় না! উনি তো এক পম্পাস পাদ্রি।

রাত অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তবু ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর কেউ জেগে নেই এখন।

— তুমি আমাকে একটা অন্তত বাংলা কথা শিখিয়ে দাও না!

— কোন্ কথাটা বলো ?

— আমুর। লাভ!

— ওর বাংলা হচ্ছে ভালবাসা।

মার্গারিট তিন–চারবার উচ্চারণ করলো—বা–লো–বা–শ্যা! ওর পাতলা ঠোঁটে ঐ শব্দটা কী মধুর শোনায়! কিন্তু আর নয়। এরকমভাবে রাত কেটে যাবে। বললাম, এবার আমি চলি!

ও বললো, তোমাকে এতটা রাস্তা এখন একলা ফিরতে হবে! চলো, আমি তোমাকে আবার একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

— না, না, না!

— চলো না, একটুখানি ।

খানিকটা পথ গিয়েই আমি থেমে পড়ে বলি—ব্যাস, আর না। ও বলে, আর একটুখানি, আর একটু। দেখতে–দেখতে অনেকটা চলে এলো। তখন আমি দৃঢ়ভাবে বললাম—না, আর কিছুতেই না! তাহলে আমি যাবো না।

মার্গারিট হেসে বললো, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো—অ রেভোয়া!

আমিও ওর হাত চেপে ধরে বললাম—অ রেভোয়া!

তবু এখানেই শেষ হলো না। আমার হাতটা ছুঁয়েই মার্গারিট বললো, ইস, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা! নিশ্চয়ই তোমার খুব শীত করছে। এতোক্ষণ বলো নি কেন ?

— না, না, এমন কিছু না।

— হ্যাঁ, এমন কিছু ! তোমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ওর গলায় একটা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা। সেটা ঝট করে খুলে দিয়ে বললো, তুমি এটা নিয়ে

যাও!

— না, দরকার নেই, সত্যি বলছি দরকার নেই।

— তুমি বুঝতে পারছো না। এই সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায় !

— কিন্তু তুমি যে আবার এতোটা পথ ফিরবে, তোমার যদি ঠাণ্ডা লাগে ?

— আমার কিছু হবে না।

— তা হতে পারে না। এক কাজ করা যেতে পারে। তোমাকে আমি আবার বব্ বাকল্যান্ডের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। ততোক্ষণ তুমি এটা পরে থাকো, তারপর আমি নিয়ে যাবো।

— তাতে কি লাভ হবে ? তোমার আরও বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা লাগবে।

মার্গারিট আমার কথা না শুনলেও আমি ওর হাত ধরে টানতে লাগলাম। ওকে দিয়ে আসবোই আবার বাড়ির কাছে।

ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি এসে আমাদের কাছাকাছি থামলো। নির্জন রাস্তায় প্রায় শেষ রাত্রে আমি একটি তরুণীর হাত ধরে টানছি—এ দৃশ্য রোমাঞ্চকর নিশ্চয়ই! আমি কাঠ হয়ে দাঁড়ালাম। ওদের কাছে সবসময় বন্দুক-পিস্তল থাকেই, কী করে আমি আমার সঙ্গিনীকে রক্ষা করবো!

গাড়িটা আসলে পুলিশ পেট্রল। মুখ ঝুঁকিয়ে একজন মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলো, এনি ট্রাবল, কিড ?

ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকারীরা কোনো কর্তৃপক্ষকে সহজে সহ্য করে না মনে হলো। মার্গারিট ঝাঁঝালো গলায় বললো, নো ট্রাবল! ইউ গো টু হেল!

মেয়েটার সাহস দেখে আমি চমৎকৃত। মার্কিনী পুলিশ ট্রিগার-হ্যাপি হিসেবে কুখ্যাত। তাদের মুখের ওপর এমন কথা! আমার মুখের ওপর একজন টর্চ ফেললো। ভয়ে আমার ভেতরটা শিরশির করছে। আমি শ্বেতাঙ্গ নই, এটাই যদি আমার প্রধান অপরাধ হয়! কালো লোক হয়ে আমি একটি শ্বেতাঙ্গিনীর হাত ধরে টেনেছি!

এবার মার্গারিটই আমার হাত ধরে ঝটকা টান দিয়ে বললো, চলো!

পুলিশের গাড়িটা তবু কুকুরের মতন আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগলো।

আবার মার্গারিটই দাঁড়িয়ে পড়ে বকুনি দিয়ে ওদের বললো, হোয়াই ডোন্ট য়ু লিভ আস অ্যালোন ?

এবার গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। আমি মিনমিন করে বললাম, তোমার তো খুব সাহস!

মার্গারিট বললো, তুমি জানো না, ওদের একদম পাত্তা দিতে নেই। কেন, তুমি কি ওদের ভয় পাও নাকি ?

— আমার একটু-একটু ভয় করছিল। কারণ আমি কালো লোক।

— ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।

আবার আমরা হাঁটতে-হাঁটতে সেই বাড়ির সামনে পৌঁছোলাম। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, আগে তুমি গেটের মধ্যে ঢোকো, তারপর আমি যাবো।

ভেতরে ঢুকে ও গেটে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। আমি ওর চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, আজ রাতটা খুব সুন্দর কাটলো।

— আমারও।

ওর হাতটা একবার ছুঁয়েই আমি হাঁটতে লাগলাম পেছন ফিরে। স্কার্ফটা জড়িয়ে নিলাম গলায়। তাতে একটা ক্ষীণ গন্ধ। সেই গন্ধটা যেন আমাকে আদর করছে।

মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলাম। মার্গারিট তখনো দাঁড়িয়ে আছে। সাদা বাড়িটার পটভূমিকায়

যেন এক দেবদূতী। হাত তুলে নাড়লো একবার।

আমার মনে এক বিজয়ীর আনন্দ। আমি পেরেছি। আজ আমি ঠিক পেরেছি। এই নির্জন রাস্তায়, এমন নিশুতি রাত্রে এতক্ষণ আমি একজন রূপসী নারীর পাশে ছিলাম, তবু আমি সংযম ভাঙি নি। শুধু একটু হাতের স্পর্শ, আর কিছু না।

গলার স্কার্ফটায় হাত বুলোতে–বুলোতে বাকি রাস্তাটা প্রায় দৌড়ে চলে এলাম। বাড়িতে এসে জুতো খুলেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বিছানাটা কী ঠাণ্ডা!

৭

দু' চারদিনের মধ্যেই অ্যারিজোনার নেমন্তন্নর চিঠিটা এসে গেল। সঙ্গে প্লেন ভাড়া। যেতে হবে অ্যারিজোনার টুসন্ শহরে। বানান অনুযায়ী মনে হয় টাকসন, কিন্তু আসল উচ্চারণ টুসন্। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা আর কিছু অনুবাদ কবিতা পাঠ করতে হবে। বক্তৃতাটা এলেবেলে, বেশি করে কিছু অনুবাদ কবিতা পড়ে দেওয়া যেতে পারে। থাকার ব্যবস্থা ওরাই করবে।

পল ওয়েগনার বললো, তুমি যদি প্লেনের বদলে বাসে যাও তাহলে কিছু টাকা বাঁচিয়ে আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসতে পারবে।

সে তো আমি আগেই ভেবে রেখেছি। অ্যারিজোনা রাজ্যটি আমেরিকার প্রায় দক্ষিণ উপকূলে, আমি আছি মধ্য–দক্ষিণে, সুতরাং অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে আসা যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে আমার বাকি টাকাকড়ি সব তুলে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম।

সোজা গন্তব্যের দিকে যাওয়ার বদলে একটু এঁকেবেঁকে যাওয়াই আমার স্বভাব। প্রথমেই বাস ধরে চলে গেলাম শিকাগোতে। বাসগুলোর নাম গ্রে হাউন্ড। গর্জন করে পথ চলে। ভিড়ভাট্টার প্রশ্নই নেই, যতগুলো সিট, সেই ক'টা যাত্রী। এবং সিটগুলো ঠিক এরোপ্লেনের মতনই, এমনকি হাতলের সঙ্গে লাগানো অ্যাশট্রে পর্যন্ত। বেশিরভাগ বড় শহরেই এইসব বাসের স্টেশন আছে মাটির নিচে, প্রায় রেল স্টেশনের মতনই জমজমাট জায়গা।

হিটলার জার্মানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে সারা দেশ জুড়ে অটোবান বা বড়–বড় রাস্তা বানিয়েছিলেন। এখন রাস্তা নির্মাণে আমেরিকানরাও দারুণ মনোযোগী। সারাদেশ জুড়ে বিরাট–বিরাট রাস্তা এবং আশ্চর্য মসৃণ। কোনো–কোনো রাস্তায় চারটি করে লেন, কোনো গাড়ি সত্তর মাইলের কম গতিতে গেলেই পুলিশে ধরে। নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত তিন হাজার মাইলের রাস্তায় গাড়ি একবারও থামবার দরকার নেই, লেভেল ক্রসিং বা চৌরাস্তায় ট্রাফিক আলোতেও দাঁড়াতে হয় না, সেসব জায়গায় রাস্তাটা হয় ছাদে উঠে গেছে অথবা মাটির তলায় ডুব মেরেছে। যে-কোনো ছোটখাটো শহর বা গ্রামেও একই রকম পাকা রাস্তা। অবশ্য অধিকাংশ সেতু পেরুবার সময়েই ট্যাক্স দিতে হয়। সেই ট্যাক্সের টাকায় ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সেতু এবং রাস্তা।

এদেশের খাদ্য চলাচল করে প্রধানত ট্রাকে। ট্রাকের জিনিসপত্র অবশ্য তেরপল মোড়া নয়। অনেক ট্রাকের খোলই এয়ার কন্ডিশানড্, অথবা সেখানে ডিপ ফ্রিজ বসানো, যাতে মাছ–মাংসও টাটকা থাকতে পারে। এক–একটা রাজ্য এক–এক রকম খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়েছে। কোথাও হচ্ছে শুধু গম, কোথাও শুধু কমলালেবু, কোথাও পোলট্রি। এইজন্যই *ক্যালিফোর্নিয়ার* ডাকনাম অরেঞ্জ স্টেট, আয়ওয়ার ডাকনাম কর্ন স্টেট। সরকার পরীক্ষা করে খাঁটি বলে নির্দেশ না দিলে কোনো খাদ্যই বাজারে আসতে পারে না—এবং সারাদেশে সব জায়গায় খাদ্যের এক

দাম। উত্তরপ্রদেশ থেকে সস্তা দামে শর্ষে কিনে কলকাতার বাজারে বেশি দামে বিক্রি করার কায়দা এদেশে অচল। এখানে গরিব ও বড়লোকের প্রভেদটা অত্যন্ত প্রকট। গরিব অত্যন্ত গরিব এবং বড়লোকেরা যাচ্ছেতাই রকমের বড়লোক। তবে, আমাদের দেশের সঙ্গে তফাত এই যে, গরিব আর বড়লোকদের দৈনন্দিন খাবারদাবার প্রায় এক। বড়লোকরা শুধু একটা ছবি কেনবার জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে কিংবা নিজস্ব এরোপ্লেনে চেপে ফুটবল খেলা দেখতে যায়। কিন্তু অত্যন্ত গরিবও দু'বেলা মাংস-রুটি খেতে পায়। এদেশে কিছু ভিখিরিও আছে, কিন্তু তাদের গায়ে অটুট ওভারকোট এবং তাদের রান্নাঘরে রেফ্রিজারেটর থাকে। পরে এক সময় আমি ঐরকম একজন ভিখিরির ঘরে কয়েকদিন ছিলাম।

আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, বাসে, ট্রেনে কিংবা সিনেমা হলে গরিব আর বড়লোককে পাশাপাশি বসতেই হবে। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের ব্যাপার নেই কোথাও। উত্তরের রাজ্যগুলোতে অন্তত, নিগ্রো আর সাদারাও পাশাপাশি বসতে বাধ্য।

আমেরিকানরা নিজেদের দেশে এরকম অনেক বিষয়ে সমতা বজায় রাখলেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসা করার সময়ে তারা একেবারে নৃশংস। অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় গমের উৎপাদন একটু কম হলেই সে বছর তারা সারা পৃথিবীর গমের বাজারে যেমন খুশি দর বাড়ায়। সেনেটর ফুলব্রাইট একবার অভিযোগ করেছিলেন যে, আমেরিকান ওষুধ ব্যবসায়ীরা ভারতে অন্তত চারশো গুণ বেশি দামে ওষুধ বেচে।

দুপুরে শিকাগোতে এসে পৌঁছোলাম। প্রথমদিন এই শহরে এসেছিলাম প্রায় ভিখিরির মতন। এবার তার শোধ নিতে হবে। যাকে বলে ডাউন টাউন অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রস্থলে সাউথ ওয়াবাস এভিনিউতে একটা ভালো হোটেলে উঠলাম, এবং কথায়-কথায় ট্যাক্সি। যতোদিন পয়সা থাকে নবাবী করা যাক্ না একটু। সবসময় টিপে-টিপে পয়সা খরচ করলে একটা মানসিক দৈন্য এসে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পাশে নিউইয়র্ক আর অন্যদিকে লস এঞ্জেলিস পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে সবসময়। মাঝখানে শিকাগো বসে আছে এক দৈত্যের মতন। মাফিয়াদের ঘাঁটি। এককালে বিখ্যাত দস্যু আল কাপন এই শহরটাকে পায়ের তলায় রেখেছিল। আবার নিগ্রো গুণ্ডাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রথম রাত্রেই একটি নাইট ক্লাবে আমার চোখের সামনে কয়েকজন নিগ্রোর মধ্যে ছুরি মারামারি হয়ে গেল। শিকাগোর জ্যাজ্ বাজনা বিখ্যাত, তাই শুনতে গিয়েছিলাম, শেষকালে দৌড়ে পালাবার পথ পাই না!

দু'তিন দিন থাকার পরেই শিকাগোর বৈচিত্র্য অনেক কমে যায়। পৃথিবীর বড়-বড় শহরগুলো খুব একটা আলাদা নয়। পার্ক স্ট্রিটকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাঁচ গুণ করতে পারলেই শিকাগোর রাস্তা হয়ে যায়। এত বড় সুন্দর পার্ক অবশ্য কলকাতায় নেই, কিন্তু দিল্লিতে আছে। লেক মিসিগান দেখলে সমুদ্রের কথাই মনে পড়ে। অন্যান্য চাকচিক্যও দু'দিনে পুরোনো হয়ে যায়, যেমন পঞ্চাশতলা মোটর গ্যারেজ কিংবা দোকানের ম্যাজিক ডোর—দরজার সামনে দাঁড়ালেই আপনাআপনি দরজা খুলে যাওয়া, কিংবা আকাশের গায়ে আলোয় বিজ্ঞাপন। চুম্বক ছাড়া আর কোনো বস্তুরই দীর্ঘস্থায়ী আকর্ষণ থাকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত থাকে মানুষ। এবং শহরে মানুষ কোথাও খুব আলাদা নয়।

শিকাগোর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ন্যাশনাল মিউজিয়াম। সেটা গোটা একদিন ধরে ঘুরে দেখে পরদিনই কেটে পড়লুম সেখান থেকে।

আবার যে-কোনো জায়গায় বাস ধরলেই হয়। তবে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম অ্যালাবামা, জর্জিয়া, মিসিসিপির রাস্তার দিকে কিছুতেই যাবো না। কালো লোক বলে যদি কেউ

মাথায় চাঁটি মারে কিংবা কোনো দোকানে ঢুকতে না দেয়, তবে সেই দণ্ডেই এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে ! প্রায়ই কাগজে এরকম ঘটনা পড়ি।

বাস ধরে চলে এলুম ক্যানসাস সিটি। তারপর উইচিটা। তারপর আরক্যানসস। এক একদিন এক এক জায়গায়। এও যেন সাঁওতাল পরগনায় ঘুরে বেড়াবার মতোনই। তফাত এই যে, সব জায়গাতেই একই রকম আরামদায়ক হোটেল। ঘুরতে-ঘুরতে আলবুকার্কে শহরে এসেই একটু অন্যরকম লাগলো। এখানে রাস্তাঘাটে অনেক রেড ইন্ডিয়ান দেখা যায়। পালকের মুকুট পরা নয় অবশ্য, সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরাই, তবু দেখলে চেনা যায়। শুনলাম কাছেই কোথাও ওদের এনক্লেভ আছে, অর্থাৎ ওদের জন্য আলাদা করা নির্দিষ্ট জায়গা—হলিউডের ফিল্ম কোম্পানিগুলো ছবি তুলতে এলে ওরা মুখে লাল রং মেখে মাথায় পালকের মুকুট পরে নেয়।

ইতোমধ্যে বাসে বা হোটেলে আমি অন্যদের কাছে পরিচয় দেবার সময় নিজেকে ইন্ডিয়ান বলা ছেড়ে দিয়েছি। কেউ বোঝে না। এখানে স্পষ্ট করে বলতে হয়, কামিং ফ্রম ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা। শুধু ইন্ডিয়ান বললে এখন আমেরিকার আদিবাসীদেরই বোঝায়। রেড শব্দটা উঠে গেছে। উচ্চারণটা অবশ্য একটু আলাদা, ইন্ডিয়ান নয়, ইনজান্ ! কী অবস্থা সে বেচারিদের ! ভূতপূর্ব জমিদার যদি বাড়ির দারোয়ান হয় সেই রকম। কলকাতা সমেত তিনখানা গ্রাম সাবর্ণ রায় চৌধুরীরা বেচে দিয়েছিল মাত্র তেরোশো টাকায়। সেইরকম নিউইয়র্ক নামের উপদ্বীপটিও ইন্ডিয়ানরা সাহেবদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল মাত্র ছাব্বিশ ডলারে।

কাছেই মেক্সিকো। আমেরিকার একটি রাজ্যের নামও নিউ মেক্সিকো। এখান স্প্যানিশ ভাষাও বেশ চলে। রেড ইন্ডিয়ান আর স্প্যানিশদের মিশ্রণে এখানে একটি সংকর জাতি তৈরি হয়েছে। তাদের চেহারা অনেকটা আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের মতোন। রাস্তাঘাটে অনেকে আমার দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে কী যেন বলতে শুরু করে দেয়, আমি এক বর্ণ বুঝি না। আমাকে বোকার মতন চুপ করে থাকতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করে—স্প্যানিওল স্প্যানিওল ? ওরা আমাকে জাতভাই ভেবেছে। আমি ঘাড় নেড়ে বলি—নো, ইংলিশ। আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওনলি ইংলিশ। কেউ-কেউ তখন বেশ রাগতভাবে তাকায়। ছাপরা জেলার কোনো লোক যেন কলকাতায় এসে বাবু সেজে জাতভাইদের চিনতে পারছে না !

মেক্সিকো ঘুরে আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার ভিসা নেই। ভিসা অফিসে গিয়ে শুনলাম, ওদিকে যেতে পারি বটে, কিন্তু এদিকে আর ফিরতে পারবো না। ওখান থেকেই বাড়ি যেতে হবে। সুতরাং যাওয়া হল না। নোগালিস নামে একটা শহরের অর্ধেকটা আমেরিকায়, অর্ধেকটা মেক্সিকোতে। সেই শহরেই একদিন ঘুরে বেড়িয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম। এ যেন শুধু ফুন্‌ট-শুলিং গিয়ে ভুটান দেখে আসা।

নোগালিস শহর থেকে আর বাস নয়, প্লেনে চাপলাম। কারণ টুসন্-এ আসল নিমন্ত্রণ-কর্তারা আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিতে আসছে। এইভাবে তাদের চোখে ধুলো দেওয়া। আমি যেখানে থেকেই যাই না কেন, প্লেন থেকে নামলেই তো হলো।

বিমানবন্দরে দেখলাম জাঁদরেল চেহারার এক মেমের পাশে আমার এক স্কুলের বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। সে যে এই দেশে আছে তাই জানতাম না। অন্তত পনেরো বছর দেখাই হয় নি। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের মুখ কেউ ভোলে না।

বাংলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কী রে সুবোধ ! তুই কী করে এলি ?

সুবোধ এক গাল হেসে বলল, আমি এসেছি তোকে চিনিয়ে দেবার জন্য। স্টুপিড, আমাকে চিঠি দিস নি কেন আসবার আগে ?

— কি করে জানবো, তুই এখানে আছিস ?

— আমি কি করে জানলুম জানিস ? এখানকার কাগজে তোর নাম ছাপা হয়েছে।

— তাহলে খুব ফেমাস হয়ে গেছি বল ?

— না রে গাধা। ইউনিভার্সিটিতে বাইরে থেকে যে-ই আসে, সভা–সমিতির কলমে তারই নাম ছাপা হয়।

খুব জমে গেল টুসন্-এ। শুধু পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই নয়। এখানকার লোকেরা খুব চট করে আপন করে নিতে জানে। নানান জায়গায় নেমন্তন্ন, পরের গাড়িতে খুব ঘুরাঘুরি। বক্তৃতার ব্যাপারটা দু'লাইনে সেরে এবং কাঁপা–কাঁপা গলায় কিছু কবিতা আবৃত্তি করে আমার দায়িত্বও চুকিয়ে দিলাম।

এখানকার কবি–লেখকদের প্রধান আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেমন্তন্ন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কবিতা পাঠ বা বক্তৃতা দিতে ডেকে তাদের পাঁচশো থেকে হাজার ডলার দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন জ্যান্ত লেখকদের গ্রাহ্যই করে না, মৃতদেরই শুধু কদর। এখানে ঠিক তার উল্টো। এখানে বেঁচে থাকাই প্রতিদিন একটা উৎসবের মতন, মৃত্যুকে এরা মনে রাখে না। মৃত্যু আসে এবং চলে যায়। তবু বাকি লোকদের কাছে জীবন প্রতিদিন আরও বেশি ফুল–ফল–পল্লবময়।

ড্যানি ডেনহাম নামে একটা ছেলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। তার বউয়ের নাম বারবারা। দু'জনেরই এমন চমৎকার স্বাস্থ্য যে মনে হয় বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় এরা যুগ্মভাবে প্রথম হবার যোগ্য। কেন যে কেঁচোর মতন মাস্‌লওয়ালা কিছু লোক ঐ সব প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর জেতে কে জানে !

ড্যানি ওদের বাড়িতে এক সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন খেতে গেলে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, রাজস্থানের মরুভূমিতে কত ফুট খুঁড়লে জল পাওয়া যায় বলতে পারো ?

এ আবার কী বিদঘুটে প্রশ্ন ? রাজস্থানের মরুভূমির কথা জানলোই বা কি করে ? সাধারণভাবে দেখেছি, আমেরিকানরা ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা এখনো সাউথ আফ্রিকার রাজধানীর নাম মুখস্থ করে—আর এখানে এরা অনেকে জানেই না বেঙ্গল পৃথিবীর কোথায়। এরা বেশি খবর রাখে নিজের দেশের। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অনেকখানি অজ্ঞ বলেই মনে করে, ওদের দেশটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা। আসবার পথে মিসিসিপি নদী দেখতে গিয়েছিলাম যখন, খুবই সুন্দর সেই নদীর দৃশ্য, তবু সেখানে এক প্রৌঢ়ের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল, এত বড় নদী আগে কখনো দেখেছো ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র দেখেছি। সেই প্রৌঢ় পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্রের নাম তো দূরে থাক, সম্ভবত চীনের হোয়াং হো বা ইয়াংসি কিয়াং–এরও নাম শোনে নি।

ড্যানির কথায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করায় বারবারা বললো, জানো না, ওর খুব মরুভূমি সম্পর্কে কৌতূহল। পৃথিবীর সব মরুভূমির খবর রাখে। ও মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে যায় কিনা!

—তাই নাকি ?

ড্যানি বললো, কালই তো আবার যাচ্ছি। তুমি যাবে ?

ওয়াইল্ড ওয়েস্টে স্বর্ণশিকারীদের সম্পর্কে অনেক গল্প পড়েছি, ছবিও দেখেছি। সেরকম এখনো চলে নাকি ? এই এক নতুন অভিজ্ঞতার সুযোগ ছাড়া যায় না। রাজি হয়ে গেলাম।

ড্যানির একটা স্টেশান ওয়াগন আছে, নানারকম রং করা। রৌদ্র–ঝলমল সকাল, তার মধ্যে দিয়ে গাড়িটা একটা অচেনা প্রাণীর মতন ছুটে যায়। প্রচুর হ্যাম সসেজ আর পাঁউরুটি নেওয়া হয়েছে, আর কয়েক ডজন বিয়ার। বারবারা যা পোশাক পরেছে, তাকে পোশাক না বলে পোশাকের অছিলা বলা যায়। ড্যানি পরেছে একটা শর্টজ আর খালি গা। বারবারারও খালি

গা-ই প্রায়, শুধু ফিতের মতন একটা ব্রা–তে প্রগল্‌ভ স্তন দু'টিকে আটকে রাখার চেষ্টা। আমি আলবুকার্কেতে ব্লু জিন্‌স আর গেঞ্জি কিনেছিলাম, তাই পরে এসেছি। গাড়ির সামনের সিটেই আমরা তিনজন। প্রথম–প্রথম বারবারার শরীরের সঙ্গে ছোঁয়া লাগায়, যাকে বলে আমার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠছিল এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছিল। বারবারার দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলাম না। খানিকটা বাদে কিন্তু সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আকাশের নিচে, খোলা মাঠের মধ্যে আমরা প্রকৃতির সন্তান, পোশাকের বাহুল্যের প্রয়োজনটা কি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মরুভূমিতে। এ মরুভূমি অবশ্য অন্যরকম, নিছক বালির সমুদ্র নয়। অসমতল বিরাট প্রান্তর, কোথাও বালি, কোথাও পাথুরে মাটি। কিছু দূর–দূর অন্তর প্রহরীর মতোন দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একটা বিরাট ক্যাকটাস, দু'তলা তিনতলা বাড়ির মতন উঁচু। স্প্যানিশ ভাষায় এগুলোর নাম সাউআরো, আশি–নব্বই বছর করে বয়েস এক–একটার, কোনো কোনোটা নাকি দেড়শো দুশো বছর পর্যন্তও বাঁচে। অদ্ভুত দৃশ্য। আরও ছোটখাটো নানান জাতের ক্যাকটাসও ছড়িয়ে আছে, ফুল ফুটেছে কোনোটাতে। একটা আগেকার দিনের পাউডার পাফের মতোন ফুল দেখিয়ে বারবারা জিজ্ঞেস করলো, এটার নাম কি জানো? একে বলে শাশুড়ির মাথা।

ড্যানি গাড়ি থামিয়েছে একটা টিলার কাছে। রোদ এখন বেশ কড়া। একটা দানব ক্যাকটাসের ছায়ায় বসে আমরা বিয়ার সহযোগে কিঞ্চিৎ ছোট হাজরি সেরে নিলাম। ড্যানি বললো, সাবধানে চারদিকটা দেখে বসবে কিন্তু, এ জায়গাটায় র‍্যাট্‌ল স্নেকের আড্ডা!

প্রথম কিছুক্ষণ আমরা ড্যানির সঙ্গে সোনার সন্ধানে যোগ দিলাম। পাশাপাশি ছড়িয়ে শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে–তাকিয়ে হাঁটা। এখানকার বালি ছাঁকলে নাকি সত্যি কিছু–কিছু সোনা পাওয়া যায়, কিন্তু খরচা পোষায় না। ড্যানি তাতে উৎসাহী নয়। সে চায় তাল–তাল সোনা। কিংবা সোনার ঢ্যালা। কেউ–কেউ নাকি দু'একবার পেয়েছেও। এখানকার পাথরগুলোর রংও বিচিত্র, সুতরাং একেবারে সোনালি রঙের পাথর থাকা একেবারে অসম্ভব নয়।

এক সময় বারবারা আর আমি ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। ড্যানির ক্লান্তি নেই।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে বারবারা বললো, ড্যানিটা কী রকম পাগল জানো? এই বিরাট মরুভূমিটাকে ও ইঞ্চি–ইঞ্চি করে খুঁজে দেখবে ঠিক করেছে। গত সপ্তাহে ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, আজ আবার সেইখান থেকে শুরু করেছে। আমি জানি, ও কোনোদিনই পাবে না। পাবার কোনো দরকারও নেই।

—কেন?

—আমরা তো স্বর্ণলোভী নই। এই খোঁজাটাই আসল, এটাই দারুণ এক্সাইটিং। পাওয়াটা নয়। জীবনে সবসময়েই কিছু খুঁজে বেড়ানো দরকার। পেয়ে গেলে খোঁজাটা থেমে যায়—সেটাই বিরক্তিকর!

এসব দার্শনিক কথাবার্তা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না। সেই স্বর্ণকেশী যুবতীর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, ড্যানি তো একেই পেয়েছে, আর সোনা পাওয়ার দরকারটাই বা কি! এ বছর বারবারা চাকরি করছে, ড্যানি করছে পড়াশুনো আর এইরকম অ্যাডভেঞ্চার। আগামী বছর সে চাকরি করলে, বারবারা আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। চমৎকার জীবন।

আর একটা কথা ভেবেও আশ্চর্য হচ্ছিলাম। এরা কত সহজে আপন করে নিতে পারে। মাত্র ত' একদিনের পরিচয়! এই এখন দুপুর রৌদ্রে এক অজানা মরুভূমির মধ্যে বসে এক প্রায় অচেনা মেয়ের পাশে বসে–বসে বিয়ার খাবো—এটা কি কয়েক মাস আগে স্বপ্নে ভেবেছিলাম? এখনো মাঝে–মাঝে সবটাই স্বপ্ন মনে হয়। সত্যি আমি এখানে বসে আছি? হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করি।

তারপরই কাছাকাছি কোথাও কিরকির কিরকির শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠি। র‍্যাট্‌ল স্নেক নয় তো ! ড্যানি অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে।

এরা এতোই উদ্যমী যে এই মরুভূমির মধ্যেও একটা ছোট মিউজিয়াম খুলে রেখেছে। একলা একটি বাড়ি। তাতে রয়েছে এই মরুভূমির ম্যাপ এবং এখানে কী কী জিনিস ও পশুপাখি–প্রাণী পাওয়া যায় তার নমুনা। সেখানে র‍্যাট্‌ল স্নেকও যেমন আছে, তেমনি আছে কয়েক টুকরো সোনালি পাথর—ড্যানির মতন ছেলেদের উৎসাহ টিকিয়ে রাখার জন্য।

দুপুরে আমাদের এক ফাঁকে মিউজিয়ামটা দেখিয়ে দিয়ে ড্যানি আবার সোনা খুঁজতে লাগলো। তারপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধে এলো। সূর্যাস্তে দিগন্ত সোনার রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এখন গোটা মরুভূমিটাকেই সুবর্ণময় বলে মনে হয়। তার মধ্যে থেকে ড্যানি রিক্ত হাতে ফিরে এলো, মুখে কিন্তু হাসি, বললো—আবার সামনের রবিবার আসবো।

ঘোর সন্ধের পর ফিরে, তারপর আর এক অধ্যাপকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আবার ঘরে ফিরলাম অনেক রাতে। আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে পোয়েট্রি সেন্টারের অতিথি ভবনে। গোটা বাড়িটাতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সকালবেলা একটি মেয়ে এসে শুধু বিছানার চাদর পাল্টে দিয়ে যায়—তারপর তো সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটছে।

নির্জন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হয়। একটা বই নিয়ে শুয়েছিলাম। তখন তন্দ্রা এসে গেছে, তার মধ্যে যেন অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কোথায় টেলিফোন বাজছে। আমার এ ঘরে টেলিফোন নেই। আরও দু'খানা ঘর পার হয়ে সামনের অফিস ঘরে টেলিফোন। শব্দটা সেখান থেকেই। উঠতে ইচ্ছে করে না। নিশ্চয়ই আমার জন্য নয়। শব্দটা কিছুতেই থামছে না। উঠতেই হলো।

—হ্যালো ?

—তোমাকে কি বিরক্ত করলাম ? ঘুমোচ্ছিলে ?

—না, মানে, কে আপনি ? কাকে চাইছেন ?

—আমি মার্গারিট। আমি কিন্তু তোমার গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পেরেছি।

—মার্গারিট ? ভাবতেই পারিনি।

—শোনো, এত রাত্রে টেলিফোন করলাম কেন জানো তো ? রাত বারোটার পর লং ডিসটেন্স কল–এর চার্জ সস্তা হয় কিনা।

—ও, না না, বেশি রাত হয় নি, ওখানে কি কিছু হয়েছে ?

—না, কিছু হয় নি, এমনিই ইচ্ছে হলো। তুমি ভালো আছো তো ? ওদিকের লোকগুলো কেমন, তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে ?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই ! তুমি কেমন আছো ?

—তুমি এতদিন দেরি করছো কেন ? কবে ফিরবে ?

মাত্র তিন মিনিট সময়। বিস্ময় কাটতে না কাটতেই সময় ফুরিয়ে যায়। রিসিভারটা রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। মনের মধ্যে তিরতির করছে একটা ভালো–লাগার অনুভূতি। আমার জন্য একজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে ! আমি কবে ফিরবো ? এটা নিশ্চয়ই নিছক ভদ্রতার প্রশ্ন নয়। তাহলে নিশ্চয়ই এত রাত্রে ফোন করতো না। তাছাড়া মেয়েটাও যে অন্যরকম।

পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম লস অ্যাঞ্জেলিসের দিকে। ঘোরাঘুরি করতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি এসে হলিউড–ফলিউড না দেখে গেলে লোকে বলবে কি !

লস অ্যাঞ্জেলিসের লোকেরা বলে, তাদের শহরটা নিউইয়র্কের চেয়েও বড়। আসলে এটা একটা শহর নয়, পাশাপাশি কয়েকটা শহর জোড়া দেওয়া। আমার মনের অবস্থার জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক, শহরটা আমার ভালো লাগলো না। শুধুই যেন টাকা–পয়সার গন্ধ।

এখানকার সিনেমা হলগুলোও অদ্ভুত। হলিউডের গা-ঘেঁষা বলেই বোধহয় এখানকার লোকেরা সহজে সিনেমা দেখতে চায় না। অনেক সিনেমা হলেই এক টিকিটে দুটো পুরো ছবি দেখানো হয় এবং আগে ও পরে বেশ কিছু জ্যান্ত মেয়ের ধেই-ধেই করে ন্যাংটো নাচ। দেখতে-দেখতে হাই ওঠে।

কন্ডাকটেড ট্যুরে হলিউডের স্টুডিও-ফুডিও দেখে নিলাম একবেলায়। বিকেলে নিজেই বাস ধরে চলে গেলাম সমুদ্রের ধারে। রাস্তা ছেড়ে, বাড়ির আড়ালগুলো পার হতেই চোখে ভেসে উঠলো সমুদ্র। সমুদ্র আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু চোখের সামনে প্রশান্ত মহাসাগর। তাতেই কীরকম রোমাঞ্চ হয়। এই হচ্ছে সমুদ্রের রাজা। সোজা যেদিকে তাকিয়ে আছি সেদিকেই কোথাও এক জায়গায় এর সঙ্গে মিশেছে ভারত মহাসাগর। তারই এক টুকরোর নাম বঙ্গোপসাগর। তার কোলের কাছে কলকাতা। ঝাঁপ দেবো এই সাগরে? সাঁতার তো মন্দ জানি না।

পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে ঢেউ। মনে পড়লো, কাল রাত্রে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, কবে ফিরবে। আর তো কোথাও কেউ আমার জন্য প্রতীক্ষা করে নেই!

এবার সানফ্রানসিসকো। এই শহরটা সত্যিই সুন্দর। প্রকৃতিকে আমরা যে অর্থে সুন্দর বলি, সেই অর্থে কোনো বড় শহরই সুন্দর নয়। বোধহয় সানফ্রানসিসকোই এর ব্যতিক্রম। এখানে প্রকৃতি আর মানুষে গড়া সভ্যতা চমৎকারভাবে মিলেমিশে আছে। শহরটা ঘুরতে-ফিরতে হঠাৎ-হঠাৎ চোখে পড়ে সমুদ্র। কী গাঢ় নীল জল!

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছে পল এঙ্গেলনার আগে থেকেই চিঠি লিখে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। মোটেল থেকে কিছুতেই সেই অধ্যাপককে টেলিফোনে ধরতে পারছি না। এটাই আমার এখানে একমাত্র কাজ। তাছাড়া বিশ্ববিখ্যাত বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় একবার চোখে দেখা। এখানকার ছাত্র আন্দোলন সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে দেয়।

কলাম্বাস এভিনিউ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে একটা বইয়ের দোকান চোখে পড়লো। সিটি লাইট্‌স বুক শপ। নামটি চেনা। এদের প্রকাশিত কিছু বই পড়েছি, চিঠিপত্রেও একবার যোগাযোগ হয়েছিল।

ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, মিঃ ফের্লিংগেটি আছেন কি?

মেয়েটি আমার দিকে আপাদমস্তক একবার দেখে শুকনো গলায় বললো, তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করা শক্ত।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে আসছিলাম, মেয়েটি আবার ডাকলো। সেই মুহূর্তে বাইরের দরজা দিয়ে একজন দীর্ঘকায় লোক ঢুকলো, মাথার চুলগুলো কাঁচাপাকা। গায়ে চেকচেক লাল জামা। মেয়েটি বললো, ইনিই তো লরেন্স ফের্লিংগেটি।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

ফের্লিংগেটি আমার কাঁধে এক থাবড়া মেরে বললো, সত্যি? সেই অত দূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছো?

সে আমাকে কাছাকাছি একটা এসপ্রেশো কফির দোকানে টেনে নিয়ে গেল। অনেক গল্প। মাঝে-মাঝে অন্য ছেলেমেয়েরা আসছে, আলাপ হচ্ছে, কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ থাকছে। ফের্লিংগেটি দারুণ আড্ডাবাজ, কিছুতেই আমাকে উঠতে দেবে না।

একটু বাদে দাড়িওয়ালা নোংরা জামা-প্যান্ট পরা একজন লোক এসে টেবিলে বসলো। ফের্লিংগেটি তাকে গ্রাহ্যই করলো না। তখন সে নিজেই বললো, ল্যারি, এক কাপ কফি খাওয়াও!

আমার দিকে ফিরে বললো, আমার নাম জো স্মিথ। হু ইউ ?

ফের্লিংগেটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, সেই সুযোগে জো স্মিথ ফিসফিস করে বললো—ক্যাঁ ইয়া স্পেয়ার মি আ বব ?

ফের্লিংগেটি মুখ ফিরিয়ে এক ধমক দিয়ে বললো, এই জো, এই ফাকিং ব্যাস্টার্ড, তোর লজ্জা করে না ! তুই একজন গরিব ভারতীয়ের কাছ থেকে ভিক্ষে চাইছিস ?

আমি হেসে বললাম, আমি গরিব ভারতীয় বলেই এদেশের লোকদের ভিক্ষে দিতে আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া তোমাদের দেশের টাকাই তো খরচ করছি।

এক ডলার বাড়িয়ে দিতেই জো স্মিথ নির্লজ্জের মতন সেটা নিয়ে সুট করে কেটে পড়লো।

এরা ঠিক না-খেতে পাওয়া ভিখিরি নয়। এদের বলে জাঙ্কি। নেশার জন্য যে-কোনো উপায়ে টাকার যোগাড় করে।

তবে, খানিকটা আগে, রাস্তায় একজন লোক কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলেছিল—আ কোয়ার্টার, আ কোয়ার্টার (সিকি) প্লিজ। আর তাকে খাঁটি ভিখিরিই মনে হয়েছিল। এসব দেখলে আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এখন রাস্তায় কোনো একটা লোককে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে দেখলেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সানফ্রানসিসকোর চীনেরা বেশ বিত্তশালী। এখানকার মতোন এমন ঐশ্বর্যাঢ্য চীনে-পাড়া এখন খোদ চীনেও আছে কিনা সন্দেহ। বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর নৌকো-টৌকোতে পার হয়ে কবে এরা এখানে এসেছিল কে জানে। কিংবা এসেছিল শ্লেভ লেবার হিসেবে। এখন এদের বিশাল-বিশাল দোকান, বাড়িঘর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল। যে-কোনো দোকানে ঢুকলে এদের নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যদি কোনোদিন এরা সানফ্রানসিসকোর খানিকটা অংশ আলাদা চীনা-স্তান হিসেবে দাবি করে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিকেলের দিকে টেলিফোনে অধ্যাপককে পাওয়া গেল। উনি বললেন—আরে কি মুশকিল। আমিও তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তুমি এক কাজ করো, বাস ধরে এক্ষুনি চলে এসো ; ফেরার সময় আমি তোমায় পৌঁছে দেবো। এখন আমার যেতে-যেতে দেরি হয়ে যাবে, সন্ধের সময় গোল্ডেন গেট ব্রিজের অপূর্ব দৃশ্য তুমি মিস করো না—।

সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেতু। পৃথিবীর উনিশতম আশ্চর্য। এত আলোয় সাজানো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দূরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া সোনার জন্য বিখ্যাত ছিল এক সময়। এখনো সূর্যের আলো ও বিদ্যুতে চতুর্দিকে শুধু স্বর্ণসজ্জা। হঠাৎ মনে হয়, এই সবকিছুই একদিন প্রচণ্ড আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে।

৮

অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এলাম আয়ওয়ায়। লাস ভেগাসে নেমেও জুয়া খেলার লোভ সংবরণ করেছি। নেভাদার পাহাড় ডিঙিয়ে, বিরাট লবণ হ্রদের পাশ দিয়ে, নেব্রাস্কা হয়ে ঘুরে-ঘুরে আসতে লাগলাম। আর বেড়াতে ভালো লাগছে না। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। এখন বাড়ি মানে অবশ্য মিড ওয়েস্টে, ছোট্ট শহরে রাস্তার পাশে একটা দোতলার ঘর।

ডাক-বাক্সে অনেক চিঠি জমে আছে। গেটের পাশে বেশ কয়েকদিনের খবরের কাগজ। সব কুড়িয়ে এনে ঘরের চাবি খুললাম। তারপর প্রথমেই টেলিফোন করলাম মার্গারিটকে—আমি এসে গেছি। তোমার কি এখন ক্লাস আছে ? কখন দেখা হচ্ছে ?

দশ-বারো মিনিটের মধ্যে মার্গারিট এসে গেল। ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু।

দারুণ চমকে গেলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, এ কি ?

দু'হাত ছড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মার্গারিট বললো, এসো, তুমি এবার আমাকে একটা চুমু খাও।

— কিন্তু এরকম তো কথা ছিল না ?

— সেদিন আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কবিতা পড়ার পর তুমি আমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলে, তোমার মুখখানা তখন বাচ্চা ছেলের মতোন দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন একটা আবদার, তবু আমি রাজি হই নি ! আমি অন্যায় করেছি সেদিন !

—না, না, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয় !

—জানো, এ নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। একথাও মনে হয়েছে, তুমি হয়তো ভাবতে পারো, যেহেতু তুমি ইওরোপিয়ান বা হোয়াইট নও, সেইজন্যই আমি রাজি হই নি ! ইস্, ছি ছি ছি, যদি সে কথা ভেবে থাকো...।

—না, ভাবি নি সেরকম। সত্যি ! বিশ্বাস করো।

—আমি চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করার সময় মনে-মনে জিজ্ঞাসা করতাম, ভগবান, আমাকে বলে দাও কোন্‌টা ঠিক ! হঠাৎ একজনকে চুমু খাওয়া পাপ না একজনের মনে দুঃখ দেওয়া বেশি পাপ ? আমি কয়েকদিন আগে উত্তর পেয়ে গেছি।

—কি ?

—এই যে তোমাকে চুমু খেলাম ? এবার তুমি আমাকে খাও ! এই শোনো, আমি কিন্তু ঠিক মতন চুমু খেতে জানি না। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে তো ?

মার্গারিটকে স্পর্শ করতে আমার ভয় করলো। যেন ও একটা দুর্লভ, দারুণ মূল্যবান জিনিস, আমার স্পর্শে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা গাঢ় লাল রঙের সোয়েটার পরে আছে। মুখেও যেন সেই রঙের আভা। হাত বাড়িয়ে বললো, এসো ! কোনোদিন কোনো নারী আমাকে এরকমভাবে আহ্বান করে নি। অনেক প্রত্যাখ্যান পেয়েছি, আহ্বান পাই নি। এগিয়ে গিয়ে খুব নরমভাবে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম।

মার্গারিট সত্যিই ঠোঁট দুটো শুধু একটু ফাঁক করে রইলো আনাড়ির মতন। নাকে নাক লেগে যায়। চুমু খাওয়ার সময় যে নারী-পুরুষের নাক দুটো অদৃশ্য হয়ে যায়, তাও জানে না।

চুম্বন সমাপ্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে মার্গারিট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছটফটিয়ে উঠলো। বললো, আমার একটুও সময় নেই। একটুও সময় নেই এখন ! শুধু এলাম একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে। আমার ক্লাস আছে। কিছু বইপত্র এনেছো ? কি কি জিনিস কিনলে ? আচ্ছা, সব পরে দেখবো। চলি, আমার চারটে পর্যন্ত ক্লাস, বিকেলে আবার আসবার চেষ্টা করবো।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ও হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। কাঠের সিঁড়িতে ওর হাই হিল জুতোর এমন খটখট শব্দ হচ্ছিল যে আমার ভয় হলো, মেয়েটা পড়ে না যায় !

দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সকাল এগারোটা বাজে। এখন অনেক কাজ। ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে। রান্নার কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ফ্রিজ খালি, দোকান থেকে কিছু কিনে না আনলে চলবে না। পল ওয়েগনারকে আমার ফিরে আসার খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করলো না। বিছানাটা খুলে শুয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নিজের ঠোঁটটায় হাত রাখলাম। এই সকালবেলা একটা মেয়ে ঝড়ের মতন এসে আমাকে চুমু খেয়ে গেল। একি সত্যি ? না কি এটাও স্বপ্ন ?

শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। অল্প-অল্প শীতের আমেজের মতোন একটা ভালো-লাগার চাদর যেন আমার গায়ে জড়িয়ে আছে। একটু বাদে অনুভব করলাম, সত্যি

শীত করছে। উঠে গিয়ে যে সেন্ট্রাল হিটিং-এর সুইচটা চালিয়ে দেবো; তাও ইচ্ছে করলো না। গুটিসুটি মেরে শুয়ে সিগারেট ধরালাম। অ্যাশট্রেটা টেবিলের ওপর, উঠে সেটা আনতেও আলস্য লাগলো। নিজের ঘরের মেঝেতে যদি ছাই ফেলি, তাতে আমায় কে কি বলবে ? আমার যা খুশি করতে পারি।

ঘণ্টাখানেক বাদে দরজায় আবার খটখট শব্দ হলো। এবার তো উঠতেই হবে। কে হতে পারে ? শার্ট-প্যান্ট পরেই আছি। সুতরাং দরজা খোলার কোনো অসুবিধে নেই।

খুলেই দেখলাম মার্গারিট। মুখটা লাজুক-লাজুক। একটু যেন অপরাধীর মতো ভাব।

—একি, তুমি ক্লাস করলে না ?

—আমি কি আবার এসে তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম !

—না, না, এসো এসো।

ভেতরে এসে ও বললো, ক্লাসে গিয়ে দেখলাম, আমার আজ পড়াতে একটুও ভালো লাগছে না। কিছুতেই মন বসছে না। অন্যমনস্কভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো উচিত নয়।

আমি একটু হাসলাম।

মার্গারিট কৃত্রিম রাগের সঙ্গে আমার বুকে একটা আঙুলের টোকা মেরে বললো, তুমিই তো আমার আজ সবকিছু এলোমেলো করে দিলে !

—আমারও আজ কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো যেন মার্গারিটের শরীরটা একটু-একটু দুলছে। ঘোরের মতোন অবস্থা। আমিও যেন পৃথিবীর আর সবকিছু ভুলে গেছি। একটা আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলাম, আর একবার ?

ও নিজেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ওর ঠোঁটে, কানের নিচে, গলায়, বুকে অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিলাম। যেন আমি অমৃত পান করছি, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হবে না।

দু'জনেই কখন এসে বিছানায় বসেছি। ও আমার গালে দু'হাত রেখে চোখ দুটো বড়-বড় করে বললো, শোনো, একটা কথা শোনো—।

—কি ?

—তোমার ভালো লাগছে ?

একথা তো মেয়েরা জিজ্ঞেস করে না, ছেলেরাই জানতে চায়। এ মেয়েটা কোনো কিছুই জানে না।

—তোমার ?

মার্গারিট রুদ্ধশ্বাসভাবে বললো, আমার এত অসম্ভব ভালো লাগছে যে আমি যেন সহ্য করতে পারছি না। এ আমার কী হলো বলো তো ? এতদিন কিছু জানতামই না—।

—মার্গারিট, তোমাকে আগে কেউ চুমু খায় নি ?

—আমার বাবা, মা।

—না, সেরকম নয়। এতদিন এদেশে আছো—।

মার্গারিট অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বললো, এই আমেরিকান ছেলেগুলো ? এঃ!

—কেন, এদের কারুকে তোমার ভালো লাগে নি ? অনেক ভালো-ভালো ছেলে আছে।

—সে কথা বলছি না। তা থাকতে পারে। কিন্তু এরা শারীরিক ব্যাপারটা এত জল-ভাত করে ফেলেছে, আমার মোটেই পছন্দ হয় না।

—তবু এতোদিনে কেউ তোমাকে চুমু খেতে চায় নি ?

—না। চায় নি। অনেকে জোর করে খেতে এসেছে—জোর মানে, দে টেক ইট ফর

গ্রান্টেড—কোনো পার্টিতে কারুর সঙ্গে নাচলে বা একটু বেশিক্ষণ কারুর সঙ্গে কথা বললেই অমনি ঠোঁটটা এগিয়ে আনে—যেন এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ জিনিস। আমি সবসময় নিজের ঠোঁটে হাত চাপা দিয়েছি বা মুখ সরিয়ে নিয়েছি। কেউ আগে থেকে অনুমতি চায় না। তুমিই সেদিন প্রথম চাইলে, তোমার মুখখানা অবিকল একটা বাচ্চা ছেলের মতন দেখাচ্ছিল—সেইজন্যই মনে হলো, এর মধ্যে কোনো পাপ থাকতে পারে না—সত্যি তুমি খুব বাচ্চা ছেলের মতন এমন সরলভাবে বলেছিলে...।

মার্গারিট বার বার আমার মুখখানা বাচ্চা ছেলের মতন বলছে, সেটা আমার তেমন পছন্দ হলো না। আসলে ওর চোখমুখই যে একেবারে শিশুর মতন সেটাই ও জানে না।

ও আবার বললো, তোমার ম্যাকগ্রেগরকে মনে আছে? ও একদিন আমাকে গাড়ির মধ্যে এমন বিশ্রীভাবে জোর করে আদর করার চেষ্টা করেছিল, আমি খুব চটে গিয়েছিলাম! আমাকে আমেরিকান মেয়েদের মতন চিপ মনে করেছিল।

—তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করেছো! গল্প-উপন্যাসে যা পড়েছি, আমারও ধারণা ছিল, ফরাসি মেয়েরা এইসব ব্যাপারে খুব ফ্রি হয়, তাদের কোনো ইনহিবিশান থাকে না।

মার্গারিট দারুণভাবে আপত্তি করে বললো, 'না, না, না,—একদম মিথ্যে কথা। মোটেই সত্যি না। ফরাসি মেয়েরা কক্ষনো ওরকম হয় না, পারির মেয়েরা হতে পারে! প্যারিসিয়ান আর ফ্রেঞ্চ পিপল্-এ অনেক তফাত। পারি হচ্ছে সারা ফ্রান্সের তুলনায় সম্পূর্ণ একটা অন্যরকম জায়গা।'

আমি বললাম, তা নয়। আসলে তুমিই অন্য ফরাসী মেয়েদের তুলনায় একদম আলাদা। তোমাদের বাড়ি প্যারিসে নয়? তাহলে কোথায়?

—আমি তো গ্রামের মেয়ে। আমাদের গ্রামের নাম লুদাঁ। এই নাম শুনে অবশ্য কেউ চিনবে না। কাছাকাছি শহরটার নাম পোয়াতিয়ে। আমাদের গ্রাম থেকে আমি আর আমার বন্ধু এলেনই শুধু পারিতে পড়তে এসেছিলাম।

—পারিতে পড়াশুনো করেও তুমি প্যারিসিয়ান হও নি!

—কোনো জায়গার খারাপ জিনিসটাই কি নিতে হবে?

—মার্গারিট, তুমি কি আজ থেকে খারাপ হয়ে গেলে?

মার্গারিট ব্যাকুলভাবে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো, না, না, না, না! এই দেখো। তুমি দেখো, আমার গা কাঁপছে। আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। কোনো খারাপ কাজ করলে কখনো এত ভালো লাগে? আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, কোনো খারাপ কাজে আমার কখনো আনন্দ হয় না।

—কোন্‌টা খারাপ, কোন্‌টা ভালো, তাই নিয়ে তো অনেক তর্ক আছে।

—আই ডোনট্ কেয়ার! আমি নিজের মনে-মনে ঠিক বুঝতে পারি। কোনো কিছু হলে, আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি। চার্চে প্রেয়ার করার সময়েও প্রশ্ন করি মনে-মনে। আমি ঠিক উত্তর পেয়ে যাই।

আমি মার্গারিটের হাতের আঙুলে চুমু খেলাম। তারপর ওকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। তাবপর ওর সোয়েটারের বোতামে হাত রাখতেই ও খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি আরো কিছু করবো?

—কেন, তোমার কি আপত্তি আছে?

—আমি ঠিক জানি না। মনের ভেতর থেকে একটা দারুণ ইচ্ছে বার বার যেন বলতে চাইছে, তুমি আমাকে আরও আদর করো, আরও অনেক আদর করো—কিন্তু আমি কি একদিনে

এতখানি সইতে পারবো ?

—হ্যাঁ পারবে। ঠিক পারবে।

—না, না, শোনো, আমরা বরং আর একটু অপেক্ষা করি। আজ না হয় কাল, না হয় আরও পরে—আমি ঠিক বুঝতে পারবো, আমি নিজেই তোমাকে বলবো ... ব্যাপারটা যেন শুধু লোভ না হয়ে যায়, যেন সবসময় খাঁটি আনন্দ থাকে। এখন আমার নিজেরই খুব লোভ হচ্ছে, এটা যখন লোভহীন আনন্দ হয়ে যাবে, ঝর্নার জলের মতন নির্মল, আমি একবার আলজাস্‌লোরেনে এরকম একটা ঝর্না দেখেছিলাম, আমার মনে হয়েছিল, আঃ, জলটা এত সুন্দর পরিষ্কার, পৃথিবীতে কি আর কোনো কিছু এতো পরিষ্কার হতে পারে ? তুমি আমার ওপর রাগ করলে ?

—না, না।

—প্লিজ রাগ করো না। আমার ওপর কক্ষনো রাগ করো না। তুমি আমার পাশে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি কিন্তু আজ ক্লাসে যাবো না, কোথাও যাবো না, এইখানে শুয়ে থাকবো। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আর কারুকে দরজাও খুলে দেবে না। কেউ এলেও আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে থাকবো—ভাববে ভেতরে কেউ নেই।

শুয়ে রইলাম পাশাপাশি। কোনো মেয়ের পাশে যে এরকমভাবে শুয়ে থাকা যায়, আমি জানতাম না আগে। বিশেষত এরকম একটি যৌবনবতী অপরূপ সুন্দরীর পাশে। তবু আমার কষ্ট হলো না। একটা শান্ত মাধুর্যের স্বাদ পেলাম জীবনে প্রথম।

মার্গারিট আমার একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে নিজের হাত বুলোতে বুলোতে-বললো, তোমার গায়ের রংটা কী রকম জানো ? পাকা জলপাইয়ের মতন। দেখলেই মনে হয়, তোমার চামড়া অনেক রোদ্দুর শুষেছে, তাই একটা সতেজ টাটকা ভাব আছে। আমাদের রং সাদা, ফ্যাকাশে—তার মানে বেশি রোদ্দুর খাই নি। আমি এত রোদ্দুর ভালবাসি।

আমি বললাম, 'তোমার পাশে আমাকে কী রকম দেখাচ্ছে জানো ? আমার লজ্জা করছে। আমার গায়ের রং কালো হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমার চেহারাটা কি বিচ্ছিরি! থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, গোদা-গোদা হাত-পা—তোমার পাশে আমি যেন ঠিক বিউটি অ্যান্ড দা বিস্ট-এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

আমার গায়ে একটা চাপড় মেরে বললো, ঠিকই তো। তুমি একটা বিস্ট। এতো জোর চুমু খেয়েছো যে আমার ঠোঁট ফুলে গেছে। আর একটা চুমু দাও।

একটু বাদে বললো, আচ্ছা, কিস্‌-এর বাংলা কি ? দেখো সেদিন লাভ-এর বাংলা শিখিয়েছিলে, আমার মনে আছে।

—কিস্‌ হচ্ছে চুমু।

—সু-মু ?

—না, চুমু। চ অ্যাজ ইন চক্‌।

—আই ?

—আই হচ্ছে আমি।

—দ্যাখো, এবার আমি একটা পুরো বাংলা সেনটেন্স বলতে পারবো। দেখবে ?

জলে ডুব দেবার আগে কিংবা দৌড় শুরু করার আগে লোকে যেমন দম নেয়, সেইরকম জোর নিঃশ্বাস টেনে মার্গারিট বললো—আম্মি সুমু বালোবাশ্যা।

আমার হাসি আর থামতেই চায় না। দেশ ছাড়ার পর এমন প্রাণ খুলে একদিনও হাসি নি। এমন মিষ্টি বাংলাও শুনি নি এর মধ্যে।

ও বারবার বলতে লাগলো, কি ভুল হয়েছে ? ভুল বলেছি ? কেন ভুল হলো ?

আমার মুখে আসল বাংলাটা শুনে বললো, তোমাদের ভাষা কিন্তু খুব শক্ত।

—তোমাদের ফরাসির চেয়ে অনেক সোজা ! বাবাঃ, ফরাসিতে তো ভার্ব মুখস্থ করতে করতেই প্রাণ বেরিয়ে যায় !

—মোটেই না। ফরাসি খুব সহজ। তুমি শিখবে ?

—ইউনিভার্সিটিতে তোমার ক্লাসে ভর্তি হবো ?

—তাহলে খুব মজা হয় কিন্তু। আমার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু সবাই বাচ্চা নয়। পি–এইচ–ডি করতে গেলে এখানে ফ্রেঞ্চের একটা কোর্স নিতে হয়। তুমি বেশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে থাকবে, আমি পড়াতে–পড়াতে মাঝে–মাঝে তোমার দিকে তাকিয়ে উইংক করবো। তুমি উইংক করতে জানো ?

—কেন জানবো না। এই তো !

—না, না, তোমার ঠিক হলো না ! একদম বাচ্চাদের মতন করলে, তোমার দু'চোখই বুজে আসছে। এই দ্যাখো, ফ্রেঞ্চরা সবচেয়ে ভালো উইংক করতে পারে—।

—তাহলে ফরাসি ভাষা শেখবার আগে উইংকিংটাই আগে ভালো করে শেখা যাক্ !

—নিশ্চয়ই। ফ্রেঞ্চ ভালো করে শিখতে গেলে তোমাকে ঠিক মতন কাঁধ শ্রাগ করা শিখতে হবে। ওনিয়ন সুপ খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, আড়াই শো রকমের চিজ–এর মধ্যে যে–কোনো একটা মুখে দিয়েই তোমাকে বলতে হবে, সেটা কতদিনের পুরোনো, হুইস্কির বদলে কোনিয়াক ভালো লাগাতে হবে।

কিছুক্ষণ আমরা চোখ টেপাটিপির খেলা খেললাম। তারপর আমি বললাম, ইস, ইংরেজদের বদলে যদি ফরাসিরা ভারতবর্ষটা দখল করতে পারতো, তাহলে এসব আমরা কবেই শিখে যেতাম !

—তুমি এর আগে কোনো ফরাসি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছো ?

—অনেকদিন আগে, তখন আমি খুবই ছোট, পাঁচ–ছ' বছর বয়েস, চন্দননগর বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা চকোলেটের দোকানে একজন ফরাসি মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার নাম কি ? তিনি আদর করে আমার গাল টিপে দিয়েছিলেন, মনে আছে।

—কোন্ জায়গাটা বললে ?

—চন্দননগর !

মার্গারিট লাফিয়ে উঠে বসে উত্তেজিতভাবে বললো, ও, স্যানডোরনাগার। কারিক্কল, মাহে, স্যানডোরনাগার। ভূগোলে পড়েছি, ইন্ডিয়াতে আমাদের কলোনি ছিল ! আমাদের ধারণা ছিল জায়গাগুলো বোধহয় পৃথিবীর উল্টো পিঠে। কলকাতা থেকে কতদূরে ?

—খুব কাছেই। কলোনি ছিল বলে খুব গর্ব, তাই না ?

—মোটেই না। কোনো মানুষের উপরেই অন্য মানুষের রুল করা উচিত নয়। গডই তো সবাইকে রুল করছেন।

—মার্গারিট, আমি কিন্তু ঈশ্বর মানি না।

—তাতে ঈশ্বরের কোনো ক্ষতি নেই। তোমার মানাটা আমিই মেনে দেবো এখন। তোমাকে কিছু করতে হবে না। থাকগে, শোনো না, আমার বাবার না একবার স্যানডোরনাগারে যাবার কথা ছিল চাকরি নিয়ে, আমিও তখন খুব ছোট। আমার মা কিছুতেই রাজি হলেন না, তাই যাওয়া হয় নি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, যদি আমরা যেতাম সেখানে—তাহলে সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারতো। আমরা এক সঙ্গে খেলা করতাম, কি মজা হতো না !

আমি হেসে বললাম, না। সেরকম কিছুই হতো না ! তুমি থাকতে কলোনিয়াল অফিসারের

মেয়ে, পাক্কা মেমসাহেব—আর আমি সামান্য একটা নেটিভের ছেলে। আমাদের দেখাশুনো হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না।

মার্গারিট ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, কি জানি ! কিন্তু হলে বেশ ভালো হতো !

—তোমার সঙ্গে এখানে যে আমার দেখা হয়েছে, সেটাই এখনো ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কোথায় আমি ছিলাম, কোথায় তুমি ছিলে !

—সত্যি, এটা কিন্তু সত্যি—আমিও তো ছিলাম লুদাঁ বলে একটা গ্রামে, কি করে এসে পড়েছি আমেরিকার একটি গ্রামে, সেখানে বন্ধুত্ব হলো পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকারী এক ভারতীয়ের সঙ্গে।

—পাঁচ হাজার বছর-টছর বলো না। আমাকে কি অতটা বুড়ো মনে হয় ?

মার্গারিট হেসে উঠলো খুব। বললো, না, ঠিক অতটা না হলেও তোমার বয়েস অন্তত দু'তিন হাজার বছর মনেই হয় !

দুপুর দুটো বাজে। আমাদের হঠাৎ খেয়াল হলো, আমরা কেউই কিছু খাবার খাই নি। মার্গারিট বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি কিছু খাবে না ? আমার খিদে পেয়েছে কিন্তু। চলো, আমরা দু'জনে মিলে কিছু রান্না করি !

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, রান্না করার মতন কিছুই নেই যে। এখানে ছিলাম না তো, ফ্রিজ খালি। চলো কোনো দোকানে গিয়ে খেয়ে আসি।

—দূর, ইচ্ছে করছে না !

—তাহলে তুমি বসো। আমি চট্ করে কিছু কিনে আনি।

মার্গারিট কয়েক মুহূর্ত কিছু চিন্তা করলো। তারপর বললো, আচ্ছা এক কাজ করা যাক্। খাবার-টাবারের ঝামেলা করে দরকার নেই। তুমি এক ডজন বিয়ার আর কিছু চিজ আর হ্যাম নিয়ে এসো। আমরা সেগুলো নিয়ে কবিতা পড়তে বসবো !

আমি তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা পরে নিলাম। সেটা হিমের মতন ঠাণ্ডা। মার্গারিট বললো, একি, তুমি সেন্ট্রাল হিটিং চালু করো নি ! উ হু হু হু আমার খুব শীত করছে ! আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো !

আমার বুকে মাথা রেখে মার্গারিট লাজুক-লাজুক মুখ করে বললো, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলবো ? সেদিন তোমার বাড়িতে আমি আমার বইখানা ইচ্ছে করে ফেলে গিয়েছিলাম !

—সত্যি ? কী ভাগ্য আমার।

—সেদিন তো ডোরি আর লিন্ডার সঙ্গে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে বিশেষ কোনো কথাই বলা হলো না ! শকুন্তলার গল্পটা শোনার বিশেষ ইচ্ছে ছিল আমার। তাই ভাবলাম, আবার আসবার একটা কিছু উপলক্ষ তো চাই—কতদিন ধরে গল্পটা জানার আগ্রহ ছিল—তুমি এত সুন্দর করে বললে !

—তুমি আপোলিনেয়ারের কবিতাটা আরো অনেক বেশি সুন্দর করে পড়েছিলে! আপোলিনেয়ারকে ধন্যবাদ, উনি শকুন্তলার বিষয়ে না লিখলে তোমার সঙ্গে বোধহয় আমার আলাপই হতো না।

—এসো, আজ আমরা শকুন্তলা আর আপোলিনেয়ারের স্বাস্থ্যপান করবো।

৯

কয়েকদিন হলো বেশ জমিয়ে শীত পড়েছে। কিন্তু বরফ পড়া এখনো শুরু হয় নি। সবাই বলছে, ঠিক ক্রিসমাসের দিন তুষারপাত শুরু হবে। এখনো পনেরো ষোলো দিন বাকি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার ছিল বিকেলবেলা। রাশিয়া থেকে একজন কবি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁর কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা। ক্রুশ্চেফের সফরের পর এই দু'টি দেশের মধ্যে খুব শুভেচ্ছা সফর বিনিময় শুরু হয়ে গেছে। পল ওয়েগনারও কিছুদিনের মধ্যেই মস্কো যাবেন।

কবিটি কিন্তু নিতান্তই বাচ্চা। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি বয়েস নয়। যদিও দোভাষী আছে, তবু সে নিজেই মাঝে-মাঝে ছটফটিয়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলার চেষ্টা করে। বেশ জমে গেল সেমিনারটা। ছেলেটি চমৎকার হাসিখুশি! মাঝে-মাঝে তার রসিকতায় শ্রোতারা হো-হো করে হেসে উঠেছে। সুন্দর আনন্দময় পরিবেশ। দেখে কে বলবে যে, এই দু'টি জাত পরস্পরের জন্মশত্রু!

আমি বসেছিলাম ক্রিস্তফের পাশে। ওর খুব সর্দি হয়েছে বলে গোড়াতেই আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল—তুমি দূরে গিয়ে বসো, তোমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে !

ও বেচারা সারাক্ষণ মুখ বেজার করে বসেছিল। কিছুই ঠিক মতন উপভোগ করতে পারছে না। অনবরত নাকে রুমাল চাপতে হচ্ছে।

সেমিনারের শেষে সাইডার পান। এখানে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে মধ্যে কোনো উৎসবে মদ্য পরিবেশন করা হয় না। সেটুকু সংস্কার রয়ে গেছে। শুধু দেওয়া হয় আপেলের রস অথবা কোকাকোলা। এখানে এরা বলে যে-কোনো বিদেশী যদি সকাল এগারোটার আগেই এক বোতল কোকাকোলা খাবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আমেরিকান সংস্কৃতি তাকে একেবারে গ্রাস করেছে।

সাইডার পার্টিতে আমি আর না থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'পাশে বিরাট বাগান। পেছনে নদী। খেলার মাঠ নেই। সমস্ত রকম খেলার জন্য নদীর ওপাশে স্টেডিয়াম আছে। অনেকে দুঃখ করে, আয়ওয়াতে মাত্র একটা স্টেডিয়াম, অন্যান্য বেশিরভাগ শহরেই স্টেডিয়াম তিন-চারটে।

বাগানের মধ্য দিয়ে শর্ট কাট করলে আমার বাড়িটা কাছে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবন অর্থাৎ ক্যাপিটলের দক্ষিণ দিকে বলে আমার রাস্তাটার নাম সাউথ ক্যাপিটল। বাগানের নানা জায়গায় অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন ছাত্রছাত্রী শুয়ে আছে। প্রত্যেকটি যুগলই দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। ওদের দিকে তাকাতে নেই, তাকালেও খুব একটা দোষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইড বইতেই লেখা আছে যে, বিদেশী ছাত্র বা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের পক্ষেও ডেটিং-এর সময় নেকিং-পেটিং-কিসিং পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশি দূরে না যাওয়াই ভালো। আমার শুধু আশ্চর্য লাগে ওদের চুম্বনের তীব্রতা দেখে। এতই দীর্ঘস্থায়ী যে মনে হয় পরস্পর পরস্পরের জীবনীশক্তি যেন একেবারে শুষে নিতে চাইছে। এতে কি ভালো লাগে ? আর একটা ব্যাপার, এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর আছে, এবং যে-কোনো ছেলে বা মেয়ের ঘরে অন্য যে-কেউ আসতে পারে, কোনোরকম বিধিনিষেধ নেই, তবু, বাইরে, বাগানের মধ্যে এরা এই প্রদর্শনীটি করবেই। দেখতে অবশ্য আমার মোটেই খারাপ লাগে না।

মন্থরভাবে হাঁটছিলাম, হঠাৎ মনে হলো আমার গায়ে কি যেন পড়ছে। মুখ তুলে সামনে তাকালাম। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলাম না। চতুর্দিকে বাতাসে যেন অসংখ্য পেঁজা তুলোর টুকরো ভাসছে। মাটিতে সেগুলো পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই কি তুষারপাত ? আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। অন্য কেউ কিছু গ্রাহ্যই করছে না যদিও, কিন্তু আমার জীবনে

এই তো প্রথম তুষার দেখা। গায়ের ওপর পড়ছে, তাতে আমি ভিজে যাচ্ছি না তো ! হয় ওভারকোটের হাতায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অথবা খসে পড়ছে ফুলের পাপড়ির মতন ! আজ বছরের প্রথম তুষারপাত, আমার কাছে কেন যেন মনে হলো একটা বিরাট সংবাদ। মার্গারিটকে জানাতে হবে তা, ও কি দেখেছে ?

বাড়ির দিকে দৌড় লাগালাম। পৌঁছোবার আগেই যদি থেমে যায় ? চাবি দিয়ে দরজা খুলেই দেখলাম, মার্গারিট টেবিলের সামনে বসে বিনম্র আলোয় একটা বই পড়ছে। ঘরটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। সমস্ত পর্দাগুলো ফেলা।

ওর হাত ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে নিয়ে এসে বললাম, কি করছো ? বাইরেটা দেখো নি !

পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। তুষারপাত এখন আরও অনেক ঘন হয়ে এসেছে। বাইরে শুধু এখন পেঁজা তুলো। মার্গারিট শিশুর মতন হাততালি দিয়ে উঠে বললো, ইস, কী সুন্দর, কী সুন্দর ! আমি বোকার মতন এতক্ষণ দেখি নি !

মার্গারিটও যে আমার মতন খুশি হয়েছে, এতে আমি খানিকটা কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। কোনো কিছু ভালো লাগলেই প্রিয়জনকে তার ভাগ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে যদি তাতে উৎসাহ না পায়, তাহলেই মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায় !

মার্গারিট আমার বুকে মাথা রেখেছে, আমি ওর চুলে বিলি কেটে দিতে–দিতে বাইরের বরফ পড়া দেখতে লাগলাম। ও বললো, একটা জিনিস লক্ষ করেছো ? যখন স্নো পড়ে, তখন চারদিকটা কী অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে যায় ? সবাই যেন একে সম্মান জানাচ্ছে। প্রত্যেক বছর প্রথম তুষারপাতের দিনটা আমার দারুণ এক্সাইটিং লাগে।

—তোমাদের ফ্রান্সে এরকম পড়ে ?

—নিশ্চয়ই ! আরও অনেক ভালো করে পড়ে !

—দুষ্টুমণি। তোমাদের ফ্রান্সে তো সবকিছুই বেশি ভালো।

মার্গারিট ওর নীল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইলো, আমি ওকে ঠাট্টা করছি কি না ! আমি চুমু দিয়ে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে দিলাম। ও আমার ওভারকোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলো। তারপর আস্তে–আস্তে বললো—দাঁ ল' ডিঈ পারক সলিতেয়ার এ প্লাসে। দিঈ ফরম জঁ তু আ ল' অব পাসে...

—এর মানে ?

—ইস্, হঠাৎ এটা বললাম কেন ? এটা দুঃখের কবিতা—মৃতদের কবিতা।

—তবু মানেটা বুঝিয়ে দাও।

—প্রাচীন নির্জন পার্ক, তুষারে ঠাণ্ডা, এর মধ্যে দিয়ে দু'টি ছায়ামূর্তি এইমাত্র পার হয়ে গেল।

—জানি, এটা ভ্যেরলেইনের কবিতা, অনুবাদ পড়েছিলাম।

মার্গারিট গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় নাচতে–নাচতে বললে—মঁ দিউ ! কি চমৎকার ! কেউ যদি কোনো কবিতার লাইন শুনে চিনতে পারে, তাহলে কি যে ভালো লাগে, কি বলবো !

—শোনো, শোনো, এটা বাই চান্স আমি একটা অনুবাদে পড়েছিলাম তাই, আমারই এক বন্ধু অনুবাদ করেছে।

—যাই বলো না কেন, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার মতন এমন কবিতা–পাগল আমি আগে কখনো দেখি নি !

—তোমার একটা পুরস্কার পাওয়া দরকার। কী পুরস্কার নেবে বলো তো ?

—আমি তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে চাই।

—সে পরে হবে, দাঁড়াও ! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

মার্গারিট জানে, আমি ঘরে ফিরেই সু-মোজা খুলে চটি পরি। তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো।

—আরে, আরে, কি করছো কি ?

—আমি আজ তোমার জুতো খুলে দেবো।

—না, না, না।

কোনো বাধাই মানলো না। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এ মেয়েটা কি শরৎচন্দ্র পড়েছে নাকি ? শরৎচন্দ্রের নায়িকারা ছাড়া কোন্ মেয়ে কবে পুরুষের জুতো খুলে দিয়েছে ? কিংবা সব দেশের মেয়েরাই এক ! এই ক'মাসে একটা জিনিস বুঝেছি, ভাষার তফাত, কয়েকটি আচার-ব্যবহারের তফাত বাদ দিলে সব দেশের মানুষের মধ্যেই অনেক সাধারণ মিল আছে। হাসি কিংবা কান্নার মুহূর্তগুলো সকলেরই এক।

বাড়িওয়ালাকে লুকিয়ে আমার দরজার সামনের কার্পেটের চাবিটা আমি মার্গারিটকে দিয়ে দিয়েছি দেড় মাস আগেই। বাড়িওয়ালা বুড়ো অবশ্য একদিন দেখে ফেলেছে, মার্গারিট যে প্রায় সারাক্ষণই আমার ঘরে থাকে, সে কথাও জানে। কিন্তু এদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবোধ এত তীব্র যে অন্যদের ঘরোয়া ব্যাপারে কিছুতেই মাথা গলায় না, কোনো মন্তব্যও করে না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বাড়িটা বেশ কাছে বলেই মার্গারিট এখানে যখন-তখন আসে। মাঝখানে এক ঘণ্টা ক্লাস না থাকলে এখানে এসে বিশ্রাম নিতে পারে। এখানে স্নান করে। ওর কয়েক প্রস্থ জামাকাপড়ও এখানে রাখা আছে। ওর টাইপরাইটারটা আমাকে ধার দিয়েছে, দু'জনে মিলে সুবিধে মতন ব্যবহার করি। আমার জন্য প্রায়ই ও গাদা-গাদা বই কিনে আনে। সেগুলো এক সঙ্গে পড়া হয়। রাসিন নাকি শেক্সপিয়ারের চেয়েও বড় নাট্যকার। সেটা প্রমাণ করবার জন্য যে কত বই পড়ে শোনালো।

রান্নাবান্নার ভারও ও নিয়ে নিয়েছে। প্রথম-প্রথম আমার রান্নার রকম-সকম দেখে ও হেসে কুটি কুটি হতো ! আমি ভেবেছিলাম, খিচুড়ি রান্নাই সহজতম উপায়। এখানে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। তবে নতুন করে নামগুলো শিখতে হয়। ওয়ার্ডবুকের বিদ্যেতে বিশেষ সুবিধে হয় না। বেগুনের ইংরেজি জানতাম ব্রিঞ্জাল, এখানে তাকে বলে এগ্ প্ল্যান্ট। কী অদ্ভুত নাম বাবা! এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার আরো আছে। এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার নাম ফুটবল, সেটা ওরা হাত দিয়ে খেলে। হেলমেট ও বর্ম পরা কিছু লোকের মাঠের মধ্যে হাতে বল নিয়ে মারামারি করাই খেলা। ওটার নাম হ্যান্ড বল হওয়া উচিত ছিল, তবু ওরা ফুটবল বলবেই। আর আমাদের দেশের পা দিয়ে বল খেলাটার নাম নাকি সকার ! ঠিক একই রকমভাবে এরা কমলালেবুকে বলে ট্যাঞ্জারিন, কিন্তু মৌসুম্বি লেবুকে বলে অরেঞ্জ। দই-এর ইংরেজি কার্ড নয়, ইয়োগার্ট। বিস্কুটকে বলবে কুকি। কত রকম তরকারির আগে নামই শুনি নি, যেমন আর্টিচোক, সেলারি ইত্যাদি। তবে, পটোলের মতন চেহারার কোনো কিছু এখনো দেখি নি। দেশ থেকে একটা বেঙ্গলি-টু-ইংলিশ ডিকশনারি আনিয়েছিলাম, তাতে আবার বেশিরভাগ আমেরিকান শব্দই নেই। সাধে কি আর একবার ইংরেজরা বলেছিল, আমেরিকান ফিল্মগুলো ইংরেজিতে ডাব্ করা উচিত।

যাই হোক, ডিকশনারি দেখেই আমি টারামারিক অর্থাৎ হলুদ গুঁড়ো আর লেনটিল অর্থাৎ মুসুরির ডাল কিনেছিলাম। মুসুরির ডাল দেখে মার্গারিট বলেছিল—লেনটিল ? লেনটিল সুপ তো ইটালিয়ানরা খুব খায়। তোমরাও খাও নাকি ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। কী বলবো ! বাঙালিকে মুসুর ডাল খাওয়াতে শেখাবে ইটালিয়ানরা ! লেনটিল সুপ আর ফোঁড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল কি এক হলো ?

খিচুড়ি রান্না করা খুব সোজা। প্রথমে বড় সসপ্যানটাতে খানিকটা ডাল ঢেলে খুব করে ফোটালাম। তারপর তাতে ঢেলে দিলাম খানিকটা চাল। এবার ইনস্ট্যান্ট রাইস নয়, ক্যানসাসে উৎপন্ন বাসমতী চালের মতন সরু কাঁচা চাল। রং করার জন্য দিলাম হলুদ। খিচুড়িতে আলু থাকে বলে দিলাম চাকা-চাকা করে কেটে কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ। মাঝে-মাঝে হাতায় করে তুলে দেখছি সব ঠিক সেদ্ধ হয়েছে কি না! ধৈর্য থাকে না। আরও কিছু যেন করা দরকার। কয়েকটা কাঁচা বিন ফেলে দিলাম ওর মধ্যে। সেদ্ধ করা ফ্রোজেন চিংড়ি ছিল। তাও দিলাম। তারপর কয়েক চামচ নুন। দু'একটা কাঁচালঙ্কা। আর কি দেওয়া যায়! হ্যাঁ, টম্যাটো তো আছে। তা তো সব জিনিসেই চলে। এবার দিলাম কয়েকটা বড় সাইজের টম্যাটো। মাসরুম অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতাও খুব সুস্বাদু, এটাই বা বাদ যাবে কেন?

যখন রান্না শেষ হলো, তখন দেখলাম, যতটা খিচুড়ি হয়েছে তাতে পনেরো-কুড়ি জনের রীতিমতন ভুরিভোজন চলতে পারে। ঘন থকথকে একটা জিনিস। যতোটা পারলাম খেলাম। অমৃতের মতন স্বাদ। নিজের রান্না বলে বলছি না, ও রকম খিচুড়ি পৃথিবীতে একবারই রান্না হয়েছে। বাকিটা ঢুকিয়ে রাখলাম ফ্রিজে।

পরদিন দেখি, সে জিনিসটা জমে শক্ত হয়ে আছে। ছুরি দিয়ে তা থেকে এক টুকরো কেটে নিলাম। বড় এক স্লাইস কেকের মতন। পরে সেটার সঙ্গে জল মিশিয়ে আবার ফুটিয়ে নেবো ভেবে অন্য একটা সস্প্যান রেখেছি, এমন সময় মার্গারিট এসে উপস্থিত। দেখে বললো, এটা কি? কোনো কেক?

—না, এটার নাম খিচুড়ি।

—কে' স ক্য সে?

—তুমি বুঝবে না। খিচুড়ি খুব চমৎকার জিনিস। তোমাদের পিৎজা'র থেকে অনেক ভালো।

—দেন আই মাস্ট টেইস্ট ইট।

সেই ঠাণ্ডা শক্ত খিচুড়ি খানিকটা মুখে দিল। মুখ দেখে মনে হলো, ও যেন সক্রেটিসের হেমলক পানের দৃশ্য অভিনয় করছে। থু থু করে ফেলে দিয়ে বললো, এ রকম বিচ্ছিরি, বাজে, বীভৎস, জঘন্য, নুন পোড়া, অদ্ভুত গন্ধওয়ালা জিনিস আমি আগে কখনো খাই নি। কোনো মানুষ খেতে পারে না। তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাও?

ফ্রিজ খুলে বড় সসপ্যানটা দেখে ও আবার চমকে উঠলো। চোখ গোলগোল করে বললো, তুমি কি তোমার এই সাধের 'কেচুড়ি'—এখানে যতদিন থাকবে কিংবা সারা জীবন ধরে খেতে চাও?

আমি হাসতে লাগলাম। সেই সুযোগে মার্গারিট সমস্ত জিনিসটাই ফেলে দিল ট্র্যাস ক্যানে। আমি হা-হা করে বাধা দিতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে।

মার্গারিট বললো, তুমি মায়োনেজ কি করে বানাতে হয় জানো? কিংবা দুধ দিয়ে ওমলেট? এসো শিখিয়ে দিচ্ছি।

এখানে চিকেন সবচেয়ে সস্তা। তারপর হ্যাম, সবচেয়ে দাম বিফের। পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না, ভেড়ার মাংসে একটা বিটকেল গন্ধ, মাছ বিশেষ কেউ খায় না, আমাদের মাছের মতন স্বাদও নয়। আমি পরপর কয়েকবার মুরগি কিনে আনলেই মার্গারিট বলতো—তুমি কি গরিব হয়ে গেছো নাকি? তুমি কি টাকা জমিয়ে টেকসাসে তেলের খনি কিনবে?

টাকা-পয়সা সম্পর্কে মেয়েটি অদ্ভুত নির্মোহ। আমরা এক সঙ্গে রান্নাবাড়ি শুরু করার পর থেকেই মার্গারিট ওর পুরো মাসের মাইনে আমার টেবলের ড্রয়ারে রাখে, আমার টাকাও সেখানে রাখতে বাধ্য করে। তারপর যেমন খুশি খরচ হয়। ওর মতে, টাকা-পয়সার হিসেব করলে

মানুষের আত্মায় কালোকালো দাগ পড়ে। ওর জামাকাপড় কেনার শখ নেই, কোনো রকম জিনিসের প্রতি লোভ নেই, সবসময় তবু অদ্ভুত এক আনন্দে মেতে থাকে।

এমনও হয়েছে, কোনো-কোনো মাসের কুড়ি–বাইশ তারিখে আমরা একেবারে নিঃস্ব। বাজার করার পয়সা নেই, সিগারেট কেনারও পয়সা নেই। মাস না ফুরোলে আর কোনো জায়গা থেকে কিছুই সম্ভাবনা নেই। আমার তো এরকম অভ্যেস আছেই, কিন্তু মার্গারিটও এই দৈন্য খুব উপভোগ করে। শুধু কফির সঙ্গে শুকনো পাউরুটি চিবোতেই ওর দারুণ আনন্দ! কখনো অবস্থা চরমে উঠলে ও আমাকে ষড়যন্ত্রের সুরে বলে—কার–কার বাড়িতে নেমন্তন্ন জোগাড় করা যায় বলো তো? ডোরিকে ফোন করবো? কিংবা ওয়ল্টার ফ্রিডম্যান তোমাকে একদিন বাড়িতে ডাকবে বলেছিল না? কিংবা ক্রিস্তফ? ক্রিস্তফ তো খুব সলিড!

কখনো–কখনো আমরা হ্যাংলার মতন ঠিক সন্ধেবেলা খাওয়ার সময় নিচের তলায় ক্রিস্তফের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ক্রিস্তফ খুব সাজানো–গুছোনো মানুষ, ঝকঝকে ঘর, নিজে একটা দুটো সিগারেট খেলেও সবসময় চার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট মজুত রাখে। ওর কাছে যে–কোনো সময় পঞ্চাশ, একশো ডলার ধার পাওয়া যায়। এবং ওর ঘরে গেলেই কিছু না কিছু খেতে বলে।

আমরা গেলে ক্রিস্তফ খুশিই হয়। ও এখনো খুব নিঃসঙ্গ। মাঝে–মাঝে মুখখানা খুব বিষণ্ন দেখায়। মেয়েদের সম্পর্কে ওর ঝোঁক খুব বেশি; কিন্তু ঠিক কোনো সঙ্গিনী পায় নি। প্রথম কিছুদিন মার্গারিটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার অনেক রকম চেষ্টা করেছিল, এখন বুঝে গেছে, এখন মার্গারিটের প্রতি ওর ব্যবহার সম্ভ্রমপূর্ণ।

একদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। সেদিনও আমাদের হাতে পয়সা কড়ি কিচ্ছু নেই। সন্ধে থেকে মার্গারিট আর আমি গালে হাত দিয়ে বসে আছি। আমাদের শেষ ভরসাস্থল ক্রিস্তফও বেড়াতে গেছে শিকাগোতে। ভাঁড়ার শূন্য, রাত্রে কী খাবো তার ঠিক নেই। এমন সময় টেলিফোন এল পল ওয়েগনারের স্ত্রী মেরি ওয়েগনারের কাছ থেকে। মেরি জিজ্ঞেস করলো—নীললোহিত, তুমি কি একলা আছো? তোমার কি খাওয়া হয়ে গেছে? তুমি কি একবার আসবে? আমার ভীষণ–ভীষণ একা লাগছে। আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি মরে যাবো! চলে এসো, এক্ষুনি এসো—

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আমি মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলাম, যাবে নাকি? বুড়ি কিছু খাওয়াতে পারে।

মার্গারিট ভয় পেয়ে বলে উঠলো, না, না, না, না, তুমি খবরদার আমার নাম করো না! মেরি ওয়েগনার মেয়েদের একদম পছন্দ করে না, তুমি জানো না? ভীষণ পাগলামি করবে তাহলে। তুমি ঘুরে এসো।

—না, আমিও যাবো না।

—ঘুরে এসো না, আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্য।

তবু আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না, মেরিকে নানা রকম অজুহাত দেবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই সে শুনলো না। ওদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাই, মেরি কক্ষনো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, সুতরাং আমি বেশি রূঢ় হতে পারলাম না। মার্গারিটকে বললাম, বসো, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।

ট্যাক্সি ধরার পয়সা নেই, অনেকখানি রাস্তা প্রায় দৌড়ে–দৌড়ে যেতে হলো। শীতের জন্য দৌড়তে খারাপ লাগে না। এই শীতের মধ্যেও মেরি গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

এখন অনেক চালু হয়ে গেছি। এখন আর মাদার–টাদার নয়। এখন দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলি—হাই মেরি! তারপর কাছে গিয়ে ওর গালে ঠোনা মেরে চুমু দিই। মেরি আমার হাত ধরে

বললো, নটি বয় ! এত দেরি করলে কেন, ট্যাক্সি নিতে পারো নি ?

ট্যাক্সি খুঁজেও পাই নি, এই অজুহাত এখানে খাটে না। টেলিফোন করলে দু' মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি বাড়ির সামনে আসে।

বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। পল ওয়েগনার ওয়াশিংটন ডি.সিতে গেছে জানি। মেরি বললো, দেখো, পল একটাও চিঠি লেখে নি, টেলিফোন করে নি। মেয়েটাও কিছুতেই আমার কাছে থাকবে না। মানুষ দিনের পর দিন একলা থাকতে পারে ?

আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এসে বললো, শুধু নিজের জন্য কারো রান্না করতে ভালো লাগে ? এই শীতের মধ্যে কারুর একা খেতে ভালো লাগে ?

টেবিলের ওপর অনেক রকম খাদ্য। দু'জনের জন্য ডিনার প্লেট পাতা। মেরি বললো, দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসো ?

মেরির কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়ানো। টেবিলের ওপর একটা প্রায়–খালি জিনের বোতল। সারাদিন ধরে বোধহয় ঐ জিন খেয়েছে। বাড়ি থেকে কখনো বেরোয় না, পল না থাকলে এ বাড়িতে কেউ আসেও না, দিনের পর দিন বাড়িতে সম্পূর্ণ একলা কাটানো নিশ্চয়ই কষ্টকর। যথারীতি আজও সে প্যান্ট–শার্ট পরে আছে। কোনোদিন ওকে স্কার্ট বা গাউন পরতে দেখি নি। খর্বকায় বলে ওকে প্রায় একটি কিশোরের মতন দেখায়।

এত ভালো–ভালো খাদ্য, কিন্তু কিছুতেই আমার মুখে রুচছে না। বার বার মনে পড়ছে, মার্গারিট অভুক্ত হয়ে বসে আছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে প্রায়। আমি কী স্বার্থপর ! সেদিনই প্রথম বুঝলাম, অপরকে বঞ্চিত করে নিজে বেশি খাওয়ার মর্ম কি ! ইচ্ছে করছে, সমস্ত খাবারদাবার ছুড়ে ফেলে দিই। মেরি বারবার তাড়া দিচ্ছে—একি, তুমি খাচ্ছো না কেন ? তোমার যদি জিন না পছন্দ হয়, তুমি স্কচ নিতে পারো !

ও তো কিছুই বুঝবে না।

খাওয়া কোনোক্রমে শেষ করে বললাম, এবার আমি যাই !

—এক্ষুনি কি যাবে ? বোকা ছেলে, জানো না, খাওয়া শেষ করে তক্ষুনি যাবার কথা বলতে নেই ?

—আমার একটা জরুরি লেখা আজই শেষ করতে হবে যে !

—জরুরি লেখা অপেক্ষা করতে পারে। কোনো মেয়েবন্ধু অপেক্ষা করে নেই তো ?

—না, না।

—কোনো মেয়েবন্ধু পাও নি এখনো ?

—কোথায় আর পেলাম ? কেউ পাত্তা দেয় না।

—পুয়োর, পুয়োর নীললোহিত। আমারই মতন লোন্‌লি !

মেরি কাছে এসে আমার ঠোঁটে চুমু খেল। এমনিতে ব্যাপারটা নির্দোষই বলা যায়। কিন্তু মেরি আমার মুখের মধ্যে ওর জিভটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝলাম, সেই যে একদিন মাদার বলেছিলাম, তার প্রতিশোধ!

মেরি বললো, এখানে শীত করছে ? চলো, স্টোভের পাশে গিয়ে বসি। লিফ্‌ট মি, টেক মি দেয়ার! ওন্ট যু ?

বসবার ঘরে কৃত্রিম ফায়ার প্লেসের মধ্যে হিটার বসানো। মেরি খুব হাল্কা, তাই ওর কথা মতন ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও আবার আমাকে চুমু খেতে লাগলো। জানি এখন ও কী চায়। সোফার ওপর ওকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, দুঃখিত, আমাকে যেতেই হবে, ভীষণ কাজ, যেতেই হবে...। প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

ফিরে এসে দেখি মার্গারিট ঘুমিয়ে পড়েছে টেবিলে মাথা দিয়ে। যেন বিষণ্ণ সুন্দর একটা ছবি। চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে বুকের ওপর। ওর পিঠে আলতো করে হাত ছোঁয়াতেই চমকে জেগে উঠলো। বললো, তুমি খেয়ে এসেছো তো ?

আমি বললাম, আমি খুব খারাপ, স্বার্থপর, পাজি, নোংরা।

—কেন, কি হয়েছে কি ?

—কেন আমি তোমাকে ফেলে চলে গেলাম ? কেন আমি একা-একা...

—তাতে কিচ্ছু হয় নি। আমি তো কবিতা পড়ছিলাম এতক্ষণ, খুব ভালো লাগছিল।

—পাগলি মেয়ে, খালি পেটে কি কবিতা পড়া যায় ?

ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললাম, তোমার জন্য একটা কেক আর এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে এনেছি।

ও হাততালি দিয়ে বলে উঠলো,ওয়ান্ডারফুল ! ওয়ান্ডারফুল। আর কি চাই ? ইউ ডিজার্ভ আ কিস্।

—দাঁড়াও, আগে মুখটা ধুয়ে আসি।

সিঙ্কে খুব ভালো করে মুখ ধুয়ে মেরির চুম্বনের স্বাদ মুছে ফেললাম। তারপর এসে মার্গারিটকে পুরো ঘটনাটা বললাম। ও বললো, এ তো খুব স্বাভাবিক। এ তো এখানে প্রায়ই হয়, এদের প্রেমহীন জীবন কিনা ! চল্লিশ বছর বয়েস পার হয়ে গেলেই আমেরিকান মহিলারা বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা আলাদা হয়ে যায়, স্বামী বাইরে-বাইরে ঘোরে, ওদের আর তখন কী করার থাকে বলো ! তাছাড়া মেরি তো আজ ড্রাঙ্ক ছিল.

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমরা তৃষ্ণার্তের মতোন পরপর দু'তিনটে করে সিগারেট টানলাম। মার্গারিট বললো, ইস্, এই সঙ্গে যদি একটা ওয়াইন বা এক বোতল কিয়ান্তি থাকতো ! আচ্ছা, কল্পনা করে নাও না, আমরা শ্যামপেন খাচ্ছি, এই বোতল খোলা হল, পং ! এবার গেলাসে ঢালছি—তির তির তির তির—এবার চুমুক দাও।'

আমি ওর বুকে মুখটা ডুবিয়ে ছটফট করতে-করতে বললাম, পাগলি, একদম পাগলি মেয়েটা! মার্গারিট, লক্ষ্মী সোনা, তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো না ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলে, কি জানি ! এখনো বুঝতে পারি না !

—আমি যে আর থাকতে পারছি না !

—আর একটু ধৈর্য ধরো ! প্লিজ...

আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েও এই একটা জায়গায় আটকে আছি। ভালবাসার ওপর মার্গারিটের দারুণ বিশ্বাস। আমি আবার ভালবাসা ঠিক কাকে বলে জানি না। ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি আর কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি নি, মার্গারিটও অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে একদিনও বাইরে কোথাও যায় নি, তবু এর নাম ভালবাসা নয় ? প্রথম যেদিন ওকে বলেছিলাম—তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি—ও আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—বলো না, ও কথা বলো না, যদি মিথ্যে হয় ? পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখের জিনিস যদি ভালবাসাটাও মিথ্যে হয়ে যায়।

আমি একটু আহত হয়ে বলেছিলাম, মিথ্যে কেন হবে ? তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না ?

ও বিষণ্ণভাবে উত্তর দিয়েছিল—কি জানি। সবসময় নিজেকে তো এই প্রশ্নই করছি। আশা করছি একদিন উত্তর পেয়ে যাবো ! একথা ঠিক, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমার এখানে আসতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে, তোমার আদর পেতে আমার যতোখানি ভালো লাগে,

তেমন আর কিছুই আমার ভালো লাগে না এখন। কিন্তু ভালো লাগা আর ভালবাসা কি এক?
ভালো লাগা আর ভালবাসার সূক্ষ্ম তফাত আমি বুঝতে পারি না।

যারা ওকে চেনে, অনেকদিন দেখছে, তারা সবাই জানে, মার্গারিট অত্যন্ত ধার্মিক, স্বভাবটাও নির্মল, কিছুতেই মিথ্যে কথা বলবে না একটাও। অথচ ও দারুণ বোহেমিয়ান এবং প্রচণ্ড রোমান্টিক। একটা ভালো কবিতার লাইন পড়ে পাগল হয়ে যায়। আমাদের দেশের মান অনুযায়ী মদ্যপান ও সিগারেট খাওয়া তো গর্হিত অপরাধ, বিশেষত কোনো ধার্মিক মেয়ের পক্ষে, কিন্তু ওর এ সম্পর্কে কোনো গ্লানি নেই। ও বলে—এই জন্যই তো আমি নান্ হই নি, আমার দু'বোন হয়েছে, আমিই শুধু বাদ। আমি গোমড়া মুখে ঈশ্বরের পুজো করতে পারবো না। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আনন্দ পাবার জন্য না কষ্ট পাবার জন্য !

আমার মতোন নাস্তিক এবং রীতিদ্রোহী ওর আরও কিছু সংস্কার ভেঙে দিয়েছে। আমরা এখন এক বিছানায় শুয়ে ঘুমোই। মার্গারিট একদিন আমাকে স্নান করিয়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। স্নানের ঘরে ঢুকে আমি তোয়ালে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, দরজা ফাঁক করে ওর কাছে তোয়ালে চেয়েছিলাম, ও তোয়ালে নিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকে এসেছিল।

আর একদিন আমার পেড়াপেড়িতে ও আমার সামনে সমস্ত পোশাক খুলে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম—তুমি সুন্দর। আমি একটা সুন্দর জিনিস দেখবো না কেন ? এতে কি দোষ আছে ?

তবু একটা জায়গায় একটা বাধা রয়ে গেছে। ওর ধারণা নারী–পুরুষের মিলন একটা পবিত্র ব্যাপার। নিছক লোভ বা বাসনার জন্য এটাকে ছোট করে ফেলা উচিত নয়। সত্যিকারের ভালবাসা থাকলেই জিনিসটা স্বর্গীয় আনন্দময় হতে পারে। আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করি না ? মানুষের জীবন এত বড়, ভালবাসার সাড়া পাবার জন্য আমরা কি অন্তত একটা বছরও অপেক্ষা করতে পারবো না ?

আমি বলেছিলাম, মার্গারিট, তুমি শরীরের এই একটা ব্যাপারকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছো কেন ? আজকাল তো বাচ্চা–টাচ্চা হবার ভয় নেই, কতো রকম জিনিস বেরিয়েছে।

ও তক্ষুনি দৃঢ়ভাবে বলেছে, তুমি পাগল হয়েছো ? আমি রোমান ক্যাথলিক, আমি অন্য কিছু ব্যবহার করবো ? কক্ষনো না। যদি ভালবাসার কথা টের পাই, আমি তখন কোনো কিছুই গ্রাহ্য করবো না—আমি বিয়ে–ফিয়েও গ্রাহ্য করি না, যদি বাচ্চা হয়, আমি তাকে পবিত্র প্রাণ হিসেবে মানুষ করবো, যদি পথের ভিখিরিও হতে হয়, তবু তাকে নিয়ে আমি পথে–পথে ঘুরবো, কোনোদিন অস্বীকার করবো না...

এক–একদিন আমি থাকতে পারি নি, ওর ওপর জোর করতে গেছি। সব রকম আদরের পর কি থেমে থাকা যায় ? মার্গারিট তখন কেঁদে ফেলেছে। কান্নার সময়ে ফুলে–ফুলে উঠেছে ওর শরীর। আমি লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেছি। এক সময় ও অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে বলেছে—তুমি জানো না আমারও কতো কষ্ট হয়। এক–এক সময় থাকতে পারি না, মনে হয় নির্লজ্জের মতন তোমাকে নিজেই মুখ ফুটে বলে ফেলি, টেক মি, টেক মি ! তারপরই নিজের মুখ চাপা দিই। যদি ভালবাসার অপমান করে ফেলি ! এই দেখো, ছুঁয়ে দেখো, এখনো আমার শরীরে কত তাপ, ঠিক যেন জ্বালা করছে...শোনো নীল, তুমি যদি সহ্য করতে না পারো, যদি তোমার শরীরের দাবি খুব বেশি হয়, তুমি অন্য যে–কোনো মেয়ের কাছে যেতে পারো, এরকম মেয়ে তো এখানে অনেক পাবে—আমি কিন্তু তবুও আসবো, আমাকে তাড়িয়ে দিও না—

সেই সময় মার্গারিটের মুখ কী অপরূপ সুন্দর দেখায়। মনে হয় বাঁতচেল্লি ওকে দেখেই সব ছবি এঁকেছেন। মার্গারিটকে ছেড়ে আমি কি অন্য আর কোনো মেয়ের কাছে যেতে পারি ? আমি

কি পশু!

মাসের গোড়ার দিকে যখন আমাদের হাতে বেশ টাকা-পয়সা থাকে, তখন আমরা ঘন ঘন পার্টি দিই আমার ঘরে। আমরা বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করি না, অন্য বড়-বড় পার্টিতেও যাই না, তাই অন্যদেরই ডাকি আমাদের এখানে। মার্গারিট এই ধরনের পার্টি খুব ভালবাসে।

এখন আর শুধু তুষারপাত নয়, রাস্তাঘাটে কয়েক ফুট বরফ জমে আছে। উইলো গাছগুলোর গায়ে থোকা-থোকা ফুলের মতন বরফ। নানারকম তাদের আকৃতি। গাড়ি চলার রাস্তাগুলো থেকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বরফ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবার পথে একটা দোকানের মাথায় একটা বিরাট ঘড়ির মতন ব্যারোমিটার বসানো, তাতে দেখা যায় তাপাঙ্ক কত নামছে। যেদিন কাঁটাটা শূন্যের নিচে নেমে গেল, সেদিন আমরা সেই উপলক্ষে একটা মস্তবড় পার্টি দিলাম।

কয়েক ডজন বিয়ার, দু'তিন বোতল স্কচ আর কিছু ওয়াইন কিনে আনলাম। মার্গারিট রান্না করলো চিংড়ি মাছ আর মাসরুম মেশানো ভাত; ম্যাসড্ পোটাটো বা আলুসেদ্ধ মাখা, মাছের রোস্ট, স্যালাড, আর গরম-গরম স্টেক বা মাংসের চাক্তি ভেজে দেবে। তারপর স্ট্রবেরি আর ক্রিম। বেশ এলাহি ব্যবস্থা। পাঁচটি যুগল এসেছে, আমার ঘরে জায়গা কম বলে বসতে হয়েছে মেঝেতেই। কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলে আড্ডা জমে।

ক্রিস্তফের সর্দি সারে নি বলে ও আসতে চাইছিল না। নিচ থেকে জোর করে ধরে আনলাম। এইটুকু জায়গায় নাচের সুবিধে নেই বলে সবাই মিলে গান ধরলাম। ডোরি বেশ ভালো পল্লীগীতি গায় এবং নিগ্রো ব্লু। একটা গান বারবার গাইতে লাগলো—ভার্জিন মেরি হ্যাড ওয়ান সান, ও হেলিলুইয়া। সাম কল হিম মাইকল্, আই কল হিম ডেভিড, ও হেলিলুইয়া।

মার্গারিট গাইলো কয়েকটা ফরাসি গান। তার মধ্যে একটা গান প্যারিসের বেশ্যাদের, অথচ ফ্রান্সে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও নাকি গানটা জানে: জ্য শার্শঅ ফরতুন তুতান্তু দু শা নোয়া ও ক্রেয়ার দ্য লা লুন আ মমার্ত ল্য স্যয়ার...কী করুণ সুর গানটার। এই গানটারই একটা লাইন পরে অনেকদিন আমরা কথায়-কথায় ব্যবহার করেছি: জ্য নে পা দারজঁ—আমার টাকা নেই, আমার টাকা নেই।

সবাই আমাকে একটা গান গাইবার জন্যও চেপে ধরলো। খুব বেশি সাধাসাধির প্রয়োজন হলো না অবশ্য, আমি প্রায় আর একবার সাধিলেই গাহিব অবস্থায় বসে ছিলাম। কিছু না ভেবেচিন্তেই আমি একটা গান ধরলাম :

> অ্যারাইজ ই প্রিজনার অব স্টার্ভেশান
> অ্যারাইজ ই রেচেড অব দা আর্থ
> ফর ফাস্ট ইজ থান্ডার্স কনডেমনেশান
> এ্যান্ড দি নিউ ওয়ার্ল্ড ইজ ইন দা বার্থ ...

খানিকটা গাইবার পর দেখলাম, কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছে না, সবাই গম্ভীর। একটু খটকা লাগলো। আমার সঙ্গীত-প্রতিভার এমন সমাদর আগে তো কখনো দেখি নি !

একটু থামতেই স্ট্যান বললো, এটা কি গান ? একটা বাংলা গান গাইছে না কেন ?'

ক্রিস্তফ আমার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সুরে বললো, এটা তো কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল—এটা কি এখানে গাইতে হয় ?

—কেন, কি হয়েছে ?

—তোমার পেছনে পুলিশ লাগলে বুঝতে পারবে।

মার্গারিট বললো, কিন্তু গানটা তো চমৎকার।

সম্ভবত কিছুদিন আগে সেই রাশিয়ান কবিকে দেখে কিংবা মার্গারিটের গানে দারিদ্র্যের কথা ছিল বলেই গানটা আমার মাথায় এসেছিল। যাই হোক, গানটা একবার গেয়েছি যখন, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতেই হবে। আমি বললাম, পৃথিবীতে যত ভালো গান আমি শুনেছি, এটা তার মধ্যে একটা। ভালো গান হিসেবেই এটা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া এ গানটা পল রোবসনের রেকর্ড আছে, আমেরিকানরা কি শোনে না ?

ক্রিস্তফ বললো, তা শুনতে পারে। কিন্তু তুমি একজন বিদেশী, তোমার ব্যাপার আলাদা। যদি শুধু শুধু ঝঞ্ঝাটে পড়ো।

মার্গারিট বললো, আমেরিকানরা অবশ্য এরকম অনেক বোকামি করতেও পারে। একবার আমি শুনেছিলাম নিউইয়র্কে...

ক্রিস্তফ চুপ করে গেল। সে নিজে কমিউনিস্ট দেশের লোক, সেইজন্যই সে এখানে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না।

কিন্তু মার্গারিটের কথায় স্ট্যান বেশ চটে গেল। সে শ্লেষের সঙ্গে বললো, যে-কোনো সুযোগে আমেরিকানদের নিন্দে করতে পারলে ফ্রেঞ্চ পিপলদের বেশ আনন্দ হয়, তাই না ? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আমরাই ফ্রান্স উদ্ধার করেছিলাম, প্যারিস শহরটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম কি না। উপকারীকে আক্রমণ করাই নিয়ম।

মার্গারিট উত্তর দিতে যেতেই ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। সবাই মিলে থামানো হলো ওদের। জর্জি নামে একটি ছেলে ঈষৎ নেশাগ্রস্ত জড়িত গলায় বললো—টু হেল্ উইথ আমেরিকা, টু হেলছ উইথ ফ্রান্স। আর উই গড ড্যাম ডিপ্লোম্যাটস্ হিয়ার ? সিংগ বেবি, সিংগ।

সে ডোরিকে একটা ধাক্কা মারলো। ডোরি আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললো, নীল, তোমাকে একটা ব্যাপারে অ্যাসিওর করতে পারি, তুমি যে-রকম ইচ্ছে গান গাইতে পারো, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। ইট্‌স আ ফ্রি কান্ট্রি। আমরা চাইছিলাম, তুমি তোমার নিজের দেশের একটা বাংলা গান গাইবে।

আমি যদি ঐ গানটারই বাংলায় নজরুলের অনুবাদ শুনিয়ে দিতাম, কেউ কিছু বুঝতো না। চেপে গেলাম। অন্যরা গান শুরু করলো। কিন্তু সুর কেটে গেছে, আর জমছে না।

পার্টিটা তারপরেও আর জমলো না। খাওয়া-দাওয়ার একটু পরই ক্রিস্তফ হঠাৎ সিঙ্কে গিয়ে বমি করলো। ও সাধারণত হুইস্কি-টুইস্কি বেশি খায় না—কিন্তু কোনোক্রমে মাথায় নেশা চড়ে গেছে। ওকে শুইয়ে দিয়ে আসা হলো ওর ঘরে।

তার একটু পরেই ডোরির একটা টেলিফোন এলো আমার ঘরে। দারুণ দুঃসংবাদ। ডোরির বাড়ির একটি মেয়ে টেলিফোন করে জানালো যে লিন্ডা সাঙ্ঘাতিক একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে, বাঁচবে কি না ঠিক নেই। লিন্ডা সেই টেক্সাসের মেয়েটি, যে মার্গারিট আর ডোরির সঙ্গে প্রথম এসেছিল আমার এখানে। পরেও অনেকবার দেখা হয়েছে, খুব ডাকাবুকো ধরনের মেয়ে, দুর্দান্ত গতিতে গাড়ি চালায়। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সিডার র‍্যাপিডসে, ডোরি তক্ষুনি এখানকার একজনের গাড়িতে চলে গেল।

আস্তে-আস্তে চলে গেল অন্য সবাই। মার্গারিট একটু রয়ে গেল জিনিসপত্র খানিকটা গুছিয়ে রাখবার জন্য। জিনিসপত্র তুলতে আমি ওকে সাহায্য করলাম খানিকটা। মার্গারিট ডিসগুলো এখনই ধুয়ে রাখবে—এবং আমার সাহায্য ও চায় না। আমি ওকে সেখানেই রেখে ঘরে ফিরে এসে গেলাসে আরও খানিকটা স্কচ ঢেলে বসলাম। উৎসব অকস্মাৎ ভেঙে গেলে মেজাজটা ভালো লাগে না।

হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি বেসিনের সামনে গিয়ে, দেখি,

মার্গারিট ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

আরও বেশি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো—লিন্ডা...লিন্ডা—এতো ভালো মেয়ে ...

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, ও তো এখনও ...মানে ...ওরা বললো,... বেঁচে উঠবে।

— এখন কত কষ্ট পাচ্ছে? লিন্ডা কতো কষ্ট পাচ্ছে!

কোন্ ভাষায় ওকে সান্ত্বনা দেবো! জানিই তো মার্গারিটের মনটা কতো নরম। কিছুতেই ও অন্য কারুর বিপদ বা কষ্টের কথা সহ্য করতে পারে না।

ওকে ধরে-ধরে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে দিলাম। কিছুতেই ওকে সামলানো যায় না। একটু আগে যে আমেরিকানদের নিন্দে করছিল, এখন সে একটি আমেরিকান মেয়ের জন্য আকুল হয়ে কাঁদছে।

ওকে জোর করে খানিকটা ব্র্যান্ডি খাওয়ালাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদে খানিকটা শান্ত হলো। ওকে কথা দিলাম, কাল সকালেই ওকে সিডার র্যাপিডস্-এর হাসপাতালে নিয়ে যাবো। এবং ওকে কবিতা পড়ে শোনাতে হলো।

রাত দেড়টা বাজে। হস্টেলে ওকে একটার মধ্যে ফিরতে হয়। শনিবার দিন অতিথিরা রাত দুটো পর্যন্ত হস্টেলের মধ্যে থাকতে পারে। আমিও গেছি কয়েকবার ওর ঘরে; মেয়েদের হস্টেলে জীবনে আগে কখনো ঢুকিই নি। তাও রাত দুটো পর্যন্ত সেখানে থাকা! আমার নিজেরই খুব লজ্জা করছিল, কিন্তু অন্য কেউ কিছু মনেই করে না।

আজ অবশ্য মার্গারিট হস্টেলে ফিরবে না। আজ আবার যাবে বব বাকল্যান্ডের বাড়ি পাহারা দিতে। বব বাকল্যান্ড বিরাট ধনী, প্রায়ই সপরিবারে ইওরোপ যান, সেই সময় বাড়ি পাহারা দিয়ে মার্গারিটের একশো ডলার উপার্জন হয়।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তবু বেশি হুইস্কি খেয়েছিলাম বলে হঠাৎ একবার বুঝি আমার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। মার্গারিট বললো, এই, তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো। আমি তাহলে চলি এবার।

বই মুড়ে রেখে মার্গারিট উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মার্গারিট প্রবল আপত্তি জানাতে লাগলো। কিন্তু সেটা তো কোনো কথা হতে পারে না। বাইরে নিঃশব্দে বরফ পড়ছে। তুষারপাতের সময় মোটেই বেশি শীত করে না। কনকনে শীত করে যখন হাওয়া দেয়, তখন মনে হয় নাকটা যেন খসে পড়বে শরীর থেকে। এখন তুষারপাত হচ্ছে সোজাসুজিভাবে, হাওয়ায় উড়ছে না, সুতরাং কোনো বিপদ নেই। গরম গেঞ্জি, তারপর জামা, তারপর সোয়েটার, তার ওপরে ওভারকোট চাপিয়ে, গলায় মাফ্লার এবং হাতে গ্লাভস পরে নিলাম। মার্গারিটকেও পরিয়ে দিলাম যাবতীয় গরম জামাকাপড়। ওর ওভারকোটের নিচে জড়িয়ে দিলাম আমার দেশ থেকে আনা শাল।

নিঃশব্দে বরফ পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করছে এখন। চার-পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। মার্গারিটের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এত জামা সত্ত্বেও শীতে মাঝে-মাঝে কাঁপন ধরাচ্ছে অবশ্য, তবু তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড এক ভালো-লাগা। এর নামও কি ভালো-লাগা না ভালবাসা? মাঝে-মাঝে আমি ওর মুখ চুম্বন করছি। ও গ্লাভস পরে নি বলে হাতটা গরম করার জন্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার কোটের মধ্যে। এক জায়গায় খানিকটা জলমতন জমেছে, সেখানটা আমি মার্গারিটকে কোলে করে নিয়ে গেলাম। আমাকে সবসময় শক্ত বরফের ওপর সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। একবার পা পিছলোলেই আলুর দম!

আয়ওয়া নদীটা একদম জমে শক্ত হয়ে গেছে। যেন ধপধপে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা রাস্তা। মার্গারিট বললো, চলো, আমরা ব্রিজের ওপর দিয়ে না গিয়ে, নদীর ওপর দিয়েই হেঁটে

যাই।

—চলো।

ব্রিজ থেকে নামতে গিয়েও থেমে গিয়ে ও বললো, না, থাক। যদি তোমার কোনো বিপদ হয় ?

—কেন ?

—কোথাও বরফ একটু পাতলা থাকলে হুস করে ভেঙে ভেতরে ঢুকে যেতে পারো। তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। দিনের বেলা আসবো।

—ওরে পাগলি, তাতে শুধু আমার একার বিপদ হবে কেন ? তুমিও তো পড়ে যেতে পারতে।

—সে আমার যা হয় হতো, কিন্তু তোমার কোনো বিপদ হবে, একথা ভাবলেই আমার ...

কী এর নাম ? ভালবাসা না ?

অর্ধেকের বেশি পথ আসবার পর মার্গারিট থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আপন মনে বললো—আমি একটা ব্লাডিফুল।

—কেন, কী হলো ?

—এই ঠাণ্ডার মধ্যে তোমাকে নিয়ে এলাম কেন ? আমিই তো তোমার ওখানে থেকে গেলেই পারতাম। কাল ভোরে চলে আসতাম।

—চলো, ফিরে চলো।

—এখন ফিরতে গেলে বেশি পথ যেতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করো না—তুমি এসো—তুমি বাকল্যান্ডের বাড়িতেই থেকে যাবে। তোমাকে তো ভোরে ফিরতেও হবে না। রাজি!

—নিশ্চয়ই রাজি। কোনো অসুবিধে নেই তো ?

—কিসের অসুবিধে! বাড়িতে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে জুতোর বরফ ঝেড়ে ফেলে ঢুকলাম ভেতরে। হঠাৎ ভেতরে এলে যেন বেশি শীত করে। আমি মার্গারিটের মুখে আর বুকের জামার মধ্যে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে ওকে গরম করে দিতে লাগলাম। ও আমার বুকে জোরে-জোরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

একটা কুকুর ডেকে উঠলো ঘাউ-ঘাউ শব্দে। অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। মার্গারিট বললো, ভয় নেই, বাঁধা আছে।

বব বাকল্যান্ডের বাড়িটা হলিউডের ফিল্মের বাড়ির মতন সাজানো। বিরাট-বিরাট ঘর। বসবার ঘরের বাইরেই অলিন্দে একটা বার কাউন্টার রয়েছে, তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি বোতল সাজানো। মার্গারিট বারের ওপাশে গিয়ে বললো, ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান আই সার্ভ ইউ ?

কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে মুখটা ঝুঁকিয়ে আমি বললাম, 'শ্যাল আই হ্যাভ টু পে ? অর, অন দা হাউস ?

—অন দা হাউজ, অফকোর্স।

—কোনিয়াক, সিল ভু প্লে।

গেলাসে ফরাসি ব্র্যান্ডি ঢেলে বললো—ইসি মঁসিউ।

—ম্যার্সি। আ ভত্‌র্ সান্তে।

এইরকম খেলায় আমরা খানিকক্ষণ হাসাহাসি করলাম। তারপর আমি কাউন্টারের ওপর উঠে বসে ওর গলা ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, দুষ্টুমণি, এ বাড়িতে আমাকে আগে নিয়ে আসো নি কেন ?

ও লাজুকভাবে বললো, আমি একটা বোকারাম কি না। মনে আছে, যেদিন তুমি প্রথম

আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলে ? সেদিনই আমি ভেবেছিলাম, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ও ফিরে গেল কেন ? এত বড় বাড়ি, ও তো অনায়াসেই এখানে থাকতে পারতো। লজ্জায় তোমাকে কথাটা বলতে পারি নি। এখন ইচ্ছে করে ঠাস-ঠাস করে নিজের গালে চড় মারতে।

—মার্গারিট, আমাকে কি একটুও ভালবাসো না ?

—তোমাকেই, শুধু তোমাকেই ভালবাসতে চাই।

—আমি তোমাকে যতটা ভালবাসি, তার চেয়ে বেশি কী করে ভালবাসতে হয় জানি না। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলবো ?

—বলো।

—আমি এখানে আসবার আগে মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কিছুতেই মেম বিয়ে করবো না। কিন্তু তুমি তো মেম নও। তুমি তো কোনো দেশেরই মেয়ে নও। তুমি শুধু আমার। কাল-পরশুই আমরা বিয়ে করতে পারি না ?

মার্গারিট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। শোনো, নীল, তুমি কি ভেবেছো, বিয়ের জন্যই আমার সবকিছু আটকে আছে ? আমার ওরকম নীতিবোধ নেই। আই ডোন্ট কেয়ার ফর ম্যারেজ। ওটা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানলেও হয়, না মানলেও হয়—বেশিরভাগ মানুষই মানে কিছু সুবিধের জন্য। আমি তো কোনো সুবিধের কথা ভাবছি না। আমি শুধু ভাবছি, আত্মার কাছে যাতে কোনো ছলনা না করি। তুমি কি খুব ব্যস্ত হয়ে গেছো ? আর কিছুদিন অপেক্ষা করা যায় না ?

আমি বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা, সত্যি, বড্ড অধৈর্য হয়ে পড়ি। তোমার চেয়ে আমি অনেক দুর্বল।

আমরা দোতলায় গিয়ে সব ক'টা ঘর ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলাম। সব ক'টা ঘরই গোল। অন্তত চারখানা শয়নকক্ষ, তার প্রতিটিতেই আরামের সব রকম উপকরণ। প্রকাণ্ড খাটে দুধ-সমুদ্রের মতন বিছানা পাতা। মস্তবড় কাচের জানালা, বাইরে দেখা যায় ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে, অথচ ভেতরটা উষ্ণ।

মার্গারিট বললো, দেখেছো, আমরা এখানকার যে-কোনো ঘরের যে-কোনো বিছানায় শুতে পারি। কিন্তু প্রতিবাদ হিসেবে আমরা এর কোনোটাতেই শোবো না।

—কিসের প্রতিবাদ ?

—এদের এতো ঐশ্বর্যের ! দিস ভালগার ডিসপ্লে অব ওয়েল্‌থ! এদের এতো আরামপ্রিয়তা, এদের কালচার মানেই হচ্ছে কমফর্ট ... আমরা আজ ঘরের মেঝেতে শোবো।

দুটো কম্বল নিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, তাও কম আরামদায়ক নয়। পাশাপাশি শুয়ে রইলাম অনেক-অনেকক্ষণ ঘুমহীন চোখে।

১০

দেখতে-দেখতে বছর প্রায় ঘুরে এলো। পল ওয়েগনার একদিন তার অফিস ঘরে ডেকে একটা ফর্ম দিয়ে বললো, এটায় সই করে দাও!

—কি এটা ?

—তোমার আগামী বছরের স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত। আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতে হয় কিনা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে-আস্তে বললাম, এতে তো অনেকগুলো ঘর

ভর্তি করতে হবে। আমি পরে ফিল আপ করে তোমাকে দিয়ে যাবো।

কাগজটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন ঝড় বইতে শুরু করেছে। আর একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আরও এক বছর এখানে থাকবো কি থাকবো না ? কেন থাকবো ? কেন চলে যাবো ? আমার কোনো পিছুটান নেই।

তবু একটা কথা কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিচ্ছে। আমার জায়গা এখানে নয়। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র বা গবেষক, তাদের এখানে অনেক রকম উপকার হতে পারে বটে, কিন্তু আমি কী মাথামুণ্ডু করছি ?

আমি বেড়াতে ভালবাসি। মাঝে–মাঝেই এখান থেকে এদিক–সেদিক বেরিয়ে পড়ি, উঠে পড়ি যে–কোনো দিকের বাসে, তখন চক্ষু ও মন ভরে যায়। প্রকৃতি এদেশে সম্পূর্ণ অকৃপণ। সবকিছুরই মধ্যে যেন বিরাটত্বের স্পর্শ আছে। খুব উঁচু কোনো পাহাড় নেই আমেরিকায়, এছাড়া আর সবকিছুই বিশাল।

ভ্রমণ ছাড়া, যখন থাকতে হয় আয়ওয়ায়, তখন কিছুই করার থাকে না। কিংবা কাজের নামে ছেলেখেলা। মাঝে–মাঝে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাছাড়া সর্বক্ষণ নিজের ঘরে। দু'একটা প্রবন্ধ, কিছু কবিতার অনুবাদ করেছি অতিকষ্টে, তবু সবসময়েই মনে হয় যেন পণ্ডশ্রম। অতি উৎসাহী দু'চারজন ছাড়া এসব জিনিস এদেশে আর কার কাজে লাগছে ? সেয়োমিনি ভাষার কবিতা যদি অনুবাদ হয় বাংলায়, ক'জন পড়ে ? তাছাড়া আমার ইংরেজি শুদ্ধ করে দেবার ভার পড়েছে যার ওপর, তার সঙ্গে প্রায়ই মতের অমিল হয়। শ্মশানবন্ধুর ইংরেজি যখন সে বলে 'পল বেয়ারার', তখন ঠিক মেনে নিতে পারি না। পল বেয়ারার শুনলেই কালো পোশাক পরা কিছু গম্ভীর চেহারার মানুষের চেহারা মনে পড়ে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের কোমরে গামছা–বাঁধা, বল হরি হরিবোল চিৎকার করা ছোকরাদের কোনো মিলই নেই। তখন মনে হয়, এই অনুবাদ–ফনুবাদ আমার কম্মো নয়। আমার কাজ আমার নিজের দেশে। সেখানে আমি জলের মাছ।

পল ওয়েগনার অবশ্য আমার কর্মহীনতা বা আলস্যকেও উৎসাহ দেয়। সে বলে, কোনো চিন্তা নেই, দেখো না, এর থেকেই একদিন না একদিন কাজের উৎসাহ বেরিয়ে আসবে। তোমার নিজস্ব কাজ। প্রত্যেক মানুষেরই প্রস্তুতি দরকার। সেই প্রস্তুতি যদি এক বছর, দু'বছর বা তিন বছরেও হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। লোকটি সত্যিই ভালো।

এদেশের সাধারণ লোকেরা অধিকাংশই তো ভালো মানুষ। পৃথিবীর সব দেশের সাধারণ মানুষের মতনই। এদের অবস্থা বেশি সচ্ছল বলেই অন্যান্য বিলাসিতার মতন দয়ালু হবার বিলাসিতাও করতে পারে। সারা সপ্তাহ দুর্দান্ত দৈত্যের মতন পরিশ্রমের পর সপ্তাহান্তে প্রাণভরে ফুর্তি করে—কিন্তু চার্চগুলো কখনো ফাঁকা থাকে না। এরা স্বভাবতই পরোপকারী, সচরাচর মিথ্যে কথা বলে না। আর একটা খুব বড় গুণ, এরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে না। অন্যের কথা খুব মন দিয়ে শোনে, বিদেশী অতিথির নাম যতই কঠিন হোক, ঠিক মনে রাখার চেষ্টা করে এবং কোনো একটা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে পরিষ্কার বলে, এটা তো জানি না আমি। আমাদের মতন কোনো একটা বিষয়ে কিছু না জেনে কিংবা অর্ধেক জেনেও অনেকক্ষণ কথা বলার অভ্যেস নেই এদের। এবং কিছুতেই অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাবে না। যেহেতু আমেরিকানদের কোনো ঐতিহ্য নেই এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা এখানে এসে বাসা বেঁধেছে, তাই এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত প্রবল।

এক এক সময় মনে হয়, বড় শহরের বদলে আমি এই আধা গ্রামে থেকেছিলাম বলেই এদেশের মানুষগুলোকে ভালো করে চিনতে পেরেছি। এই শান্ত নিরুপদ্রব জীবন দেখে বিশ্বাসই করা যায় না এদেশেই আছে কু ক্লুক্স ক্ল্যান বা বার্চ সোসাইটির মতন হিংস্র দল! অ্যালাবামার

পুকুরে দু'টি নিগ্রোর মৃতদেহ ভাসতে দেখে কয়েকটি সাদা ছেলে মন্তব্য করেছিল, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে, আমরা তো মাছেদের খাদ্য হিসেবে মাঝে–মাঝেই নিগারের মাংস ছুড়ে দিই! অবশ্য আমাদের দেশেও এখনো হরিজন হত্যা হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তা প্রধান খবর হয় না।

শুধু সাদা–কালোর দ্বন্দ্বই নয়। দেশজুড়ে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা বা রোমহর্ষক ডাকাতির খবর শুনে মাঝে–মাঝে বুক কেঁপে ওঠে। তার ওপরে আছে এফ বি আই এবং সি আই এ'র কীর্তিকলাপ। যে–কোনো সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল, অথচ সরকারি নীতিতে যেন তার স্থানই নেই। এফ বি আই দেশের বিশিষ্ট লোকদের বাথরুমে পর্যন্ত ওত পেতে থাকে, আর সি আই এ অন্য রাষ্ট্রগুলোর রান্নাঘরেও নাক গলায়। সি আই এ'র কার্যকলাপ এতই গোপন আর জটিল যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতন সে মাঝে–মাঝে নিজের স্রষ্টাকেও আঘাত করতে যায়। সি আই এ নাকি তার প্রধান কর্তার ওপরেও তার অজ্ঞাতসারে নজর রাখে। কে সেই হুকুম দেয় ? পৃথিবীর যে–কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান খুন বা বড়–বড় হত্যাকাণ্ডের পিছনে সি আই এ'র ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠলে তা চট করে অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যার পরেও তার পেছনে সি আই এ'র হস্তক্ষেপের দৃঢ় অভিযোগ উঠেছিল।

তবে, এদেশের সংবাদপত্রগুলো সি আই এ'র চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান এবং তৎপর। সি আই এ'র বীভৎস এবং অসংখ্য চোরাগোপ্ত কুকীর্তির খবর এদেশের বড়–বড় সংবাদপত্রেই প্রমাণ সহযোগে ছাপা হয়ে যায়। সি আই এ আজ পর্যন্ত তার কোনো প্রতিশোধ নিতে পারে নি। এদেশের বিপুল ঐশ্চর্য, বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ, বড়–বড় মনীষী, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতনই, এখানে অপরাধ ও পাপের আকারও প্রকাণ্ড। অধিকাংশ আমেরিকানদের সঙ্গে আলাদা কথা বললে দেখা যাবে সে চমৎকার মানুষ, কিন্তু সব মিলিয়ে দেশটা কোন্ দিকে যাচ্ছে, কেউ জানে না।

অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। একটা রাস্তার মোড়ে দেখলাম চমৎকার একটা টেবিল ল্যাম্প পড়ে আছে। আমার একটা টেবিল ল্যাম্প দরকার এবং জিনিসটা এতই সুন্দর যে আমার নেবার ইচ্ছে হলো। নিলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। এদেশে পুরোনো জিনিস বিক্রি হয় না বললেই চলে। মাত্র দু'তিন বছরের পুরোনো ঝকঝকে চেহারার হাজার–হাজার মোটর গাড়ি ক্রেতার অভাবে অটোমোবিল গ্রেভ ইয়ার্ডে পড়ে থাকে। নিত্যনতুন ফ্যাসন অনুযায়ী জিনিসপত্র বদলানো এদেশের রেওয়াজ। পুরোনো অটুট জিনিসপত্র এরা অবশ্য নষ্ট করে না, বড়–বড় রাস্তার মোড়ে সযত্নে রেখে আসে, অন্য কারুর দরকার হলে তুলে নিয়ে যেতে পারে। গরিবরা বা বিদেশী ছাত্ররা এইসব জিনিস নিয়ে গিয়ে ঘর সাজাতে পারে অনায়াসেই। অবশ্য পুরোনো মোটর গাড়ি এইভাবে ফেলে যাওয়া যায় না, পার্কিং স্পেশ নষ্ট হচ্ছে বলে পুলিশ ফাইন করে, সেইজন্যই অনেকে পুরোনো গাড়ি পাহাড়ী রাস্তায় নিয়ে গিয়ে নিচের খাদে ফেলে দিয়ে দুর্ঘটনা বলে চালায়। ভেতরে আরোহী না থাকলে এইসব 'দুর্ঘটনায়' ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেয় না।

টেবিল ল্যাম্পটা আমার বেশ পছন্দ হলো, কিন্তু সেটা তুলে নিয়েও আবার রেখে দিলাম। কী হবে এত সব জঞ্জাল বাড়িয়ে ? আমি আর এখানে কতোদিন থাকবো ? আমার কি এখানে শিকড় আছে ? খাদ্যের অভাব নেই, প্রচুর আমোদ–প্রমোদের উপকরণের অভাব নেই, তবু মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা। এদেশে কেউ কাজ না করে বসে থাকে না, সেইজন্যই মনে হয়, আমাকেও কিছু কাজ করতে হবে। এবং আমার কাজ এখানে নয়। বিভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল গরিব এক দেশেই আমার নিয়তি বাঁধা।

এখানে এখন একমাত্র আকর্ষণ মার্গারিট। ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারি না! ওর জন্য আমি দেশ–কাল–সমাজ সবই ত্যাগ করতে পারি। এমন সারল্যময় মাধুর্যের স্পর্শ তো কখনো জীবনে আর পাই নি। এর চেয়ে বেশি কী আছে ? যতোক্ষণ ওর সঙ্গে থাকি—তখন আর পৃথিবীর কোনো কথাই মনে পড়ে না।

যখন মার্গারিট থাকে না, যখন আমি একা, তখন প্রায়ই থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। পুরুষ মানুষ হিসেবে আমার মধ্যে একটা ছটফটানি জাগে। কাজ ছাড়া পুরুষ মানুষ বাঁচতে পারে না। এখানে একটা চাকরি–বাকরি অনায়াসে জুটিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু সেরকম কাজ তো কখনো করতে চাইনি। আমার নিজস্ব কিছু কাজ থাকার কথা ছিল না ? কিছু লেখার চেষ্টা করলেও মন বসে না। বাংলা ভাষার সাহচর্য ছাড়া বাংলায় লেখা যায় না। এখানে একদিনও বাংলায় হাসতে পর্যন্ত পারি না। স্থানীয় বাঙালিরা আমার সংসর্গ ত্যাগ করেছে। আমার ঘরে সবসময়েই কোনো মেয়েছেলে থাকে বলে তারা কেউ–কেউ আমাকে হিংসে, কেউ–কেউ ঘৃণা করে। তাদের সঙ্গে মেশার খুব একটা আগ্রহও আমি কখনো বোধ করি নি, কেউ ঠিক আমার টাইপ নয়।

মার্গারিটকে রিসার্চ শেষ করার জন্য এখানে আরও অন্তত দু'বছর থাকতে হবে। সেই দু'বছর আমি কি করবো ? টেবিলের ওপর পল ওয়েগনারের দেওয়া ফর্মটা এখনো রাখা আছে—কয়েকদিন ওর সঙ্গে দেখাই করি নি।

শীত শেষ হয়ে বসন্তকাল এসে গেছে। রাস্তার দু' ধারের জমাট বরফ ফাটিয়ে প্রথম একদিন একটা ঘাসের মতন চারাগাছ উঠেছিল। কয়েকদিন বাদেই দেখলাম তার ডগায় সিঁদুরের টিপের মতন একটা লাল ফুল। এ যেন প্রাণশক্তিরই অপূর্ব প্রকাশ। এতদিন প্রচণ্ড শীত আর বরফের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল গাছটা। মার্গারিট সেই ফুলটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিল, হোয়াট আ কিউট লিট্‌ল থিং! এদেশে লিট্‌ল কথাটা খুব সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে। জিভের ডগায় আদর করার মতন বলে, লিল্‌ল।

আস্তে–আস্তে আরও কয়েকটা ফুলগাছ মাথা তুললো। তারপর অজস্র ফুলের সমারোহ। নদীর দু'ধারে চেরি গাছগুলোতে থোকা–থোকা সাদা ফুল। বড়-বড় বাড়িগুলোর বিশাল দেওয়াল জোড়া নীলমণি লতা। আমাদের বাড়ির পর্চের সামনেই দু'টি ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্ডিফ্লোরা গাছ। কে জানতো এর ফুল এতো সুলভ! বসন্তকালে ব্লুমিংটন ইন্ডিয়ানায় বেড়িয়ে এলাম কয়েকদিনের জন্য।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে মার্গারিট ফিরে এলো বেশ উত্তেজিতভাবে। হাতে একটা টেলিগ্রাম। ফ্রান্স থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, ওর মায়ের খুব অসুখ। এক্ষুনি চলে এসো।

টেলিগ্রামটা অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলো মার্গারিট। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে চায় না। বারবার বলতে লাগলো—আমার মায়ের গত কুড়ি বছরের মধ্যে একবারও অসুখ করে নি! কোনোদিন দেখি নি মাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে। বাবা তো খুব নিষ্কর্মা, মা–ই বাড়ির সব কাজ করেন!

আমি বললাম, কুড়ি বছর যার অসুখ করে না, তাঁর যে কখনো অসুখ করবেই না, এর তো কোনো মানে নেই!

—না, তুমি জানো না! এর অন্য মানে থাকতে পারে। আমি তো প্রতি বছর একবার করে বাড়ি যাই! এবার শীতকালে যাই নি, তাই হয়তো আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

তারপর লাজুকভাবে বললো, আজকাল বেশি চিঠিও লিখতাম না। তোমার জন্যই তো—একদম সময় পাই নি!

—যাও না, তাহলে একবার ঘুরে এসো।

—কিন্তু আমার যে অনেক কাজ। মঁসিউ অ্যাসপেলের সঙ্গে আমার থিসিসের স্কিম নিয়ে বসবার কথা—

সন্ধের দিকে মার্গারিট দুর্বল হয়ে পড়লো। যদি সত্যিই মায়ের অসুখ হয়? মাকে একবার দেখবে না? বছরের পর বছর বাড়ি থেকে অনেক দূরে থেকেছে মার্গারিট, কিন্তু এখন ওর অনবরত বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগলো। আমাকে বোঝাতে লাগলো ওর খুঁটিনাটি বাড়ির বর্ণনা। কোথায় বাগান, কোন-কোন গাছ ওর নিজের হাতে পোঁতা, কোন গাছের নিচে ওর বাবা রোজ চেয়ার পেতে বসেন, কোথায় ওর মা চিজ শুকোতে দেন—অবশ্য রোদ ওঠে খুবই কম।

খেতে বসে আমরা ঠিক করলাম, মার্গারিটকে যেতেই হবে। ও একবার শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বললো, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমার একলা যেতে ভয় করছে।

আমি বললাম, আমি? তোমার বাড়িতে? তা কি সম্ভব?

সত্যি সম্ভব নয়। ওদের গোঁড়া ধার্মিক বাড়িতে এরকম একজন অচেনা পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। তবু মার্গারিট বললো, তুমি যদি যেতে, আমরা এক সঙ্গে ফ্রান্সে বেড়াতাম। তোমাকে নিয়ে যেতাম আলজাস লোরেনের সেই ঝর্নাটার কাছে।

—যেখানকার জল পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে পরিষ্কার?

—হ্যাঁ, এমন কিছু নাম করা নয় ঝর্নাটা, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল... তোমাকে দেখাতাম... যদিও তোমারও সে কথা মনে হতো...

মার্গারিটের চোখের দিকে তাকিয়েই যেন আমি সেই ঝর্নাটা দেখতে পেলাম। আস্তে-আস্তে বললাম, নিশ্চয়ই যাবো, পরে এক সময় নিশ্চয়ই যাবো—

এবার সমস্যা দাঁড়ালো টাকা জোগাড় করার। মার্গারিটের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়া উচিত। শিকাগোতে লং ডিসটেন্স কল্ করে জানা গেল, পরশুর আগে টিকিট পাওয়া যাবে না। যাওয়া-আসায় অন্তত আটশো ডলার লাগবে।

আমাদের দু'জনেরই সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। ব্যাঙ্কে দশ-পনেরো ডলার আছে কি না সন্দেহ। মার্গারিট পাগলের মতোন টাকা খরচ করে। টাকা জিনিসটা ওর সহ্য হয় না, হাতে এলেই কোনোক্রমে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। মাসে বই কেনেই একশো-দেড়শো ডলারের। কোনো একটা ভালো বই দেখলে কিনবেই!

মাসের মাঝামাঝি বলে অবশ্য আমাদের দু' জনেরই কিছু টাকা ছিল ড্রয়ারে। শ'দেড়েক ডলারের মতন। বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে? পরদিন মার্গারিট সারা সকাল ঘুরে একশো কুড়ি ডলার জোগাড় করে আনলো, কারা যেন ধার নিয়েছিল। আমি পল ওয়েগনারের কাছে আমার দু'মাসের টাকা অগ্রিম চাইতে গেলাম, তাতে অন্তত শ'পাঁচেক ডলার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দারুণ দুঃসংবাদ পেলাম, পল ওয়েগনার আগের রাত্রেই নিউ আর্লিয়েন্সে চলে গেছে। চারদিন বাদে ফিরবে।

মার্গারিট কিন্তু একটুও নিরাশ হলো না। বললো, দাঁড়াও, আমি আর এক জায়গায় ঘুরে আসছি। এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এলো ছ'শো ডলার হাতে নিয়ে।—কোথা থেকে পেলে? —ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে এলাম।—দিল?— দেবে না কেন? আমি জোর দিয়ে বললাম, আমার খুব দরকার, আমাকে যদি এখন না দাও তাহলে ব্যাঙ্ক খুলে বসেছো কেন?

আশ্চর্য এখানকার ব্যাঙ্ক। যে-মেয়েটি এদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাকেও টাকা ধার দেয়। মেয়েটি তো কোনো কারণে আর এদেশে না ফিরতেও পারে! সম্ভবত ওর সরল-সুন্দর মুখের দাবি ওরা উপেক্ষা করতে পারে নি। অবশ্য, এদেশের ব্যাঙ্কগুলোর কাছে পাঁচ-ছ'শো ডলার

নিতান্ত খোলামকুচি।

পরদিন ভোরবেলা মার্গারিটের প্লেন। পাছে ঠিক সময় আমরা উঠতে না পারি, তাই সারারাত জেগে রইলাম। গত সাত–আট মাসের মধ্যে আমরা তিন–চার দিনের বেশি পরস্পরকে ছেড়ে থাকি নি। এবার মার্গারিট ক'দিনের জন্য যাচ্ছে তার কোনো ঠিক নেই। ওর মাকে একটু সুস্থ দেখলেই চলে আসবে। কিন্তু ওর মায়ের যদি কিছু একটা হয়ে যায়? আমরা মুখে কেউই সে-কথা বলছি না। ভেতরে–ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছি খুব। দু'জনেই যেন দু'জনকে খুশি রাখার চেষ্টায় নানারকম মজার–মজার কথা বলতে লাগলাম। ও আমাকে শোনালো ত্রিস্তান অর ইসল্টের কাহিনীর সাত–আট রকম ভাষা। আমি ওকে শোনালাম বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের কাহিনী। অন্য আলো নিভিয়ে একটা বড় লাল রঙের মোমবাতি জ্বালা হয়েছে, সঙ্গে এক বোতল কোনিয়াক। যখন রাত ভোর হয়ে গেল, তখন মোমবাতি কিংবা কোনিয়াকের বোতল—কোনোটাই শেষ হয় নি। ওর কোলে আমার মাথা। ও মুখটা নিচু করে শেষবার আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, এবার চলো।

ঠিক সময় পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। টাকা–পয়সা একেবারে টায়–টায়। আমার কোনো অসুবিধে নেই, ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে, তিনদিন বাদে পল এলেই আমি টাকা পেয়ে যাবো। কিন্তু ফ্লাইটের কোনো গোলমাল হলে মার্গারিট বিপদে পড়ে যাবে। তবু সেই টাকা থেকেই দেড় ডলার খরচ করে এয়ার ইনসিওরেন্স করে ফেললো। সেই কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললো, নাও, আমি যদি মরি, তাহলেই তুমি কুড়ি হাজার ডলার পেয়ে যাবে।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। এই মেয়ের প্রাণের দাম মাত্র কুড়ি হাজার ডলার! আমি তো এর বিনিময়ে বলিরাজার মতন স্বর্গ–মর্ত্যও দান করতে পারি। কিন্তু প্লেনটা আকাশে উড়ে যাবার পর আমার মনে হলো, সত্যিই যদি কিছু হয়, তাহলে কুড়ি হাজার ডলার আমার হাতে এসে যাবে? সে যে অনেক টাকা! বিমান দুর্ঘটনা তো যখন–তখন হয়! পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আমি মার্গারিটের মৃত্যু কামনা করছি? মানুষের মন এরকম সাঙ্ঘাতিক হয়! হাতের সেই কাগজটাকে মনে হলো ফণা তোলা সাপ। ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিলাম রাস্তায়।

মার্গারিট চলে যাবার পর কিন্তু নিজেকে অনেকটা স্বাধীন মনে হলো। এতদিন ওর সততা ও নীতিবোধের জন্য আমিও অনেকখানি আটকে ছিলাম। যখন–তখন যা খুশি করতে পারি নি! একথা ঠিক, ওর সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা না হলে আমি অনেক বখে যেতে পারতাম। যে–দেশে নারী এবং সুরা এত সুলভ, সেখানে আমি ডুবে যেতে পারতাম সহজেই। আমার তো কোনো দায় নেই। আমি পাপ–পুণ্যের জন্য কারুর কাছে দস্তখত দিই নি। কাজে ডুবে থাকতে না পারলে আমার মধ্যে দারুণ একটা অস্থিরতা জাগে। এখন আমি স্বাধীন, আমি যা খুশি করতে পারি।

দু' তিনদিন বাদেই বুঝলাম, মানুষ সবসময় সব রকম স্বাধীনতাও চায় না। মার্গারিট নেই বলে কিছু ভালো লাগে না। আমার ঘরটাকে শূন্য আর ঠাণ্ডা মনে হয়। সব জায়গায় ছড়ানো আছে ওর চিহ্ন। ওর রুমাল, ওর স্কার্ফ, ওর চটি। আমার গায়ে ওর কিনে দেওয়া ড্রেসিং গাউন। চিঠি লেখার কাগজও ও কিনে এনেছে। রান্নাঘরের প্রতিটি জিনিসে ওর স্পর্শ। দূর ছাই, কে আর রান্না করে!

টেবিলের ওপর ওর টাইপরাইটার। কিছুদিন ধরে এটা আমিই ব্যবহার করছি। মনে পড়ছে, একদিন ও আমার একটা ইংরিজি বাক্যের ভুল ধরেছিল! আমি চটে উঠে বলেছিলাম—তুমি ফরাসি, তুমি ইংরিজির কী জানো? বলেছিল—যাও, যাও, তোমার চেয়ে অনেক ভালো জানি! আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম না? তুমি জানো, কখন প্রপোজাল আর কখন প্রপোজিশান হয়? হিউমিলিটি আর হিউমিলিয়েশনের তফাত জানো? আমাদের মধ্যে ঝগড়াটাই ছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার।

আমি কখনো খুব রেগে উঠলেই মার্গারিট হাসতে–হাসতে একেবারে ভেঙে পড়তো, ওর শরীরে যেন রাগ জিনিসটাই নেই। আমাকে বলতো—ইউ লুক লাইক অ্যান অ্যাংরি গড্। ওল্ড টেস্টামেন্টের গডের মতন...

কয়েকদিন পরেই আমার একাকিত্ব আরো অসহ্য হয়ে উঠলো। প্রথম দিকের একাকিত্বের চেয়ে এটা আরও অনেক বেশি তীব্র। তখন পাবে আবার আড্ডা দিতে যেতে লাগলাম। পুরোনো বন্ধু–বান্ধবীদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়। গ্যালন–গ্যালন বিয়ার খেয়েই নেশা হয়ে যায়। গাঁজাও চলছে অনেকের মধ্যে। আমি ভারতীয় বলে কেউ–কেউ ভাবে, গাঁজা-সাজার ব্যাপারে আমার বুঝি জন্মগত জ্ঞান আছে। দু'আঙুলের ফাঁকে গাঁজা ভর্তি সিগারেটটা কল্কের মতোন ধরে হুস করে টান দিয়ে ওদের তাক লাগিয়ে দিই।

ডোরির সঙ্গেও এখানে দেখা হতে লাগলো। একদিন দেখলাম লিন্ডাকেও। লিন্ডা বেঁচে উঠেছে, কিন্তু চোখ দু'টি সম্পূর্ণ অন্ধ। একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে তার, তখন সে পাবে আসতে পারে। কিন্তু এর ভেতরটা কী রকম, তা আর ওর দেখা হলো না।

একদিন সন্ধের পর পাব থেকে বেরিয়ে ডোরি বললো, চলো আমরা সবাই এখন আন্টি আইমারের জয়েন্টে যাচ্ছি, তুমি যাবে ?

বললাম, চলো!

ডোরির সঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণ থাকে এখন একটি অস্ট্রেলিয়ান ছেলে। ওর স্ট্যাম্প অ্যালবামে নতুন স্ট্যাম্প। সে আজ নেই। আমরা সাত–আটজন ছেলেমেয়ে মিলে হাজির হলাম আন্টি আইমারের বাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে, ডে ময়েনের দিকে যেতে রাস্তার ওপর ফাঁকা জায়গায় একলা একটা বাড়ি। আন্টি আইমারের বয়েস কিন্তু বেশি নয়। তিরিশ–বত্রিশ মাত্র, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। এসেই বুঝলাম, এখানে ছেলেমেয়েরা গ্রুপ সেক্স এবং নানারকম নেশা করতে আসে। এটা অবশ্য আন্টি আইমারের পেশা নয়, টাকা–পয়সা নেয় না কারুর কাছ থেকে, বরং নিজেই অনেক খরচ করে, এটা তার শখ। হলঘরের মধ্যে একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের বিরাট ছবি মালা দিয়ে সাজানো, পাশে অনেকগুলো ধূপ জ্বেলে। সে নাকি কোন্ যোগী। তিনটে ছেলেমেয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে, তারা এল এস ডি খেয়েছে, পোশাকের কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। অন্যরা যার যেখানে খুশি বসে গেল, এ ওর গায়ের ওপর, গাঁজার কটু গন্ধে ঘর ভরে গেল। কে যে কি কথা বলছে, সকলের চেঁচামেচিতে তার কিছুই বোঝা যায় না। এর মধ্যে আবার কে একটা ক্যানকেনে আওয়াজের রেকর্ড চালিয়ে দিল।

আন্টি আইমার আমার পাশে বসে বিনা আলাপেই মিষ্টি করে বললো, তুমি কি নেবে, ডার্লিং ?

অন্য নেশাফেসা আমার তেমন পছন্দ হয় না। বললাম, কোনোরকম অ্যালকোহল আছে ?

এক বোতল স্কচ আর একটা লম্বা গেলাস নিয়ে এসে সে বললো—হেল্প ইয়োর সেলফ!

আমি চুকচুক করে সেই স্কচ খেতে–খেতে ওদের দেখতে লাগলাম। খারাপ লাগে না। এর মধ্যে যৌবনের দুরন্তপনার একটা ছবি আছে। আমি জানি, এদের মধ্যে কয়েকজন পড়াশুনোয় সাঙ্ঘাতিক ভালো, চাষ করার সময় মাঠে গিয়ে দারুণ পরিশ্রম করতে পারে—পৃথিবীর যে–কোনো জায়গায় এদের নিয়ে ছেড়ে দিলেও ভয় পাবে না।

বুঝতে পারছি, বেশ নেশা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? নিজের সেই নির্জন ঠাণ্ডা ঘরটায় ফিরতে ইচ্ছে করে না কিছুতেই। এখানে নেশায় মাটিতে গড়িয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। আন্টি আইমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে একজনের সঙ্গে নাচ শুরু করেছে, যাদের জ্ঞান আছে এখনো, তারা হাততালি দিচ্ছে।

ফ্রিজ থেকে খানিকটা বরফ আনবার জন্য আমি উঠে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ডোরি। ওরও বেশ নেশা হয়েছে। চোখ দু'টি চকচকে, ধারালো নাকটি দামাস্কাসের ছুরির মতন খাড়া হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলো, কি, কেমন লাগছে ?

জড়ানো গলায় বললাম—গ্রেট! এভরিথিং ইজ গ্রেট!

ডোরি ওর ডান হাতটা উঁচু করে বগলটা দেখিয়ে বললো, এখানে একটা চুমু দাও।

ঐ জায়গাটা যে চুমু খাওয়ার পক্ষে একটা আদর্শস্থান, এটা আর কারুকে বলতে শুনি নি। ওকে খুশি করার জন্য সম্পূর্ণ আলিঙ্গন করে সেখানে একটা চুমু দিলাম। ডোরি খিলখিল করে হেসে উঠলো। ওর বগলে পাউডার, সেন্ট আর ওর ঘামের গন্ধে আমার মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো! আমি চোখ বড়-বড় করে ডোরির দিকে তাকালাম। ওর বুকের জামাটা এতখানি কাটা যে সবই দেখা যায়। সেখানে আমার মুখ নামাতেই ও বললো, এসো—।

হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলো পাশের ঘরে। বিছানা পাতাই ছিল। তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ডোরির পোশাকটা খুলে ফেলা অত্যন্ত সহজ কাজ, কেননা সবকিছুই প্রায়-খোলা, তবু আমি এমন টানাটানি করতে লাগলাম যেন ছিঁড়েই যাবে; ডোরি শুধু খিলখিল করে হাসছে। ওর শরীরটা দারুণ উত্তপ্ত। আমি পাগলের মতন ঝুঁকে পড়লাম ওর ওপরে, ওর চোখের দিকে চোখ গেল, যেন নীল আলো বেরুচ্ছে...

সামনেই একটা ড্রেসিং টেবিলের আয়না। তাতে আমার মুখটা দেখলাম। এ কে ? এ কি সেই আমি ? আমার মুখখানা একটা জন্তুর মতন দেখাচ্ছে। আমি ডোরির বুকের ওপর শুয়ে আছি। এইজন্যই মার্গারিট বলেছিল, চট করে ভালবাসার কথা বলতে নেই। ভালবাসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অনেক রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৌঁছাতে হয় ভালবাসার কাছে। ঠিকই বলেছিল মার্গারিট। আমি পারলাম না, আমি হেরে যাচ্ছি।

ডোরি ঠাস করে আমার গালে এক চড় মেরে বললো, ব্লাডি ফুল! তুমি অন্য কারুর কথা ভাবছো।

আমি ওকে এক ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিলাম। ডোরি আঁচড়ে কামড়ে এবং গালাগাল দিয়ে আমার প্রায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চাইলো। এক সময় দেখলাম আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। উঠে বেসিনে রক্ত ধুতে গেলাম—ডোরি হা-হা করে হাসতে লাগলো। সেই হাসি শুনলে ভয় হয়। বেসিনের আরসির দিকে তাকিয়ে বললাম—মার্গারিট, আমাকে ক্ষমা করবে ?

বাড়ি ফিরে চুপ করে বসে রইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিছানায় নয়, চেয়ারে নয়, ঘরের মেঝেতে, এক কোণে। মাথাটা এখনো পরিষ্কার নয়। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় দুঃখবোধ অনেক তীব্র হয়। আমার কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। নিজেকে শাস্তি দিলাম, ঘর থেকে আর একদম বেরুবো না।

বেরুলাম না বেশ কয়েকদিন। কিন্তু এই রকমভাবে কতদিন থাকা যায়। ঘরের মধ্যে মার্গারিটের স্মৃতি, বাইরে নানারকম প্রলোভন। আমাকে বাঁচতে হবে তো!

মার্গারিটের চিঠি আসছে প্রায় প্রত্যেকদিন। ওর মায়ের সত্যিই খুব অসুখ। কবে আসতে পারবে ঠিক নেই। ফ্রান্সের আবহাওয়া এখন যা সুন্দর! কেন আমি ওর কাছে এখন নেই!

মার্গারিট জানে, আমার চিঠি লেখার অভ্যেস খুব কম। তাই প্রতি চিঠিতেই লেখে, শোনো নীল, তোমাকে সব চিঠির উত্তর দিতে হবে না। তুমি সপ্তাহে একটা অন্তত ছোট্ট চিঠি লিখো আমাকে। পারবে তো ? একা-একা রান্না করে খেয়ো না! দোকান থেকেই কিছু কিনে নিও! আমাদের ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক আমেরিকা ঘুরে এসে কী বলেছিলেন জানো ? ও দেশটা সম্পর্কে

শুধু এইটুকু বলা যায়, ওদের মাংসের কোয়ালিটি বেশ ভালো!

না-পড়া বইগুলো শেষ করি এখন। অনেক বই মার্গারিটের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়ার কথা ছিল। রেকর্ড প্লেয়ারে এখনো চাপানো আছে ইভ্ মতাঁর গান, ফিউমে ল্য সিগার—মার্গারিট যাওয়ার আগের দিন দু'জনে মিলে শুনেছিলাম। তার নিচে এদিথ্ পিয়াফ। বাক্সের ওপর রাখা আছে আমার সংগ্রহ করা রবিশঙ্কর, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়তে-পড়তে যখন চোখ জ্বালা করে, তখন একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে হুইস্কির বোতল খুলে বসি। কখনো একা-একা নাচি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলায় গালাগাল দিই বিশ্ব-সংসারকে। তারপর এক সময় খুব নেশা হলে ঘুমিয়ে পড়ি আপনিই।

দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও আমি ফেল করলাম। শনিবার অনেক রাত্রে আমার বাড়ির সিঁড়িতেই একটা কান্নার আওয়াজ শুনলাম। বাড়ির সব ছেলেমেয়েই আজ ডেটিং করতে গেছে, এমনকি ক্রিস্তফও গেছে একটা জাপানি মেয়ের সঙ্গে। এখন সিঁড়িতে কে কাঁদে ? বাড়িতে তো আমি ছাড়া আর কারুর থাকার কথা নয়। বেরিয়ে এসে দেখলাম, সিঁড়ির ওপর বসে আছে তিনতলার মেয়েটি, সম্পূর্ণ নগ্ন। যাওয়া-আসার পথে সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দু'একবার 'হাই' 'হাই' হয়েছে মাত্র। মেয়েটি লম্বা আর চওড়ায় এত বড় যে একটি ছোটখাটো মেয়ে-দৈত্য বলে মনে হয়, যদিও বয়েস বেশি নয়। এরকম চেহারার জন্য ওর বিশেষ ছেলেবন্ধু হয় না। কোনো ছেলেই নিজের থেকে বেশি লম্বা কোনো মেয়ের পাশে হাঁটতে ভালবাসে না।

কিন্তু মেয়েটি এই সময় এই অবস্থায় বসে কাঁদছে কেন ? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বারবারা, কী হয়েছে তোমার ?

বারবারা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে কাঁদছে। একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, তারপর বললো—দ্যাট্স নান অব ইয়োর ড্যাম বিজনেস।

মেয়েটি একদম মাতাল। আমার নিজেরও তখন বেশ নেশা, তবু মনে হলো, একে এর ঘরে পৌঁছে দেওয়া উচিত। পরোপকার করা মানুষের নেশা। একা কোনো মেয়েকে দেখলে মানুষ আরও বেশি পরোপকারী হয়ে ওঠে।

আমি ওর হাত ধরে বললাম—কাম অন বেবি! চলো ঘরে চলো—

বারবারা ঘ্যাক করে আমার হাতে কামড়ে দিল। উ হু হু হু করে আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। এ তো সাঙ্ঘাতিক মেয়ে দেখছি! কিন্তু যে-রকমভাবে দুলছে, যে-কোনো সময় সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। ওর পাশে বসে খুব নরম গলায় বললাম, এ কি করছো ? লোকজন এসে পড়বে। তোমার মতন নাইস, ডিসেন্ট গার্ল—।

বারবারা কান্না থামিয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললো—ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ মি ?

হ্যাভ কথাটার কতোরকম মানে হয়। আমি যদিও পৃথিবীর হ্যাভ নটস-দের দলে, তবু এখানে এই সহজতম বাক্যটি শুনে আমার সারা গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। বারবারার দ্বিগুণ আকারের শরীর, অথচ বেঢপ নয়, সুগঠিত বুক ও উরু—আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইলাম।

আমার দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ঐটা তোমার ঘর ?

—হ্যাঁ।

—চলো, ওখানে যাবো। আমার ঘরে যাবো না! এক সান অব আ বিচ্ এসে জলটল ফেলে, বোতল ভেঙে আমার ঘর একেবারে নোংরা করে দিয়ে গেছে। আর যাবো না ওখানে। তোমার ঘরে চলো—

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো,—গেট মি, লাভার বয়।

দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টেনে তুলতেই ও আমার বুকের ওপর এসে পড়লো। আদিম মানবী। ও এখন একটাই জিনিস চায়। আমিও তো এই পৃথিবীর আদিবাসী। তবে আর আমার দ্বিধা থাকবে কেন ? আমি এখন একা, বারবারাও একা। আমার হাতটা দিয়ে ওর কোমর জড়ালো, তারপর নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো—হোল্ড মি টাইট।

প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল আমার। তবু দরজার সামনে এসে থেমে গেলাম। এই ঘরে! মার্গারিটের এত স্মৃতিমাখা এই ঘরে কাকে নিয়ে যাচ্ছি ? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? মার্গারিট নেই বলে বারবারা নামের এই মাংসপিণ্ডের সঙ্গে ? তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম—সরি! এখানে হবে না। দেয়ার ইজ অ্যানাদার গার্ল ইন দেয়ার!

মাতাল অবস্থাতেও বারবারা এ কথাটার মানে বুঝলো। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রাণভরে গালাগাল দিতে লাগলো—ইউ ডার্টি ডাব্‌ল ক্রসার! ব্লাডি স্কাঙ্ক! ব্যাসটার্ড! নিগার্!

ওর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলাম। সিঁড়িতে দুমদুম শব্দ হচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে বার্বারা! আমি তো ওর উপকারই করেছি। আমি মিথ্যে কথা বললেও, ও তো সিঁড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তবে আমি হাঁপাচ্ছি কেন ? আমি দুর্বল, আমি ভীষণ-ভীষণ দুর্বল। এক হাতে মাথার চুল খিমচে ধরলাম। অন্য হাতে সেতারের কানের মতন নিজের কান এমন মোচড়াতে লাগলাম যাতে তার-টার সব ছিঁড়ে যায়।

পরদিন সকালে মার্গারিটের চিঠি এলো। মায়ের অসুখ অনেকটা ভালো। তবে এখন তো গ্রীষ্ম এসে গেল, শিগগিরই ছুটি পড়বে। সবাই আমাকে বলছে, এক্ষুনি ফিরে কী হবে ? আরও একমাস দেড়মাস থেকে যেতে। এরা তো কেউ বুঝবে না আমি কেন ফেরার জন্য ব্যস্ত! আমার একটা দিনও এখানে থাকতে আর ইচ্ছে করে না। তোমাকে কতোদিন যেন দেখি নি, যেন কতো যুগ...। মা হাসপাতাল থেকে না এলে ফেরা যাবে না। বোনরা ছাড়ছে না কিছুতেই। তবে একদিনের মধ্যেই একবার পারি যাচ্ছি? ইস, তুমি যদি একবার আসতে পারতে! আমার বন্ধু মোনিক-এর ফ্ল্যাট আছে, থাকার জায়গার কোনো অসুবিধে ছিল না! ইস, এই যা একখানা সুযোগ না! তুমি একবার আসতে পারো না? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করো না! আমরা ফিরে গিয়ে সব শোধ করে দেবো। দু'জনেই বেবি সিট্ করবো রোজ-রোজ, ঠিক শোধ হয়ে যাবে। আসবে না ? কতোদিন দেখি নি।

তৎক্ষণাৎ মন ঠিক করে ফেললাম। সেই ফরমটা আজও ফিল-আপ করা হয় নি। সেদিনই পল ওয়েগনারের কাছে সেটা ফেরত দিয়ে বললাম, আর দরকার নেই। আমি আর থাকবো না!

পল ওয়েগনার যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। চোখ বড়-বড় করে বললো, কি বলছো তুমি !

—তুমি যে বলেছিলে আমি যে-কোনো সময় ফিরে যেতে পারি ?

—তা তো পারোই । কেউ তোমায় আটকাচ্ছে না ! কিন্তু কেন ফিরে যাবে ? কোনো অসুবিধে হচ্ছে ? আমায় খুলে বলো। এখনো এতো রকম সুযোগ রয়েছে, অনেক রকম কাজ করতে পারো।

কিন্তু আমার বাঙালের গোঁ। একবার যখন ফিরবো ঠিক করেছি, আর মত বদলাবো না কিছুতেই।

অন্য কাউকে কিছু বললাম না। চুপিচুপি ব্যবস্থা করে ফেললাম সব। কারুর কাছে কোনো ধার-টার আছে কিনা। কোথাও কোনো কাগজপত্রে সই করা বাকি আছে কিনা। আমার একটা ভালো ইস্ত্রি ছিল, যাতে উল, টেরিলিন বা সুতির জামা-কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য ইচ্ছে মতন উত্তাপ

কমানো বাড়ানো যায়—ক্রিস্তফ সেটা মাঝে-মাঝে ধার নিতো। ওকে বললাম 'ওটা তুমিই রেখে দাও, আমার আর লাগবে না।

ও অবাক হয়ে বললো, কেন, লাগবে না কেন ? তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

আমি সাবধান হয়ে গেলাম। বললাম, না, না, আমি এই কিছুদিনের জন্য একটু নিউইয়র্ক থেকে ঘুরে আসছি।

ক্রিস্তফ নিজেকে আমার অভিভাবক মনে করে। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না, কেন আমি এতো তাড়াতাড়ি এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই।

মার্গারিটকে সংক্ষেপে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম, আমার জন্য প্যারিসে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

এয়ারপোর্টে এসেও পল ওয়েগনার আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, নীললোহিত, এখন বলো, তুমি থাকতে চাও কিনা! এখনো সব ব্যবস্থা করা যায়। টিকিট ক্যানসেল করা যায়!

আমি ভারি গলায় বললাম, না, পল, তা আর হয় না। তোমার দেশ খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। আমার কাজ আমার নিজের দেশে। সবকিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিদায়!

১১

প্যারিসে পৌঁছে দেখলাম, সমস্ত দেয়ালে-দেয়ালে আমার নাম। বিরাট-বিরাট পোস্টারে লেখা, নীল! নীল! যেন গোটা শহর আমাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে। যখনকার কথা বলছি, তখনও আমার নামেরই আর একজন, প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদে পা দেয় নি। সুতরাং তার জন্য এ অভ্যর্থনা হতে পারে না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ওটা একটা নতুন বেরুনো সাবানের বিজ্ঞাপন।

এয়ারপোর্ট থেকে বাস নিয়ে শহরের মধ্যে এয়ার টার্মিনালে পৌঁছেই দেখি মার্গারিট দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে একেবারে হেসে-কেঁদে অস্থির হয়ে উঠলো। সত্যিই যেন এক যুগ পরে দেখা। অথচ মাত্র দেড় মাস। তারপর বকুনি দিয়ে বললো, তুমি কি কিপ্টে হয়ে গেছ, এয়ারপোর্ট থেকে বাসে এলে? ট্যাক্সি নিতে পারো নি ? আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি! ওকে আর কী করে বলবো যে এখানকার ফ্রাঁ-এর হিসেব আমি এখনো বুঝি নি! ফরাসি দেশের মতন এমন মজার টাকা বোধহয় আর কোনো দেশে নেই। আর কোন্ দেশে নোটের ওপর শিল্পী, সাহিত্যিকদের বড়-বড় ছবি ছাপা থাকে!

একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম প্লাস পিগাল। এটা প্রধানত টুরিস্টদের পাড়া, হোটেলের দাম গলা-কাটা। বড়-বড় নাইট ক্লাব আর ফটোগ্রাফির দোকান। যার যতো খুশি অসভ্য ছবি কিনতে পারে এ পাড়ায়।

আমরা এসে থামলাম বিশ্ববিখ্যাত নাইট ক্লাব মুল্যাঁ রুজের সামনে। মেঘলা-মেঘলা দুপুর, এখন তো কেউ নাইট ক্লাবে যায় না। মার্গারিট বললো, এসোই না !

মুল্যাঁ রুজ যে বাড়িটার অংশ, সেটা একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি। প্রধান দরজার কাছে এসে মার্গারিট বাড়ির কঁসিয়ার্জের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। প্যারিসের কঁসিয়ার্জদের কথা আগে অনেক শুনেছি, এঁদের নেকনজর ছাড়া বাড়িতে ঢোকা-বেরুনোর উপায় নেই। এ বাড়ির ইনি একটি মোটাসোটা মহিলা। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। অ্যালজিরিয়ান ?

হা কপাল। ভারতীয়দের কেউ চেনে না। ভারত নামের দেশটার কথা সবসময় মনেই থাকে

না এদের।

লিফট দিয়ে তিনতলায় উঠে এলাম। তারপরও বিরাট বারান্দা দিয়ে এতোখানি হাঁটতে হলো, যেন রেড রোডের এপার-ওপার। একেবারে শেষ প্রান্তে এসে মার্গারিট চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলে বললো, এটা এখন শুধু আমাদের।

ফ্ল্যাটটা একদম খালি। বড়-বড় তিনখানা ঘর। নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ হবে, তাও ফরাসি ভাষায়, এই ভেবে মনে-মনে আমি শঙ্কিত ছিলাম। এখন সেই জড়তাটা কেটে গেল। আনন্দের চোটে মার্গারিটকে কোলে তুলে নিয়ে এক পাক ঘুরে গিয়ে বললাম, হুর্‌রে! একদম খালি! এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে!

দেড় মাসের পাওনা সব ক'টি চুমু ওর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বন্ধু মোনিক কোথায়?

— সে তো অফিসে। সে খুব সকালে বেরিয়ে যায়। শোন, মোনিক তোমাকে বিঁয়াভন্যু (স্বাগতম) করে গেছে, তোমার জন্য একটা সুইট ডিস বানিয়ে রেখে গেছে।

— এত বড় ফ্ল্যাটে মোনিক একা থাকেন? এটা তো খুব খরচের শহর শুনেছি।

— এটা ছিল আগে আমার বন্ধু এলেনের। এলেনই আমার আসল বন্ধু, যার সঙ্গে আমি পারিতে পড়তে এসেছিলাম—কালও দেখা হলো ওর সঙ্গে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো—

— এলেন ছেলে না মেয়ে?

মার্গারিট শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, যদি বলি ছেলে? তোমার হিংসে হবে?

— নিশ্চয়ই!

— বলেছিলাম না, তুমি ওল্ড টেস্টামেন্টের গডের মতোন, যেমন অ্যাংরি, তেমনি জেলাসও বটে!

পরে জেনেছিলাম, এলেন আসলে, বাংলা বা ইংরিজিতে যাকে আমরা বলি হেলেন। ফরাসিরা তো হ্ উচ্চারণ করবে না কিছুতেই!

এলেন আর মোনিক আগে এক সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে থাকতো। এলেন বিয়ে করে অন্য জায়গায় উঠে গেছে। মোনিক্ যদি শিগগির বিয়ে না করে, তাহলে সেও এটা ছেড়ে দেবে। বিয়ে করবে কি না, সে সম্পর্কে মোনিক্ মত স্থির করতে পারছে না।

দুপুরবেলা এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। সবাই কাজে বেরিয়ে যায়। মনে হয় যেন বাহান্নখানা অ্যাপার্টমেন্টওয়ালা এই পেল্লায় বাড়িটায় আমি আর মার্গারিটই শুধু দু'টি মাত্র প্রাণী।

চট করে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বিশ্রম্ভালাপ শুরু করলাম। মার্গারিট ওর মায়ের তৈরি দু'বোতল ওয়াইন নিয়ে এসেছে। পূর্ববঙ্গে যেমন বাড়ির তৈরি কাসুন্দি অন্যান্য বাড়িতে উপহার পাঠানো হয়, ফ্রান্সে সেই রকম বাড়ির তৈরি ওয়াইন। একটু চেখে বলেছিলাম—মার্গারিট, সত্যি অপূর্ব এমন কখনো আগে খাই নি। কী মিষ্টি তোমার মায়ের হাত।

মায়ের প্রশংসায় ছেলেমানুষের মতন খুশি হয়ে বললো, জানো তো, মাকে আমি তোমার কথা বলেছিলাম!

— কী বললেন তিনি!

— মা বললেন, নিয়ে এলি না কেন? আমি কখনো কোনো হিন্দু দেখি নি।

ভারতের যে-কোনো লোকই এদের কাছে হিন্দু। সেই হিসেবে আমার নিজেকে খুব একটা দ্রষ্টব্য মনে হলো না।

আমি বললাম, মার্গারিট, তুমি যতোদিন ছিলে না, আমি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম।

— তুমি কতোটা খারাপ হতে পারো?

— অনেক অনেক খারাপ!

— তুমি যখন খারাপ হও, সেই অবস্থায় তোমাকে আমার একটু দেখতে ইচ্ছে করে! তোমার খারাপ হবার ক্ষমতাই নেই। তুমি খারাপের ডেফিনিশান জানো না!

— কি পাগল! তুমি আমাকে এতটা বিশ্বাস করো!

— শোনো নীল, ওখানে এই ক'দিন আমার কথা তোমার মনে পড়তো?

— প্রতিদিন, প্রত্যেক ঘণ্টায় মনে পড়তো। বিশ্বাস করো, তুমি ছিলে না বলে আমার এক মুহূর্তও ভালো লাগে নি! আমার ঘরটাকে কী রকম বিচ্ছিরি আর ফাঁকা মনে হতো... বব বাকল্যান্ডের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন দু'একবার গেছি, তাকাতে পারি নি বাড়িটার দিকে...

— আমিও এখানে, তোমাকে ছেড়ে এসে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারি নি। মায়ের অসুখ। তার খাটের পাশে বসেও আমি তোমার কথা ভেবেছি।

এরপরে আমার মুখে আর একটা প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। তবু আমি চুপ করে রইলাম। মার্গারিট আমার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই তা বুঝে গেল। চোখ নামিয়ে বললো, 'আমি তোমাকেই, শুধু তোমাকেই ভালবাসতে চাই। আমি এখনো বুঝি নি ভালবাসা কাকে বলে, কিন্তু আমি ভালবাসতে চাই। সেই রকম ভালবাসা—যা মানুষের জীবন থেকে আর কখনো ছাড়ে না। আমি এবার এসে বাইবেল তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, ভালবাসা কাকে বলে, তা জানার জন্য। কেউ বলতে পারে নি। আমি জানি, এর উত্তর আছে শুধু মানুষের মনে। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি খুব শিগগিরই এর উত্তর পেয়ে যাবো!

আমি বললাম, 'মার্গারিট, সারা ইওরোপ-আমেরিকায় তুমিই বোধহয় এখন একমাত্র মেয়ে, যে ভালবাসা নিয়ে এরকম চিন্তা করছে। আর কেউ করে না। সবাই এখন বোঝে সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ভালবাসা নিয়ে কে মাথা ঘামায়! এ পর্যন্ত যতোজনকে দেখলাম—

মার্গারিট উত্তেজিতভাবে বললো, না, না, তা হতে পারে না! এ তো প্রিমিটিভ! একদম প্রিমিটিভ। শুধু সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং— এ প্রিমিটিভ ছাড়া কি! ভালবাসা ছাড়া মানুষের সভ্যতা বাঁচতে পারে না!

বিকেলবেলা মোনিকের সঙ্গে আলাপ হলো। কালো সিল্কের গাউন-পরা শ্বেতপাথরের এক মূর্তি যেন। মার্গারিটেরই মতন ছিপছিপে তন্বী, তবে ভুরু আঁকে এবং সাজগোজের দিকে বেশ নজর আছে। প্রথম আলাপে তাকে একটু গম্ভীর মনে হয়, আসলে তার একটা চাপা রসিকতা বোধ আছে। ফরাসি ছাড়া ইংরিজিতে সে এক অক্ষরও কথা বলবে না, আমি বুঝতে না পারলে আবার বলবে—না, না, মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করো না, পেতি লারুস্ দেখো। ফরাসি ভাষায় বেশ মোটাসোটা একটা বিখ্যাত অভিধানের নাম পেতি লারুস্। ঐ যদি পেতি লারুসের চেহারা হয়, তাহলে গ্রাঁ লারুস্ কী রকম দেখতে হবে কে জানে!

মোনিক্ এসেছে বোর্দো অঞ্চল থেকে। শহরে একা চাকরি করে। এই জিনিসটা আমরা এখনো দেখি নি, একলা-একলা মেয়েরা গ্রাম থেকে শহরে চাকরি করতে আসে এবং নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। মোনিক্ও অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারে বটে, কিন্তু তার স্বভাব মার্গারিটের একদম বিপরীত। একদিন সে তার এক ইটালিয়ান ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল, কিছুক্ষণ একসঙ্গে গল্প ও মদ্যপানের পর সে তার ছেলে-বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। কিছুদিন আগেই নাকি তার এক জার্মান বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেও

এরকম দরজায় খিল দিয়েছে। সে ভালবাসায় বিশ্বাস করে না। সে বিশ্বাস করে সিলেকশানে।

আমাদের কাছে আলাদা চাবি আছে, আমরা ইচ্ছে মতন যখন খুশি আসবো-যাবো, যখন ইচ্ছে খেয়ে নেবো—মোনিক বলেছে তার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট করার কোনো দরকার নেই।

আমরা সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াই। নতুন লোকের পক্ষে প্যারিসের রাস্তা চিনতেই অনেক সময় যায়। আমার সে সমস্যা নেই। মার্গারিট একদিনেই আমাকে বুঝিয়ে দিল, কী করে মাটির তলায় নেমে এক জায়গায় বোতাম টিপে আলো জ্বাললেই মেট্রো রেলের সব জায়গার রুট জানা যায়। এর মধ্যে ঘুরে এলাম ভার্সাই। লুভ্‌র মিউজিয়াম দেখতেই দু'দিন কেটে গেল। আলাদা-আলাদা আর্ট গ্যালারিতে আলাদা আর্টিস্টদের একক প্রদর্শনীর খবর মার্গারিট জোগাড় করে আনে। রুয়োর শেষ জীবনের বিপন্ন ম্লান ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনী দেখে এক সন্ধে মন খারাপ হয়েই রইলো।

কখনো ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেলে সাঁজেলিজের কোনো কাফেতে বসি। চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার দৃশ্য দেখতেই ভালো লাগে। প্যারিসের সবকিছুর মধ্যেই একটা ছিমছাম সৌন্দর্যের ব্যাপার আছে। স্যেন নদী তো সামান্য ছোট্ট একটা খালের মতন প্রায়, অথচ তারই ওপর কতোগুলো ব্রিজ—এবং প্রত্যেক ব্রিজে আলাদা কারুকাজ।

বাড়ির নিচেই মুল্যাঁ রুজ, সেখানে একদিনও যাওয়া হয় নি। অতিবিখ্যাত জায়গাগুলোতে মার্গারিট যেতে চায় না, আমারও আগ্রহ নেই। সেজন্য ইফেল টাওয়ারে ওঠাই হলো না। সকালবেলা মুল্যাঁ রুজের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি, ভেতরের চেয়ার-টেবিল সব উল্টোনো, মেয়েরা বাইরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে কফি খাচ্ছে, তখনও তাদের গালে একটু-একটু রং লেগে। তখন কে বলবে, এই মেয়েরাই রাতের মোহিনী, সারা বিশ্বের ভ্রমণকারীদের হৃদয়ে তুফান তুলে দেয়।

সেই সময়টায় আমি বাজার করতে যাই। সস্তা হবে বলে মঁমার্ত্রের বাজার থেকে ঘোড়ার মাংস কিনে আনি আর লাঠির মতন লম্বা-লম্বা শক্ত রুটি। প্যারিসে ভাত খাওয়ার আশা বড় দুরাশা। এখানকার দোকানে ব্যাঙ বিক্রি হতেও দেখি না, যদিও ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনেছিলাম চীনেম্যানরা যেমন আরশোলা খায়, ফরাসিরা সেই রকম ব্যাঙ-খেকো। বরং আমেরিকায় প্রায় সব দোকানেই কাঁচা ব্যাঙের ঠ্যাং বিক্রি হয়। একবার মার্গারিট আর আমি কিনে এনে ভেজে খেয়েছিলাম। মার্গারিটেরও সেই প্রথম ভেক-ভক্ষণ।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার আগে আমরা আর বেরুই না। কারণ বাইরে খাওয়ার দারুণ খরচ। দু'জনে খুনসুটি করে কোথা থেকে যে সময় কেটে যায় বুঝি না! খবর এসেছে যে মার্গারিটের মা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন এবং ভালো আছেন। মার্গারিট বাড়ি থেকে আর একবার ঘুরে এসে তারপর আমার সঙ্গেই আমেরিকায় ফিরবে—এই রকম পরিকল্পনা করে প্রায়ই। এই সময় আমি চুপ করে থাকি। এই একটা কথা এ পর্যন্ত ওকে বলা হয় নি। কী করে বলবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

একদিন দুপুরবেলা কাছাকাছি অ্যাপার্টমেন্টের এক বুড়ি দেখা করতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। ঠিক আমার দিদিমার মতন দেখতে, সেই রকম সৌম্য মুখ, ঠোঁটটা হাসি-হাসি। আমার লজ্জা করছিল একটু। মার্গারিট আর আমার তো বিয়ে হয় নি, তবু আমরা একসঙ্গে এখানে থাকি—এই বৃদ্ধা মানুষটি যদি পছন্দ না করেন? বৃদ্ধা কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমার সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাঙালি শুনে তিনি বললেন—ও, ফই দ্য বেঙ্গাল! সে তো চার্চের একরকম আলোর নাম। আর একরকম পাখি আছে আমাদের গ্রামে,

বেঙ্গালি—ছুঁচোলো ঠোঁট।

মার্গারিট হাততালি দিয়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদিমা, ঐ পাখির উল্লেখ আছে মালার্মের কবিতায়!

বৃদ্ধা বললেন, কি জানি বাপু! আমি কি তোদের এইসব মালার্মে না ফালার্মের কবিতা পড়েছি নাকি! আমরা পড়েছিলাম ভিক্তর য়ুগোর কবিতা, আহা, অমনটি আর হলো না।

ঠিক যেন আমার দিদিমার মুখে কাশীরাম দাসের প্রশংসা।

স্যেনের পাশে-পাশে পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা মার্গারিটের এক নেশা। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়। সন্ধে হয়ে আসে। তখন দেখা যায়, নদীর পাড়ে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ের অন্তহীন চুমুব প্রদর্শনী। একদিন আমি বললাম, মার্গারিট, আমারও এইরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। বেশ সকলের সামনে।'

মার্গারিট মুখ লুকিয়ে বললো, আমার লজ্জা করে। এইসব দেখলে কী রকম যেন লাগে!

অন্য যে-কোনো মেম-যুবতী একথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। চুমু খেতে লজ্জা, এ আবার কী নতুন রকমের কথা!

একটু থেমে মার্গারিট বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, এসো—একটু অন্ধকার দেখে।

— না। অন্ধকার নয়। ব্রিজের আলোর নিচে।

— আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

মার্গারিটকে জড়িয়ে ধরে ঠিক অন্যদের কায়দায় ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে রাখলাম। মধ্যবয়স্কা পত্নীকে নিয়ে ভ্রমণরত এক ভারতীয় আমাকে দেখে একেবারে আঁতকে উঠলো। ইস্, এই সময় চেনাশুনো বাঙালি কেউ এসে দেখলে যে কী অনর্থই হতো আমার!

মার্গারিট ফিসফিস করে বললো, চলো নত্‌রদাম গির্জায় যাই। ইচ্ছে করেই আর একদম আলাদা থাকব না! এক বাড়িতেই থাকবো সবসময়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলাম। মার্গারিটের কাছে এ পর্যন্ত আর কোনো কথা গোপন করি নি। কিন্তু একথাটা যে কী করে বলবো!

একটু বাদে মার্গারিট বললো, চলো নত্‌রদাম গির্জায় যাই। ইচ্ছে করেই এখানে তোমাকে এতোদিন নিয়ে যাই নি? আজ রবিবার, আজ আমি ভেতরে গিয়ে প্রার্থনা করবো, তুমি ঘুরে-ঘুরে দেখবে। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো, আমি আজ জিজ্ঞেস করবো...

— কিন্তু তোমার ঈশ্বর কি আমার মতন হীদেন এবং নাস্তিকের প্রতি কোনো দয়া দেখাবেন ?

— ঈশ্বর সকলের।

— আমার জন্য নয়।

হাঁটতে-হাঁটতে গেলাম নত্‌রদাম গির্জায়। আমি ঠিকই বলেছিলাম, মার্গারিটের ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ। বহুদিন পর গির্জাটায় রং করা হচ্ছে বলে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

মার্গারিট দারুণ বিষণ্ন হয়ে গেছে। ফেরার পথে আর একটাও কথা বলতে পারলো না। আমারও মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে বেশ। এই রোমান ক্যাথলিকদের ভালবাসার মর্ম বোঝা আমার সাধ্য নয়! আমার আর এই মেয়েটির মধ্যে ঈশ্বর এসে দাঁড়ায় কেন ? ঈশ্বরের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই ?

মোনিক্ সকালবেলা তার জার্মান বন্ধুর সঙ্গে শহরের বাইরে গেছে, রাত্রে ফিরবে না বলে

গেছে। ফ্রিজ থেকে স্যাম্পেনের বোতলটা বার করে রান্নাঘরেই বসে গেলাম। আজ আর কিছুই ভালো লাগছে না, আজ নেশা করতে হবে। মার্গারিট জামা–কাপড় ছেড়ে আসতে দেরি করছে, ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি, ও বিছানায় শুয়ে আছে।

— এই, তুমি শুয়ে আছো কেন ? শরীর খারাপ লাগছে ? মাথা ধরেছে ?

— না, আমার কিচ্ছু হয় নি। তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ফিরে গেলাম। সামনে গেলাস নিয়ে আকাশ–পাতাল চিন্তা। আমাকে কিছু একটা কাজ করতেই হবে। এই লক্ষ্যহীন ভ্রাম্যমাণ জীবন আর কতোদিন ?

ঘণ্টাখানেক পরে খেয়াল হলো মার্গারিট তখনও আসে নি। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ? গেলাস হাতে নিয়ে ডাকতে গেলাম আবার। মার্গারিট চোখ মেলে শুয়ে আছে। গেলাসটা ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, একটু চুমুক দাও তো, লক্ষ্মীটি, মন ভালো হয়ে যাবে।

গেলাস সরিয়ে দিয়ে মার্গারিট উঠে বসলো। তারপর দু'টি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তুমি আমাকে নাও!

আমি তখনও বুঝতে পারি নি।

ও আবার বললো, তুমি যদি আমাকে ভালো না–ও বাসো, যদি কখনো আমাকে ঘৃণাও করো, অন্য মেয়ের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করো, তবু তোমায় আমি ভুলিয়ে দেবো। আমি মন থেকে উত্তর পেয়ে গেছি আজ, তোমার চেয়ে আমি আমার মাকে, বাবাকে, এমন–কি ঈশ্বরকেও বেশি ভালবাসি না। তুমি আমাকে নাও!

আমার বুকে যেন দুম করে একটা ধাক্কা লাগলো। কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে পারলাম না। গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম পাশে।

মার্গারিট কাছে এসে আমার গা ছুঁয়ে বললো, 'একি, তুমি কোনো কথা বলছো না কেন ?'

আস্তে–আস্তে বললাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে !

— আমি নির্বোধ, তাই আমি বুঝতে এতো দেরি করেছি।

— না, তা নয়। এতদিন আমি তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলাম। আজ শুনে বুঝলাম, আমি এর যোগ্য নই! মার্গারিট, তুমি আমাকে ভালবাসার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলে। কিন্তু আমার ধৈর্য নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারি নি। আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারবো না। তোমাকে আমেরিকাতে ফিরতেই হবে। আমার আর ফেরার কোনো উপায় নেই।

— তুমি কী সব আজেবাজে কথা বলছো, নীল ?

— আমার কথাটা সত্যি না হলেই এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু এটাই কঠিন সত্যি। আমার আর ফেরার উপায় নেই, তুমি আর আমি আর একসঙ্গে থাকতে পারবো না!

মার্গারিট আমার গেলাসের সবটা শ্যাম্পেন একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিতেই কয়েকবার বিষম খেলো। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। ও টলটলে দু'টি চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো ?'

ওর পাশে বসে পড়ে আমি বললাম, না মার্গারিট, ঠাট্টা নয়। নদী পেরিয়ে এসে নৌকোগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা যাকে বলে, আমি তাই করেছি। আমার বাড়ি ফেরার টিকিট ব্যবহার করে আমি এ পর্যন্ত এসেছি। পরের বছরের স্কলারশিপের ফর্মে আমি সই করি নি। ভিসা রিনিউ করি নি। আমার ফেরার ভাড়া নেই। আর আমি ফিরতে চাইলেও ওরা ফিরতে দেবে না এখন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মার্গারিট ব্যাপারটা বুঝলো। তারপর শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেন এরকম করলে ? সত্যিই তুমি আর ধৈর্য রাখতে পারো নি ?

— হয়তো তাই। তাছাড়া আমি আমার নিজস্ব কিছু কাজ করার জন্য ছটফট করছিলাম। ওখানে আমার কিচ্ছু হচ্ছিল না।

— ওদেশে তোমাকে ফিরতে হবে না। তুমি ফ্রান্সেই থাকো। আমি এখানে চাকরি করবো।

— আমি ভিখিরি কিংবা ক্লশার হয়েও থাকতে রাজি আছি। তবু কি আমাকে থাকতে দেবে? বিনা কাজে কোনো বিদেশীকে কি থাকতে দেয় ? তাছাড়া তোমায় আমেরিকায় ফিরতেই হবে মার্গারিট।

— কেন ? না, আমি যাবো না। দরকার নেই আমার রিসার্চের। তোমাকে আমি এখানে লুকিয়ে রাখবো।

— তোমাকে ফিরতেই হবে মার্গারিট।

মার্গারিট আমেরিকার ব্যাঙ্ক থেকে ধার করেছে। আমি জানি, আত্মবিক্রয় করতে হলেও ও সেই টাকা শোধ দেবেই। কথার মর্যাদা যে ওর কাছে সাঙ্ঘাতিক।

অনেকক্ষণ আমরা বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর মার্গারিট উঠে এসে আমার কোলের ওপর বসে গলা জড়িয়ে ধরে বললো, আমি আর একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভালবাসার সঙ্গে তো মিলন বা বিচ্ছেদের কোনো সম্পর্ক নেই। ভালবাসা হচ্ছে ভালবাসা। আমরা এক সঙ্গে থাকি বা না থাকি, তাতে কি আসে যায় ? ভালবাসা তো ভালবাসা ছাড়া আর কোনো কিছুই দাবি করে না। ক্রিস্তান আর ইসল্ট কি এক সঙ্গে থেকেছিল ? রাধা আর কৃষ্ণ কি এক বাড়িতে থাকতো।

— তবু ওদের দেখা হতো।

— আমাদেরও দেখা হবে। আমি কোনো না কোনোদিন কালকুত্তায় যাবো ঠিক।

— আমি আবার ফিরে আসবো।

— সে সব তো পরের কথা। আজ রাত্তিরটা আমরা দুঃখ করে কাটাবো কেন ? ভালবাসার জন্য যদি এক মুহূর্তেরও আনন্দ পাই, তাও তো জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ে থাকবে।

ওর মাথাভর্তি সোনালি এলোমেলো চুলে আমি হাত রাখলাম। শান্তভাবে আদর করতে লাগলাম ওর সারা মুখে। ও চোখ বুজে আছে। আবেগে সারা শরীরটা কাঁপছে। এত নরম, এত সুন্দর এই বালিকাটিকে কি আমি আঘাত দিলাম ? নিজেও তো কম আঘাত পাই নি।

আস্তে-আস্তে খুলে দিলাম ওর জামা ও স্কার্ট। লাজুকভাবে ও আমার বুকে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন একটা শিশু। চুমুতে ভরিয়ে দিলাম সারা দেহ। আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চট করে রান্নাঘরে চলে গেলাম শ্যাম্পেনের বোতলটা আনতে। ফিরে এসে দেখি ও পেছন দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছে। চমকে উঠলাম। ও যেন মানুষ নয়, একটা ছবি। কোন্ মিউজিয়ামে যেন এই ছবিটা দেখেছি ? হ্যাঁ, Ingres-এর আঁকা, লা গ্রাঁড ওদালিস্ক। সত্যি-সত্যি মার্গারিটের রক্তমাংসের শরীরটা যেন শিল্প হয়ে যায়। ঈষৎ উঁচু করা চিবুক, বুকের ওপর এসে পড়েছে নীলাভ আলো, কাছাকাছিই অন্ধকার—এ যেন অলৌকিক এক দৃশ্য। চোখ ভরে যায়, কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারলাম, ভালবাসার মধ্যে কতখানি মায়া। এই দেবোপম শরীর দেখেও তো ঠিক লোভ হয় না। মনে হয় যেন একটা পাহাড়ে লুকোনো ঝর্না, এখানে নিরালায় অবগাহন করি।

আমার বুকের মধ্যে এসে মার্গারিট কাঁপতে লাগলো। যেন একটা পাখি। আমি ওকে কিছু একটা কথা বলতে গেলেও ও আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে কথা থামিয়ে দেয়। তারপর একটু পরে নিজেই ফিসফিসিয়ে বলে—আজ আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমি ভালবাসাকে জেনেছি।

আমাদের বিচ্ছেদের দিন হঠাৎ খুব কাছে চলে এলো। মোনিক্ ফিরে এসেই ঘোষণা করলো, জার্মান ছেলেটিকে সে অবিলম্বে বিয়ে করছে। সুতরাং আর ঐ অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের থাকা চলে

না। আর দু'দিনের সময় নিলাম।

মার্গারিট দারুণ উচ্ছল, আর বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই আর মন খারাপ করবে না। সকালবেলা এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মার্গারিট আমার জন্য কিনে নিয়ে এলো একটা আলপাকার উলের দামী সোয়েটার। আমিও চুপিচুপি বেরিয়ে কিনে আনলাম ওর জন্য একটা ফারের কোট। ও খুব রাগারাগি করে বললো—তুমি কি পাগল হয়েছ ? এত টাকা কেউ খরচ করে ? তোমার এখন কত টাকা দরকার হবে!

আমি বললাম—আহা রে খুকি! তোর বুঝি আর টাকার দরকার হবে না ? অতদূরে ফিরবি কী করে ?

দুপুরবেলা ও আবার কিনে আনলো আমার জন্য একজোড়া সিল্কের জামা। এবার আমিও বকলাম খুব। ওর জন্য কিনে আনলাম প্যারিসের শ্রেষ্ঠ পারফিউম। ও বকতে যেতেই আমি বললাম—আমি চাই, এই পারফিউম মেখে আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে শোবে। আমার হুকুম! ও আবার কিনে আনলো একটা ঘড়ি। মার্গারিট নিশ্চয়ই টাকা ধার করছে। ওর কাছে এত টাকা থাকার কথা নয়। তাহলে আমারই বা সর্বস্বান্ত হতে বাধা কি ? সাঁজেলিজের শ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁয় ওকে খেতে নিয়ে গেলাম। সেখানে দু'জনের ডিনারের বিলে কত লোকের এক মাসের মাইনে হয়ে যায়।

দু'দিন বাদে মার্গারিট যখন আমাকে ওর্লি এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এলো, তখন আমরা দু'জনেই এমন হাসিখুশি গল্পে মেতে রইলাম, যেন দু'একদিনের জন্য আমি কাছাকাছি কোনো জায়গায় যাচ্ছি।

অবশ্য এখন যাচ্ছি কাছাকাছিই। প্রথমে যাবো লন্ডনে। বাঙালির ছেলে এদিকে এসে একবার বিলেত ঘুরে বিলেত–ফেরত না হলে কি চলে ? ওখানে এক বন্ধু বিমানকে চিঠি লিখে দিয়েছি। পকেটে আমার এখন আছে ঠিক দশ ডলার। বিমান যদি কোনো কারণে এখন লন্ডনে না থাকে বা এয়ারপোর্টে না আসে, তাহলেই লন্ডনে গিয়ে আমায় হাবুডুবু খেতে হবে। ঠিক শিকাগোতে প্রথম দিন যে অবস্থা হয়েছিল। যেরকমভাবে ভ্রমণ শুরু করেছিলাম, সেরকমভাবেই শেষ করছি। তাতে অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই। নিঃস্বের তো শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয় থাকে না!

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। ভিসায় ছাপ পড়া মানেই আমি এখন কার্যত ফ্রান্সের বাইরে। মার্গারিটও আজই একটু বাদে বাবা–মার কাছে ফিরে যাবে। কাস্টমস বেরিয়ার–এর ঠিক পাশেই আমরা একটা বেঞ্চে বসে আছি। আমি হাসতে–হাসতে ওকে শোনাচ্ছি, আমার প্রথমবার এই বিমানবন্দরের অভিজ্ঞতা। মার্গারিটও বলছে কাস্টমস্ সম্পর্কে অনেক মজার গল্প।

এক সময় বুঝলাম, আর বেশি সময় নেই। ওকে বললাম, আমার চোখের দিকে তাকাও! এবার বলো, একদম মন খারাপ করবে না!

মার্গারিটও হাসিমুখে বললো, তুমিও আমার চোখের দিকে তাকাও। এবার বলো, একদম মন খারাপ করবে না।

— মার্গারিট, আমরা হাসিমুখে বিদায় নেবো!

— নীল, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই তো আনন্দের।

ফ্লাইট নম্বর ধরে ডাক দিয়েছে। এবার যেতে হবে। সত্যিই আমি ফিরে যাচ্ছি ? এক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, মার্গারিটের হাসিমুখ দেখেই সামলে নিলাম। ও যদি ঠিক থাকতে পারে, আমি পারবো না ?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলি মার্গারিট। অ রেভোয়া। দু'তিন বছরের মধ্যে আবার নিশ্চয়ই

ফিরে আসবো।

— আমিও কলকাতায় যাবো। দু'তিন বছরের মধ্যেই। মন খারাপ করবে না ?

— না। তুমি ?

— দেখো, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখো, একটুও কাঁপছে ?

একজন লোক এসে তাড়া দিল। আমি মার্গারিটের গালে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

নিচে নেমে এসে রানওয়ে ধরে হাঁটতে–হাঁটতে দেখলাম, ওপরে বারান্দায় একটা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিট। হাসিমুখে বারবার হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে আমার দিকে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমিও উত্তর দিলাম কয়েকবার পেছন ফিরে–ফিরে। তারপর বিশাল প্লেনের গর্ভে ঢুকে গেলাম।

ভেতরটায় বেশ গুমোট। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, রুমাল বাইরে রাখতে ভুলে গেছি। ইস, মার্গারিট জামা–প্যান্ট গুছিয়ে দেবার সময় মনে রাখে নি রুমালের কথা। যাক, তবু জানালার কাছে সিট পাওয়া গেছে। ওপরের হাওয়া ছেড়ে দিয়ে সিট বেল্ট বেঁধে গুছিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে কি মার্গারিটকে দেখা যায় এখনো ?

ও কি ? কী দেখছি ? দূরে এয়ারপোর্টের বারান্দায় মার্গারিট রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে। দু'জন লোক চেপে ধরে আছে তার দু'হাত। আকুলি–বিকুলি করছে মার্গারিট। তার তন্বী শরীরটা যেন ঝড়ের মধ্যে একটা ফুল গাছ। কিছু না ভেবেই আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। বিকৃত গলায় কী যেন বললাম। সহযাত্রীরা অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। আর তক্ষুনি দৌড় শুরু করলো বিমানটা।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম। ঝড়ে যেন আমার শরীরটা কাঁপাচ্ছে! নিজেকে সামলাতে পারছি না, দরদর করে জল পড়ছে চোখ দিয়ে। ইস্, রুমাল নেই, মুছে ফেলতে পারছি না, অন্য লোকেরা ভাবছে কি! পাশের লোকটি হাঁ করে চেয়ে আছে। একবার সে জিজ্ঞেস করলো— কি হয়েছে আপনার ?

উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। শৈশবের প্রায় কুড়ি–পঁচিশ বছর পরে আমি আবার কাঁদছি। নির্লজ্জের মতন। আমার হেঁচকি উঠে যাচ্ছে। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছেও সে কান্না শেষ করা যায় না!

আবার জানালা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলাম। আর কিছুই দেখা যায় না। বাইরে শুধু মেঘ। আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি একলা... আর একি অসম্ভব একাকিত্ব, বুক যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে—মার্গারিট, আমি আছি, তুমি আমার দিকে একবার তাকাও, চোখে চোখ রাখো, আর একবার বলো, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই তো আনন্দের!

স্বপ্ন লজ্জাহীন

মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধেবেলায়। বিকেল থেকেই একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছিল। তারিখটা মনে আছে, ১৯৬৬ সালের ১৭ জুলাই।

ছবিটা মনে পড়ে স্পষ্ট, যদিও বছর পাঁচেক আগের কথা। শিয়ালদার দিক থেকে ট্যাক্সিতে আসছিলাম। ট্যাক্সিতে আমি আর হেমন্ত। বৌবাজারের মোড়ের কাছে ট্যাফিকের লাল আলো, হেমন্ত পকেট থেকে সিগারেট বার করলো, আমি দেশলাই জ্বেলে প্রথমে হেমন্তকে ধরাতে গিয়ে নিভে গেল। দ্বিতীয় কাঠিতে দু'জনেই ধরালাম, ধোঁয়া ছেড়ে ডান পাশে তাকাতেই চোখে পড়লো রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মনীষা। সঙ্গে-সঙ্গে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ...

এই পর্যন্ত লিখে আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে। সিগারেট শব্দটা ব্যবহার করার জন্যই এখন আমার সিগারেট টানার কথা মনে আসে। ড্রয়ার খুলে সিগারেট বার করে ধরালাম, প্যাকেটে আর মাত্র তিনটে সিগারেট, চকিতে আফসোস হয়, কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরার সময় আর একটা প্যাকেট কিনে আনলেই হতো। এই রোদ্দুরের মধ্যে এক ঘণ্টা বাদেই আবার সিগারেট কিনতে বেরুতে হবে। বড্ড গরম আজ, পাখাটা সম্পূর্ণ জোর করাই আছে, তুলে দিলাম জানলার সবগুলো পর্দা, আসুক একটু হাওয়া।

নতুন উপন্যাস শুরু করতে হবে। দিন দশেক ধরেই ভাবছি, এবার কি নিয়ে লেখা যায়। আমি সম্পূর্ণ কাহিনী কিংবা পুরো বিষয়বস্তু আগে ভেবে ঠিক করে নিতে পারি না। একটা কোনো দৃশ্য চোখে ভাসে অথবা মনে পড়ে কোনো একটা চরিত্র—সেখান থেকে শুরু করি, তারপর দুপুরবেলার আকাশে ভাসমান চিলের মতন গল্প যেখানে খুশি যায়।

এবার প্রথমে ভেবেছিলাম বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এই মর্মান্তিক ঘটনা, মুক্তিফৌজের নৈতিক সাহস ও শরণার্থী শিবিরের লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে একটা কিছু লিখবো। লেখা উচিত। কিন্তু দু-তিনদিন বাংলাদেশের রণ-প্রাঙ্গণে ঘুরে এবং শরণার্থী শিবির দেখে আমি নির্বোধ হয়ে যাই। আমি বুঝতে পারি, লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিশাল দুঃখের কথা লেখার মতন ক্ষমতা আমার নেই। সে-রকম ভাষা আমি এখনও শিখি নি। তাছাড়া ও-সব দেখলে লিখতে ইচ্ছে করে না, প্রচণ্ড রাগ হয়। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাই। কিন্তু ঘৃণা

বা ক্রোধ থেকে সাহিত্য হয় না। ভালবাসা ও করুণাই সাহিত্যের অবলম্বন। আমি একটা ক্লিশে ব্যবহার করলাম। উপায় নেই।

বাংলাদেশ বিষয়ে বেশ কয়েকদিন মুহ্যমান কিংবা মোহ্যমান থেকে, তারপর মনে হয়, নিজের জীবন ছাড়া আর কিছুই লেখার নেই। নিজের জীবনের কোনো খণ্ড; তৎক্ষণাৎ চোখে একটা দৃশ্য ভাসে। একজন দরিদ্র স্কুল মাস্টারের ছেলে, ধুতির ওপর শার্ট পরা, একুশ বাইশ বছর বয়েস, সাধারণ চেহারা, মাথায় অনেক চুল, শার্টে একটা বোতাম নেই—সে একটা বাগানওয়ালা বাড়ির লোহার গেট ঠেলে ঢুকলো। বাড়িটা উত্তর কলকাতায়। বাগানের এখানে সেখানে পাথরের জলপরী, পাশ দিয়ে লাল কাঁকর বিছানো পথ। ছেলেটি খানিকটা হেঁটে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালো। একজন বুড়ো চাকর তাকে দেখেই বললো, আসুন। ছেলেটি চাকরটির সঙ্গে গিয়ে একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে বসলো। এই হলঘরেও অনেক পাথরের মূর্তি, দেয়ালে ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং দশ-এগারোটা বিভিন্ন রকমের ঘড়ি। এই সব ঘড়ি সময়ের জন্য নয়। শিল্প সংগ্রহ। বুড়ো চাকরটি ভেতর মহলে গিয়ে ডাকলো, খোকাবাবু, দিদিমণি, মাস্টারবাবু এসেছে। ছেলেটি সোফার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। সে এ-বাড়ির দু'টি ছোট ছেলেমেয়েকে পড়ায়। কিন্তু অত্যন্ত সংকুচিত, অপরাধীর মতন তার ভঙ্গি। যেন একটা কিছু বিরাট অন্যায় করেছে সে। আগের দিন তার হাতের ধাক্কা লেগে চায়ের কাপ উল্টে—কার্পেটে পড়েছিল। কাপটা ভাঙে নি, কিন্তু কার্পেটে চায়ের দাগ ... অবশ্য এজন্য কেউ কোনো কিছু বলে নি তাকে, শুধু বুড়ো চাকরটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল, ছাত্রছাত্রীর মা আড়াল থেকে ...

এই দৃশ্যটি দিয়ে অনায়াসে উপন্যাস শুরু করা যায়। আমারই জীবনের ঘটনা। প্লট চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। তবু ঠিক পছন্দ হয় না। দু-তিনদিন ধরে মনের মধ্যে দৃশ্যটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। বারবার মনে হয়, কি যেন দু-একটা ছোটখাটো বিবরণ বাদ থেকে যাচ্ছে। ছেলেটির চটি জুতোয় কি পেরেক ওঠা ছিল? ছেলেটির, অর্থাৎ আমার? সেই বাগানবাড়িতে কি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল? এখন মনে পড়ছে না, কোনো না কোনো দিন ঠিক মনে পড়বেই।

আমি অন্য কোনো দৃশ্য ভাববার চেষ্টা করি। বাংলাদেশের যুদ্ধের ঘটনাই বেশি করে মনে পড়ে। সাধ হয়, কলম ছেড়ে দিয়ে রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ ছেলেদের সঙ্গী হই। একদিন গিয়েও ছিলাম একটি ক্যাম্পে, বলেছিলাম, আমাকেও আপনাদের দলে নিন্। আমারও তো জন্ম পূর্ব বাংলায়। উত্তর পেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি তো ভারতীয় নাগরিক। আমাদের লড়াইটা আমাদেরই লড়তে হবে—শেষ পর্যন্ত দরকার হলে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে সাহায্য চাইবো।

দু-তিনদিন সময় কেটে যায়। সারাদিন কতো লোকের সঙ্গে মিশছি, কথা বলছি, রাস্তা দিয়ে ঘুরছি, অফিসে কাজ ও সন্ধের পর আড্ডা— কিন্তু কেউ জানে না, আমি সর্বক্ষণ আমার নতুন উপন্যাসের কথা ভেবে যাচ্ছি। একটা দ্বীপের দৃশ্য। ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি বা কাকদ্বীপের কাছ থেকে যে-রকম ছোটখাটো দ্বীপ দেখা যায়। ঐ রকম একটা দ্বীপে আমি একবার গিয়েছিলাম ভরা বর্ষায় নৌকো চেপে। নিবিড় গাছপালা, খুব সাপের ভয়। গিয়েছিলাম সাত আট বছর আগে। কেন সেই দ্বীপের কথা এখন মনে পড়লো কে জানে! এবং মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম, সেই দ্বীপে একটা সিমেন্টের বেদিতে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে একজন রমণী। রমণীটির স্বামী দু-মাস আগে খুন হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। রমণীটি কাঁদে না, কিন্তু তার চোখ-মুখে শান্ত কঠিন শোক। বিশাল সমুদ্রের সামনে মনে হয় তার শোক আরও বিশাল। রমণীটির মুখ অবিকল আমার চেনা একজন মহিলার মতন। যদিও আমার সেই চেনা মহিলা বিধবা নন এবং জীবনে যথেষ্ট সুখী, তবু আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, তীব্র দুঃখের দৃশ্যে তাঁকে খুব মানাবে। সমুদ্রের সামনে

সেই শোকাভিভূতা মূর্তি অসম্ভব সুন্দর দেখায়। সেই রমণীর থেকে সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। তার মুখখানা অনেকটা আমার মতন। অনেকটা, কিন্তু আমি নয়, অন্য লোক। অর্থাৎ এই উপন্যাস থার্ড পার্সনে লেখা হবে।

দৃশ্যটা আমার বেশ পছন্দ হয়। দু-তিনদিন ধরে মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করি। খুঁটিনাটি যোগ হয়। দ্বীপের এক প্রান্তে সিমেন্টের বেদির ওপর বসা সমুদ্রের দিকে মুখ করা বিষণ্ন রমণী, একটু দূরে দাঁড়ানো একজন তরুণ ওভারসিয়ার—এই দৃশ্যে সংলাপ যোগ করলেই হয়। সেই সংলাপ শুরু করা আমার পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা থেকে যায়। একটা দ্বীপে শুধু তো একজন নারী, একজন ওভারসিয়ার এবং ওদের মতন আর দু-চারজন মানুষ থাকবে না! ওখানকার চাষী, মজুর, জেলেদের কথা না বললে সম্পূর্ণ হবে না দ্বীপের কথা। কিন্তু কি করে বলবো ? ঐ সব মানুষের সমস্যা আমি কিছুটা বুঝি, জীবনযাত্রাও কিছুটা দেখেছি, কিন্তু ওদের ভাষা আমি জানি না। এজ্ঞে, গেইছিনু, খেইছিনু—ইত্যাদি দু-একটা শব্দ লাগিয়ে অনেকে চাষী-মজুরদের সংলাপ ফোটায়, ও-সব আমার ক্ষমতার বাইরে। ওদের কথা ভালো করে না জানলে আমি লিখতে পারবো না। মনের মধ্যে একটা সুপ্ত ইচ্ছে থাকে বটে, একদিন সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে মিশবো, ওদের জীবনকে নিজের জীবনের মতন জানবো— তারপর লিখবো ওদের কথা—কিন্তু কবে তা হবে, জানি না। অনেক ইচ্ছেই জীবনে পূর্ণ হয় না।

দ্বীপের দৃশ্যটাও খারিজ করে দেবার পর আর কোনো নতুন দৃশ্য মনে পড়ে না। তাহলে কি নিয়ে লিখবো উপন্যাস ? সকালবেলা চা-টা খেয়ে সাদা কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকি। হাতে খোলা কলম।

কলমটা প্যাডের প্রথম পাতার ওপর আঁকিবুকি কাটতে থাকে। আমি একটুও ছবি আঁকতে জানি না, মানুষের মুখ আঁকতে গেলে খোক্কোসের মতন দেখায়— এলোমেলো রেখায় পাতা ভরে যায়। সে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিই। পরের পাতায়, আচম্বিতে বিনা নোটিশে আমার কলম কিছু লিখতে শুরু করে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওকথাগুলো আমি লিখি নি, আমার কলমই লিখেছিল, কারণ ওকথাগুলো আমি এক মুহূর্ত আগেও ভাবি নি।

মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধেবেলায়। বিকেল থেকেই একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। তারিখটা মনে আছে, ১৯৬৬ সালের ১৭ই জুলাই! ...

একটা উপন্যাস কোন্ জায়গা থেকে শুরু হবে এবং কোথায় শেষ হবে তা আমি আজও জানি না। যেখানে শেষ হয়, তারপর কি আর কিছু নেই ? যেখানে আরম্ভ—তার আগেও কি জীবনের অনেক কথা বাকি থাকে না ? সেদিন বৌবাজারের মোড়ে হঠাৎ দেখা হওয়ার কথা দিয়েই বা কেন শুরু হলো ? তার বহু আগে থেকে আমি মনীষাকে চিনি। সেদিনই যে মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি, তাও নয়। তার আগে এবং পরে মনীষা সম্পর্কে অনেক ভুল করেছি। স্বপ্নে মানুষের যেমন অনেক ভুল হয়ে যায়।

আরম্ভের ঐ কথাগুলো লেখার পরই সেদিনকার সন্ধেবেলার সব ক'টি মুহূর্তের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এমনকি, সিগারেট ধরিয়ে প্রথমবার ধোঁয়া ছেড়ে তাকানো পর্যন্ত। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কেন ? যে মেয়েটিকে আমি এতো ভালবাসি, যার কথা আমি সবসময় ধ্যান করি, তাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পাওয়া মাত্র কেন আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম ? স্বাভাবিক ছিল না কি, 'আরেঃ মনীষা' বলে চেঁচিয়ে ওঠা ? সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়া ?

কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

মনীষার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছিল, সে তার গভীর কালো চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল

আমাদেরই ট্যাক্সির দিকে। অর্থাৎ ও আমাকে আগেই দেখেছে। মনীষা চোখ ফেরায় নি। আমিই ফিরিয়ে নিয়েছি।

— চোখ ফিরিয়েই আমি দেখলাম হেমন্তকে। হেমন্ত মনীষাকে দেখে নি। ট্যাক্সির দু'দিকের জানলা আমাদের দু'জনের। ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলছে, এক্ষুনি সবুজ হবে। আমি আবার তাকালাম মনীষার দিকে, রাস্তার ওদিকে। মনীষা তখনও চেয়ে আছে ট্যাক্সির দিকে। ঠোঁটে সামান্য হাসি, চোখে কৌতুক—সাধারণ যে ভঙ্গিতে ও তাকায় আমার দিকে।

আবার চোখাচোখি হলো, আবার আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

অপরাধ করে শিশু অনেক সময় মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারে না। পড়া না পারলে কিংবা মিথ্যে কথা বললে ছাত্র মাস্টারমশায়ের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমি কেন? মনীষার চেয়ে আমি বয়েসে পাঁচ বছরের বড়, আমি যে-কোনো সময়ে ওর চুলে হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিতে পারি, কথা বলতে-বলতে পারি ওর পিঠে হাত রাখতে, 'এই দুষ্টু মেয়ে' বলে গালে টোকা দিয়েছি সব মিলিয়ে তিনবার, আমি কেন ওর দিকে চোখ পড়লে চোখ সরিয়ে নেবো?

এবারও আমি তাকালাম হেমন্তর দিকে। ও এখনো দেখতে পায় নি।

বৌবাজারের মোড়ে, ভিড়ে, গাড়ি-ঘোড়ার জটলায়— সন্ধে সাড়ে ছ'টায় মনীষাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবো, এবং একা—এরকম তো কখনো ভাবি নি। তাই আমার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যায়।

লাল থেকে সবুজ। ট্যাক্সি চলন্ত। এবার বেপরোয়া হয়ে আমি আবার তাকালাম মনীষার দিকে। একটা ট্রাম আড়াল করলো মনীষাকে।

রাস্তার ওপাশে এসে হেমন্ত বললো, এখন কোন দিকে যাওয়া যায়? এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

আমি শুকনো গলায় বললাম, কোথায় যাওয়া যায়, বল্ তাহলে?

— পার্ক স্ট্রিটের দিকে যাবি?

— গেলে হয়।

— অবিনাশকে ডাকলে হয় না?

— হেমন্ত, শোন্।

— কী?

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের সামনে আবার ট্রাফিকের লাল আলোয় ট্যাক্সি থেমেছে। হেমন্ত মুখ ফিরিয়েছে আমার দিকে, আমি চুপ করে আছি। হেমন্তর চশমার পুরু কাচের আড়ালে ওর উদ্বেগহীন চোখ।

— মনে হলো মনীষাকে দেখলাম। বৌবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

চশমার আড়ালে হেমন্তর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। ব্যস্ত হয়ে বললো, কোথায়?

— বৌবাজারের কাছটায়। ঠিক মনীষা কিনা জানি না, মনে হলো অনেকটা ওর মতন।

— একা?

— তাই তো মনে হলো।

— ডাকলি না? আমাকে বললি না কেন?

— ভালো করে দেখার আগেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

— সর্দারজী, ট্যাক্সি ঘুমা লিজিয়ে।

হেমন্তর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় না। মনীষাকে কেউ কোনোদিন কখনো কোনো রাস্তায় একা

দেখে নি। হঠাৎ একদিন দেখলে কি কেউ তাকে ফেলে চলে যেতে পারে ?

হেমন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু বিরক্ত। এইসব ভিড়ের রাস্তায় ট্যাক্সি ঘোরানো সহজ নয়। হেমন্ত অনবরত তাকে তাড়া দিচ্ছে। গাড়ি ঘোরানো হলো, হেমন্ত আমাকে বললো, কোথায় ? কোন জায়গাটায় ?

মনীষা সেখানে নেই।

একটু আগে এই জায়গাটাকে যে-রকম দেখে গিয়েছিলাম, এখনও অবিকল সেই রকম আছে। পানের দোকানে পারাচটা আয়না, কবিরাজি ওষুধের দোকানের বেঞ্চের ওপর বসা দুই বৃদ্ধ, ফুটপাথে আড্ডায় বিভোর পাঁচ যুবক, রিক্সাওয়ালা এখনও খৈনি ডলছে, পাঁচটি শিশু নিয়ে এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী—সবাই আছে, শুধু মনীষা সেখানে নেই।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমি আর হেমন্ত সেখানে নেমে পড়লাম। খুনের তদন্তের মতন জায়গাটাকে খুঁজতে লাগলাম তন্নতন্ন করে। মনীষা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটা এখনও খালি, আর কেউ দাঁড়ায় নি। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করলে মনীষার পায়ের ছাপও দেখা যাবে।

— তুই ঠিক দেখেছিলি ? এখানেই তো ?

— হ্যাঁ, এখানেই।

— তাহলে কোথায় গেল ?

রাস্তায় অন্য যেসব লোকজন দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে কি জিজ্ঞেস করা যায়, মশাই, একটু আগে এখানে যে একটি মেরুন রঙের শাড়ি পরা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে কোথায় গেল ?

— চল হেমন্ত, ও চলে গেছে !

হেমন্ত আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কোথায় গেল ?

আমি হেসে বললাম, তা আমি কী করে জানবো ?

— তুই একটা কী রে ? মনীষাকে দেখেও তুই তখন কিছু বললি না ?

— হয়তো মনীষা নয়। ওর মতন দেখতে অন্য কেউ।

হেমন্ত আমার কথায় গ্রাহ্য করলো না। চকিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো, কোথায় যেতে পারে ?

মনীষা ট্রামে ওঠে নি, কারণ, ওখানে ট্রাম দাঁড়ায় না। ট্যাক্সি নিয়েছে ? এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি পেয়ে গেল ? সন্ধেবেলা এই সব অঞ্চলে ট্যাক্সি পাওয়া এক হুলুস্থূল ব্যাপার।

হেমন্ত বললো, ঐ যে একটা ফরটি সেভেন বাস যাচ্ছে না ? মনীষার বাড়ির পাশ দিয়ে যায়। চল্—

আমাদের অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে উঠে সেই বাসকে অনুসরণ করলাম। হেমন্ত সব ব্যাপারে চূড়ান্ত না দেখে ছাড়ে না। ও রাস্তার সমস্ত ট্যাক্সি ও বাসকে ওভারটেক করে উঁকিঝুঁকি মারছে। ফরটি সেভেন বাসে বড় ভিড়, ভেতরে মনীষা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। হেমন্ত তবু সেই বাসটাকে ছাড়বে না—

সেই মেঘলা সন্ধেবেলা মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি। তারিখটা মনে আছে, ১৯৬৬ সালের ১৭ই জুলাই।

তারিখটা কেন মনে আছে ? স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ইতিহাসের তারিখ আমি কক্ষনো মুখস্থ রাখতে পারতুম না। শুধু ইতিহাসের রাজা-রাজড়ার নয়, চেনাশুনা কারুর বিয়ের তারিখ, জন্ম তারিখও মনে রাখতে পারি না আমি। তবু ঐ তারিখটা কেন মনে আছে ? একটু ভাবতেও হলো না, লিখতে গিয়ে আপনিই কলম থেকে বেরিয়ে এলো, ১৯৬৬ সালের ১৭ই জুলাই। ঐ

তারিখটার বিশেষত্ব কি ? লেখা বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলুম। হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলে হতো, কিন্তু হেমন্ত এখন কলকাতায় নেই।

সেদিন হেমন্ত আর আমি ট্যাক্সিতে কোথা থেকে আসছিলাম ? শুধু মনীষার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্চর্য ব্যাপার নয়, আমাদের পক্ষেও সন্ধেবেলা বৌবাজারের কাছ দিয়ে ট্যাক্সি করে আসাটা একটু অসাধারণ। আমরা সন্ধের দিকে সাধারণত চৌরঙ্গি পাড়াতেই—। ও, সেদিনটা ছিল ছুটির দিন, আমরা শিয়ালদা থেকে ধরেছিলাম ট্যাক্সি। সকালবেলা চব্বিশ পরগণার দিকনগরে সুবিমলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারিখটা সেইজন্যই মনে আছে।

সুবিমলের নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ হয়েছিল ঐদিন। সুবিমল হাসতে-হাসতে বলেছিল, আমার জন্ম ১৯৩৩ সালের ১৭ই জুলাই। আমার বিয়ে হয়েছিল আমার এক জন্মদিনে—১৯৫৯ সালের ১৭ই জুলাই। আমার জন্মদিন আর ম্যারেজ অ্যানিভারসারি একই দিনে হয়। আবার দ্যাখ, তখন বউকে বলেছিলাম বিয়ের ঠিক সাত বছর পর বাড়ি বানাবো—আজ ঠিক সাত বছর—১৯৬৬'র ১৭ই জুলাই।

সুবিমলের অনেক কিছুই অদ্ভুত। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সুবিমল বিয়ে করেছে সবচেয়ে আগে, এবং বিয়ের অনেক আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, ওর ছেলের নাম রাখবে মানসপুত্র। ছেলে না হয়ে মেয়ে হওয়ায় সুবিমল একটুও বিচলিত না হয়ে নাম রেখেছে মানসী। সুবিমল ওর বাড়িতে দুটো কদম গাছ লাগিয়েছে, তার তলায় বসে ও রাত্রিবেলা বাঁশি বাজানো শেখে। অবশ্য শুধু শীতকালে, তখন সাপের ভয় থাকে না।

তার আগে আমি কোনো গৃহপ্রবেশ উৎসবে যাই নি। ঐ উৎসব কী রকম হয়, আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমার অন্যান্য বন্ধুরা তখন বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া ধরনের, আর সুবিমল ম্যাজিকের মত একটা বাড়ি বানিয়ে ফেললো, রীতিমতন বাগান ও পুকুর সমেত।

আমি ভেবেছিলাম, গৃহপ্রবেশ উৎসবে গিয়ে দেখবো, একটা ফাঁকা বাড়ি, কোনো আসবাব নেই, সব ঘর তালাবন্ধ। প্রথমে সদর দরজা ও তারপর এক-এক করে প্রত্যেক ঘরের তালা খোলা হবে, আমরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বা হিপ-হিপ-হুররে ধরনের আওয়াজ করবো। ইট পেতে উনুন বানানো হবে, তারপর পিকনিকের মতন খিচুড়ি ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়া।

বস্তুত ব্যাপারটা সে রকম নয়। মাটির ঘট ও ডাব থাকে, পুরুত এসে মন্ত্র পড়ে, বহু আত্মীয়-স্বজন ও ঠাকুমা দিদিমারা আসেন, ঠাকুমা দিদিমারা বলেন, আমাদের বিমু একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। বন্ধুবান্ধবদের কোনো ভূমিকাই থাকে না সেখানে। আমি আর হেমন্ত বেশ খানিকটা নিরাশ হয়েছিলাম।

শিয়ালদায় এসে পৌঁছেছিলাম সন্ধে ছ'টা আন্দাজ। একটু আগে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তখনও পড়ছে টিপিটিপি করে, আকাশ দারুণ মেঘলা। ট্রেনে বসবার জায়গা পাই নি; এসেছি প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ মেজাজ খারাপ থাকার পক্ষে উপযুক্ত সময়।

হেমন্ত বলেছিল, সুবিমল যে বাড়ি বানালো, ঐ বাড়িতে ও থাকবে কতক্ষণ ? সারাদিন অফিস, তারপর প্রত্যেকদিন দু'বার করে এই ট্রেন জার্নির ধকল।

আমি বলেছিলাম, তবু তো নিজের বাড়ি। সুবিমলরা বাঙাল, এতদিন প্র্যাকটিকালি রিফিউজি ছিল, এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের খাঁটি নাগরিক হয়ে গেল।

হেমন্ত অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, নিজের বাড়ি ! তুই চোখ বুজে তিন চারবার 'নিজের বাড়ি' কথা দুটো উচ্চারণ কর তো ! দ্যাখ তো, কিছু ছবি ভেসে ওঠে কিনা।

শিয়ালদা স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। ট্যাক্সি খোঁজার জন্য লোকজনের ছুটোছুটি, কুলিদের ধাক্কা,

ভিখিরির ঘ্যানঘ্যানানি, ফেরিওয়ালার চিৎকার। আমি হেমন্তর কথা মতন সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে তিন চারবার বললাম, নিজের বাড়ি !

হেমন্ত বললো, দাঁড়া আগে কিছু বলিস না ! আমি দেখে নি।

হেমন্তও চোখ বুজলো। বিড়বিড় করলো, নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, তুই কি দেখলি ?

— দূর ছাই, আমি কিছু দেখতে পেলাম না। আমার চোখে শুধু সুবিমলের বাড়িটাই ভেসে উঠলো। যদিও ও-রকম কোনো বাড়ি আমি নিজের বাড়ি হিসেবে চাই না।

— সত্যি আর কিছু দেখিস নি ?

— না।

— সুনীল, তুই খুব অনেস্ট। তুই তো অনায়াসেই বানিয়ে-বানিয়ে একটা চমৎকার বাড়ির বর্ণনা দিয়ে দিতে পারতি। সমুদ্রের পাড়ে, চারপাশে ঝাউ গাছ।

— তুই কি দেখলি ?

— আমি কোনো বাড়িই দেখি নি।

— তা হলে ?

— আমি একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। আমি আজকাল চোখ বুজলেই তাকে দেখতে পাই।

— কাকে ? আমি চিনি ?

— এখন বলবো না —

ঐ চোখ বোজার খেলাটার জন্য আমাদের মেজাজটা একটু ভালো হয়ে গিয়েছিল। এ রকম মাঝে-মাঝে করি।

একটু ভিড় কমলে আমরা ট্যাক্সি পেয়েছিলাম। তারপর বৌবাজারের মোড়ে মনীষাকে ...। মনীষা সম্পর্কে সেই আমি প্রথম ভুল করি ... আমি মনীষাকে দেখতে পেয়েও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম ...

হেমন্ত তখন সাতচল্লিশ নম্বর বাসটাকে তাড়া করে যাচ্ছে ট্যাক্সি নিয়ে। বাসটাকে বেশ খানিকটা পেরিয়ে এসে হেমন্ত আমাকে বললো, সুনীল, তুই নেমে গিয়ে এ বাসটায় উঠে পড়। দ্যাখ, ওতে মনীষা আছে কিনা। এক স্টপ পরে নেমে পড়বি। আমি তোকে ফলো করছি।

— যাঃ, অতটা দরকার নেই।

— যা না, আমি বলছি দেখে আয়। মনীষা নিশ্চয়ই ঐ বাসে উঠেছে।

— তুই যা।

হেমন্ত সঙ্গে-সঙ্গে নেমে গেল। আমি সব ব্যাপারেই অনেক দ্বিধা করি। হেমন্ত করে না। পরের স্টপে বাস থেকে নেমে হেমন্ত আবার ট্যাক্সিতে উঠলো। বিমর্ষভাবে বললো, না, মনীষা নেই। কোথায় গেল তা হলে ?

— যাক গে, অত ভেবে আর কি হবে !

— তুই একটা ইডিয়েট। মনীষাকে দেখেও ডাকলি না ! কেন ডাকলি না বল তো ?

— জানি না।

— আমি সঙ্গে ছিলাম বলে ?

— সে রকম কোনো কথা আমার মনেই পড়ে নি।

— মনীষা তোকে দেখতে পেয়েছিল ?

— হ্যাঁ।

হেমন্ত আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ওর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। হেমন্তর প্রশান্ত সুন্দর মুখে সহজেই মন-খারাপের ছায়া পড়ে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম।

আমার মনে হলো, পথের ওপর একলা মনীষাকে দেখতে পেয়েও ওর চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি মনীষাকে গভীরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুল।

২

মনীষার সঙ্গে দেখা করা খুব সোজা। ওর বাড়িতে গেলেই হয়।

সব মেয়ের সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করা যায় না। অনেক বাধা থাকে। টেলিফোন কিংবা চিঠির সুযোগ নিতে হয়। কিংবা তৃতীয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে। কিংবা পথের মোড়ে অপেক্ষা। মনীষার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো অসুবিধে নেই। সোজা ওদের বাড়িতে গিয়ে মনীষার নাম ধরে ডাকলে কেউ কিছু মনে করবে না।

মনীষার ডাকনামটা একটু অন্য ধরনের। মধুবন। ওর বাড়ির সবাই, এমনকি বন্ধুবান্ধব অনেকেই ওকে মধুবন বলে ডাকে। মনীষার বদলে মধুবন হিসেবেই ও বেশি পরিচিত। যে-মেয়ের ভালো নাম তিন অক্ষরে, তার ডাকনাম চার অক্ষরের কেন, আমি জানি না। পৃথিবীতে এমন অনেক আশ্চর্য ব্যাপার থাকে। শুধু মনীষার বাবা ওকে ডাকেন খুকি বলে। এই নামটা আমার বেশ পছন্দ। অনেক মেয়েকে আমার খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে, বয়েস যাই হোক না। 'আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি'—এই ধরনের লাইন মনে আসে।

— দিদিমণি বাড়ি নেই।

— কখন বেরিয়েছে ?

— এই আধঘণ্টা আগে।

চাকরের কাছে এরপর আর জিজ্ঞেস করা যায় না যে, দিদিমণি কোথায় গেছে বা কখন ফিরবে।

সে কথাও জানার উপায় আছে। সদর দরজা থেকে ফিরে যাবার দরকার নেই। আর কিছু জিজ্ঞেস না করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাওয়া যায়। কিংবা চাকরকে জিজ্ঞেস করা যায়, দাদাবাবুরা আছেন তো?

মনীষার দুই দাদা এবং তাঁদের স্ত্রীদের আমি অনেকদিন চিনি। অরুণ আমার ক্লাসমেট ছিল। বরুণদা ওর চেয়ে মাত্র তিন বছর বড়। অরুণের স্ত্রী সুজয়ার সঙ্গে আমার ইয়ার্কির সম্পর্ক। সীমাবৌদি আমার ছোট মাসীর বন্ধু ছিলেন। মনীষার দিদি উষাদিও আমাকে ভালোই চেনেন। বিয়ে করেননি উষাদি। উনি নামকরা সমাজসেবিকা, রিফিউজি মেয়েদের হাতের কাজ শেখাবার জন্য বিরাট প্রতিষ্ঠান করেছেন, একবার এম-এল-এ হয়েছিলেন।

এ বাড়িতে অনেক মানুষজন আসে, আমি হঠাৎ দেখা করতে এলে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু সদর দরজার কাছে মনীষার খোঁজ করে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ওকে আর একা পাবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমার দোষ এই, ওপরে উঠে গেলে, অরুণ কিংবা উষাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, আমি তাঁদের কাছে আর মনীষার কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না। এমন ভাব দেখাতে হয়, যেন আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। এরকম কতদিন গেছে, ও বাড়িতে গিয়ে অরুণ, বরুণদা বা উষাদির সঙ্গে গল্প করতে-করতে চাতকের মতন প্রতীক্ষা করেছি মনীষার জন্য।

বরুণদার দারুণ নেশা ক্যারাম খেলার। দেখলেই জোর করে ক্যারামে বসিয়ে দেবেন। আমি হয়তো বরুণদার সঙ্গে ক্যারাম খেলে-খেলে আঙুল ব্যথা করছি, আর পাশের ঘরে শুনতে পাচ্ছি মনীষার গলা। তখন আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, আমি শুধু মনীষার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি, আর কারুর সঙ্গে নয়। মনীষা যাতে পাশের ঘর থেকে আমার উপস্থিতি টের পায়, তাই আমি কথা বলেছি জোরে-জোরে, হো-হো করে হেসে উঠেছি অকারণে। মনীষা আসে নি। খেলাটেলা শেষ করে যখন আমি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ হয়তো সিঁড়ির মুখে মনীষার সঙ্গে দেখা। মনীষা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এই, তুমি কখন এসেছো? বাঃ, আমাকে ডাকলে না যে?

বাড়ির সবার সামনেই মনীষা আমাকে তুমি বলে। কেউ অস্বাভাবিক মনে করে না। বাংলা গল্প-উপন্যাসে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আপনি থেকে তুমিতে নামার জন্য অনেকগুলো পৃষ্ঠা খরচ হয়। অথচ অনেক বাড়িতেই আমি দেখেছি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাবলীল 'তুমি' ব্যবহার। হেমন্তকে অবশ্য মনীষা আপনি বলে ডাকে। এই নিয়ে হেমন্তর একটু ক্ষোভ আছে। যাক্, এ সম্পর্কে পরে কথা হবে।

মনীষার সঙ্গে আমি ওদের বাড়ির বাইরে দেখা করার চেষ্টা করেছি, সুবিধে হয় নি। মনীষার মধ্যে যে সারল্যের আমি বন্দনা করি, সেই সারল্যই অনেক সময় আমার পক্ষে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারল্য কিংবা দুষ্টুবুদ্ধি।

মনীষা তখন সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। সার্কুলার রোড দিয়ে আমি বাসে চেপে অফিসে যাচ্ছি, জানলার ধারে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একটা বাস স্টপে মনীষা দাঁড়িয়ে আছে। মনীষাই আমাকে দেখে বলেছিল, এই, কোথায় যাচ্ছো?

এর আগে মনীষা দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিল বেশ অনেকদিন ধরে। প্রায় দু'মাস ওকে দেখি নি। ভ্রমণের পর ও আরও সুন্দর হয়ে এসেছে।

— উঠে পড়ো, এই বাসটায় উঠে পড়ো।

মনীষা হেসে বললো, এই বাসে গেলে আমার হবে না।

— কোথায় যাচ্ছো?

— ইউনিভার্সিটিতে।

আমারই তো নেমে পড়া উচিত। ধড়মড় করে উঠতে-উঠতে বাস ছেড়ে দিল। হন্তদন্ত হয়ে চেঁচালুম, রোক্ কে, রোক্ কে! অফিসের সময়ে বাস এত সহজে থামে না। দু'একজন কি যেন টিপ্পনি কাটলো। আমি তো এখন কিছু শুনতে পাবো না। ঠেলেঠুলে এলাম দরজার কাছে। এত চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার কোনো মানে হয় না। লম্বা এক স্টপ বাদে বাস থামলো। সেখান থেকে হনহন করে হেঁটে এলাম মনীষার দিকে।

মনীষা নেই।

এর মধ্যে আরও তিন-চারটে বাস চলে গেছে, মনীষা তো যে-কোনো একটাতে উঠে পড়তেই পারে। আমি তো মনীষাকে অপেক্ষা করতে বলি নি। আমি তো বলি নি, দাঁড়াও, আমি আসছি। তাছাড়া আমি অফিসে যাচ্ছি, মনীষা কলেজে যাচ্ছে, রাস্তায় যদি দেখা হয় তাহলে দু-একটা কথা বলাই তো স্বাভাবিক, গতিপথ তো পাল্টাবার কথা নয়।

তাড়াহুড়ো করে কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেও দেখা না পেলে কী রকম একটু বোকা-বোকা লাগে না? সেই ভাবটা কাটাবার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরালাম। এরপর কল্পনার সিরিজ শুরু হলো। যদি আমি বাস থেকে নেমে পড়তে পারতাম, যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতাম মনীষার। বলতাম, মনীষা, আজ কলেজে যেতে হবে না।

মনীষা কী উত্তর দিত ?

মনীষা হেসে বললো, কলেজে তো যাচ্ছি না। আমি এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।

— ঐ একই হলো। অনেক সাহেবরা আজকাল ইউনিভার্সিটিকে স্কুল বলে। আজকে ক্লাস কাটো।

— বাঃ, কতদিন ক্লাস নষ্ট হলো। আজই তো যাচ্ছি অনেকদিন বাদে।

— সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কবে ফিরলে ?

— পরশু। খুব ঘুরলাম। দারুণ ভালো লেগেছে, দারুণ।

— কতদূর গিয়েছিলে ?

— একেবারে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

— ওখানে সমুদ্রে স্নান করেছিলে ?

— বাঃ, করবো না !

— ওখানে সমুদ্রে স্নান করার সময় কি তোমার আংটি হারিয়ে গিয়েছিল ?

মনীষা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। ভুরু কুঁচকোলেও ওর চোখের কোণ থেকে হাসি-হাসি ভাবটা কখনো মেলায় না। দু-এক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, তার মানে ? হঠাৎ আমার আংটি হারাবার কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ?

— আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। সমুদ্রে স্নান করতে করতে তোমার আংটিটা হারিয়ে গেল।

— তারপর একটা রাঘব বোয়াল সেটা টুপ করে গিলে ফেললো ?

হাসতে-হাসতে মনীষা বললো, স্বপ্ন দেখেছিলে না ঘেঁচু ! এমন সব চট্ করে বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারো ! চলি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

— এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও ! সত্যি আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। তোমার নীল পাথর বসানো একটা আংটি ছিল, সেটা দেখছি না কেন ?

— সেটা আমার নয়, ছোট বৌদির। আমি অত জিনিসপত্তর হারাই না। তোমার অফিস নেই ?

— আজ অফিসে না গেলে কি হয় ? চলো আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাই।

— কেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবে কেন ? বই নিতে হবে ?

— না, না। ওখানকার মাঠে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করবো ?

— গল্প করার জন্য অতদূরে যেতে হবে ?

চমৎকার জায়গা। আগে যখন ওখানে পড়তে যেতাম, তখন দেখতাম, ওখানকার সবুজ মাঠে চমৎকার জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়েরা বসে গল্প করছে। দেখে আমার এমন লোভ হতো—

মনীষা চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। আমি উতলা হয়ে বললাম, চলো, চলো, অত আর ক্লাসের মায়া করতে হবে না। একদিন একটু বেড়ানো যাক্।

— দাঁড়াও, ভাবছি।

— কী ভাবছো ?

— তোমার সঙ্গে যাবো কি না।

— অত ভাবাভাবির কি আছে। চলো, গেলেই ভালো লাগবে। একটা ট্যাক্সি নিই বরং। ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি—

আসলে এসব কিছু না। মনীষা অনেকক্ষণ আগে বাসে চেপে চলে গেছে। আমি সিগারেট টানতে-টানতে এই ধরনের কথা ভাবছিলাম। বাড়ি ফিরে গিয়ে কবিতা লিখলাম, বাস স্টপে

তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ !

পরদিন ঠিক সেই জায়গায় আগে থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এক ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে। মনীষা এলো না। আজ কি ইউনিভার্সিটি বন্ধ ? একটু দূরেই মনীষাদের বাড়ি, অনায়াসেই গিয়ে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু আমি তো বাইরে দেখা করার জন্যই—।

তার পরের দিন আবার। সেদিনও মনীষা এলো না। আমার ধৈর্য তখনও ফুরোয় নি। তিন চারদিন বাদ দিয়ে আবার গেলাম। অফিসে অনবরত লেট হচ্ছে। চুলোয় যাক অফিস।

তিনটে সিগারেট শেষ করার পর দূরে দেখতে পেলাম মনীষা আসছে। হঠাৎ আমার লজ্জা করতে লাগলো। মনীষাদের বাড়ির এত কাছে আমি ওর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছি, ও দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু এটা কি আমার মানায় ? আমি মনীষাকে কোনোদিন প্রেমপত্র লিখি নি, আড়ালে কখনো ভালবাসার কথা জানাই নি—তার দরকার হয় না। ওদের বাড়িতে কিংবা কোনো নেমন্তন্নে বা পিকনিকে মনীষার সঙ্গে দেখা হয়, সাবলীল হৈ-চৈ, অনায়াস ঠাট্টা ইয়ার্কি, কোথাও কোনো বাধা নেই ! মনীষা সেই ধরনের মেয়ে, যে ভালোবাসার কথা বলার জন্য আড়াল খোঁজে না। একদিন ওদের বাড়িতেই অরুণের ঘরে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় মনীষা ঢুকলো। হাতে একটা বড় চিরুনি, মনীষা চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতেই আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিল কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনীষা একবার আমাকে বললো, এই, তোমার চুলগুলো এরকম কপালের ওপর এসে পড়ে কেন ? মাথা আঁচড়াও না বুঝি, চুলগুলো একেবারে পাখির বাসা করে রেখেছো !

আমাদের ছাত্র বয়েসে চুলে তেল না দেওয়া এবং চুল না আঁচড়ানোই ফ্যাসান ছিল। আমার মাথা ভর্তি রুক্ষ বড়-বড় চুল। মনীষা জোর করে আমার চুলে চিরুনি চালিয়ে দিল। আমার তখন মনে হয়েছিল, সেই চিরুনির স্পর্শের নামই ভালবাসা।

সেই অনুযায়ী, আমার মনে হয়েছিল, আর পাঁচটা ছেলের মতন পথের মোড়ে মনীষার জন্য প্রতীক্ষা করা আমাকে মানায় না। অথচ নেশার মতন টানে আমি এসেছি। দূর থেকে মনীষাকে সত্যি-সত্যি আসতে দেখে আমার লজ্জা করলো।

আমি চট করে সরে গেলাম। চলে গেলাম উল্টো ফুটপাথে, যাতে মনীষা আমাকে সহজে দেখতে না পায় ! মনীষা বাস স্টপে দাঁড়াবার পর, আমি এমন করে অন্যমনস্ক ভাব করে হেঁটে যাবো, যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে মনীষা হাতব্যাগ থেকে চশমা বার করে পরলো। মনীষা সব সময় চশমা চোখে দেয় না, এখন বোধহয় বাসের নম্বর দেখার জন্য—

ঠিক সেই সময় কোণাকুনি রাস্তা পার হয়ে আর একটি মেয়ে এসে মনীষার পাশে দাঁড়ালো। গল্প লেখার সুবিধের জন্য ওকে আমি মেয়ের বদলে ছেলে করে দিতে পারতুম। তাতে গল্প জমে ওঠার বেশ সুবিধে। কিন্তু ছেলে নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি মেয়েই, বেশ লম্বা, কমলা রঙের শাড়ি পরা— এরও হাতে বই-খাতা। মেয়েটি চেনে মনীষাকে, দু'জনে গল্প করছে। মনীষা আজ সাদা শাড়ি পরা।

তৃতীয় ব্যক্তিটি ছেলের বদলে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমি চটে গেলুম। এর কোনো মানে হয় না। এখন আমি মনীষার সঙ্গে কথা বলবো কি করে ? অন্য কারুর সামনে আমি একদম কথা বলতে পারি না। বেশি লাজুক হয়ে যাই। সেই জন্যই তো মনীষাকে একলা পাওয়ার ইচ্ছে।

তীব্রভাবে আশা করেছিলাম, মেয়েটি আগেই কোনো বাসে উঠে পড়বে। তা হলো না। এবং ওরা দু'জনেই একটা লাল রঙের ডবল ডেকার বাসের দিকে এমন উদ্‌গ্রীবভাবে তাকালো যে আমি বুঝতে পারলুম, ওদের পথ আলাদা নয়। এরপর আমার কি করা উচিত আমি আর ভেবে পেলুম না। এক-এক সময় এই রকম হয়, এই পৃথিবীর সব নিয়ম-নীতির সঙ্গে হিসেব রেখে

চলতে পারি না আমি। সব সময় যুক্তিতর্ক আর হিসেব মিলিয়ে তো সব ঘটনাও ঘটে না। খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ি। তখন রাশ আলগা করে দিই। শরীরটা যা করতে চায় করুক। আমার শরীর আর আমি তখন যেন আলাদা।

আমার শরীর দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গেল এবং চলন্ত বাসে উঠে পড়লো।

মনীষা আর সেই মেয়েটি বসার জায়গা পায় নি। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে এখনও কি কথা বলছে। মনীষা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। চেনা মানুষকে দেখলে মানুষ এ রকম হাসে। কোনো বিস্ময় নেই। আমাকে ও অনেকক্ষণ আগে থেকেই দেখেছে, না এইমাত্র দেখলো— তাও বোঝার উপায় নেই কোনো।

আমি মনীষাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে দাঁড়ানো কন্ডাকটর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমাকে বললো, টিকিট !

আর একটু পরে কি টিকিট চাওয়া যেত না ? কিংবা আমাকে দেখলে কি মনে হয়, আমি পয়সা ফাঁকি দেবো ? যাই হোক, এই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলার জন্য আমার শরীর পকেটে হাত ঢোকালো। ডান হাতের আঙুল তুলে আনলো অনেক খুচরো পয়সা। কন্ডাকটরের দিকে বাড়িয়ে দিতে গিয়েও হাত থেমে গেল। শরীর এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ক'টা টিকিট কাটবো ? এটা শারীরিক ব্যাপার নয়, এ সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে।

এ তো এক সমস্যা ! শুধু নিজের টিকিট কাটা যায় না। কিন্তু মনীষার সঙ্গের ঐ মেয়েটির ? মনীষার সঙ্গে ওর তো বেশ ভাব দেখছি। মনীষা নিজে টিকিট কাটলে নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটিরও টিকিট কাটতো। কিংবা ঐ মেয়েটি কাটলে মনীষার। কিন্তু আমি মনীষাকে যে ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম ? তাহলে ঐ মেয়েটি ? বাসের এত লোকজনের মধ্যে বলবোই বা কি করে ?

— তিনটে ধর্মতলা।

কন্ডাকটরের বাড়ানো হাতে পয়সা তুলে দিলাম। টিকিট নিয়ে তার মধ্যে থেকে দুটো মনীষার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই নাও !

কথা বন্ধ করে মনীষা অবাক হয়ে তাকালো। তারপর তাকালো মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তাকালো মনীষার চোখে। মেয়েটি চকিতে আমার দিকে চেয়েই আবার চোখ ফেরালো। মনীষা মুচকি হেসে মেয়েটিকে বললো, এই তোর টিকিট কাটা হয়ে গেছে। তুই আর কাটিস না। মনীষা আবার সেই অবাক চোখে আমার দিকে।

এত অবাক হবার কি আছে ? আফটার অল, আমি মনীষার দাদার বন্ধু, হঠাৎ বাসে ট্রামে দেখা হলে তার টিকিট কাটবো, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এবং সঙ্গে আর কেউ থাকলে—

ইউনিভার্সিটি বেশি দূরের পথ নয়। নামবার সময় মনীষা অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, কাল এসো আমাদের বাড়িতে। একটা দরকার আছে।

মেয়েটিও ওখানেই নামবে। মেয়েটি যদি না নামতো, তাহলে বলাই বাহুল্য আমিও নেমে পড়ে মনীষাকে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকের বাসে ওঠাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা হলো না। মেয়েটিও নামার সময় আমার দিকে তাকাবো না তাকাবো না ভাব করেও চকিতে একবার তাকালো, ঈষৎ লজ্জা ও ধন্যবাদ মেশানো হাস্যে বললো, চলি !

উঃ, এই সামান্য ঘটনাটা নিয়ে মনীষা এরপর আমাকে কী জ্বালান জ্বালিয়েছে ! পরের দিন ওদের বাড়িতে এক গাদা লোকের সামনে মনীষা বলে উঠলো, জানো বৌদি, সুনীলদাকে দেখলে মনে হয় ভালো মানুষ, কিন্তু পেটে-পেটে এত—আমার বন্ধু শিবানী—তুমি চেনো তো, ছত্রিশের সি বাড়িতে থাকে— সুনীলদা না তার জন্য বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। মনীষার সঙ্গের সেই মেয়েটার নাম শিবানী। জীবনে তাকে আগে কখনো দেখি নি।

সুজয়া, সীমা বৌদিরা কৌতূহলের সঙ্গে হাসছে। অরুণের একটু মুখ আলগা; সে বললো, কি রে, তুই আবার মেয়েদের পেছনে হিড়িক দিচ্ছিস নাকি ? ট্রেনিং নিয়েছিস ? আমার কাছ থেকে আগে ট্রেনিং নে, না হলে প্যাঁক খেয়ে যাবি।

আমি চোখ দিয়ে মনীষাকে অনুনয় করতে লাগলুম। মনীষা থামলো না, দ্বিগুণ উৎসাহে বললো, আমার জন্য অসুবিধে হয়ে গেল, সুনীলদা শিবানীর সঙ্গে বেশি কথাই বলতে পারলো না। আহা, আমাকে একটু আগে থেকে বলে দেবে তো ! আমি অন্য বাসে উঠতুম।

— কেন বাজে কথা বলছো ! আমি মেয়েটিকে চিনিই না। একটাও কথা বলেছি ওর সঙ্গে ?

— দেখেছো, দেখেছো, লজ্জায় কি রকম কান লাল হয়ে গেছে ? তুমি ওর টিকিট কাটো নি ?

— বাঃ টিকিট কাটার মধ্যে কি আছে ?

— ওর টিকিট কাটার পর আমাকে দেখতে পেয়ে বাধ্য হয়ে আমারটাও—শিবানী কিন্তু খুব ভালো মেয়ে, তোমার পছন্দ আছে—

অরুণ বললো, ভালো কী রে ! শিবানীর গালে তো মেছেতার দাগ আছে !

— এই দাদা, ভালো হবে না বলছি। আমার বন্ধুর নামে যা-তা বলবে না। শিবানী খুব সুন্দর, পড়াশুনোতেও খুব ভালো।

— মধুবন, তুই এক কাজ কর না। শিবানীকে একদিন বাড়িতে ডাক না, সুনীলও থাকবে। এখানেই যা কথাবার্তা বলার বলবে। মেয়েদের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা—বেচারার অবস্থা দু'দিনেই কাহিল হয়ে যাবে—যা টায়ারসাম—মেয়েরা একদম কথার ঠিক রাখে না—আমি তো হাড়ে-হাড়ে জানি !

সুজয়া চোখ পাকিয়ে অরুণকে বললো, তুমি জানো !

— বাঃ জানি না ! তুমি ভাবছো তুমিই ফার্স্ট ? এর আগে এগারোটা মেয়ের সঙ্গে—আমি তো প্রমিসই করেছিলাম, এক ডজন পুরো না হলে বিয়েই করবো না ! সুনীল, তুই এই মেয়েটার সঙ্গে কদ্দিন ধরে চালাচ্ছিস রে ?

গম্ভীর হয়ে থাকলে আরও রাগাবে। যে-কোনো উত্তর দিলে সেটারই অন্য মানে করবে। সুতরাং কোনো উত্তর না দিয়ে রাগ চেপে চোখে হাসিমুখ করে বসে রইলাম !

মনীষা বললো, সুনীলদার অফিস আলিপুরে, আর শিবানীর জন্য বাসে চেপে চলে গেল ইউনিভার্সিটির দিকে। তোমার অফিসের দেরি হয়ে যায় না ?

অরুণ বললো, গভর্নমেন্ট অফিস তো, বারোটার আগে যায় না। তুই সপ্তাহে ক'দিন দেখা করিস রে ?

মনীষার সঙ্গে বাইরে দেখা করার চেষ্টার এই পরিণতি। আরও দু'চারবার অনেক কায়দাকানুন করে বাইরে আলাদা দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। সুবিধে হয় নি। চিঠি লিখে কিংবা টেলিফোনে আমার এই ব্যাকুল ইচ্ছেটার কথা জানিয়ে কি মনীষার সঙ্গে দেখা করা যেত না ? যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি সে রকম চেষ্টা কখনো করি নি। আমার মনে-মনে একটা ভয় ছিল, মনীষাকে কোনো চিঠি লিখলে ও বোধহয় বাড়ির সবাইকে সেই চিঠি দেখিয়ে দেবে। ওর বাড়ির লোক অবশ্য কেউ সেজন্য রেগে যাবে না বা গেট আউট বলবে না আমাকে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে জ্বালিয়ে মারবে। টেলিফোনেও সে রকম সুযোগ হয় নি।

কতবার বিনা কারণে টেলিফোন করেছি অরুণকে, যদি মনীষা প্রথম এসে টেলিফোন ধরে। সে রকম ঘটেছে কদাচিৎ। সুজয়া কিংবা সীমা বৌদি ধরলে খানিকক্ষণ গল্প করার পর ওরাই ডেকে বলেছে, এই মধুবন, সুনীল টেলিফোন করেছে, কথা বলবি? মনীষা তক্ষুনি এসে হালকা ইয়ার্কি শুরু করেছে। শিবানীর সঙ্গে আর দেখা করি না কেন? শিবানী খুব দুঃখ করছিল। ও রোজ ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় বাস স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে—পরপর অনেকগুলো বাস ছেড়ে দেয়। কিংবা—ওর কোন বন্ধুর দাদা নাকি চেনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। সে বলেছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি লুঙ্গি পরে বাজারে যায় আর মাছওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করে! সত্যি?

কোনো-কোনোদিন প্রথমেই টেলিফোনে মনীষাকে পেয়ে আমি বলেছি, মনীষা, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।

— কি রকম জরুরি? এক্ষুনি বলতে হবে?

— না, এখন নয়। শোনো—

— তা হলে সেটা জরুরি কথা নয়। যে-কথা পরেও বলা যায়, তা কক্ষনো জরুরি কথা হয় না।

— আর যদি এক্ষুনি বলি?

— বলো। খুব তাড়াতাড়ি।

— কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

— আমার ভীষণ তাড়া আছে। আমাকে গানের ক্লাসে যেতে হবে।

— দ্যাখ খুকি, তুই বেশি চালাকি করিস না তো! আমি তোর জন্য মরে যাচ্ছি, আর তুই—

মনীষা হাসতে-হাসতে বললো, এই বৌদি, শোনো-শোনো, সুনীলদা টেলিফোনে আমার কান মুলে দিতে চাইছে।

শুনতে পেলাম একটু দূরে সীমা বৌদির গলা, তুই-ই ওর নাকটা মুলে দে না!

তারপর মনীষা টেলিফোনে কী দিয়ে যেন একটা দারুণ আওয়াজ করলো, আমার কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম।

মনীষার সঙ্গে আমি এরকমভাবে দেখা করতে চাই কেন? তাও বুঝিয়ে বলে দিতে হবে?

মনীষা আমাকে এরকমভাবে এড়িয়ে যায় কেন? মনীষা তো কচি খুকি বা ন্যাকা নয়! মনীষা আমাকে পছন্দ করে না?

তাহলে, শান্তনুর বিয়ের দিন তিনতলা ও চারতলার সিঁড়িতে মনীষার সঙ্গে আমার দেখা—সিল্কের শাড়িতে সপ্‌সপ্‌ আওয়াজ করে মনীষা দ্রুত নেমে আসছিল, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, আমি নির্নিমেষে দেখছিলাম ওর অবর্ণনীয় রূপ—মনীষা ধমকের সুরে বললো, এত দেরি করে এলে কেন?—আমি উত্তর দিলাম না—মনীষা ওর মুঠো করা ডান হাত সোজা ঢুকিয়ে দিল আমার বুক পকেটে, কী যেন একটা রাখলো, বললো, তোমার জন্যই রেখেছিলাম এতক্ষণ—মনীষা আবার তরতর করে নেমে চলে গেল—আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি, দুটো চাঁপা ফুল—কেন? ফুল দুটোতে তখনও মনীষার হাতের ঘাম লেগে আছে, গন্ধ শুঁকলাম, মনে হলো, চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ ছাড়িয়েও তার মধ্যে আমি মনীষার হাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

ঘোর কাটতে দু'এক মিনিট সময় যায়। সিঁড়িতে আমার পাশ দিয়ে আরও অনেক মানুষ নেমে যাচ্ছে, উঠছে, আমি কারুকে দেখছি না। তারপর নেমে এলাম নিচে। বর যে ঘরে বসেছে, তার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মনীষা কথা বলছে হেমন্তর সঙ্গে। সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছে মনীষা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর দুল। হাতে কোনো চুড়ি বা গয়না নেই। মনীষার গায়ের রঙ খুব

ফর্সা নয়, মুক্তোর রঙও তো ধপধপে সাদা হয় না।

হেমন্ত বললো, দ্যাখো, মনীষা, এর কোনো মানে হয় ? আমি এ বাড়িতে আর কারুকে চিনি না। আর সুনীলটা আমাকে একা ফেলে ওপরে চলে গেল !

আমি বললাম, আমি মনীষাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম !

মনীষা হাসতে–হাসতে বললো, যা মিথ্যুক ! তুমি তো সিঁড়িতে আমাকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলে। আমাকে দেখতেই পাও নি !

— যা সেজেছো না আজ, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলে, তাই দেখতে পাই নি।

নিজের প্রশংসা শুনলে তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মনীষার। আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললো, এই, তোমরা ঝুমনির মাকে দেখতে যাও নি কেন ?

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে অনুভাদির ?

— বাঃ, সে খবরও রাখেন না ? খবরের কাগজে বেরিয়েছিল—

আমি হেমন্তকে বললাম, ঝুমনির মায়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। শিয়ালদা স্টেশনে একটা গোলমালে উনি লাইনের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভালো আছেন তো শুনেছিলাম।

— শুনেছিলে ? একবার গিয়ে দেখতে পারো নি ?

— কোথায় আছেন ?

— মেডিক্যাল কলেজে। আমি আজ বিকেলেও গিয়েছিলাম, ঝুমনি এমন কাঁদছে—আমার আজ নেমন্তন্ন বাড়িতে আসতে ইচ্ছেই করছিল না।

হেমন্ত আর আমি একটু চুপ করে রইলাম। হাসপাতালে কারুকে দেখতে যাওয়া আমাদের দু'জনের ধাতে নেই। তবে অনুভাদির দুর্ঘটনার কথা শুনে মন খারাপ হয় ঠিকই। ব্যারাকপুরে একবার পিকনিকে অনুভাদি আর ঝুমনি আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল, সেইখানেই প্রথম আলাপ। অনুভাদির মতন এমন হাসিখুশি সরল ভালো মানুষ খুব কমই দেখেছি—বয়েস চল্লিশের বেশি, তবু প্রাণশক্তি অফুরন্ত।

অনুভাদির কথা ভাবতে–ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আমার পাপ মন। আমার মনে হয়, মেডিক্যাল কলেজে অনুভাদিকে দেখতে গেলে মনীষার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেত। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দু'জনে এক সঙ্গে—

হেমন্ত বললো, আমারও নেমন্তন্ন বাড়িতে আসতে ভালো লাগে না। কি রকম দম বন্ধ লাগে। চল সুনীল, এবার কেটে পড়ি। দেখা দেওয়া তো হয়ে গেছে।

মনীষা বললো, এই, না, যাবেন না। মোটেই উচিত নয়, শান্তনুদা তাহলে কি মনে করবে ?

— আমরা এসেছিই তো। এখন ঐ মাংসের ঘ্যাঁট আর বুক–জ্বলা ফ্রাইড রাইস যদি না খাই, তাতেও খারাপ দেখাবে ? মনীষা, তুমি চলো না আমাদের সঙ্গে।

— ধ্যাৎ !

— অরুণ কোথায় ? সুজয়া ?

— দাদা পরিবেশন করছে ওপরে। বৌদি কনে সাজাচ্ছে।

— মনীষা, প্লিজ চলো, অন্তত একটু ঘুরে আসি। বড্ড গরম এখানে।

— ভ্যাট, আমি কোথায় যাবো ! আমি ওপরে চললুম !

হেমন্ত মনীষার হাত ধরে বললো, একটুখানি এসো না এখনও বিয়ে আরম্ভ হতে তো দেরি আছে। দশটায় লগ্ন—

হেমন্ত আন্তরিকভাবে জোর করতে পারে, আমি পারি না। মনীষা আসতে বাধ্য হলো। বেরুবার মুখে যার–যার সঙ্গে দেখা হলো, আমরা বললাম, আসছি এক্ষুনি, একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ে হচ্ছিল শান্তনুর। একটু হেঁটে এলেই পদ্মপুকুর। আকাশে মেঘ–বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই। গাছগুলো শান্ত, পুকুরের জলে তরঙ্গ নেই, আমি মনীষা আর তিনবন্ধু হয়ে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ, মনীষা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত।

আমার হাতের মুঠোয় তখনও সেই চাঁপা ফুল দুটো। মুঠো খুলে মৃদু হেসে আমি বললাম, মনীষা, তোমার জন্য আমি এই চাঁপা ফুল দুটো নিয়ে এসেছিলাম। এতক্ষণ দিতে পারি নি।

হেমন্ত বললো, দুটোই তুই দিস নি। একটা আমাকে দে। আমরা দু'জনে দুটো ফুল দিই মনীষাকে। এই নাও—ভালো যদি বাসো সখী, কি দিব গো আর— কবির হৃদয় এই, দিনু উপহার।

মনীষা ফুল দুটো নিয়ে নাকের কাছে গন্ধ শুঁকলো। কৌতুক হাস্যে বললো, উঁঃ, সিগারেট খাওয়া হাতে এতক্ষণ ধরে আছো, তোমাদের হৃদয়ে সিগারেটের গন্ধ হয়ে গেছে।

অহংকারী নারীর মতন ও ফুল দুটো ছুড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে।

কোমরে গোঁজা ছিল রুমাল, বার করলো। কালিম্পং–এ কুয়াশার মধ্যে লুপ্ত চাঁদ যে–রকম দেখেছিলাম, সেই রকম ওর নাভি দেখতে পেলাম চকিতে। ঝকঝকে তকতকে নিকোনো আঙিনার মতন ওর পেটের কাছের জায়গাটা! সাটিনের মতন মসৃণ ত্বক।

রুমাল দিয়ে আলতো করে মুখ মুছে মনীষা বললো, এবার আমাকে যেতে হবে। তোমরা আর যাবে না?

হেমন্ত হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, না। তুমি একা যাও!

৩

যা বলছিলাম, মনীষার সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়ে যখন খুশি দেখা করা যায়। মনীষা বাড়িতে না থাকলে আমি ওপরে উঠে যেতে পারি।

— দাদাবাবু বাড়িতে আছে তো?

— কোন দাদাবাবু? ছোড়দাদাবাবু আছেন।

চাকরের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আমি সিঁড়িতে পা দিলাম। অরুণ আর সুজয়ার সঙ্গে গল্প করতে–করতে যদি মনীষা এসে পড়ে— তাহলে কোনো একটা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে, সেদিন সন্ধেবেলা ও বৌবাজারের মোড়ে একলা দাঁড়িয়ে ছিল কেন? কোথা থেকে আসছিল বা কোথায় যাচ্ছিল? মনীষা সম্পর্কে ওদের বাড়িতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, ও কখন কোথায় যাবে বা কখন ফিরবে, সে সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে না। এক একটি মেয়ে থাকে এরকম, যাদের সম্পর্কে অভিভাবকরা শাসন করতেও সাহস পান না। নিজেরা ছোট হয়ে যাবেন, এই ভয়ে। মনীষা কোনোদিন কোনো অপমানজনক বা মুখ নিচু হওয়ার মতন কাজ করবে, একথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

মনীষা যদি জিজ্ঞেস করে, আমি কেন সেদিন ওকে দেখেও ট্যাক্সি থামাই নি, কিংবা চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম? কী উত্তর দেবো? এসব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে ঠিক করে রাখা যায় না। তখন সেই মুহূর্তে যা মনে আসবে। কিংবা সবচেয়ে সহজ উত্তর যেটা, সেটা বলাই তো ভালো। জানি না। মনীষা, কেন আমি সেদিন ওরকম করেছিলাম, আমি নিজেই জানি

একটা পাজামা পরা, খালি গায়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে অরুণ। সারা গায়ে ঘাম। মনীষা নেই। মনীষার দেখা না পাওয়াই যেন আমার নিয়তি। ছাদে এই প্রবল হাওয়ার মধ্যে ও কি আঁচল উড়িয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না? অরুণ আমাকে দেখেই বললো, এসেছিস, লাটাইটা ধর তো। অনেকদিন অভ্যেস নেই।

— আরে লাট ছাড়, লাট ছাড়! ঐ লাল চাঁদিয়ালটা তোকে তলায় পড়ে টানতে আসছে।

— আসুক না—বাড়ুক আগে, আর একটু বাড়ুক।

— দে, দে, আমায় দে। আমি ওটাকে এক্ষুনি টেনে দিচ্ছি।

— দাঁড়া, আমি প্যাঁচটা খেলে নি। এর পরেরটা তুই খেলবি। মধুবন এতক্ষণ লাটাই ধরেছিল, হঠাৎ চলে গেল?

আমরা দুই বন্ধু তারপর অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ানোতে মগ্ন হয়ে গেলাম। লাল চাঁদিয়ালটা সাঙ্ঘাতিক খেলছে, আমাদের তিনখানা ঘুড়ি ভো কাট্টা করে দিল। আমরা ওটাকে কাটার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

অনেকদিন অভ্যেস নেই, মাঞ্জা দেওয়া সুতো জোরে টানতে গিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে, বেশিক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যেসব প্যাঁচ আগে কত সহজ ছিল, এখন সেগুলো খেলতেই পারছি না। অন্য ঘুড়ি এসে কুচ করে কেটে দিচ্ছে। যে লাল চাঁদিয়াল ঘুড়িটা আমাদের নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল—একটু পরে টের পেলাম সেটা ওড়াচ্ছে একটা চোদ্দ বছরের ছেলে। ঐ বয়সে অরুণ আর আমিও পাড়ার সব ঘুড়ি কেটে ফাঁক করে দিতাম।

বিকেলের আলো নিভে গেলেও আমাদের ঘুড়ি ওড়াবার নেশা কমে নি, হঠাৎ বৃষ্টি এলো। দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল একেবারে। ঘুড়ি–সুতো–লাটাই ফেলে রেখে দৌড়োলাম; অরুণ বললো, আয় এই ঘরটায় ঢুকে পড়।

তিনতলায় সিঁড়ির দু'পাশে দুটো ঘর, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম একটায়। ছোট কিন্তু ছিমছাম সাজানো ঘরখানা, এক পাশে একটা পুরোনো আমলের ভারী ভারী পায়াওয়ালা খাট, তার পাশে ছোট্ট একটা টিপয়, অন্যদিকে ড্রেসিং টেব্‌ল, স্টিলের আলমারি—আর দু'খানা কাঁচের গা–আলমারি ভর্তি বই। লাল রঙের মেঝে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার—মাঝখানে এইটা কালো বড় সাইজের বৃত্ত, আগেকার অনেক বাড়িতে এরকম দেখা যেত। চেয়ার নেই। অরুণ বললো, আয়, এই বিছানায় বোস। মাথাটা মুছবি, দেখি তোয়ালে–টোয়ালে আবার কোথায় রেখেছে?

— এই ঘরে কে থাকে রে?

তোয়ালে খুঁজে না পেয়ে অরুণ বললো, এটা মধুবনের ঘর। কোথায় যে কি রাখে—কিচ্ছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তোয়ালে–টোয়ালে নেই একটাও—

আমি বললাম, ঘরখানা তো বেশ সাজিয়ে–গুছিয়ে রেখেছে। বেশ ঝক্‌ঝকে—

— মধুবন এসব করে নাকি? ছাই! এসব তো কালোর মা করে।

— কালোর মা কে?

— দেখিস নি? আমাদের যে রান্না করে! ও তো জন্ম থেকে মধুবনকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে—মধুবনকে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসে। এত বয়েস হয়ে গেছে—বাবা বলেছিল ওকে এক সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে দেবে—নিজের ছেলের কাছে গিয়ে থাক্—তা ও কিছুতেই যাবে না।

আমি মনে–মনে কালোর মাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মনীষাকে যে ভালবাসে, সে আমারও প্রিয়।

হেমন্ত আন্তরিকভাবে জোর করতে পারে, আমি পারি না। মনীষা আসতে বাধ্য হলো। বেরুবার মুখে যার–যার সঙ্গে দেখা হলো, আমরা বললাম, আসছি এক্ষুনি, একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ে হচ্ছিল শান্তনুর। একটু হেঁটে এলেই পদ্মপুকুর। আকাশে মেঘ–বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই। গাছগুলো শান্ত, পুকুরের জলে তরঙ্গ নেই, আমি মনীষা আর তিনবন্ধু হয়ে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ, মনীষা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত !

আমার হাতের মুঠোয় তখনও সেই চাঁপা ফুল দুটো। মুঠো খুলে মৃদু হেসে আমি বললাম, মনীষা, তোমার জন্য আমি এই চাঁপা ফুল দুটো নিয়ে এসেছিলাম। এতক্ষণ দিতে পারি নি।

হেমন্ত বললো, দুটোই তুই দিস নি। একটা আমাকে দে। আমরা দু'জনে দুটো ফুল দিই মনীষাকে। এই নাও—ভালো যদি বাসো সখী, কি দিব গো আর— কবির হৃদয় এই, দিনু উপহার।

মনীষা ফুল দুটো নিয়ে নাকের কাছে গন্ধ শুঁকলো। কৌতুক হাস্যে বললো, উঁঃ, সিগারেট খাওয়া হাতে এতক্ষণ ধরে আছো, তোমাদের হৃদয়ে সিগারেটের গন্ধ হয়ে গেছে !

অহংকারী নারীর মতন ও ফুল দুটো ছুড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে।

কোমরে গোঁজা ছিল রুমাল, বার করলো। কালিম্পং–এ কুয়াশার মধ্যে লুপ্ত চাঁদ যে–রকম দেখেছিলাম, সেই রকম ওর নাভি দেখতে পেলাম চকিতে। ঝকঝকে তকতকে নিকোনো আঙিনার মতন ওর পেটের কাছের জায়গাটা ! সার্টিনের মতন। মসৃণ ত্বক।

রুমাল দিয়ে আলতো করে মুখ মুছে মনীষা বললো, এবার আমাকে যেতে হবে। তোমরা আর যাবে না ?

হেমন্ত হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, না। তুমি একা যাও।

৩

যা বলছিলাম, মনীষার সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়ে যখন খুশি দেখা করা যায়। মনীষা বাড়িতে না থাকলে আমি ওপরে উঠে যেতে পারি।

— দাদাবাবু বাড়িতে আছে তো ?

— কোন দাদাবাবু ? ছোড়দাদাবাবু আছেন।

চাকরের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আমি সিঁড়িতে পা দিলাম। অরুণ আর সুজয়ার সঙ্গে গল্প করতে–করতে যদি মনীষা এসে পড়ে— তাহলে কোনো একটা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে, সেদিন সন্ধেবেলা ও বৌবাজারের মোড়ে একলা দাঁড়িয়ে ছিল কেন ? কোথা থেকে আসছিল বা কোথায় যাচ্ছিল ? মনীষা সম্পর্কে ওদের বাড়িতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, ও কখন কোথায় যাবে বা কখন ফিরবে, সে সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে না। এক একটি মেয়ে থাকে এরকম, যাদের সম্পর্কে অভিভাবকরা শাসন করতেও সাহস পান না। নিজেরা ছোট হয়ে যাবেন, এই ভয়ে। মনীষা কোনোদিন কোনো অপমানজনক বা মুখ নিচু হওয়ার মতন কাজ করবে, একথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

মনীষা যদি জিজ্ঞেস করে, আমি কেন সেদিন ওকে দেখেও ট্যাক্সি থামাই নি, কিংবা চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম ? কী উত্তর দেবো ? এসব প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে ঠিক করে রাখা যায় না। তখন সেই মুহূর্তে যা মনে আসবে। কিংবা সবচেয়ে সহজ উত্তর যেটা, সেটা বলাই তো ভালো। জানি না। মনীষা, কেন আমি সেদিন ওরকম করেছিলাম, আমি নিজেই জানি

একটা পাজামা পরা, খালি গায়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে অরুণ। সারা গায়ে ঘাম। মনীষা নেই। মনীষার দেখা না পাওয়াই যেন আমার নিয়তি। ছাদে এই প্রবল হাওয়ার মধ্যে ও কি আঁচল উড়িয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না? অরুণ আমাকে দেখেই বললো, এসেছিস, লাটাইটা ধর তো। অনেকদিন অভ্যেস নেই।

— আরে লাট ছাড়, লাট ছাড়! ঐ লাল চাঁদিয়ালটা তোকে তলায় পড়ে টানতে আসছে।

— আসুক না—বাড়ুক আগে, আর একটু বাড়ুক।

— দে, দে, আমায় দে। আমি ওটাকে এক্ষুনি টেনে দিচ্ছি।

— দাঁড়া, আমি প্যাঁচটা খেলে নি। এর পরেরটা তুই খেলবি। মধুবন এতক্ষণ লাটাই ধরেছিল, হঠাৎ চলে গেল?

আমরা দুই বন্ধু তারপর অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ানোতে মগ্ন হয়ে গেলাম। লাল চাঁদিয়ালটা সাঙ্ঘাতিক খেলছে, আমাদের তিনখানা ঘুড়ি ভো কাট্টা করে দিল। আমরা ওটাকে কাটার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

অনেকদিন অভ্যেস নেই, মাঞ্জা দেওয়া সুতো জোরে টানতে গিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে, বেশিক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যেসব প্যাঁচ আগে কত সহজ ছিল, এখন সেগুলো খেলতেই পারছি না। অন্য ঘুড়ি এসে কুচ করে কেটে দিচ্ছে। যে লাল চাঁদিয়াল ঘুড়িটা আমাদের নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল—একটু পরে টের পেলাম সেটা ওড়াচ্ছে একটা চোদ্দ বছরের ছেলে। ঐ বয়সে অরুণ আর আমিও পাড়ার সব ঘুড়ি কেটে ফাঁক করে দিতাম।

বিকেলের আলো নিভে গেলেও আমাদের ঘুড়ি ওড়াবার নেশা কমে নি, হঠাৎ বৃষ্টি এলো। দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল একেবারে। ঘুড়ি–সুতো–লাটাই ফেলে রেখে দৌড়োলাম; অরুণ বললো, আয় এই ঘরটায় ঢুকে পড়।

তিনতলায় সিঁড়ির দু'পাশে দুটো ঘর, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম একটায়। ছোট কিন্তু ছিমছাম সাজানো ঘরখানা, এক পাশে একটা পুরোনো আমলের ভারী ভারী পায়াওয়ালা খাট, তার পাশে ছোট্ট একটা টিপয়, অন্যদিকে ড্রেসিং টেব্‌ল, স্টিলের আলমারি—আর দু'খানা কাঁচের গা–আলমারি ভর্তি বই। লাল রঙের মেঝে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার—মাঝখানে এইটা কালো বড় সাইজের বৃত্ত, আগেকার অনেক বাড়িতে এরকম দেখা যেত। চেয়ার নেই। অরুণ বললো, আয়, এই বিছানায় বোস। মাথাটা মুছবি, দেখি তোয়ালে–টোয়ালে আবার কোথায় রেখেছে?

— এই ঘরে কে থাকে রে?

তোয়ালে খুঁজে না পেয়ে অরুণ বললো, এটা মধুবনের ঘর। কোথায় যে কি রাখে—কিচ্ছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তোয়ালে–টোয়ালে নেই একটাও—

আমি বললাম, ঘরখানা তো বেশ সাজিয়ে–গুছিয়ে রেখেছে। বেশ ঝক্‌ঝকে—

— মধুবন এসব করে নাকি? ছাই! এসব তো কালোর মা করে।

— কালোর মা কে?

— দেখিস নি? আমাদের যে রান্না করে। ও তো জন্ম থেকে মধুবনকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে—মধুবনকে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসে। এত বয়েস হয়ে গেছে—বাবা বলেছিল ওকে এক সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে দেবে—নিজের ছেলের কাছে গিয়ে থাক্—তা ও কিছুতেই যাবে না।

আমি মনে–মনে কালোর মাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মনীষাকে যে ভালবাসে, সে আমারও প্রিয়।

অরুণ বললো, দাঁড়া দেখি, দিদির ঘরে তোয়ালে পাওয়া যায় কি না। সুজয়া কী করছে নিচে, কফি–টফি বানাচ্ছে ?

— তোমার বউ কি করছে, আমি তা কি করে জানবো ?

— এই বৃষ্টির মধ্যে মুড়ি তেলেভাজা হলে বেশ জমতো। খাবি ?

— খাবো। কাঁচালঙ্কা চাই সঙ্গে।

সিঁড়ির ওপাশের ঘর থেকে অরুণ একটা তোয়ালে নিয়ে এলো। হাঁক ছাড়লো সুজয়াকে।

মাথা মোছার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, মনীষা এই ঘরে একলা একলা থাকে ? ওর ভয় করে না ?

— ভয় করবে কেন ? ও তো অনেক কম বয়েস থেকেই একা–একা শোয়। ওদিকের ঘরটায় দিদি থাকে—কিন্তু দিদি অনেক সময় টুরে গেলে—তিনতলায় ও তখন একলা।

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিই আমি বোকার মতন। সত্যি তো, আজকাল কোনো মেয়ে একলা ঘরে শুতে ভয় পায় নাকি ? বরং বাড়িতে বেশি জায়গা থাকলে সবাই সেটা পছন্দ করে। কিন্তু মনীষা সম্পর্কে এরকম ছোটখাটো তথ্য জানতে বেশ ভালো লাগছে আমার। এতদিন এ বাড়িতে আসছি, অথচ মনীষা কোন্ ঘরে শোয় সেটা আমি জানতুম না। এই ঘরটায় আমি অবশ্য আগে এসেছি বার দু'য়েক। তখন ঘরটার চেহারা অন্যরকম ছিল। প্রথমবার এসেছিলাম অরুণের বিয়েতে। এই ঘরটায় কনেকে বসানো হয়েছিল বউভাতের দিন—অন্যরকম সাজানো ছিল। আর একবার দোলের দিন এই ঘরে খুব গানবাজনা হলো—খুব দুর্দান্ত রঙের খেলা হয়েছিল সেবার—সেবার আমি মনীষার ...

সুজয়া আসছে না, অরুণ আবার হাঁক মারতে গেল। খাট থেকে নেমে আমি ঘুরে–ঘুরে দেখতে লাগলাম ঘরটা। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের চোখে আমি দেখে নিতে লাগলাম এ ঘরের প্রতিটি আসবাবের অবস্থান। যেন সবকিছুই ঠিকঠাক মুখস্থ করে নিতে হবে, কোনো ভুল না হয়। অথচ কোনোই মানে হয় না। এত খুঁটিয়ে–খুঁটিয়ে দেখছি। যাতে এরপরে চোখ বুজলেই ঘরটা স্পষ্ট দেখতে পারি। দেয়ালের দাগগুলো পর্যন্ত।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা চিঠির প্যাড। মনীষা আমাকে কোনোদিন চিঠি লেখে নি। আমিও লিখি নি। আলমারির পাশে একটা ছোট্ট দেয়াল র‍্যাক, তাতে ঝুলছে মনীষার হাউস–কোট। গা–আলমারির বইগুলোতে চোখ বোলালাম। একটা ছোট্ট বারান্দা রয়েছে রাস্তার দিকে। কয়েকটা টব সাজানো, রজনীগন্ধাগুলো দুলছে বৃষ্টির ছাঁট লেগে। এবং বিনা কারণে সেখানে রয়েছে বাচ্চাদের একটা তিনচাকার সাইকেল। এ বাড়িতে কোনো বাচ্চা নেই। মনীষাই এ বাড়ির কনিষ্ঠ সন্তান, সাইকেলটা বোধহয় মনীষারই ছেলেবেলার। অত্যন্ত মায়ার সঙ্গে আমি সাইকেলটার গায়ে হাত বুলোলাম।

অরুণ তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কি সব বলছে, আমি বারান্দা থেকে ঘরে এলাম। আলমারিটার পাশ দিয়ে যেতে–যেতে র‍্যাকে ঝোলানো মনীষার হাউস–কোটটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শুয়ে পড়ার আগে কিংবা ঘুম থেকে উঠে মনীষা ওটা গায়ে দেয়। লাল ও খয়েরি রঙের লতাপাতা আঁকা সুন্দর ডিজাইন। হাউস–কোটটার ওপর হাত রেখে, কিছু না ভেবেই আমি মুখ এগিয়ে নিয়ে বুকের কাছাকাছি জায়গায় চুমু খেলাম আলতোভাবে।

পরক্ষণেই আমার মনে হলো, এই যে ব্যাপারটা আমি করলাম, নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের বইতে এ ব্যাপারটারও কিছু একটা নাম আছে। ভারিগোছের ল্যাটিন কোনো নাম থাকাও বিচিত্র নয়। এবং নির্ঘাৎ সেখানে অস্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কে অনেক কচকচি। আমি কি অস্বাভাবিক মানুষ?

তেলে ভাজা এসে পৌঁছোবার আগেই সুজয়া কফি বানিয়ে ফেলেছে। আগে নিয়ে এসেছে

কিসের একটা ধাক্কা লাগলো। একটু আগে বারান্দায় তিনচাকার সাইকেলটায় একবার ধাক্কা খেয়েছি। আলোর সুইচটা কোনদিকে সেটা সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্য করা হয়নি। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক ভুল।

দেয়াল হাতড়ে–হাতড়ে সুইচ খুঁজতে লাগলাম। সাধারণত দরজার পাশেই থাকার কথা। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে খানিকটা—আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি বিছানায় শুয়ে আছে মনীষা, ওদিকে পাশফেরা।

আলো কি জ্বালা উচিত ? অন্ধকারে আমার আসার অস্তিত্ব টের পেয়ে মনীষা যদি চেঁচিয়ে ওঠে ? আলো জ্বাললেও এই গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে মনীষা চেঁচিয়ে উঠবে না?

সাবধানে পা ফেলে মনীষার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালাম। টিপয়ের ওপর এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া। কি সুন্দর লেসের কাজ করা ঢাকনা। কিছু না ভেবে–চিন্তে আমি গেলাসের জলটা খেয়ে ফেললাম। খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়ায় আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম একটা। দেশলাইয়ের কাঠিটা কোথায় ফেলবো ? মেয়েদের ঘরে অ্যাশট্রে আশা করা যায় না, জানলার কাছে গিয়ে বারবার ছাই ফেলে আসতে হবে।

এখন আর নিজেকে চোর–চোর মনে হচ্ছে না। চোর কখনো সিগারেট ধরায় না। এখন সবকিছুই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটু–একটু দুলছে মনীষার শরীর। খাটের পাশে বেড সুইচ—হঠাৎ আলো জ্বালার আর কোনো অসুবিধে নেই।

মেয়েদের ঘুম সাধারণত খুব গাঢ় হয় না। মনীষা কি হঠাৎ জেগে উঠবে ? ঘুমন্ত মনীষাকে আমি কখনো দেখি নি। দেখি নি ওর নিমীলিত চোখ। বস্তুত, এত কাছ থেকে এত নিবিষ্টভাবে ওকে কখনো দেখার সুযোগ হয় নি।

মন, চেয়ে দ্যাখ, এর নাম নারী। রক্তমাংসের এই এক মহাশক্তিশালী চুম্বক। এই এক মায়ার খনি। এরই নাম মহামায়া। পাখির ডানার মতন ঐ দুই ভুরু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, নিঃশ্বাসে দুলে ওঠা সুঠাম দুই বুক, কোমল আঙুল, নর্তকীর মতন কটিরেখা, জঙ্ঘার ডৌল, মা–লক্ষ্মীর মতন দু'টি পায়ের পাতা—এ কোনরকম সৌন্দর্যের আধার ? এ কি শুধু নির্নিমেষে দেখার, না ছুঁয়ে ছেনে ভোগ করার ? ফুল দেখলে গন্ধ শুঁকি, খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না। নদী দেখলে স্নান করার বাসনা হয়। এ কোন ধরনের সৌন্দর্য ? ফুল না নদী ?

জানলা দিয়ে সিগারেটটা ফেলে এসে আমি খুব আলতোভাবে খাটের ওপর বসলাম। আমার দুঃসাহস দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। মনীষা জাগলো না। আরও সাহস সঞ্চয় করে আমি হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। মনীষা তখনো জাগে নি। দেখতে যখন চাই তখন পরিপূর্ণ আলোয় দেখা ভালো।

মনীষার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির ছায়া। কোনো সুখের স্বপ্ন দেখছে ? এর আগে অনেকবার আমি মনীষার হাস্যময় মুখের কথা বলেছি। সেটা আমার মুদ্রাদোষ নয়—মনীষার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে ওর চাপা হাসিমাখা মুখ। গম্ভীর কিংবা মনমরা অবস্থায় ওকে আমি কখনো দেখি নি। আমি নিজেও ওকে কখনো বিষণ্ন করে দিতে পারি নি। ঘুমের মধ্যেও ওর ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে। আজ কি আমি ওকে বিষণ্ন করে দেবো ?

পাতলা রাত্রিবাস পরে শুয়ে আছে মনীষা। কিন্তু আমার মনে কোনো অসভ্য চিন্তা জাগলো না। এজন্য আমার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। উরুর কাছ থেকে আলতোভাবে ওর রাত্রিবাসটা সরিয়ে দেবার লোভ কি আমার জাগতে পারতো না ? আমি তো সাধু পুরুষ নই! তাছাড়া, সৌন্দর্য দর্শনে কি কোনো সীমারেখা টানা যায় ? কিন্তু মনীষার চরিত্রটাই এ রকম, ওর কাছে এলে

অরুণ বললো, দাঁড়া দেখি, দিদির ঘরে তোয়ালে পাওয়া যায় কি না। সুজয়া কী করছে নিচে, কফি–টফি বানাচ্ছে ?

— তোমার বউ কি করছে, আমি তা কি করে জানবো ?

— এই বৃষ্টির মধ্যে মুড়ি তেলেভাজা হলে বেশ জমতো। খাবি ?

— খাবো। কাঁচালঙ্কা চাই সঙ্গে।

সিঁড়ির ওপাশের ঘর থেকে অরুণ একটা তোয়ালে নিয়ে এলো। হাঁক ছাড়লো সুজয়াকে।

মাথা মোছার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, মনীষা এই ঘরে একলা একলা থাকে ? ওর ভয় করে না ?

— ভয় করবে কেন ? ও তো অনেক কম বয়েস থেকেই একা–একা শোয়। ওদিকের ঘরটায় দিদি থাকে—কিন্তু দিদি অনেক সময় টুরে গেলে—তিনতলায় ও তখন একলা।

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিই আমি বোকার মতন। সত্যি তো, আজকাল কোনো মেয়ে একলা ঘরে শুতে ভয় পায় নাকি ? বরং বাড়িতে বেশি জায়গা থাকলে সবাই সেটা পছন্দ করে। কিন্তু মনীষা সম্পর্কে এরকম ছোটখাটো তথ্য জানতে বেশ ভালো লাগছে আমার। এতদিন এ বাড়িতে আসছি, অথচ মনীষা কোন্ ঘরে শোয় সেটা আমি জানতুম না। এই ঘরটায় আমি অবশ্য আগে এসেছি বার দু'য়েক। তখন ঘরটার চেহারা অন্যরকম ছিল। প্রথমবার এসেছিলাম অরুণের বিয়েতে। এই ঘরটায় কনেকে বসানো হয়েছিল বউভাতের দিন, অন্যরকম সাজানো ছিল। আর একবার দোলের দিন এই ঘরে খুব গানবাজনা হলো— খুব দুর্দান্ত রঙের খেলা হয়েছিল সেবার—সেবার আমি মনীষার ...

সুজয়া আসছে না, অরুণ আবার হাঁক মারতে গেল। খাট থেকে নেমে আমি ঘুরে–ঘুরে দেখতে লাগলাম ঘরটা। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের চোখে আমি দেখে নিতে লাগলাম এ ঘরের প্রতিটি আসবাবের অবস্থান। যেন সবকিছুই ঠিকঠাক মুখস্থ করে নিতে হবে, কোনো ভুল না হয়। অথচ কোনোই মানে হয় না। এত খুঁটিয়ে–খুঁটিয়ে দেখছি। যাতে এরপরে চোখ বুজলেই ঘরটা স্পষ্ট দেখতে পারি। দেয়ালের দাগগুলো পর্যন্ত।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা চিঠির প্যাড। মনীষা আমাকে কোনোদিন চিঠি লেখে নি। আমিও লিখি নি। আলমারির পাশে একটা ছোট্ট দেয়াল র‍্যাক, তাতে ঝুলছে মনীষার হাউস–কোট। গা–আলমারির বইগুলোতে চোখ বোলালাম। একটা ছোট্ট বারান্দা রয়েছে রাস্তার দিকে। কয়েকটা টব সাজানো, রজনীগন্ধাগুলো দুলছে বৃষ্টির ছাঁট লেগে। এবং বিনা কারণে সেখানে রয়েছে বাচ্চাদের একটা তিনচাকার সাইকেল। এ বাড়িতে কোনো বাচ্চা নেই। মনীষাই এ বাড়ির কনিষ্ঠ সন্তান, সাইকেলটা বোধহয় মনীষারই ছেলেবেলার। অত্যন্ত মায়ার সঙ্গে আমি সাইকেলটার গায়ে হাত বুলোলাম।

অরুণ তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কি সব বলছে, আমি বারান্দা থেকে ঘরে এলাম। আলমারিটার পাশ দিয়ে যেতে–যেতে র‍্যাকে ঝোলানো মনীষার হাউস–কোটটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শুয়ে পড়ার আগে কিংবা ঘুম থেকে উঠে মনীষা ওটা গায়ে দেয়। লাল ও খয়েরি রঙের লতাপাতা আঁকা সুন্দর ডিজাইন। হাউস–কোটটার ওপর হাত রেখে, কিছু না ভেবেই আমি মুখ এগিয়ে নিয়ে বুকের কাছাকাছি জায়গায় চুমু খেলাম আলতোভাবে।

পরক্ষণেই আমার মনে হলো, এই যে ব্যাপারটা আমি করলাম, নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের বইতে এ ব্যাপারটারও কিছু একটা নাম আছে। ভারিগোছের ল্যাটিন কোনো নাম থাকাও বিচিত্র নয়। এবং নির্ঘাৎ সেখানে অস্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কে অনেক কচকচি। আমি কি অস্বাভাবিক মানুষ?

তেলে ভাজা এসে পৌঁছোবার আগেই সুজয়া কফি বানিয়ে ফেলেছে। আগে নিয়ে এসেছে

কিসের একটা ধাক্কা লাগলো। একটু আগে বারান্দায় তিনচাকার সাইকেলটায় একবার ধাক্কা খেয়েছি। আলোর সুইচটা কোনদিকে সেটা সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্য করা হয়নি। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক ভুল।

দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে সুইচ খুঁজতে লাগলাম। সাধারণত দরজার পাশেই থাকার কথা। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে খানিকটা—আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি বিছানায় শুয়ে আছে মনীষা, ওদিকে পাশফেরা।

আলো কি জ্বালা উচিত ? অন্ধকারে আমার আসার অস্তিত্ব টের পেয়ে মনীষা যদি চেঁচিয়ে ওঠে ? আলো জ্বাললেও এই গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে মনীষা চেঁচিয়ে উঠবে না?

সাবধানে পা ফেলে মনীষার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালাম। টিপয়ের ওপর এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া। কি সুন্দর লেসের কাজ করা ঢাকনা। কিছু না ভেবে-চিন্তে আমি গেলাসের জলটা খেয়ে ফেললাম। খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়ায় আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম একটা। দেশলাইয়ের কাঠিটা কোথায় ফেলবো ? মেয়েদের ঘরে অ্যাশট্রে আশা করা যায় না, জানলার কাছে গিয়ে বারবার ছাই ফেলে আসতে হবে।

এখন আর নিজেকে চোর-চোর মনে হচ্ছে না। চোর কখনো সিগারেট ধরায় না। এখন সবকিছুই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটু-একটু দুলছে মনীষার শরীর। খাটের পাশে বেড সুইচ—হঠাৎ আলো জ্বালার আর কোনো অসুবিধে নেই।

মেয়েদের ঘুম সাধারণত খুব গাঢ় হয় না। মনীষা কি হঠাৎ জেগে উঠবে ? ঘুমন্ত মনীষাকে আমি কখনো দেখি নি। দেখি নি ওর নিমীলিত চোখ। বস্তুত, এত কাছ থেকে এত নিবিষ্টভাবে ওকে কখনো দেখার সুযোগ হয় নি।

মন, চেয়ে দ্যাখ, এর নাম নারী। রক্তমাংসের এই এক মহাশক্তিশালী চুম্বক। এই এক মায়ার খনি। এরই নাম মহামায়া। পাখির ডানার মতন ঐ দুই ভুরু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, নিঃশ্বাসে দুলে ওঠা সুঠাম দুই বুক, কোমল আঙুল, নর্তকীর মতন কটিরেখা, জঙ্ঘার ডৌল, মা-লক্ষ্মীর মতন দু'টি পায়ের পাতা—এ কোনরকম সৌন্দর্যের আধার ? এ কি শুধু নির্নিমেষে দেখার, না ছুঁয়ে ছেনে ভোগ করার ? ফুল দেখলে গন্ধ শুঁকি, খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না। নদী দেখলে স্নান করার বাসনা হয়। এ কোন ধরনের সৌন্দর্য ? ফুল না নদী ?

জানলা দিয়ে সিগারেটটা ফেলে এসে আমি খুব আলতোভাবে খাটের ওপর বসলাম। আমার দুঃসাহস দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। মনীষা জাগলো না। আরও সাহস সঞ্চয় করে আমি হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। মনীষা তখনো জাগে নি। দেখতে যখন চাই তখন পরিপূর্ণ আলোয় দেখা ভালো।

মনীষার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির ছায়া। কোনো সুখের স্বপ্ন দেখছে ? এর আগে অনেকবার আমি মনীষার হাস্যময় মুখের কথা বলেছি। সেটা আমার মুদ্রাদোষ নয়—মনীষার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে ওর চাপা হাসিমাখা মুখ। গম্ভীর কিংবা মনমরা অবস্থায় ওকে আমি কখনো দেখি নি। আমি নিজেও ওকে কখনো বিষণ্ণ করে দিতে পারি নি। ঘুমের মধ্যেও ওর ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে। আজ কি আমি ওকে বিষণ্ণ করে দেবো ?

পাতলা রাত্রিবাস পরে শুয়ে আছে মনীষা। কিন্তু আমার মনে কোনো অসভ্য চিন্তা জাগলো না। এজন্য আমার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। উরুর কাছ থেকে আলতোভাবে ওর রাত্রিবাসটা সরিয়ে দেবার লোভ কি আমার জাগতে পারতো না ? আমি তো সাধু পুরুষ নই! তাছাড়া, সৌন্দর্য দর্শনে কি কোনো সীমারেখা টানা যায় ? কিন্তু মনীষার চরিত্রটাই এ রকম, ওর কাছে এলে

কোনোরকম অসমীচীন বা কুৎসিত চিন্তা মাথায় আসে না। ওর ঘুমন্ত শরীরেও সেই চরিত্রটা জেগে আছে, একটা হাত বুকের কাছে, একটা হাত বিছানায় ছড়ানো। গলায় হার নেই, হাতে একটাও চুড়ি নেই। এ রকম নিরলঙ্কার নারী আমি দেখি নি। গোছা-গোছা চুল ছড়িয়ে আছে বালিশ জুড়ে। পায়ের তলা দুটোও কি পরিষ্কার, একটুও ময়লা নেই।

ওর চুলের ওপর হাত রাখতে যেতেই মনীষা একটু নড়ে উঠলো। দিশে হারিয়ে আমি তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম নিথরভাবে। মনীষা আবার নড়ে উঠতেই আমি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালাম দেয়াল ঘেঁষে। মানুষের চুল কি এত সেনসেটিভ যে সামান্য ছোঁয়াতেই টের পেয়ে যাবে?

মনীষা পাশ ফিরলো, হাত বাড়ালো জলের গেলাসের দিকে। ও জানে না, চোর এসে জল খেয়ে নিয়েছে। খুট করে শব্দ হয়ে আলো জ্বলে উঠলো। তাও আমাকে দেখতে পায় নি।

চোরেরা যা করে না, সে রকম একটা কিছু আমার করা উচিত। পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমি শব্দ করে দেশলাই কাঠি জ্বালালাম।

মনীষা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। সদ্য ঘুমভাঙা মুখে চড়া আলো পড়ার জন্য চোখ কুঁচকে গেছে, সেইভাবে দেখছে আমাকে। বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে স্বপ্ন। আমি মৃদু গলায় ডাকলাম, মনীষা—।

এবার ধড়মড় করে উঠে বসে পায়ের কাছ থেকে একটা চাদর টেনে গায়ে জড়ালো। বললো, একি?

হঠাৎ খুব বেশি চিৎকার করে উঠবে, কিংবা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে—মনীষা সেরকম মেয়ে নয়। তবু আমার একটু-একটু আশঙ্কা ছিল। ব্যাপারটা এত সহজ হবে আশা করি নি। এরপর মনীষা আর যাই করুক চেঁচিয়ে বাড়ির লোক জড়ো করবে না।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, মনীষা, রাগ করো না—

তখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ঘোরলাগা চোখ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকালো দরজার দিকে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আস্তে-আস্তে বললো, তুমি কী করে এলে?

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, হঠাৎ খুব বিপদে পড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমাকে পুলিশে তাড়া করেছিল—আমার কোনো দোষ নেই।—সবটা আগে শোনো—

জানি, খুবই অতি নাটকীয় শোনাচ্ছে। বটতলার উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনা থাকে। আমি বানিয়ে-বানিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে পারি, কিন্তু নিজে কোনো সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়লে, কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ বানাতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, ভীষণভাবে আমার বুক কাঁপছিল। আমি নিজেই সেই দুপদাপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মনীষা আমার কথায় গুরুত্ব দিল না, আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী করে এলে?

— পাইপ বেয়ে। বারান্দার পাশেই একটা পাইপ আছে, অতিকষ্টে, পা পিছলে আর একটু হলে পড়ে মরছিলাম—

এই বর্ণনাটা আরও খারাপ। আমি ঠিক পাইপ বেয়ে ওঠা ছেলে-ছোকরার টাইপ নই। সত্যিকারের পুলিশ কোনোদিন তাড়া করলেও প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি কোনোদিন তিনতলা বাড়ির বারান্দায় পাইপ বেয়ে উঠতে পারবো না। শারীরিক সামর্থ্য ছাড়াও, আমার লজ্জা করবে।

মনীষার মুখ দেখে মনে হলো না আমার একটা কথাও বিশ্বাস করেছে। করতলে রাখলো চিবুক। চোখ আমার চোখে।

সপ্রতিভ হবার জন্য আমি বললাম, রাস্তার দিকে বারান্দার এই দরজাটা খুলে শুয়ো না কক্ষনো। অন্য লোকও তো উঠে আসতে পারে। যদি কোনো চোর-ডাকাত হতো—

— কি জানি !

— মনীষা, ইয়ার্কি করো না। এটা ইয়ার্কির সময় নয়।

— তাহলে ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না। ভালবাসা মানে কি ? বিশেষ কোনো একজনকে বিয়ে করতে চাওয়া ? যারা বিয়ে করেছে, তাদের তো দেখেছি, সব ব্যাপারটাই কি রকম ঘরোয়া আর সাধারণ হয়ে যায়।

আমি চট করে কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। ব্যাপারটা যে এ রকমভাবেও বলা যায়, আগে খেয়াল করি নি। কারুকে ভালবাসা মানে কি তাকে বিয়ে করতে চাওয়া ? বিয়ে করার পরে কি?

মনে মনে দুর্বল হয়ে গেলেও হার মানা যায় না। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, তুমি আমার ওপরে এখনো রেগে আছো, সেদিন বৌবাজারের মোড়ে—

— এবার তুমিই জোরে কথা বলছো। দিদির কিন্তু খুব পাতলা ঘুম। দিদি যদি দেখে ঘরে আলো জ্বলছে—

— আলো নিবিয়ে দাও—

— তুমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে ?

— যদি দাঁড়িয়ে না থাকি, তোমার পাশে শুয়ে পড়ি ? শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করবো!

— কি পাগলের মতন আবোল-তাবোল কথা বলছো তখন থেকে ?

— এটা কি পাগলের মতন কথা ? আমি যদি তোমার পাশে শুয়ে তোমাকে একটু আদর করি, সেটা কি খুব দোষের ব্যাপার ?

— দোষ-গুণ জানি না। এটা ঠিক নয়।

— মনীষা, তোমার সঙ্গে সত্যিই আমার অনেক কথা আছে।

— যাঃ! এবার লক্ষ্মীটি চলে যাও। এত রাত্রে এসব ভালো দেখায় না! তুমি বুঝতে পারছো না। এসব তোমাকে মানায় না। তোমার একটা সম্মান আছে।

— ধুত্তোরি ছাই সম্মান! তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমার এমন কষ্ট হয়!

আমি নিজেই নিভিয়ে দিলাম আলো। বসে-থাকা মনীষাকে শুইয়ে দিয়ে ওর বুকে আমার কাতর মুখ ঘষতে-ঘষতে বললাম, মধুবন, তোমাকে আমি চাই, সেদিন বৌবাজারে আমি অন্যায় করেছি, তোমাকে দেখেও... রাগ কোরো না প্লিজ... তুমি কেন বৌবাজারে দাঁড়িয়ে একা ঐ সময়ে... আমি তোমার জন্য... আঃ কি সুন্দর গন্ধ তোমার শরীরে...

না, এই ঘটনার এক বর্ণও সত্যি নয়। সবই আমার মনে-মনে দেখা স্বপ্ন। বুকে হাত দিয়ে বলুক তো, কোন যুবক এ রকম স্বপ্ন দেখে না ?

সেই গঙ্গার ধার, সুজয়া, অরুণ আর হেমন্তর পাশে আমি দাঁড়িয়ে। মনে-মনে আমি চলে গিয়েছিলাম মনীষার কাছে। নিছক ছেলেমানুষি কল্পনা। ওরকমভাবে কোনোদিনই আমি মধ্যরাত্রে মনীষার ঘরে ঢুকতে পারবো না। মনীষার সঙ্গে অতক্ষণ একা-একা কথা বলার সুযোগও কি পাবো কখনও ?

হুইস্কির বোতলটি শেষ হয়ে গেছে। অরুণ সেটা ছুড়ে ফেলে দিল গঙ্গার জলে। সুজয়া বললো, খুব হয়েছে, এবার বাড়ি চলো!

হেমন্ত বললো, কী রে সুনীল, তুই এত গুম মেরে রয়েছিস কেন ? চল, অরুণ আর সুজয়াকে নামিয়ে দিই, আমরা অবিনাশকে খুঁজি। বেশি বাজে নি, নাইট ইজ ইয়াং ...

কোনোরকম অসমীচীন বা কুৎসিত চিন্তা মাথায় আসে না। ওর ঘুমন্ত শরীরেও সেই চরিত্রটা জেগে আছে, একটা হাত বুকের কাছে, একটা হাত বিছানায় ছড়ানো। গলায় হার নেই, হাতে একটাও চুড়ি নেই। এ রকম নিরলঙ্কার নারী আমি দেখি নি। গোছা-গোছা চুল ছড়িয়ে আছে বালিশ জুড়ে। পায়ের তলা দুটোও কি পরিষ্কার, একটুও ময়লা নেই।

ওর চুলের ওপর হাত রাখতে যেতেই মনীষা একটু নড়ে উঠলো। দিশে হারিয়ে আমি তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম নিথরভাবে। মনীষা আবার নড়ে উঠতেই আমি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালাম দেয়াল ঘেঁষে। মানুষের চুল কি এত সেনসেটিভ যে সামান্য ছোঁয়াতেই টের পেয়ে যাবে ?

মনীষা পাশ ফিরলো, হাত বাড়ালো জলের গেলাসের দিকে। ও জানে না, চোর এসে জল খেয়ে নিয়েছে। খুট করে শব্দ হয়ে আলো জ্বলে উঠলো। তাও আমাকে দেখতে পায় নি।

চোরেরা যা করে না, সে রকম একটা কিছু আমার করা উচিত। পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমি শব্দ করে দেশলাই কাঠি জ্বালালাম।

মনীষা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। সদ্য ঘুমভাঙা মুখে চড়া আলো পড়ার জন্য চোখ কুঁচকে গেছে, সেইভাবে দেখছে আমাকে। বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে স্বপ্ন। আমি মৃদু গলায় ডাকলাম, মনীষা—।

এবার ধড়মড় করে উঠে বসে পায়ের কাছ থেকে একটা চাদর টেনে গায়ে জড়ালো। বললো, একি ?

হঠাৎ খুব বেশি চিৎকার করে উঠবে, কিংবা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে—মনীষা সেরকম মেয়ে নয়। তবু আমার একটু-একটু আশঙ্কা ছিল। ব্যাপারটা এত সহজ হবে আশা করি নি। এরপর মনীষা আর যাই করুক চেঁচিয়ে বাড়ির লোক জড়ো করবে না।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, মনীষা, রাগ করো না—

তখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ঘোরলাগা চোখ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকালো দরজার দিকে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আস্তে-আস্তে বললো, তুমি কী করে এলে?

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, হঠাৎ খুব বিপদে পড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমাকে পুলিশে তাড়া করেছিল—আমার কোনো দোষ নেই।—সবটা আগে শোনো—

জানি, খুবই অতি নাটকীয় শোনাচ্ছে। বটতলার উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনা থাকে। আমি বানিয়ে-বানিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে পারি, কিন্তু নিজে কোনো সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়লে, কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ বানাতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, ভীষণভাবে আমার বুক কাঁপছিল। আমি নিজেই সেই দুপদাপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মনীষা আমার কথায় গুরুত্ব দিল না, আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী করে এলে ?

— পাইপ বেয়ে। বারান্দার পাশেই একটা পাইপ আছে, অতিকষ্টে, পা পিছলে আর একটু হলে পড়ে মরছিলাম—

এই বর্ণনাটা আরও খারাপ। আমি ঠিক পাইপ বেয়ে ওঠা ছেলে-ছোকরার টাইপ নই। সত্যিকারের পুলিশ কোনোদিন তাড়া করলেও প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি কোনোদিন তিনতলা বাড়ির বারান্দায় পাইপ বেয়ে উঠতে পারবো না। শারীরিক সামর্থ্য ছাড়াও, আমার লজ্জা করবে।

মনীষার মুখ দেখে মনে হলো না আমার একটা কথাও বিশ্বাস করেছে। করতলে রাখলো চিবুক। চোখ আমার চোখে।

সপ্রতিভ হবার জন্য আমি বললাম, রাস্তার দিকে বারান্দার এই দরজাটা খুলে শুয়ো না কক্ষনো। অন্য লোকও তো উঠে আসতে পারে। যদি কোনো চোর-ডাকাত হতো—

— কি জানি !

— মনীষা, ইয়ার্কি করো না। এটা ইয়ার্কির সময় নয়।

— তাহলে ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না। ভালবাসা মানে কি ? বিশেষ কোনো একজনকে বিয়ে করতে চাওয়া ? যারা বিয়ে করেছে, তাদের তো দেখেছি, সব ব্যাপারটাই কি রকম ঘরোয়া আর সাধারণ হয়ে যায়।

আমি চট করে কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। ব্যাপারটা যে এ রকমভাবেও বলা যায়, আগে খেয়াল করি নি। কারুকে ভালবাসা মানে কি তাকে বিয়ে করতে চাওয়া ? বিয়ে করার পরে কি?

মনে মনে দুর্বল হয়ে গেলেও হার মানা যায় না। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, তুমি আমার ওপরে এখনো রেগে আছো, সেদিন বৌবাজারের মোড়ে—

— এবার তুমিই জোরে কথা বলছো। দিদির কিন্তু খুব পাতলা ঘুম। দিদি যদি দেখে ঘরে আলো জ্বলছে—

— আলো নিবিয়ে দাও—

— তুমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে ?

— যদি দাঁড়িয়ে না থাকি, তোমার পাশে শুয়ে পড়ি ? শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করবো!

— কি পাগলের মতন আবোল-তাবোল কথা বলছো তখন থেকে ?

— এটা কি পাগলের মতন কথা ? আমি যদি তোমার পাশে শুয়ে তোমাকে একটু আদর করি, সেটা কি খুব দোষের ব্যাপার ?

— দোষ-গুণ জানি না। এটা ঠিক নয়।

— মনীষা, তোমার সঙ্গে সত্যিই আমার অনেক কথা আছে।

— যাঃ! এবার লক্ষ্মীটি চলে যাও। এত রাত্রে এসব ভালো দেখায় না! তুমি বুঝতে পারছো না। এসব তোমাকে মানায় না। তোমার একটা সম্মান আছে।

— ধুত্তোরি ছাই সম্মান! তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমার এমন কষ্ট হয়!

আমি নিজেই নিভিয়ে দিলাম আলো। বসে-থাকা মনীষাকে শুইয়ে দিয়ে ওর বুকে আমার কাতর মুখ ঘষতে-ঘষতে বললাম, মধুবন, তোমাকে আমি চাই, সেদিন বৌবাজারে আমি অন্যায় করেছি, তোমাকে দেখেও... রাগ কোরো না প্লিজ... তুমি কেন বৌবাজারে দাঁড়িয়ে একা ঐ সময়ে... আমি তোমার জন্য... আঃ কি সুন্দর গন্ধ তোমার শরীরে...

না, এই ঘটনার এক বর্ণও সত্যি নয়। সবই আমার মনে-মনে দেখা স্বপ্ন। বুকে হাত দিয়ে বলুক তো, কোন যুবক এ রকম স্বপ্ন দেখে না ?

সেই গঙ্গার ধার, সুজয়া, অরুণ আর হেমন্তর পাশে আমি দাঁড়িয়ে। মনে-মনে আমি চলে গিয়েছিলাম মনীষার কাছে। নিছক ছেলেমানুষি কল্পনা। ওরকমভাবে কোনোদিনই আমি মধ্যরাত্রে মনীষার ঘরে ঢুকতে পারবো না। মনীষার সঙ্গে অতক্ষণ একা-একা কথা বলার সুযোগও কি পাবো কখনও ?

হুইস্কির বোতলটি শেষ হয়ে গেছে। অরুণ সেটা ছুড়ে ফেলে দিল গঙ্গার জলে। সুজয়া বললো, খুব হয়েছে, এবার বাড়ি চলো!

হেমন্ত বললো, কী রে সুনীল, তুই এত গুম মেরে রয়েছিস কেন ? চল, অরুণ আর সুজয়াকে নামিয়ে দিই, আমরা অবিনাশকে খুঁজি। বেশি বাজে নি, নাইট ইজ ইয়াং ...

৪

স্বপ্ন নয়। এবার বাস্তবের কথা হোক। বাস্তব এই রকম।

বাস্তবে আমি একজন সাধারণ মানুষ, ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, কয়েকজন ভাইবোনের দাদা, একটা সাধারণ চাকরি করি। লিখে-টিখে কিছু সুনাম ও দুর্নাম হয়েছে, মাঝে-মাঝে কিছু টাকাও পাই। ছাত্র বয়েসে আর সবার মতোই কিছুদিন বামপন্থী রাজনীতিতে মেতে উঠে দলীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা দেখে এবং দুর্বল নেতাদের নেতৃত্ব মানতে না চেয়ে সরেও এসেছি। কবিতা লিখে পৃথিবীটি বদলে দেবার উদ্ভট কল্পনা মাঝে-মাঝে মাথায় ভর করে—যদিও ভিড়ের মধ্যে অতি সামান্য হয়ে মিশে থাকি।

অফিসে একটা মস্ত বড় হলঘরে আমি বসি। তখন বসতাম, যখন আমি সরকারি চাকরি করতাম। যখন আমি মায়াপাশে বাঁধা ছিলাম মনীষার কাছে। হলঘরটার সামনে একটা অর্ধেক দরজা। তার ওপাশে মানুষের কোমর পর্যন্ত দেখা যায়। বারবার দরজার দিকে চোখ পড়ে, দরজার তলা দিয়ে দেখতে পাই ধুতি পরা, প্যান্ট পরা, শাড়ি পরা দু'টি করে পা হেঁটে আসছে। তাদের মুখ দেখার জন্য কৌতূহল থাকে। মানুষের শরীরের আর যে অংশই দেখা যাক না কেন, মুখটা না দেখলে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না। সব মুখ দেখতে পেতাম না, কারণ দরজার ওপাশে মুখোমুখি দুই অফিসারের ঘর। অনেক চলন্ত পা শেষ পর্যন্ত আমাদের হলঘরটায় না ঢুকে অফিসারদের ঘরে ঢুকে যায়। সুতরাং দরজার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি ঐসব জোড়া-জোড়া পা দেখতুম। মানুষের পায়ের গড়ন ও হাঁটার ভঙ্গি সম্পর্কে আমি প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলাম।

সরকারি অফিসে বিশেষ কেউ কাজ করে না। যেটুকু কাজ না-করলে নয়—সেটুকু সারার পর বাকি সময়টা গল্প করে। আমি কাজও করি না, গল্পও করি না। নাম সই করার সময় কলমটা খুলি, তারপর সারাক্ষণ কলমটা ব্লটিং প্যাডের ওপর পড়ে থাকে। তার পাশে জমে একটার পর একটা ফাইল। আমি সেসব ফাইল ছুঁই না, কখনো-কখনো কলম দিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর আঁকিবুকি কাটি। প্রাগৈতিহাসিক আমলের কত জন্তুর রূপ ফুটে ওঠে কলমের রেখায়। কাজ করি না মানে কি, সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ফাইলগুলো টেবিলের ওপর জমে, ধুলো মাখা নোংরা ফাইল, অস্পৃশ্যের মতন সেগুলো আমি দূরে সরিয়ে রাখি। সপ্তাহে তিনদিন টিফিনে যাবার আগে ফাইলগুলোর ফিতে খুলে মনোযোগ দিই ঘণ্টা দেড়েক। তাতেই সব ফাইল আবার চলে যায় অন্য টেবিলে। এর বেশি আর কাজ নেই। তারপর হাত ধুয়ে ফেলি।

প্রথম-প্রথম আমি প্রত্যেকদিনই মিনিট চল্লিশেক ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করতাম। তখন সবাই আমাকে ঠাট্টা করে ভালো ছেলে বলতো। অফিসে আসার পরই সারাক্ষণ মুখ বুজে কাজ করা সত্যিই যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। তাহলে আন্দোলন ইত্যাদি করার সময় পাওয়া যাবে কখন? এইসব অফিসে কাজ হয় না বলে বাইরের একদল লোক আবার আন্দোলন করে। তাদের জন্য আবার আর একদল। যেমন, এ জি অফিস থেকে ঠিক সময় টাকা পাওয়া যায় না বলে শিক্ষকরা আন্দোলন করেন—আবার পড়াশুনো না-হওয়ার জন্য ছাত্ররা। ইত্যাদি। সে-কথা যাক। আমি ভালো ছেলে হওয়ার অপবাদ নিতে চাই নি। তাছাড়া, পরে ভেবে দেখলাম, ঐ সামান্য কাজের জন্য প্রত্যেকদিন ওগুলো ছোঁয়ার কোনো মানেও হয় না। অধিকাংশ ফাইলই অন্যায়ে ভরা।

লেখা-টেখার বিপদ এই যে, তাতে নানা রকম খুঁত বেরিয়ে পড়ে। আমি যদি একজন শিক্ষককে দুশ্চরিত্র বলি, তাহলেই হয়তো কেউ বলবেন, সমস্ত শিক্ষক সমাজকে হেয় করা

আমিও খুব আস্তে–আস্তে বললাম, আপনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি বলুন, কথাটা ভুল। তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো। এটাও কি ভুল—পাবলিক সারভিস কমিশন থেকে তিনজন ক্যান্ডিডেট এসে রোজ ঘুরে যাচ্ছে, জয়েন করতে পারছে না—তার কারণ টেমপরারি বেসিসে যে তিনজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল—তারা দুশো টাকা করে ঘুষ দিয়েছে। একটা টেন্ডারের ব্যাপারে গত সপ্তাহে একটা ওষুধ কম্পানি দু'হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে। বলুন এগুলো মিথ্যে ? তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো। মানুষকে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করে আমার—

— সুনীলবাবু, আপনি একটু বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

— এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো কথা থাকতে পারে না!

— আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? বসুন না!

— না, আমি বসবো না। আমাকে এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করবেন না দয়া করে। আমার ভীষণ ভয় করে। আমার চোখের সামনে যদি কেউ এক হাজার টাকার নোট এগিয়ে দেয়, তাহলে আমি হয়তো নিয়েও নিতে পারি! আমাকে পারচেজ সেকশন থেকে সরিয়ে দিন। কোনো নিরিবিলি সেকশনে দিন। নইলে আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে!

সব কেরানিই সাধারণত অফিসারদের হিংসে করে। এটা এক ধরনের ঈর্ষা। অফিসারের আলাদা ঘর, গদিমোড়া চেয়ার ও বেশি মাইনে এবং ক্ষমতার জন্য ঈর্ষা। সেই জন্য অফিসারের মুখের ওপর কেউ কড়া–কড়া কথা বললে কেরানিরা খুশি হয়। এবং যত গোপন ঘরেই এই ঘটনা ঘটুক কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই জেনে যাবেই। ইউনিয়নের পাণ্ডা ও নতুন ছেলে ছোকরারা এই ব্যাপারের পর আমার সঙ্গে খুব মাখামাখি করতে লাগলো। তার এক মাস বাদে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।

এর কিছুদিন পর একটা আধাসরকারি সংস্থায় আমি নিজেই অফিসারের চাকরি পেয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, চেনাশুনোর জোরে। সেখানে আমার আলাদা ঘর, জানলায় খসখসে পর্দা, মস্তবড় টেবিল, চকচকে পেতলের বেল। প্রথম–প্রথম আমি আস্ত গাড়লের মতন সুট–টাই পরে অফিসে যেতাম।

কিছুদিন আগেই আমি নিজে কেরানি ছিলাম বলে স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, পাশের ঘরের কেরানিরা আমাকে কী রকম ঈর্ষা করে। নিজেকে আমার মনে হতে লাগলো ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মতন। আমার মাইনে যে–কোনো কেরানির ডবলের বেশি, এবং আরও কতকগুলো সুযোগ–সুবিধা পাই, কিন্তু কোন্ যোগ্যতায় আমি অফিসার হয়েছি ? যে দেশে চল্লিশটি চাকরির পদের জন্য এক লক্ষ লোক দরখাস্ত পাঠায় সেখানে যোগ্যতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার অধীনে যে পঁয়ত্রিশ জন কর্মচারি আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন এম.এ পাশ, একজন আবার দু' সাবজেক্টে। ছ'জন বি.এস.সি ও একজন এল.সি.ই— যাঁদের কেরানির কাজ করার কথাই নয়। ডবল এমএ পাশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কিছুতেই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। সবসময় মনে হয়, আমি অপরাধী।

অন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা করছে, এটা জানলে এক ধরনের অহঙ্কার জাগে। মনে হয়, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ব্যতিক্রম। আবার ভেতরে ভেতরে খানিকটা ভয়ও জন্মায়। এই অহঙ্কার ও ভয় মিশিয়ে তৈরি হয় ক্ষয় রোগ। ক্ষয়ে যায় মনুষ্যত্ব।

একলা বড় ঘরে সুট–টাই পরে অফিসার সেজে বসে থাকতে-থাকতে প্রায়ই নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। মনে হতো, আমি ছদ্মবেশ ধরে আছি। আমি যোগ্য নই। একজন বিধবা রমণী আমাদের দপ্তর থেকে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন, আমাকে বলতে হলো, কী করবো বলুন, সরকারের গ্রান্ট নেই। রমণীটি কেঁদে ফেললেন। আমি মনে–মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম।

৪

স্বপ্ন নয়। এবার বাস্তবের কথা হোক। বাস্তব এই রকম।

বাস্তবে আমি একজন সাধারণ মানুষ, ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, কয়েকজন ভাইবোনের দাদা, একটা সাধারণ চাকরি করি। লিখে–টিখে কিছু সুনাম ও দুর্নাম হয়েছে, মাঝে–মাঝে কিছু টাকাও পাই। ছাত্র বয়েসে আর সবার মতোই কিছুদিন বামপন্থী রাজনীতিতে মেতে উঠে দলীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা দেখে এবং দুর্বল নেতাদের নেতৃত্ব মানতে না চেয়ে সরেও এসেছি। কবিতা লিখে পৃথিবীটি বদলে দেবার উদ্ভট কল্পনা মাঝে–মাঝে মাথায় ভর করে—যদিও ভিড়ের মধ্যে অতি সামান্য হয়ে মিশে থাকি।

অফিসে একটা মস্ত বড় হলঘরে আমি বসি। তখন বসতাম, যখন আমি সরকারি চাকরি করতাম। যখন আমি মায়াপাশে বাঁধা ছিলাম মনীষার কাছে। হলঘরটার সামনে একটা অর্ধেক দরজা। তার ওপাশে মানুষের কোমর পর্যন্ত দেখা যায়। বারবার দরজার দিকে চোখ পড়ে, দরজার তলা দিয়ে দেখতে পাই ধুতি পরা, প্যান্ট পরা, শাড়ি পরা দু'টি করে পা হেঁটে আসছে। তাদের মুখ দেখার জন্য কৌতূহল থাকে। মানুষের শরীরের আর যে অংশই দেখা যাক না কেন, মুখটা না দেখলে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না। সব মুখ দেখতে পেতাম না, কারণ দরজার ওপাশে মুখোমুখি দুই অফিসারের ঘর। অনেক চলন্ত পা শেষ পর্যন্ত আমাদের হলঘরটায় না ঢুকে অফিসারদের ঘরে ঢুকে যায়। সুতরাং দরজার দিকে তাকিয়ে–তাকিয়ে আমি ঐসব জোড়া-জোড়া পা দেখতুম। মানুষের পায়ের গড়ন ও হাঁটার ভঙ্গি সম্পর্কে আমি প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলাম।

সরকারি অফিসে বিশেষ কেউ কাজ করে না। যেটুকু কাজ না–করলে নয়—সেটুকু সারার পর বাকি সময়টা গল্প করে। আমি কাজও করি না, গল্পও করি না। নাম সই করার সময় কলমটা খুলি, তারপর সারাক্ষণ কলমটা ব্লটিং প্যাডের ওপর পড়ে থাকে। তার পাশে জমে একটার পর একটা ফাইল। আমি সেসব ফাইল ছুঁই না, কখনো–কখনো কলম দিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর আঁকিবুকি কাটি। প্রাগৈতিহাসিক আমলের কত জন্তুর রূপ ফুটে ওঠে কলমের রেখায়। কাজ করি না মানে কি, সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ফাইলগুলো টেবিলের ওপর জমে, ধুলো মাখা নোংরা ফাইল, অস্পৃশ্যের মতন সেগুলো আমি দূরে সরিয়ে রাখি। সপ্তাহে তিনদিন টিফিনে যাবার আগে ফাইলগুলোর ফিতে খুলে মনোযোগ দিই ঘণ্টা দেড়েক। তাতেই সব ফাইল আবার চলে যায় অন্য টেবিলে। এর বেশি আর কাজ নেই। তারপর হাত ধুয়ে ফেলি।

প্রথম–প্রথম আমি প্রত্যেকদিনই মিনিট চল্লিশেক ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করতাম। তখন সবাই আমাকে ঠাট্টা করে ভালো ছেলে বলতো। অফিসে আসার পরই সারাক্ষণ মুখ বুজে কাজ করা সত্যিই যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। তাহলে আন্দোলন ইত্যাদি করার সময় পাওয়া যাবে কখন? এইসব অফিসে কাজ হয় না বলে বাইরের একদল লোক আবার আন্দোলন করে। তাদের জন্য আবার আর একদল। যেমন, এ জি অফিস থেকে ঠিক সময় টাকা পাওয়া যায় না বলে শিক্ষকরা আন্দোলন করেন—আবার পড়াশুনো না–হওয়ার জন্য ছাত্ররা। ইত্যাদি। সে–কথা যাক। আমি ভালো ছেলে হওয়ার অপবাদ নিতে চাই নি। তাছাড়া, পরে ভেবে দেখলাম, ঐ সামান্য কাজের জন্য প্রত্যেকদিন ওগুলো ছোঁয়ার কোনো মানেও হয় না। অধিকাংশ ফাইলই অন্যায়ে ভরা।

লেখা–টেখার বিপদ এই যে, তাতে নানা রকম খুঁত বেরিয়ে পড়ে। আমি যদি একজন শিক্ষককে দুশ্চরিত্র বলি, তাহলেই হয়তো কেউ বলবেন, সমস্ত শিক্ষক সমাজকে হেয় করা

আমিও খুব আস্তে–আস্তে বললাম, আপনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি বলুন, কথাটা ভুল। তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো। এটাও কি ভুল—পাবলিক সারভিস কমিশন থেকে তিনজন ক্যান্ডিডেট এসে রোজ ঘুরে যাচ্ছে, জয়েন করতে পারছে না—তার কারণ টেমপরারি বেসিসে যে তিনজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল—তারা দুশো টাকা করে ঘুষ দিয়েছে। একটা টেন্ডারের ব্যাপারে গত সপ্তাহে একটা ওষুধ কম্পানি দু'হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে। বলুন এগুলো মিথ্যে ? তাহলেই আমি বিশ্বাস করবো। মানুষকে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করে আমার—

— সুনীলবাবু, আপনি একটু বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

— এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো কথা থাকতে পারে না!

— আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? বসুন না!

— না, আমি বসবো না। আমাকে এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করবেন না দয়া করে। আমার ভীষণ ভয় করে। আমার চোখের সামনে যদি কেউ এক হাজার টাকার নোট এগিয়ে দেয়, তাহলে আমি হয়তো নিয়েও নিতে পারি! আমাকে পারচেজ সেকশন থেকে সরিয়ে দিন। কোনো নিরিবিলি সেকশনে দিন। নইলে আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে!

সব কেরানিই সাধারণত অফিসারদের হিংসে করে। এটা এক ধরনের ঈর্ষা। অফিসারের আলাদা ঘর, গদিমোড়া চেয়ার ও বেশি মাইনে এবং ক্ষমতার জন্য ঈর্ষা। সেই জন্য অফিসারের মুখের ওপর কেউ কড়া–কড়া কথা বললে কেরানিরা খুশি হয়। এবং যত গোপন ঘরেই এই ঘটনা ঘটুক কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই জেনে যাবেই। ইউনিয়নের পাণ্ডা ও নতুন ছেলে ছোকরারা এই ব্যাপারের পর আমার সঙ্গে খুব মাখামাখি করতে লাগলো। তার এক মাস বাদে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।

এর কিছুদিন পর একটা আধাসরকারি সংস্থায় আমি নিজেই অফিসারের চাকরি পেয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, চেনাশুনোর জোরে। সেখানে আমার আলাদা ঘর, জানলায় খসখসে পর্দা, মস্তবড় টেবিল, চকচকে পেতলের বেল। প্রথম-প্রথম আমি আস্ত গাড়লের মতন সুট–টাই পরে অফিসে যেতাম।

কিছুদিন আগেই আমি নিজে কেরানি ছিলাম বলে স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, পাশের ঘরের কেরানিরা আমাকে কী রকম ঈর্ষা করে। নিজেকে আমার মনে হতে লাগলো ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মতন। আমার মাইনে যে–কোনো কেরানির ডবলের বেশি, এবং আরও কতকগুলো সুযোগ–সুবিধা পাই, কিন্তু কোন্ যোগ্যতায় আমি অফিসার হয়েছি ? যে দেশে চল্লিশটি চাকরির পদের জন্য এক লক্ষ লোক দরখাস্ত পাঠায় সেখানে যোগ্যতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার অধীনে যে পঁয়ত্রিশ জন কর্মচারি আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন এম.এ পাশ, একজন আবার দু' সাবজেক্টে। ছ'জন বি.এস.সি ও একজন এল.সি.ই— যাঁদের কেরানির কাজ করার কথাই নয়। ডবল এমএ পাশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কিছুতেই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। সবসময় মনে হয়, আমি অপরাধী।

অন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা করছে, এটা জানলে এক ধরনের অহঙ্কার জাগে। মনে হয়, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ব্যতিক্রম। আবার ভেতরে ভেতরে খানিকটা ভয়ও জন্মায়। এই অহঙ্কার ও ভয় মিশিয়ে তৈরি হয় ক্ষয় রোগ। ক্ষয়ে যায় মনুষ্যত্ব।

একলা বড় ঘরে সুট–টাই পরে অফিসার সেজে বসে থাকতে-থাকতে প্রায়ই নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। মনে হতো, আমি ছদ্মবেশ ধরে আছি। আমি যোগ্য নই। একজন বিধবা রমণী আমাদের দপ্তর থেকে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন, আমাকে বলতে হলো, কী করবো বলুন, সরকারের গ্রান্ট নেই। রমণীটি কেঁদে ফেললেন। আমি মনে–মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম।

অফিসের মধ্যে কান্নাকাটি—একটা নুইসেন্স। কিন্তু এই অবস্থায় কী করা যায় ? আমি বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললাম, রতনবাবুকে আসতে বলো। আমার অধঃস্তন কর্মচারি রতনবাবু এলে আমি বললাম, দেখুন তো, এই ভদ্রমহিলাকে কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না। ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনি যান, এঁর সঙ্গে কথা বলুন। যদি কিছু করা সম্ভব হয়, ইনি নিশ্চয়ই করবেন।

একটা চমৎকার জোচ্চুরির ব্যাপার ঘটে গেল। আমি খুব ভালোভাবেই জানি, ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করার কোনো উপায়ই আমাদের অফিসের নেই। কিন্তু আমার ঘর থেকে কান্নাকাটির বিশ্রী দৃশ্য সরাবার জন্য আমি রতনবাবুর কাছে পাচার করে দিলাম। রতনবাবুও বুঝলেন ব্যাপারটা। কিন্তু উনিও অফিসে অধিকাংশ সময় কাজ করেন না, সুতরাং মাঝে-মাঝে অফিসারকে এরকম অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁকে তো নিতে হবেই।

আমার দু'জন সিনিয়র অফিসার সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। অফিসারদের শুধু সই মারতে হয়—একথা ঠিক নয়, অনেক দায়িত্বও নিতে হয়। আমি মাঝে-মাঝে ওঁদের ঘরে কাজের পদ্ধতি দেখতে যেতাম। দু'জনেই বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ভালো মানুষ। খানিকটা কথাবার্তা বললেই বোঝা যায়, ব্রেন ওয়াশিং ব্যাপারটা শুধু দু'একটা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। এঁদেরও ব্রেন ওয়াশিং সমাপ্ত হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ চাকরি সংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া এঁদের আর কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা লুপ্ত বলা যায়। পে স্কেল, অ্যালাওয়েন্স, অন্যান্য অফিসারদের পদোন্নতি, ট্রান্সফার—এই নিয়ে একটা গণ্ডি। এইসব অফিসাররাই বি.এ পরীক্ষার সময় সেক্সপিয়ারের নাটক মুখস্থ করেছিলেন, ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষায় লিখতে হয়েছে রক্তকরবীর সমালোচনা। আমি আমার ভবিষ্যতের চেহারাটা দেখে শিউরে উঠি।

পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন আমি আমার বেয়ারা রামপূজন সিংকে আপনি বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। এটা আমার হঠাৎ খেয়াল। বিহারের ছাপরা জেলার এক গ্রাম থেকে এসেছে রামপূজন, তার বয়েস সত্তরের কম নয়, অনেকে বলে বাহান্ন। বহুকাল সে বেয়ারার পদে চাকরি করছে। দেশে তার জমিজমা আছে, ছেলেপুলে, নাতি-নাতনী, বছরে একবার দেশে যায়, ফেরার সময় প্রত্যেকবারই মাথা ন্যাড়া করে আসে। মাথা ন্যাড়া করাটা ওর শখ। চাকরি না করলেও তার চলে, কিন্তু চাকরিটা নেশার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। বস্তুত, রামপূজন বিহারের একজন মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ এবং বয়স্ক ব্যক্তি, আমার অধীনে সে বেয়ারার চাকরি করে বলেই তাকে তুমি বলে ডাকার অধিকার কি আমার আছে ? বিহারের ছাপরা জেলায় যদি কখনো বেড়াতে যাই, সেখানে রামপূজনের মতন লোকের সঙ্গে দেখা হলে, এমন কী রামপূজনের বড় ছেলের সঙ্গে দেখা হলেও আপনি বলেই সম্বোধন করবো। তাহলে ?

— রামপূজনজী, এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন তো ?

— সাব ?

— এক গেলাস জল নিয়ে আসুন। আর একটা কথা শুনুন, আমাকে শুধু সুনীলবাবু বলবেন। এখন থেকে আমাকে সাহেব বলে ডাকার দরকার নেই।

প্রত্যেক অফিসেই দু'একজন মাথা-পাগলা লোক থাকে। আমাকে সবাই সেই রকম মাথা-পাগলা লোক হিসেবে ধরে নিল। আগে যারা আমাকে ঈর্ষা করতো, এখন তারা আড়ালে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার সিনিয়ার অফিসার রায়চৌধুরী আমাকে ডেকে একদিন হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নাকি বেয়ারা-দারোয়ানদের আপনি বলে কথা বলতে শুরু করেছেন! রোজ ওদের পায়ের ধুলোও নেন নাকি ?

আমি চুপ করে রইলাম! রায়চৌধুরী তৃপ্তভাবে বললেন, ভালো, ব্যাপারটা ভালো। সারাদেশেই এইরকম নিয়ম চালু হওয়া উচিত। আমাদের বাড়িতে একজন বুড়ো চাকর ছিল,

তাকে আমরা রাখুদা বলে ডাকতুম। কেউ তাকে শুধু রাখু বললে আমার বাবা খুব রাগ করতেন। আমার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরই যা প্রতাপ ছিল—এখনকার মতন তো আর চুনোপুটিও ডেপুটি হতো না, আমার বাবা যেবার রায়গঞ্জে পোস্টেড, এক সাহেব ...

চুপ করে শুনে গেলাম। বাবার গল্প থামিয়ে রায়চৌধুরী বললেন, কিন্তু রামপূজনকে যদি আপনি বলে ডাকা শুরু করেন—তাহলে ওকে দিয়ে কি আর জলটল আনানো উচিত ? গুরুজনদের কি কেউ হুকুম করে ?

রায়চৌধুরী দুষ্টুমির চোখে তাকালেন আমার দিকে। কি রকম ঘায়েল করেছি—এইরকম একটা ভাব। সত্যি, আমার তুলনায় আর সবাই ভালো-ভালো যুক্তি জানে। আমি এসব যুক্তির কোনো উত্তর দিতে পারি না।

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, ও চাকরির মধ্যে যে-টুকু ডিউটি সেটা করায় কোনো অপমান নেই।

— এসব করে কি হবে ? আপনি একলা-একলা কিছু করতে পারবেন ? আপনি সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাতে পারবেন ? আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট নেতাদেরও তো বাড়িতে ঝি-চাকর থাকে। তারা কি ঝি-চাকরদের আপনি বলে ?

— না, না, আমি সেসব কিছু ভাবি না— এটা আমার একটা খেয়াল।

— খেয়াল ? এখনো বড্ড ছেলেমানুষ আছেন। থাকুন আর কিছুদিন, সরকারি চাকরির জাঁতায় কিছুদিন ঘুরলে সব খেয়াল-টেয়াল উবে যাবে।

রামপূজন নিজেই দু'দিন বাদে এসে আমার কাছে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। হাত জোড় করে বললেন, সাব, আমার নোকরিটা ছাড়বেন না। মেহেরবানি করুন, আমি গরিব—

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না, আপনার নোকরি ছাড়াবো কেন ?

রামপূজন একটা মোক্ষম যুক্তি ছাড়লেন। তিনি বললেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হয়ে যদি তাঁকে আপনি-টাপনি বলি, তাহলে নাকি তাঁর পাপ হবে। ব্রাহ্মণকেই সবাই সম্মান করে; ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য জাতের লোকের কি সমান হতে পারে ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রামপূজনজী, বাঙালি ব্রাহ্মণকেও কি কেউ সম্মান করে ? তারা তো মাছ খায়!

রামপূজনের মতে, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তখন বললাম, রামপূজনজী, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হলেও আমার জাত নষ্ট হয়ে গেছে। আমি গরুর মাংস খাই, শুয়োরের মাংস খাই—মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি বারো জাতের ছোঁয়া খাই। আমি আপনার থেকেও নিচু জাত।

ন্যাড়া মাথা বৃদ্ধ রামপূজন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। হাত জোড় করলেন, চোখে জল এসে গেল, গাঢ় গলায় বললেন, হুজুর, আমার নোকরিটা খাবেন না। বুড়ো বয়সে ভুখা থাকবো—

কিছুতেই তাকে বোঝানো যায় না। চাকরি খাবার কোনো প্রশ্নই নেই, কিন্তু রামপূজনের যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ এলেন আমার পা জড়িয়ে ধরতে। হতাশা, বিরক্তি ও ক্লান্তিতে আমি মনমরা হয়ে রইলাম বেশ কিছুদিন।

আমাদের অফিসের অন্য একজন অফিসার, মিঃ করগুপ্ত একদিন আমাকে ডেকে বললেন, মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি এত সিগারেট খান, আপনার লাইটার নেই ?

— না।

— এতদিন বলেন নি কেন ?

আমার লাইটার নেই, এটা কি সকলকে ডেকে-ডেকে বলার মতন ব্যাপার ? আবার বাড়ি

নেই, গাড়ি নেই, সানগ্লাস নেই, সোয়েডের জুতো নেই, চাবির রিং নেই, ছবির অ্যালবাম নেই—একথা কি আমি লোকজনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বেড়াবো ? সুতরাং, 'আমাকে বলেন নি কেন ?' এ প্রশ্নের উত্তরে আমাকে চুপ করে থাকতে হয়।

করগুপ্ত বললেন, স্মিথ কম্পানির ঐ যে লোকটা আসে, চ্যাটার্জি, চেনেন তো, আমি ওকে বলে দেবো এখন। ও আমাকে একটা চমৎকার লাইটার দিয়েছে। আপনি বললেও হয়, কিন্তু আপনি লাজুক লোক—বলতে পারবেন না, আমিই বলে দেবো এখন।

— আমার লাইটার লাগে না। দেশলাইতেই চলে যায়।

— আরে মশাই, রনসন। ভালো জিনিস।

— চ্যাটার্জি কোথা থেকে দেবে ?

— ও কোথা থেকে পায় যেন! চৌধুরীকেও তো দিয়েছে।

রনসন কম্পানির লাইটার স্মিথ কম্পানির লোক কোথা থেকে আর পাবে—দোকান থেকে কিনবে— একটা শিশুও বোঝে। কিন্তু অফিসার হলে এসব বুঝতে নেই।

যদি আমার বন্ধু দীপক বা ভাস্করের পাল্লায় পড়তো, এক্ষুনি কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু আমি মুখের ওপর লোককে অপমান করতে পারি না।

খানিকটা গোবেচারা-ভাব দেখিয়ে বললাম, আমি, জানেন, পকেটে কোনো ভারি জিনিস রাখতে ভালবাসি না। আমার পকেটে নোটবুক থাকে না, এমন কী পার্সও না। লাইটারও ঐ জন্যই রাখি না—নইলে একটা কি আর কিনতে পারতাম না এতদিনে ?

মিঃ করগুপ্ত বিস্মিতভাবে বললেন, পকেটে পার্সও রাখেন না ? সব টাকা ব্যাঙ্কে ? খুব জমাচ্ছেন—বিয়েথা তো করেন নি এখনো।

কী কথার কী উত্তর! পার্স ছাড়া শুধু পকেটে বুঝি টাকা-পয়সা রাখা যায় না ?

আমি যে খুব একটা সাধুপুরুষ, আমি ঘুষ নিই না, পার্টির কাছ থেকে উপহার নিই না, বেয়ারাকে আপনি বলে ডেকে মহত্ত্ব-প্রভাব দেখাই—এসব কিন্তু বোঝাতে চাইছি না। এতক্ষণ কি সেইরকম মনে হচ্ছিল ? আসলে অফিসের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য আমি নানারকম উপায় খুঁজতাম। এবং ঘুষ নেবার কোনো প্রলোভন এলেই ভয় হতো আমার। নিজের ওপরেই আমার বিশ্বাস নেই। টাকা-পয়সার লোভ সামলানো সহজ নয়। কিন্তু আমি জানতাম, একবার যদি আমি আমার এই হাত ঘুষ নিয়ে নোংরা করি, তাহলে সেই হাতে আর কোনোদিন আমি মনীষাকে ছুঁতে পারবো না। আমার এই ওষ্ঠ মনীষার নাম উচ্চারণ করে। এই ওষ্ঠে আর কোনোদিন মিথ্যে কথা বলা মানায় না! ভালবাসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। পট করে বললুম, আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি। অমনি কি আমি তার ভালবাসার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি ? পৃথিবীতে যারা অন্যায় কাজ করে, তারা কেউ কখনো সত্যিকারের ভালবাসে নি।

স্বপ্নের মধ্যে মনীষা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ভালবাসা মানে কি ? ভালবাসা মানে কি কারুকে বিয়ে করার ইচ্ছে ? আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। প্রশ্নটা বড় গোলমেলে। আমি কলকাতা শহরে থাকি, মনীষার সঙ্গে চেনা, মনে হয় মনীষাকে না পেলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি জন্ম থেকেই দিল্লি কিংবা বেনারস কিংবা গোহাটিতে থাকতাম, চিনতামই না মনীষাকে—সেখানকার কোনো মেয়ের জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। কিংবা সেখানে এমনভাবে মানুষ হতাম, যাতে বাবা-মায়ের পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করতাম যথাসময়ে; তার আগে বড়জোর দু'একটা মেয়ের সঙ্গে একটু বেড়াতে যাওয়া, আড়ালে হাসাহাসি বা ফষ্টিনষ্টি।

মনীষা আমার জীবনে বিশুদ্ধতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এনে দিয়েছে। মনীষার জন্য আমি ক্রমশ মানুষ হিসেবে ভালো হয়ে উঠতে চাই। মনীষার কথা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে একটু-একটু কষ্ট

হয়।

মনীষার কাছে আমি কি চাই ? যখন দেখা হয় না, তখন ওকে ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করে। যখন দেখা হয়— তখন কিছুতেই কাছে পাই না। এই ধরা না-ধরার খেলাই যেন আমার নিয়তি। অথচ আমি তো কতদিকে বেশ চটপটে, দরকার হলে লোককে ধমকাতে পারি, কাজ আদায় করতে পারি—এমনকি অন্য মেয়েদের সঙ্গেও বেশ ইয়ার্কি ফচকেমি করতে পারি। অথচ মনীষার কাছে কোনো চালাকিই চলে না।

সেবার কাকদ্বীপে পিকনিকে সুজয়া আমাকে বলেছিল, আপনি বিয়ে করছেন না কেন ?

ডাকবাংলোর ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম। ম্যাটমেটে জ্যোৎস্নায় পৃথিবীময় আবছায়া। দূরে গঙ্গা, জোনাকির মতন নৌকোর আলো। নিচে চাতালে হেমন্ত, সুবিমল, অরুণ, মনীষা আর কৃষ্ণা বসে গান গাইছে। সন্ধেবেলা ডায়মন্ডহারবার থেকে এসে পৌঁছেছি এই বাংলোয়, কাল সারাদিন থাকবো। সুজয়া ছাদ দেখতে উঠেছিল আমার সঙ্গে। এখন নদী দেখছে।

— তোমার মতন এমন সুন্দরী মেয়ে আর কোথায় পাবো! অরুণ আগে বিয়ে করে ফেলেছে, তাই আমি আর বিয়ে করছি না।

— আহা-হা! আপনি সত্যি একটা বিয়ে করুন, আপনার বৌকে আমি সাজিয়ে দেবো।

— আমি রাজি।

— কি রাজি! সত্যি বিয়ে করছেন শিগগির ?

— তা জানি না। যখন বিয়ে করবো, তখন আমার বৌকে তুমি সাজাবে। এতে রাজি।

— ঠিক করে বলুন না। আপনার কারুর সঙ্গে ঠিকঠাক আছে ?

— কেউ আমাকে পাত্তাই দেয় না ?

— কেন, সেই শিবানীর সঙ্গে কি হলো ?

— ধ্যাৎ! আমি চিনিই না শিবানীকে।

— আমি তাহলে দেখবো আপনার জন্য ?

— হ্যাঁ, দেখো না—

— সত্যি-সত্যি বলছেন তো ? এটা কিন্তু ঠাট্টার কথা নয়।

— আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না।

— করুন না বাবা, এবার একটা চটপট বিয়ে করে ফেলুন। আমাদের দলে একজন বাড়বে।

— আমি কি বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি নাকি ?

— মধুবনের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে—

এই প্রসঙ্গে মনীষার নাম করায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। সুজয়া কি মনীষার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করতে চাইছে ? মনীষার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করে বিয়ে হবে ? ব্যাপারটা এতই অস্বস্তিকর আমার পক্ষে যে আমি তক্ষুনি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, চলো, নিচে যাই। অরুণ বোধহয় ভাবছে। আমি তার বৌকে নিয়ে চুপি-চুপি—

— কিছু ভাবছে না। শুনুন না—

— দেশলাই নেই। সিগারেট না খেতে পারলে প্রকৃতির দৃশ্য-ফিশ্য কিছুই আমার ভালো লাগে না।

— আপনি একদম সিরিয়াস নন্। একটা কথা বলবো—

— তুমি বিয়ের ঘটকালি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে নাকি ? হেমন্ত, অবিনাশ এদের জন্য সম্বন্ধ খোঁজো না। এরা আমার চেয়ে কত ভালো পাত্র—

আমি ছাদ থেকে চলে আসতে চাইছিলাম তক্ষুনি। কিন্তু সুজয়া আমার হাত চেপে ধরলো।

বললো, এই, আপনি পালাচ্ছেন কেন ? দাঁড়ান! আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

আমি মিটিমিটি হেসে চোখ পাকিয়ে বললাম, এই, ওরকমভাবে আমার হাত চেপে ধরলে আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি তোমার সঙ্গে প্রেম করে ফেলবো বলে দিচ্ছি!

পরদিন সকালবেলা গেছি গঙ্গার ধারে। জলের কাছে যাবার উপায় নেই, এত কাদা। উঁচু পাড় থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত পঁচিশ তিরিশ গজ কাদায় থকথক করছে। মনীষা তার মধ্য দিয়েই যাবে।

— গঙ্গার পারে এসে গঙ্গার জল ছোঁবো না ? ধ্যাৎ, তার কোনো মানে হয় না।

এটা ঠিক ভক্তির কথা নয়। এক ধরনের কবিত্ব। যে বুঝতে পারবে, সে বুঝুক!

অরুণ বললো, এই মধুবন যাস নি। বিচ্ছিরি কাদা, পড়ে যাবি।

অরুণ ওর বোনকে ঠিক শাসন করতে কিংবা নিষেধ করতে পারে না। কেউই পারে না। অরুণ শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছিল। যদিও জানতো, মনীষা যাবেই।

— তোমরা কেউ তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

হেমন্ত ডাক-বাংলোতে রয়ে গেছে। সকালে বেরোয় নি আমাদের সঙ্গে। হেমন্ত থাকলে তক্ষুনি রাজি হতো। হেমন্তর চরিত্রে প্রকৃত শিভালরি আছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার শিভালরি দেখাবার কথা নয়, মনীষা ঠিক আমাকেই না ডাকলে আমি তো যাবো না।

মনীষা ততক্ষণে কাদার মধ্যে নেমে পড়েছে। শাড়িটা একটু উঁচু করেছিল, কিন্তু হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতেই শাড়ি-টাড়ি কাদায় একেবারে মাখামাখি।

অরুণ বললো, এই মধুবন, কি হচ্ছে কি ? তোর ঘেন্নাও করে না ?

— পরে চান করে নেবো তো।

— পড়ে যাবি, তখন বুঝবি! পড়ে গেলে আর উঠতে পারবি না।

মনীষা পেছন ফিরে বললো, তোমরা একজন এসো না বাবা! আমার চোখে চোখ পড়লো। খানিকটা ধমকের সুরে বললো, দাঁড়িয়ে আছো কি ? এসো!

জানতো, আমি ঠিক যাবো। তাই প্রথমেই বলে নি। চটি খুলে রেখে প্যান্ট-পরা অবস্থাতেই নেমে গেলাম কাদার মধ্যে। অরুণ আর সুবিমল হাসতে লাগলো আমাকে দেখে। এক একটা পা কাদার মধ্যে এমন গেঁথে যাচ্ছে যে, টেনে তুলবার সময় ব্যালান্স থাকে না।

মনীষার কাছে গিয়ে ওর পিঠে সামান্য ধাক্কা দিয়ে বললাম, ফেলে দিই!

মনীষা খপ করে আমার হাত চেপে ধরে বললো, এই, কি হচ্ছে কি ? সত্যি পড়ে যাবো—

— তাই তো চাই! কাদায় একবার পড়লে চেহারাখানা যা খুলবে না!

— তোমাকেও ফেলে দেবো—

মনীষাকে একটা ধাক্কা দিয়ে আমি ছপছপ করে দৌড়ে একটু দূরে সরে গেলাম। মনীষা পড়তে-পড়তেও তাল সামলে নিল কোনোক্রমে। তারপর তেড়ে এলো আমার দিকে।

ভাটার নদী। পারের কাছে তাই বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এখন কাদা। দূরে বাঁধের ওপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আর নিচে এতখানি খোলা জায়গায় আমরা দু'জন কাদার মধ্যে ছপছপ করে দৌড়োদৌড়ি করছি।

দূরে দাঁড়িয়ে ওরা খেলা দেখছে, হাসছে। ততক্ষণে হেমন্ত এসে পৌঁছে গেছে। হেমন্ত চেঁচিয়ে বললো, দাঁড়া, আমিও আসছি।

হেমন্ত এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে এক ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল কাদার মধ্যে। আমিও ওর পা ধরে দিলুম এক হ্যাঁচকা টান। তারপর দু'জনেই কাদা-মাখা ভূত। মনীষার প্রায় কোমর পর্যন্ত কাদা পৌঁছেছে, ওকেও ফেলে দেবার জন্য হেমন্ত আর আমি এগোলাম দু'দিক থেকে।

তার আগেই মনীষা পৌঁছে গেল জলের কিনারায়। ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'দিক থেকে হেমন্ত আর আমিও।

অরুণ চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই, এখানকার জলে কুমির আছে। তাছাড়া মাগুর মাছের মতন মস্ত বড় কাঁটাওয়ালা মাছ—

কে শোনে ও-সব কথা। জলে বেশ স্রোত, তাছাড়া আমাদের গায়ে পুরো জামা-প্যান্ট, সাঁতার কাটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু দারুণ আনন্দ পাচ্ছিলাম। আমরা তিনজনেই মোটামুটি ভালো সাঁতার জানি। যদিও গঙ্গা এখানে এত চওড়া, রীতিমতো স্রোত—এমনিতে একা একা এখানে সাঁতার কাটতে সাহস পেতাম না। কিন্তু সেই সময় ভয়-ডরের কথা একবারও মনেই পড়ে নি। মনীষা বললো, চলো, সাঁতরে ঐ দ্বীপটায় যাবো ? পারবে ?

হেমন্ত বললো, তার চেয়ে ভাসতে-ভাসতে বেশ সমুদ্রে চলে যাই—

আমি বললাম, সমুদ্র পেরিয়ে আন্দামানে ...

না, আবার মনীষার কথা এসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতন সেইসব দিন। আবার বাস্তবে ফিরে আসা যাক।

বাস্তব। আমার বাড়ি। একতলার ঘরে, সকাল সাড়ে দশটার সময়েও শুয়ে আছি।

মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, আজ অফিস যাবি না ?

— না, আজ অফিস ছুটি।

— কালও তো যাস নি। কালকেও ছুটি ছিল ?

— হ্যাঁ, ছুটি মানে কি। আমাদের অফিস বিল্ডিং রং করা হচ্ছে, ফার্নিচার-টার্নিচার বদলানো হচ্ছে, তাই কাজ হচ্ছে না ক'দিন ধরে—

মায়েদের কাছে বাজে কথা বলে কিছুতেই পার হওয়া যায় না। মা কাছে এগিয়ে এসে কপালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, শরীর-টরীর খারাপ হয় নি তো ?

— না, না।

মা উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি হয়েছে, সত্যি করে বল তো ? অফিসে কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো ?

অফিসে আমার প্রায়ই গণ্ডগোল হয়। এ পর্যন্ত চারবার চাকরি ছেড়েছি। এই হাহাকারের দিনে চাকরি ছেড়ে আবার চাকরি পাওয়া সোজা কথা নয়। আমিও সহজে পাই না। এক-একবার চাকরি ছেড়ে দু-এক বছর বেকার থাকি। আবার কোনো রকমে একটা জুটে যায়। প্রত্যেকবারই পাওয়াটা কঠিনতর হয়ে ওঠে। বাবা শিগগিরই রিটায়ার করবেন, দু'টি ভাইবোন এখনো স্কুলে পড়ে, প্রত্যেক মাসে ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া হয় না, মাসের শেষে মাছের টুকরো ছোটো হয়ে যায়, কোনো-কোনোদিন অদৃশ্য।

চাকরি করতে অনেকেরই ভালো লাগে না, অফিসে মানিয়ে নিতে অনেকেরই অসুবিধে হয়। অনেক সময়ই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বিরোধ বাধে। কিন্তু তাহলেও ঝট করে চাকরি ছাড়া যায় না। মানুষকে খেয়েপরে বাঁচতে হয়, আস্তে-আস্তে বয়েস বাড়লে বিবেকের সঙ্গে নানান কারচুপি করে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। কখনো খুব অসহ্য বোধ হলে ছুটি না নিয়ে অফিস কামাই করে অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

— না, মা, কিছু হয় নি। অফিসে গণ্ডগোল হবে কেন ?

— কারুর সঙ্গে রাগারাগি করেছিস নাকি ?

— বলছি তো, সে-সব কিছু না!

বত্রিশ বছর বয়েসে মায়ের আদুরে ছেলে সাজতে মন্দ লাগে না। মা পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন, ছেলে সেটা উপভোগ করতে-করতে অস্বীকার করছে। ছেলে বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললো, যাই একটু ঘুরে আসি একটা জায়গা থেকে।

মা বললেন, অফিসে যাবি না যখন, তখন আর এই রোদ্দুরের মধ্যে বেরুতে হবে না।

ছেলে একটু ভাবলো। তারপর বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, বেরুবো না। আর একবার চা হবে নাকি ?

রাস্তায় বেরুলে শুধু যে রোদ তাই নয়। অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, হঠাৎ ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সিআরপি লাঠি চালাতে পারে—অনেক রকম বাধা। যেখানে যাবার কথা, সেখানে অনেক সময়ই যাওয়া হয় না।

তার বদলে নিজের টেবিলে থুতনিতে হাত দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকলে অনেক কাজ হয়। মন মথুরায় চলে যায়। কিংবা মনীষার বাড়ির আশেপাশে। আজ স্কুল-কলেজে ধর্মঘট। মনীষা আজ ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। এখন কি করছে ?

ছাদের সেই ঘরে মনীষা এখন একা। মোটা-মোটা বই থেকে নোট নিচ্ছে। আর একমাস বাদে ওর ফাইনাল পরীক্ষা। ঈষৎ লালচে রঙের চুল ওর পিঠময় এলোমেলো। দু'এক ফোঁটা ঘাম এসে জমেছে থুতনিতে।

— মনীষা, তোমাকে খুব ডিসটার্ব করতে ইচ্ছে করছে। পরীক্ষার আগে এত বেশি পড়াশুনা করা ভালো নয়। মাঝে-মাঝে গল্পটল্প করে মাথা হালকা করে নিতে হয়।

— এই, যা, এখন নয়! অনেক পড়া বাকি। আমার যা ভয় করছে। কোর্সের অনেক কিছুই পড়ানো হয় নি ক্লাসে—

— এম.এ পরীক্ষার আগে কোনোদিনই কোর্স কমপ্লিট করা হয় না। আমার পরীক্ষার আগে তুমি আমাকে ডিসটার্ব করেছিলে মনে নেই ?

— আমি ? বাঃ, আমি আবার কখন ডিসটার্ব করলাম ?

— নিশ্চয়ই ডিসটার্ব করেছো! এখন মনে পড়ছে না বুঝি ?

— কি মিথ্যুক তুমি! আমি মোটেই তোমাকে ...

— আমার পরীক্ষার ঠিক এগারো দিন আগে তোমরা কেন দীঘায় বেড়াতে গেলে ?

— তুমি তো যাও নি আমাদের সঙ্গে।

— যাই নি বলেই তো বেশি ব্যাঘাত হয়েছে আমার পড়াশুনোর! তোমরা দীঘায় গিয়ে মজা করবে, আর আমি ঘরে বসে-বসে মুখ বুজে পড়তে পারি ? বই খুললেই আমার চোখে ভেসে উঠতো, তোমরা দীঘার সমুদ্র পারে দৌড়োদৌড়ি করছো। হাওয়ায় তোমার শাড়ি উড়ছে, তুমি হাসতে-হাসতে পা দিয়ে বালি ওড়াচ্ছো ... আমি এদিকে ঘরের মধ্যে একা। আমি রাত্তিরবেলা পড়তে বসলেই তুমি এসে আমার বইখাতা উলটে দিতে। নইলে আমিও ছাত্র খুব খারাপ ছিলাম না, আমিও ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারতাম।

— আমি রাত্তিরবেলা তোমাদের বাড়িতে যেতাম ? অতদূরে ?

— আসতে না ? আমার চোখের দিকে তাকাও, তাকিয়ে বলো তো!

— এই তো তাকিয়েছি চোখের দিকে। সত্যি যেতাম! আমি তো জানি না—আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি না।

— মনীষা, তুমি এই যে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছো, চুলগুলো উড়ছে, চোখে একটু অবাক-অবাক ভাব, পায়ের কাছে দেখা যাচ্ছে শায়ার লেস, আঙুলে কালির দাগ—এই দৃশ্যটা

অমর হয়ে থাক। আমাদের বয়েস বাড়বে, বুড়ো হবো, একদিন মরবো—তুমি আমি কেউই আর এ পৃথিবীতে থাকবো না— নতুন মানুষ আসবে, নতুন সমাজ—কিন্তু সেদিনও তোমার এই বসে থাকার দৃশ্যটা পুরোনো হবে না।

মনীষা মুখটা নিচু করলো। নিজের প্রশংসা ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। মুখময় অস্বস্তি ও লজ্জা। অবশ্য এটা ঠিক প্রশংসা নয়, আমি তো ওকে সুন্দরী বলি নি, বলেছি শুধু বসে থাকার দৃশ্যটার কথা। আমার মতন পাষণ্ডেরও চিত্ত সমাহিত হয়। মনীষার কাছে এসে আমি তো দস্যু হয়ে উঠি নি, কোনো জালে ওকে জড়াবার চেষ্টা করি নি। মনীষার কাছে আমি কী চাই? কিছুই না।

মনীষা নরমভাবে অথচ অভিযোগের সুরে বললো, সুনীলদা, তুমি এসব কথা আমাকে কেন বলো, আমি বুঝতে পারি না। আমি একটা সামান্য মেয়ে—

— মোটেই সামান্য নয়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কে কি বলেছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন, ও জানে না ও কে। তোমার সম্পর্কে আমিও তাই বলতে চাই। তুমি জানো না, তুমি কে!

— ভ্যাট? শুধু ওইসব বলে আমার পড়াশুনো নষ্ট করা হচ্ছে! আমি ফেল করলে কিন্তু সব দোষ তোমার।

— এম.এ পরীক্ষায় ফেল করতে হলে রীতিমতন প্রতিভা থাকা দরকার। আজকাল তো থার্ড ক্লাস নেই, সেকেন্ড ক্লাস ঠিক পেয়ে যাবে।

— কেন, আমি ফার্স্ট ক্লাস পেলে বুঝি তোমার খুব হিংসে করে!

— ফার্স্ট ক্লাস পেলে তুমি তারপর কি করবে?

— রিসার্চ করবো।

— রিসার্চ করে ডক্টরেট পাবে। তারপর?

— বাবা রে বাবা! অতসব জানি না!

— ডক্টরেট হবার পর হয়তো বিলেত যাবে।

— না, আমি বিলেত যাবো না। আমার ভালো লাগে না—

— আচ্ছা, না হয় এখানেই কোনো কলেজে পড়াবে। কিংবা তোমার বিয়ে হবে, আস্তে আস্তে একটি দু'টি সন্তান...

— এই, কি হচ্ছে কি?

— শোনো না। একটি দু'টি সন্তান—খুব আইডিয়াল হয় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সুখের সংসার—প্রথম-প্রথম তোমার স্বামী তোমাকে অফিস থেকেও টেলিফোন করবে বারবার—কয়েক বছর পর সে একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে—অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই দেরি হবে—তবু কিন্তু বিবাহ বার্ষিকীতে ঠিক মনে করে দামী সেন্ট কিনে আনবে উপহার হিসেবে—মাঝে-মাঝে ঝগড়া হবে—ভাবও হবে—ছেলেমেয়েরা যত বড় হবে—ততই তোমার আর তোমার স্বামীর দেখা দেবে অম্বলের অসুখ, ব্লাড প্রেসার বা ডায়াবিটিস হওয়াও অসম্ভব নয়—চুল পাকবে, চামড়া কুঁচকে আসবে তোমার—তারপর যদি সতী লক্ষ্মী হও—সিঁথির সিঁদুর দিয়ে স্বামীর আগেই তুমি যাবে—চিতার আগুনে জ্বলে যাবে তোমার ঐ নশ্বর দেহ—কিন্তু সেদিনও তোমার আজকের এই বসে থাকার ভঙ্গিটি, হাঁটুর ওপর থুতনি, অবাক-অবাক চোখ—এই দৃশ্যটি থেকে যাবে কোথাও না কোথাও।

— আমি বুড়ো হবো, মরবো। আর তুমি তখন কোথায় থাকবে?

— আমি হয়তো তার আগেই মরে যাবো। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ দীর্ঘায়ু নয়। বড়

জোর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যদি বাঁচি, যথেষ্ট! শোনো একটা গল্প বলি! কোন একটা কবিতায় যেন পড়েছিলাম। এক বিরাট জমিদারের বাড়ির পাশে একটা কুঁড়েঘরে একজন গরীব লোক থাকতো। সে বলতো, জমিদারবাবুর এই যে বিরাট সাত মহলা বাড়ি, এত বড় বাগান, ঘাট বাঁধানো কমল দিঘি, যার জল মানুষের চোখের মতন কালো, নহবৎখানা, সিংহের মূর্তি বসানো দরজা, আমিও এর মালিক। জমিদারবাবু কাগজেপত্রে এসবের মালিক বটে, কিন্তু এই প্রাসাদ, বাগান, দিঘি, নহবৎখানা, সিংহদ্বার—এই সবকিছু মিলিয়ে যে দৃশ্যের শোভা, আমিও তার সমান অংশীদার। আমিও তা উপভোগ করি, আমার কাছ থেকে এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। বুঝলে মনীষা, আমি ঐ কুঁড়েঘরের গরীব লোকটার মতন।

মনীষা এই গল্পের মানে ঠিকই বুঝেছে, কিন্তু মুখে তা স্বীকার করলো না। স্ফুরিত হাস্যে বললো, এটা গল্প না হেঁয়ালি? কিছুই মানে বুঝলাম না।

— বুঝলে না? মনীষা, আমি তোমাকে পেতে চাই না। কিন্তু তুমি আমার।

মনীষা একটু কেঁপে উঠলো। পূর্ববৎ চোখ নিচু করে বললো, সুনীলদা, তুমি এসব কথা আমাকে বলো না। আমার ভয় করে। তোমার সঙ্গে কত লোকের চেনাশুনো, তুমি অনেক বড়—আমি একটা সামান্য মেয়ে—

— তুমি কে, তুমি তা জানো না।

বাইরে রাস্তায় পরপর দুটো বোমার আওয়াজ হলো। চমকে যেতেই হয়। বোমার আওয়াজের পর একাগ্রতা থাকে না। অত্যন্ত তন্ময় হয়ে মনীষার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ এই ব্যাঘাতে আমি প্রায় শারীরিক কষ্ট পেলাম বলা যায়। লেখা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম। কৌতূহল খোঁচা মারতে লাগলো ভেতরে। বেলা এখন সাড়ে এগারোটা—এই সময় বোমার আওয়াজ অন্যদিন শুনি নি। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

কিছু লোক দৌড়োদৌড়ি করছে। কিছু গাড়ি ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে দ্রুত। কয়েকটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনো লোক আহত হয় নি, কেউ ধরা পড়ে নি, বোমা দু'টি ফাটার কোনো কারণই বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ ধারে কাছে নেই, লুঠতরাজের কোনো উদ্যোগও দেখা যায় নি। একটা অতি সাধারণ ঘটনা। কালকের কাগজে এর কোনো উল্লেখও থাকবে না। দুপুর সাড়ে এগারোটায় বড় রাস্তায় শুধু দু'টি বোমা ফেটেছে, এর আবার কোনো গুরুত্ব আছে নাকি?

পাশের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চিরঞ্জীব। প্রায় সময়ই ও ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করলাম, কি চিরঞ্জীব, কি ব্যাপার?

চিরঞ্জীব ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, কী জানি?

— কোথায় ফাটলো?

— ঐ মোড়ের মাথায়। মুদির দোকানটার সামনে—

— কারুর তো লাগে-টাগে নি মনে হচ্ছে।

— না লাগে নি।

এসব নিছক কথার কথা। নেহাৎ চিরঞ্জীবের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, দু-একটা কথা তো বলতে হবেই। বোমার প্রসঙ্গ ত্যাগ করে বললাম, তোমার খবর-টবর কি?

— এই চলছে আর কি! নতুন কিছু খবর নেই।

দরজা বন্ধ করে আমি ভেতরে ফিরে এলাম। কিন্তু এখন আর লেখায় মন বসানো সম্ভব নয়।

বোমার প্রচণ্ড শব্দে আমি আবার বাস্তবে ফিরে এসেছি। 'বাস্তব' বলতে সাধারণত যা বোঝায়।

লেখার কাগজপত্র টেবিলে চাপা দিয়ে আমি খাটে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। হঠাৎ নিজের প্রতি আমার একটা ধিক্কার জন্মালো। কেন আমি মনীষার কথা লিখছি? এসব ধোঁয়াটে–ধোঁয়াটে প্রেমের গপ্পো লেখার কোনো মানে আছে আজকের দিনে? কিংবা প্রেমও ঠিক নয়। জড়াজড়ি চুমু খাওয়ার কথা নেই, এক সঙ্গে বিছানায় শোওয়ার ভূমিকা নেই—হৃদয়বিদারক কোনো ঘটনাই নেই—এ আবার প্রেম নাকি? তাছাড়া এসব তো আমার নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার—এ নিয়ে অন্যের কি মাথাব্যথা আছে! পৃথিবীতে এখন কত সমস্যা, কত প্রতিবাদ—লিখলে তাই নিয়েই লেখা উচিত।

চিরঞ্জীবের কথাই ধরা যাক। ছেলেবেলা থেকে দেখছি ওকে। আগে ছটফটে দুরন্ত ধরনের ছেলে ছিল। আজকাল বেশ গম্ভীর আর স্বল্পভাষী। প্রয়োজনের বেশি একটাও কথা বলে না। তিন বছর আগে বি.কম পাশ করে টানা বেকার বসে আছে। মাঝখানে তিন মাসের জন্য একটা ইস্কুলে লীভ ভ্যাকেন্সিতে মাস্টারি করেছিল— এছাড়া খাঁটি বেকার।

চিরঞ্জীব নিশ্চয়ই মনে–মনে আমাকে হিংসে করে। আমি বেকার নই, আমি চাকরি করি। আমি মাঝে–মাঝে অফিসে না গিয়ে খাটে শুয়ে বিলাসিতা করতে পারি। আর চিরঞ্জীবের দিনের পর দিন অসহ্য ছুটি। চিরঞ্জীব অবশ্য একটা কথা জানে না। আমি মনে–মনে সব সময় চাকরি ছেড়ে দিতে চাই। 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি!' একটা মজা করলে কি হয়! যতদিন অন্য কোনো ব্যবস্থা না হয়, তার আগে—এখন যারা চাকরি করছে, তারা সবাই একযোগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কয়েক লক্ষ বেকারকে চাকরির সুযোগ দিলে কেমন হয়? আমি রাজি। তাতে এখনকার চাকরিজীবীরা অনুভব করতে পারবে দারিদ্র্যের কষ্ট! আর বেকার বুঝতে পারবে চাকরির কষ্ট!

চিরঞ্জীব-সম্পর্কে সবচেয়ে অসহ্য ব্যাপার হলো তার ঐ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা। কখনো রাস্তার মোড়ে। সারা দিন রাত ওর কোনো কাজ নেই। একটা সুস্থ–সবল যুবক। খেলার মাঠও নেই যে খেলাধুলো করবে। এমন একটা ক্লাবও নেই যে তাকে কোনো কিছুতে উৎসাহিত, ব্যস্ত রাখবে। মাঝে মাঝে পয়সা জোগাড় করে সিনেমা দেখা কিংবা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার একমাত্র কাজ। বই পড়া কিংবা গান–বাজনা থেকে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করার মতন মানসিক গঠন তার নয়। বেপরোয়াভাবে ঝুঁকি নিয়ে সে একলা দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেও পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্মানিতে যখন হাজার–হাজার শিক্ষিত যুবক বেকার হয়ে পড়ে—তখন তারা রোজ সকালে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়ে চাষী মজুরদের কাছে যে কোনোরকম কাজের জন্য কাকুতি–মিনতি করতো—তার বদলে চাইতো একবেলার খাবার।

চিরঞ্জীবের সমস্যা নিয়ে কি আমার লেখা উচিত নয়? কিংবা চিরঞ্জীবের বন্ধু শিবু! শিবুকেও চিনি ছেলেবয়েস থেকে। এখন তাকে দেখতে পাই না। পুলিশ খুঁজছে তাকে—তার নামে সব সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ। অথচ শিবুকে আমি যা চিনি, সে কোনো অন্যায় করতে পারে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না। নতুন সমাজ গড়ার আগে সে এই সমাজটা ভেঙেচুরে দিতে চায়। আগে তার সঙ্গে যখন কথা বলেছি, তার যুক্তিগুলোর মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারি নি। মনে হয়েছে, তার কল্পনাশক্তি একটু কমে গেছে। কিন্তু তার রাগ ও আক্রোশের কারণটা বুঝতে পারি। সেটা যথার্থ। রাগের সময় মানুষের যুক্তি প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভাঙার ইচ্ছে, ধ্বংসের ইচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে—নিজের জীবনে বঞ্চিত হলেই সেই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে।

চিরঞ্জীব কিংবা শিবুর জীবন ও সমস্যা নিয়েই বোধহয় আমার লেখা উচিত। প্যানপ্যানানি প্রেমের গল্প লেখার কোনো মানে হয় না। ইচ্ছে হয়, মনীষা সম্পর্কে লেখা এতগুলো পৃষ্ঠা ছিঁড়ে

ফেলে দিই। গল্প–উপন্যাসে সমাজের মুক্তির পথ দেখানো উচিত নয় ? লেখকদের উচিত নয়, মানুষের সামনে একটা আশার আলো তুলে ধরা ? সবাই তো তাই বলে! শুধু আমিই বুঝতে পারি না কেন আমার কলম দিয়ে এইসব ব্যক্তিগত কথা বেরিয়ে আসে। কিন্তু ওদের কথা আমি কি করে লিখবো জানি না। আগে বারবার লিখতে গেছি, প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, সমস্যার ঠিক জায়গায়টা আমি স্পর্শ করতে পারি নি। জীবনের হৃৎস্পন্দন শোনা যায় না। আমি ব্যর্থ। আমার ব্যর্থতার কথা আমি সমালোচকদের থেকেও ভালো জানি।

কি নিয়ে লিখতে হবে, তা লেখক জানে না। জানে সমালোচকরা। তারা বলে, ঐ লেখাটা প্রতিক্রিয়াশীল, অমুক লেখাটার পেছনে নিশ্চয়ই লেখকের কোনো কু–অভিসন্ধি আছে। যদি বলা যায়, 'বরং নিজেই তুমি লেখো না কো একটি কবিতা!' হে সমালোচক, তুমি নিজেই লিখে দেখিয়ে দাও না, সত্যিকারের মহৎ আদর্শমূলক লেখা কী রকম হওয়া উচিত—তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে।

কি নিয়ে লিখতে হবে, লেখক তা জানে না। সে শুধু জানে, লেখার কি দুঃখ। তা আর কেউ জানবে না। লেখকের জীবনীশক্তি তিল–তিল করে ক্ষয়ে যায় লেখার মধ্যে। লিখতে–লিখতে কোনো একটা সময় যখন পরবর্তী পরিচ্ছেদটার কথা আর মনে আসে না, একজন লেখকের জীবনে সেটা সবচেয়ে দুঃখের সময়। সে সময় সে খাবার খেয়ে কোনো স্বাদ পায় না, কারুর সঙ্গে কথা বলে কোনো আনন্দ পায় না ... সমস্ত পৃথিবীকেই তার বিরুদ্ধবাদী মনে হয়।

'নার্স, নার্স, তোমার মুখখানা ঠিক আমার মায়ের মতন, কিন্তু তুমি আমার মায়ের মতন দুঃখী হয়ো না'— গত বছর এই লাইনটা লিখতে গিয়ে আমি কলম ফেলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম হঠাৎ। কেন কেঁদেছিলাম, আমি নিজেও তা জানি না। সেই সময় কেউ হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাকে দেখলে, নিশ্চয়ই পাগল ভাবতো। একজন সুস্থ–সমর্থ লোক নিজের কল্পিত কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কাঁদছে—এর কোনো মানে হয়? পাগলামিই তো—সাহিত্য রচনা এক ধরনের পাগলামি ছাড়া আর কি ? কী হয় এসব লিখে ? এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উত্তর দিয়েছিলেন, কিছুই হয় না।

মনীষা এখন অনেক দূরে। সব ব্যাপারটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতন। "মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধেবেলা ..." এই অনুচ্ছেদটা তো আমি নিজের ইচ্ছেতে লিখি নি। কলম নিয়ে বসবার পর আপনিই চলে এলো। মানুষের স্বপ্ন দেখা কেউ আটকাতে পারে ? কখন কী রকম স্বপ্ন দেখা হবে, এ সম্পর্কে কোনো আইন করা যায় ?

মনীষা, তোমার সম্পর্কেই আমার লিখতে ইচ্ছে করে। তোমার ঐ থুতনির ওপর হাঁটু ঠেকিয়ে বসে থাকা, অবাক–অবাক চোখ—পাতলা ঠোঁট দুটোতে সামান্য হাসির আভাস—বারবার মনে পড়ে এই দৃশ্যটা, এখনও চোখের সামনে জীবন্ত।

— সুনীলদা, আমি একটা সামান্য মেয়ে—

সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা।

৫

এতখানি লেখার পর আমার মনে হচ্ছে, এবার কাহিনীর মধ্যে একজন ভিলেন আনা দরকার। সিনেমার সমালোচনায় যাদের বলে 'খলনায়ক'। একজন ভিলেন না থাকলে কাহিনী ঠিক জমে

না। ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব, সাদা ও কালোর সীমারেখা—এইসব দেখতে আমরা অভ্যস্ত।

কিন্তু ভিলেন এখন কোথায় পাই ? মনীষার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছেলের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু সেসব একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন কী, দেবাশীষ নামে একটি নামকরা সাঁতারু ছেলে একবার মনীষার প্রেমে পড়েছিল খুব, রোজ আসা-যাওয়া শুরু করেছিল এবং স্বাভাবিক বাঙালি প্রথায় বাড়ির লোককে দিয়ে মনীষার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কি কারণে যেন সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নি। তবু ও যখন মনীষাকে বিয়ে করবার জন্য একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিল, তখনও আমি ওকে ঠিক ভিলেন হিসেবে ভাবতে পারি নি। দেবাশীষের ওপর আমার কক্ষনো রাগ হয় নি, বেশ সাদাসিধে ভালো মানুষ ধরনের ছেলে। হঠাৎ তার ভালো লেগেছিল মনীষাকে দেখে। হঠাৎ তার বিয়ে করার শখ হয়েছিল। এখনো তার সঙ্গে দেখা হয়, অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে, দু'টি সন্তান, আমার কাছে মনীষার কথা জিজ্ঞেস করে। মনীষা সম্পর্কে এখনও ওর মনে একটু দুর্বলতা আছে! এরকম ভালো মানুষ ছেলেকে ভিলেন সাজালে আমার পাপ হবে।

বরুণদার এক বন্ধু মনীষার সঙ্গে দেখা হলেই ওর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতো। মুখে একটা ভগ্নী স্নেহের ভাব থাকলেও ওর হাতের গতিবিধি সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু ওঁকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না, কারণ মনীষা ওঁকে খুবই অপছন্দ করতো এবং পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতো। বরুণদা আসলে ওঁর ভেতরের গোপন লালসা মাঝে-মাঝে বাইরে এনে ফেলতেন। কিন্তু ওসব কদর্যতা মনীষাকে স্পর্শ করে না।

মনীষার বাবা সম্পর্কে আমার ভেতরে একটু চাপা রাগ আছে বটে, কিন্তু উনি কোনোদিন আমার সঙ্গে ঠিক খারাপ ব্যবহার করেন নি। ওঁর সামনে পড়লে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতাম, আর কিছু না।

তাছাড়া ভিলেন খুঁজতে হলে, নায়ক কে, তা আগে ঠিক করা দরকার। এ উপন্যাসে নায়িকা আছে, নায়ক নেই। আমি নিজের কথা একটু বেশি বলে ফেলেছি বটে, কিন্তু নায়কের সাজ আমাকে মানায় না। আমি পার্শ্বচরিত্র, কিংবা উপন্যাসের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা মানতে হলে আমাকেই ভিলেন বলা উচিত। একটু পরেই তা বোঝা যাবে।

হেমন্ত আমার অফিসে এসে বললো, চল, এক্ষুনি তোকে বেরুতে হবে।

হেমন্ত আমার অফিসে সাধারণত আসে না। ও কাজ করে কমার্শিয়াল ফার্মে, ওকে সত্যিই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, বেরুবার সুযোগ পায় না অফিস থেকে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার ? এত হন্তদন্ত হয়ে এলি যে ? বোস বোস!

— না, বসবো না। চল, বেরুবো।

— এক্ষুনি বেরুবো কি করে ? কয়েকটা কাজ আছে।

হেমন্ত রেগে গিয়ে বললো, রাখ রাখ! কাজ দেখাস নি বেশি। তোদের গভর্নমেন্ট অফিসে আবার কাজ! ছ'মাস-আট মাস ধরে বিল আটকে থাকে আমাদের—

— আমাদের ডিপার্টমেন্ট সে রকম নয়। এখানে সত্যিই কাজ হয়।

হেমন্ত হাতের ধাক্কায় টেবিল থেকে কিছু কাগজপত্র ফেলে দিয়ে বললো, চল, চল, ওঠ তো!

তাকিয়ে দেখলাম, কোনো কারণে হেমন্ত বেশ রেগে আছে। আর বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই ওকে। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসের বাইরে এসেও হেমন্ত গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবি ?

হেমন্ত বললো, কি কারণে যেন আজ বাস বন্ধ। ট্যাক্সি পেতে ঝামেলা হবে।

— কোথায় যাবি ট্যাক্সি নিয়ে ? অফিস যাস নি ?

— ধ্যাৎ, ভালো লাগছে না অফিস-টফিস করতে—

— কোথায় যাবি তাহলে ?

হেমন্ত আমার চোখের দিকে তাকালো। অন্যমনস্কভাবে বললো, কোথায় যাওয়া যায় বল তো ? এক কাজ করলে মন্দ হয় না, কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বসে যদি বিয়ার খাওয়া যায়—

— এখন তিনটে বাজে। এখন থেকেই যদি বিয়ার শুরু করিস।

— সন্ধের পর মাতাল হয়ে যাবো ? ক্ষতি কি ?

— তার চেয়ে চল কোনো সিনেমায় ঢুকে পড়ি।

হেমন্ত রীতিমতন রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে বললো, মেয়েছেলেদের মতন তোর অত সিনেমা দেখার ইচ্ছে কেন ?

— তাহলে কী করতে চাস বল না ?

— চল, অবিনাশকে ডেকে ওর মাথায় কাঁঠাল ভাঙি!

অবিনাশকে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সুবিমলের কাছে যাই চল—

— সুবিমলের কাছে ? ওর অফিস তো অনেক দূর। আর বিচ্ছিরি অফিস!

— না, না, অফিসে না। ও ছুটি নিয়েছে। সুবিমল একটা বাড়ি বানাচ্ছে— কলকাতা থেকে চার–পাঁচটা স্টেশন দূরে। ও একলা সেখানে মিস্তিরি খাটায়—আমাদের যেতে বলেছিল—

— সেখানে গিয়ে কী করবো ?

— ট্রেনে ঘুরে আসা হবে। দেখে আসি জায়গাটা কি রকম ?

— তুই চিনতে পারবি ?

— খুঁজে বার করা যাবে। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে উঠবো—আয় ট্রাম ধরি—

হঠাৎ অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রেনে চেপে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার কি মানে হয়? সুবিমলের সঙ্গে তো আমাদের কোনো দরকারি কথা নেই। এভাবে কেউ যায় না। বেশিরভাগ মানুষই সুস্থভাবে অফিস করে, গরমের সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে গা ধোয়। আর আমরা বিনা কারণে সুবিমলের কাছে হুট করে চলে গেলাম, রাত্তিরে আর বাড়িতে ফেরাই হলো না!

অল্প দূরের জার্নি, তাই হেমন্ত ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছে। কলেজ-টলেজ ছুটি হয় নি, ফার্স্ট ক্লাস এখন পুরো ফাঁকা। কয়েকটা ভিখিরির ছেলে ও ফেরিওয়ালা বসে জটলা করছে।

দু'জনে দুই জানলার ধারে মুখোমুখি বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে আমি হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার রে তোর! আজ এত ছটফট করছিস কেন ?

— ছটফট করছি কোথায় ?

— চালাকি করিস না। কী হয়েছে কি ?

— হয় নি কিছুই। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আজ মনীষার বাবা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

— তোকে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছেও কয়েকদিন আগে তোর খোঁজ করছিলেন। দেখা হলেই তোর কথা জিজ্ঞেস করেন। কি বললেন ?

— কিছু না। এমনিই অনেক গল্প–টল্প করলেন। শেষকালে হঠাৎ বললেন, হেমন্ত, তুমি আমার একটা উপকার করবে ? তুমি মধুবনের জন্য একটা পাত্র খুঁজে দাও না!

আমি অবাক হলাম না। মুচকি হেসে বললাম, তোকে বললেন এই কথা!

— হ্যাঁ, আমি কি মাইরি প্রজাপতি অফিস খুলেছি নাকি যে পাত্র ধরে দেবো ? হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এই কথা উনি বললেন, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না—আর আমার ছেলে দুটোও কোনো কম্মের না—তোমরা যদি একটু সাহায্য না করো—

— অরুণ তখন বাড়িতে ছিল না ?

— না। মনীষার বাবা হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে একলা ঘরের মধ্যে গম্ভীরভাবে এই কথা বলতে লাগলেন—আমি ব্যাপারটার মানেই বুঝতে পারলাম না।

— তুই কি বললি ?

— আমি আর কী বলবো ? বললাম, আপনি মনীষার জন্য এখনই এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? ও তো এখনো পড়াশুনো করছে। উনি বললেন, ওর এম.এ. পরীক্ষা দুচারদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপর রিসার্চ যদি করতে চায়, বিয়ের পর করুক। আমার শরীরটা ভালো নয়, আমি ওর বিয়েটা দিয়ে যেতে চাই।

— কাকাবাবুর শরীর খারাপের কথা তো শুনি নি।

— বললেন তো, হার্টে কি সব হয়েছে।

— মনীষার সঙ্গে তোর দেখা হলো ?

— হ্যাঁ, একটুক্ষণের জন্য। পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত। তোর কথা জিজ্ঞেস করলো।

— আমার সঙ্গে দেখা হলেও তোর কথা জিজ্ঞেস করে। যাকগে, এইজন্য তুই এত ছটফট করছিস ?

— মোটেই ছটফট করছি না। কিন্তু মনীষার বিয়ের চেষ্টা চলছে—একথা শুনে তোর খারাপ লাগলো না ?

— না, কেন খারাপ লাগবে ? তোর লেগেছে বুঝি ?

— নিশ্চয়ই লেগেছে। আমি তোর মতন হিপক্রিট নই। কিন্তু আমি ভাবছি, মনীষার বাবার চারদিকে এত জানাশোনা—এত লোক থাকতে, উনি হঠাৎ আমাকে ডেকে মনীষার জন্য পাত্র খুঁজতে বললেন কেন ? প্রকারান্তরে কি বুঝিয়ে দিলেন, আমরা যাতে মনীষার সঙ্গে আর না মিশি ?

আমি হো হো করে হেসে উঠে বললাম, তুই একটা বুদ্ধু। বুঝতে পারলি না ? উনি প্রকারান্তরে জানতে চাইছেন তুই মনীষাকে বিয়ে করতে রাজি আছিস কি না। পাত্র হিসেবে তোকেই ওঁর পছন্দ হয়েছে।

হেমন্ত কঠিনভাবে তাকালো আমার দিকে। গম্ভীরভাবে বললো, সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কির কোনো মানে হয় না।

— এতে ঠাট্টা ইয়ার্কি কী আছে ?

হেমন্ত ঝট্ করে আমার বুকের কাছে জামাটা চেপে ধরে বললো, যদি চুপ না করিস তো এক থাপ্পড় মারবো!

আমিও ঝুঁকে খপ্ করে হেমন্তর জামাটা ধরে এক টান মারলাম। হঠাৎ ছিঁড়ে গেল জামাটা। হেমন্ত সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, শালা, তোমার জামাও আমি আস্ত রাখবো না।

ও টানাটানি করতে লাগলো, আমি বসে রইলাম নিশ্চেষ্টভাবে। প্রথমে ছিঁড়লো দুটো বোতাম, তারপর অনেকখানি ফেঁসে গেল। তারপর দু'জনেই হেসে সিগারেট ধরালাম। হেমন্ত এবার শান্ত করে মিষ্টি হেসে বললো, তুই একটা কাওয়ার্ড! নিনকমপুফ! পুরুষ নামের অযোগ্য! তুই মনীষাকে ভালবাসিস, সে কথা সাহসের সঙ্গে ওর বাবার কাছে বলতে পারিস না ? অন্তত অরুণকেও তো বলতে পারিস ?

— হঠাৎ ওদের কাছে আমি ভালবাসার কথা বলতে যাবো কেন ? ওরা আমাকে পাগল ভাববে না ?

— তাহলে মনীষাকে বল, ওদের বলতে।

— আমি তো মনীষাকেও কোনোদিন বলি নি, আমি ওকে ভালবাসি।

— তা বলতে পারবে কেন? শুধু ন্যাকামি করতে পারো। ঠিক আছে, আমি মনীষার বাবাকে কালকেই বলবো, আমি পাত্র পেয়ে গেছি।

— খবরদার ও কাজ করতে যাস নি। ঘটক একটা সম্বন্ধ আনলো, তারপর যদি দেখা যায় পাত্র পক্ষ রাজি নয়—তাহলে সে ঘটকের খুব বদনাম হয়ে যায়।

— তুই রাজি না? ফের চালাকি?

হেমন্ত ঝট করে আমার চশমাটা খুলে নিয়ে জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে বললো, ফেলে দিই?

আমিও হেমন্তর বুক পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে বললাম, আমি ফেলে দিই এটা?

— তাহলে আমি তোর প্যান্টুলুন খুলে নেবো।

— আমিও তোর আন্ডারওয়্যার না খুলে ছাড়বো না।

তিরিশ বছর পেরিয়ে যাওয়া দু'জন পুরুষ মানুষ এই ধরনের ছেলেমানুষি করছিল। আমাদের বন্ধুত্ব এ রকম।

হেমন্ত বললো, তুই মনীষাকে চাস না?

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, না, আমি মনীষাকে চাই না।

— এর মানে কি?

এর মানে খুব সহজ। তুই মনীষাকে বিয়ে কর। মনীষার বাবা তাই চান। মনীষাও আপত্তি করবে না।

হেমন্তর সুন্দর সহাস্য মুখখানা বিমর্ষ হয়ে এলো। রিক্ত মানুষের মতন বললো, মনীষাকে আমি বিয়ে করবো? একথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি ওর যোগ্য নই।

— তুই ওর যোগ্য না? মনীষা একটা সামান্য মেয়ে। এমনকি ব্যাপার আছে ওর? তবে সব মিলিয়ে মেয়েটা বেশ ভালো। তোর সঙ্গে মানাবে।

হেমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো, সুনীল, তুই কোনোদিন যা করিস না আমার সঙ্গে আজ তাই করবার চেষ্টা করছিস। তুই লুকোচুরি খেলছিস আমার সঙ্গে। তোর মুখখানা মিথ্যেবাদীর মতন দেখাচ্ছে।

— বিশ্বাস কর হেমন্ত, আমি তোকে একটুও মিথ্যে কথা বলছি না।

— প্লিজ, আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করিস না। আমার আজ মন খারাপ।

— তোর সঙ্গে যখন মনীষার দেখা হলো, তুই ওকে বললি না যে ওর বাবা ওর জন্য পাত্র খুঁজছেন?

— যাঃ, তা কখনো বলা যায়?

— মনীষাকে সব বলা যায়।

— একটা কাজ করলে হতো, আজ আসবার সময় মনীষাকে নিয়ে এলে হতো। ও তো বেড়াতে ভালবাসে— রাজি হয়ে যেত নিশ্চয়ই।

— শুনলে নিশ্চয়ই রাজি হতো। কিন্তু তুই ওর দেখা পেতিস না এখন।

— কেন, কোথায় গেছে?

— তা আমি জানি না। তবে, যখন মনীষাকে খুব খোঁজা যায়, তখন ওকে কিছুতেই পাওয়া যায় না।

ট্রেন থেকে নামলাম, দু'জনেরই ছেঁড়া জামা। লোকে তাকিয়ে দেখছে। তবে, যে–সময়ের

কথা বলছি, তখনও কোনো জায়গায় অচেনা লোককে দেখলেই লোকে সন্দেহ করে না। আমাদের দেখে মজা পাচ্ছে। কেউ-কেউ ভাবতে পারে, আমরা দু'জনেই কোনো গুণ্ডা দলের পাল্লায় পড়েছিলাম।

সুবিমলের বাড়ি কোথায় বানানো হচ্ছে জানি না। সাইকেল রিকশায় চড়ে বসলাম। বললাম, ভাই কোথায়-কোথায় নতুন বাড়ি বানানো হচ্ছে, চলুন তো?

রিকশাওয়ালা অবাক হতেই হেমন্ত বললো, আমরা ইন্সপেক্টার। কোথাও নতুন বাড়ি তৈরি হলেই আমরা দেখতে যাই।

ছোট্ট শহর। ঘিঞ্জি দোকানপাট। রাস্তায় কাদা! সেসব একটু পেরিয়ে যেতেই বহুদূর ছড়ানো আকাশ, তেপান্তর শব্দটা মনে পড়বার মতন মাঠ। একটা খালভর্তি কচুরিপানা, তার ওপর কাঠের ব্রিজ, সেখান দিয়ে ভারী লরি চলাচল করা নিষেধ—এই কথাটা লেখা আছে।

ছাতা মাথায় দিয়ে সুবিমল মিস্তিরিদের তদারক করছিল। আমাদের দেখে যত অবাক, তারচেয়ে বেশি খুশি। আমার ছেঁড়া জামার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পুরপুর করে আরও খানিকটা ছিঁড়ে দিয়ে বললো, গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড। আমার জামাটাও ছিঁড়ে দে না!

— হ্যাৎ পাগলা!

সুবিমল সহাস্য মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে। তারপর বললো, মাইরি, কী ভালো যে লাগছে না তোদের দেখে—কী বলবো! একা-একা রোদ্দুরে দাঁড়িয়েছিলাম—আমার মনে হচ্ছিল, আমার কোনো বন্ধু নেই। আমার কথা আর কেউ ভাবে না।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, তুই আজকাল এখানেই থাকিস বুঝি? তাই তোর দেখা পাই না।

— হঠাৎ কী ভেবে আমার কাছে এসেছিস বল তো?

— এমনিই।

— চমৎকার! অবিকল সেই পুরোনো দিনের মতন, তাই না? যখন আমরা বিনা কারণে কত কী করতাম!

— কতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

— আমাকে তোদের দলে নিবি? আমি আলাদা হয়ে গেছি, না রে? আমি বিয়ে করেছি, বাড়ি বানাচ্ছি—

— হ্যাঁ, তুই আলাদা।

— আগেকার মতন আবার এক সঙ্গে হল্লা করা যায় না? আয়, আমরা তিনজনেই জামা খুলে ফেলে খালি গায়ে ঘুরি! জুতো খুলে ফ্যাল! তোরা কিন্তু আজ রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারবি না।

— বাড়ি ফিরবো না তো কি করবো?

— আমি এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। পেল্লায়-পেল্লায় ঘর—ঢাউস বারান্দা। মাদুর পেতে দেবো, শুয়ে পড়বি!

— তুই এখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ফেলেছিস পর্যন্ত?

— নিজে সব দেখাশুনো করতে হবে না? ১৭ই জুলাইয়ের মধ্যে কমপ্লিট করবো—সেদিন গৃহপ্রবেশ হবে, আসতে হবে কিন্তু তোদের!

— ১৭ই জুলাইতেই গৃহপ্রবেশ কেন? খুব শুভদিন বুঝি? একগাল হেসে সুবিমল বললো, নিশ্চয়ই। এটা আমার জন্ম তারিখ, আমার বিয়েরও তারিখ।

হেমন্ত বললো, তোর বাড়ি তো এখনও কিছুই হয় নি রে শুধু খোঁড়াখুঁড়ি চলছে দেখছি।

— ভিত হচ্ছে। ভিত হয়ে গেলেই তো আদ্ধেক হয়ে গেল। তারপর ছাদ ঢালাইয়ের সময়

যা একটু ঝামেলা! এই দ্যাখ না, ঐখানটায় বসবার ঘর, সামনে বারান্দা—এই যে এদিকে—তিনটে বেডরুম, বাথরুম অ্যাটাচ্‌ড—

ফাঁকা মাঠের দিকে হাত উঁচু করে সুবিমল এইসব দেখাচ্ছিল। হেমন্ত বললো, তোর সত্যি কল্পনাশক্তি আছে। তুই সব দেখতে পাচ্ছিস?

— সব! ছবির মতন চোখে ভাসছে। এই সুনীল, সরে আয়, ঐখানে একটা সাপের গর্ত আছে।

আমি চমকে একটা লাফ দিলাম। গর্ত একটা সেখানে আছে সত্যি।

— এটা সাপের গর্ত?

— আজ সকালেও সাপটা বেরিয়েছিল। অ্যাত্ত বড়, খাঁটি গোখরো।—আমার দিকে ফণা তুলে গম্ভীর চালে তাকালো।

— মারলি না?

— মারবো কি? পাগল! বাস্তু সাপ কেউ মারে? বাস্তু সাপ থাকলে লক্ষ্মী আসে।

আমার গা শিরশির করছে। সাপের নাম শুনলেই অস্বস্তি লাগে। আড়চোখে তাকালাম গর্তটার দিকে। এমনও হতে পারে, সুবিমল বানিয়ে বলছে। সুবিমল অম্লানমুখে মিথ্যে গল্প বানায়। এই যে বাড়িটা বানাচ্ছে—হয়তো এটাও সত্যিকারের বাড়ি নয়।

সুবিমল মাটিতে পা ঠুকে-ঠুকে বললো, এই যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছিস, এ জায়গাটা আগে কী ছিল বল তো? নদী ছিল। হরেন মিস্তিরির বয়েস পঁচাশি, তার বাবা দেখেছে সেই নদী। তারও আগে এখানে সমুদ্র ছিল নিশ্চয়—এখান থেকে সমুদ্র মাত্র বত্রিশ মাইল দূরে। গোটা বাংলাদেশটাই তো সমুদ্রের চড়া। মাইরি, ভাবতে অদ্ভুত লাগে না—একদিন যেখানে নদী কিংবা সমুদ্র ছিল এখন আমি সেখানে বাড়ি বানাচ্ছি। সব ব্যাপারটাই যেন মনে হয় ম্যাজিক।

একটা ছোট পুকুরের মতন কাটানো হয়েছে। থরে-থরে সাজানো ইট। টাল দিয়ে রাখা আছে শুরকি। শুরকির স্তূপে পা ডুবিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেবেলার মতন শুরকির মধ্যে হুটোপুটি করে খেলা করতে ইচ্ছে হয়।

মিস্তিরি খাটছে আট-দশজন, ছাতা মাথায় দিয়ে সুবিমল তদারক করছে তাদের। যদিও রোদ পড়ে এসেছে। খালের ধারে দাঁড়িয়ে হেমন্ত দেখছে কচুরিপানার শ্লথ ভেসে যাওয়া।

একটু বাদে হেমন্ত ফিরে এসে বললো, হ্যাঁ রে, সুবিমল, এসব কেমন লাগে রে?

— কি সব?

— এই বিয়ে করা, বাড়ি বানানো? আমাদের তো এসবের অভিজ্ঞতা নেই। হঠাৎ একটা মেয়েকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা, তার প্রীতির জন্য বাড়ি বানাতে হয়। হঠাৎ একটা-দুটো বাচ্চা জন্মে বিছানায় ভাগ নিয়ে নেয়—এসব কি রকম লাগে?

সুবিমল ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, আমার মতে, মেয়েদের বিয়ে করা উচিত, ছেলেদের বিয়ে করা উচিত না।

আমি বললাম, তাহলে মেয়েদের বিয়েটা কি মেয়েতে-মেয়েতে হবে?

— না। আনফরচুনেটলি, ছেলেরা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। কিংবা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিবশত বিয়ে করে ফেলে। তারপর বন্দীজীবন। ভারত স্বাধীন হয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট, আর আমি পরাধীন হয়েছি উনিশশো তেষট্টি সালের সেভেনটিনথ জুলাই!

কথা বলার সময় সুবিমলের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে থাকে সব সময়। এরকম আনন্দময় মানুষ আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ নেই।

হেমন্ত বললো, তোর মতন সুখী পরাধীন মানুষ আমি আগে দেখি নি।

— না রে। তোরাই সুখী। স্বাধীনতার মতন কি সুখ আছে ? যে মেয়েকে কিছু দিতে হয় না, তাকে আদর করায় কত বেশি আরাম বল তো! আসলে দেখ না স্ত্রীর জন্য জমি কিনতে হয়— লাইফ ইনসিওরেন্স করতে হয়, দিনের অনেকগুলো ঘণ্টা উৎসর্গ করে দিতে হয়!

— তা সত্ত্বেও তোর বাড়ি বানানোর এত উৎসাহ ? মেয়েকে লরেটোতে ঢোকাবার জন্য ঘোরাঘুরি করছিস!

সুবিমল নিঃশব্দে হেসে বললো, এ পথ ভালোই লাগে রে! আসলে কি জানিস, মানুষ স্বাধীন থাকতে চায় না। কিংবা যখন সে পরাধীন থাকে, তখন ফটফট করে—স্বাধীনতার জন্য। আবার স্বাধীন হলেই চায়, কোনো না কোনো আদর্শ অথবা কোনো না কোনো নেতার হাতে—আগের যেমন ছিল ভগবান—নিজের দায়িত্বটা তুলে দিতে। মাঝে-মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হলে অসহ্য লাগে বটে—কিন্তু বউ নামক একটা জিনিসের কাছে নিজের সবকিছু সঁপে দেবার মধ্যে একটা বেশ মজাও আছে।

হেমন্ত গম্ভীরভাবে সুবিমলকে বললো, তুই এসব সুনীলকে ভালো করে বুঝিয়ে দে! সুনীল শিগগিরই বিয়ে করছে।

সুবিমল চমকে উঠে বললো, তাই নাকি ? গলায় গেরো পরছিস তাহলে ? এঃ হে হে হে! সুনীলটাও গেঁজে গেল! বেশ ছিল ছেলেটা—মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো—হঠাৎ তার এই দুর্মতি! মেয়েটা কে ? আমি চিনি ?

হেমন্ত বললো, হ্যাঁ, দু'একবার দেখেছিস!

— সুনীল তো সেই একটা বাচ্চা মেয়ে—যমুনা না কী নাম যেন—তাকে নিয়ে কিছুদিন খুব মেতে উঠেছিল। কোথায় গেল সেই মেয়েটা ? অনেকদিন দেখি নি মনে হচ্ছে।

— সে ওকে পাত্তা দেয় নি। এর নাম হচ্ছে মনীষা—

— ওঃ, আমাদের অরুণের বোন তো ? খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে। তবে সুনীলের সঙ্গে একদম মানাবে না। মেয়েটার কূলকিনারা পাওয়া যায় না। কবে ?

আমি বললাম, আমি বিয়ে করছি না। বিয়ে করছে হেমন্ত। ঐ মেয়েটিকেই।

হেমন্ত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আবার চ্যাংড়ামি হচ্ছে ?

সুবিমল হাত তুলে বললো, দাঁড়া, দাঁড়া, জমাটি ব্যাপার মনে হচ্ছে ?

মিস্ত্রিদের উদ্দেশে সুবিমল বললো, মনসুর মিঞা, আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক। সিমেন্টের বস্তাগুলোর দিকে একটু নজর রেখো—চুরি না হয়ে যায়—

হঠাৎ সুবিমল মনীষার কথা একদম ভুলে গিয়ে বাড়ি বিষয়ে কথা বলতে লাগলো। বাড়ি তৈরি করার সময় কেন নিজে দেখাশুনো করতে হয়, কিভাবে মালপত্র চুরি যায় এইসব।

তারপর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললো, মেয়েদের কথা সব সময় ভাবতে নেই। শরীর গরম হয়ে আয়ুক্ষয় হয়। এখন দু'ঘণ্টা গ্যাপ দে। তারপর ঐ মেয়েটা সম্পর্কে ফয়সালা করা যাবে।

লাস্ট ট্রেন পৌনে এগারোটায়। সুবিমল তবু আজ আমাদের ছাড়বে না। ওর ভাড়া বাড়িতে গিয়ে আমরা বসলাম। বারান্দার প্রায় নিচেই একটা পানাপুকুর। তার ওপারে অনেকখানি সুপুরি বাগান। সুবিমল বললো, দেখিস, একটু বাদেই সুপুরিগাছের মাথায় চাঁদ উঠবে। এখানকার চাঁদ একেবারে অন্যরকম। সাইজ অনেক বড়, রংটাও নীলচে ধরনের। বিশ্বাস হচ্ছে না ? দেখিস নিজের চোখে। এই যে হাওয়া খাচ্ছিস না, খাঁটি বে অফ বেঙ্গলের হাওয়া।

হেমন্ত বললো, 'খাঁটি হাওয়া আমার সহ্য হয় না। একটু রাম-টাম জোগাড় কর তো!

সুবিমল বললো, রাম বোধহয় পাওয়া যাবে না। তাড়ি খাবি ? আমি খাই, মাঝে-মাঝে।

হেমন্ত বললো, না, ওসব আমার চলবে না। গ্রামে এলেই তাড়ি আর বিড়ি—আমার দ্বারা হবে না। সুনীল খেতে পারে—

আমি বললাম, সুনীল বড় ভালো ছেলে। সে যাহা পায়, তাহাই খায়।

সুবিমল উঠে পড়ে বললো, দেখছি, কি পাওয়া যায়।

ইলেকট্রিক কানেকশান নেই, হ্যারিকেন জ্বলছে। বিশাল ঘরটায় আলো হয়েছে তাতে সামান্যই। আমি আর হেমন্ত পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে হেমন্তকে বললাম, তুই একবার বলেছিলি মনীষাকে আজ এখানে নিয়ে আসতে। যদি সত্যিই মনীষা আসতো—তাহলে আজ রাত্রে এখানে থাকা হতো না।

হেমন্ত ভুরু কুঁচকে বললো, মনীষাকে যদি জোর করতাম, ও থেকে যেত না আমাদের সঙ্গে ?

— কে জোর করতো, আমি না তুই ?

— সেটা একটা কথা বটে। কিংবা ওকে হয়তো জোর করতেই হতো না—ও নিজেই রাজি হয়ে যেত। ও তো হৈহৈ করতে খুব ভালবাসে। আমরা তো খারাপ কিছু করছি না।

— তবুও থাকতো না। ওর পরীক্ষা সামনেই।

— ও তাই তো। তুই মনীষার সব খবর রাখিস।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমন্ত বললো, সত্যি করে বল তো, তুই কি চাস ?

— আমি মনীষাকে বিয়ে করতে চাই না।

— তুই ওকে ভালবাসিস না ?

— আমি ওকে কখনো ভালবাসার কথা বলি নি।

— মুখে বলার দরকার নেই।

— মনীষাকে আমি কখনো চিঠি লিখি নি।

— সে কথা হচ্ছে না—

— শোন হেমন্ত, মনীষা যদি কখনো কারুকে বিয়ে না করতো, তাহলেই আমি সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ঊষাদি বিয়ে করেন নি। ওর বাড়ির সবাই মনীষাকে চাপ দেবে, তাছাড়া, মনীষা বিয়ে না করবেই বা কেন ? এবং বিয়ে করলে তোকেই বিয়ে করা উচিত।

— কেন ?

— হেমন্ত, বুকে হাত দিয়ে বল্, তুই মনীষাকে ভালবাসিস না ?

হেমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো, মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। মনীষাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। একটা দুর্লভ ধরনের মেয়ে। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারি না। আমি বোধহয় ওর যোগ্য নই—

— বাজে কথা বলিস না। প্রথম কথা, তোর হৃদয় আছে। তাছাড়া, তোর ভালো চাকরি, কলকাতা শহরে তোদের বাড়ি—মনীষার বাবার পছন্দ হয়েছে তোকে।

— রাস্কেল! ওর বাবার পছন্দে কি আসে-যায়। মনীষার মতামতটাই আসল।

— মনীষাও নিশ্চয়ই রাজি হবে।

— নাইনটি পার্সেন্ট মেয়েই বাবা-মা'র কথায় রাজি হয়। আমি সে-রকম চাই না।

— মনীষা সে-রকম মেয়েও নয়।

— তুই একটা কথার উত্তর দে তো। মনীষা তোকে তুমি বলে, আমাকে আপনি বলে কেন ?

— ওটা কিছু নয়। আমি অনেক বেশিদিন ধরে ওদের বাড়িতে যাই তো—আমাকে অনেক আগে থেকে চেনে। সেই তুলনায় তোকে তো খুব বেশিদিন দেখে নি—কিন্তু তোকে ও খুব পছন্দ করে! কাকদ্বীপের সেই পিকনিকের কথা মনে নেই ?

কাকদ্বীপের পিকনিকে মনীষা আর সুজয়া রান্না করছিল ডাকবাংলোর রান্নাঘরে। চৌকিদার রেঁধে দিতে পারতো, কিন্তু ওরা শখ করে গিয়েছিল। হেমন্ত খুব সর্দারি করছিল রান্নাঘরে গিয়ে। এটা-ওটা মন্তব্য করছিল। সুজয়া আর মনীষা হেমন্তকে দিয়ে জল আনাচ্ছিল, পেঁয়াজ বাটাচ্ছিল। পেঁয়াজ বাটতে গিয়ে হেমন্ত কেঁদেকেটে অস্থির। হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল সুজয়া। মনীষা ঠাট্টার ছলে ওর হলুদমাখা হাতের ছাপ দিয়ে দিয়েছিল হেমন্তর গালে।

হেমন্তও ওস্তাদ ছেলে। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি এ দাগ মুছবো না। এই কলঙ্কের ছাপ আমি শরীরে ধারণ করবো। এই অবস্থাতেই কলকাতায় যাবো।

সত্যি-সত্যি হেমন্ত গালে সেই হলুদমাখা হাতের ছাপ নিয়ে ঘুরতে লাগলো। স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। হলুদের দাগ উঠতে চায় না সহজে। হেমন্তর লজ্জা নেই—তাকে যে দেখছে সে-ই হাসছে। শেষ পর্যন্ত লজ্জায় পড়লো মনীষা। ও নিজেই বারবার অনুরোধ করতে লাগলো, এই ধুয়ে ফেলুন, প্লিজ ধুয়ে ফেলুন। আর কক্ষনো দেবো না!

হেমন্ত কিছুতেই ধোবে না। বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার সময় সেই অবস্থা নিয়েই যখন হেমন্ত গাড়িতে উঠছে, তখন মনীষা ওর হাত টেনে ধরে বলেছিল, এই কি হচ্ছে কি ? এবার ধুয়ে ফেলুন!

হেমন্ত বলেছিল, আমি কিছুতেই ধোবো না। যদি তুমি ধুয়ে দাও, তাহলে রাজি আছি।

নিজে সাবান মাখিয়ে হেমন্তর গাল থেকে সেই দাগ মুছে দিয়েছিল মনীষা। অবশ্য হেমন্তর চোখে সাবানের ছিটে লাগিয়ে দিয়েছিল ইচ্ছে করে।

হেমন্ত মুচকি হেসে বললো, হ্যাঁ, মনে আছে। আমার গালে এখনো যেন মনীষার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে।

আমার মনে পড়লো অন্য একটা কথা। হেমন্ত যখন ওদের সঙ্গে রান্নাঘরে, আমরা তখন অন্য একটা ঘরে তাস খেলছিলাম। হেমন্ত তাস খেলা পছন্দ করে না! হাসিঠাট্টা নিয়ে সময় কাটাতে ভালবাসে হেমন্ত, গম্ভীর হয়ে তাস খেলায় ও আনন্দ পায় না।

ব্রিজ খেলা হচ্ছিল, সেদিন খুব হারছিলাম আমি। একবার মনীষা ঢুকলো সেই ঘরে। মনীষা নিজেও ব্রিজ খেলা জানে, পয়েন্টস লেখা কাগজটা দেখে আমাকে বললো, এ মা, তোমরা হারছো ?

তাসে হারলেই আমার মুখটা থমথমে হয়ে যায়। আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

মনীষা আমার পাশে বসে পড়ে বললো, ইস, হেরে হেরে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে জিতিয়ে দিচ্ছি।

আমি মনীষাকে প্রায় একটা ধমক দিয়েই বললাম, এই, এখন বিরক্ত করো না! এই বারটা না জিতলে মানসম্মান থাকবে না।

মনীষা বললো, আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না ? দেখো, তোমায় জিতিয়ে দিতে পারি কিনা। আমি পাশে থাকলেই তুমি জিতবে।

সেবার তাস বিলি করা হয়েছে, আমার তাসগুলো আমি তখনো তুলি নি। মনীষা সেগুলো ছুড়ে দিয়ে বললো, এবার তুলে দ্যাখো, কী রকম তাস পেয়েছো।

সেবার আমি ফোর নো-ট্রামপস ডেকে রি-ডাবলের খেলা করছিলাম। খেলার মোড় ঘুরে গিয়েছিল সেবার থেকে। মনীষা একটু পরেই উঠে গেল আমার পাশ থেকে। যাবার সময় আমার পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে বলে গেল, দেখলে আমি তোমায় জিতিয়ে দিতে পারি

কিনা।

সুবিমল ফিরে এসে বললো, কী রে, তোরা এমন গুম মেরে বসে আছিস কেন?

সত্যিই, সেই আধো অন্ধকার ঘরে, হেমন্ত আর আমি বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলি নি। সিগারেট টানছিলাম নিঃশব্দে। বোধহয় আমরা দু'জনেই স্বপ্ন দেখছিলাম মনীষাকে।

মাছ ভাজা আর এক বোতল ব্র্যান্ডি এনেছে সুবিমল। সেগুলো নামিয়ে রেখে বললো, দোকানদারকে বলে এসেছি, আরও মাছ ভাজা দিয়ে যাচ্ছে।

— এখানকার দোকানে এত ভালো মাছ ভাজা পাওয়া যায় নাকি?

— না, না। বাজার থেকে মাছ কিনে একটা দোকানে ভাজিয়ে নিলাম। টাটকা ভেড়ির মাছ। এ-রকম স্বাদ কলকাতার মাছে পাবি না।

হেমন্ত বললো, তুই এখানে বাড়ি বানাচ্ছিস বলে, এরকম জায়গা আর পৃথিবীতে কোথাও নেই মনে হচ্ছে। যাক গে, মাছগুলো সত্যিই ভালো।

আধবোতল ব্র্যান্ডি ফুরিয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। তারপর সুবিমল বললো, এইবার বল মেয়েটাকে নিয়ে তোদের প্রবলেম কি?

আমি বললাম, কোনো প্রবলেমই নেই। হেমন্ত ওকে বিয়ে করবে।

— অসম্ভব।

— কেন, অসম্ভব কেন?

— আমি বিয়ে-টিয়েই করবো না। বেশ আছি। তাছাড়া মনীষা সুনীলেরই প্রাপ্য।

— বাজে কথা বলিস না, হেমন্ত। তুই ভালোভাবেই জানিস মনীষাকে আমি পেতে পারি না। পেতে চাই না। আমি মনীষার ব্যর্থ প্রেমিকও নই। হেমন্ত, তুই-ই ওর যোগ্য।

সুবিমল বললো, একি ভাই, তোরা কি একজন আর একজনের ওপর গছিয়ে দেবার চেষ্টা করছিস নাকি?

হেমন্ত বললো, ধ্যাৎ ইডিয়েট। তুই ভালো করে মনীষাকে চিনিস না। মনীষার মতন মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

সুবিমল বললো, তোরা একটা মেয়েকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিস। বিয়ের আগে মেয়েদের একটু দেবী-টেবি মনে হয়, বিয়ের পর দেখবি মাইরি, সব এক। সেই শাড়ি-গয়না, বাপের বাড়ি যাবার বায়না—

— তুই মনীষাকে চিনিস না।

— আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বিচার করে দিচ্ছি। সুনীল, তুই আগে বল তুই কেন মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাস না—

আমি মাছের কাঁটা মুখ থেকে বার করে ফেলে চুমুক দিলাম ব্র্যান্ডির গেলাসে। তারপর বললাম, এর দু'রকম কারণ আছে। প্রথম কারণটা তোকে বলবো না। তুই বুঝতে পারবি না। কিংবা, আমি না বললেও তুই বুঝতে পারবি। দ্বিতীয় কারণটা বলছি। মনীষা বেশ অবস্থাপন্ন ফ্যামিলির মেয়ে। ওর বাবা ওর জন্য একটা যোগ্য পাত্র চাইবেন—সেইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই তুলনায় আমি কি? একটু কবিতা-টবিতা লিখি, মামুলি চাকরি করি, আমাদের বাড়িতে একটা ঘর পর্যন্ত নেই। তুই ভেবে দ্যাখ, হেমন্তই ওর ঠিক যোগ্য কিনা!

সুবিমল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে শুনলো। খানিকক্ষণ কী যেন চিন্তা করলো। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, তুই তাহলে ডগ ইন দা ম্যানজার হয়ে আছিস কেন? তুই মনীষাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দে—তারপর হেমন্ত যদি পারে, মানে তখন ব্যাপারটা অনেকখানি ইজি হয়ে যাবে—

সুবিমলের মুখে ডগ ইন দা ম্যানজার কথাটা শুনে আমার আঘাত লেগেছিল। এ ধরনের তুলনা ঠিক সম্মানজনক নয়। তবে ঐ কথাটা শুনেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, আমিই এই কাহিনীর ভিলেন। মনীষার সঙ্গে আমি যদি ভালবাসার খেলা না খেলতাম, তাহলে হেমন্তর সঙ্গে ওর অনায়াসেই চমৎকার মিল হতে পারতো। হেমন্তর দিক থেকে অন্তত কোনো দ্বিধা থাকতো না। কিন্তু আমিই বা কি করবো, মনীষাকে না চিনলে আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। আমি বোধহয় তাহলে অফিসে ঘুষ নিতাম, চাকরির উন্নতির জন্য মন দিতাম, আমার অধঃপতনের পথ সরল হয়ে যেত।

হেমন্ত সুবিমলকে বললো, তুই চুপ কর। তুই কিছু বুঝবি না। মনীষা যদি একটু সাধারণ মেয়ে হতো, তাহলে কোনো সমস্যাই থাকতো না। এমনকি মনীষা আমাদের দু'জনের একজনকেও ভালবাসে কি না তাও জানি না। সবটাই হয়তো আমাদের মনগড়া।

আমি বললাম, একটা জিনিস মনগড়া নয়। মনীষার বাবা তোকে ডেকে বিয়ের কথা বলেছেন।

হেমন্ত হঠাৎ রেগে গেল। নেশার ঝোঁকে আমাকে একটা থাপ্পড় মেরে বললো, শালা, ফের ঐ কথা! আমি কারুর বাবার কথা শুনে বিয়ে করবো ? আমি আমার নিজের বাবা-মার কথাই শুনি না—আর একটা মেয়ের বাবা-মার কথা শুনবো ?

আমি বললাম, হেমন্ত, বড্ড জোরে লেগেছে আমার!

— জোরে লেগেছে ? তোকে আবার মারবো।

— মার!

— মারবোই তো! মনীষা আমার কেউ নয়, মনীষা তোর!

— একথা বললে তোকেও আমি মারবো।

আমি ঝুঁকে বেশ শব্দ করে একটা চড় কষালাম হেমন্তকে। সুবিমল আঁতকে উঠে বললো, এই, তোরা কি শুরু করলি রে ? একটা মেয়ের জন্য মারামারি!

হেমন্ত হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলো। সুবিমলের থুতনি ধরে বললো, তুই বুঝবি না। আমরা কেন মারামারি করছি, তুই বুঝবি না, বড় কষ্ট রে সুবিমল।

সুবিমল বললো, একটা মেয়ের জন্য দুই বন্ধু মারামারি করতে পারে কিংবা হাসতে পারে—এটা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলাম! আমার মনে হতো সব মেয়েই মেয়ে! শুধু কারো স্বাস্থ্য খারাপ—এইটুকুই যা তফাৎ। বিয়ে করলে বোধহয় এই রকমই মনে হয়।

আমার মনে পড়লো, মনীষা স্বপ্নের মধ্যে বলেছিল, বিয়ের পর সবকিছুই কি রকম অভ্যেস হয়ে যায়। এর নামই কি ভালবাসা ?

সুবিমল বিষণ্ণভাবে বললো, আমি বিয়ে করে তোদের থেকে আলাদা হয়ে গেছি, না রে ? আমাকে তোরা আর দলে নিবি না ?

হেমন্ত সে কথা গ্রাহ্য করলো না। আমার পা দুটো চেপে ধরে কান্নাপন্ন গলায় বললো, সুনীল, মনীষাকে অন্য কোথাও যেতে দিস না। মনীষাকে অন্য কেউ নিয়ে যাবে—আমি এটা সহ্য করতে পারবো না। ও অন্তত আমাদের মধ্যেই থাক। মনীষাকে তোরই পাওয়া উচিত।

হঠাৎ একটা দারুণ মিথ্যে কথা বলার ঝোঁক এসে গেল আমার মধ্যে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমি শুকনো মুখ করে বললুম, তাহলে শোন, তোকে সত্যি কথাটা বলি। আমি মনীষাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। মনীষা রাজি হয় নি। মনীষা আমাকে চায় না, আমি আগেই জেনে গেছি।

৬

আমার কখনো খুব কঠিন অসুখ হয় নি, কিন্তু একবার আমি মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি দেখেছিলাম।

বছর ছয়েক আগে কলকাতা থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের নামটা ভুলে গেছি। তবে সেখানে একটা মস্তবড় দিঘি আছে, যার নাম সেন দিঘি—লোকে বলে রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে নাকি দিঘিটা কাটানো হয়েছিল। গ্রামের কয়েকটি ছেলে বললো, ঐ দিঘি কেউ এপার–ওপার করতে পারে না। কী যেন একটা অলৌকিক গল্প আছে সে সম্বন্ধে।

এইসব কথা শুনলেই চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছে করে। বন্ধুদের কথায় গ্যাস খেয়ে আমি বললাম, আমি এপার–ওপার করবো—কি দেবে বলো?

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গে, সাঁতার শিখেছি সহজাতভাবে। অনেক দিন অভ্যেস নেই, কিন্তু সাঁতার কেউ কখনো ভোলে না। আমি স্পিড তুলতে পারবো না, কিন্তু যথেষ্ট সময় পেলে আস্তে–আস্তে সাঁতরে যাওয়া কি আর শক্ত? মাঝে–মাঝে হাত–পা ছেড়ে চিৎ হয়ে ভেসে থাকলেই হবে।

যাবার সময় ঠিকই চলে গেলাম। দিঘিটার পাড়ে দাঁড়িয়ে যত বড় মনে হয়, আসলে তার চেয়েও বড়, জল বেশ ভারী। বন্ধুরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছিল। হাততালির নেশায় মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। যদিও পুকুরের মাঝামাঝি এলে পাড়ের আওয়াজ কিছুই শোনা যায় না।

যাই হোক, পার হয়ে ওপারে পৌঁছুলাম—সেখানে ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। বুকের মধ্যে হাঁসফাঁস করছে। বহুদিন অনভ্যাসে দম নেই। ওপারে বন্ধুদের চেহারা ছোট–ছোট দেখাচ্ছে। এপার জনশূন্য, একটা ভাঙা শিবমন্দির, একটা কুবো পাখি অনেকক্ষণ ধরে ডেকে যাচ্ছে একটানা।

ঘাটের সিঁড়িতে বসে বিশ্রাম নিতে–নিতে খুব মনে হতে লাগলো, আর সাঁতরে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। এবার পাড় দিয়ে হেঁটে যাই। হাত–পাগুলো অবশ লাগছে। কিন্তু বাজিতে হেরে যাবার ব্যাপারটা মনে হতেই আবার অনেক যুক্তি এসে যায়। আস্তে–আস্তে চিৎ–সাঁতার কাটলে দম বেশি লাগবে না। ফেরার সময় আরও আস্তে–আস্তে যাবো। ওপার থেকে একজন কেউ নাম ধরে ডাকতেই আমি আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ফেরার পথ সব সময়ই দীর্ঘতর হয়। তাছাড়া, এবার জলে নেমেই মনে হলো, আমি কি নির্বোধ, সামান্য বাজির জন্য শরীরকে এরকম কষ্ট দিচ্ছি। বহুদিন অনভ্যাসের ফলে হাত–পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। খানিকটা এসে খুব ইচ্ছে করতে লাগলো ফিরে যাই। হার স্বীকার করি! কিন্তু তখন ফিরতে গেলে বেশি সময় লাগবে না পৌঁছুতে—সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। মনে হয়, মাঝখানে এসে গেছি, দু'দিকেই সমান দূর।

সেই সময় নিজেকে কী ভীষণ একা লাগলো। ক্লান্ত হয়ে, চিৎ–সাঁতার কাটছিলাম, চোখের সামনে শুধু আকাশ—বহুদিন এরকম আকাশ দেখি নি। এখন কেউ আমাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে না। এতবড় একটা দিঘির মাঝখানে আমি একা। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, দূরে বন্ধুবান্ধবরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ব্যস্ত, আমার দিকে কারুর নজর নেই।

সেই মুহূর্তে সেন দিঘি সম্পর্কে প্রবাদ সত্যি হয়ে ওঠার উপক্রম হলো। আমি দম ফুরোবার ভয় করছিলাম, কিন্তু আমার হাতে–পায়ে খিল ধরে গেল। বাঁ দিকের পা ও হাত পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যাবার মতন, আর নাড়াতে পারছি না। দিঘির অতল আমাকে টানছে, আমি ডুবে যাচ্ছি। চিৎকার করে উঠেছিলাম, অবিনাশ, অবিনাশ, আমাকে বাঁচা।

কেউ শুনতে পায় নি আমার চিৎকার। কিংবা হয়তো আমার গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরোয় নি। আস্তে-আস্তে ডুবে যেতে যেতে আমি বুঝতে পারলাম, মৃত্যু খুব কাছে। মৃত্যুর চেহারা নীলরঙা জলের মতন। রাশি-রাশি স্তব্ধ নীল জল আমাকে ঘিরে ধরেছে—কী অসম্ভব জোরে চিৎকার করার ইচ্ছে হয় তখন, অথচ উপায় নেই, হাত-পা ছুড়তে ইচ্ছে হয়—অথচ আমি শৃঙ্খলিত মানুষের মতন বন্দী। কী সাঙ্ঘাতিক অসহায় একাকিত্ব!

বলাই বাহুল্য, সেবার আমি মরি নি। এই লেখা তো আমি ভূত হয়ে লিখছি না। বেশিরভাগ মৃত্যুই যেমন দুর্ঘটনা, বেঁচে ওঠাও সেই রকম। দিঘিটা খুব বেশি গভীর ছিল না—দু'আড়াই মানুষ হবে। ডুবে গিয়ে তলার মাটিতে পা ঠেকানো মাত্র আমার হাত-পায়ের খিল ছেড়ে যায়, প্রাণপণ শক্তিতে আমি আবার ঠেলে ওপরে উঠেছিলাম। তারপর বাকি অংশটা সাঁতরে গেছি অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে—বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণ যত জোরে ছোটে। ফিরে যাবার পর বন্ধুরা কেউ আমার কথায় বিশ্বাস করে নি। ভেবেছিল, আমার কৃতিত্বকে আমি বেশি রোমাঞ্চকর করে তুলছি।

কিন্তু রাশি-রাশি নীল জল মৃত্যুর মতন আমাকে ঘিরে ধরছে—এই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। জীবনের নানা সঙ্কট সময়ে এই দৃশ্যটা ফিরে আসে। টের পাই সেই অসহায় একাকিত্ব।

সন্ধেবেলা চৌরঙ্গি দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার প্যান্ট-শার্ট ফর্সা। আমার পকেটে কুড়ি-পঁচিশটা টাকা আছে, চতুর্দিকে অসংখ্য মানুষ, সিনেমা হলে উজ্জ্বল আলো, কত দোকানের হাতছানি—কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মানুষের মতন আমি হেঁটে যাই। আমার চারপাশে মৃত্যুর নীল জলরাশি। আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

নিজেই এক-এক সময় বুঝতে পারি, এটা আমার মনগড়া দুঃখ। দুঃখ নিয়ে বিলাসিতা যাকে বলে। কেউ অভিযোগ করলে আমি অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু পৃথিবীর কোন সুখ বা কোন দুঃখটা মনগড়া নয় ? এমনকি খেতে না পাওয়ার দুঃখও মনগড়া। লছমনঝোলায় আমি একজন সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম, সারাদিনে যাঁর খাদ্য মাত্র একখানা রুটি ও দু'টি ট্যাঁড়শ সেদ্ধ এবং চার-পাঁচ কমণ্ডলু ভর্তি জল। দিনের পর দিন তাঁকে ঐ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে দেখেছি। উনি নাকি জল থেকেই সমস্ত খাদ্যগুণ পেয়ে যান। ক্যালোরি ও ফুডভ্যালুর সমস্ত তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে সেই সাধুজি এক মনগড়া ভগবানকে নিয়ে বেশ আনন্দে আছেন।

পৃথিবীর সমস্ত গরীব লোক মাত্র একখানা রুটি ও ট্যাঁড়শ সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, এটা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। কেননা, আমি নিজেও তা পারি না। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, পৃথিবীর অনেক সুখের মতন, অনেক বাস্তব দুঃখও মনগড়া।

চৌরঙ্গি ছেড়ে আমি ময়দান দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। সিগারেটের পর সিগারেট শেষ করে যাচ্ছি অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ এখানে আমার চেনাশুনো কেউ আমাকে দেখলে অবাক হবে। আমি আড্ডা ও হৈহল্লায় থাকার মানুষ। আমি একলা-একলা ময়দানে ঘুরছি—আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? মানসিক একাকিত্বের সঙ্গে সমতা রাখার জন্যই আমার এই শারীরিক একাকিত্ব। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

আমি মনীষাকে ভালবাসি, অথচ তাকে কখনো নিজের করে চাই নি। এর কোনো মানে হয় ? আমি মনীষাকে সবসময় খুঁজছি, অথচ বৌবাজারের মোড়ে তাকে দেখেও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কি এর রহস্য ? আমি নিজেই আমার নিজের ব্যবহারের মর্ম বুঝি না। অন্য মানুষের চরিত্র আমি কি করে বুঝবো ? আমি লেখক না কচু! আমি কিছু জানি না। একা-একা বিনা উদ্দেশ্যে এরকমভাবে তো আমার ময়দানে ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়! ধরা যাক, এই বিশাল অন্ধকার ময়দানে কোথাও একটা সূঁচ পড়ে আছে, আমাকে সেটা খুঁজে বার করতে হবে।

... এক টুকরো নতুন সাদা কাপড়ের ওপর পেন্সিল দিয়ে গোলাপ ফুল আঁকা। মাটিতে পা ছড়িয়ে মনীষা সেলাই করতে বসেছে। সূঁচ ও সুতোর দিকে দারুণ মনোযোগ। বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছে সুজয়া।

— এই, অরুণ কোথায় ? অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছি, শুনতে পাচ্ছো না ?

ধড়মড় করে উঠে বসলো সুজয়া। আমাকে দেখে বললো, ও তো ফেরে নি এখনো ?

— ফেরেনি ? সাতটার সময় ওর বাড়িতে থাকার কথা। এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।

— আমাকে তো কিছু বলে নি। ভুলেই গেছে বোধহয়।

— ইস, অরুণটা এমন জ্বালাতন করে!

মনীষা মুখ তুলে বললো, এত ছটফট করছো কেন ? কোথায় যাওয়ার কথা আছে ?

— জাহাজে।

— জাহাজে মানে ?

— পোর্ট কমিশনার্স-এর একটা জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বন্ধু। সে আজ আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। অরুণকে সাতটার সময় বাড়ি থেকে তুলে নেবার কথা—

সুজয়া বললো, আপনারা জাহাজে উঠবেন ? আমরা বুঝি সেখানে যেতে পারি না ?

— না, জাহাজে মেয়েরা যায় না।

— কেন, মেয়েরা কী দোষ করলো ?

— তা জানি না। মোট কথা, আমার বন্ধু মেয়েদের নিয়ে যাবার কথা বলে নি।

— আপনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের কথা ? করেন নি। এসব প্রোগ্রামের সময় আমাদের কথা মনেই থাকে না।

— তোমরা জাহাজে গিয়ে কি করবে ? আমরা সেখানে একটু বিলিতি হুইস্কি–টুইস্কি খাবো, হৈচৈ করবো।

— বাঃ, আপনারা জাহাজে গিয়ে হৈচৈ করবেন, আর আমরা বাড়িতে বসে থাকবো ? কেন, আমরা বুঝি হৈচৈ করতে পারি না ?

— আচ্ছা, না হয় আর একদিন বলে দেখবো। অরুণটাকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হলো!

মনীষা আবার সেলাইয়ে মনোযোগী হলো। ফের মুখ তুলে বললো, একটু বসো, দাদা হয়তো এসে পড়বে।

— বসবো কি। নিচে ট্যাক্সিতে আরও দু'জন ওয়েট করছে।

— কে ? তাদেরও এসে বসতে বলো।

— তোমরা তাদের চেন না।

— তাহলে ওদের চলে যেতে বলে দাও।

— না, আমিও ওদের সঙ্গে চলে যাবো। সাড়ে সাতটার মধ্যে না পৌঁছলে—

— দাদা যদি না আসে, তাহলে দাদাকে ফেলেই চলে যাবে ?

— অরুণের যদি এত ভুলো মন হয়, তাহলে আমি কী করতে পারি !

— তুমি যেও না।

মনীষার কথায় আমি থমকে গেলাম। মনীষা তো কখনো এরকমভাবে বলে না। আমি মনীষার চোখের দিকে তাকালাম। মনীষাও সোজা আমার দিকে চেয়ে আছে। আর একবার বললো, তুমি যেও না। জাহাজের প্রোগ্রামটার ব্যাপারে আমার খুবই উৎসাহ ছিল। কে যেন তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল।

সুজয়া বললো, সত্যি, আমাদের বাদ দিয়ে আপনারা যাবেন, এর কোনো মানে হয় না। আমি

কখনো কোনো জাহাজের ভেতরে ঢুকি নি। আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। আর একদিন ব্যবস্থা করুন, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে যাবো।

— অরুণ এখনো ফিরলো না কেন ? অফিস থেকে আর কোথাও গেছে নাকি ?

— কী জানি। আমাকে কি আর সব কথা বলে!

মনীষা আবার মুখ নিচু করে শেলাই করছে। ও যেন ভালো করেই জানে, ওর 'যেও না' শুনে আমি কিছুতেই যাবো না। সেইজন্যই আমি নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, না, ভাই, কথা দেওয়া আছে, আজ আমি যাই। আর একদিন না হয় তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো।

মনীষা মুখ না তুলেই বললো, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!

আমি ওকে এক ধমক দিয়ে বললাম, ভালো হবে না মানে ? অরুণ দেরি করছে বলে কি আমি যাবো না ? নিশ্চয়ই যাবো!

— ঠিক আছে, তুমি গিয়ে দেখো।

সুজয়া হাসতে লাগলো। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমিও আজ তোমাদের মজা দেখাচ্ছি!

ট্যাক্সিতে অপেক্ষমাণ বন্ধুদের বুঝিয়ে–সুঝিয়ে ছেড়ে দিলাম। ওপরে ফিরে এসে আফসোসের সুরে বললাম, আজ অরুণের জন্য আমার প্রোগ্রামটা নষ্ট হলো। জাহাজে ওরা ডিউটি–ফ্রি জিনিস পায়—

সুজয়া বললো, বসুন। আপনাকে ফিস ফ্রাই খাওয়াচ্ছি। আপনারা বাইরে-বাইরে প্রোগ্রাম করবেন—আমাদের কী করে সময় কাটে বলুন তো। আপনার বন্ধু তো আজকাল একদিনও সন্ধের পর বাড়ি ফেরে না। সব আড্ডা বাইরে-বাইরে। বাড়িতে আর যেন ফিরতে ইচ্ছেই করে না!

— সে কি, তুমি বাড়িতে একলা–একলা থাকো ?

— বিয়ের দু'এক বছর পর সব ছেলেরাই এরকম হয়ে যায়!

মনীষা মনোযোগ দিয়ে শেলাই করছে। আমাকে বললো, তুমি যেও না, অথচ এখন আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি ধমক দিয়ে বললাম, এই মনীষা, তুমি রাত্তিরবেলা শেলাই করছো কেন ? চোখ খারাপ হয় ওতে।

— কাল আমার এক বন্ধুর জন্মদিন। তাকে দিতে হবে।

আমি জানি, মনীষা কোনো বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা জন্মদিনের নেমতন্নে সাধারণত কেনা জিনিস উপহার দেয় না। নিজের হাতে কিছু বানিয়ে দেয়। সেইজন্য ওর উপহারের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত স্পর্শ থাকে।

— তা হোক। কাল সকালে শেলাই করো। রাত্তিরে না—

— কাল সকালে শেষ হবে না—

সুজয়া বললো, পরশু হেমন্তদা আমাদের একটা সিনেমা দেখালেন। 'নাইট অব দা ইগুয়ানা'। আর একটি মেয়ে ছিল ওঁর সঙ্গে। আপনি বইটা দেখেছেন।

আমি বললাম, হেমন্তটা পাজি আছে তো! আমাকে বলে নি!

— আপনাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল।

— মনীষা, তুমি গিয়েছিলে ?

সুজয়া উত্তর দিল, না, মধুবন যায় নি। ওর কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। আজ আপনি একটা সিনেমা দেখান না। নাইট শোতে।

— আজ ? অরুণের তো এখনো পাত্তাই নেই!

সুজয়া দুষ্টুমি করে বললো, ও থাক না! চলুন, আমি, আপনি আর মধুবন চলে যাই। ও এসে দেখবে ঘর তালাবন্ধ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তালাবন্ধ থাকবে কেন ? বাড়িতে আর কেউ নেই ?

— না। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই সোনারপুর গেছেন। কাল ফিরবেন।

সোনারপুরে অরুণদের একটা বাড়ি আছে। ওর বাবা–মা সেখানে যান মাঝে মাঝে।

সুজয়া অভিযোগ করে বললো, দেখুন না, আজ বাড়ি ফাঁকা—তবু ওর বাড়ি ফেরার নাম নেই। আজ ওর শাস্তি পাওয়া উচিত— চলুন আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

— ঠিক আছে, চলো! তৈরি হয়ে নাও। এই মনীষা, ওঠো।

— ভ্যাট! এই রকমভাবে যাওয়া যায় নাকি ? দাদাকে না বলে—

সুজয়া জোর দিয়ে বললো, কী হয়েছে তাতে ? তোমার দাদা একদিন বুঝুক। রোজ কোথায় তাস খেলতে যায়—দশটা এগারোটায় ফেরে—

আমি বললাম, পুরুষ মানুষের বেশি সময় বাড়িতে থাকা ভালো নয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আজ যদি একান্তই অসুবিধে হয় কাল সিনেমায় যাবে ? এলিটে একটা খুব নাম করা ফ্রেঞ্চ বই এসেছে। কালই শেষ।

— মনীষা যাবে তো ?

— আমি যাবো না। তোমরা যাও। কাল আমার এক বন্ধুর জন্মদিনের নেমন্তন্ন—

— নাইট শোতে যাবো। তার আগে তুমি নেমন্তন্ন সেরে এসো।

— সত্যি, তা হবে না। ওর বাড়ি সেই নিউ আলিপুরে। অতদূরে যাওয়া–আসা—

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কাল তোমাকে ঐ নেমন্তন্নতে যেতে হবে না।

মনীষা মুখ তুলে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। ও বরের সঙ্গে বিলেত চলে যাচ্ছে। কাল না গেলে আর দেখাই হবে না ওর সঙ্গে। আমি ওকে কথা দিয়েছি।

একটু আগে ও আমাকে বললো, তুমি যেও না। এখন আমি ওকে এক জায়গায় যেতে বারণ করছি, ও শুনবে না। এ মেয়েকে নিয়ে পারা যায় ? মনীষা কি আমাকে নিয়ে খেলা করছে ? নাকি বেশি ব্যক্তিত্ব দেখাচ্ছে ? বেশ রাগ হলো। ইচ্ছে হলো, টান মেরে ওর শেলাইয়ের জিনিসপত্র ফেলে দিই—

সুজয়া বললো, মধুবন না গেলে বুঝি আমাকে দেখাবেন না ? আমার তো কাল নেমন্তন্ন নেই। আমি কি দোষ করলুম ?

আমি সুজয়ার হাত ধরে বললাম, তাহলে চলো, আজই যাই। তুমি আর আমি। চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবো।

মনীষা বললো, বৌদি তুমি যাও না। আমি দাদাকে খাবার দিয়ে দেবো।

শেষ পর্যন্ত সুজয়ার সাহসে কুলোলো না। বললো, আপনার বন্ধু কিন্তু তাতে রাগ করবে না। কিন্তু কী করবো বলুন তো ? এই ছুতো পেয়ে, এরপর আরও দেরি করে বাড়ি ফিরবে।

আমি হতাশভাবে বললাম, তাহলে আর ফিস ফ্রাইটা মিস করি কেন ? তুমি যে বললে ফিস ফ্রাই খাওয়াবে ?

সুজয়া খাবার আনতে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মনীষা একমনে শেলাই করে যাচ্ছে। সাদা কাপড়ে ফুটে উঠছে গোলাপ ফুলের ডিজাইন।

আমি বললাম, তুমি যদি মন দিয়ে শেলাই–ই করবে শুধু, তাহলে আমাকে থাকতে বললে কেন ?

— এমনিই। ইচ্ছে হলো।

— এতক্ষণে আমি জাহাজে গিয়ে কত আনন্দ করতে পারতুম।

— সেইজন্যই তো।

— তার মানে ?

— তার মানে আর কিছু নেই।

— বাঃ, আমি শুধু-শুধু বসে থাকবো, আর তুমি শেলাই করবে ?

— আমাকে যে এটা শেষ করতেই হবে।

একটান দিয়ে আমি শেলাইয়ের কাপড়টা সরিয়ে নিলাম। মনীষা বললো, উঃ, আমার আঙ্গুলে সূঁচ ফুটিয়ে দিলে তো!

সত্যিই মনীষার তর্জনীর ডগায় একবিন্দু রক্ত। মনীষা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে। ওর সুচারু আঙ্গুলে ঐ রক্তের বিন্দু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বিন্দুটা আস্তে-আস্তে ফোঁটা হলো।

আমি বললাম, দেখি আঙ্গুলটা।

— কেন ?

— রক্ত নষ্ট করতে নেই। আমি খেয়ে ফেলছি ওটা।

— ভ্যাট! অন্যের রক্ত খায় নাকি ?

— আমি খাবো। আমি কখনো মেয়েদের রক্ত খাই নি। স্বাদটা কী রকম দেখি তো—

খানিকটা অনিচ্ছায় খানিকটা কৌতূহলে মনীষা আঙ্গুলটা বাড়িয়ে দিল। আমি সেটা মুখে দিলাম। মুখ থেকে যদি আর বার না করি ?

— কি রকম স্বাদ ? অন্য রকম ?

— রক্তের ? না তোমার আঙ্গুলের ?

— থাক, বলতে হবে না।

— এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার একটা রক্তের সম্পর্ক হয়ে গেল, জানো তো ?

মনীষা হাসলো। আমি বললাম, আমার আর একটা শখ আছে। তোমার চোখের জল একদিন একটু টেস্ট করে দেখবো। মেয়েদের চোখের জলের স্বাদ কী রকম হয় সেটা আমার জানতে ইচ্ছে করে। তুমি কখন কেঁদে ফ্যালো বলো তো ?

মনীষা এবার শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, ক'দিন আগে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম, তার একটা লাইন হঠাৎ মনে পড়ে গেল!

— কি লাইন ?

— তাতে এক জায়গায় আছে, একটা মেয়ে বলছে, 'আমার কান্না দেখতে পাওয়া যায় না।' আমারও ঐ লাইনটা বলতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু হয়তো ওটা সত্যি নয়। সত্যি না হলেও অনেক কথা এক-এক সময় বলতে ইচ্ছে করে, তাই না ?

— আমি তোমাকে এক্ষুনি কাঁদিয়ে দিতে পারি।

— সে আর এমন শক্ত কি ? চোখের সামনে কমলালেবুর খোসা টিপে দিলে কিংবা হঠাৎ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিলে চোখে জল এসে পড়ে। কিন্তু সেটা তো সত্যিকারের কান্না নয়।

— সে রকম নয়। সত্যিকারেরই কান্না। সে রকম কান্না বুঝি তোমার বেরোয় না।

— অনেকদিন সে রকমভাবে কাঁদি নি বোধহয়। ঠিক মনে পড়ছে না।

— আমি তোমাকে সেরকম কাঁদিয়ে দিতে পারি।

— পারবে না।—এই, এই, তা বলে মেরো না যেন আমাকে। তুমি বড্ড মারো—। আর একবার সেই মেরেছিলে, ময়দানে—

— তোমার মনে আছে সে কথা ?

— মনে থাকবে না ?

— তোমাকে দেখলে এক-এক সময় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

— এখন মাথা খারাপ হয়েছে নাকি! আমি তাহলে চলে যাচ্ছি—

মনীষা সত্যি-সত্যি উঠে পড়লো। আমি হাত ধরে ওকে আটকাতে গেলাম, ওর হাত থেকে শেলাইয়ের জিনিসগুলো পড়ে গেল।

মনীষা বললো, এই যাঃ। সূঁচটা হারিয়ে ফেললে তো ? কী হবে এখন ?

— হারাবে কোথায় ? আমি খুঁজে দিচ্ছি।

— দাও, খুঁজে দাও!

সারা ঘরময় আমি সূঁচটা খুঁজতে লাগলাম। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, খাটের নিচে একটু-একটু অন্ধকার ... আমি সূঁচ খুঁজছি ...

৭

চীনে দোকানের ক্যাবিনের নম্বর জানিয়ে হেমন্ত আমাকে টেলিফোন করেছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, হেমন্তর সঙ্গে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটি বেশ রোগা, মুখখানা ঢলঢলে, চড়া হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি পরে আছে। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, ভুরুতে কাজল।

হেমন্ত বললো, আয়, সুনীল। আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম হচ্ছে সান্ত্বনা। সান্ত্বনা চক্রবর্তী। আর এ হচ্ছে ...।

ক'দিন ধরেই শুনছিলাম, হেমন্তকে প্রায়ই একটি মেয়ের সঙ্গে পথেঘাটে, সিনেমায় দেখা যাচ্ছে। সুবিমলের কাছে যেদিন গিয়েছিলাম তারপর থেকে হেমন্ত আমাকে এড়িয়ে চলছে। আমি চেষ্টা করে ওকে ধরতে পারি নি, আজ নিজে থেকেই আমাকে টেলিফোন। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। হেমন্তকে আমি চিনি বছর দশেক ধরে। অথচ এই মেয়েটিকে আমি কোনোদিন দেখি নি।

হেমন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে বললো, সান্ত্বনা খুব ভালো গান করে। রেডিওতে চান্স পেয়েছে। একদিন অ্যারেঞ্জ করতে হবে, সান্ত্বনার গান শোনার জন্য।

আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

— সান্ত্বনার সঙ্গে আমার খুব ছেলেবেলায় আলাপ ছিল মুঙ্গেরে। অনেকদিন বাদে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

হেমন্ত আর সান্ত্বনা টেবিলের একদিকে পাশাপাশি বসে আছে। কোনো মেয়ের সঙ্গে এরকমভাবে বসা একটু বিসদৃশ। আমি বসেছি বিপরীত দিকে। হেমন্ত কথা বলার সময় সান্ত্বনার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করছে। বোঝা যায়, অনেকদিন বাদে হঠাৎ দেখা হলেও হেমন্তের সঙ্গে মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে অনেকখানি।

হেমন্ত বললো, বুঝলে সান্ত্বনা, এই যে সুনীল, এ হচ্ছে আমার অনেক দিনের বন্ধু। এর সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করবে না।

সান্ত্বনা হেসে বললো, বাঃ, খারাপ ব্যবহার করবো কেন ?

— তোমাদের মেয়েদের একটা খারাপ অভ্যেস আছে। একজনের সঙ্গে বেশি ভাব হয়ে গেলে অন্যদের আর পাত্তাই দিতে চাও না!

সান্ত্বনা লাজুকভাবে বললো, বাঃ!

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। হেমন্তর অতিরিক্ত উৎসাহের মানে বোঝা যাচ্ছে না। হেমন্ত

একটা কিছু নতুন খেলা খেলতে চাইছে। হেমন্তর উদ্ভাবনীশক্তির শেষ নেই।

এক গাদা খাবারের অর্ডার দিয়েছে হেমন্ত। আমার সামনেই সান্ত্বনাকে মৃদু আদর করে ফেলছে মাঝে-মাঝে। সেই সঙ্গে আবোল-তাবোল গল্প। হঠাৎ বললো, সান্ত্বনাকে অরুণদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম, জানিস তো ? সবাই মিলে একসঙ্গে সিনেমায় গেলাম। মনীষা কিছুতেই গেল না। এত করে যেতে বললাম—। যাই বল, মনীষার বড্ড ডাঁট।

তারপর সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললো, সেদিন যে মনীষাকে দেখলে—ওর সঙ্গে সুনীলের খুব ভাব। খুব ভাব—বুঝলে তো!

সান্ত্বনা বললো, ওকে খুব সুন্দর দেখতে।

— কাকে ?

— ঐ মেয়েটিকে। যার নাম মনীষা—

— সুনীলকেই বা এমন কি খারাপ দেখতে ? খুব খারাপ বলা যায় না। সুনীলের সঙ্গে ওকে মানাবে না ?

আমি চোখ সরু করে তাকিয়ে রইলাম হেমন্তর দিকে। হেমন্ত আমাকে কথা বলার কোনো সুযোগই দিচ্ছে না।

হেমন্তর কথা শুনতে-শুনতে আমি সান্ত্বনাকে ভালো করে লক্ষ করলাম। মেয়েটি বারবার চকিতে একবার হেমন্ত একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। শরীরের তুলনায় ওর মাথার খোঁপাটা মস্তবড়। হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা-লম্বা—কে যেন বলেছিল আমাকে, শিল্পীদের আঙ্গুল এরকম লম্বা হয়। টেবিলের তলায় মেয়েটি ঘনঘন পা নাচাচ্ছে। তার শাড়ি ও পোশাকের তুলনায় চটির অবস্থা বেশ খারাপ। আমার দৃঢ় ধারণা খোঁপার তলায় ওর ঘাড়ে ময়লা জমে আছে।

মেয়েটির জন্য আমার হঠাৎ খুব দুঃখ হলো। ওর কোনো দোষ নেই। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলাম আমরা। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইছিলাম, হেমন্ত কিছুতেই ছাড়লো না। হেমন্ত প্রায়ই একটু গদগদ ভাব দেখিয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে আলাদা কথা বলছে ফিসফিস করে—অথচ আমাকে চলে যেতেও দেবে না। কোনো মেয়ের সঙ্গে এরকম ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে তৃতীয় ব্যক্তি তখন অবাঞ্ছিত। হেমন্তর উচিত ছিল আমাকে কাটিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, হেমন্ত আমাকে এসব দেখাতেই চায়। সান্ত্বনা বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত। হেমন্ত ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে চায়—কিন্তু সান্ত্বনা বাসে যাবে। বাসে উঠবার আগে হেমন্ত আর সান্ত্বনা আবার কিছুক্ষণ আলাদা কথা বললো, আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সান্ত্বনা বাসে উঠে যাবার পরও হেমন্ত একটুক্ষণ সতৃষ্ণভাবে বাসটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধহয় ওর হাত নাড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সান্ত্বনা বসবার জায়গা পায় নি, তাকে আর দেখা গেল না।

তখন হেমন্ত আমার দিকে ফিরে বললো, দারুণ গান গায়, বুঝলি। শুনলে তুই ফ্ল্যাট হয়ে যাবি।

— তুই শুনেছিস ওর গান ? কোথায় শুনলি ?

— আমার মামাবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা হলো। সেখানেই ও গান গাইছিল। পরদিন ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আলাদা দেখা করলাম।

— এর মধ্যেই তোর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে, তুই ওকে অরুণদের বাড়িতে নিয়ে গেলি ?

— এত ভাব মানে কি ? ওর সম্পর্কে আমি এত অ্যাটাকটেড হয়ে গেছি যে, চোখ বুজলেই

এখন ওর মুখটা দেখতে পাই।

আমি হেমন্তর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম। হেমন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বললো, ক্যাবলার মতন হাসছিস কেন ?

— হেমন্ত, তোর মামাতো বোন অসীমার এক বন্ধু ছিল, কি যেন তার নাম ? ও, হ্যাঁ, নন্দিনী এখন কোথায় থাকে ?

— কী জানি, খবর রাখি না। হঠাৎ তার কথা কেন ?

— এমনিই জিজ্ঞেস করছি। নন্দিনীর বেশ দুর্বলতা ছিল তোর সম্পর্কে।

— এক সময়ে অনেক মেয়েরই দুর্বলতা ছিল আমার সম্পর্কে। আমি তো তোর মতন ফালতু নই। আমার সি.এ ডিগ্রি আছে।

— হঠাৎ যদি তোর মেয়েদের সঙ্গে মেশার ঝোঁক চাপে, তাহলে নন্দিনীর মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশাই তো ভালো।

— কেন, সান্ত্বনাকে তোর পছন্দ হলো না। চোখ দুটো কি সুন্দর, তুই লক্ষ করিস নি ?

— দ্যাখ, মনীষাকে ভোলার চেষ্টা করতে গেলে এই সান্ত্বনা খুবই পুয়োর সান্ত্বনা। এর নামটাও খুব সিগনিফিকেন্ট, তুই লক্ষ করেছিস ?

— তুই রাখ তো! তোর ধারণা মনীষার মতন সুন্দরী আর কেউ নেই। ওরকম মেয়ে ঢের দেখা যায়! কী আছে মনীষার ? চোখ খারাপ—চশমা ছাড়া দূরের জিনিস দেখতে পায় না! কপালটা ছোট—

— গায়ের রং তেমন ফর্সা নয়—

— কখনো সিরিয়াস হতে জানে না। সবসময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে—

— বাড়িতে থাকে না। টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়—

— ছেলে-ঘেঁষা। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেশে—

— মনীষার আরও অনেক দোষ আছে। আয়, মনীষার দোষগুলোর একটা লিস্টি বানাই।

— আমার দরকার নেই। নট ইন্টারেস্টেড—

— হেমন্ত, তুই হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন রে ? মনীষার বাবা কি তোকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন ? সেইজন্যই তুই সান্ত্বনাকে অরুণদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলি ?

— মনীষার বাবাকে আমি বলে দিয়েছি, আমি ইন্টারেস্টেড নই।

— তোর কত টাকা খরচ হচ্ছে রে ?

— কিসের টাকা খরচ ?

— সান্ত্বনা খুব গরিব ঘরের মেয়ে। ওকে টাকা রোজগার করে সংসার চালাতে হয়, তাই না ?

— তার মানে, তুই ওকে চিনতিস আগে থেকে ?

— না, চিনতাম না। তবে, ওর টাইপটা চিনি।

— তুই বলতে চাস কী ? গরিব ঘরের মেয়ে তো কি হয়েছে ? তুই কি দিন-দিন স্নব হচ্ছিস নাকি ?

— আমি সেকথা বলছি না। আমিও তো গরিবের ছেলে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সান্ত্বনা একজন অ্যামেচার অ্যাকট্রেস। অফিস-টফিসের ক্লাব-থিয়েটারে অভিনয় করে।

হেমন্ত চোখ সরু করে আমার দিকে তাকালো। হেমন্তর চোখে-মুখে অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে। হেমন্তর মনে সুখ নেই। অনেক সুদিন-দুর্দিনের বন্ধু আমরা। কোনো কিছু লুকোবার চেষ্টা করলেও আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি।

হেমন্তর চোখে–মুখে চঞ্চলতা। পরপর সিগারেট ধরিয়েই যাচ্ছে। সবসময় কিছু যেন লুকোতে চাইছে। আমার কাছ থেকে, না নিজের কাছ থেকে ? নিজের কাছেই কোনো কিছু লুকোবার সময় মানুষ এত বেশি নার্ভাস হয়ে যায়।

আমি জানি, মনীষার বাবা হেমন্তকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এক মেয়ে বিয়ে করে নি, এই মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একথা সকলেই জানে, সাধারণভাবে পাত্রী হিসেবে দেখিয়ে মনীষার বিয়ে দেওয়া যাবে না। মনীষাকে সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হতে বলবে—এমন সাহস কারুর নেই, মনীষার বাবারও না। অথচ মনীষা নিজে থেকেও কারুকে বিয়ে করতে চাইবে না। ও নিজে কোন্ নেশায় মেতে আছে, কে জানে ?

হেমন্ত বললো, থিয়েটার করে ? তুই কোনো থিয়েটারে ওকে দেখেছিস ?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না, দেখি নি। কিন্তু ঐ টাইপটা আমি চিনি। আমি তো নানান অফিসে কাজ করেছি, কেরানিও ছিলাম—তোর মতন অফিসার নয়—অফিস–ক্লাবের অনেক থিয়েটার দেখেছি। অফিসের তিরিশ–চল্লিশজন পুরুষ থাকে—আর বাইরের দু'তিনটি মেয়েকে ভাড়া করে আনা হয়। মধ্যবিত্ত ছা–পোষা বাঙালিদের তো তুই চিনিস—বাড়িতে এরা নীতিবাতিকগ্রস্ত, কিন্তু এইসব থিয়েটার–ফিয়েটারের সময়ে পুরুষরা উসখুস করে। দুঃখী সংসার থেকে আসে এইসব মেয়েরা, কারুর বাবা বেকার, কেউ পিতৃহীন, কারুর দাদা মারা গেছে পুলিশের গুলিতে কিংবা দাঙ্গায়। সত্তর--পঁচাত্তর টাকা পায় এক–একটা অভিনয়ে। তার আগে ছ-সাতদিন রিহার্সাল—অত্যুৎসাহী কয়েকজন ছোকরা অফিসবাবু রিহার্সালের পর এদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য রেষারেষি করে—। বাড়ি পৌঁছুবার মাঝপথেই কখনো ঢুকে যেতে হয় কোনো রেস্তরাঁর পর্দা ঢাকা ক্যাবিনে। কিছু টাকা বেশি উপার্জন হয়! সকলে এরকম নয়। অনেকেই। এদের মধ্যে কারুর চেহারা বেশ ভালো, বিয়ে হলেও হতে পারতো, কিন্তু বিয়ে হলে পরিবারের অন্য লোকেরা না–খেয়ে থাকবে। আমি চিনি এই টাইপটা। দেখলে বুঝতে পারি। তোর সঙ্গে সান্ত্বনার কোথায় আলাপ হলো ?

হেমন্ত তখনও লুকোবার চেষ্টা করে বললো, বললাম তো— আদার আমার মামাবাড়িতে ওর সঙ্গে অনেকদিন পর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

— ফের মিথ্যে কথা বলছিস্!

হেমন্ত বললো, সান্ত্বনা থিয়েটার করে কি না আমি জানি না। কিন্তু তুই কি এখনো মনে করিস নাকি, মেয়েদের থিয়েটার করাটা অন্যায় ?

— হেমন্ত, কেন এসব করছিস পাগলের মতন ? সত্যি করে বল তো সান্ত্বনার সঙ্গে তোর কোথায় আলাপ হয়েছে ? তোর মামাবাড়িতে যে আলাপ হয় নি সেকথা আমি বাজি ফেলে বলতে পারি!

— মামাবাড়িতেই তো আলাপ হয়েছে।

— মোটেই না!

— যা, যা, আর কথা বাড়াতে হবে না। চল তো এখন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে।

— সান্ত্বনার সঙ্গে তোর কী করে আলাপ হলো আমাকে যদি না বলিস, আমি তোর সঙ্গে যাবো না।

— আচ্ছা মুশকিল তো! তোর এত কিউরিসিটি কেন ? সান্ত্বনাকে তোর ভালো না লাগতে পারে, আমার খুব ভালো লেগেছে! কি মিষ্টি মুখখানা— ব্যবহার কত সোবার—

— কোথায় আলাপ হয়েছে ?

— জ্বালিয়ে মারলি তুই! আমাদের অফিসের এক কলিগ আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমার সিনেমা লাইনের অনেকের সঙ্গে জানাশুনো আছে, আমার কাকা একটা ছবি প্রোডিউস করেছিলেন তো— তাই ভদ্রলোক ধরেছেন, যদি আমি সান্ত্বনাকে সিনেমায় একটা চান্স করিয়ে দিতে পারি। আমি সান্ত্বনার জন্য সিরিয়াসলি চেষ্টা করবো—ওকে আমার পছন্দ হয়েছে খুব, ওর জন্য একটা কিছু করা দরকার—

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, জানি! ঐ স্তোকবাক্যটুকুতেই সান্ত্বনা তোর জন্য সবকিছু করতে রাজি আছে! এইসব মেয়েদের স্বপ্ন শুধু একটা। কোনো একদিন এক দেবদূত এসে ওকে সিনেমার নায়িকা করে দেবে। তারপরই বাড়ি, গাড়ি, বোম্বে—

— চল, চল, এখন চল তো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি ?

— হেমন্ত, এসব করে কি হবে ? নিজেকে ঠকাচ্ছিস ?

হেমন্ত হঠাৎ চটে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়ালো রাস্তার রেলিং ছেড়ে। আন্তরিক রাগের সঙ্গে বললো, তুই যতই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক কথা বলার চেষ্টা করিস সুনীল, তোকে আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি! আমি মনীষাকে বিয়ে করবো না! দ্যাট ইজ ফাইন্যাল! কেন বিয়ে করবো না জানিস ? তুই জিতে যাবি বলে! বিয়ে করলে আমি হতাম মনীষার স্বামী, আর তুই চিরকাল থাকবি ওর প্রেমিক। কে না জানে, স্বামীরা একদিন এলেবেলে হেঁজিপেঁজি হয়ে যায়, আর প্রেমিকরা চিরকালই প্রেমিক থাকে। তোমাকে মোটেই আমি সে চান্স দিচ্ছি না, যতই আমাকে ভজাবার চেষ্টা করো। আমিও মনীষার প্রেমিক থাকতে চাই।

৮

এরপর বৌবাজারের মোড়ে সেইদিন সন্ধেবেলার কথা।

মনীষা সম্পর্কে আমি প্রথম ভুল করি এক মেঘলা সন্ধেবেলা। ... ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে আমাদের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে। তারিখটা মনে আছে, ১৭ই জুলাই ...।

সুবিমলের গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম আমি আর হেমন্ত। শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্যাক্সি। বৌবাজারের মোড়ে। মনীষা ওখানে একা দাঁড়িয়েছিল কেন ? আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম কেন ? আজও তার ব্যাখ্যা আমি জানি না। মনীষা পথের ওপর একলা দাঁড়িয়ে, তাকে দেখেও আমি চলে যাবো—এরকম অসম্ভব ব্যাপার আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না। হেমন্ত সঙ্গে ছিল বলেই কি ? হেমন্ত আর আমি এক সঙ্গেই তো জীবনে অনেক পুণ্য ও পাপ করেছি।

পরে হেমন্ত আর আমি দু'জনে একসঙ্গে খুঁজেছিলাম মনীষাকে। ট্যাক্সি নিয়ে তাড়া করেছিলাম বাস। পাই নি। মনীষা উধাও হয়ে গিয়েছিল।

মনীষা নাম্নী একটি মেয়েকে আমি ও হেমন্ত— আমরা দুই বন্ধু মিলে ভালবাসতাম। আমরা কেউই ওকে বিয়ে করি নি। এর মধ্যে কোনো গল্প নেই। এরকম প্রায়ই ঘটে। গল্প শুধু এই, পথের মধ্যে মনীষার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, তারপর আমরা দু'জনেই কেউ আর মনীষার দেখা পাই নি, অনেক চেষ্টা করেও। কার যেন কবিতা আছে, সম্ভবত ব্রাউনিং-এর, আউট ফল অল ইয়োর লাইফ, গিভ মি বাট আ সিঙ্গল মোমেন্ট। সেই একটি মুহূর্ত হারানোর গল্প।

মনীষাকে জাগ্রত স্বপ্নে দেখেছি বহুবার। কিন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে কিংবা অন্য কোথাও আর মনীষার সঙ্গে দেখা হয় নি। হেমন্তও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি।

হেমন্ত আর আমি পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করতে চেয়েছি, হেমন্ত মনীষার বাবাকে কিছু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু মনীষাকে তো আমরা কিছুই বলি নি কখনো। ভালবাসা বা প্রত্যাখ্যান—কিছুই না। সেই সন্ধেবেলার পর থেকে মনীষার দেখা না পাওয়াটা খানিকটা অলৌকিক মনে হয়। সকালবেলা ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনেছি, মনীষা আগের রাত্তির থেকে ওর মাসীর বাড়িতে আছে, রাত্তিরবেলা গিয়ে শুনেছি, ও নাইট শোতে সিনেমায় গেছে।

কয়েকদিন পর শুনলাম, মনীষা বেড়াতে চলে গেছে দিল্লিতে। শুনেই মনে হলো, আমারও দিল্লি না যাবার কোনো মানে হয় না। কত সুন্দর শহর দিল্লি, কতদিন দেখা হয় নি। অফিসে এখন কাজের খুব চাপাচাপি, যদি ছুটি পেতে অসুবিধে দেখা দেয়— তাহলে এক লাথি মেরে চাকরি ছেড়ে গেলেই তো হয়। ঘড়ি-কলম বিক্রি করে টাকা জোটানো যাবে, কিংবা সুবিমল ধার দেবে। দিল্লিতে গিয়ে কোথায় থাকবো ? আর কোথাও যদি থাকবার জায়গা না পাই, রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে বলবো, এত জায়গা খালি পড়ে আছে, আমাকে থাকতে দাও!

হেমন্ত বললো, তুই দিল্লি যাচ্ছিস তো ? আমার দিদি আর জামাইবাবু থাকে করোলবাগে। তুই ওখানে উঠিস, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি!

হেমন্ত আমার মনের কথাটাই বুঝে ফেলেছে বলে আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, ভ্যাট, আমি দিল্লি যাচ্ছি কে বললো ? হঠাৎ দিল্লি যাবো কেন ?

— যা না, ঘুরে আয়। এই রকম সময়ে দিল্লিতে খুব ভালো সিজন।

— আমার অফিস-টফিস নেই ? দিল্লিতে যাবো কী করে ?

— তোর তো ভারি অফিস! অফিস গুলি মার। যা, ঘুরে আয়!

— না রে, এখন দিল্লি-টিল্লি যাওয়া হবে না। কলকাতায় অনেক কাজ!

— কী কী কাজ আছে বল। আমি করে দিচ্ছি। তুই তো দিল্লিতে সেই একবার মোটে গিয়েছিলি! এখন দেখবি, অনেক বদলে গেছে। বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। আমার দিদিকে তাহলে চিঠি লিখে দিই!

— না, না! যদি যাইও, তোর দিদির বাড়িতে থাকতে পারবো না। তোর জামাইবাবুকে চিনি না—অচেনা জায়গায় থাকতে আমার খুব অস্বস্তি লাগে—

— তোর কিছু অসুবিধে হবে না। জামাইবাবু বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন না। ওদের একস্ট্রা ঘর আছে—বিছানা-টিছানা সব আছে। আমারই তো যাবার কথা ছিল সামনের সপ্তাহে— কাজেই সব ব্যবস্থা করা আছে।

— তোর যাবার কথা ছিল ? তা হলে চল্, একসঙ্গে যাই—

হেমন্ত মুচকি হেসে বললো, না আমি যাবো না।

আমি অনুনয় করে বললাম, কেন, যাবি না কেন ? চল না, অনেকদিন তুই আর আমি একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই নি।

— না, আমার যাওয়া হবে না। অফিস থেকে আমার ট্যুর প্রোগ্রাম দিয়েছিল দিল্লিতে। আমি ক্যানসেল করে দিয়েছি এখন। তার বদলে বাঙ্গালোর যাবো।

আমি ভর্ৎসনার সুরে বললাম, কেন ক্যানসেল করলি ?

হেমন্ত হাসতে-হাসতে বললো, কেন করলাম, বুঝতে পারলি না ? আমি হ্যান্ডিক্যাপ নিতে চাই না। তোর অফিস থেকে ছুটি পেতে ঝামেলা হবে, দিল্লিতে তোর থাকার জায়গা নেই, তোর হাতে টাকা-কড়ি এখন কম—এতগুলো অসুবিধে তোর। আর আমি অফিসের ভাড়ায় দিল্লি যাবো, দিদির বাড়িতে থাকবো—তার ওপর মনীষার সঙ্গে দেখা হবে—এতগুলো সুযোগ নেওয়া কি উচিত আমার ?

— তাহলে চল্, দু'জনেই একসঙ্গে যাই।

— মনীষার সঙ্গে আর কখনো আমাদের দু'জনের একসঙ্গে দেখা হবে না।

— কেন?

— এটাই আমাদের নিয়তি। আমরা মনীষাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। তুই একা চেষ্টা করে দ্যাখ্—

হেমন্ত সত্যিই বাঙ্গালোরে যায় কি না সেটা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম কয়েকদিন। তারপর সত্যিই একদিন আমি হেমন্তকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিলাম।

... কনট্ সার্কাসে একটা বইয়ের দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে, একটা উলের দোকান থেকে বেরুলো মনীষা। উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি, কনুই পর্যন্ত ঢাকা হাতার লাল ব্লাউজ, লাল চটি, লাল ব্যাগ—ওর শরীর থেকে যেন লাল গোলাপ ফুলের আভা বেরুচ্ছে। কনট্ সার্কাসের এত মানুষজন, এত ভিড়—সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেল। মনে হলো, আর কোথাও কিছু নেই—জগৎ-সংসার জুড়ে শুধু ঐ লালরঙা শাড়ি পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

হাতব্যাগ খুলে পয়সা বার করলো মনীষা। নিচু হয়ে পরম করুণায় পয়সা দিল ভিখিরিকে। আমি আগেও লক্ষ করেছি, মনীষা যখন ভিখিরিকে কিছু দেয় তখন শুধু পয়সাই দেয় না, ওর আত্মার একটা টুকরোও তুলে দেয়।

এরপর মনীষা ফলের দোকান থেকে কমলালেবু কিনলো। সেখানেও একটা বাচ্চা ছেলে এসেছে, হাত পেতেছে। মনীষা তার হাতে তুলে দিল একটা কমলালেবু। মনীষা একা। মনীষা কোন্ দিকে যায়, দেখি!

ঝপ করে ট্যাক্সি ডেকে মনীষা তাতে উঠে পড়লো। আমি দৌড়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। লোকজনের ভিড়, অন্যান্য গাড়ি—আমি পৌঁছুবার আগেই মনীষার ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে।

যাক না, দুঃখ নেই, আবার দেখা হবে। দিল্লি শহরটা এমন কিছু একটা জটিল জায়গা নয়। মনীষার পিসীমার বাড়ি শঙ্কর রোডে।

... কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি থেকে বেরুচ্ছে মনীষা। হাতে অনেকগুলো প্যাকেট। সঙ্গে ওর বাবা। এখুনি ট্যাক্সি ধরবে না, হাঁটছে। ঠিক তিরিশ গজ দূর থেকে আমি ওদের অনুসরণ করছি। মনীষার বাবা দেখলেও আমার কিছু যায় আসে না। দিল্লি ইউনিভার্সিটির এক সিমপোসিয়ামে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে। নেমন্তন্ন করতেই পারে।

ট্যাক্সি নয়, বাসে উঠলো মনীষা! মনীষার বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি এখন ফিরবেন না। প্রায় ওঁকে ঠেলেই আমি দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়লাম। মনীষার পাশে আমার জন্য তো খালি জায়গা থাকবেই!

মনীষা ভুরু তুলে হাস্যময় মুখে বললো, এই, তুমি কবে এলে?

— মনীষা, আজই এসেছি আমি। ট্রেন থেকে নেমেই তোমাকে খুঁজছি।

— ভ্যাট! তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

— কিচ্ছু আনি নি। শুধু একটা সুটকেস—সেটা স্টেশনের লেফট লাগেজে—

— সত্যি-সত্যি তুমি আজই এসেছো!

— হ্যাঁ, সত্যিই। বলতে গেলে এই মাত্র।

— বাইরে কোথাও এসে চেনা কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব ভালো লাগে, তাই না?

— আমি শুধু একজনের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।

— তুমি কোথায় থাকবে ? আমার পিসীমার বাড়িতে থাকবে ? জায়গা আছে। পিসীমা খুব ভালো লোক—

— না, না আমি হোটেলে উঠবো। তোমাকে না পেলে আজই ফিরে যেতাম।

— কেন, হঠাৎ দিল্লিতে এসেছো কেন ? কোনো কাজ আছে বুঝি ?

— শুধু তোমাকে দেখতে। এই ক'দিনেই আরও কি সুন্দর হয়েছো তুমি—

সঙ্গে-সঙ্গে মনীষার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, অনুভাদির খবর শুনেছো ?

— না তো। কী হয়েছে ?

— অনুভাদি মারা গেছেন। কাল বৌদির চিঠি পেলাম—আমার এত মন খারাপ লাগছে!

আমি মনীষার একটা হাত তুলে নিয়ে সামান্য চাপ দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে কারুর মৃত্যু সংবাদ না শুনলেই ভালো হতো। আমি মনীষার রূপের প্রশংসা করেছি তো, তাই ও মৃত্যুর প্রসঙ্গটা তুললো হঠাৎ। পৃথিবীতে এরকম মেয়ে আর আছে ?

— মনীষা, এখন বাড়ি ফিরে কী করবে ?

— কেন বলো তো ?

— এখন তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না। তুমি এখন আমার সঙ্গে থাকবে।

— হাতে এত জিনিসপত্তর রয়েছে যে ?

— প্যাকেটগুলো বাড়িতে রেখে এসো। এগুলো সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় না। তারপর আমরা খুব বেড়াবো। এসো, বাস ছেড়ে দিয়ে ট্যাক্সি নিই—

— এই তো এসে গেছে আমাদের বাড়ি।

মনীষা জোর করে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। মনীষার তো মনে কোনো গ্লানি নেই। ওর পিসীমাকে ডেকে বললো, পিসীমণি, এই হচ্ছে সুনীলদা! চেনো না ? তুমি তো কিছু বাংলা বইটই পড়ো না। অবশ্য সুনীলদার লেখা পড়লেও তোমার ভালো লাগতো না। সুনীলদা খুব খারাপ-খারাপ লেখে। কেন যে ছাপা হয় ওসব। পিসীমণি, আমি সুনীলদার সঙ্গে বেরুচ্ছি!

— মনীষা, আমি লালকেল্লায় সন-এ-এ-লুমিয়ের দেখি নি।

— আমি দেখেছি।

— তুমি আমার সঙ্গে আবার দেখবে না ?

— আমি কখনো কুতুব মিনারের ওপরে উঠি নি।

— আমি উঠেছি একবার। আবার তোমার সঙ্গে উঠবো।

— আমরা কাল ওখলা গিয়েছিলাম।

— আজ তুমি আর আমি আবার যাবো।

— আচ্ছা, তুমি কখনো মহাত্মা গান্ধীর সমাধির সামনে দাঁড়িয়েছো ? মনটা কিরকম অন্যরকম হয়ে যায় না ?

— আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো। এসো আজ গান্ধীর সমাধিতে গিয়ে ফুল দিই। যদিও আমি একটুও গান্ধীভক্ত নই।

— হুমায়ুনস্ টুম-এ গেলে মনে হয় না, সারাদিন ওখানেই বসে থাকি ?

— আজ সারাদিন ওখানেই বসে থাকবো।

— সুনীলদা, তুমি দিল্লিতে আর ক'দিন থাকবে ?

— যে ক'দিন তুমি আছো। মনীষা, আমরা শুধু বেড়াচ্ছিই, কোনো কথা বলা হচ্ছে না। অনেক কথা আছে—

— বাঃ, আমরা কি এই ক'দিন বোবা হয়েছিলাম ?

— এই ক'দিন মানে ? তোমার সঙ্গে আমার এই তো কয়েক মিনিট আগে দেখা হলো!

— এই তিনদিন ধরে যে এত জায়গায় বেড়ালাম ? লালকেল্লা, ওখলা, গান্ধীঘাট। কিন্তু এই হুমায়ুনের সমাধিটাই আমার সবচেয়ে সুন্দর লাগে!

— মনীষা, তোমার সঙ্গে একটাও কথা বলা হয় নি।

— তাহলে এতক্ষণ ধরে কে বকবক করলো ? সব বুঝি আমিই বলেছি ?

— আরো অনেক কথা আছে। মনীষা, তোমার হাতটা দাও তো। কি সুন্দর গন্ধ তোমার হাতে। মনীষা, এসো, এখানে একটু দৌড়োই। দৌড়োবে ?

— হ্যাঁ। এক্ষুনি। রেস দেবে ? তুমি পারবে আমার সঙ্গে! দেখি তো—

— না, রেস নয়। হাতে হাত ধরে। হাতে হাত ধরে ছোটার মধ্যে ভীষণ একটা খুশির ব্যাপার আছে। আমার এত ভালো লাগছে—

— এসো, আমরা হুমায়ুনের সমাধির চারপাশটা দৌড়ে আসি।

— মনীষা, হুমায়ুনের মতন তোমার যদি কখনো অসুখ করে, আমি আমার জীবনীশক্তি দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবো।

— এই যাঃ! বৃষ্টি এসে গেল! আমরা কিন্তু ভিজবো—

— মনীষা, এখানে কেউ নেই। তোমার কানে-কানে একটা কথা বলবো ?

— কানে কু দিয়ো না কিন্তু বলছি—

— মনীষা, সেদিন বৌবাজারের মোড়ে

— সুনীলদা, তোমার পকেট থেকে সব পয়সা পড়ে গেল!

— পড়ুক! মনীষা, আমাকে ক্ষমা চাইতে দাও! সেদিন বৌবাজারের মোড়ে তোমাকে দেখেও...

— তুমি আগ্রা দেখেছো ? আমি ফতেপুর সিক্রি যাই নি।

— তোমাকে দেখেও আমি...

— এখানে ফুল ছিঁড়লে কেউ বোধহয় কিচ্ছু বলবে না। ঐ রঙিন ফুলের একটা থোকা এনে দাও না আমাকে—

— আঃ, তোমাকে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি, তুমি শুনছো না কেন ?

— শুনছি তো!

— আচ্ছা, থাক ওসব কথা। চলো, আমরা এক্ষুনি তাজ এক্সপ্রেসে চেপে আগ্রা চলে যাই, ওখান থেকে ফতেপুর সিক্রি। তুমি যা যা দেখ নি, তোমাকে সব দেখাতে চাই। আমার কাছে অনেক টাকা—

— আমি তো কত জায়গা দেখি নি।

— তোমাকে সব জায়গায় নিয়ে যাবো। সারাজীবন এই রকম বেড়িয়ে বেড়ালে কী রকম হয় ?

— আমি রাজি। সারা জীবন ? পারবে ?

— কেন পারবো না ? যদি টাকা ফুরিয়ে যায়—একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করলেই তো হয়। খুব শক্ত নয়—তোমার পিসেমশাই তো জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার। ওঁর সারভিস রিভলভারটা কয়েক ঘণ্টার জন্য লুকিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না ?

— তারপর কি হবে ?

— আমি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরবো কোনো ব্যাঙ্কের কাউন্টারে। তুমি মুখে একটা কালো মুখোস পরে একটা থলিতে সব টাকাগুলো ভরে নেবে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাড়া করা কালো অ্যামবাসেডর !

— আমিও তো অ্যাকমপ্লিস হয়ে যাবো। তারপর ধরা পড়লে ?

— ধরা পড়ে তুমি আর আমি জেলখানার এক ঘরে থাকতাম। সেটাও তো এক রকমের বেড়ানো।

— জেলে বুঝি এক ঘরে থাকতে দেয়!

— দেয় না বুঝি ? তাহলে তো মুশকিল। একমাত্র বিয়ে নামক জেলখানাতেই একসঙ্গে থাকা যায়। তবে কি আগেই সেই জেলখানা—

মনীষা আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে হাসতে-হাসতে বললো, ভ্যাট! তোমাকে কে বিয়ে করবে ? তুমি একটা পাগল!

— আমি পাগল ? তাহলে পৃথিবীতে একটাও সুস্থ মানুষ নেই। তাছাড়া আমিও তো তোমাকে মোটেই বিয়ে করতে চাই না !

— ভাগ্যিস! তাহলে মহা মুশকিল হতো।

— কিসের মুশকিল ?

— তোমাকে বিয়ে করা কিংবা বিয়ে না করা।

— তার মানে ?

— কিছু মানে নেই।

— মনীষা, তুমি ভীষণ আজকাল রহস্য করে কথা বলো।

— তাহলে এসব কথা না তুললেই হয়!

— আমাকে একটু আদর করতে দেবে ? আমি তোমাকে একটু আদর করবো।

— এই রঙ্গন ফুলের থোকাটা আমার খোঁপায় গুঁজে দাও।

— তাকাও আমার দিকে। দেখি তোমাকে ভালো করে। তোমার চোখ দুটো কত সুন্দর আমি জানি না। কিন্তু কি অসম্ভব সুন্দর তোমার এই রকম চেয়ে থাকা। এই রকম হাসি মাখানো চোখের দৃষ্টি আমি আর কখনো দেখি নি।

— আকাশের দিকে তাকাও! শিগগিরই দারুণ ঝড় উঠবে!

— মনীষা, সেদিন বৌবাজারের মোড়ে আমি ভুল করেছিলাম বলেই কি—

— আমি কান চাপা দিয়ে আছি। খুব জোরে কান চেপে থাকো, কী রকম বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়—

আবু হোসেনের স্বপ্ন। আমি দিল্লিতে সত্যিই গিয়েছিলাম বটে, মনীষার সঙ্গে দেখা হয় নি। উঠেছিলাম কালীবাড়িতে। মনীষার পিসীমার খোঁজ করেছিলাম। মনীষারা তখন হরিদ্বার চলে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। আমিও গিয়েছিলাম হরিদ্বার। তবু দেখা হলো না। হৃষীকেশ, লছমনঝোলা পর্যন্তও গেছি—মনীষা নেই। এমনও হতে পারে, আমি যেদিন হরিদ্বারে ওরা সেদিন লছমনঝোলায়। আমি যখন লছমনঝোলার পথে, ওরা তখন ফেরার ট্যাক্সিতে আমার পাশ দিয়েই চলে গেছে—আমি দেখতে পাই নি। মনীষা তো জানতো না, আমি ওকে অনুসরণ করছি। সুতরাং ওর পালিয়ে বেড়াবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হেমন্ত বলেছিল, এটাই আমাদের

নিয়তি।

দিল্লি ফিরে শুনলাম, ওরা আবার অমৃতসর হয়ে সিমলার দিকে গেছে। বাধ্য হয়ে আমাকে কলকাতায় ফিরতে হলো। মনীষার খোঁজে তো আমি সমস্ত উত্তর ভারত চষে বেড়াতে পারি না।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলো, কি রে, দেখা পেলি ?

মিথ্যে কথা বলতে পারতাম। কিংবা স্বপ্নের কথা। কিন্তু হেমন্তর কাছে এখন তা আর বলা যায় না। হেমন্ত আমার থেকে ওপরে উঠে গেছে। ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

হেমন্ত মন দিয়ে আমার কথা শুনলো। তারপর বললো, কতদিন আর ঘুরে বেড়াবে। কলকাতায় তো ফিরতেই হবে। তবে অরুণের কাছে শুনলাম, ওর বাবা লিখেছেন সিমলায় নাকি একটি চমৎকার ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। যাক গে, শোন, একটা দরকারি কথা আছে—

ঝট করে ড্রয়ার খুলে হেমন্ত একটা ব্র্যান্ডির বোতল বার করলো। চোখের ইসারায় জিজ্ঞেস করলো, খাবি ?

আমি বললাম, কী ব্যাপার রে ? তুই আজকাল অফিসে এইসব রাখতে শুরু করেছিস ?

— আরে ধুৎ! চোর কম্পানির অফিস, কে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় ? দুপুরের দিকে একটু না খেলে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে।

— হেমন্ত, তুই আজকাল বড্ড বেশি খাচ্ছিস!

হেমন্ত হা-হা করে হেসে বললো, দেবদাস হয়ে যাবো ? দেবদাস। মাইরি ক'দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, এর মধ্যে সান্ত্বনাও কেটে পড়েছে!

চশমাটা খুলে হেমন্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। পুরু চশমা যারা পরে, চশমা খুললে তাদের মুখটা হঠাৎ কী রকম অসহায় দেখায়।

খানিকটা আপনমনেই বললো, চৌতিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেল। আবার যদি কেউ আঠারো বছর বয়েসটা ফিরিয়ে দিত, সম্পূর্ণ নতুনভাবে জীবনটা শুরু করতাম। মানুষের জীবনের একটা কিছু উদ্দেশ্য থাকা দরকার। আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই।

— তুই যে কি দরকারি কথা বলবি বলছিলি ?

— ও হ্যাঁ। এবার ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম একটা বিশেষ মতলোব নিয়ে, সেটা খুব সাকসেসফুল হয়েছে। কম্পানি আমাকে ছ'মাসের জন্য বিলেত পাঠাচ্ছে!

আমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি হেমন্তর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

— এজন্য বড়-বড় সাহেবদের খুব তেল দিতে হয়েছে। ব্যাটারা কিছুতেই রাজি হতে চায় না। নিজেরা সবাই বছরে একবার করে যায়, শুধু আমার বেলাতেই কিপ্টেমি!

— তুই বিলেত যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে গেলি কেন ? একবার তো গেছিস আগে।

— আরে বিলেত কি পুরোনো হয় ? যতবার যাওয়া যায়—ছ'মাসের জন্য আপাতত পাঠাচ্ছে, যদি আরও ছ'মাস বাড়াতে পারি—

আমি চুপ করে বসে রইলাম। হেমন্ত লুকিয়ে ব্র্যান্ডির বোতলে চুমুক দিয়ে ঠোঁট মুছলো। তারপর কৌতুক করে বললো, কি রে, তোর হিংসে হচ্ছে আমি বিলেত যাচ্ছি বলে ?

হঠাৎ দপ করে আমার মেজাজ চড়ে গেল। হিংস্রভাবে তাকিয়ে বললাম, শালা, তোর বিলেতে আমি পেচ্ছাব করে দিই। কিন্তু তুই পালাচ্ছিস। তুই মনীষার কাছ থেকে পালাচ্ছিস।

— আস্তে আস্তে! এটা অফিস। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। এত মেজাজ খারাপ করছিস কেন ?

আমি উঠে বললাম, তোকে আমি যেতে দেবো না। এটা আনফেয়ার।

হেমন্ত টং টং করে বেল বাজালো। বেয়ারা এসে উঁকি মারতেই বললো, এই সাহেবের জন্য

কফি নিয়ে এসো। আর সিগারেট দিয়ে যাও এক প্যাকেট।

আমি আবার ধপ করে বসে পড়লাম।

হেমন্ত ব্যস্ত ভঙ্গি করে বললো, ও–রকম মাথা গরম করিস নি। অনেক কাজের কথা আছে। যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে আমার। তোর একটা ওভারকোট আছে না? সেটা দিবি আমাকে। একটা ভালো চামড়ার সুটকেস কিনতে হবে—

আমি এবার অনুনয় করে বললাম, হেমন্ত, তুই সত্যিই কেন চলে যাচ্ছিস বল্ তো? যদি যেতেই হয়, মনীষাকে বিয়ে করে ওকে সঙ্গে নিয়ে যা। মনীষা বেড়াতে খুব ভালবাসে।

হেমন্ত বললো, সুনীল, তোর জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। তোর তো বিলেত যাবার সুযোগ নেই। তুই মনীষাকে বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবি না!

— আমি পারলেও মনীষাকে নিয়ে যেতাম না। আমি তো ওকে বিয়ে করছি না। তুই পারিস।

— তা আর হয় না। মনীষাকে আমি দিয়ে দিয়েছি তোর হাতে। তুই–ও ওকে পাবি না জানি। কিন্তু তুই কষ্ট তো পাবি। সেই কষ্টটুকু তোর নিজস্ব থাকুক।

৯

ধর্মতলার মোড়ে অরুণের সঙ্গে দেখা। আমি দেখতে পাই নি, অরুণ পেছন থেকে আমার পিঠে একটা ঘুষি মেরেছে। দম বন্ধ করে আমাকে সেই ব্যথা সামলাতে হলো। অরুণের জামা–প্যান্ট সব ভেজা। খেলার মাঠ থেকে ফিরছে। বললো, অনেকদিন আমাদের বাড়িতে আসিস না কেন? চল, আজ চল!

আমি বললাম, তোরও তো আজকাল পাত্তা পাই না। যাস না তাসের আড্ডায়? চল, কোথাও বসে একটু চা খাই।

— জামা–প্যান্ট যে ভিজে ঢোল। বাড়ি যেতে হবে।

— ঠিক আছে, যা তা হলে, পরে দেখা হবে।

— তুই আসছিস না কেন আমাদের বাড়ি? সুজয়া বলছিল—

আমি বাড়ি বদল করেছি। অরুণদের বাড়ি বেশ দূরে বলে আর যাওয়া হয় না। অবশ্য আগে সারা কলকাতা চষে বেড়াতাম—এই শহরটাকে খুব ছোট মনে হতো।

— যাবো, শিগগিরই যাবো একদিন।

— আজ চল না! মধুবন এসেছে, ওর সঙ্গে দেখা হবে।

মুখের রেখা আমার একটাও পাল্টায় না। সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করি, মনীষা এসেছে নাকি? কবে এলো?

— এই তো পরশুদিন, থাকবে এখন কিছুদিন। ওর বাচ্চা হবে।

— তাই নাকি? এক্সপেকটেড ডেট কবে?

— এই তো অগাস্টেই।

— কোন্ নার্সিংহোমে দিবি? দেখতে যাবো এখন!

— আজই চল না।

— না, আজ নয়। মনীষাকে বলিস, দেখা করবো!

— মধুবন এসেই জিজ্ঞেস করছিল তোর কথা। তুই নাকি কি একটা গল্প লিখেছিস, তাতে ওর নাম দিয়ে দিয়েছিস? দেখা হলে তোকে দেবে এক চোট। আমি অবশ্য আজকাল কিছুই পড়ার সময় পাই না।

— তোকে পড়তেও হবে না।

— কবে আসছিস ?

— যাবো কাল–পরশু।

না, দেখা করবো না আসলে। মনীষাকে আমি দেখতে চাই না। মনীষা হারিয়ে গেছে। এখন কত কাজে ব্যস্ত থাকি, মনীষার কথা তো প্রায় মনেই পড়ে না। এখন ফর্সা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেই রুমালটা ময়লা হয়ে যায়।

সময় অনেক বদলে গেছে। আমি আর এখন কথায়–কথায় চাকরি ছাড়ি না। বন্ধুরা ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে। মনীষার কথা কখনো সখনো মনে পড়ে। রাস্তায় কোনো আলাদা ধরনের রূপসী দেখলে মনে হয়, এই বুঝি মনীষা।

বাচ্চা হবার আগে মনীষার কি রকম চেহারা হয়েছে জানি না। আমার সেটা দেখার দরকারও নেই। আমার চোখে শুধু ভাসে ওর সেই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে থাকা—সেই অমর চিরকালীন দৃশ্য।

মনীষার বিয়ের দিন ওকে বলেছিলাম, তুমি আমাকে সারাজীবন দুঃখ দেবে। মনীষা ওর সুবর্ণ কঙ্কণপরা হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল, যাঃ, ও কথা বলতে নেই, আমি একটা সামান্য মেয়ে—

বিয়ের দিন বড্ড বেশি সেজেছিল মনীষা। কিংবা ওকে সাজিয়ে দিয়েছিল জোর করে। ব্যাপারটা আমার চোখে লেগেছিল এইজন্য, মনীষাকে আর কোনোদিন আমি বেশি সাজতে দেখি নি। লগ্ন শুরু হতে তখনও অনেক দেরি ছিল, সম্পূর্ণ সাজগোজ করে একটা সিংহাসনের মতন চেয়ারে বসে ছিল মনীষা, চারপাশে অনেক মেয়ে। বিয়ে আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত আমি থাকবো না, তাই আগেই ওকে একটু উঁকি মেরে দেখে যেতে এসেছিলাম। মনীষা ডেকেছিল হাতছানি দিয়ে।

কাছে যেতেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হেমন্তদা আসেন নি ?

— হেমন্ত তো নেই এখানে। ও তো বিলেত চলে গেছে!

— ওর ঠিকানাটা দিও তো।

— দেবো।

— এতোদিন তোমার দেখা পাই নি কেন ?

বিয়ে আরম্ভ হবার একটু আগে তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না, সেই একদিন সন্ধেবেলা বৌবাজারের মোড়ে তুমি একলা দাঁড়িয়ে ছিলে কেন ? তোমাকে দেখার পরও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম—সেজন্য কি তুমি রাগ করেছো ?

বললাম, আমিও তো তোমার দেখা পাই নি। তুমি কতোসব জায়গা ঘুরে এলে।

মনীষাকে বলি নি, আমি ওর খোঁজে দিল্লি গিয়েছিলাম। হরিদ্বার–লছমনঝোলা পর্যন্ত ছোটাছুটি করেছি। ওসব আর বলা যায় না।

মনীষা বললো, তুমি আজ সারারাত থাকবে কিন্তু—

— না ভাই ? আমি একটু আগে–আগেই চলে যাবো।

— তুমি যদি চলে যাও, তাহলে আমি ভীষণ রাগ করবো—

ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম। অত সাজপোশাক করে মনীষা খুব ঘামছিল। আমরা একটুক্ষণের জন্য এসে দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়।

তিনতলায় সেই ঘর, যেটা মনীষার নিজের শোওয়ার ঘর। এই ঘরেই আজ বাসর হবে। লক্ষ করে দেখলাম, সেই তিন–চাকার সাইকেলটা নেই, কেউ সেটা সরিয়ে নিয়েছে। আমি

একদিন স্বপ্নের মধ্যে এই বারান্দা দিয়ে মধ্যরাত্রে মনীষার ঘরে ঢুকেছিলাম। আজ মধ্যরাত্রে এই ঘরে সত্যি-সত্যি একজন অন্য পুরুষ আসবে।

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, তুমি আমাকে সারাজীবন দুঃখ দেবে।

মনীষাকে আমি কোনোদিন প্রণয়ের কথা বলি নি। ওর বিয়ের রাত্রে শুধু বলেছিলাম ঐ দুঃখের কথা।

চন্দনের ফোঁটায় সাজানো মনীষার মুখখানা বিহ্বল হয়ে গেল। অস্ফুটভাবে বললো, যাঃ, ওকথা বলতে নেই। আমি একটা সামান্য মেয়ে—

আমি বললুম, তুমি তো বিয়ের পরই লক্ষ্মৌ চলে যাচ্ছো। এরপর আর বহুদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

— কেন দেখা হবে না ? আমি তো প্রায়ই কলকাতায় আসবো। তাছাড়া তোমরা লক্ষ্মৌ বেড়াতে যাবে না ?

— না।

— কেন ?

— তুমি এবার ভেতরে যাও। তোমাকে কারা যেন ডাকছেন !

আমি চলে আসতে চাইছিলাম। মনীষা তবু আমার হাত ধরে রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে ?

— কার সঙ্গে ? দীপঙ্করের সঙ্গে তো ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। চমৎকার ছেলে। এত ভদ্র ও বুদ্ধিমান ছেলে খুব কম দেখেছি আমি !

সত্যি, মনীষার স্বামী অসাধারণ ভালো। প্রেমিকার স্বামীকে অপছন্দ করাই নিয়ম। কিন্তু দীপঙ্করকে কিছুতেই ভালো না লেগে যায় না। অত্যন্ত বিনীত অথচ ন্যাকা নয়। প্রখর রসিকতাবোধ আছে। চরিত্রে কোনো মালিন্য নেই।

সিমলায় স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের কাছে মনীষার বাবার হঠাৎ স্ট্রোকের মতন হয়। বিকেলবেলা বেড়াতে-বেড়াতে। কাছেই ছিল দীপঙ্কর। দীপঙ্করের সঙ্গে আগেই ওদের আলাপ হয়েছিল। দীপঙ্করের জন্যই সেবার মনীষার বাবা বেঁচে যান। তিনদিন জ্ঞান ছিল না—সেই সময় দীপঙ্করই যাবতীয় বড়-বড় ডাক্তার এনে হাজির করে—বরুণদা ও অরুণকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। টেলিগ্রাম পাবার পর ওরা গিয়ে পৌঁছুতে যে সময় লেগেছিল—তার মধ্যে দীপঙ্কর না থাকলে কী হতো বলা যায় না। মনীষা একলা আর কতটাই বা করতে পারতো !

সেরে উঠে মনীষার বাবা দীপঙ্করের কাছে মানসিকভাবে প্রায় ক্রীতদাস হয়ে গেলেন। হওয়াই স্বাভাবিক। তারপর সেই উপকারী, বিনয়ী, অবিবাহিত যোগ্য ছেলেটির সঙ্গে মনীষার বাবা যদি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন, তাতেও কোনো দোষ দেওয়া যায় না। এতে কারুর আপত্তি করার কথাও নয়। দীপঙ্করেরা দু'তিন পুরুষ দিয়ে লক্ষ্মৌয়ের প্রবাসী বাঙালি। অবস্থাপন্ন, দীপঙ্কর নিজেও বেশ সুশ্রী এবং ভালো চাকরি করে। অত্যন্ত শুভ যোগাযোগ।

আমিও এই ব্যাপারটাতে আশ্চর্য হই নি। কারণ আমি জানতাম, বৌবাজারের মোড়ে সেই এক মুহূর্তের ভুলে আমি মনীষাকে চিরকালের মতন হারিয়েছি। কেন সেই রকম ভুল করেছিলাম জানি না।

বিয়ের পর লক্ষ্মৌ চলে গিয়েছিল মনীষা। দু'মাস বাদেই একবার ফিরেছিল। সেবার আমি দেখা করি নি। মনীষার সুখী বিবাহিত জীবনে আমার পক্ষে মাথা গলানো এখন একটা কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার। এসব আমি করতে পারি না। মনীষার সঙ্গে দেখা হলেই হয়তো আমি দুর্বল হয়ে

পড়বো। দেখা না করাই ভালো।

— এই সুনীল, তুই মধুবনকে দেখতে গেলি না ?
— কোন নার্সিং হোমে আছে যেন ? ক'নম্বর ক্যাবিনে ?
— নার্সিং হোম থেকে তো বাড়ি চলে এসেছে! ওর একটা ছেলে হয়েছে।
— এর মধ্যে বাড়ি চলে গেল ? ছেলে? বাঃ, খুব সুখবর! ক' পাউন্ড ওজন ?
— সাত পাউন্ড।
— বেশ নর্মাল তার মানে। দু'জনেই ভালো আছে তো! মিষ্টি–ফিষ্টি খাওয়ানো হবে না ?
— তুই আয় একদিন আমাদের বাড়িতে। আজই চল—মধুবন বলছিল তোর কথা।
— আজ নয়। কাল ঠিক যাবো। ও তো আরও থাকবে কিছুদিন ?
— এখনও মাস দেড়েক আছে।
— মধুবনকে বলিস, আমি হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম বলে নার্সিং হোমে যেতে পারি নি। ও ফিরে যাবার আগে একবার দেখা করে আসবো।
— আমরা ভাবছি একবার লক্ষ্ণৌ ঘুরে আসবো। তুই যাবি ? চল্ না।
— গেলে মন্দ হয় না।

যাই নি। সেবারও যাই নি একদিনও। ভদ্রতা রক্ষা করে অন্তত নার্সিং হোমে যাওয়া উচিত ছিল একবার। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে মনীষার অন্যরকম চেহারা। মাতৃমূর্তিতে মনীষাকে দেখার ইচ্ছে একটু–একটু হয়েছিল। যাকে ভালবাসি, তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখলেও ভালো লাগে। হেমন্ত থাকলে যেতাম। দু'জনে একসঙ্গে। একা যাওয়া যায় না।

— এই সুনীল, মনীষা চিঠি লিখেছে। তোকে বলেছে ওর ছেলের জন্য নাম ঠিক করে দিতে।
— নাম আমি কি করে ঠিক করবো?
— বাঃ, তোরা লেখকরাই তো নাম–টাম দিস।
— তাহলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস কর।
— তোকে নাম দিতে বলেছে, অথচ তুই বলছিস অন্যদের কথা!
— আমার দ্বারা হয় না ওসব। কত বড় হয়েছে মনীষার ছেলে ? কথা বলতে পারে ?

অরুণ বললো, বছর দেড়েক হয়ে গেল। খুব কথা বলে। যা দুষ্টু হয়েছে না! আমরা লক্ষ্ণৌ গিয়ে সাতদিন ছিলাম—সবসময়টা তো ওকে নিয়েই কেটে গেল। তারপর ওখান থেকে সবাই মিলে রাজস্থান ঘুরে এলাম। তুই গেলি না কেন আমাদের সঙ্গে ?

— আমি যে তখন দারুণ ব্যস্ত ছিলাম।
— তুই আজকাল খুব ব্যস্ত মানুষ হয়েছিস, তাই না ?

হেমন্ত চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে, মনীষা কি লন্ডনে গেছে? কয়েকদিন আগে পিকাডেলি সার্কাসে চলন্ত ট্যাক্সিতে ও অবিকল মনীষার মতন একটি বাঙালি মেয়েকে দেখেছে। মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল! হেমন্ত আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করেও ধরতে পারে নি।

মনীষা লন্ডনে যায় নি। হেমন্তও লন্ডনে বসে মনীষার স্বপ্ন দেখছে।

— এই সুজয়া, কোথায় যাবে ?

সুজয়া মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর বললো, তবু ভাগ্যি চিনতে পারলেন! কতদিন দেখা নেই! আর তো আসেনই না—

— বড্ড দূর হয়ে গেছে।

— বাজে কথা। আপনি আমাদের ওদিকে কখনো আসেন না ? অবশ্য আমাদের বাড়িতে আর আসবেনই বা কেন ? আকর্ষণ তো নেই কিছু ?

— তুমিই তো মস্ত বড় আকর্ষণ।

— থাক খুব হয়েছে। আমি সব জানি, আপনি একটা কী রকম যেন! মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। যাক শুনুন, এবার একদিন আসবেন ? মধুবন এসেছে !

— মনীষা আবার এসেছে ?

— কেন, ও এলে আপনার অখুশি হবার কারণ আছে নাকি? বাপের বাড়ি আসবে না ?

— না, তা বলছি না। এই তো সেদিন গেল!

— সেদিন কোথায় ? ন'মাস আগে। সেবার তো বেচারা বাড়িতেই বন্দী হয়েছিল। কোথাও যেতে পারে নি। এবার একটু বেড়াবে! আপনি কি আপনার বাড়িতে একবার নেমন্তন্ন করতে পারেন না ?

— কাকে ?

— আমাকে না হয় নাই করলেন। মধুবনকেও তো একদিন নেমন্তন্ন খাওয়াতে পারতেন। ঠিক আছে, নেতন্তন্ন না করলেও আমরা এমনিই একদিন গিয়ে উপস্থিত হবো।

— আমাকে তো বাড়িতে পাবে না। আমি তো বাড়িতে থাকিই না!

— তার মানে যেতে বারণ করছেন তো। অদ্ভুত আপনি।

সুজয়া আর দু'তিনজন মহিলার সঙ্গে নিউ মার্কেটে এসেছিল। বেরিয়ে ট্যাক্সি পাচ্ছে না। বিকেলবেলা অফিস–ছুটির সময়। এখন ট্যাক্সি ধরে দেওয়া আমারই দায়িত্ব।

অন্য মহিলাদের একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে সুজয়া আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। খুব সিরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি আজও বিয়ে করলেন না ?

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, তুমি এখনও আমার বিয়ের ঘটকালির কথা ভাবছো নাকি ?

— মোটেই না। আমার হাতে আর পাত্রী নেই। একজনই ছিল—তাকে তো আপনি বিয়ে করলেন না।

— একজন ছিল ? কে বলো তো ?

— আ–হা–হা! জানেন না ? ন্যাকা! আপনি সত্যিই ন্যাকা—মনের কথাটা কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেন না ?

আমি চুপ করে রইলাম। সুজয়া বললো, থাক গে, মধুবন নেই—তার জন্য আপনি আমাদের বাড়িতে আসাও ছাড়বেন ? নাকি ভয় পান—হঠাৎ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! আপনি এখন মধুবনের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পান, তাই না ?

কলকাতা শহরটা ছোট। একদিন দেখা হয়েই যায়। মনীষার সঙ্গে কোনোদিন দেখা করবো না—এমন প্রতিজ্ঞাও তো আমি করি নি। এমনিই মনে হয়, না দেখা হওয়াই ভালো। শুধু–শুধু এক ধরনের দুঃখ পাওয়া।

রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ের কাছে অরুণ হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। সেদিনের সেই কিল মারার শোধ নেওয়া হয় নি। পেটে চালালুম এক ঘুষি।

অরুণ মুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর বললো, দেরি হয়ে যাবে। অলরেডি শো আরম্ভ হয়ে গেছে।

— কোথায় যাচ্ছিস ?

— মুক্তাঙ্গনে একটা থিয়েটার দেখতে।

— কী বই ?

— নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র। খুব ভালো হয়েছে শুনছি। মধুবন আমাদের দেখাচ্ছে। মধুবনের জন্য আমাদের অনেক থিয়েটার দেখা হয়ে গেল। ও সবক'টা দেখে যাচ্ছে।

— ঠিক আছে যা।

— চল, তুই যাবি ? টিকিট পাওয়া যাবে কিনা জানি না অবশ্য। চল না গিয়ে দেখা যাক।

— না, অমি দেখবো না। তুই যা।

— আরে চল্ না। কতক্ষণের আর ব্যাপার।

— না ভাই, আমার অন্য কাজ আছে এ পাড়ায়, এখন থিয়েটার দেখতে পারবো না।

— আমারও থিয়েটার-ফিয়েটার অত ভালো লাগে না। কিন্তু সুজয়াকে জানিস তো না গেলে এমন কাণ্ড করবে।

— তাহলে আর দেরি করছিস কেন ?—

অরুণ চলে যাবার পর আমার মনটা উসখুস করতে লাগলো। মনীষা এত কাছে আছে, তবু একবার দেখা হবে না ? শুধু একটু চোখের দেখা। অন্য কোনো সময় এরকম মনে হয় নি। এখন এত কাছে আছে বলেই মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই তো আর কয়েক পা গেলেই মুক্তাঙ্গন—তবু আমি দূরে চলে যাবো ? মনীষা শুনলে অপমানিত বোধ করবে না ? মনীষাকে অপমান করার অধিকার আমার নেই। আমি তো অনায়াসেই মুক্তাঙ্গনে গিয়ে একটা টিকিট কেটে ঢুকে পড়তে পারি। যদি হাউসফুল হয়, টিকিট না পাওয়া যায়, তবুও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খবর পাঠিয়ে ভেতরে ঢোকা খুব বোধহয় শক্ত হবে না। যাবো ? গিয়ে মনীষার পিঠে অজান্তে একটা কিল মেরে বলবো, এই খুকী !

কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না কোনটা আমার পক্ষে বেশি উচিত, যাওয়া বা না-যাওয়া, সেটা বুঝতে পারি না। হঠাৎ টের পাই, যেন আমার চারপাশে রাশি-রাশি নীল জল।

— কখন শো শেষ হবে ?

গেটের কাছে দাঁড়ানো লোকটি বললো, সাড়ে ন'টা।

এখন সাড়ে সাতটা বাজে। এখন আর ভেতরে ঢোকা যায় না। নাটকের মাঝখানে ঢুকলে অন্যদের ডিসটার্ব করা হবে। শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। আরও দু'ঘণ্টা কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানায় ঢুকে হেমন্তকে টেলিফোন করলাম। হেমন্ত ফেরে নি। বিলেত থেকে ফিরেছে তিন মাস আগে, কিন্তু এখন আবার কলকাতার বাইরে। হেমন্তকে পেলে অনেক সুবিধে হতো। হেমন্ত সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মনীষা এত কাছে, বসে-বসে থিয়েটার দেখছে। আমার এখন মনীষার সঙ্গে দেখা করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে হেমন্তকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়।

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় ফিরে এলাম মুক্তাঙ্গনের সামনে। শো একটু আগেই ভেঙেছে। বেশ কিছু লোক বেরিয়ে গেছে। মনীষারাও যদি চলে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধাবো। আমি যখন ফিরে এসেছি, তখন মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হতেই হবে। সব ব্যাপারটা আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। সাড়ে ন'টার সময় শো শেষ হবার কথা—তার পাঁচ মিনিট আগেই যদি ভেঙে যায়, আমি তার কি জানি! আমি গেটের কাছ থেকে কিছুটা দূরে বকুল গাছের নিচে দাঁড়ালাম।

না, ঐ তো মনীষা আসছে। সঙ্গে আছে সুজয়া, সীমা বৌদি, ঊষাদি আর অরুণ। দীপঙ্কর নেই।

... কাছাকাছি আসতেই আমি ডাকলাম, এই মনীষা!

মনীষা চোখ তুলে খুঁজতে লাগলো। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে বললাম, মনীষা, আমাকে দেখতে পাচ্ছো না ?

মনীষা শিশুর মতন উজ্জ্বল হয়ে গিয়ে বললো, তোমাকেই তো খুঁজছিলাম। কোথায় ছিলে এতদিন ? একবার দেখা করতে পারো না ? তুমি লক্ষ্ণৌতে এলে না কেন ?

— লক্ষ্ণৌতে যাওয়া কি আমায় মানায় ?

— কিন্তু আমার যে খুব দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে !

— আমারও ইচ্ছে করে। মনীষা, চলো একদিন বেড়াতে যাই।

— কোথায় ?

— অনেক দূরে। মনে নেই, সারাজীবন আমাদের বেড়াবার কথা ছিল ? চলো, কোনো একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই।

কোন্ পাহাড়ে ?

— খুব উঁচু কোনো পাহাড়ে। যেখানে বরফ থাকবে না, অথচ বেশ উঁচু—দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়। সেই পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে তোমাকে একটা খুব জরুরি কথা বলবো—

— কি জরুরি কথা ?

— সেটা পাহাড়ে না উঠলে বলা যাবে না। সেখানে মাথার ওপরে শুধু আকাশ, পায়ের নিচে, অনেক নিচে, মানুষের বসতি—আমাদের ধারেকাছে আর কেউ নেই—সেখানেই শুধু কথাটা বলা যায়। এখানে চারপাশে এত মানুষ। এত গোলমাল—এখানে সে কথা মানাবে না। জীবনে কোনোদিন যদি সে কথাটা না বলতে পারি—তাহলে এই বেঁচে থাকাটাই ব্যর্থ মনে হবে। যাবে আমার সঙ্গে একদিন পাহাড়ে ?

—যাবো। তুমি যেদিন ডাকবে, সেদিনই আমি যাবো। কিন্তু তুমি তো ডাকো না।

— মনীষা, তুমি কেমন আছো ?

— আমি ভালো নেই।

— কেন, ভালো নেই কেন ? তোমাকে তো আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে—

— না, আমি ভালো নেই।

— কেন ?

— জানি না। সেটাও বুঝতে পারি না। সারাদিন বাড়ি বসে থাকি, ছেলেকে চান করাই, খাওয়াই। রেকর্ড শুনি। সন্ধেবেলা ও এলে গল্প করি। অথচ মনে হয়, সারাদিন কিছুই করা হলো না। কেন লেখাপড়া শিখলাম ? কেন খেটে খুটে এম.এ. পাশ করলাম ?

— তুমি রিসার্চ করতে পারো—

— কি হবে রিসার্চ করে ? ছেলে মানুষ করার জন্য রিসার্চ করার দরকার হয় ?

— তাহলে ওখানে কোনো কলেজ-টলেজে পড়াও না।

— কি হবে কলেজে পড়িয়ে ? আরও কত ছেলেমেয়ে চাকরি পায় না—তাদের টাকার দরকার, আমার তো সেরকম দরকার নেই টাকার।

— তাহলে কি করবে ?

— জানি না। শুধু মনে হয়, সারাদিনে কিছুই করা হলো না।

— মনীষা, তুমি কোনো রকম কষ্টে আছো শুনলে আমার খুব খারাপ লাগবে। কষ্টে থাকা তোমায় সাজে না।

— ঠিক কষ্টে যে আছি, তা বলা যায় না। একে তো কষ্ট বলে না। আমার মন ভালো নেই। আমি কলকাতায় ভালো ছিলাম।

— তা হলে তুমি কলকাতায় ফিরে এসো।

মনীষা চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার ইচ্ছে হলো, এক্ষুনি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাই। অনেক দূরে, সবার চোখের আড়ালে—কোনো পাহাড় চূড়াতে হলেই ভালো হয়। সেই অসীম নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মনীষাকে আমার জীবনের সার সত্য কথাটা বলতে হবে।

আচমকা মনীষা আমাকে বললো, সুনীলদা, তুমি আমাকে ভুলে গেছ!

— আমি? আমি তোমাকে কখনো ভুলতে পারি? তা কখনো সম্ভব!

— তুমি যদি আমাকে ভুলে যাও, তাহলে সেদিনই আমি মরে যাবো। আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে থাকবে না।

— শোনো, আমি তোমাকে যখন ডাকবো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো পাহাড় চূড়ায়?

— একথা কি দু'বার জিজ্ঞাসা করতে হয়? এতে কোনো সন্দেহ আছে?

— মনীষা, ঊষাদি ডাকছেন তোমায়। এবার তোমায় ট্যাক্সিতে উঠতে হবে।

— যাচ্ছি, একটু পরে যাচ্ছি।

মনীষা আমার বাহুতে ওর একটা হাত রাখলো। তন্নতন্ন চোখে দেখলো আমার মুখে দিকে। তারপর একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সুনীলদা, তুমি অনেক বদলে গেছ।

আমি সামান্য হেসে বললাম, হ্যাঁ, বদলে গেছি। আমার দু'পাশের জুলপি পাকতে শুরু করেছে। বেশ মোটাসোটা হয়ে গেছি। চোখের নিচে কয়েকটা কালো দাগ পড়েছে—যাতে বোঝা যায় আমি এখন ব্যস্ত লোক।

মনীষা দুঃখী গলায় বললো, আমি সেরকম বদলের কথা বলি নি। তুমি এমনিই বদলে গেছ।

— না তো, আমি তো আর একটুও বদলাই নি। তুমিও বদলাও নি। কে বলবে, তোমার একটা ছেলে আছে? তুমি ঠিক আগের মতনই আছো। কয়েক বছর আগে সেই যে এক সন্ধেবেলা বৌবাজারের মোড়ে তুমি একলা দাঁড়িয়ে ছিলে—

— ট্যাক্সিতে হর্ন দিচ্ছে। এবার আমি যাই?

— যাও। কথা রইলো, একদিন আমার সঙ্গে একটা খুব উঁচু পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। সেখানে একটা জরুরি কথা বলবো তোমাকে—যা কোনোদিন বলা হয় নি, পাহাড় চূড়ায় না দাঁড়িয়ে বলা যায় না। যাবে তো?

— হ্যাঁ, যাবো। কথা দিলাম, তুমি যেদিন বলবে ...

অরুণই আমাকে প্রথমে দেখতে পেয়েছিল। অরুণ কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি এক দৃষ্টে মনীষার দিকে তাকিয়ে, এতক্ষণ ওর সঙ্গে মনে-মনে কথা বলছিলাম। কাছাকাছি আসতেই আমি ডাকলাম, এই মনীষা—

মনীষা চোখ তুলে খুঁজলো। আমাকে দেখে বললো, ও তুমি? আমি ভাবলাম হঠাৎ কে ডাকছে আমাকে এখানে। গলাটা চেনা-চেনা—

— এখন চিনতে পারছো তো?

— কষ্ট হচ্ছে চিনতে। অনেকদিন দেখি নি তো! কেমন আছো?

— ভালো আছি।

— কলকাতায় কতবার আসি, তোমার দেখাই পাই না।

— তুমি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না।

— এই মিথ্যুক! দাদাকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি তোমার কথা। হেমন্তদা কেমন আছেন?

— ভালো।

— হেমন্তদার সঙ্গে দিল্লিতে একবার দেখা হয়েছিল। তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না।

— থিয়েটার কি রকম দেখলে ?

— বেশ ভালো। তুমি দেখো নি ?

— না।

— একদিন এসো না আমাদের বাড়িতে। আসো না কেন ?

— যাবো। মনীষা, তুমি কেমন আছো ?

মনীষা আমার চোখে চোখ রাখলো। ঠোঁটে সামান্য হাসির রেখা। যেমন চিরকাল দেখেছি। কপালের টিপটা একটু বাঁকা যেমন আগে দেখেছি। দু-এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর হালকা গলায় বললো, আমিও ভালো আছি।

আমি আর কোনো কথা বললাম না। মনীষার চেহারা সামান্য একটু বদলেছে, চোখের নিচে সূক্ষ্ম একটা কালো দাগ। একটু যেন ক্লান্ত মনে হলো ওকে দেখে। তবু সেই ঝিকমিকে হাসির ভঙ্গিটি এখনো অক্ষুণ্ন আছে। মনীষার সঙ্গে কোনোদিন পাহাড় চূড়ায় যাওয়া হবে না সত্যি-সত্যি।

মনে-মনে বললাম, মনীষা, বলেছিলাম না, একদিন আমাদের বয়েস বাড়বে, আমরা বদলে যাবো,—কিন্তু তোমার সেই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চেয়ে থাকার দৃশ্য—তা চিরকাল থেকে যাবে।
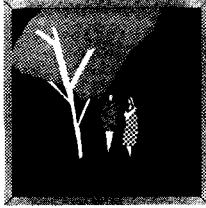
অরণ্যের দিনরাত্রি

সকালবেলা ধলভূমগড় স্টেশনে চারজন যুবক ট্রেন থেকে নামলো। ছোট্ট স্টেশন, সারা দিন-রাতে দু'তিনবার মাত্র সরব হয়ে ওঠে, বাকি সময়টা অলসভাবে নিঝুম। আলাদা টিকিট কালেক্টার নেই, স্টেশন মাস্টার নিজেই ট্রেন থেকে নামা ছোট্ট যাত্রীদলের দিকে এগিয়ে আসেন টিকিটের জন্য—যাত্রীরা অধিকাংশ স্থানীয় লোক, নেংটি পরা সাঁওতাল আর ওরাওঁ—তাদের প্রত্যেকেরই কাঁধে একখানা করে লাঠি, আট হাত শাড়ি ফেরতা দিয়ে পরা মেয়েরা—আম্র পল্লবের মতন তারা পাঁচজন পাঁচজনের হাত ধরাধরি করে থাকে ও গানের সুরে কথা বা ঝগড়া করে যায়, এ ছাড়া দু'চারজন আধা-বিহারী আধা-বাঙালিবাবু কিংবা পাইকার।

এর মধ্যে ঐ চারজন যুবক একটুখানি নতুনত্ব, কেননা এই জায়গায় কখনো চেঞ্জাররা আসে না, সে-রকম কোনো ব্যবস্থাও নেই। ছোট্ট একটুখানি শহর-সাজা গ্রাম, থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না—এমন ভাব, দু'চারখানা বাড়ি ফুরোতেই না ফুরোতেই শুরু হয়ে গেছে জঙ্গল। যুবক চারজনের বয়েস পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, প্রত্যেকেরই সুঠাম স্বাস্থ্য, হাতে ভালো চামড়ার সুটকেস, হোল্ডঅল, টেরিলিন জাতীয় সুদৃশ্য পোশাক পরিহিত, ওদের মুখ-চোখ দেখলেই আর কারুকে বলে দিতে হয় না যে, ওরা কলকাতার মানুষ।

স্টেশন মাস্টার মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বেড়াতে এলেন বুঝি?

ওদের মধ্যে একজন প্যান্টের এ-পকেট ও-পকেট খুঁজছিল। পিছন পকেটের চামড়ার ব্যাগ থেকে বেরুলো ভাড়ার রসিদ, তখন সে জবাব দিলো, হ্যাঁ, সেইরকমই, দেখা যাক! আমাদের কাছে কিন্তু টিকিট নেই। মাঝরাত্রে টিটির কাছে ভাড়া দিয়ে এই রসিদ নিয়েছি। চলবে তো?

স্টেশন মাস্টার এক পলক উঁকি দিয়ে দেখেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই সময় এখানে বেড়াতে এলেন? আপনাদের তো অসুবিধে হবে...

— কেন, অসুবিধে কিসের; আপনার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না!

— থাকবেন কোথায়? এখানে তো—

— সে আমরা যা-হোক ব্যবস্থা করে নেবো।

ওদের মধ্যে আরেকজন বললো, কেন, এখানে একটা বাংলো আছে না? তাই শুনেই তো

এলাম।

— তা আছে, যদি জায়গা পান দেখুন, তাছাড়া খাবার-দাবারেরও অসুবিধে হবে।

—আপনি যদি খাবার-দাবার পান, তাহলে আমরা পাবো না কেন?

— কিচ্ছু পাওয়া যায় না এখানে স্যার। জংলীদের জায়গা, মাছ নেই, দুধ নেই, মাংসও সপ্তাহে দু'একদিন—আপনারা একটু আনন্দ-টানন্দ করতে এসেছেন—

ওদের মধ্যে যার সবচেয়ে দীর্ঘ চেহারা, মাথার চুল কৌকড়ানো, প্যান্টের পিছন পকেটে হাত, সে হা-হা করে হেসে উঠলো। বললো, কী করে বুঝলেন, আমরা আনন্দ করতে এসেছি? কলকাতায় কি আনন্দ কম?

আরেকজন এগিয়ে এলো, আপাতত আমরা অন্তত একটা আনন্দ পেতে চাই। এখানে চায়ের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা আছে কোথাও?

স্টেশন মাস্টার বিমর্ষভাবে বললেন, স্টেশনে কিছু নেই, এ লাইনটাই এ রকম, একটু এগিয়ে—কলকাতার মতন রেস্টুরেন্ট অবশ্য পাবেন না। তবে বাজারের মধ্যে দু'একটা চায়ের দোকান—

— বাজার কত দূরে?

— কাছেই, ঐ তো—

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওরা ওভারব্রিজে উঠলো। নরম সকালের হাওয়া আলগাভাবে খেলা করে গেল ওদের চোখে-মুখে-চুলে, ছানার জলের মতন আলো চারদিকে, ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা চার-পাশটা একবার তাকিয়ে দেখলো। ডান দিকে যতদূর দেখা যায় ঢেউ খেলানো মাঠ ও ছোট ছোট টিলা, বহুদূরে আবছা একটা পাহাড়, বাঁদিকে জঙ্গল শুরু হয়েছে, জঙ্গল কেটে চলে গেছে রেললাইন—এইমাত্র ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটা এখনো অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। নতুন জায়গায় ঢোকার আগে ওরা যেন ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখেছে। সামনেই বাজার, গোটা তিরিশেক পাকা বাড়ি একটু দূরে দূরে ছড়ানো, তারপর এক পাশে মাঠ এক পাশে জঙ্গল।

ওরা ঘুরে ঘুরে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিকেই দেখলো। আর বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই। একজন বললো, 'ধলভূমগড় নাম যখন, তখন একটু দুর্গ-টুর্গ থাকা তো উচিত। কোথায়, দেখতে তো পাচ্ছি না।

— জঙ্গলের মধ্যে ভাঙাচুরো কোথাও পড়ে আছে হয়তো।

মাথার ওপরের আকাশ গভীর সমুদ্রের মতন নীল। এক ছিটে মেঘ নেই। ওদের মধ্যে একজনের হাতে একটা পাকানো খবরের কাগজ ছিল, সে সেটা ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, বিদায়।

তার পাশের জন বললো, এই সঞ্জয়, কাগজটা ফেললি কেন?

— ধুৎ। খবরের কাগজের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাই না।

— ফেরার সময় জুতো মুড়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজে লাগতো।

— তখন দেখা যাবে। দে, সিগারেট দে।

খবরের কাগজটা হাওয়ায় দুলতে দুলতে নিচে লাইনের ওপর গিয়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল। কি একটা কাপড় না সিগারেট কোম্পানির আধপাতা জোড়া বিজ্ঞাপনের ছবিতে সুট-টাই পরা একজন লোভী লোকের হাত একটি শালোয়ার কামিজ পরা খুকির শরীর দোলাচ্ছে। ওভারব্রিজের রেলিং ধরে ঝুঁকে সেদিকে তাকিয়ে একজন বললো, সঞ্জয়, ঐ ছবির ওপর ঠিক করে থুতু ফেলতে পারবি?

— ছেলেটার মুখে না মেয়েটার মুখে?

— তুই ছেলেটার, আমি মেয়েটার।

হাওয়ায় থুতু উড়ে যাচ্ছে, সোজা নিচে পড়ছে না। বিজ্ঞাপনের ছবি অম্লানই রইলো। বিরক্ত হয়ে একজন জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুড়ে মারলো। সেটাও কাগজের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে চলে গেল কোথায়।

সবচেয়ে লম্বা যুবকটি বললো, এই, কি ছেলেমানুষী করছিস! তাড়াতাড়ি চল, চা না খেয়ে পারছি না!

ওভারব্রিজ পেরিয়ে একটু দূরেই একটা বড় চাতাল। একটা বট গাছের নিচে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো অনেকখানি বেদি, সেখানে দশ–বারোটা আদিবাসী মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। তার ওপাশে কয়েকটা ছোট দোকান, ছোটখাটো বাজারের মতন। বাজারটায় যেন কোনো প্রাণ নেই, মানুষজনের ভিড়ে জমজমাট নয়। পটল ওজন করছে একটা লোক, কিন্তু কি রকম অলস তার ভঙ্গি, দুটো দিচ্ছে, তিনটে কমাচ্ছে, ওজন আর ঠিকই হয় না—তার সামনে দাঁড়ানো খদ্দেরটিরও যেন কোনো তাড়া নেই—সিনেমা দেখার মতন গভীর মনোযোগে দেখছে পটল মাপা। এক পাশে ডাঁই করা কতকগুলো কুমড়োর চূড়ার ওপর চুপটি করে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর।

মেয়েগুলো শুধু বসেছে আলাদা—এদের থেকে দূরে, পরিষ্কার উঁচু চাতালে। প্রত্যেকের কাঁখালে একটা করে ঝুড়ি, ঝুড়িতে করে কি বেচতে এসেছে তা দূর থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ওদের সামনে কোনো খদ্দের দাঁড়িয়ে নেই। সঞ্জয় বললো, অসীম, দ্যাখ তো ওদের কাছে ডিম আছে নাকি? তা হলে কয়েকটা ডিম কিনে নে, চায়ের সঙ্গে খেতে হবে তো।

অসীম ও আরেকজন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি রে তোদের কাছে ডিম আছে! আণ্ডা?

পা ঝুলিয়ে বসা মেয়েগুলো এ–ওর গায়ে হেলান দিয়ে মুখ টিপে হাসলো কেউ বা গ্রীবা সামান্য বেঁকিয়ে বাঁ দিকের কাঁধে মুখ গুঁজলো। কেউ কোনো উত্তর দিলো না।

— আণ্ডা মিলেগা? আণ্ডা হায় তুমলোগ পাশ?

মেয়েগুলো পূর্ববৎ তরঙ্গের মতন সবাই হাসিতে দুললো, পরস্পর গা ঠেলাঠেলি করলো, ওদের মধ্যে দু'একজন জলে ঘটি ডোবানোর মতন গুপ গুপ করে হাসলো, কিন্তু উত্তর দিলো না।

তখন পর্যন্ত ওরা ঐ মেয়েগুলো সম্পর্কে কোনোই ধারণা করে নেয় নি, নতুন জায়গায় এসে হাল্কা চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, কোনো ব্যস্ততা নেই। বাজারে ঢোকার আগে, এক কোণে বসা এই মেয়েগুলোকে চোখে পড়লো বলেই যেন কিছু জিনিস কেনার কথা মনে পড়েছে, জিনিসপত্র তো কিছু কিনতেই হবে—আর কিনতে হলে ময়লা ধুতি জড়ানো রুক্ষ দাড়িওলা দোকানিদের বদলে—এই হাসিখুশি সোমখ মেয়েগুলোর কাছ থেকেই কিছু কেনার কথা স্বাভাবিকভাবেই ওদের মনে আসে। দাম হয়তো একটু বেশি নেবে, তা হোক, সঙ্গে তো বাতাস–খুশি করা হাসি দেবে। শহুরে ছেলে সকালবেলা ডিম কেনার কথাই ওরা প্রথম ভেবেছে। ডিম না থাকে—মেয়েদের যে–কোনো সওদা, শিম–বরবটি কিংবা আলু–পেঁয়াজ যাই হোক—তাও হয়তো কিনবে।

অসীমরা এগিয়ে এসে মেয়েগুলোর ঝুড়িতে উঁকি মারলো। কিছু নেই ফাঁকা ঝুড়ি সবারই ফাঁকা ঝুড়ি। ওরা একটু অবাক হলো। নীলপাড় শাড়ি পরা একটি কচি–মুখ মেয়েকে অসীম বললো কি রে, সব ফুরিয়ে গেছে? ডিম–টিম নেই কারুর কাছে?

মেয়েটি ঝংকারময় গলায় বললো, ডিম নেই তো দেখতেই পেছিস! অ্যাঁ!

— কিছু নেই তো এখানে বসে আছিস কেন?

— বসে আছি, হাওয়া খেতে মন লয়! তুহার তাতে কি?

অসীম বললো, আরে, এইটুকু লঙ্কার ঝাল তো কম নয়। দেখছি ঝগড়া করতে চাইছে। কী দোষ করলুম বাপু?—সে তার বন্ধুদের দিকে ফিরে বললো আশ্চর্য ব্যাপার মাইরি, এতগুলো মেয়ে খালি ঝুড়ি নিয়ে এমনি সকালবেলা বসে আছে!

আশপাশের দু'চারজন লোক কৌতূহলী হয়ে ওদের দেখছিল টেরা চোখে একটা হলুদ গেঞ্জি পরা ছোকরা ওদের দিকে ঘন হয়ে এসে শুনছিল ওদের কথা। সে বললো, উ মেয়েগুলো সব জন খাটে বাবু। ডিম বেচে না।

— জন খাটে মানে?

— রাজমিস্তির কাজে যোগান দেয়, ইট বয়।

— তা এখানে বসে আছে কেন?

— ইখানে বসে থাকে, যদি কারুর দরকার হয় তো ডেকে খাটাতে লিয়ে যার।

— ও বুঝলুম। তা এখানে আর প্রত্যেক দিন কী এত রাজ–মিস্তিরির কাজ হয় কে জানে। থাকগে তোমাদের এখানে ডিম পাওয়া যাবে?

— ডিম তো মিলবে না আজ, সেই হাটবার মঙ্গলবার।

— হাটবার ছাড়া আর ডিম পাওয়া যাবে না?

— যাবে, সে আপনার হোটেলে।

— ও, হোটেলও আছে এখানে? আচ্ছা রেস্ট হাউসটা কত দূরে?

— ওসব কিছু তো এখানে নাই বাবু।

— নেই মানে? আলবৎ আছে। ফরেস্ট রেস্ট হাউস!

— ফরেস্ট বাংলা? সে আপনার সেই দিকে জঙ্গলে।

— ঠিক আছে, এখোনে রিক্সা–টিক্সা পাওয়া যায়?

— আজ্ঞে না, রিক্সা ইদিকে কোথায় পাবেন, এসব জংলা জায়গা—বাবুরা তো কেউ আসে না তেমন, যারা আসে তারা মোটর আনে—

লোকটির নাম লখা, তাকে ওরা তল্পিদার হিসেবে নিযুক্ত করলো। লোকটির কাঁধে কিছু মোটঘাট চাপিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো ওরা চারজন—সঞ্জয়, অসীম, শেখর এবং রবি। কাল রাত্তিরেই হয়তো বৃষ্টি হয়েছে, সরু রাস্তায় প্যাচপ্যাচ করছে কাদা, দু'পাশে কয়েকটা মুদির দোকান, সিমেন্ট সুরকির আড়ত, নোংরা ভাতের হোটেল, একটা সেলুনও আছে, সিগারেটের দোকানে ঝ্যান ঝ্যান করে রেডিও বাজছে।

একটা দোকান বেছে নিয়ে ওরা বাইরের বেঞ্চিতে বসে গরম জিলিপি আর সিঙাড়া সঙ্গে চা খেলো। গেলাসের চায়ে কী রকম কাঁঠাল কাঁঠাল গন্ধ, এঁটো শালপাতায় এসে বসেছে নীল রঙের ডুমোডুমো কাঁঠালে মাছি। দোকানের বাকি লোকরা নিজস্ব কথা বলা থামিয়ে ওদের দিকেই চেয়ে আছে। যে–কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তাদের সকলেরই মুখভঙ্গি ব্যগ্র। ওরা চারজন অন্য কোনো দিকেই মনোযোগ দিলো না, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো, রেডিওর ফাটা আওয়াজটা খুবই বিরক্ত করছিল, অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো এগোই।

দু'চার পা হাঁটতেই বাজার শেষ হয়ে গেল, সরু রাস্তা এসে মিশলো বড় রাস্তায়। এখানে দু'চারটে ছড়ানো সুদৃশ বাড়ি, প্রত্যেক বাড়ির সামনে কম্পাউন্ডে ফুল, লতা ও ইউক্যালিপটাস গাছ, শুধু এই জায়গাটুকু দেওঘর বা মধুপুরের এক টুকরো মনে হয়। লখা অনবরত বকবক করে যাচ্ছিল, কোনটা কার বাড়ি সেই বিবরণ, এই জায়গাটার অসংলগ্ন ইতিহাস–ভূগোল, ওরা সব কথা শুনছিল না, মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করছিল হঠাৎ। একটা বাড়ির দিকে ওদের সবারই

চোখ পড়লো, গোলাপি রঙা একটা সুন্দর বাড়ি, বাড়ির সম্পূর্ণ সীমানা দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তার ওপর ভাঙা কাচ ও কাঁটা তার বসিয়ে সুরক্ষিত, এক অংশে সবল লোহার গেট। গেটের পাশে একটা পুরোনো মরিস গাড়ি, একজন চাকর সেটা ধুচ্ছে। গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়, বাগানের মাঝখানে পাথরের পরী বসানো ফোয়ারা, বাগানের পথটুকু ব্যতীত বাকি অংশ ঘাসের বদলে লাল পর্টুলেকায় ছেয়ে আছে, যেন টুকটুকে লাল রঙের বাগান এক পাশে নেট খাটিয়ে দু'টি মেয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে, পালক দেওয়া কর্কের বদলে ওরা খেলছে রেশমের বল দিয়ে, মেয়ে দু'টি খেলছে আর ঝলমল করে হাসছে, বার-বারান্দায় ইজিচেয়ারে এক প্রৌঢ় খবর কাগজ নিয়ে ঝুঁকে বসা।

ওরা চারজন গেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দু'এক পলক মাত্র এই দৃশ্য দেখলো, পরস্পর চোখাচোখি করলো, রবি বললো, এখানে এক টুকরো বালিগঞ্জও আছে দেখছি। তবে যে শুনেছিলুম, এখানে জঙ্গল আর আদিবাসীরা ছাড়া কিছু নেই?

সঞ্জয় বললো, বড়লোকেরা কোথায় না আছে! তারা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

শেখর একটু চিন্তিতভাবে বললো, ওদের মধ্যে একটা মেয়েকে কী রকম যেন চেনা-চেনা মনে হলো।

রবি সঙ্গে সঙ্গে খোঁচা মারলো, বাজে গুল মারিস না! দুনিয়ার সব মেয়েই তোর চেনা। নতুন জায়গায় পা দিতে না দিতেই তোর চেনা মেয়ে? অ্যাঁ?

— হ্যাঁ, সত্যি বলছি, খুব চেনা না হলেও মনে হলো আগে কোথাও দেখেছি।

— আমার তো সব মেয়েকেই দেখে মনে হয় আগে দেখেছি, এজন্মে না হোক গতজন্মে। সে কথা বাদ দে।

— তা নয়, সত্যিই, মনে করতে পারছি না অবশ্য।

রবি বললো, চল ফিরে যাই, ভালো করে দেখে আসি তোর চেনা কিনা। তোর চেনা হলে আমারও চেনা হতে পারে!

তখন ওরা বাড়ির গেটটা থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে চলে এসেছে। শেখর বললো, যাঃ তা হয় নাকি, ফিরে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে তাকাবো? যদি সত্যিই চেনা না হয়?

রবি শেখরের একটা হাত ধরে টানাটানি করতে বললো, চল না, চল না, চেনা নাই-বা হলো, মেয়েরা বাগানে খেলছে তা দেখতে দোষ কি?

শেখর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো যাঃ।

অসীম জিজ্ঞেস করলো, লখা এটা কাদের বাড়ি?

— ইটা তো ত্রিপাঠী সাহেবের বাড়ি। খুব ভারী ব্যবসা ওঁয়াদের—কলকাতায় আপনাদের হাওড়াপাড়া আছে যে, সেখানে ওঁয়াদের—

অসীম মুখ ঘুরিয়ে শেখরকে প্রশ্ন করলো, কি রে, তুই ত্রিপাঠী পদবীর কোনো মেয়েকে চিনিস?

শেখরের মুখ দেখে মনে হয় তন্ন তন্ন করে সে ভেতরটা খুঁজছে। অন্ধকার রান্নাঘরে কালো জিরে খুঁজে না পেলে গৃহিণীরা যেমন এক একটা কৌটা খুলে গন্ধ শুঁকে দেখেন আর রেখে দেন, শেখরও সেইরকম আধ-চেনা প্রত্যেকটা মেয়েকে চোখের সামনে এনে প্রশ্ন করছিল, তুমি কি ত্রিপাঠী? না, না, গন্ধ মিলছে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে অমলেশ ত্রিপাঠীর কাছে ইতিহাস পড়েছিলুম, দীপ্তি ত্রিপাঠীর লেখা বই ছিল তাপসের ঘরে, ভবানীপুরে ত্রিপাঠী অ্যান্ড সন্স নামে একটা রেডিওর দোকান আছে, না, আর কোনো ত্রিপাঠীর কথা সে শোনে নি। শেখরকে হার

মানতেই হলো।

ঐ বাড়িটা ছাড়বার পর আর দু'একটা এদিক ওদিক ছড়ানো খাপরার চালাঘর, তারপর রাস্তা ফাঁকা হয়ে এলো, এবার জঙ্গলে ঢুকবে, সামনেই জঙ্গল দেখা যায়। এই রাস্তাটা চাকুলিয়া হয়ে জামসেদপুরে চলে গেছে—তাই মাঝে মাঝে ট্রাকের আনাগোনা।

এপ্রিলের শেষে, রোদ্দুর এখনো বিরক্তিকর হয় নি, ঝকঝকে আকাশ থেকে রোদ এসে খেলা করছে বনে চূড়ায়। এই বন দেখলে গা ছমছম করে না, তরুণ শালগাছগুলোয় বল্লরী ধরেছে। বিশ্বাস করা যায় না ঐ কঠিন সব শাল বৃক্ষের এত সুন্দর নরম-রঙা ফুল। দু'একটা জারুল আর ইউক্যালিপটাসের ভেজাল থাকা সত্ত্বেও জঙ্গলটা এখানে পুরোপুরি শালেরই জঙ্গল। লালচে রাস্তা দিয়ে ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো।

বনের মধ্যে ঢুকেই ওদের অন্য রকম লাগলো। স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা আলাদা জগৎ। বনের ভিতরটা সব সময় নিঃশব্দ। আসলে অনেক রকম শব্দ আছে, কিচকিচে পাখির ডাক, হাওয়ার শোঁ শোঁ, লুকানো কাঠবিড়ালির চিড়িক চিড়িক, ঝিঁঝিঁর কোরাস, শুকনো পাতার খরখর, দূরে কোথাও কাঠ কাটার একঘেয়ে শব্দও ভেসে আসছে—তবু মনে হয় অরণ্য নিস্তব্ধ। ওসব শব্দ নিস্তব্ধতারই অলঙ্কার। জঙ্গলে ঢুকলে সত্যিকারের একটা বিশাল জিনিসকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা হয়।

কালো পীচের চওড়া রাস্তা, দু'পাশে লাল সুরকি ছড়ানো—তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ওরা হাঁটছে। অসীমকে অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, শেখরও বন্ধুবান্ধবদের না বলে মাঝে মাঝেই হঠাৎ দু'এক মাসের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশে চলে যায়। ক্রিকেট খেলার জন্য রবি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘুরেছে, মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে একটা শিকারের পার্টিতেও গিয়েছিল একবার। সঞ্জয় একটু ঘরকুনো, কিন্তু বছরে একবার তাকে হরিদ্বারে যেতেই হয়। ওর বাবা সংসার ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে হরিদ্বারে আছেন, সঞ্জয় তার সঙ্গে দেখা করে আসে। অর্থাৎ ওরা চারজনেই আগে নানা জায়গায় ঘুরেছে, এই প্রথম ওরা দল বেঁধে একসঙ্গে বাইরে এলো। ওরা একসঙ্গে মিশেছে—কিন্তু সবকিছু মেলে নি, মাঝে মাঝে ওরা একসঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে, মাঝে মাঝেই আবার অন্যমনস্ক, তখন চারজনে যেন চার রকম ভাবনায় অন্যমনস্ক।

বেশি হাঁটতে হলো না, আধ মাইলের মধ্যেই চোখে পড়লো ডাক-বাংলোর গেট, বাঁ দিকে চওড়া মোরাম বিছানো পথ, ভিতরে জাপানি ছবির মতন সাজানো বাড়িখানা। উঁচু সিমেণ্টের ভিতের ওপর বাড়ি, বারান্দার ঝুলন্ত টবে সাজানো রয়েছে নানা জাতের শৌখিন অর্কিড কয়েকখানা পরিচ্ছন্ন অটুট ইজিচেয়ার। বাড়ির সামনে কেয়ারি করা ফুল বাগান, একপাশে গাড়ি রাখার ছোট গ্যারাজ, তারও ওপাশে চৌকিদারের ঘর। ওদের দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলো, বাঃ! সত্যি চমৎকার জায়গাটা।

লখা মালপত্তর নামিয়ে রেখে, সমগ্র নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চেঁচাতে লাগলো, রতিলাল! রতিলাল—! এ—চৌকিদার!

কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। দূর থেকে শুধু সেই কাঠ কাটার অক্লান্ত শব্দটা একঘেয়েভাবে শোনা যাচ্ছে। সঞ্জয় বললো, দেখে মনে হচ্ছে এ জায়গায় বিশেষ লোকজন আসে না। চৌকিদার কি আর সব সময় থাকে?

লখা বললো, দাঁড়ান বাবু আমি ওকে ঢুঁড়ে লিয়ে আসছি।

— হ্যাঁ যাও, তাড়াতাড়ি দ্যাখো। চৌকিদার না আসা পর্যন্ত তোমার বকশিশ মিলবে না।

বকশিশের কথা শুনে লখা যেন চমকে উঠলো, যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিংবা এসব কথা

তার সামনে উচ্চারণ করাই উচিত নয়। অত্যন্ত লাজুকভাবে ঘাড় নুয়ে বললো, সে জন্য কি আছে হুজুর!

ওরা বারান্দায় উঠলো। চেয়ারে বসে হাত–পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো : রবি আর সঞ্জয় দু'দিকের বারান্দা ঘুরে তদন্ত করে এলো। রবি বললো, সত্যি খুব গ্র্যান্ড জায়গা, ট্রেনের সেই লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মাইরি।

অসীম বললো, লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে হতো। মনে হচ্ছে, সেও খুব রসিক লোক।

ওরা ছিল ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। মাঝ রাত্তিরে যখন চেকার ওঠে, ওরা বলেছিল, আমরা টিকিট কাটি নি কোথায় যাবো এখনো ঠিক করি নি।

— কোথায় যাবেন জানেন না তা হলে ট্রেনে উঠেছেন কেন?

— এমনিই শখ হলো। জানলা দিয়ে দেখছি—কোনো জায়গা পছন্দ হলে নামার সময় গার্ডকে ভাড়া দিয়ে দেবো।

—মাঝ রাত্তিরে জায়গা দেখছেন? তা বেশ! ট্রেনের আইনে তো ওসব চলে না। অন্তত টাটানগর পর্যন্ত টিকিট কাটুন এখন!

— টাটানগর গিয়ে কী করবো? বাজে জায়গা।

— কোথায় যাবেন তা–ই যখন জানেন না—

এই সময় ওদের পাশের লোকটি কথা বলে। লোকটি মধ্যবয়স্ক ঘন নীল–রঙা সুট পরে ছিল—হাতে সব সময় একখানা বই, প্রত্যেক স্টেশনে চা খাচ্ছিল। দেখে মনে হয়েছিল লোকটি অবাঙালি, এবার সে পরিষ্কার বাংলায় বললো আপনারা নিরিবিলিতে কোথাও ছুটি কাটাতে চান তো? আমি একটা জায়গা সাজেস্ট করতে পারি। ধলভূমগড়, বেশি দূর নয়। ঝাড়গ্রামের দু'স্টেশন পরেই।

রবি জিজ্ঞেস করেছিল কী রকম জায়গা বলুন তো?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল এতক্ষণ আপনাদের কথাবার্তা শুনে আপনাদের মেজাজটা বুঝেছি। ধলভূমগড়ে যান, আপনাদের ভালো লাগবে। আমি অনেকবার গেছি, খুব নিরিবিলি। রেস্ট হাউসে থাকবেন, কেউ বিরক্ত করবে না। আপনারা তো সেই রকম জায়গাই চান!

লোকটি ওদের সাহায্য করতেই চাইছিল, তবু গায়ে পড়ে পরামর্শ দিচ্ছে বলে ওদের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। রবি বলেছিল, আমরা কী রকম জায়গা চাই, তা আপনি কি করে বুঝলেন দাদা?

লোকটি সামান্য হেসে বলেছিল, বছর পনেরো আগে আমার বয়েসও আপনাদের সমান ছিল। আমার সেই সময়কার কথা ভেবে বললুম আর কি! আমরা সভ্য মানুষরা মাঝে মাঝে জঙ্গলে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাই। সেদিক থেকে ও জায়গাটা ব্রিলিয়ান্ট!

— আমরা কী রকম জায়গা চাই, তা অবশ্য ঠিক জানি না। আচ্ছা, ধলভূমগড়েই গিয়ে দেখা যাক।

এখন চেয়ারে পা ছড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে সঞ্জয় বললো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আগে থেকে রিজার্ভ না করলে ফরেস্ট বাংলোতে থাকা যায় না। বোধহয় গোলমাল করবে চৌদিকার এসে।

—ওসব কিছু না। দুটো টাকা একস্ট্রা দিলেই হবে।

—হবে কি না সন্দেহ।

দূরে দেখা গেল একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে লখা ফিরছে। শেখর বললো, সকলের একসঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। রবি, তুই চৌকিদারকে ট্যাক্‌ল কর।

রবির সু জোড়া নতুন, হাঁটলে গস্ গস্ শব্দ হয়, ফরসা মুখে ওর ঘন কালো জোড়া ভুরু—

বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। প্যান্টের হিপ পকেটে হাত দিয়ে রবি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল, অত্যন্ত অবজ্ঞা ভরে লখাকে জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটাই চৌকিদার নাকি?—কী নাম তোমার?

রবি লোকটার চোখে চোখ ফেলে প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলো। লোকটা এখনো সেলাম করে নি, রবির কাছে সেইটাই এখন সবচেয়ে বড় ব্যাপার। নিরীহ চেহারার মাঝ বয়স্ক লোকটা, সম্পূর্ণ খালি গা, তামাটে বুকের ওপর ঝুলছে মোটা পৈতে। লোকটা খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, কোনো অসমাপ্ত কাজ থেকে যেন হঠাৎ উঠে এসেছে। রবির চোখের দিকে সে তাকাচ্ছিল না, কিন্তু চোখে চোখ পড়লোই, সঙ্গে সঙ্গে সে সেলামের ভঙ্গিতে কপালের কাছে হাত তুলে দুর্বল গলায় বললো, হ্যাঁ, হুজুর। আমার নাম রতিলাল।

হঠাৎ অকল্পনীয় রবি প্রবল কঠোরতার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অ্যাঁ? উল্লুক-কাঁহাকা; আধ ঘণ্টা ধরে বাইরে বসে আছি—দরজা তালাবন্ধ।

লোকটা ভয়ে একবারে কেঁপে উঠলো। ক্ষীণ গলায় বললো, হুজুর, কারুর তো আসার কথা ছিল না।

— আসার কথা ছিল না মানে ? সাতদিন আগে চিঠি দিয়েছি!

— হুজুর, কোনো খৎ তো পাই নি।

— খৎ পাও না পাও, তোমার ডিউটি এখানে থাকা। যাও, তাড়াতাড়ি দরজা খোলো।

লোকটা খানিকটা দম নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করলো, তারপর বললো, হুজুরের কাছে সিলিপ আছে? রিজার্ভ না থাকলে তো—

সে-সব পরে হবে, তুমি আগে দরজা খোলো। ফরেস্টারবাবু কোথায়?

—ফরেস্টারবাবু চাকুলিয়া গিয়েছেন, কাল বিকালে আসবেন।

—ঠিক আছে, ফরেস্টারবাবু এলে তাঁকে সিলিপ দিয়ে দেবো। এখন দরজা খুলে দাও।

—কিন্তু আমার ওপর অর্ডার আছে, স্লিপ না দেখালে তালা খুলতে মানা।

রবির মেজাজ এবার সপ্তমে পৌঁছুলো। সমস্ত মুখ বিকৃত করে সে বললো, আঃ, জ্বালালে দেখছি! এ-পকেট সে-পকেট খুঁজতে লাগলো রবি। বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, এর নামে রিপোর্ট করতে হবে। ডিউটির সময় আড্ডা মারতে যাওয়া! তারপর রবি পকেট থেকে কিছু একটা পেয়ে গেল—ট্রেনে চেকার ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে রসিদ দিয়েছিল—ধলভূমগড়ের স্টেশন মাস্টার যেটা দেখেই খুশি হয়েছিলেন—আর নিতে চান নি, রবি সেই কাগজটা মুড়ে চৌকিদারের দিকে ছুড়ে বললো, এই নাও! এবার খোলো—

শেখর, সঞ্জয় ও অসীম তখন অতি মনোযোগ দিয়ে নিজেদের হাতের পাঞ্জা দেখছে, কেউ পরীক্ষা করছে দেয়ালের চুনকাম, মুখগুলো কঠিন, যাতে কোনোক্রমে হাসি বেরিয়ে না পড়ে।

রতিলাল কাগজটা তুলে নিয়ে দেখলো। সব সরকারি কাগজই একরকম, সে কাগজটা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে চাবি বার করে দরজা খুললো। তারপর অতি ব্যস্ত হয়ে বললো, আমি টাঙ্কিতে এখনি পানি ভরে দিচ্ছি।

রবি বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিশ্বজয়ীর কণ্ঠস্বরে বললো, কি চলবে তো? চল ঘরগুলো দেখা যাক। এই লখা, মালপত্তরগুলো ঘরে তোল।

দু'খানা ঘর, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সঙ্গে বাথরুম। প্রত্যেক ঘরে দু'খানা করে খাট, ড্রেসিং টেবিল, পোশাকের র‍্যাক, এমন কি শীতের জন্য ফায়ার প্লেস। ঘর দেখে ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটার কৃতিত্ব নেবার ভঙ্গিতে রবি মুখ প্রসন্ন করলো, তারপর রতিলালকে বললো, শোনো চৌকিদার ঝটপট চায়ের ব্যবস্থা করো। রান্নাবান্নাও করতে হবে। এখানে কী

কী খাবার পাওয়া যাবে?

রতিলাল বললো, হুজুর, আমি চা বানাতে পারবো। কিন্তু খানা পাকাতে আমি জানি না। আমার বহু উসব করতো, সাহেবরা তার রান্না খেয়ে কত খোস্ হয়েছেন, কিন্তু তার বড় বোখার। ডাগদরবাবুর পাশ গিয়েছিলুম, ডাগদরবাবু বললেন, সুই নিতে হবে।

—তাহলে তো মুশকিল। রান্না করবে কে? অসীম, তুই পারবি?

—দু'একবেলা চালিয়ে দেবো।

—ঠিক আছে, আজকের দিনটা তো চলুক। চৌকিদার, তুমি বাথরুমে জল তুলে দাও, চা করো, আর জিনিসপত্র কিনতে হবে, চাল, আলু, আর এখানে মুর্গী পাওয়া যাবে তো?

—মুর্গী তো সেই হাটবার।

—ভাগ্, সবই শুধু হাটবার ! গ্রামের মধ্যে মুর্গী পাওয়া যাবে না?

লখা বললো, আমি মুর্গী যোগাড় করে দুবো বাবু। ভালো মুর্গী, দুবলা-ফুবলা নয় নিজের ঘরের।

—ঠিক আছে, এই লোকটাকে দিয়েই জিনিসপত্র আনানো যাক। চৌকিদার, তুমি একে চেনো তো? এ টাকা পয়সা নিয়ে পালালে তুমি জামিন রইলে।

লখাকে টাকা আর জিনিসের লিস্ট দিয়ে পাঠানো হলো। রতিলাল গেল জল তুলতে। ওরা এবার জুতো-জামা খুললো, সুটকেস থেকে বেরুলো টাটকা গেঞ্জি আর পা-জামা। অসীমের সুটকেসের এক কোণে উঁকি মারলো একটা ব্রান্ডির বোতল। রবি একটু ছটফটে, সে চটি জুতো খুঁজে পাচ্ছে না, তার ধারণা বেডিং-এর মধ্যেই রেখেছিল, সেখানে নেই। সুটকেস হাঁটকেও না পেয়ে রবি পুরো সুটকেসটাই উলটে দিলো। চটি জুতো আনতে সে ভুলেই গেছে, কিন্তু তার জিনিসপত্রের মধ্যে সবার চোখে পড়লো একটা খাপসুদ্ধ বড় ছোরা। অসীম বললো, আরে, দারুণ জিনিসটা তো !

অসীম সেটা তুলে নিয়ে খাপ থেকে ছোরাটা বার করলো। খাঁটি স্টিলের ন'ইঞ্চি ফলা, ঝকঝক করছে। জিজ্ঞেস করলো, এটা এনেছিস কেন?

রবি বললো, রেখেছি সঙ্গে—যদি কাজে লাগে।

অসীম বললো, এত বড় ছোরা সঙ্গে থাকলেই কাজে লাগাতে ইচ্ছে করে। ডেঞ্জারাস !

রবি তাকে তাড়া দিয়ে বললো, নে নে যা, চট করে আগে চান করে নে, আবার রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে !

টুথ ব্রাস, টুথ পেস্ট, তোয়ালে নিয়ে দু'জন ঢুকলো বাথরুমে। শেখরই শুধু পুরো পোশাকে অলসভাবে বসে রইলো চেয়ারে। জুতোও খোলে নি। একটু একটু পা দোলাচ্ছে, ওদের কথার দিকে মন নেই। একমনে সিগারেট টানতে লাগলো, একটা হাত তার মাথার চুল নিয়ে খেলা করছে।

রবি বললো, কি রে শেখর তুই জামা-কাপড় ছাড়লি না?

—দাঁড়া, এই সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—মুখখানা অমন উদাস কেন? ও বাড়ির সেই মেয়েদের কথা ভাবছিস বুঝি?

—কোন বাড়ির?

ঐ যে আসবার সময় দেখলুম, ত্রিপাঠীদের বাড়ির সুন্দরীরা, তোর চেনা-চেনা—

—যাঃ, ও কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

—তাহলে, এমন চুপচাপ !

—বাঃ, চুপচাপ নিরিবিলিতে কাটাবার জন্যই তো এখানে এলাম।

—দাঁড়া না, নিরিবিলি বার করছি। একেবারে নরক গুলজার করে তুলবো।

জঙ্গল অথচ ঠিক জঙ্গলের মতন নয়। যতদূর দেখা যায়, ঘন গাছের সারি, কোথাও কোথাও ঘন পাতার আড়ালে নিবিড় ছায়া, কিন্তু যে-জঙ্গলে হিংস্র-জন্তুজানোয়ার নেই, সেটাকে তো অরণ্য না বলে বাগান বললেও চলে। লখাকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল, লখার মুখেই শুনলো, না, বাঘ-টাঘের কোনো ভয় নেই এখানে। মাঝে মাঝে দু'একটা নেকড়ের দেখা পাওয়া যায়, সেও খুব কম। বছর তিনেক আগে নাকি এক জোড়া ভাল্লুকের দেখা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং তাদের আর সন্ধান নেই। রাত্তিরেও এ জঙ্গল দিয়ে অনেকে চলাফেরা করে, হাতে একটা লাঠি থাকলেই যথেষ্ট।

কিছু কিছু শাল গাছ বেশ কচি, মনে হয় সরকারী অ্যাফরেস্টেশন প্ল্যানে বছর কয়েক আগে লাগানো, নবীন যুবার মতন তাদের ছিপছিপে দেহ। মোটকথা, বনটা বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝুপসি ডালপালা কিংবা লতা-ঝোপের বিশেষ বাধা নেই, খুব সহজভাবে হাঁটা যায়।

প্রথম প্রথম জঙ্গল সম্বন্ধে ওরা চারজন নানারকম কৌতূহল জানাচ্ছিল, একটু পরে সে-সব নিবৃত্ত হলে অরণ্যের আচ্ছন্নতা ওদের অধিকার করলো। ওরা চুপচাপ হাঁটতে লাগলো, শুকনো পাতায় ওদের ভারী পায়ের আওয়াজ শুধু। সরু সরু পায়ে চলা পথ পেরিয়ে পেরিয়ে ওরা এলো বড় রাস্তায়, জঙ্গল কেটে সেই রাস্তা বেরিয়ে গেছে, চওড়া ফাঁকা রাস্তা, তার একপ্রান্তে খুব আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে সূর্যাস্ত হচ্ছে। পাতলা পাতলা মেঘ ফাটিয়ে সূর্য ছড়াচ্ছে তার রাশি রাশি গাঢ় লাল রং, গাছের চূড়ায় সেগুলো পৌঁছাতে পৌঁছাতে হয়ে যাবে সোনালি, খুব একটা শেষ রঙের খেলা চলছে। এ ধরনের জমকালো সূর্যাস্ত তো আজকাল মানুষ সচরাচর দেখে না, এসব এখন শুধু দেখা যায় সিনেমায়, সুতরাং ওদের পশ্চিমী সিনেমার কথাই মনে পড়লো, রবি বললো, মনে আছে, গার্ডেন অব ইভ্‌ল-এ বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার?

অসীম বললো, ভাগ, ও বইতে বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার ছিল না, গ্যারি কুপার আর রিচার্ড উইডমার্ক, আর সেই পাছা দোলানো মেয়েটা যেন কে ছিল?

সিনেমার খবর সঞ্জয়ই বেশি রাখে, সে হেসে জানালো—মেয়েটা ছিল আভা গার্ডনার, বুক আর পাছা একসঙ্গে দোলায়, কিন্তু গ্যারি কুপার ছিল না, গ্রেগরি পেক।

রবি বললো, ছবি তুললে অনেক কিছুই ভালো দেখায়। এখানে এই সান-সেট্‌টার ছবি তুললে—হলিউডের এইসব সিনের থেকে কিছু এমন খারাপ হতো না। ক্যামেরাটা আনলেই হতো। শেখর শুধু শুধু বারণ করলি—

শেখর বললো, না, না ওসব দামি জিনিস সঙ্গে নিয়ে এরকমভাবে বেড়াতে বেরুনো যায় না। সব সময় ভয় থাকে—এই বুঝি হারালো। সঙ্গে ওসব না থাকলে কিছু হারাবারও ভয় থাকে না।

একটা বেশ প্রশস্ত সিমেণ্টের কালভার্ট। ওরা বসলো তার ওপর। লখা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। আস্তে আস্তে আলো কমে এসে, প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নামলো, তারপর রাস্তার ওপরেও পড়লো কালো ছায়া।

শেখর সিগারেটটা ছুড়ে ফেললো, বললো, এখন কী করা যায় বল তো ?

রবি বললো, তাস এনেছিস?

—না, তাস-ফাস নয়। জঙ্গলে তাস খেলার জন্য আসি নি।

—তা হলে কি করবি? সময় কাটাতে হবে তো?

অসীম বললো, ভাবতে হবে না, দেখিস, আপনিই সময় কেটে যাবে। আমি তো ঠিক করেছি, যে ক'দিন এখানে থাকবো জঙ্গল থেকে বেরুবো না। শহর ছেড়ে এখানেই কাটাবো। তা ছাড়া ঐ তো নোংরা শহর, ওখানে গিয়েই বা লাভ কি?

শেখর নিচু হয়ে দুটো পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিলো, একটা শূন্যে সামনে ছুড়ে দিয়ে বললো, আমিও তাই ভাবছি। দ্বিতীয় পাথরটা পড়লো ডান দিকের জঙ্গলে, হঠাৎ সেখানে কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হলো। ওরা চমকে সবাই ঘুরে তাকালো।

টর্চ ছিল রবির হাতে। সেই দিকে আলো ফেললো। দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা নির্জন বাড়ির আভাস। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা ভাঙাচুরো বাড়ি, কোনোটারই দরজা-জানলা নেই, ভিতরে আবর্জনা, ভাঙা কাচ, ছেঁড়া বিছানা, সাপের খোলস—দেখলেই বোঝা যায়, এক কালে মিলিটারির আস্তানা ছিল। লখাও সেই কথা জানালো। তার মনে আছে, ছেলেবেলায় এখানে গোরা সাহেবেরা থাকতো, তার মা সেইসব সাহেবদের গল্প এখনো বলে। কি দরাজ দিল ছিল সাহেবদের—। সাহেবরা চলে যাবার পর বাড়িগুলো এমনিই পড়ে আছে। দু'একটা ঘর একটু পরিষ্কার, মনে হয়, কিছুদিনের মধ্যেও লোক ছিল এখানে। অরণ্যে কে কোন প্রয়োজনে ভাঙা বাড়ি ব্যবহার করে কেউ জানে না।

বাড়িগুলো দেখে খুশি হয়ে শেখর বললো, বাঃ, আমরা তো এখানেও থাকতে পারতুম। ডাকবাংলোয় জায়গা না পেলেও এমন কিছু অসুবিধে হতো না।

—যাঃ, ছাদ ভাঙা।

—তাতে কি হয়েছে, এখন মার্চ মাসে বৃষ্টি পড়বে না, শীতও কমে গেছে। যাক, বাড়িটা দেখা রইলো, পরে কাজে লাগতে পারে।

—অমন চমৎকার বাংলো পেয়ে গেছি, এটা আর কি কাজে লাগবে? অসীম বললো।

—দেখা যাক।

—একটা বন্দুক আনলে হতো, পাখি-টাখি মারা যেতো।

অসীম তোদের তো রাইফেল ছিল একটা, আনলি না কেন?

—কোথায় রাইফেল, গত যুদ্ধের সময় বাবা তো হুজুগে পড়ে ওটা ডিফেন্স ফান্ডে দান করে দিলেন। মাত্র দু'দিনের জন্য—

অসীমের গলায় আফসোস ফুটে উঠলো। কেননা, যুদ্ধের হুজুগে বেহালায়, অসীমদের পাড়ায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ডিফেন্স ফান্ডের জন্য মিটিং করেছিলেন, তখন পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে অসীমের বাবাও উপস্থিত ছিলেন এবং পাঁচজনের কথা শুনে ঝোঁকের মাথায় তিনি নিজের বন্দুকটাই দান করে ফেললেন। বন্দুকের বাঁটে ওর বাবার নাম খোদাই করা, সেই দশ বছরের পুরোনো রাইফেল কোন যুদ্ধে কাজে লাগাবে কে জানে, অসীমরা সবাই আপত্তি করেছিল, কিন্তু ওর বাবা শোনেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধ-বেঁকানো হাসি ও জনতার হাততালির লোভ সামলাতে পারেন নি। এবং তার ঠিক দু'দিন পরেই অসীমের বাবা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যান এবং সেই রাত্রেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। পিতার মৃত্যুর জন্য দুঃখিত অসীমের আফসোস শুনলে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই মরলেনই যখন বাবা আর দু'দিন আগে মরলেই রাইফেলটা বাঁচতো।

শেখর বললো, রাইফেল আনলেও আমি শিকার করতে দিতুম না। পাখি মারা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

রবি হেসে উঠলো। সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, একটা জিনিস লক্ষ করেছিস? শেখর কি রকম নিজে নিজেই লিডার হয়ে গেছে? সবকিছু ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনুযায়ী চলবে। ভাগ্!

শেখর বললো, না, লিডার কেউ নয়। কিন্তু একটা জিনিস মানতে হবে। কোনো একটা জিনিস আমাদের একজনের খারাপ লাগলে, বাকিদের সেটা করা চলবে না। না হলে সব মাটি হয়ে যাবে!

—তা হয় না। বরং, এইটা ঠিক কর, কেউ কারুর কাজে বাধা দেবে না। আমি কখন কি করবো, তার কোনো ঠিক নেই। বাইরে এসেছিই একটু প্রাণ খুলে যা-খুশি করতে।

শেখর এবার যথার্থ দলপতির মতনই ভারী গলায় বললো, রবি আজ বাংলোয় তোর ছুরিটা আমাকে দিয়ে দিবি।

—কেন ?

—আমার দরকার আছে।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা মৃদু গন্ধ আসছিল, আর কিছুক্ষণ পথ পেরিয়ে এসে এবার কিছু লোকের কথার আওয়াজ ও দু'এক বিন্দু আলো দেখা গেল। আর একটু এগিয়ে চোখে পড়লো, নিম গাছের তলায় কয়েকটি চালাঘর, এখানে জঙ্গল ফাঁকা, ঝাঁপ তোলা এক দোকানে আলুর দম আর ছোলা সেদ্ধ বিক্রি হচ্ছে, পাশের দোকানটির সরু রকে ও মাটিতে বহু মেয়ে-পুরুষ বসে আছে, হাতে লাল রঙের বোতল ও পাতার ঠোঙা। জায়গাটার নির্ভুল চেহারা, তবু অসীম জিজ্ঞেস করলো লখা এখানে, কি হচ্ছে?

—উসব ছোটলোকের জায়গা বাবু, মহুল খাচ্ছে সব।

—মহুয়া? তাই গন্ধটা পাচ্ছিলুম। শেখর, একটু চেখে দেখবি নাকি?

—নিশ্চয়ই।

রবি সব কিছু জানে, সে বললো, জানতুম এখানে মহুয়া পাওয়া যাবেই। এসব ট্রাইবাল পকেটে মহুয়া ছাড়া।

পুরো দলটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যেন ওরই, রবি এগিয়ে গেল এবং দেখে আশ্চর্য হলো, জঙ্গলের মধ্যে দোকান, কিন্তু পুরোদস্তুর লাইসেন্সড্। সামনে সরকারি বিজ্ঞপ্তি টাঙানো, তাতে বিভিন্ন বোতলের দাম ও দোকান খোলা-বন্ধের সময় জানানো। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রবি দরাজ গম্ভীর গলায় এক নম্বরের দু'বোতলের অর্ডার দিলো।

লোকজনরা ওদের দেখে কিছুটা তটস্থ হয়ে উঠেছে। সারা জায়গাটা জুড়ে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ছিল—হঠাৎ সেটা থেমে গেল। অনেকগুলো চোখ এসে পড়লো ওদের ওপরে। একসঙ্গে একরকম চারজন বাবুকে এখানে কখনো দেখতে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকদের কাছে এসব জিনিস অস্পৃশ্য দু'একজন খেলেও চাকরকে দিয়ে কিনতে পাঠায়, কিন্তু এরা একেবারে সশরীরে। একটা বুড়ো সাঁওতাল মাতলামি করছিল, সে পর্যন্ত মাতলামি থামিয়ে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। মেয়েরা অনেকে পেছন ফিরে বসলো, একটি যুবতী মেয়ে তার অচৈতন্য মরদকে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল, সে শুধু ফচকে গলায় বলে উঠলো চল মুংরা, পুলিশ আ গেলল্, আভি তুহাররে পাকড় লে যাই-ই—।

রক থেকে কয়েকজন নেমে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিয়েছিল, রবি গেলাসে ঢেলে এক চুমুকে সবটা শেষ করে বললো, বেশ জিনিসটা তো। স্ট্রং আছে ! অসীম, তুই একটু কম কম খাস।

অসীম বললো, আমার এসবে কিছু হয় না।

কিন্তু অসীমের গেলাস ধরার কায়দা দেখেই বোঝা যায়—সে জিনিসটাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। গায়ে চুমুক দেবার মতন আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে। কষা স্বাদে মুখে একটুখানি বিকৃত হয়ে এলেও বন্ধুবান্ধবের সামনে প্রকাশ করতে চাইছে না।

রবি তো সব জানে, অসীমকে উপদেশ দেবারও অধিকার তার আছে। বললো, মহুয়া জিনিসটা দেখতে এ রকম সাদা জলের মতন—কিন্তু হঠাৎ কিক্ করবে। জিনের বাবা।

শেখর চারদিক চেয়ে লোকগুলোকে দেখছে। সবাই তখনো ঝিঁক চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কেউ কথা বলছে না। শুধু সেই মাতাল মেয়েটা সব কিছু অগ্রাহ্য করা গলায় তীক্ষ্ণভাবে বলতে লাগলো, এ মুংরা, পুলিশ আভি তুহারকে পাকড় লে যাই-ই, এ মুংরা...।

রবি এক পলক তাকিয়ে দেখলো ওদের দিকে। তারপর গলা চড়িয়ে মেয়েটাকে বললো, ওকে একা কেন, তোদের দু'জনকেই ধরে নিয়ে যাবো।

মেয়েটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, যাবি তো চল না। আমি নাচ দেখাবো। আর সালে থানায় গিয়ে সারা রাত নাচ দেখাইছি। বড়বাবু পাঁচো রুপিয়া দিলো, হি-হি-হি?

সঞ্জয় বললো, একটা জিনিস দেখেছিস, এরা বাংলা—হিন্দি দুটোই বেশ জানে। বাংলা তো সব বুঝতেই পারে—

রবি বললো, এসব সিংভূম জেলার জায়গা তো, আগে বাংলাদেশেই ছিল, আগে তো এখানে বাংলাই বলতো।

মেয়েটির নেশা প্রচুর, নিজের মরদের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা ছেড়ে সে দুলতে দুলতে ওদের কাছে এগিয়ে এসে বললো, এ বাবু, আমাকে একটু খাওয়াবি? এই টুকুনি, আধ পোয়া?

রবি প্রচণ্ড ধমকে উঠলো, ভাগ্ ! যা এখান থেকে !

দু'তিনটে মাতাল নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, হাঁ, গলার জোর আছে, পুলিশই বটে মনে হয়—

রবি শুনতে পেয়েছিল সে কথা, উত্তর দিলো, হাঁ, ঠিকই মনে লয়—বেশি গোলমাল করো না।

শেখর নিম্নস্বরে রবিকে বললো, ওরকম ধমকে কথা বলিস নি ! এদের সঙ্গে বরং বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করা ভালো।

—ধমকে কথা না বললে এরা লাই পেয়ে মাথায় উঠবে।

তা বলে ওরকম ভয় দেখাস নি ! এদের সঙ্গে বসে এদের সঙ্গে এরকমভাবে মিশে যাওয়াই ভালো। তাতেই বেশি মজা। শুধু শুধু বাবু সেজে আলাদা হয়ে থাকার মানে হয় না।

শেখর পাশের একটি লোককে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি ভাই।

লোকটি কোনো কথা বললো না। আস্তে আস্তে নিজের বোতলটি সঙ্গে নিয়ে উঠে গিয়ে দূরে এক জায়গায় বসলো। রবি অট্টহাসি করে উঠলো ভাই? শেখরটা একটা ড্যাম রোমান্টিক। ভাই বলে তুই এদের সঙ্গে মিশবি? তুই কোতারি না শুনলেই ওরা ভয় পায়। দেখবি কি করে এদের সঙ্গে কথা বলতে হয়?

রবি আরেকটি লোকের দিকে চেয়ে বললো, এ মাঝি, তোর গাঁও কোথায় রে?

লোকটি উত্তর দিলো ঠিকই, কিন্তু একটু উদাসীনভাবে, বললো সেই সেদিকে, লতাডিহি।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু'ক্রোশ হবে।

— তোমার গ্রামে মুর্গী পাওয়া যায় ?

—মুর্গী তো হাল দুনিয়ায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়।

বোঝা গেল, লোকটা কথা চালাতে বিশেষ উৎসাহিত নয়। কেননা, সেও এবার উঠে বোতল জমা দিয়ে, লাঠিটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের পথে রওনা দিলো। সঞ্জয় বললো, এদের সঙ্গে ভাব করা সহজ নয় ? জোর করে চেষ্টা করেই বা কি লাভ?

রবি জিজ্ঞেস করলো, সঞ্জয়, তুই খাচ্ছিস না?

—না। আমার নেশা করতে ভয় করে।

—ঠিক আছে। আমাদের বেশি নেশা হয়ে গেলে কিন্তু তুই দেখবি।

লখা এবার লজ্জিত ও বিনীতভাবে জানালো, আমাকে একটু বাবু !

রবি কিছু বলার আগেই শেখর বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে একটু দাও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবি হাতের বোতল থেকে লখাকে পাতার ঠোঙায় ঢেলে দিলো, তারপর ইংরাজিতে বললো, যাক, তবু শেখর এদের মধ্যে একজন অন্তত বন্ধু পেয়েছে। কিন্তু লখা, তুই দুপুর বেলা মুর্গীর বড় বেশি দাম নিয়েছিস। বেশি চিটিং করার চেষ্টা করলে কিন্তু তার ঠ্যাং ভাঙবো ! ভেবেছিস কলকাতার বাবু—মাল চেনো নি এখনো !

রবি কাছ থেকে আকস্মিক বকুনি খেয়ে লখা হতচকিত হয়ে যায়। কিন্তু বাবুর হাতে মদের গ্লাস থাকলে সেই সময় তর্ক করতে নেই—এ কথা সে ভালোভাবে জানে, তাই কোনো উত্তর না দিয়ে সে অপরাধীর মতন মাথা নিচু করলো।

রবিরই প্রথম নেশা হয়। তার তেজী শক্তিমান শরীরটা ছটফট করে। সে উঠে দল ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়, একে-ওকে বকুনি দেয়। দোকানের মালিককে তার লাভ-লোকসান বিষয়ে প্রশ্ন করে। শেখর বেশি কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে, জঙ্গলের মাথায় জট বেঁধে অন্ধকার নামা দেখে। তার মনে পড়ে, গতকাল এই সময় সে অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে। জিনিসপত্র গোছাবার সময় সে টের পেয়েছিল তার ছাড়া শার্টের পকেটে চিঠি ছিল—বাড়ির লোক সেই চিঠি সমেতই শার্টটা কাচতে পাঠিয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিঠি। তাই নিয়ে রাগারাগি, মাকে সে বলেছিল... হঠাৎ শেখরের খেয়াল হলো, এখানে এই ক'দিন সে কলকাতার কথা একবারও মনে করবে না ঠিক করেছে !

সাড়ে সাতটায় দোকান বন্ধ, আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে এলো। সেই মেয়েটা এর-ওর কাছে মদ ভিক্ষে চেয়ে তাড়া খাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। সে নিজে নেশায় টলছিল, কিন্তু একটু পরেই সে তার অজ্ঞান মরদকে কাঁধে নিয়ে অবলীলাক্রমে বনের অন্ধকারে মিশে গেল।

সঞ্জয় অল্প হেসে বললো, এদের সঙ্গে সাহেবদের খুব মিল কিন্তু।

অসীম বললো, হ্যাঁ, এরা বেশিরভাগই ক্রিশ্চান।

—না, সেজন্য নয়। দেখছিস না—সাহেবদের মতই—মেয়েদের কোনো আব্রু নেই, মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে, সামান্য ছোট-খাটো উৎসব হলেই এরা মেয়ে-পুরুষে হাত-ধরাধরি করে নাচে, মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার—ঠিক ওয়েস্টার্ন সোসাইটি।

রবি হেসে উঠে বললো, তুই খেলি না তো, তাই তোর এসব ভালো ভালো কথা মনে পড়েছে। খা না একটু !

—না। সঙ্গে নিয়ে চল, বাংলোয় বসে খেয়ে দেখবো।

—এখানে খাবি না কেন?

—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতে হবে তো—সকলের নেশা হলে মুশকিল !

—তাও হিসেব করে রেখেছিস ! হিসেবগুলো একটু ভুলে যা না একদিন। জঙ্গলের মধ্যে ফিরলে কি হবে? রবি চৌধুরী সঙ্গে আছে, কোনো ভয় নেই।

ফেরা-পথের দৃশ্য অন্যরকম। জ্যোৎস্নায় সমস্ত বন ধুয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর এক প্রান্তে এখন সত্যকার নিস্তব্ধতা। রবির বেশি নেশা হয়েছে, সে স্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ইংরিজি গান গাইছে দীর্ঘ গলায়; হঠাৎ গান থামিয়ে উৎফুল্লভাবে দাবি জানালো, আয় সঞ্জয়, তো'তে-

আমাতে নাচি।

—দেখবি, নাচবো দেখবি ?

ফাঁকা রাস্তায় অসীম খানিকটা ছুটে এগিয়ে গেল, তারপর ওদের দিকে ফিরে টুইস্ট নাচতে লাগলো। সেই জ্যোৎস্নায়, দু'পাশে নীরব বৃক্ষ দর্শক, চওড়া রাস্তায় অসীমের আবছা মূর্তিটা খানিকটা অলৌকিক দেখাতে লাগলো, রবি ওর নাচে সুর দিচ্ছে।

শেখর হাততালি দিয়ে তাল দিতে দিতে বললো, আঃ, খুব ভালো লাগছে রে। তুই ঠিক বলেছিস অসীম, এই জঙ্গল থেকে আর বাইরে যাবো না ! এখানে যে ক'দিন আছি, জঙ্গলের মধ্যেই থাকবো, আর মহুয়া খাবো।

৩

পরের দিনই ওদের অবশ্য একবার শহরে যেতে হলো। প্রথমদিন ঠাণ্ডা কুয়োর জলে স্নান করার পর সঞ্জয়ের একটু সর্দি লেগেছে—ওষুধ কেনা দরকার। নেশা করলে পরের দিন ভোরে অসীমের মাথা ধরে—তার অ্যাসপিরিন লাগছে। তা ছাড়াও ওদের খেয়াল হয়েছিল ওরা কেউ চিরুনি আনে নি, একজন কেউ আনবেই—এই ভেবে কেউই নিজে চিরুনি আনে নি। রবির চুল চাপ বাঁধা, কোঁকড়ানো, তার চিরুনি না থাকলেও চলে, শেখরের স্বভাব যখন-তখন বাঁ হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চিরুনির মতন চালানো, কিন্তু অসীম ও সঞ্জয়ের চুল অবাধ্য বিশেষত সঞ্জয় যথেষ্ট শৌখিন প্রকৃতির যতবার সে মুখ ধোয়—ততবারই চুল আঁচড়ে নেওয়া তার চাই, সুতরাং চিরুনি একটা দরকারই।

খবরের কাগজ পড়ার ইচ্ছে অবশ্য কারুরই নেই, কিন্তু মাদ্রাজ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ইন্ডিয়া হারলো কি জিতলো, সে খবরটা অন্তত না জানলে চলে না। তা ছাড়া, সকালবেলা চায়ের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ খাওয়া বহুদিনের অভ্যাস, দু'দিন ডিম না পেয়ে ওরা উসখুস করছে। অসীমের মত এই যে, রান্না নিয়ে বেশি ঝঞ্ঝাট করার মানে হয় না বটে, কিন্তু গরম ভাতের সঙ্গে খানিকটা মাখন পেলে যে-কোনো জিনিসই সুখাদ্য হয়ে উঠবে। একটা মাখনের টিন কিনলে খুব ভালো হয়। সিগারেটেরও স্টক রাখা দরকার।

চৌকিদার রতিলালের বউয়ের খুব অসুখ, সে লোকটা খুব বিব্রত হয়ে আছে। উনুন ধরাচ্ছে, চা বানিয়ে দিচ্ছে, বাথরুমের ট্যাঙ্কে জল ভরছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝেই সে রেললাইনের ওপারে নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। লখা আশেপাশে ঘুরঘুর করছে সব সময়, যে-কোনো হুকুম তামিল করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু রবির ধারণা লোকটা বড্ড বেশি চোর, ওকে দিয়ে সব জিনিস আনানো উচিত নয়।

ডাকবাংলোর পেছন দিকে ফাঁকা মাঠ, সেখান দিয়ে বাজার ও স্টেশন সর্ট-কাট হয়। চা খাবার পর কিছুক্ষণ আলস্য করে, ওরা সবাই শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। যার যা দরকার একেবারেই কিনে আনা ভালো। দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম অবশ্য ওরা সবাই এনেছে, কিন্তু আজ সকালে দাড়ি কামাবার ইচ্ছে কারুরই দেখা গেল না। এই জঙ্গলের মধ্যে আর কে দেখতে আসছে—দরকার কী ওসব ঝামেলার। সঞ্জয় অবশ্য নিজের ধারালো গালে দু'একবার হাত বুলালো, কিন্তু চুল আঁচড়ানোই যাচ্ছে না যখন—

আবার সেই নোংরা বাজার, রেডিওর চিল্লানি, হোটেলের ভালো-ভালো গন্ধ। সেইসব কৌতূহলী চোখ, নীল ডুমো ডুমো মাছি। রাস্তার কাদা শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে বহু মানুষের পায়ের ছাপ আঁকা।

টিনের মাখন পাওয়া গেল না—অতিরিক্ত হলদেটে রঙের স্থানীয় মাখন কিনতে হলো—অত্যন্ত বেশি দাম দিয়ে। চিরুনি জুটলো প্লাস্টিকের সস্তা চিরুনি। একটা দোকান থেকে দশ প্যাকেট সিগারেট কিনতে—সে দোকানের সব সিগারেটই শেষ হয়ে গেল। চটের থলেতে বিছিয়ে গুচ্ছের আলু-পেঁয়াজ-কুমড়ো-পটল নিয়ে বসেছে দু'একজন, কিন্তু ডিমের কোনো দেখা নেই। মঙ্গলবারের হাট ছাড়া ডিম অসম্ভব। একটা হোটেলের সামনে তারের ঝুড়িতে ডিম ঝোলানো রয়েছে, কিন্তু সে ডিম আলাদা বিক্রি হবে না, সুতরাং ওরা সেখান থেকেই চারটে ডিম সিদ্ধ খেয়ে নিলো। বেশ বোঝা যাচ্ছে, জঙ্গলের শান্ত আবহাওয়া ছেড়ে এই নোংরা বাজারে এসে ওরা কেউ খুশি হয় নি। তবু, তৎক্ষণাৎ ফিরে যাবার পক্ষেও একটা কিছু অতৃপ্তি রয়ে যাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা চলে এলো স্টেশনের পাশে। সেই বটগাছ তলার বাঁধানো বেদিতে আজও দশ বারোটা সাঁওতাল মেয়ে খালি ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। পরস্পর জটলা ও হাসাহাসি করছিল, ওদের দেখে থেমে গেল। অসীম বললো, আশ্চর্য দেখ, এখন প্রায় দশটা বাজে, আজও ওরা এখানে বসে আছে। কে ওদের কাজ দেবে বুঝতে পারি না।

রবি জবাব দিলো, সবাই কি আর কাজ পায়, হয়তো দু'একজন কাজ পায়।

— কাল ভোরবেলা যে-ক'জন দেখেছিলাম, আজ এত বেলাতেও তো প্রায় সেই ক'জন দেখছি!

— তুই গুণে রেখেছিলি বুঝি?

— না, ঐ যে নীলপাড় শাড়ি পরা ফচকে মেয়েটা সবার সামনে বসে আছে, কালও তো ওকে দেখেছিলুম। আমার কাজ দেবার হলে আমি ওকেই প্রথমে কোনো কাজ দিতুম।

— তাই দে না। কোনো একটা কাজের ছুতো বানিয়ে নে।

— মন্দ বলিস নি, এদের কয়েকজনকে দিয়ে ডাকবাংলোয় আর একটা ঘর তুলে নিলে হয়।

— ডাকবাংলোয় কেন? জঙ্গলের মধ্যে যে-ভাঙা বাড়িগুলো দেখলুম, সেগুলো নিশ্চয়ই বেওয়ারিস, সেগুলোই ওদের দিয়ে সারিয়ে আমরা নিয়ে নিলে পারি!

মেয়েগুলো হাসি ও কথা থামিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে। ওরা ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানলো। সাঁওতাল মেয়েদের বয়েস ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস সবার নিশ্চিত। নীলপাড় শাড়ি পরা মেয়েটির বয়েসই কম সবচেয়ে। অন্য মেয়েরা চোখ ফিরিয়ে আছে, কিন্তু সে এই নতুন চারটে বাবুর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। কালো পাথরের মতন আঁট স্বাস্থ্য মেয়েটার, সাদা শাড়িটা কিন্তু বিস্ময়কর রকমের ফরসা। ওদের কারুরই শাড়ি ময়লা নয়, জঙ্গলে থাকে, কুলির কাজ করতে এসেছে, কিন্তু ধুলোবালি মেখে আসে নি। এমন কি ওদের মুখ ও শরীরের চকচকে চামড়া দেখলে মনে হয়—ওদের শরীরেও এক বিন্দু ময়লা নেই।

যারা ভদ্দরলোক, যারা বাবু, তারা প্রকাশ্যে অন্তত সাঁওতাল মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে না—এইটাই অলিখিত নিয়ম। এইসব অঞ্চলের হাটে-বাজারে, রাস্তায় অনবরত সাঁওতাল মেয়েরা ঘোরে তাদের ব্লাউজহীন বুক ও ছেঁড়া শাড়ি নিয়ে—কিন্তু কেউ তাদের দিকে চেয়ে দেখবে না। কেউ বলবে না, বাঃ, ঐ মেয়েটির স্বাস্থ্য কি সুন্দর! কিন্তু এই চারজন—এরা নতুন বাবু, এরা কলকাতার লোক, এরা বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলোকে দেখছে। রবি এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে নীলপাড় মেয়েটির দিকে।

শেখর বললো, হঠাৎ যেন এদের দেখলে আগেকার সেই ক্রীতদাস-দাসীদের বাজারের কথা মনে পড়ে। ওরা যেন নিজেদের বিক্রি করার জন্য বসে আছে, যদি কেউ কখনো কেনে।

রবি বললো, চল না, আমরা প্রত্যেকে এক-একজনকে কিনে নিয়ে যাই।

— উহুঁ এসব বাজে মতলব করিস নি, ঝঞ্ঝাট হবে অনেক। এটা সত্যি আশ্চর্য লাগে, ওরা রোজ চাকরি পায় না, তবু ওরা হাসাহাসি করে কি করে? দিব্যি তো বসে হাসছিল এতক্ষণ।

সত্যিই ওরা চলে যাবার জন্য পেছন ফিরতেই সব মেয়েরা কি একটা কথায় একসঙ্গে হেসে উঠলো, হাসির ধমকে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়লো, সেই নীলপাড় শাড়ি পরা ফচকে মেয়েটা হাতের ঝুড়ি উলটো করে মাথায় বসিয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগলো। রবি অনেকবার পেছন ফিরে নিজের ঠোঁটে সেই হাসির জবাব দিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, আশ্চর্য।

শেখর আবার বললো, সত্যি কুলি-মজুরের কাজ করুক আর যাই করুক, হাসিটা ওদের রানীর মতন।

সঞ্জয় বললো, রানীর মতন? তুই ক'টা রানীকে হাসতে দেখেছিস রে? স্বচক্ষে একটাও রানী দেখেছিস?

সিনেমায় অনেক দেখেছি!

ফেরার পথে মাঠের সর্ট-কাট দিয়ে না এসে ওরা পাকা রাস্তাই ধরেছিল, দেখা গেল, দূর থেকে রতিলাল ছুটতে ছুটতে ওদের দিকেই আসছে। কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, রেঞ্জারবাবু আসিয়েছেন, আপলোককে বোলাতে বুললেন।

রবি ভুরু কুঁচকে বললো, কেন, রেঞ্জারবাবু আমাদের ডাকবেন কেন?

— সাহেব তো বাতাতা, আপলোককা কোনোই রিজার্ভ নেহি থা।

— জরুর হ্যায়!

— ঠিক হ্যায়, উনসে বাতচিত তো কর লিজিয়ে। সাহাব বোলা তুরন্ত সাহেবলোগকো বোলাও, ঐসি লিয়ে হম—

রবি ধমকে উঠে বললো, রেঞ্জার তোমাদের কী এমন সাহেব যে, ডাকলেই যেতে হবে? সাহেবকে গিয়ে বলো, আমাদের যখন সময় হবে তখন যাবো। এখন আমাদের সময় হবে না।

রতিলাল তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে রবি ফের ধমক দিয়ে বললো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও! তোমার সাহেবকে গিয়ে বলো, আমরা এক ঘণ্টা বাদে ফিরবো—সাহেব যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন।

বন্ধুদের দিকে ফিরে নিম্নস্বরে রবি বললো, ডাকামাত্র গেলে প্রেস্টিজ থাকে না। আমরা ওর হুকুমের চাকর বুঝি? চল্, একটু দেরি করে যাবো, শহরের ঐ দিকটা বরং দেখে আসি।

ওরা উলটো দিকে ফিরে শহরের অন্যদিকে রওনা হলো। এদিকেও বিশেষ কিছু নেই, তবু চোখে পড়লো একটা অসমাপ্ত স্কুল, ইঁটখোলা, শিবমন্দির, কয়েক ঘর মধ্যবিত্তর বাড়ি। কিছুদূর যেতে না যেতেই ফাঁকা মাঠ শুরু হলো। দু'একটা সরষে- ক্ষেতে একরাশি ফুল ধরেছে, হলুদ-রঙা ঢেউ উঠছে হাওয়ায়। মাঠের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের পাথর, পাথরটার মাথার ওপর ঠিক ছাতার মতন একটা পাকুড়গাছ। ওদের তো এদিকে সত্যি কোনো দরকার নেই, শুধু খানিকটা সময় কাটানো, তাই ঐ পাথরটার ওপর কিছুক্ষণ বসে আবার চলে যাবে এই ভেবে পাথরটার দিকে এগুলো।

সকাল ন'টাও বাজে নি, তবুও এর মধ্যেই রোদ চড়া হয়ে এসেছে। এদিকে জঙ্গল নেই, বহুদূর পর্যন্ত ঢেউ খেলানো মাঠ। সেই মাঠ জুড়ে ঝকঝক করছে রোদ্দুর। এক ঝাঁক হরিয়াল উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে, দূরে শোনা গেল ট্রেনের শব্দ।

এরকম জায়গায় এলেই হঠাৎ মনে হয় যে, পৃথিবীটা মোটেই গোল নয়, চৌকো। পৃথিবী কখনো ঘোরে না, স্থির হয়ে থাকে। সময়ের কোনো গতি নেই। রবি সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে দিয়ে বললো, মাত্র কাল সকালে এসেছি—অথচ এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যেন অনেক কাল ধরে

এখানে আছি।

মাঠের মাঝখানে এই জায়গাটা টিবির মত উঁচু হয়ে উঠেছে, বেশ পরিষ্কার। খুব ভালো পিকনিকের জায়গা হয়, না রে?—রবি বললো।—তা কলকাতার কাছাকাছি এই রকম জায়গা হলে পিকনিকের পক্ষে ভালো হতো, কিন্তু আমরা আছি জঙ্গলের মধ্যে, সুতরাং বনভোজন বলতে যা বোঝায়—

কথা বলতে বলতে ওরা থেমে গেল। পাথরটার পাশ থেকে ছোটছেলের খিল খিল হাসি ও মেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছিল। ওরা টিবিটার ওপর উঠে এসে পাথরটার এ-পাশে তাকালো। দু'টি মহিলা, একটি তিন চার বছরের বাচ্চা ছেলে ও একজন বুড়ো দরওয়ান।

মহিলা দু'টি চমকে ওদের দিকে তাকালো, ওরাও এক পলক চেয়ে দেখে ভাবছিল, চলে যাবে কিনা, এমন সময় শেখর পরম স্বস্তির সঙ্গে বলে উঠলো, ঠিকই মনে হয়েছিল কাল, চেনা-চেনা—তুমি জয়া নও? প্রেসিডেন্সি কলেজের—

দু'জনের মধ্যে যে-মেয়েটির স্বাস্থ্য ঈষৎ ভারী, প্রতিমার মতন মুখের গড়ন—তার মুখে ক্ষণিক আশঙ্কা ও প্রতীক্ষা ফুটে উঠেছিল, তারপরই খুশিতে ঝলসে উঠলো, বললো, আরেঃ, তাই তো, শেখরবাবু; আমিও প্রথমটায় ভেবেছিলুম—কাল সকালে আপনারাই এসেছেন, না? বম্বে মেলে—

— তুমি কি করে জানলে?

— বাঃ, কাল আমাদের গেটের পাশ দিয়ে আপনাদের যেতে দেখলুম, এখানে তো কেউ বড় একটা আসে না।

— তোমরা ঐ ত্রিপাঠীদের বাড়িতে থাকো বুঝি? কাল তো তোমরা ব্যাডমিন্টন খেলছিলে, আমাদের দেখলে কখন?

— মেয়েরা খেলার সময়েও সব দিকে চোখ রাখে। এখানে হঠাৎ এলেন যে?

— তোমরা এখানে কেন?

— বাঃ, এখানে তো আমার শ্বশুরবাড়ি!

—ও, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?

— কবে—ছ'বছর আগে। এই যে আমার ছেলে, আর এ আমার বোন, অপর্ণা।

চেহারা দেখলে দু'বোন বলে চেনাই যায় না, অপর্ণা ছিপছিপে, একটু বেশি লম্বা, কমলা রঙের শাড়িটা এমন আঁট করে পরা যে একটু দূর থেকে দেখলে শালোয়ার-কামিজ বলে ভুল হয়। সে গাছের গুঁড়িতে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাতে একটা বড় লাল-সাদা বল, এবার বলটা ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে বললো, নমস্কার। আপনারা বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

অপর্ণা হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে, যার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকাতে হয়। প্রথমেই এক দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকা যায় না। ওর বয়েস কুড়ি-একুশের বেশি হবে না, কিন্তু ওর মুখে-চোখে একটা বিরল সপ্রতিভ সরলতা আছে। প্রথম পরিচয়ের কোনোরকম লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই। সাবলীলভাবে ও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুললো, কথা বললো ঝর্নার জলের মতন স্বচ্ছ গলায়।

শেখর উত্তর দিলো, হ্যাঁ, বেড়াতেই। আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—এর নাম রবি চৌধুরী, ভালো স্পোর্টসম্যান যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল। ওর নাম অসীম মল্লিক, ওদের নিজেদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম আছে, আর ও হচ্ছে সঞ্জয় ব্যানার্জি—জয়া, তুমি ওকে দেখেছো বোধহয়, প্রেসিডেন্সিতে আমাদের চেয়ে এক ইয়ার জুনিয়র ছিল, এখন পাটকলে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে—লেবাররা অবশ্য ওর কাছ থেকে ওয়েলফেয়ার

চায় না।

জয়া বললো, রুণি, আর ইনি হচ্ছেন শেখর সরকার, আমরা একসঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে হিস্ট্রি অনার্স পড়তুম। উঃ, কতদিন পর দেখা—সাত আট বছর, না? সেই পারমিতার বিয়ের সময়।

শেখর বললো, আমিও কাল তোমায় এক ঝলক দেখে চিনতে পেরেছিলুম, তারপর ত্রিপাঠীদের বাড়ি শুনে কিরকম গুলিয়ে গেল। আমার বন্ধুদের বললুম। ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না, তোমার মতন কোনো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে।

জয়া এ কথায় কিছু বললো না, শুধু মুখ টিপে হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনার নিশ্চয়ই এখনো বিয়ে হয় নি?

— না! কেন?

— আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

শেখর একটু বিব্রত হয়ে বললো, ভ্যাট! কিন্তু তোমার এই ধ্যাধ্‌ধেড়ে গোবিন্দপুরে বিয়ে হলো কি করে?

— আমার মোটেই এখানে বিয়ে হয় নি। আমার বিয়ে হয়েছে বর্ধমানে আমার শ্বশুরের এখানে একটা বাড়ি আছে—এখানকার জলে ওঁর খুব উপকার হয় বলে মাঝে মাঝে আসেন—আমিও সঙ্গে আসি।

অপর্ণা বললো, আপনারাই বা হঠাৎ এখানে বেড়াতে এলেন কেন?

অন্য কেউ কিছু উত্তর দেবার আগেই রবি বললো, ঐ যে—এখানকার জল খুব ভালো, সেই শুনেই এলাম।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। অপর্ণা ঠোঁট উল্টে বললো, জল খেতে আবার কেউ আসে নাকি? আমি তো পাঁচদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। এমন বিশ্রী জায়গা—মেজদি'রা যে কি করে থাকে—একটা কিছু দেখবার নেই—

শেখর বললো, কেন, জঙ্গলটা তো বেশ সুন্দর।

— আমার জঙ্গল ভালো লাগে না।

শেখর বললো, আমরা ইচ্ছে করেই এরকম একটা নাম-না-জানা জায়গায় এসেছি, জঙ্গলের মধ্যে নিরিবিলি কাটাবো বলে—কিন্তু তোমরাও যে কেন এই সময়ে এলে! এখন সন্দেহ হচ্ছে।

— কেন, আমরা এসে কি অসুবিধে করলুম?

— তোমাদের দেখার পর আমার বন্ধুরা কি আর জঙ্গলের নিরিবিলিতে থাকতে চাইবে?

জয়া হাসতে হাসতে বললো, তাহলে তো আমরা এসে খুব ভালোই করেছি।

— কেন?

— চার চারটে এমন ভালো ভালো ছেলে জঙ্গলে এসে সন্ন্যাসী হতো—আমরা সেটা বন্ধ করতে পারবো।

হাসি শেষ করে শেখর বললো, তোমার ছেলেটি বেশ সুন্দর হয়েছে, জয়া। নাম কী ওর?

— দেবকুমার।—তোমার নাম বলো, কাকুদের কাছে তোমার নাম বলো ছোটন!

— জয়া, তোমার স্বামী এখানে আছেন? আলাপ করতে হবে।

— না।

— উনি তোমাদের সঙ্গে আসেন নি বুঝি?

জয়া এ কথার উত্তর তক্ষুনি না দিয়ে বোনের দিকে তাকালো। অপর্ণা দ্রুত ওদের চারজনের মুখের প্রতীক্ষা দেখে নিয়ে—হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে মাটি থেকে বলটা তুলে নিলো। তারপর জয়ার ছেলের হাত ধরে বললো, চলো ছোটন, এবার বাড়ি যাই আমরা। এ কি, বলটা ফেলে দিলে?

চলো, বাড়ি যাবো—দাদু একা বসে আছেন!

জয়া অপেক্ষারত বুড়ো দারোয়ানকে বললো, পরমেশ্বর খোকাবাবুকে নিয়ে তুমি এগিয়ে চলো, বাড়ি যেতে হবে। ঐ বলটা কুড়িয়ে নাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লক্ষ্মী ছোটন, আর হাঁটে না এখন, দরওয়ানজীর কোলে উঠে পড়ো, লক্ষ্মীসোনা, বিকেলবেলা আবার বেড়াতে বেরুবো, তখন তুমি আবার নিজে নিজে হাঁটবে।—রুণি, ওর জুতোটা পরিয়ে দে তো—

দরওয়ান ছেলেকে কোলে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে জয়া মাটির দিকে চোখ নিচু করলো, গলার স্বরে খুব দুঃখ ফুটলো না, কিছুটা উদাসীনভাবে বললো, আমার স্বামী বেঁচে নেই।

— সে কি?

— বিলেতে একটা ট্রেনিং নিতে গিয়েছিল, তারপর সেখানে নিজের ঘরে কেউ এসে ওকে খুন করে যায়...কাগজে বেরিয়েছিল...।

একটুক্ষণ ওরা সবাই চুপ করে রইলো। জয়ার ভরাট স্বাস্থ্য, সারা পিঠজোড়া কালো কোঁকড়ানো চুল, নানান রঙে রঙিন একটা ছাপার শাড়ি পরেছে—সেই জন্যই বোধহয় খবরটা বেশি আঘাত দিলো।

অসীম বললো, হ্যাঁ, বছর দু'এক আগে—কাগজে আমিও দেখেছিলাম মনে আছে, ইঞ্জিনিয়ার কেন খুন হয়েছিল, কারণ জানা যায় নি। আপনারা কিছু আনতে পারেন নি?

জয়া ও অপর্ণা একবার চোখাচোখি করলো, তারপর জয়া অনেকটা স্বাভাবিক শান্ত গলায় বললো, না। ওখানকার পুলিশ শেষ-পর্যন্ত জানিয়েছে—খুন নয়, আত্মহত্যা।

শেখর আঁৎকে উঠে বললো, আত্মহত্যা! মানুষ এখনো আত্মহত্যা করে নাকি? আত্মহত্যা কেন করেছিলেন?

জয়া ও অপর্ণা চকিতে আরেকবার চোখাচোখি করলো। এবার যে একটা ছোট্ট বিষণ্ণ নিঃশ্বাস উড়ে গেল, সেই সঙ্গেই ভেসে এলো জয়ার উত্তর, না, সেরকম কোনো কারণ কেউ জানতে পারে নি।

যে জন্যই হোক, রবির কাছে যেন মনে হলো, খুনের চেয়ে আত্মহত্যাটা অপমানজনক। কেননা, সে বেশ রাগত সুরেই বলে উঠলো, আত্মহত্যা মোটেই নয়, ওরকম একজন লোক শুধু শুধু আত্মহত্যা করতেই বা যাবেন কেন! তাও বিলেতে বসে? ওখানকার পুলিশ কালপ্রিটকে ধরতে পারে নি, তাই আত্মহত্যা বলে চালিয়েছে। আজকাল ওখানকার পুলিশও হয়েছে আমাদেরই মতন, একেবারে যা-তা, এই তো সেদিন অতবড় একটা মেল ট্রেন ডাকাতি হয়ে গেল ইংলন্ডে, পুলিশ তো একজনকেও—।

অপর্ণাকে দেখা গেল যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সে বিষয় পরিবর্তনের এই সুযোগ বিন্দুমাত্র উপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কোন ট্রেন ডাকাতি?—এবং সে রবির কাছ থেকে ট্রেন ডাকাতির পুরো গল্পটা শুনতে চেয়ে ওদের মাঝখানে সরে এলো।

টিলা থেকে জয়াদের বাড়ি প্রায় পনেরো মিনিটের পথ, সেই পথটুকু আসতে আসতে গল্প ঘুরে গেল অন্যদিকে; যখন গেট পর্যন্ত পৌঁছলো তখন জয়ার মুখেও আবার ক্ষীণ হাসি ফুটেছে, অপর্ণা সহজে হাসতে চায় না—ঠোঁট অল্প ফাঁক করে বুঝিয়ে দেয় যে, আরেকটু ভালোভাবে বলতে পারলে ঠিক হাসতুম! রবি তবু তাকে হাসাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং না হাসলেও অপর্ণার হাঁটার ছন্দে লঘুতা এসেছিল। পরমেশ্বর আগেই পৌঁছে দেবকুমারের হাত ধরে গেট খুলে দাঁড়িয়ে আছে। জয়া বললো, আসুন, ভেতরে এসে বসবেন একটু। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে যান। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আপনাদের ভালোই লাগবে। অনেক বিষয়ে পড়াশুনো করেছেন।

রবি ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, শেখর বললো, না, এখন থাক। পরে আসবো রবি, রেঞ্জারের সঙ্গে একবার তো দেখা করতেই হবে।

রেঞ্জারের কথা রবি ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছিল, এখন মনে পড়তেই বললো, হ্যাঁ, ও ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা দরকার।

অপর্ণা বললো, তা হলে কাল সকালে আপনারা আসুন–না, আজ বিকেলে হবে না। বিকেলে আমাদের একটু ঘাটশীলায় যাবার কথা আছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে চলে আসুন, এখানেই আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।

ওরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ চমৎকার! আপনাদের বাড়িতে ডিম আছে তো?

— তা আছে, কিন্তু হঠাৎ শুধু ডিম কেন?

সঞ্জয় বললো, সকালে চায়ের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ না পেয়ে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। এখানে একদম ডিম পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়া হাসতে হাসতে বললো, যাচ্ছে না বুঝি? ঐ জঙ্গলের মধ্যে ডাকবাংলোয় কেউ এক রাত্তিরের বেশি থাকে? খাবার–দাবার এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না ওয়ায়। আমাদের বাড়িতে এসে থাকুন না—এখানে অনেক ঘর আছে।

শেখর বললো, না না, আমরা জঙ্গলেই থাকবো ভেবে এখানে এসেছি। যদি অবশ্য খুব বিপদে পড়ি; তা হলে এখানে চলে আসতে পারি।

— বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে বুঝি?

— বলা যায় না। ডাকবাংলোয় রিজার্ভেসান নিয়ে একটু ঝামেলা করছে। দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, কাল সকালে আসবো।

— ঘুম থেকে উঠেই চলে আসবেন। আমাদের কিন্তু খুব সকাল সকাল চা–খাওয়ার অভ্যেস!

ডাকবাংলোর সামনে জিপ দাঁড় করানো। বারান্দায় ইজিচেয়ারে রেঞ্জার বসে বসে পা দোলাচ্ছে খাকি প্যান্ট ও সাদা–শার্ট পরা শক্ত সমর্থ পুরুষ, হাতে পাইপ। লোকটির মুখখানা কঠিন ধরনের কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করা, লোকটি একা একাই বসে আপন মনে হাসছে অথবা গান করছে।

রবি সিগারেট অর্ধেক অবস্থাতেই ফেলে দিলো, পকেট থেকে চুরুট বার করে ধরালো। ওর ধারণা চুরুট মুখে থাকলে ওকে খুব ভারিক্কী দেখায়। গলার আওয়াজও তখন ইচ্ছে করে গম্ভীর করে ফেলে। একাই আগে গিয়ে বললো, নমস্কার! লোকটি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর হাত জোর করে দু'বার বললো, নমস্কার নমস্কার। আপনারাই বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছেন? কী সৌভাগ্য আমাদের, এসব জংলা জায়গায় তো কেউ আসে না—লোকে যায় ঘাটশীলা, তবু আপনারা এলেন—বসুন, বসুন।

রবি প্রশ্নবোধক ঝোঁক দিয়ে বললো, আপনি?

লোকটি বললো, আমি এ অঞ্চলের ফরেস্ট রেঞ্জার আমার নাম সুখেন্দু পুরকায়স্থ, বেহারেই ছেলেবেলা থেকে...এ অঞ্চলে ট্যুরে এসেছিলাম হঠাৎ ফরেস্টার বললে, কে চারজন আন অথরাইজড় লোক বাংলোয় এসেছে। তা আমি বললুম, আরে মশাই যান না, গিয়ে দেখুন তারা

কে, বাঘ-ভাল্লুক তো নয়। তা জঙ্গলের চাকরিতে বাঘ-ভাল্লুকেও ভয় করলে চলে না—তা ওরা নিশ্চয়ই ভদ্দরলোক...ফরেস্টার এমন ভীতু, নিচে আসতে চায় না।

রবি বললো, আন-অথরাইজড হবার কি আছে? খালি বাংলো দেখে এসেছি, যা চার্জ লাগে দেবো। এর মধ্যে আবার গণ্ডগোলের কি আছে?

লোকটি অত্যন্ত বিনীতভাবে হেসে বললো, তা তো বটেই, তা তো বটেই, ঠিক কথা বলেছেন। ফরেস্ট বাংলো খালি থাকলেও সব সময় লোককে দেবার নিয়ম নেই অবশ্য, তাছাড়া এই ইয়ে, মানে, রেলওয়ে রিসিটকে রিজার্ভেসান স্লিপ বলে চালানোরও কোনো সিস্টেম নেই এদিকে, তবে, মানে, আপনারা এসেছেন—

রবি এই প্রথম হাসলো। দেখে মনে হয়, অতিকষ্টে হাসতে রাজি হলো। চুরুট আবার জ্বালতে জ্বালতে বললো, ওসব চৌকিদারের জন্য, সে তো খুলতেই চাইছিল না, তাই আর কি—আপনাদের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝিয়ে বলতুম। ফরেস্টারই বা আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি কেন?

—দরজার চাবি খোলার দায়িত্ব চৌকিদারের। এই সামান্য অপরাধেই তার চাকরি যেতে পারে। দেখবেন ওর চাকরিটা যেন না যায়, গরিব লোক, তাছাড়া শুনলুম বৌয়ের অসুখ। আমি অবশ্য চাকরি দেবার বা খাবার লোক নই।

— আপনি এবার কাজের কথাটা বলুন তো? আপনার বক্তব্যটা কি? বুঝতেই পারছেন, আমরা এসেছি যখন—তখন চলে তো আর যাবো না! রিজার্ভেসান থাক আর নাই থাক—আমরা এখানে থাকবোই। তার জন্য কি করতে হবে আমাদের? আপনি কিছু আলাদা টাকা চাইবার জন্য এত ভূমিকা করছেন? কত টাকা বলুন, বিবেচনা করে দেখবো।

লোকটি হঠাৎ স্থিরভাবে রবির চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর অদ্ভুতভাবে একরকমের হাসলেন। গলার স্বর বদলে অসহায়ভাবে বললেন, আমাদের এ লাইনে উপরি রোজগার যে একেবারে নেই, সে কথা বলতে পারি না, আছে বটে, কন্ট্রাক্টররা যখন চুক্তির বেশি গাছ কাটে তখন পাই। কিন্তু ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে ঘুস নেবার অভ্যেস আমাদের নেই। এর আগে কেউ দিতেও চায় নি। আপনারা ক'দিন থাকবেন?

— কোনো ঠিক নেই। সাতদিন, দশদিন, কিছুই ঠিক করি নি।

— এই জঙ্গলে সাতদিন দশদিন থাকবেন?

— কোনো ঠিক নেই। যে-ক'দিন আমাদের ভালো লাগবে সেই ক'দিন থাকবো!

— তাহলে তো কিছুই বলার নেই। আপনাদের তো আমি চলে যেতে বলতে পারি না। আর আমি বললেই বা আপনারা যাবেন কেন! ডিভিশনাল কনজারভেটরের এদিকে আসবার কথা আছে, তিনি সঙ্গে বৌ নিয়ে চলাফেরা করেন সব সময়, তাঁর আবার শ্বশুরবাড়ির এদিকেই—।

রবি রুক্ষ গলায় বললো, ঠিক আছে, কনজারভেটর এলে তাঁর সঙ্গেই কথা বলবো, আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলে লাভ নেই।

শেখর এবার এগিয়ে এসে বললো, বাংলো খালি আছে বলেই আমরা আছি। কনজারভেটর বা অন্য কেউ এলে আমরা তখুনি ছেড়ে চলে যাবো। আমাদের থাকবার জায়গার অভাব নেই।

নতুন লোকের সঙ্গে কথা শুরু করার জন্যই বোধহয় রেঞ্জার আবার আগেকার বিনীত ভাব ফিরিয়ে আনলেন, না না, আপনাদের চলে যেতে হবে তা তো বলি নি। কনজারভেটর আসতেও পারেন, না আসতেও পারেন। আসবার কথা আছে, কিন্তু কথা থাকলেও ওঁরা সব সময় আসেন না। ওঁরা হলেন বড় অফিসার সব সময় কথার ঠিক রাখা তো ওঁদের মানায় না। তবে যদি আসেন, তবে ডি. এফ. ও. সাহেবও আসবেন বোধহয়, সাধারণত তাই আসেন। রাত্তিরে থাকলে—

দু'খানা ঘরই ওঁদের লাগে।

—ঠিক আছে, তিনি যে মুহূর্তে আসবেন, সেই মুহূর্তেই আমরা ঘর ছেড়ে দেবো।

রবি শেখরকে সরিয়ে দিয়ে বললো, কেন, ছাড়বো কেন? এটা কি কনজারভেটরের শ্বশুরবাড়ি নাকি? উনি যখন খুশি আসবেন, তখনি ওনাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে?

শেখর রবির দিকে একটা হাত তুলে বললো, আঃ, রবি, মাথা গরম করিস নি। ওদের যদি সে রকম কোনো আইন থাকে, আমরা বাংলো ছেড়ে দিয়ে জয়াদের বাড়ি চলে যাবো!

রবি বললো, না, আমি জয়াদের বাড়ি যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। এই লোকটা কি হিসেবে বলছে আমাদের ঘর ছাড়তে হবে?

রেঞ্জার তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, তাই কি আমি বলেছি! ঘর আপনাদের ছাড়তেই হবে—এমন কোনো কথা নেই। আমি বলেছি যদি কনজারভেটর সাহেব আসেন এবং যদি থাকতে চান তাছাড়া, সেদিন সাহেবের মেজাজ কী রকম থাকে, তার ওপর নির্ভর করছে। মেজাজ ভালো থাকলে তিনি আমায় ডাকেন সুখেন্দু বলে, আর গরম থাকলেই বলবেন পুরকাইট! তেমনি মেজাজ ভালো থাকলে তিনি হয়তো আপনাদের অনেক খাতির করবেন, আপনাদেরই এখানে থাকতে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবেন অন্য বাংলোয়! আবার খারাপ থাকলে প্রথমেই চৌকিদারের চাকরি যাবে, তারপর বুঝলেন না, অত বড় বড় সাহেবদের তো মেজাজ একরকম থাকলে মানায় না!

শেখর হাসতে হাসতে বললো, ভারি তো একজন সরকারী অফিসার, তার মেজাজে আমাদের কি আসে যায়? তার মেজাজ ভালো–খারাপ থাকার ওপরই আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে নাকি? রেঞ্জারও স্মিত হেসে বললো, না স্যার আপনাদের ভাগ্য কেন নির্ভর করবে! অন্যদের ভাগ্য...! বড় অফিসারদের তো মেজাজ না থাকলে মানায় না!

রবি বললো, কী মুশকিল এত কথার দরকারটা কি! ডাকবাংলোয় থাকা কি একটা বিরাট ব্যাপার নাকি? আফটার অল, পাবলিক প্রপার্টি, খালি রয়েছে তাই আছি। তার আবার এত ঝামেলা।

লোকটি হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা আমি চলি। নমস্কার।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, উইস ইউ ভেরি গুড টাইম। ভাববেন না, আমি আপনাদের চলে যাবার কথা বলতে এসেছিলাম। আপনারা থাকলে আমার কোনো স্বার্থও নেই, ক্ষতিও নেই। আমি শুধু বলতে এসেছিলাম, দেখবেন চৌকিদারটার চাকরি না যায়। কনজারভেটর এলে সেই দিকটা একটু দেখবেন।

— শুধু শুধু ওর চাকরি যাবে কেন?

সুখেন্দু পুরকায়স্থ এবার মলিনভাবে হাসলেন। বিষণ্ণভাবে বললেন, এক ডাকে সাড়া দিতে পারে নি বলে আমি অন্তত চারজন চৌকিদারের চাকরি যেতে দেখেছি। এ লোকটার তো আবার বউয়ের অসুখ!

তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে জিপে গিয়ে উঠলেন। আবার একবার হেসে গাড়ি ঘোরালেন। চলে যাবার পর শেখর বললো, লোকটা ভালো কি খারাপ ঠিক বোঝাই গেল না। আজকাল বেশিরভাগ লোককেই বোঝা যায় না।

রবি বললো, লোকটা দু'চারটে টাকা বাগাবার তালে ছিল নিশ্চয়ই। শেষ পর্যন্ত সাহস পেলো না।

— আমার তা মনে হয় না।

— যাকগে, এ পর্যন্ত তো চুকলো। এরপর কনজারভেটর এলে দেখা যাবে। রতিলাল, এ রতিলাল, চা বানাও—

পরক্ষণেই রবি প্রসঙ্গ বদলে বলে, তোর ঐ জয়া মেয়েটা কিন্তু বেশ! খুব স্যাড—এর মধ্যেই স্বামী মারা গেছে—তোর সঙ্গে ওর কিছু ছিলটিল নাকি?

শেখর অন্যমনস্কভাবে বলে, না, সেরকম কিছু না। দেখলি না, ওর বিয়ে হয়ে গেছে—সে খবরই জানতাম না!

৪

একটা বিচিত্র রঙিন পাখির পালক উড়তে উড়তে এসে পড়লো অতসী ফুলগাছগুলোর ওপরে। সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে পালকটা কুড়িয়ে নিলো। কোন পাখির পালক সেটা দেখার জন্য চাইলো এদিক-ওদিক। পাখিটাকে দেখা গেল না। অন্যমনস্কভাবে সঞ্জয় এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

ডাকবাংলোর সীমানার ঠিক প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যেই একটা সিমেন্টের বেঞ্চ বাঁধানো রয়েছে, সঞ্জয় একা গিয়ে বসলো সেটার ওপর। রঙিন পালকটা নিজের মুখে বুলোতে লাগলো। পালকটা যেন ফুল, নাকের কাছে সেটা এনে সঞ্জয় গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলো। কোনো পাখির গন্ধও সেটাতে লেগে নেই।

সিমেন্টের বেঞ্চটার এক পাশে কয়েকটা বনতুলসীর আগাছা হয়ে আছে। দুটো ফড়িং একসঙ্গে একটা ফুলের ওপর বসার চেষ্টা করছে। ঐটুকু ছোট একটা ফুলের ওপর দু'জনের বসার জায়গা নেই, ওরা দু'জনে মারামারি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে—আবার এসে বসছে সেই একই ফুলে। আরও তো ফুল রয়েছে, তবু ঐ একটা ফুলের ওপরই বসার জন্য দু'জনের লোভ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সঞ্জয় আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

অপর্ণাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। মিঃ বিশ্বাসের মেয়ে অনুরাধার সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল। সেইরকম টিকোলো নাক, সেইরকম ভুরুর ভঙ্গি, বেশি উজ্জ্বল চোখ। অথচ অপর্ণা জয়ার বোন—সুতরাং মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকার কথাই নয়। তবু অপর্ণাকে দেখলেই অনুরাধার কথা মনে পড়ে। কিন্তু অনুরাধার চেয়েও তার বাবা মিঃ রথীন বিশ্বাসের কথা মনে পড়ছিল সঞ্জয়ের। অথচ ওসব কথা আর মনে করবে না বলেই তো সঞ্জয় বেড়াতে এসেছে বন্ধুদের সঙ্গে।

শ্যামনগরের জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বিশ্বাস। শুধু ম্যানেজার নয়, তাঁর শ্বশুরের কোম্পানি—সুতরাং অর্ধেক মালিকও বলা যায়। লম্বা শরীর, বাহান্ন বছর বয়সেও অটুট স্বাস্থ্য, এখনো টেনিস খেলতে হাঁপান না। সঞ্জয় সামান্য লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার—তার সঙ্গে মিঃ বিশ্বাসের খুব বেশি অন্তরঙ্গতা থাকার কথা নয়, কিন্তু সঞ্জয়ের কাকার সঙ্গে তিনি বিলেতে এক ফ্ল্যাটে ছিলেন ছাত্রজীবনে—সেই সূত্রে তিনি সঞ্জয়কে বাড়িতে ঘন ঘন ডেকে পাঠান। সঞ্জয়ের দিকে হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলেন সঞ্জয়, আজ সন্ধেটা কি করা যায় বলো তো! এ উইকটা বড্ড খাটুনি গেছে—চলো, গাড়ি নিয়ে কলকাতায় ঘুরে আসা যাক। গ্রেট ইস্টার্নে সাপার খেললে কেমন হয়? টেলিফোন করে দ্যাখো না—একটা টেবল্ পাওয়া যাবে কিনা। বাড়িতে বসে কোয়ায়েট ইভনিং কাটাবো, বুঝলে, ওটা আমার ধাতে সয় না!...বিলেতে থাকার সময় তোমার কাকার সঙ্গে এক একদিন সন্ধেবেলা...আমার গিন্নী আবার আশেপাশে আছেন কিনা দেখো—উনি এসব শুনলে আবার...আঃ, সে-সব গুড ওল্ড ডেইজ।

অনেক বড় বড় অফিসার বাড়ি ফিরেই পোষা কুকুরকে আদর করেন, কুকুর নিয়েই সারা সন্ধেটা কাটিয়ে দিতে পারেন। তেমনি, সঞ্জয় বুঝতে পারে, মিঃ বিশ্বাস বাড়ি ফিরে আরাম করে গা ছড়িয়ে বসার পর একজন শ্রোতা চান। সে শ্রোতা নিজের স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে হলে চলবে না,

চাকর-বাকর বা আত্মীয়স্বজন হলেও হবে না। একজন যুবক, শক্ত সমর্থ পুরুষ—তার কাছে মিঃ বিশ্বাস নিজের যৌবনের গল্প বলবেন। বোঝাতে চাইবেন, তাঁর নিজের যৌবনে তিনি এখানকার যে-কোনো যুবকের চেয়েও দুর্ধর্ষ ছিলেন, শোনাবেন নিজের নানান দুঃসাহসিক কীর্তি ও কৃতিত্ব। সেই যুবকের প্রতি তিনি প্রচ্ছন্ন স্নেহের সুরে নানান হুকুম করবেন—তার সামনে দুরন্তবেগে গাড়ি চালিয়ে কিংবা দু'তিন ধাপ সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে তিনি প্রমাণ করতে চাইবেন—এখনো তিনি যে-কোনো যুবকের চেয়ে বেশি যুবক। সঞ্জয় এ ব্যাপারটা টের পেয়েছিল, বুঝেছিল এই জন্যই প্রতি সন্ধেবেলা জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বিশ্বাস তাকে ডেকে পাঠান। বুঝতে পেরেও সঞ্জয় বিশেষ কিছু আপত্তি করে নি। কারণ, মিঃ বিশ্বাস কথাবার্তা বেশ ভালোই বলতে পারেন। অনবরত নিজের সম্পর্কে গল্প করলেও রসিকতাবোধ আছে খানিকটা। জেনারেল ম্যানেজারের ডাক অগ্রাহ্যও করা যায় না।

তা ছাড়া অনুরাধার সঙ্গে দেখা হবার আকর্ষণও ছিল। অনুরাধার দিকে সঞ্জয় কোনো লোভের চোখে তাকায় নি। অনুরাধা বড় বেশি জ্বলন্ত—এইসব মেয়েকে হাত দিয়ে ছুঁতে ভয় করে। সব সময় চোখ দুটো চঞ্চল অনুরাধার—কথায় কথায় ঝর ঝর করে ইংরেজি বলে—আবার অর্গান বাজিয়ে গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাবার সঙ্গে সমানভাবে টেনিস খেলে এসেই আবার জানলা দিয়ে আলু-কাবলিওয়ালাকে ডাকাডাকি করে—বাড়ির কারুর বারণ না শুনে দারুণ ঝাল-মেশানো আলু-কাবলি খেতে খেতে জিভ দিয়ে উস্ উস্ শব্দ করে। সঞ্জয় অনুরাধার প্রতি মনে মনে লোভ রাখতেও সাহস পায় নি। শুধু এক দারুণ বাসনা ছিল অনুরাধাকে দেখার, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে একটা দুটো কথা বলার। মিঃ বিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে অনুরাধাকে এক ঝলক দেখতে পেলেই তার মন খুশি হয়ে যেতো।

মিঃ বিশ্বাস একদিন বললেন, সঞ্জয়, আজ দুপুরে দেখলাম ঐ রতন বলে ছেলেটা তোমার সঙ্গে খুব হাত-পা নেড়ে গল্প করছে! ওসব ছেলেকে বেশি নাই দিও না—

সঞ্জয় বলেছিল, কেন, ও ছেলেটা তো বেশ ছেলে। ভালো কাজ জানে—

— না, না, কিস্যু কাজ করে না—শুধু দল পাকায়। ওসব দল-পাকানো ডার্টিনেস আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। যদি কিছু গ্রিভান্স থাকে—সোজা এসে আমাকে বলবে—তাছাড়া তুমি ওদের ইন্টারেস্ট দেখছো—

রতন ছেলেটিকে দেখে সঞ্জয় অবাক হয়েছিল। খুব সবল চেহারা, ফরসা গায়ের রং, কিন্তু সব সময় একটা ময়লা খাকি প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরে থাকে। বয়লারের দারুণ গরমে কাজ করতে করতে ওর মুখের রং খানিকটা জ্বলে গেছে। মুখখানা দেখে খুব চেনা-চেনা মনে হয়েছিল সঞ্জয়ের, দু'একটা প্রশ্ন করতেই পরিচয় বেরিয়ে পড়েছিল।

মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে রতন বলেছিল, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার, আমার নাম রতন আচায্যি, আপনাদের গাঁ মামুদপুরের পুরুত ঠাকুর যোগেন আচায্যিরই ছেলে আমি। কি করবো স্যার, পাকিস্তান হবার পর রিফুউজি হয়ে চলে এলাম—লেখাপড়া আর কিছু হলো না—বাবাও মন্তর-ফন্তরগুলো শেখাবার আগে মরে গেলেন! ঘণ্টা নেড়ে তবু ভণ্ডামির কারবার চালানো যেতো—তার থেকে এই বেশ আছি। গায়ে খেটে রোজগার করছি। ওসব সংস্কৃত-ফংস্কৃত বলতে গেলে আমার দাঁত ভেঙে যেতো।

পুরুত বংশের ছেলে, ওর বাপ-ঠাকুরদা চিরকাল ঠাকুর পুজো করে কাটিয়েছে—কিন্তু সে আজ মজুরের কাজ করছে—এবং সেজন্য কোনো গ্লানি নেই—এই ব্যাপারটা সঞ্জয়ের বেশ ভালো লেগেছিল। মাঝে মাঝে সে রতনের সঙ্গে তার দেশের গল্প, বাড়ির গল্প করতো।

জুট মিলে একদিন একটা ছোটখাটো দাঙ্গা হয়ে গেল দু'দল শ্রমিকের মধ্যে। সেদিন সন্ধের

পর মিঃ বিশ্বাস একটু বেশি নেশা করে ফেললেন। তীব্র কণ্ঠে তিনি বললেন, সঞ্জয়, আজকের কালপ্রিটদের একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলো—ওসব গুণ্ডা-বদমাশদের আমি আমার মিলে রাখবো না।

সঞ্জয় বললো, হ্যাঁ, পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে—

— ওসব পুলিশ-ফুলিশ না। আমাদের নিজেদের মিলের শ্রমিকদের আমরা চিনবো না? আমি সব রিপোর্ট পেয়েছি—ঐ যেগুলো দল পাকায়, ইউনিয়ন করে—সব ক'টাকে চিনি!

সঞ্জয় একটু অবাক হয়ে বললো, কিন্তু আজকের দাঙ্গাটার মধ্যে তো খানিকটা বাঙালি-বিহারী ফিলিং ছিল—ইউনিয়নের লোকরা থামাতে গিয়েছিল।

— মোটেই না, ওসব ওদের চালাকি! ঐ তোমার সেই রতন, তার এক চেলা আছে। কি যেন নাম, দাঁড়াও—আমার কাছে কাগজে লেখা আছে—এত চেষ্টা করছি এদের উন্নতি করার—আমি চাই শ্রমিকদের স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং উন্নত হবে, ওরা মানুষের মতন বাঁচবে, বেশি খাটবে—বেশি রোজগার করবে—তা নয়, কতগুলো সুইন্ডলার পলিটিসিয়ানের প্যাঁচে ভুলে ইউনিয়ন আর দল পাকানো—এতে দেশের কোনোদিন উন্নতি হবে তুমি বলতে চাও! শ্রমিকরা যতদিন বস্তিতে থাকবে—ততদিন দেশের উন্নতি নেই। ওদেরও ভালোভাবে বাঁচতে দিতে হবে—তার জন্য দরকার হলো কাজ, আরও কাজ—বুঝলে, কাজ না করে শুধু শুধু ইউনিয়ন আর ভোট—

আবেগে মিঃ বিশ্বাসের গলা কাঁপতে থাকে। সঞ্জয় সিগারেটে টান দিতে ভুলে যায়। অনুরাধা এই সময় ঘরে ঢুকলো। একটা অদ্ভুত ধরনের ব্লাউজ পরেছে অনুরাধা—কনুই পর্যন্ত হাতা—সেখানে ফ্রিল দিয়ে ফুলের মতন তৈরি করা, গলার কাছটাও ফুল-ফুল ধরনের, গত শতাব্দীর মেমসাহেবদের মতন মনে হয়—এবং সেই ব্লাউজে অপূর্ব দেখাচ্ছে অনুরাধাকে। সারাদিনের দুর্ভাবনা ও উত্তেজনা ভুলে গিয়ে সঞ্জয় তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। অনুরাধা মুক্তোর মতন দাঁত দেখিয়ে হাসলো, বললো, তোমরা দু'জনে এত সিরিয়াস ফেস করে বসে আছ কেন? সঞ্জয়দা, ক্যারম খেলবে?

সঞ্জয় কিছু উত্তর দেবার আগেই মিঃ বিশ্বাস বললেন, দাঁড়াও মা-মণি আমাদের কাজগুলো আগে সেরে ফেলি। এসো সঞ্জয়, আগে রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা যাক। বদমাশগুলোর সব ক'টাকে কাল ছাঁটাই করে দেবো।

অনুরাধা বললো, সঞ্জয়দা, আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যান-না। আমি আজ একটা পুডিং-এর এক্সপেরিমেণ্ট করেছি!

সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। অনুরাধা তার সঙ্গে নেহাত ভদ্রতাই করছে, তবু অনেকক্ষণ অনুরাধার সাহচর্য পাবার লোভে সঞ্জয় আর দ্বিরুক্তি করে না। মিঃ বিশ্বাস উঠে গিয়ে কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ এনে বললেন, এই নাও, এতে বদমাশগুলোর নাম আছে। এদের অপরাধের ডেফিনিট প্রুফ আছে আমাদের কাছে, তুমি এক্ষুনি নোটিশ তৈরি করে ফেলো। আমি চাইছি এদের উন্নতি করতে, আর এরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল বসাবে। এই এরিয়ার আর কোন মিল-ফ্যাক্টরিতে আমাদের মতন মজুরদের বাথরুমে ফ্রি সাবান সাপ্লাই করা হয়, খোঁজ নিয়ে দেখো তো!

একটু বেশি রাত্রে সঞ্জয় যখন নিজের কোয়ার্টারে ফিরছিল, তখন দেখতে পেলো রাস্তার মোড়ে একদল লোক জটলা করছে। একটু গা ছমছম করে উঠেছিল তার। দাঙ্গার উত্তেজনা রয়েছে, তাকে মজুররা হয়তো মালিক পক্ষের লোক বলে ভাবে, হঠাৎ আক্রমণ করে বসা বিচিত্র নয়। মিঃ বিশ্বাস তাঁর গাড়ি করে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সঞ্জয় আপত্তি করেছিল। পাঁচ সাত

মিনিটের পথ—এজন্য গাড়ি নেবার কোনো মানে হয় না।

দঙ্গল থেকে দু'জন লোক এগিয়ে এলো সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় চিনতে পারলো রতনকে। উত্তেজিত উগ্র মুখ। বললো, স্যার, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনকে যে-ভাবে বানচাল করে দেওয়া হচ্ছে—

সঞ্জয় রুক্ষভাবে বললো, এত রাত্রে সে-কথা আমাকে বলতে এসেছো কেন?

— এত রাত্রেই আসতে হলো, আপনাকে একটা ব্যাপারে সাক্ষী থাকতে হবে।

— সাক্ষী? আমি?

হ্যাঁ, স্যার—এই ভিখুরামকে এদিকে নিয়ে আয় তো!

সেই দঙ্গলের চারজন লোক একজন লোককে টানতে টানতে নিয়ে এলো। সে লোকটার প্রচণ্ড নেশা, পা টলছে, চোখ দুটো লাল—একজন তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বললো, বল, স্যারের কাছে বল কত টাকা পেয়েছিস!

সঞ্জয় বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, এসব কি ব্যাপার?

রতন বললো, আজকের দাঙ্গাটা কেন হলো, সেটা নিজের কানে আপনি শুনে রাখুন!

— আমার কাছে কেন? পুলিশের কাছে যাও!

— বাঃ, আপনি আমাদের অফিসার—আপনি জানবেন না?

সঞ্জয় মনে মনে একটু হাসলো। কারুর উপকার কিংবা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। সে শুধু চাকরি করছে। শ্রমিকরা তাকে মাইনে দেয় না, মাইনে দেয় মালিক। মালিকের কথা মতন কাজ না করলে—তাকেই চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। তার জায়গায় অন্য লোক এসে—সে কাজ করবে।

রতন হঠাৎ সেই মাতালটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বললো, বল না শালা, বড় সাহেবের কাছ থেকে তুই কত টাকা পেয়েছিস।

সঞ্জয় রেগে উঠে ধমকে বললো রতনকে, রতন, তুমি ভদ্রবংশের ছেলে মিলে কাজ করতে এসেছো—সৎভাবে কাজ করবে সেটাই আশা করেছিলাম! তার বদলে এরকম গুণ্ডামি-বদমাইশী।

রতন রাগলো না, হেসে বললো, শুনুন স্যার, গুণ্ডামি-বদমাইশী কে করে! এই ভিখুরাম মদ খেয়ে সব স্বীকার করেছে—বড় সাহেবের পেয়ারের লোক ঘনু সরকার ভিখুকে আড়াইশো টাকা দিয়েছে মারামারি বাঁধাবার জন্য। শুধু ভিখু একা নয়, বাঙালিদের মধ্যেও দু'তিনজন পেয়েছে—দু'দলকে না উসকালে মারামারি হবে কেন? মারামারি কেন বাধিয়েছে জানেন—যাতে আমাদের ইউনিয়ানটা ভেঙে যায়—আমরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি জানাবো—সেটা যাতে না হয়—সেই জন্যই দলাদলি মারামারি লাগিয়ে—আপনি তো জানেনই স্যার, পর পর দু'বছর পাটের ওভার-প্রোডাকশন হয়েছে—রেট নেমে যাচ্ছে—সেই জন্য কোম্পানি চায় কাজ কমাতে, লোক ছাঁটাই করতে—কিন্তু আমাদের শ্রমিক-মজদুর ঐক্য কিছুতেই নষ্ট করা যাবে না—আমরা জান দিয়ে ইউনিয়ানটাকে বাঁচাবো। মজদুরের আবার বাঙালি বিহারী কি! মজদুরের কোনো জাত নেই—

সঞ্জয় বেশ হকচকিয়ে রতনের বক্তৃতা শোনে। পুরুতের ছেলে রতন সংস্কৃত উচ্চারণ করতে ভয় পেলেও বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বেশ জোরালোভাবে এসব বলতে শিখেছে। হঠাৎ সঞ্জয়ের মনে পড়লো, কাল সকালেই মিলের গেটে নোটিশ ঝুলবে। ছাঁটাইয়ের নোটিশ—যে দশজন ছাঁটাই হবে, তার মধ্যে রতনেরও নাম আছে। রতন বলছে, ওর ইউনিয়ানটাকে জান দিয়ে বাঁচাবে—কিন্তু কাল থেকে মিলের মধ্যে ওর ঢোকাই বন্ধ। হঠাৎ সঞ্জয়ের একটা দারুণ ঘৃণা জন্মালো। সেই ঘৃণা মিঃ বিশ্বাসের ওপর, অনুরাধার ওপর, নিজের ওপর, এমনকি ঐ ভিখুরাম

আর রতনের ওপরেও। সঞ্জয়ের মনে হলো, চারদিকে থু-থু করে ছেটায়। চতুর্দিকেই নোংরা।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাগ এবং ঘৃণা এসে জমা হয়েছিল নিজের ওপরেই। মিঃ বিশ্বাসের খুব বেশি দোষ সে দেখতে পায় নি। সঞ্জয় এত বোকা নয় যে, মিল পরিচালনার এইসব গতানুগতিক পদ্ধতি সে বুঝতে পারবে না! প্রতিবাদ না করুক, সে যা না-বোঝার ভান করেছিল সে শুধু অনুরাধার সাহচর্য পাবার জন্য। অথচ, সেই অনুরাধাকে পুরোপুরি পাবার চেষ্টা কিংবা লোভ রাখার মতন দুঃসাহসও তার নেই—সেইজন্যই বেশি রাগ নিজের ওপর।

সঞ্জয় তারপর এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে। শুধুই ভেবেছে দিনের পর দিন। নিজের জন্য সে কোনো পথ খুঁজে পায় নি। ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল—এসব ব্যাপার যদি সে ভুলে থাকতে না পারে—তবে তার কোনো উপায় নেই! হয়তো সে পাগল হয়ে যাবে—পৃথিবীতে অনেক কল-কারখানাতেই এরকম ছাঁটাই হয়, মারামারি হয়—সঞ্জয় তার কি করবে? সে বড়জোর চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। তারপর? সুতরাং ভুলে থাকাই একমাত্র উপায়।

অরণ্যে এসে এসব তো সে ভুলতেই চেয়েছিল। ভেবেছিল, সভ্য জগতের সবকিছু এই অরণ্যের বাইরে পড়ে থাকবে। সঞ্জয় অনেকখানি ভুলতেও পেরেছিল, হঠাৎ জয়ার বোন অপর্ণাকে দেখে মনে পড়লো অনুরাধার কথা। সঞ্জয়ের একটু মন খারাপ হয়ে গেল—চোখের সামনে ভেসে উঠলো অনুরাধার ছিপছিপে চঞ্চল শরীরটা। অথচ অনুরাধা তার কেউ না। অনুরাধার সঙ্গে সে একদিনও গাঢ় স্বরে কথা বলে নি। শুধু তাকে দেখতে পাওয়ার লোভেই সঞ্জয় তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে রাজি ছিল!

কয়েকটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে সঞ্জয় সেই বনতুলসী ফুলের ওপর বসা ফড়িং দুটোর দিকে ছুড়ে ছুড়ে মারতে লাগলো। একটাও লাগলো না। ফড়িং দুটোর মধ্যে এখন ভাব হয়ে গেছে—তারা দু'জনেই কোনোক্রমে সেই একটা ফুলের ওপর বসেছে। সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে ওদের ধরতে গেল। পারলো না, দুটোই উড়ে গেল একসঙ্গে। তখন সঞ্জয় সেই ফুলটাকে ছিঁড়ে আনলো, দেখতে চাইলো ফুলটার এমন কি বিশেষত্ব আছে!

অনেকক্ষণ থেকেই কার ডাক শোনা যাচ্ছিল। সঞ্জয় এবার উৎকর্ণ হলো। রবি আর অসীম মাঝে মাঝে তার নাম ধরেই ডাকছে। বেঞ্চটা থেকে উঠে সঞ্জয় ফিরে এলো ডাকবাংলোর দিকে। বারান্দায় অসীমকে দেখে বললো, কি রে, ডাকছিস কেন?

— বাঃ, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? রান্না চাপাতে হবে না?

— আমার রাঁধতে ভালো লাগছে না। কাল রেঁধেছি বলে আজও আমি রাঁধবো নাকি? তোরা বসে আড্ডা দিবি—আর আমি একা রান্নাঘরে থাকবো!

— আজ তো মাংস-ফাংস নেই, সংক্ষেপে কিছু একটা করে দে-না বাবা! রতিলালকে বলে কাল থেকে রান্নার লোক যোগাড় করতেই হবে একটা। নিজেরা রেঁধে খাওয়া যাবে না। আজ এ বেলাটা তুই চালিয়ে দে।

সঞ্জয় বললো, আমি রাঁধতে পারি—কিন্তু সবাইকে এসে রান্নাঘরে বসতে হবে আমি একা থাকবো না। তোরা এসে আলু-পেঁয়াজ কেটে দিবি—বেশিক্ষণ একা থাকতে আমার ভালো লাগে না।

রতিলাল উনুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি, উনুনে ঠাসা আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। ডেকচিতে ভাত চাপিয়ে দিয়ে তার মধ্যেই ওরা আলু আর পেঁয়াজ ফেলে দিলো সেদ্ধ করার জন্য, আজ আর মুর্গী আনা হয় নি, শুধু ভাতে-ভাতই খাওয়া হবে মাখন দিয়ে।

রান্নাঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত। ডেকচি-কড়াই এবং চিনে মাটির বাসনপত্র

ঝকঝকে করে মাজা। রতিলাল লোকটা ফাঁকিবাজ নয়। কিন্তু বউয়ের অসুখে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে।

ভাত যখন প্রায় ফুটে এসেছে, তিনজন স্নান করে নিতে গেছে, এমন সময় রান্নাঘরের পেছনে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ ও মেয়েলি চুড়ির আওয়াজ শোনা গেল। রবি শুধু বসেছিল রান্নাঘরে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে উঁকি মারলো। দেখলো, ঝুড়ি হাতে নিয়ে তিনটে সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের আড়ালে, মুখে একটু একটু হাসি। মেয়েগুলো প্রায় সমান লম্বা, সমান বয়েস, সমান কালো রং। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তারা। কিন্তু ওদের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে যেন খানিকটা লজ্জা এবং অপরাধবোধ মিশে আছে। ওদের মধ্যে একজনকে রবি চিনতে পারলো, সেই নীল পাড় শাড়ি পরা মেয়েটি। এরা তিনজনই বাজারের কাছে সেই সিমেণ্টের বেদীতে ঝুড়ি হাতে বসে ছিল। রবি জিজ্ঞেস করলো, কি চাই এখানে? মেয়েগুলো কোনো সাড়াশব্দ করলো না। রবি আর একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, কি চাই তোদের এখানে? মেয়েগুলো এবারও কোনো উত্তর দিলো না, অপরাধী হেসে নতমুখী হলো।

হঠাৎ রবির মুখ–চোখ বদলে গেল, এক ঝলক রক্ত এসে মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখালো, সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে রবি একেবারে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। বিনা দ্বিধায় সেই নীল পাড় মেয়েটির হাত নিজের হাতে ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো, কি রে?

সেই মেয়েটি এবার উত্তর দিলো, বাবু, তোদের ইখেনে কোনো কাম দিতে পারিস?

রবি আলতোভাবে মেয়েটির মসৃণ চিবুক তুলে ধরে বললো, এখানে তোরা কি কাজ করবি রে পাগলী? অ্যাঁ?

যেন রবিই এই জগৎ–সংসারের সবকিছুর মালিক, সেই হিসেবেই মেয়েটি তার কাছে অভিযোগ জানালো, পাঁচদিন কোনো কাম মিলছে নাই তো কি করবো? রেলের বাবুরা গুদাম বানাইছিল তো কাম মিলছিল, সেও তো বন্ধ করলো—

রবির শরীরটা যেন কাঁপছে, চোখ দুটো যেন ফেটে আসবে, কিন্তু গলার স্বর আশ্চর্য স্নেহময়, নালিশ-করা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বললো, ইস্, কি সুন্দর তোকে দেখতে, আয়, আয়—

— তিনজনাকেই লিতে হবে কিন্তুক। আমরা ঘর সাফা করবো, পানি তুলে দুবো।

— তোদের কিছু করতে হবে না। আয়, আয়—

— দু'টাকা রোজ লিই।

রবি মেয়েটির দু'কাঁধে তার দু'হাত রাখলো, আদুরে ভঙ্গিতে বললে, দু'টাকা? এত সুন্দর তোকে দেখতে—

মেয়েটা রবির হাত ছাড়িয়ে সরে গেল না। শুধু একটু ঘন ঘন নিঃশ্বাসে তার বুক দুলছে। অভিমানীর মতন দাঁড়িয়ে রইলো। অন্য দু'টি মেয়ে একটু আড়ষ্ট, তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, আমরা সব কাম পারবো বাবু, কাপড় কাচা করে দুবো, জুতা ভি পালিশ করতে জানি— দু'টাকা রোজ দিবি—

— দেবো, দেবো, আয় ভেতরে আয়।

গলার আওয়াজ পেয়ে এবার শেখর উঁকি মেরেছিল, সদ্য স্নান সেরেছে, এখনো তার পরনে শুধু তোয়ালে, শেখর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো এই রবি ও কি করছিস?

রবি মুখ ফেরালো, সম্মোহিতের মতন রহস্যময় তার মুখ, অদ্ভুত ধরনের হেসে প্রায় ফিসফিস করে বললো, এরা কাজ চাইতে এসেছে। নিজে থেকে এসেছে, বিশ্বাস কর, নিজে থেকে—

শেখর কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো। একটি মেয়ের কাঁধে তখনো রবির হাত দেখে একটু হেসে চোখ দিয়ে রবিকে নিষেধ করলো। তারপর বললো, তোমরা এখানে কি কাজ করবে?

এখানে তো কোনো রাজমিস্ত্রির কাজ হচ্ছে না! আমরা দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি—

মেয়ে তিনটিই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলো, আমরা সব কাম পারবো বাবু! দু'টাকা রোজ দিবি—পাঁচদিন আমাদের কোনো কাম মেলে নি—

রবি সোৎসাহে বলে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব কাজ পারবে! কি সুন্দর মুখখানা দ্যাখ!

শেখর একটু অবাক হলো, রবির মুখের চেহারা গলার আওয়াজ, সবই যেন কি রকম বদলে গেল। অত্যন্ত উত্তেজনায় রবি কাঁপছে। শেখর এক মুহূর্তে নিজের বয়সের চেয়েও ঢের বেশি বয়স্ক হয়ে গিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললো, তারপর বললো, না, এদের বাংলোয় রাখা যাবে না। গণ্ডগোল হবে!

রবি বললো, না, না, কিছু গণ্ডগোল হবে না। রবি সেই মেয়েটিকে প্রায় আলিঙ্গন করে বললো, আয় রে, তোরা সব ভেতরে আয়। দু'টাকার অনেক বেশি পাবি।

শেখর দ্রুত এগিয়ে এসে ঝটকা দিয়ে রবিকে সরিয়ে বললো, ভাগ্! ওসব মতলব মোটেই করিস না।

রবি পরম অনুনয়ের ভঙ্গিতে শেখরের হাত ধরার চেষ্টা করে বললো, এরা কাজ চাইতে এসেছে, এরা খেতে পাচ্ছে না, বুঝছিস না—

— আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই—এই, তোমরা যাও।

— অনেক কাজ আছে। কী রকম সুন্দর দেখতে, আঃ, কল্পনা করা যায় না।

— বাজে বকিস না। এই, তুমলোগ যাও না! বোলতা হ্যায়—ইধার কুছ কাম নেহি হ্যায়।

অসীম সাড়া পেয়ে এসেছিল। রবি এবার অভিমানী শিশুর মতন ঝাঁঝালো গলায় বললো, শেখর তোর এটা বাড়াবাড়ি। আচ্ছা এদের দিয়ে রান্নার কাজও করানো যায় না? মাত্র দু'টাকা রোজ—আচ্ছা তোরাই বল—আমরা নিজেরা রেঁধে মরছি!

অসীম হাসতে হাসতে বললো, ব্যাপারটা কিন্তু রবি খুব খারাপ বলে নি। রান্নার কাজটা করতে পারে—মেয়েলি হাতের রান্না না হলে কি আর খেয়ে সুখ আছে।

রবি উৎসাহিত হয়ে মেয়েদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, তোরা রান্নার কাজ পারবি না? খানা পাকানো?

শেখর দৃঢ় স্বরে বললো, আমি অত্যন্ত আপত্তি করছি কিন্তু। আমি এসব ব্যাপার মোটেই পছন্দ করি না।

— তোর আপত্তি করার কোনো মানে হয় না।

শেখর রবির চোখের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ অসীমের দিকে ফিরে বললো, এই অসীম, তুইও রবিকে তাল দিচ্ছিস কেন? দেখছিস না, ওর মাথা ঠিক নেই!

রবি চেঁচিয়ে উঠলো, বেশি বেশি সর্দারি করিস না—শুধু তোরই মাথা ঠিক আছে, না? তোকে কেউ লিডার করে নি। আমি আমার যা ইচ্ছে তাই করবো! রবি আবার হাত বাড়িয়ে সেই মেয়েটাকে ধরতে গেল।

শেখর ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে রবিকে বাধা দিলো। রবি এবার খানিকটা হতাশভাবে বললো, এবার কি নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে হবে নাকি? তুই কি করছিস শেখর? ওরা নিজেরাই আমাদের কাছে এসেছে—আর আমরা ওদের তাড়িয়ে দেবো?

এই সময় চৌকিদার রতিলাল এসে হাজির হলো, চিন্তা-ভাবনায় তার মুখে অনেক ভাজ, মেয়েগুলোকে দেখেই সে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠলো। চৌকিদারকে দেখে মেয়েগুলোও পিছু হটতে শুরু করেছিল, এবার তারা দ্রুত পালাতে লাগলো। চৌকিদার এদের দিকে ফিরে বললো, এইসব মেয়েগুলোকে ইধার ঢুকতে দিবেন না বাবু। আইনে মানা আছে।

ইয়ারা সব—

রবি বললো, কেন, ওরা এলে হয়েছে কি? তুমি নিজে তো—

তাকে থামিয়ে দিয়ে শেখর বললো, না, ঠিক আছে, আমিই ওদের চলে যেতে বলছিলাম।

সারা দুপুর রবি গুম হয়ে রইলো, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতে চাইলো না। বারান্দায় একা ইজিচেয়ারে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইলো। বিকেলবেলা বেড়াতে যাবার প্রস্তাবেও রবি বিশেষ সাড়া দিলো না, উদাসীনভাবে বললো, তোরা ঘুরে আয়। আমি আর আজ যাবো না।

সঞ্জয় একটা ইংরেজি গোয়েন্দা গল্প খুলে নিয়ে বসেছিল, সেও রবির কথা শুনে বললো, তাহলে আমিও যাবো না, বইটা না শেষ করে পারছি না। অসীম আর শেখরই বেরোলো, যাবার আগে অসীম বক্রহাস্যে বললো, রবির বোধহয় আজ তপতীর কথা মনে পড়ে গেছে!

শেখর বললো, থাক ও কথা, ও কথা বলিস না। রবি আরও রেগে যাবে।

—আজকাল আর রাগে না। তপতীর নাম শুনলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

— ক'বছর হলো রে?

— চার বছর। তপতীর বিয়ে হয়েছে সিক্সটি ওয়ানে—

— সত্যি, মেয়েটা বড় দুঃখ দিয়েছে রবিকে। আমি হলে আরও ভেঙে পড়তুম।

বেড়াতে আর কোথায় যাবে, সেই তো একই জঙ্গল। জঙ্গলে বেশিক্ষণ বেড়াতে ভালো লাগে না জল যেমন অন্য জল দেখলেই গড়িয়ে যেতে চায়, মানুষও সেইরকম মানুষ চায়। কিছুক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা আবার এলো সেই পাকা রাস্তায়, দু'জনে কোনো যুক্তি করে নি—তবু ওরা সেই মহুয়ার দোকানেরই পথ ধরলো। যাবার পথে চোখে পড়লো, সেই ভাঙা মিলিটারি ব্যারাক থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। অসীম বললো, ওখানে কারা রয়েছে চল তো দেখে আসি?

নিবন্ত উনুন থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সেই আদিবাসী মেয়ে তিনটি শাল পাতায় ভাত বেড়ে সেখানে সদ্য খেতে বসেছে। ওদের দেখে অভিমানী চোখে তিনজনেই একবার তাকালো, তারপর আবার খাওয়ায় মনঃসংযোগ করলো। দেখেই শেখর বললো, চল!

অসীম তবু দাঁড়িয়ে রইলো, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তিনটি মেয়ে—তাদের বয়েস পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে যে-কোনো জায়গায়, কিন্তু শরীরে তারা ভরাট যুবতী, তাদের সামনে শাল পাতায় ঢালা শুধু ভাত আর ধুঁধুল সেদ্ধ, নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। দু'জন পুরুষ দাঁড়িয়ে সেই খাওয়া দেখলে—জঙ্গলের মধ্যে তখন আবছা অন্ধকার।

শেখর অসীমের হাত ধরে টেনে বললো, চল!

অসীম তবু নড়লো না, অস্ফুটভাবে বললো, এখানে খাচ্ছে? এদের বাড়ি নেই?

— থাকবে না কেন? কিছু দূরে বোধহয় এদের গ্রাম—সারাদিন কাজ খুঁজেছে আর ফিরে যায় নি।

অসীম পিছন ফিরে কিছুদূর হেঁটে তারপর বললো, দুপুরে তুই ওদের তাড়িয়ে দিলি কেন? তোর গোঁয়ার্তুমি ওরা দুটো খেতে পেতো অন্তত।

— ওদের খাওয়ানোর জন্য অত মাথাব্যথা কিসের রে?

— দুপুরে আমাদের কতগুলো ভাত বেশি হয়েছিল—কুকুরকে খাওয়ালুম। তাতে ওদের তিনজনের অনায়াসে খাওয়া হয়ে যেতো। তুই শুধু এমন চেঁচামেচি আরম্ভ করলি!

— ভালোই করেছি।

— তার মানে? জঙ্গলের মধ্যে বিকেল পাঁচটার সময় ধুঁধুল সেদ্ধ দিয়ে ভাত গিলছে! আমরা

ওদের দুটো খাওয়াতে পারতুম না?

— দু'দিন আগে আমরা এখানে ছিলুম না। দু'দিন পরেও আমরা থাকবো না। ওদের খাওয়ানোর দায়িত্ব আমাদের নয়।

— এটা তোর বাজে যুক্তি। যে ক'দিন আমরা থাকবো, সে ক'দিন তো খেতে পেতো, কাজের জন্য কিছু টাকাও দিতে পারতুম।

— আমাদের ওখানে থাকলে ওদের দ্বারা কোনো কাজ হতো না। কি হতো, তুই ভালোভাবেই জানিস—

— হলোই বা, তাতেই বা আপত্তি কি? ওরা তো জেনেশুনেই এসেছিল—রবি ওদের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ওরা আপত্তি করে নি। খেতে না পেলে ওসব নীতি-ফিতির কোনো মানে হয় না।

— সেই জন্যই তো আমি আপত্তি করছিলুম। কয়েকটা মেয়ে খেতে পাচ্ছে না বলেই সেই সুযোগ নিয়ে তাদের শরীর আমরা ছেঁড়াছিঁড়ি করবো?

— করতুমই যে তার কোনো মানে নেই।

— তুই রবির চোখ-মুখ লক্ষ করিস নি?

— রবির বুকের মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান রয়েছে তপতীর জন্য। আমার তো তাই মনে হয় এদের নিয়ে কিছুটা ছেলেখেলা করলে রবির পক্ষে ভালোই হতো—কিছুদিন অন্তত তপতীর কথা ভুলে থাকতে পারতো। তুই দিন দিন এত মরালিস্ট হয়ে উঠেছিস কেন?

— মরালিটির প্রশ্ন নয়। তোকে একটা কথা বলি অসীম, মেয়েদের সম্বন্ধে তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা খানিকটা বেশি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একটা মেয়েকে ভোলার জন্য অন্য যে-কোনো একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলে কিছু লাভ হয় না। তাতে অভিমান আরও বেড়ে যায়।

— তোর নিজেরও ব্যথা আছে বুঝি সে রকম?

— ব্যথা কার না আছে? আমার অন্য রকম ব্যথা। সে কথা থাক।

— শেখর, তোকে তোর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই হঠাৎ চেপে যাস কেন বল তো? আমি লক্ষ করেছি, তুই মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়ে যাস। কি ব্যাপার তোর?

শেখর হা হা করে হেসে উঠে বললো, তুই যে দেখছি গোঁফ খাড়া করে আমার গোপন কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিস! আমার কিছু ব্যাপার নেই।

মহুয়ার দোকানে আজ একটু বেশি ভিড়। তা ছাড়া দৃশ্য প্রায় একই রকম, লাইন দিয়ে সবাই মাটিতে বসে গেছে। আশ্চর্য, সেই মেয়েটার মরদ আজও অজ্ঞান—মেয়েটা টানাটানি করছে তাকে। সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক, এরা মহুয়া খেতে আসে নি, এদের অন্য মতলব। সমস্ত জায়গাটায় একটা অসহ্য ধরনের মিষ্টি গন্ধ।

চাটের দোকানে আজ মেটুলির ঝোল রান্না হয়েছে, ওদের দেখেই দোকানদার হৈ-হৈ করে ডাকতে শুরু করে দিলো। এক বোতল মহুয়া কেনার পর অসীম আর শেখর মেটুলির ঝোল একটুখানি চোখ দেখলো। অসম্ভব ঝাল, শেখর শাল পাতাটা ছুড়ে দিয়ে উস্ উস্ করে হাওয়া টানতে টানতে বললো, বাপস্! আগুন ঝাল, মেরে ফেললে একেবারে! উস্।

দোকানদার হাসতে হাসতে বললো, ঝালই তো ভালো বাবু, মহুয়ার সঙ্গে। ঐ দেখেন না সাঁওতালগুলো কি রকম কাঁচা লঙ্কা খেয়ে ল্যায়, দুটা চুমুক দিন আর ঝাল লাগবে নি।

একবার ঝাল খেলে আরও খেতে ইচ্ছা করে। অসীম বেশি ঝাল খেতে পারে, তার তো আপত্তি নেই-ই। অসীম বললো, এখান থেকেই মেটের তরকারি আর আলুর দম কিনে নিয়ে গেলে হয়,

রাত্তিরে তাহলে আর কিছু খাবার লাগবে না।

কিন্তু শেখর সঙ্গে কোনো টাকা আনে নি। অসীমের সঙ্গে মাত্র পাঁচ টাকা। তাহলে আর মহুয়া কেনাই হয় না। রবির জন্য কিছুটা নিয়ে যাওয়া উচিত। ভিড়ের মধ্যে এক কোণে লখাকে দেখতে পেয়ে অসীম বললো, লখাকে পাঠালেই তো হয়। বাংলোয় গিয়ে সঞ্জয় বা রবির কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনবে।—এই লখা লখা—

ওরা এখানে এসে পৌঁছবার পর থেকেই লখা ওদের সঙ্গে আঠার মতন লেগেছিল। লোকটা এমনিতে বেশ বাধ্য এবং বিনীত, সবরকম ফাই-ফরমাশ খাটতেই রাজি। কিন্তু একটু হাত-টান আছে, জিনিসপত্র কিনতে পাঠালে ফিরে এসে খুচরো পয়সা সহজে ফেরত দিতে চায় না। দিলেও এমন হিসেব দেখায়—যাতে স্পষ্ট কারচুপি ধরা পড়ে। আর কেউ লক্ষ করে নি বিশেষ, কিন্তু রবি এই লখাকে ধমকেছে। এমনিতে রবি টাকা-পয়সার হিসেব গ্রাহ্য করে না—যখন পকেটে টাকা থাকে দু'হাতে ওড়ায়-ছড়ায়, বকশিশ দেবার সময় তার হাতই সবচেয়ে দরাজ। কিন্তু, কেউ তাকে ঠকাচ্ছে টের পেলেই সে বিষম খিটখিটে হয়ে ওঠে।

লখার এবার চোখ লাল, চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, তবু সে অনুগতভাবে এগিয়ে এসে বললো, কী হুজুর!

— তোর বেশি নেশা হয়েছে নাকি? একটা কাজ করতে পারবি?

লখা লাজুক হেসে বললো, নেশা কি, এই তো এইটুকুন, আধপোয়া... ফরমাইয়ে আভি তুরন্ত।

— ঠিক আছে, তুই একবার বাংলোতে গিয়ে বাবুদের কাছ থেকে আমাদের জন্য দশটা টাকা নিয়ে আয়। বাবুদের জন্য এই এক বোতল মহুয়া দিচ্ছি নিয়ে যা, তুই নিজে খবরদার খাবি না, ফিরে এলে তোকে বকশিশ দেবো—

লখা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নাটকীয়ভাবে বললো, আমার বকশিশ চাই না বাবু, আমাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে একটা নোকরি দিন। এখানে কিছু মেলে না।

লখা শেখরের পা ধরতে গিয়েছিল, শেখর বিব্রতভাবে পা সরিয়ে নিয়ে বললো, আরে, আরে, এর বেশি নেশা হয়ে গেছে দেখছি। ছাড়, ছাড়, কলকাতায় চাকরি সস্তা নাকি?

— না বাবু, আমাকে কলকাতা নিয়ে চলুন! এখানে কিছু মেলে না—

লখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো। মাতালের চোখে জল দেখলে সবারই হাসি পায়। এমনকি অন্য মাতালরাও হাসে। অসীম ও শেখর পরস্পর চোখাচোখি করে মুচকি হাসলো। শেখর কৌতুকের ছলে জিজ্ঞেস করলো, তুই কলকাতায় যেতে চাস কেন? এখানে তোর বাড়ি-ঘর, খেত-খামার আছে, হাঁস-মুর্গীও পুষছিস—এসব ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে কি করবি? ওখানে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় না।

দুঃখিত মাতালের মুখ খুব করুণ, বড় বেশি করুণ বলেই হয়তো হাস্যকর লাগে। সেই রকম মুখ তুলে লখা বললো, খাওয়া তো জনম ভোরই আছে, কিন্তু ইসব জাগায় কোনো টাকা নেই বাবু! কলকাতায় নোকরি করে দুটো পয়সা কামাবো—দু'বছর আগে ঐ শালা মুলিয়া কাহার কলকাতার ফেকটারিতে কাম নিলো—এখন সে হাতে ঘড়ি লাগায়। সিগ্রেট খায়—রোয়াব কি।—আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলুন, আমি আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবো।

ফের সে পা ধরতে আসতেই শেখর বললো, কলকাতায় গিয়ে এ রকম নেশা করবি নাকি? তাহলে পুলিশে ধরবে।

— না বাবু, আমি কিরা করে বলছি, ইসব আর ছুঁবো না। ধরম সাক্ষী—আপনারা রাজা লোক—

অসীম বললো, ঠিক আছে, তোকে আমাদের অফিসে চাকরি করে দেবো, এখন যা তো।

কতক্ষণে আসবি?

— আধা ঘণ্টা, বিশ মিনিট, দৌড়কে যাবো।

দু'ঘণ্টার মধ্যেও লখা এলো না। চাটওয়ালাকে খাবারের অর্ডার দিয়ে রাখা হয়েছিল, সে আর কারুকে বিক্রি করে নি, তার কাছে লজ্জায় পড়তে হলো। এদিকে পাঁচ সিকে দিয়ে আর এক বোতল মহুয়া খাবার ফলে শেখর আর অসীমের বেশ নেশা হয়ে গেল।

সেই মাতাল মেয়েটা বার বার এসে বলতে লাগলো, এ বাবু, থানায় ধরে লিয়ে যাবি না? লিয়ে চল না, এ বাবু!

অসীম পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বার করে মেয়েটার হাতে ঝরঝর করে ঢেলে দিয়ে বললো, নাচ দেখাবি? নে, নাচ দেখা!

মেয়েটা অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পয়সাগুলো গুনলো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দোকান থেকে একটা কোয়ার্টার বোতল কিনে এনে নিজের অজ্ঞান মরদকে ধাক্কা দিয়ে বললো, লে মুংরা। বাবুলোক খিলালো—। মরদটা সঙ্গে সঙ্গে চোখ ও মুখ খুললো, এবং মেয়েটা তার ঠোঁটের ফাঁকে বোতলটা ধরতে চুক চুক করে বেশ খেতে লাগলো এবং একটু বাদে আবার চোখ বুজলো। মেয়েটা নিজে বাকি অর্ধেকটা খেয়ে হাতে তালু দুটো বার বার মুছলো নিতম্বের কাছে শাড়িতে। তারপর মাথার ওপর হাত দুটো তুলে তালি বাজাতে বাজাতে বললো, নাচ দেখবি?

মেয়েটা অত্যন্ত লচকে দু'বার কোমর দোলালো, আবার বললো, লাচ দেখবি? বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে ফের সেই প্রশ্ন, লাচ দেখবি? কাল হাটবার, আজ আখুনি লাচ দেখবি? দুটো হাত দু'পাশে ছড়িয়ে সে নিপুণ ছন্দে বুক দোলালো, একটা পা সামনে এগিয়ে দিতে ভোজালির মতন তার উরুর কিছুটা অংশ দেখা গেল, পাগলাটে গলায় সে আবার বললো, লাচ?

নেশা করার সময় এইসব আদিবাসীরা বেশি কথা বলে না। গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ সারার ভঙ্গিতে পাতার ঠোঙায় মদ ঢালে এবং এক চুমুকে শেষ করে ঝিম মেরে বসে থাকে। কথা বললেও বলে আস্তে আস্তে, ফিসফিস করে।

সেই দীর্ঘস্থায়ী অপরাহ্নে ভাঁড়িখানার সামনের চাতালে গুটি পঞ্চাশেক লোক নিঝুম হয়ে বসে আছে, তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। মেয়েটার অতিরিক্ত নির্লজ্জতায় কারুর কারুর মুখ অপ্রসন্ন, কেউ কৌতুক পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব—কিন্তু কোনো কথা বললো না। তা ছাড়া ওরা যেন জানে যে, কলকাতার এইসব ছোকরা বাবুদের নানা রকম পাগলামি থাকে—মুখ বুজে সেগুলো দেখে যাওয়াই ভালো। বাবুরা তাদের সঙ্গে এক জায়গায় বসে মদ খাচ্ছে কেন, অনায়াসেই তো নোকর পাঠিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারতো! সবাই তো তাই করে!

মেয়েটা ঠিক নাচলো না। অসীম তাকে নাচতে বলায় হঠাৎ যেন সে বিষম অহংকারী হয়ে উঠলো। খানিক আগে যে একটু মদের জন্য ভিক্ষে করছিল—এখন সে হঠাৎ রহস্যময়ী হয়ে উঠলো। নাচ শুরু করলো না। কিন্তু যাদুকরীর মতন ভঙ্গিতে অসীমের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তার আঁট শরীরটা দুলিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো, লাচ দেখবি?

যেন সমস্ত নৃত্যকলাকে সে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে, তারপর এক-একটা টুকরো ছুড়ে দিচ্ছে অসীমের দিকে। বুভুক্ষুর মতন অসীম সেই এক-একটা টুকরো লুফে নিচ্ছে। মেয়েটা আর এক পা এগিয়ে এলো অসীমের দিকে, সাপের মতন শরীরটা সামনে পেছনে দোলালো, একবার মাত্র, ভোজালির মতন উরুটা আরেকবার দেখালো, তারপর হাত বাড়িয়ে বললো, দে—।

অসীমের চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এসেছে। পৃথিবীটা একবার মাত্র দুলে উঠলো। সে

অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, কি দেবো?

মেয়েটা ঠিক সেই রকমই দাঁড়িয়ে, যেন নাচের মাঝখানে কোনো এক জায়গায় থেকে গিয়ে চিত্রার্পিত মূর্তি, উরুর কাছে তার হাতটা মা কালীর মুদ্রার মতন, সে আবার তীব্রস্বরে বললো, দে!

অসীম যেন খুব ভয় পেয়েছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে তার দুর্বোধ বিস্ময়, উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, কি? কি?

সাইকেলে হেলান দেওয়া লোক দুটোর সঙ্গে শেখর কথা বলছিল, সেই মুহূর্তে শেখর পেছন ফিরে অসীমের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে চেঁচিয়ে বললো, ডোন্ট টাচ দ্যাট গার্ল অসীম, দ্যাট উইল ইনভাইট ট্রাবল্।

অসীম উন্মত্তের মতন দু'তিন পা এগিয়ে এসে অস্বাভাবিক রকম চিৎকার করে বলে উঠলো, আই ডোন্ট কেয়ার! তুই হুকুম করছিস কেন, আমি তোর হুকুম শুনতে চাই না! আমার যা ইচ্ছে তাই করবো—।

সাইকেলওয়ালা লোক দুটো অন্য প্রদেশী পাইকার ! এইসব অঞ্চলের হাট থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে অন্য প্রদেশে চালান দেয়। কখনো কখনো কুলি-কামিন চালান দেবার ঠিকাদারীর কাজও করে। শেখর ওদের সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতির বিষয়ে আলোচনা করছিল। অসীমের অবস্থা দেখে সে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল।

অসীমের গলার স্বর বদলে গেছে, চোখের দৃষ্টি অচেনা, ঠিক মতন দাঁড়াতে পারছে না। শেখর ওর দু'হাত চেপে ধরে বললো, অসীম, কি যা-তা বলছিস ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর?

অসীম জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, মেয়েটা কী চাইছে আমার কাছে? আমি দেখতে চাই।

—কি আবার চাইবে? চল এবার বাংলোয় ফিরি—নেশাটা এলো না—।

—আমি এখন যাবো না !

শেখর মেয়েটার দিকে ফিরে এক ধমক দিয়ে বললো, এই, তুই আবার কি চাস? বাবু তো পয়সা দিয়েছে একবার—এখন যা, ভাগ্ !

মেয়েরা শেখরের কথা গ্রাহ্যই করলো না। স্থিরভাবে চেয়ে আছে অসীমের দিকে। অসীমের চোখও চুম্বকের মতন মেয়েটার দিকে আটকানো। ক্রুদ্ধ বাঘের লেজ আছড়ানোর মতন মেয়েটা সমস্ত শরীরটা মুচড়ে আর একবার নাচের প্রাক্‌ভঙ্গি করলো। সম্মোহন করার মতন হাত বাড়িয়ে বললো, এবার দে ! দিবি না?

অসীম চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, কী দেবো ? কি?

শেখরের দিকে ফিরে আবার বললো, কী চায় ? কী দিতে বলছে ?

শেখর মেয়েটাকে গ্রাহ্যই করছে না, কিন্তু অসীমের পরিবর্তনে সে খুবই অবাক হয়। শান্তভাবে অসীমকে বোঝাতে চায়, কিছু না—আমাদের মাতাল ভেবে—।

—না, না, ও কি যেন বলতে চাইছে !

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, না দিয়ে তুই যাবি কোথায় ? দিতে হবে—

অসীম হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে ধরার চেষ্টা করতেই শেখর ওকে বাধা দেয়।

—কিছু না। একদম বাজে মেয়েছেলে, এখানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিপদ হবে বলছি।

—বিপদ ! আমার কোনো বিপদ হবে না। কত বড় বিপদ আমি কাটিয়ে এসেছি, তুই জানিস না? আমি একটা মেয়েকে খুন করেছিলাম।

—কি যা-তা বকছিস ! চল এবার।

—মোটেই যা-তা বকছি না। তুই জানিস না?

—তখন তোকে অতটা খেতে বারণ করলুম! সহ্য করতে পারিস না যখন—তখন এতটা খাস কেন? একটু খেয়েই বকবক—

অসীম আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে শেখরকে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললো, বাজে বকবক করছি না মোটেই, কেউ জানতে পারে নি, আমি একটা মেয়েকে খুন করেছিলাম—আঃ রক্ত, কি রক্ত—

—সেটা খুন নয়, দুর্ঘটনা। তুই এত দিনেও—

—আলবত খুন। আমি নিজে—

এখানে সবাই বাংলা বোঝে, অসীমের চিৎকারে সবাই উৎকর্ণ, সাইকেলে হেলান দেওয়া লোক দুটো চোখ সরু করে উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে আছে। শেখর আর উপায়ান্তর না দেখে অসীমের কলার ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বললো, কি, হচ্ছে কি? অসীমের চৈতন্য শেষ সীমায় এসেছিল, ঐ ঝাঁকানিতেই সে মাটিতে ঝুপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

মেয়েটা থুতনিতে আঙুল দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, যেন তার ঐ বিস্ময়ও নাচেরই একটা ভঙ্গি। এবার সে ঘরে গিয়ে নিচু হয়ে বললো, লে মুংরা, তু-ও বেহোঁশ, বাবু ও বেহোঁশ আর একটো বাবু পাগলা—হি-হি-হি-হি—। তার হাসির শব্দ এখন তীক্ষ্ণ যে, চাটওয়ালা ওদিক থেকে ধমকে উঠলো, এ সুরি, আভি চুপ যা, বেহুদা বেশি কাঁহাকা!

শেখর বিপন্নভাবে এদিক ওদিক তাকালো। যদি লখাটা এখনো আসতো।—কিন্তু তার কোনো পাত্তা নেই। শেখর চাটওয়ালাকে বললো, এক ঘটি জল দেবে ভাই?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে নেমে এসে বললো, চলিয়ে না, আমি বাবুকে আপনা সাথ পৌঁছা দিয়ে আসছি।

শেখর উৎসাহিত হয়ে বললো, তাহলে তো খুব ভালো হয়। তুমি আমার সঙ্গে গেলে মাংসের দামটা দিয়ে দেবো ওখানে।

—দামের জন্য কি! আপলোক রাজা আদমি। কাল দাম লিয়ে লিতম।

—না, কাল আর এখানে আসবো না।

চোখ-মুখে খানিকটা জলের ঝাপটা দিতেই অসীমের জ্ঞান ফিরলো। দুর্বলভাবে খানিকটা হেসে বললো, কী? অজ্ঞান হয়েছিলাম? কখন?

শেখর বিরক্তির সঙ্গে বললো, এখন ফিরতে পারবি তো?

—হুঁ।

অসীম চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলো, মেয়েটার দিকে চোখ পড়তেই চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলো, মেয়েটা কি চাইছিল রে?

—মাথা আর মুণ্ডু! নে, এখন ওঠ।

অসীম তবু আচ্ছন্নের মতন বসে রইলো। দু'হাতের তালু দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ কচলে সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে আবার আবছা আলোয় ফিরে এসে বললো, জানিস শেখর, আমি হঠাৎ খুব ভয় পেয়েছিলুম! ঐ মেয়েটা কি হিপ্‌নোটিজম্ জানে?

শেখর বললো, কি আবোল-তাবোল বকছিস! মেয়েটা আরও কিছু পয়সা বাগাবার তালে ছিল।

মাংসওয়ালা শেখরের কথায় সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ বাবু, ঠিক বলিয়েছেন ও ছোক্‌রিটা একেবারে বে-হুদা বেশরম্!

অসীম সব কথা মন দিয়ে শুনছিল না। বার বার তাকাচ্ছিল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা তীক্ষ্ণ

চোখে অসীমের দিকেই তাকিয়েছিল। শেখর অসীমকে ধাক্কা দিয়ে বললো, কি রে, মাথাটা একেবারে খারাপ করে ফেলবি নাকি?

—আমার মাথাটা সত্যি গুলিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মেয়েটা যেন আমার কাছে এসে প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

শেখর ধমকে উঠলো, প্রতিশোধ আবার কি? যত রাজ্যের আজে বাজে কথা মাথায় ভরে রেখেছিস!

সন্ধে গাঢ় হয়ে উঠেছে। দোকানের সামনে জ্বলে উঠেছে হ্যাজাক। সেটার থেকে আলোর বদলে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বেশি। রকের ওপর অসীম আধ–শোয়া, তার দু'পাশে শেখর আর মাংসওয়ালা—যেন একটা নাটকের দৃশ্য, অন্য লোকগুলো সেইভাবেই আছে ওদের দিকে। অসীম আপন মনেই বললো, না, মেয়েটা পয়সা চায় নি! ওকে নাচ দেখাতে বলুম, তার বদলে ও কি রকম আমার সামনে দাঁড়িয়ে—যেন ও আমার সব গোপন কথা জানে, সবার সামনে আমাকে—।

—ওসব কিছু আমি শুনতে চাই না। এখন যাবি কি না বল!

দু'জনে দু'দিক থেকে তুলে ধরতেই অসীম নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো, শার্ট–প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে অকারণে বিরক্ত মুখে বললো, দূর–ছাই! তারপর মেয়েটার দিকে আর না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল একাই। কিছুটা রাস্তা আসতেই প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলো। আরও খানিকটা এসে অসীম রাস্তার ধারে হড় হড় করে বমি করলো। তারপর থেকে সে আবার হালকা স্বাভাবিক পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গান ধরলো।

সেই গানের সঙ্গে শেখর যোগ দিলো না। বন্ধুদের মধ্যে একজন কেউ মাতাল হয়ে গেলে অন্যদের নেশা কেটে যায়। অসীমকে সামলাতে গিয়ে শেখরের সব মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। শেখর এখন গম্ভীরভাবে অপ্রসন্ন মুখে হাঁটছিল। ঐ মেয়েটার কথা শেখর এবার নিজেও একটু ভেবে দেখলো। মেয়েটার ব্যবহার সত্যিই খানিকটা রহস্যময় অদ্ভুত। কিন্তু জঙ্গলের মানুষের রীতি–নীতি তো খানিকটা আলাদা হবেই।

মাংসওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, শেখর তাকে জিজ্ঞেস করলো, জঙ্গলের মধ্যে কোনো সর্ট–কাট আছে কিনা। লোকটি জানে, ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। টর্চ নেই, এখানে নিবিড় অন্ধকার, মাঝে মাঝে চাঁদভাঙা আলো। পরস্পরের পায়ের শব্দ শুনে শুনে ওরা হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ অসীম একটা ফুলগাছের সামনে দাঁড়ালো। গাছটা একটু অদ্ভুত, কাঁধ–সমান উঁচু—কিন্তু গাছটায় একটাও পাতা নেই, শুধু থোকা থোকা সাদা ফুল। অসীম জিজ্ঞেস করলো, এটা কী ফুলগাছ?

মাংসওয়ালা বললো, কি জানি বাবু? তবে, সাঁওতালগুলাক্ তো ই ফুলকে বলে নিমিঠু। পরবের দিনে ওরা এ ফুল মাথায় দেয়!

শেখর একটা থোকা ভেঙে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো। এতক্ষণ বাদে সে পরিপূর্ণ গ্লানিমুক্ত গলায় বললো, আঃ! কি সুন্দর গন্ধ—আগে তো এ ফুল দেখি নি!

৫

বাংলোর ঘরে আলো জ্বলে নি, বারান্দাও অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই রবি আর সঞ্জয় চুপ করে বসে আছে ইজিচেয়ারে। অসীম চেঁচিয়ে উঠলো, কি রে, তোরা অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছিস কেন?

রবির গলা তখনো থমথমে সে গম্ভীরভাবে জানালো, বারান্দার আলো জ্বালিস না।

শেখর ঘরের ভেতর থেকে টাকা এনে চাটওয়ালাকে বিদায় করলো। তারপর আবার বারান্দায় এসে, চোখে পড়লো টেবিলের ওপর প্লেটে চিবানো মাংসের হাড়। শেখর জিজ্ঞেস করলো, এ কি, মাংস—

—তোমার বান্ধবী দরওয়ানের হাত দিয়ে কাটলেট পাঠিয়ে ছিলেন বিকেলবেলা। তোমাদের দু'জনেরটা ঘরে ঢাকা আছে।

—এদিকে আমরাও যে মাংস নিয়ে এলুম। আরে, এ কি, রবি—

এতক্ষণ লক্ষ করি নি, এবার আবছা আলোয় শেখর দেখলো, রবি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে আছে। তার জামা-প্যান্ট, গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া সব, চেয়ারের হাতলে জড়ো করা। শেখর এবার হাসতে হাসতে বললো, এ কি রে, তুই রাগ করে শেষ পর্যন্ত—

—রাগের কি আছে ! গরম লাগছিল।

—গরম লাগছে বলে একেবারে ত্রৈলঙ্গস্বামী?

ব্যাপারটাতে অসীম খুব মজা পেয়ে গেল। সে উল্লাসের সঙ্গে বললো, ঠিকই তো, জঙ্গলের মধ্যে রাত্তির বেলা এসব ঝামেলা—আয় আমরাও খুলে ফেলি—। অসীম অবিলম্বে নিরাবরণ হয়ে গিয়ে শেখরের জামা ধরে টানাটানি শুরু করে দিলো। শেখর বললো, আরে, আরে, টানিস না, খুলছি খুলছি—।

অসীম ডাকলো, সঞ্জয়, এই সঞ্জয়!

সঞ্জয় চোখ বুজে ছিল, এবার বিরস গলায় বললো, আমাকে বিরক্ত করিস না, আমার ভালো লাগছে না।

—কেন রে, তোর কি হলো!

—আমার এখানে আর ভালো লাগছে না। আমি কাল চলে যাবো। এসব আমার পছন্দ হয় না—রবি আজ সেই লোকটাকে মেরেছে।

শেখর আর অসীম প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করলো, কাকে মেরেছে?

সঞ্জয় বললে, ঐ যে আমাদের সঙ্গে এসেছিল, কি নাম যেন—লখা! লোকটা এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ...

—কেন, তাকে মেরেছে কেন?

রবি হুংকার দিয়ে উঠলো, মারবো না? লোকটা চিট, আমাকে ঠকাতে এসেছিল। তোদের নাম করে আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছিল।

শেখর চমকে উঠে বললো, সে কি রে, আমরা যে সত্যিই ওকে পাঠিয়েছিলাম।

—মোটেই না। আমি ওকে দেখেই বুঝেছিলাম আমাকে ঠকাতে চাইছে।

পোশাক না পরা পুরুষের শরীর কি রকম যেন দুর্বল আর অসহায় দেখায় ! বিশেষত ঐ অবস্থায় ইজিচেয়ারে বসে থাকার মধ্যে একটা হাস্যকরতা আছে। রবি খানিকটা বেঁকে বসে আছে—তার ছিপছিপে কঠিন দেহ—কোথাও একছিটে চর্বি নেই, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সাদা পোশাকে তাকে অপরূপ লাবণ্যময় দেখায়—মনে হয়, সেইটাই তার আসল চেহারা, নিরাবরণ শরীরে রবিকে এখন অচেনা মনে হচ্ছে। কোনো একটা ব্যাপারে রবি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে। রবি মানুষকে ধমকাতে ভালোবাসে, হঠাৎ তো কারুকে মারতে চায় না ! শেখর জিজ্ঞেস করলো, লখা এসে আমাদের নাম করে বলে নি?

রবি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, আমি জানি লোকটা জোচ্চোর।

—না রে, আমরা মাংস কিনবো, টাকা ছিল না, তাই ওকে পাঠালাম। ওর হাত দিয়ে এক

বোতল মহুয়াও পাঠিয়েছিলাম দেয় নি?

সঞ্জয় বললো, হ্যাঁ, সেটা রবি একাই শেষ করেছে।

রবি আবার তেড়ে উঠলো, এক বোতল ছিল না, আধ বোতল ঐ হারামজাদা নিজে খেতে খেতে এসেছে—

পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা সঞ্জয় চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে বললো, আমি রতিলালের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম—লোকটা খুব বিপদে পড়েছে, বৌয়ের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। আমি ওর সঙ্গে গেলাম, ওর বৌটা বাঁচবে না, কি হয়েছে কে জানে—পেটটা বিষম ফুলে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলছে হাঁপরের মতন, পাশে তিনটে বাচ্চা। বাড়িতে এ রকম অসুখ, অথচ রতিলালকে দিয়ে আমরা জল তোলাচ্ছি, উনুন ধরাচ্ছি—বিচ্ছিরি লাগছিল ভেবে—তার ওপর, আমরা বে-আইনিভাবে বাংলোটা দখল করে আছি। আমাদের জন্য লোকটার যদি চাকরি যায়—

অসীম অধৈর্য হয়ে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা, রতিলালের কথা পরে শুনবো। লখার সঙ্গে কি হলো বল না!

সঞ্জয় একটু জ্বালা মিশ্রিত দুঃখের সঙ্গে কথা বলছিল, অসীমের অধৈর্য উক্তি শুনে এক পলক আহতভাবে তার দিকে তাকালো। ফের বললো, ফিরে এসে দেখি রবি লখাকে ধরে পেটাচ্ছে। আমি বাধা না দিলে হয়তো রক্তারক্তি করতো। তারপর এক বোতল মদ গিলে, অসভ্যের মতন জামা কাপড় সব খুলে—আই ডিটেস্ট অল দিজ—একটা সভ্যতা ভদ্রতা বলে ব্যাপার আছে।

রবি বললো, জঙ্গলে এসে আবার সভ্যতা কি রে?

—আমরা জঙ্গলে বেড়াতে এসেছি, জংলী হতে আসি নি। আমরা যেখানেই যাই, আমরা সভ্য মানুষ।

শেখর বাধা দিয়ে বললো, সত্যি তোরা এমন এক একটা কাণ্ড করছিস, শেষ-পর্যন্ত একটা বিপদ-আপদ না-হয়ে যাবে না দেখছি। লখা যদি দলবল নিয়ে আমাদের মারতে আসে?

রবি বললো, যা যা, ক'জন আসবে, আসুক না!

অসীম বললো, অত ভাববার কি আছে! ও রকম মার খাওয়ায় ওদের অভ্যেস আছে। লখা আমার কাছে কলকাতায় চাকরি চেয়েছে, আমি দেবো বলেছি, সেই লোভেই সব সহ্য করবে। কলকাতায় চাকরি নিতে কত লাঠিঝাঁটা খেতে হবে—এখান থেকেই সেটা বুঝে নিক!

সঞ্জয়ের গলায় যুগপৎ দুঃখ ও অভিমান, সে অনেকটা আপন মনেই উচ্চারণ করলো, গ্রাহ্য করি না, কোনো মানে হয় না, আমরা মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করি না, শুধু নিজেদের আনন্দ ফূর্তি, কোনো মানে হয় না, ভাল্‌গার—

—এমন কিছু করা হয় নি, তুই আবার বাড়াবাড়ি করছিস!—

অসীম জানালো, জানিস রবি, সেই মেয়েগুলোকে সন্ধ্যাবেলাও দেখলাম—

—কোন মেয়েগুলো? কোথায়?

সেই দুপুরে যে-তিনজন এসেছিল, তাদের দেখলাম সেই ভাঙা মিলিটারি ব্যারাকে বসে ধুঁধুল দিয়ে ভাত খাচ্ছে।

রবি চেয়ার ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো, আবেগের সঙ্গে বললো, সেই তিনজন? মিলিটারি ব্যারাকে? ওরা নিজের থেকে এসেছিল, আমরা তখন তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—

রবি এবার তড়াক করে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে আর একটি কথাও না বলে অন্ধকারে ছুটলো। শেখর চেঁচিয়ে উঠলো, এই রবি, কোথায় যাচ্ছিস?

রবি কোনো সাড়া দিলো না। দূরে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ। শেখর বললে, আরে, ছেলেটা

পাগল হয়ে গেল নাকি? অসীম, আয় তো—

ওরা দু'জনেও বারান্দা থেকে নেমে ছুটলো। অরণ্যের স্তব্ধতা বড় কঠোর ভাবে ভেঙে যেতে লাগলো। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না, শুধু পায়ের শব্দ, রাত্তিরবেলা এ রকম পদশব্দ জঙ্গলে সপরিচিত। শেখর চেঁচালো, রবি রবি—। কোনো সাড়া নেই। অসীম, তুই কোন দিকে? রবি কোথায় গেল?

বুঝতে পারছি না।

—রবি, ফিরে আয়, এখন ওরা ওখানে নেই।—লতার ঝোঁপে পা আটকে পড়ে গেল শেখর। হাতের তালুতে কাঁটা ফুটেছে। দু'এক মুহূর্ত চুপ করে কান পেতে শুনলো। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটু বাদে পাশেই খরখর করে শব্দ হলো, সেদিকে দ্রুত হাত বাড়িয়ে মনুষ্য শরীর পেয়ে শেখর চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠে অসীম বললো, আমি, আমি—। রবিকে ধরতে পারবি না, ও ক্রিকেটে সর্ট রান নেয়।

—ওকে ছেড়ে দেওয়া যায়? কত রকম বিপদ হতে পারে, কিছু একটা হলে ওর মাকে কী বলবো?

—ঐ যে ডান দিকে শব্দ হচ্ছে।

শেখর আবার উঠে ছুটলো। আবার পাতা ভাঙার শব্দ, চিৎকার, রবি, রবি, এখানে আয় বলছি—

অসীমের বদমায়েশী হাসি, রবি, থামিস না, চলে যা—

—এই অসীম, দাঁড়া, তোকে একবার হাতের কাছে পাই—

—শেখর, এত সিরিয়াস হচ্ছিস কেন? বেশ মজা লাগছে মাইরি, ইয়া—হু, আমি টার্জন, আব-আব-আব, রবি, তাড়াতাড়ি পালা!

—অসীম, আমাকে ধর, আমার পা মচকে গেছে।

—ধ্যাৎ তেরি! মচকে গেছে তো পড়ে থাক, আমার—

তেমন বেশি আঘাত লাগে নি শেখরের। তবু ও আর উঠলো না। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। পিঠের তলায় ভিজে ভিজে মাটি আর শুকনো পাতা ভারী আরাম লাগছে। যেন কত কাল এ রকমভাবে শোওয়া হয় নি, শরীর যেন এর প্রতীক্ষায় ছিল। কোনো আলাদা গন্ধ নেই, সব মিলিয়ে একটা জংলী গন্ধ ভেসে আসছে। ভুক্ ভুক্ ভুক্ করে একটা রাত-পাখি হঠাৎ ডেকে উঠলো। মাঝে মাঝে অসীম আর রবির দু'এক টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে। শেখরের আর ইচ্ছে হলো না ওদের ডাকতে। তার বদলে এই অন্ধকার জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকার একটা মাদকতা বোধ করলো।

পোশাক খুলে ফেলার পর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও যেন আর কিছু গোপন রাখতে চায় না। রবি কেন অত ছটফট করছে শেখর জানে। ওর আঘাত আর দুঃখ, শহরে যা গোপন রাখা যায়, এই অরণ্যে এসে তা আরও বিশাল হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। দূর-ছাই, যা হবার হোক!

হঠাৎ অসীমের ত্রস্ত ডাক ভেসে এলো দূর থেকে, এই রবি, ওদিকে যাসনে, গাড়ি আসছে! শেখর ধড়মড় করে উঠে বসলো।

এক ঝলক প্রবল আলো ও একটানা একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। ওরা বড় রাস্তার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, দূরে দুটো ট্রাক আসছে। হেড লাইটের আলোয় মাঝরাস্তায় রবির দীর্ঘ, ফরসা, উলঙ্গ দেহটা একবার দেখা গেল! কে জানে, ট্রাক ড্রাইভাররা ভূতের ভয় পেয়েছিল কিনা, তারা গাড়ির স্পিড আরও বাড়িয়ে দিলো। শেখর চিৎকার করে উঠলো, রবি, সাবধান—।

ট্রাক দুটো চলে যাবার পর আরও বেশি অন্ধকার। একটু বাদে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেবার পর শেখর আর অসীম রাস্তার এ-পারে এলো। রবি এক ধারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। না, কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে না, রবি মাঝরাস্তা থেকে অনেক দূরে। শেখর ঝুঁকে পড়ে জননীর মত স্নেহে রবির কপালে হাত রেখে ডাকলো, রবি, রবি—

রবি পাশ ফিরে বললো, উঁ। আমার হাঁটুতে খুব লেগেছে।

—কেটে গেছে? চল, আমার কাছে পেনিসিলিন আয়ন্টমেন্ট আছে, দাঁড়াতে পারবি তো?

—ঘষড়ে গেছে, জ্বালা করছে খুব। হ্যাঁ, দাঁড়াতে পারবো।

অসীম বললো, রবি, তোকে মাঝরাস্তায় আলোতে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল, গ্রীক দেবতার মতন—।

ক্লিষ্ট হেসে রবি বললো, আয় না একটু বসি—কী সুন্দর জায়গাটা!

—আবার কোনো ট্রাক গেলে যদি আমাদের গায়ে আলো পড়ে—শেখর এতক্ষণে হাসলো।

—না, আলো দেখলে আমরা সরে যাবো। আজ সারাদিন আমার বড্ড মন খারাপ ছিল রে।

ঘাসের ওপর বসলো তিনজনে। শেখর রবির ডান পা-টা টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানটা দেখলো। হাঁটুর কাছে অনেকখানি ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ঘোরের মাথায় ছুটছিল রবি, হঠাৎ ট্রাকের হেড লাইটের আলো চোখে পড়ায় দিশাহারা হয়ে পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে রগড়ে রবির পায়ে লাগিয়ে দিলো শেখর।

এতক্ষণ বাদে অনেকটা চাঁদের আলো উঠেছে। চওড়া পীচের রাস্তাটা দু'দিকে যতদূর দেখা যায়, সোজা মিলিয়ে গেছে ধূসরতায়! জঙ্গলের চূড়ার দিকটা দৃশ্যমান হলেও মাঝখানে অন্ধকার। মাঝে মাঝে এক ধরনের লুকোচুরি খেলার বাতাস কোনো কোনো গাছকে দুলিয়ে যাচ্ছে—বাকি বৃক্ষগুলো নিথর। দূরে, অনেক দূরে দুটো শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠলো। সেই ডাক শুনে অসীম সচকিত হয়ে বললো, এদিকে আসবে নাকি?

রবি ভ্রূক্ষেপ করলো না, বললো, ওগুলো তো শেয়াল!

শেখর চোখ তীক্ষ্ণ করে জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে তাকালো। আলো জ্বলা হয় নি, ডাকবাংলোটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বললো, সঞ্জয়টা ওখানে একলা রইলো।

অসীম ঝাঁঝালো গলায় বললো, ও এলো না কেন আমাদের সঙ্গে? ওর আসা উচিত ছিল! জঙ্গলে বেড়াতে এসে ও ভারি সভ্যতা ফলাচ্ছে! একসঙ্গে বেড়াতে এসেও এ রকম একা একা থাকার কোনো মানে হয় না!

অপ্রত্যাশিতভাবে রবিই উত্তর দিল, সঞ্জয়ের দোষ নেই। ওর ব্যাপার আমি জানি। মাসখানেক ধরে ওর মেজাজটা খুবই খারাপ হয়ে আছে—কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না। সঞ্জয়টা খুব ভালো ছেলে তো—

কনুইতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে শেখর বললো, তোদের তিনজনেরই দেখছি মেজাজের ঠিক নেই! আমার কিন্তু বেশ লাগছে এ জায়গাটা। কি চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে!

অসীম বললো, ইস্, সিগারেট নেই, সিগারেট থাকলে আরও ভালো লাগতো!

শেখর অসীমের নগ্ন নিতম্বে একটা লাথি কষিয়ে বললো, তোর জন্যেই তো! তুই-ই তো জোর করে জামা-প্যান্ট খোলালি! এখন যা, বাংলো থেকে সিগারেট নিয়ে আয়।

—এই অন্ধকারের মধ্যে আমি একা যাবো? আমার বয়ে গেছে—

—রবি, তুই দৌড়োতে দৌড়োতে কোথায় যাচ্ছিলি? তোর কি ধারণা, সেই ভাঙা ব্যারাকে মেয়েগুলো এখনো তোর জন্যে বসে আছে?

—আমি যাবো জানলে ওরা ঠিকই বসে থাকতো! তোর জন্যেই তো দুপুরবেলা ওদের

তাড়িয়ে দিতে হলো —

—থাকলেও, তুই এই অবস্থায় তিনটে মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস? তোর কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—তাতে কি হয়েছে? জঙ্গলের মধ্যে, রাত্তিবেলা—এখানে কোনো ভণিতার দরকার হয় না। ওরা তো আর তোদের সেই ন্যাকা শহুরে মেয়ে নয়! এখানে ওরা যা চায়, আমি যা চাই—সবই সোজাসুজি—

—বুঝলুম! তার মানে, আজ আবার তপতী তোকে খুব জ্বালাচ্ছে!

—তপতী?

রবির চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠলো, শক্ত হয়ে গেল চোয়াল, হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠো করে ধরে শেখরের দিকে একদৃষ্টে তাকালো। তারপর বললো, তপতী? খবরদার, আমার সামনে আর তপতীর নাম উচ্চারণ করবি না!

—চার বছর হয়ে গেল, এখনো এত রাগ?

—তুই জানিস না! তুই কিচ্ছু জানিস না! তপতী আমাকে—

৬

কাচের জানলা, কাচের দরজা, তাই অতি ভোরের সূর্য যখনি রক্তবর্ণ, তখনই আলোয় বাংলোর দু'খানা ঘর ভরে যায়। এক ঘরের খাটে সঞ্জয় আর শেখর, অন্য ঘরে অসীম আর রবি, চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখা যায়। রবির লম্বা শরীরটা কুঁকড়ে আছে—শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শেখরের মুখখানা যেন বিষদাচ্ছন্ন, বোধহয় কোনো দুঃখের স্বপ্ন দেখেছে একটু আগে।

বারান্দায় খাবারের ভাঁড়টা ভর্তিই পড়ে আছে, অসংখ্য কালো পিঁপড়ে সেটাকে ছেঁকে ধরেছে। থামের পাশে পড়ে আছে রক্তমাখা তুলো, ঐখানে বসে কাল রবি পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধেছিল।

সিঁড়িতে একটা বড় কোলা ব্যাঙ বিহ্বলের মতন এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছিল, এবার সে থপ্ থপ্ করে নিচে নেমে গেল। নেমে গিয়ে ব্যাঙটা দু'তিনটে মল্লিকা ফুলের চারার গায়ে ধাক্কা মারলো, কেঁপে উঠলো ফ্রক-পরা মেয়েদের মতন মল্লিকা ফুলগুলো—তাদের গা থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়লো কয়েক ফোঁটা শিশির। কী একটা পাখি ডেকে উঠলো টু-চি-টু, টু-চি-টু, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক শালিক তার উত্তর দিলো, কুরু-রাং কু-রু-রাং কু-রু-রাং—। ভোরবেলায় পৃথিবীকে প্রত্যেকদিন মনে হয় পবিত্র নির্মল।

প্রথমে রবির ঘুম ভাঙলো। চোখ ঘুরিয়ে একবার এদিক-ওদিক তাকালো, যেন তার মনে ছিল না, সে কোথায় শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে উঠে গিয়ে পা-জামাটা পরে নিলো এবং অসীমকে ধাক্কা দিয়ে বললো, এই অসীম, ওঠ ওঠ, আজ আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন আছে। অসীম চাদর সরিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়েই রবির দিকে ঘাড় ঘোরালো—সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ হাসিতে তার চোখ-মুখ ভরে গেল। আবার চাদরটা টেনে গায়ে জড়িয়ে বললো, দাঁড়া, আর একটু ঘুমিয়ে নি। এক্ষুনি কি!

পাশের ঘরে শেখরের ঘুম ভাঙলো আস্তে আস্তে। প্রথমে চোখ খুললো, তখন শুধু ওর চোখ দুটোই জেগে উঠেছে, বাকি শরীরটা ঘুমন্ত। আলসভাবে শেখর তাকালো জানলার বাইরে। রান্নাঘরের দিকে বিশাল কালোজাম গাছটা হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে, তাতে এক একবার ঝিকমিকে রোদ এসে পড়ছে শেখরের মুখে, এক একবার পাতার ছায়া। তিনটে সাদা বক

জামগাছটার ডালে বসে রোদ পোহাচ্ছে। এবার শেখর ওর হাতেরও ঘুম ভাঙালো। ডান হাতটা খুলে পাশের খাটের দিকে নিয়ে সঞ্জয়ের পিঠে রাখলো। ডাকলো, সঞ্জয়, ওঠ! সঞ্জয় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল, বেশ কয়েকবার ডাকেও সাড়া দিলো না।

আস্তে আস্তে চারজনেই বিছানা ছেড়ে উঠলো। মুখ ধোয়ার পর, দাড়ি কামিয়ে নিলো সবাই, অসীমের কাছে আফটার-শেভ লোশান এবং ক্রিম ছিল। প্রত্যেকের ব্যাগ থেকে ফরসা জামা-প্যান্ট বেরুলো, জুতোগুলো পর্যন্ত পালিশ করা হলো। রতিলাল তখনো আসে নি, সুতরাং এখানে চা খাওয়ার কোনো উপায় নেই। একেবারে বাড়িতে গিয়েই প্রথম চা খেতে হবে।

একটু বাদে যখন বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো ওরা চারজন, তখন ওরা সকলেই ছিমছাম পরিচ্ছন্ন যুবা, নিখুঁত পোশাক ও সুবিন্যস্ত চুল। জঙ্গল ছেড়ে ওরা বাইরে এলো।

পরমেশ্বর গেট খুলে দিলো ওদের দেখে, জয়ার শ্বশুর বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন— সবল চেহারার বৃদ্ধ, ধবধবে মাথার চুল ও গোঁফ, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসো, এসো—। বৌমা, ছেলেরা এসে গেছে—।

জয়া ও অপর্ণা বেরিয়ে এলো পাশের একটি ঘর থেকে, এই সকালেই তাদের স্নান ও বেশবাস পাল্টানো হয়ে গেছে। ওরা ঘরে ঢোকা মাত্রই সাবান, স্নো, পাউডার, মাথার তেলের মিলিত কৃত্রিম সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। জয়া বললো, বাবা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এঁরা হচ্ছেন—।

সদাশিব ত্রিপাঠীর প্রশান্ত মুখে সামান্য দু'চারটি মাত্র ভিন্ন রকম রেখা। দেখলে মনে হয়, এই মানুষ জীবনে সার্থক ও তৃপ্ত, সৎ এবং উদার। তবু মুখের রেখাগুলো পড়েছে জীবন যাপনের বৈচিত্র্যে। এখানে কাছাকাছি কোথায় ওঁর একটি কাঠের কারখানা আছে, তার পরিচালনার জন্য হয়তো ওঁকে কখনো কঠোর হতে হয়, সেই জন্য মুখে একটি রেখা, যৌবনে কোনো হটকারিতার জন্যও সম্ভবত মুখে আর একটা রেখা পড়েছে, একমাত্র পুত্রের মৃত্যু বা আত্মহত্যার জন্যও কি মুখে আর একটি রেখা পড়ে নি? তবু তাঁর সমগ্র মুখে একটি সমগ্র ব্যক্তিত্ব; তিনি হেসে বললেন, এইসব স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দেখলে আমার, বেশ ভালো লাগে। এখানে তো বিশেষ কেউ আসে না—।

অসীমই প্রথম, বিনা ভূমিকায় ঝুপ করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। সুতরাং বাকি তিনজনকেও প্রণাম করতে হয়। জয়া বললো, আসুন, ব্রেকফাস্ট রেডি—

সদাশিব বললেন, তোমরা চা খেয়ে নাও। আমি কিন্তু আগেই সেরে নিয়েছি। আমার সকাল ছ'টার মধ্যেই চা খাওয়া হয়ে যায়।

বড় গোল টেবিল ছিমছাম সাজানো। এখানে পাঁউরুটি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু জয়া টেবিলের মাঝখানে টোস্টের স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে, এমন কি টিনের সার্ডিন মাছ এবং ভালো জাতের মার্মালেডও উপস্থিত। প্রত্যেকের ডিশে দু'টি করে মুর্গীর ডিম। সবারই খিদে পেয়েছিল, খেতে শুরু করে শেখর বললো, জয়া, তোমার কালকে পাঠানো কাটলেট বেশ ভালো হয়েছিল। বেশ রাঁধতে শিখেছো তো!

জয়া হাসতে হাসতে বললো, আমি তো রাঁধি নি! ঠাকুর রেঁধেছে—একটু বেশি ঝাল হয়েছে, না?

— আমি একটু বেশিই ঝাল খাই।

— কাল সন্ধেবেলা আপনারা কি করলেন?

—কি আর করবো, জঙ্গলের মধ্যে একটু ঘুরলাম-টুরলাম, আর আড্ডা—সারাক্ষণ আড্ডা! ঐ জন্যই তো আসা! তোমরা কাল ঘাটশীলা থেকে কখন ফিরলে?

— বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার কপার মাইন্‌সের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সেনগুপ্তের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর বউ মহাশ্বেতা 'মামার মাসতুতো বোন—কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লো না।

অপর্ণা প্রত্যেকের কাপে কফি ঢেলে দিচ্ছিল, রবির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন কেন?

রবি অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললো, এই, মানে—

শেখর সঙ্গে সঙ্গে বললো, কাল রবি ফুল পাড়তে একটা গাছে উঠেছিল—

— গাছ থেকে পড়ে গেছেন নাকি?

— না, একেবারে ধপাস করে পড়ে গেলে কি আর হাড়গোড় আস্ত থাকতো! নামবার সময় শেষ দিকটায় পা পিছলে—

রবি বললো, একটা ছোট ডাল ধরেছিলুম, সেই ডালটা ভর্তি কাঠপিঁপড়ে—

অপর্ণা অন্যদের কাপে কফি ঢালা শেষ করলো, তারপর নিজের চেয়ারে বসে এক চুমুক দিয়ে বেশ স্পষ্ট গলায় বললো, মিথ্যে কথা মোটেই গাছ থেকে পড়ে যান নি।

এমনই অপর্ণার বলার ভঙ্গি, প্রত্যেকে ওরা চমকে উঠলো। একটা অজানা অস্বস্তি এক মুহূর্তে ওদের মুখে খেলা করে গেল। একটু লম্বা ধরনের মসৃণ মুখ অপর্ণার, সে মুখে এ পর্যন্ত একটিও রেখা পড়ে নি, বড় বড় দু'টি টানা চোখের মণি দুটো সদা চঞ্চল, ভিজে চুল আলগা বেণি করে ফেলে রেখেছে বুকের ওপর, বাঁ হাতের কনুই টেবিলে রাখা, মণিবন্ধে ঘড়ি ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নেই, একুশ বছরের যুবতী সুলভ কোনো অকারণ লজ্জাও নেই তার, অপর্ণার চাহনি ঝর্নার জলের মতন স্বচ্ছ।

শেখর হাসার চেষ্টা করে বললো, কেন, মিথ্যে কথা কেন?

অপর্ণাও হাসলো, বললো, আমি জানি।

— কি করে জানলে?

— আমি মিথ্যে কথা শুনেই বুঝতে পারি। মিথ্যে কথা বলার সময় মানুষের মুখ-চোখ কি রকম বদলে যায়!

জয়া বললো, সত্যিই কিন্তু রুণি ভীষণ বুঝতে পারে।

অসীম বললো, যাঃ, তা হতেই পারে না। আমি এমন মিথ্যেবাদী দেখেছি, সারা পৃথিবী তাদের কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য।

অপর্ণা বললো, আনবেন একবার তাদের আমার সামনে!

— ইস্‌, খুব গর্ব যে দেখছি। আর নিজের বুঝি সব সময় সত্যি কথা বলা হয়!

— আমি তা তো বলি নি! আমি তো বলি নি, মিথ্যা কথা বলা খারাপ। আমি বলেছি, আমি মিথ্যে কথা শুনলেই বুঝতে পারি।

জয়া বললো, রুণি মাঝে মাঝে লোককে এমন অপ্রস্তুত করে দেয়! সেদিন আমাদের সরকার মশাই বাবাকে বলছেন—

রবির মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে যেন এতক্ষণ কী একটা খুঁজছিল, জয়ার মুখে রুণি নামটা সে যেন খুঁজে পেলো। এতক্ষণ কেউই অপর্ণাকে তুমি কিংবা আপনি বলে নি, ভাববাচ্যে কাজ সারছিল, এবার রবিই অপ্রত্যাশিতভাবে অপর্ণাকে ডাক নামে ডেকে উঠলো। বললো, তুমি আমারটা কিন্তু ঠিকই ধরেছো, রুণি। আমি সত্যি গাছ থেকে পড়ে যাই নি। কিন্তু কেন পড়ে গিয়েছিলুম, তা অবশ্য বলবো না! তুমি তো মিথ্যেটা ধরতে পারো, কিন্তু সত্যিটা আসলে কি তা বুঝতে পারো?

— অনেক সময় তাও পারি।

— এটা কিছুতেই পারবে না।

জয়া আর অপর্ণা পরস্পর চোখাচোখি করে মেয়েদের অন্তর্জগতের ভাষায় হেসে উঠলো। অপর্ণা বললো, দেখলি দিদি, কায়দাটা কি রকম খেটে গেল!

জয়া বললো, আমিও কী রকম তোকে সাহায্য করলুম বল!

অপর্ণা বললো, আহা, তা না করলেও—

এরা দু'বোন যেন কী একটা রহস্য করছে আঁচ পেয়ে অসীম বললো, আমরা কিন্তু রুণিকে খুশি করার জন্যই স্বীকার করছি যে, আমরা মিথ্যে কথা বলেছি।

অপর্ণা ঝরঝর করে হেসে উঠে বললো, থাক, আর বলতে হবে না। গাছে উঠে ফুল পাড়তে গিয়েছিলেন! অতই যদি ফুল ভালবাসেন, তবে আজ আসবার সময় কিছু ফুল আনতে পারেন নি!

— বাঃ, তোমাদের বাগানেই তো কত ফুল রয়েছে, সেই জন্যেই আমরা বাইরে থেকে আর ফুল আনি নি।

— আহা, কি বুদ্ধি! বাগানে ফুল থাকা আর বাইরে থেকে কারুর উপহার আনা বুঝি এক কথা?

— ইস্! সত্যিই এটা ভুল হয়ে গেছে!

— তা বলে বোকার মত কাল যেন ফুল নিয়ে আসবেন না!

শেখর বলে উঠলো, তাহলে কালও আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন তো! যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! এবার মেয়েদের দমন করে পুরুষদের হাসির আওয়াজ দীর্ঘ।

চায়ের পাট শেষ হলে সদাশিব ঘুরে ঘুরে সারা বাড়িটা ওদের দেখালেন। সদাশিবের কোনো পূর্বপুরুষ এখানকার রাজাদের কুলপুরোহিত ছিলেন—সেই আমলের কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। সেই পুরোহিত বংশ এখন ধনী ও অভিজাত হয়েছে, সেই জন্যই বোধহয় ঐশ্বর্যের অহমিকার কোনো প্রকাশ নেই। দোতলার ঘরগুলো বনেদী চালে সাজানো। প্রত্যেক ঘরে পুরু গালিচা পাতা, দেয়ালে দেয়ালে অয়েল পেইন্টিং, এক ঘরে কিছু তলোয়ার, বর্শা, তীর আর গাদা বন্দুকের সংগ্রহও রয়েছে! এর অনেকগুলোই সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্যবহার হয়েছিল। ইতিহাস ও পুরাণ সদাশিবের বেশ ভালো পড়া আছে—তিনি ওদের বুঝিয়ে বলছিলেন, সঞ্জয় একাই প্রশ্ন করছিল শুধু।

তবে ওরা লক্ষ করলো, সদাশিব কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান, বাক্য শেষ না করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। এই বাড়ির প্রতিটি ঘরে একদিন আর একটি যুবার পায়ের শব্দ শোনা যেতো। বিলেতের কোন অন্ধকার ঘরে এক বরফ-পড়া রাতে অপমানিত অরুচিকর মৃত্যু তাকে নিয়ে গেছে।

সদাশিব নিজের ছেলের কথা একবারও তুললেন না। ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধের মতন একবারও নিজের ভাগ্যকে দোষ দিলেন না! কঠোর সহ্যশক্তির চিহ্ন তাঁর চোখে-মুখে। দুই মেয়ের পর ঐ একটি মাত্র ছেলে ছিল তাঁর রূপবান, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান ছেলে। পার্থিব কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার, নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল জয়াকে, ফুটফুটে সন্তানের পিতা হয়েছিল—তবু কেন সব ছেড়ে সে দূর লন্ডনের এক ভ্যাপসা গন্ধমাখা ঘরে একা একা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর কাছে চলে গেল—এই একটা বিরাট প্রশ্ন এ বাড়ির নিস্তব্ধতার মধ্যে মিশে আছে।

খানিকক্ষণ ওরা হৈ-হৈ করে সামনের বাগানে ব্যাডমিন্টন খেললো। রবির হাতে র‍্যাকেট

ঘোরে তলোয়ারের মতন, অপর্ণাও মন্দ খেলে না। চটি খুলে রেখে খালি পায়ে ছুটছে অপর্ণা, এক একটা পয়েন্ট নিয়ে রবিকে বলছে, জানি, আপনি বলবেন, আপনার পা খোঁড়া বলে আজ খেলতে পারছেন না! আপনাকে হারিয়ে আনন্দ নেই।

রবি বললো, দেখো–না, এক পায়েই কী রকম খেলি! সঞ্জয়, তুই পেছন দিকটা সামলে রাখ।

— অসীমদা, আপনি অত চাপ মারবেন না, প্লেসিং করুন।

পরমেশ্বর জয়ার ছেলে দেবকুমারকে বেড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলো। শেখর তাকে নিয়ে আদর করলো, তার সঙ্গে ছেলেমানুষ হয়ে খেললো খানিকক্ষণ। দু'গেম খেলেই জয়া হাঁপিয়ে উঠেছিল, সে এসে পাথরের বেদিতে বসলো। শেখর বললো, জয়া, আজ তো হাট হবে। আজ হাটে যাবে নাকি?

জয়া বললো, হ্যাঁ, রুণি বলেছে কাচের চুড়ি কিনবে।

— আমরাও যাবো ওখানে তা হলে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।

— ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো। নইলে বড় একঘেয়ে লাগছিল। রুণি তো হাঁপিয়ে উঠেছে এরই মধ্যে!

— তোমরা আর কতদিন থাকবে?

— বাবা আরও দিন পনেরো থাকতে চান। রুণিরও তো এখন ছুটি। আপনাদের কেমন লাগছে এ জায়গাটা?

— আমার তো বেশ ভালোই লাগছে। তোমরা আমাদের বাংলোয় চলো না—সবাই মিলে পিকনিক করা যাবে।

— খুব ভালো কথাই তো! কবে বলুন?

— আজ?

— আজ থাক। আজ হাটে যেতে হবে যখন—সকাল সকাল খাওয়া–দাওয়া সেরে নেওয়াই ভালো। আপনারাই বরং দুপুরের খাওয়াটা এখানেই খেয়ে নিন না!

শেখর একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। অপর্ণা–রবিদের খেলার দিকে দেখলো একবার। তারপর কি যেন ভেবে জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, না আজ খাবো না। নেমন্তন্ন করো নি! এমনি খাবো কেন! আমার বিয়েতেও তুমি আমায় নেমন্তন্ন করো নি!

জয়া বললো, আপনি অনেক বদলে গেছেন!

শেখর জয়ার বাহুতে একটা টোকা মেরে বললো, তুমি বদলাও নি? তুমিও অনেক বদলে গেছ।

ফেরার সময় মাঝপথে এসে অসীম পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে বললো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত হবে না, বুঝলি! আগে থেকেই ঠিক করা ভালো—কে কার দিকে মনোযোগ দেবে? সঞ্জয় তো গম্ভীর হয়েই আছে ও বাদ। আর শেখর তো জয়ার সঙ্গেই—জানা কথা। রবি, তোর আর আমার মধ্যে কে অপর্ণাকে চান্স নেবে—আগে থেকে ঠিক হয়ে যাক।

শেখর হাসতে হাসতে বললো, ওরকমভাবে হয় নাকি? মেয়েটার কাকে ভালো লাগবে—কিংবা কারুকেই ভালো লাগবে কিনা—সেটা দ্যাখ!

— সে আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেবো! অসীম টুসকি দিয়ে আধুলিটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে মুঠোয় লুফে নিয়ে বললো, বল রবি, হেড না টেল। এই আধুলিটা হচ্ছে অপর্ণা।

রবি অভাবিত রকমের নিস্পৃহ গলায় বললো, আমার দরকার নেই। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

— সে কি, তুই যে সব সময় ওর দিকেই মনোযোগ রেখেছিলি।

— সে এমনি খেলার খেলা। যেটুকু সময় দেখা, তাছাড়া আর—

— তোর বুঝি আবার মনে পড়েছে—

রবি হাত তুলে নীরস গলায় বললো, থাক। এখন ওকথা থাক।

সবাই এক মুহূর্ত চুপ করে গেল। অসীমের হাত তখনো মুঠো করা, মুঠোয় বন্দী আধুলি। শেখর বললো, আচ্ছা অসীম, আমিই কনটেস্টে নামছি। তুই হেড আমি টেল, এবার হাত খোল, দেখি অপর্ণা কার ভাগ্যে উঠেছে।

অসীম মুঠোর মধ্যে রেখেই আধুলিটা পকেটে ভরে বললো, তা হলে থাক, ব্যাপারটা রহস্যেই থেকে যাক।

— খুললে দেখবি, তোর ভাগ্যে ওঠে নি। ওখানে কিছু সুবিধে হবে না—ও বড় কঠিন মেয়ে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

— আমিও কম কঠিন ছেলে নই। কঠিনে কঠিনে বেশ টক্কর খাবে। কথাটা বলে অসীম আড়চোখে রবির দিকে তাকালো। একটানা এতক্ষণ খেলার পর রবির মুখটা ঘামে ভেজা-ভেজা, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। জামার সব ক'টা বোতাম খুলে দিয়েছে রবি, কারুর কথায় কোনো মনোযোগ দিচ্ছে না। অসীম রবিকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, কি রে, তুই চান্স নিবি না বলছিস, আর ওদিকে তো বেশ রুণির হাতখানা খপ করে ধরে ফেললি একবার!

রবি এবার ম্লানভাবে হেসে বললো, ওটা অভ্যেস!

— তার মানে!

— মানে আর কি। হাতের কাছে কোনো মেয়ের হাত দেখলেই ধরতে ইচ্ছে করে। সুন্দর শরীর দেখলেই ইচ্ছে করে একটু আদর করতে। এইসব পুরোনো অভ্যেসগুলো কিছুতেই কাটাতে পারছি না। কিন্তু মেয়েদের আর আমার একেবারে সহ্য হয় না।

—মেয়েদের সহ্য হয় না তোর? হরিহরি, বেশ লাগলো শুনতে কথাটা!

সন্ন্যাসী হবি নাকি? সন্ন্যাসী কেন হবো? কিন্তু ঐ সব স্নো-পাউডার মাখা ন্যাকা মেয়েদের আমি দু'চক্ষে সইতে পারি না!

— রুণি তুই ন্যাকা বলছিস!

— নিশ্চয়ই ন্যাকা? ওরা সবাই একরকম!

— বাজে বকবক করিস না! তুই নিজেই একটা ন্যাকা হচ্ছিস দিন দিন!

রবি এবার পরিপূর্ণভাবে হেসে বললো, কি রে, রুণির নাম তোর এত গায়ে লাগছে কেন? আমি তো বললুমই তোকে চান্স নিতে।

অসীম গজগজ করে তবু বলে, তপতীর ব্যাপারের পর তুই গোটা মেয়ে জাতটার ওপরে খেপে গেছিস। কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি, তপতীর শুধু একারই দোষ ছিল না, তোরও দোষ ছিল—

রবি হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠলো, ঝাঁঝাল গলায় বললো, দ্যাখ অসীম, তোদের কারুর মুখ থেকে আমি তপতীর নাম উচ্চারণও শুনতে চাই না, বুঝলি? আর কক্ষনো বলিস না।

—কেন বলবো না? বেশ করবো!

শেখর মাঝখানে এসে বললো, আঃ, অসীম, থাক না। চুপ কর।

৭

হাট দেখে নিরাশই হলো। গুচ্ছের মাটির হাঁড়িকুড়ি আর তরিতরকারির দোকান ছাড়া কিছুই নেই প্রায়। কিছু মুর্গী ছাগল এসেছে, গামছা আর ঝ্যালঝেলে শাড়ি-ধুতির কয়েকখানা দোকান, এক কোণে কয়েকটা নাপিত লাইন দিয়ে চুল কাটতে বসেছে। আর একদিকে ভাত-পচাই হাঁড়িয়ার মদ বেচছে কয়েকটা মেয়ে, ছুরি-কাঁচি শান দিচ্ছে একটা লোক—তার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। তবু মানুষের অন্ত নেই, দূর দূর গ্রাম থেকে সকাল থেকেই এসেছে মেয়ে-পুরুষ, খেতে না পাওয়া শীর্ণ চেহারার মিছিল।

ওরা ভেবেছিল, হাট হবে অনেকটা মেলার মতন, আনন্দ-ফুর্তি হৈ-হল্লার একটি বিকেল। তার বদলে শুধুই মানুষ আর বেগুন-পটলের ভিড়, এরা সবাই এসেছে অজানা অঞ্চলের মাঠ, জঙ্গল কিংবা টিলার প্রান্ত থেকে, শুধু হৃদয়হীন বিনিময়ের জন্য। বেঁচে থাকা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মতন একটা দারুণ শক্ত কাজে এরা সবাই বিষম ব্যস্ত।

আনন্দের ব্যবস্থা যে একেবারেই নেই তা নয়, ডুগডুগিতে ডিগ—ডিগ—ডিগ—ডিগ শব্দ তুলে বাঁদর নাচ দেখানো হচ্ছে এক জায়গায়, ছক্কা-পাঞ্জার জুয়ার বোর্ড পড়েছে গোটা তিনেক, হাঁড়িয়ার দোকানগুলোতেও ভিড় কম নয়।

রোদের তাপ উঠেছে চড়া হয়ে, ওরা চারজন অলস পায়ে ঘুরছে, ভালো লাগছে না ওদের, সঞ্জয় বললো, চল, কাল চলে যাই এ জায়গা থেকে। আর ভালো লাগছে না।

অসীম বললো, কেন, খারাপ কিসের—কলকাতাতেই বা এর চেয়ে কী এমন বেশি ভালো লাগে!

—কিন্তু আমরা এখানে এসেছিলুম চুপচাপ থাকতে। কিন্তু এখানেও সেই ভিড় আর গণ্ডগোল!

— তোর যদি ভিড় ভালো না লাগে তো তুই বাংলোয় গিয়ে শুয়ে থাক না!

সঞ্জয় বললো, ঠিক ভিড়ের জন্যও না। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে। আদিবাসীদের মেলা অনেক কালারফুল হবে ভেবেছিলাম। কতগুলো কুষ্ঠরোগী এসেছে দ্যাখ। ওদের দিকে তাকালেই গা শিরশির করে।

শেখর বললো, তুই সব কিছুই দেখবি কেন? তোর পছন্দমতন বেছে নে! লক্ষ করে দ্যাখ, এখানকার পুরুষগুলো সব রোগাপটকা হলেও মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য খারাপ নয়, তাকাতে খারাপ লাগে না। আমি শুধু মেয়েদেরই দেখছি!

সঞ্জয় শেখরের ইয়ার্কি গায়ে মাখলো না। বললো, একটা জিনিস তোর মনে হচ্ছে না। এদের মধ্যে আমরা যেন একেবারে বিদেশি। আমাদের পোশাক, চালচলন—এদের সঙ্গে কত তফাৎ—আমরা একই দেশের মানুষ, এ কথা বোঝার কোনো উপায় আছে? এদেশে রেভোলিউশান কবে সম্ভব হবে? আমাদের কথা ওরা কোনোদিন শুনবে? কোনোদিন ওরা আমাদের বিশ্বাস করবে? আপন জন বলে ভাববে?

শেখর বললো, তুই একটা মধ্যবিত্ত, তোর কথা কে শুনবে? কেউ শুনবে না। বিপ্লব যদি কখনো হয় তবে তার নেতা ওদের মধ্যে থেকেই জন্মাবে।

— কবে?

ভিড়ের মধ্যে লখাকে দেখতে পেয়ে শেখর ওকে ডেকে উঠলো। লখার সঙ্গে স্পষ্ট চোখাচোখি হতেও লখা সাড়া দিলো না, চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। অসীম হাসতে হাসতে বললো,

ওর অভিমান হয়েছে! আসবে আবার ঠিক, কলকাতায় চাকরি দেবার লোভ দেখিয়েছি।

পরমেশ্বরের সঙ্গে অপর্ণা আর জয়াও এসেছে। ওরা চারজন তখন জুয়ার বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে, অসীম শেখরকে বলছিল, কি রে, খেলবি নাকি?

শেখর বলছিল, কী হবে খেলে, গরিব বেচারারার এক্ষুনি আমাদের কাছে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে! এ খেলায় যার বেশি টাকা থাকে সেই জেতে, আমি কতবার দেখেছি! এদের সঙ্গে খেলতে ভালো লাগে না—

অসীম বললো, যা, যা, চাল মারিস না! তুই সব খেলাতেই জিতিস? খেলে দ্যাখ না?

শেখর হেসে পকেট থেকে ব্যাগ বার করলো। ফিস ফিস করে বললো, অসীম তুই আমার জুয়া খেলা দেখিস নি। সুনীল আর অবিনাশের সঙ্গে বারীণদার আড্ডায় এক সময় কি তুলকালাম কাণ্ড করেছি, তুই তা জানিস না।

একটা লাল দু'টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে শেখর বললো, ছড়িদার, রাখো ওটা হরতনের ওপর রাখো।

যে লোকটা বোর্ড পেতেছে, সে সম্ভ্রমের সুরে বললো, পুরা দু'রুপিয়া, মালিক? এখানে সিকি-আধুলির বেশি কেউ খেলে না, সামর্থ্য নেই। শেখর ঘাড় হেলালো। টিনের কৌটোর মধ্যে একটা বড় ছক্কা ঘটাং ঘটাং করে নেড়ে ওলটালো লোকটা। রুহিতন। শেখর হেরেছে। শেখরের মুখে কিন্তু তখনো টেপা হাসি। এবার একটা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ফিন্ হরতন।

সেবারেও শেখরের হার। শেখর একটা দশ টাকার নোট রাখলো সেই হরতনেই। আবার হার। আবার হরতনে কুড়ি টাকা। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে শেখরকে দেখছে। সেবার হরতন উঠলো, শেখর বললো দাও হে ছড়িদার, ষাট টাকা দাও! দেখলি অসীম এ খেলাটা এতই সোজা।

সঞ্জয় বললো, থাক শেখর, টাকাটা তুই নিস নি। বেচারা গরিব লোক।

শেখর বললো, অত দয়ামায়া আমার নেই। জুয়ার টাকা আমি ছাড়ি না।

এমন সময় পেছন থেকে জয়া বলেছিল, একি, কতক্ষণ থেকে আপনাদের খুঁজছি !

ওরা পেছন ফিরে বললো, আমরাও তো তোমাদের খুঁজছি। রুণি, তোমার কাচের চুড়ি কেনা হয়েছে? হয় নি? চলো খুঁজে দেখি।

— আপনাদের আরেকজন কই?

ওরা তাকিয়ে দেখলো, রবি নেই। একটু আগেও ছিল। অসীম বললো, কিছু একটা কিনছে বোধহয়। এসে পড়বে এক্ষুনি!

অপর্ণা বললো, আমরা তো সব জায়গাই ঘুরে এলুম, ওকে কোথাও দেখলুম না তো!

— একটু আগেও তো ছিল আমাদের সঙ্গে। কিছু বলে যায় নি যখন, তখন কাছেই কোথাও গেছে। হয়তো—

— আপনারা ঐ ভিড়ের মধ্যে কি করছিলেন?

— জুয়া খেলছিলাম। শেখর অনেক টাকা জিতে নিয়েছে!

জুয়ার কথা শুনে জয়া একটু আঁৎকে উঠলো। ভর্ৎসনার চোখে শেখরকে দেখে বললো, ছি ছি, ঐসব লোকের মধ্যে বসে আপনারা জুয়া খেলছিলেন?

শেখর হাসতে হাসতে বললো, তাতে কী হয়েছে? জিততে বেশ লাগে। তুমি একটু খেলবে নাকি?

— মাগো। বলতে লজ্জা করলো না আপনার? হাটের মধ্যে বসে আমি জুয়া খেলবো— আর বাকি থাকবে কি?

অপর্ণা কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহ পেয়ে গেল। উজ্জ্বলভাবে দাবি জানালো, আমি খেলবো একটু!

আমায় খেলাটা শিখিয়ে দিন। কত টাকা লাগবে?

দু'বোনের বদলে অপর্ণা আর জয়াকে দুই বন্ধু বলেই মনে হয় সব সময়। তার মধ্যে অপর্ণারই ব্যক্তিত্ব বেশি। এবার কিন্তু জয়া হঠাৎ দিদিগিরি ফলিয়ে ভারী গলায় বললো, না, রুণি, ছেলেমানুষী করিস না।

— কেন, একটু খেলি, বেশি না।

— না। বাবা শুনলে রাগ করবেন।

দিদির কথার অবাধ্য হবে কি হবে না—এই রকম দ্বিধা অপর্ণার মুখে। সে আর কিছু বলার আগেই শেখর তার চোখে সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে বললো, রুণির খুব শখ দেখছি। এই বয়েসেই জুয়া খেলায় এত ঝোঁক? থাক, খেলতে হবে না, চলো।

পায়ে পায়ে সম্পূর্ণ হাটটাই ঘোরা হয়ে যায় আবার। সঞ্জয় বার বার চোরা চাহনিতে দেখছে অপর্ণাকে। অনুরাধার সঙ্গে অপর্ণার সত্যিই দারুণ মিল। শুধু চেহারায় নয়, স্বভাবেও। অনুরাধা যদি এই মেলায় আসতো—তাহলে সেও নিশ্চয়ই জুয়া খেলতে চাইতো। হঠাৎ একটা কথা কল্পনা করে সঞ্জয়ের হাসি পেলো। মিঃ বিশ্বাস যদি কখনো দেখতে পেতেন, এই রকম একটা হাটে কতগুলো নোংরা আর জংলী লোকের সঙ্গে বসে তাঁর মেয়ে জুয়া খেলতে চাইছে—তাহলে তাঁর মুখের চেহারা কেমন হতো? মিঃ বিশ্বাস খুব স্পোর্টের ভক্ত, জুয়া খেলাকেও তিনি কি স্পোর্ট হিসেবে নিতে পারতেন? কিংবা গেইম ফর রিলাক্সেশান? মিঃ বিশ্বাসের ওপর কোনো একটা প্রতিশোধ নেবার দারুণ ইচ্ছে হয় সঞ্জয়ের।

অসীম বার বার চেষ্টা করছে অপর্ণার পাশে পাশে হাঁটতে। অপর্ণা কখনো এদিক-ওদিক চলে গেলে অসীম আবার স্থান বদলে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে। অপর্ণার কৌতূহলের শেষ নেই। যে-কোনো ভিড় দেখলেই সে একবার উঁকি দেবে। এমনকি বাঁদর নাচও তার দাঁড়িয়ে দেখা চাই।

অনেক খুঁজে একটা পছন্দসই চুড়ির দোকান পাওয়া গেল। অন্যদের সরিয়ে ওরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জয়ার হাত নরম—সহজেই সে হাতভর্তি চুড়ি পরে ফেললো, কিন্তু অপর্ণার হাত একটু শক্ত, অনভিজ্ঞ চুড়িওয়ালা অনবরত পরাতে গিয়ে ভাঙছে। অসীম তার পাশে বসে পড়ে বললো, ধ্যাৎ, দাও, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

অপর্ণা ভ্রূভঙ্গি করে বললো, আপনি চুড়ি পরাতেও পারেন বুঝি?

— পরাতে না পারি, ওর মত ভাঙতে তো পারবো! ভাঙছেই যখন, ওর বদলে আমিই ভাঙি।

— কিন্তু ও ভাঙলে পয়সা লাগবে না, আপনি ভাঙলে পয়সা দিতে হবে।

— হোক। তবু আমার কাচের চুড়ি ভাঙতে ভালো লাগে।

— আগে অনেক ভেঙেছেন বুঝি?

— হ্যাঁ, অনেক। মনে মনে।

অসীম অপর্ণার হাত নিজের করতলে তুলে নিলো, আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, নখগুলোতে গোলাপি আভা, দেখতে এত নরম হাত—এত শক্ত কেন?

— মুখ-টেপা হাসিতে অপর্ণা বললো, একি অত জোরে চেপে ধরেছেন কেন? চুড়ির বদলে আমার হাতটাই ভাঙবেন দেখছি!

অনেক ভেবে-চিন্তে সঞ্জয় একটা রসিকতা করার চেষ্টা করলো, কি করবে, ওর তো পাণিগ্রহণ করার অভ্যেস নেই!

সে রসিকতায় কেউ হাসলো না। জয়া বললো, চুড়িওয়ালা হিসেবে অসীমবাবুকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে!

অসীম বললো, রুণি, তুমি কী রঙের চুড়ি পরবে বলো?

— আপনিই পছন্দ করুন।

অপর্ণার শাড়ির পাড় হালকা সবুজ, কপালেও সবুজ টিপ পরেছে, সেগুলো এক পলক দেখে নিয়ে অসীম বললো, তোমাকে সবুজই ভালো মানাবে—সবুজ চুড়ির গোছা তুলে নিয়ে, সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে অসীম প্রথম দুটো চুড়ি না ভেঙে অপর্ণার হাতে পরিয়ে দিলো।

পেছনে দাঁড়ানো উদ্‌গ্রীব জয়া, শেখর, সঞ্জয় হু-র্‌-রে করে উঠলো। অসীম সগর্বে পরের দু'গাছা একটু তাড়াতাড়ি পরাতে দু'গাছা কব্জি পর্যন্ত এসেও টিকলো না, অপর্ণা বললো, আপনি আমার হাত কত জোরে চেপে ধরেছেন! লাগছে, সত্যি!

শেখর বললো, অসীম, উঠে আয়, তোর কেরদানি বোঝা গেছে। তুই ভাঙতে ভাঙতে দোকানই সাফ করে ফেলবি।

অসীম বেপরোয়াভাবে জবাব দিলো, ভাঙুক না। ক'টাকার আর জিনিস আছে এখানে!

অসীমের এই স্থূল ভাষণে সঞ্জয় একটু দুঃখিত বোধ করলো চুড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে সে যেন একবার নীরবে ক্ষমা চেয়ে নিলো। সঞ্জয় অনুভব করলো, কি করে যেন তার মনের বিষণ্ণতা বা গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। অনুরাধাকে সে কোনোদিন কাচের চুড়ি পরতে দেখে নি। অনুরাধার হাত কি শক্ত? কোনো সন্দেহ নেই, এই হাটে এলে অনুরাধারও কাচের চুড়ি পরতে বসে যেতো!

অপর্ণা মুখ তুলে বললো, হাতখানা কি রকম জোরে ধরেছে দেখুন না। চুড়ি পরাবেন না হাতকড়ি পরাবেন?

—দাঁড়াও, এবার ঠিক, খুব আস্তে—হাতখানা আস্তে ধরে অসীম বোধহয় চুড়িগুলো বেশি জোরে ধরেছিল, এবারে একটা চুড়ি ভেঙে অপর্ণার হাতের মধ্যে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তরতর করে বেরিয়ে এলো রক্ত, অপর্ণার ফরসা হাতের ওপরে মোটা মোটা রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে গেল। একটুও মুখ বিকৃত না করে, অপর্ণা খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, বেশ হয়েছে, এবার ছাড়ুন!

অসীমের মুখ ফ্যাকাশে, বললো, ইস্! রক্ত বেরিয়ে গেল!

সে তখনো অপর্ণার হাত ধরে রক্তের দিকে চেয়ে আছে, অপর্ণা আবার বললো, এবার হাতখানা ছাড়ুন।

—রক্ত! কী হবে এখন!

—কী আর হবে! ভারী তো একটু রক্ত।

জয়া বললো, রুণি, উঠে আয় হাতটা বেঁধে দিচ্ছি—

অপর্ণা বললো, বাঁধতে হবে না, এক্ষুনি থেমে যাবে, বেশি কাটে নি।

অসীমের মুখখানা ক্রমশ অস্বাভাবিক সাদা হয়ে এলো, গলার আওয়াজ বদলে গেছে, সে বললো, আমি রক্ত বার করে দিলাম!

অপর্ণা সেই রকমই হাসতে হাসতে বললো, ও কি, আপনি ওরকম করছেন কেন? একটু রক্ত বেরিয়েছে তো কি হয়েছে?

—মুখ দিয়ে টানলে অনেক সময় রক্ত থেমে যায়।

অবলীলাক্রমে অপর্ণা তার হাতখানা অসীমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনি মুখ দিয়ে টানবেন? টানুন না।

অসীম কেঁপে উঠে বললো, না না, আমি রক্ত সইতে পারি না—

না, না।

—কী ছেলেমানুষ! ভয় পান বুঝি?

কাল সন্ধেবেলা মহুয়ার দোকানে সেই নাচুনে মেয়েটার দিকে অসীম যে-রকম ভয়ার্তভাবে তাকিয়েছিল, আজও অসীমের দৃষ্টি ক্রমশ সেই রকম হয়ে এলো! শেখর বুঝতে পারলো অসীমের সেই পরিবর্তন। শিরা ফুটো হয়ে গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।—কিন্তু অপর্ণার হাতের ঐটুকু ক্ষত থেকে বেশ রক্ত বেরুতে লাগলো! কয়েক ফোঁটা পড়লো মাটিতে। অপর্ণার হাত ছেড়ে দিয়ে অসীম সেই মাটিতে পড়া রক্তের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শেখর বললো, দেখি রুণি, তোমার হাতে কাচ-টাচ ফুটে আছে কি না। গাঁদা গাছের পাতা রগড়ে লাগালে রক্ত এক্ষুনি থেমে যেতো। অপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে, শেখর সস্নেহে তার হাতখানা নিয়ে পকেট থেকে ফরসা রুমাল বার করে মুছতে লাগলো। কাচ বিঁধে নেই, কিন্তু ক্ষতটা ভোঁতা ধরনের, তাই রক্ত থামতে চাইছে না।

এর মধ্যেই ওদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। বাবুদের বাড়ির সুন্দরী মেয়ের হাতে রক্ত, আর একজন ছোকরাবাবু এত মানুষের ভিড়ের মধ্যে সেই মেয়ের হাত ধরে আছে। হাটের জীবনে আর তো কোনো মজা নেই, এই একটুখানি মজা! তাদের আরও আনন্দ দেবার জন্যই বোধহয় শেখর অপর্ণার হাতটা মুখের কাছে নিয়ে ক্ষতস্থানে মুখ দিলো।

অপর্ণার মুখে কোনো রেখা নেই, সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো, রবিদা তো এলেন না!

জয়া শিউরে উঠে বললো, ইস্, অন্য কারুর রক্তও কেউ খেতে পারে! শেখরবাবু যেন একটা কি।

শেখর হাসিমুখ তুলে বললো, আমি নিজের হাত কেটে গেলে কখনো মুখ দিতে পারি না। কিন্তু মেয়েদের রক্তের স্বাদ নেবার সুযোগ তো আর কখনো পাই নি! তাই একটু চেয়ে নিলাম। রুণির রক্ত কি মিষ্টি!

অপর্ণা এই প্রথম নিজের ক্ষতস্থানে ভালো করে তাকালো। আপন মনে বললো, মিষ্টি বুঝি! আমি শুনেছিলাম সব রক্তের স্বাদই নোনতা। রবিদা'র কি হলো? হারিয়ে গেলেন নাকি?

—কী জানি, হয়তো আমাদের খুঁজে না পেয়ে বাংলোয় ফিরে গেছে।

—চলুন, এবার আমরাও ফিরি, এ হাটের তো কিছুই দেখার নেই। তা ছাড়া এমন জলতেষ্টা পেয়েছে। ইস্, কতদিন যে কোকাকোলা খাই নি!

শেখর বললো, সত্যিই তো, কোকাকোলার অভাবে বালিগঞ্জের মেয়েদের তো কষ্ট হবেই! ডাব খাবে?

—ডাব পাওয়া যাবে এখানে?

—না, খোঁজাখুঁজি করেও ডাব পাওয়া গেল না। পানীয় বলতে এখানে শুধু হাঁড়িয়ার মদ। তা দিয়ে অপর্ণার তৃষ্ণা মেটানো যাবে না। এবার ফিরতেই হবে।

হাট ভাঙতে শুরু করেছে বিকেল গাঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই! খুব বেশি রাত হবার আগেই এরা অনেকে ফিরে যাবে দূর দূর গাঁয়ে। মাটির হাঁড়িতে সওদা ভরে নিয়ে দল বেঁধে চলে যাচ্ছে অনেকে। নতুন করে আসছেও দু'একটা দল। কিন্তু এ কথা ঠিক, রবি এদের মধ্যে কোথাও নেই। শেখরের ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে গেল। ওদের ডেকে বললো, চলো, এবার ফিরি।

অসীম একটু দূরে সরে গিয়েছিল, আবার অপর্ণার পাশে এসে বিষণ্ন সুরে বললো, তোমরা আমাদের বাংলোয় একটু বসবে? ওখানে ডেটল আছে, লাগিয়ে দিতাম—ইস, এতখানি রক্ত বার করে দিলাম।

অপর্ণা পাগলাটে গলায় বললো, খবরদার, আর রক্তের কথা বলবেন না। আমার ভালো লাগছে না! আপনি ওরকম করছেন কেন?

শেখর জয়াকে জিজ্ঞেস করলো, কি, একটু বাংলোয় গিয়ে বসবে নাকি? তোমার শ্বশুরমশাই

চিন্তা করবেন না তো?

জয়া উত্তর দিলো, পরমেশ্বরকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারি। কিন্তু ছেলেটা আবার কান্নাকাটি না করে। চলুন, একটু ঘুরে আসি, আমি ঐ বাংলোতে কখনো যাই নি।

বাইরে গাছতলায় বসেছিল পরমেশ্বর। জয়া তাকে ডেকে বললো, তুমি বাবুকে গিয়ে বলবে, আমি একটু পরে আসছি। ছোটবাবু যদি কাঁদে—আমার কাছে আসতে চায়—তবে আমার কাছে ঐ বাংলোয় যাবে। বুঝলে?

৮

বাংলোতে বেশ ভিড়। চৌকিদার রতিলাল খাকি পোশাক পরে সেজেগুজে ফিটফাট হয়েছে, আর কয়েকজন ফরেস্টগার্ড ঘোরাঘুরি করছে। বাইরের বাগানে চেয়ার-টেবিল সাজানো, ফুলদানিতে ভর্তি ফুল। কি ব্যাপার? আজ এখানে উৎসব নাকি?

রান্নাঘরের পাশ থেকে চওড়া মুখে বিনীত হাস্যে রেঞ্জার সুখেন্দু পুরকায়স্থ বেরিয়ে এসে বললো, আজ কনজারভেটর আসবেন, খবর পাঠিয়েছেন। প্রায় সাড়ে তিন মাস বাদে স্যার এদিকে আসছেন, না, না, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

—সেই জন্যই বাইরে ব্যবস্থা করেছি, আপনারা বারান্দা কিংবা ঘরে বসুন—উনি অবশ্য আজ রাত্রে এখানে থাকবেন কি না ঠিক নেই—

অরণ্যের অধিপতি আসছেন, তাই সাজসাজ রব। ওদের একটু আড়ষ্ট লাগতে লাগলো, ওরা যেন আজ এখানে অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। ওদের দিকে বিশেষ কেউ চেয়ে দেখছে না। জয়া বললো, তা হলে আজ আমরা চলে যাই—।

শেখর বললো, না, কেন—

অপর্ণার কব্জিতে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো হয়ে গেছে, সে বললো, বাঃ, যাবো কেন, বেশ সুন্দর লাগছে জায়গাটা—আসুক না ওরা!

জয়া তবু স্বস্তিবোধ করছে না। সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ সে, একটা জিনিস তার সহ্য হয় না—সে যেখানে উপস্থিত থাকবে, সেখানকার চাকর-আর্দালিরা তার হুকুমের প্রতীক্ষায় না থেকে অন্যদের জন্য খাটবে—এরকম তার অভ্যেস নেই। রতিলালকে দু'বার ডেকেও পাওয়া যায় নি। তার ওপর সে যখন শুনলো—শেখরদের ঠিক মতন রিজার্ভেসান নেই এখানে, তাতে সে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললো, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এক্ষুনি চলুন না আমাদের বাড়িতে! কত ঘর পড়ে রয়েছে—বাবা খুব খুশি হবেন।

সঞ্জয় তাকে বললো, না, বসুন না! সামান্য কে এক কনজারভেটর আসছে বলেই আমরা পালাবো কেন?

রবির অনুপস্থিতি এখন স্পষ্ট বোধ করা যাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে রবিই দাপটের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারতো। ওরা বারান্দায় বসে নিচুস্বরে গল্প করতে লাগলো।

একটু ঘুরে এসে সঞ্জয় বললো, জানিস শেখর, এখানে আশ্চর্য চলছে। কনজারভেটরদের গুষ্টির জন্য কি রান্না হয়েছে জানিস? রাক্ষসের খাবার! ডজন খানেক টোস্ট, গুচ্ছের চিংড়ি মাছ ভাজা, ভেটকি মাছ, এক হাঁড়ি রসগোল্লা, ক্ষীর—এসব যোগাড় করলোই বা কি করে? আর, কাদের পয়সায় জানিস?—বলতে বলতে সঞ্জয় উত্তেজিত হয়ে উঠলো, আমি রতিলালকে জিজ্ঞেস করলুম, সব ঐ রতিলাল আর তিনজন ফরেস্ট-গার্ডের পয়সায়—সাতচল্লিশ টাকা করে মাত্র মাইনে পায়—কী ব্যাপার চলছে এসব এখানে?

অসীম বললো, এসব জঙ্গলের আলাদা নিয়ম-কানুন, তুই এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছিস কেন?

—তার মানে? চালাকি নাকি? কনজারভেটরও তো নেহাত একজন সরকারি অফিসার—তার খাওয়ার জন্য এরা খরচ করবে কেন?

—হয়তো সাহেব ওদের পরে বকশিশ দিয়ে দেবে।

—কোনো সরকারি অফিসার বেয়ারাদের বকশিশ দেয় না। আমি জানি না? আচ্ছা, দেখছি ব্যাপারটা।

কিন্তু রতিলালকে আমরা ডাকছি, সে আসছে না কেন? আমরা তো তাকে রোজই বকশিশ দিচ্ছি।

—আমি বলে এসেছি, আসছে এক্ষুনি। ওর দোষ নেই। রতিলাল লোকটা সত্যি ভালো—চোর-টোর নয়, সৎলোক। কিন্তু কি করবে? কনজারভেটর ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—আমরা তো এসেছি দু'দিনের জন্য। সুতরাং বড় সাহেবকে খুশি না করলে—

এই সময় রতিলাল আস্তে আস্তে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। মেয়েদের দিকে একবার আড়চোখে তাকালে। অসীম জিজ্ঞেস করলো, কী রতিলাল, আমাদের চা দেবে না? এতবার ডাকছি, শুনতে পাও নি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রতিলাল কাঁচুমাচুভাবে বললো, বড়াসাব ইধার আজ রাতমে ঠার জানে সে আপলোগ—

অসীম তীব্রভাবে বললো, সে আমরা বড় সাহেবের সঙ্গে বুঝবো। এই মেমসাহেবদের চেনো? ত্রিপাঠীজির কোঠি—দরকার হলে আমরা সেখানে চলে যাবো।

অপর্ণা বললো, আমার কিন্তু এক্ষুনি চা চাই। যা তেষ্টা পেয়েছে—

পর পর দুটো গাড়ি এসে কম্পাউন্ডে ঢুকলো। গাড়ি থেকে নামলো দু'জন সমর্থ পুরুষ, একজন স্থূলাঙ্গী মহিলা, দুটো বাচ্চা, একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে—চাপা প্যান্ট ও হাতে মাউথ অর্গান, একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে—আঁট শালওয়ার-কামিজ পরা—হাতে ট্রানজিস্টার, মুহূর্তে জায়গাটা মাউথ অর্গানের কর্কশ আওয়াজ আর হিন্দী গানের সুরে মুখরিত হলো। তা ছাপিয়ে শোনা গেল স্থূলাঙ্গী মহিলার কণ্ঠস্বর, লাস্ট টাইম ইধার একঠো ম্যাগনোলিয়া ট্রি দেখ কর গিয়া, উও কিধার—?

শেখররা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল, দলটি ওদের এখনো দেখতে পায় নি। সঞ্জয় বললো, ঐ পাইপ মুখে লোকটাই টপ বস্, মুখ দেখলে চেনা যায়। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে, সুতরাং এটা অফিশিয়ালট্যুর নয়! ওর কোনো প্রায়রিটি নেই। গাড়িগুলোও নিজেদের না, সরকারি গাড়ি বলেই সন্দেহ হচ্ছে।

শেখর হাসতে হাসতে বললো, সঞ্জয় তুই কোনো গ্রামাঞ্চলে কখনো ঘুরিস নি বুঝতে পারছি। এইসব জায়গায় সরকারি কাজ কিভাবে হয় তোর কোনো আইডিয়া নেই!

সঞ্জয় বললো, তা হোকনা! সপরিবারে বেরিয়েছে—তার মানে অফ্ ডিউটি, এখন আমরা আর ওরা একই—চল, এগিয়ে গিয়ে কথা বলি।

জয়া বললো—দেখ রুণি, ভদ্রমহিলা কি রকম বিশ্রী ধরনের একগাদা গয়না পরেছেন।

অপর্ণা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এক পলক মাত্র সেই দলটির দিকে তাকিয়ে আর গ্রাহ্যই করে নি, এবার আলগাভাবে উত্তর দিলো, তুই অমনি শাড়ি-গয়না দেখতে বসলি।

চোঙা প্যান্ট পরিহিত ছোকরা মাউথ অর্গান রেখে ক্যামেরা খুলেছিল, ওদের দিকে চোখ পড়তেই থমকে তাকালো। চোখ সরু করলো! পাইপ-মুখে লোকটি কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন। রেঞ্জার পুরকায়স্থ তার কাছে গিয়ে নিচু গলায় কি যেন বলতে লাগলেন। পাইপ-মুখে

ব্যক্তিটি বললেন, অফ কোর্স, অফ কোর্স।

সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে বললো, লেট আস্ ইনট্রোডিউস আওয়ার সেলভ্‌স।

হাসিমুখে তিনি বললেন—একটু ভাঙা উচ্চারণ, কিন্তু নিখুঁত বাংলায় সব শুনেছি, ইনি ডি এফ ও মিঃ শাকসেনা, আমি হচ্ছি আর কে ভগট্। আপনারা বেড়াতে এসেছেন, খুব আনন্দের কথা—খুব আনন্দ, আমরা তা হলে অন্য জায়গায় যাচ্ছি, আপনার ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন?

শেখর বললো, না, আমরা ফ্যামিলি নিয়ে আসি নি, ওরা আমাদের বান্ধবী—এখানে ওদের বাড়ি আছে, দরকার হলে আমরা—।

কনজারভেটর সাহেব আড়চোখে আরেকবার তাকালেন জয়া আর অপর্ণার দিকে। ইজিচেয়ারে বসে জয়া অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, কিন্তু অপর্ণা চেয়ে আছে এদিকেই। থামে হেলান দিয়ে, একটু পা উঁচু করা, উদ্ধত ভঙ্গি অপর্ণার, অপর পুরুষ তার দিকে তাকালে সে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয় না।

ডি. এফ. ও-র দিকে তাকিয়ে কনজারভেটর পরম উদার ভঙ্গিতে বললেন, তা হলে মিঃ শাকসেনা, এঁরা যখন এখানে রয়েছেন, আমরা তা হলে অন্য কোথাও—

মিঃ শাকসেনা চকিতে একবার দেখলেন রেঞ্জারের দিকে। ঈষৎ তীব্র দৃষ্টি। তিনি বিশেষ বিনয়ের ধার ধারেন না। জিজ্ঞেস করলেন, এঁদের কি এখানে রিজার্ভেশান ছিল? আমার দপ্তরে তো কোনো চিঠি যায় নি! এখানকার চৌকিদার কে?

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বললো, না, আমাদের রিজার্ভেসান ছিল না। খালি দেখে এখানে এসেছি—আমাদের অবশ্য থাকবার অন্য জায়গাও আছে এখানে।

কনজারভেটর বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুললেন, নো নো, ইউ এনজয় ইওরসেলভ্‌স। আমরা যাচ্ছি। পুরকাইট, নেক্সট্ বাংলোটা কত দূরে? টুয়েন্টি মাইলস্? ফাইন! ম্যাটার অফ হ্যাফ অ্যান আওয়ার—লেটস্ মুভ।

শালওয়ার পরা মেয়েটি সারা শরীর দুলিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ড্যাডি, আর নট্ উই স্টেয়িং হিয়ার!

—নো ডার্লিং, উই আর মুভিং ফর আ বেটার রেস্ট হাউস।

ওরা আবার গাড়িতে ওঠার বন্দোবস্ত করছে, ততক্ষণে সার বেঁধে খাবার আসতে শুরু করেছে। সুখেন্দু পুরকায়স্থ ছুটে গিয়ে কনজারভেটরকে বললেন, স্যার, থোড়া টি আউর স্ন্যাক্স্—।

মিঃ ভগৎ গাড়িতে পা দিয়েছিলেন, পেছন ফিরে বললেন, এসব কি! এত খাবার? হো-য়া-ই?

মিঃ ভগৎ অত্যন্ত রেগে গেছেন মনে হয়। বললেন, তার মানে? এত খাবার—কে আপনাদের করতে বলেছে? এসব অন্যায়—আমাদের নিজেদের সঙ্গে খাবার আছে। তারপর অসীমের দিকে ফিরে বললেন, দেখেছেন কাণ্ড! এরা কি ভাবে—এখনো বৃটিশ আমলে আছে—সাহেবদের খুশি করার জন্য...দিস্ মেন্টালিটি...।

—স্যার, সামান্য অন্তত কিছু মুখে দিন—

—নো—।

রতিলাল সাহেবের স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলো খেতে। মোটা গিন্নী জানালেন, তাঁর এখন পেট ভর্তি, আচ্ছা, অত অনুরোধ করছে যখন, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, পরে খাবেন—সুসি ডার্লিং টিফিন কেরিয়ার ঠো নিকাল দেও।

কনজারভেটর এবং ডি এফ ও সেই মুহূর্তে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। দু'জনেই এগিয়ে

গিয়ে গাছ পরীক্ষা করতে লাগলেন। শাল গাছে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষজন বিস্মৃত হয়ে অরণ্য বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

চৌকিদার আর ফরেস্ট-গার্ডরা লাইন বেঁধে খাবারের প্লেট নিয়ে আসতে লাগলো। একটা নয়, তিনটে টিফিন কেরিয়ার ও ইট বক্স বেরুলো গাড়ি থেকে—আলাদা আলাদাভাবে খাবারগুলো ভর্তি হতে লাগলো তাতে। মোটা গিন্নী সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। শালওয়ার পরা মেয়েটি তাঁর কানে কানে কিছু বলতেই, তিনি অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন অপর্ণাকে। একটু বাদে কনজারভেটর হঠাৎ আবার বাস্তবজ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, ওয়েল, লেটস্ গো!

গাড়ি ছাড়বার আগে হাসিমুখে মিঃ ভগৎ ওদের দিকে চেয়ে বললেন, এনজয় ইয়োরসেলভ্স। উইস ইউ এ ভেরি গুড টাইম—। পুরকাইট, কাল আমার সঙ্গে দেখা করবে—।

গাড়ি ছেড়ে যেতেই সুখেন্দু পুরকায়স্থ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললো, হ'য়ে গেলো! ব্যাড রিপোর্ট নির্ঘাত। এখন কার চাকরি যায়—।

অসীম বললো, চাকরি যাবে কেন? ভদ্রলোক তো বেশ ভালোই—।

—কী বলছেন স্যার, উনি কী রকম রেগে গেছেন বুঝতে পারলেন না!

—কোথায়, রাগ তো দেখলুম না।

—স্বয়ং কনজারভেটর বাংলোয় থাকার জায়গা পান নি—ওনাদের রাগ কি মুখে-চোখে ফোটে? দেখলেন না, আমায় সুখেন্দু না ডেকে পুরকাইট ডেকেছেন! খাবার একটুও মুখে তুললেন না।

খাবার বানানোই আপনাদের অন্যায় হয়েছে।

—অন্যায়? বৃটিশ আমল আঠারো বছর আগে শেষ হয়ে গেছে, আমরা জানি না? আমরা ঘাস খাই? এই সাড়ে তিনমাস আগে উনি যখন এসেছিলেন, কি রকম ভুঁড়িভোজন করে গেছেন, তা জানেন? সেবার আবার বলেছিলেন, বড় মাছ যোগাড় করতে পারো না? কত কষ্টে এবার সকালের ট্রেনে লোক পাঠিয়ে জামশেদপুর থেকে মাছ আনিয়েছি—শুধু আপনাদের দেখে ভড়ং—।

রতিলাল বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ স্পষ্ট ছলছল, সেদিকে তাকিয়ে সুখেন্দু পুরকায়স্থ বললেন, এই লোকটাই মরবে—।

সঞ্জয় তীব্র কণ্ঠে জানালো, মোটেই না, আপনি বেশি ভয় পাচ্ছেন, আমি ওর চাকরির দায়িত্ব নিলুম।

অসীম অপর্ণার দিকে ফিরে বললো, সঞ্জয়টা লেবার অফিসার তো, এখন ওর মধ্যে সেইটা জেগে উঠেছে। বেড়াতে এসেও চাকরির স্বভাব যায় না ওর। কপালে ঐ যে কাটা দাগটা দেখছো, একবার শ্রমিকরা ওকে মেরেছিল।

সঞ্জয় চেঁচিয়ে উঠলো আমরা এখানে এসে উঠেছি এবং আছি বলেই রতিলালের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে তা হতেই পারে না।

অসীম ব্যঙ্গ করে বললো, চাকরি ওর যাওয়াই উচিত! বৌয়ের অসুখ বলে লোকটা আমাদের জন্য কোনো কাজই করে নি। আজ বিকেলে এসে তিনবার চা চেয়েছি—তবু পাই নি। চাকরি ওর না গেলে আমিই ওর নামে কমপ্লেন করবো।

—অসীম, তুই ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না।

—খুব পারছি। বাংলোয় চৌকিদারের কাজ—বাংলোতে যে এসে থাকবে—তারই দেখাশুনা করা। কোনো অফিসারের নিজস্ব আর্দালি তো নয়। বৌয়ের অসুখ! আজ সারাদিন এখানে বসে

রান্না করলো কি করে?

রেঞ্জার সুখেন্দু পুরকায়স্থ উঠে এসে অসীমের কাঁধে হাত রেখে বিনীতভাবে বললো, অসীমবাবু, বৌয়ের অসুখ নিয়ে ওকে আর ভাবতে হবে না। সে আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও বাঁচবে না বোধহয়।

অসীম থতমত খেয়ে বললো, কি বলছেন আপনি! তা-ও ও এসেছে এখানে?

—এসব জায়গায় চাকরির কি রকম দাম আপনি জানেন না। সকালে আমি নিজে ওর বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তার—তিনি বললেন, কয়েক ঘণ্টার বেশি আয়ু নেই। আমি দেখলুম, বউ যখন বাঁচবেই না তখন আর চাকরিটা হারায় কেন। ছেলেমেয়েগুলোকে খাওয়াতে হবে তো।

গাড়ি দু'খানা বাংলোয় গেট পেরিয়ে ডান দিকে বেঁকেছে, এখনো তেমন স্পিড নেয় নি, কোনাকুনি ছুটলে হয়তো এখনো ধরা যায়। হঠাৎ সঞ্জয় সেইদিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠলো, ওয়ান মিনিট, মিঃ ভগৎ, একটু দাঁড়ান, ওয়ান মিনিট, প্লিজ—

কাল রাত্রে যে জঙ্গলের মধ্যে রবি-অসীমরা উলঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করেছিল—সঞ্জয় সেখান দিয়েই ছুটে গেল। গাড়ি দুটো থেমেও গেল—জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিঃ ভগৎ বললেন, এনি ট্রাবল্‌?

আপনাদের বিরক্ত করলুম, ক্ষমা করবেন। একটা কথা, আমরা এ বাংলোয় আছি বলে আপনারা কি বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন? তাহলে—।

—না, না, নাথিং অব দ্যাট সর্ট।

—দেখুন, এখানকার চৌকিদার এবং অন্যান্যদের ধারণা, আমরা আছি বলেই আপনারা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন এবং এজন্য পরে ওদের চাকরির ক্ষতি হবে—এরকম নাকি হয়।

—দেখুন মিঃ, এইসব ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলার কোনো রকম উৎসাহ আমাদের নেই, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সঞ্জয় অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, আপনাদের দেরি করবার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। কিন্তু ওরা ভয় পেয়েছে, আপনি যদি একটু মুখের কথা বলে যান যে, ওদের কোনো ক্ষতি হবে না—

—হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি আমার সাবঅরডিনেটদের কাছে এক্সপ্লেইন করতে যাবো? আপনার এই অনুরোধকে কেউ কেউ অডাসিটি বলতে পারে।

—না, না, ওদের কাছে বলতে হবে না, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে ওদের কিছু—

—আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ব্যাপারে আপনাকে কেন প্রতিশ্রুতি দিতে যাবো? মাইন্ড ইওর ওউন বিজনেস।

—দিস ইজ অলসো মাই বিজনেস! আমরা এখানে এসেছি বলেই যদি একটা লোকের চাকরি যায় সেটা অত্যন্ত অন্যায়। তাতে আমাদের—।

—আপনাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি—এইটাই যথেষ্ট নয়।

—না, যথেষ্ট নয়। আপনার যদি কিছু আপত্তির থাকে আপনি আমাদের বলতে পারেন। পরে শুধু শুধু ঐ গরিবদের ওপর অ্যাকশন নেবেন না। আপনি জানেন না, ঐ চৌকিদারটার বইয়ের ভীষণ অসুখ, হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে—তবু এসেছে আপনাদের জন্য।

—অ্যাবসার্ড!

—না, না, সত্যিই। আপনি বরং আরেকবার আসুন।—সব শুনবেন। আমরাও এইমাত্র জানতে পারলাম!

—আপনারা এখানে মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছেন, আপনাদের তো অত কথা ভাববার দরকার নেই!

আপনি ভদ্র ভাষায় কথা বলুন। ঐ মেয়েরা এখানকার লোকাল লোক—বেড়াতে এসেছে—আপনি শুধু শুধু খারাপ ধারণা করবেন না।

আপনি রাস্তা ছাড়ুন, আমি আর দেরি করতে পারছি না।

—না, আপনি বলে যান। যদি কারুর চাকরি যায়, আমি সহজে ছাড়বো না।

—ইজ দিস চ্যাপ এ লুনাটিক অব সামথিং—? ড্রাইভার চালাও!

সঞ্জয় সত্যিই অনেকটা পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগলো। তার কপালে কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে—সে বলতে লাগলো, আপনাদের খেয়ালখুশিতে লোকের চাকরি যাবে? ভেবেছেন কি? আমি শেষ পর্যন্ত দেখে নেবো—আমারও ইনফ্লুয়েন্স কম নেই! চালাকি নয়, ভেবেছেন জঙ্গলে আছেন বলে যা ইচ্ছে করবেন? আইন আছে, দরকার হয় আমি ওদের হয়ে কেস লড়বো, আমি—।

সঞ্জয়ের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি দুটো বেরিয়ে গেল।

৯

জঙ্গলের মধ্যে অসীম আর অপর্ণা আলাদা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। বিকেল শেষ হয়েছে একটু আগে, এখনো সন্ধে নামে নি, জঙ্গলের মধ্যে আবছা আলো। রবি তখনো না ফেরায় সবাই ক্রমশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোথায় তাকে খোঁজা হবে—তারও ঠিক নেই। জয়া-অপর্ণাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শেখর চেয়েছিল ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে। কিন্তু অপর্ণা রাজি হয় নি। রবির ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

বাংলোটা আবার নির্জন। শুধু পাখিগুলো রাত্তিরের ঘুম শুরু করার আগে শেষবার ঝাঁক বেঁধে ডেকে নিচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর, অসীম অপর্ণাকে বলেছিল, চলো রুণি, একটু জঙ্গলে বেড়িয়ে আসি। তোমাকে একটা অদ্ভুত ফুলগাছ দেখাবো!

অপর্ণা বললো, এখন জঙ্গলটা বেশ ভালো লাগছে—দিনের বেলা গাছগুলোকে এমন লম্বা লম্বা মনে হয়, আমার ভালো লাগে না—আমার খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

—না, খালি পায়ে হেঁটো না, কাঁটা ফুটতে পারে।

—কিছু হবে না। আপনিও জুতো খুলে ফেলুন-না। এখানে থাক—ফেরার সময় নিয়ে যাবো। ইস্, কতদিন খালি পায়ে হাঁটি নি!

অপর্ণার লালরঙের চটি জোড়ার পাশে অসীমও নিজের শু খুলে রাখলো। ওর মুখে অল্প একটু হাসির আভাস দেখা গেল। যেন ওর মনে পড়লো, কাল ওরা সমস্ত পোশাকই খুলে ফেলেছিল, কিন্তু অপর্ণাকে সে কথা বলা হয়তো ঠিক নয়।

কাল রাত্রে বাংলোয় ফেরার পথে একটা ফুলগাছ দেখেছিল অসীম, কী যেন এক নাম-না-জানা গাছ, যে গাছে একটিও পাতা নেই, শুধু ফুল। অপর্ণাকে সেই গাছটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। বললো, আশ্চর্য, গাছটায় একটাও পাতা নেই, শুধু থোকা থোকা সাদা ফুল—এরকম গাছ আমি আগে কখনো দেখি নি!

অপর্ণা কিছুতেই ঠিক আশ্চর্য বোধ করে না, সে বললো, এ আর এমন কি, দিশি আমড়া গাছেও তো এক সময় কোনো পাতা থাকে না—শুধু ফুল, তারপর যখন ফুল থেকে ফল বেরোয়—তখন পাতা বেরোয় সেই ফলগুলোকে লুকোবার জন্য!

অসীম একটু আহত হয়ে বললো, না, না, আমড়া গাছ নয়, ছোট গাছ, এতে বোধহয় কোনো ফল হয় না, শুধু ফুল।

অপর্ণার ছিপছিপে ধারালো শরীর শুকনো পাতা ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে অনায়াসে ছন্দে। যে-কোনো মুহূর্তে কাঁটা ফোটার ভয়ে অসীমের প্রতি পদপাত সন্ত্রস্ত। ঝুপঝুপ করে অরণ্যের মধ্যে বড় তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামে। এখন আর গাছগুলোকে আলাদা করে চেনা যায় না। কোথায় সেই ফুল গাছ, অসীম আর খুঁজে পাচ্ছে না। একবার অসীম বললো, চলো রুণি, তা হলে আমরা ফিরে যাই, তোমার দিদি ভাববেন হয়তো—

—বাঃ, গাছটা খুঁজে পাওয়া যাবে না?

—গাছটা সত্যি আছে কিন্তু, আমি কাল রাত্তিরবেলাও দেখছিলুম,—মিথ্যে কথা বলি নি।

—আমি তো অবিশ্বাস করি নি—কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে তো! মিথ্যে হলে আমি ঠিকই বুঝতে পারতুম।

—ইস, তোমার ভারী গর্ব, তুমি সব মিথ্যে কথা বুঝতে পারো?

—সব! প্রত্যেকটা অক্ষর—চেষ্টা করে দেখুন।

—আচ্ছা, আমি যদি বলি, আমি তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছি, তুমি বিশ্বাস করবে?

অপর্ণা হা-হা করে হেসে উঠলো। তার হাসি থামতেই চায় না। অন্ধকারে এখন তার শরীর ভালো দেখতে পাওয়া যায় না—শুধু তার শরীরময় হাসি—।

অসীম বললো, তুমি বিশ্বাস করলে না?

— কেন বিশ্বাস করবো না? এতে আর সত্যি-মিথ্যে কি আছে? এ তো অন্য রকম।

— না, অন্য রকম নয়, আমার মন বার বার এই কথাটা জানাতে চাইছে।

অপর্ণা অসীমের থেকে একটু দূরে, সে বললো, তাতে কি হয়েছে, আমরা ফুল ভালবাসি, কোকাকোলা ভালবাসি, চিকেন চৌমিন ভালবাসি, ট্রেনের জানলার ধারের সিট ভালবাসি, অনেক ছেলেকে ভালবাসি, অনেক মেয়েকে ভালবাসি—এর মধ্যে মিথ্যের কি আছে? আমাকে তো আপনি ভালবাসবেনই, আমি তো আর দেখতে খুব খারাপ না—

অসীম বললো, তুমি ছেলেমানুষ নাকি! আমি সে-রকমভাবে বলছি না—

— অন্য রকম আবার কী আছে বলুন! মনে করুন, এখানে আমার সঙ্গে যদি আপনার দেখা না হতো—তাহলেও আপনি কী করে আমাকে ভালবাসতেন? কিংবা, আমার বদলে যদি অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হতো—আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকেও কি আপনি ভালবাসতেন না?

— মোটেই না। আমি আগেও অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, কারুকে এমন ভালবাসি নি!

— বাসেন নি? আমি তো অনেক ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তার মধ্যে অনেককেই আমি ভালবাসি।

— যাঃ, সে রকম নয়। তুমি কি এতই ছেলেমানুষ যে, কিছু বুঝতে পারো না!

— বাঃ, এর মধ্যে না বোঝার কি আছে?

— তুমি বুঝতে পারছো না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

অপর্ণা আবার সেইরকম অনাবিলভাবে হেসে উঠলো। তার মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও, সেই হাসিরও যেন একটা রূপ আছে। অসীমের থেকে একটু দূরে সরে গেছে অপর্ণা, সেখান থেকেই সরল গলায় বললো, বাঃ, কষ্ট হবে কেন? আপনার সঙ্গে বেড়াতে আমার তো খুব ভালো লাগছে! কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু পাশাপাশি হাঁটছি, বেশ মজা, না?

অসীম সত্যিই এক ধরনের কষ্ট বোধ করছিল। সে অনুভব করছিল, অপর্ণার সঙ্গে তার প্রায় এগারো বারো বছর বয়েসের তফাত। এই বারো বছরে যেন আর একটা অন্য যুগ এসে গেছে।

অপর্ণার মতন মেয়েরা ভালবাসার কথা শুনলে হাসে, তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে, শুনলে হাসে। ওদের কাছে এইসব কথা অন্য ভাষায় বলা দরকার। কিন্তু কী সেই ভাষা, অসীম জানে না। ভারী গলায় অসীম বললো, তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ!

— আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই! আমি অনেক কিছু বুঝি, আপনি যা ভাবছেন—তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু বুঝতে পারি।

— তাহলে এটা বুঝতে পারছো না, এক ধরনের ভালবাসা আছে, যা শুধু একজনেরই জন্য, যার জন্য বুকের মধ্যে টনটন করে, যাকে না পেলে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। জানো না?

— আপনি জানেন বুঝি? আপনার আগেকার অভিজ্ঞতা আছে?

— না, নেই। আমি মেয়েদের ভালবাসতে ভয় পেতুম। আমি খেলা করতে জানি, কিন্তু ভালবাসা...মেয়েদের আমি একটু ভয়ই করি। তোমাকে নিয়েও খেলা করবো ভেবেছিলাম—কিন্তু তোমার হাতের রক্ত দেখে আজ কী রকম যেন অন্য রকম হয়ে গেল, তারপর, এই অন্ধকার জঙ্গলে এসে মনে হলো, আমি শুধু একমাত্র তোমাকেই ভালবাসতে পারি।

— আবার জঙ্গল থেকে বেরুলেই অন্য রকম মনে হবে।

— না—

— হ্যাঁ, আমি জানি।

— তাহলে চলো, এখুনি ফিরে যাই। ফিরে গিয়ে দেখি—

— বাঃ, সেই গাছটা খুঁজবো না? সেটা দেখতেই তো এলাম।

— সেটা বোধহয় এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি টর্চ আনি নি...দেরি হয়ে যাচ্ছে...তোমাদের বাড়িতে কি ভাবছেন!

— এমন কিছু দেরি হয় নি। আসুন খুঁজে দেখা যাক অন্তত।

এখন দু'জনের কারুরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে একটু দূরত্বে ওরা—আকাশে অভূতপূর্ব রকমের বিশাল চাঁদ উঠেছে, চাঁদটা যেন আকাশ থেকে অনেকটা নেমে এসেছে বনের মাথায়, মাঝে মাঝে তার জ্যোৎস্নায় ওরা পথ দেখতে পাচ্ছে—আর দু'জনের শরীরের অস্পষ্ট রেখা। তীব্র কোনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে—কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কোনো আলাদা ফুলের গাছ।

একটুক্ষণ নীরব থাকার পর অসীম আবার বললো, ইস্, তোমার হাতটা আজ কেটে দিলাম! ব্যথা হয়েছে? দেখি তোমার হাতটা!

হাতে হাত নিলে কি আর ব্যথা বোঝা যায়! কিন্তু অপর্ণা সে কথা বললো না, হাতটা এগিয়ে দিলো। অসীম হাতটা ধরেই রইলো, ছাড়লো না দু'জনে এখন পাশাপাশি। জঙ্গলের মধ্যে সত্যিই অনেক নিয়ম বদলে যায়। অসীম বুঝতে পারে, অপর্ণাকে ভালবাসার কথাটা সে খুবই তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছে। সরল ধরনের ছটফটে মেয়ে অপর্ণা, শরীরে সদ্য যৌবন পেয়ে তাতেই টলটল করছে। এখন গাঢ়স্বরে বলা কথা শোনার ধৈর্য তার নেই। কিন্তু পশুর মতন চঞ্চলতা বোধ করে অসীম। এই অন্ধকারে, অরণ্যের মধ্যে অপর্ণাকে পাশে পেয়ে তার বুকের মধ্যে—না, সারা শরীরে অস্পষ্ট যন্ত্রণা হয়, মনে হয়, আর সময় নেই, আর সময় নেই, অপর্ণাকে এক্ষুনি বুকের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলতে না পারলে আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। অসীম ওর আর একটা হাত অপর্ণার কাঁধে রাখলো, অপর্ণার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অসীম জিজ্ঞেস করলো, রুণি, তোমার ভয় করছে না?

— ভয় কি? আপনি তো সঙ্গে আছেন।

— আমাকে ভয় করছে না?

— কেন, ভয় করবে কেন?

— আমার সঙ্গে একলা এতদূর এসেছো—দু'দিন আগেও তো আমাকে চিনতে না! সত্যি, একটু ভয় করছে কিনা বলো?

— উহুঃ, আমি যাকে-তাকে ভয় পাই না।

— রুণি, আমাকে ভয় পাবার কারণ আছে। আমি একবার একটা মেয়েকে খুন করেছিলাম।

অপর্ণা অসীমের হাত ছাড়িয়ে দিলো না, দূরে সরে গেল না, কেঁপে উঠলো না, শুধু বললো, ওসব কথা বলতে নেই!

— রুণি, তুমি তো সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারো, এটা আমি সত্যি কথা বলছি—আমি একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছিলাম, ইচ্ছে করে নয় যদিও, কিন্তু...আমার মন থেকে সে কথা কখনো মোছে না। সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়লেই আমার মনে হয়, আমি একটা জঘন্য লোক, আমি পাপী, আমি খুনী। আর জানো তো, একবার যে খুন করেছে, দ্বিতীয়বার সে খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না!

মুখ দেখা যাবে না জেনেও অপর্ণা একদৃষ্টে তাকালো অসীমের দিকে। অসীমের খাড়া নাক আর চিবুকের এক অংশ শুধু চকচক করছে জ্যোৎস্নায়। এলোমেলো হাওয়ায় এমন শব্দ হয় গাছের পাতায়, যেন মনে হয় এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। মাটিতে ঝরা শুকনো পাতায় মাঝে মাঝে সর সর শব্দ হয়—মেঠো ইঁদুর কিংবা গিরগিটির—অথবা সাপও হতে পারে। সবই অনুমান, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ নয়। অপর্ণা একটু চঞ্চলভাবে বললো, আপনি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন বুঝি?

যে-হাত অপর্ণার কাঁধে ছিল, অসীম নিজেই সে হাত সরিয়ে নিলো। আপন মনে কথা বলার মতন বললো, জীবনের এর থেকে সত্যি ঘটনা আর কখনো ঘটে নি, আমার বাবা একটা মোটরগাড়ি কিনেছিলেন, উনিশ শো একষট্টি সালে, আমি রেড রোডে আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে ড্রাইভিং শিখতাম...ভালো করে শেখা হয় নি তখনো—এলগিন রোডের কাছে...আমার হাতে স্টিয়ারিং, মেয়েটি অফিস যাবার জন্য বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিল, আমি মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ভেবেছিলাম, বাঃ, বেশ দেখতে তো!...ওকে আরেকবার ঘুরে দেখার জন্য আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম...আমার গাড়ির ঠিক সামনে একটা কুকুর পড়েছিল—এমনিই রাস্তার ঘিয়ে-ভাজা কুকুর, কিন্তু সেটাকে বাঁচাবার জন্য আমি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে...চাপা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা মরে গিয়েছিল, বীভৎস রুণি, সেই দৃশ্য এখনো আমি দেখতে পাই, পরে শুনেছিলাম—

— থাক, আর বলতে হবে না, এটা তো অ্যাকসিডেন্ট।

— না, শুধু অ্যাকসিডেন্ট নয়, পরে শুনেছিলাম, সেই মেয়েটির আর দু'মাস বাদে বিয়ে হবার কথা ছিল, আমারই একজন চেনা লোকের সঙ্গে।

— তবুও অ্যাকসিডেন্টই তো।

— অ্যাকসিডেন্ট হোক, কিন্তু শাস্তি পেলো কে জানো? আমাদের ড্রাইভার—তার তিন বছর জেল হয়, বিনা দোষে। আমার বাবা খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক ছিলেন, পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে তার চেনা ছিল, দু'একজন মন্ত্রীকেও চিনতেন, নানান সাক্ষী যোগাড় করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সে সময় আমি গাড়িতেই ছিলাম না, শুধু ড্রাইভার ছিল, সে লোকটার বিনা দোষে...আমি স্বীকার করতে পারি নি তখন, আমার সাহস হয় নি। আমি খুব ভয় পেয়ে হাজারীবাগে পালিয়ে ছিলাম একমাস। সব সময় ভাবতাম, মেয়েটার রূপ দেখার জন্যই আমি অন্যমনস্ক হয়ে তাকে মেরে ফেলেছি। আমার বাবা ডিফেন্স ফান্ডে আমাদের বন্দুক দান

করেছিলেন, ইলেকশানে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন—আমি শাস্তি পাই নি।

— শাস্তি পেলেই বা কি হতো? মেয়েটার জীবন তো বাঁচতো না?

— কিন্তু অন্য একজন শাস্তি পেলো বলেই আমি অপরাধী হয়ে রইলুম চিরকাল। আমি ভুলতে পারি না, রুণি, আমাকে তুমি ভুলিয়ে দেবে?

— আমার সে-রকম কোনো ক্ষমতা নেই।

— কিন্তু রুণি, আমার আর উপায় নেই। তুমি বিশ্বাস করেছো তো আমাকে, আমি একজন কারুর কাছে সান্ত্বনা না পেলে—

— আমি মুখে সান্ত্বনা জানালে আপনার জীবনের কিছু বদলাবে? কিছু বদলাবে না!

অসীম দু'হাতে অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে, অপর্ণার কাঁধের কাছে মুখ এনে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, রুণি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি খারাপ লোক নই—

অপর্ণা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না, বিচলিতও হয় না, একটি মেয়ের ওরকম মৃত্যুর কথা শুনে কোনোরকম দুঃখও তার গলায় প্রকাশ পায় না। যেন পৃথিবীতে অনেক মেয়েই অনেকভাবে মরে—এই সত্যটা সে জেনে রেখেছে। অসীমের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও সে শিহরণ বোধ করে না, নিজের সম্পর্কেও ভয় না পেয়ে সে শরীরটা ঈষৎ শক্ত করে বলে, আপনি শুধু আপনার কথাই বললেন। আমার কথা তো ভাবলেন না। আমারও তো কোনো কথা থাকতে পারে?

— কী কথা বলো, আমি তোমার কথাও শুনবো।

—না, এখন নয়, ছাড়ুন।

—আমি আর পারছি না।

— ছিঃ, ওরকম করে না—ছাড়ুন!

অসীম অপর্ণাকে বুকের ওপর চেপে ধরেছে, তার হাত স্পষ্টত অপর্ণার বুকে, সেখানে সে তার মুখ এগিয়ে আনে। অপর্ণা এবার সামান্য জোর করে বলে, ওরকম করছেন কেন? না, এখন ছাড়ুন। না—

— আমি পার পারছি না—আমি একবার তোমার বুকে মুখ রাখতে চাই, একবার—

— না, এখন নয়—

— এখন নয়? কখন? না, এই তো সময়, আমার একমাত্র আশা—

— এখন নয়।

— কখন?

— আসুন আগে আমরা সেই ফুল গাছটা খুঁজি—যেটায় পাতা নেই, শুধু ফুল।

— এখন হয়তো সেটাকে খুঁজে পাবো না! কিন্তু সেটা আছে, বিশ্বাস করো—

— কিন্তু সেটাকে খুঁজে পেতেই হবে! সেটা পাবার আগে আর কিছু না, ছাড়ুন—

১০

মেয়ে-পুরুষের একটা দল মাদল বাজাতে বাজাতে হাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, কিছু না ভেবেই রবি তাদের সঙ্গ নেয়। ওরা কিছু বলে নি, তোয়ালে-শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরা একটি লম্বা শক্ত চেহারার বাবু এদের সঙ্গে আসছে, তবু ওরা কিছু বলে নি। ঢ্যাং-ঢ্যাং করে অকারণে মাদল বাজাচ্ছিল একটা বুড়ো, দু'তিন জন নাচের ভঙ্গীতে দুলছিল, ওরা হাঁড়িয়া খেয়ে নেশা করেছে। মাইল দেড়েক সেই রকম যাবার পর একটা গ্রামের সীমানায় পৌঁছুলো।

এদের সঙ্গে আসবার আগে রবি কিছুই চিন্তা করে নি। হাট দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল,

ঘুরতে ভালো লাগছিল না। শেখর যখন জুয়া খেলায় মাতলো, সে তখন একটু সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। হঠাৎ মাদলের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকায়। বুড়োটা নেশার ঘোরে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, মাদলের ভারও যেন সইতে পারছে না, কিন্তু সরু সরু আঙুলে বোল তুলছে স্পষ্ট— পিড়কা পিটাং পিড়কা পিটাং পিড়কা পিটাং। সেই বাজনার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব দোলানি— রবির শরীরেও লেগেছিল সেই দোলা। পায়ে পায়ে রবি সেদিকে এগিয়ে এসেছিল, তার শরীরটাও দুলতে শুরু করেছে ততক্ষণে সেই মাদলের তালে তালে। বুড়োটার পিছন-পিছন চলেছে একটা ছোটখাটো শোভাযাত্রা। জন দশ-বারো মেয়ে-পুরুষ, কয়েকটা বাচ্চাও। রবির তখন মনে হয়েছিল, তার বন্ধুদের চেয়েও এদের সঙ্গেই তার যোগ বেশি। সে ওদেরই একজন হতে চায়। কোনো দ্বিধা না করে রবি ওদের দলে মিশে নাচতে শুরু করেছিল। কয়েকজন ফিরে তাকিয়েছে, মেয়েরা মুচকি হেসেছে, কিন্তু কেউ আপত্তি করে নি। আরও দু'চার জন সাঁওতাল ওরাও মেয়ে-পুরুষ মাঝপথে যোগ দিলো ঐ দলে। যেন একটা নদী চলেছে, যেখান থেকে জল এসে মেশে মিশুক।

মাঠের আলপথ ধরে নাচতে নাচতে এগিয়েছিল দলটা। কতদূর যাবে রবি কিছু ঠিক করে নি। একটু পরে কালকের সেই মেয়েটাকে দেখেছিল সে।

গ্রামের প্রথম বাড়িটার ঝকঝকে মাটির দাওয়া, উঠোনে কয়েকটা খাটিয়া বিছানো, একটা চকচকে চেহারার কচি আমগাছ ঠিক মাঝ উঠোন ফুঁড়ে বেরিয়েছে। এক পাশের ঘরে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে একটা বুড়ি। সেই মাদল বাজানো বুড়োটা একটা খাটিয়ায় বসে বললো, এ বিটিয়া, দু'আনার হাঁড়িয়া—রসা মিলবেক?

গৃহস্থ বাড়ি হলেও সেখানে হাঁড়িয়া চোলাই হয়, মাঠের মানুষ বাড়ি ফেরার মুখে যার যা ইচ্ছে খেয়ে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, এই যে দলটি এলো—এরা সবাই সবাইর আত্মীয় বা চেনা নয়, স্রেফ একসঙ্গে জুটেছে ঐ মাদল বাজনার ছন্দের আকর্ষণে। সঞ্জয় ঠিকই বলেছিল, সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অনেকটা সভ্য আমেরিকানদেরই মতন, মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে মিলছে খোলাখুলি, নাচছে, মদ খাচ্ছে। কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই। নীল পাড় শাড়ি পরা মেয়েটিকে রবি আগে থেকেই চোখে চোখে রেখেছিল, এবার একটা খাটিয়ায় সেই মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলো, বললো, আমাকেও দু'আনার হাঁড়িয়া। তারপর সেই মেয়েটির দিকে ফিরে বললো, তুই খাবি?

মেয়েটি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, তু তো কাল হামাকে ফিরায়ে দিছিলি।

কথাটা শুনেই খুব কষ্ট হলো রবির। শেখরের ওপর রাগ হলো। কাল এই মেয়েটা আরও দু'টি মেয়ের সঙ্গে ওদের বাংলোয় কাজ চাইতে গিয়েছিল, ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। এই রকম মেয়েকে কেউ ফিরিয়ে দেয়? বরং ওদের ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই মেয়ে—এর শরীরের মতন মনও স্পষ্ট, এর ক্ষুধা স্পষ্ট, দাবি স্পষ্ট, অভিমান স্পষ্ট। রবি তো এই রকম সরলতার জন্যই উন্মুখ হয়ে ছিল। রবি মেয়েটির দিকে গভীরভাবে তাকালো।

— আজ আর ফেরাবো না। তোর স্বামী কোনজন?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে সুর করে বললো, উ তো কবে মরে গেছে। এতদিনে কুথায় আবার খোকা হয়ে জন্মালো!

আধঘণ্টার মধ্যে রবি জমিয়ে নিলো আসর। পকেট থেকে সে ফরফর করে একটার পর একটা নোট বার করতে লাগলো, সবাইকে হাঁড়িয়া খাওয়ালো। বেশি নয়, মাত্র সাত টাকা খরচ করতেই সে-বাড়ির সমস্ত হাঁড়িয়া—মদ শেষ হয়ে গেল। দলসুদ্ধ সকলেই তখন টং। নুন লাগানো সেদ্ধ ছোলা আর কাঁচা লংকা খেয়ে খেয়ে পেট ভরে গেল। রবির অসম্ভব ভালো লাগছে, সে জামাটা খুলে মাথায় পাগড়ির মতন বেঁধে ওদের সঙ্গে হৈহৈ করে নাচতে লাগলো। যেন,

শব্দ শুনতে পাচ্ছে রবি, পট পট করে ওর এক একটা বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কলকাতা, তপতী, অফিস, বাবা-মা—সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। আদিম, বনবাসী মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে সে এখন। ক্রিকেট খেলার মাঠেও রবি এতটা সাবলীল কোনোদিন হয় নি। ডান পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু তবু নাচের তালে তালে পা মেলাতে অসুবিধা হচ্ছে না তার। গানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে, 'কোকিলা বাসা খুঁজে বাসা নাই, কাউয়োর বাসা আছে ছেনা নাই, কাউয়ো কোকিলায় বিয়া হব্যে এ—'

ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। হাট-ফেরত নারী-পুরুষ যাবার পথে এ বাড়ির নাচ-গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে এসে যে-যার হাতের সওদা নামিয়ে রেখে ভিড়ে যাচ্ছে দলের মধ্যে। কার বাড়ি, কে-কার চেনা এসবের কোনো বালাই নেই। নাচ-গান হচ্ছে তো—সেই তো যথেষ্ট নেমন্তন্ন। এরকম অবিমিশ্র আনন্দের স্বাদ রবি কখনো পায় নি।

সেই বুড়োটার ক্ষমতা অসাধারণ। এতক্ষণ ধরে মদ খেয়ে যাচ্ছে, নেশায় শরীর টলমল, নাচের ঝোঁকে দু'একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে—কিন্তু মাদলের বোল নির্ভুল স্পষ্ট। উঠোন ভর্তি এক রাশ মুর্গী-ছাগল, সেগুলোও পায়ে পায়ে ঘুরছে।

খানিকটা বাদে ঐ ভিড়ের মধ্যে রবি দেখতে পেলো লখাকে। পুরোনো কথা যেন সব কিছুই ভুলে গেছে রবি। কাল যে সে লখাকে মেরেছে, সে কথাও মনে নেই। হাঁড়িয়ার নেশা রবিকে পেয়ে বসেছে—সে লখাকে ডেকে হুকুম করলো, এই লখা, এখানে হাঁড়িয়া ফুরিয়ে গেছে। এই নে টাকা, যেখান থেকে পারিস হাঁড়িয়া নিয়ে আয়!

খানিকটা বাদে রবি উঠোন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মেয়েটা এসে বললো, কোথায় যেছিস?

রবির কোনো দ্বিধা হলো না, গলা একটু কাঁপলো না, স্পষ্টভাবে বললো, দাঁড়া পেচ্ছাপ করে আসছি।

মেয়েটারও কোনো দ্বিধা নেই, সে বললো, চল, তোকে জাগা দেখায়ে দিচ্ছি, সাপ খোপ আছে না জংলায়!

মেয়েটা ওকে নিয়ে এলো, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে, মাঠের মধ্যে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলা, সেই জায়গাটা দেখালো। মেয়েটা কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো, যেন এর মধ্যে কোনোই অস্বাভাবিকতা নেই।

রবি জিজ্ঞেস করলো, তোর নাম কি?

— দুলি! আর তুহার নাম তো রবি-ই?

— তুই কি করে জানলি?

— কাল ঐ যে রাগী পাগলা বাবুটো রবিই রবিই বুলাচ্ছিল!

রবি হয়তো এক পলক শেখরের মুখটা দেখতে পেলো। হেসে বললো, হাঁ, ঐ রাগী বাবুটা সত্যিই পাগলা। আচ্ছা দুলি, তুই কাল আমাদের বাংলোয় গিয়েছিলি কেন?

— কাম ঢুঁড়তে। কাম মিলে না পাঁচ রোজ...তোর মত একটো পাতলা বাবু একবার আমাকে বলেছিল কলকাত্তা লিয়ে যাবে। বাবুটো আর এলো না—বেমারই হলো, না মরে গেল!

— তুই কলকাতায় যেতে চাস্ কেন?

— কলকাতায় কত কাম মেলে, আর সাল ফুলমণি গেল, আখন সে তো লাল বেলাউজ কিনছে খুঁপার জাল কিনছে।

কলকাতা আর কলকাতা! এদিকে সবারই মুখে কলকাতা একটা ম্যাজিক শব্দ। কলকাতায় সব সমস্যার সমাধান, কলকাতায় গেলেই চাকরি! রবি বিরক্তভাবে হাসলো। এখান থেকে তো টাটানগর কাছে, কাজ পাবার সম্ভাবনা সেখানেই বেশি, তবু কলকাতা এত মোহময়। কলকাতায়

রাজমিস্ত্রিদের কাজে যোগান দেবার জন্য কিছু কিছু আদিবাসী মেয়েদের সে দেখেছে। কিংবা রাস্তা বানানোর কাজে। ছাপা শাড়ি উঁচু করে পরা, অনেক সময় পিঠে বোঁচকা-বাঁধা শিশু। হ্যাঁ, লাল ব্লাউজ পরে তারা, মাথার খোঁপায় জাল পরতেও পারে। তার জন্য দাম দিতে হয়, চামড়া খসখসে হয়ে আসে, চোখ শুকিয়ে যায়—কলকাতার হাওয়া এরকম।

এই মেয়েটা ধলভূমগড়ের বাজারে পাঁচ দিন বসে থেকেও কোনো কাজ পায় না—ব্লাউজ কেনার সামর্থ্য হয় নি, পেটে ভাতও জোটে না রোজ, তবু এরকম মসৃণ ভরাট শরীর কি করে পায় কে জানে! মাঠভর্তি চাঁদের আলো নেমেছে, সেই আলো পিছলে যাচ্ছে মেয়েটার শরীরে। রবি বললো, আমরা আর ওখানে ফিরে যাবো না, চল, মাঠের মধ্যে গিয়ে তুই আর আমি বসি।

মেয়েটার চোখ চকচক করে উঠলো। যেন সে ধন্য হয়ে গেল। তার জীবন সার্থক, কত তো মেয়ে ছিল, কিন্তু শুধু তাকেই কলকাতার ফর্সাবাবুটা দয়া করেছে, আলাদা তার সঙ্গে বসতে চেয়েছে। ধন্য তার জীবন। সে উঠে এসে সরাসরি রবির হাতটা ধরলো, পাখির বাসার মতন গরম তার হাত। সে পরম অনুনয় ভরা গলায় বললো, আমায় টাকা দিবি? আমি খুঁপার জাল কিনবো, একটো লাল বেলাউজ কিনবো।

রবির মনে হলো, এই তো সবচেয়ে সরল ও স্বাভাবিক—ওর নেই, ও চাইছে, রবির আছে, রবি দেবে। যে দেবে, সে তার বদলেও কিছু নেবে। সবারই ভিন্ন ভিন্ন রকম দেবার জিনিস আছে। অথচ, তপতীর জন্য সে...। রবি পকেটে হাত ভরে যা ছিল সব তুলে আনলো। মাত্র চোদ্দটা টাকা ছিল, সব তার হাতে গুঁজে দিতে দুলি অসম্ভব রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, রবির শরীরের সঙ্গে নিজের দেহ লেপটে আদুরে গলায় বললো, বাবু, তুই রাজা হবি।

রবি হাত দিয়ে দুলির শরীর বেষ্টন করলো। একটা হাত দুলির বুকে রেখে আর এক হাত ওর মুখে বুলোতে লাগলো। নরম মসৃণ চামড়া ভিজে ভিজে গরম, সারা শরীরটা কাঁপছে।

দুলি ফিসফিস করে বললো, চল।

মাঠ পেরিয়ে ওরা আবার বনের মধ্যে ঢুকলো। অন্ধকারে রবি কিছু দেখতে পায় না, শুধু অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দুলির শরীরটাই তার কাছে স্পষ্ট। দুলির সব কিছু চেনা, অরণ্যের প্রতিটি গাছের মাঝখানের ফাঁকটুকুও যেন তার মুখস্থ। শিশুর হাত ধরে যেমন অন্ধ বৃদ্ধ যায়, সেইরকম, রবি বুঝতে পেরেছিল, দুলির ছটফটে পায়রার মতন শরীরটা ছুঁয়ে থেকেই সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়ে দুলি সেই ভাঙা মিলিটারি ব্যারাকে গিয়ে পৌঁছোলো।

গতকালের এঁটো শালপাতাগুলো সেখানে তখনো পড়ে আছে। ইঁট পাতা উনুনের ওপর কালো হাঁড়ি। কাল মেয়ে তিনটে এখানে ধুঁধুল সেদ্ধ আর ভারত খেয়ে পেটের জ্বালা মিটিয়েছে।আজ তাদের মধ্যে দুলি একা এখানে এসেছে এক রাজপুত্রের হাত ধরে। বেলগুদামের বাবু হারাধন বাবুর বাড়িতে বাগানের আগাছা পরিষ্কারের কাজ করতে গিয়েছিল দুলি, বাবুর ভাইপো তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল—কি কথায় একবার যেন তার হাত ধরেছিল। বাবু দেখতে পেয়ে নিজের লোককে কিছু বলে নি, দুলির নাকের ওপর একটা থাপ্পড় মেরে টেনে ফেলে দিয়েছিল। তার নিজের মরদটা যতদিন বেঁচে ছিল সেও তাকে মারতো। মার খেয়েছে ঠিকাদারের কাছে, রাজমিস্ত্রির কাছে। যারা টাকা দিয়ে কাজ করায়, তারা মাঝে-মাঝে মারবে, গালাগালি দেবে, একটু দোষ পেলেই টাকা কেটে নেবে—এসব তার কাছে স্বাভাবিক। শুধু আজ এই একটা বাবু—সব বাবুর সেরা বাবু—যত্ন করে হাত রেখেছে তার কোমরে, কী আদর করে ফিসফিস করে কথা বলছে কানে কানে!

দুলির কোনো লজ্জা নেই। পা দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে সে রবির হাত ধরে টেনে তাকে বসালো মাটিতে। তারপর রবির সেই হাতখানা সে তার বুকের ওপর রাখলো। নির্নিমেষে

তাকিয়ে রইলো রবির দিকে। কত কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সে কোনো কথা জানে না। সব কথা একসঙ্গে বলার একমাত্র ভাষায় সে আপন মনে হেসে উঠলো।

এই রাত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত। সে কাজ পায় না, তার স্বামী নেই, সে একটা সামান্য হতভাগ্য প্রাণী, আর এই সুন্দরপানা বাবুটা এত লোক থাকতে, তাকেই আদর করছে, তার এই সামান্য শরীরটাকে নিয়ে কত খেলা করছে, এত সৌভাগ্য সে কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল? ফুলমণির চেয়েও আজ সে বেশি সৌভাগ্যবতী। এক কথায় বাবুটা তাকে দশ টাকা আর চার টাকা দিয়ে দিলো, ঐ টাকার বদলে সে কত কাজ করে দিতে রাজি ছিল, সে এ জন্য কুয়া থেকে পাঁচশো বালতি জল তুলে দিতে পারতো, সাত দিন ঝাঁকা ঝাঁকা ইঁট বইতে পারতো, বাবুটা সে সব কিছু চায় না, বরং বাবুটা উল্টে তাকে কত আদর করছে।

রবিও কোনো কথা বলছে না। দুলির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে সে এক ধরনের শিহরণ বোধ করছে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে এসে জমা হচ্ছে রাগ আর অভিমান। সাতাশ বছর বয়েস—এর আগে রবি কখনো কোনো মেয়েকে এমনভাবে স্পর্শ করে নি। অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার, অনেক মেয়ে তাকে অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত দিয়েছে—কিন্তু রবি তপস্বীর মতন নিজেকে পবিত্র রেখেছিল শুধু একজনের জন্য। তপতী সান্যাল, নিউ আলিপুরে, রবির হাতে রেখে বলেছিল...তপতীর মুখখানা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠলো, রক্তবর্ণের ঠোঁট, দেবী–দুর্লভ দু'টি টানা টানা চোখ—এই তপতীকেই রবি একদিন দেখেছিল...। অসহ্য রাগে রবির বুক গুমড়ে উঠলো, সে সব কিছু ভেঙে ফেলবে, লণ্ডভণ্ড করে দেবে। একটা চাপা আওয়াজ করে রবি পাগলা পশুর মতন দুলির বাহু কামড়ে ধরলো। ভয় পেয়ে দুলি চিৎকার করে উঠতেই রবির সম্বিৎ ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি বললো, না, তোকে না, তোকে না, তুই খুব ভালো, তোকে আমি খুব ভালবাসবো।

মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো রবি, দুলিকেও পাশে শোয়ালো নিজের হাতের ওপর। মাথার ওপর জ্যোৎস্না–ধোঁয়া নীল আকাশ, তাতে অসংখ্য তারা। এত বেশি তারা কলকাতার বাইরের আকাশেই দেখা যায়। কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কাছে কালপুরুষ! রবি বললো, তুমি দেখো।

শাড়িটা খুলে ফেলেছে দুলি, আনন্দে উঁ–উঁ শব্দ করছে। অন্ধকারে মিশে আছে ওর কালো দৃঢ় শরীর। রবি ওর বুকে আঙুল রেখেছে, কোমর বেষ্টন করে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দুলির মুখে রসুন রসুন গন্ধ, চুলে বাসি জলের গন্ধ, শরীরে শ্যাওলার গন্ধ। দুলির ঠোঁট বড় বেশি নোনতা, বুক নোনতা।

এসব গন্ধ আর স্বাদ যে খুব মনোরম তা নয়। কিন্তু, এতকাল মেয়েদের কাছে এসেই রবি পেয়েছে শুধু শ্যাম্পুর গন্ধ, সাবানের গন্ধ, পাউডারের গন্ধ, স্নো'র গন্ধ—সেই সব গন্ধ প্রত্যেকটি রুচিশীল। কিন্তু এই রকম একটি প্রাকৃতিক সরলতার জন্য যে রবির মন এমন উন্মুখ হয়েছিল—রবি তা নিজেই জানতো না। চিরকাল কলকাতা শহরে মানুষ—কোনোদিন গ্রামে থাকে নি, কোনোদিন খালি পায়ে হাঁটে নি, নাগরিক গন্ধ, নাগরিক হাওয়ায় সে চিরকাল অভ্যস্ত। কিন্তু আজ এই মাটিতে শুয়ে থাকা তার কাছে মনে হচ্ছে কত স্বাভাবিক, যেন কতকাল এই রকম জঙ্গলে শুয়ে থেকেছে সে। যে–কোনো নারীকে পাশে শোবার জন্য ডেকেছে। জঙ্গলের জীবনই মানুষের রক্তে এখনো মিশে আছে, একটুও ভুলতে পারে নি।

পাগলের মতন ছটফট করতে লাগলো রবি, দুলির গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এক সময় সে তার সম্পূর্ণ শরীরটাকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিলো। মেয়েটার শরীরে যেন কোনো হাড় নেই, চামড়া দিয়ে আগুনের হালকা বেরুচ্ছে, উরু দুটো দিয়ে প্রবলভাবে চেপে ধরেছে রবিকে,

রবি অশ্রান্তভাবে বলতে লাগলো, তুই খুব ভালো, তুই খুব ভালো—আমি তোকেই এতদিন চেয়েছিলাম, আর কাউকে চাই না। তার নিঃশ্বাস এত ঘন ঘন যেন দম আটকে আসবে। রবির শুকনো, গন্ধ বুকের মধ্যে যেন এতদিনে একটা সত্যিকারের নরম হাতের ছোঁয়া।

খানিকক্ষণ পর, মাটিতে চিৎ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে রইলো ওরা। চাঁদ এখন এসে পড়েছে মাথার ওপর, ঠিকরে পড়ছে জ্যোৎস্না রোদ্দুর আড়াল করার মতনই রবি চোখের সামনে হাত দিয়ে, জ্যোৎস্না আড়াল করছে। ওর শরীরের ওপর রাখা দুলির একটা ঠাণ্ডা হাত। রাত এখন তার ঠিক নেই। রবির তখন কিছুই মনে পড়ছে না, কলকাতা নয়, বাংলোর বন্ধুরা নয়, শুধু চোখের সামনে একটা জ্যোৎস্না-আড়াল করা হাত।

দুলি রবিকে একটা ঠেলা দিয়ে বললো, বাবু, আমার কলকাতা নিয়ে যাবি ?

রবি বললো, না।

—নিয়ে যাবি না ?

—না, কলকাতা ভালো না।

—তুই চলে যাবি?

—না, যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। কথাটা শুনে দুলির কি মনে হলো কে জানে, সে ধড়মড় করে উঠে কনুইতে ভর দিয়ে রবির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সাধারণ গলায় বললো—যাঃ, ঝুট্ বাত্। তুই কেন এখানে থাকবি? তুই কলকাতায় কত ভারী কাম করবি, পয়সা কামাবি—ইখানে এ জঙ্গলে কি আছে?

রবি হাত দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে বললো—থাক্, চুপ কর। এখন কলকাতার কথা আমার মনে করতে ইচ্ছে করছে না।

খানিকটা বাদে রবির সব মনে পড়লো, খেয়াল হলো বাংলোয় ফেরার কথা। উঠে পোশাক পরে বললো, চল দুলি, আমায় রাস্তা দেখিয়ে দিবি। দুলি তখনো উঠতে চায় না, তার ইচ্ছে সারারাত ওখানেই থাকে। এত আনন্দ—ও তার জীবনে আর কখনো কি আসবে? এখুনি সে শেষ করতে চায় না।

কিন্তু দুলি তবু উঠে পড়লো।

সামনেই সেই পাকা রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে ওপারে জঙ্গলে আবার ঢুকলো। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে জঙ্গলে শুকনো পাতা ভাঙার আওয়াজ। যেন অলৌকিক মুহূর্তে অশরীরীরা জঙ্গলে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দুলি তখনো রবির শরীরের সঙ্গে লেগে আছে, মাঝে মাঝে বড় বড় আরামের নিঃশ্বাস ফেলছে। রবি সিগারেট ধরালো।

একটু বাদেই সামনে কয়েকটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি চোখে পড়লো। রবি বুঝতে পারলো, তার বন্ধুরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। রবি চেঁচিয়ে উঠলো, শেখর? আমি এখানে—

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া এলো না। পায়ের শব্দ থেমে গেল। রবি আবার বললো, শেখর? কে?

এবার ওদিক থেকে উত্তর এলো, উই সেই হারামি বাবুটা!

গলার আওয়াজ শুনেই রবি চিনতে পারলো। দুলি ভয়ে কেঁপে উঠলো, তার রাজকুমারের এবার বিপদ! অন্ধকার থেকে জ্যোৎস্নার নিচে এগিয়ে এলো চারটে ছায়ামূর্তি, প্রত্যেকের হাতে লাঠি, তার মধ্যে একজন লখা। আর একজন প্যান্ট-শার্ট পরা সাঁওতাল, স্পষ্টতই সে কোনো সাহেবের বাড়ির খানসামা কিংবা সহিস ছিল, কিংবা মিশনারিদের কাছে লেখাপড়া শিখেছে, কেননা, সে বৃটিশ উচ্চারণে বলে উঠলো, ইউ বাস্টার্ড, ইউ সান অব এ বিচ-ইউ থিংক সানথাল গার্লস আর ফ্রি—

রবি গর্জন করে উঠলো, কে রে? কে তুই?

আর কিছু বলার আগেই একটা লাঠির ঘা লাগলো রবির আহত পায়ে। দুলি কঁকিয়ে উঠলো ভয়ে। একজন এসে দুলির মুখ চাপা দিলো। রবি আহত নেকড়ের মতন শূন্যে লাফিয়ে উঠে, দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, হারামজাদা!

সে লখার টুটি চেপে ধরতে গেল। লখা এক ঝটকা দিয়ে ওকে ফেলে দিতেই আরেকজন আবার লাঠির ঘা কষালো। আঘাতটা লাগলো রবির ঘাড়ে। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে রবি মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পাক গড়িয়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো। এখন সে ছুটে পালাতে পারে—তার এক পায়ে ব্যথা হলেও তার সঙ্গে ছুটে কেউ পারবে না।

কিন্তু রবির সে কথা মনেই পড়লো না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর ওপর দারুণ ঘৃণায় সে থুঃ করে থুতু ফেললো। ওদের মধ্যে একজন দুলির হাত দুটো পিছমোড়া করে শক্তভাবে ধরে আছে, অন্য হাতে দুলির মুখ চাপা দেওয়া। বাকি তিনজন রবিকে আবার আক্রমণ করার জন্য উদ্যত। রবির সমস্ত শিরা-উপশিরা সজাগ হয়ে উঠলো, অন্যদের ছেড়ে সে লখার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো। প্যান্টপরা লোকটি লাঠি তুলতেই রবি তাকে বিদ্যুৎ গতিতে পাশ কাটিয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে 'হারামজাদা' বলে সে লাফিয়ে গিয়ে ধরলো লখার ঘাড়। মুহূর্তের মধ্যে তাকে ঘুরিয়ে সামনের দিকে এনে নাকের পাশে মারলো একটা প্রবল ঘুষি। হাতের মুঠোটা তার তক্ষুনি রক্তে ভিজে গেল। লখারও গায়ের জোর কম নয়, রবির ওরকম ঘুষি খেয়েও সে অজ্ঞান হলো না, দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন চিৎকার করে সে সাঁড়াশির মতন শক্ত হাতে রবির গলা চেপে ধরতে গেল। রবি জুডোর কায়দায় হাঁটু তুলে মারলো লখার চিবুকে। কিন্তু আর সরে যাবার সময় পেলো না—বাকি দু'জন তাকে জাপটে ধরলো পেছন থেকে। একটা গাছের সঙ্গে ঠেসে ধরলো।

প্যান্টপরা লোকটা এগিয়ে এসে ঠাস করে রবির গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বললো, হারামির বাচ্চা! কলকাতা থেকে এখানে ফুর্তি করতে এসেছো? এই জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে ফেলবো আজ!

রবির নড়ার ক্ষমতা নেই। চোখ দুটো স্থির করে তাকিয়ে রইলো। তক্ষুনি এই গোটা পৃথিবীটা ধ্বংস করার ইচ্ছে হলো তার। সে শক্তিও তার আছে, অনুভব করলো। লখা নিজের চোয়াল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে রক্তমাখা থুতু ছিটিয়ে দিলো রবির মুখে। ওদের মধ্যে বাকি লোকটা একটু ভদ্র, সে হাত দিয়ে লখাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, বাবু, আপনারা কি ভাবেন? চিরকাল এক জিনিস চলবে? যাকে তাকে ধরে মারবেন? আমাদের মেয়েদের কোনো ইজ্জৎ নেই? আমাদের মেয়েদের নিয়ে যা খুশি করবেন?

রবি গর্জন করে উঠেলো, বেশ করবো! যে চোর, তাকে নিশ্চয়ই মারবো। মেয়ে আবার আমাদের তোমাদের কি? যাকে যার পছন্দ হবে—আমি কি ওকে জোর করে ধরে এনেছি?

দুলি এই সময় কোনোক্রমে হাত ছাড়িয়ে এসে আর্তগলায় বললো, বাবুকে ছেড়ে দে! ইটা ভালো বাবু! প্যান্টপরা লোকটা এক থাপ্পড় দিয়ে দুলির কথা থামিয়ে দিলো। রবিও নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ঝটকা মেরে, তেড়ে এলো ঐ লোকটার দিকে। মাথায় লাঠির ঘা পড়ায় রবি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো—শেখর! শেখর! সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ঘুষি পড়লো তার মুখে। রবি টলে যেতেই আবার একটা লাঠির ঘা লাগলো তার শিরদাঁড়ায়, রবি মাটিতে পড়ে গেল, ধপাধপ করে জুতোসুদ্ধ লাথি এবং লাঠির ঘা পড়তে লাগলো তার শরীরে। রবির আর প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই, অসহ্য যন্ত্রণায় আস্তে আস্তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার চেতনা হঠাৎ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল, তার মনে হলো, এ লোকগুলো

কেন তাকে মারছে? কেন সে শাস্তি পাচ্ছে? কিন্তু যাই হোক, আজ সে কোনো অন্যায় করে নি, কোনো পাপ করে নি, তার পূর্ব জীবনে যত অন্যায় সে করেছে আজ সেইজন্য সে শাস্তি পাচ্ছে। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগে সে একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। দুলির মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে হেঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে সরে পড়লো সেই চার ছায়ামূর্তি।

১১

শেখর আর জয়া বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে, বাগানে পাতা টেবিল–চেয়ার তুলছে রতিলাল। টেবিলের উপর ফাঁকা ডিসগুলো পড়ে আছে, ঝকঝকে পরিষ্কার, খাবার দেবার সুযোগ হয় নি রেঞ্জার সুখেন্দুর সঙ্গে কী যেন কথা বলছে সঞ্জয়। সেদিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে শেখর জয়াকে বললো, আজকাল একটা মুশকিল হয়েছে, কোনো একজন মানুষ—ভালো কি খারাপ, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এই কনজারভেটর লোকটিকে ঠিক কি রকম মনে হলো তোমার? আমার তো দেখে মনে হলো বেশ ভদ্র, এলো আর চলে গেল, কোনো খাবার ছুঁলো না। অথচ শুনেছি, অন্যবার এসে নাকি সব খাবার হালুম হুলুম করে খায়! আশ্চর্য, লোকটা তা হলে—ভদ্র না ভণ্ড?

জয়া হেসে বললো, আপনি সব মানুষ দেখেই বুঝি ভালো কি খারাপ বিচার করতে চান? আমার তো লোকটাকে দেখে কিছুই মনে হয় নি। সব লোকই তো এই রকম—খানিকটা খানিকটা ভণ্ড—

—যাঃ, সব লোকই ভণ্ড হবে কেন?

জয়া অন্যদিকে মুখ ফেরালো, খানিকটা উদাসীনভাবে বললো, হয়, আমি জানি।

জয়ার উদাসীনতাটুকু লক্ষ করে শেখর চুপ করে গেল। জয়া দূরের জঙ্গলের ক্রমশ অবনত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। শেখর একটা সিগারেট ধরালো।

রতিলাল কাপ–ডিসগুলো জড়ো করেছিল একজায়গায়, সেগুলো তুলতে গিয়েও নামিয়ে রেখে হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে উঠলো। চমকে উঠলো ওরা দু'জনেই। ধুতির ওপর খাকি পোশাকে জোয়ান চেহারার মানুষ, সে হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে কান্নায় আকুল হলো। যেন অমন একজন বয়স্ক পুরুষকে ওরকমভাবে কখনো কাঁদতে দেখে নি, সে রকমভাবে জয়া বললো, ওমা, ওকি? ওরকম করছে কেন?

শেখর বললো, বোধহয় ওর চাকরি যাবে!

—লোকটা চাকরি যাবার ভয়ে ওরকমভাবে কাঁদছে নাকি? আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি। এমন কিছু আজ হয় নি, যে জন্য ওর চাকরি যেতে পারে—আমার তো মনে হয়, সঞ্জয়বাবু যে রকম অকারণে কনজারভেটরের সঙ্গে রাগারাগি করলেন—সেই জন্যই ওর চাকরি যেতে পারে। নইলে সত্যিই তো এমন কিছু হয় নি—

—সঞ্জয়টা ঐরকমই...পাগলামি যত সব। এইসব লোকদের ব্যাপারে ওর একটা গ্লানি আছে। দেখছো না, ওর কপালে ঐ কাটা দাগটা—

—কী হয়েছিল?

—থাক, সে গল্প শুনে আর কি হবে!

জয়া বনেদী বাড়ির মেয়ে ও বউ, অকারণে কৌতূহল প্রকাশ না করার একটা বংশগত শিক্ষা আছে। সেই কারণে, ও বিষয়ে আর প্রশ্ন না করে আপন মনে বললো, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এমন একটা কিছু না, যদি চাকরি যায়ও, আমি বাবাকে বলে আমাদের কাঠের গোলার ওর একটা চাকরি করে দেবো না–হয়।

সঞ্জয়ের গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়ছে, সুখেন্দুকে সে কি যেন বোঝাতে চাইছে ব্যস্তভাবে। বারান্দা থেকে শেখর আর জয়া তাকিয়ে রইলো সেদিকে। জয়া শেখরকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, সঞ্জয়বাবু কি আপনাদের অনেকদিনের বন্ধু?

শেখর বললো, হ্যাঁ, ছেলেবেলার বন্ধু। এখন মাঝে মাঝে অনেকদিন দেখা হয় না, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না কখনো।

—উনি কিন্তু আপনাদের তিন বন্ধুর থেকে অনেক আলাদা।

—কেন আলাদা?

—দেখলেই মনে হয়। সব সময় কপাল কুঁচকে থাকেন—কি একটা ব্যাপারে যেন খুব চিন্তিত। বেড়াতে এসেও সে কথা ভুলতে পারেন নি!

শেখর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে পড়লো, মাসখানেক আগে এক ভোরবেলা সঞ্জয় তার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, ক্ষতবিক্ষত মুখ...। শেখর বললো, সঞ্জয় সত্যিই আমাদের মতন নয়, ও খুব ভালো ছেলে।

জয়া বললো, তা দেখলেই বোঝা যায়, বড্ড বেশি ভালো।

সঞ্জয় উত্তেজিতভাবে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। সারা মুখে তার ক্রোধ ও বেদনা। বললো, জানিস, কি ব্যাপার? কল্পনা করা যায় না! কোন দেশে আছি? আজ সকাল দশটায় ডাক্তার এসে বলে গেছে ওর বউ আর এক বেলাও বাঁচবে কি না সন্দেহ আর ও সারা দুপুর এখানে সাহেবদের সেবার জন্য...ঐ রেঞ্জার সুখেন্দুটা ওকে চাকরির ভয়, অমানুষিক ব্যাপার—

শেখর বললো, ঠিক জানতুম, কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল আছে। ঐ রেঞ্জারেরই স্বার্থ...

—কে জানে কার স্বার্থ। অসহ্য। অসহ্য! মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না যে দেশে...আমি রেঞ্জারকে বলেছি, ওকেও যেতে হবে, আমরা সবাই রতিলালের বাড়ি যাবো, চল—।

—রতিলালের বাড়ি? আমরা সবাই গিয়ে কি করবো?

—বাঃ, আমাদের একটা দায়িত্ব নেই? আমরা শুধু আরাম করবো আর পয়সা দিয়ে দায় মেটাবো? এ সময় আমাদের সবারই ওর পাশে দাঁড়ানো দরকার—।

—সবাই গেলে কোনো লাভই হবে না—শুধু ওকে বিব্রত করাই হবে। তা ছাড়া রবি আসে নি, অপর্ণা, আর অসীম কোনোদিকে গেলে, তুই বরং একা যা, তোর যাওয়া দরকার।

—দরকার? আমার একার কি দরকার! আমার একার দায়িত্ব নাকি?

—হ্যাঁ, তোরই যাওয়া দরকার, তাতে তোর ভালো হবে। তুই যা।

—তার মানে?

সঞ্জয় দু'চোখ এক রেখায় করে তাকালো শেখরের দিকে। শেখর স্পষ্ট স্পন্দনহীন চোখে চেয়ে আছে। দু'এক মুহূর্ত, তারপর সঞ্জয়ের মুখে আলতো ব্যথার আভাস ভেসে উঠলো, নিঃশ্বাস ফেলে চাপা গলায় সে বললো, হ্যাঁ যাই, আমি ঘুরে আসি—।

এতক্ষণ অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত ছিল সঞ্জয়। হঠাৎ বদলে গেল। দুর্বল মানুষের মতন আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে, বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে না নেমে সিঁড়ি ভাঙলো, সেইরকমই মন্থরভাবে এগিয়ে রতিলালের কাঁধে হাত রেখে বললো, চলো!

ওদের দলটা ডাকবাংলোর এলাকার প্রান্তে পৌঁছালে শেখর চেঁচিয়ে বললো, সঞ্জয়, বেশি দেরি হলে একটা খবর পাঠাস কারুকে দিয়ে!

নিরালা হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ শেখর আর জয়া চুপ করে বসে রইলো। অন্ধকার ভারী হয়ে নেমে এসেছে, বাংলোয় আলো জ্বালা হয় নি, দৃষ্টির সীমায় কোনো আলো নেই, পাশাপাশি

ওরা দু'টি মূর্তি ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে ডাক, কখনো জোর, কখনো বা মৃদু, হাওয়ায় গাছের পাতায় বিভিন্ন রকম শব্দ। এক একটা পাতার সরসরানি এমন হয়, যেন মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই নেই, আকাশে একছিটে মেঘ নেই, আস্তে আস্তে সেদিনের চাঁদ তার সেদিনের নিজস্ব রীতিতে জেল্লা ছড়াচ্ছে।

খানিকটা পরে শেখর সচকিত হয়ে বললো, রুণি আর অসীম এখনো এলো না! ওদের খোঁজ করবো?

—থাক না, একটু বেড়াচ্ছে।

—কিন্তু এই অন্ধকারে... তোমাদের ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

—না, এমন কিছু দেরি হয় নি। কোনো দরকার থাকলে পরমেশ্বর খবর নিতে আসতো। জানে তো এখানেই আছি।

—কিন্তু তোমার শ্বশুর কি ভাববেন?

—কি ভাববেন?

—মানে, তোমরা দু'টি মেয়ে এতগুলো ছেলেছোকরার সঙ্গে ডাকবাংলোয় আছ...।

জয়া ঝরঝর করে হেসে বললো, আমার শ্বশুরের চেয়ে আপনারই ভাবনা যে বেশি দেখছি!

শেখর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না, মানে ভাবতে তো পারেন—যাই হোক—আমাদের সঙ্গে খুব বেশি তো চেনা নয়—।

বাইরে এলে অনেককিছুই অন্য রকম! কলকাতায় আলাপ হলে সহজে আড়ষ্টতা ভাঙতে চায় না, কিন্তু বাইরে জঙ্গলের মধ্যে সব জিনিসটা সহজ হয়ে যায়—আপনার বন্ধুদের সঙ্গে তো মনে হচ্ছে যেন কতদিনের চেনা!

—তোমর সঙ্গে আমার তো অনেক দিনেরই চেনা। কলেজে...তখন বোধহয় তোমার দিকে দু'একটা ইশারা ইঙ্গিতও করেছিলাম।

—বাবাঃ, কলেজে আপনি যা দুর্দান্ত ছিলেন! সব মেয়েদের আপনি বিষম জ্বালাতন করতেন।

—জ্বালাতন করবো না কেন? মেয়েরা আমাকে পাত্তা দিতেই চাইতো না। সেইজন্যই জ্বালাতন করে...

—বাজে কথা বলবেন না! একমুখ দাড়ি রেখে, ময়লা জামা–প্যাণ্ট পরে কলেজে এসে খুব বীরত্ব দেখাতেন! ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া আর অসভ্য কথা বলার জন্যই তো আপনি বিখ্যাত ছিলেন!

—শুধু সেইজন্য বিখ্যাত ছিলুম? আমি ম্যাট্রিকে থার্ড স্ট্যান্ড করেছিলাম না?

—ভারী তো থার্ড! ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড তো হন নি! সেইজন্যই ফার্স্ট সেকেন্ড বয়দের থেকে আলাদা হবার চেষ্টায় ঐরকম চ্যাংড়া সেজে থাকা।

—আমি তোমার সঙ্গে কোনোদিন চ্যাংড়ামি করেছি?

আপনার সাহসই হতো না! একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে আপনি একটা মেয়েকে...কি যেন নাম ছিল মেয়েটার? সোফিয়া? হ্যাঁ, সোফিয়া চৌধুরী, দারুণ দেখতে, ইংলিশ–এ অনার্স ছিল, আপনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে পেছন থেকে গিয়ে তার চোখ টিপে ধরেছিলেন। সারা কলেজে ছড়িয়ে ছিল সেই গল্প। আমি শুনে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে ওরকম করতে এলে চালাকি বার করে দিতাম।

শেখর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কি করতে?

জয়া ডান হাতটা মুঠো করে তুলে ধরে বললো, গুম্ গুম্ করে পিঠে কিল মারতাম। দু'জনেই

অনাবিলভাবে হেসে উঠলো। জয়া বললো, এখন কিন্তু আপনি অনেক শান্ত হয়ে গেছেন।

শেখর খানিকটা চিন্তিতভাবে বললো, শান্ত হয়ে গেছি? কি জানি! কিন্তু এ জঙ্গলে বেড়াতে এসে আমার কিন্তু সত্যিই নিজেকে খুব শান্ত লাগছে। এই দেখো না, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে নিরালায় বসে আছি, কোথাও কেউ নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে একটুও দুষ্টুমি করার চেষ্টা করেছি? মনে হয়, আগেকার সব কিছু যেন ভুলে গেছি।

তারপর শেখর হঠাৎ ধড়মড় করে ওঠার চেষ্টা করে বললো, দাঁড়াও আলোটা জ্বেলে দিই।

—না, থাক না। এই তো বেশ।

—কিন্তু তোমার শ্বশুর সত্যিই কিছু ভাববেন না? যদি হঠাৎ খোঁজ করতে আসেন—

—আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার শ্বশুর কিছুই ভাববেন না, সন্ধের পর তাঁর কিছুই ভাববার সময় নেই। সন্ধের সময় তিনি ঠাকুরঘরে ঢোকেন, তারপর অন্তত তিনটি ঘণ্টা—।

—সে কি! খালি বাড়িতে আর দু'টি মেয়ে...

বাড়ির দু'টি মেয়ে নিজেদের যথেষ্ট সামলাতে পারে, তা তিনি জানেন। তাছাড়া, ওঁরও তো কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার। সারাদিন সংসারের সঙ্গে, মানুষ জনের সঙ্গে মানিয়ে চলেছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তত একা হয়ে ওঁর কান্নার সময় তো চাই। দুঃখ–কষ্ট মানুষটার কম নাকি?

শেখর ধীর স্বরে বললো, জয়া, তোমার একা থাকার দরকার হয় না? তোমার কান্নার জন্য সময়—।

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় জয়া বললো, না। কাঁদতে যাবো কেন? আমার কান্নার কি আছে?

শেখর একটু সময় চুপ করে রইলো। জয়ার আংটির হীরেটা ঝিকমিক করছে অন্ধকারে, সেই হীরের জ্যোতি দেখে বোঝা যায়, জয়ার হাত খুব কাছেই মাটিতে ভর দেওয়া। একটু বাদে শেখর হাত বাড়িয়ে জয়ার হাতটা ধরলো, খুব নরমভাবে জিজ্ঞেস করলো, তিন বছর কেটে গেল, জয়া, সত্যি তোমার কষ্ট হয় না?

তুমি শরীরে কোনো জ্বালা টের পাও না?

—না। শরীরের মধ্যে আমি সব সময় একটা অপমান টের পাই।

—কিসের?

—বুঝতে পারলেন না? ভালবেসে বিয়ে করলুম, সে কেন দূর দেশে গিয়ে আত্মহত্যা করলো? এই রহস্য যতদিন না বুঝতে পারি, ততদিন নিজের প্রতি একটা অপমান—

—হয়তো আত্মহত্যা নাও হতে পারে। যদি দুর্ঘটনা হয়?

—তাহলেও! বিলেত যাবার কি দরকার ছিল? বাড়িতে কোনো অভাব নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল, তবু আমাদের কারুকে না জানিয়ে চুপিচুপি সব ব্যবস্থা করে হঠাৎ একদিন চলে যাওয়া—

—তোমরা আগে থেকে কিছুই বুঝতে পার নি?

—আমি বোধহয় ভালবাসা কাকে বলে তাই কখনো বুঝতে পারি নি।

শেখর এবার একটু বিরক্ত হয়ে জয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, তোমরা মেয়েরা ভালবাসা কথাটা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করো! দু'জনে দু'জনকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে, সচ্ছল সংসার, অমন সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছে—মানুষের সুখি জীবন তো একেই বলে, এর মধ্যে ভালবাসা নিয়ে বেশি ন্যাকামিই বা আসে কোথা থেকে আর আত্মহত্যার প্রশ্নই বা আসে কি করে?

জয়া আলতোভাবে হেসে বললো, আপনি বুঝি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না?

—করবো না কেন? কিন্তু ভালবাসা নিয়ে অতটা মাতামাতি করা আমি মোটেই পছন্দ করি না! একজনকে না পেলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল—ন্যাকামি! আমাদের রবিটা যেমন...যাক্‌গে! তোমরা দু'জনে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে—তারপর মতের অমিল হতেও বা পারে কখনো-সখনো—একটু-আধটু অন্যদের সঙ্গেও ফষ্টি-নষ্টি চলতে পারে—কিন্তু এর মধ্যে আত্মহত্যার কথা ওঠে কি করে?

একটুও বিচলিত না হয়ে বেশ সপ্রতিভ গলায় জয়া বললো, সেই কথাই তো বলছি, আপনিই বলুন না, এর মধ্যে আত্মহত্যার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আমি কোনো অবিশ্বাসের কাজ করি নি, তবু কেন ও আমাকে তুচ্ছ করে দূরে চলে গেল? বিয়ের আগে ও বলেছিল, আমাকে না পেলে ওর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিয়ে করে ও তো আমাকে পেয়েছিল, তবুও কেন নিজের জীবনটা ব্যর্থ করে দিলো! একটা মেয়ের কাছে এটা কত বড় প্রশ্ন আপনি বুঝতে পারবেন? ভালবাসা ছাড়া আর কিসের কাছে আমি এর উত্তর খুঁজবো?

নিজের প্রশ্ন নিজেরই কাছে ফিরে আসায় উত্তর না দিতে পেরে শেখর একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, কি জানি! এসব সমস্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না! এখানে সব অন্যরকম। আমি একটু শোবো।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঝুঁকে পড়ে শেখর জয়ার কোলের ওপর মাথা রাখলো। জয়া আপত্তি করলো না, বরং নিজের দুই উরু সমান করে বিশাল কোল পেতে দিলো। শেখর ওপরে তাকালো, জয়ার দুই চোখের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পাওয়া যায় অন্ধকারে। বিধবা কথাটার মধ্যে কি দারুণ নিঃস্বতা আছে, কিন্তু জয়ার মাংসল দুই উরু ও ভরাট কোল, বেশবাস ভেদ করে বেরিয়ে আসা শরীরের চাপা সুগন্ধ—জয়াকে শুধু নারী বলেই মনে হয়। শেখরের শরীরটা হালকা হয়ে এলো। চাপা গলায় বললো, জয়া, কলেজে পড়ার সময় তোমাকে আমি একদিন আইসক্রিম খেতে আমার সঙ্গে কোয়ালিটিতে যেতে বলেছিলুম। তুমি যাও নি। যদি যেতে—

—গেলে কি হতো?

—তাহলে, বলা যায় না, হয়তো আমাদের দু'জনেরই জীবন অন্যরকম হতো।

—অন্য অনেক মেয়ে তো আপনার সঙ্গে আইসক্রিম খেতে যেতে রাজি হয়েছিল জানি—তাদের জীবন কি অন্যরকম হয়েছে?

—কলেজে পড়ার সময় তুমি কিন্তু খুব গম্ভীর ছিলে। কফি হাউসে কিংবা ওয়াই, এম, সি, এ-তে কেউ কোনোদিন তোমায় আড্ডা দিতে দেখে নি। বাড়ির গাড়িতে কলেজে আসতে, আবার বাড়ির গাড়িতে ফিরে যেতে। কেউ কথা বলতেই সাহস করতো না। আমি যেদিন তোমাকে কোয়ালিটিতে যাবার কথা বললুম, তুমি যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠেছিলে। তুমি বলেছিলে, আমি? না, না, আমি কোথাও যাই না, গেলেও আপনার সঙ্গে যাবো কেন?

শেখর জয়ার গলা নকল করেছিল বলে জয়া রেগে উঠে শেখরের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে বললো, মোটেই আমি ওরকমভাবে বলি নি! ইস্, আমি ভয় পাবো!

শেখরও দু'হাত উঁচু করে জয়ার কোমরে সুড়সুড়ি দেবার চেষ্টা করে বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলেছিলে! কেন বলেছিলে? কেন আমার সঙ্গে সেদিন যাও নি?

—বেশ করেছি যাই নি। কেন যাবো? এক একদিন এক একটা মেয়েকে তো ঐ একই কথা বলতেন! অনেক মেয়েই তো গেছে আপনার সঙ্গে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি রাজি হও নি বলেই তোমার কথাটা বেশি করে মনে আছে। আজ এই মুহূর্তে, কেন জানি না, মনে হচ্ছে, যদি তুমি যেতে তাহলে জীবনটা—

—ওসব যদির কথা বাদ দিন। তাহলে তো বলা যায়, যদি আমি না জন্মাতুম—!

—ওকি কথা? তোমার কি জীবনের ওপরেই বিতৃষ্ণা এসে গেছে নাকি?

—মোটেই না। কেন? আমার কি দোষ?

—তোমার দোষের কথা তো বলি নি।

—তাহলে, ওসব কথা আর বলতে হবে না।

—আচ্ছা আর বলবো না। আমার এখানে শুয়ে থাকতে খুব ভালো লাগছে। আর একটু শুয়ে থাকি?

জয়ার যে হাত শেখরের চুলের মুঠি ধরেছিল, সেই হাত এখন সেখানেই বিলি কাটছে। শেখরের যে হাত জয়ার কোমরের কাছে সুড়সুড়ি দেবার জন্য উঠেছিল, সে হাত এখন সেখানেই থেমে আছে। খুব কাছেই জয়ার দু'টি স্তন, শেখরের হাত একবারও লোভী হয়ে সেদিকে উঠতে চায় নি। বরং হাতটা নেমে এলো, ভর রাখলো জয়ার উরুর পাশে। সিল্কের শাড়ি পরেছে জয়া, শেখরের হাত সেখানে ভারী আরাম পায়। যেন পরম স্নেহের ভঙ্গিতে শেখর সেখানে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

কলেজ-জীবনে জয়ার সঙ্গে ভালো করে আলাপও হয় নি শেখরের, এক ক্লাসে পড়তো, কিন্তু কখনো নিরালায় বসে নি দু'জনে। অথচ, এতদিন পরে দেখার পর, কোন মন্ত্রবলে কাদের সম্পর্ক কত সহজ হয়ে এসেছে। এই জঙ্গলের নির্জনতা, পাতা আর বাতাসের ফিসফাস, অন্ধকারের নিজস্ব অবয়ব—এখানে যেন কোনো স্বভাব-বিরুদ্ধ কৃত্রিমতাই মানায় না।

কিছু না ভেবেই শেখর হঠাৎ প্রশ্ন করলো, জয়া, তোমার বিয়ের পর কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?

এরকম কোনো প্রশ্নের জন্য জয়া একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। অবাক হয়ে বললো, কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—এমনিই। বিয়ের পর হানিমুনে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই কোথাও?

—গিয়েছিলাম, মাউণ্ট আবু-তে। কিন্তু সে কথা শুনে আপনার কি হবে?

—বলো না! কবে গেলে, কতদিন ছিলে, এইসব। তোমার জীবনের কোনো একটা আনন্দ-মধুর সময়ের কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে!

জয়া একটা হাত শেখরের চোখে চাপা দিয়ে বললো, বোকারাম একটি! বুঝতে পারছেন না, ঐ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই?

দু'জনেই আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। দু'জনেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। অন্ধকারে প্রথমে চোখে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে—তারপর অন্ধকারকে অন্তত স্পষ্ট দেখা যায়। জঙ্গলে অবশ্য এখন আর অবিমিশ্র অন্ধকার নেই। কোথাও কোথাও ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়েছে—শেখর কিন্তু চাপ-বাঁধা অন্ধকার অংশগুলোর দিকেই তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমশ তার অস্বস্তি জাগলো। রাত বাড়ছে। রবিটা এলো না! অসীম, অপর্ণা এলো না!

শেখর বললো, অসীম আর রুণি এলো না—ওরা পথ হারিয়ে ফেলে নি তো?

নিশ্চিন্ত গলায় জয়া বললো, এর মধ্যে আবার কোথায় হারাবে? তাছাড়া রুণি কখনো পথ হারায় না!

—কেন? টর্চ সঙ্গে নেয় নি, এই অন্ধকারে, অসীমের সঙ্গে ও একা গেছে, তোমার ভাবনা হচ্ছে না?

—উ হুঃ! আপনি রুণিকে চিনতে পারেন নি। ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হয়, বুদ্ধিতে আমার চেয়ে বেশি! রুণি একবার মাত্র পথ ভুল করেছিল, তাও মাঝপথ থেকে ফিরে

এসেছে, আর কখনো ভুল করবে না। জানি।

—ঐটুকু তো মেয়ে, তার সম্বন্ধে অমন জোর দিয়ে বলার কি আছে!

—ঐটুকু হলেও, জানেন না, ও মানুষকে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারে। কাল রবি যখন আমাদের ওখানে বিকালবেলা—

—কাল রবি তোমাদের ওখানে—

—হ্যাঁ, কাল যখন একা গেল—

যেন শেখর ঘটনাটা জানে। সেইরকমভাবে শেখর কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলো না। কাল ওরা দু'জন যখন মহুয়ার দোকানে গিয়েছিল, সঞ্জয় গিয়েছিল রতিলালের বাড়িতে, রবি তো সে সময় জয়াদের বাড়িতে যেতেই পারে, এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে শেখর বললো, হ্যাঁ, কাল আমরা যখন জঙ্গলে বেড়াতে গেলাম, রবি গেল না, তোমাদের বাড়িতে যাবে বলেছিল—

হ্যাঁ, রবি হন্তদন্ত হয়ে গেল, গিয়ে বললো, একা একা ভালো লাগছে না! আমরা তখন কাটলেট ভেজে আপনাদের জন্য পরমেশ্বরের হাত দিয়ে পাঠাবো ঠিক করছিলুম, আমরা বললুম, আপনি এসেছেন যখন ভালোই হলো। কিন্তু কি রকম বন্ধু আপনার, পাগল! আর কোনো কথাবার্তা নেই, রুণির দিকে তাকিয়ে বললো—চলো, তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখন বেড়াতে বেরুবো। আমি বললুম, সে কি, এখন বেড়াতে যাবে কি করে? রবি কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলে নি, রুণির দিকেই তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে, সোজাসুজি রুণির হাত ধরে টান মেরে বললো—কেন, যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে—আমার একা একা ভালো লাগছে না।

শেখর এবার বিস্ময় গোপন করতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, রুণিকে একা যেতে বলছিল?

জয়া সামান্য হেসে বললো, তাই তো মনে হয়। যাই বলুন, আমার কি দারুণ ভালো লেগেছিল। তখনো তো রুণির সঙ্গে বলতে গেলে ওর ভালো করে পরিচয়ই হয় নি, সেই গাছতলা থেকে আমাদের বাড়িতে আসার পথটুকু পর্যন্ত যা কথা হয়েছে, কিন্তু তবুও একটা ছেলে সোজাসুজি এসে ওরকম হাত ধরে বললো—চলো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেই হবে—এর মধ্যে এমন একটা পৌরুষ আছে, আমি আগে কখনো দেখি নি। কিন্তু বেচারাকে কষ্ট দিতেই হলো। রুণিই হাসতে হাসতে বললো, কি করে যাবো? আমরা যে এক্ষুনি ঘাটশীলা যাচ্ছি। সকালে বলেছিলুম, ভুলে গেছেন। রবি তাতেও দমে নি, বললো, ঘাটশীলা যেতে হবে না। রুণি বললো, ইস্, কেন আপনার সঙ্গে যাবো! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ চড়ে গেল। রবি বললো যাবে না? ঠিক আছে। আমি চললুম তা হলে! যেমন এসেছিল তেমনি হঠাৎ আবার তখুনি চলে এলো কাটলেটগুলো হাতে নিয়ে। কত বসতে বললুম—আমি রুণি দু'জনেই, আর বসলো না। রবি চলে যাবার পর রুণি বললো, জানিস দিদি, ওকে দেখলেই মনে হয়, উনি যখন আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন, তখন ঠিক আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে অন্য কারুর কথা ভেবে ওসব বলছিলেন। উনি কারুর ওপর খুব অভিমান করে আছেন, তাই ছটফট করছিলেন সবসময়—। আমি তক্ষুনি বুঝলুম, রুণি ঠিকই বলছে। বলুন, সত্যি কিনা?

শেখর হাসার চেষ্টা করে বললো, রবি আবার কার ওপর অভিমান করে থাকবে, ও অমনিই পাগলাটে—

শেখর গোপনে আবার একটু ভেবে নিলো। প্রথম দিনের আলাপেই রুণিদের বাড়িতে রবি একা গিয়েছিল? বলে নি তো! রবির এ ধরনের স্বভাব নয়। কিন্তু কেন? এ-ও আর এক ধাঁধা। শেখরের এ সম্পর্কেও আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করলো না।

শেখর জয়ার কোলে উপুড় হলো। জয়ার নরম উরুতে ওর মুখ ডুবে যাচ্ছে! কিন্তু কোথাও কোনো শান্তি বিঘ্নিত হয় নি। শেখর যেন এতখানি শান্তিতে বিশ্বাস করতে পারলো না, তাই পরখ করার

জন্য জয়ার উরুতে একটা চিমটি কাটলো। জয়া উঃ শব্দ করে বললো, এবার বুঝি আরম্ভ হলো ছেলেমানুষী? তাহলে কিন্তু—শেখর আবার মুখ ফিরিয়ে বললো, না জয়া, সত্যি ছেলেমানুষীই। এখানে শুয়ে থাকতে এত ভালো লাগছে—এক্ষুনি উঠতে বলো না। একটা কথা বিশ্বাস করবে? আমি কোনো মেয়ের কোলে এতক্ষণ মাথা দিয়ে আগে কখনো এমন চুপ করে শুয়ে থাকি নি। এতটা ভালোমানুষ আমি কোনোদিনই তো ছিলুম না! আমার পাগলামি একটু বেশি, আমি শরীরকে সব সময় শরীর হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছি। কিন্তু আজ কেমন অন্যরকম লাগছে, পুরোনো কোনো কথা মনে পড়ছে না। জঙ্গলে এসে জংলী হবার বদলে আমি হঠাৎ সভ্য হয়ে গেলুম! আচ্ছা, সত্যি কথা বলো তো, তোমার ভালো লাগছে না? তোমার পাগলামি করতে ইচ্ছে করছে না?

জয়া হেসে বললো, আমার ভালো লাগছে। কিন্তু আমার পাগলামি করতে ইচ্ছে করছে না।

—এই তিন বছরের মধ্যে কোনোদিন ইচ্ছে করে নি?

—না। ঐ যে বললুম, ভালবাসার ব্যাপারে আমি ভুল বুঝেছিলুম কিনা, তার উত্তর না পেলে—

—আঃ! আবার সেই ভালবাসা নিয়ে বাড়াবাড়ি! ভালবাসা-টাসা ছাড়াও শরীরের তো কতগুলো নিজস্ব দাবি আছে—নাকি, তোমাদের মেয়েদের সেটা নেই?

—থাকবে না কেন? কম বয়সে ঐ পাগলামিটা বেশি থাকে। আমার বয়েস এখন সাতাশ, সেটা খেয়াল আছে?

—সাতাশ? তাই নাকি? তা হলে তো একেবারেই বুড়ি!

জয়া হাসলো না। আপন মনে কথা বলার মতন বলে গেল, বুড়ি হই নি, কিন্তু কম বয়েসের সেই ছটফটানিটা আর নেই! মেয়েদের একবার সন্তান হলে শরীরের রহস্যটা অনেকখানি জানা হয়ে যায়। তখন হৃদয়ের রহস্য জানার জন্য খুব ব্যাকুলতা আসে। অবশ্য আপনারা একথা বুঝবেন না। ছেলেরা সাতাশ কেন, সাতচল্লিশেও ছেলেমানুষ থাকে।

—জয়া, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না সত্যিই! তুমি কি বলতে চাও, তুমি তোমার স্বামীর স্মৃতি নিয়েই চিরকাল থাকবে?

—বয়ে গেছে আমার, কোনো মরা মানুষের স্মৃতি নিয়ে দিন কাটাতে! আমি জানতে চাই আমার ভালবাসায় কোথায় ভুল হয়েছিল, যাতে দ্বিতীয়বার আর ভুল না করি।

—আবার সেই ভালবাসা! জ্বালালে! দেখছি ঘুরে ফিরে সেই একজায়গায়।

—আপনি সত্যিই ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না?

—আমি ভালবাসায় বিশ্বাস করি না। ভালবাসতে চাওয়াটুকু বিশ্বাস করি। সেই চাওয়াটুকুতেই যা আনন্দ। ভালবাসা কোনো পবিত্র অলৌকিক ব্যাপার নয়!

—কিন্তু শরীরের ছটফটানি কি সেই চাওয়াটুকুও ভুলিয়ে দেয় না? শরীরের নিজস্ব চাওয়া একটা গোটা মানুষকে চাইতে ভুলিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, থাক ও কথা। জয়া, তোমার হাতটা দাও তো—

জয়া তার হীরের আংটি পরা ঝিকমিকে হাতখানা শেখরের কপালে রাখলো। তারপর চমকে উঠে বললো, এ কি, আপনার গা এত গরম কেন!—জ্বর হয়েছে নাকি?

জয়ার চমকানি দেখে শেখর কৌতুক বোধ করলো। হাসতে হাসতে বললো, না, কিছু হয়

নি। এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়। তোমারও হাতখানা খুব গরম—

এবার জয়াও হেসে উত্তর দিলো, আমারও এরকম মাঝে মাঝে হয়।

—তা হলেই দেখছো, আমাদের দু'জনের জীবনে কতটা মিল!

—জীবনের না হোক, আমাদের দু'জনেরই নিশ্চয়ই দুঃখের মিল আছে।

শেখর সচকিত হয়ে বললো, দুঃখ? আমার আবার দুঃখ কি?

—লুকোচ্ছেন কেন, আপনি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না, আপনারও কি দুঃখ কম নাকি? আপনারও চাপা দুঃখের কথা আমি জানি।

—তুমিও বুঝি রুণির মতন সব মানুষের সত্যি বা মিথ্যে কথা বলে দেওয়ার প্র্যাকটিস শুরু করেছো!

—রুণির মতন অতটা না হলেও, আপনি এতক্ষণ আমার কোলে মাথা দিয়ে আছেন, আপনার সম্পর্কে অন্তত এইটুকু বলতে পারবো না! বলুন, কোনো দুঃখ নেই?

—না, নেই। দুঃখ নেই, গ্লানি নেই। থাকলেও কিছু এখন মনে পড়ে না।

—কিছুই মনে পড়ে না? তা হলে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন?

—ভ্যাট্! চালাকি হচ্ছে, না? মোটেই কথার মাঝখানে মাঝখানে ব্রাকেটে দীর্ঘশ্বাস ফেলা আমার অভ্যেস নয়! সত্যিই জয়া, এই জঙ্গলে এসে আমার মনটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছে। আমি যে কোনোদিন কোনো মেয়ের শুধু কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থেকে এত আনন্দ পাবো—এ ধারণাই আমার ছিল না। আমি যেন বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি! কি জানি, আমার উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে!

জয়া শেখরের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলো। তারপর খুব মৃদুভাবে বললো, আপনি এখনো ছেলেমানুষ, ভীষণ ছেলেমানুষ। এবার উঠে পড়ুনতো। আমার পা যে ব্যথা হয়ে গেল।

শেখর উঠে বসলো। পাশাপাশি বসে জয়ার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, জয়া, তোমাকে আমি একদম বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে হবেও না। একদিনেই বোঝা যায়?

শেখর হঠাৎ গলার স্বর বদলে ডাকলো, জয়া—। জয়া কোনো উত্তর দেবার আগেই, ঠিক সেই সময়, দূরের জঙ্গল থেকে আর্তনাদের মতন ডাক ভেসে এলো, শেখর—। প্রথমটা শেখর ঠিক বুঝতে পারলো না, পরে আরেকবার। অনেকটা দূর হলেও এবার চেনা গেল রবির গলা। শেখর অতি দ্রুত উঠে পড়ে বললো, রবির গলা না? বিপদে পড়েছে মনে হচ্ছে—দৌড়ে শেখর বারান্দার আলো জ্বাললো। ঘর থেকে বড় টর্চটা নিয়ে এসে বললো, জয়া, তুমি এখানে বসো, আমি দেখে আসছি।

জয়া বললো, আমি একা বসে থাকবো নাকি? আমিও যাবো।

দু'জনে নেমে জঙ্গলের মধ্যে ছুটলো। শেখর প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো, রবি। রবি! কোনদিকে?

রবির আর কোনো সাড়া নেই। জয়ার হাত ধরে আন্দাজে ছুটছে শেখর। একটু আগে শেখরের শরীরে যে একটা মদির আলস্য এসেছিল তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। শেখর বিপদের গন্ধ নিঃশ্বাস টেনে বুঝতে পারে। রবির বিপদের কথা টের পেয়ে সে জয়ার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে ভুলে গেছে। শক্তভাবে জয়ার হাত চেপে ধরেছে, ছুটতে জয়ার অসুবিধে হলেও জোরেই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে শেখর, আর মাঝে মাঝে রবির নাম ধরে চিৎকার করছে।

একটু বাদেই মানুষের গলা পাওয়া গেল, অসীম ডাকছে শেখরের নাম ধরে; শেখর চেঁচিয়ে বললো, তুই শুনেছিস? রবির গলা—

—হ্যাঁ—

—কোনদিকে?

—বড় রাস্তার দিকে, তোর ডান দিকে।

অসীম আর অপর্ণা একটুক্ষণের মধ্যেই ওদের সঙ্গে এসে মিললো। শেখর ওদের বললো, তোরা কতদূরে ছিলি? রবির এরকম গলার আওয়াজ, কোনো বিপদ-টিপদ হয়েছে নিশ্চয়ই—

জয়া বললো, রুণি তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

—আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে মরছিলুম, পথ হারিয়ে ফেলেছি।

—পথ হারিয়ে ফেলেছিলি?

—ঠিক হারাই নি, অসীমদা বলছিলেন আমাকে একটা কি সাদা ফুলগাছ দেখাবেন, ঘুরে মরছিলুম, খুঁজে পাচ্ছিলুম না কিছুতেই।

—এই অন্ধকারে—

—ভেবেছিলুম, বাংলোয় আলো দেখতে পাবো। তোরা আলো জ্বালিস নি বুঝি?

চার জনেই তখনো ছুটছে। শেখরের হাতে জোরালো আলো, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে জঙ্গলের প্রতিটি কোণ। অসীম বললো, আমার একবার মনে হয়েছিল, আওয়াজটা হবার পর কয়েক জন লোক ছুটে পালালো।

—তোদের থেকে কতটা দূরে?

—বেশ খানিকটা দূরে। মনে হলো রাস্তার পাশে, তার একটু পরেই একটা ট্রাক গেল।

—ডাকাত-টাকাতের পাল্লায় পড়ে নি তো! যে রকমভাবে ডাক দিলো, উঃ, এমন ছেলে—

খুঁজতে খুঁজতে ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছোলো। রাস্তার ওপাশে সেই মিলিটারিদের ভাঙা ব্যারাকটাও দেখে এলো। আবার ফিরে এদিকে একটু খুঁজতেই শেখরের টর্চের আলো পড়লো একটা মানুষের শরীরে।

দুমড়ে মুচকে পড়ে আছে রবি, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি ভিজে গেছে, জামা-প্যান্ট ছেঁড়া, চুলের মধ্যেও চাপ চাপ রক্ত। মাথার কাছে একটা সাদা ফুলগাছ—গাছটায় একটাও পাতা নেই, শুধু ফুল। অসীম আর রুণি যে গাছটা খুঁজছিল, সেই গাছটার নিচে পড়ে আছে রবি। শেখরের টর্চ স্থির হয়ে রইলো। জয়া 'আঁ—' ধরনের একটা শব্দ করে হাত দিয়ে মুখ চাপা দিলো। অসীম ফিসফিস করে বললো, মরে গেছে! মরে গেছে!

সাদা ফুলগাছটা ও রবিকে একসঙ্গেই দেখতে পেয়েছিল অপর্ণা. সে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে বললো, একি! না, না—।

অপর্ণা ছুটে যেতে চাইছিল, শেখর একটা হাত বাড়িয়ে তাকে আটকে বললো, জয়া, ওকে ধরো। অপর্ণা তবুও ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠলো, না, না—। অসীম এক পা এগোতে এগোতে বললো, মরে গেছে—বুঝি মরে গেছে রবি, উঃ, এত রক্ত—

শেখর অবিচলিতভাবে বললো, কিছু হয় নি! মরতে পারে না, অসম্ভব, আমি কখনো মৃত্যু দেখি নি, আজও দেখবো না। কোনো ভয় নেই। জয়া, তুমি রুণিকে ধরো, কোনো ভয় নেই—

অপর্ণাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, জীবনে সে কখনো এ ধরনের দৃশ্য হয়তো দেখে নি। মুখ দিয়ে একটা চাপা কান্নার স্বর বেরুচ্ছে তার, জয়ার হাত ছাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলছে, আমি একবার দেখবো, একবার—।

অসীম এসে অপর্ণার আর একটা হাত ধরতেই সে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে হিংস্র গলায় বললো, ছেড়ে দিন! আমাকে ছোঁবেন না।

শেখর এসে রবির মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালো। মুখখানা রক্তে মাখামাখি, প্রায় চেনাই যায়

না। একটা জ্বলন্ত সিগারেট রবির ঠিক মাথার কাছে পড়েছিল, ওর চুলের খানিকটা পুড়িয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেখর তাড়াতাড়ি সেটাকে নিবিয়ে দিলো, রবির একটা হাত খুঁজে বার করে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলো।

সেই সাদা ফুলগাছটার ফুলের পাশে পাশে বড় কাঁটা। একটা কাঁটা শেখরের গায়ে বিঁধতেই শেখর বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকালো। বেশ শক্ত বুনো গাছ, শুধু ফুল ফোটায় আর ফুলের পাশে ধারালো কাঁটার পাহারা রেখেছে। রবির একটা হাত সেই গাছের ওপর। গাছটাকে শেখর সাবধানে ধরে হেলালো, আর কোনোদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করে নি, গাছটাকে মাটিতে নুইয়ে তার ওপর বুটজুতো পরা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সে সেটাকে মড় মড় করে ভেঙে জায়গাটা পরিষ্কার করলো। তারপর বললো, অসীম, আমি মাথাটা তুলে ধরছি, তুই পা দুটো সাবধানে ধর, রবিকে এখুনি বাংলোয় নিয়ে যেতে হবে।

১২

পাথরের বেঞ্চে হাতলের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে শেখর হেলান দিয়ে বসেছিল। খুব আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটছে। বহুদিন শেখর এইরকম সূর্যোদয় দেখে নি। বাতাস এখন ঠাণ্ডা, ভোরের আলোও হিম, সূর্যের এখনো দেখা নেই, শুধু দূরের জঙ্গলের মাথায় নীলচে আলো। সূর্য উঠলেও জঙ্গলের আড়ালে বহুক্ষণ দেখা যাবে না, শেখর তবুও দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করার চেষ্টায় জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলো। জানে, এই জঙ্গলের বিস্তার বেশিদূর নয়, তবু রাত্রিবেলা মনে হয়েছিল সীমাহীন। ভোরের আলোয় এখন আবার সবকিছুর যথাযথ আয়তন ফিরে আসছে।

সারারাত অসংখ্য সিগারেট খেয়েছে, ভোরের দিকে তাই কাশি আসছিল বার বার। হাতের জ্বলন্ত অর্ধেক সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো। দু'তিনটে ঝরা ইউক্যালিপটাসের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে রগড়ে নাকে ঘ্রাণ নিতে ভারী আরাম লাগলো।

পেছন থেকে কে এসে শেখরের কাঁধে হাত রাখলো। শেখর চমকালো না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললো, রুণি! ঘুমোওনি? একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে!

অপর্ণা কোনো উত্তর দিলো না। ঘুরে এসে শেখরের পাশে বসলো। একটুক্ষণ কোনো কথা না বলে, রুণি তাকিয়ে রইলো বাগানের গেটের দিকে। জয়াদেব বাড়ির গেটটা আজ আর বন্ধ করা হয় নি, খোলাই আছে সারারাত ঘুমোয় নি, কিন্তু অপর্ণার চোখ দু'টিতে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই।

একটু পরে অপর্ণা জিজ্ঞেস করলো, আপনি আজ কলকাতায় যাবেন?

শেখর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, অপর্ণার প্রশ্ন শুনে মন ফিরিয়ে এনে বললো, উঁ? না, এখনো কিছু ঠিক করি নি। দেখা যাক, বেলা হোক।

—ওঁর বাড়িতে খবর দেবেন না?

—না, এখন নয়।

—কে কে আছেন ওঁর বাড়িতে?

—মা, দাদা-বৌদি, এক বোন, খুব ছোট, আট-ন'বছর বয়েস... বলতে বলতেই তপতীর কথা মনে পড়লো শেখরের। একসময় তারা সবাই তপতীকে রবির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হিসেবেই ভাবতো। বারাসতে সেই বাগানবাড়ির পিকনিকে বৃষ্টির মধ্যে তপতী আর রবির হাত ধরাধরি করে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য—মনে হয়েছিল বহুকাল বহু শতাব্দী ধরে সেই ছবিটা থাকবে। এখন নিউ আলিপুরে সন্তান সম্ভাবা তপতীর কাছে রবির খবর পৌঁছে দেবার কোনো মূল্য আছে কি?

শেখর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো চলো।

অপর্ণা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

—চলোই না! রবির কাছে কেউ আছে তো? অসীম তো ঘুমোচ্ছে।

—দিদি আছে।

—ঠিক আছে, চলো, আমরা একটু ঘুরে আসি। খালি পায়েই যাবে?

—সকালবেলা খালি পায়ে হাঁটতে খারাপ লাগবে না।

শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। পর্টুলেকা ফুলগুলো ফুটি-ফুটি করছে। রাত থাকতেই ফুটে আছে অতসীর ঝাড়, ঘন সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটি গন্ধরাজ। গোলাপ ক্ষেতে অনেকগুলো গভীর পায়ের ছাপ, কয়েকটা চারা দুমড়ে নেতিয়ে আছে, কাল রাতে রবিকে ধরাধরি করে বয়ে আনার সময় গোলাপ ক্ষেতের কাছে কেউ সাবধান হয় নি।

গেটের কাছাকাছি এসে শেখর আবার মত বদলে ফেললো।

অপর্ণাকে বললো, না, থাক, রুণি তুমি বাড়িতেই থাকো—আমি একটু একা ঘুরে আসছি।

—আমিও যাবো, চলুন না।

—না, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। দুপুরের দিকেই আবার জামসেদপুর যেতে হতে পারে—

—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—স্টেশনের দিকে। আমার একটু কাজ আছে—

ভোরের নরম নির্মল আলোতেও শেখরের মুখ প্রশান্ত হয় নি। মুখে অনেকগুলো চিন্তার রেখা। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা কি বুঝলো কে জানে, সে দৃঢ়স্বরে বললো, না, আপনাকে এখন একা কোথাও যেতে হবে না।

অপর্ণা নিজেই গেটের বাইরে বেরিয়ে এলো। বললো, এমনিই দু'জনে কাছাকাছি একটু হেঁটে আসি। সকালবেলা হাঁটতে ভালো লাগবে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।

শেখর বললো, চলো—

সেই সময় দোতলার বারান্দা থেকে সদাশিবের গমগমে গলায় মন্ত্র উচ্চারণ শোনা গেল। সদাশিব সর্বপাপঘ্ন দিবাকরকে প্রণতি জানাচ্ছেন। কাল রাত্রে সদাশিব নিজে গাড়ি চালিয়ে ঘাটশীলা থেকে ডাক্তার ডেকে এনেছেন। তবু আজ ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্যবন্দনা করতে তাঁর ভুল হয় নি।

ওরা কিছু ঠিক করে নি, তবু ওরা বাংলোর দিকেই এগুলো। পথ দিয়ে এর মধ্যেই লোক চলাচল শুরু হয়েছে। আপাতত নিস্তরঙ্গ জীবন, তবু এত ভোরে উঠে মানুষ কিসের জন্য ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে কে জানে!

অপর্ণা বললো, ওকে জামসেদপুরের হাসপাতালেই নিয়ে যাবেন? না কলকাতায়...

—দেখি। দুপুরে ডাক্তার আবার আসুক। জ্ঞান ফিরুক।

—কখন জ্ঞান ফিরবে?

অপর্ণার গলার আওয়াজে এমন একটা বিষণ্ণ ভয় ছিল যে, শেখর সচকিত হয়ে তাকালো। হাসলো। আলতোভাবে অপর্ণার হাত ছুঁয়ে বললো, রুণি, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রবির কিছু হবে না। শক্ত ছেলে, জীবনে ওরকম অনেক আঘাত খেয়েছে।

—ডাক্তার যে বললেন, নার্ভের ওপর—

—ডাক্তাররা ওরকম বলে! আমি রবিকে অনেকের চেয়ে ভালো চিনি।

—আপনি কতদিন চেনেন? খুব একরোখা লোক, তাই না?

—হুঁ। ছেলেবেলা থেকেই চিনি—খুব ইমোশনাল... আচ্ছা রুণি, তুমি এ পর্যন্ত কারুকে চোখের সামনে মরতে দেখেছো? কোনো আত্মীয়-স্বজন?

—না। না। মরার পর দেখেছিলাম, বড় মামার মুখ... কিন্তু চোখের সামনে—না, এ পর্যন্ত কারুকে না!

—আমিও দেখি নি! আমার বাবা যখন মারা যান, তখন একটুর জন্য—আমি ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলাম, গলির মোড়ে এসেছি, সেই সময় কান্না...। তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

—কি?

—চোখের সামনে কারুকে মরতে? আমার ইচ্ছে করে, কেউ মরছে—আমি চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি—শেষ মুহূর্তে নাকি শরীরটা প্রবলভাবে মুচড়ে ওঠে, চোখ ঘুরে যায়।

—আঃ, চুপ করুন! কি হচ্ছে কি?

—না, সত্যিই আমার ধারণা, নিজের মরার আগে একবার অন্য একটা মৃত্যু চোখে দেখা দরকার। কাল রবিকে প্রথম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম—মৃত্যু ধারে কাছে নেই—তোমরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে—তুমি ওরকম ছটফট করছিলে কেন?

—আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলুম। রবিদাকে ওরকম দেখে—কখনো আগে ওরকম দৃশ্য তো দেখি নি—হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল—আগের দিন রবিদা আমাকে ডেকেছিলেন ওঁর সঙ্গে যাবার জন্য আমি যাই নি—আমি অন্যায় করেছি, মানুষকে বুঝতে এরকম ভুল আমার কখনো হয় না।

—হঠাৎ ঐ কথাটাই তোমার তখন মনে হলো?

—হ্যাঁ। আমার মাসতুতো ভাই হিরন্ময়ের কথাও হঠাৎ মনে পড়েছিল একবার—

—কেন, তার কথা কেন?

—ঠিক জানি না। তবে, তার সঙ্গে গিয়ে একবার আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

—বুঝেছি।

বাংলোর সুরকি ঢালা পথের সামনে ওরা থমকে দাঁড়ালো। এক জায়গায় কয়েক ফোঁটা রক্ত তখনো চাপ বেঁধে আছে। সেদিকে চোখ পড়তেই শেখর চোখ ফিরিয়ে নিলো। স্বাভাবিকভাবে বললো, জিনিসপত্রগুলো সব চুরি হয়ে গেছে কিনা একবার দেখে আসি। ঘর বোধহয় খোলাই ছিল সারারাত।

সিঁড়ি দিয়ে ওরা বারান্দায় উঠলো। দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ। কাচের জানলা দিয়ে দেখা গেল, সঞ্জয় উপুড় হয়ে আছে মুখ এক পাশে ফেরানো। সঞ্জয় এদিকের ঘটনা কিছুই জানে না। কাল রাত্রে সারা পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র মানসিক স্বস্তির সঙ্গে ঘুমিয়েছে—তার মুখে সেই চিহ্ন। চোখের পাশটা একটু কুঁচকে রইলেও, হাসির আভাস—সঞ্জয় কোনো স্বপ্ন দেখছে।

আজয়াজ করলো না, ডাকলো না। শেখর ফিসফিসিয়ে অপর্ণাকে বললো, থাক, ঘুমোক। ওকে এখন জাগাবার কোনো দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এসে ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। শেখর বললো, রুণি, তোমার ক্লান্তি লাগছে। নইলে, চলো, কাল রবি যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গাটা একবার দেখে আসি।

অপর্ণা বললো, আমিও সেই কথাটাই ভাবছিলুম।

রাস্তা চিনতে ভুল হলো না। পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে, পাখির কোলাহল চলেছে অবিশ্রান্ত। দু'জন আদিবাসী কাঁধে কুড়ুল নিয়ে বনের পথ ভেঙে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল, তাদের কুড়ুলের ফলায় রোদের ঝলসানি অনেকক্ষণ চোখে পড়লো। একটু দূর যেতেই দু'জোড়া চটি জুতো দেখা

গেল—অসীম আর অপর্ণার। কাল জুতো খুলে ওরা অরণ্যে প্রবেশ করেছিল সেদিকে তাকিয়ে অপর্ণা হাসলো। নিজের চটি পায়ে গলিয়ে নিয়ে বললো, অসীমদার জুতো, কি হবে? হাতে নেবো?

—জুতো এখন কে বইবে? এই সকালে? দাও আমাকে—অসীমের চটি জোড়া নিয়ে একটা একটা করে শেখর জোরে ছুড়ে মারলো বাংলোর দিকে। বললো, যাক, পরে খুঁজে নেওয়া যাবে।

একটু পরে ওরা সেই জায়গায় পৌঁছুলো। ফুল গাছটার নিচে অনেকখানি কালচে রক্ত, জামার ছেঁড়া একটা টুকরো আটকে আছে কাঁটায়। একটা কাঠবিড়ালী রক্তের ওপর বিভ্রান্তভাবে গন্ধ শুঁকছিল—ওদের দেখে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। অপর্ণা প্রথমেই বললো, কাল আমরা এই ফুল গাছটা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, অনেক ঘুরেও পাই নি, শেষ পর্যন্ত এটার সামনেই—

দিনের আলোয় ফুল গাছটার বিশেষত্ব কিছু নেই। সাদা ফুলগুলোকে মনে হয় কাগজের ফুল, পাতাবিহীন গাছটাকে মনে হয় মরা গাছ শুধু কাঁটাগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। শেখর কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে বললো, এই নাও।

অপর্ণা দু'হাত জোড় করে ফুলগুলো নিলো, নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বললো, খুব সামান্য গন্ধ, কিসের মতন যেন, কি রকম একটা ছেলেবেলা-ছেলেবেলার ভাব আছে!

শেখর খর চোখে চারপাশটা তাকিয়ে দেখছে। মাটিতে ঐ রক্ত আর দু'একটা ভাঙা ডাল ছাড়া আর কোনো বৈষম্য নেই। কাঠবিড়ালীটা শাল গাছের ওপর থেকে ব্যগ্রভাবে ওদের দেখছে। একটা কেন্নো খুব মন্থরভাবে চলে যাচ্ছে পায়ের পাশ দিয়ে, এক ঝাঁক শালিক হাসাহাসি করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

শেখর একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, খুব বদলে গেছি আমরা সেটা আজ টের পেলাম।

—কেন?

—কাল রবিকে ওরকমভাবে মেরেছে, আর আজ সকালে আমি তোমাকে ফুল ছিঁড়ে দিচ্ছি। দু'তিন বছর আগে হলে—

—কি করতেন তখন?

—জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিতুম! তুমি জানো না রুণি, কি অসম্ভব রাগ ছিল আমার—যে হারামজাদা রবিকে মেরেছে—তাদের খুঁজে এনে জিভ উপড়ে নিতুম—রবি একটা ছুরি এনেছিল সঙ্গে—সেটা আমিই সরিয়ে রেখেছি—এক একবার ইচ্ছে করছে ছুটে যাই, আবার এক একবার কি রকম যেন—

—আপনাকে কিছুই বোঝা যায় না। আপনি ভীষণ চাপা লোক—

—ছিলুম না এ রকম, পাজী বদমাইশ ছিলুম—এখন কী রকম যেন মনে হচ্ছে, পৃথিবীর একটা নিজস্ব নিয়ম আছে—সেই নিয়ম অনুযায়ীই সব কিছু চলছে, রবির মার খাওয়াটাও তার মধ্যে পড়ে—

—ওকে কারা মারলো? কেন মারলো?

—ঠিক জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি।

—কেন?

—রবি নিজেকে ভাঙতে চেয়েছিল। এখানে মার না খেলেও অন্য কোথাও ওকে একদিন মার খেতেই হতো।

—কেন?

—আত্মহত্যা তো সবাই করতে পারে না—তোমার জামাইবাবুর মতন। রবি তাই ইচ্ছে করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে—

—কেন রবিদার এরকম—

শেখর অসহিষ্ণু বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলো, আঃ, কি একঘেয়ে কেন কেন জিজ্ঞেস করছো। তুমি মেয়ে হয়ে যদি এটা বুঝতে না পারো—তোমায় আমি কি করে বোঝাবো।

অপর্ণা আর কোনো কথা বললো না। মুখ নিচু করলো। শেখর সন্দেহ করে অপর্ণার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, ঠিক, দু'ফোঁটা জল টলটল করছে চোখে, এক্ষুনি গড়িয়ে নামবে। শেখর একটু জোরে বললো রুণি। ও কি? কী ছেলেমানুষ তুমি।

অপর্ণা মুখ তুললো, চোখের জলের ফোঁটা দুটোকে কোন অলৌকিক উপায়ে ভেতরে ফেরত পাঠিয়ে দিলো, কাঁদলো না। ফ্যাকাশেভাবে হেসে বললো, কি? কিছু হয় নি তো।

ফুল গাছটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে অপর্ণা। তার কমনীয় তন্বী শরীরের ওপর জাফরিকাটা রোদ এসে পড়েছে। নিঃশ্বাসে দুলছে তার বুক, চিবুকের পাশে বহু ভাষার ব্যঞ্জনা। অঞ্জলিবদ্ধ হাত থেকে ফুলগুলো সে ঝরঝর করে মাটিতে ফেলে দিলো।

শেখর বললো, রুণি, কাল পর্যন্ত তুমি কি রকম হাসিখুশি ছেলেমানুষ ছিলে। আজ কেমন গম্ভীর আর চাপা, সে রকম হাসছো না—জঙ্গলে এসে তুমিও বদলে গেলে?

—বদলাবো না? সবাই বদলায়।

—তুমি কেন বদলাবে। যারা সরল আর নিষ্পাপ, তারা সব জায়গাতেই একরকম।

অপর্ণা এবার স্পষ্ট করে হেসে বললো, আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো? আমি কি কচি খুকি নাকি?

—কচি খুকি না হলেও, তুমি সত্যিই সরল মেয়ে।

—আপনি মেয়েদের চেনেন না। মেয়েদের সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই মনে হচ্ছে!

—তোমাদের আজকালকার মেয়েদের এই একটা ফ্যাশান হয়েছে। সরল কিংবা নিষ্পাপ শুনলে খুশি হও না। নিজেকে খুব একটা জটিল আর রহস্যময়ী ভাবতে খুব ভালো লাগে, তাই না?

—না শেখরদা, আমি সরল থাকতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু পারি নি। আমি অনেক মানুষকে দুঃখ দিয়েছি।

—তোমাদের ঐ সব সখের দুঃখ তো! প্রেম–প্রেম খেলা। তোমাকে একজন ভালবেসেছিল, তুমি তাকে ভালবাসো নি—তারপর তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল—এইসব তো? তোমরা মেয়েরা এই ভেবে খুব আনন্দ পাও, কিন্তু মানুষের জীবন অত সহজে ব্যর্থ হয় না।

—আপনি বুঝি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না?

—এইসব ছেলেমানুষী ভালবাসায় বিশ্বাস করি না।

—আপনি কোথায়ও নিশ্চয়ই কঠিন আঘাত পেয়েছে!

—কোনো আঘাত পাই নি। তোমাকে পাকামি করতে হবে না!

—আমি কিন্তু ভালবাসার কথা বলতে চাই নি। আমার দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই, আমি এ পর্যন্ত ভালবাসার ব্যাপারটা নিজের মধ্যে টেরই পেলাম না। আমার ব্যাপারটা শুনবেন? আমাদের বাড়ি থেকে বরাবরই আমরা খুব স্বাধীনতা পেয়েছি। যখন খুশি যার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি, আমি ড্রাইভিং জানি, গাড়ি নিয়ে যখন-তখন বেরিয়ে গেছি—আমাদের দেশে এরকম স্বাধীনতা অনেক মেয়েই পায় না। অনেক ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তারা আমাকে দামি রেস্তরাঁয় খেতে নিয়ে গেছে, গাড়িতে করে বেড়িয়েছে, আর একটু আড়াল হলেই ভালবাসার কথা বলেছে, কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি? দু'তিন বছর ওরকম অনেকের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে প্রেমের রিহার্সাল

দিলে তারপর ওদের মধ্যে কেঁদে কেটে সবচেয়ে যে ভালো চাকরি করে আর সবচেয়ে যাকে ভালো দেখাতে—তাকে একদিন বিয়ে করে ফেলবে—তোমাদের মতন মেয়েদের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক।

—মোটেই স্বাভাবিক নয়! আপনি ভাবেন আপনি সব বোঝেন, তাই না? মোটেই বোঝেন না! ঐ সব ছেলেদের মুখে ভালবাসার কথা শুনলেই আমার কি রকম অ্যালার্জি হয়। সবাই একই কথা বলে! কেউ একটু রসিকতা করতে জানে, কেউ ভালো ইংরাজিতে বলে, কথা সবারই এক! এটা কি করে হয়? একটা মেয়ের সঙ্গে একটু আড়াল পেলেই সবার মধ্যে ভালবাসা জেগে ওঠে? ঘেন্না ধরে গেছে আমার ওরকম ভালবাসায়—

শেখর যেন অপর্ণার কথায় বেশ মজা পাচ্ছে—এইভাবে মুচকি হাসতে লাগলো। সিগারেট খেলেই কাশি হচ্ছে, তবু আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে শেখর বললো, আমি বুঝতে পারছি তোমার ব্যাপারটা। তুমি বড়লোকের মেয়ে, এক ধরনের হাল্কা বড়লোকের ছেলের সঙ্গেই তোমার আলাপ হয়েছে। তারা ঐরকমই তো। অন্য ধরনের ছেলেদের সঙ্গে তো মেশো নি।

অপর্ণা ঝাঁঝালো গলায় বললো, বড়লোক-গরিবের কথা এর মধ্যে তুলবেন না! গরিবের ছেলেদেরও দেখেছি—তারা প্রেম নিয়ে আরও বেশি প্যানপ্যানানি করে—তারা রসিকতা করতেও জানে না সব সময় একটা কাতর কাতর ভাব দেখায়। আমি আপনার বন্ধুদেরও ঐরকম ভেবেছিলাম!

—আমার বন্ধুদের? তারা কেউ ওরকম ন্যাকা নয়।

—আপনার কথা বলছি না, আপনি তো সাধু-পুরুষ দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনার অন্য বন্ধুরা—

—আমার বন্ধুরাও কেউ দু'একদিনের আলাপে প্রেমের কথা শোনাবে না।

অপর্ণা একটু চুপ করে বসে রইলো, সাদা ফুলগাছটার তীক্ষ্ণ কাঁটায় আঙুল বুলোতে বুলোতে আবার বললো, আমি রবিদাকেও তাই ভেবেছিলাম। রবিদা যখন একা একা আমাদের বাড়িতে গিয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে ডাকলো—আমি সেটাকেও হাল্কা ব্যাপার ভেবেছিলাম—কিন্তু তারপর থেকে সব সময় আমি মনের মধ্যে রবিদার সেই ডাক শুনতে পাচ্ছি! এরকম আমার আগে কখনো হয় নি। আমার মনে হচ্ছে—এই প্রথম আমার জীবনে একটা সত্যিকারের ডাক এসেছিল—কিন্তু আমি সেটা ফিরিয়ে দিয়েছি! আমি বোকা, দারুণ বোকা। হয়তো, আমার ভুলের জন্যই রবিদার এরকম হলো।

শেখর একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, তুমি খানিকটা দায়ী নিশ্চয়ই। তোমারই মতন আর একটা মেয়ে, তপতী তার নাম—সে-ও...

অপর্ণা হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বললো, বলবেন না! আর কারুর কথা আমাকে বলবেন না! রবিদার জীবনের অন্য কোনো কথা আমি শুনতে চাই না!

শেখরের দিকে পেছন ফিরে অপর্ণা দাঁড়িয়ে রইলো। তার সারা শরীরটা কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ তাকে সেইভাবেই থাকতে দিলো শেখর। ওর ব্যাকুলতা দেখেও শেখরের মুখ-টেপা হাসিটা মেলায় নি। যেন সারা রাত জেগে থাকার পর ভোরবেলায় এই রকম ঘটনাই ঠিক মানায়—এইরকম তার ভাব। একটু পরে, অপর্ণা নিজেকে একটু সামলে নিতে শেখর জিজ্ঞেস করলো, রুণি, এখানে একটু বসবে?

—আমার এই জায়গাটায় থাকতে কি রকম অস্বস্তি লাগছে!

চলুন এবার ফিরে যাই।

এসো। শেখর হাত বাড়িয়ে দিলো।

সদাশিব সেই একই ভঙ্গিতে বারান্দার ইজিচেয়ারে বই হাতে নিয়ে বসে আছেন। দেবকুমারকে নিয়ে বাগানে খেলা করছে পরমেশ্বর। দূর থেকে ট্রেনের শব্দ শোনা গেল! এই রকম সময়েই শেখররা এই স্টেশনে নেমেছিল।

ওরা সদাশিবের সামনে এসে দাঁড়ালো। সদাশিব চোখ তুলে বললেন, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসছে। ভয় নেই। স্বাস্থ্যবান ছেলে, সহ্য করে নেবে—

কাল রাত্রে সদাশিব একবারও প্রশ্ন করেন নি, কারা রবিকে মেরেছে, কেন মেরেছে। জঙ্গলে অত রাত্রে ওরা কেন ঘুরছিল। শুধু আহত মুমূর্ষু রবিকে দেখে তিনি বলেছিলেন, একি, এমন সুন্দর ছেলে, তার এই অবস্থা কেন? আমি এক্ষুনি ঘাটশীলার কপার মাইনস্ থেকে ডঃ সরকারকে নিয়ে আসছি, তোমরা গরম জল করে ভালোভাবে ওয়াশ করে দাও—

শেখর জিজ্ঞেস করলো, ওকে কি আজই হাসপাতালে রিমুভ করবো?

সদাশিব চোখের ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বসো।

অপর্ণা ওদের পাশ কাটিয়ে দোতলায় উঠে গেল। সিঁড়িতে দেখা হলো জয়ার সঙ্গে। জয়া উদ্ভাসিত মুখে বললো, জ্ঞান ফিরে আসছে। জ্ঞান ফেরার পরেই কি চিৎকার! কষ্ট হচ্ছে তো খুব!

সে দিদির দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললো, কথা বলতে পারছে?

—মাঝে মাঝে। বেশিক্ষণ জ্ঞান থাকছে না একসঙ্গে।

—তোকে চিনতে পেরেছে?

—হ্যাঁ। তোরা কোথায় গিয়েছিলি!

অপর্ণা ঘরে ঢুকলো। মাথার কাছে টুলে বসে আছে অসীম, অতক্ষণ পর সে তখন একটু ঘুমে ঢুলছে। অপর্ণাকে দেখে সে-ও একই কথা বললো, জ্ঞান ফিরে এসেছে রবির। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

অপর্ণা কথার উত্তর দিলো না। রবির মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। সারা মুখ জোড়া ব্যান্ডেজ...চোখ দুটো আর নাকটা শুধু খোলা। পায়েও ব্যান্ডেজ। বিছানার পাশ দিয়ে একটা হাত করুণভাবে ঝুলছে। অপর্ণা সেই হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো।

রবি চোখ খুলে তাকালো। আবছা ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে চেনার চেষ্টা করলো। চোখে কয়েকটা তরঙ্গ খেলা করে গেল। অস্ফুটভাবে বললো, কে? তপতী?

—না, আমি রুণি! অপর্ণা।

রবি আবার স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো শরীর, তবু একদৃষ্টে রুণির দিকে তাকিয়ে থেকে যেন সত্যিই ভালো করে চিনতে পারলো! সঙ্গে সঙ্গে রবি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। বিকৃত গলায় বললো, শেখর কোথায়?

অপর্ণা শক্ত করে রবির হাতটা চেপে ধরে থেকে বললো, না, হাত ছাড়িয়ে নেবেন না!

রবি আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। পারলো না। তখন সে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলো।